



উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



মাঘ
১৩৯৬
৯২ তম বর্ষ
১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

৯২তম বর্ষ

(মাঘ ১৩৯৬ হইতে পৌষ ১৩৯৭ ; ইংরেজী : ১৯৯০)

সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ





উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ছত্রিশ টাকা ☐ সডাক : বিয়াল্লিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : পাঁচ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

১২তম বর্ষ

(মাঘ ১৩৯৬ হইতে পৌষ ১৩৯৭)

দিব্যবাণী : ১, ৬১, ১২১, ১৮১, ২৪১, ৩০১, ৩৬১, ৪২১, ৪৮১, ৬১৩, ৬৭৩, ৭৩৩

কথাপ্রসঙ্গে ☐ স্বামী [illegible]নন্দ : স্বামীজীর আহ্বান—১ ; "তোমাদের চৈতন্য হউক"—৬১ ; ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—[illegible] আচার্য শঙ্করের হৃদয়—১৮১ ; একটি পূজা এবং তাহার তাৎপর্য—২৪১ ; সভ্যতার রথরজ্জু যাহাদের হাতে—৩০১ ; লোকগুরু—৩৬১ ; ত্রিশত বার্ষিকীর প্রশ্ন—৪২১ ; সত্যের অপিহিত মুখ—৪৮১ ; শুভ বিজয়া—৬১৩ ; দীপাবলীর উৎস ও তাৎপর্য সন্ধানে—৬১৩ ; ধর্মের মর্ম—৬৭৩ ; জীবনই যাঁহার বাণী—৭৩৩

স্বামী অখণ্ডানন্দ (সৎসঙ্গ-রত্নাবলী)... সাধন-ভজন ২৬৬, ৩২৮, ৩৮৯, ৬৩৭, ৬৮৮, ৭৪৯

অচিন্ত্য বিশ্বাস (কবিতা)... বিদায়বেলার কবিতা ... ৩২৬

স্বামী অচ্যুতানন্দ (পরিক্রমা)... মধু বৃন্দাবনে ৬৬০, ৭০৯, ৭৬৯

অজিতকুমার মাইতি (পরিক্রমা)... গঙ্গোত্রী ... ২২৩

অজিতেন্দ্র সিংহ (যৎকিঞ্চিৎ)... অভাজনের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ... ৬৩৯

অটলচন্দ্র দাস (কবিতা)... শব্দের শক্তি ... ৩২৫

অনিলকুমার চক্রবর্তী (প্রবন্ধ)... স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলীতে আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা ... ১৫৭

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য (কবিতা)... এক-অক্ষরা ... ৫০৪

স্বামী অভেদানন্দ (প্রবন্ধ)... স্বামী বিবেকানন্দ ... ৫

অমর ষড়ংগী (কবিতা)... হারিয়ে যাই ... ৫০৬

অমরেন্দ্রনাথ বসু (প্রবন্ধ)... মনোবিজ্ঞানী বিবেকানন্দ ... ১৮

অমলকান্তি ঘোষ (কবিতা)... তিনি ... ২৬২

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (ধারাবাহিক নিবন্ধ)... সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সংসার ... ১৫০, ১৯৬, ২৫৭

অমিয়া ঘোষ (কবিতা)... শরণাগতি ... ৭৪৭

অরুণকুমার দত্ত (কবিতা)... প্রার্থনা ... ৬৩৩

অরুণকুমার বরাট (কবিতা)... একটি শিশিরকণার স্বপ্ন ... ৩৭৯

অরুণকুমার বিশ্বাস (ধারাবাহিক নিবন্ধ)... শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সুবর্ণযুগে বিজ্ঞান-চেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য ২১৫, ২৪৯

অরুণকুমার সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ)... কোম্পানির আমলে শহর কলকাতার কিছু লুপ্ত ও বিস্মৃত নাম ... ১৬৩

(নিবন্ধ)... কলকাতায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রাচীন সচিত্র বাঙলা বই ... ৬৩৬

স্বামী অলোকানন্দ (প্রবন্ধ)... রোমাঁ রোলাঁ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ... ৩১৬

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)... ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা ... ৫২৪

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়	(নিবন্ধ)...	উনিশ শতকের কলকাতায় শরীরচর্চা	... ৪৪
অসীম মুখোপাধ্যায়	(বিশেষ প্রবন্ধ)...	জগদীশচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ	... ৭০৩
স্বামী আত্মস্থানন্দ	(ধারাবাহিক নিবন্ধ)...	সকলের মা সারদা	৩০৫, ৩৬৫, ৬১৭
আনন্দ ঘোষ হাজরা	(কবিতা)...	সঙ্কেতে, সঙ্গতে	... ১১৪
আনন্দ বাগচী	(যৎকিঞ্চিৎ)...	কিংকর্তব্য	... ৫৮৭
আশাপূর্ণা দেবী	(নিবন্ধ)...	অপচয়ের হিসাব	... ৩৪
	(নিবন্ধ)...	এযুগের উদ্বেগ	... ৫৫১
উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়	(নিবন্ধ)...	আমার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ	... ৫৭৫
ঊষারানী সান্যাল	(স্মৃতিকথা)...	স্মৃতিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ	... ৫৫০
এ. আর. ভার্মা	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	হীরের আদর এত বেশি কেন	... ৭৭৪
এম. জি. শ্রীনিবাসন	(নিবন্ধ)...	আলাসিঙ্গা পেরুমল	... ২৭১
কঙ্কাবতী মিত্র	(কবিতা)...	অনন্ত পথ আসার পর	... ৩৮০
	(কবিতা)...	পবিত্র বেদির তলায়	... ৭৪৬
কণিকা দেব	(কবিতা)...	ধ্যানের মন্ত্র	... ৫০০
কমলা সেন	(কবিতা)...	অন্তর বাজে—যন্তর বাজে	... ৫০৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী	... ৩৭০
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	তোমারই মুখের পানে চেয়ে	... ৬৯৫
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ	(স্মৃতিকথা)...	পুণ্যস্মৃতি	৪৯, ১৩৮, ২০৭, ২৬৩, ৩৩৪, ৩৯১
কৃষ্ণা দে	(কবিতা)...	জীবন	... ৭৪৮
কৃষ্ণা সেন	(প্রবন্ধ)...	রামকথা-রামকৃষ্ণকথা	... ১২৬
কেয়া তালুকদার	(প্রবন্ধ)...	শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং আমরা মেয়েরা	৭৩৯
স্বামী গোপেশানন্দ	(যৎকিঞ্চিৎ)...	সেই এক	... ১০৯
	(রম্যরচনা)...	পরীক্ষা	... ৩৩৭
	(রম্যরচনা)...	মা সরস্বতী	... ৫৮২
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)...	দেবীসূক্তে মহাশক্তির আত্মপরিচয়	... ৪৮৯
গোরাচাঁদ কুণ্ডু	(প্রবন্ধ)...	ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা	... ৭৬
চিত্রা বসু	(পরিক্রমা)...	বৃষ্টির জলপ্রপাত-ভূমি চেরাপুঞ্জিতে	... ৩৯৯
চিরপ্রশান্ত বাগচী	(কবিতা)...	উপলব্ধি	... ৬৯৫
স্বামী চেতনানন্দ	(প্রবন্ধ)...	ঠাকুর যদি আজ থাকতেন	... ৫০৮
স্বামী জগদ্যাত্মানন্দ	(নিবন্ধ)...	জীবনের এপার-ওপার ও তার রহস্য	... ২১৯
জয়নাল আবেদীন	(কবিতা)...	সম্পর্ক	... ১৯৫
	(কবিতা)...	জীবন	... ৩৮০
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)...	স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জনগণ	... ২৭
জলধিকুমার সরকার	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	পোলিও টিকা সম্বন্ধে কিছু নূতন চিন্তা-ভাবনা	... ১১১
	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	জ্বর	... ২৮৯
জ্যোতি বসু	(ভাষণ)...	মানুষের সেবাই যেখানে ধর্ম	... ৪২৭

ডালি বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)..	কতদিনে	... ৭৪৮
তপোব্রত সান্যাল	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)..	বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ	... ৩৮৯, ৬৪৫
তরুণ সান্যাল	(কবিতা)..	নাস্তিকের দেবী-বন্দনা	... ৬৩৪
তাপস বসু	(কবিতা)..	তিনি হেঁটে যাচ্ছেন	... ২৬
	(কবিতা)..	একজন মানুষ	... ৫০৬
দিলীপকুমার দত্ত	(প্রবন্ধ)..	সমকালীন কবিদৃষ্টি ও রাধাতনু শ্রীচৈতন্য	... ১০৪
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী	(প্রবন্ধ)..	যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ	... ১৯১
দেবকুমার বাগচী	(কবিতা)..	ফসল	... ৬৯৪
দেবাশিস ঘোষাল	(কবিতা)..	তোমাতেই লীন	... ৫০০
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)..	মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না শ্মশানে	... ৬০৫
দেবী রায়	(কবিতা)..	যে সত্য বিবেকানন্দ বলেছিলেন	... ৩২৫
দেবীপ্রসাদ মৈত্র	(কবিতা)..	প্রপঞ্চ	... ৫০১
স্বামী ধীরেশানন্দ	(ধারাবাহিক সঙ্কলন)..	সৎসঙ্গ-রত্নাবলী	৩২, ৯৬, ১৩৩, ২১০
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	(স্মৃতিকথা)..	রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে একদিন	... ৯১
নমিতা ঘোষ রায়	(কবিতা)..	রাত্রির গভীরে	... ১৯৫
	(নিবন্ধ)...	বাহাই ধর্ম ও সম্প্রদায়	... ৭১২
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	কর্ম	... ৫০৭
নিভা দে	(কবিতা)..	সাহারার আকাশে ফোটাই	... ৩৮০
	(কবিতা)..	কলকাতা : একটি সন্ধ্যা	... ৪০১
	(কবিতা)...	এনে দিক সহস্র ক্ষমা	... ৫০৪
স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ	(স্মৃতিচারণ)...	শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আমি কিভাবে এসেছি	... ৬৭৭
স্বামী নিত্যাত্মানন্দ	(নিবন্ধ)..	আরাত্রিক প্রসঙ্গে	. ১২৯
নিমাই মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)..	নতুন পৃথিবী	. ৩২৭
	(কবিতা)..	আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও	. ৫০৪
নির্মলকুমার রায়	(প্রবন্ধ)...	স্বামী শিবানন্দের শিবতুল্য পিতা	৭৫৩
নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়	(নিবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা চলচ্চিত্র	.. ৮৭
নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)...	বিবেক-ঋত্বিক	... ৬৯৪
পলাশ মিত্র	(কবিতা)...	বিবেকানন্দ : একটি নাম অনন্ত প্রেরণা	... ২৬
	(সঙ্কলন)...	কবিতায় কলকাতা	... ৪৬৮
	(কবিতা)...	ভোরবেলায়	... ৬৩৫
পামেলা মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	ডেকে নাও তোমার কঠিন পথে	... ২৬১
	(কবিতা)...	কোন্ সুর	... ৭৪৬
পার্থসারথি বসু	(পরিক্রমা)...	বৃষ্টির জলপ্রপাত-ভূমি চেরাপুঞ্জিতে	... ৩৯১
পূরবী মৈত্র	(কবিতা)...	মমতাময়ী	... ৭৪৬
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	(কবিতা)...	কলকাতা তুমি	... ৪৩৩
প্রগতি রায়	(কবিতা)...	ঋগ্বেদ-সংহিতা	... ১৪০
	(বিশেষ রচনা)...	রাত্রিসূক্ত : ঋষির অনুভূতি	... ৪৯৫
প্রণব ঘোষ	(কবিতা)...	হে গোপনচারী	... ২৫
	(কবিতা)...	ধন্য তুমি কলিকাতা	... ৪০১

প্রণবেশ চক্রবর্তী	(নিবন্ধ)...	বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৫৭২
প্রভাকর মাঝি	(কবিতা)...	শুভেচ্ছা : কলকাতাকে	... ৪৩১
	(কবিতা)...	রূপান্তর	... ৫০২
স্বামী প্রভানন্দ	(প্রবন্ধ)...	হরিলীলায় যেন ভেলকি লেগে যায়	... ৫৫৭
স্বামী প্রমেয়ানন্দ	(প্রবন্ধ)...	কুমারীপূজা	... ৪৯৮
বনবিহারী ভট্টাচার্য	(কবিতা)...	ভাবা	... ২৬২
বিজয়কুমার দাস	(কবিতা)...	জাগরণী	... ২৬
বিনয় বিশ্বাস	(কবিতা)...	জীবিকা ও জীবন	... ৫০১
বিভুপ্রসাদ বসু	(কবিতা)...	উদ্ভাস	... ১৯৪
বিমল মৈত্র	(কবিতা)...	ভারতভগিনী	... ৬৩৩
স্বামী বিমলাত্মানন্দ	(প্রবন্ধ)..	স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও কালী কমলীওয়ালা	... ২৯
	(প্রবন্ধ)..	কলকাতার সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন	... ৪৪২
	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)...	বলরাম মন্দির : পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি	৬২৮, ৬৮৮, ৭৫১
বিশ্বনাথ দত্ত	(বিশেষ রচনা)..	উদ্বোধনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি	... ৫৫৫
বিশ্বনাথ ভড়	(পরিক্রমা)..	মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম	... ৩৯
	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)..	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য	... ৩৪৭
বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী	(কবিতা)...	তোমার তুলনা শুধু তুমি	... ৮০
	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	আবার কবে গ্রহণ হবে	... ২৩০
ব্রত চক্রবর্তী	(কবিতা)..	মূর্তি হয়ে গেছ	... ৬৩৫
স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ	(নিবন্ধ)..	'মন্মনা ভব'	... ৩৩৯
ভক্তিমা ভট্টাচার্য	(কবিতা)..	স্বপ্নই যদি দেখেছি -	... ৭৪৭
স্বামী ভাস্করানন্দ	(পরিক্রমা)..	আইসল্যান্ডে কয়েকদিন	... ৯৮, ১৪২
	(পরিক্রমা)..	ধর্মের সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয়ায়	... ৫৯৬
স্বামী ভূতাত্মানন্দ	(কবিতা)..	ভক্ত মন	... ৮০
স্বামী ভূতেশানন্দ	(ভাষণ)..		... ৬৮
	(ভাষণ)..	শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কৃপা ও সাধনা	... ২৪৫
	(ভাষণ)..	একটি স্বপ্নের রূপায়ণ	... ৪২৫
	(ভাষণ)..	ভগবানলাভের উপায়	... ৪৮৫
মঞ্জু নন্দী মজুমদার	(কবিতা)..	সূর্যের সন্ধান	... ২৬১
মঞ্জুভাষ মিত্র	(প্রবন্ধ)..	রোমান্টিক বিবেকানন্দ	... ৯
মণিকা চক্রবর্তী	(কবিতা)..	একটি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ	১৭
মণিমোহন ঘোষ	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)..	পুষ্টিতে স্বল্পমাত্রিক মৌল উপাদানগুলির ভূমিকা	.. ৫৩
মণীন্দ্রলাল রায়	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)..	দূরভাষের উৎপত্তি ও প্রসার	.. ৬৬৩
মধুসূদন পাল	(কবিতা)..	নববর্ষ	.. ১৯৪
	(কবিতা)..	ভারত—আমার জন্মভূমি	.. ৫০৫

মানসী বরাট	(কবিতা)...	আসছে সে যে	৩২৭
স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ	(প্রবন্ধ)...	ভগবান বুদ্ধ	১৮৫
	(প্রবন্ধ)...	মহাশক্তি কালী	৬২২
রতনকুমার নাথ	(কবিতা)...	প্রভু মোর	৭৯
	(কবিতা)...	বিল্বমঙ্গল	৫০২
রথীন রায়	(কবিতা)...	বিবেকানন্দ	২৫
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	(বিজ্ঞান : প্রতিবেদন-নিবন্ধ)..	কলকাতার মশা-সমস্যা	৪৭২
রমলা বড়াল	(কবিতা)...	হতে চাই	৫০১
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	(কবিতা)...	অপরিচিতি	১৯৫
	(কবিতা)...	চলোর্মি	৫০৫
রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	(কবিতা)...	মাতৃবন্দনা	৫০০
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	প্রাচীন ভারতে ব্যাধিচিন্তা	১৭২
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)...	অন্য বাঁচা	৫০৭
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	(প্রবন্ধ)...	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা	৪০৪
	(নিবন্ধ)...	একটি লকেটের অমর জীবন	৫৭৯
শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	শারীরবিদের দৃষ্টিতে মাদকের ক্রিয়া	৪০৫
শান্ত রায়	(কবিতা)...	স্বামীজী	১৯৪
শান্তশীল দাশ	(কবিতা)...	ডাকা	৮০
	(কবিতা)...	নাস্তিক-আস্তিক	৬৩৫
শান্তি সিংহ	(কবিতা)...	স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি	২৫
	(কবিতা)...	কলকাতা	৪৩২
শান্তিকুমার ঘোষ	(কবিতা)...	অনন্ত যেখানে ভেঙে	৩৮০
	(কবিতা)...	আশা জাগে মনে	৫০৪
শিবশম্ভু সরকার	(স্মৃতিকথা)...	মহাপুরুষ মহারাজের কিছু অস্ফুট স্মৃতি	... ৭৬৩
শিবসৌম্য বিশ্বাস	(কবিতা)...	প্রেমে ও আগুনে	... ১৯৫
শিশির কর	(প্রবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম	... ৫৪১
	(প্রবন্ধ)...	সন্ন্যাসিনী যখন বিপ্লবী	... ৬৫৬
শেখ সদরউদ্দীন	(কবিতা)...	সীমার মাঝে অসীম তুমি	... ৭৯
	(কবিতা)...	তোমার গানের সুরের পরশ	... ৫০১
শোভনা ভৌমিক	(কবিতা)...	সুখ	... ২৬২
শোভারানী দাশগুপ্ত	(নিবন্ধ)...	গুরু ও গুরুশক্তি	... ৩৯৫
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	(নিবন্ধ)...	মৃত্যুঞ্জয়	... ৫০৮
সংযুক্তা মিত্র	(স্মৃতিকথা)...	স্মৃতির আলোয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	... ৬৫৮
সচ্চিদানন্দ ধর	(প্রবন্ধ)...	ভারতের জাতীয় চেতনার দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ	... ৬
	(প্রবন্ধ)...	তন্ত্রসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৩৯০
সজনীকান্ত দাস	(কবিতা)...	বিবেকানন্দ	... ২৪
সঞ্জীব কাঞ্জিলাল	(কবিতা)...	দূরে, বহু দূরে	... ৩৭৯

সত্যানন্দ চক্রবর্তী	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে কয়েকটি কথা	... ৭২৩
সনৎকুমার মিত্র	(কবিতা)...	ক্ষণিক আধার	... ৬৯৪
সন্তোষ চৌধুরী	(কবিতা)...	প্রেমের ঠাকুর	... ৫০৩
সন্তোষকুমার অধিকারী	(কবিতা)...	স্পর্শ	... ৫০৭
সন্তোষকুমার মাজী	(কবিতা)...	অন্তর্গত শব্দ	... ৫০৬
সন্দীপকুমার চক্রবর্তী	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)...	কলকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রোগ	... ৬০৩
সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	(প্রবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তি	... ৭২
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়	(পরিক্রমা)...	মহাতীর্থ বৈষ্ণোদেবী	... ৩৪৩
সমীরা দে	(কবিতা)...	চাই না ছুটির বাকি	... ৬৩৩
সরযূ দেবী	(স্মৃতিকথা)...	কলকাতায় মায়ের বাড়ীতে মাকে প্রথম দেখি	... ৪৬৬
স্বামী সহদেবানন্দ	(প্রবন্ধ)...	ঈশ্বর-বীক্ষণ যন্ত্র	... ৭১৭
সুদীপ বসু	(নিবন্ধ)...	কলকাতা ঃ দুটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ	... ২২৮
	(কবিতা)...	শতাব্দীর খেলা	... ৫০৬
সুধীরকুমার নন্দী	(প্রবন্ধ)...	শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন	... ৮১
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)...	হাওড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	... ৫৯১
সুহাসিনী ভট্টাচার্য	(কবিতা)...	নীড়ভাঙা পাখী	... ৩২৬
সোফিওর রহমান	(কবিতা)...	অঙ্ক-কবিতা	... ৫০৫
হরিপদ আচার্য	(প্রবন্ধ)...	ভক্তি	... ১৬৫
হিমাংশুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)...	যুগান্তরের শবরী	... ২৬২
হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী	(কবিতা)...	রথ দেখা কলাবেচা	... ৩২৭
	(কবিতা)...	দরজা আমার কেউ নাড়ে না	... ৬৯৫
ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী	(পরিক্রমা)...	অপরূপ নেপাল	... ২৭৮
হীরাবতী দত্তগুপ্তা	(কবিতা)...	সাধ ও সারদা	... ৭৪৭

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ঃ কুমুদবন্ধু সেন ☐ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব—৫৩৫ ; পর্বতবাসী ☐ পার্বতীদেবীর মন্দিরে—১৪৮ ; ভগিনী নিবেদিতা ☐ শিবের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা—৬৫২ ; স্বামী শুদ্ধানন্দ ☐ অজামিল ও নামমাহাত্ম্য—২০৪ ; স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ☐ রাজধানী কলিকাতা—৪৫৯ ; সরলাবালা সরকার ☐ সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী—১৫, ৯৩ ; সন্ন্যাসিনীর কাহিনী—২৬৮, ৩৩৩, ৩৮৫ ; সন্ন্যাসিনী-মা—৭০০, ৭৬০

মাধুকরী ঃ অনিল গুপ্ত ☐ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী—৭৫৭ ; স্বামী অভেদানন্দ ☐ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা—৬৬ ; কালিদাস নাগ ☐ স্বামী বিবেকানন্দ—২০০ ; পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ☐ মহাত্মা রামকৃষ্ণ—১৩১ ; গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—২৮৩ ;

ডেভিড ম্যাককাচিয়ন ☐ কলকাতা ও শহরতলীর মন্দির—৪৫২ ; নরেন্দ্র দেব ☐ স্বামীজী—৬৯৭ ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ বাঙালীর দুর্গোৎসব—৫৪৬ ; পিনাকীলাল রায় ☐ শিব ও শক্তি—৬৪১ ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ☐ স্বামী বিবেকানন্দ—১৪ ; সৈয়দ মুজতবা আলী ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব —৩২০, ৩৭৫

আনন্দের সন্তান : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ☐ সহাস্য বিবেকানন্দ—৫১

বাতায়ন : ইউরোপে ডিগ্রির সঙ্গে বয়সের অনুপাত—৪৩ ; বর্তমান জাপানে নারী—১১০ ; পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন : ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নতির শিখরে—১৪৬ ; সত্যের জন্য অনন্ত অন্বেষা—২১১ ; আমেরিকায় রোগীর অধিকার—২৮৭ ; অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্যত্র সমুদ্র-কিনারের শহরগুলির বিপদ নিয়ে ভাবনা—৩৩৩ ; বার্লিন-বিভাজন ঘুচল, খুলল ব্রান্ডেনবুর্গ দ্বার—৩৯৪ ; আমেরিকাবাসীকে নিরামিষাশী হওয়ার পরামর্শ—৬৯৬ ; দক্ষিণ কোরিয়াতে বালকের সংখ্যা বালিকার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—৭৬৮

পরমপদকমলে ☐ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : রামকৃষ্ণদাস—৪৭, চিরগুরু—১০২, লজ্জা—১৭০, সাধনা—২২৫, 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া'—২৯২, কাতরে কর করুণা—৩৫১, হাত ধর—৩৯৭, কলকাতা এবং রামকৃষ্ণলোক—৪৬৪, প্রণাম—৫৮৪, ব্যাকুলতা—৬৫০, কেন চোখের জলে—৭২১, 'দুজনেই মার সখী'—৭৭২

পুরাতনী : স্বামী অবধূতানন্দ ☐ ভববন্ধন ছেদনের উপায়—৭১৫ ; ব্রহ্মচারী সনৎকুমার ☐ রন্তিদেব-কথা—১৬১, ভোগতৃষ্ণাই দুঃখের মূল—৭৭৬

অপ্রকাশিত পত্র : স্বামী সারদানন্দ—৬৫, ৭০৮, স্বামী শিবানন্দ—৭০৭

গ্রন্থ পরিচয় : ৫৬, ১১৩, ১৭৪, ২৩৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৪১২, ৪৭৬, ৬০৭, ৬৬৭, ৬৬৮, ৭২৬, ৭২৭, ৭৭৮

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ : ৫৭, ১১৫, ১৭৫, ২৩৫, ২৯৬, ৩৫৬, ৪১৪, ৪৭৭, ৬০৮, ৬৬৯, ৭২৮, ৭৮০

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ : ৫৮, ১১৬, ১৭৭, ২৩৬, ২৯৭, ৩৫৭, ৪১৫, ৬০৯, ৬৬৯, ৭২৯, ৭৮১

বিবিধ সংবাদ : ৫৯, ১১৭, ১৭৮, ২৩৭, ২৯৮, ৩৫৮, ৪১৬, ৪৮০, ৬১০, ৬৭০, ৭৩০, ৭৮২

বিজ্ঞান সংবাদ : ৫৯, ১১৯, ১৮০, ২৩৯, ৩০০, ৩৬০, ৪৮০, ৬১২, ৭৩২, ৭৮৪

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ : ৪১৯, ৬৭২

চিত্রসূচী : ২৫২, ২৫৩, ৪৭৬ (ক), ৪৭৬ (খ), ৪৮৪ (ক), ৫৬৫, ৫৬৮(ক), ৫৬৮ (খ), ৫৬৮ (গ), ৫৬৮ (ঘ)

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।



৯২তম বর্ষ—১ম সংখ্যা	জানুয়ারি, ১৯৯০	মাঘ, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

স্বামীজী। আমি চাই একদল যুবক ... ; এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব 'তমো' পূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

*

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা, কি ব্রহ্মচর্য—সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোক কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজী। আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হলো। ... Ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মতো কাজ করে যেতে হবে।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর আহ্বান

'উদ্বোধন' তাহার আগামী কালের যাত্রাপথে আরও একটি মাইল-প্রস্তর অতিক্রম করিল। উদ্বোধন বিরানব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করিল। শতবর্ষে উপনীত হইবার আরও একটি বর্ষের ব্যবধান তাহার কমিয়া গেল। শুধু বাঙলা ভাষায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের কোন দেশীয় ভাষাতেই অপর কোন সাময়িকপত্রের নাম আমাদের জানা নাই যাহা সূচনালগ্ন হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে একানব্বই বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইবার ঐতিহ্য বহন করিতেছে। সেই হিসাবে উদ্বোধন বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাময়িক-পত্র। অবশ্য উদ্বোধন-এর জন্মের (১ মাঘ ১৩০৫ঃ ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯) পূর্বে বাঙলা ও অন্য ভারতীয় ভাষায় কয়েকটি পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের কাহারোই ঐ ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য নাই। কারণ সূচনার পর কয়েকবছর চলিয়া, হয় তাহারা সাময়িক-ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেই নহে, সর্বক্ষেত্রেই অনিয়মই ভারতবর্ষে নিয়ম হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বোধনের নিরবচ্ছিন্নভাবে একানব্বই বৎসর অতিক্রম করা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, ইহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না।

তবে এই বিরল গৌরবে আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মশ্লাঘার কিছু নাই। কারণ, উদ্বোধন যাঁহার

বাণীশরীর, উদ্বোধন-এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক সেই স্বামী বিবেকানন্দ আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মশ্লাঘাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। সংগ্রাম —নিরন্তর সংগ্রাম, সতর্কতা—নিরলস সতর্কতা এবং উদ্যমশীলতা—সদাজাগ্রত উদ্যমশীলতা ছিল তাঁহার জীবন ও চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনে যাহা তিনি স্বয়ং আচরণ করিতেন তাহাই অপরকে আচরণ করিতে বলিতেন। তাঁহার জন্মের (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩) ১২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা এবং স্মরণ করানো প্রয়োজন।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন মানুষ—খাঁটি নির্ভেজাল নিটোল মানুষ। উদ্বোধন-এর প্রকৃত গৌরব হইল একানব্বই বছর ধরিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকের সেই আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি সে জনসাধারণকে অবহিত করিবার প্রয়াস করিয়াছে। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা কবে উপনীত হইব তাহা জানি না, তবে সেই লক্ষ্যের কথা জাতিকে স্মরণ করাইবার ভূমিকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহাই উদ্বোধন নিরলসভাবে পালন করিয়া চলিয়াছে। সে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণীতে বিশ্বাসীঃ "কর্মে আমাদের অধিকার ; ফল প্রভুর হস্তে।"

'উদ্বোধন' হইতে আমরা এখন স্বামী বিবেকানন্দে আবার ফিরিয়া যাই।

১৯০৪ খৃীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি। বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসব-সভায় বক্তৃতা করিতেছেন ভগিনী নিবেদিতা। আগের দিন (৯ জানুয়ারি) ছিল স্বামীজীর পুণ্য জন্মতিথি। সেদিন হইতেই মঠে উৎসবের পরিবেশ। হাজার হাজার মানুষ আসিতেছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন যুগাচার্যের প্রতি। পরের দিনও চলিতেছে উৎসব। পূজা, বেদ-উপনিষদ পাঠ, কনসার্ট, ভজন-সঙ্গীতে মঠভূমি মুখরিত। মধ্যাহ্নে জনসভা। বহু মানুষ সেখানে সমবেত হইয়াছেন। সভার মুখ্য আকর্ষণ অবশ্যই ভগিনী নিবেদিতার ভাষণ। নিবেদিতা তাঁহার ভাষণে বলিলেনঃ "আমরা এখানে কেবল উৎসবের আনন্দে ক্ষণিক উন্মত্ত হইতে সমবেত হই নাই। যাহাতে স্বামীজীর শিক্ষা প্রাণপণে কার্যে পরিণত করিতে পারি, তাহার শক্তিলাভের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন। তাঁহার কি শিক্ষা ছিল? তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার নাম লোকে গান করুক? না, আমরা জানি, তিনি নাম যশ প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম চতুর্দিকে প্রচারিত হউক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ বা কার্যপ্রণালী সকলে অনুসরণ করুক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন কি? তিনি চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক।" 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১ মাঘ ১৩১০, পৃঃ ৩২) 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব' সংবাদে নিবেদিতার ভাষণের এই অংশটির অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, নিবেদিতা এখানে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ও আকুতির মর্মমূলে অঙ্গুলি-স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, নিবেদিতা বলিতেছেন, স্বামীজী চাহিতেন না দেশের মানুষ তাঁহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী হউক অথবা তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হউক। স্বামীজী চাহিতেন না সবাই তাঁহার (অর্থাৎ স্বামীজীর) ভাবাদর্শ গ্রহণ করুক। তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার দেশবাসী যেন মানুষের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, আত্ম-বিশ্বাসী হইয়া উঠে, আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া উঠে। তাহারা যেন 'মানুষ' হয়।

বস্তুতঃ, এই 'মানুষ' হইবার সাধনাই ছিল স্বামীজীর জীবনবেদ। স্বামীজীর মতে, 'মানুষ' হওয়ার প্রথম শর্ত হইল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-স্থাপন। তিনি বলিতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যাহার নাই সে কখনোই 'মানুষ' পদবাচ্য হইতে পারে না। তিনি বলিতেন, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য যদি একটা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে উজাড় করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমৃদ্ধি স্থায়ী হইবে না যদি সেই গ্রামের মানুষগুলি আত্মবিশ্বাসী না হয়। বাস্তবিকই তাহাই। মানুষ যদি নিজের উপর আস্থাহীন হয়, নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী না হয় তাহা হইলে জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত হওয়াই হইবে তাহার বিধিলিপি। স্বামীজী বলিতেছেন, আত্ম-বিশ্বাসই হইল আসল শক্তি। সেই শক্তিই মানুষকে জীবন-সংগ্রামে আগাইয়া চলিবার রসদ যোগায়। তাঁহার সেই বিখ্যাত বৈপ্লবিক উক্তির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিতঃ "প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক, আর নতুন ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক।"

আত্মবিশ্বাসের শক্তি মানুষকে কোথায় লইয়া যায় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি স্বয়ং। কপর্দকহীন অপরিচিত এক সন্ন্যাসী আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থানে কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। সেখানে কত প্রতিবন্ধক,

মিশনারীদের কত বিরুদ্ধ-প্রচার, নানাভাবে তাঁহার চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করার ষড়যন্ত্র এবং তাহাতে ভারতবর্ষের কিছু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের ইন্ধনদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ! তাহা সত্ত্বেও বিদেশের মাটিতে একাকী লড়াই করিয়াছিলেন তিনি। সেই কাহিনীর অনেকটাই আজ আমাদের গোচরে আসিয়াছে মারি লুইস বার্ক এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণার মাধ্যমে। তাঁহার 'পত্রাবলী'-তেও পাইতেছি ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত সেই সংগ্রামী মানুষটির চেহারা। আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে, কিন্তু সেই মানুষটিকে কোন অবস্থায় হতোদ্যম দেখিতেছি না। সবসময় যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে তাঁহার মধ্যে পুরুষকারের অগ্নি। আত্মবিশ্বাসের অটল প্রস্তর-ভূমিতে অচঞ্চল দাঁড়াইয়া আছেন তিনি। সমস্ত প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূলতার প্রতি তাঁহার চোখে বিস্তীর্ণ উপেক্ষার হাসি। অবশেষে জয় হইয়াছে তাঁহারই। এ জয় তাহার পুরুষকারের। এ জয় তাঁহার আত্মবিশ্বাসের। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি বলিতেছেনঃ ব্যর্থতা, বিফলতা তো থাকিবেই। হাজার বার তুমি বিফল হও, সহস্র প্রতিবন্ধক তোমার সম্মুখে হিমালয়ের মতো দাঁড়াক। কিন্তু তুমি পিছাইয়া যাইও না। অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, হৃদয় রক্তাক্ত হইয়া যাক। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ ব্যাধি। তুমি নির্ভয়ে অগ্রসর হও। সম্মুখে, সম্মুখে!

এ তাঁহার নিছক বাণী নহে, এই বাণীর মূর্তি ছিলেন তিনি। নিজের জীবনকে বজ্রানলে জ্বালাইয়া আপন বাণীকে তিনি সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন।

নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, স্বামীজী চাহিতেন না দেশের মানুষ তাঁহাকে পূজা করুক। ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না স্বামীজী। ব্যক্তিপূজাকে তিনি প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা করিতেন। রসিকতা করিয়া তিনি বলিতেন, মৃত্যুর পর আমি যদি দেখি তোমরা আমার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেছ, তাহা হইলে ভূত হইয়া আসিয়া আমি তোমাদের ঘাড় মটকাইয়া দিব। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, স্বামীজী পছন্দ করিতেন না কেহ তাঁহাকে অনুকরণ করুক। অনুকরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের সর্বশেষ নির্দেশই ছিলঃ "কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে, তাকে পদাঘাতে দূর করে দেবে।" 'সর্বশেষ' কথাটি আক্ষরিক অর্থেই। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই অপরাহ্নে স্বামীজী মঠে গুরুভাই ও অন্যান্যদের কথাগুলি বলিয়াছিলেন। নিবেদিতার সূত্র হইতেই তাহা জানিতে পারি। স্বামীজী বলিতেন প্রত্যেকের মধ্যে যে সহজাত শক্তি ও প্রতিভা রহিয়াছে তাহারই বিকাশ ঘটাইতে হইবে। প্রত্যেকেই যেন মৌলিক হয় এবং নিজস্ব মৌলিকতা লইয়াই গড়িয়া উঠে। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, স্বাধীন সত্তার বিকাশ, স্বাধীন কার্যধারার বিকাশ এবং সর্বোপরি স্বাধীন পথে বিকাশ—ইহাই ছিল স্বামীজীর অন্তরের অভিপ্রায়।

নিবেদিতা যখন বলিতেছিলেন, দেশের মানুষ তাঁহার প্রাণপ্রিয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাতলে সমবেত হউক, তাঁহার অনুগামী হউক, স্বামীজী ইহাও চাহিতেন না, তখন তিনি এইকথাই বলিতে চাহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী হওয়া অথবা তাঁহার মতাদর্শের অনুসারী হওয়াতে যে শুধু ভারতেরই নহে, সারা জগতেরই কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা স্বামীজীর চাহিতে বেশি আর কেই-বা জানিতেন? কিন্তু তিনি চাহিতেন না মূর্খের মতো, অন্ধের মতো মানুষ তাঁহাকে গ্রহণ করুক। আগে বুঝুক, বিচার করুক, হ্যাঁ—ইচ্ছা হইলে চ্যালেঞ্জ করুক। সমস্তই করুক স্বাধীনভাবে। তারপর যদি মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণযোগ্য তখন তাঁহাকে গ্রহণ করুক, তাঁহাকে অনুসরণ করুক, যেমন স্বামীজী স্বয়ং করিয়াছিলেন। (লক্ষ্য করিতে হইবে এখানে 'অনুসরণ' করিবার কথা বলা হইল, 'অনুকরণ' করিবার নহে।) শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাই চাহিতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথ যেন নির্বিচারে কোন কিছুকেই মানিয়া না লন। শুধু নরেন্দ্রনাথ কেন, সকলের সম্পর্কেই ছিল তাঁহার ঐ একই মনোভাব। একবার তিনি একজনকে একটি কথা বলিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেছেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করিতেছেন। তখন উপস্থিত একজন লোকটিকে বলিলেনঃ উনি যখন বলিতেছেন তখন মানিয়া লউন না। শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলিলেনঃ ওকি কথা! আমি বলিতেছি বলিয়াই মানিয়া লইবে সে কেমন কথা? এসব আমি পছন্দ করি না। কেন সে নির্বিচারে আমার কথা মানিয়া লইবে?

এই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামীজী। গুরুর জীবন দেখিয়াই তিনি জানিয়াছিলেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশই হইল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূলমন্ত্র। গুরুর কাছেই তিনি শিখিয়াছিলেন ব্যক্তিপূজাকে ঘৃণা করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গুরু, কর্তা আর বাবা—এই তিনটি সম্বোধন তিনি সহ্য করিতে পারেন না। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ তিনটি সম্বোধনের মধ্যে আছে ব্যক্তিপূজার শিকড়। সেই শিকড়কেই উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গুরুর শিক্ষায় শিক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দও সারাজীবন ধরিয়া তাহাই করিয়া গিয়াছিলেন। দেশে-বিদেশে তিনি

গুরুর কথা প্রায় বলেনই নাই। তাঁহার নামই প্রায় অনুচ্চারিতই রহিয়া গিয়াছে বলা যায়। ইহা লইয়া তাঁহাকে সমালোচিত হইতে হইয়াছে নিজের গুরু-ভাইদের কাহারও কাহারও কাছেই। তাঁহারা তখন বোঝেন নাই শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ব্যক্তিমাত্র নহেন, ব্যক্তি-সত্তার অতিরিক্ত একটি মহত্তর সত্তা তাঁহার আছে। সেই সত্তা নৈর্ব্যক্তিক। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আদর্শের নাম, নানা ভাবরাশির সমষ্টিভূত একটি মানববিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি প্রতীক। স্বামীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন আলাসিঙ্গা পেরুমল) স্বামীজীর কাছে পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। তিনি তাহার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের জানাইয়াছেনঃ "রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করিবার জন্য জেদ করিও না। তাঁহার ভাব প্রচার কর।" স্পষ্টতর ভাষায় নিজের শিষ্যদের এবং সেই সঙ্গে নিজের গুরুভাইদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেনঃ "সব মহাপুরুষদের চেলারাই চিরকাল ভাব-উপদেশগুলির সঙ্গে গুরুর ব্যক্তিত্বকে অচ্ছেদ্যভাবে মিশাইয়া ফেলে এবং অবশেষে ব্যক্তিকে বড় করিয়া তুলিয়া ভাবগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ যেন এই ধরনের হঠকারিতা না করেন, তাঁহাদের সেইবিষয়ে সাবধান থাকিতেই হইবে। ভাবরাশিকে জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য কাজ কর, ব্যক্তির প্রচারের জন্য নহে।"

নিবেদিতা জানিতেন তাঁহার আচার্যকে। এই জানা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। আমরা জানি তিনি স্বামীজীর নিকট চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আত্মসমর্পণ ব্যক্তি-বিবেকানন্দের কাছে নহে, আদর্শ-বিবেকানন্দের নিকট। এবং এই আত্ম-সমর্পণের পটভূমিতে রহিয়াছে অনেক সংঘর্ষ, অনেক সংঘাত, অনেক প্রশ্ন। সেইসবের সেতু পার হইয়াই নিবেদিতা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন প্রত্যয়ের প্রস্তর-দ্বীপভূমিতে। সেখানে আসিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেনঃ বিবেকানন্দকে পূজায় নহে, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সংগ্রাম ও সাধনাতেই বিবেকানন্দের একমাত্র এবং পরম পরিতৃপ্তি।

স্বামীজী জোর দিতেন 'হওয়ার' উপর। 'মানুষ' হওয়ার উপর। প্রশ্ন উঠিতে পারেঃ মানুষ তো আমরা আছিই। নূতন করিয়া আবার কি মানুষ হইব? হ্যাঁ. মানুষ আমরা আছি ঠিকই। কিন্তু সে শুধু আকৃতিতেই। ব্যবহারে মানুষ আমরা কি সবাই? না, অধিকাংশই আমরা তাহা নহি। কি করিয়া তাহা হইব? স্বামীজী বলিলেন, ধর্মের দ্বারা। 'ধর্ম' শব্দটি যদি কাহারও অপছন্দ হয় সেজন্য বলিলেন 'আধ্যাত্মিকতা'—স্পিরিচুয়্যালিটি'। *কিন্তু এই 'ধর্ম' বা 'আধ্যাত্মিকতা' বস্তুটি* কি? পূজা-পাঠ, ব্রত-উপবাস—মন্দির-মসজিদ-গীর্জা, বেদ-বাইবেল-কোরাণ, সাধু-ফকির-পাদ্রী, মক্কা-কাশী-জেরুজালেম? না, স্বামীজী বলিলেন, প্রকৃত ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ঐগুলির কোন সম্পর্ক নাই, থাকিলেও তাহা নিতান্তই গৌণ। ধর্ম হইতেছে, স্বামীজী বলিলেন, সেই প্রক্রিয়া, সেই বিজ্ঞান যাহা পশুকে মানুষ এবং মানুষকে দেবতা করে। আমরা অধিকাংশই মানুষরূপী পশু। ধর্ম আমাদের ভিতরের পশুত্বকে নাশ করায়। ধর্ম আমাদের, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'মান হুঁশ' করায়। আমার মধ্যে যে মনুষ্যশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যে দেবশক্তি সুপ্ত হইয়া আছে, তাহার বিকাশ করায় ধর্ম। আসলে ধর্ম মানুষের মধ্যস্থিত শক্তির বিকাশ ঘটায়। ধর্ম মানুষকে বলে, স্বামীজী বলিতেছেন, তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি দুর্বল নহ। তুমি ক্ষুদ্র হইতে পার না, তুমি দুর্বল হইতে পার না। কারণ, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তুমি তোমার সেই মহিমা সম্পর্কে সচেতন হও। তোমার সেই মহিমা তোমার কর্মে, তোমার আচরণে, তোমার সমগ্র জীবনে প্রকট কর, প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর হও। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বর হউক। কারণ, প্রত্যেক মানুষই অব্যক্ত ঈশ্বর।

ঈশ্বর হওয়াতেই মানুষের চরিতার্থতা। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ সেই ঈশ্বর হওয়ারই ইতিবৃত্ত। এই চরিতার্থতা, এই পরিপূর্ণতা মানুষকে স্বয়ং অর্জন করিতে হইবে। অর্জন করিতে হইবে সাধনার দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা। গীতায় উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাবাণী পুনরুচ্চারণ করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্।" নিজেকে নিজেই উদ্ধার করিতে হইবে। সেই বাণীই দিয়া যাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই 'উদ্ধার'ই মানব-জীবনের লক্ষ্য। 'উদ্ধার' কেন? কারণ তাহা আমারই ছিল, এখন হারাইয়াছি, অথবা আড়ালে রহিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সেই সন্ধানের সাধনাই মানুষের সাধনা, মানুষের ধর্ম। আর তাহার প্রাপ্তিতেই সেই সাধনার সমাপ্তি, ধর্মের লক্ষ্যে উপনয়ন। স্বামীজী বলিলেনঃ "উঠ, জাগ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার লক্ষ্যে না পৌঁছিতেছ ততক্ষণ থামিও না—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" ইহাই বেদান্তের মূলকথা। বেদান্তের সেই মর্মবাণীকেই স্বামীজী প্রচার করিয়াছিলেন। প্রচার করিয়াছিলেন নূতন ভাবে, নূতন ভঙ্গিতে, যুগোপযোগী ভাষায়।

প্রবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

নারায়ণজ্ঞানে জীবের সেবা।—জীবে দয়া নয়। 'দয়া' শব্দে উঁচু-নীচু ভাব আনয়ন করে, আর আশ্রিত, করুণাপ্রার্থী, এরূপ ভাব প্রকাশ পায়। দীনহীনকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা বা সেবা করা। স্বামীজী এই নূতন ভাব প্রচার করলেন। অবশ্য এই ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই ছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ভাব প্রচার করলেন। দরিদ্রের দুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণ কাঁদত। মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী যাওয়ার সময় দেওঘরে বৈদ্যনাথ দর্শন করবার জন্য কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। একদিন তিনি নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষের কষ্ট দেখে কাঁদতে কাঁদতে মথুরবাবুকে বললেনঃ "মথুর, এইসব দরিদ্রনারায়ণ। এদের মাথায় তেল নেই, পরিধানে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নেই। এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তুমি এই দরিদ্রনারায়ণদের সেবা কর। এদের তেল দাও, কাপড় দাও, ভাল করে খাওয়াও; তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।" মথুরবাবু ভক্ত ছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে সেইসব দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করলেন।

নেতা হওয়া শক্ত। যে সকলের সেবা করতে পারে, সে-ই নেতা হতে পারে—servant of all. শুধু হুকুম চালালে হয় না। স্বামীজীর কোন অভিমান ছিল না। তাঁর অনেক গুণ ছিল—আমাদের একটু-আধটু গুণ আছে। স্বামীজী কখনো গুরুভাইদের হুকুম করতেন না। বলতেনঃ "আমি তোদের দাস। তিনি গুরুভাইদের কি সম্মানই করতেন, কি ভালই বাসতেন! মানুষকে ভালবাসার দ্বারাই আপনার করে নিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ভালবাসায় বশ করেছিলেন। তাইতে আমরা বাপ-মাকে ভুলে গিয়েছিলাম। ভালবাসা-দ্বারা মানুষকে গোলাম করা যায়। স্বামীজী আমাকে ভালবাসতেন। তাইতে আমি তাঁর গোলাম হয়েছিলাম। তিনি নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিতেন। এটাই হচ্ছে সন্ন্যাসীর আদর্শ। মানের কাঙাল হতে নেই। স্বামীজী নিজে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু তিনি তার প্রেসিডেন্ট হলেন না।

স্বামীজী দেশোদ্ধারের কথা বলেছিলেন। বাস্তবিকই দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। দ্বিতীয়বার স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিউ ইয়র্ক যান, তখন আমাকে বলেছিলেনঃ "দ্যাখ, কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত আমাকে কি reception দিয়েছে! আমায় কি সম্মান করেছে! দেশটা মেতে গিয়েছিল। আমায় তখন ইংরেজ কেন জেলে দিলে না! তাহলে সমস্ত দেশটা ক্ষেপে যেত! দেশটা উদ্ধার হতো! স্বরাজ আসত।" স্বামীজীর মধ্যে এইসব ভাব ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় ভাই ছিলেন। চিরদিন তাঁকে মান্য করে এসেছি। তিনি যখন যা আদেশ করতেন, তাই করতাম। তাঁর আজ্ঞাবহ ছিলাম। বিবেকানন্দ দেবতা। বিবেকানন্দ জ্ঞানের অবতার। তিনি বলেছিলেনঃ "আমি যা জগতকে দিয়ে গেলাম, তা বুঝতে ঢের দিন লাগবে।" বাস্তবিকই তাঁর ভাব দিন দিন একটু একটু লোকে বুঝতে পারছে। যতদিন যাবে ততই লোকে ক্রমশঃ তাঁর ভাব বুঝতে পারবে। তিনি নিউ ইয়র্ক-এ আমাকে বলেছিলেনঃ "আমি এত বড় হয়েছি এই ক্ষুদ্র শরীর আমায় ধারণ করতে পারছে না। আমি শিগ্‌গীরই দেহত্যাগ করব।" আমি মনোমোহন থিয়েটারে বক্তৃতায় বলেছিঃ "বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ ক'রে হৈচৈ করলে তাঁকে মান্য করা হয় না। তাঁর নামে মন্দির তৈরি করলুম আর দুটো ফুল ফেলে দিলুম 'বিবেকানন্দায় নমঃ' বলে—তাহলেই তাঁর পূজা হলো না। তিনি তা চাইতেন না। তাঁকে মানি আর নাই মানি, তিনি যা বলেছিলেন তা যদি কার্যে পরিণত করতে পারি, তখনই তাঁকে প্রকৃত মান্য করা হবে, তখনই তাঁর প্রকৃত পূজা করা হবে, আর তখনই তিনি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করবেন।"*

* যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, ৩য় ভাগ, ১ম সং, ১৩৮২, পৃঃ ৫৬, ৮১, ৯৫, ১৩২, ১৭১, ১৮৩

সংগ্রহঃ নারায়ণচন্দ্র গুহরায়

ভারতের জাতীয় চেতনার দিশারী
স্বামী বিবেকানন্দ

সচ্চিদানন্দ ধর

জাতীয় চেতনার মূল সুরের প্রবক্তা

প্রত্যেক জাতিরই জাতীয়তাবোধের একটা মূল সুর বা সূত্র থাকে। এই মূল সূত্রকে ধরেই জাতি-বিশেষ তার সমগ্র চিন্তা এবং কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা লাভ করে। জাতীয় জীবনের এই মূল চেতনাকে বিস্মৃত হলেই সেই জাতি তার বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয়তাবোধের সচেতনতাই জাতির প্রাণ। ইংরেজ শাসন, ইংরেজী শিক্ষায় মন্দ জিনিসকে অনুকরণ এবং খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের অপপ্রচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় চেতনাবোধে একটা সংশয় ও বিপর্যয় এসেছিল। এই জাতীয়তাবোধের বিপর্যয় সম্পর্কে তদানীন্তন চিন্তাশীল, ধর্মপ্রাণ এবং স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়মাত্রেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনমুক্ত করে, ভারতীয়-ভাবে সর্বপ্রকারে সমুন্নত করার জন্য বহু মনীষী ব্যক্তি এবং সংস্থা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সচেষ্ট ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, প্রার্থনা-সমাজ, বেদসমাজ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য সংস্থা এবং ব্যক্তি ভারতের সর্বত্রই কোন-না-কোন ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই যথার্থ ভারতপ্রেমিক এবং এঁদের প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে 'ভারতীয়ত্ব' চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে সহায়তা করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে কারও প্রচেষ্টা সীমিত থেকে গেছে ধর্মের বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে, কেউ চেয়েছেন সমাজ-সংস্কার (জাতিভেদ প্রথা দূর, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি) কেউ চেয়েছেন বিদেশী ইংরেজ-শাসনের অবসানের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। ভারতবর্ষকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে তখনকার পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ আমাদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল নিঃসন্দেহে এবং নবভারত গঠনে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বা রাজনীতির মাধ্যমে দেশের বৈষয়িক উন্নতির কথাটাই আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে স্বাভাবিক কারণেই প্রভাবিত করেছিল। তাই ভারতের নবজাগরণে কোন্ ভাবনাকে আমরা মৌলিক ভারতীয়ত্ববোধের আশ্রয়রূপে অবলম্বন করব তা ভারতের মানুষ বুঝে উঠতে পারেনি। ভারতের এই জাতীয় জীবনের নব জাগরণের প্রাতঃসন্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম দৃঢ় কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন ভারতের জাতীয় চেতনার মূল সুর ধর্ম—রাজনীতি বা অন্য কিছু নয়।

ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শিকাগো ধর্মসভা থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত স্বামীজী তাঁর যে-সকল বাণী প্রচার এবং কর্মধারার প্রসার করে গেছেন তার মূলকথাই হলো ভারতের জাতীয় জীবনের মূলসুর ধর্মকে জানা, সেই আদর্শকে নিজ জীবনে রূপায়িত করা এবং সেই আদর্শের দ্বারাই ভারত-বর্ষকে উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র বিশ্বে এই ভাবকে প্রচার করা। শিকাগো ধর্মসভার পর স্বামীজী চার বৎসর কাল পাশ্চাত্যে ভারতের সার্বজনীন ধর্ম বেদান্ত প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় জীবনাদর্শ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্বজনীন প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকেই বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেন। এর ফলে বিশ্ববাসী ভারতীয় আধ্যাত্মিক-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শিখল এবং হীনম্মন্যতায় পীড়িত ভারতবাসী ও জাতীয় জীবনের গৌরবদীপ্ত মূল সূত্রটির সঙ্গে পরিচিত হবার অনুপ্রেরণা পেল। যে ধর্মবোধকে স্বামীজী ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলে-ছেন, যাকে অবলম্বন করে ভারতের জাতীয় জীবনের নব জাগরণ করতে চেয়েছেন তার যথার্থ স্বরূপ কী

এবং কিভাবে এই ধর্মবোধকে ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবের মহামিলনে প্রয়োগ করতে হবে তারও নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্বামীজী কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রতিদিনের আলাপচারিতায় যে ভাবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ভাবকে ভারতে ও বিশ্বে কার্যকর করতে চেষ্টা করেছেন, তা থেকেই বুঝা যাবে স্বামীজী ধর্মের ভিত্তির ওপরই কিভাবে ভারতের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবোধের মূল চেতনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

শিকাগো থেকে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই কলম্বোতে স্বামীজী প্রথম যে ভাষণ দিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন—ধর্মই ভারতের মুখ্য সম্বল, ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নয়; কখনো ছিল না, আর কখনো হবেও না। পরবর্তী সমস্ত বক্তৃতাতেই ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত হলো। আর দৃঢ়ভাবে একথাও বললেন: "ভালই হউক, আর মন্দই হউক—ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত।... এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।"[১] ধর্মকে জাতির মেরুদণ্ড জেনে এই ধর্মের পথেই দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন স্বামীজী: "আমার আদর্শ—জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি।"[২] "যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।"[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা

স্বামীজী ভারতবাসীকে যে ধর্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করে বিশ্বে সেই ধর্মবোধকে প্রচার করার দায়িত্ব নিতে বলেছেন—তা হলো ভারতের বেদান্ত। এই বেদান্তের নব-ভাষ্যকার বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী ভারতবর্ষকে ও তাঁর ধর্মবোধকে উপলব্ধি করেছেন তিনটি উৎস থেকে—(১) ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্র, (২) ভারতীয় জনগণ এবং (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ। আপাত-বিরোধী বহুধা-বিভক্ত ধর্মচেতনার অখণ্ড সর্বজনীন হিন্দুধর্মের ভিত্তি হলো বেদান্ত। স্বামীজী সেই সর্বাবয়ব বেদান্তকেই হিন্দুধর্মের তথা বিশ্বধর্মের ভিত্তিরূপে উপলব্ধি ও প্রচার করেছেন। বেদান্ত জীবে ও ব্রহ্মে অভেদবুদ্ধি দান করে। অধিকারী-ভেদে ধর্মের বহুত্বকে স্বীকার করেও মৌলিক ঐক্যকেই স্বীকার করে। বেদান্তই মানুষের সাম্য-স্বাধীনতা এবং মুক্তির একমাত্র প্রবক্তা। বেদান্তের একত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই আধুনিক রাজনৈতিক সাম্যবাদী বলতে পারে সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ভাবনায় এবং 'চোখখোলা' অনুভবেই বুঝেছিলেন সকল মানুষের মধ্যে একই ব্রহ্ম বিরাজমান।

যে-ধর্মবোধ সাকার নিরাকার নিয়ে দ্বন্দ্ব করে না, যে-ধর্মবোধ নিজের মুক্তি অপেক্ষা অপরের মুক্তির সাধনাকে অধিকতর মূল্য দেয়, যে-ধর্মবোধ দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞদের মধ্যে নিজের সত্তাকেই উপলব্ধি করে তাদের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে—সেই নব-বেদান্তেরই বেত্তা এবং প্রবক্তা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই ভাববাহক। শ্রীরামকৃষ্ণের নব-বেদান্ত মানুষের পেটের চিন্তাকে অস্বীকার করে না, সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয় না, আবার মানুষের বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক চিন্তাকেই জীবনের সম্মুখে স্থাপন করে। সেই বেদান্তভিত্তিক ধর্মবোধের উপরই বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। জাতীয় সংহতি একমাত্র বেদান্তের ভিত্তির ওপরই সম্ভব। ধর্মাদর্শবিহীন জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যে ব্যর্থ হতে দেখেই স্বামীজী ভারতের ধর্মাদর্শীয় জাতীয়তা-বাদের ওপর বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণে বেদান্ত যেভাবে "ত্যাগ ও

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড (১ম সংস্করণ), পৃঃ ৬৭

২ ঐ, পৃঃ ৮৫ ৩ ঐ, পৃঃ ৪৬

সেবাদর্শে" নবরূপ ধারণ করেছে—সেই ভাবেই হবে ভারতের নবজাগরণ এবং আত্যন্তিক কল্যাণ। এই ভারতীয় বেদান্তভাবনাই ভারতকে জাগাবে—এবং বেদান্তভাবনায় ভাবিত ভারত বিশ্বে মহা ঐক্য এবং মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা করবে। স্বামীজীর মতে "কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নয়। বেদান্তই পারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে।"[৪] স্বামীজী বলছেন: "বেদান্তের এই আদর্শ যে শুধু ভারতেই খাটিবে তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"[৫]

বেদান্তভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দেশের উন্নতির পর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য সেই ভাবকে বিশ্বের সর্বত্র প্রচারের জন্য স্বামীজী ভারতবাসীকে উৎসাহিত করেছেন: "ধর্মপ্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে; জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট প্রচার করিতে হইবে।"[৬]

ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিকতাকে জাতীয় জীবনের মূল সুর হিসাবে গ্রহণ করতে না পারলে শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতিদ্বারা ব্যক্তির বা জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়—এই সত্যটি উপলব্ধি করেই স্বামীজী সমগ্র বিশ্ববাসীকেই এই ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

স্বামীজীর বেদান্তভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনাকে আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ এবং সুভাষচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত করতে তাঁরা সফল হননি। স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ ছিল দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-সংস্কার এবং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাও স্বামীজীর সর্বাবয়ব বেদান্তভাবনারই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড (১ম সংস্করণ), পৃঃ ৭১

৫ ঐ, পৃঃ ৮৭ ৬ ঐ, পৃঃ ১১৩

রোমাণ্টিক বিবেকানন্দ

মঞ্জুভাষ মিত্র

রোমাণ্টিক বিবেকানন্দ? কথাটা হয়তো একটু নতুন শোনায় আমাদের রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ, রোমাণ্টিক শেলী ইত্যাদি শব্দবন্ধে অভ্যস্থ কানে। রোমাণ্টিক অর্থাৎ কবি, কবি আর সন্ন্যাসীকে কে আর একের মধ্যে মিলিয়ে দিতে পারে। আমাদের মনের মধ্যে হয়তো ছায়া ফেলে যেতে পারেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে 'সাধক রবীন্দ্রনাথ' বলে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি,' 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' ইত্যাদি উপনিষদীয় মন্ত্রের উচ্চারক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শান্তি-নিকেতন নিবন্ধমালায়, গীতালি-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য কাব্যবৃত্তে, আত্মপরিচয় গ্রন্থের জীবনদেবতাতত্ত্বের নির্মিতিতে সর্বোপরি 'মানুষের ধর্ম' তথা 'Religion of Man' প্রভৃতি গ্রন্থের সাক্ষ্যে আমরা তাপসহৃদয় বলে সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু জীবন প্রত্যয়ে তিনি কবি, তিনি ছিলেন রূপের তাপস, সৌন্দর্যের তপস্যাকারী। স্বামী বিবেকানন্দকে মানবমঙ্গলের তপস্যাকারী বলতে পারি, তাঁকে কোন অর্থে রোমাণ্টিক বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

রোমাণ্টিকতার অর্থ কল্পনার পরিপূর্ণ উন্মীলন; এই কল্পনা মানবকল্পনা যেহেতু তা এক বিশিষ্ট মানবিক বৃত্তি। রোমাণ্টিক কবিসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্লেক একবার বলেছিলেন, কল্পনার জগৎ হচ্ছে অনন্তের জগৎ অসীমের জগৎ। প্রতিতুলনায় মর্তজগৎ হচ্ছে সীমাবদ্ধ ও বস্তুগ্রাহ্য, বস্তুর চিরন্তনত্বকে অনুসন্ধান করতে হলে প্রবেশ করতে হবে কল্পনার জগতে। একমাত্র মানবকল্পনার যোগেই আমরা জগদীশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে শুভবোধে যুক্ত হতে পারি অথবা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। এই অন্তর্জ্ঞানের কারণেই দীপ্তিমান ব্লেক বলতে পেরেছিলেন:

> "ক্ষমা ও করুণা, ভালবাসা আর শান্তি আছে বলে
> ঈশ্বর হয়েছেন আমাদের পিতা প্রিয়তম।"
>
> (The Divine Image:
> Songs of Innocence)

পাশাপাশি স্মরণ করি 'ভাববাদী' বিবেকানন্দের 'হিন্দুধর্ম' নামক বক্তৃতায় উচ্চারিত বাক্যসমূহ: "বিশ্বজগতের পিতা, অনন্ত সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতালাভ করে, তবে তখন তাহাকে অনন্তও হইতে হইবে।"[১] ঈশ্বর অনন্ত এই বোধ থেকে যিনি মানুষের আত্মার মধ্যে অনন্তশক্তি আছে এই বোধে উপনীত হন তিনি আত্যন্তিকভাবে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন। অধিকন্তু একমাত্র উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির সাহায্যেই এই ধরনের বৈপ্লবিক প্রতীতি ও প্রত্যয়ে পেঁছানো সম্ভব। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ রোমাণ্টিক কবিদের মতোই ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট কল্পনাসমৃদ্ধ ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে রোমাণ্টিক ধারণাবলী সাহিত্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) মানসী, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যকবিতা একালেই লেখা। অন্যদিকে তিনি একজন রোমাণ্টিক কবি, বিশিষ্ট আত্মসন্ধানী এবং গীতিকবি। আত্মার নিরন্তর অনুধ্যানে রোমাণ্টিকতা থেকে গীতিকবিতা ও গীতিকবিতা থেকে রোমাণ্টিকতায় যাত্রা সতত সুগম। স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩—১৯০২) অলৌকিক জীবনবিকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটে এবং তাঁর মতো আত্ম-জিজ্ঞাসাব্যাকুল, আত্মবিদ মনস্বী বিরল।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থে একজন বিশিষ্ট রোমাণ্টিক যে তিনি সুতীব্র কল্পনাশক্তির অধিকারী, আত্মার গভীরে অবতরণক্ষম এবং অদম্য মানবপ্রেমিক মানবতাবাদী। ছবিতে তাঁর দুটি পদ্মপলাশ চক্ষু, দৃঢ়সুন্দর ওষ্ঠদ্বয়, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল ও ঘনকৃষ্ণ কেশদাম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনের অ্যালবামে রাখা শেলী, কীটস, বায়রণ অথবা যুবক রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি একের পর এক জেগে ওঠে এবং মনে হয় এমন মুখাবয়ব হলেও হতে পারত একালের কোন শ্রেষ্ঠ কবির। কিন্তু আলোচ্য মানুষটি কবির ভাববাদের পরিবর্তে এক অভিনব আধ্যাত্মিক

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড (১৩৬৯), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২২৫

কর্মবাদকেই জীবনের অন্যতম প্রধান দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নপ্রচেষ্টাই ছিল সেই কর্মবাদের কেন্দ্রে। বিপ্লবী রুশো এক মুক্ত মানবজাতকের কথা বলেছেন যে সতত সর্বত্রই বন্দী। মুক্ত প্রমিথিয়ুসের জীবনসঙ্কেতে মহাকবি শেলী মানুষের জীবনপ্রতিমা কিভাবে অনন্তের সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় দেখিয়েছেন, যেখানে সে অস্পর্শিত দ্যুলোকের সমুচ্চ নক্ষত্রের মতো ঊর্ধ্বচারী —'The loftiest star of unascended heaven.' আমেরিকায় উইলিয়াম জেমস নিরন্তর বলে চলেছিলেন মানুষ শক্তির এক দশমাংস মাত্র ব্যবহার করে যেহেতু ইচ্ছাশক্তির তীব্র স্বরূপ সম্বন্ধে সে মোটেই অবহিত নয়। আর স্বামী বিবেকানন্দ ব্যথিত দুঃখিতমনা হয়েছিলেন ভ্রষ্ট মানুষ ক্রমাগত পশুত্বকে তার জীবন-চর্চার বিষয় করে তুলেছে বলে; তিনি বলেছিলেন 'অভীঃ' অর্থাৎ নিরন্তর সাহসী হয়ে ওঠাই মানব-চারিত্র্য। আচরণধর্মে এক পথপ্রদর্শনকারীরূপে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেই আগ্নেয় বাণী "আমি ধ্যান করি সিংহের হৃদয়।" অথবা যেমন রচনাবলীতে প্রিয় কঠোপনিষদ্ থেকে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নন—এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানেই বুঝতে পারি ঐতিহাসিক কারণে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে স্বামীজী কেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রিয় প্রেরণাদাতা হয়ে উঠেছিলেন।

রোমাণ্টিক কবিরা মানবপ্রেমের ধারণা দ্বারা পরিচালিত, মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁদের মানব-মুক্তির পথনির্দেশে প্রবর্তিত করেছে। শেলী যেমন তাঁর 'মিলেনিয়ামে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন, এক আদর্শ মানবসমাজ যেখানে মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার করে না; অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে যেমন ভিড় করে এসেছিল সাধারণ মানুষেরা—কবিকল্পনায় উজ্জ্বল তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল অসাধারণের মণিমুকুট। আর 'পুনশ্চে' রবীন্দ্রনাথের কোপাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অগণিত নামহারা ভাষাহারা সাধারণ মানুষের প্রতীকী রূপ। বিবেকানন্দও আজীবন মানুষের প্রতি এক অসাধারণ ভালবাসা ও মমতাবুদ্ধিদ্বারা পরিপ্লাবিত হয়েছিলেন; তাঁর মানসসত্তা এই সুতীব্র মানবপ্রেমদ্বারাই পদে পদে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল সেবামূলক মানবধর্মের অভিমুখে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন এই স্বপ্নেরই কায়রূপ, নররূপী নারায়ণের সেবার এক মহতী ভাবকেন্দ্র। এই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য নিরন্তর তিনি অর্থসংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন স্বদেশে ও বিদেশে; স্বামীজীর রাজকীয় চারিত্র্যমহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েই স্বদেশী রাজরাজড়া বা ধনাঢ্য পাশ্চাত্যবাসীরা মিশনের কাজে অর্থদান করেছেন। একইভাবে একদা রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যা মিলন কেন্দ্র শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহচিন্তা ভারতবর্ষের নানাস্থানে অথবা সুদূর ইওরোপ আমেরিকায় ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেও বিস্মৃত হতে পারেননি।

বিবেকানন্দ একদিকে যেমন মানবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দেশ করেছেন, অন্যদিকে ধর্মের বেদ-উপনিষদ্-নির্দেশিত নিগূঢ় অর্থটি সম্বন্ধেও ভারতবাসীকে বারংবার সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—এই বিশ্বনিসর্গে যা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা-ই আবার সামান্য অণু-পরমাণুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্ররূপে ঘটে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মানুষ ক্ষুদ্র, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন; কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় মানুষ বৃহৎ, এক, অখণ্ড। এখান থেকে ধর্ম ও নীতিবাদের প্রকৃত অর্থের উৎপত্তি। ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের অবলোপ ও সত্তার নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের উপলব্ধি আমাদের জানতে শেখায় যে তোমাকে আমি যখন আঘাত করি তখন নিজেকেই আঘাত করি এবং তোমাকে যখন সাহায্য করি নিজেকেই সাহায্য করি। বলা বাহুল্য দ্বিতীয়টিই আমাদের অভিপ্রেত। 'আমি'র সঙ্গে এই বিশ্বযোগ যা-সব মানুষের মধ্যে সহমর্মিতার মেলবন্ধন রচনা করে দেয়, বস্তুজাগতিক খণ্ডরূপগুলিকে বিলুপ্ত করে দেয় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও পরিচিত ছিলেন; স্মরণ করি 'সেঁজুতি' কাব্যে তাঁর অসাধারণ উচ্চারণঃ "যে আমি রয়েছে তোমায় আমায় সে আমি আমারি আমি।" এটুকু বুঝবার পর হৃদয় মানুষের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রীবুদ্ধিতেই জেগে ওঠে, কিন্তু পৃথিবীতে এই সহজটুকুই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। যা হোক বিবেকানন্দের পূর্বোক্ত 'ধর্মের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য' (Methods And Purpose of Religion) প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমরা অনুভব করতে

পারি সংকীর্ণ ব্যবহারিক ধর্ম এভাবেই হয়ে ওঠে উদার মানবধর্ম। এই মানবধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে এক ধরনের সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে এই চিরমানবের এবং মানবধর্মের কথাই বলেছিলেন, "আমার অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।" এই মানুষের উপলব্ধিতেই সর্বমানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি ঘটে।

উপনিষদের ঋষিদের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ আত্মার সৌন্দর্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই আত্মা রয়েছে সকল অণুতে, সর্বত্রগামী, সর্ব বস্তুর সারাৎসার, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তার নিরন্তর মানসবিহার অথবা উভয়ে একাত্ম—একে জেনেই মানুষ জানতে পারে সে ঈশ্বরবৎ অসামান্য, সে প্রকৃত অর্থেই মুক্ত। এখানে তুলনাসূত্রে আক্ষিপ্ত হতে পারেন শেলী, কীটস প্রভৃতি রোমান্টিকেরা যাঁরা সৌন্দর্যের আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন ; শেলী তাঁর 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতায় স্পষ্টতই তাঁর ওপর এই সৌন্দর্যরূপী দিব্য আত্মার অমোঘ প্রভাবের কথা বলেছেন। কীটস তাকেই বলেছেন একমাত্র সত্য ও একমাত্র সৌন্দর্য যারা নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তারই প্রভাবে সমগ্র বিশ্বভুবনকে দেখেছেন দিব্য আলোয় বিমণ্ডিত আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি।"

স্বামীজী মনোসংযোগ ও ধ্যানের গুরুত্বের কথা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রাজযোগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানে পাতঞ্জলযোগসূত্রের সূত্র তুলে তিনি স্বীয় তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। 'অভ্যাসবৈরাভ্যাং তন্নিরোধঃ'—ধ্যানযোগেই যুক্তির সংকীর্ণ সীমা অতিক্রান্ত হয় এবং মানসে বোধির উদার অভ্যুদয় ঘটে, অন্যদিকে রোমান্টিকতার একটি মূল কথাই হচ্ছে এই যে যুক্তির চেয়ে বড় অনুভূতি, সেই হচ্ছে কল্পনাদোসর। ক্রমাগত অভ্যাসের পথেই আসে বিবিক্তি, মানুষ তখন ক্ষুদ্র খণ্ডের থেকে বিবিক্ত হয়ে অর্জন করে আত্মবোধ। তখন ঘটে আমির গভীরে অবতরণ, বিশ্বপথিকরূপে মহানিষ্ক্রমণের পূর্বে সাধনার এই স্তরটি অতিক্রম করা প্রয়োজন। বাঙলা সাহিত্যের একজন আদি রোমান্টিক বিহারীলাল চক্রবর্তী এই মানস-অবস্থার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন 'সাধের আসন' কাব্যে :

রহস্য, মাধুরী মালা, রহস্য রূপের ডালা—
রহস্য স্বপন বালা খেলা করে মাথার ভিতরে ;

*

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

ধ্যানের মাধ্যমে ঘটে যায় তীব্র মানসভ্রমণ, অতঃপর বাস্তবজগতে অবতরণ ও বিশ্বভ্রমণের প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়—এ যেন গঙ্গার মর্তে অবতরণের মতো। কবি মাত্রেই নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ, সন্ন্যাসীমাত্রেই বিশ্বপথিক। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি বিবেকানন্দের মতো বিশ্বসন্ন্যাসী সম্বন্ধে এই কথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে ধাবমান হয়েছিলেন প্রতীচীবিজয়ে, প্রাচীন ধরিত্রীর এক শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভ্রমণ করেছেন। দুজনেই গিয়েছেন সর্বমানুষের প্রতি অন্তরে এক মৈত্রীবোধ ও বিনম্র প্রণাম নিয়ে।

এই সূত্রে আমরা স্বামীজীর প্রথম আমেরিকা গমন ও শিকাগো বক্তৃতার স্মরণ করছি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা মনস্বিনী লেখিকা মেরী লুইস বার্ক তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট : নিউ ডিসকভারিস' এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' নামক গ্রন্থে প্রদান করেছেন।—কন্যাকুমারিকা থেকে বিবেকানন্দের কর্মপথ প্রসারিত হলো আমেরিকা ও ইওরোপে। আলাসিঙ্গা প্রমুখ দক্ষিণী ভক্তবৃন্দ এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান কর্মসহায়ক। স্বামীজী বলাবাহুল্য সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভ্রমণ ব্যতীত সত্তার প্রকৃত বিস্তার সম্ভব হয় না। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "আমার যদি টাকা থাকিত তোমাদের প্রত্যেককেই বিশ্বপর্যটনে পাঠাইতাম। কোণ থেকে না বেরোলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।" দ্বিতীয় বাক্যটিই সবিশেষ মূল্যবান। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বক্তৃতাপ্রদানকালে স্বামীজী শুধু বিশ্বজয়ই করেননি, পরিব্রাজক এই সন্ন্যাসী আত্ম-আবিষ্কারও করলেন—অনুভব করলেন তাঁর

ভিতরে এক অলৌকিক অনন্ত শক্তি রয়েছে মানুষকে প্রভাবিত করবার ও তাদের দিয়ে কুশল কার্য করিয়ে নেবার পক্ষে যা অত্যুত্তম। শিকাগোতে বিবেকানন্দ তাঁর অনন্য বাক্যবন্ধে সর্বধর্মের অন্তর্গত মূল ঐক্য-তত্ত্ব উপস্থিত সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন স্থানে উদ্গত হয়েও একসমুদ্রে এসে মেশে, বিভিন্ন মানুষ অথবা মানবসম্প্রদায় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করলেও শেষ পর্যন্ত সেই একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের নৈকট্যে উপনীত হয়। রোমান্টিক বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হয়েই প্রেরণার এক দিব্যমুহূর্তে দিব্যকণ্ঠ মানবত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন, সেই মুহূর্তে তাঁর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিষ্য ও শিষ্যার অন্তরের মধ্যে চিরদিনের জন্য তাঁর পথ নির্মিত হয়ে গেল। এঁদের সাহচর্য ও সহমর্মিতা বিবেকানন্দ মূল্যবান বলে মনে করতেন, কর্মযজ্ঞে আলোচ্য বিদেশী-বিদেশিনীরা নিরন্তর আহুতিদান করেছেন, স্বামীজীর জীবন-অভিজ্ঞতাকে তাঁরা আপন আপন সংস্পর্শ দ্বারা করে গেছেন বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। পাশাপাশি মনে পড়ে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর পথিকবৃত্তি, "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" প্রভৃতি সৌন্দর্যসিক্ত উচ্চারণ।

স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠে দেখি মেরী হেলকে লেখা চিঠিগুলিতেই স্বামীজী সর্বাধিক আবেগপ্রবণ ও সরল উচ্ছ্বাসী, এক শিশুর মতোন এই অদম্য কর্মযোগী যেন মুহূর্তের জন্য এক স্নিগ্ধ অবসরের সরোবরে অবগাহন করছেন। মেরীকে লেখা পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রেই প্রকাশিত হয়েছেন রোমান্টিক বিবেকানন্দ, এখানে এক চিরপিপাসিত ঊর্ধ্বাতিশায়ী প্রাণসত্তার অলৌকিক ও মরমী ভাবুকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি পত্রে মেরীকে লিখছেন, আমার স্বর্ণবিত্ত কিছুই নেই, কিন্তু আর যা আছে সবকিছুই তোমাকে মুক্তরূপে দান করছি। আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ভালবাসাই হচ্ছে আত্মসমর্পণের সহজতম পথ। অবশ্য এ ভালবাসা হচ্ছে সর্ব ইন্দ্রিয়ভাবনাবর্জিত, সন্ন্যাসীর চির-উদ্দিষ্ট শুদ্ধ প্রেম—বিশুদ্ধ হেমতুল্য স্বয়ংপ্রভ। আবার পত্রান্তরে প্রাচ্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে কি রাজকীয় সম্বর্ধনা পাচ্ছেন তার বিবরণ দিচ্ছেন। কিন্তু খ্যাতির তুঙ্গচূড়ায় আহরণ করেও *ভিতরে ভিতরে তিনি চাইছেন শান্তি ও নির্জনতা।* ১৮৯৭-তে লেখা একটি চিঠিতে মেরীর কাছে উজ্জ্বল রসিকতায় লিখেছেন: অকালজরা তাঁকে আক্রমণ করছে; মুখমণ্ডল শীর্ণ হচ্ছে, ত্বক কুঞ্চিত, মাথার চুল গুচ্ছে গুচ্ছে হয়ে যাচ্ছে রূপোলী। দার্জিলিং থেকে লেখা এই পত্রে আরো জানাচ্ছেন, সমতল থেকে পাহাড়েই তিনি থাকেন ভাল। স্বামীজীর বন্ধুভাগ্য ছিল অসাধারণ। ওলি বুল, নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, ম্যাকলাউড মেরী হেল প্রভৃতির কাছে স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যবিভামণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর বিদেশিনী ভক্ত অথবা ভক্তশিষ্যাদের কাছে এক প্রেমের অতিথি; কিন্তু এই প্রেম কোন ব্যক্তির প্রতি উচ্ছ্বসিত নয়, তার উৎসার নিখিল মানবকে কেন্দ্র করে, এই প্রেম অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

একজন শুদ্ধ রোমান্টিকের মতোই বিবেকানন্দ ছিলেন বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত পথের পথিক, এক মন্ময় কল্পনার অধীশ্বর ও আত্মপ্রভু। 'কর্মযোগ'-এ একস্থানে বলছেন: "আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি; ইহাতেই মানুষ হিসাবে আমার গৌরব।" এতে বোঝা যায় বিবেকানন্দ মানুষ হিসেবে স্বেচ্ছা-মনোনয়ন পছন্দ করেন, কর্মদাস নয় কর্মপ্রভু হওয়াই তাঁর কাঙ্ক্ষিত।

বিবেকানন্দের যে-চিত্র আমরা দেখি তাতে তাঁকে যুগপৎ একজন পরম তেজস্বী ও স্বপ্নচারী মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয় তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন, কোন নন্দন নিকুঞ্জকানন থেকে যেন ক্ষণকালের আহ্বানে পৃথিবীতে এসেছেন। কোলরিজ কবির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাই দিয়ে মনে হয় এই আয়তচক্ষু ঘনকৃষ্ণকেশদাম সন্ন্যাসীকে যেন বিচার করা যায়:

> "সে করেছে আস্বাদনা সু-মধু শিশির
> নন্দনের দুগ্ধধারা সে করেছে পান।"

রোমান্টিক কবিসঙ্ঘের কাছে ব্লেকের অভিমত অনুসারে আদরণীয় ছিল—এক কণা বালিতে বিশ্বদর্শন, একটি বুনোফুলে দিব্যালোককে দেখা, প্রভাপূর্ণ অসীম ছিল তাঁদের করধৃত, অনন্তকে তাঁরা পেতেন প্রহরঘণ্টার ক্ষীণায়ু প্রবাহে। এই রহস্যদর্শন,

বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করে এই ভাবে তার মধ্যস্থ প্রাণসারকে আবিষ্কার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনার অন্যতম অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়। ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারাই এই আদর্শ পরিলভ্য। "আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমরা বুদ্ধিরও অতীত দেশে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পৌঁছিতে পারে না" (রাজযোগ)। এই হচ্ছে মনের একাগ্র অবস্থা, মানুষ তখন অমলিনকে লাভ করে এবং এই অতিশয় মলিন, সতত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিবিচারের বাইরে সে অবস্থান করে। শেলী প্রভৃতি রোমান্টিকেরা যুক্তির মলিনসংসর্গ-বর্জিত শুদ্ধ কল্পনাকেই অনুসন্ধান করেছিলেন এবং এই কল্পনাকে তাঁরা পবিত্র ও ঐশ্বরিক বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। অতএব কবি ও সন্ত মাঝে মাঝে যে এক হয়ে যান এটা আমরা লক্ষ্য করি।

সাধনার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় কবি ও সাধকের কাছে সমগ্র বিশ্বভুবন আত্মগত হয়ে ওঠে, 'বিশ্বভুবন ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে'। আত্মার ভিতর থেকে এক আলোকদীপ্তি, গৌরব ও মেঘমালাতুল্য সৌন্দর্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে যেন সারা পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে অথবা ঢেকে দেয়; আত্মার সঙ্গীতকণ্ঠ জেগে ওঠে পরিপূর্ণ ধ্বনিমাধুর্যে—দার্শনিক কোলরিজের এই উচ্ছ্বাস কোন মিথ্যাচার নয় বরং পরম সত্য। সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষ হয়ে ওঠে পূর্ণ সচেতন অথবা আপন সৃষ্টিপার্থক্যে সে হয়ে ওঠে ঈশ্বরতুল্য অক্ষয় অমর ও জ্যোতির্ময়। এই অলৌকিক সামর্থ্য কবির ভিতর শেলী লক্ষ্য করেছিলেন বলেই 'Defence of Poetry'-তে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন: "A poet participates in the eternal, the infinite, and the one." (কবি মিলিত হন অনন্ত, অসীম ও একের সঙ্গে।) তখন তিনি অনায়াসে বলতে পারেন 'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে।' 'ভক্তিযোগ'-এ বিবেকানন্দ একেই বলেছেন প্রেমের দ্বৈতভাব। "প্রেমের ধর্মে আমাদিগকে দ্বৈতভাব আরম্ভ করিতে হয়। ভগবান আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরাও তাঁহা হইতে আমাদিগকে ভিন্ন মনে করি। প্রেম উহাদের মধ্যে আসিয়া উভয়ের মিলন সম্পাদন করে।"

সন্ন্যাসীর কাছে, রোমান্টিকের কাছে জগৎ ধীরে ধীরে একটি স্বপ্ন বা vision-এ পরিণত হয়। কিন্তু একজন রোমান্টিকের চিত্তসত্তা বা মানসকমল সততই কি অনন্দসাগরে ভাসমান? তাকেও তো সইতে হয় বস্তুর অভিঘাত, দুঃখের ঝড়ঝাপটা। নিরন্তর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হওয়াই চৈতন্যবানের নিয়তি। এভাবে গড়ে উঠেছে রোমান্টিক কবিদের দুঃখের বিকীর্ণ পদাবলী, হাসির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুজলের করুণ-নিটোল মুক্তো। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৫-এ বসন্ত সময়ে নিউইয়র্কে অবস্থান কালে বিবেকানন্দ 'My Play is Done' (খেলা মোর হলো শেষ) বলে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তা স্মরণে আসে।

হায়রে আমার জন্য নেই বিশ্রাম
ভাসমান বুদবুদ এই যে পৃথিবী
এর ফাঁপা অবয়ব, অর্থহীন নামাবলী
অসার জীবন মৃত্যু
আমার নিকটে তার নেই কোন দাম।
(লেখক কর্তৃক অনূদিত)

এই বিষাদ-ব্যাকুল কবিতাটিতে দিব্যসন্ন্যাসী ক্লান্ত শিশুর মতো গৃহে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি স্থাপিত করতে পারি শেলীর একটি বিখ্যাত কবিতা, কবি আর সন্ন্যাসীর চিন্তাধারা কি আশ্চর্যজনকভাবে সমান্তরাল:

Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around.

এবং পুনশ্চ

I could lie down like a tired child,
And weep away these life of care
('Stanzas Written in Dejection
Near Naples')

আশাহীন স্বাস্থ্যহীন অশান্ত শেলী শিশুর মতো মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে চেয়েছেন, জীবনবেদনা ভুলে যাওয়ার জন্য।

পরিশেষে ফিরে যাচ্ছি আবার আমাদের প্রাথমিক উচ্চারণে। হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-প্রত্যয়ে একজন রোমান্টিক ছিলেন; বিপুল কল্পনাশক্তির অধিকারী এই মানুষটি তাঁর মরমী ভাবুকতাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চন্দ্রকিরণের মতোই তা স্বপ্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (জন্ম : ১৮৬১, ১১ ফেব্রুয়ারি—পূর্বজীবনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছাত্রজীবনে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্স্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজে) স্বামীজীর (তখন নরেন্দ্রনাথের) সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ও সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেছিলেন। একদা স্বামীজীর সতীর্থ হয়েও পরবর্তী কালে ব্রহ্মবান্ধব স্বামীজী এবং তাঁর আন্দোলনের প্রচণ্ডভাবে বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁর চরিত্রে অস্থিরতার বীজ নিহিত ছিল। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে (নববিধান) দীক্ষাগ্রহণ, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রোটেস্ট্যান্ট মতে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষাগ্রহণ এবং ঐ বৎসরেই আবার রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষপ্রান্তে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর প্রচণ্ড বিবেকানন্দ-বিরোধিতা গভীর বিবেকানন্দ-অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'স্বরাজ' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ২৬ ফাল্গুন ১৩১৩, শেষ প্রকাশ ১৫ আষাঢ় ১৩১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর যেসমস্ত উচ্ছ্বসিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোক্তটি তাদের অন্যতম। মুদ্রিত অংশটি 'স্বরাজ' পত্রিকার ২২ বৈশাখ ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ : বিবেকানন্দ কে ?' শীর্ষক রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ। রচনাটির পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদ 'উদ্বোধন'-এর ৯০তম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (১৩৯৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় পৃঃ ২২৩) প্রকাশিত হয়েছিল।—সংযুক্ত সম্পাদক।

এই অশান্তির দিনে উদাসীন সন্ন্যাসীর কথা লইয়া আলোচনা করা কি সঙ্গত ? স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গি জাতি ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম-কর্ম সভ্যতা-সমাজকে পদদলিত করিতেছে—জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে—উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ভারত-সন্তানেরা কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে—না আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্যজ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী! ইঁহার স্পর্ধা তো কম নয়—স্থূলবিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোর্টের ভিতরে গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দুজাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে।—ঐ বিজয়ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গিস্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্যজ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান—সকল কর্মকৌশল—বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামীজী—আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে—তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয়পর্বত-ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজেও হইবে না। কত বাধা বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত ব্রত-বিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে—তবে তো উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণ-মনকে ভরপুর করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভিত্তির উপরে যে স্বরাজ-মন্দির নির্মিত হইবে তাহার চূড়ায় আর্যজ্ঞানের স্বর্ণকলস দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিবে—উহাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বসিবে—উহার প্রাঙ্গণে ফিরিঙ্গিপ্রমুখ জাতিরা সেবাদাস হইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে—।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

৮ ॥

পিতার দেহত্যাগের অতি অল্পদিন পরেই চণ্ডীও দেহত্যাগ করিয়া যায়।—সংক্রামক রোগী বলিয়া, সে রাত্রে—চণ্ডীর সৎকারের জন্য পাছে অনুরোধ করি—এই ভয়ে একটি লোকও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই, বাড়িতে কেবল পুত্রশোকে উন্মাদিনী আমার মা ও অভিভাবকের মধ্যে আমি। মায়ের করুণবিলাপ শুনিতে শুনিতে কি জানি কি অমানুষিক বলে বলী হইয়া ষোল বৎসরের বালকের মৃতদেহ বুকে করিয়া অন্ধকার রাত্রে একা শ্মশানে গিয়াছিলাম। যখন চিতা জ্বলিয়া উঠিল—যে দেহ, যে মুখ, যে চোখ, এত প্রাণের প্রিয় ছিল, সেই দেহ যখন আমারই সম্মুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন মনের যে ভাব হইয়াছিল—যে ভাব একদিন আমার সংসারমোহ ঘুচাইয়া দিয়াছিল—চণ্ডীর কথা মনে পড়িয়া আজ আবার সহসা সেই ভাব মনে জাগিয়া উঠিল।

নৌকারোহী যেমন নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন-ভাবে নদীর দুইধারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যায়, সেইরূপে গত জীবনের কত কথা মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, কিন্তু মনকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। মায়ের কথা মনে পড়িল। যদি যথার্থই স্নেহ দিয়া কোন শরীর গঠন সম্ভব হয়, তবে আমি বলিতে পারি, মা আমার স্নেহের প্রতিমা। ছেলে-বেলায় যদি কেহ আমাকে 'কালো মেয়ে' বলিত, মা অমনি আমাকে বুকে করিয়া কত আদর করিতেন, কতবার আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, যেন সে নিন্দা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেন। আবার যদি কেহ বলিত, "মেয়ের কি সুন্দর চুল, যেন শ্যামা ঠাকরুণ"—তাহা হইলে একদিকে আনন্দ আবার শ্যামা মার সহিত তুলনার জন্য ভয় দুই একসঙ্গে হইয়া মাকে যে তখন কি সুন্দর দেখাইত। তাড়াতাড়ি জোড়হাতে মা প্রণাম করিতেন, বলিতেন, "ও আমার শ্যামা মায়ের দাসী।" সেই চুল আর কালো রঙের জন্য মার আবার এক নূতন বিপদ হইত। দুর্গোৎসবে কি অন্য কোন ব্রতোপলক্ষে কুমারীপূজার সময় আমাকে কুমারী করিবার জন্য সকলেরই ভারী আগ্রহ ছিল। মার দৃঢ় বিশ্বাস—যাহাকে কুমারীপূজা করা হয়, সে কুমারী নিশ্চয়ই বিবাহের পর বিধবা হইবে। আমাকে মা কত আর সাবধান করিয়া রাখিবেন, যখন পথে খেলা করিতেছি, তখন হয়তো কুমারী করিবার জন্য কেহ কোলে করিয়া তুলিয়া নিয়া যাইত। টাটের উপর পা রাখিয়া ঠাকুর হইয়া পূজা লইতে আমার বড়ই আমোদ হইত। —যখন পরণে রাঙা কাপড়, হাতে লাল শাঁখা, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরিয়া বাড়ি আসিতাম, মা দেখিয়াই কপালে করাঘাত করিতেন—"এই আমার সর্বনাশ করে এসেছে।" মা এখনও বলেন যে, "যখনই টাটে পা রেখে পূজা করেছে, তখনই জানি, আমার কপাল ভেঙেছে। তাই কি যে সে পূজা করেছে? যাঁরা ডাকলে মা জাগ্রত হয়ে সাড়া দেন, তাঁরাই কিনা আমার দুধের মেয়ের পা পূজা করে আমার এই সর্বনাশ করলেন?" মায়ের বিশ্বাস যে, আমার যে বৈধব্য—সে কেবল সেই কুমারীপূজার জন্যই হইয়াছে, না হইলে মায়ের যে এমন সুলক্ষণা মেয়ে, তাহার বৈধব্য কখনই সম্ভব নয়।

মা এদিকে এত স্নেহপরায়ণা, বালিকার মতো অল্পেই শঙ্কিতা, বালিকার মতো সকল বিষয়ে সরলবুদ্ধি অথচ কর্তব্যে একেবারে পাথরের মতো দৃঢ়চিত্তা। আমার বয়স যখন নয়-দশ বৎসর, তখনই মা আমাকে এক পীড়িতা বৃদ্ধার সেবায় নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশে সমস্ত দিন, এমনকি অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাকে তাহার নিকট থাকিয়া সেবা করিতে হইত, কেবল স্নানাহারের জন্য কিছুক্ষণ বাড়ি আসিতাম।

বালিকাকাল হইতেই আমি সকল বিষয়ে শঙ্কা-হীন, আবার শরীরে এত সামর্থ্য যে, লোকে সে কথা শুনিলে বিস্মিত হইয়া থাকে। পথে বাহির হইবার পরে কতবার নিজেই নিজের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। একবার হাঁটাপথে খণ্ডগিরি দর্শনে যাইতে যাইতে পথে একজন রমণীর পায়ে আঘাত লাগিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না, সেই যাত্রিদলের আমিও একজন সঙ্গী। নির্জন পথের মধ্যে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সকলেই তাঁহাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। সেখানে গাড়িও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমি সেই রমণীটিকে কাঁধে করিয়া চড়াই-উতরাইয়ের পথে আড়াই ক্রোশ চলিয়াছিলাম। বহিয়া চলিবার সময় বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই, কিন্তু পরে উরুতে ফোড়া হইয়া কিছুদিন ভুগিতে হইয়াছিল। আর একবার মথুরা স্টেশনে এক ভদ্রলোক পরিবার লইয়া নিতান্ত বিপন্ন, কোন গাড়িতেই তিলমাত্র স্থান নাই, তিনি কেবল একবার এদিক একবার ওদিক স্ত্রী-পুত্র বোঁচকা-বুঁচকি সঙ্গে লইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছেন। একটা গাড়িতে কিছু জায়গা ছিল কিন্তু সে গাড়ির দুয়ারে তিনটি গুণ্ডো পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহাকেও গাড়িতে উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের যেমন অসুরের মতো আকৃতি, প্রকৃতিও সেইরূপ। যদিও লোক তিনটির বেশভূষা ভদ্রলোকের মতো কিন্তু আচরণ নিতান্ত অভদ্র। ভদ্রলোকটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "আজ রাত্রে ট্রেন না পাইলে আমায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্টেশনে রাত্রি কাটাইতে হইবে। আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি।" কিন্তু লোকগুলি সে কথায় কর্ণপাতও করিতেছে না। ট্রেন ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ব্যাপার দেখিয়া আর আমার সহ্য হইল না। আমি গিয়া সে লোক তিনটিকে খুব জোরে এক ধাক্কা দিলাম। সেই এক ধাক্কাতেই তিনটি অসুরতুল্য লোক তিনদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ভদ্রলোকটি বিনা বাধায় পরিবার লইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

এই যে আমার এত সাহস ও বল—এমন সময়ও আসিয়াছে যে, সে সাহস ও বল কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মা—তখন শান্ত প্রসন্নভাবে সে বিপদে কর্ণধার হইয়াছিল। প্রসব হইবার সময় প্রসূতি যদি কষ্ট পায়, মা দিন কি রাত্রি, যে কোন সময় অথবা যেকোন জাতির বাড়ি হউক না কেন, শুনিবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসব করাইতে মায়ের দৈবী ক্ষমতা ছিল, লোকে বলিত, মা গায়ে হাত দিলেই প্রসূতির আর কোন ভয় নাই। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়িল, ঘরের বাহির হইবার অনেকদিন পরে একবার মাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্যটনে আসিয়াছিলাম। কোন এক স্টেশনে নামিয়া আর গাড়ি ধরিতে পারি নাই। রাত্রিটুকুর মতো আশ্রয়ের জন্য স্টেশন-মাস্টারের বাড়ি গিয়া শুনিলাম, তাহাদের বড় বিপদ, স্টেশনমাস্টারের স্ত্রীর প্রসববেদনা হইয়া সকাল হইতে শিশুর পা বাহির হইয়া এ-পর্যন্তও প্রসব হইতে পারে নাই; শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল। কিন্তু মা তখনই সেই বিপন্না প্রসূতিকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত না নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি বারাণ্ডায় বসিয়া কেবল জপ করিয়াছি। কি রকম একটা হৃদয়ের দৌর্বল্য আসিল—প্রসূতির ঘরের ত্রিসীমানাতেও আমি পা দিতে পারি নাই।

চণ্ডীর কথা, মার কথা—আরও কত জনের কথা স্মৃতিবায়ুতে চালিত হইয়া মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। মনে পড়িল—ক্রিয়া লইবার পর যখন দক্ষিণা কি দিব গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার শুচি-অশুচিবোধের সংস্কারটি আমাকে দক্ষিণা দাও।" পূজা-অর্চনায় সর্ববিষয়ে শুচিতা রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় আমার শুচিবাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার জন্য কত সময় অনর্থক গিয়াছে, কত কষ্টও পাইয়াছি। গুরুদেব বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া আমার ভয় হইল, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ মনের ভয় দূর করিয়া এই ভাবিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম, "আমি যদি দিতে না পারিতাম, গুরুদেব তবে কখন তাহা চাহিতেন না। তিনি যখন চাহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দিবার শক্তিও আমি পাইব।" সেই দিন—সেই দিনই বা বলি কেন, সেই মুহূর্ত হইতেই আমার শুচি-অশুচির সংস্কার দূর হইয়া গেল। কিন্তু শুচিতারক্ষাকল্পে দিনে ও রাত্রে অনেকবার স্নান করিয়া ভিজা চুলে থাকিয়া চক্ষু দুটি নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, ক্রমে একেবারে সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। গুরুদেব তখন গৃহে ছিলেন না, পত্রদ্বারা তাঁহাকে জানাইলাম, "আমি অন্ধ হইতে বসিয়াছি।" দুটি মাত্র ছত্র লিখিয়া তিনি সে পত্রের উত্তর দিলেন, প্রথম ছত্রটি এই—"অন্ধ হইলেই চক্ষুষ্মান হয়।" দ্বিতীয় ছত্রে একটি টোটকা ঔষধের কথা লেখা ছিল। সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আমার চক্ষু আরাম হইয়া গিয়াছিল। আর একবার আমাকে সাপে কামড়াইয়াছিল, গুরুদেব যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আহার করিতে বসিয়া-ছিলেন। তাঁহার জন্য আমিই খিচুড়ি রাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। সংবাদ শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খিচুড়িটা না খেয়ে আর যাচ্ছি না, সে যদি না বাঁচে তবে কাল তো আর এমন রান্না খাইতে পাইব না।" তাহার পর আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে নাকি সাপে কামড়াইয়াছে? সাপ কি তোমাকে কামড়াইতে পারে? কেমন করিয়া কামড়াইবে, তোমার কাছে আসিলে যে সাপ সাপই থাকিবে না, তখনি সে তার হিংসা করা স্বভাব ভুলিয়া যাইবে।" লোকে বলিত, গুরুদেব সর্পাঘাতের চিকিৎসা খুব ভাল জানিতেন। তাঁহারই চিকিৎসায় আমি সুস্থ হইয়াছিলাম।

এসব যেন এক একটা ঢেউ, যেমন জলের ঢেউ জলে উঠিয়া জলেই মিশায়, তেমনি অনন্ত কালসাগরের ঢেউ তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই মিশাইতেছে। এই যমুনার বুকে কত ঢেউ উঠিয়াছে, সে ঢেউ এখন কোথায়? জলের ঢেউ জলে মিশিয়া গিয়াছে।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া "মা!" বলিয়া আমার পায়ের তলায় পড়িল। সে "মা" ডাক কি ব্যাকুল, কি আর্তস্বরেই উচ্চারিত হইয়াছিল! "আহা বাছারে আমার! কার এত দুঃখ?" আমি প্রথমে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, চিনিতেও পারি নাই, তাহার পর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সে অসিতনাথ। অসিতনাথ আমাকে সেদিন যত কথা বলিল, তাহার তিনভাগ কেবল "মা! মা! মা!" তাহার জীবনে যে কত অপরাধ, সেই কথাই সে যেন শতমুখে বলিতে চায়, কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না। কেবলই বলে, "মা, আমি যে কত পাপী তা তো তুমি জান না। আমি যে মনে মনে তোমার কাছেও অপরাধী হয়ে-ছিলাম!" এই তার কথা, আর কেবল সেই এক কথা —"মা! মা!" মাটিতে পড়ে আছে, আমি যত আদর করি, "ওঠ বাপ আমার, গোপাল আমার!" ততই আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "ওমা, আমায় আদর করো না মা, আর আমায় আদর করো না। তুমি জান না আমি কেমন ছেলে। আমি তোমার মাতৃদ্রোহী ছেলে। তোমার পা ছুঁয়ে যে পায়ের ধুলো নেব, সে সাহসও আমার হয় না, এমনই নরক আমার মন।" একে তো তার এই পাগলামি, সেই সময় আবার নদীর ধারের জঙ্গলের ভিতর হইতে আর একজন লোক বাহির হইয়া আসিয়া "মা, আমার অপরাধও ক্ষমা কর" বলিয়া উপস্থিত।* [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, পৃঃ ২৩০—২৩৬

মনোবিজ্ঞানী বিবেকানন্দ

অমরেন্দ্রনাথ বসু

প্রতিভাবান ব্যক্তি মননশীলতার কোন একটি ধারায় বিশিষ্টতা অর্জন করলেও চিন্তাজগতের অপরাপর শাখাও তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু সেগুলি সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ বিশিষ্টতার দিকটির ভাস্বরতায় অন্যান্য দিকগুলি হয় অলক্ষ্যে থেকে যায় অথবা হয়ে যায় নিষ্প্রভ, যেমন সূর্যালোকে আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কসমূহ দিনেরবেলা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রতিভার আকাশেও একটি প্রতিভা বহুমুখী। জীবন একটি সামগ্রিক প্রবাহ। প্রতিভাবান ব্যক্তি জীবনের প্রায় সকল দিকগুলিকেই স্পর্শ করে থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এক বহুমুখী প্রতিভা। তিনি মানব-হিতৈষণায় উৎসর্গীকৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পৃথিবীকে তিনি শুনিয়েছিলেন ভারতাত্মার মর্মবাণী,—বেদান্ত। কিন্তু কেবলমাত্র শুধু বেদান্ত-চিন্তার মধ্যেই তাঁর ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। শুধুমাত্র মানব-সেবার কাজেই তাঁর কর্মপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বিবেকানন্দের ভাবনায় আমরা পাই বিজ্ঞান-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা, শিল্প-চিন্তা, সাহিত্য-চিন্তা প্রভৃতি আরও নানা বিষয়। তাঁর কর্মধারা ছিল মানবপ্রেম ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপথের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের পথরেখা এখনও বহুদূরে প্রসারিত হয়নি। এই পথ এখনো অপরাপর বিজ্ঞান-পথের মতো জনাকীর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিস্মিত হতে হয়, এই মনোবিজ্ঞানের পথেও বিবেকানন্দের পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখে। ভারতীয় যোগদর্শন, বিশেষ করে পাতঞ্জলযোগসূত্র এবং তার অনুশীলন রহস্যকে স্বামীজী তাঁর প্রতিভার রসে সম্পৃক্ত করে আধুনিক বিজ্ঞানের ধাঁচে পরিবেশন করেছিলেন।

মনোবিজ্ঞানের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পশ্চিম-ভ্রমণকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনি মনীষী-দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস-এর (William James) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে মানব মনের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত হন। স্বামীজী অধ্যাপক জেমসকে রাজযোগের প্রক্রিয়া এবং তার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং সমাধিস্থ হয়ে অধ্যাপক জেমসকে রাজযোগ-অনুশীলনজাত অবস্থা প্রত্যক্ষ করান। স্বামীজী সম্ভবতঃ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস শহরে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক ডাবলু. এইচ. মায়ারস-এর (Frederick W. H. Myers) সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞানী মায়ারস-ই ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ মনোবিজ্ঞানী সিগমাণ্ড ফ্রয়েড-এর (Sigmund Freud) মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্ত সৃষ্টিকারী বই 'স্টাডিস্ অন হিস্টিরিয়া'র (Studies on Histeria) [বইখানি যদিও ফ্রয়েড ও ব্রয়েরার (Breuer) কর্তৃক যুগ্মভাবে লেখা, তথাপি এটি ফ্রয়েডের নামেই প্রচলিত] বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষাভাষী বিদগ্ধজনের কাছে প্রথম পরিবেশন করেন। কাজেই মায়ারস স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময় ফ্রয়েডের গবেষণার কথাও উল্লেখ করে থাকতে পারেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ যেসকল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে বহু মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। যেমন: Psychology, Applied Psychology, Spiritual breathing, Theory of concentration, The Powers of mind, The mind—its Powers and Possibilities ইত্যাদি। এছাড়া ঐ দেশে তিনি রাজযোগ সম্বন্ধে যেসকল পাঠদান করেছিলেন তাকে ফলিত মনোবিজ্ঞানের (Applied Psychology) পাঠদান বললেও ভুল হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক ভাবনা-চিন্তা প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানচিন্তা থেকে গৃহীত। বিশেষ করে উপনিষদ্, কূর্মপুরাণ এবং পাতঞ্জলযোগসূত্র তাঁর মনোবিজ্ঞান-চিন্তার মূল ভিত্তি। তবে নিজের অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যে আলোচনার আলোকে মনোবিজ্ঞান-চর্চা এবং তার মূল উদ্দেশ্যকে তিনি একটি মহৎ ও ব্যাপক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিজ্ঞানচর্চার প্রধান উদ্দেশ্যের বিচারে তিনি পশ্চিমের ভাবধারার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। পশ্চিম বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করেছে প্রধানতঃ পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও উপভোগের হাতিয়ার হিসাবে। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়তই আমাদের সত্যোপলব্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়—এই দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিবেকানন্দের কাছে মনোবিজ্ঞান-চর্চার মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যোপলব্ধি। এই খণ্ড বস্তু-জগতের পিছনে যে অসীম অখণ্ড সত্তা বা একত্ব বিরাজমান তাকে আমাদের মন দিয়েই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করতে হবে। এই কাজে মনোবিজ্ঞানই আমাদের একমাত্র সহায়। এই কারণেই তিনি মনোবিজ্ঞানকে বলেছেন সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান—"Psychology is the science of sciences."

সত্যোপলব্ধির সাধনায় অথবা আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-উপলব্ধির সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী বা অভিমতবাদী (empiricist)। তাই তিনি বলেছেন: "What right has a man to say he has a soul if he does not feel it, or that there is a God if he does not see Him? If there is a God, we must see Him, if there is a soul, we must perceive it; otherwise it is better not to believe."—এর মর্মকথা হলো, ঈশ্বর ও আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা চাই। তা নাহলে এসবে বিশ্বাস না করাই ভাল। অতএব এদিক থেকে বিবেকানন্দকে অভিজ্ঞতাবাদী বলা যেতে পারে। তাঁর মতে ভারতীয় যোগশাস্ত্রই হলো সত্যকে প্রত্যক্ষ করার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। বিভিন্ন যোগশাস্ত্র মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

মনোবিজ্ঞানের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, মনোবিজ্ঞানই আমাদের নিজেদের মনকে জানতে ও বুঝতে শেখায়। এর সাহায্যেই আমরা আমাদের মনের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করে পার্থিব জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তুলতে পারি। এদিক থেকে বিবেকানন্দের মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষার (মনোবিজ্ঞানের) যথেষ্ট মিল রয়েছে। মনঃসমীক্ষার সাহায্যেও আমরা মনের গভীর অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করতে পারি এবং এই গভীর অভ্যন্তর প্রদেশের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জেনে ও বুঝে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতাকে দূর করে জীবনযাত্রাকে সহজতর করতে পারি।

মানবমনের কামশক্তি বা যৌনশক্তি (sexuality) যে সাধারণ মানবের জীবনে প্রধান চালিকাশক্তি তা স্বামীজী অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তাঁর মতে এই প্রবল যৌনশক্তিই রূপান্তরিত হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং সেই শক্তিকে তিনি বলেছেন ওজঃ-শক্তি। রাজযোগ গ্রন্থে 'The Control of Psychic Prana' অধ্যায়ে স্বামীজী বলেছেন: "That part of the human energy which is expressed as sex energy, in sexual thought, when checked and controlled, easily becomes changed into Ojas." (মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পায় তা দমিত হলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত হয়।) 'Six lessons on Raja-yoga' বক্তৃতায় তৃতীয় পাঠের এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "No man or woman can be really spiritual until the sexual energy, the highest power possessed by man, has been converted into Ojas." (মানুষের মধ্যে অবস্থিত প্রবলতম যৌনশক্তি যতক্ষণ না ওজঃতে রূপান্তরিত হয় ততক্ষণ কোনও পুরুষ বা নারীর পক্ষেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।) আধুনিক মনঃসমীক্ষাও এই মতের পরিপোষক। ফ্রয়েডের মতে যৌনশক্তি বা কামশক্তিই (libido) রূপান্তরিত হয়ে মানব-সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ফ্রয়েড বলেছেন: "Much of our highly valued

cultural heritage has been acquired at the cost of sexuality and by the restriction of sexual motive forces."

মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যেসময়ে রোগীকে সম্মোহন বা সংবেশনের (hypnosis) সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন, স্বামী বিবেকানন্দও অনুরূপ সময়েই সংবেশন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। রাজযোগ গ্রন্থের 'Pratyahara and Dharana' অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী বলেছেন : "The so-called hypnotic suggestion can only act upon a weak mind...It leads to ultimate ruin··· At each one of these processes the man operated upon loses a part of his mental energies, till at last, the mind instead of gaining the power of perfect control, becomes a shapeless, powerless mass, and only goal of the patient is the lunatic asylum." (সম্মোহন কেবলমাত্র দুর্বল মনের ওপরই কার্যকরী হয়··· এবং পরিণামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরম সর্বনাশ নিয়ে আসে। যার ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, এর ফলে তার মানসিক শক্তির কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। এবং পরিণামে সে নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পরিবর্তে একটি শক্তিহীন জড় পদার্থে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত তার উম্মাদাগারে আশ্রয় লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।)

সম্মোহন বা সংবেশন পদ্ধতির এই অপকৃষ্টতার জন্যই ফ্রয়েড এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং তা মানসিক রোগ চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে থাকেন। এই পদ্ধতির নাম free association method বা অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি। মনঃসমীক্ষকরা মানসিক রোগচিকিৎসায় আজও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রোগীকে চিকিৎসকের কাছে খুব আরামদায়ক অবস্থায় (relaxed) বসে বা অর্ধশয়ান হয়ে চোখ বন্ধ রেখে মনে যা-কিছু আসে তা বলে যেতে হয়। এতে দেখা যায় যে, রোগীর অবচেতন মন থেকে এমন সকল ভাবনা চিন্তা ও কল্পনা আসতে থাকে যা রোগী পূর্বে কখনো সচেতনভাবে চিন্তা বা কল্পনা করেনি। এই প্রক্রিয়া স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের ধ্যান অনুশীলন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। রাজযোগে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার কথা বলা হয়েছে তার প্রথম পাঠ ('Pratyahara and Dharana' : Raja-yoga) হলো : Sit for sometime and let the mind run on. The mind is bubbling up all the time. It is like that monkey jumping about. Let the monkey jump as much as he can ; you simply wait and watch··· until you know what the mind is doing··· many hideous thoughts may come into it ; you will be astonished that it was possible for you to think such thoughts··· until at last the mind will be under perfect control ; but we must patiently practise everyday."—সারকথা হলো, মনকে যা খুশি তাই ভাবতে দিতে হবে। দেখা যাবে যে, মনের গভীর থেকে অনবরতই বুদবুদের মতো ভাবনা উঠে আসছে। এ যেন সতত উল্লম্ফনশীল একটি বানরের মতো। এই মনরূপ বানরটিকে যতখুশি লাফাতে দিয়ে শুধু নিরীক্ষণ করে যেতে হবে। দেখা যাবে যে, কত অসম্ভব গোপন অবাঞ্ছিত ভাবনা মনের মধ্যে এসে ভীড় করেছে। এসব ভাবনা যে কোথায় ছিল তা ভাবতে অবাক হতে হয়। অবশেষে দেখা যাবে যে, মন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত ও সাম্য অবস্থার রূপ নিচ্ছে। তবে প্রতিদিনই ধৈর্যের সঙ্গে অনুশীলন করে যেতে হবে।

মনকে সংযত করার জন্য ধ্যান অনুশীলনের দ্বারা নিজের ব্যবহারিক মনের স্বরূপ জানার ওপরে স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের প্রবৃত্তি চালিত যে-মন বস্তু-জগতের সঙ্গে অনবরতই লিপ্ত হয়ে পড়ছে তার স্বরূপ না বুঝলে কখনই মনের আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় রূপকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক মনের স্বরূপ অনুসন্ধান করাই আত্মানুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রাজযোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই এই ব্যবহারিক মনকে জানা। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে

আধুনিক মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। মনঃসমীক্ষার সাহায্যেও আমাদের ব্যবহারিক মনের গতিবিধি ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জানতে পারি এবং মনকে স্বচ্ছন্দমুক্ত করে তুলতে পারি। তবে রাজযোগের সর্বশেষ উদ্দেশ্য হলো আত্মোপলব্ধি বা জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করা।

নির্জ্ঞান বা অবচেতন মনের (unconscious mind) অস্তিত্ব প্রমাণ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের একটি যুগান্তকারী কীর্তি। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ফ্রয়েডের আবিষ্কারের সমসাময়িক কালেই স্বামী বিবেকানন্দও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বক্তৃতায়, বিশেষ করে রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাবলীতে অবচেতন মনের অস্তিত্বের কথা বলেছেন।

স্বামীজী মানবমনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম হলো সচেতন স্তর (conscious plane)। এর মধ্যেই আমাদের যুক্তি, বিচার, অনুভূতি এবং অহংবোধ নিহিত। দ্বিতীয়, অবচেতন স্তর (subconscious plane)। এই স্তর অনুভূতি ও যুক্তি-বিচারহীন। এখানে কোনও অহংবোধ নেই। এই স্তরই হলো আমাদের প্রবৃত্তি, সকল রকমের প্রতিবর্ত (reflex) এবং আদিম কাল থেকে সঞ্চিত ও জন্মগতভাবে পাওয়া সকল গুণাবলী বা সংস্কারের আবাসভূমি। বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় মনের তৃতীয় স্তরকে বলা হয় অতিচেতন (superconscious) স্তর। এই স্তরটিও অবচেতন স্তরের মতোই পার্থিব যুক্তি-বিচার, অনুভূতি ও অহংবোধ রহিত। কিন্তু এই স্তরেই মানবমনের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত। তাঁর মতে বস্তুজগতের সংস্পর্শে এসে আমাদের মন নানা রূপ পরিগ্রহ করে ; যার প্রকাশ হয় তার সচেতন অহংবোধ এবং অবচেতন স্তরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। কিন্তু এসকল বিচিত্র রূপের অন্তরালে অতিচেতন স্তরেই মানবমনের যথার্থ সত্তা প্রকাশিত। ফ্রয়েডের মতো বিবেকানন্দও মনের এই তিনটি স্তরের বর্ণনায় বোঝার সুবিধার জন্য একটা সংস্থানগত (topographical) বা দৈশিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি অবচেতন স্তরটিকে সর্বনিম্নে এবং অতিচেতন স্তরটিকে সকলের ঊর্ধ্বে কল্পনা করেছেন। এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে চেতন স্তর। স্বামী বিবেকানন্দ ও ফ্রয়েড উভয়েই অবচেতন মন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরো একটি লক্ষণের কথা বলেছেন— অবচেতন মন স্থানকালের প্রভাবমুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে অতিচেতন মনকেও স্থানকাল স্পর্শ করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে— অবচেতন ও অতিচেতন স্তরে পার্থক্য কোথায়, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অজ্ঞান ও জ্ঞানে যে তফাৎ, অবচেতন ও অতিচেতন মনের মধ্যেও সেই তফাৎ। ("There is a super-conscious state. Both it and the unconscious state are sensationless, but with a vast difference between them—difference between ignorance and knowledge.") স্বামীজী বলছেন, এই স্তরে আরোহণ করেই মন সত্যকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারে যা সহজ প্রবৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেও সম্ভব নয়। ("... it goes beyond the limits of reason and comes face to face with facts which no instinct or reason can ever know."—Raja-yoga : 'Prana') এই স্তরেই মানবমনের মহত্তর দিকে রূপান্তর ঘটে, সে এক পরম বিশালতার বা একত্বের স্বাদ পায়। আর অবচেতন স্তরের মধ্যে মানবমন হয় নিকৃষ্টাভিমুখী। সেখানে ক্রমেই সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। তাই অতিচেতন স্তরকেই বলা হয়েছে প্রজ্ঞার স্তর, সমাধির স্তর।

ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং বোঝার সুবিধার জন্য ফ্রয়েড মানবমনকে গঠনগত (structural) দিক থেকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন। এই সকল বিভাগগুলির বিভিন্ন কাজ। প্রথমতঃ ইদ (Id)। এটি সম্পূর্ণই অবচেতন। দ্বিতীয়তঃ অহং (Ego)। এটি অংশতঃ সচেতন এবং অংশতঃ অবচেতন। এর কাজ বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করা। তৃতীয়তঃ, অধিশাস্তা বা বিবেক (Super ego) এটিও অংশতঃ সচেতন এবং অংশতঃ অবচেতন। এটি জীবনে নীতি ও আদর্শ যোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দ মনের এই সকল গঠনগত বা অবয়ববাদী (structural) এবং দৈশিক রূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও তিনি অহং-এর

(Ego) কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, মন (অর্থাৎ অহং) সচেতন পরিধির মধ্যে তার কাজ চালায়। এবং এই আমিত্ব বা অহং কিছুটা সচেতন স্তরে এবং প্রধানতঃ অবচেতন স্তরে ব্যাপৃত রয়েছে। ('The mind acts in and under consciousness." এবং "This 'I' of ours covers just a little consciousness and a vast amount of unconsciousness.")।

বস্তুগত অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) বৈজ্ঞানিক হিসাবে ফ্রয়েড মনের অতিচেতন স্তরের কথা স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর ব্যবহারিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির (method of empirical science) সাহায্যে এই স্তরে পেঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ফ্রয়েডের অবচেতন মনের বর্ণনায় আমরা কি একটা অতিচেতন স্তরের আভাস পাই না? তিনি মন এবং অবচেতন মন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: মন মূলতঃ অবচেতন: "The mental state is in itself unconscious."; মূলতঃ মনের সব কিছুই ছিল অদস্ বা ইদ-এর অন্তর্গত যা নাকি সম্পূর্ণই অবচেতন ("Originally everything was Id."); আমাদের সত্তার মূলেই ("core of being") হলো এই অবচেতন ইদ; বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ইদ-এর একটি নিজস্ব প্রত্যক্ষের জগৎ রয়েছে ("The Id, which is cut off from the external world, has its own world of perception") এবং ইদ-এর জগতের সবকিছুই একটা অনির্দিষ্ট ও আনন্দ-বেদনার অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হয়, এবং ইদ অপ্রতিহত আনন্দ নীতিরই অনুগামী: "It remains certain that self-perceptions—co-anaesthetic feelings and feelings of pleasure—unpleasure—govern events in the Id with despotic force. The Id obeys the inexorable pleasure principle." কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এই অবচেতন মনের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এই অবচেতন ইদ-স্তর অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় ("unknown and unknowable")। ফ্রয়েড তাঁর প্রায়োগিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই স্তরে পেঁছাতে পারেননি। তাই তিনি আলাদাভাবে এই স্তরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেননি, কিন্তু অনুমান করেছেন। তাই ইদ-স্তরের জ্ঞান তাঁর কাছে অনুমানলব্ধ জ্ঞান। কেউ কেউ মনে করেন যে, ফ্রয়েডের ইদ-স্তরই একাধারে বিবেকানন্দের অবচেতন ও অতিচেতন স্তরের সমাহার এবং বিবেকানন্দ ফ্রয়েডের ইদ-স্তরকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে এসে তাকে অতিচেতন স্তরে উন্নীত করেছিলেন? ফ্রয়েড যদিও তাঁর মনঃসমীক্ষার কাঠামোর মধ্যে অতিচেতন স্তরের জন্য স্থান করে দিতে পারেননি, তথাপি কারুর পক্ষে যে এই স্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়—এমন কথাও তিনি বলেননি। তিনি তাঁর 'Civilisation and Discontent' গ্রন্থে রোমাঁ রোলাঁ লিখিত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের সর্বভূতে একত্ব অনুভূতির ("oneness with the universe") আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, এই অনুভূতিকে তিনি নিজে মানুষের মনের প্রাথমিক অনুভূতি হিসাবে স্বীকার করতে পারছেন না। তবে এ-দ্বারা তাঁর এরূপ বলার কিছুমাত্র অধিকার নেই যে, এরূপ অভিজ্ঞতা কারুর পক্ষেই লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি নিজে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে অক্ষম। ("From my own experience I could not convince myself of the primary nature of such feeling. But this gives me no right to deny that it does in fact occur in other people ··· I have nothing to suggest which could have decisive influence on the solution of this problem.') স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতিচেতন স্তরে পেঁছানোর পন্থা নির্দেশ করেছেন এবং সেই স্তরে স্বয়ং অবস্থান করেছেন। সুতরাং এই স্তর তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। এই স্তরের স্বরূপ যে আনন্দময় তা তার কাছে সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ফ্রয়েডও তাঁর ইদ-এর আনন্দময়তার কথা বলেছেন। অবশ্য তা পার্থিব সুখের প্রতি আসক্তির অভিজ্ঞতার ওপরে ভিত্তি করে অনুমান করেছেন। ইদ তার নিজের সুখ অ-সুখের জগতের মধ্যে সতত‍ই দোলায়মান। একদিকে যেমন সে প্রবৃত্তির তাড়নায় সুখানুভূতি

খুঁজে বেড়ায়, অপর দিকে সে এই প্রবৃত্তিগত (অতএব পার্থিব) সুখানুভূতির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে [কারণ এর মধ্যে প্রবৃত্তিজাত পীড়ন (tension) বর্তমান] এক পরিনির্বৃত্তিতে স্থিতিলাভ করতে চায়। কারণ বেদনা পরিহার করে অখণ্ড আনন্দলাভের দিকেই তার গতি। ফ্রয়েড এই অবস্থাকে শেষ পর্যন্ত 'নির্বাণ' অবস্থা বলেছেন। তবে এই নির্বাণ অবস্থার স্বরূপ কি? একি অনুভূতিহীন অবস্থা, না এ-ই স্বামী বিবেকানন্দের অতিচেতন মনের আনন্দানুভূতি? ইদ কিভাবেই বা তার সুখ-অ-সুখের দোলায়মান ও পীড়নমূলক অবস্থার পরিনির্বৃত্তি ঘটিয়ে 'নির্বাণ' অবস্থায় পেঁছায়? এ-সকল প্রশ্নের উত্তর মনঃসমীক্ষা মনোবিজ্ঞানে এখনো অসম্পূর্ণ। হয়তো মনঃসমীক্ষার এই অনুসন্ধানের কাজে অনুমান ব্যতীত অন্য কোনও অবলম্বন নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে প্রত্যক্ষানুভূতির কথা বলেছেন এবং এই অনুভূতির কাজে তাঁর সহায় হলো রাজযোগ। স্বামীজীর কাছে মনোবিজ্ঞান হলো আমাদের অতিচেতন মানসিক স্তরকে জানার উপায় এবং রাজযোগই মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। তাঁর মতে রাজযোগের সাহায্যে আমরা মনের অতি-চেতন স্তরের উপাত্ত (data) বা ঘটনাসমূহ সংগ্রহ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান পেতে পারি।

ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষার দ্বারা মনের অবচেতন স্তরের উপাত্ত বা ঘটনাসমূহ সংগ্রহ করে (পরোক্ষ ভাবে) মনকে বোঝার ও জানার রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি কালের প্রভাবে মুক্ত অবচেতনের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। অধ্যাত্ম জগৎ তাঁর অনুসন্ধানের বাইরেই থেকে গেছে। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর বিজ্ঞানের অক্ষমতার কথা বারবার প্রকাশ করেছেন এবং ধর্মের জগতের (আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়) অতীন্দ্রিয় চেতনার উৎস অনুসন্ধানের সমস্যাটিকে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্যা থেকে আলাদাভাবে দেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। (**"This is a fresh psychological problem"** এবং **"The origin of the religious attitude can be traced back in clear outlines as far as the** feeling of infantile helplessness. There may be something further behind that, but for the present it is wrapped in obscurity.")

বিবেকানন্দের রাজযোগভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক অতীন্দ্রিয় বস্তুচেতনার স্তরে পেঁছাতে পারি। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে যে পরম সত্তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, বিবেকানন্দের মনোবিজ্ঞানে তা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে ধরা দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে বিবেকানন্দকে আমরা দৃষ্টিসিদ্ধ (empirical) মনোবিজ্ঞানী বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও (spiritual experience) এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

এখন দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের মনোবিজ্ঞানের সর্বশেষ পরিণতি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মানুভূতি এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পাই সর্বজীবে প্রেম। তাই বলা চলে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের কাজ হলো আমাদের মনের কালিমা দূর করে, মনের নানা দ্বন্দ্ব ও বাধা-বিপত্তির উত্তরণ ঘটিয়ে মনকে বিশ্বপ্রেমের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আধুনিক মনঃসমীক্ষা—মনোবিজ্ঞানের অনেক ধ্যান-ধারণাই স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ফ্রয়েডের সমসাময়িক কালেই প্রতিফলিত হয়েছিল। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষাকে মানসিক রোগ আরোগ্যের কাজে প্রয়োগ করেন এবং এর দ্বারা মানবমনের যথার্থ প্রকৃতি উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হন। বিবেকানন্দ মনোবিজ্ঞানকে আত্মোপলব্ধির সোপান হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে অধ্যাত্ম-জীবনের আলোতেই মানুষ সকল রোগ-শোক, ভয়-ভাবনা এবং জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে। তাই তিনি মনোবিজ্ঞানকে 'আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান' বা 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান' (Spiritual Science) রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। অপরপক্ষে ফ্রয়েডের হাতে মনঃসমীক্ষা হয়ে উঠেছিল নিছকই একটি প্রাকৃত বিজ্ঞান (Natural Science)। মনোবিজ্ঞানের এই দুই রূপই স্বীকৃত—প্রাকৃত বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, তবে বিবেকানন্দের চিন্তাই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিবেকানন্দ

সজনীকান্ত দাস

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

সন্ন্যাসী ভ্রমেন একা হিমাচল পাদমূলে
হাতে দণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক,
বিজন পার্বত্য-পথে নামিয়া এল কি ভুলে
দেহধারী জ্বলন্ত পাবক!
দেখিয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাঁড়ায় পথ,
মনে ভাবে স্বয়ং শঙ্কর—
ললাটেতে রাজটিকা, নাহিক সারথি—রথ,
নাহি সহস্রেক অনুচর।

স্বপ্ন কিম্বা কর্ম দুই ভাবনার মাঝখানে,
সংশয়-আকুল তাঁর মন,
এ তীরের মহারাজা যেন ও তীরের টানে
পরিয়াছে গৈরিক বসন।
হেথা তাঁর কোন্ কাজ—ধরার ধূসর ধূলি,
তমোময় পঙ্কিল সংসার—
শ্মশানে শঙ্কর চলে বিষাণে নিনাদ তুলি—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

সন্ন্যাসী পড়িল জলে মেলি শ্রান্ত ক্লান্ত আঁখি,
ভারতভূমির পানে চায়।
কে ডাকিল, 'ওরে বৎস, কত কাজ আছে বাকি
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়।
কাঁদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে নিপীড়নে,
রক্তমেঘে ঢেকেছে আকাশ—
ভালবাস বুকে নাও, আলো দাও অন্ধজনে—'
সন্ন্যাসী উঠিল সিক্তবাস।

ভারতের মৃত্তিকায় সিক্ত পদচিহ্ন রাখি
ললাটে জুড়িয়া দুই কর
উত্তরে প্রণাম করি, পশ্চিমে ফিরাল আঁখি,
শিব শিব, শঙ্কর শঙ্কর॥
ভারতের বাণীমূর্তি দাঁড়াইল রূপ ধরি
মূর্তি ভারতের সাধনার—
পূর্বাচল বহ্নিশিখা পশ্চিমে ভাসাল তরী—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

পশ্চিমে বিজয়লক্ষ্মী কণ্ঠে দিল জয়মালা,
বিজয়ী ফিরিয়া এল ঘরে,
কে বসিবে সিংহাসনে বক্ষে যার বহ্নিজ্বালা,
নীলাকাশ শিরে ছত্র ধরে!
পীড়িত আর্তের সেবা পতিত অন্ত্যজে প্রীতি,
দীনতা ভুলাতে দীনজনে
সংশয়-তিমির ছেদি ওঠে সন্ন্যাসীর গীতি,
ধায় মন পঞ্চবটীবনে ;

মন্দির করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে,
নাচে শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে—
ক্ষুধিত জঞ্জালপুঞ্জে বহ্নির পরশ লাগে,
গুরু জানে আর শিষ্য জানে,
আঁধার গগনবক্ষে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়া ওঠে,
বহ্নি জাগে তিমির-বিদার—
একটি কমল হতে সহস্র কমল ফোটে—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

[রচনা ১৩৪০ বঙ্গাব্দ]

বিবেকানন্দ

রথীন রায়

তুমি বলেছিলে, ধর্ম নয় পূজার্চনা,
নেই সে তো মন্দিরে, মসজিদে, নেই গ্রন্থে, মতে ;
জীবে প্রেম, জীবে ভালবাসা
সেই তো পরম পূজা, সেই তো পরম আশা।
বলিষ্ঠ ভাষায় তুমি বলেছিলে জগতে।
শিকাগোর সেই পুণ্য ক্ষণে
সে ধূপের ছড়ালো সৌরভ—
নয় বঙ্গ, নয় এ ভারত,
নিখিল বিশ্বের সে গো
সর্বকালে সেই তব পরম গৌরব।
জাগ্রত বিবেকের মাঝে তুমি আনন্দ অনির্বাণ
বিশ্বের বিবেক তুমি সত্যের আলোকে মহান।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

শান্তি সিংহ

অনাস্থা হেনেছি আজ দুর্জয় পাষাণে
ভালোবাসা ফুটে ওঠে পাখিদের গানে।

দেখেছি মিথ্যার রূপ সত্যের মুখোশে
মোলায়েম হিংস্রতায় জ্বলে উঠি রোষে।

বিবেক-বিহীন হয়ে আনন্দ-উৎসব
ভোপাল বা আর্মেনিয়া সংখ্যাহীন শব!

অনাস্থার মাঝে তবু জ্বলুক বিবেক
ঘুচে যাক ঘন বর্ষা—স্তব্ধ হোক ভেক!

হে গোপনচারী

প্রণব ঘোষ

সকল শব্দের রাজা, কে তুমি নিশ্চুপ!
রূপে রূপে ছবি এঁকে যাও হে অরূপ ;
বর্ষা ঘন কৃষ্ণ মেঘে, তড়িত লেখায়
কদম্ব পুষ্পের শোভা—শিখীর পাখায়।
বৈশাখের রুদ্ররূপে, শরতের কাশে,
হেমন্ত-গোধূলি আর পলাশের মাসে।
মানুষের চিত্তে চিত্তে কে ধ্যানমগন,
স্বখেয়ালে, ক্রীড়াচ্ছলে, চিত্তনিরঞ্জন।
নিত্য নব ইচ্ছে দিয়ে আঁকো আঁকিবুকি,
কল্যাণেরই শতধারে কে গো শতমুখী?

রচেছে জীবনের বিচিত্রিত পথ,
দুঃখ ও সুখের নিত্য দুরন্ত দৈরথ?
অশান্ত স্পর্ধিত সিন্ধু, অন্তরীক্ষ-নীলে
নটরাজ, কে নীলকণ্ঠ ধেয়ানে বসিলে?
কাল থেকে কালান্তরে কে বাজাল নাথ,
সুন্দরের বাঁশিখানি সন্ধ্যা ও প্রভাত।
সে কি সত্য?—নাকি মিথ্যা, কল্প-প্রতিমাটি,
আকাশে দুহাত মেলে, স্পর্শ করে মাটি,
যাকে আমি পেতে চাই, সেকি মিথ্যা, ভুল?
নিত্য সত্য, হৃদয়ে তো আনন্দ অতুল।

সে প্রেমেরই অর্ঘ্যে মম লভিবে প্রণাম;
নয়নান্তরালচারী নয়নাভিরাম॥

বিবেকানন্দ
একটি নাম অনন্ত প্রেরণা

পলাশ মিত্র

কে আর মনের গভীর থেকে ডাক দিয়ে
আমাদের শোণিতে তোলে দুরন্ত তুফান,
কে বলো দুহাতে কাছে বুকে টেনে নিয়ে
ভালবাসার ঝরনাধারা ঢালে অবিরাম।
কে বল কোমলে-কঠোরে আর
শৌর্যদীপ্তে আনন্দতনয়,
কম্বুকণ্ঠে কে শোনালো
ঘুমন্ত জাতিকে বরাভয়।

কার কণ্ঠে শোনা গেল
মানুষের শক্তি সীমাহীন
শুধুমাত্র মানুষেরই ভাবনায়
বল কার কাটে রাত্রিদিন।
কে সেই সূর্যস্নাত, অথবা নিজেই সূর্য
অসীম অনন্ত এক মহান বিস্ময়,
কালের শতেক প্রলেপে বল
কার নাম বিন্দুমাত্র হবে নাকো ক্ষয়।

অন্ধ তমিস্র রাতে কার নামে
আশা জাগে মনেঃ
কালও তো ভেবেছি তাঁকে
আজও ভাবি কারণে-অকারণে।

তিনি হেঁটে যাচ্ছেন

তাপস বসু

তিনি হেঁটে যাচ্ছেন
তিনি হেঁটে যাচ্ছেন
ধুলোয় স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে দিয়ে
কুসুমে কসুমে চরণ চিহ্ন এঁকে দিয়ে
তিনি হেঁটে যাচ্ছেন

সাদা, কালো, লাল, নীল
সব মানুষের মাঝখান দিয়ে
দেহময় স্বচ্ছতা নিয়ে
তিনি হেঁটে যাচ্ছেন

তিনি হেঁটে যাচ্ছেন
জলে স্থলে রণে বনে আরাত্রদিনে
কীট হতে অণুকীটে
প্রাণ হতে প্রাণে—বিশ্বচরাচরে অক্লান্ত
তিনি হেঁটে যাচ্ছেন

তিনি হেঁটে যাচ্ছেন
আমাদের সকলকে সৃষ্টিশীল, সচল রাখতে
অনস্পৃশ্য কিন্তু অনুভববেদ্য
তিনি হেঁটে যাচ্ছেন
আমাদের পূর্ণ, শুদ্ধ, সুন্দর করে তুলতে।

জাগরণী

বিজয়কুমার দাস

ওঠ, উঠে দাঁড়াও। ছুঁড়ে ফেল
এই বিষন্নতা, বুকের বীণায়
বাজাও অমৃতের জাগরণী।
এই রক্ত আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে
এক পথ হও একই মিছিলে।

জাগ, ঘুম ভাঙাও। ছুঁড়ে ফেল
স্থবির জড়তা, এই কুয়াশায়
শোনাও জীবনের আগমনী।
এই যুদ্ধ আর শত্রুর বিরুদ্ধে
এক পথ হও একই মিছিলে।

জাগরণের দূত ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে—
এস, আমরা জাগরণের গান গাই।

প্রবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জনগণ

জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়

সমাজচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মূলতঃ বিপ্লবী। তিনি হিন্দুসমাজের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও এর জাতিভেদপ্রথার গোঁড়ামি কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। বর্ণাশ্রমধর্ম এদেশে প্রাচীনকালে যে অবস্থাতেই উদ্ভূত হোক না কেন, এর অনুশাসনে নিম্ন বর্ণের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমে ক্রমে সীমাহীন হয়ে ওঠে ও তারা ক্রমশঃ নিচুতে নামতে নামতে দাসত্বের স্তরে পেঁছায়। ভারতীয় জনগণের অধঃপতিত ও অবহেলিত বিপুল অংশকে স্বামীজী 'শূদ্র' নামে বিশেষিত করেছিলেন। তাদের ব্যথা-বেদনা স্বামীজীকে গভীরভাবে বিচলিত করে। শূদ্রের অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী তাঁর বজ্রকণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামীজীর একটি উক্তি এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

"এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের (উচ্চবর্ণের) অনেকের চেয়ে ঢের বেশি। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের ওপরে উঠে যাবে। ...তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।...

"শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা 'ছোটলোক' ভাবছিস, আর নিজেদের 'শিক্ষিত' বলে বড়াই করছিস? ...এরা একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্যগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ··এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।...

"তা নাহলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই।··· এই জনসাধারণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে, তারাই তখন সব ভেঙে দেবে।..."[১]

উনিশ শতকে রামমোহনের সময় থেকে হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠনের সপক্ষে যে চিন্তাস্রোত আমাদের দেশে বইতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধারাকে আরো বেগবতী করে তোলেন—প্রথমতঃ, তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু দিয়ে, দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাত্মাদর্শনের বাস্তব প্রয়োগ করে। নিপীড়িত জনগণের কথা আধুনিক যুগে স্বামীজীর পূর্বে এবং পরে এদেশে অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু যে অনুভূতির তীব্রতা নিয়ে স্বামীজী সমস্যাটিকে দেখেছেন তার কোন তুলনা নেই। "যতদিন একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার ধর্ম হবে সেই কুকুরটির মুখে অন্ন তুলে ধরা"—স্বামীজী বলেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের বা মহাপ্রভু চৈতন্যের হৃদয়বত্তার সঙ্গে স্বামীজীর হৃদয়বত্তার তুলনা করা চলে।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, জাতিভেদপ্রথা হলো একটি নিছক সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা নয়। প্রাচীনকালে এই প্রথা হিন্দুসমাজের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই গঠিত হয়েছিল এবং হিন্দু-সমাজের উদার বক্ষে সকল বর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের—অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবে এর চেহারা ও চরিত্র পাল্টে যায়, উচ্চবর্ণের প্রভাব বৃদ্ধি হয় আর নিম্নবর্ণের মানুষদের অবস্থা হয় ক্রীতদাসের মতো শোচনীয়। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত ও নিপীড়িত শূদ্রশ্রেণীকে স্বামীজী চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমাজের নিম্নবর্ণের কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্গতির জন্য স্বামীজী প্রধানতঃ দায়ী করেছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণী তথা উচ্চবর্ণকে। যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মের যুক্তি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে ক্রীতদাস বা পশুর স্তরে নামিয়ে রেখেছে।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ১০৭

স্বামীজী জানতেন যে, হিন্দুধর্ম আত্মার মহিমা প্রাচীনকাল থেকেই ঘোষণা করে আসছে। জাতি-ভেদপ্রথার পেছনে তার কোন সমর্থন নেই। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করে স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণকুল লক্ষ লক্ষ প্রতিবেশীকে 'অস্পৃশ্যের' স্তরে নামিয়ে এনে যে পাপাচার অনুষ্ঠান করেছে সেই পাপের বিরুদ্ধে, সেই ছুঁৎমার্গীদের বিরুদ্ধে স্বামীজী সর্বশক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। স্বামীজীর চিন্তাধারায় জনগণের স্বার্থকে অবহেলা করা ভারতের "প্রবল জাতীয় পাপ" এবং তা-ই ভারতের "অবনতির অন্যতম কারণ।"[২] শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন, সচক্ষে দেখলেন রূঢ় বাস্তবের ভারতবর্ষকে, দেখলেন ভারতীয় জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্য, দুর্দশা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার। বিত্তবান ও অভিজাতদের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরলেন পতিত মানুষদের উন্নতির পথ নির্ধারণের জন্য, কিন্তু তেমন কোন সাড়া পেলেন না। অথচ জন-সমাজের এই বিপুল অংশের ভাগ্যোন্নতি না হলে জাতির সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব। যে দরদ নিয়ে জনগণের কথা স্বামীজী প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আলোচনা করেছিলেন তা চিন্তা করলে আজও মনে শিহরণ জাগে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার একটা উপায় খুঁজতেই তিনি আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

জাতিভেদপ্রথার কুফল দূরীকরণের জন্য স্বামীজী কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথমতঃ, উচ্চশ্রেণীদের একচেটিয়া অধিকার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। জন্মসূত্রে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন জাতিভুক্ত হতে পারে; পরবর্তী কালে কোন ব্যক্তি অন্যদের চেয়ে অধিক অর্থবান বা জ্ঞানবান হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি অতিরিক্ত কিছু সুযোগসুবিধা পাবে। বরং স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, যদি সুযোগসুবিধা দিতেই হয় তবে তা সমাজের অবহেলিত শ্রেণীকে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বামীজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলছেনঃ "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবনগঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়?... সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে যে, সত্যিকার জাতি যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।... তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"[৩] শিক্ষা বলতে তিনি নিছক পুঁথিগত শিক্ষা বলেননি, সুস্থ সার্থক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবমুখী শিক্ষা বুঝিয়েছিলেন। স্বামীজী বলছেনঃ "আমাদের চাই কি জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই কারিগরী শিক্ষা, চাই—যাতে শিল্প (industry) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"[৪] তিনি জানতেন যে, শিক্ষার প্রসার ঘটলে তাদের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে, তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, জাতিভেদপ্রথাও ক্রমে হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণের জন্য স্বামীজী নিম্ন-বর্ণদের উপবীত প্রদান করার কথাও বলেছেন এবং স্বয়ং তা প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সর্বোপরি, স্বামীজী সচেতন ছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে সমতা এনে দিচ্ছে। রাজনৈতিক পরাধীনতা, পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষার প্রসার, প্রতিযোগিতা-মূলক উৎপাদন ব্যবস্থা, শিল্পোন্নতি, নগরপত্তন ও বাণিজ্যিক বিকাশ জাতিভেদপ্রথাকে ধীরে ধীরে আরও অর্থহীন করে দেবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের ওপরতলার মানুষদের শক্তি ও সততার উপর যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি তাদের মৃত বা মৃতকল্প বলে মনে করতেন। বলতেন, তারা হলো দশহাজার বছরের পুরাতন মমির মতো। তারা সমাজের বুক থেকে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবার পরই জেগে উঠবে নতুন ভারতবর্ষ, যে-ভারতবর্ষের রূপকার হবে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষেরা অর্থাৎ শূদ্রেরা। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশ বিপ্লব বা ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের চৈনিক বিপ্লবেরও বহু পূর্বেই স্বামীজী শূদ্রের অনিবার্য অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন।

২ বাণী ও রচনা, পৃঃ ৪৭২ ৩ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৩৫ ৪ ঐ, পৃঃ ৪০৩

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও কালী কমলীওয়ালা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

তীর্থযাত্রীদের কাছে একটি সুপরিচিত নাম কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালা ও অন্নসত্র। তপোভূমি হিমালয়ের কোলে রয়েছে দুর্গম তীর্থক্ষেত্রগুলি। ঐ সব স্থানে তীর্থযাত্রীদের—সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের—যাওয়া যেমন দুষ্কর ছিল, তেমনি ছিল আশ্রয়ের তীব্র সমস্যা। এইটি সর্বপ্রথম মনে-প্রাণে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন একজন নিঃস্ব সন্ন্যাসী। তাঁরই অনলস প্রচেষ্টায় তীর্থস্থানগুলিতে স্থাপিত হয়েছে ধর্মশালা ও অন্নসত্রগুলি। এই নিঃস্ব সন্ন্যাসী হলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। তবে তিনি 'বাবা কালী কমলীওয়ালা' নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

বাবা কালী কমলীওয়ালার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা ও অন্নসত্রগুলিকে রামকৃষ্ণ সংঘকে হস্তান্তর করে দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। তবে এ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থগুলিতে কোন উল্লেখ নেই। এমনকি অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতেও কোন বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু বাবা কালী কমলীওয়ালার জীবনীতে ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রীমর জীবন-ভাষ্য 'শ্রীম দর্শন' বইতে এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এছাড়া স্বামী নির্লেপানন্দের সংকলিত 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' গ্রন্থেও এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। এবিষয়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

বাবা কালী কমলীওয়ালার পূর্বাশ্রমের নাম বিসাবা সিংহ। পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার কীটনা-জালালপুর গ্রামে অভিজাত বৈশ্যকুলে তিনি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতার ছিল মিঠাইয়ের দোকান। ছোটবেলায় এই দোকানে কালী কমলীওয়ালাজী কাজ করতেন। প্রথম বয়স থেকেই বিসাবা ছিলেন বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী। সাধু-সঙ্গ ও সাধুসেবা ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় কাজ। মাত্র ষোল বছর বয়সে বাধ্য হয়ে তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। তিন পুত্রের জনক হন তিনি। কিন্তু সংসারের জালে বেশিদিন তাঁকে থাকতে হয়নি। প্রবল বৈরাগ্যের প্রেরণায় বত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পুণ্যধাম কাশীতে গিয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন পরমহংস তপোনিধি স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর বিসাবা নতুন নামে ভূষিত হলেন—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ।[১]

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর বিশুদ্ধানন্দকে গৃহস্থাশ্রমে নির্লিপ্তভাবে তিন বৎসর অতিবাহিত করতে হয় তাঁরই গুরুর আদেশে। এরপরে চিরতরে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে থেকে সাধন-ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন তিনি। তারপরেই বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পরিক্রমায়। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কেদারবদরী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি দুর্গম পথে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী যাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন নিজের চোখে। অরণ্যপূর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃষীকেশে ঝুপড়িতে তপস্যারত সাধুরা জীবনধারণ করতেন কন্দমূল, জংলী ফল ও বেলপাতা আহার করে। এসব দেখে বিশুদ্ধানন্দ বিচলিত হলেন। সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তীর্থযাত্রীদের সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার।[২]

বিশুদ্ধানন্দ নিজ সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলেন বহু ধনী ব্যক্তিদের কাছে। অর্থের পরিমাণের কথা চিন্তা করে সবাই পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু দমবার পাত্র নন বিশুদ্ধানন্দজী। কলকাতার এক শেঠের অর্থে তিনি প্রথম কাজ আরম্ভ করলেন হৃষীকেশে। সময় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। যাত্রীদেরকে বিতরণ করলেন জল, ছোলাভাজা ও গুড়। এরপর কলকাতার বহু শেঠ এগিয়ে এলেন বিশুদ্ধানন্দকে সাহায্য করতে। সিংঘানার ধনী দেবী সহায় টিবড়েওয়াও দান করলেন।

১ ভারতের সাধক—শংকরনাথ রায়, ১ম খণ্ড (১৩৯২), পৃঃ ৪৬৮

২ ঐ, পৃঃ ৪৬৯

হৃষীকেশের ভরতমন্দির-মোহন্ত রামরত্নদাসজী বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত হলো।[৩] ভারতের সব তীর্থস্থানে গড়ে উঠল ধর্মশালা ও অন্নসত্র।[৪] সাধুরা নিশ্চিন্তমনে সাধন-ভজনে ডুব দিলেন। তীর্থযাত্রীদের সুরাহা হলো আশ্রয় ও অন্নের। পরম আনন্দে সম্পন্ন হতে থাকল তাঁদের তীর্থযাত্রা।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের পরনে থাকত একটি কালো কম্বল। আর একটি কালো কম্বলেই ঘুমোতেন তিনি। তিনি সর্বদা এই কালো কম্বল ব্যবহার করতেন বলেই লোকে তাঁকে ডাকতেন কালী কমলীওয়ালা বলে। আর এই নামেই সারা ভারতবর্ষে বিশুদ্ধানন্দজী পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হলো 'কালী কমলীওয়ালা পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র'।[৫] 163080

পরিব্রাজককালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল কালী কমলীওয়ালার। কিন্তু কোন্ সময়ে? ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে শিষ্য স্বামী সদানন্দ সহ স্বামীজী কিছুকাল হৃষীকেশে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখানে দীর্ঘকাল সাধন-ভজনে অতিবাহিত করবেন। স্বামী সদানন্দের কঠিন রোগ ও তাঁর নিজের ম্যালেরিয়ায় ভোগার দরুন স্বামীজী ঐ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে বরাহনগর মঠে ফিরে আসেন।[৬] স্বামীজী দ্বিতীয়বার হৃষীকেশে আসেন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে। সঙ্গী ছিলেন তাঁর গুরুভাইরা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, পরে সন্ন্যাস-জীবন ত্যাগ করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন)। এখানে তাঁরা নিরত ছিলেন তপস্যায়। স্বামীজী হৃষীকেশে অন্নসত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে কালী কমলীওয়ালার অন্নসত্র কিনা বলেননি। কিন্তু সে-সময় ঐ অন্নসত্র ছাড়া অন্য কোন অন্নসত্র হৃষীকেশে ছিল না। সুতরাং ওটি কালী কমলীওয়ালা অন্নসত্র হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এই দু-বারের কোন এককালে স্বামীজীর সঙ্গে কালী কমলীওয়ালার সাক্ষাৎকার হলেও দ্বিতীয়বারে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, দ্বিতীয়বারে স্বামীজী হৃষীকেশে দীর্ঘকাল ছিলেন। সেসময় বহু সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তা তিনি নিজেই বলেছেন।[৭] শ্রীমও বলেছেন: "শোনা যায়, বাবা কালী কমলীওয়ালা স্বামীজীকে চিনতে পেরেছিলেন। তখনো তিনি আমেরিকায় যান নাই। হৃষিকেশে ছিলেন।"[৮]

শ্রীম আরও বলছেন: "বিবেকানন্দ বলতেন বাবা কালী কমলীওয়ালার কথা। বলতেন, ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম ঐ একটি সাধুকে করতে দেখেছি।"[৯] বলেছেন: "বিবেকানন্দ হৃষীকেশের কালী কমলীওয়ালা বাবার গল্প করতেন।"[১০] সুতরাং শ্রীমর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বামীজী কালী কমলীওয়ালার কথা তাঁর গুরুভাইদের কাছে বলেছিলেন। এবং এও প্রমাণ হয় যে, স্বামীজীর সঙ্গে কালী কমলীওয়ালার সাক্ষাৎকার হয়েছিল ও পরিচয় ছিল। তা নাহলে তিনি পরবর্তী কালে তাঁর কথা উল্লেখ করতেন না।

স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ও তৎপূর্বে হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান অতি দুর্গম ছিল।... হৃষীকেশে কালী কম্বলীবাবার সত্র এবং আর একটি

৩ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৬৯

৪ এদের প্রধান কার্যালয় কলকাতায়। ঠিকানা: বাবা কালী কমলীওয়ালা পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র, ২০৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। এই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিম্নরূপ: সদাব্রত—৬৫, দাতব্য চিকিৎসালয়—৬৫, ধর্মশালা—৯০, পানি-পিয়াও—৭০, মন্দির—৬০, গোশালা—৫, পাঠশালা—২, অনাথ আশ্রম—২, আয়ুর্বেদ কলেজ ও ওষুধের কারখানা—১। এই সংখ্যা বাংলা ১৩৯০ সালের। বর্তমানে সংখ্যা নিশ্চয় আরো বেড়েছে। প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রবন্ধকারকে বর্তমানের সঠিক সংখ্যা দিতে পারেননি।

৫ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৬৯

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩), পৃঃ ২৪৮—২৪৯

৭ ঐ, ২৯০—২৯৪

৮ শ্রীম দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ, ১৩৮২), পৃঃ ১০৬

৯ ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৫

১০ ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৭৩

কি দুটি সত্র ছিল। দুটি সত্র সময় সময় বন্ধ থাকিত, শুধু কম্বলীবাবার সত্রই বারোমাস খোলা থাকিত।... তিনি যেমনি ত্যাগী তেমনি কর্মবীর ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ হৃষীকেশে অবস্থানকালে কম্বলীবাবার ভাব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কম্বলিবাবার অনেক উল্লেখ করিয়াছিলেন।"[১১]

স্বামীজী বাবা কালী কমলীওয়ালার প্রশংসা করে বলেছেন: "সারা ভারতে বাবা কালী কমলী-ওয়ালার মতো এমন কর্মযোগী আর দেখি নাই। দেশের কল্যাণের জন্য এমনি ধরনের কর্মী মহাত্মারই প্রয়োজন সর্বাধিক।"[১২] কালী কমলীওয়ালার কর্মযোগীর রূপচিত্র এঁকেছেন শ্রীম: "চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন। তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট করালেন। মাঝে মাঝে ধর্মশালা আর সদাব্রত। হৃষীকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র।... নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন, রুটি সেঁকতেন। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন—নিজেও বাইরে এসে সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন।"[১৩]

কালী কমলীওয়ালা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্রের ভার স্বামীজীকে দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীম বলেছেন একথা।[১৪] একথা স্বামী নির্লেপানন্দের "স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন" পুস্তকে উল্লিখিত আছে।[১৫] এই স্মৃতিকথা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। কালী কমলীওয়ালা এসেছিলেন কলকাতায় —বড় বাজারে শিউপরসাদ ঝুনঝুনওয়ালার বাড়িতে। তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। কালী কমলীওয়ালা দেখা করবেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে। এঁরা সবাই তখন ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর বাগবাজারের ভাড়াবাড়িতে। শ্রীমায়ের এই বাসভবনটি ছিল বাগবাজারে ৩ নম্বর সরকার বাড়ি লেনে। স্বামীজী তখন পাশ্চাত্যে। কালী কমলীওয়ালা শ্রীমায়ের বাসভবনে এলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন স্নান করছিলেন। স্নান করে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। রাজা মহারাজ বললেন: "মৈ আপকা ক্যা সেবা করু"—আপ ক্যা পাওয়েঙ্গে, মহারাজ।" কালী কমলীওয়ালার উত্তর: "যো কুছ মিলেগী।" ওখানেই শ্রীঠাকুরের প্রসাদ পেলেন তিনি। তাঁকে স্বামীজীর বক্তৃতা পড়ে ভাবার্থ শোনালেন স্বামী যোগানন্দ। তারপরেই কালী কমলীওয়ালা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সব সত্রগুলোর পরিচালন-ভার অর্পণ করতে চাইলেন। তবে তিনি কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিদেশে স্বামীজীকে জানানো হলো। শর্তগুলি স্বামীজীর পছন্দ হয়নি। ফলে অধিগ্রহণের কাজ আর এগোয়নি।[১৬]

কোন্ সময়ে কালী কমলীওয়ালা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এসেছিলেন? সরকার বাড়ি লেনে শ্রীমা সারদাদেবী সঙ্গীসহ ৫।৬ মাস বাস করেছিলেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে। ব্রহ্মানন্দজী, যোগানন্দজী প্রমুখ দোতলায় থাকতেন। তিনতলায় ছিল শ্রীমায়ের বাসস্থান।[১৭] আর কালী কমলীওয়ালার দেহত্যাগ হয় কাশীধামে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে।[১৮] সুতরাং এ থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগের আগে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের পর কোন একসময়ে কালী কমলীওয়ালার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

১১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড (৫ম মুদ্রণ, ১১৮৭) পৃঃ ১২৩ এই সূত্রে মহেন্দ্রনাথের পরবর্তী মন্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে। তিনি লিখছেন: "নরেন্দ্রনাথের কর্মের ভাব কম্বলি-বাবার কার্য দেখিয়া অনেক পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। হৃষীকেশ তাঁর পীড়ার সময় ঔষধ ও চিকিৎসার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল এবং সাধুদিগের শরীর অসুস্থ হইলে কিরূপ দুর্গতি হয় এইসকল বিষয় তিনি পরিদর্শন ও হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সেবাশ্রম করিবার জন্য এত প্রয়াস করিয়াছেন।" (পৃঃ ১২৪)

১২ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৭০

১৩ শ্রীম দর্শন, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৫

১৪ ঐ, পৃঃ ১০৬

১৫ স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ (২য় মুদ্রণ, ১৩৮২), পৃঃ ৮৬–৮৭

১৬ উদ্বোধন, ৪২শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় (১৩৪৭), পৃঃ ২৯৮—২৯৯

১৭ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা (৫ম সংস্করণ, ১৩৮১), পৃঃ ২১৫

১৮ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৭০

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ-রত্নবলী

॥২॥

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর কথা

(৫)

প্রারব্ধ ও পুরুষকার

"প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুঃ"—প্রারব্ধই শরীরকে পোষণ করিবে। শরীরস্থিতি প্রারব্ধাধীন। কিন্তু অজ্ঞানী লোক শরীরকে প্রারব্ধের হাতে সমর্পণ না করিয়া সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে দেহের ভোগ, পোষণ ও রক্ষণাদি ব্যাপারে। পরমার্থ বিষয়ে পুরুষার্থ প্রয়োগ করা উচিত। যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় সেজন্য পুরুষার্থ করা উচিত। সে কথায় সে বলেঃ "ভগবানের কৃপা হইলে তবে তো তাঁহার দর্শন হইবে? প্রারব্ধে যেমন আছে তেমনই তো হইবে, ইত্যাদি।" পরমার্থ ছাড়িয়া দেয় প্রারব্ধের উপর। ঠিক উল্টোটি করে। আর দেহের ভোগাদির জন্য খুব পুরুষার্থ করে। মুমুক্ষুর ঠিক বিপরীত। সে দেহের প্রতি উদাসীন থাকিবে। দেহের স্থিতি, পোষণ, রক্ষণ সব প্রারব্ধের হাতে সমর্পণ করিবে আর সর্ব পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী সাধন অনুষ্ঠানের জন্য। তবে তো হইবে।

(৬)

পরমাত্মবাসনা

পূর্বাপর বিচার ব্যতিরেকেই—কোন নিমিত্তবশতঃ নহে, নিমিত্তের অভাবেও যে হঠাৎ কামক্রোধাদি বৃত্তির উদয় হয় তাহার কারণ বাসনা—অবশ্যই দুর্বাসনা। যখন উত্তেজক নিমিত্ত সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতেও কামক্রোধাদি বৃত্তির উদ্রেক হয় না তখন বুঝিতে হইবে বাসনা নির্মূল হইয়াছে।

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

সৎসঙ্গ, শাস্ত্রবিচারাদির দ্বারা পরমাত্মবাসনা বা সংস্কারের জন্ম হয়। ব্যবহারকালেও যখন চিত্ত অন্য ব্যাপারে নিমগ্ন তখনও হঠাৎ কাহারও আকস্মিক কোন কথায় বা অন্য কোন নিমিত্তবশতঃ অকস্মাৎ সেই পরমাত্মবাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পূর্বাপর কোন বিচার ব্যতিরেকেই আত্মচিন্তন বা আত্মাকারবৃত্তি চিত্তে জাগ্রত হয়। উহার নিমিত্ত হইল পরমাত্মবাসনা। এই বাসনার যত বৃদ্ধি হইবে ততই কল্যাণ। ততই অশুভ বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকিবে। দুর্বাসনা বিনষ্ট হইলে শুদ্ধচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

(৭)

মান—শরীর, বিষয়—বস্ত্র

যদি ডাকাত কাউকে মারিতে আসে তখন সে বলে—"আমায় প্রাণে মারিও না, গলা কেটো না। আমার কাপড়চোপড় টাকা পয়সা যা আছে নিয়ে যাও, তাতে আপত্তি নেই, তবু আমায় প্রাণে মেরো না।" লোকে বস্ত্র, মান ত্যাগ করিয়া শরীরকে বাঁচাইতে চাহে। বিষয় যেন বস্ত্র এবং মান শরীর। লোকে বিষয় ত্যাগ সহজেই করিয়া থাকে মানের জন্য, মানরূপ শরীরের জন্য। শরীর ত্যাগ কি কেউ করিতে চায়? শরীরের মমতা ছাড়া কঠিন। তেমনি এই মান ত্যাগও অতি কঠিন। বিষয় ত্যাগ তো অতি সহজ। যেন শরীরের উপরের বস্ত্রখণ্ড ত্যাগ। শরীর অর্থাৎ মান ত্যাগ কে করিতে পারে?

বিষয় ভোগ হ্যায় মনকে কপড়ে।
বিষয়ত্যাগ মন তুচ্ছ দুঃখ অপড়ে [প্রাপ্ত হয়] ॥
মান অহে যহ মনকো তন্না [তনু, দেহ]।
মান হনে [নাশ হইলে] যহ মনহী হন্না
[নাশ হয়] ॥

(৮)
গোলামের গোলাম।

মনঃসংযম সাধুর পক্ষে অতি আবশ্যক। মনে মনে বিষয়-ভোগবাসনার সংকল্প হইতে থাকিলে অন্য সাধন ব্যর্থ। এক রাজা এক সাধুর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সাধু বলিলেনঃ "তোমার সঙ্গে আমি কি কথা বলব? তুমি তো আমার গোলামের গোলাম।" রাজা বলিলেনঃ "সে কি? আমি দেশের রাজা। আপনার গোলামের গোলাম কি করে?" সাধু বলিলেনঃ "মন আমার গোলাম। কিন্তু তুমি বিষয় ভোগলালসায় নিরন্তর মনের সংকল্পদ্বারা চালিত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছ, তাই তুমি হচ্ছ মনের গোলাম। সেই জন্যই বলেছি, তুমি আমার গোলামের গোলাম। যতক্ষণ গোলামি করবে ততক্ষণ কোন উপদেশই তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করবে না।"

(৯)
ঘটে আকাশ কি ভরা যায়?

মনে কর একটি ঘটে বালি বা অন্য কিছু ভর্তি রহিয়াছে। এখন তুমি চাহিতেছ ঘটটিকে আকাশ পূর্ণ করিতে। এখন কি করিবে? বালিগুলি বা অন্য জিনিস ফেলিয়া দিলেই দেখিতে পাইবে যে, ঘটে আকাশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তুমি কি ঘটে আকাশ ভরিলে? তা নহে। কেবল অন্য জিনিসগুলি সরাইয়া দিলে মাত্র। আকাশ পূর্ব হইতেই সেখানে রহিয়াছে, সেটাই তুমি জানিতে পারিলে।

তেমনি সুখস্বরূপ আত্মা পূর্ব হইতেই তোমাতে রহিয়াছেন। তুমি সুখস্বরূপ। তার উপর অজ্ঞানাদি আবরণ রহিয়াছে। তোমার কর্তব্য এই আবরণগুলি সরাইয়া দেওয়া। সেগুলি সরিয়া গেলেই সুখস্বরূপ আত্মা প্রকট হইবেন। তাই সূত্র রহিয়াছেঃ

সিদ্ধং তু অতন্নিবর্ত্তকত্বাৎ।

শাস্ত্র কেবল 'অতৎ' অর্থাৎ অনাত্মবস্তু বা আবরণগুলি নিবৃত্ত করিয়া দেয় মাত্র। বস্তু তো প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্রের উপযোগিতাও সিদ্ধ হয়, যদিও বস্তুর সহিত শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

(১০)
স্বস্থতা ও সুখদুঃখ

স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ, স্বরূপবিচ্যুতিই দুঃখ। মানুষ যখন ভাল থাকে তখন 'কেন ভাল আছ' বা 'কেন সুখে আছ' এই প্রশ্ন কেহ করে না। কিন্তু যদি বলে 'বড় দুঃখে আছি', তখন লোকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে। যেটা স্বাভাবিক অবস্থা সেবিষয়ে লোকের প্রশ্ন হয় না। অগ্নি উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে না। জল শীতল, কেন শীতল সেবিষয়েও প্রশ্ন হয় না। যদি উল্টাটি হয় তবে লোকে জিজ্ঞাসা করে কি করিয়া ঐরূপ হইল। সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ সুখ তাহার স্বরূপ। তাই সুখে থাকিলে বা স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না। দুঃখ অর্থাৎ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইলেই প্রশ্ন হয়— 'কেন ঐরূপ হইল' ইত্যাদি।

সুতরাং সুখই জীবের স্বরূপ।

স্ব-স্থতাই সুখ। অ-স্বস্থতাই দুঃখ।

(১১)
মহাত্মা ও ক্ষুদ্রাত্মা

মহাত্মা কে? মহান হইতেছেন পরমাত্মা। যিনি পরমাত্মাকে নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই মহাত্মা—অক্ষুদ্রবুদ্ধি।—আর যিনি পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ অনাত্মা দেহ ও জাগতিক পদার্থে আত্মা ও আত্মীয় বুদ্ধি করেন, তিনিই ক্ষুদ্রাত্মা বা দুরাত্মা। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

অপচয়ের হিসাব

আশাপূর্ণা দেবী

দেশে রাজ্যে সর্বদাই উন্নয়নের অনেক শপথ, জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটাপিটি এবং সঠিক শিল্পোন্নয়নের বহুবিধ প্রকল্পের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু একটি ব্যাপার কি লক্ষণীয় নয়? 'মানুষ' হিসেবে আমাদের 'মান' ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে! ঠাকুর যাকে বলতেন 'মান হুঁশ'। অর্থাৎ আপন 'আত্মমর্যাদা' সম্পর্কে 'হুঁশ'। যে 'হুঁশ'টি থাকলেই তবে মানুষকে 'মানুষ' পদবাচ্য করে। অস্বীকার করা যাবে না সেই 'হুঁশ'টি অর্থাৎ সেই চেতনাটি আমাদের সমাজ-জীবনের চরিত্র থেকে ক্রমশঃই যেন লুপ্ত হতে বসছে। মানুষ ক্রমেই যেন শুধুই 'লোক' হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের ভাষায়, যারা লোক না 'পোক'। এই 'পোক'দের নিয়েই আজকের পোকায় খাওয়া সমাজজীবন। আজকের সমাজে সত্যকার একটি 'চরিত্র' বড় দুর্লভ! আদর্শবাদী উন্নতমানের মহৎ একখানি 'চরিত্র' যা একদা চোখে পড়ত এবং এখনো 'বরণীয় আর স্মরণীয়ের' তালিকায় যাঁদের নাম, তেমন চরিত্র আজকাল আর সহজে দেখতে পাওয়া যায় কি? আজকের বাংলার প্রজন্মকে দেখলে কি মনে হয় এদেশ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, অরবিন্দ, সুভাষ, ক্ষুদিরাম আর সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবীর দেশ? সেইসব মহৎ আদর্শ মহদ্‌বাণী কি এই প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে কেউ?

অবশ্য দেশের একাংশে নীরবে নিভৃতে কিছু 'কাজ' হয়ে চলেছে। তা না চললে, জগতের ভার-সাম্য থাকে না। তবে অধিকাংশ নিয়েই তো কথা! আজকে নেতৃত্ব দেবার তেমন 'আবির্ভাব' ঘটছে কই? আজকের দেশনেতা রাষ্ট্রনেতা বা সমাজনেতা সকলেই যেন একটি অন্ধচক্রের পাকে পাক খেয়ে চলেছেন। তাঁদের কাজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তার পরিচয় দেখা যায় না। চিন্তা কেবল আপন 'পদোন্নয়ন'।

রাষ্ট্রনেতাদের তাই 'মানুষ' নামক বস্তুটার দরকারই হয় না (বরং বোধহয় যেটা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাকরই)। তাঁরা শুধু 'লোক' পেলেই সন্তুষ্ট। যেটির নাম 'সংখ্যা'। যেটির থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে একটি ভোট। তা মহৎ অথবা 'মহামহোপাধ্যায়ের'-ও তো একটাই ভোট এবং 'বুন্ধু-গদাইয়ের'-ও একটাই ভোট। তবে আর 'মহা'দের জন্যে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি?

এখন তো আবার আঠারো বছর মাত্রই ভোটাধিকার! কাজেই সংখ্যার তালিকা অনেক পরিপুষ্ট।

অবশ্য সেটি অন্যায্য নয়। আঠারো বছর বয়সটি কিছু কম নয়। একদা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির যুদ্ধে অনেক আঠারো বছরের (তার থেকে কমও) তরুণ

দেশে রাজ্যে সর্বদাই উন্নয়নের অনেক শপথ, জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটাপিটি এবং সঠিক শিল্পোন্নয়নের বহুবিধ প্রকল্পের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু একটি ব্যাপার কি লক্ষণীয় নয়? 'মানুষ' হিসেবে আমাদের মান ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে!

একদা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির যুদ্ধে অনেক তরুণ সে-যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। ইতিহাসে আগুনের অক্ষরেই তাদের নাম লেখা আছে। তারও আগে উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা 'নবজাগরণ'-এর আলোকশিখা হাতে নিয়ে এসে একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের মধ্যেও বহু তরুণ যুবক 'কুসংস্কারমুক্তি'র আন্দোলনে স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সে-যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। ইতিহাসে আগুনের অক্ষরেই তাদের নাম লেখা আছে। তারও আগে উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা 'নবজাগরণ'-এর আলোকশিখা হাতে নিয়ে এসে একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের মধ্যেও তো অনেক নিতান্ত তরুণ যুবকও 'কুসংস্কারমুক্তির' আন্দোলনে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কালের বিচারে হয়তো বলা হতে পারে 'সব সময়ই যে তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন তা নয়।' তবু ভ্রান্ত-অভ্রান্ত যাই হোক যুবশক্তির একটি প্রবল প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাঁদের সেই দুর্বার গতির মধ্যে।

সমাজজীবনে সর্বসাধারণের মধ্যেও তখনো 'ধর্ম' শব্দটি ছিল ভয়ঙ্কর মূল্যবান (যেটি এযুগে আর নেই)। তাই ধর্মের নতুন করে মূল্যায়নের চেষ্টাও হয়েছিল জোরালোভাবে। এই দুই অধ্যায়েই বাঙালীর জীবনে 'যুবশক্তি' যেন একটি 'ধ্রুবজ্যোতি'র মতো স্মরণের অমৃতলোকে দীপ্যমান, যে 'জ্যোতি'র কেন্দ্রীভূত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি দেশে দেশে কালে কালে চিরকালীন যুবশক্তির আদর্শস্বরূপ। কোন কালে কোন পরিপ্রেক্ষিতেই যুবসমাজের কাছে স্বামীজী নির্দেশিত আদর্শ অব্যবহার্য হয়ে যাবার নয়।

কিন্তু হতাশার সঙ্গেই লক্ষণীয়—এই প্রজন্মের যুবসমাজের মধ্যে নেই তেমন কোন জ্যোতির্ময় শক্তির প্রেরণা। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা দেখা যে যায় না তা নয়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষ তো থাকবেই জগৎ-সংসারে। তবে সার্বিকভাবে কিছু গড়ে তোলার মতো পরিবেশ তাঁদের নেই। উপাদানও আশাপ্রদ নয়। তাছাড়া সবকিছুর মধ্যেই তো আবার এখন ভেজাল ঢুকে পড়ে। এমন অনেক উদ্যোগীজন এক একটি মহৎ আদর্শবাদ নিয়ে কিছু কিছু সঙ্ঘ সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলেন, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন-উদ্দেশ্য থাকে 'নাম করা'। অথবা বলতে কুণ্ঠা এলেও বলতে বাধ্য হতে হয়, 'মহৎ কর্মের' ধ্বজার আড়ালে কিছু ফায়দা লোটা! বর্তমানে সমগ্রভাবে যুবসমাজের মধ্যে কোন প্রাণের জোয়ার আসার চিহ্নমাত্র নেই।

এযুগ 'ধর্ম' নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। কুসংস্কারমুক্তির প্রেরণাও নেই। আজকের সমাজ শুভ আদর্শহীন। রাজনীতি যুবসমাজকে কোন মানসিক আশ্রয় দিতে পারছে না! আজকের দিনের 'পাইয়ে দেওয়া' রাজনীতি আর গদিরক্ষার চেষ্টার রাজনীতি, শুধু সমগ্র জাতটাকে লোভী আর নীতিজ্ঞানহীন করে তুলছে।

শুভ চেতনার আশ্রয় কোথায়? দেশের যুবশক্তি যেন বাসিমুড়ির মতো মিইয়ে যেতে বসেছে। তাই এই প্রজন্মের যুবশক্তির কাছে সমাজের কোন প্রত্যাশা নেই। এদের খানিকটা অংশের শক্তি বিনিয়োগ হচ্ছে কোন দলীয় নেতাদের কবলিত হয়ে অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করে চলায়, আর কিছুটা অংশ দেখছে একটা অশুভশক্তির দ্বারা চালিত হতে পারলে বেশ খানিকটা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, যথেচ্ছাচারের 'রাইট' জন্মে যায়। অতএব সেই 'অশুভকে' জীবনে গ্রহণ করে এরা সমাজে আতঙ্কসৃষ্টি করার পথ বেছে নিয়েছে। বললে ভুল হবে না—যুবশক্তির এমন নিদারুণ অপচয় ঘটে চলেছে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। অনেক সাধনা আর সংগ্রামের পর স্বাধীনতা যখন এসে গেল, নেতারা ভাবলেন, 'আর কি'। আর তো কোন কাজ রইল না! এখন শুধু 'গুছিয়ে বসা'। সেই গুছিয়ে বসার জন্যে দেশের যুবশক্তির

সমাজজীবনে সর্বসাধারণের মধ্যেও তখনো 'ধর্ম' শব্দটি ছিল ভয়ঙ্কর মূল্যবান (যেটি এযুগে আর নেই)। তাই ধর্মের নতুন করে মূল্যায়নের চেষ্টাও হয়েছিল জোরালোভাবে। এই দুই অধ্যায়েই বাঙালীর জীবনে 'যুবশক্তি' যেন একটি 'ধ্রুবজ্যোতি'র মতো স্মরণের অমৃতলোকে দীপ্যমান, যে 'জ্যোতি'র কেন্দ্রভূত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি দেশে দেশে কালে কালে চিরকালীন যুবশক্তির আদর্শস্বরূপ। কোন কালে কোন পরিপ্রেক্ষিতেই যুবসমাজের কাছে স্বামীজী নির্দেশিত আদর্শ অব্যবহার্য হয়ে যাবার নয়।

আর প্রয়োজন কি? (তখন প্রয়োজন পাকা মাথার)। অতএব—যেন 'যুদ্ধ তো মিটে গেছে সেনারা এবার শিবিরে গিয়ে গা গড়াও।'

অথচ সেই মহালগ্নেই 'এদের' দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি! এদেরই প্রকৃত পথে পরিচালিত করতে পারলে এরা দেশ গড়ে তুলতে পারত! জাতীয়জীবনে এনে দিতে পারত নতুন জোয়ার!

তা হলো না। এদের কেউ কাজে লাগাল না। এরা অনুভব করল না, 'এখন এদেশ আমাদের।' তাই দেশকে ভালবাসতেও শিখল না। একটি বৃহৎ অপচয়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন বানের জলে ভেসে বেড়িয়ে কোথায় হারিয়ে গেল! হারিয়ে গেল তাদের একটি অখণ্ড মানসিকতা!

তাই আজকের যুবসমাজের এই খণ্ড ছিন্ন-রূপ। তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ অংশটি হচ্ছে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। এদের ধ্যানজ্ঞান সাধনা সংগ্রাম কেবলমাত্র আপন 'কেরিয়ার' গড়ে তোলায়। এরা 'দেশ' 'জাতি' 'সমাজ'—কারো নয়। এমন কি আপন পরিবারেরও নয়। সাবালক হয়ে ওঠা মাত্রই এবং 'নিজের জন্যে নিজে!' এদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কৃতী হয়ে উঠতে পারলেই দেশত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি। যেখানে—রয়েছে অশেষ সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আর তথাকথিত গৌরব। তখন আর নিজের দেশটাকে বসবাসের যোগ্য বলে মনেই হয় না তাদের। অনায়াসে আপন দেশ সমাজ সব ছেড়ে, এককথায় শিকড় ছিঁড়ে, অন্যত্র রোপিত হতে যেতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

না, আজকের কৃতী যুবসমাজ তার 'শিকড়ের' সন্ধান নিয়ে মাথা ঘামায় না! এরা চকচকে বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে, কিন্তু এরা কারুর নয়। হয়তো কাগজে কলমে 'ভারতীয়' বলে পরিচয় দেবে কেউ, কেউ হয়তো তাও নয়। বিদেশে 'নাগরিকত্ব' গ্রহণ করে সে পরিচয়ও মুছে ফেলে ক্রমশঃ তার সন্তান-সন্ততিদের একটি 'জগাখিচুড়ি' জাতিতে পরিণত করবে।

'মানুষ' অবশ্যই কোন একটি জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসে থাকবার জীব নয়, চিরকালই সে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে—পৃথিবীকে জানতে চিনতে। যাযাবর শ্রেণীরা হয়তো যেখানে সুবিধে পেয়েছে সেখানে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু জ্ঞানে-কর্মে ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কোন সভ্যজাতি কি আপন পরিচয় হারাতে চেয়েছে কখনো? 'সভ্যতার' প্রথম পাঠই তো আপন 'নেশন' সম্পর্কে সচেতন থাকা। 'দেশকে' ভালবাসবার শিক্ষাই তো জীবনের পরম মূলধন।

কিন্তু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পর যখন দেশ স্বাধীন হলো অনেক মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে, তখন সেই দেশকে গুছিয়ে তুলে জগৎ সমক্ষে উচ্চাসনে তুলে ধরবার চেষ্টা হলো না। চেষ্টা যা হলো তা বহিরঙ্গের উন্নতির লক্ষ্যে। হলো কল-কারখানা, হলো যন্ত্রমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা, হলো বিরাট বিরাট ইমারৎ গড়ে-তুলে দেশ ছেয়ে ফেলার চেষ্টা। ক্রমশঃ মহাকাশ বিজয়ের চেষ্টাও হলো—যেন লাফ মেরে অন্য সব দেশ-এর সঙ্গে সমান হবার চেষ্টা এদিকে পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য অশিক্ষা নিরক্ষরতা সীমাহীন কুসংস্কার আর আলস্য কর্মবিমুখতা, এসব রয়েই গেল।

উন্নত দেশগুলি বেড়িয়ে এসে, নেতারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে 'কনটেসা', 'হেলিকপটারকে' অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শিখলেন, কিন্তু বৃহৎ জনগণ গরুরগাড়ির যুগেই রয়ে গেল। তাদের জন্যে—রোগে ব্যাধিতে ওষুধ ডাক্তারও অবশ্য প্রয়োজনীয়ের কোঠায় পৌঁছাল না। অথচ বহিরঙ্গের দাপটে তলিয়ে যেতে বসল ভারতবর্ষের চিরন্তন ধ্যানধারণা, আদর্শ, সত্য-বোধ, নীতিবোধ আর মানবিকতাবোধের ভাবধারা।

একথা বলা হচ্ছে না যে, আগে সবাই মহৎ ছিল, আদর্শবাদী ছিল তবে একথা স্বীকার্য যে, আজ দেশে অক্ষম অযোগ্যের সংখ্যাই বেশি। এখন না বলে পারা যাবে না, দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ নীতিবোধ আর আদর্শ সম্বন্ধে একটি সমীহ শ্রদ্ধা ছিল। আজ আর সে শ্রদ্ধা সমীহ দেখতে পাওয়া যায় না। নৈতিকতার মান এতো নেমে

যেতে বসেছে যে, আজ কেউ কাউকে যথার্থভাবে বিশ্বাস করতে পারে না কে যে কোন্ মুহূর্তে 'লোভের শিকার' হয়ে বসবে তার নিশ্চয়তা নেই। লোভ আর দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায়। শুধু ব্যক্তিগত জীবনকে পুষ্টকরে তোলার নির্লজ্জ প্রচেষ্টাই হলো আজ জীবনের সারসত্য। ন্যায় অন্যায় যে-কোন পথে ব্যক্তি-জীবনটিকে উঁচুতে তুলে ধরার ধাক্কায় ছুটছে জাতটা। তার মধ্যেকার 'চরিত্র' বলে যে একটা শক্ত কাঠামো থাকার দরকার ছিল তা আর কারো মনে থাকছে না। এখন সকলেই ধরে নিয়েছে, দেশে যদি উন্নয়নমূলক কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, সেই বাবদ বরাদ্দের সিংহভাগটি যাবে কর্মচারীদের পকেটে। কাজেই কাজ হবে সিকি পরিমাণে কিনা সন্দেহ। এ একেবারে অবধারিত সত্য।

যেসব 'সভ্য' দেশের দেখাদেখি আমরা রাজ্যে আকাশছোঁয়া বাড়ি, 'স্টেডিয়াম', 'পাতাল রেল' গড়ে তোলার জন্যে এই গরিব দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে জৌলুস বাড়াবার চেষ্টায় যত্নবান, সেইসব দেশ কি ভাবতে পারে শিশুর খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কারবার চালানো যায়! ভেজাল চালানো যায় জীবনদায়ী ওষুধে! নজির অজস্র—সকলেরই জানা। বলাটা অরণ্যে রোদন মাত্র!

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিই বোধহয় সবচেয়ে অভাগা। এখানেই যেন জাতটা ক্রমশঃ সর্বদিক থেকে পিছিয়ে চলেছে। বাঙালীর যে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরব ছিল, তাও যেতে বসেছে। 'বাঙালী' আজ আর মোটেই সর্বভারতের সমীহের পাত্র নয়, যেন অবজ্ঞার পাত্র। অথচ পরাধীন দেশে বাঙালীই ছিল অখণ্ড ভারতের সর্ববিধ চিন্তা-চেতনার পথিকৃৎ। 'বাঙালী আজ যা ভাবছে, সারা-ভারত পরদিন তা ভাবে.', এটাই ছিল চলতি কথা। একদা সারা ভারতে 'বাঙালী ডাকদরবাবু' এবং 'বাঙালী মাস্টারবাবু'র শ্রদ্ধা সম্মান ছিল দেবতা-তুল্য। সেকথা এখন কিংবদন্তী। সেই শ্রদ্ধার আসন আজ খুইয়ে বসেছে বাঙালী। বাঙালী আজ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া, পিছনের সারিতে বসা! বিশেষ করে 'ডাক্তার' আর 'মাস্টার' এই দুটি শ্রেণীই আজ সবচেয়ে সমালোচিত। এঁদের অধিকাংশই আজ আর্থিক লাভের-লোভের শিকার হয়ে পরমার্থিক লাভটুকুকে আর হিসেবের খাতায় রাখছেন না। অবশ্য একথাও বলছি, ব্যতিক্রম আছেই। তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয় বাঙালী ক্রমশঃই হৃদয়-সম্পদে দেউলে হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিই বোধহয় সবচেয়ে অভাগা। এখানেই যেন জাতটা ক্রমশঃ সর্বদিক থেকে পিছিয়ে চলেছে। বাঙালীর যে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরব ছিল, তাও যেতে বসেছে। অথচ পরাধীন দেশে বাঙালীই ছিল অখণ্ড ভারতের সর্ববিধ চিন্তা-চেতনার পথিকৃৎ।

সদ্য পাশকরা তরুণ ডাক্তারও আজ গ্রামে যেতে নারাজ। চিকিৎসা-বিদ্যাটি যে কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য নয়, এর জন্যে থাকে একটি দায়বদ্ধতা। সেবামূলক কাজ একটি ধর্ম, সে-শিক্ষা কোথায়? বাঙালী যে আজও জগৎ-সমক্ষে একটু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে শুধু তার অতীত গৌরবের সম্বল নিয়ে। তার বড়মুখ করে বলবার এইটুকু আছে, 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন! আমাদের বিবেকানন্দ আছেন, আমাদের জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী আছেন।' বিশ্বসভায় বাঙালীর এই একটি পরম পরিচয়। কিন্তু আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে, এই প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে মন হতাশায় ভরে যায় না কি? মনে হয় না কি, আমাদের যে এঁরা আছেন তা কি আজকের এরা অনুভব করে? করার মতো বোধ বুদ্ধি আছে?

স্বাধীনোত্তর দেশে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর-

কালে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে কোন নতুন চেতনা এনে দিতে পারিনি, দিতে পারিনি বৃহত্তর কোন 'মূল্যবোধ', দিতে পারিনি জাতীয়তার পাঠ। অথচ কুসংস্কার দূরীকরণের নামে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি চির-কালীন মূল্যবোধগুলি, বহু কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন থেকেও যা ছিল শিকড়ের মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে। সেই শিকড়ের রসই ভারতবর্ষকে বহু বৈদেশিক আঘাত, বহু পরশাসন আর বহু-দুর্দশার মধ্যেও টিঁকিয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু এখন যেন কুসংস্কারের জাল ছিঁড়তে সেই শিকড়েই কুঠার পড়ছে। অথচ সত্যিই কি এই প্রজন্মের মজ্জাগত কুসংস্কারসমূহ দূর হয়েছে? হলে তার নমুনা কোথায়?

আমরা তো দেখতে পাচ্ছি—দেশে ক্রমশঃই জ্যোতিষী, রত্ন-পাথর তন্ত্রমন্ত্র ভেলকি অলৌকি-কের ধ্বজাধারী বাবাদের ভক্ত-সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর এই ভিড়ে তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই বেশি, তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি, বেশি তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তদের সংখ্যাই।

কুসংস্কারের কমতি মাত্র নেই। নিজের চক্ষে দেখা, একটি বিদেশী ডিগ্রীধারিণী বিদুষী মহিলা তাঁর শিশু-সন্তানকে খাওয়ানোর সময় কারো সামনে খাওয়ান না 'নজর' লেগে যাবার ভয়ে। এতো একটিমাত্র নজির, উঠতে বসতে কুসংস্কা-রের বন্ধন মজ্জায় মজ্জায়। 'সন্তোষীমা'-র পুজোর দিন গরু খুঁজে বেড়িয়ে বিপর্যস্ত তরুণ যুবককে বলতে শোনা গেছে, 'শুক্রুরবার হলেই রাস্তার গরুগুলো যে কোথায় উড়ে যায়।' ... আর সেই বিশেষ দিনে হঠাৎ খাদ্যে 'টক'-এর স্পর্শ লেগে যাওয়ায় প্রায় হাহাকার করতে দেখা গেছে ওই দিব্যি আধুনিক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে! কে বলতে পারে ক্রমশঃ এই অতি আধুনিক ছেলেমেয়েদের মধ্যেই ক্রমশঃ আরো কত পুজোর প্রবণতা দেখা যাবে কিনা!

মানসিক ঔদার্য, মানবিক গুণাবলী, এসবের চিত্র কোথায় এদের মধ্যে? এই প্রজন্ম দেশের জন্যে সমাজের জন্যে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসতে পারেনি। কারণ স্বাধীন দেশের নেতারা তাদের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরতে পারেননি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে চরিত্রগঠনের জন্য কোন বিশেষ পাঠক্রম নেই। আছে শুধু পুঁথির বোঝা।

তাই অবিরত অপচয়ের হিসেবটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায়। আর এই প্রশ্নই মনে জাগে, দেশের মানুষের 'মান' যদি ক্রমশঃই নেমে যেতে থাকে (ওপরতলা থেকে নিচের তলা), তাহলে কোন্ উন্নয়ন চেষ্টা দেশকে জীবনীশক্তি জোগাতে পারবে? অবশ্যই কিছু শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ থাকেনই, এবং তাঁদের অবিরাম চেষ্টা থাকে সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করবার, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের চেতনা আনবার, কিন্তু সে চেষ্টা প্রায় প্রবল বন্যার মুখে বালির বাঁধের মতোই।

তবে হ্যাঁ, এই প্রজন্ম খুব নির্ভীক! 'পাপ-পুণ্যের ভয়'টা তো কবেই 'সেকেলে' বলে বাতিল হয়ে গেছে। আইনের ভয়টা ছিল, তা কি জানি কোন্ মন্ত্রে এখন সে ভয়টাও দূরীভূত। দোষ করলে শাস্তি পেতে হয়, অপরাধ করলে জেলে যেতে হয়, খুন করলে ফাঁসি হয়, এসবে আর বিশ্বাসী নয় কেউ। আর সবচেয়ে যে বড় ভয়টা মানুষকে বাগিয়ে রাখতো, সেই মস্তভয় 'লোক-নিন্দে'র ভয়টাও এখনকার এরা নস্যাৎ করে ফেলেছে। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। 'লোকভয়', 'রাজভয়', 'ধর্মভয়' কোন ভয়কেই আর এযুগ মনে রাখতে সক্ষম নয়। অতএব বলতেই হবে, সবাই বেশ নির্ভীক হয়ে গেছে।

কিন্তু এই নির্ভীকতাই কি কাম্য?

দেশের প্রতিটি মানুষেরই যে 'দেশ' সম্পর্কে একটি দায়বদ্ধতা থাকে, এ চেতনা কে এনে দেবে? একটা দেশকে বা জাতিকে রক্ষা করতে প্রধান শর্ত যে 'সর্বাত্মক সততা', এ বোধ কে এনে দেবে?

ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগ্যধারার নিয়ম অনুসারে সহসাই এমন একটি আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটবে কি, যে-আবির্ভাব আজকের এই শ্রদ্ধা-হীন সততাহীন নিষ্ঠাহীন যুগটাকে ডাক দিয়ে বলে উঠবে, "তোরা মানুষ হ" যে ডাকে দেশটা তার একটা যুগের অপচয়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে শক্ত ভূমিতে দাঁড়াতে পারবে?

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম

বিশ্বনাথ ভড়

স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ১৯ মার্চ তাঁর দুই ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যার উদ্যোগে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর সেই শিষ্যদ্বয় হলেন ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ও শ্রীমতী সি. ই. সেভিয়ার। স্বামীজী যখন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সুইজার-ল্যান্ডের আল্পস অঞ্চলে বেড়াচ্ছিলেন তখনই তাঁর মনে মায়াবতীর পরিকল্পনা জেগে ওঠে। তিনি ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে (তিনি তখন স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছেন এবং আল-মোড়ায় অবস্থান করছেন) লিখেছিলেন—তিনটি বিষয় মনে রেখে তিনি যেন স্থান নির্বাচন করেন। সেই তিনটি বিষয় হলোঃ (১) স্থানটির উচ্চতা হবে সমুদ্রতল থেকে ৬০০০—৭০০০ ফুটের মধ্যে। (২) স্থানটি হবে গভীর অরণ্য-পরিবেষ্টিত। (৩) হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত শৃঙ্গগুলির দৃশ্য যেন সেখান থেকে দেখা যায়।

এখন যেখানে মায়াবতী আশ্রম সেই জায়গাটির মালিক ছিলেন মিস্টার ম্যাগ্রেকার নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। তাঁর চা-বাগান ছিল। তিনি সমস্ত সম্পত্তিটি দশ হাজার টাকায় সেভিয়ার-দম্পতির কাছে বিক্রি করেন। স্বামীজী যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করতে বলেছিলেন, তাঁরা দেখলেন ঐস্থানটি তার উপযুক্ত। আশ্রমটি হিমালয়ের নির্জন বনভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। সেখান থেকে চির তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। স্থানমাহাত্ম্যই অনেক সময় মানবমনে আত্মসংযম ও গভীর অন্তর্মুখি-নতার ভাব স্বাভাবিকভাবেই জাগিয়ে তোলে। যে বনের মধ্যে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কোন গাছ কাটা হয় না। এখানে আছে দেবদারু, পাইন, ওক, রডোডেন্ড্রন ও আরো নানারকমের গাছ। সমুদ্রতলদেশ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৬৪০০ ফুট। উত্তর দিকে বিরাজ করছে হিমালয়ের তুষারাবৃত সুউচ্চ শৃঙ্গরাজি (যার বিস্তৃতি ২১০ মাইল এবং মায়াবতী থেকে সরাসরি হিসাব ধরলে দূরত্ব হবে ৭০ মাইল)। আশ্রম থেকে দর্শনীয় শৃঙ্গের মধ্যস্থলে আছে নন্দাদেবী যা ভারতে অবস্থিত হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। স্বামীজী আশ্রমটিকে ঠিক একটি তীর্থস্থান বা মন্দিরে পরিণত করতে চাননি। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে প্রধানতঃ এটি 'অদ্বৈত বেদান্ত' সম্পর্কে মনন ও অনুধ্যানের একটি বিশেষ কেন্দ্র। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম এই শাখাকেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সাহিত্যের ইংরেজী প্রকাশনার একটি প্রধান কেন্দ্র। 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত উচ্চমানের একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা মায়াবতী থেকে স্বামীজীর সময় থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আশ্রমের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে আছে মায়াবতী দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানে আছে রোগীদের জন্য পঁচিশটি শয্যা। ভারতের উত্তর সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনে এই হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। এখানে একটি অতিথিশালাও আছে, যেখানে অধ্যাত্মপিপাসুরা স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে অনুরাগীদের জন্যই এই অতিথিশালা। এটি সাধারণ পর্যটন-কেন্দ্র নয়।

দুটি পথ আছে মায়াবতীতে যাবার—একটি দিল্লী থেকে এবং অন্যটি লখনৌ থেকে।

আমার মায়াবতী দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল বছর কয়েক আগে—১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর। আমার এক বন্ধু-কন্যা, যিনি দিল্লীর এক মহিলা পলিটেকনিকে অধ্যাপনা করেন, আমাকে জানালেন যে, ১৯৮০-তে তিনি তাঁর কলেজের তিন সহকর্মীর সঙ্গে মায়াবতী ঘুরে এসেছেন। অপূর্ব জায়গা। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী আমি মঠাধ্যক্ষের কাছে চিঠি লিখে আমাদের যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা

করি। আমরা দলে ছিলাম সবশুদ্ধ নয়জন।

১৯৮৩-র ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় আমরা দিল্লী থেকে উত্তরপ্রদেশের আন্তঃ-প্রাদেশিক বাস-টারমিনাস থেকে সরকারি বাসে যাত্রা করলাম। আমাদের জনপ্রতি বাসভাড়া লাগল ৪৫ টাকা করে। পরদিন বেলা দশটার সময় বাস আমাদের টনকপুরে পৌঁছে দিল। দিল্লী থেকে টনকপুরের দূরত্ব ৩৮৯ কিলো-মিটার। টনকপুর থেকে লোহাঘাট (দূরত্ব ৮৫ কিলোমিটার) যেতে আমাদের উঠতে হলো পাহাড়ী রাস্তায় চলার উপযোগী ছোট একটি বাসে। প্রায় বেলা চারটের সময় আমরা লোহাঘাট গিয়ে পৌঁছালাম। রাস্তায় ধ্বস নামায় লোহাঘাট পৌঁছাতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। লোহাঘাট থেকে মায়াবতী বাস যায় না, পায়ে হেঁটে গেলে দূরত্ব ৬ কিলোমিটার, জীপ বা মিনিবাসে গেলে দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। সময়মতো লোহাঘাটে পৌঁছালে আশ্রমের ভক্ত ধন সিং-এর মিনিবাস আমাদের মায়াবতী পৌঁছে দেবে—মঠাধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেরিতে পৌঁছানোয় ধন সিং-এর মিনিবাসটি আমরা ধরতে পারিনি। কারণ সেটি তখন অন্য কাজে পাঠানো হয়ে গিয়েছে। যাইহোক, লোহাঘাটে ধন সিং-এর যে পাঠাগার আছে তার দোতলার একটি ঘরে আমাদের বিশ্রাম নিতে তিনি বললেন। হাতমুখ ধুয়ে, চা ও জল-খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল বলে প্রথম দেড় কিলোমিটার পথ বেশ খারাপ ছিল। বাকি রাস্তাটুকু ভালই। সন্ধ্যে সাতটার পর যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, আমরা তখন ঘন বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম ; সত্যিকথা বলতে কি, আমি মনে মনে আশঙ্কা করছিলাম যদি কোন জন্তু-জানোয়ার বেরোয়—তাহলে কি হবে! সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আমি হাতে রেখে-ছিলাম বড় একটি লাঠি। যাইহোক, দেখতে পেলাম আমাদের বিপরীত দিক থেকে দুটি বড় আলো এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আশ্রমের ম্যানেজার-মহারাজ এবং দুজন সহকারী আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। অতিথিভবনের* দুটি তলায় চারটি ঘর আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সেখানে বিছানা, কম্বল, গরমজলের ব্যবস্থাও রয়েছে। তাড়াতাড়ি করে হাতমুখ ধুয়ে আমরা আশ্রমের প্রধান বাড়িটিতে গেলাম রাতের আহারের জন্য। মঠাধ্যক্ষ মহারাজ, চারজন সাধু এবং আমরা সকলেই একসঙ্গে খেতে বসলাম।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি খুব উজ্জ্বল আবহাওয়া। অতিথিশালার দোতলা থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখরশ্রেণী দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাঁদিক থেকে কেদারনাথ (২২,৭৭০ ফুট), চৌখাম্বা (২৩,৪০০ ফুট); নীলকণ্ঠ (২১,৬০০ ফুট) ; নন্দাঘুন্টি (২১,৭০০ ফুট); ত্রিশূল (২৩,১০০ ফুট) ; নন্দাদেবী (২৬, ৬৪৫ ফুট), নন্দাকোটি (২২,৫১০ ফুট) এবং পঞ্চচুল্লী (২২,৬৫০ ফুট)।

আমরা সকলে প্রাতরাশের জন্য আশ্রমে গেলাম সকাল ৭-৪৫ মিনিটে। এরপর আমরা দেখলাম আশ্রমের প্রধান বাড়ি 'প্রবুদ্ধ-ভারত'-এর সম্পাদকীয় কার্যালয় ও তার সংলগ্ন পাঠকক্ষ, ডাকঘর এবং তার সঙ্গে ফুলবাগান ও ব্যাড-মিন্টন খেলার মাঠ। চারিদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেই আমাদের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত। পরিবেশের নির্জনতা উপভোগ করতাম এবং হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ-সমূহের মহানরূপ অবলোকন করতাম। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন দুপুর বারো-টায়। ইতিমধ্যে আমরা আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসা-লয়টি দেখে নিয়েছি। সেখানে স্থানীয় দরিদ্র লোকদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম যখন এই চিকিৎসালয়টি গড়ে ওঠে তখন এর আয়োজন ছিল খুবই সামান্য। সেই সামান্য প্রচেষ্টা থেকে আজ বড়

* এটি পুরনো অতিথিভবন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ নতুন একটি অতিথিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মহারাজ।

একটি হাসপাতালে এটি রূপান্তরিত হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন অনেক কিছু গড়ে ওঠে, এখানেও তেমনি স্বাভাবিক সেবার প্রয়োজনেই এটি গড়ে উঠেছে এবং ক্রমে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে। এটি এখন এই অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় হাসপাতাল। স্থানীয় লোকেরা বিপদে-আপদে এই হাসপাতালের সহায়তাকে ভগবান-প্রদত্ত সহায়তা বলেই মনে করে। দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা এখানে দেখাতে আসে—কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা ডুলিতে। আত্মীয়স্বজনের পিঠে চড়েও অনেকে আসে।

আশ্রমিকরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে 'কাজই হলো পূজা' স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত এই নীতিই তাঁরা জীবনে অনুসরণ করেন। আশ্রমের প্রধান বাড়িটি দোতলা। এক-তলায় আছে পাঠাগার, রান্নাঘর, খাবারঘর ইত্যাদি। দোতলায় সাধুদের আবাসস্থল। রাত্রে খাওয়ার পর আশ্রমে একটি পাঠের আসর বসে। সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে অতিথি ভক্তরাও তাতে যোগ দেন। যে কদিন ছিলাম প্রতিদিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা সেখানে সমবেত হতাম শাস্ত্র পাঠ শোনার জন্য। পরিবেশটি খুবই পবিত্র বলে মনে হতো। তাছাড়া এটি হলো সেই স্থান যেখানে স্বয়ং স্বামীজী অবস্থান করেছেন।

মায়াবতী আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে 'ধরমগড়' হলো সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, যেখান থেকে তুষার-ঢাকা শৃঙ্গগুলিকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায়। স্বামীজী একদিন ওখানে উঠেছিলেন এবং সেই দৃশ্য দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন যে, ওখানে তিনি একটি তপস্যাস্থল গড়ে তুলবেন ; সেই নিভৃত ও নির্জন স্থানে বসে যাতে সাধু ও ভক্তরা সহজে ধ্যানমগ্ন হতে পারেন।

কয়েকজন আশ্রমিকের একান্ত ইচ্ছানুসারে স্বামীজীর জীবিতকালেই একসময় এখানে একটি 'ঠাকুরঘর' গড়ে তোলা হয়। সেখানে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি। মায়াবতীতে থাকার সময় একদিন স্বামীজী দেখলেন ঐ ঘরে ফুল, ধূপ-ধুনা ও অন্যান্য উপচার সাজিয়ে রীতিমত পূজা হয়। স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল, এটি হবে একান্তভাবে অদ্বৈত সাধনার কেন্দ্র। তাই সেদিন সন্ধ্যেবেলা সবাই যখন অগ্নিকুণ্ডের (Fire-place) পাশে এসে সমবেত হয়েছে, তিনি সেখানে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরপূজা নিষিদ্ধ। অদ্বৈত আশ্রমে নিরাকার অদ্বৈত বেদান্ত সাধনা করতে হবে, ধ্যান ও সাধনার ওপরেই এখানে গুরুত্ব দিতে হবে, শাস্ত্রপাঠ করতে হবে। অদ্বৈতের স্থানে দ্বৈতভাব নিয়ে আসা সঙ্গত নয়। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই কথার পর সেদিন থেকে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সেই ঠাকুরঘরটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় থেকে আজও এখানে শুধুমাত্র অদ্বৈতের সাধনাই চলে আসছে। স্বামীজীর সেদিনের সেই সুস্পষ্ট নির্দেশের পরেও কিন্তু তার যথার্থতা সম্পর্কে কারও-কারও সন্দেহ ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন (স্বামী বিমলানন্দ—স্বামীজীর শিষ্য) পরে শ্রীমা সারদাদেবীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তার মতামত জানতে চাইলেন। শ্রীমা তাঁর উত্তরে স্বামীজীর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে জানিয়ে লিখলেন সেই অবিস্মরণীয় পত্র ঃ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

জয়রামবাটী

১৩০৯/১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু

পরমশুভাশীর্বাদবিশেষ—

বাবাজীবন, একখান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি।... আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।...

আশীর্বাদিকা

তোমাদের মাতা

'মায়াবতী' নামটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ 'মাঈ পঠ' (মায়ের পীঠ?—মায়ের স্থান) কথাটি থেকে। স্থানীয় লোকেরা জায়গা-টিকে একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান হিসেবে দেখত। এখনো আশ্রমের একটি জায়গায় তারা

আসে ফুল, ধূপ, ফল ইত্যাদি নিয়ে। স্থানটির নাম 'মায়াবতী' দেওয়া হয় এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর। অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ারের দ্বারাই আশ্রমের প্রাথমিক উন্নতির সূচনা। কিন্তু সমৃদ্ধির সূত্রপাত আশ্রমের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দের সময়ে। অবশ্য তাঁরও প্রধান সহায় ছিলেন মিসেস সেভিয়ার। ক্যাপটেন সেভিয়ারের মৃত্যু হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর। তাঁর ইচ্ছানুসারে নদীর তীরে সম্পূর্ণ হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। এই স্থানে কোন স্মারকচিহ্ন বা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়নি তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে। নদীতীরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানটি আমরা পরিদর্শন করেছি। এছাড়া মাদার সেভিয়ারের বাংলো, খামার বাড়ি ও বাগান দেখলাম। আশ্রমে নানাধরনের ফলের গাছ আছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এই বাংলো বাড়িটি অতিথিশালা রূপেও ব্যবহার করা হয়। আশ্রমের গোশালাটিও সুন্দর। সেখানে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী প্রচুর দুধ দেয়। সেই দুধ আশ্রমিক ও অতিথিদের জন্য ব্যয়িত হয়। অতিরিক্ত দুধ লোহাঘাট বাজারে বিক্রিও করা হয়। একটি বড় সবজিবাগানও আছে, সেখানে নানাবিধ ফল ও শাক-সবজি হয়।

আমরা দিনের অনেকটা সময় কাটাতাম প্রবুদ্ধভারত ভবনের পাঠকক্ষে। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাধরনের পত্র-পত্রিকা আসে। অবশ্য আশ্রমের গ্রন্থাগারও বেশ সমৃদ্ধ, সেখানে কয়েক হাজার বই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পার্ষদদের ছবি সেখানে টাঙানো আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মায়াবতীতে এসেছেন। আশ্রমের আদিপর্বে অনেক কষ্ট স্বীকার করে মায়াবতীতে গিয়েছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও। সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আনন্দমোহন বসু, সপরিবারে চিত্তরঞ্জন দাশ, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলিয়ট ক্লার্ক, মিস ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, সরলা দেবী চৌধুরানী এবং শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জগদীশচন্দ্র ওখানে একাধিক বার এসেছেন এবং যে রাস্তায় উনি হাঁটা-চলা করতেন, আজও তাকে বলা হয় 'বোসের রাস্তা'। এই স্থানটি আবার ভগিনী নিবেদিতারও খুব প্রিয় ছিল।

সরলা দেবী চৌধুরানী যখন এই আশ্রমে আসেন তখন প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী স্বরূপানন্দ জীবিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে তিনি আশ্রম সম্পর্কে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "আমি গিয়েছিলাম হিমালয়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে। সেখানে দেখলুম সেই 'অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল' ভারতবর্ষকে আমার, সেই শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী মাকে আমার। আহা! কি সুন্দরী! চোখের সামনে ঝকঝক করছে কেদার-বদরী-নারায়ণের শৃঙ্গ। এই তুষার প্রাচীরের ওপারে অন্যান্য বর্ষ, অন্যান্য সভ্যতা; এপারে চির সনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত-সভ্যতা, যা বেদমন্ত্রে মুখরিত হয়ে ভারতের গগন আচ্ছন্ন করেছিল। এই পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে আজ কি তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে না? ঐ উপত্যকা ক্রোড়স্থিত মেঘমুক্ত চিরঞ্জীব ঋষিদের হোমাগ্নি-ধূমে কি আজও ধূমায়িত নয়?...

"এখানে দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ, যাঁর সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়—'প্রবুদ্ধভারত' নামীয় অতি উচ্চাঙ্গের একখানা পত্রিকার সম্পাদন করছেন, ব্রহ্মচারীদের জন্য বেদান্ত ক্লাসে নিয়মিত অধ্যাপকতা করছেন। আবার তিনিই অন্য সময়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সৎকারে ত্রুটি না হয়—এ জন্য আশ্রমের ভাণ্ডার-গৃহ থেকে চাল, ডাল, আটা, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি বের করে রৌদ্রে শুকুতে দিচ্ছেন, নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝেড়ে আবার ভাণ্ডারে তুলছেন। কোন কর্মই তাঁদের পক্ষে অবহেয় নয়। ধীরে ধীরে আমার মনে অনুপ্রবেশ করল যে, এই হলো জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়; এঁদের এই গৃহস্থতুল্য কর্মের মধ্যে গৃহস্থের স্বার্থপরবশতা নেই, শুধু কর্তব্যের ও পরসেবার অনুপ্রেরণা রয়েছে।" (পৃঃ ১৮২-১৮৩)

বাতায়ন ইউরোপে ডিগ্রির সঙ্গে বয়সের অনুপাত

যখন কোন ব্রিটিশ কোম্পানি তরুণ গ্র্যাজুয়েটকে কর্মসংস্থানে নিযুক্ত করে তখন তার বয়স হতে হবে ২২ বছর। পশ্চিম জার্মানির কোম্পানী যখন তা করে তখন হতে হবে ৩০ বছর। ব্যাপারটি নির্ভর করছে কি বয়সে পড়াশুনা শুরু করা হয় তার ওপরে। ইউরোপের জায়গায় জায়গায় এটি আলাদা। কোন জায়গায় ডিগ্রি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর বয়স দেখা যায় ২০ বছর, কোথাও বা ২৫ বছর—অনেকেই বিবাহিত এবং পাশ করবে ৩০ বছর বয়সে। এদের সকলেই কিন্তু ইউরোপে অনেক সময় একই চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু ২২ বছরের যুবককে অপেক্ষাকৃত কম খরচে পাওয়া যায় বলে, দীর্ঘদিন ধরে পড়াশুনা করার ঝোঁক কমে আসছে।

ঈষৎ কুঞ্চিতচর্ম ছাত্র বেশি দেখা যায় উত্তর-ইউরোপে, যেখানে আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় ও মোটা সরকারি বৃত্তি পাওয়ায় ছাত্ররা বহুদিন ডিগ্রির জন্য লেগে থাকতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে চল্লিশ শতাংশের বেশি ছাত্র বয়সে পঁচিশোর্ধ্ব; ফিনল্যান্ডে এই সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ। ডেনমার্কে কলাবিভাগে ডিগ্রির পাঠক্রম বছরে ৮ থেকে ৯ বছরের; একজন ডাক্তারের প্র্যাকটিস করার জন্য পড়াশুনা ও শিক্ষানবিশী শেষ করতে বয়স হয়ে যায় প্রায় চল্লিশ। ফিনল্যান্ডের সরকার ছাত্রকে পড়াশুনার জন্য সাত বছর বৃত্তি দেয়। যদি সে এই কালের মধ্যে তার পাঠক্রম পরিবর্তন করে, তবে সে আবার সাত বছর বৃত্তি পায়। আরও দক্ষিণের দেশগুলি ছাত্রাবস্থাকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে চায় না। স্পেনে বেশিরভাগ ছাত্র বিশ বছরেই ছাত্রাবস্থা শেষ করে। ফ্রান্সে বৃত্তি দেওয়া হয় যৎসামান্য। এমনকি উত্তর-ব্রিটেনেও উচ্চশিক্ষার্থীদের বয়স ২৫ বছরের নিচে।

ইউনিভার্সিটিতে চার বছরের বেশি যারা কাটিয়েছে, তাদের সম্পর্কে ফরাসী নিয়োগকর্তারা খুব সতর্ক। পশ্চিম জার্মানীর নিয়োগকর্তারা সেরকম নয়। এদের মতে পঁচিশের কমবয়সীরা কম পূর্ণতা-প্রাপ্ত (mature); সেখানে বড় বড় কোম্পানীতে ইউনিভার্সিটি থেকে আসা নবনিযুক্তদের গড়পড়তা বয়স ২৮ বছর। সেখানে এদের এম. বি. এ. (M. B. A.) হবার সুযোগ নেই। নিয়োগকর্তাদের ধারণা অন্য দেশ থেকে এম. বি. এ. ডিগ্রিধারীরা 'উদ্ধতস্বভাব' হয়।

আগামী বছরের শেষ নাগাদ ই. ই. সি. (ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি) দেশগুলি, এদের মধ্যে যে-কোন দেশে ডিগ্রি নিলে, সে ডিগ্রিকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। যে-কোন দেশ হতে অ্যাকাউন্টেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার বা ওই ধরনের পাশকরা লোক এসে যে-কোন দেশে তার পেশা চালাতে পারবে। তাদের কাউকে কাউকে ভাষা-পরীক্ষা দিতে হবে বা যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা কি ঠিক সমান সমান লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে?

ছাত্রাবস্থার বয়স (১৯৮১-৮২ সাল)

	উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঁচিশ বা পঁচিশোর্ধ্ব বয়সের ছাত্রের শতকরা হিসাব	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঁচিশ বা পঁচিশোর্ধ্ব বয়সের ছাত্রের ঢুকিবার শতকরা হিসাব
ব্রিটেন—	১৯.৬	১৬.৭
ফ্রান্স—	৩২.৫	৯.২
পশ্চিম জার্মানি—	৪০.২	৮.৭
সুইডেন—	৬১.৮	৫৪.৬

ইটালিতে উকিল হতে গেলে পড়াশুনা ও শিক্ষানবিশী শেষ করতে ২৫ বছর বয়স হয়ে যায়; স্পেনে ১৭ বছরে আরম্ভ করে ২২ বছরে উকিল হতে পারে। তবে ডেনমার্ক, হল্যান্ড, পশ্চিম-জার্মানী প্রভৃতি দেশে বয়স সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। এই সব দেশে প্রথম ডিগ্রি পাবার বয়স কমানো হচ্ছে। এমনকি সুইডেনেও যেখানে ছাত্রদের বেশি বয়সে উচ্চশিক্ষা নিতে উৎসাহ দেওয়ার ফলে বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবাই পঁচিশোর্ধ্বে, সেখানেও এখন কমবয়সে পড়াশুনা শেষ করার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। গত বছর (১৯৮৮) এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে, সুইডেনে কলকারখানায় নিয়োগকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে, নবাগত গবেষণাবিজ্ঞানীরা অধিকবয়সী। সেখানে গবেষণারত ছাত্রদের গড়পড়তা বয়স ছিল ছত্রিশ বছর।

[The Economist 15-21 Oct. 1988, pp. 58-59]

নিবন্ধ

উনিশ শতকের কলকাতায় শরীরচর্চা

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্সিং-রিং-এ দারুণ উত্তেজনা। ছ-ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান তরুণ বাবু পি. এন. মিত্রকে খবরের কাগজে দেখে চ্যালেঞ্জ করেছেন পেটানো চেহারার এক ফিরিঙ্গি বক্সার। তিনটে ঘুষি মুখে বসাতে পারলে দশ টাকা নগদ। উইলসন সাহেবের 'গ্রেট ওয়ার্লড সার্কাস' কানায় কানায় ভরা। কলকাতার রক্তচাপ বাড়িয়ে লড়াইটা শেষ হয়ে যায় মাত্র দুমিনিটে। মিত্তির মশাইয়ের পাথরভাঙা ঘুষিতে জর্জরিত হয়ে ফিরিঙ্গি-পুঙ্গব আর উঠে দাঁড়াননি! বক্সিং-এ ভারতের নাম লিখে দিলেন এক বঙ্গসন্তান। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। 'ইংলিশম্যান' লড়াইয়ের রিপোর্ট তাতালো কলকাতাকে। 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে বিরাট চিঠি—"সাবাস্। বাঙালীদের নতুন যুগের সূচনা হলো ··· নিজেদের মর্যাদার যোগ্য, প্রয়োজনে গর্জে ওঠার যোগ্য হয়ে ওঠার, সাহসী শক্তিমান হওয়ার সাধনা।··· বক্সিং-এর মতো আত্মবিশ্বাস আর কোন খেলা এনে দিতে পারে? ···এই ঘটনা নিশ্চয়ই বহু বাঙালী তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে ··· " ইত্যাদি ইত্যাদি।

রিং-এ বাঙালী গর্জে ওঠার দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ। কলকাতা ময়দানে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কুস্তিগির স্যান্ডোর সঙ্গী এলমোর সঙ্গে লড়েছিলেন শ্যামাকান্ত। কুস্তিতে শ্যামাকান্তের চ্যালেঞ্জ ফিরিয়ে দিয়ে স্যান্ডো লড়তে পাঠিয়েছিলেন বাঘা বক্সার এলমোকে। দু-চারটে ঘুষি ছুঁয়েই শ্যামাকান্ত এলমোর এলেম বুঝে নেন, আর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে নিঙড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন রিং-এর বাইরে। পনেরো মিনিট পর জ্ঞান ফেরে এলমোর। "দিস ইজ রং...রং..., চেঁচিয়ে ওঠে উত্তেজনায় তেতে ওঠা সাহেব সুবোর দল। গ্রীক দেবতার মতো সুন্দর বাঙালী তরুণটি হেসে বললেনঃ "হি ক্যান স্টান্ড দ্য শক অব বিইং থ্রোন অ্যাওয়ে। বাট ফ্রম দ্য স্ট্যান্ড পয়েন্ট অব আ বক্সার, আই পারপাসলি অ্যাভয়ডেড দ্য ফ্যালাসি অব বিইং আ মারডারার।"

খুনে ঘুষিই বটে। বুনো বাঘ সহ্য করতে পারত না শ্যামাকান্তের ঘুষি। খালি হাতে খাঁচায় ঢুকে লড়তেন। না, স্যান্ডোর মতো দাঁত নখ ভাঙ্গা বাঘ নয়। পাটনার নবাব একবার জঙ্গল থেকে বিশাল এক বাঘিনী ধরে এত্তেলা পাঠালেন, কালকেই লড়তে হবে। ভয়ে বিস্ময়ে হাজার-খানেক ভারতবাসী দেখতে এল এক বীর্যবান ব্রাহ্মণ সন্তানকে গ্লাডিয়েটরের ভূমিকায়। আধঘণ্টা প্রাণপণ লড়ে ক্লান্ত পশুটা ধুঁকতে লাগল শ্যামাকান্তের হাঁটুর তলায়। বিরাট সম্বর্ধনা, দু হাজার টাকা, দুটো আরবী ঘোড়া আর বাঘিনী পুরস্কার। এমন কয়েকটা বাঘ এবং বেশকিছু জন্তু-জানোয়ার পেয়ে শ্যামাকান্ত খুলে ছিলেন 'গ্র্যান্ড শো অব ওয়াইলড অ্যানি-ম্যালস' ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে।—শ্যামাকান্তের সার্কাস।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে অধর ঘোষের আখড়ায় নাড়া বেঁধে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন এক জবরদস্ত কুস্তিগির। চকিতে প্রতি-দ্বন্দ্বীর পেছনে গিয়ে তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে কাঁধ গড়িয়ে আছড়ে ফেলতেন। চারমনি পালোয়ান পরেশনাথ ছিলেন শ্যামাকান্তের সঙ্গী। কলকাতার সিটি কলেজে পড়তেন পরেশনাথ। দুই বাঙালীবীর শিনা ফুলিয়ে বেড়িয়েছেন পূর্ব-পশ্চিম ভারতের আখড়ায়। চল্লিশ পেরোতে শ্যামাকান্তের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সোহহং স্বামী। সার্থক সন্ন্যাসী। বেশ কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ ও বেদান্ত সাহিত্য রচনা করেছেন উনিশ বছরে সন্ন্যাস-জীবনে শক্তি সাধনার আখড়ায় সংযম অভ্যাস করে পরমার্থ পথে এগিয়ে যাবার এমন দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে।

শ্যামাকান্তের শরীর-সাধনা বাংলার গর্বঃ কিন্তু খেলাধুলা, শরীরচর্চা সমাজে কতটুকু উৎসাহ পেতো উনিশ শতকের বাংলায়?

ডাঃ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরীর পালন'

বইটি ভারতীয় স্কুলের জন্য নির্বাচন করেন ইংরেজ সরকার ১৮৮০ খৃীস্টাব্দে। ডাক্তারবাবু লিখেছেনঃ "...ডন খেলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহাতে শিরোরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা ... মানসিক পরিশ্রম যাহাদিগকে কিছুমাত্র করিতে হয় না, এতাদৃশ ব্যায়াম তাহাদিগেরই কোন অনিষ্ট করে না ... অশ্বারোহণ সর্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম। কিন্তু উহা কেবল উন্নত অবস্থার লোকেরই ঘটিয়া উঠিতে পারে। ..." সুতরাং ডাক্তারবাবুর পরামর্শ, "... অশ্বারোহণ ব্যতীত আর যতপ্রকার ব্যায়াম আছে, তন্মধ্যে বেড়ানোই সর্বপ্রধান।" ...

ভাগ্যিস 'বেড়াবার' এই প্রেসকিপশনের পাশাপাশি ডাঃ হরিশ শর্মার 'ব্যায়াম শিক্ষা' বইটাও ছিল। "...লম্ফন, মুষ্টি নিক্ষেপ, প্যারেলাল বার, হরিজন্টাল বার, মাস্তুল বা শুপারি গাছে আরোহণ, ডন-বৈঠক..." করার সচিত্র বর্ণনা দিয়ে ডাঃ শর্মা লিখেছেনঃ "... সর্পসকল যেরূপ গরুড়ের নিকট গমন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার শরীর ব্যায়াম দ্বারা মর্দিত এবং পাদদ্বারা ঘৃষ্ট তাঁহাকে কোনপ্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।" বইটির প্রশংসা করে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' লিখেছিলঃ "...চারি আনা মূল্যের ব্যায়াম শিক্ষার প্রথম এই গ্রন্থটি ১২ খণ্ডের অতিরিক্ত লইলে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।..." বাঙালীর স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে বইটির প্রচারে বিশেষ যত্ন নিয়েছিল 'অমৃত বাজার পত্রিকা'ও।

এসব উনিশ শতকের সত্তর দশকের গোড়ার কথা। যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরীর পালনে'ই তখন 'দুধুভাতু' বঙ্গসন্তান বেড়ে উঠছে। শরীরচর্চার 'পীড়া' সহ্য করার শক্তি কোথায়! শরীরচর্চা তখন অশিক্ষিতের কর্ম, মস্তিষ্কচর্চার ভীষণ অন্তরায়! এসব সত্ত্বেও উত্তর কলকাতায় মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে 'অম্বু গুহর আখড়া' তখন অবশ্য জমে বসেছে। যশোরের 'রাজাবাবু' অম্বিকাচরণ গুহ (গোবর গুহর ঠাকুর্দা) মথুরা থেকে বীর হনুমানের মূর্তি পুজো করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছেন (১৮৫৭) কুস্তির আখড়ায়। 'অম্বু গুহ—ক্ষেতু গুহ' আখড়ার (মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের এ আখড়া পরবর্তী কালে 'দর্পণা' সিনেমার সামনে উঠে যায় এবং তারও পরে গোয়াবাগানে) মাটি মাখেননি, ভারতে তখন এমন পালোয়ান কমই ছিল। তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আখড়ায় আসতেন। অম্বুগুহর বড় ছেলে অন্নদাচরণ ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সিমলার যোগেন পালের আখড়াতেও জোর বাড়াতে যেতেন নরেন্দ্রনাথ। আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে হিন্দুমেলাখ্যাত নবগোপাল মিত্রের 'জাতীয় ব্যায়ামশালায়' যেতেন বিশেষ করে 'বারের খেলা' প্র্যাকটিস করতে। নরেন্দ্রনাথ নৌকাচালানো, তলোয়ার খেলা এবং বক্সিংও ভাল করতেন।

লাঠিরও বেশ প্রতাপ ছিল তখন। রাজসিংহ, দেবী চৌধুরানী শুধুই গল্প নয়। হাতের সামনে প্রিয় লাঠিগাছা না পেয়ে, নবদ্বীপের আর এক ব্রাহ্মণসন্তান আশানন্দ, একদল ডাকাতকে শায়েস্তা করেছিলেন, বিশ্বাস করুন, একটা ঢেঁকি দিয়ে! অভিধানে আজও তিনি 'আশানন্দ ঢেঁকি'। দুর্দান্ত লেঠেল ছিলেন, আশানন্দ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাঙলার ডাকাতে' লিখেছেন।

"... হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে..." দুঃখ করে লিখেছিলেন ঋষি বঙ্কিমঃ "...তুমি কত তরবারি ভাঙিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায় বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাংলার আব্রু, পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। ডাকাত তোমার জ্বালায় ত্রস্ত ছিল। নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল তুমি তখনকার, পিনালকোড ছিলে। ..."

শিক্ষিত হাতে প্রাণ পেয়ে সহজ সরল বাঁশের লাঠির ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা, অনুপ্রাণিত করত সাহসী ছেলেদের। জোড়াবাগান পার্কের 'পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি' আজ শুধুই কুস্তির আখড়া। পঞ্চানন ঠাকুরের নামে এই সঙ্ঘ (১৮৮১) লাঠিখেলারও অন্যতম কেন্দ্র ছিল সেকালে। ছিপছিপে শরীরের শয়ে শয়ে লেঠেল তেল মাখানো লাঠি নিয়ে শক্তিসাধনা করত। বন্দুকের গুলি

আটকানো গল্পকথা কিনা জানি না, তবে দু হাতের লাঠির চক্রব্যূহ ভেদ করে ইট পাটকেল ছুঁতে পারত না অনেক লেঠেলকেই।

লাঠি খেলা অবশ্যই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য একটি ইউনিফর্ম একসারসাইজ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় লিখলেনঃ "... It necessitates the cultivation of the quickness of the eye and quickness of the movement of every limb. ... It should be unwise if we allow it to die away from our midst." কিন্তু লাঠিকে ধরে রাখা যায়নি।

সরলা দেবী চৌধুরানী উনিশ শতকের শেষ দিকে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন কলকাতার স্বাস্থ্য ফেরাতে। 'ভারতী' পত্রিকার সুবাদে কলকাতার তরুণদের কাছে পৌছে, লাঠি খেলা, তলোয়ার-যুদ্ধ, বক্সিংয়ের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিয়ে, ফুটবল মাঠে শিনা ফুলিয়ে খেলবার সাহস যুগিয়ে, সংবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন কবিগুরুর এই দামাল ভাগিনেয়ী। অবাক চোখে তাকিয়েছিল সারা ভারত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল সঞ্জীবনী, বঙ্গবাণী, ইয়ং ইন্ডিয়া। দ্য বেঙ্গলী লিখেছিলঃ "... সরলাদেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'সারপ্রাইজ স্প্রিং' করছেন—আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—অতঃকিম্ ? ..."

সেকালের শরীরচর্চার আর এক বিস্ময় কলকাতার (তালতলার) জিতেন ব্যানার্জী, লেখা-পড়ার সাথে সাথে শুধু শরীরটাকে ধরে রাখার জন্যই যাঁর ব্যায়াম-চর্চা। মুগুরভাজা, ডনবৈঠক, কুস্তি, লাঠি, বক্সিং টমিদের (গোরাসৈন্য) যম। পোশাকী নাম ক্যাপ্টেন জে. এন. ব্যানার্জী। সুরেন্দ্রনাথের ছোটভাই। দুঁদে ব্যারিস্টার। 'ব্যায়ামের রাজা' উপাধিতে সংবর্দ্ধিত করেছিল বাংলা তাঁকে। সারা জীবনের সঞ্চয়, প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, শরীরচর্চার কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন অকৃতদার জিতেন্দ্র-নাথ। সে টাকায় গ'ড়ে ওঠে 'অল বেঙ্গল ফিজি-ক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন', বাংলার তরুণদের জন্য প্রথম আধুনিক জিমন্যাসিয়াম। মহম্মদ আলি পার্কের গায়ে জিমন্যাসিয়ামটি আজও সজীব। শ-চারেক ছাত্র-যুবক লোহা নিংড়ে রস বের করার আনন্দে সেখানে আজও মশগুল।

মাদ্রাজের ব্যায়ামবীর রামমূর্তি হাতি বুকে তুলে বাহবা নিতেন তখন। বাঙালী তরুণদের সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞার জবাব দিতে উঠে দাঁড়ালেন দুই বীর রাজেন্দ্র নারায়ণ আর মহেন্দ্রনাথ। হাতি, ১৬২ মন রোলার, চলন্ত মোটর গাড়ি বুকে তুলতেন—লোহার শেকল ছিঁড়ে দুহাতে গাড়ি থামিয়ে শিহরণ জাগালেন। 'সার্কাসম্যান' মহেন্দ্র মজুমদারের দুটি দুর্দান্ত আবিষ্কার—শব্দভেদীবাণ এবং মোটর জাম্প। প্রথমটিতে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠত আর দ্বিতীয়টিতে তা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সার্কাস এরিনা থেকে বাংলার কোনায় কোনায়। শুধু ছাত্র-তরুণেরাই নয়, অভিভাবকেরাও দুলে উঠত সে উত্তেজনার দোলায়। এই উত্তেজনার ফসল—অলরাউন্ডার বলাই চ্যাটার্জী, বক্সার জি. কে. শীল, সন্তোষ দে, ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ, বিনয় মল্লিক, বসন্ত ব্যানার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেন দাস, নীরদ সরকার প্রমুখ। শরীর-সম্পদকে এত সৌন্দর্য করে তুলবার এই আগ্রহের কৃতিত্ব অনেকটাই রাজেন গুহঠাকুরতার। সিটি কলেজ ও হার্ডিঞ্জ হস্টেল জিমন্যাসিয়াম ছিল তাঁর 'মানুষ' গড়ার আখড়া। বিশ শতকের শুরু থেকেই এই প্রবাহ বয়ে গেছে দিকে দিকে। সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে লিখেছেনঃ "বহুবিধ আখড়া ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া, নানাবিধ খেলাধূলার প্রতিযোগিতা করিয়া বাঙালী জাতি বর্তমানে ভীরুতা ও দুর্বলতার কলঙ্ক অনেকখানি স্খালন করিয়াছে। ... সাহেব, বিশেষ করিয়া গোরা সৈন্যদের সম্বন্ধে যে লজ্জাকর আতঙ্ক জনসাধারণের ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে এই শক্তিচর্চারই ফলে। ... মানুষের দেহকে পেশীপ্রদর্শনীতে পরিণত করিয়া দর্শকদের তাক লাগাইবার প্রবৃত্তিকে আমি প্রশংসা করি না। মানুষ মানসিক ও দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আত্ম ও শরণাগত রক্ষায় পটু হইয়া উঠিলেই দেহচর্চা যথার্থ সাফল্য লাভ করে।..."

রামকৃষ্ণদাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বলেছিলেন ঃ "গীতায় ভগবান যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন সে পুজো, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম—অন্য কর্ম নয়।" তা আমরা যাঁরা সংসারী মানুষ, তাঁদের তো অন্য কর্ম করতেই হয়। ফাঁক-ফোকরে না হয় একটু জপ-ধ্যান হলো। সেও অবশ্য ছটফটে, চলচঞ্চল মন নিয়ে। তখন নিজের মধ্যেই একটা অপরাধবোধ জাগে—কেন মনকে বসাতে পারছি না! দুধ ওথলানোর মতো, অবচেতন থেকে বাসনা-কামনাসমূহ ফুলে-ফুলে উঠছে। বসে আছি ঠিকই, স্থির হয়ে, চোখ বুজে। সবাই মনে করছে খুব ধ্যানে বসেছে, পরম ভক্ত। ভেতরে কিন্তু লড়াই চলেছে স্থির আর অস্থিরে। যে বসেছে সে বুঝতে পারছে সংগ্রামটা কোথায়।

আবার স্বামীজী বলছেন ঃ আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। না হলে হবে না। যত লোক আসক্তির বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শিব সংসারী—কিন্তু সংসারকে তিনি দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত। ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন।

শুনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। আসক্তি নিয়েই তো সংসার। আর সত্যিই তো সংসারী মানুষ উঠতে বসতে স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে ব্যস্ত। মন যুগিয়ে চলার কি ঘটা! স্ত্রীকে নরম গলায় যখন স্বামী বলে, 'তুমি যা বলো সেইরকমই হবে।' কিংবা কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে—'ওকে জিজ্ঞেস করো। ওর মত না হলে কিছুই হবার নয়।' আবার যে স্ত্রীর বশ নয়, সে হয়তো স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম না দিয়ে জলস্পর্শ করে না! তার মানে এই নয় সে মহাধার্মিক। সে হলো নর-পশু। তাহলে সংসারী জীব এখন করে কি? হাজার হাজার জীবন ভেস্তে যাবে। কবে আমি ভাল সংস্কার নিয়ে আসব, এসেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হব, তবেই আমি অধিকারী হব তাঁর পথে এগোবার। তাও পথের শেষ দেখতে পাব কিনা জানি না।

কারণ স্বামীজী বলেছেন, "আরেক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে! এই নানা কাজ চিন্তা পর্যন্ত তিনি করাচ্ছেন। ঠাকুর বলতেন, 'যতক্ষণ আমি ধ্যান করছি এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশক্তির এলাকা। শক্তি মানতেই হবে।" সোঽহং বললে যে-আমি বোঝায়, সে-আমি, এ-আমি নয়। মন দেহ, এসব বাদ দিলে যা থাকে সেই আমি।"

এই উক্তির পর আমার অবস্থা আরও অসহায় হলো। মন দেহ বাদ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। সেই আদ্যাশক্তির সমস্ত ইচ্ছা ফলবতী হচ্ছে আমার জীবনে। ঠাকুরের উপমায় আমি এক বেড়ালছানা। তিনি ঘাড় কামড়ে যখন আমাকে আঁস্তাকুড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছেন, তখন আমি সেখানে, যখন নরম বিছানায় তুলছেন তখন আমি আরামে। তাহলে, আমার ইচ্ছার জোর কতটুকু!

স্বামীজীকে আমার অসহায় প্রশ্ন ঃ "তাহলে আমার কি হবে!"

আমি জানি কি বলবেন স্বামীজী। প্রথমেই বলবেন—কৃপা। তাঁর কৃপা। ঠাকুর চলে গেছেন। বরানগরের মঠে স্বামীজী, সঙ্গে ঠাকুরের সন্তানগণ। জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন ঃ "আচ্ছা মশায় সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে?" স্বামীজী বললেন ঃ "তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।" পরে আর একদিন তাঁর ভাইদের বলছেন ঃ "পড়ে থাক, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক।" বলেই আবিষ্ট হয়ে গান ধরলেন—"প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা। তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥ দো রোটি এক লেঙ্গটি তেরে পাস ম্যায় পায়া।"

স্বামীজী শ্রীমকে একটি পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ঃ "অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মানি, দুঃখকষ্ট না পেলে Resignation হয় না—Absolute dependence on God." দুঃখ আর কষ্ট মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে দেয়। দুঃখ আর কষ্ট হলো তাঁর আশীর্বাদ। সংসার পাটাতনে আমরা এক-একটি জংধরা স্ক্রু। সেই স্ক্রু খুলতে হলে, প্রথমে এদিকে, ওদিকে হাতুড়ি মারতে হয়। মেরে মেরে জং ঝরিয়ে, তারপর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ঘোরালে তবেই খুলবে। দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান-বঞ্চনা হলো সেই হাতুড়ির ঘা। আর গুরু হলেন সেই স্ক্রু-ড্রাইভার। ঠাকুর বলতেন, ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে ঈশ্বর দেখা

দেবেন। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

তবু স্বামীজীর মতো কৃপাধন্য একদিন মহা আক্ষেপে মাস্টারমশাইকে বলছেন: "ভগবান নেই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাইনি। কত দেখলুম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছে না।" এই 'হা ঈশ্বর', 'হা ঈশ্বর' অবস্থাই সাধকের প্রকৃত অবস্থা। শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল। ঠাকুরের হয়েছিল। স্বামীজী ও তাঁর সন্ন্যাসী ভায়েদের হয়েছিল। রাখাল মহারাজ বলছেন: "এখানে থেকে তো কিছু হলো না। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবানদর্শন, কৈ হলো! চল নর্মদায় বেরিয়ে-পড়ি।" স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন: "বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞানে কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস!" একজন ভক্ত বলছেন: "তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?" স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে বলছেন, "রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব!"···

স্বামীজীর কাছে উত্তর পেয়ে গেছি—সেই মর্ত-মহেশ্বরের কাছে। একটু তেজ চাই। একটা গোঁ। "যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে, একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out.—বল আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে, সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। খবরদার No 'নেই নেই'; বল, 'হাঁ হাঁ', 'সোঽহং সোঽহম্।'

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥···

ভয় কি? কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।" (আমরা তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করব আমাদের কি জান না! আমরা রামকৃষ্ণদাস।)

১৯৮৮-৮৯ সালের রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯ বিকাল ৩-৩০ মিনিটে **বেলুড় মঠে** অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্যদের কাছে ১৯৮৮-৮৯ সালের পরিচালন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপিত করা হয়।

জয়পুরে (রাজস্থান) একটি শাখাকেন্দ্রের সূচনা এবং বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয় অফিসে ও কতিপয় শাখাকেন্দ্রে কম্পিউটার স্থাপন আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য বিষয়। **রাঁচী মোরাবাদি (বিহার) কেন্দ্র** উপজাতি মানুষদের জন্য ব্যাপকভাবে একটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সেচব্যবস্থা, কম খরচে গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য কর্মসূচী এই প্রকল্পের অন্তর্গত।

ত্রাণসেবা: এই সময়ে মঠ-মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবার কাজে ব্যয় করেছে ৫৫.৮১ লক্ষ টাকা। সেবা-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রাপ্ত প্রায় ২১.০৫ লক্ষ টাকার মূল্যের বিভিন্ন সামগ্রীও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে।

চিকিৎসা সেবা: ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র সহ মিশন তার ৮টি হাসপাতাল ও ৭৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। প্রায় ৪১ লক্ষ রোগী সেবিত হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫.৫৪ কোটি টাকা।

শিক্ষা সেবাকাজ: প্রতিবারের ন্যায় এবারও মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পর্ষদ/বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৪৯১ এবং ১.৪৯.৫৬৭ জন। এই বিভাগে খরচ হয়েছে ১৭.৬৬ কোটি টাকা।

গ্রাম ও পার্বত্যজাতি উন্নয়নমূলক সেবাকাজ: দেশের বিভিন্ন স্থানে মিশন ব্যাপকভাবে গ্রামে ও পার্বত্য এলাকায় কাজ করেছে। এই কাজে অর্থের পরিমাণ প্রায় ১.৭৮ কোটি টাকা।

বহির্ভারতে সেবাকাজ: বিদেশে অবস্থিত আমাদের কেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রচারে রত। ওখানেও বেশ কিছু শিক্ষালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে।

বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত ভারত ও ভারতেতর মিশন ও মঠের শাখা-কেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭ এবং ৭৩।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯

স্বামী গহনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬-এর পর]

॥ ৩ ॥

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ও পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দজী, শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। সহজে ভাবের আবেগে চালিত হওয়া তাঁদের ধাতে ছিল না বলে মনে হয়েছিল। তবে মহারাজের ভাবের আবেগ যে কখনো দেখা যেত না তা নয়। যদিও তিনি ভাব চেপে রাখতেন, তবুও মাঝে মাঝে তা বেরিয়ে পড়ত।

রাজা মহারাজজীর সাধারণতঃ তিনটি ভাব দেখা যেত। কখনো ছেলেমানুষের মতো চোখে দুষ্টু হাসি। সাধারণভাবে থাকলে মজলিস জমিয়ে রাখতেন। যখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠতেন, মুখের দিকে তাকায় কার সাধ্য? চোখ লাল টক টক করছে।

শরৎ মহারাজ চট করে রাজা মহারাজের ঘরে ঢুকতেন না। হয়তো সেবক ভবানী মহারাজকে (স্বামী বরদানন্দকে) বলতেন : "যা তো দেখে আয়, মহারাজ কি করছেন?" যাওয়া-আসা করতে করতে আমরাও খানিকটা তাঁর দেখাদেখি শিখে গিয়েছিলাম। যদি বুঝতাম মহারাজের ঘরে ঢোকা যায়, ঢুকে পড়তাম। হয়তো দেখলাম শুয়ে আছেন, মুড বুঝে হাত-পা টিপে দিতুম। বলতেন : "কিরে, এতদিন আসিসনি কেন? রাগ করেছিস নাকি?" কখনো বলতেন : "আরে, মঠ তো তোদেরই।" তাঁর মুখে দু-একবার বলতে শুনেছি : "যাকে ভালবাসলাম, সে যদি তা জানতে পারল তাহলে তা আর ভালবাসা হলো কই?" এই হেঁয়ালিপূর্ণ অতি গভীর কথার কিঞ্চিন্মাত্রও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁর কি অপার করুণা ও সহানুভূতিই না ছিল। সেই সহানুভূতি দিয়েই তিনি মঠ-মিশন পরিচালনা করতেন। একবার কাশী সেবাশ্রমে কর্মীর অভাব হলে মহারাজ তাঁর এক দীক্ষিত সন্তানকে (স্বামী মঙ্গলানন্দকে) বলেন : "দেখ বাবা, কাশী সেবাশ্রমে কর্মীর বড় অভাব হয়েছে। তুই কি সেখানে যাবি? গেলে বড় ভাল হয়।"

একজন সন্ন্যাসী পাঞ্জাব অঞ্চলে কিছুকাল কাটিয়ে ভুবনেশ্বর মঠে এসে রয়েছেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সম্ভবতঃ রামলাল-দাও ভুবনেশ্বর মঠে রয়েছেন। তখন ভুবনেশ্বর মঠের ঠাকুরঘর নিচে। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ মাঝের হলঘরটিতে সাধু-ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন। ঐ সাধুটিকে অতি স্নেহ ও করুণামাখা স্বরে আধঘণ্টা ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যেন আর কোথাও না গিয়ে ভুবনেশ্বর মঠেই তিনি থাকেন। শুধু হাতে-পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছেন—সে রাজি নয়। তখন বলছেন : "আচ্ছা, তুমি কি চাচ্ছ? তুমি চাচ্ছ নিরিবিলিতে থেকে সাধন-ভজন করবে আর ভগবানের নাম করবে। তা বেশ তো, আমি তোমার জন্য এখানে আলাদা কুঠিয়া করে দিচ্ছি। খাবার-দাবার সব সেখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তুমি এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেও না।"

উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় মহারাজজীর এই কাতর আবেদনে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। আধঘণ্টা ঐভাবে বলার পরেও যখন সাধুটি বললেন তিনি আবার বেরুবেন তখন মহারাজ বললেন : "দেখ, বাবা, মানুষে কি করবে বল। ইচ্ছা করলেই মানুষ কি সব করতে পারে, না সৎপথে চলতে পারে? কত সব evil propensities (অশুভ সংস্কার) রয়েছে।" কথাগুলি বলে তিনি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

মহাপুরুষ মহারাজজী সব শুনে ঐ সাধুটিকে লক্ষ্য করে শুধু বললেন : "বেশ, মহারাজের কথা তো আর শুনলে না। এর ফল শিগ্‌গিরই বুঝতে পারবে।" ভুবনেশ্বর মঠ ছেড়ে যাবার অল্প কিছুকাল পরেই গর্হিত কোন কাজ করার ফলে সাধুটি নৈতিক জীবনে পতিত ও সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হন।

একবার গর্হিত কোন কাজের জন্য জনৈক সাধুকে কর্তৃপক্ষ বেলুড় মঠ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। যখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সেই সভায় সভাপতি হিসাবে তিনি উপস্থিতও ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি চুপ করে ছিলেন। পরের দিন সকালেই বলরাম মন্দির (সেখানেই তিনি তখন ছিলেন) থেকে একখানা কাপড় ও গামছা বগলে নিয়ে তিনি হাজির হলেন মায়ের বাড়ী (উদ্বোধন কার্যালয়ে) সারদানন্দজীর কাছে। মহারাজকে সকালে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে সারদানন্দজী তো অবাক! "এ কি? এত সকালে যে! কি ব্যাপার?"—শরৎ মহারাজ বললেন। মহারাজ বললেনঃ "দেখ ভাই, কালকে তো তোমরা resolution পাশ করে ঐ ছোঁড়াটাকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করলে। আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কিন্তু মঠ-মিশনের সভাপতি থেকে তাদের আইন লংঘন তো আমি করতে পারি না। তাই মনে করছি ঐ সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে তিন-চার টাকা দিয়ে গঙ্গার ধারে একখানা ছোট ঘর ভাড়া করে ওকে নিয়ে থাকব। তাই চলে এসেছি।"

বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত! ঐ কথা শুনে সারদানন্দজী একেবারে হতভম্ব। তখন তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেনঃ "এ কি বলছ মহারাজজী! ঠিক আছে, ও বিষয়ে কি করা যায় তা আমি দেখছি। তুমি শান্ত হও।" এইসব বলে তাঁকে শান্ত করলেন শরৎ মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান সেই সাধুটি এই দুই মহাপুরুষের অশেষ কৃপায় মহারাজের শরীর ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মহারাজ তখন স্থূলদেহে নেই। বিশেষ কোন অন্যায় কাজের জন্য কোন সাধুকে মঠ থেকে সরিয়ে দেবার কথা ট্রাস্টী বোর্ডের সভায় ওঠে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁর অনুমতি চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেনঃ "দেখ, মহারাজ তো আমাকে ছেলেদের দেখবার কথা বলে গেছেন, কাকেও তিনি তাড়িয়ে দেবার কথা তো বলে যাননি।" মহাপুরুষ মহারাজজীর অশেষ কৃপায় সেই সাধুটিকে আর যেতে হয়নি।

মহারাজ যেবার আঁটপুরে গিয়েছিলেন, সেবার শিবচতুর্দশীর দিনটিতে তিনি সেখানে ছিলেন। রামলাল-দাদাও সঙ্গে আছেন। শিবচতুর্দশীর সকালে রামলাল-দাদার সঙ্গে দেখা হতেই 'সুপ্রভাত দাদা' বলে তাঁকে অভিবাদন করে ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে বললেনঃ "দাদা, আজ তো শিবরাত্রি। তাহলে আজ তো উপবাস।"

রামলাল-দাদা—"হ্যাঁ, তাই তো।"

মহারাজ—"আচ্ছা দাদা, হবিষ্যান্ন তো উপবাসের সামিল?"

রামলাল-দাদা—"তা বলতে পার।"

মহারাজ—"তাহলে দাদা, আজ আমরা হবিষ্যান্ন করেই শিবরাত্রি-ব্রত পালন করব।"

দাদাও তাতে রাজি, তখন মহারাজজী শান্তিরাম-বাবুকে (বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদরকে) ডেকে বললেনঃ "দেখ শান্তিরাম, আজ তো শিবরাত্রি। আমরা দুজন হবিষ্যান্ন করে শিবরাত্রি-ব্রত পালন করব, তুমি তার ব্যবস্থা কর।" শান্তিরামবাবুও হবিষ্যান্নের ব্যবস্থাদি সব উপবাসের সামিলই করলেন! এমন বেশি কিছু নয়, ভাতের সঙ্গে পনের-বিশ রকম সেদ্ধ, ঘি-সহযোগে সেব্য! এ যেন সেই ব্যাসের উপবাস!

গ্রীষ্মের এক বিকেলে বলরাম মন্দিরে গেছি। মহারাজকে তাঁর ঘরে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, তিনি ছাদে আছেন। আমিও নিঃসঙ্কোচে ছাদে গিয়ে হাজির। দেখি মহারাজ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, সঙ্গে আছেন ভবানী মহারাজ, ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) প্রমুখ কয়েকজন। আমি গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় বললেনঃ "তুই ঘুড়ি ওড়াতে পারিস?"

আমি উত্তরে বললামঃ "হ্যাঁ, কিছু কিছু।"

তিনি প্রশ্ন করলেনঃ প্যাঁচ খেলতে পারিস?',

আমি—"হ্যাঁ, একটু একটু।"

তখন তিনি সেই উড়ন্ত ঘুড়ির সুতোটা আমার হাতে দিলেন। অন্য আর একখানা ঘুড়ি তখন প্যাঁচ খেলতে এসেছে। সেই ঘুড়ির সঙ্গে আমি প্যাঁচ খেললাম। প্যাঁচে আমি কাটলাম না সে কাটল তা এখন মনে নেই। [ক্রমশঃ]

সহাস্য বিবেকানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিবেকানন্দের রসিকতা ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে কঠোর কিংবা গভীরতায় অতলস্পর্শ। এখানে বিবেকানন্দ কখনো সদানন্দ শিশু, কখনো কৌতুকপরায়ণ দুষ্ট বালক, কখনো বা মজাদার হুল্লোড়ের মুগ্ধ কিশোর। তাঁর চিরকালের বালকস্বভাব তাঁকে কোনদিন ত্যাগ করেনি বলেই তিনি জীবনের ভয়াবহ দিনগুলির মধ্যেও মরূদ্যানের আশ্রয় পেয়েছেন। পৃথিবীর যন্ত্রণা বহন করতে হতো এই প্রমিথিউসকে—শিষ্য-ভক্ত-বন্ধুরা অগ্নিবহনের জ্বালা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন—তিনিও সানন্দে সাময়িক-ভাবে বিস্মৃতির মায়াফলটি খেতেন—আর সেই সময়ে তাঁকে দেখে 'শিশু-ঈশ্বরের' অপরূপ ছবিখানি সকলের সামনে খুলে যেত। সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে 'পাঞ্চ' পত্রিকা পড়ে তিনি হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন—তাঁর সঙ্গীরা তাঁরই মতো হেসেছেন—কিন্তু তাঁরা একই সময়ে সচেতন থেকেছেন—হাসির বাতাসে দুলছে এই যে শিখা, তা হয়তো এখনই নিবাত নিষ্কম্প হয়ে যাবে—সে বড় ভয়ঙ্কর নির্জনতা—সকলের সমক্ষে অপরিচিত কোন এক আত্মনির্বাসন।

সেকথা থাক। এখন শুধু গাল-গল্প, শুধু স্ফূর্তি, মজাদারি।

মীরাটের ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বড় মেয়ে পরি-ব্রাজক বিবেকানন্দের এক টুকরো মনোহর ছবি উপহার দিয়েছেন ঃ

"বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়, তাই তিনি বাবার সামনে তামাক খেতেন না—বাগানের দিকে এক ধারের ঘরে তক্তপোষের উপর বসে খুব খেতেন। হাসতে হাসতে বলতেন, 'বাবাকে যেন বলিসনি।' আমাদের দুবোনকে 'নিকষা-মাসী', 'শূর্পনখা-মাসী' বলে খ্যাপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন, 'তোরা চটিস কেন? ওঁরা দুজন কি কম? স্বয়ং রামচন্দ্র একজনের নাক কেটেছেন, আর বিভীষণ অন্যজনের ছেলে।' চাটনি পরিবেশনের সময় মজা করতেন, 'দেখিস যেন দিতে দিতে লাল না পড়ে যায়।'

"বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুড়ি দিয়ে গান গাইতেন। আলু-কড়াইশুটিসেদ্ধ জামবাটি ভরে খেতেন শীতকালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে। এই সময় সেখানে গঙ্গাধর মহারাজ ছিলেন—তাঁকে আমরা 'ছোট স্বামীজী' বলতাম; ছিপছিপে চেহারা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি। খড়ের গাদার উপর উঠে একলাটি বসে থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন, 'কেন একলা বসে আছে জানিস? মা-মাসীর জন্য চুপি চুপি কাঁদছে রে!—কেউ যেন দেখতে না পায়! কান্না কেন বাপু—দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়! তারা বোধ করি যেতে মানাই করেছে! আর এখান থেকে যাবেই বা কি করে—এমন খ্যাঁটের বহর কোথায় পাবে?' শুনে হো হো হাসি সবাই মিলে।"

সরস কথা স্বামীজীর ওষ্ঠাগ্রে যেন প্রস্তুত থাকত। আর তার ধাক্কা সামলাতে হতো তাঁর পার্ষদদের। শিষ্য গুডউইনের লাঞ্ছনার কিছু কথা শোনাই। বেচারা সর্বদাই উৎফুল্ল এবং উৎসাহী। কথার পিঠে কথা বলতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সব সময়ে ঠিক কথাটা বলে উঠতে পারেন না। মিঃ স্টার্ডি তার পুরনো স্মৃতি শোনাচ্ছিলেন—স্কুলে পড়ার সময় এক শিক্ষক একটি ছাত্রের হাতে বেত মারেন; তেজস্বী ছাত্রটি হাত না সরিয়ে শিক্ষককে বারবার বলছিল—আরও মারুন। আরও মারুন! ছাত্রটির হাত দিয়ে রক্ত পড়লেও সে স্থির ছিল। শিক্ষকই শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিরস্ত হয়েছিলেন।

তারপর থেকে, স্টার্ডি বললেন—"I become awfully angry when I see a man beating a boy"—সেই থেকে আমি যখনই দেখি, কোন লোক কোন ছেলেকে মারছে; আমি ভয়ানক রেগে যাই।

একথা শুনে গুডউইন একটা কিছু বলার প্রেরণায় বলে বসলেন—"Yes Mr. Sturdy, I too become awfully angry when I see a man beating a donkey."—হ্যাঁ মিঃ স্টার্ডি, আমিও ভয়ানক রেগে যাই, যখন দেখি কোন লোক গাধাকে পেটাচ্ছে।

স্বামীজী ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন। গুড-উইনের কথা শেষ হওয়ামাত্র তিনি বলে উঠলেন—"Yes, because it rouses your fellow feeling."—ঠিক যেহেতু তা তোমার স্বজনপ্রেম জাগিয়ে তোলে। অর্থাৎ তুমি একটি—গাধা।

নিজ বুদ্ধিতে অতি বিশ্বাসের অনেক কাহিনীই স্বামীজী বলতেন। সবাই নিজের মাপে সবকিছুকে মাপতে ব্যস্ত। বোম্বাইয়ের একটি মজার ঘটনা তিনি শোনালেন :

বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে বসে দাবা খেলছিল দুই ব্যক্তি—একজন হিন্দু, অপরজন জৈন। দাবা খেলা বহুক্ষণ ধরে হয়—সুতরাং খেলার মধ্যে জানালা থেকে সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটা তারা দেখতে পেল। কী অদ্ভুত কাণ্ড—সমুদ্রের জল ফুলে উঠল—আবার কমে গেল। কি করে? কারণ ব্যাখ্যা করতেই হয়। একজন বলল—'ও আর কিছু নয়, দেবতাদের খেলা। তাঁরা হুড় হুড় করে জল ঢালছেন, আবার তুলে ফেলে দিচ্ছেন।' দ্বিতীয় ব্যক্তির এই ব্যাখ্যার সবটা পছন্দ হলো না। তবে এটা যে দেবতাদেরই কীর্তি তাও অগ্রাহ্য করতে পারল না। সে বলল—'না হে, দেবতারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য উঁচু পাহাড়ের মাথায় জলটা তুলে নিয়ে যান; তারপর কাজ শেষ হলে সেটা ফেলে দেন—তাতেই জল কখনো কমে কখনো বাড়ে।' এক ছোকরা-ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। দাবাড়েদের কথা শুনে সে হেসে ফেলল—'না মহাশয়রা, জোয়ার-ভাটার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, ওসব হয় চাঁদের টানে।' শুনে দাবাড়েরা মহা গরম, নিজেদের পার্থক্য ভুলে দুজনেই চেঁচিয়ে বলল,—'কে হে ছোকরা তুমি—কি বাজে বকছ? আমরা গাধা নাকি? বলি, চাঁদের হাতে কি কোন দড়ি আছে যে, সে দড়ি দিয়ে জলকে টেনে তুলবে? আর অতবড় দড়িই বা সে পাবে কোথা থেকে? যাও যাও, ওসব আহাম্মকি শোনার সময় আমাদের নেই।' ঠিক এই সময় গৃহস্বামী ঢুকলেন সেখানে। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু দেখলেন, মূর্খ দাবাড়েদের আসল কথা বোঝানো অসম্ভব। তখন তিনি ছোকরাটিকে চোখ টিপে নিরস্ত করে নিজের ব্যাখ্যা দিলেন—'তোমাদের জানা উচিত, বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখানে স্পঞ্জের একটি বিরাট পর্বত আছে। স্পঞ্জ কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো। বুঝতেই পারছ, ঐ বিরাট স্পঞ্জের পাহাড় প্রচুর জল টেনে রাখে—যখন তা রাখে তখন সমুদ্রের জল কমে গিয়ে ভাটা হয়। তারপর ঐ পাহাড়ে দেবতারা এসে হাজির হন—এবং নাচতে শুরু করেন—আর বোঝ, অন্য কারো নয়, দেবতাদের নাচ!—তার ধাক্কায় স্পঞ্জের পাহাড়ের জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে এবং জোয়ার শুরু হয়ে যায়। মশাইরা, এই হলো জোয়ার-ভাটার আসল কারণ—কী সহজ অথচ কী যুক্তিযুক্ত!'

ব্যাখ্যা শুনে, দুই দাবাড়ে মুগ্ধ। তারা চাঁদের টানে জোয়ার-ভাটা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু স্পঞ্জের পাহাড়ে দেবতাদের নাচে অবিশ্বাসের কিছু নেই। তাদের কাছে দেবতারা সত্য, এবং তারা স্পঞ্জও দেখেছে—উভয়ের যোগে জোয়ার-ভাটা ঘটা আশ্চর্য কি!

স্বামীজী নিজেই একটি চরম জীবনরসিক সন্ন্যাসীর কথা বলেছেন। হৃষিকেশে সেই সাধুকে তিনি দেখেছিলেন। সাধু উন্মাদভাবে থাকতেন। একদিন রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে চলেছেন—তাঁর পিছনে ছোঁড়ারা ঢিল মারতে মারতে ছুটছে—ফলে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দরদর করে রক্ত পড়ছে—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই—হেসেই খুন। স্বামীজী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে তাতে ন্যাকড়া-পোড়ানো ছাই দিলেন, তবে রক্ত থামে। তাঁর কিন্তু খেয়াল নেই—তিনি অবিরাম হেসে লুটোপুটি—আর বলছেন—'কেয়া মজাদার খেল্ হ্যায়। বিলকুল বাবাকা খেল্। কেয়া আনন্দ!'

?তে স্বল্পমাত্রিক মৌল উপাদানগুলির ভূমিকা

মণিমোহন ঘোষ

মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ এবং নানাবিধ শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াসমূহের জন্য কার্বো-হাইড্রেট, স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট, প্রোটিন এবং ভিটামিন ছাড়াও কতকগুলি মৌল পদার্থ (trace elements) অপরিহার্য। এইসব পদার্থগুলিকে চাহিদা অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা যায়। অতিমাত্রিক এবং স্বল্পমাত্রিক। যেসব মৌল পদার্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া প্রয়োজন হয়, তাদের অতিমাত্রিক উপাদান বলে, যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্লোরিন। অন্যদিকে যে সমস্ত উপাদান খুবই অল্প পরিমাণে পুষ্টির জন্য অপরিহার্য তাদের স্বল্পমাত্রিক উপাদান বলে। যেমন কপার, আয়োডিন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানীজ, সালফার প্রভৃতি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে গঠিত পুষ্টি-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি মোটমাট চৌদ্দটি স্বল্পমাত্রিক মৌল উপাদানকে চিহ্নিত করেছিল যেগুলি মানুষের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেগুলি হলো : আয়রন, আয়োডিন, ক্লোরিন, তামা, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, মলিবডেনাম (Molibdenum), সেলিনিয়াম, টিন, সিলিকন এবং ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)। এগুলির প্রধান উৎস হলো শাকসবজি, ফল, ডিম, মাছ-মাংস, দানাশস্য এবং সমুদ্রজাত দ্রব্য। অনেকগুলি উপাদানেরই মানবজীবনে কার্যকারিতা আজও অজ্ঞাত। হৃদ ও রক্তনালীজাত (Cardiac and Circulatatory) নানাবিধ রোগের সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে দেখা হচ্ছে। ক্যালসিয়াম, ক্রোমিয়াম, তামা, মলিবডেনাম এবং দস্তা, সাধারণভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বভুক হিসাবে গণ্য হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব স্বল্পমাত্রিক মৌলের অভাব হয় না। মনে রাখতে হবে এইসব স্বল্পমাত্রিক মৌল উপাদানসমূহকে কখনোই খাদ্যের পুষ্টিবৃদ্ধিকারী হিসাবে যেন ব্যবহার না করা হয়। কারণ এদের অনেকেরই অতিমাত্রা প্রয়োগে ক্ষতি হতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় স্বল্পমাত্রিক মৌল পদার্থের আলোচনা করব।

আয়রন

আলোচনার প্রথমেই যে উপাদানটি মনে আসে সেটি হলো আয়রন বা লৌহ। লোহিত কণিকা তথা হিমোগ্লোবিন প্রস্তুতিতে আয়রন একটি আবশ্যিক উপাদান। এছাড়া পেশী ও অন্যান্য নানা উৎসেচক (enzyme) যেমন সাইটোক্রোম পেরক্সিডেজ (cytochrome Peroxidase), এবং ক্যাটালেজ (catalase) প্রভৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে আয়রন।

একজন সুস্থ-সবল প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের দেহে ৩·৫ থেকে ৪.৫ গ্রাম পর্যন্ত আয়রন আছে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে এর পরিমাণ ৪০·৫০ মিলিগ্রাম এবং বস্তুতঃপক্ষে এর সবটাই হিমোগ্লোবিনের মধ্যে। আয়রনের উৎস হলো : যকৃৎ, মাংস, ডিম, ডাল (আস্ত দানা সমেত), সবুজ সবজি, পেঁয়াজ, লেটুস শাক, শুকনো ফল, খেজুর, ডুমুর, কিশমিশ এবং ঢেঁকি ছাটা চাল।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

(১) হিমোগ্লোবিন গঠন : লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক আয়রন-প্রোটিন যৌগ গঠনে এর প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। লোহিত কণিকা পুষ্টিসাধন করে, প্রাণিদেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

(২) উৎসেচক গঠন : আয়রন-প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাইটোক্রোম পেরক্সিডেজ ও ক্যাটালেজ নামক উৎসেচক গঠন করে—যা শ্বসনকালে অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যবস্তুর জারণ (digestion) নিয়ন্ত্রিত করে।

অভাবজনিত রোগ

রক্তাল্পতা– আয়রনের অভাবে লোহিত কণিকা সৃষ্টি বিঘ্নিত হয়। ফলে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। একে বলে অপুষ্টি-জনিত রক্তাল্পতা। আর আমাদের দেশে এই জাতীয় রক্তাল্পতা রোগই সবচেয়ে বেশি। রক্তে আয়রনের অভাব দেখা দিতে পারে যদি আমাদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে এই উপাদান কম থাকে কিংবা শরীর থেকে এর দ্রুত নিষ্কাসন হয়। যেমন, দুর্ঘটনাজনিত রক্তপাত। নানাবিধ ক্রিমি সংক্রমণে, মূত্রের সঙ্গে, ঘাম ও পিত্তের মাধ্যমেও এর নিষ্কাসন হয়। স্ত্রীলোকের মাসিক সময়ে প্রতিদিন প্রায় ১ মি. গ্রামের মতো আয়রন শরীর থেকে নিষ্কাসিত হয়ে যায়।

লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা রোগ (Iron deficiency anaemia) অন্যভাবেও দেখা দিতে পারে। যেমন যে সকল শিশু জন্মের পর ৭ বা ৮ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র দুধের উপর নির্ভরশীল, তাদেরও এ-রোগ দেখা দেয়। কারণ নবজাত শিশুর যকৃতে জমা লোহা ৫/৬ মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। দুধের মধ্যে লোহার পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই রক্তাল্পতাকে Milk injury-ও বলে। এর প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো, শিশুর ৬ মাস বয়স থেকেই সেইসব কঠিন খাদ্য দেওয়া যাতে কিছ পরিমাণ লোহা আছে। এশিয়া মহাদেশে শতকরা দশজন পুরুষ এবং শতকরা কুড়িজন মহিলা রক্তাল্পতায় ভুগছে।

দৈনিক প্রয়োজন

সাধারণতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০ মি. গ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-লোকের ক্ষেত্রে ৩০ মি. গ্রাম লৌহ উপাদান হলো সর্বনিম্ন প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় এবং শিশুকে দুগ্ধ প্রদানকালে লৌহের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সেই সময় প্রাত্যহিক চাহিদা ৪০ মি. গ্রাম। বাড়ন্ত শিশুদের বয়স ও বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে প্রতিদিন ২৫-৩০ মি. গ্রাম লৌহের প্রয়োজন।

আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতা দূরীকরণের জন্য প্রতিদিন খাদ্যের সঙ্গে থাকা প্রয়োজন ৬ মি. গ্রাঃ আয়রন এবং ৫০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক এ্যাসিড। তারপরে অন্যকারণ খুঁজতে হবে। রোগীকে পুষ্টি-শিক্ষা দিতে হবে। তার পরিবেশ উন্নত করতে এবং আর্থসামাজিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

আয়োডিন

স্বল্পমাত্রিক মৌল উপাদানগুলির মধ্যে আয়োডিন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর অভাব জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষের নানা স্থানে।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

(১) থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি—আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গ্রন্থিরস ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে।

(২) আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। এই রোগে থাইরয়েড গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং গলার সামনে এটি স্ফীত থলির মতো ঝুলে থাকে।

উৎস: সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক লবণ, কড-লিভার অয়েল, ডিম, ছাগলের দুধ, পেঁয়াজ, আর আয়োডিনসমৃদ্ধ মাটিতে উৎপন্ন শাক-সবজি।

যেসব জায়গায় জল ও সবজির মধ্যে আয়োডিন থাকে সেখানে গলগণ্ড রোগ কখনও দেখা যায় না।

বর্তমানে কতকগুলি খাদ্যকে গলগণ্ড উৎপাদন-কারী খাদ্যহিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যা থাইরয়েড গ্রন্থির আয়োডিন ব্যবহার ব্যাহত করে দেয়। খুব বেশি পরিমাণে বাঁধাকপি, ফুলকপি ও মূলো গ্রহণেও গলগণ্ড রোগ দেখা যায়। আগে যে অপরিশোধিত সামুদ্রিক লবণ ব্যবহৃত হতো, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকত। বর্তমান কালে লোকের পছন্দ অনুযায়ী পরিশোধিত লবণ, যা দেখতে খুব সাদা, বাজারে বিক্রয় হয় যাতে আয়োডাইজড ভাগ অত্যন্ত কম। সেজন্য এখন অনেক কোম্পানী ঐ লবণে আয়োডিন মিশিয়ে 'আয়োডাইজ্ড সল্ট (Iodised salt) বার করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাহাড়ি অঞ্চলে লবণের দাম বেশি বলে লবণের ব্যবহার কম হওয়ায় কিছু কিছু পাহাড়ি অঞ্চলে গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

প্রাত্যহিক প্রয়োজন

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রাত্যহিক প্রয়োজন হলো ০·১০ থেকে ০·১৫ মি. গ্রাঃ। যৌবনের প্রারম্ভে গর্ভাবস্থায় ঠান্ডা লাগলে থাইরয়েড গ্রন্থির ওপর

চাপ পড়ে। তাই এই সময়ে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়।

ফ্লোরিন

অস্থি এবং দাঁতের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে এ উপাদানটি বর্তমান। চায়ের পাতায় প্রতি ১০০ গ্রামে ১৭৫ মি. গ্রাঃ পর্যন্ত ফ্লোরিন পাওয়া যায়। জলে ফ্লোরিনের স্বাভাবিক মাত্রা প্রতি লিটারে ০·৫ মি. গ্রাঃ থেকে ০.৮০ মি. গ্রাঃ। এর থেকে কম হলে দাঁতে পোকা (Caries tooth) ধরতে পারে, আর ১ মি. গ্রাঃ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ফ্লুরোসিস (Flourosis) রোগের সৃষ্টি হয়।

ম্যাগনেসিয়াম

উৎস ঃ সকল প্রকার দানাশস্য ও সবুজ সবজির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে এই উপাদানটি বর্তমান। এর প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ২০০—৩০০ মি. গ্রাঃ। লিভারের সিরোসিস রোগে, মদ্যপানের ক্ষেত্রে প্রোটিন-শক্তি (Protein-energy) অপুষ্টি রোগে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

(১) ম্যাগনেশিয়াম অস্থি গঠনে সহায়তা করে।

(২) স্নায়ু ও পেশীর স্বাভাবিক কার্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

(১) এই লবণের অভাবে দেহের পেশীসমূহের সুসংবদ্ধ আচরণে ব্যাঘাত ঘটে।

(২) স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্য ব্যাহত হয় এবং খিঁচুনীর লক্ষণ প্রকট হয়।

তামা

লোহার সঙ্গে তামাও হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করে, যদিও তামা হিমোগ্লোবিনের অন্তঃস্থ নয়। কিন্তু এর অভাবে লোহার অভাব-জনিত রক্তাল্পতার মতোই রোগ দেখা দেয়। দুধ ছাড়া অন্যান্য প্রতিটি খাদ্যবস্তুর মধ্যেই তামা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় এর অভাব পরিলক্ষিত হয় না। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রাত্যহিক চাহিদা হলো ০·২ গ্রাম।

অন্যান্য স্বল্পমাত্রিক উপাদান

কতকগুলি উৎসেচক সৃষ্টিতে এবং আর্জিনিন (arginine) বিপাকীয় ক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানীজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

বি-ভিটামিনের এক বিশিষ্ট উপাদান হচ্ছে কোবাল্ট। থাইরয়েড গ্রন্থি কর্তৃক আয়োডিন অধি-গ্রহণে সহায়তা করে। এর অভাবে আয়োডিন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর অভাব সচরাচর দেখা যায় না। ইনসুলিনের এক উপাদান দস্তা। এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বলিক এ্যাসিড সদ্ব্যবহারের জন্য যে উৎসেচক কার্বোনিক এ্যানিহাই-ড্রেজ (Carbonic Anihydrase) প্রয়োজন হয় তারও অংশবিশেষ এই দস্তা। মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে দস্তা ছড়িয়ে আছে।

কার্বোহাইড্রেট ও ইনসুলিনের কার্যাবলীতে 'ক্রোমিয়ামে'র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি জানা গেছে শরীরে মলিবডেনাম-এর অভাব হলে মুখগহ্বরে ও খাদ্যনালীতে ক্যান্সার রোগ দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে এর আধিক্য অস্থি-বিকৃতির কারণ।

মানুষের পুষ্টিতে সেলেনিয়াম-এর গুরুত্ব বিষয়ে কিছু দিন আগে পর্যন্ত কোনরকম চিন্তাভাবনা করা হয়নি। মানুষের পুষ্টিতে এর যে অভাব দেখা দিতে পারে তা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬১ এবং পরে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে। যেসকল শিশু কোয়াসিয়ারকর (Kwashiarkor) রোগে আক্রান্ত, তাদের খাদ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ সেলিনিয়াম মিশিয়ে দেখা গেছে এতে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায়। যাবতীয় অনুসন্ধান নির্দেশিত করে যে, প্রোটিন-শক্তি-অপুষ্টিতেই এর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত স্বল্পমাত্রিক মৌলসমূহ আমাদের পুষ্টিতে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে আশার কথা হচ্ছে যে,সাধারণ যেসব খাদ্য আমরা খেয়ে থাকি তার মধ্যেই এগুলি প্রয়োজনমতো বর্তমান। নিতান্ত প্রোটিন-শক্তি-অপুষ্টির শিকার না হলে এদের অনেকেরই অভাবজনিত রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

মুক্তির বাণী বেদান্ত : স্বামীজীর কণ্ঠস্বর

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

Vedanta : Voice of Freedom. Swami Vivekananda. Edited by : Swami Chetanananda. Foreword : Christopher Isherwood. Preface : Huston Smith. Philosophical Library, 200 West 57th Street, New York, N. Y. 10019, $ 19. 95.

বেদান্ত শুধু ভারতের দর্শন নয়, জীবনদর্শনও বটে। আদর্শ ভারতীয়ের জীবনের সমগ্র সাধনার একটিই লক্ষ্য—মুক্তি। ভারতাত্মার বাণী বেদান্ত তাই মুক্তিরও বাণী। মৃন্ময় জীবনের তমসা থেকে চিন্ময় জীবনের জ্যোতিতে উত্তরণের জন্য ভারতবর্ষের ব্যাকুলতা এদেশের বিশ্ববিশ্রুত প্রার্থনা-মন্ত্রে উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়েছে—'তমসো মা জ্যোতির্গময়' (আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও)। এই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য ও মর্মবাণী। বেদান্তের তত্ত্ব নিহিত রয়েছে সূত্রাকারে এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে।

বেদান্তের আধুনিক প্রবক্তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তিনি যখন বলেছিলেন, 'I have a message to the West, as Buddha had a message to the East' (পাশ্চাত্যের জন্য আমার বিশেষ বাণী রয়েছে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য বিশেষ বাণী ছিল), তখন তিনি বেদান্তের বাণীর কথাই ভেবেছিলেন। বেদান্ত ছিল স্বামীজীর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা-স্বপ্ন। এই বেদান্তের প্রচারই তিনি বিদেশে করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের বেদান্ত বিদেশীদের শেখা উচিত নিজেদের সত্যিকারের উন্নতির জন্য। তাই তাঁর উক্তি :

> "তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেরও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

গ্রন্থটি বারোটি সুচিন্তিত অংশে সুবিন্যস্ত : (১) বেদান্ত কি ? (২) বেদান্তের দর্শন, (৩) বেদান্তের ধর্ম, (৪) বেদান্তে ঈশ্বর ও মানব, (৫) মায়াবাদ, (৬) কর্মযোগ, (৭) জ্ঞানযোগ, (৮) ভক্তিযোগ, (৯) রাজযোগ, (১০) বেদান্তের ব্যবহার, (১১) বেদান্তের লক্ষ্য, এবং (১২) বেদান্তের বিশ্বজনীনতা। শেষাংশে একটি শব্দকোষ, গ্রন্থপঞ্জী এবং নির্ঘণ্ট গ্রন্থটির উপযোগিতা বাড়িয়েছে।

'বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর'-শীর্ষক মুখবন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভারতপ্রেমী ক্রিস্টোফার ইশারউড লিখেছেন :

> "আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিষয়বস্তুর অনেকটাই প্রথমে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে বলা হয়েছে, কখনো কখনো বিনা প্রস্তুতিতে, এমনকি বিবেকানন্দ যা বলতে চেয়েছেন তার কোন খসড়া ছাড়া। এসব ক্ষেত্রেই তাঁর কথাগুলি দ্রুতলিখনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল··· তাই আমরা স্বামীজীর জীবন্ত ভাষার তাজাভাবের অভিজ্ঞতা লাভ করি। তাঁর শব্দগুলির অন্তরালে বিবেকানন্দের প্রাণময় উপস্থিতি অনেক সময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"
>
> (সমালোচক কর্তৃক অনূদিত)

বিবেকানন্দের এই প্রাণময় উপস্থিতি আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এনে দিয়ে স্বামী চেতনানন্দ যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন তার জন্য তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থটি মুখ্যত বিদেশী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হলেও ভারতীয়দের কাছেও যে এটি সমভাবে সমাদৃত হবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিখ্যাত দার্শনিক হুস্টন স্মিথের ভূমিকা গ্রন্থটির একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

প্রধান কার্যালয়

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত প্রাইভেট আশ্রমসমূহের দুইদিনব্যাপী এক সম্মেলন গত ১৯ ও ২০ নভেম্বর সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় **বেলুড় মঠে** অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে সীমিত সংখ্যক প্রতিনিধি এবং পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে মুখ্যতঃ দেশের নানাপ্রান্তে অবস্থিত প্রাইভেট আশ্রমসমূহ এবং ভাবপ্রচার সমিতিগুলি কিভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারে তার উপায় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী।

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুরীধামে পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে **পুরী রামকৃষ্ণ মঠ** গত ১২—১৪ নভেম্বর '৮৯ তিনদিনের এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ। পুরীর বাইরে থেকেও, এমনকি উড়িষ্যার বাইরের ভক্তরা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে ভক্তসম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিদিন বিকালে সর্বসাধারণের জন্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ নভেম্বর বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও জপ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বহু সংখ্যক ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ, স্বামী দীনেশানন্দ এবং স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ।

রাজকোট আশ্রম ঃ গত ১৩ অক্টোবর '৮৯ এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে মোট ২৭৫ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

রাঁচি মোরাবাদী আশ্রম গত ৯—১৩ সেপ্টেম্বর, '৮৯ পাঁচদিন-ব্যাপী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রসমূহের এক ন্যাশন্যাল সেমিনার-কাম-ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা ও কৃষিশিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। সেমিনারে সমাপ্তি-ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। আই. সি. এ. আর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল, বহু কৃষিবিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ মোট ২৫০ জন প্রতিনিধি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর কলেজের দুইজন ছাত্র পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কে প্রথম স্থান এবং স্ট্যাটিস্টিক্সে দুইজন ছাত্র যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

পরিদর্শন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং তদানীন্তন জল পরিশোধন ও রাজভাষা বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা দেওঘর বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করেন। বিদ্যাপীঠ ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের রাজ্য হকি চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করায় দশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

গত ১১ নভেম্বর '৮৯ মেঘালয়ের নগর উন্নয়ন ও পৌর-প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী এ. লিংদু **চেরাপুঞ্জী আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

বস্ত্রবিতরণ

জয়রামবাটী মাতৃমন্দির গত জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে জয়রামবাটী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যে ১৩১৯টি শাড়ি এবং ৪৩১টি ধুতি বিতরণ করেছে।

চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির

জামতাড়া আশ্রম ঃ গত ৩—১০ নভেম্বর '৮৯ এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করে।

ঐ শিবিরে মোট ৭৪জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক রোগীকে পশমের কম্বলও দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর (হুগলী) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত ১৮—২৫ নভেম্বর '৮৯ অনুরূপ শিবিরের আয়োজন করে। ঐ শিবিরে ২৬ জন মহিলা ও ২৩ জন পুরুষ রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়। স্থানীয় তরুণ-তরুণী ও ভক্তবৃন্দ দিনে ও রাতে পর্যায়ক্রমে রোগীদের শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ: অন্ধ্র-প্রদেশের নেলোর জেলার কাবালি অঞ্চলের কোণ্ডাপুরমে সাম্প্রতিক ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত একহাজার পরিবারের মধ্যে বেলুড় মঠ থেকে খাদ্য, কাপড়-চোপড়, কম্বল, লণ্ঠন, বাসনপত্র প্রভৃতি মিলিয়ে তিন লক্ষাধিক টাকার জিনিস দেওয়া হয়েছে—এবং বহু নতুন ও পুরনো কাপড়ও পাঠানো হয়েছে।

পুনর্বাসন: 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচীর মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার ছয়টি গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনস্থ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পঁচিশটি গ্রামে ১০৯টি নতুন গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৪টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ মেরামত করা হয়েছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটিতে গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পালিত হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে এবং ২৫ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তাছাড়া ৬ ডিসেম্বর এবং ১৩ ডিসেম্বর কেন উপনিষদ ও রাজযোগের ওপর বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন যথাক্রমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। ৩১ ডিসেম্বর 'নিউ ইয়ার্স ইভ' পালন করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৭ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং ২৩ ডিসেম্বর '৮৯ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ। ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী 'মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ' বিষয়ে একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব

গত ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (৪ পৌষ, ১৩৯৬) বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৭তম শুভ আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐদিন ভোর থেকে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত অগণিত ভক্ত নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলা ১১-৩০ মি. থেকে ২-৩০ মি. পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ-হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সকাল ১০টায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিংহ ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬-৩০ মি. গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দ।

খ্রীস্টোৎসব

গত ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ 'সারদানন্দ হল'-এ ভগবান যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যা ৬-১৫ মি. ভগবান যীশুর প্রতিকৃতির সম্মুখে আরতির পর তাঁর বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। আলোচনার পর ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর ধর্মালোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণস্মরণ সংঘে (কলিকাতা-৪) গত ২৮ অক্টোবর '৮৯ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বরাভয়লীলা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। ভজন পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং ভাষণ দেন নির্মাল্য বসু।

বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (পিকনিক গার্ডেন, কলিকাতা-৩৯) গত ১০ সেপ্টেম্বর 'স্বামী বিবেকানন্দ অনুধ্যান' নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশ নেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী।

প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের চুঁচুড়া শাখা গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর '৮৯ যথাক্রমে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। প্রথম দিন সাধারণ অধিবেশন এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল স্বামীজী-কথিত গল্প, সঙ্গীত আবৃত্তি ও ভাষণ। দ্বিতীয় দিন সকালে শোভাযাত্রা, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দিরের সৌজন্যে ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

অখিল ভারত রামকৃষ্ণ পরিষদ (কলিকাতা-৬৩) গত ১৩ সেপ্টেম্বর '৮৯ হেয়ার স্কুলে এবং ১৬ সেপ্টেম্বর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে ঐ দুই স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা বিষয়ে দুটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে। আলোচনা চক্র দুটিতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

লবণ খাওয়া সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য

অ-জৈব প্রাকৃতিক পদার্থ হিসাবে লবণ একটি অদ্ভুত সামগ্রী। হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের খাদ্যে লবণ স্থান পেয়ে আসছে। 'সার্মন অফ দি মাউন্ট' (Sermon of the Mount)-এ পাওয়া যায় যীশুখ্রীস্ট তাঁর অনুগামীদের বলছেন "তোমরা পৃথিবীর লবণ।" প্রাচীন রোমে লবণ এমন মূল্যবান বস্তু ছিল যে সম্রাট সিজারের সৈন্যদের মাহিনার খানিকটা অংশ হিসাবে লবণ দেওয়া হতো, যা থেকে 'স্যালারিয়াম' (salarium) এবং পরে 'স্যালারি' (salary) কথাটি এসেছে। গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করেই তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীসে লবণ দিয়ে ক্রীতদাস কেনা-বেচা হতো—যা থেকে 'নট ওয়ার্থ দি সল্ট' (Not worth the salt) বাক্যাংশটি চালু হয়েছে।

খাদ্য থেকে যদি লবণকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে খাওয়ার যোগ্য কিছুই থাকবে না। তা ছাড়া খাদ্য সংরক্ষণের (Preservation) জন্যও এটি প্রয়োজনীয় বস্তু। এসব সত্ত্বেও এখন লবণের অবগুণ সম্বন্ধে কথা শোনা যাচ্ছে—লবণ সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার 'ফুড এ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের' ভূতপূর্ব কমিশনার ডাঃ আর্থার হুল হেজ বলেছেন যে, লবণ খাওয়া কমিয়ে দিলে সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল হবে। 'অ্যামেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন', 'অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন' এবং আমেরিকার সার্জেন জেনারেল ঐ একই সুরে মতপ্রকাশ করেছেন। বলা হচ্ছেঃ "একজন কতটা সোডিয়াম (Sodium) খায়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের অসুখ, রক্তনালীর অসুখ, স্ট্রোক (stroke) এবং অল্পবয়সে মৃত্যু।" ব্যাপারটি যদি সত্যই তাই হয়, তাহলে সেটি ভয়ের ব্যাপার। কিন্তু সম্প্রতি অনেক চিকিৎসা-গবেষক বুঝতে পারছেন যে লবণ-ভীতিতে বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়েছে। শেষোক্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন অ্যালবাম

ইউনিভার্সিটির কার্ডিও ভ্যাসকুলার রিসার্চের অবসর-প্রাপ্ত ডাইরেক্টর হ্যারিয়েট দস্তান। তিনি বলেছেন: "লবণ খাওয়া নিয়ে এত হৈচৈ-এর প্রয়োজন নেই।" তিনি সম্প্রতি ১৫০ জনের উপর এক স্বল্পমেয়াদী গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, যাদের রক্তচাপ সাধারণ, তাদের খাবারে লবণ বাড়ালে বা কমালে কিছু তফাৎ পাওয়া যায় না। রক্তচাপ যাদের বেশি (হাইপার-টেনসিভ—hypertensive) তাদের কম লবণ খাইয়ে অর্ধেকের রক্তচাপ কমানো গিয়েছিল, কিন্তু লবণের পরিমাণ সাধারণ করার পরে, তাদের রক্তচাপ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অন্য অনেক গবেষণার ফলও দাস্তানের অভিমতের পক্ষে যায়। ইন্ডিয়ানার একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে—সুস্থ লোককে খুব বেশি লবণ খাইয়ে তাদের সবসময় হাইপারটেনসিভ করা যায় না। ইজরায়েলে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওজনে ভারী লোকদের খাবারে লবণ না কমিয়েও কেবল খাবারের পরিবর্তন (low calorie diet) করেই রক্তচাপ কমানো সম্ভব। লবণে অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride)-এ ৩৯ শতাংশ সোডিয়াম এবং ৬১ শতাংশ ক্লোরাইড আছে। শরীরের মধ্যে এ দুটি মিশে থাকে, তবে ভিন্ন রকমের কাজ করার জন্য এরা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ক্লোরাইডের কাজ হলো দেহকোষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জলের অনুপাত রক্ষা, হজমের কাজে অংশ নেওয়া এবং সোডিয়ামের সঙ্গে মিশে, রক্তে অম্লতা-ক্ষার এর সাম্যতা (acid-base balance) বজায় রাখা, যা জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সোডিয়াম রক্তের পরিমাণ ও চাপ রক্ষার কাজে লাগে, স্নায়ুতন্ত্রীতে শক্তি চলাচলে এবং হৃৎপিণ্ডের ও মাংসপেশীর সংকোচনে সাহায্য করে।

শরীরে লবণাধিক্য বা লবণাল্পতা যাতে না হয়, তারও ব্যবস্থা আছে। লবণ বেশি খেলে বৃক্ক (kidney) তাকে বার করে দেয়; কম খেলে প্রস্রাবে লবণের ভাগ কম ও জলের ভাগ বেশি হয়। লবণ ছাড়া শরীর চলে না। তাই রোগীদের অস্ত্রোপচারের সময়, শক (shock) নিবারণে লবণজল ইনজেকশন দেওয়া হয়। শরীরে লবণ কম হলে মাংসপেশীর যন্ত্রণাদায়ক সংকোচন হয়; আবার বেশি হলে গা বমি বমি করে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সেনাবাহিনীকে লবণ সরবরাহ না করতে পারায় নেপোলিয়নকে রাশিয়া থেকে ভয়াবহ অবস্থায় ফিরে আসতে হয়েছিল এবং তাতে হাজার হাজার সৈনিক প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট হওয়ার জন্য রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে এখন লবণের প্রাপ্তিস্থল অনেক। প্রতি লিটার সমুদ্র-জল হতে ৩০ গ্রাম লবণ পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া প্রায় প্রতিটি মহাদেশের যেসব জায়গায় প্রাচীন যুগে সমুদ্র ছিল কিন্তু এখন নেই, সেসব স্থানে প্রচুর লবণ জমে আছে। সেইরকম একটি জায়গা হলো আমেরিকার কারগিল সল্ট রিফাইনারি। (Cargill Salt Refinery) যেখানে বছরে দুই লক্ষ টন লবণ আহৃত হয়। সাবান, রবার, পেন্ট প্রভৃতি নানা রাসায়নিক কারখানায় লবণ ব্যবহৃত হয়।

আমাদের খাদ্যে লবণের বেশি-কম কিভাবে ধরা হবে? সাধারণ লোক দিনে ৪-১০ গ্রাম (চা-চামচের আধ থেকে এক চামচ,) লবণ খাবে, রন্ধিত খাদ্যে বা অন্যান্য খাদ্যে মিশিয়ে নিয়ে। তবে যাদের বৃক্কে, হৃৎপিণ্ডে বা যকৃতে অসুখ আছে তাঁরা অবশ্য ডাক্তার বললে লবণ কম খাবেন। অনেকে মনে করেন যে, লবণ বেশি খেলে রক্তচাপ বাড়ে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নেই। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, লবণ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য যেমন পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম—এদের রক্তচাপ বাড়ানোর ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। শরীরে ক্যালসিয়াম কমে গেলে যে রক্তচাপ বাড়ে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তাহলে কি দাঁড়াল? লবণ আমাদের শত্রু নয়; এটি সমস্ত শরীরাংশের উপাদান। চিকিৎসক যদি অসুখকে ঠিক লবণ-সংক্রান্ত না বলেন, তাহলে, লবণ খাওয়া ছাড়ার দরকার নেই।

[Reader's Digest
May 1989. pp. 143—146]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



ফাল্গুন

১৩৯৬

৯২ তম বর্ষ

২য় সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ —২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ ফাল্গুন, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

আজ শনিবার ২৫শে ফাল্গুন (১২৯১), ৭ই মার্চ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো। ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি সহাস্যে)—এর (পদসেবার) অনেক মানে আছে। (নিজের হৃদয়ে রাখিয়া বলিতেছেন) এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়।

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্য কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—এখানে বাইরের লোক কেউ নাই। তোমাদের একটি গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম, খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে, **আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।**

এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি না।...যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

কথাপ্রসঙ্গে

"তোমাদের চৈতন্য হউক"

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐদিন 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন। ভক্তদের প্রতি তাঁহার "করুণাব্ধি সেইদিন "বেলাভূমি অতিক্রম" করিয়াছিল। তাহার পর পূর্ণ একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন সেই মহাপবিত্র তীর্থভূমিতে। তাঁহাদের বিশ্বাস, আজও একইভাবে ঐস্থানে ঐদিন তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হয়, তিনি একইভাবে 'কল্পতরু' হন।

ঐদিন বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল? অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সকলকে অবাক করিয়া দিয়া তাঁহার দ্বিতলের কক্ষ হইতে নিচে উদ্যানমধ্যে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐভাবে নামিয়া আসিতে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীপাগত গিরিশচন্দ্রকে সহসা সম্বোধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: "গিরিশ তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যুক্তকরে উত্তর দিলেন: "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি!" গিরিশচন্দ্রের এই আন্তরিক ও অকপট কথাগুলি শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ করুণায় উদ্বেল হইয়া সমবেত সকলের (সেদিন ছুটির দিন বলিয়া তিরিশ জনেরও বেশি ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন) উদ্দেশে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন: "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক!"

স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন: "ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐকথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের

অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ-কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি-আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতঃপূর্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল।... কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতঃপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজ হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকট নহে, কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে।..."

শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনের প্রধান আশীর্বাদঃ "তোমাদের চৈতন্য হউক।" ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 'চৈতন্য' শব্দের অর্থ চেতনা বা জ্ঞান। চেতনা বা জ্ঞান কি উপস্থিত ভক্তগণের ছিল না? ছিল তো নিশ্চয়ই। তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত এই শব্দগুলির মধ্যে বিশেষ কি রহিয়াছে?

বিশেষ কি রহিয়াছে সেই প্রসঙ্গে এবার যাই। বেদান্তের মতে, মানুষ মাত্রই স্বরূপতঃ চৈতন্য বা ঈশ্বর। প্রতিটি জীবে, প্রতিটি মানুষে তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু মানুষ তাহার এই মহিমা সম্পর্কে অবহিত নহে, সচেতন নহে। অজ্ঞানের দ্বারা তাহার সেই বোধ, সেই চেতনা থাকে আবৃত। যে-মানুষ যত এই আবরণকে 'উন্মোচন' করিতে পারে সে ততই 'আবিষ্কার' করে তাহার মহিমা, তাহার স্বরূপের ঐশ্বর্য। তখনই সে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হয় এবং অনুভব করে ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু (সৎ), তিনি চৈতন্যরূপে (চিৎ) সর্বজীবে বিদ্যমান এবং তিনি আনন্দ-স্বরূপ। বেদান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, সৎ-চিৎ-আনন্দই আমাদের স্বরূপ। সেই চৈতন্য বা চেতনা (awareness) আমাদের হউক। তাহা হইলে আমরা নিজের মধ্যে প্রকটিত করিব আমাদের যথার্থ ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য আত্মার ঐশ্বর্য, এই ঐশ্বর্য চেতনার ঐশ্বর্য। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের পার্থক্য এই দিব্য-ঐশ্বর্য বিকাশের তারতম্যে। যে-মানুষের মধ্যে মানুষের সহজাত এই পরম ঐশ্বর্যের চরম প্রকাশ ঘটে তাহাকে আমরা তখন আর মানুষ বলি না, বলি ঈশ্বর বা ভগবান। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত প্রকাশকে যিনি আপন জীবনে প্রকটিত করেন তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান। ভগবান বুদ্ধ, ভগবান খ্রীস্ট, ভগবান চৈতন্য, ভগবান রামকৃষ্ণ সেই প্রক্রিয়ারই জীবন্ত ইতিবৃত্ত। আপন আপন জীবনে কঠোর সংগ্রাম ও তপস্যার দ্বারা সহজাত ভগবদ্‌সত্তার বা অন্তর্নিহিত চৈতন্যের চূড়ান্ত বিকাশ তাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন।

কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো মানুষ যেমন দেবত্বসহ জন্মগ্রহণ করে, তেমনই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে বহন করিয়া আনে অজ্ঞানকেও। এই অজ্ঞান আর কিছুই নহে—আমাদের অন্তরস্থিত পশুত্ব। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেবত্বের বা যথার্থ মনুষ্যত্বের, স্বামীজীর ভাষায়, 'বুদ্ধ-ম্যান'-এর—বুদ্ধমানব-এর, সঙ্গে পশুত্বও, স্বামীজীর ভাষায়, 'ব্রুট-ম্যান' বা পশুমানবও থাকে পাশাপাশি। আমাদের পূর্বজগণ হিতোপদেশ-এ বলিয়াছেনঃ

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সমানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং হি তেষামধিকো বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

জ্ঞানের জন্যই পশু আর মানুষের পার্থক্য। জ্ঞানবিহীন মানুষ তো পশুরই সমান, পশুরই নামান্তর। যাহার দ্বারা পশুমানব মানুষে এবং মানুষ দেবতায় বা বুদ্ধমানবে উত্তরণ করিতে প্রয়াসী হয় তাহারই নাম জ্ঞান এবং যে কৌশল বা যে প্রক্রিয়ায় জ্ঞান তাহা করায় তাহারই নাম ধর্ম বা ধর্ম-বিজ্ঞান। কেহ ইচ্ছা করিলে ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য 'ধর্ম' বা 'ধর্ম-বিজ্ঞান' ব্যবহারের পক্ষপাতী। যথার্থ ধর্মের অনুশীলনে মানুষের মধ্যে মহতের, বৃহতের, অমৃতের, ভূমার চেতনা, শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাষায়, 'হুঁশ', জাগ্রত হয়। 'ভূমা' হইল মানুষের 'মান'-এর অর্থাৎ মর্যাদার স্বরূপ, তাহার মর্যাদার পরাকাষ্ঠা। যাহার সেই 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' আছে সে-ই মানুষ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আশীর্বাদ করিলেনঃ "তোমাদের চৈতন্য হউক", তখন তিনি চাহিতেছেন আমরা যেন সত্যকারের 'মানুষ' হই। ইহার চাহিতে বড় আশীর্বাদ আর কী হইতে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। আমরা বুঝি পণ্ডিত হওয়া, ধনী হওয়া, সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন পাণ্ডিত্য, অর্থ, লোকমান্য প্রভৃতি সকল পার্থিব প্রাপ্তিই ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ বিচারে সেগুলি যত বড় প্রাপ্তিই মনে হউক না কেন, ঈশ্বরপ্রাপ্তির কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। একের পিঠে শূন্য বসাইয়া এক-কে মুছিয়া দিলে শূন্যের

যে মূল্য, ঈশ্বর-বিচ্যুত সকল পার্থিব প্রাপ্তির মূল্যেও তাহাই। ঈশ্বরকে পাইলে আর কিছু পাইবার থাকে না। আবার জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও ঈশ্বরকে না পাইলে সব পাওয়াই শূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়। বিখ্যাত জার্মান মরমিয়া দার্শনিক একহার্ট বলিতেনঃ "To be full of God is to be empty of things, while to be full of things is to be empty of God"—ঈশ্বর যাহার হৃদয় জুড়িয়া আছেন, পার্থিব সম্পদে সে নিঃস্ব হইলেও আত্মিক ঐশ্বর্যে সে পূর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পার্থিব সম্পদের তুঙ্গশিখরে বসিয়াও ঈশ্বরপ্রাণতার অভাবে সেই দুর্ভাগা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব হইয়া যায়। ভারতীয় মরমিয়া সাধক তাই বলিতেছেনঃ "সব ছোড়য়ে তো সব পাওয়ে।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যং "লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (৬।২২)—যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকেই ততোধিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরকে লাভ করিলে অন্য সকল লাভ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'আলুনি' লাগে। কারণ, সমস্ত অকেজো বস্তুকে নিঃশেষ করিয়া তাঁহার সত্তার ঐশ্বর্যে অন্তর পূর্ণ করিয়া ঈশ্বর যে তখন বিরাজ করেন। কবি খুব সুন্দরভাবে বলিতেছেনঃ "শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা তারই লাগি রইনু বসি।" পার্থিব জগতের ঐশ্বর্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মোটেই ঐশ্বর্যবান ছিলেন না, কিন্তু পরম ঐশ্বর্যে তিনি ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। ইংরেজ কবির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে "Having nothing he hath all." শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনের আশীর্বাদের তাই অন্যতম তাৎপর্য হইলঃ ঈশ্বরলাভই যে জীবনের একতম লক্ষ্য—এই বোধ, এই চেতনা, এই চৈতন্য যেন আমাদের জাগ্রত হয়। তখন আমরা উপলব্ধি করিবঃ ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। সকল আনন্দ তাঁহার নিকট হইতেই উৎসারিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ আশীর্বাণী উচ্চারণ গিরিশচন্দ্রের একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাহা করিয়া প্রকারান্তরে তিনি তাঁহার স্বরূপ স্বীকার করিলেন। যেন বলিলেনঃ "আমিই স্বয়ং ঈশ্বর—তোমাদের সম্মুখে এই রোগশীর্ণ দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। আদিকবি বাল্মীকি এবং মহাকবি ব্যাস যাঁহাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবতাদি গ্রন্থে—সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রাম এবং কৃষ্ণই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূত। তোমরা তাহা ধারণা কর এবং বিশ্বাস কর। আশীর্বাদ করি, আমার সেই ঐশী স্বরূপ সম্পর্কে তোমাদের চৈতন্য হউক।" অবিশ্বাস মানুষের সহজাত। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না। মানুষকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস, যে-মানুষ আবার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তিনি কেমন করিয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে পারেন?—এই সংশয়, এই অবিশ্বাসের দোলায় তখন দোদুল্যমান হইতেছিল কোন কোন ভক্তের মন। বিশ্বাসের খনি ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসে অভিভূত শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন বাধ্য হইয়াছিলেন 'আত্মপ্রকাশ' করিতে। তিনি বলিতেনঃ "যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব।" এ তো সেই হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দেওয়াই। ইহার অর্থাৎ এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেদিন উপস্থিত ভক্তদের উপলক্ষ করিয়া জগৎকে এই অমোঘ অভয়বার্তাও শুনাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়াছেন মানুষকে উদ্ধার করিতে, মানুষের দুঃখভার মোচন করিতে। যীশুখ্রীস্ট বলিতেছেনঃ "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest." যীশুর মতো রামকৃষ্ণও সেদিন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন সকল দুঃখী ও অসহায় মানুষের পরিত্রাতা হইয়া তিনি আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলিলেনঃ "তুমি দুর্বল নহ, তুমি পাপী নহ, তোমার মধ্যে পূর্ণের স্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে। তুমিই পূর্ণ। তুমি অমৃতের সন্তান, পাপের সন্তান কদাপি নহ। তুমি পাপ কর না—যাহা কর তাহা ভুল। মিথ্যা হইতে আমরা সত্যে যাই না—যাই ক্ষুদ্রতর সত্য হইতে বৃহত্তর সত্যে। তোমার দুর্বলতা, তোমার অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া তুমি আগাইয়া চল। আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি—তোমাদের বন্ধু, তোমাদের পরম আপনজন।" এই অভয়-আশ্বাসই তিনি সেদিন শুনাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ তাই লিখিয়াছেনঃ "[তাহারা প্রত্যেকে] সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন!"

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভক্তদের কাছে 'কল্পতরু দিবস' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ঐদিনের ঘটনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ বলিতেছেনঃ "আমাদিগের বোধ হয় উহাকে ঠাকুরের অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তি-যুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা

করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর তো ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয়-প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় [তিনি] সুব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক, শুধু ঐ একটি দিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিলে বা বলিলে তাঁহার মহিমাকে খর্বই করা হয়। কারণ, তিনি তো একদিনের জন্য কল্পতরু নহেন, তিনি নিত্য কল্পতরু। ঐদিন অভূতপূর্ব করুণা প্রকাশ করিয়া উপস্থিত ভক্তদের তিনি কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সকল ভক্ত তো ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। আবার আশ্চর্যের বিষয়, যাঁহারা পরবর্তী কালে তাঁহার 'ত্যাগী সন্তান' রূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন সেই নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তাহা হইলে ঐদিন ঐস্থানে অনুপস্থিত গৃহী-ভক্ত এবং ত্যাগী-ভক্তদের জন্য কি তিনি কল্পতরু ছিলেন না? কিন্তু তাহা তো যথার্থ নহে। তিনি সর্বদেশে সর্বকালে এবং নিখিল মানব-সাধারণের কল্পতরু, শুধু ঐদিন ঐসময় এবং ঐ কয়েকজন ভক্তের কাছেই নহেন। করুণার হরির লুট তিনি ঐ ঘটনার আগেও বহুবার বিলাইয়াছেন, পরেও বিলাইয়াছেন। অপ্রকট হইয়া আজিও বিলাইতেছেন, ভবিষ্যতেও বিলাইয়া চলিবেন। স্বামী প্রেমানন্দকে একবার জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন: "বেলুড় মঠে কেন কল্পতরু উৎসব হয় না?" প্রেমানন্দজী উত্তরে বলেন: "ঠাকুর যেনিত্য কল্পতরু, ভক্তদের সকল প্রার্থনা নিত্য মঞ্জুর করছেন।"

ভক্তির শেষ কথা চৈতন্য, জ্ঞানেরও শেষ কথা চৈতন্য, কর্মের শেষ কথা চৈতন্য, যোগেরও শেষ কথা চৈতন্য। সর্বদেশে সর্বকালে সকলকে নির্বিচারে সেই চৈতন্য দান করিতে তিনি কল্পতরু। দেশ কাল জাতির গণ্ডি ভাঙিয়া তাহা প্রচার করিবার জন্যই কি বাঙলা তারিখের পরিবর্তে ইংরেজী ১ জানুয়ারি তারিখটিকে তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন?

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি, স্বামী সারদানন্দ যেমন বলিয়াছেন, পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরু নহেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষ রূপকথার 'তাল-বেতাল'-এরই প্রাচীন সংস্করণ। ভুলবশতঃ বা নিছক কৌতূকবশতঃ যদি কেহ তাহার নিকট নিজের ধ্বংস চাহিয়া বসে তো তৎক্ষণাৎ ধ্বংসই নামিয়া আসিবে তাহার জীবনে। আবার সমৃদ্ধি চাহিলে তৎক্ষণাৎ সমৃদ্ধি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো ঐরূপ কল্পতরু নহেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে মানুষ শুধু মঙ্গলই পায়। না চাহিলেও পায়। শুধু মঙ্গল, শুধু শ্রেয়, শুধু কল্যাণ, শুধু অভয়। নির্বিচারে মানুষকে তিনি যেমন চৈতন্যের রাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন, তেমনই দিয়াছেন অকুণ্ঠ অভয়-আশ্রয়ও।

"চৈতন্য হও" অথবা "চৈতন্য হউক" শুধু সেইদিনের নহে, সমগ্র রামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বাংশে ধ্বনিত একটি প্রধান বার্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও লীলার মধ্যে যে কাহিনী কথিত তাহা একান্তভাবেই চৈতন্যের সন্ধান ও তাহার প্রাপ্তির কাহিনী। বর্তমান জগতের মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বহু-প্রতীক্ষিত পুরুষ যিনি তাহাদের নিকট চৈতন্য দান করিতেই আবির্ভূত। মানুষকে তিনি চৈতন্যসত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঈশ্বর-প্রেরিত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি যে দিব্যলীলা কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রধান পুরুষ নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু তাহার প্রধান পার্শ্বচরিত্র নিঃসন্দেহে গিরিশচন্দ্র যিনি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্কম্প প্রত্যয় লইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে, কি তাঁহার প্রকৃত পরিচয়—যিনি এতদিন গহনতম তমিস্রার মধ্যে আলোকচৈতন্যের জন্য সুকঠিন সংগ্রাম করিতেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রলগ্নে দীর্ঘ সংগ্রামের পর গিরিশচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন আলোকচৈতন্যের সন্ধান এবং সেইসঙ্গে একান্তভাবে তাঁহাকেও যিনি সেই আলোকচৈতন্যের উৎসমুখে দণ্ডায়মান। সেই চৈতন্য-পুরুষের আলোকে ক্রমে গিরিশচন্দ্রের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উত্তরণ করিয়াছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্রে, নট গিরিশচন্দ্র হইয়াছিলেন সন্ত-পুরুষ গিরিশচন্দ্র। জীবনের শেষ প্রান্তে যে-ই তাঁহাকে দেখিয়াছে সে-ই সেই বিরাট বিবর্তনের আকার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। বজ্রানলে আপন পঞ্জরাস্থিকে জ্বালাইয়া লইয়া বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র মহান অহঙ্কারে বলিতেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কিনা আমাকে দেখে তোমরা বোঝ। কি ছিলাম, আর কী তিনি করে দিয়েছেন!"

ইহারই নাম সত্যকারের বিপ্লব। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক দুর্ধর্ষ নায়ক এই বিপ্লবকে "রামকৃষ্ণ বিপ্লব" বলিয়া চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তায় ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে, মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হলো এই বিপ্লবের প্রকৃতি।" 'মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়া' মানে মানুষের মধ্যে চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া দেওয়া, সে যে চৈতন্যস্বরূপ সেই বোধে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিশেষে তাহাকে 'চৈতন্য'ই করিয়া দেওয়া।

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

Udbodhan Office
1. Mukherji Lane
Baghbazar, Calcutta
৩ জানুয়ারি ১৯২৫

কল্যাণবরেষু,*

তোমার ১ জানুয়ারির পত্র পাইলাম। [তোমার] প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে দিতেছি।

১ম। জীবনের লক্ষ্য ভগবানলাভ বা পরমাত্মার জ্ঞানলাভ—সাধন-ভজন করা তাহারই জন্য। নিঃস্বার্থ কাজ করাটাও সাধন-ভজনের মধ্যে জানিবে। কারণ, উহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া [সাধক] ভগবান-লাভের অধিকারী হয়। তবে, কার্য করিতে যাইলেই অনেক সময় মনে স্বার্থপরতার ভাব আসিয়া পড়ে। উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধ্যান-জপ এবং নিঃস্বার্থ কর্ম করিয়া যাইতে হয়। আবার কোন একটা কাজের ভার লইলে সময়ে সময়ে উহার সিদ্ধির জন্য ধ্যান-জপ ছাড়িয়াও উহাতে লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। ঐরূপ হইলে, ঐ কার্য সিদ্ধ হইবার পরে কয়েকমাস কার্য ছাড়িয়া ধ্যান-জপেই ষোল আনা মন দিয়া থাকিলে ভাল হয়। সেজন্যই অধিকারীভেদে আমরা কাহাকেও সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়া থাকি।

২য়। মিশনের কাজে যদি কেহ সত্যই জীবন উৎসর্গ করে তাহা হইলে কালে ঠাকুর স্বামীজীর প্রতি বিশ্বাস ভক্তি হইবে এবং সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছাও হইবে এবং জ্ঞানলাভ হইয়া মুক্তিও হইবে।

৩য়। যাহারা sincere অথবা sincere হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের বিনাশ নাই—নিশ্চয়ই উচ্চগতি লাভ করিবে।

আমার আশীর্বাদ সতত জানিবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইবে। আমার শরীর একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। অন্যান্য সকলের কুশল।

গত ৩১ ডিসেম্বর তারিখে পূঃ গোলাপ-মার মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

* স্বামী কাশীশ্বরানন্দকে লিখিত

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা

স্বামী অভেদানন্দ

অতীতে যেসকল অবতারপুরুষ বিশ্বের কল্যাণে আগমন করিয়াছিলেন, গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্বে যে কঠোর তপস্যা তিনি করিয়াছিলেন, আজিও তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের বুকে বর্তমান রহিয়াছে। তিনি যেসময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ বাস্তবিকই তদুপযোগী হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে-মহান সত্য তিনি বিতরণ করিয়া গিয়াছিলেন সুখ-শান্তি ও সব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পথে মানবকে তাহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তৎপর ভগবান যীশুখ্রীস্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবও অবতীর্ণ হইয়া মানবের অধ্যাত্মজীবনের অভাব ও প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করিতে দেশ ও কালোপযোগী সত্যরাশি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে স্মরণীয় এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে অবতারপুরুষের পুণ্য সাধকজীবনী আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, তিনিও ঠিক অন্যান্য অবতারপুরুষগণের ন্যায় মানবের অধ্যাত্মজীবনে সাহায্য করিতে ও ধর্মগ্লানি দূর করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা অন্যান্য অবতার-চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয় নাই। এ জগতে স্ত্রী, পুত্র ও ঐশ্বর্য ত্যাগের যথার্থানুষ্ঠান জীবনে ঠিক ঠিক প্রতিভাত করা বড়ই দুরূহ। এমনকি ভগবান তথাগতের জীবনীতেও আমরা দেখিতে পাই যে, দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়াও তাঁহার মন হইতে স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আমরা কিন্তু অদ্ভুত সংযম ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। তিনি কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি জয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া বা তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলাইয়া নহে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই।

তাঁহার ত্যাগের সাধনা বাস্তবিকই ছিল অলৌকিক। এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলিতে বলিতে উভয়কে সমজ্ঞান করিয়া তিনি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই অবধি জগতের কোন বস্তুই তাঁহার নিকটে মূল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হইত না। আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা জগতের উপর আধিপত্যলাভের ইহা এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সময় হইতে টাকা বা কোন ধাতুদ্রব্যই তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না। অজ্ঞাতসারেও স্পর্শ করিলে তাহার আঙুল বাঁকিয়া ও শরীর নিস্পন্দ হইয়া যাইত। বাস্তবিক ইহা আশ্চর্য নহে, কারণ তিনি অর্থকে ত্যাগ করিয়াছিলেন পরমার্থলাভের পথে সম্পূর্ণ অন্তরায় জ্ঞান করিয়াই; কিন্তু বর্তমান দেহাত্মবাদের যুগে মানুষের মন অর্থের প্রতি এমনই আসক্ত যে, তাহাদের অর্থোপার্জনের যন্ত্রস্বরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অর্থোপার্জনকেই তাহারা পারিবারিক জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাই অনর্থ অর্থের জন্য তাহারা অনেক সময় যে-কোন প্রকার পাপকার্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভোগের মাঝে তাই ত্যাগের পূর্ণ আদর্শরূপে অলৌকিক সাধনাদ্বারা দেখাইলেন 'টাকা মাটি' বা তুচ্ছ পদার্থ, অর্থে শান্তি নাই, পরমার্থই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং ভোগের মাঝে থাকিয়াও যথার্থ ত্যাগকে বরণ করিয়া ঐ জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায়।

শুধু তাহাই নহে। সকল রমণীই ছিল তাঁহার চক্ষে শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতিমূর্তি। পত্নীকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানেই পূজা করিতেন, এজন্য দৈহিক সম্বন্ধ তাঁহার পত্নীর সহিত কখনো ছিল না। এই কাম-কাঞ্চনের যুগে নরনারী ইন্দ্রিয়-লালসার অবাধ প্রবাহে যখন চিরভাসমান এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যের আদর্শ একরূপ বিস্মৃত, তখনই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনে দেখাইলেন কেমন করিয়া দাম্পত্য-জীবনেও বিবাহের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ মানবসমাজে পবিত্রভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে। নারী যে ভোগ্যা নয়, পূজ্যাই; নারীর সম্মান ও পূজায় মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে অজ্ঞানাবরণ দূর করিতে হইবে, ইহাই তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুর নারীজাতিকে পরম শ্রদ্ধার স্থান প্রদান করিয়াছিলেন আপনার সাধনক্ষেত্রে

রমণীকে প্রথম আচার্যপদে বরণ করিয়া। ঐ রমণী ব্রহ্মচারিণী, অসামান্যা গুণবতী, পরমা বিদুষী ও হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বপ্রকার সাধনায় সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহাভাবসকল ভগবদ্দর্শনের পথে উপস্থিত হইত, শ্রীশ্রীঠাকুরেরও সেসকল চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন,—"এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।" ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব ও শৈবতন্ত্রোক্ত সকল সাধনপ্রণালীই একটির পর একটি সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরের তান্ত্রিক-সাধনার সময় তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কারণ নামকরণ হইতেছে পূর্ণাভিষেকের একটি বিশেষ অঙ্গ। 'রামকৃষ্ণ'-এই নামটি আবার "নিত্যানন্দের খোলে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব" এই অর্থেই বোধ হয় ব্রাহ্মণী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন প্রকার সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় তিনি জগন্মাতার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কখনো কখনো গঙ্গার তীরে বসিয়া মায়ের দর্শনলাভের জন্য চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন ও শিশুর ন্যায় সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। একদিন প্রাণের ব্যাকুলতায় অস্থির হইয়া তিনি মায়ের দর্শনলাভের জন্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পাগলের ন্যায় খড়্গ লইয়া আপনার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু খড়্গ তাঁহার হাত হইতে পতিত হইল এবং তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় জগজ্জননীর জ্যোতির্ময়ী বরাভয় মূর্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইল, মা সহাস্যে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আবার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাষাণমূর্তিতে মিলাইয়া গেলেন। তখন হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ের দর্শনলাভ করিতে লাগিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন।

সাধনাবস্থায় একবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমানই হইতেছে ভগবদনুগ্রহ লাভের পথে বিষম অন্তরায়, তাই তিনি অলক্ষ্যে অস্পৃশ্য মেথরের বাটীতে যাইয়া নিজ হস্তদ্বারা, কখন বা মস্তকের দীর্ঘ কেশদ্বারা তাহাদের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিতেন। এইরূপে সমস্ত ভেদবুদ্ধি ও আত্মাভিমানকে তিনি চির-বিসর্জন দিয়াছিলেন।

পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরম জ্ঞানযোগী ন্যাংটা তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈত বেদান্তবিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মাত্র তিনদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় গভীর নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টান মতেও তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিকের বাগানবাটীতে বহুদিন তিনি বাইবেল পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে একদিন যীশু-খ্রীস্টকে দর্শন করেন ও আপনার শরীরাভ্যন্তরে তাঁহাকে মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া সমাধিমগ্ন হন।

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইসলাম ধর্মমতে সাধনা করিতে অগ্রসর হন এবং ঈশ্বরানুগ্রহলাভের জন্য মুসলমান সাধকের সর্বপ্রকার সাধনাই তিনি করিয়াছিলেন। ফকির গোবিন্দের সহায়তায় তিনি অল্প-দিনের মধ্যে ইসলামধর্মের রহস্য ভেদে সক্ষম হন ও ভাবাবেশে হজরত মহম্মদের দর্শনলাভ করেন।

এইরূপে সর্বমতে সাধনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল সম্প্রদায়ের ধর্মের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য বা গন্তব্য এক, নাম বা অভিধা-মাত্র পৃথক এবং বিভিন্ন ধর্মমতসমূহ ঈশ্বরলাভের নানা উপায় মাত্র। হিম-গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া নদীসকল যেইরূপ সরল ও বক্রপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে পতিত হয়, বিভিন্ন জাতির সম্প্রদায়গত মতবাদসমূহও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সেই এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগররূপ লক্ষ্যে মিলিত হয়। তাই "যত মত তত পথ" এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া তিনি সকল সঙ্কীর্ণতার বুকে উদারতার জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়া গেলেন, ভালবাসা ও একতার স্রোতে সারা বিশ্ব তাই প্লাবিত হইতে চলিল। নিরক্ষর পূজারীরূপে আসিয়াছিলেন তিনি জগতের এক গুরু-ভার বহন করিয়া। নবীন প্রবাহ ও সত্যালোকে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ-বেশে আসিয়া যে পবিত্র আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণে বিশ্ববাসী অবশ্যই ধন্য হইবে।*

* আনন্দবাজার পত্রিকা—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা (২৪. ২. ১৯৩৬) সংগ্রহ: নারায়ণচন্দ্র গুহরায়

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজ আর নূতন করে বলবার কিছু নেই। দিকে দিকে দেশে দেশে তাঁর মাহাত্ম্যের কথা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও অনেক জায়গায় যাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যেখানেই গিয়েছি দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে। যদি মনে করি আমরা তাঁকে প্রচার করছি তাহলে তা হবে চরম ভ্রান্তি। তিনি কোন প্রচারের অপেক্ষা রাখেন না। নিজেই নিজেকে তিনি সর্বত্র প্রসারিত করছেন। তাঁর বিরাট সত্তার কোন সীমা নেই, দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে তা পরিব্যাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের বলতেন, এবার যেন রাজার ছদ্মবেশে তাঁর রাজ্যের ভিতরে আসা। রাজা আত্মপরিচয় গোপন করে রাজ্যের ভিতরে ঘুরে প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। প্রজারা জানে না তিনি রাজা। জানলে তাদের সঙ্গে তাঁর একটা ব্যবধান রচিত হবে। লোকে তাঁকে সম্ভ্রম সমীহ করবে, আপনার করে নিতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি তাদেরই একজন হয়ে ঘুরছেন তখনই তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের সুখদুঃখের কথা, মনের কথা প্রাণ খুলে বলতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণও বলছেন, এবার ছদ্মবেশে আসা। কেন তিনি নিজের স্বরূপ ঢেকে রেখে ছদ্মবেশে এলেন? তাঁর ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য যেন অপরের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান সৃষ্টি না করে, সকলে যেন তাঁকে আপন করে নিতে পারে—এজন্যে এবার ছদ্মবেশ। এজন্যই ভগবান যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে মানুষের মধ্যে এসে লীলা করেন। তা না হলে মানুষ তাঁর সঙ্গে নৈকট্য বোধ করতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক। ভগবান যদি ভগবান হয়েই আসেন তাহলে তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্ভ্রমের দূরত্ব থেকে যায়, মানুষ তাঁকে আপন করে নিতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্গে আরও বলেছিলেন: "যাবার সময় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব।" হাঁড়ির মধ্যে কি আছে কেউ জানে না, হাটের মধ্যে সর্বসমক্ষে হাঁড়ি ভেঙে দিলে কিছু লুকানো থাকবে না, সব প্রকাশ হয়ে যাবে। সত্যই তিনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে, আধ্যাত্মিক রহস্যের গভীর তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে সমাধি অবস্থায় তাঁর কিরকম অনুভব হয় সে সম্বন্ধে বলছেন। বলতে বলতে মুহুর্মুহু সমাধি হয়ে যাচ্ছে। কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না বলে চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে। বলছেন: "ওরে আমি তো তোদের সব বলতে চাই কিন্তু মা যে আর বলতে দিচ্ছে না, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।" ভক্তদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যা অসম্ভব, যা অসাধ্য তাই তিনি সম্ভব, সাধ্য করতে চান। যে ভগবান সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন তিনি বাক্যমনের অতীত, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেই সকলের সামনে উদ্ঘাটিত করতে চান; কিন্তু পারছেন না তাই এই দুঃখ, অশ্রুপাত। ভক্তদের জন্য তাঁর অন্তরে এতই বেদনা। একদিন ভক্তসমক্ষে

শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজ আর নূতন করে বলবার কিছু নেই। দিকে দিকে দেশে দেশে তাঁর মাহাত্ম্যের কথা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও অনেক জায়গায় যাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যেখানেই গিয়েছি দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে। যদি মনে করি আমরা তাঁকে প্রচার করছি তাহলে তা হবে চরম ভ্রান্তি। তিনি কোন প্রচারের অপেক্ষা রাখেন না। নিজেই নিজেকে তিনি সর্বত্র প্রসারিত করছেন। তাঁর বিরাট সত্তার কোন সীমা নেই, দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে তা পরিব্যাপ্ত।

বারবার সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলছেন: "মা আমাকে বেহুঁশ করিস নে, আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা কইব।" সাধকরা জন্ম জন্মান্তরের সাধনাতেও যে সমাধি-সুখ লেশমাত্র অনুভব করতে পারেন না, সেই সমাধি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আসছে, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে পরিহার করতে চাইছেন। কারণ তিনি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবেন। ভক্তদের প্রতি তাঁর এমনই ভালবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে এইটি আমাদের বিশেষ করে উপলব্ধি করবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদেরা যাঁরা তখন যুবক, ছাত্র, একদিন তাঁরা কয়েকজন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফেরার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কথা—শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন ভাল লাগে, তাঁর মধ্যে কে কি দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন এইসব আলোচনা করছেন। স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) চুপ করে আছেন। সকলেই জানেন নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে যত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এমন আর কেউ পারেননি। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বল? নরেন্দ্র একটু স্তব্ধ থেকে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন L O V E personified. (প্রেমের মূর্ত রূপ)।"

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না এই কথাই লোকে জানে। তিনি লোহাকে সোনা করতে, রোগীর রোগ ভাল করতে, মকদ্দমায় জিতিয়ে দিতে পারতেন না, তিনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন না ইত্যাদি, ইত্যাদি। লোককে যা আকৃষ্ট করে অথবা লোকে যার জন্য সাধুর কাছে যায় তার কোনটিই তিনি করতে পারতেন না। একবার একজন তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বলল: "এখানে নাকি এক পরমহংস আছেন যিনি ওষুধ দিতে পারেন।" ঠাকুর বললেন: "না, না, এখানে নয়। ঐ পঞ্চবটীতে একজন আছেন, সম্ভবতঃ তিনি দিতে পারেন।" পঞ্চবটীতে অনেক সাধু এসে থাকতেন তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। বলতেন, অষ্ট-সিদ্ধির একটি থাকলেও ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না। কোন ঐশ্বর্য তিনি চাননি, তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের অলৌকিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, আমাদের মতো দুরন্ত, শিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অবিশ্বাসী দুরন্ত যুবকদের মনগুলিকে তিনি কাদার তালের মতো যেমন খুশি গড়তেন আর ভাঙতে পারতেন। এরচেয়ে অলৌকিক ঘটনা আর কি আছে? জড় বস্তুকে পরিবর্তিত করার শক্তি তত বেশি বড় কথা নয়, কিন্তু এই যে চেতন মনগুলি—যে মনগুলি আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—সেইগুলিকে কাদার তালের মতো তিনি গড়েছেন, ভেঙেছেন। স্বামীজীর মনকেও এই-ভাবে ঠাকুর বহুবার ভেঙেছেন, গড়েছেন। স্বামীজী সহজে ঠাকুরের কাছে ধরা দেননি, এমনি এমনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন: "আমার মতো ঠাকুরের সঙ্গে কেউ সংগ্রাম করেনি। কিন্তু আমি যতবার চেষ্টা করেছি ততবার দেখেছি তিনি আমার সমস্ত অভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। বারবার এরকম হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর চরণে মাথা নত করতে আমি বাধ্য হয়েছি।"

স্বামীজী বলেছেন, আমাদের মতো দুরন্ত, শিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অবিশ্বাসী দুরন্ত যুবকদের মনগুলিকে তিনি কাদার তালের মতো যেমন খুশি গড়তেন আর ভাঙতে পারতেন। এরচেয়ে অলৌকিক ঘটনা আর কি আছে? জড় বস্তুকে পরিবর্তিত করার শক্তি তত বেশি বড় কথা নয় কিন্তু এই যে চেতন মনগুলি—যে মনগুলি আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—সেইগুলিকে কাদার তালের মতো তিনি গড়েছেন, ভেঙেছেন।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কি বস্তু দেখলেন তা তিনিই জানেন, সাধারণ মানুষের তা দেখবার সামর্থ্য নেই। কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলছেন: "ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যায়।" শুনে একজন গুরুভাই বলছেন: "কই আমরা তো এরকম কিছু দেখি না।" তখন স্বামীজী উদাহরণস্বরূপ ঠাকুরের মাহুত নারায়ণ আর হাতী-নারায়ণের গল্পটি নিয়ে সাতদিন ধরে আলোচনা করলেন। তাঁর গুরুভাইরা বললেন: "এর ভিতরে যে এত গভীর তত্ত্ব আছে তা তো আমরা বুঝিনি!" নরেন্দ্রনাথ যে স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হলেন,

স্বামীজী বলতেন তা ঐ শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তি। তিনি বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধুলো থেকে লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন। গুরুভক্তির আতিশয্যে এসব তাঁর অতিশয়োক্তি নয়। স্বামীজী সে পাত্রই ছিলেন না। তিনি প্রত্যেকটি কথা ওজন করে বলতেন। ঢাক পিটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। পাশ্চাত্যে তিনি সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেননি। আমেরিকায় যখন স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছেন তখন কচিৎ কোন ভক্তের কাছে সাবধানতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে সভায় উঠেছেন। উঠে সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন। আমেরিকার সমাজের নানা ত্রুটি অসম্পূর্ণতার দীর্ঘ সমালোচনা করে তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন। কিন্তু সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলবেন শ্রোতাদের এই আশাই ছিল। বক্তৃতার পরে স্বামীজীর কাছে তাঁদের অনুযোগ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বললেন না তো। স্বামীজী বললেন ঃ "আমি বলব স্থির করেই মঞ্চে উঠেছিলাম কিন্তু সভার দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বকে ধারণা করতে পারেন এমন একজনকেও দেখতে পেলাম না। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারলাম না। দেখলাম, সকলের মন কাম-কাঞ্চনে আসক্ত। সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্র ব্যক্তিত্বকে ধারণা করবার সামর্থ্য তাদের নেই।" অবশ্য পরে বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু সেদিন এমন অভিভূত হয়ে ছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি। আরও একবার বলেছিলেন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে আমার ভয় হয়, এইজন্য যে, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে না বসি, তাঁকে বিকৃত করে না ফেলি। আমার সীমিত বুদ্ধি দিয়ে অসীমকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা স্বামীজীকে এত অভিভূত করেছিল যে, বহু বক্তৃতায় তিনি তার উল্লেখ করেছেন। কথাটি হলো, ভগবানের কখনো ইতি করা যায় না। অর্থাৎ তিনি এই পর্যন্ত, এই তাঁর সীমা—এ কথা কখনো বলা যায় না। আমাদের মন, বুদ্ধি ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। স্বামীজীর ভাষায়, 'এক ছটাক আধার, তার মধ্যে তাঁকে ধরে রাখা যায় না। কলসীর মধ্যে সমুদ্রকে রাখা যায় কি? ঠাকুর বলতেন, এক সেরের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে?

আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে চর্চা করি, তাঁকে যদি প্রকাশ করতে যাই তবে এইটুকুই বলতে পারি যে, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝেছি তা এই। স্বামীজী অনেক জায়গায় তাঁর গুরুভাইদেরও এবিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। কেউ হয়তো খুব কঠোর সাধনা করছেন, তাঁকে বলেছেন, তোরা কি ভেবেছিস তোরা এক-একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সেই সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ হওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র আধার তাঁর অমৃতবাণী দিয়ে ভরে নিতে পারলেই যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আজকাল অনেক নাটক অভিনীত হচ্ছে, ছায়াচিত্র তৈরি হচ্ছে। তাঁকে নানাভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এসব প্রয়াসের উদ্দেশ্য সৎ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিনয় দেখে প্রায়শঃ মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একজন অর্ধোন্মাদ মানুষ। তাঁর যেন হাত-পা স্ববশে নেই, যেন পার্কিনসন রোগ-গ্রস্ত। সংলাপে আর্ট নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ ঐরকম ছিলেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, তিনি ছিলেন পুরুষসিংহ। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে অতি বড় ব্যক্তিত্ববানও মেষশাবক হয়ে থাকত। বড় বড় পণ্ডিত মনীষী, বক্তা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নির্বাক, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন। সেকালের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলতেন ঃ "এখানে আমি তর্ক করতে পারি না, তর্কের অতীত এই তত্ত্ব।"

স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম ঃ "ঠাকুর আপনাদের কিভাবে সাধন-ভজন করাতেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন ঃ "সাধন-ভজন করব কি, তিনি সকালে মধুর স্বরে যে নাম করতেন তাতে পাষাণ গলে যেত। সেখানে আমাদের মন থাকলে তো সেই মন

দিয়ে জপ-ধ্যান করব?” কথাটি উপলব্ধির বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সুমধুর স্বরে ভগবানের নাম করতেন, চারদিকে যেন সেই ভাবপ্রবাহে পরিপূর্ণ করে দিতেন। সেখানে সাধনার আর অবকাশ থাকত না। মন স্বতঃই উচ্চ স্তরে উঠে যেত। ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব যে, চেষ্টা করে মনকে ওঠাতে হয় না। ভাগবতে আছে, ভগবানের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেন— “মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্” (১০।৩।৫)—যাঁরা সাধুব্যক্তি, সৎব্যক্তি, অসুর বিরোধী, তাঁদের মন প্রসন্ন হয়ে স্বচ্ছ নির্মল হয়ে যায়। কেবলমাত্র তাঁর সান্নিধ্যেই এমনটি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য মাত্রেই মানুষের মন এমন ঊর্ধ্বগামী হয়ে যেত। ঠাকুর বলছেন যে, এখানে তিনি তুচ্ছ করতেন। নিজের মুক্তি চাননি মোক্ষাভিলাষী স্বামীজীকেও একারণে তিনি কঠোর তিরস্কার করেছেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা কেউ কেউ পাঁচসের বেগুন দিয়ে হীরার মূল্য নিরূপণ করি।

ধর্ম মানে যে ঈশ্বরকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি সেই ভালবাসাকে সর্বজীবে প্রসারিত করা, এই শাস্ত্রবাক্য বিস্মৃত হয়ে আমরা লোকাচার, দেশাচারকে ধর্মের আসনে বসিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আমাদের দৃষ্টিকে পরিবর্তিত করে দেখিয়ে দিলেন ভগবানকে পেতে গেলে কিভাবে জীবনকে পরিচালিত করতে হয়। কেবল ধ্যান-জপের সময়টুকু মাত্র নয়, সমগ্র জীবনের আচরণে

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আজকাল অনেক নাটক অভিনীত হচ্ছে, ছায়াচিত্র তৈরি হচ্ছে। তাঁকে নানাভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এসব প্রয়াসের উদ্দেশ্য সৎ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিনয় দেখে প্রায়শঃ মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একজন অর্ধোন্মাদ মানুষ। তাঁর যেন হাত-পা স্ববশে নেই, যেন পার্কিনসন রোগগ্রস্ত। সংলাপে আর্ট নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ ঐরকম ছিলেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলছেন, তিনি ছিলেন পুরুষসিংহ। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে অতি বড় ব্যক্তিত্ববানও মেষশাবক হয়ে থাকত। বড় বড় পণ্ডিত মনীষী, বক্তা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নির্বাক, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন।

তো আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না যে, আজ ইনি ভাষণ দেবেন। ভাষণ দেবার তাঁর দরকার হতো না। পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব স্বতঃই তাঁর থেকে প্রসারিত হতো। অবতারপুরুষরা এইভাবে জগৎকে প্রভাবিত করেন। তাঁরা যখন আসেন তখন আপনিই মানুষের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়। বহু লোক সেই দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। অবতারের এটি বৈশিষ্ট্য। অথচ অবতার আখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিতৃষ্ণা ছিল। খ্যাতিলাভের জন্য তিনি দেহ ধারণ করেননি। সকলের পাপ-তাপ, দুঃখ গ্রহণ করে সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছিলেন তিনি। সকলের মনকে ঊর্ধ্বগামী করতে এসেছিলেন তিনি। তার জন্য সমাধিসুখকেও ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তবেই ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারব। ধর্ম মতবাদ, আচার অনুষ্ঠানের ভিতরে নয়, বাগ্মিতাতেও নয়, ধর্ম অন্তরের উপলব্ধির বস্তু এবং মানুষ ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই সর্বজীবের প্রতি তার প্রেম বাড়বে। চন্দনের বন, রূপার খনি, সোনার খনি, হীরের খনি—এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। গন্তব্যে পেঁছালে দেখব তিনি আর আমি এক, তিনি আর তাঁর ভক্তেরা এক। প্রার্থনা করি আমরা যেন দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তাঁর জীবনালোকে পথ দেখে এগিয়ে যেতে পারি। লক্ষ্যে পেঁছালে দেখব সকলেই সেই এক তত্ত্বে, এক অমৃতলোকে পেঁছেছি।*

* গত ২৬.৪.১৯৭৯ তারিখে বাংলাদেশের কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তি

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ ও অনুসৃত ধর্মাদর্শ যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা—একথা বলা অবশ্যই বাহুল্য মাত্র। আর সেই প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে এ-নীতিটি জগতের তাবৎ ধর্মমতেরই মূল তত্ত্ব। ভাষা ও ভঙ্গিমার বিভিন্নতার অন্তরালে নিহিত সকল ধর্মেরই মূল তাৎপর্য হলো স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তবে এ-নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তিটি সব ধর্মমতে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত নয়। এদিক দিয়ে ভারতের সনাতন ধর্ম নিঃসন্দেহে অনন্যতার দাবী করতে পারে।

এই সনাতন ধর্মের সার্থক সংজ্ঞা রয়েছে মহাভারতে—যে মহাভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে প্রচলিত প্রবচনেঃ 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' মহাভারতের 'শান্তিপর্বে'র একটি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ধর্ম' শব্দটির যথার্থ তাৎপর্যঃ

"সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কায়েন মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে॥"

—যিনি সকলের নিত্য সুহৃৎ, যিনি কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সকলের হিতে রত থাকেন, হে জাজলে, তিনিই ধর্ম যে কি তা জানেন।

ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাস—বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাদিও অহিংসা ও জীবপ্রেমের মৌল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই নীতির সমর্থক কোন দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনা সেখানে তেমনভাবে নেই,—যেমনভাবে আছে সনাতন ধর্মের ক্ষেত্রে।

বর্তমান দুনিয়ায় সর্বাধিক প্রচারিত ও আচরিত ধর্মবিশ্বাস খ্রীস্টধর্মও এই জীবপ্রেমের ও জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কবি কোলরিজ খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্রীয় নীতিটি এইভাবে তুলে ধরেছেনঃ

"He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all."

('The Rime of the Ancient Mariner', lines: 614-617).

—যিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীকেই সমভাবে ভালবাসেন, তিনিই যথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করেন। কারণ, আমাদের প্রিয় ঈশ্বর যিনি আমাদের সকলকে ভালবাসেন, জগতের সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

বস্তুতঃ খ্রীস্টধর্মের উৎস—যীশুখ্রীস্টের বাণী-সমন্বিত যে বাইবেল—তার কেন্দ্রীয় তত্ত্বটিই কবি শ্রবণ-সুখকর মাধুর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন এই ছত্র-চতুষ্টয়ে। যীশুখ্রীস্টের ধর্মোপদেশের সারাৎসার হলোঃ তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাস—"Love your neighbour as yourself।" কিন্তু এই প্রেমের প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে—এর প্রবর্তনার সঙ্গত হেতু সম্বন্ধে—কোন আলোকপাত করেননি তিনি তাঁর শিষ্যদের মনে। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু"—নীতির কোন সঙ্গত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না খ্রীস্টধর্মে, পাওয়া যায় না জগতের অন্য কোন ধর্মেই।

যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারেঃ আমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ বোধ করবার জন্য কেমন করে আমার হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হবে?

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-বিশ্রুত জার্মান দার্শনিক ডঃ ডয়সনের মনে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নেরই উদয় হয়েছিল এবং আন্তরিক জিজ্ঞাসায় অনুসন্ধিৎসু হয়ে এর সংশয়াপনোদক ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের সনাতন ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ আকর গ্রন্থ—বেদ-উপনিষদে। তিনি লিখছেনঃ

"The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality—'Love your neighbour as yourself.' But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself, and not in my neighbour? The answer is not in the Bible, but it is in the Vedas—in the great formula—'That Thou Art'=(তৎ ত্বম্ অসি), which gives, in three words, metaphysics and morals together."

—" 'তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাস'—এই বাণীকেই বাইবেল-এর অন্তর্ভুক্ত সুসমাচারসমূহ সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ বলে যথার্থতঃ উপস্থাপিত করেছে কিন্তু কেন আমি তা করব? কারণ, প্রকৃতির নিয়মে আমি কেবলমাত্র আমারই চেতনায় বেদনা এবং আনন্দ অনুভব করি, আমার প্রতিবেশীর চেতনায় তা করি না। এই প্রশ্নের কোন উত্তর বাইবেল-এ নেই—উত্তর আছে বেদের মধ্যে, আছে বেদের মহাবাক্যে—'তৎ ত্বম্ অসি।' এই তিনটি শব্দের মধ্যে নীতি ও ধর্মের সব কথা বলে দেওয়া হয়েছে।"

'তত্ত্বমসি' হলো সামবেদের মূল তত্ত্বজ্ঞাপক মহাবাক্য। বলা বাহুল্য, চতুর্বেদে এমন চারিটি মহাবাক্যে অধ্যাত্মজগতের পরম তত্ত্বটি ব্যক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের মহাবাক্য হলোঃ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'; সামবেদের —'তত্ত্বমসি'; যজুর্বেদের—'অহং ব্রহ্মাস্মি'; অথর্ব-বেদের—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। চতুর্বেদের এই মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন। সনাতন ধর্মের উৎসরূপে পরিগণিত—'প্রস্থানত্রয়'-এর মূলতত্ত্বই এই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন—এই তিন শাস্ত্রকে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়,—কারণ এই তিনটি হলো সনাতন হিন্দুধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। আচার্য শঙ্কর তাই বললেন:

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

—যা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হয়েছে, তা আমি মাত্র অর্ধশ্লোকে বলছি—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

যে গীতা উপনিষদ্‌সমূহের সারাৎসার বলে গণ্য, সেই গীতার নানা শ্লোকে বিধৃত হয়ে আছে এই পরমতত্ত্বটি। তন্মধ্যে বিশেষ একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যাক যার মধ্যে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়ে আছে:

"সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥"
(৬।৩১)

—যে যোগী একত্বে স্থিত হয়ে,—অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করে, সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করে সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। সর্বভূতে সেই এক আত্মাই বিরাজিত—এই বোধই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

"যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, সর্বলোক আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে।"

কেন আমি বোধ করব—'বসুধৈব কুটুম্বকম্', —'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'? এ-নীতির ভিত্তি কি?

এর সঙ্গত ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছেন আর্য ঋষিগণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন:

"...ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।...ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।" (৪।৫।৬)

—লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি—অর্থাৎ অন্তর্যামীর প্রতি—অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশতঃ সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়।

জীবপ্রেমের motive বা প্রবর্তনার এমন সন্তোষ-জনক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সনাতন হিন্দুধর্ম ব্যতীত

অন্যত্র প্রাপ্য নয়। তুমি অপরকে আত্মবৎ ভালবাসবে কেন? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে ভালবাস। আর তুমিই তো সেই আত্মা—'তত্ত্বমসি'।

সনাতন ধর্মের এই তাত্ত্বিক ভিত্তিটি আপন অপরোক্ষ উপলব্ধিতে লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃসংশয় চিত্তে ঘোষণা করলেন: "যত্র জীব তত্র শিব"। সর্বজীব যেহেতু সেই এক পরমাত্মার বিবিধ প্রকাশ, সেই হেতু জীবমাত্রেই পরস্পর আত্মার আত্মীয়। তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনের জীবপ্রেম তাই স্বতোৎসারিত, প্রয়াসসাপেক্ষ নয়।

তোতাপুরী-নির্দেশিত পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ বেদান্ত-সাধনায় মাত্র তিন দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মলীন হয়ে প্রত্যক্ষ প্রত্যয় লাভ করলেন জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্বে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—তত্ত্বে। উপলব্ধি করলেন—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—জগতে যা-কিছু আছে সমস্তই পরমেশ্বর বা আত্মা থেকে অভিন্ন, পরমাত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত।

পরবর্তী কালে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলছেন: "তাঁর (ঈশ্বরের) চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। ...এক একবার দেখি—বর্ষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে, সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে।" (কথামৃত, ৩।৪।১)

এই ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান হলো অধ্যাত্ম-জগতের সর্বোচ্চ অবস্থা। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন:

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি। (২।৭২)

—হে পার্থ, এই হলো ব্রহ্মলীন অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে জীবের আর সংসারমোহ থাকে না। মৃত্যুকালাবধি এই অবস্থায় থেকে তিনি ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষলাভ করেন।

গীতায় অন্যত্র শ্রীভগবান বলছেন, এই আত্মারাম বা আত্মানন্দ অবস্থা পরম সুখকর। এই আপ্তকাম অবস্থার অধিক আনন্দময় অবস্থা আর হতে পারে না।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ (৬।২০)

—যে-অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত সর্ববৃত্তি-শূন্য হয় এবং যে-অবস্থায় আত্মাদ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করে পরম তুষ্টি লাভ হয় (তাই যোগপদবাচ্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বললেন: এর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে। নরেন (বিবেকানন্দ) যখন সংসার-বৈরাগ্যবশতঃ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন—"আমার ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব" —তখন তিনি বললেন: "তুই তো বড় হীন-বুদ্ধি! ও অবস্থাব চেয়ে উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'" (কথামৃত, ১৩।২৩।২)

এই উচ্চতর অবস্থাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'বিজ্ঞান' অবস্থা। "ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ··ঈশ্বর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান।···জীব জগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" (কথামৃত, ৩।৬।৪)

এই 'দর্শন করা'—কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সত্তার অন্তরালে ছিল একটি জ্ঞানি-সত্তা। বিবেকানন্দ যথার্থই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

"Outwardly he was all Bhakta, but inwardly he was all Jnanin."

—বাইরে তিনি ছিলেন পরম ভক্ত, কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানী।

এই জ্ঞানি-সত্তা সদা-জাগ্রত থাকত তাঁর অন্তরের গভীরে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি নিয়ে। তাঁর ভক্ত-সত্তা তাই মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের মতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠত—"আমায় দে মা পাগল করে/কাজ নেই আমার জ্ঞান-বিচারে।" তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন—"মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহ দান করত নরেন্দ্রের মতো যুক্তিবাদী শিষ্যদের—যাচাই না করে নির্বিচারে কোন কিছু মেনে না নিতে—এমনকি তাঁর বক্তব্যকেও।

এই মনই সক্ষম করেছিল তাঁকে তাঁর কথিত 'বিজ্ঞান' অবস্থা লাভ করতে। তিনি বলছেন: "ভক্ত তিন শ্রেণীর। ...উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনিই সব হয়েছেন,—যা-কিছু দেখছি—সব তাঁর এক-একটি

রূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করত আর বলত, 'তিনিই সব হয়েছেন—তাহলে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি।'

"তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শোনা এক, দেখা এক। শুনলে ষোল.আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকি থাকে না।

...কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়,—কোশা-কুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়—তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম।" (কথামৃত, ৩।৮।১)

এরই নাম—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর-গহনে-স্থিত জ্ঞানি-সত্তা পর্যবেক্ষণ (observation), অনুমান-সিদ্ধান্তজ্ঞান (Inferential knowledge), পরীক্ষা (experiment), যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ (logical proof)—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই ধাপগুলি (stages) পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে অধ্যাত্মজগতের প্রতিটি তত্ত্বের সত্যে পৌঁছেছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল না কোন একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মমত যাকে আমরা তাঁর নামাঙ্কিত করে বলতে পারি—'রামকৃষ্ণীয় ধর্ম'—যেমন বলে থাকি বুদ্ধ, মহাবীর জিন, খ্রীস্ট প্রমুখ ধর্মাচার্যদের প্রচারিত ধর্মমতকে। তাঁর প্রচারিত ধর্মভাবনা এক হিসাবে তাই অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত জগতের উদারতম ধর্ম 'সনাতন হিন্দুধর্ম'-এর ওপর। একথা বোধ হয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-যুগ পরম্পরায় পুঞ্জীভূত "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি" থেকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন "বিচারের স্রোতঃ পথে"। এর ফলেই বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় (Parliament of Religions) ভারতের সনাতন ধর্ম লাভ করল শ্রেষ্ঠ আসন। আর এই কাজটি স্বামীজীর মাধ্যমে তিনি করলেন এমন শৈল্পিক নৈপুণ্যে, এমন সর্ব-জন-চিত্ত-আকর্ষক-রূপে, এমন স্ব-উপলব্ধির রসে অভিষিক্ত করে—যে তা এক নবচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত করল ভারত তথা পৃথিবীর মানুষকে। ভারতের শাশ্বত ধর্মমতই প্রচারিত হলো নবযুগের নবধর্মরূপে—যার বীজমন্ত্র হলো: "যত্র জীব, তত্র শিব"।

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই অনন্যসাধারণ কর্মের মূলে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-ব্যক্তিত্বের যাদু। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "আমি এক একবার ভাবি যে, আমি কী জানি যে এত লোকে আসে। বৈষ্ণবচরণ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বলত, তুমি যেসব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।" (কথামৃত, ৩।৪।১) আসল কথা হলো, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিকত্ব। বৈষ্ণবচরণ তা জানতেন।

বৈষ্ণবচরণ ছিলেন সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারে মথুরবাবু তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে উদিত হয় ইংরেজ মনীষী রাসকিনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি: "That virtue of originality that men so strive after, is not newness,...it is only genuineness."—যে মৌলিকতাগুণের জন্য মানুষ এত লালায়িত, তা আসলে অভিনবত্ব নয়,...তা হলো অকপটতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অকপটতা। স্বামীজী বলছেন দেশ-বিদেশের সর্বত্র ঘুরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একমাত্র তাঁর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণেরই 'ভাবের ঘরে চুরি' নেই। অকপটতা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্র জুড়ে তাঁর কথায়, তাঁর কাজে, তাঁর আদর্শে। এই অনন্যসাধারণ অকপটতার উৎস তাঁর অনন্যসাধারণ উপলব্ধি: যত্র জীব তত্র শিব। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই পরম ধর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপরোক্ষ উপলব্ধির অকপটতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর প্রচারিত বাণীর মর্মমূল স্পর্শ করার শক্তির রহস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভবে এমন বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল বলেই তার প্রায়োগিক বা ফলিত দিকটি আজ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন'রূপে আখ্যাত হয়ে বিশ্ব-চেতনায় এমন সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা

গোরাচাঁদ কুণ্ডু

দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে ভদ্রকালী একটি প্রাচীন গ্রাম। একদা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সপার্ষদ এসেছিলেন এই গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে। ঘটনাটির বিবরণমূলক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি[1] এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথায়[2]। কিন্তু ভদ্রকালী গ্রামে কোথায়, কার গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমন ঘটেছিল, কি ছিল সেই পরম ভাগ্যবান গৃহস্থের নাম আর কোথায়-ই বা ছিল তাঁর সেই পবিত্র গৃহাঙ্গন—উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। তাই এই ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী ও কোতরং-এর কিছু আগ্রহী ব্যক্তির উদ্যোগে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির বর্তমান নাম "শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সংঘ, ভদ্রকালী।" সৌভাগ্যের বিষয়, অনলস চেষ্টায় এবং নানা সূত্র অবলম্বনে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেবক সংঘ আকাঙ্ক্ষিত তথ্যাদি সহ আরো কিছু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। জানা গিয়েছে এই পুণ্যবান গৃহস্থের নাম ছিল সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর পবিত্র গৃহাঙ্গনের বর্তমান ঠিকানা ১৮ নম্বর নীলমণি সোম স্ট্রীট (পূর্বেকার হোল্ডিং নং ১৬), ভদ্রকালী। বিশেষজ্ঞদের বিচারে তথ্যগুলির যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা স্বীকৃত হবার পর সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিশেষ স্মারক পুস্তিকায় এগুলি নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

এই সব অধুনা আবিষ্কৃত তথ্যাদি এবং পুঁথি-বর্ণিত ঘটনাবলীর যোগাযোগ দেখে মনে হয় ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন ও ভিক্ষান্নগ্রহণ শুধু নিমন্ত্রণরক্ষার একটি সাধারণ ব্যাপার মাত্র ছিল না, পরন্তু, ঘটনাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের লোককল্যাণলীলার অপর একটি অনবদ্য অধ্যায় যার তাৎপর্য ও মাধুর্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে সকলকে আকৃষ্ট করছে।

সূর্যকান্তের ডাক নাম ছিল পটু ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন অতি সরলমতি এক দরিদ্র ব্যক্তি। ভদ্রকালীতে পাটারী পাড়ায় (অধুনা নীলমণি সোম স্ট্রীটে) গোলপাতার ছাউনিঘেরা মাটির ঘরে তিনি বাস করতেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের গৃহে পূজা-পাঠ ও কথকতা করতেন বলে উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে বা অভিজাত সমাজে তাঁর কোন সমাদর ছিল না। তাদের কাছে তিনি 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের কাছে অনাদৃত হয়েও যিনি সকলের চেয়ে উচ্চ সেই নর-দেবতাকে গৃহে এনে ভিক্ষান্ন দিয়েছিলেন তিনি। এতেই বোঝা যায় বাইরের দিক থেকে সহায়সম্বলহীন এই মানুষটি ভিতরে ভিতরে ছিলেন পরম ধনের অধিকারী এক অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর অসামান্য কীর্তি ভদ্রকালী গ্রামের ইতিহাসে এক মহা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

ইতিহাসের পশ্চাতেও আবার ইতিহাস থাকে। ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনের পশ্চাৎ-ইতিহাসটুকুও বড়ই মনোরম। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় তখন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পূজারী। তিনি শুনেছিলেন কাছেই আলমবাজারে একজন সুকণ্ঠ পাঁচালী গায়ক এসেছেন—নাম শিবু ভট্টাচার্য। সকলেই তার গানে মুগ্ধ। রামলালের ইচ্ছা হলো আলমবাজারে গিয়ে পাঁচালী গান শুনবেন। তাই ঠাকুরের কাছে এসে নিবেদন করলেন—"শুনিতে যাইব মনে ইচ্ছা অতিশয়।/ যাইবারে পারি যদি অনুমতি হয়।।"[3] অনুমতি-প্রাপ্ত রামলাল পাঁচালী শুনে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলে ঠাকুর জানতে চাইলেন কেমনতর গান হলো? কিন্তু

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি— অক্ষয়কুমার সেন (১৩৭৮), পৃঃ ৫৪২

২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (১৩৬০), পৃঃ ১৬৭

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৫৪০

রামলাল বলবেন কি ?—তাঁর কি আর কিছু মনে আছে ! সেদিন ছিল রামায়ণ গান। লঙ্কার রাজ-পুরীতে বন্দিনী সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে মহাবীর হনুমান এসেছেন অশোক কাননে। সেখানে অপরূপা কিন্তু ম্লানমুখী এক রমণীকে দেখতে পেয়ে হনুমান বুঝতে পেরেছিলেন ইনিই মা জানকী। তবু পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠ' হনুমান বৃক্ষান্তরাল থেকে রামনাম কীর্তন শুরু করলেন এবং লক্ষ্য করতে লাগলেন সীতার কি অবস্থা ঘটে। অশোক অরণ্যে সহসা রামগুণগান ধ্বনিত হওয়ায় রামময়জীবিতা সীতার যে অবস্থা হলো তার বর্ণনা শুনতে শুনতে রামলাল ভাবের জোয়ারে ভেসেছেন, ডুবেছেন আর অঝোরে শুধু কেঁদেছেন। গানের বাক্যাংশ বলতে যা, তার বিশেষ কিছুই রামলালের মনে ছিল না। তাই তিনি ঠাকুরকে তেমন কিছু শোনাতে পারলেন না। তবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এর কয়েকদিন পরে গায়ক শিবু ভট্টাচার্য স্বয়ং এলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে গান শোনাতে। ঠাকুরের আদেশে সেই রামায়ণ গান শুরু হলো ; কিন্তু রাম নাম শুনতে না শুনতেই ঠাকুরের বাহ্য চেতনা লুপ্ত হয় এবং মন সমাধিতে বিলীন হয়। বহুক্ষণ পরে গান সমাপ্ত হলে তাঁর বাহ্য চেতনা ফিরে আসে। তারপর—

> "প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীপ্রভু কন পরে।
> শুনিতে না পাইনু গীত, পুনঃ গাও ফিরে ॥
> যথা-আজ্ঞা গায়ক আরম্ভ করে গান।
> পূর্ববৎ ভাবগ্রস্ত হইলা ভগবান ॥"[৪]

এমনি করে বারবার চেষ্টা করেও ঠাকুরের গান শোনা হয়ে উঠল না। অগত্যা ঠাকুরের আদেশে রামলাল গানগুলি লিখে নিলেন। গায়ক শিবু ভট্টাচার্য কিন্তু সব দেখেশুনে বিস্ময়ে হতবাক। জীবনে এমন শ্রোতা তিনি পাননি আর এমন মিষ্টি কথাও কখনো শোনেননি। ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি ভাবতে ভাবতে চললেন—

> "উত্তর পাড়ার কাছে ভদ্রকালী গ্রামে।
> গায়ক চলিল সেথা শ্বশুরের ধামে ॥"[৫]

শিবু ভট্টাচার্যের শ্বশুরমশায় হলেন সেই সরল-মতি গৃহস্থ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য। জামাতার মুখে দক্ষিণেশ্বরে তার সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা শুনে সূর্যকান্ত ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, "শুনে নাম অবিরাম প্রাণখানি নাচে।"[৬] কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতাকে হৃদয়ে চেপে তিনি পঞ্জিকা এনে দিনক্ষণ গুণতে লাগলেন। শুদ্ধ-সত্ত্বের আধার সূর্যকান্ত বোধ হয় অনুভব করেছিলেন কোথায়, কার কাছে তিনি চলেছেন। চিরন্তনের কাছে চিরকালের জন্য এই যাত্রা। তাই বুঝি সূর্যকান্তের মনে হয়েছিল এই যাত্রার জন্য শুভদিন চাই, শুভক্ষণ চাই। অতএব,

> "পঞ্জিকা দেখিয়া করি শুভদিন স্থির,
> জামাতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির ॥"[৭]

এরপর প্রাণের আকর্ষণে সূর্যকান্তকে বারবার দক্ষিণেশ্বরে আসতে হয়েছে, কেননা "বেশি দিন অদর্শনে থাকিতে না পারে।"[৮] শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ধীরে ধীরে এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, নিজের গৃহে নিয়ে এসে তাঁকে ভিক্ষান্ন দান করার, তাঁকে "একান্ত করে পাওয়ার" 'মহাসাধ' তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে। মহাসাধ-ই বটে ! কেননা সর্ব-জনের বরণীয় এই দুর্লভ দেবতাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা এবং তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া—এই দুঃসাধ্য দুষ্পূরণীয় অভিলাষ পূর্ণ হওয়া তাঁর মতো কাঙালের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার মতো এক অবাস্তব কল্পনা—ব্রাহ্মণ যুক্তি বিচার দিয়ে একথা বুঝেছিলেন বটে কিন্তু তবু তাঁর অন্তরের কান্না কিছুতেই থামেনি।

> "মন বোঝে তো প্রাণ বোঝে না,
> ধরবে শশী হয়ে বামন।"

—এমনি ছিল সূর্যকান্তের অবস্থা। ঠাকুর কিন্তু সূর্যকান্তকে ভালো করেই চিনতেন। তাঁর অন্তরের গোপন কান্না অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না। তাই সত্য সত্যই একদিন আকাশের চাঁদ মাটিতে

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৫৪১
৫ ঐ, পৃঃ ৫৪২
৬ ঐ, পৃঃ ৫৪২
৭ ঐ, পৃঃ ৫৪২
৮ ঐ, পৃঃ ৫৪২

নেমে এসে বামনের হাতে ধরা দিলেন। "হৃদয় বুঝিয়া প্রভু করিলা স্বীকার।"[৯]

গঙ্গা পার হয়ে এসেছিলেন ভদ্রকালী গ্রামে, সূর্যকান্ত অল্পদিনে এমন আয়োজন করলেন—"ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম।"[১০] দক্ষিণেশ্বর থেকে সপার্ষদ ঠাকুরকে আনবার জন্য চারখানি বৃহৎ পানসি নৌকা সাজানো হলো। উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, কোতরং, কোন্নগরের বহু নরনারী সেদিন সমবেত হয়েছিলেন গঙ্গার তীরে। তাঁরা তোরণ সাজিয়েছিলেন, ধামা ধামা বাতাসা ছড়িয়েছিলেন আর সূর্যকান্তের গৃহাঙ্গনে একত্র হয়ে ভগবানকে বরণ করেছিলেন—তাঁর সঙ্গে নেচেছিলেন, গেয়েছিলেন এবং আনন্দে মেতেছিলেন। আবার, ভদ্রকালী গ্রামে ঠাকুর যে-বেশে এসেছিলেন, পুঁথিকার বলেছেন, সচরাচর তাঁকে বাইরে সে-বেশে দেখা যেত না। ভক্তজন-বিমোহন সে এক মধুর মূরতি—পরণে পীতাম্বর, গলায় দোদুল্যমান পুষ্পমাল্য, মুখে দেবদুর্লভ হাসি। বিত্তহীন, সামাজিক মর্যাদাহীন সূর্যকান্তের মাটির ঘর দুয়ার সেদিন "ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ-পরশে, / হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে।"[১১]

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-ইতিহাসে ভদ্রকালী গ্রামের কাহিনী আরো একটি কারণে চিরস্মরণীয়। ঘটনাটি হলো সূর্যকান্তের গৃহাঙ্গনে সমবেত নরনারী যখন ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা ঠিক সেই সময়ে সেখানে সশিষ্য উপনীত হলেন সে-যুগের এক বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী। কথামৃতের বিভিন্ন খণ্ডে একাধিক জায়গায় সামাধ্যায়ীর নামের উল্লেখ আছে। ইনি সেই তার্কিক পণ্ডিত যিনি ঈশ্বরকে নীরস আখ্যা দেওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন "যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলছে। এ লেকচারে কি হবে?"[১২]

সূর্যকান্তের গৃহপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে পণ্ডিত সামাধ্যায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবিচারে ঠাকুরকে তর্কে আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে পরাজিত করে আপনার ব্যক্তিত্বের গৌরব বর্ধন। অতএব, সেদিন গঙ্গার পশ্চিমতীরে ভদ্রকালী গ্রামে সূর্যকান্তের গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক অকল্পনীয় বিচারপর্ব—যার একপ্রান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অপরপ্রান্তে তর্কযোদ্ধা অহঙ্কারী পণ্ডিত সামাধ্যায়ী। চির-পরীক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য বহুবার বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু ভদ্রকালীতে ছাড়া আর কোথায়ও কেউ তাঁকে এমনভাবে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছেন কিনা জানি না। যাই হোক তিনি কি তর্ক করবেন! শেষ সিদ্ধান্তের প্রতিমূর্তি তো তিনি স্বয়ং। তাঁর কথা—কুম্ভ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভক্ ভক্ করে। অতএব ঠাকুরের হয়ে তর্কে এগিয়ে এলেন মহিমাচরণ চক্রবর্তী। পরাজিত হলেন মহিমাচরণ। তর্কের ধূলিজালে যখন সকলে আচ্ছন্ন, তখন কুতর্ক-ক্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে পণ্ডিতকে স্পর্শ করেন। মুহূর্তে পট পরিবর্তিত হয়। তার্কিক-শিরোমণি নির্বাক হয়ে আপন হৃদয়ে তর্কের প্রতিপাদ্য সত্যবস্তুর উপলব্ধি লাভ করেন এবং শান্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন: "একবার স্পর্শ, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি।"[১৩] মনে হয় সেদিন ভদ্রকালীতে প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে সেই অঘটনই ঘটেছিল। ভগবান সেদিন সশরীরে এসেছিলেন ভদ্রকালীতে তাঁর এক দীনভক্তের মর্যাদা রক্ষা করে তাঁকে ভক্তির অমৃতফল দান করতে আর সেই সঙ্গে তর্কযুদ্ধবিশারদ শুষ্ক পণ্ডিতের প্রাণে সরস ভক্তি-লভ্য সত্যের অনুভূতি জাগিয়ে দিতে। সেদিন ভদ্রকালীগ্রামে সমবেত অসংখ্য নরনারী তাঁর এই করুণারসমণ্ডিত লীলা দর্শন করে ধন্য হয়েছিল।

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৫৪২

১০ ঐ, পৃঃ ৫৪২

১১ ঐ, পৃঃ ৫৪৪

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৭।৫

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড (১ম সং), পৃঃ ৪০১

সীমার মাঝে অসীম তুমি

শেখ সদরউদ্দীন

সীমার মাঝে অসীম তুমি, রূপ ধরেছ সবখানে।
মিশে আছ পথের ধূলায়, ব্যাপ্ত বিশাল আসমানে॥

আছ তুমি শস্যক্ষেতে, সজীব সবুজ প্রান্তরে,
আছ ধূসর উষর ভূমে, তুষার-গিরির অন্তরে।
মানুষ-হাতি-পিপীলিকা, আছ তুমি সব প্রাণে।
সীমার মাঝে অসীম তুমি, রূপ ধরেছ সবখানে॥

তোমার গানের বাণী নিয়ে যায় ছুটে যায় ঝর্ণা ওই—
নদ-নদী আর সাগর দেখে তোমার রূপে অবাক হই।

তোমার রূপে-রসে-গন্ধে বনে যত ফুল ফোটে—
প্রজাপতির পাখনা নাচে, গেয়ে অলি মৌ লোটে।
তোমার গানে কণ্ঠ ভরে আকুল প্রাণের আনচানে,
সীমার মাঝে অসীম তুমি, রূপ ধরেছ সবখানে॥

প্রভু মোর

রতনকুমার নাথ

অজ্ঞান তমিস্রা মাঝে
জেবলে দাও জ্ঞানাঞ্জন-শিখা,
উন্মুক্ত হোক নেত্র
বিদূরিয়া মায়া-মরীচিকা।

নিদ্রিত চৈতন্য মোর
স্পর্শে তব উঠুক উদ্ভাসি,
বাজুক এ ক্ষুদ্র বুকে
সীমাহীন অনন্তের বাঁশী।

নমি তোমা প্রভু মোর,
অধমেরে কাছে লও টানি—
তোমার-ই চরণে রাখি
জীবনের বেণুবীণাখানি।

একটি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ

মণিকা চক্রবর্তী

আজকের এই সন্ধ্যাটিকে
বড় ভাল লাগছে।
সৃষ্টির পর
পৃথিবীতে এটি কততম সন্ধ্যা কে জানে?

সন্ধ্যা হতেই বিদ্যুৎ হয়েছে বিকল,
মেঘমুক্ত আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে উঠেছে মোহময়।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের মন্দিরের চূড়ো।
মঠভূমি জুড়ে এক অপার্থিব স্তব্ধতা।
ঠাকুরকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।
গর্ভমন্দির ছেয়ে আছে
স্নিগ্ধ দীপের আলোয়,
নাটমন্দিরে আবছা অন্ধকার।

দিনারম্ভের খরতাপ দিনান্তে বিদায় নিচ্ছে
পৃথিবী থেকে,

ঠিক যেমন করে মানুষ বিদায় নেয়
জীবনের যবনিকা টেনে।

গঙ্গার শীতল হাওয়ায় ভরে যাচ্ছে মন,
উন্মাদিনী জোৎস্নার আলো
গঙ্গার বুক চিরে চলে যাচ্ছে অতলে।

হঠাৎ একটা লক্ষ্মীপেঁচা
ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল—
আলোর জোয়ারে গা ভাসিয়ে।
ওপার থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি।

হয়তো পাঠবাড়ীতে অথবা কোন মন্দিরে
হয়তো বা কোন বৈষ্ণব আখড়ায়
রাধাগোবিন্দের পূজো হচ্ছে!

মন্দির ছুঁয়ে আসা জ্যোৎস্না
তির্যগ্‌ভাবে পড়েছে গঙ্গায়
চঞ্চলা গঙ্গার সঙ্গী হয়েছে সেও।

ডাকা

শান্তশীল দাশ

তোমার মতো ব্যাকুল হয়ে
ডাকতে আমি পারি না-যে,
যখন তোমায় ডাকতে বসি,
ডাকে আমায় নানান কাজে।
সেই কাজেতে ভুলেই থাকি,
সময় কোথায় তোমায় ডাকি,
কানে শুনি একটি করে
মহাকালের ঘণ্টা বাজে।

আজে-বাজে কাজের বাঁধন
ছিঁড়ব, আমার শক্তি-যে নাই,
একলা বসে ডাকব তোমায়,
সে অবসর কোথায় যে পাই।
কাজের বাঁধন দাও, ছিঁড়ে দাও,
তোমার পানে নাও টেনে নাও ;
ডাকি আমি তোমায় শুধু
মূর্তিখানি বুকের মাঝে।

ভজ মন

স্বামী ভূতাত্মানন্দ

একমাত্র যিনি সার সর্বজীবের মূলাধার
নিশিদিন নাম তাঁর কেন মন জপ না।
ভজ মন রামকৃষ্ণ নাম, ছাড় অনিত্য বাসনা।
তাঁরে আরাধিলে যাবে বিষম ভবযাতনা ॥

বিষয় বিষম বিষে মত্ত হয়ে আছ বসে
কি দশা যে হবে শেষে, নিমেষেও তা ভাব না।
দারা সুত ধন জন যা তুমি ভাব আপন
সকলি জানিবে মন স্বপ্নসম কল্পনা।

ভজ মন রামকৃষ্ণ নাম, ছাড় অনিত্য বাসনা ॥

তোমার তুলনা শুধু তুমি

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

তুমি নাকি 'মূর্খোত্তম'!
তুমি নাকি নিরক্ষর-প্রায়!
তোমার প্রজ্ঞার কাছে
তবে কেন ম্লান হয়ে যায়
শত প্রজ্ঞা-চন্দ্র-সূর্য ?

কেন তারা বিনম্র শ্রদ্ধায়
তোমারই চরণতলে
নত হয়ে, ধন্য হয়ে যায় ?

'বেদান্ত-বেদের কথা
আর বাবা সবই ওঁর মুখে!'
ধন্য দাসী! মূর্খ অতি!
সেই ঠিক চিনেছে তোমাকে!

তুমি নাকি 'জেলে ডিঙি'!
তবে কেন বিদ্যার সাগর
হার মানে তব কাছে,
নত হয় গৌরী-শশধর!

ডাক্তার সরকার আর
অবিশ্বাসী ইয়ং বেঙ্গল,
বিজয়-প্রতাপ সহ
নত হয় বিশ্বখ্যাত কেশব প্রবল

মোক্ষমূলর, রোলাঁ,
ইশারউড, আরও কত নামী!
প্রণমে তোমার পদে,
তোমার তুলনা শুধু তুমি!

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন

সুধীরকুমার নন্দী

স্বামী বিবেকানন্দের কথা দিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা করি।

"Brother, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Sri Ramakrishna Paramhansa. If there has been anything, achieved by me, by thoughts or by words or by deeds, if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world, I lay no claim to it, it was His.

ঠাকুর হলেন স্বামীজীর শয়নে-স্বপনের ধ্যান-বস্তু, তাঁর প্রাণের ঠাকুর ; তাঁর সর্বকিছু ঠাকুরের ; একাধারে তিনি স্বামীজীর আদর্শ-পুরুষ, নিত্য ধ্যেয় ভগবান। স্বামীজী অকপটে বললেন যে, তিনি যা-কিছু সিদ্ধিলাভ করেছেন তা ঠাকুরের দয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে। মননে ও ধ্যানে, কর্মে ও কৌশলে তাঁর সবটুকু সিদ্ধির উৎস হলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের জীবনেই বিধৃত হয়েছিল সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সম্ভাবনা। সেটুকু স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর যোগ-সিদ্ধ দৃষ্টিতে। তাই তাঁর কাছে ঠাকুরের জীবন হলো সহজপাঠ এবং চরম পাঠ। কিন্তু সমকালীন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের কাছে ঠাকুর ছিলেন দুর্বোধ্য। তাই তাঁর সমালোচনাও কম হয়নি। একদিকে যেমন সাধুসন্তদের চোখে তিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অপাপবিদ্ধ দেবমূর্তি ; অন্যদিকে আবার জড়বাদী ভ্রান্ত যুক্তিসর্বস্ব পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা তাঁকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। পরিপূর্ণ ত্যাগই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ব্রত এবং আত্যন্তিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ এই আত্যন্তিক ত্যাগের কথা বললেন ঃ

"এমন একান্ত করে চাওয়া সেও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।"

চাওয়া এবং ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে যে অপূর্ব ভারসাম্য রয়েছে যা জীবনের পরিমাপ যন্ত্রটিকে যথাযথ সন্নিবিষ্ট করে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনে। ঠাকুরের জীবনদর্শনে আমরা এই সূত্রচতুষ্টয়ের আবিষ্কার করেছি ঃ

(এক) যত মত তত পথের সূত্র,
(দুই) শিবজ্ঞানে জীবসেবার সূত্র,
(তিন) জীবনকে সামগ্রিকভাবে ধর্মে রূপান্তরিত করার সূত্র,
(চার) অপরের অধিকারকে সবিনয়ে এবং শ্রদ্ধায় স্বীকার করার সূত্র।

লোককথায় আমরা শুনেছি লঘুচিত্ত ব্যক্তিদের আত্মপর জ্ঞানের কথা আর উদারচরিত ব্যক্তিদের সমগ্র বসুধাকে কুটুম্বজ্ঞানে আলিঙ্গন করার কথা। এই যে বোধ, এই বোধটুকুই ব্যক্তিমানসকে সমগ্র মানবসমাজের অঙ্গীভূত করে ব্যষ্টি-সমষ্টির যোগটুকু ঘটায় ; এ হলো অধ্যাত্ম মানব-ধর্মের সর্বজনীন রূপ। ঠাকুর-কথিত এই ধর্মের প্রয়োগ-রূপটুকু আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি যখন স্বামী বিবেকানন্দ তীরথ রামের দেওয়া ঘড়িটি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, এটি তিনি ব্যবহার করবেন তীরথ রামের কাছে রেখে দিয়েই, অর্থাৎ তীর্থ বা তীরথ রাম (উত্তরকালে স্বামী রামতীর্থরূপে পরিচিত) যে বিবেকানন্দ থেকে অদ্বৈত ভাবনার দিক থেকে ভিন্ন নন, এই সত্যটুকু তিনি প্রদর্শন করলেন ঃ এ হলো ব্যষ্টি-সমষ্টির যোগ ; বস্তুবৈভব কেমন করে অধ্যাত্ম-চরিত্র গ্রহণ করতে পারে, বিষয়-সম্পদ যাকে ঘিরে হানাহানির অন্ত নেই তা কেমন করে মৈত্রী এবং কল্যাণের সেতু হতে পারে তার নিদর্শন আছে এই কাহিনীটিতে। ব্যষ্টি বা ব্যক্তি কেমন করে ধীরে ধীরে ব্যক্তি-সংস্কার এবং ব্যক্তি-স্বার্থের সীমানা পার হয়ে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে তারই সন্ধান আমরা এই ঘটনাতে পাই। ব্যষ্টি যখন সমষ্টি হয়ে যায়, তখন ব্যক্তির অভাববোধ, তার দুঃখ বেদনা সবই একটা সামগ্রিক রূপ

নেয় ; তখন আর বেদনায় ব্যথা থাকে না, তা উপভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। এই রকম একটা অবস্থাকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে 'সাধারণীকরণ' বলা হয়েছে।

ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার হয়েছে। শিষ্যদের অনুরোধে তিনি ভবতারিণীর কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য অনুরোধ করলেন, মা ঠাকুরকে ভর্ৎসনা করলেন। ভর্ৎসিত ঠাকুর এসে শিষ্যদের বললেন, "তোদের কথা শুনে মাকে গিয়ে বললেম, 'মা আমায় ভাল করে দাও'। মা তোদের দেখিয়ে বললেন, 'তুই এতগুলো মুখে খাচ্ছিস, আবার নিজের মুখে খেতে চাইছিস, তোর লজ্জা হয় না?" আবার সেই ব্যষ্টি-সমষ্টির তত্ত্ব, কেমন করে ব্যষ্টিস্বার্থ ... র্থে পরিণত হয়? সেই কথাই বলি। ঠাকুরের ব্যক্তিভাবনা কিন্তু খুবই উদগ্র ছিল, তার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। এই ব্যক্তিভাবনার তাড়নায় ঠাকুর অশুচি নারীর হাতে অন্ন গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু সমষ্টিভাবনায় ভাবিত সারদা মা ঠাকুরকে বলেছিলেন, "মা বলে কেউ আমার কাছে যদি এসে দাঁড়ায়, কিছু চায়, আমি না বলতে পারবো না।" আশ্চর্য কথা, মাতৃরূপিণী শ্রীমা সমষ্টিভাবনায় যে-সত্যকে সহজ সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন, ঠাকুর তা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। শ্রীমাকে পরীক্ষা করার জন্য কিনা কে জানে! কারণ জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ,অবিমিশ্র প্রেমে অপূর্ণ জীবনকে আপনার পরিপূর্ণতার আলোকে গ্রহণ করার দৃষ্টি যে তাঁর ছিল সে প্রমাণ এই ঘটনার আগে বহু ঘটনাতেই দেখা গিয়েছে।

ভোগকে তিনি জীবনের কেন্দ্র-সত্য বলে গ্রহণ করেননি, ভর্ৎসনা করেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকেও কেবল 'আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন'—জীবসুলভ এই চতুর্বিধ প্রাকৃত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত বলে। তাঁর চোখে বস্তুজগৎ মৌল সত্য নয়, বাস্তবাতীত জগতই পরাসত্য তাঁর আছে। চেতনার প্রতিরোধে, সে-সত্যটি সবসময় আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় না ; কাম জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা নয়। চতুর্বর্গের অন্যতম হলো কামনা। তিনি কাম-কাঞ্চনকে ত্যাগ করতে বললেও জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করেছেন। বাস্তব জীবন অপূর্ব উপমা দুর্লভ সৌন্দর্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠত তার কণ্ঠে, অভিব্যক্ত হতেন নৃত্যগীতে, অভিজ্ঞতার রসভাণ্ডার ছড়িয়ে পড়তো উচ্ছল আনন্দে। গভীরতম জ্ঞানকে ধারণ করেও শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বকালের সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক মানুষ, সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। তাঁর কাছে ধর্ম, দেশ ও কালের কোন বেড়া ছিল না। জ্ঞানের ও কর্মের বহুদিনের কলহ তিনি নিরসন করলেন।

সর্বধর্মস্বরূপিণে বলে স্বামীজী তাঁর স্বতঃপ্রণোদিত পূজামন্ত্রে ঠাকুরের যে দর্শন-ভঙ্গির কথা বললেন, যে-সত্য ঠাকুরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চল ঐক্যের কথা ঘোষণা করল, তার তুলনা কোথায়? আমাদের বারবার মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ আবির্ভাব (দার্শনিক হেগেলের ভাষায় 'More Perfect Absolute'-এর) ঘটেছে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত অপটু দেহটাকে নিয়ে যখন রামকৃষ্ণের শিষ্যরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, চিকিৎসক ডাঃ সরকারেরও দুর্ভাবনার অন্ত নেই, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সব্বাইকে দেখাচ্ছে এ দেহ, মিছে এত কাণ্ড চলেছে তবুও শুদ্ধ (আমি) ঠিক আছি। দেখছি এর ভিতর থেকেই সবকিছু বেরিয়ে রিফাইন্ড হয়ে আবার এর ভিতর এসেছে।" হেগেল যেমন ভেবেছিলেন, 'The Other'-এর সঙ্গে সংঘাত এবং সমন্বয়ে Absolute বা পরব্রহ্ম পূর্ণতর রূপ পায়, ঠাকুরও তেমনি বললেন যে, চিৎসত্তা অচিতের মধ্যে গিয়েই তার মধ্যে লীলা করে আবার যখন স্বরূপে ফিরে আসে তখন সে উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দেহের মধ্য থেকে চিৎসত্তার বহির্গমন ও দেহের খোলের মধ্যে তার পুনরাগমন—এই যে যাওয়া-আসার লীলাটুকু এই লীলার ফলেই ব্রহ্ম উজ্জ্বলতর প্রভায় দীপ্যমান হন।

'One World'-তত্ত্বের প্রবক্তা মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ওয়েন্ডেল উইলকি (Wendel Willkie) কথিত বিশ্বজগতের ধারণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা তত্ত্বের মাধ্যমেই যে সত্য হয়ে

উঠতে পারে, একথা বস্তুতন্ত্রবাদীদের বুঝতে হবে। জীবের মধ্যে শিবের প্রতিষ্ঠা অনুভব করার মধ্যে যে অধ্যাত্ম ঐক্য সাধনায় আমরা যত্নবান হতে পারি তার কথাই ঠাকুর বললেন। জ্ঞানবাদী এবং কর্মবাদীর সুচির-সঞ্চিত কলহ ঠাকুরের তত্ত্বে নিরসিত হলো। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের এটি হলো মূল শিক্ষা। সেবার শেষ কথা হলো ত্যাগ। শ্রীমা ঠাকুরের মধ্যে এই আত্যন্তিক ত্যাগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আমরা জানি।

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য" প্রণাম মন্ত্রে স্বামীজী ঠাকুরকে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রণাম জানিয়েছেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বললেনঃ জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী অনুভব করবেন, 'ব্রহ্মাস্মি'—আমার জীবসত্তা হলো ব্রহ্মসত্তা, আর বিজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিজ্ঞানী অনুভব করেন "সর্বং খলিবদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ শুধু তিনি নয়, বিশ্বসংসারে সকল জীব এবং জগৎ সবই ব্রহ্মস্বরূপ ; জীবন্মুক্ত মহামানবকেই তাই জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানী এই উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। বেদান্তের 'বাধসমাধি' ও যোগশাস্ত্রের 'লয়সমাধি' এই দুয়ের মধ্যেকার সূক্ষ্ম বিভেদটুকু ঠাকুরের অনুভূতিতে ধরা পড়ল। তিনি সহজ করে বললেনঃ যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেন বা করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন জীবজগৎ তিনি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) হয়েছেন। ঠাকুরের মতে সবিকল্প সমাধিতে সাধকের মধ্যে থাকে অহং (অহং বোধ বা অভিমান বীজাকারে) কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁর আমি—অস্মিতার কিছুই থাকে না। এই আমি-অভিমান সবিকল্প সমাধিতে থাকে বলে সামগ্রিক জ্ঞান বা অনুভূতি, জীবজগৎ সব এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ, এই জ্ঞান হয় না। নির্বিকল্প সমাধিতে আমি-রূপ খাদ না থাকার জন্য সাধক দেখেন জীবজগৎ সব ব্রহ্মস্বরূপ—সর্বং খলিবদং ব্রহ্ম, জ্ঞানকে বা ব্যষ্টি ব্রহ্মানুভূতিকে তিনি বলেছেন সবিকল্প সমাধি স্তর এবং সমষ্টি বা সামান্য বা সামগ্রিক অনুভূতিকে তিনি বলেছেন নির্বিকল্প সমাধি স্তর—যেখানে জীবজগৎ ও সাধকের আপন সত্তা সবই একাকার। এটি বিজ্ঞানী স্তর, এর পূর্বের অবস্থা জ্ঞানীর।

এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে বললেন ঠাকুরঃ "নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন—এর নাম জ্ঞান। বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান।" এই যে নানা জ্ঞানের কথা বললাম, এ হলো বিশ্ব সংসারে যাবতীয় বিষয় ও বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এই বাস্তব জ্ঞান অনেক এবং অসংখ্য। এই নানা জ্ঞানে মনের চঞ্চল রূপ বৃত্তিও অনেক সুতরাং মন সর্বদাই চঞ্চল থাকে, স্থির হয় না। এই নানা বিষয়ে বৃত্তিযুক্ত জ্ঞানের নামই অজ্ঞান বা অসংস্কৃত বা অসৎ জ্ঞান ; আর ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান হলো সৎজ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞানে ঈশ্বর যে চৈতন্যরূপেই বিশ্বের সর্বত্র ও সকল বস্তুতে অবস্থিত, এই বোধ বা বুদ্ধি হয়, তখন তা প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ জ্ঞানরূপে অনুভূত হয় না। জ্ঞানীর যথার্থ উপলব্ধি ও অনুভূতি হয় বিজ্ঞানে। এইজন্য বিজ্ঞানের অপর নাম বিশেষজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়েছেনঃ সর্বভূত ঈশ্বর (চৈতন্যরূপে) আছেন, এই বোধশক্তিরূপ অভিজ্ঞতার নাম জ্ঞান, কিন্তু ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণরূপে জানার, বিশেষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাঁতে (ঈশ্বরে) আত্মীয়বোধ বা (নিজের সত্তারূপে) জ্ঞান এরই নাম বিজ্ঞান। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেনঃ দুধ সাদা দেখে যে দুধের বোধ হয় তার নাম জ্ঞান ; আর দুধ খেয়ে তার স্বাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার নাম বিজ্ঞান। কাঠে আগুন আছে, এ অগ্নিতত্ত্ব—এর নাম জ্ঞান ; আর সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া বিজ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পার্থক্য আছে। কেননা একটা কেবল দেখার ও জানার অভিজ্ঞতা এবং অন্যটা উপলব্ধি ও সত্যিকারের তত্ত্বের অভিজ্ঞতারূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ঠাকুর এ প্রসঙ্গে জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞানকাঁটা উৎপাটনের উদাহরণ দিয়েছেন, তারপর উভয়কেই বিসর্জন—এইটি বিজ্ঞানীর অবস্থা। এই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে ঈশ-

উপনিষদের প্রথম মন্ত্রেঃ

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

ঠাকুর ভিন্ন প্রসঙ্গে ছাদে ওঠা ও তার থেকে নেমে আসার উদাহরণ দিয়ে দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায় বলিঃ ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী বা অবতার-পুরুষেরা লোকসমাজে নেমে আসেন পূর্ণজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য। অবতার সাধারণ জ্ঞানের জগতে নেমে এসে দেখেন জীবজগৎ সমস্তই এক রসরূপে ব্রহ্মসমুদ্রে ভাসমান। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় এটি বিজ্ঞানীর অবস্থা। এই অবস্থাতে 'রসো বৈ সঃ' তত্ত্বের আস্বাদন ঘটে।

জীবনে কর্মের মূল্য নিরতিশয়, ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বললেনঃ সংসারে আসা আমাদের কতকগুলি কর্ম করার জন্য। কর্ম অসংখ্য, খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বরচিন্তা পর্যন্ত সমস্তই কর্ম। মনের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়রা সচল হয়, এটিও কর্ম। আবার মনের ইঙ্গিতে জীবনে সকল কিছু প্রচেষ্টা হয়, সেগুলিও কর্ম। কিন্তু কোন কর্ম শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ এবং কোন কর্ম অনিষ্টকর ও অকল্যাণকর, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র ও জ্ঞানী মনীষীরা বলেন, যে-কর্মে জীবন সিদ্ধিরূপে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়, জীবনের প্রসন্নতায় আশীর্বাদ লাভ হয়, সেই কর্মই সার্থক, শ্রেয়, কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ। আর যে-কর্মে জীবনে দুঃখকষ্টরূপ অভিশাপ আসে ও বিচিত্র বন্ধনের জাল বিভীষিকা সৃষ্টি করে সেই কর্ম অনিষ্টকর।

আমাদের মনে হয় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঠাকুর আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে, জীবনে যথার্থ সুখশান্তি লাভ তথা চরম ও পরম লাভ ঈশ্বর-দর্শন। তাহলে সংসার বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে। সুতরাং সেইরূপ কর্ম করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। নিষ্কাম কর্মের কথার অর্থ কর্ম করব, কিন্তু ফলে আসক্তি থাকবে না। সংসারে নিষ্কাম কর্ম অবশ্যই করা যায়। মানুষ কর্ম করে ফললাভের জন্য। যে-কর্মে ফলের আশা নেই ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, তেমন কর্ম মানুষ করে না। ঠাকুর আরও বললেন যে, মানুষ তো একরকমের নয়। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ বোধে দু-রকম। সাধারণ মানুষ সংসারে কর্ম করে প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রেরণায় ফল পাবার জন্য, কিন্তু অসাধারণ মানুষ কর্ম করে ঈশ্বরের পূজা ও উপাসনার ভাব নিয়ে। সাধারণ মানুষ সংসারী ও স্বার্থলোভী, কিন্তু অসাধারণ নিঃস্বার্থবান মানুষ নিস্পৃহ হয়ে কর্ম করে। তারা সংসারে থেকেও অসংসারী। মোট কথা 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব দুটি নিয়ে, আবার ছেড়েও কর্ম করে স্বার্থলোভী ও স্বার্থত্যাগী দু-রকম মানুষ। দু-রকম হয় ভাবের জন্য ও কর্মের জন্য। 'আমি' ও 'আমার' চিন্তাই স্বার্থ সৃষ্টি করে, আর 'তুমি' ও 'তোমার' চিন্তা নিঃস্বার্থভাব সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেনঃ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। এর অর্থ হলো কর্মের সংসারে কর্মের জন্য মানুষের আসা ; কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য বলতেনঃ 'নাহং নাহং, তুহু তুহু'—আমি নই, বা বিশ্বসংসারে আমার কিছুই নয়, হে ঈশ্বর সকলই তোমার। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি গান উল্লেখ করতে পারিঃ

"আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে নেব তখন তারা আমার হবে।"

সাধক কমলাকান্ত ঐ 'তুমি'-তত্ত্বকে তুলে ধরলেনঃ

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও উদাহরণ দিলেনঃ "যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার। বাগান যদি কেউ দেখতে আসে তো সে বলে, এ বাগানটি

আমাদের, এ পুকুর আমাদের পুকুর।" কিন্তু কোন দোষ দেখে যদি বাবু সরকারকে ছাড়িয়ে দেয় তবে তার 'আমার' সিন্দুকটা নিয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না। বরং দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা বাবুই পাঠিয়ে দেয়। কথা হলো এই যে, বাবু যদি সরকারকে ছাড়িয়ে দেন, তবে সরকার মনে মনে বেশ জানেন যে এতদিন যে "এ বাগানটি আমাদের", "এ পুকুরটি আমাদের" বলেছিলেন, আসলে সেই বাগান বা পুকুরের মালিক তিনি নন, বাবুই। তেমনি মানুষের মধ্যে যখন বিবেক-বুদ্ধির প্রকাশ হয়, তখন সে বোঝে যে, সংসারে কোন জিনিসই তার নিজের নয়, কেননা নিজের হলে মৃত্যুর পরও ঐ সকল (ঐহিক) তার সংগে যেত, কিন্তু মৃত্যুর পর নিজের বলে তার কিছুই থাকে না বা সংগে যায় না। এইজন্যই ঠাকুর বলতেন, 'মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। কেননা মৃত্যুকে মনে রাখলে বিচারী মানুষ কখনো চিন্তা করে না যে, সংসারে সকল বস্তু তার নিজের, বরং চিন্তা করে যে, যতদিন পৃথিবীতে জীবন, ততদিনই সকল জিনিস তার, কিন্তু মৃত্যুর পর পরলোকে কিছুই তার নয়। সংসার বিদেশ বা পরদেশ ; একমাত্র আপন বা নিজের দেশ হলো আত্মার অমৃতময় সত্তা, বিবেকী ও বিচারশীল মানুষ সর্বদাই চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় গীতার বাণী :

> "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
> অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"
> (৩।২৭)

প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তম, এই গুণ তিনটি মানুষকে সকল কর্ম করায়, নিজের স্বার্থের জন্য মানুষকে কর্ম করায় 'অহং' এই অভিমান বা অহঙ্কার 'আমি' 'আমি' চিন্তার জন্য। জ্ঞানী বা বিবেকী মানুষ চিন্তা করে 'গুণাগুণেষু বর্তন্তে'—ইন্দ্রিয়-গুলি সর্বদাই গুণতিনটির প্রভাবে সচল হয়। আমি বা আমার রূপ কর্তৃত্বাভিমান প্রকৃতির গুণের জন্য সৃষ্টি হয়। এজন্য অধ্যাত্ম সাধনায় মানুষকে গুণত্রয়ের অতীত হতে হয়। ঈশ্বর-দর্শন হলে বা আত্মজ্ঞানের আশীর্বাদ লাভ হলে গুণের প্রভাব বিলীন হয় এবং তখনি শান্তি ও পরম নির্বাণ।

ঠাকুরের এবম্বিধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নির্বাক ও নিস্তব্ধ হয়ে ঠাকুরের শান্ত সমাহিত ভাবের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে লব্ধ নিখুঁত জ্ঞানের সাহায্যে বদ্ধজীব সম্বন্ধে যে-ধারণার কথা বলে গেছেন তা এই প্রসংগে প্রণিধানযোগ্য। ঠাকুর বললেন : "বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে হাত-পা বাঁধা। তারা মনে করে ঐ কামিনী-কাঞ্চনেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে ?' আবার এমন মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও। এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে।" এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আরও বললেন, কামের আকর্ষণ হয়তো বয়সের সংগে আপনিই কমে যায়। কিন্তু কাঞ্চনের নেশা আমৃত্যু।

সর্বভূতে নারায়ণ ও ঈশ্বরের প্রকাশ প্রসংগে যখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও মাস্টার মশায় নিগূঢ় আলোচনায় ব্যাপৃত, ঠাকুর তখন ডাঃ সরকারকে বললেন, "কোন কোন জিনিসে ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ। আপনাকে তো বলেছি যে সূর্যের রশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আর এক রকম প্রতিফলিত হয়। আর্শিতে সূর্যের কিছু বেশি প্রকাশ। এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি ও এরা (এই সাধারণ ভক্তরা) কি সমান ? প্রহ্লাদের মন সব-সময় তাঁতে (শ্রীকৃষ্ণে) সমর্পিত হয়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তাবিত সূর্যালোক প্রতিফলন সূত্রের উপমাটিকে গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি যে, সূর্যের আলো যেমন বিচিত্রভাবে বিচিত্র বিষয়ের উপর পড়ে তাকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি আত্মস্বরূপের প্রকাশ সকল মানুষের মধ্যেই (অন্তঃকরণে) ঘটে। তাছাড়া শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীর মধ্যেই, এমন-কি অচেতন পদার্থের মধ্যেও আত্মার তথা ঈশ্বরের প্রকাশ

থাকেই। তবে সকল মানুষ সংসারে সমান হয় না। কেউ সমাজে অসাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে, আবার কেউ বিশেষ বুদ্ধিমান বা বিচারশীল ও ধর্মপ্রাণ। আবার কেউ ধর্মসাধনা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে আত্মস্বরূপকে জানার (উপলব্ধি) জন্য সচেষ্ট হয়। সুতরাং মানুষ হলেও সকল মানুষের প্রকৃতি, চিন্তা ও ব্যবহার এক রকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন। তাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষদের মধ্যেও তাঁর (ঈশ্বরের বা আত্মস্বরূপের) প্রকাশ বেশি ঘটে বিভিন্ন অনুপাতে। এছাড়া মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ ও আত্মজ্ঞানলাভের পথে একমাত্র উপযোগী হলেও মনুষ্যজন্মের মধ্যে স্তরভেদ আছে। মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। এরই মধ্যে আত্মার চরম বিকাশ এজন্য যে, মনুষ্যজন্মে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থাকে। এই শুদ্ধ অন্তঃ-করণেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ স্পষ্ট হয় এবং সহজেই মানুষ দুরূহ আত্মতত্ত্বের সমাধান করতে পারে। এই কারণেই সাধনভজনশীল ও বিচার-শীল মানুষই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ঠাকুর আরও বললেন, সাধনভজনশীল তথা বিচারশীল মানুষ ছাড়াও প্রয়োজন আছে ঈশ্বর কিংবা আত্মজ্ঞানানুভূতি অনুরাগী মন তথা অন্তঃকরণের মানুষের। আত্মজ্ঞানোন্মুখী চিত্তযুক্ত মানুষ বা মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। আমরা ঠাকুরের এই আত্মতত্ত্বের কথা-প্রসঙ্গে গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি:

> "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
> যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"
> (৭।৩)

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথার তাৎপর্য এই যে, সংসারের উদ্দেশ্য একেবারেই অযথার্থ ও বৃথা নয়। কেননা সংসারে পরম চৈতন্যরূপে ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর আছেন বিশ্বের উপাদান বিচিত্র বস্তুর মধ্যে। কাউকে ছেড়ে বা অস্বীকার করে তিনি নেই—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং।" সুতরাং সংসারের জ্ঞানবিচারকে বাদ দিয়ে কেবলই অজ্ঞানের (স্বার্থের) নেশায় ভোগচিন্তাকে নিয়ে মানুষের বাস করা কঠিন এবং অন্যায়। ঈশ্বর সকলকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন, সৎ ও অসতের জ্ঞানের সঙ্গে বিবেক দিয়েছেন। এই বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়; তবেই সংসারের সার ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানও উপলব্ধি করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশ্নটি তাঁর নিজের কথাতেই বলি: "সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া?" ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট জগতের ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার তত্ত্বটি জানার ও বোঝার জন্য তিনি সকলকে 'আন্তরিক' হতে বলেছেন। "মন মুখে এক হওয়া", আন্তরিক অর্থে মন ও মুখ এক করা। মুখে এক রকম ও মনে অন্যরকম—এরকম নয়। ইংরেজীতে যাকে 'হিপোক্রেসী' বলে—এ কিন্তু তা নয়। ঠাকুর নির্দেশ দিলেন: তাই মন ও মুখ এক করে নির্জন স্থানে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়—বনে, মনে ও কোণে। এই এক চিন্তার নামই হলো ধ্যান। ধ্যানে মনের সকল চিন্তাকে দূর করে একটিমাত্র বিষয় চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ ধ্যান হলো একমুখী চিন্তা। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার নাম ধ্যান। ধ্যান পাকা হলেই সমাধি। সমাধিতে ঈশ্বরের সত্তার ও মাধুর্যের অনুভব হয়। তখনি বোঝা যায়, 'জলে জল' অথবা জলে জলে একাকার কাকে বলে? এটি হলো নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায় অনুভব করা যায় একমাত্র সর্বগত ও চৈতন্য ব্রহ্মসত্তার। এই অনু-ভবের মধ্যেই সংগুপ্ত থাকে অদ্বৈতবাদের বাণী। শঙ্করাচার্যের নেতিবাদ এই অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বমহিমায়। স্বামীজীর প্র্যাক-টিক্যাল বেদান্ত সেবা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে এই অদ্বৈত চৈতন্যে মানুষকে নিয়ে যায়। এই অদ্বৈত-বাদের সাধনা সাধকের মনে প্রেরণা যুগিয়েছে সেই সুদূর অতীতে ঋগ্বেদ সংহিতার কাল থেকে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে:

> "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স
> সুপর্ণো গরুত্মান।
> একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং
> মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (১।১৬৪।৪৬)

ঠাকুরের শিক্ষা, তাই বলছি, সনাতন ভারতীয় ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন। ঠাকুর সর্বদর্শন সমন্বয়ের এক জীবন্ত বিগ্রহ।

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঙলা চলচ্চিত্র

নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৮৪ খৃীস্টাব্দ। স্টারে অভিনীত হচ্ছে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা নাটক। চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শনে সমস্ত বাংলাদেশ হরিনামে মাতোয়ারা। এমত সময় ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ শ্রীরামকৃষ্ণের গাড়ি বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের সামনে এসে থামল। সঙ্গে আছেন মাস্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্যে ও আরও দু-একজন ভক্ত। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে এসে, তাঁকে সাদরে উপরে নিয়ে গেলেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের বক্সে বসান হলো। ঠাকুরের পাশে মাস্টার বসলেন। পিছনে বসলেন বাবুরাম ও আরও দু-একজন ভক্ত। ঠাকুরকে হাওয়া করবার জন্যে গিরিশচন্দ্র বেয়ারা নিযুক্ত করে গেলেন। ঠাকুর নাট্যালয় দেখে বালকের ন্যায় আনন্দিত হলেন। তিনি মাস্টারকে সহাস্যে বললেনঃ "বাঃ, এখানে বেশ! এসে বেশ হলো! অনেক লোক এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।"

অবশেষে অভিনয় শেষ হলো। ঠাকুর গাড়িতে উঠছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কেমন দেখলেন?" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেনঃ "আসল নকল এক দেখলাম।"

স্টার থিয়েটারে আরেক দিন ঠাকুর এলেন বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করতে। সঙ্গে আছেন নরেন, মাস্টার প্রভৃতি।

এইভাবেই একদা শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল বাংলার রঙ্গমঞ্চ, ধন্য হয়েছিল বাংলার অভিনয়-জগৎ। তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন নটী বিনোদিনী। ঠাকুরের আগমনে গোটা নাট্য-জগৎ হয়েছিল পবিত্র। গিরিশচন্দ্র যখন একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বললেনঃ "থিয়েটার আর ভাল লাগে না। থিয়েটার ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দেব মনে করছি।" এই কথা শুনে ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে বললেনঃ "না না ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হচ্ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চকে কি চোখে দেখতেন, উপরোক্ত এই সমস্ত ঘটনাই তার নিদর্শন। ঠাকুরের সহজ সরল গতিময় অথচ নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ জীবনকাহিনী নিয়ে যখনই নাটক, যাত্রা পালা কিংবা চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে, তখনই তা আপামর জনসাধারণকে বারে বারে রঙ্গমঞ্চে, যাত্রার আসরে এবং প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় টেনে এনেছে। তাঁর মুখনিঃসৃত কথামৃত অগণিত দর্শকের তাপিত হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করেছে।

বাঙলা চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রথম পরিস্ফুট হলো ১৯৪৯ খৃীস্টাব্দে অমর মল্লিক পরিচালিত 'স্বামীজী' ছবির মধ্য দিয়ে। ছবিটি ছিল অমর মল্লিক প্রোডাকশন্সের, পরিচালনা করেছিলেন ফণী মল্লিক এবং ভারতী দেবী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রাইচাঁদ বড়াল এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। ক্যামেরাম্যান ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে রবি ধর ও রণজিৎ দত্ত। প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ পরিবেশিত এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৭ জুন (১৯৪৯) রূপবাণী, রক্সী, ইন্দিরা ও দীপক সিনেমায়। এই ছবিতে তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করে-ছিলেন। 'স্বামীজী' ছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিনয় করেন।

এরপর যে-ছবিটি দর্শক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে, তা হলো 'যুগদেবতা'। 'যুগ দেবতা' ছিল ১৯৫০ খৃীস্টাব্দে কালিদাস প্রোডাকশন্সের ছবি। তারকনাথ মুখার্জীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। এই ছবিতে শ্রীরাম-

কৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নীতীশ মুখার্জী, জ্যোতির্ময় কুমার, নরেন চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী, নবদ্বীপ হালদার, আশু বোস, বিজয় নারায়ণ, সুশীল ঘটক, চন্দ্রাবতী দেবী এবং রমা চৌধুরী। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন রামচন্দ্র পাল। ক্যামেরাম্যান ছিলেন গোপালকৃষ্ণ মেহতা। কালী ফিল্মস স্টুডিওতে নির্মিত এবং প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড পরিবেশিত এই ছবি মুক্তি পায় ১৯৫০ খৃীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা, ইন্দিরা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে।

১৯৫৫ খৃীস্টাব্দে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে আরেকটি ছবি নির্মিত হয়েছিল—তার নাম 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।' ছবিখানি প্রযোজনা করেছিলেন ভারতকথা চিত্রম এবং পরিচালনায় ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পিগণ। এই ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কত দক্ষ শিল্পী ছিলেন, তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করে। তাঁর অভিনয়-ভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর অভিনয়ে ঠাকুরের দৈবী চরিত্র সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। 'মা সারদা'র ভূমিকায় শোভা সেনও যথাযথ অভিনয় করেছিলেন। ছবিখানি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ খৃীস্টাব্দে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

এর আগে ১৯৫৫ খৃীস্টাব্দেই চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'রানী রাসমণি' ছবিখানি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। এই ছবির জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। ছবিখানি ১৯৫৫ খৃীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি রাধা, প্রাচী, ইন্দিরা, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। 'রানী রাসমণি' ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে মলিনা দেবী অভিনয় করেছিলেন নাম-ভূমিকায় এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয় করেছিলেন। এঁরা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, অসিত বরণ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বোস, প্রমুখ। সুরকার ছিলেন অনিল বাগচী।

১৯৫০ খৃীস্টাব্দে এম. পি. প্রোডাকশন্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি ছিল 'বিদ্যাসাগর।' এই ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। ছবির নাম-ভূমিকায় ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত। ছবিটি মুক্তি পায় ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বিদ্যাসাগরকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।" এর উত্তরে বিদ্যাসাগর হেসে বললেন: "তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।" বিদ্যাসাগরের কথায় সকলে হাসলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র।" বিদ্যাসাগর বললেন: "তা বলতে পারেন বটে।"—ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারেব দৃশ্যটি উপরোক্ত দুই শিল্পী তাঁদের অভিনয় মারফৎ অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট করেছিলেন। ছবিটি বিদগ্ধজনের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল।

এর পরের (১৬ মার্চ ১৯৫৬) ছবি 'হে মহামানব' (শ্রীগদাধর পিকচার্স লিমিটেড)। ছবিটি পরিচালনা করেন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন প্রভাত ঘোষাল। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বাংলা চলচ্চিত্রে এসেছেন ১৯৫৬ খৃীস্টাব্দে 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ছবিতে। ঐ বছর ১ জুন ছবিটি মুক্তি পায়। এই ছবি সম্পর্কে স্বয়ং পরিচালক মধু বসু তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখছেন: "১৯৫৬ খৃীস্টাব্দের মাঝামাঝি 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' মুক্তি লাভ করে রাধা, পূর্ণ, ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। এ ছবি

যে কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল, তা আমায় নতুন করে বলতে হবে না। কারণ ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের রাষ্ট্রপতির মানপত্র (Certificate of Merit) পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল 'গিরিশচন্দ্রের।'"

নাম-ভূমিকায় ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সন্ধ্যারানী, মলিনা দেবী, শোভা সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ মুখার্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, অসিতবরণ, জহর রায় প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা।"

কলাকুশলীদের মধ্যেঃ ক্যামেরা—অনিল গুপ্ত, শব্দযন্ত্রীঃ বাণী দত্ত, সম্পাদকঃ কমল গাঙ্গুলী, সুরশিল্পীঃ অনিল বাগচী, শিল্প-নির্দেশকঃ কার্তিক বসু, সহকারীঃ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন রায়। প্লেব্যাক শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠদান করেছিলেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, গীতা দত্ত। চিত্রনাট্য রচনা করেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। 'মহাকবি গিরিশ-চন্দ্র' আজও একটি জনপ্রিয় ছবি। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে 'কথা কও' নামে একটি ছবি মুক্তি পায়। তাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনী নিয়ে নির্মিত হয় 'শ্রীশ্রীমা' ছবিখানি। ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে নারায়ণ ফিল্ম প্রোডাকশন্স ও কালীপ্রসাদ ঘোষ। ছবিতে সুর-সংযোজন করেন অনিল বাগচী। এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, লক্ষ্মী গাঙ্গুলী, ভারতী দেবী, মলিনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, প্রণতি ঘোষ, সরযূবালা, জীবেন বসু, নীতীশ মুখার্জী প্রমুখ। ছবিখানি ৯ মে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে মুক্তি পায়।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী অবলম্বনে বিজয় বসু ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করেন 'ভগিনী নিবেদিতা' চিত্রখানি। ছবিখানি প্রযোজনা করেন অরোরা ফিল্ম করপোরেশন। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অনিল বাগচী। এই ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি এই বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনার জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা চরিত্রে অভিনয় করেন অরুন্ধতী দেবী এবং তিনি এই চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অমরেশ দাসের অভিনয় ছিল চলনসই। এঁরা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেনঃ শোভা সেন (মা সারদা), সুনন্দা ব্যানার্জী, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, দিলীপ রায়, কালী সরকার প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। ছবিখানি ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে রাধা এবং পূর্ণ-তে মুক্তি পায়।

পরবর্তী ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। পরিচালক মধু বসু তাঁর "আমার জীবন" গ্রন্থে (পৃঃ ৪২৮) লিখেছেনঃ "মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পরে আমি আর মাত্র একখানি ছবি পরিচালনা করেছি—সেটি হলো 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে। তখন আমি অ্যাস্টোরিয়া হোটেল থেকে কারনানি এস্টেটে চলে এসেছি।...কালীদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বারাণসীতে। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ছবি তুলতে গিয়েছিলাম সেখানে। ফিরে আসবার সময় আমাকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন—"যত ভুল তত ফুল।"

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবিখানি প্রযোজনা করেন সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ছবির নাম-ভূমিকায় ছিলেন অমরেশ দাস এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, মলিনা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, বীরেন চ্যাটার্জী, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রশেখর দে, গঙ্গাপদ বসু, জীবেন বসু, প্রেমাংশু বসু, বাবু গাঙ্গুলী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, শিলা পাল, শিশির মিত্র, সন্ধ্যা দেবী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন—অনিল বাগচী, ক্যামেরাম্যান—অজয় মিত্র, শব্দযন্ত্রী—বাণী দত্ত, শিল্প নির্দেশক—বটু সেন, এবং সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। ছবিখানি ১ মে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে রাধা এবং পূর্ণ-তে মুক্তি পায়। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে ৩ জুন মুক্তি পায় তীর্থ ভারতীর 'পাগল ঠাকুর'। পরিচালক ছিলেন হিরণ্ময় সেন, শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রাভিনেতা ছিলেন স্বপনকুমার।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত হয় 'বালক গদাধর' নামে আরেকটি ছবি। ছবিটি প্রযোজনা করেন তীর্থ ভারতী। ছবিখানি পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য রচনা করেন হিরণ্ময় সেন। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন অহীন ঘোষ, ক্যামেরাম্যান—ধীরেন দে এবং বিভূতি চক্রবর্তী, গীতিকার—শান্তি ভট্টাচার্য, শব্দ যন্ত্রী —জে. ডি. ইরাণী এবং সৌমেন চক্রবর্তী, শিল্প নির্দেশক—বিজয় বসু ও শশীভূষণ ভট্টাচার্য, নেপথ্য শিল্পী—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পিন্টু ভট্টাচার্য, মৃণাল ব্যানার্জী, তাপস চ্যাটার্জী। ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন—মাঃ সৌমিত্র, বীরেন চ্যাটার্জী, ছায়া দেবী, গীতা দে, স্বপনকুমার, অমরেশ দাস, নৃপতি চ্যাটার্জী, সবিতা সিংহ, চুমকী রায়। ছবিখানি ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে।

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' ছবিখানি নির্মাণ করেন মহাশক্তি ফিল্মস। ছবিখানি পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেন নিরঞ্জন দে। এই ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন নিরঞ্জন দে। এই ছবির অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন—তরুণকুমার, সত্য ব্যানার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, চিন্ময় রায়, পদ্মা দেবী, গীতা দে, চন্দ্রাবতী দেবী, ভারতী দেবী, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা চ্যাটার্জী প্রমুখ। ছবিখানির ক্যামেরাম্যান ছিলেন সুবোধ ব্যানার্জী, শব্দযন্ত্রী—অতুল চ্যাটার্জী, সম্পাদনা—মধু ব্যানার্জী, গীতিকার—মোহিনী চৌধুরী, মন্টু সরকার, মানা মিত্র, শ্যামাপদ বসু রায় এবং সৌরীশ ধর, নেপথ্য শিল্পী—হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ইলা বোস, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রণজিৎ বসু রায় এবং প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। ছবিখানি ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুন আলেয়া, আলোছায়া, রূপায়ণ চিত্রগৃহে মুক্তি পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে 'ক্ষ্যাপাঠাকুর' নামে আরেকটি চিত্র ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে মুক্তি পেয়েছে। ছবিখানি ছিল শিবশম্ভু পিকচার্সের প্রথম ছবি। সঞ্জয় এনটারপ্রাইজ পরিবেশিত এই ছবির পরিচালক ছিলেন সুজিত গুহ। ছবির কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও গীত রচনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কমল মিত্র, সন্ধ্যারানী, রত্না ঘোষাল, তরুণ, তপন প্রমুখ। এই ছবিখানি রসোত্তীর্ণ হয়নি এবং বিশেষ জনসমাদর পায়নি। এই ছবিখানি ছাড়াও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে 'যত মত তত পথ' নামে আরেকটি ছবি সাম্প্রতিক কালে মুক্তি পেয়েছে। 'যত মত তত পথ' ছবিখানির পরিচালক হলেন গুরু বাগচী। এই ছবিখানিও ভাল হয়নি এবং বিশেষ চলেনি। পুরনো কালের আরো দুটি ছবির নাম না করলেই নয়। একটি 'পাগল ঠাকুর'। ছবিটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে। পরিচালক হিরণ্ময় সেন, সুর দেবেশ বাগচী, শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপনকুমার। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'হে মহামানব' নির্মিত হয়। সুরযোজনা চিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় প্রভাত ঘোষাল আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাঙলা চলচ্চিত্রে অবতারপুরুষ এবং মহাপুরুষদের নিয়ে অনেকগুলি জীবনী-চিত্র রচিত হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী নিয়েই সর্বাধিক ছবি নির্মিত হয়েছে। এর কারণ ঠাকুরের জীবন দৈবী জীবন এবং সাংসারিক জীবনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি যেন উপন্যাসের ঘটনার মতো সাজানো—যা চিত্রনাট্য রচনার পক্ষে একান্তই উপযোগী। তাঁর মুখনিঃসৃত সংলাপগুলি দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া সহজ সরল সজীব অথচ গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। ফলে চিত্রনাট্যকারদের সংলাপ সৃষ্টির জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হয় না। ঠাকুরই তাঁর নিজের কাহিনী ও সংলাপ যেন নিজেই রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ঠাকুরের জীবনীমূলক সব ছবিই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তা নয়। তবে ছবিগুলি ব্যবসায়িক সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়নি। সেকারণে চিত্রকারেরা বারে বারে ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে ছবি নির্মাণ করেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে একদিন

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত*

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (একদিন) একটি বেশ বড় দল নিয়ে তাঁর জামাতা কুচ-বিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র চন্দ্র ভূপের স্টীমারে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য, সে দলে আমিও ছিলাম। আমরা দক্ষিণেশ্বরে নামিনি—পরমহংস তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে জাহাজে এসে উঠেছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিল আমাদের জন্যে এক ঝুড়ি মুড়ি আর কিছু সন্দেশ। স্টীমারে তাঁকে নিয়ে আমরা সোমরা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। পরমহংসের পরণে ছিল লালপেড়ে ধুতি আর বোতামখোলা একটি সার্ট। তিনি জাহাজে এলে আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম। কেশব তাঁর হাত ধরে নিজের খুব কাছে বসালেন। কেশব আমাকে ডেকে কাছে বসতে বলাতে আমি তাঁদের প্রায় পা ছুঁয়ে বসলাম। পরমহংসের গায়ের রঙ কালো, গালে দাড়ি, অর্ধ-উন্মীলিত চোখে অন্তর্মুখী দৃষ্টি। মাঝারি উচ্চতার মানুষটির পাতলা গড়ন—কৃশই বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্নায়ু ছিল অসাধারণ সংবেদনশীল—সামান্যতম দৈহিক যন্ত্রণাস্পর্শকাতর। কথায় ঈষৎ তোতলামি—যেটা শুনতে বেশ ভালই লাগত। কথা বলতেন সহজ-সরল বাঙলায়—'আপনি' 'তুমি' মিশিয়ে। বেশির ভাগ কথা তিনিই বলছিলেন—কেশব সমেত বাকি সবাই খুব আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও তাঁর সব কথা আমার স্মৃতি-পটে অম্লান হয়ে আছে। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা আর কারও কাছে কখনো বলেছিলেন তা আর কারও কাছে কখনো তার উপলব্ধির অবিরাম ধারা—স্বীয় ভক্তি ও প্রজ্ঞার অনিঃশেষ উৎসার। উপমা, অলঙ্কার ও সুপ্রযুক্ত উদাহরণগুলি যেমন মৌলিক তেমনি চমকপ্রদ। কখনো কখনো কথা বলতে বলতে কেশবের আরও কাছে ঘেঁষে বসছিলেন—শেষ-পর্যন্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর শরীরের আংশিক ভাগ কেশবের কোলের ওপর গিয়ে পড়ল। কেশব কিন্তু একটুও না সরে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

উপবেশনের পর পরমহংস চারদিকে তাকিয়ে তাঁকে ঘিরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেন—"বেশ বেশ! বেশ সব পটলচেরা চোখ!" তারপর দূরে জাহাজের ক্যাপস্টানের (নাটাই) উপর উপবিষ্ট সাহেবী পোযাক-পরা এক তরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "উনি কে? ওঁকে সাহেব সাহেব দেখছি।" মৃদু হেসে কেশব তরুণটির পরিচয় দিয়ে বললেন যে, সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি সবেমাত্র ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। পরমহংস হেসে বললেন, "তাই বল মশাই, সাহেব দেখলে ভয় করে কিনা!" সেই যুবকটি হলেন কুচ-বিহারের কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ [ভুপ], যিনি কিছুকাল পরে কেশবের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। এর পরমুহূর্তেই উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর সব আগ্রহ লুপ্ত হয়ে গেল এবং তিনি সাধনকালে যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ-অনুসরণ করেছিলেন সেইসব বিষয়ে কথা-বার্তা শুরু করলেন। বললেন, কখন কখন নিজেকে ব্রাহ্মীহাঁস (চক্রবাক) বলে মনে হতো—আমি ডাকতুম 'চকা'। আর অমনি ভিতর থেকে রা আসত 'চকি'। সংস্কৃত কাব্যে একটা ট্র্যাডিশন চলে আসছে যে, পুরুষ এবং স্ত্রী ব্রাহ্মীহাঁস রাত্রি যাপন করে নদীর দুই বিপরীত তীরে এবং পরস্পরকে ডাক দেয়। আবার "কখনো

* লাহোর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সুদীর্ঘকাল সম্পাদক ছিলেন

বেড়ালছানা হয়ে মাকে ডাকতুম আর মায়েরও সাড়া মিলত। আমি বলতুম 'মিউ' আর যেন ধাড়ি বেড়াল বলত 'ম্যাও'।" এইভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর অকস্মাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিলেন এবং ছোট্ট শিশুর মতো হেসে বললেন: "বুঝলে গো, গোপন সাধনার সব কথা বলতে নেই।" ব্যাখ্যা করে বললেন, ইষ্টের ধ্যানে জীবাত্মা নিজেকে হারিয়ে দিব্যসংযোগের যে আনন্দ অনুভব করে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এর পর তিনি চারপাশের কয়েকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং অবয়ববিচার বিদ্যার সাহায্যে তাঁদের চরিত্রলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। মানুষের মুখের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটিত করে। চোখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলি, যেমন কপাল, কান, নাক, ঠোঁট এবং দাঁত চরিত্র নির্ণয়ে সহায়তা করে। এইভাবে সেই স্বগত-আলাপ চলতে চলতে একসময় পরমহংস শুরু করলেন নিরাকার ব্রহ্মের কথা: "ওই যে, নিরাকাররূপ, তারও ধারণা চাই।" তিনি দু-তিনবার নিরাকার শব্দটি উচ্চারণ করে ডুবুরি যেমন অতলজলের তলায় ডুব দেয় তেমনি শান্তভাবে ডুবে গেলেন গভীর সমাধিতে। যতক্ষণ পরমহংস সমাধিতে ছিলেন তার মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে পরমহংসের নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনায় পরমহংস বিশেষভাবে অভিভূত।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমরা সমাধিমগ্ন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাঁর সমস্ত শরীরটা শিথিল হয়ে গেল, তারপর সামান্য কঠিন। পেশী, স্নায়ু নিষ্কম্প—শরীরের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই আর সাড়া নেই। হাত দুটি কোলের উপর—দু-হাতের আঙুলগুলি পরস্পরের সঙ্গে শিথিলবদ্ধ। বসার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ কিন্তু একেবারে নিশ্চল। প্রশান্ত মুখমণ্ডল সামান্য ঝুঁকে আছে। চোখ দুটি প্রায় নিমীলিত—তবে সম্পূর্ণ নয়। অক্ষিগোলক নিস্পন্দ ও নিষ্পলক—দৃষ্টি স্থির, বাইরের জগতের কোন সংবাদই মস্তিষ্কে পৌঁছাচ্ছে না। অনির্বচনীয় সুমধুর হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত অধরোষ্ঠের ফাঁকে শুভ্র দন্তপঙ্ক্তির ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত। সেই অদ্ভুত হাসিতে এমন কিছু আছে যা কোন আলোকচিত্রে ফুটে ওঠেনি।

আমরা নিঃশব্দে নির্নিমেষ চোখে বেশ কয়েক মিনিট তাঁর নিশ্চল দেহের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায়ভুক্ত সঙ্গীতকিন্নর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল খোলকরতাল সহযোগে একটা স্তোত্র গাইতে লাগলেন। সঙ্গীত উচ্চগ্রামে উঠতে পরমহংসের চোখ উন্মীলিত হলো—তিনি আয়ত লোচনে চারদিকে তাকালেন, যেন কোন অচেনা অজানা জায়গায় রয়েছেন। গান থেমে গেল। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা সব কারা?" তারপর নিজের মাথায় সজোরে চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "নেবে যা, নেবে যা।" আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর কাছে তাঁর ভাবাবেশের কথা উল্লেখ করলুম না। পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি সুমধুর কণ্ঠে গাইলেন: "শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।" গান শেষ করে পরমহংস কি করে গলা সাধতে হয়, সুকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য কি—এই বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমরা পরমহংসকে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম।*

*** মডার্ণ রিভিউ (মে, ১৯২৭): 'এ ডে উইথ রামকৃষ্ণ পরমহংস' প্রবন্ধের অনুবাদ।**

ভাষান্তর: নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৯ ॥

সে সেই গোবিন্দের পূজারী। তাহার নিকট শুনিলাম, অনেক দিন হইতে গোপনে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, আজ রাত্রে একা যমুনার ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, কিন্তু অসিতনাথের "মা মা" জপ শুনিয়া সেভাব সে ভুলিয়া গিয়াছে। "মা" বলিয়া সে আমার পায়ের ধূলা লইল, অন্ধকার রাত্রে এমনভাবে আর যেন আমি নির্জন স্থানে না থাকি, সেজন্যও বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া চলিয়া গেল।

"চিন্ময় ভূমি বৃন্দাবন, তোমাকে আমি প্রণাম করি" বলিয়া তখন সেই যমুনাপুলিনে আমি বারবার প্রণাম করিলাম। এই বৃন্দাবন গোবিন্দের লীলানিকেতন, এখানে কি আবার শঙ্কা ভয় আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতিরেণুও কৃষ্ণময়, সেখানে কি আবার নির্জন সজন আছে, সেখানে কি অন্ধকার আলোক, দিবা রজনীর কোন বিভেদসীমা আছে! ব্রজবাসীর মনেও কি গোবিন্দচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার উদয় হয়? এ যে একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিতে পারিলাম, না, এ আর কিছু নয়, ঠাকুরের এ আর এক নূতন খেলা। তোমার এ খেলায় কি আর আমি ভয় পাই? তুমি যত কেন মুখোষ পরিয়া এস না, আমি তোমাকে ভাল করিয়াই চিনিয়া নিয়াছি।

তার পরদিন শ্রীমন্দিরে গিয়ে আবার আমি গোবিন্দের প্রসাদীমালা পাইলাম। সেই পূজারীই "মালা নাও মা" বলিয়া আমাকে মালা আনিয়া দিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কাশীতেও একবার এইরকম ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়িতে আমি থাকিতাম, কুমারও সেই বাড়িতে থাকিত। কুমার দিনরাত্রি তাহার গ্রন্থরাশি লইয়া থাকিত, আমি কুমারকে রাঁধিয়া দিতাম। গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় প্রতিদিনই একটি লোক আমার অনুসরণ করিত, যতক্ষণ স্নান করিতাম, ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত, আবার স্নান শেষে বাড়ি ফিরিবার সময়ও বাড়ি পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি তাহার অন্য কিছু কাজ আছে; কিন্তু শেষে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুসরণ করা ভিন্ন তাহার অন্য কিছুই কাজ নাই। তাহাকে যখন দেখিতাম, সাপ দেখিলে লোকের শরীর যেমন শিহরিয়া উঠে, আমার শরীরও সেইরূপ শিহরিয়া উঠিত। এত একমনে "গোপাল গোপাল" জপ করিতাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে গোপাল ভাবিতে পারিতাম না। সে আমার কিছু দূরে থাকিলেও আমার মনে হইত, তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া যেন আমার গা পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য আমি প্রাতঃস্নান ছাড়িয়া দিলাম, মধ্যাহ্নেও স্নানের সময় বাড়ির বাহির হইয়া দেখি, সে যেন আমারই জন্য বাড়ির বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, আমি যেই ঘাটের দিকে চলিলাম, সেও আমার সঙ্গে চলিতে লাগিল। প্রতিদিনই আমি স্নানের সময় পরিবর্তন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। অবশেষে আমার এমনই বিরক্ত বোধ হইল, মনে হইল যে, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা কাশী ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু আবার একটু লজ্জাও হইল, এতদিন আমি একদিনের জন্যও কাহাকে ভয় করি নাই, আজ কি এই লোকটার ভয়ে কাশী ছাড়িতে হইবে? সে যা খুশি তাই করুক, আমার তাহাতে কি আসে যায়, এই ভাবিয়া মন স্থির করিলাম।

কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল। একজন অপরিচিতা রমণী গঙ্গাস্নানের সময় নানা কথায় আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন আরম্ভ করিল। শাস্ত্রে লেখা আছে, চক্ষু মনের দর্পণ, আমি একথা খুবই সত্য বলিয়া মানি। যাই আমি তাহার চোখের দিকে চাহিলাম, অমনি সেই দর্পণে তাহার মনের ভাবের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। এমন অনেক দিন ঘটিয়াছে,—অনেকের চক্ষুতেই তাহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, এবং সে দেখা কখনই ভুল হয় নাই। সে রমণী যে উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছিল, সে যখন তাহার মনের কথা আমার নিকট খুলিয়া বলিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, চোখে আমি যে মনের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, তাহা ভুল দেখি নাই।

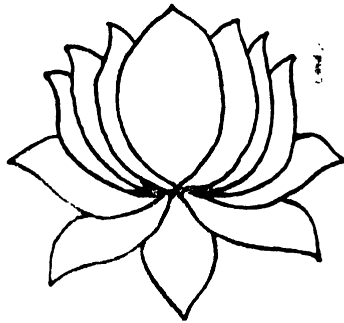
এবার আমার যথার্থই রাগ হইল। খুব রাগিয়া বিশ্বনাথকে বলিলাম, "বিশ্বনাথ, এই সব কি তোমার ভূত প্রেতের দল? থাকুক তোমার সোনার কাশী, আর আমি কাশীতে বাস করিতে চাহি না। কালই আমি কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তার পরদিন সকালে গঙ্গাস্নানে গিয়াছি,—যথানিয়মে সে লোকটিও সঙ্গে আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে। গঙ্গার জলে স্নান করিতে নামিয়াছি, এমন সময় দেখি—মৃতদেহের মতো কি যেন স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। "যদি কোন নৌকাডুবী লোক হয়?" বিদ্যুতের মতো এই কথা যেই আমার মনে উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ আমি সেই দেহ ধরিবার জন্য সাঁতার দিলাম। সাঁতারে আমি মাছের মতো পটু, দেখিতে দেখিতে সেই দেহের নিকটবর্তী হইলাম। তীরে যাহারা ছিল,—যাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাগর্ভে নামিয়াছিল, সকলেই আমার এই কীর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কেহ কেহ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, কর কি? ও যে মড়া ভেসে যাচ্ছে।—মড়া ধরতে যাচ্ছ কেন?" সে কথা আমার কানেও গেল না। আমি দুই হাতে সেই দেহ জড়াইয়া বুকে ধরিয়া স্রোতের প্রতিকূলে আবার কূলের দিকে আসিতে লাগিলাম। এত স্রোত যে, অনেক কষ্টে একটুখানি যদি অগ্রসর হই, আবার অনেকটা পিছনে সরিয়া যাইতে হয়। তীরের লোকেরা ভাবিয়াছিল, আমি ডুবিয়া মরিব, আর ভাবিয়াছিল, হয়তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। বাস্তবিক আমার মতো শরীরে শক্তি না থাকিলে ও আমার মতো সন্তরণপটু না হইলে আর কেহ বোধ হয় কূলে পৌঁছিতে পারিত না। যখন কূলের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম, তখনও কেহ মড়া ছুঁইবার ভয়ে আমাকে সাহায্য করিল না। কূলে উঠিয়া সিঁড়ির উপর দেহটিকে শোয়াইলাম। একটি ১৮।১৯ বৎসরের ছেলে, সরল সুন্দর মুখ, যেন চোখ বুজাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে, এ-দেহে প্রাণ নাই। সে মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কি যে করিয়া উঠিল,—আমি জগতের লোককে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। "বাবারে ও নীলমণি!" বলিয়া আমি একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার কান্না শুনিয়া সেখানে চারিদিক হইতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমশঃ "একটি ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছে" এই কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। আমি সিঁড়ির উপর শায়িত দেহের মাথার নিকট বসিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছি। কেন যে কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না, কেবল "বাবারে নীলমণি আমার!" এই কথা ছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে আসিতেছে না। আমার সেই উন্মাদের মতো ভাব দেখিয়া যাহাতে ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়, অনেকেই সে চেষ্টায় উদ্যোগী হইল।—কোথা হইতে যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল, আগুন, গরম কাপড়, দুধ এ সমস্ত সামগ্রী কে যে কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল, কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কেবল বসিয়া কাঁদিতেছি, চোখের জলের বিরাম নাই।

কোথায় আছি, কি করিতেছি, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, সেই মুখখানির দিকে চাহিতেছি আর আমার বুকের ভিতর সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। ৩।৪ ঘণ্টা চিকিৎসার পর যখন ছেলেটি একবার চোখ মেলিল, তখন চারিধারে "চোখ চাহিয়াছে—চোখ চাহিয়াছে" বলিয়া একটি আনন্দধ্বনি উঠিল। ডাক্তার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কেন মা কাঁদ, তোমার

ছেলে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।" গরম দুধ ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রমশঃ ছেলেটির কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন সে অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমার বাড়ি নেপালের কাছে, সেখানে আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন। আমি শিক্ষার্থী হইয়া বারাণসীতে আসিয়াছি। আমার গতরাত্রে বিসূচিকা হয়। যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়ির লোক আমি মরিয়া গিয়াছি ভাবিয়া আমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।" তাহার সেই পরিচয়ে সকলে স্তম্ভিত হইল। সে যখন বলিল, "বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন," তখন অনেকেরই চোখে জল আসিল। ছেলেটি প্রাণ পাইল কিন্তু এখনও তাহার চিকিৎসার দরকার, সুস্থ হইয়া বল পাইতে এখনও তাহার ৩।৪ দিন লাগিবে। আমি কি উপায় করিব, আকুল হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন ভাবনা নাই, যাহাতে হাসপাতালে ছেলেটি যত্নে থাকিতে পারে, সে চেষ্টা আমি করিব।" তাহার পর লোক পাঠাইয়া ছেলেটির জন্য খাটুলী আনাইয়া তাহাতে করিয়া তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া চলিলেন, আমিও সেই আর্দ্র বস্ত্রেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া ছেলেটিকে শয্যায় শয়ন করানো হইল, ডাক্তার তাহার ঔষধ পথ্যের ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়িয়া গেল যে, আমি স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। মনে পড়িয়া গেল যে, কুমারকে আমি রাঁধিয়া দিলে তবে সে খাইতে পাইবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়াই রাঁধিবার ঘরে গেলাম। ভাত নিয়া যখন কুমারকে খাইতে দিলাম, কুমার স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইতে লাগিল। কেন যে আমার এত দেরি হইয়াছে, সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা করিল না। আমি যখন বলিলাম, "কুমার, আজ বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।" কুমার বলিল, "দেরি হয়ে গিয়েছে? ওঃ, তাই আমার এত খিদে লেগেছে।" কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করিল না—কেন দেরি হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার পরদিন হইতে আর আমার সেই অনুসরণকারী লোকটি কোনদিন আমার অনুসরণ করে নাই। যদি দৈবাৎ পথে কখনও তাহাকে দেখিতে পাইতাম, সে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত।* [সমাপ্ত]

* উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, পৃঃ ২৩৬-২৪০



সৎসঙ্গ-রত্নবলী

॥ ২ ॥

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর কথা

(১২)

নিষ্ঠা ও ব্যবহার

জ্ঞানীর নিষ্ঠা থাকে স্ব-স্বরূপে। স্বরূপে সদা (নি—স্থা) নিষ্ঠা, স্থিতি! বাহ্য ব্যবহার তিনি করেন 'স্বাঙ্গ'-য়ের অনুরূপ। স্বাঙ্গ অর্থাৎ যেরূপ বেশ, তদনুরূপ ব্যবহার। যদি তিনি গৃহস্থ হন, তবে গৃহস্থের মতোই আচরণ করেন। আর যদি সন্ন্যাসী হন, তবে সন্ন্যাসীর মতোই ব্যবহার করেন। সম (ব্রহ্ম) দর্শন তিনি করেন বটে কিন্তু তাই বলিয়া সমবর্তন তিনি করেন না।

জ্ঞানীর যাহা স্বভাব বা লক্ষণ, জিজ্ঞাসুর পক্ষে তাহাই সাধন। সুতরাং জিজ্ঞাসুও ঐরূপই করিবেন।

(১৩)

মৌনীবাবা

অনেকে মৌন থাকে। ভিতরে সেভাব নাই, বাহিরে মৌন। যেন জোর করিয়া চাপিয়া-চুপিয়া থাকে। সে কোন কাজের নহে। মন যদি তত্ত্বচিন্তনে মগ্ন থাকে তবে বাহিরের মৌনও তার সহায়ক হয়। নতুবা সব ব্যর্থ।

হৃষীকেশে একবার এক মৌনী আসিলেন। কোন কথা বলেন না। ইশারায়ও কিছু প্রকাশ করেন না। একজন প্রাচীন সাধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার সামনেই এক ভক্তকে বলিলেন: "দেখ, মৌনীজীকে খুব ভাল করে খাওয়াও। ক্ষীর, মালপুয়া, পুরী, সব্জি, মিঠাই"। সবকিছু ভক্তটিকে পূর্ব হইতে শিখানো ছিল। ভক্ত মৌনীজীকে শুধু চানার রুটি খাইতে দিল দুপুরে। জলও দিল না। শুষ্ক চানার রুটি মৌনীর গলনালী দিয়া আর প্রবেশ করিতেছে না, অতি কষ্টে মৌনীবাবা খাইল।

বৈকালে মৌনীজীর সামনে সেই প্রাচীন সাধু ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভকত্‌জী, মৌনীজীকে ভিক্ষা করিয়েছিলে?" ভক্ত: "হাঁ মহারাজ।"

সাধু—"কি খাওয়ালে?" ভক্ত—"মহারাজ, এই মালপুয়া, ক্ষীর, পুরী, সব্জি, মিঠাই, পকোড়া...।"

মৌনী আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল: "সব মিথ্যা কথা। শুধু চানার রুটি খাইয়ে ব্যাটা বানিয়ে বানিয়ে বলছে কিনা—মালপুয়া, ক্ষীর, হেন-তেন—কত কি! ব্যাটা মিথ্যাবাদী কোথাকার!"

তখন সকলের খুব হাসি। মৌনীর মৌন কি প্রকার তাহা ধরা পড়িল।

পরে একদিন ভক্তটি মৌনীজীকে অবশ্য ভাল করিয়া খাওয়াইয়াছিল।

(১৪)

আত্মচিন্তনে নিয়ম নাই।

বৈদিক-কর্মাদি করিতে গেলে দেশ-কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে, কিন্তু উপাসনার ঐসব নিয়ম নাই। যেখানে যেকালে চিত্ত স্থির হবে সেখানে সেকালে তখনই ভগবচ্চিন্তন করা যাইতে পারে। সেরূপ স্ব-স্বরূপচিন্তনেও কোনও নিয়মাদির অপেক্ষা নাই।

অপরের বাড়িতে ঢুকিতে হইলে বা কোন কর্মচারী বা রাজার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় স্থান সব ঠিক করিয়া তবে যাইতে হয়, নতুবা দেখাও হয় না, কোন কাজও হয় না। কিন্তু নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিতে হইলে কাহারও অনুমতির দরকার হয় কি? অথবা কোন বিশেষ স্থান বা কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় কি?—তাহা করিতে হয় না, কারণ নিজের বাড়িতে তো আমি নিজেই মালিক। সেইরূপ কর্মাদি করিতে গেলে স্থান-

কালাদির অপেক্ষা আছে, কিন্তু নিজের স্বরূপ-চিন্তনে কোনও স্থান-কালের অপেক্ষা নাই। আত্মচিন্তন যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যে অবস্থায় ইচ্ছা—করা যাইতে পারে।

(১৫)

অদৈন্য ভিক্ষা।

ভিক্ষা সাধুর বৃত্তি। এই ভিক্ষায় দীনতা নাই। সাধারণ ভিক্ষুকের ভিক্ষায় দীনতা থাকে। 'এ শেঠজী, এ দাও ও দাও' করিয়া ও তার পিছনে লাগিয়া থাকে। সাধু ভিক্ষায় যায়, 'নারায়ণ হরি' বলিয়া, কেউ দিল, কেউ দিল না।' গালাগাল বা প্রহার করিলেও সাধু নির্বিকারভাবে তাহা গ্রহণ করে।

দুই রকম বৃত্তি আছে। কুকুর-শাবকের বৃত্তি ও হস্তি-শাবকের বৃত্তি।

কুকুরের ছানাকে এক টুকরা রুটি দিলে সে তোমার পায়ে পায়ে ফিরিবে। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, কত মিনতি করিবে। তেমনি যে-সাধু কাহারও নিকট কিছু পাইয়া তাহার সেবা করে, তাহার পিছনে পিছনে যায়, খোসামুদি করে—উহা দীনতা—উহা কুকুর-ছানার বৃত্তি।

হস্তি-শাবককে কিছু খাইতে দিলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে-পর্যন্ত মাহুত আসিয়া তাহাকে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া না খাওয়ায় সে-পর্যন্ত সে খায় না। তাহার দীনতা নাই। সেইরূপ যথার্থ সাধু, যদি কেহ শ্রদ্ধার সহিত কিছু তাঁহাকে দেয়, প্রয়োজন থাকিলে তবেই তাহা তিনি গ্রহণ করেন। দাতার খোসামুদি তিনি করেন না। তাঁহার দীনতা নাই।

(১৬)

জ্ঞান-প্রমাণও বস্তুর অধীন।

জ্ঞান-প্রমাণও বস্তুর অধীন। উহা পুরুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অধীন নহে। চক্ষু ও ঘটের সংযোগ হইলেই ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞান হইবে। তেমনি মহাবাক্য প্রমাণ ও বস্তু নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। প্রতিবন্ধরহিত মহাবাক্য শ্রবণ মাত্রই জ্ঞান হইবে। কারণ বস্তু তো নিত্যবিদ্যমান। শমদমাদি সাধনদ্বারাই সর্ব প্রতিবন্ধ দূর হয়। সংশয় বিপর্যয়রহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রমাণগত সংশয়, প্রমেয়গত সংশয়—সর্বসংশয়রহিত হওয়া প্রয়োজন। তখন মহাবাক্য সহ ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয়, যেমন চক্ষু সহ ঘটের সম্বন্ধ হয়। চক্ষু সহ তো ঘটের সংযোগ-সম্বন্ধ হয়, মহাবাক্য সহ ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্ম তো সর্ব সম্বন্ধাতীত? হাঁ, তাহা ঠিক বটে, তবে সে-সম্বন্ধে 'লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ' স্বীকার করা হয়। বেদান্তে আছে:

"সামানাধিকরণ্যং চ বিশেষণবিশেষ্যতা
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনাম্॥"

এইরূপ সম্বন্ধদ্বারাই মহাবাক্য প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মবোধের জনক হইয়া থাকে।

(১৭)

প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাব।

সমানজাতীয় দুইটি বস্তুতেই প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাব হয়। যেমন তেজ থেকে চক্ষু ও রূপ উৎপন্ন, তাই সূর্য রূপের প্রকাশক এবং চক্ষুও রূপের প্রকাশক:

"চক্ষুর্নবীক্ষতে শব্দমতদাত্মত্বকারণাৎ।
যথৈবং ভৌতিকী দৃষ্টির্নাত্মানং পরিপশ্যতি॥
(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ৪/১২)

আকাশ কার্য নহে বলিয়া চক্ষু শব্দকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ উহারা এক জাতীয় নহে। তেমনি অন্তঃকরণবৃত্তিও আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মকার্য নহে।

এক জাতীয় বলিয়া চক্ষু রূপের প্রকাশক। তেমনি আত্মা সর্বপ্রকাশক যখন বলা হয় তখন একজাতীয়ত্ব কোথায়? আত্মা চেতন আর বিষয় তো জড়?

—আত্মা সৎ-চিৎ-সুখস্বরূপ। বিষয়ও সত্তা-স্ফূর্তিবিশিষ্ট। যদিও সেই সত্তাস্ফূর্তি আত্মারই। বিষয় ও আত্মা উভয়ই সত্তাস্ফুরণ-বিশিষ্ট বলিয়া একজাতীয় বলা যাইতে পারে।

কাজেই আত্মা সর্বপ্রকাশক, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। [ক্রমশঃ]

পরিক্রমা

আইসল্যাণ্ডে কয়েকদিন

স্বামী ভাস্করানন্দ

আকাশপথে অতীতকালে শুধু দেব, যক্ষ, গন্ধর্বরাই নাকি বিচরণ করতেন। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, মুনি-ঋষিরাও উড্ডয়ন-বিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন কিনা সন্দেহ। উদাহরণস্বরূপ, উড়তে হলে দেবর্ষি নারদকেও নাকি ঢেঁকীর সাহায্য নিতে হতো!

মার্কিন দেশে আমাদের মাঝে মাঝে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়ঃ "স্বামীজী, আপনি কি 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক' জানেন?" অথবাঃ "স্বামীজী, আপনার কি 'লঘিমা-সিদ্ধি' আছে? অর্থাৎ, আপনি কি উড়তে পারেন?" উত্তরে আমি বলি, "না, আমার 'রোপ ট্রিক' জানা নেই; তবে আমি উড়তে পারি,—কিন্তু বিমানের সাহায্যে।"

আমাদের ছেলেবেলায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মশায়ের বাঙলা ভাষায় অনূদিত বাল্মিকী রামায়ণের অংশবিশেষ স্কুলের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনে আছে একটি জায়গায় রামচন্দ্র সীতাদেবীর সঙ্গে পুষ্পকরথে আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছেন আর নিচে যেসব দৃশ্য নজরে পড়ছে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সেসব দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেনঃ "এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি" ইত্যাদি। ত্রেতাযুগের অবতার রামচন্দ্রকেও গগনপথে বিচরণ করার জন্য মনুষ্যসুলভ পুষ্পকরথের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

এই ঘোর কলিযুগের মানুষ তিন-চতুর্থাংশ পাপক্লিষ্ট ও এক-চতুর্থাংশ পুণ্যবিশিষ্ট হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক দিক দিয়ে এযুগের মানুষ তাদের পূর্বপুরুষ-দের থেকে ভাগ্যবান। বিনা যোগসিদ্ধিতে, নিছক অর্থের বিনিময়েই এযুগের অতি সাধারণ মানুষও আকাশপথে অহরহ বিচরণ করছে। বিগত দেড় দশক ধরে মার্কিন মুলুকে থাকার ফলে আমারও সে-সুযোগ কার্যবলে বহুবার হয়েছে।

একবার আগস্ট মাসে লন্ডন থেকে আমেরিকার শিয়াটল শহরে যাচ্ছিলাম। 'পোলার রুট' দিয়ে, অর্থাৎ সুমেরু-বৃত্তের পাশ দিয়ে আমাদের বিমান যাচ্ছিল। হঠাৎ লাউড স্পীকারে পাইলটের ঘোষণা শোনা গেলঃ "এখুনি প্লেনের ডান পাশের জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালে আপনারা আইসল্যান্ড দেখতে পাবেন। তার কিছু পরেই দেখতে পাবেন গ্রীনল্যান্ড।"

আমার আসন জানালার পাশেই ছিল। হালকা ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে বহু নিচে আইস-ল্যান্ড নজরে পড়ল। বেশ বড় দ্বীপ, পর্বতময়, কিন্তু সবুজ; বরফ কোথাও নজরে পড়ল না। ভাবলামঃ "এদেশের নাম আইসল্যান্ড হলো কেন?"

কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড দেখা গেল। দেখলাম যে গ্রীনল্যান্ডে 'গ্রীন' কিছু নেই; সমস্ত দেশটাই প্রায় বরফে সাদায় সাদা। মনে হলো তুষারাবৃত গ্রীনল্যান্ডের নামই আইসল্যান্ড হওয়া উচিত ছিল। তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাকে একদিন এই সুদূর পান্ডববর্জিত দেশ আইসল্যান্ডে যেতে হবে। কিন্তু লেখক দিলীপ রায়ের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় 'অঘটন আজও ঘটে'। এই জুলাই মাসে (১৯৮৯) আমাকে ইংল্যান্ড যেতে হয়েছিল আমাদের বোর্ন এন্ড আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দজীর আমন্ত্রণে তাঁদের গ্রীষ্মকালীন রিট্রিটে বক্তা হিসেবে।

রিট্রিট এক সপ্তাহ ধরে চলে। কিন্তু রিট্রিট শেষ হওয়ার আগেই তিনি বললেনঃ "তোমাকে আইসল্যান্ডে একটি রিট্রিটে বক্তা হিসেবে যেতে হবে। সেখানকার থিয়সফিক্যাল সোসাইটি আমাকে দু-বছর আগে ওঁদের গ্রীষ্মকালীন রিট্রিটে যেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। গিয়েও-

ছিলাম। ওঁরা খুব উদার প্রকৃতির লোক। এবছর আবার যেতে বলায় ওঁদের আমার পরিবর্তে নিউইয়র্ক আশ্রমের স্বামী আদীশ্বরানন্দকে নিমন্ত্রণ করতে বলি। কিন্তু স্বামী আদীশ্বরানন্দের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সানফ্রান্সিসকো আশ্রমের স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ যাবেন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তোমাকেই এবার আইসল্যান্ড যেতে হবে।"

তদনুযায়ী ৪ জুলাই আইসল্যান্ড এয়ার-এর একটি বিমানে আমি লন্ডন থেকে রওনা হয়ে প্রায় মধ্যরাত্রিতে আইসল্যান্ডের কেফ্ল্যাভিক (Keflavik) বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছাই। তখন আকাশ মেঘে ঢাকা, আর টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাকে স্বাগত জানাতে স্থানীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির দুজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিঃ এইনার আদালস্টেইনসন এবং মিঃ হালদোর হ্যারালডসন।

মিঃ আদালস্টেইনসন আইসল্যান্ডের রাজধানী রেকিয়াভিক (Reykjavik) শহরের আদি বাসিন্দা হলেও কিছুকাল নরওয়েতেও পড়াশুনা করেছেন। পড়াশুনা শেষ করে রেকিয়াভিকে ফিরে এসেছেন বহুদিন হলো। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি ; বয়স ৪৭ বছর ; বিবাহিত। ওঁর মা অতি মাতৃভাবসম্পন্না মহিলা। পাশ্চাত্যদেশে এমন মাতৃভাবসম্পন্না মহিলা বিরল। মিঃ আদালস্টেইনসন বললেনঃ "ছাত্রাবস্থায় আমার ধর্মে তেমন মতিগতি ছিল না। আমার মারই ধর্মের দিকে ঝোঁক ছিল বরাবর। তাঁরই প্রেরণায় আমি থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিই।"

মিঃ হালদোর হ্যারালডসন রেকিয়াভিকের আইসল্যান্ড কলেজ অব মিউজিক'-এর পিয়ানো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। অতি ভদ্র এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি। বয়স একান্ন-বাহান্ন। ইংল্যান্ডেও সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বরাবর থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হলেও ইংল্যান্ডে থাকাকালীন আমাদের লন্ডন আশ্রমে একাধিকবার গিয়েছেন। ইদানীং ইংল্যান্ডের বোর্ন এন্ড আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। বোর্ন এন্ড আশ্রমের রিট্রিটে বার দুই যোগ দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ওঁর স্ত্রী ইংরেজ মহিলা। তাঁর নার্সিং-এর ডিগ্রী আছে ; রেকিয়াভিকের একটি হাসপাতালে কাজ করেন।

মিঃ হ্যারালডসনের গাড়িতে আমরা এয়ার-পোর্ট থেকে যখন রেকিয়াভিকের দিকে রওনা হলাম তখন মধ্যরাত্রি বলা চলে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, অন্ধকার কোথাও নেই। পুঞ্জীভূত মেঘের ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকে চারিদিক আলোকোজ্জ্বল! এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখে হঠাৎ খেয়াল হলো আমি এখন "মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশে" এসেছি। এদেশে প্রায় ছমাস দিন ও ছমাস রাত্রি। এখন এখানে চলছে ষণ্মাস দিবস!

এসময় এদেশে ঘুমোতে হলে জানালায় ভারী পর্দা ঝুলিয়ে নিতে হয়। এদেশের ঘরগুলিতে এজন্য দুরকমের পর্দা থাকে ; একটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, অপরটি প্লাস্টিকজাতীয় কাপড়ের তৈরি যার ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে না।

গাড়িতে কেফ্ল্যাভিক বিমানবন্দর থেকে ভক যেতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে। দমকা হাওয়ার সাথে ঝিরঝির করে বৃষ্টি অনবরত এসে গাড়ির জানালার কাঁচে পড়ছিল। মিনিট পাঁচেক পর জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হলো যেন আমরা বহু বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত কালো পাথর অথবা কয়লার স্তূপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। কোথাও গাছপালা এমনকি ঘাস পর্যন্ত নেই। মনে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 'কোনা' শহরটির আশপাশেও হুবহু এই দৃশ্য দেখেছিলাম।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং আইসল্যান্ড—এ দুটি অঞ্চল -অনুরূপ আরও কয়েকটি অঞ্চলের মতো পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আগ্নেয় তৎপরতার অবদান। পৃথিবীর বহির্স্তরের ফাটল দিয়ে অতীতে তরল লাভা বেরিয়ে এসে ও ক্রমে জমাট

বেঁধে এ-দুটি অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নতুন জমাট লাভা দেখতে হুবহু কয়লার মতো।

আধঘণ্টার উপর গাড়ি এই স্তব্ধীভূত ও প্রাণহীন লাভার সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন নাটকীয়ভাবে পট পরিবর্তন হলো। চোখের সামনে দেখতে পেলাম সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি উপত্যকা, ক্রমে ঢালু হয়ে তা সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই উপত্যকাটিতেই আমাদের প্রত্যাশিত গন্তব্যস্থল—রেকিয়াভিক শহর।

আগেই বলেছি, রেকিয়াভিক আইসল্যান্ডের রাজধানী। ফাকসা উপসাগরের তীরে অবস্থিত বলে এখানে একটি বেশ বড় আধুনিক বন্দর রয়েছে। এদেশের আড়াই লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস রেকিয়াভিকে। 'ভিক' শব্দের অর্থ 'সমুদ্রের খাঁড়ি'। 'রেকিয়াভিক' নামের অর্থ 'খাঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ধূমাবৃত জনপদ'। ৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে নরওয়ে থেকে প্রথম যে-ব্যক্তি এসে এদেশে স্থায়ী পত্তন করেছিলেন তাঁর নাম ইনগোলফার আরনারসন। এই অঞ্চলটির দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রথমে নজরে পড়েছিল গাছপালায় ঢাকা একটি হরিৎ উপত্যকা, আর সে-অরণ্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে প্রচুর ধোঁয়া। বহু আগ্নেয়গিরি সমন্বিত আইসল্যান্ডে অগণিত উষ্ণ-প্রস্রবণ রয়েছে। উষ্ণ-প্রস্রবণগুলি থেকে বেরিয়ে আসা পুঞ্জীভূত বাষ্পকেই ইনগোলফার আরনারসন মনে করেছিলেন ধোঁয়া। তাই তিনি দিয়েছিলেন এই নামঃ রেকিয়াভিক।

ইনগোলফার আরনারসন ছিলেন নরওয়ের দুর্ধর্ষ 'ভাইকিং' বংশোদ্ভব। ওঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম নরওয়ের হ্যারদাল্যান্ডের বাসিন্দা। রেকিয়াভিক শহরে আইসল্যান্ডের বিখ্যাত ভাস্কর এইনার ইয়নসনের তৈরি ইনগোলফার আরনারসনের একটি সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি রয়েছে।

নবম শতাব্দীতে যখন ইনগোলফার আইসল্যান্ডে এসেছিলেন তখন আইসল্যান্ড 'ফুল্লকুসুমিত' ছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু 'দ্রুমদলশোভিনী' যে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দেশের শতকরা পঁচিশ ভাগ জমি, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি, তখন প্রচুর গাছপালায় ঢাকা ছিল। বার্চ, উইলো, রোয়ান এবং অ্যাসপেন গাছের প্রাচুর্য এসব বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চলগুলিতে ছিল। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে এ অরণ্যসম্পদ আইসল্যান্ডবাসীরা নির্মমভাবে ধ্বংস করেছে। এখন এদেশের এক শতাংশ মাত্র গাছে ঢাকা। বর্তমানে আইসল্যান্ডের কুড়ি শতাংশ জমি ঘাসে ঢাকা এবং পশুচারণযোগ্য। এক শতাংশ মাত্র জমি চাষযোগ্য। পর্বতসঙ্কুল আইসল্যান্ড লম্বায় চারশো মাইলের মতো এবং চওড়ায় প্রায় তিনশো মাইল। বর্গমাইলের হিসাব অনুযায়ী এদেশে ৩৯,৭৬৯ বর্গমাইল জমি রয়েছে। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এই আইসল্যান্ড।

চিন্তা-বিগর্হিত অরণ্যহননের ফলে ও প্রচণ্ড হাওয়া ও বৃষ্টিপাতে আইসল্যান্ডের তৃণাচ্ছাদিত মাটির বহিঃস্তর ক্রমেই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। জমির এই নগ্নীভবন এদেশের একটি প্রধান সমস্যা। ইদানীং আইসল্যান্ড সরকার আলাস্কা থেকে নানা রকমের গাছের চারা ও বীজ এনে এদেশের অরণ্যসম্পদ আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই শুভ প্রচেষ্টার ফল সমস্ত দেশে প্রতিফলিত হতে হয়তো আরো একশো-দুশো বছর লাগবে।

আইসল্যান্ডের আবহাওয়াকে আবহাওয়াবিদদের ভাষায় বলা হয় "শৈত্যযুক্ত মহাসাগরীয় আবহাওয়া"। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রোপকূলের শহর বা গ্রামগুলিতে কখনো কখনো তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। তবে মেরুপ্রদেশের ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণমুখী হয়ে বইতে শুরু করলে গ্রীষ্মকালেও আইসল্যান্ডে বেশ শীত পড়ে। উষ্ণ উপসাগরীয় সমুদ্রস্রোত এদেশের পাশ দিয়ে গেছে বলে সাধারণতঃ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে শীতকালেও বরফ তেমন একটা পড়ে না। কিন্তু দেশের পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে, বিশেষতঃ উত্তরাঞ্চলে, শীতঋতুতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। দেশের মাঝখানে বৃষ্টিচ্ছায়া

অঞ্চলে একটি ছোট মরুভূমিও রয়েছে।

আইসল্যান্ডে জলসম্পদ প্রচুর। বহু ছোট বড় নদী-নালা, ঝরনা ও হ্রদ প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। ছোট বড় জলপ্রপাতগুলিও সংখ্যায় অনেক। জল-বিদ্যুৎ-সম্ভাবনাময় এই জলপ্রপাতগুলি শুধু এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বাড়ায়নি, এদেশের অর্থনীতিতেও এদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবী ভূমিকা রয়েছে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় হিমবাহ আইসল্যান্ডে।

অদূর অতীতেও এদেশে প্রায় দুশো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ছিল। ইদানীং ঘুমন্ত ও জাগ্রত গোটা কুড়ি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এর মধ্যে হেকলা বিখ্যাত। আধুনিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছরে অন্ততঃ একবার আইসল্যান্ডে কোন-না-কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হবে।

দেশের উষ্ণ-প্রস্রবণগুলি ও তপ্তজঠর আগ্নেয় এলাকাগুলি থেকে গরম বাষ্প ও জল পাইপের সাহায্যে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সুইমিং পুল ও ঘর-বাড়িগুলি গরম করা ও অসংখ্য গ্রীন হাউসে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে নানা রকমের শাকসব্জী এমনকি কলা পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূগর্ভ-নিঃসৃত গরম বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তিও উৎপন্ন হচ্ছে।

এদেশের অর্থনীতিতে মাছ ও মৎস্যভিত্তিক উৎপন্ন-দ্রব্য, যেমন 'কর্ডলিভার অয়েল' ইত্যাদির ভূমিকা সর্বপ্রধান। বিদেশ থেকে আমদানী করা খনিজ বক্সাইট থেকে ধাতব এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু মুখ্য রপ্তানী-দ্রব্য হচ্ছে নানা রকমের মাছ ও তদ্ভব দ্রব্য। আমেরিকাতে আইসল্যান্ডের তৈরি পশমের সোয়েটারেরও চাহিদা রয়েছে।

এদেশে লোক-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের অধি-কাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করা। গাড়ি, যন্ত্রপাতি, জামা-কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই বিদেশ থেকে আনা হয়। তবে ভেড়ার মাংস, গোমাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এদেশেই প্রচুর উৎপন্ন হয়।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আইসল্যান্ড ইউরোপের সবচেয়ে গরিব দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আজ এদেশের জীবনযাত্রার মান ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির সমতুল্য।

এদেশের সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয় ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে। সে-বছর আইসল্যান্ড ডেনমার্কের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গত পঞ্চাশ বছরে বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে এদেশটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। দু-চার বছর আগে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির জন্য সাময়িক সমস্যা দেখা দিলেও তাতে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হয়নি।

মধ্যরাত্রির পর আমি রেকিয়াভিকের একটি হোটেলে পৌঁছালাম। নাম ঃ 'হোটেল ও দিনসভো'। প্রথমশ্রেণীর হোটেল, এক স্থানীয় পরিবার হোটেলটি চালান। এই হোটেলেই আমাকে দুরাত্রি থেকে তারপর যেতে হবে ৬৫ মাইল দূরে ফ্লুদির (Fludir) বলে একটি ছোট্ট শহর বা গ্রামে সেখানেই চারদিনব্যাপী রিট্রিট হবে।

ইউরোপের প্রথমশ্রেণীর হোটেলগুলির মান আমেরিকার সমশ্রেণীর হোটেলগুলির থেকে দু-এক ধাপ নিচে। শয়নকক্ষের সংলগ্ন বাথরুম, ইত্যাদি কয়েক বছর আগেও ইউরোপের অধিকাংশ হোটেলে ছিল না। আমেরিকার হোটেল-গুলির ক্ষেত্রে এটা যদিও অকল্পনীয়। কিন্তু রেকিয়াভিকের এই হোটেলটি অপেক্ষাকৃত নতুন বলে এর অধিকাংশ ঘরেই সংলগ্ন বাথরুম আছে।

আইসল্যান্ড সম্পর্কে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকেরই অজ্ঞতা প্রচুর। বছর তিনেক আগে রেকিয়াভিকে রাশিয়ার গোরবাচেভ ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগান মিলিত হয়ে-ছিলেন উভয় দেশের অস্ত্রসঙ্কোচ সম্পর্কে আলোচনা করতে। এই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর চোখ প্রথমবার আইসল্যান্ডের উপর পড়ে।

নানান দিক থেকে বিচার করলে আইসল্যান্ড এক অতি অভিনব দেশ। এদেশে কোনও সৈন্য-সামন্ত বা প্রতিরক্ষাবাহিনী নেই। সমস্ত দেশে বড় জোর শ-চারেক পুলিশ রয়েছে। এ ছাড়া একটি ছোট কমান্ডো ইউনিট আছে সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিহত করার জন্য। [ক্রমশঃ]

চিরগুরু

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

চন্দনাকে সকাল-সন্ধ্যে শেখান হলো, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। পাখি সারাদিন দাঁড়ে বসে কপচায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। বছরের পর বছর। ছোলা খায়, কলা খায়, লঙ্কা খায়, আর থেকে থেকে বলে, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। সেই চন্দনা একদিন চলে গেল হুলোর পেটে। বড় চিন্তার কথা। এমন ধার্মিক পাখিকে, রাম অথবা কৃষ্ণ কেউই রক্ষা করতে পারলেন না! কেন রক্ষা করবেন? পৃথিবীতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক যে রয়েই গেছে। থাকবেও চিরকাল। এর হাত থেকে তো নিষ্কৃতি নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভীষণ অসুস্থ। শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন ঠাকুরকে বললেন: "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রই শারীরিক রোগ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার এরূপ করলে হয় না?" ঠাকুর বললেন: "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারটাকে ভাল ভাবে বুঝে নিলে, দু-ধরনের সত্য বেরিয়ে আসবে। এক হলো পার্থিব সত্য। পৃথিবীতে যা ঘটে, যা ঘটে আসছে অনন্তকাল ধরে, যা ঘটবে চিরকাল। দেহ ধারণ করে যখন পৃথিবীতে এসেছি তখন দেহ ধারণের খাজনা আমাকে দিতেই হবে। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যুর কবচ পরেই জন্ম আমাদের। আমি এগোচ্ছি, আমার পাশে পাশে কাঁধে হাত রেখে পরম বন্ধুর মতো হাঁটছে মৃত্যু। তার ঝোলা-ঝুলিতে উপহারের অন্ত নেই। বহু ধরনের অসুখের আড়তদার। বহু বিচিত্র দুর্ঘটনার সংগঠক তিনি। কখন তিনি দয়া করে আমাকে কি দেবেন তিনিই জানেন। আমি জানি না। তিনি এক মহামান্য বিচারকের মতো। যেকোন সময়, যেকোন দণ্ড তিনি দিতে পারেন। এমন কোন উচ্চ আদালত নেই, যেখানে আমার আপিল চলবে। এরপর আছে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। ঈশ্বরের কোষাগার থেকে আমার জন্যে মোহর আসবে না। খাদ্যভাণ্ডার থেকে ভারে ভারে খাবার আসবে না। সবই আছে এখানে, আমাকে অর্জন করে নিতে হবে। দেহের মাঝখানে লেগে আছে পেট। সেই পেট আমাকে ঘোরাবে নাকে দড়ি দিয়ে। আমি কারোর দাস হব, কেউ আমার দাস হবে। বড় দাস, ছোট দাস, দাসের দাস, দাসানুদাস। কারোরই বলার উপায় নেই, আমি প্রকৃত প্রভু। একমাত্র প্রভু তিনি। পৃথিবীতে মানুষের খেলা যেভাবে সেজে উঠেছে তা হলো, লোভ, লালসা, বঞ্চনা, খুন, জখম, রাহাজানি। মরো, অথবা মারো। অনেক স্বপ্ন কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। পেঁয়াজী সত্যটা হলো, ঠাকুরের কথায়, খোসার পর খোসা ছাড়িয়ে যাও, শেষে সব শূন্য। হাতে আর কিছুই থাকবে না।

এই উপলব্ধিই মানুষকে ভাবায়, ভাবতে শেখায়, তাহলে আসল সত্যটা কি? পরা সত্য। ঠাকুর একটি গল্প বললেন: "একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ-অবস্থায় থাকতেন, কারও সহিত বাক্যালাপ করতেন না, লোকেরা তাঁকে পাগল বলে জানত। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন ও কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। তাই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং তাদের

মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগল। এই দেখে সেই সাধু লোকদিগকে বলতে লাগলেন, তোমরা হাসছ কেন?

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় প্রায়ই বলতেন ঃ "যে দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই মেরেছে।" এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর এই গল্পটি বলতেন ভক্তদের চৈতন্যোদয়ের জন্যে ঃ "এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, এক জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে, ভারি প্রহার করলে। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারি মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বললে মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হলো। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে, ওহে দেখি জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'মহারাজ। তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সাধু আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই। যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন—যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ হয়েছে তাদের আরেক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। এই জ্ঞানের নামই প্রজ্ঞান। পৃথিবী পালটাবে না। যা আছে তাই থাকবে। পালটাও নিজেকে! অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানে। সদানন্দে বাঁচার কৌশল আছে আমার ঠাকুরের কাছে। চৈতন্য হলে কি হয়? (১) বেতালে পা পড়ে না, (২) হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে-কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম, (৩) সেই বোধ জাগে, সমস্ত কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।

ঠাকুর আমার মতো চিরকালের গৃহীর চিরগুরু। সংসারে আছি পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁকে আমার হাতটি ধরিয়ে যাতে অন্ধকারে আলের পথে চলতে গিয়ে পড়ে না যাই। জমিদার পৃথিবী মারবে মারুক, যাঁর পৃথিবী তিনি এসে বাতাস করে দুধ খাওয়াবেন। ঠাকুর চেয়েছেন ঃ (১) সাধনা, (২) একটু লজ্জা, (৩) সচ্চিদানন্দে প্রেম, (৪) মৃত্যু-স্মরণ, (৫) বিশ্বাস, (৬) সতর্কতা, (৭) ব্যাকুলতা, (৮) মনে মনে ভাবো সব স্বপ্নবৎ। মনে রাখো—'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম'।



প্রবন্ধ

সমকালীন কবিদৃষ্টি ও রাধাতনু শ্রীচৈতন্য

দিলীপকুমার দত্ত

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কবি নরপতি হাল তাঁর 'গাথা সপ্তশতী'তে (২।২৪) লিখেছিলেনঃ "কইঅবরহিঅং পেম্মং ণত্থি বিঅ··· মানুসে লোএ।"—কৈতবরহিত অর্থাৎ আত্মসুখের বাসনাশূন্য প্রেম মনুষ্যলোকে একেবারেই নেই। সেই একই কথা শুনিয়েছেন পঞ্চদশ শতকের একান্ত প্রেমনিষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসও—"মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে" (বৈষ্ণব পদাবলী, পূর্বরাগ)। আবার গৌড়ীয় প্রেমদর্শনের মহাকাব্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।২) প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই একই মহাবাক্যঃ "এই প্রেমা নৃলোকে না হয়।"

কাম ও প্রেম এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই সর্বস্ব করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে চিরকাল অধিকাংশ মানুষ। তাই প্রেমের নামে ভোগ-পঙ্কের স্রোত বয়ে গেছে সর্বদেশে সর্বকালেই। সাহিত্যেরও একটা বড় অংশ এই কামায়ন-প্রাচুর্যকেই প্রেম-অভিধায় পরিচিত করে এসেছে দেশে-বিদেশে। ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেও দেখতে হয়—ভোগমুক্তির পথে প্রেমের অমৃতত্বে উত্তরণের দৃষ্টান্ত মুষ্টিমেয় দু-একজন কবির রচনায় মিললেও অধিকাংশের রচনায়ই কাম ও প্রেমের সীমারেখাটি কিন্তু খুবই অস্পস্ট। আর সেই একান্ত মুষ্টিমেয় অংশটিও একেবারে কৈতবরহিত কখনই নয়। এক কথায়,—যথার্থ প্রেমের পরম স্বরূপটি অর্থাৎ ভোগ-পঙ্কের ঊর্ধ্বে অমৃত মধুরসে ভরা, সহস্রদলে বিকশিত, লাবণ্য-স্নিগ্ধ, নিষ্পাপ, সৌরভময় তার কমলরূপটি প্রায় অপরিজ্ঞাতেই থেকে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি-চণ্ডীদাসে নিত্য-বিরহমগ্না শ্রীরাধায় প্রেম-বিবশ শ্রীচৈতন্য-স্বরূপটি বিমূর্ত বীজাকারে অবশ্য নিহিত ছিল। কিন্তু, সে-রাধা লোকচক্ষুর চির-অগোচরেই থেকে হারিয়ে যেত, যদি কল্পনার সে বিমূর্ত রাধাকে আপনার মধ্যে মূর্ত ও পূর্ণস্ফুট করে না তুলতেন চৈতন্যদেব। সম্ভোগ-বাসনার সরোবর থেকে কাম-কলুষ নাশে সমাজ, সাহিত্য ও মানুষকে মুক্তি দিয়ে অমৃতরসে নিত্যপূর্ণ প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করাতেই সেই কল্পিত রাধার মূর্ত অবতাররূপেই যেন আবির্ভাব চৈতন্যদেবের। কিংবা, জন্মলগ্নের দিকে তাকিয়ে বলা চলে—কলঙ্কিত রাহুগ্রাস থেকে সুনির্মল পূর্ণচন্দ্রের কান্তিকে উদ্ধার করতেই বোধ করি তমসাচ্ছন্ন পূর্ণিমায় শচীগর্ভসিন্ধুতে 'হরীন্দু'র আবির্ভাব।

মানবীয় প্রেম একান্তই পার্থিব জীবনের সম্ভোগ-বাসনায় পূর্ণ, বস্তুগত জীবনচেতনার সঙ্কীর্ণতায় তা একান্তই সীমাবদ্ধ। দিব্যপ্রেম কিন্তু এই মানবীয় প্রেমের পরিমার্জিত উন্নততর সংস্করণ নয়; তা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেতনা-মূল্য-আদর্শ ও সম্পূর্ণ ভিন্ন রসমণ্ডিত। বৈষ্ণব অভিধায় এ দুয়ের প্রথমটি 'কাম', আর দ্বিতীয়টি তা থেকে সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভূমারসবাহী—'প্রেম'। এই চির-স্বতন্ত্র প্রেমই উচ্ছ্বসিত ও ভাস্বর হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সকল সাধকের সাধনাচরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবন-চর্যায়। 'আপনি আচরি' সেই নিষ্কলঙ্ক প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে তা থেকে উত্থিত অবিনাশী আনন্দ-রসাস্বাদের চির-দুর্লভ অধিকার তিনি দিয়ে গেলেন সর্বশ্রেণীর মানুষকে। আচণ্ডাল মানুষকে এত বড় মূল্যদান করতে বর্ণাভিমানী মধ্যযুগে বিশেষ একটা দেখা যায়নি। এই পরম উদার প্রেমধর্মকে তাই সেদিন সাদরে বরণ করে নিয়ে নানা বিভেদ, সংস্কার, ধর্মগত দলাদলিকে ভুলতে চেয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ,—যার স্পষ্ট প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের রচনায়ঃ "During the Mughal rule the entire religious life of Bengal was transformed by Vaisnavism."[১] (মুঘল শাসনকালে বাংলার সামগ্রিক ধর্মীয় জীবন ছিল বৈষ্ণবাদর্শের দ্বারা রূপান্তরিত।) কিন্তু শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সেদিন উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই

[১] The History of Bengal (Muslim Period), Patna, 1977, P. 220

প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের বন্যায়,—যাঁর প্রেরণায় অদ্বৈতবাদী বারাণসীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী, উৎকলের বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও আপন আপন মত পরিত্যাগ করে প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরম বৈষ্ণব হয়ে উঠেছিলেন; দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগরের শাসক শ্রীরায় রামানন্দ হয়ে উঠেছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ,—এমনকি দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ পর্যন্ত ব্রজবুলিভাষায়—"জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা ..." বলে শ্রীচৈতন্যস্তুতির পদ রচনা করে পদের ভণিতায় শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভিক্ষা করেছিলেন—"শাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিকারী" বলে।[২] আর বাংলার কত মুসলমান কবি যে আপন ধর্ম ত্যাগ না করেও রাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে পদ রচনা করে শ্রীচৈতন্য-প্রেমধর্মকে হৃদয়ে বরণ করে নিয়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে বিপুলভাবে পুষ্ট করে তুলেছিলেন, তার কোন সঠিক হিসাব নেই।

তাহলেও, এই মানবদরদী উদার প্রেমধর্মের প্রচারের জন্য নয়, শ্রীচৈতন্য-জীবনের অখণ্ডত্ব নিহিত আছে তাঁর আপন সাধনায়, সেখানে তাঁর একমাত্র পরিচয় রাধাতনু শ্রীচৈতন্য হিসাবে। ভক্তগণের ভক্তি-আতিশয্যে বা তাত্ত্বিকের অপ্রত্যক্ষ অনুভবে কল্পনার বেদীতে নয়, সে-মূর্তি সচল জীবন্ত প্রেমাধার ও প্রেম-সাধকরূপে শ্রীচৈতন্যদেবে একান্ত মূর্ত হয়ে উঠেছিল অগণিত মানুষের দৃষ্টি-সম্মুখে, যার প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সমকালীন শ্রীচৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবিদেরই রচনা থেকে। কবি নরহরি সরকারের নিম্নোদ্ধৃত পদটির কথাই ধরা যাক:

"আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাহা পাঙ যাঙ কার সাথ॥
ক্ষণে ঊর্ধ্ববাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুদে 'হা নাথ!' বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥..."[৩]

প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-ভাবরূপের এমন নিখুঁত ও খুঁটিনাটি পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ-দশায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত এহেন অজস্র আচরণ ছিল সমীপবর্তী সকলেরই একান্ত প্রত্যক্ষের বিষয়। ভাগবতের গোপী-প্রেমাদর্শ পর্যালোচনাকালে ভক্তিবিদ্ পণ্ডিতগণ ভক্ত-সাধকের ভক্তি-বিবর্তনে প্রেমাস্পদ ঈশ্বর থেকে এরূপ বিচ্ছেদ-বেদনার নিত্যদহনকেই প্রেমভক্তি-সাধনার সর্বশেষ পরিণতি ও প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন।

এই কারণেই প্রেমকে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—"বিষামৃতে একত্রে মিলন" বলে।[৪] এই বিরহ-বেদনার নিত্য অনুভবেই ভক্তচিত্ত প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের ভাবচিন্তায় নিত্য বিভোর থাকে, সেই বিভোরতায় অন্তর্গভীরে জাগে প্রগাঢ় অতীন্দ্রিয়-মিলনাস্বাদ। সে আস্বাদ গভীরতায় ভক্ত-সাধক গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার মতো বলতে পারেন—"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।"[৫] এই নিত্য বিভোরতাই ভক্তের সর্বোচ্চ রূপ। এই কারণেই 'নারদ-ভক্তিসূত্র'-কার (সূত্র ৭০, ৬৭) 'তন্ময়াঃ' অর্থাৎ তৎ (ভগবৎ) চিন্তায় নিত্য বিভোর এবং অনন্যচিত্ত এরূপ ভক্তকেই 'একান্তিনো মুখ্যাঃ' বা শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাদান কালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে যে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক তত্ত্বমূর্তি দান করা হয়েছিল অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ ও বহিরঙ্গে রাধাভাবদ্যুতি ও রাধা প্রেম-মানসিকতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশরূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, সে-তত্ত্বের জন্ম কিন্তু সমকালীন চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী মানুষগণের ঐতিহাসিক অনুভবে—যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন নরহরি সরকার প্রমুখ কবিগণই। তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শন সঞ্জাত অভিজ্ঞতার অনুভবে স্পষ্ট

২ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৪।২।২৯
৫ পদাবলী, পদ ৫৯৬
৩ ঐ, ৪।৭।৮
৪ চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২

ধরা পড়েছে :

"চিতে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাথী ॥"[৬]

তুলনামূলক বিচারে অবশ্য শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক কবিবৃন্দের রচনায় এবং সাধারণ মানুষের অনুভবে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণরূপ এবং কৃষ্ণাবতার ঈশ্বর-স্বরূপটিই প্রাধান্য পেয়েছিল, আর চৈতন্যদেব পুরুষ বলে প্রাথমিক বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তৎকালীন গৌড়েশ্বর স্বয়ং সুলতান হুসেন শাহও শ্রীচৈতন্যকে যে কৃষ্ণাবতার পরমেশ্বররূপেই দেখতেন, তার পরিচয় মেলে কবি বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুলতানেরই উক্তিতে :

"হিন্দু যারে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে ॥"[৭]

শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সহচর গদাধরকে রাধাজ্ঞান করে গদাধর-শ্রীচৈতন্যের যুগল-মূর্তি রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিরূপে দর্শনের বাসনাও ফুটে উঠেছিল সমকালীন কবিকণ্ঠে :

"কহে রামানন্দ—সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ ॥"[৮]

এমনকি, বৃন্দাবন-নাগর শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে নদীয়া-নাগররূপে শ্রীচৈতন্যকে বর্ণনা প্রয়াসে বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, মাধব ঘোষ প্রমুখ সমকালীন কবিরা লেখনী-বিস্তার করেছেন।

এদেরই পাশাপাশি স্বল্প হলেও শ্রীচৈতন্যলীলা-প্রত্যক্ষকারী স্থিতধী কবিপ্রজ্ঞায় ও সাধারণ জনমানসে শ্রীরাধাভাবিত কৃষ্ণপ্রেম-সাধক শ্রীচৈতন্যের রাগমার্গীয় মহাভাব—প্রেমসাধনার মূর্তিটিও কিন্তু ধীরে ধীরে আপনার আবরণ-মোচন ঘটিয়ে পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের সেই রাগনিষ্ঠ প্রেম-সাধনা প্রত্যক্ষ করে জগৎবাসীকে স্পষ্টই জানালেন—শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব না ঘটলে শ্রীরাধার প্রেমরস-মহিমার প্রকৃত স্বরূপ মানুষের চির-অজ্ঞাতই থেকে যেত :

"গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে ?"[৯]

কবির সে-উপলব্ধির পূর্ণ সমর্থন মেলে চৈতন্যদেবের আর এক পার্শ্বচর ও কবি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর—"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগত কস্য ? ..." ইত্যাদি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের' (১০।১৩০) বর্ণনায়। এই কবিই পূর্বে বারাণসীধামে বেদান্তকেশরী প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-মাধুর্যরসের আকর্ষণে আপন মতাদর্শ পরিত্যাগ করে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম-গ্রহণ করে ইষ্টরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন কৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যরসের পূর্ণতম আস্বাদন রাগাত্মিকা মহাভাবের সাধনায়—একথা শ্রীচৈতন্যই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার আনুগত্যে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমনিষ্ঠাকেই শ্রীচৈতন্য একমাত্র সাধনলক্ষ্য করে তুলেছিলেন :

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"[১০]

—"হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি শুধু এই কামনাই করি জন্মে জন্মে যেন তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের এই একান্ত রাধাত্ম-ভাবসত্যকেই পরবর্তী কালে কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দ সকাশে স্বীকৃত করে নিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকণ্ঠে :

"গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে-অন্যজন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্যরস করি আস্বাদন।"[১১]

বাস্তবিক, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই একান্ত বাস্তব রাধাভাবোন্মত্ত কৃষ্ণবিরহাতুর দশার বর্ণনা সমকালীন কবিগণের রচনায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে। যেমন, কবি বাসুদেব ঘোষের গৌরবিষয়ক পদ :

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ-নয়নে ॥"[১২]

৬ গৌরপদতরঙ্গিণী, ১।১।২৯
৭ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়
৮ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৫।৪।২৬
৯ ঐ, ১।১।৩০
১০ শিক্ষাষ্টক, ৪
১১ চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮
১২ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৪।৬।১৫

কিংবা ঃ

"আজু কেন গোরাচান্দের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান॥"[১৩]

অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—রাধা-প্রেমমানসিকতার মান-বিরহাদি নানা ভাবকেন্দ্রিক এসকল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ কৃষ্ণপ্রেমসাধক শ্রীচৈতন্য-মূর্তি দর্শনের একান্ত স্বাভাবিক ফসল, যার ফলে অনায়াসেই বলা চলে—চৈতন্যপরবর্তী কালে 'গৌর-চন্দ্রিকা' পদের যে ভাব-মাধুর্য অপরূপ হয়ে উঠেছিল কবি গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী-সাহিত্যে, তারও সুস্পষ্ট সূচনা শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক কবি-দৃষ্টিতেই।

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সকল বিরহোন্মত্ত দশাই পরবর্তী কালের 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণব কাব্য-দর্শন-অলংকারগ্রন্থে রাধা-প্রণয় মহিমার পরমরূপের প্রকাশ ও বিকাশ-সাধনকারী অধিরূঢ়-মোহনাত্মক মহাভাব সঞ্জাত দিব্যোন্মাদ দশারূপে গৃহীত হয়েছে। যা ছিল একমাত্র শ্রীরাধার সম্পদ, রাধাতনু হিসাবে শ্রীচৈতন্যকেও দেওয়া হয়েছে সে মহাভাবের পূর্ণ অধিকার। শ্রীচৈতন্যজীবনে এ বিরহের সূচনা সন্ন্যাস গ্রহণেরও পূর্বে গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদনকালে[১৪] আর পূর্ণ বিকাশ শেষ দ্বাদশ বৎসরের দিব্যোন্মাদ দশায়,—যে সুদীর্ঘ-কালের অজস্র আচরণে তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমাত্ম রাধারূপটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি কারোরই। অন্যতম শ্রীচৈতন্যপার্ষদ কবি মুরারি গুপ্তের দিনপঞ্জীজাতীয় রচনা—'কড়চা' তথা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্' কাব্যে একান্ত-তথ্যনিষ্ঠ জীবনকাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষণ হিসাবে তাই বারবার প্রযুক্ত হয়েছে—'রাধারসবিলাসী', 'রাধাভাব-মাপন্নম্', 'রাধারসাবেশঃ', 'শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তঃ', 'শ্রীরাধাভাবমাধুর্যপূর্ণঃ'—ইত্যাদি শব্দমালা।[১৫]

'পদাবলী'তে শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপ অংকন করতে গিয়ে তিনি শ্রীরাধাকণ্ঠে ব্যবহার করেছেন ঃ

"পীরিতি আগুন-জ্বালি সকলই পুড়াইয়াছি
জাতি-কুলশীল অভিমান॥

*

যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আর নাহি ভায়।—"[১৬]

এই সমস্ত যে চৈতন্যদেবেরই একান্ত অন্তরের কথা—অন্তরঙ্গ পার্ষদের সে 'মধুর চাতুরী' আমাদের কাছেও ধরা পড়ে যায় অনায়াসেই। চৈতন্যযুগের ও পরবর্তী কালের পদাবলীতে শ্রীরাধার এহেন বহু আচরণ ও মানসিকতাই শ্রীচৈতন্যে দৃষ্ট আচরণ ও মানসিকতার অনুসরণেই পুষ্ট।

শ্রীচৈতনাদেবের সন্ন্যাসজীবনের আর এক নিত্য সহচর কবি স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব মাধুরীকে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে সর্বপ্রথম দার্শনিক তত্ত্বমূর্তি দান করলেন তাঁর 'কড়চা'র —"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিঃ ..." এবং

১৩ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৪।৭।১

১৪ "অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে॥
সর্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥"

এবং

"যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ সাগরে॥ —চৈতন্যভাগবত, ১।১২

১৫ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম, ৩।৫।১৪, ৩।১৫।২৩, ৪।৫।১৫, ৪।২০।১৪, ৪।২৪।১

১৬ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৩।২।৪৭

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো···" এই দুই কাব্য শ্লোকে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে যা সংকলন করে দিয়েছেন। প্রথমটিতে লীলাজনিত প্রেম-রসাস্বাদ বাসনায় তত্ত্বতঃ অভিন্নতনু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন দেহ-ধারণের কথা উল্লেখ করে শ্রীচৈতন্যে উভয়ের আবার একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে শ্রীচৈতন্যকে কবি প্রণাম জানিয়েছেন ঃ "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥" আর দ্বিতীয়টিতে শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রণয় মহিমার স্বরূপ, আপনার মাধুর্য-বৈশিষ্ট্য এবং সে মাধুর্যের আস্বাদনে শ্রীরাধার আনন্দ গভীরতার স্বরূপ অনুধাবনে ব্রজলীলায় অসমর্থ শ্রীকৃষ্ণের মোট এই তিনটি অপূর্ণ বাসনার পরিপূরণের উদ্দেশ্যে 'রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার' করে শ্রীকৃষ্ণের নূতন জন্মগ্রহণে ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং শ্রীচৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণে সে-ইচ্ছার পূর্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই দুই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবতত্ত্বের যে সূচনা ঘটল বৈষ্ণব-দর্শনে, তাকে অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক কিংবা ভক্তের ভক্তি-আতিশয্যের ফল বলার কোন পথ থাকে না। চৈতন্য-পরবর্তী কালে কবি গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখের রচনায় রাধাতনু হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেবের অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমসাধনার অজস্রবিধ বর্ণনা যে অপূর্ব মাধুর্য ও ভাবরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অসংখ্য কাব্যে, নাটকে, পদসাহিত্যে ও জীবন-চরিতে, সেই অমৃতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-সমকালীন কবিগণের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরই একান্ত স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত বিবর্তন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন ঃ

> "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
> সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।"[১৭]

রামকৃষ্ণদেবও তাঁর সমগ্র সাধকসত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ঃ ভক্তির যে পূর্ণ পরিণতি—'মহাভাব', তা ঈশ্বরকোটি ছাড়া কারুর হয় না। গোপীদেরও হয়নি। একমাত্র শ্রীমতীর (অর্থাৎ শ্রীরাধার) হয়েছিল। স্বামীজীও বলেছেন, চৈতন্যদেবের মধ্যে সেই মহাভাব একান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল। খ্রীস্টীয় প্রেমসাধক সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসির মধ্যে এই প্রেমসাধনার নৈকট্য খুঁজে পেলেও দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন—"···the emotional flow in Chaitanya seems to be more self-centred and deeper."[১৮]—শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগের প্রবাহ অধিকতর আত্মমগ্না ও গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার সম্পদ বিশ্বজগতে অলভ্য সেই মহাভাব-সত্তার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।[১৯]

স্বর্গীয় আচার্য রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে একটি অপূর্ব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে ঃ

> "বহুযুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনরায় তাহা নির্বাণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি।"[২০]

ভারতবর্ষের সমগ্র ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে তার পরম স্বরূপের আবিষ্কার, ঈশ্বরের অনির্বচনীয় পূর্ণাঙ্গ মাধুর্যরসসত্তার উদ্ঘাটন এবং সে-রসের আস্বাদে পরিপূর্ণ ও অবিনাশী আনন্দের আলোক-ঝরনায় অবগাহন একমাত্র শ্রীরাধাভাবে রাগমার্গীয় ভক্তি-প্রেমরসের সাধনায় শ্রীচৈতন্যের গভীরতম অনুধ্যানের ফলেই সম্ভব হয়েছে, যা যুগ-যুগান্তব্যাপী দুশ্চর তপস্যার পরম সিদ্ধিই বটে।

১৭ চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২

১৮ A History of Indian Philosophy, Vol. IV (1975), P. 389

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থভাগ, ৭ম সং (১৩৭৩), পৃঃ ১৯৩

২০ বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড (১৩৭২), পৃঃ ৬৮৫

সেই এক

স্বামী গোপেশানন্দ

কিছু কিছু মানুষ আছেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যাঁদের কাজই হচ্ছে—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে বের করা। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন—'ওরে পণ্ডিত। এক বই দুই নেই।' আবার কিছু কিছু মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়—একটার সাথে আর একটার পার্থক্য খুঁজে বের করায় সদাসর্বদা তৎপর। চরম অবস্থায় এঁরা আবার বলেন—'ওরে মূর্খ। দুইটা একও সমান নয়।' এঁরা মহাশয় ব্যক্তি। আর আমাদের মতো যারা না-পণ্ডিত না-মূর্খ তাঁদেরও এই তত্ত্বগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে ভাল লাগে।

শাস্ত্রের অনুশাসন—"মুড়ি-মিছরির একদর করবে না।" যা হচ্ছে কয়লা, তাই হচ্ছে হীরা—এই কথা বৈজ্ঞানিক যত প্রমাণসহকারেই বলুন না কেন এই ব্যবহারিক জগতে কয়লা ও হীরা কোন দিনই একদরে বিক্রি হয়নি এবং হবেও না। যদি হতো তাহলে মজুতদারদের দৌলতে কয়লা বাজার থেকে উধাও হয়ে যেত। সবই যদি এক হয়, কোন বৈচিত্র্য যদি না থাকে তাহলে এই ব্যবহারিক জগতে কোন আনন্দ থাকে কি? ধরা যাক, সবকিছুর রঙ একই রকম লাল—শুধুই লাল। আর কোন রঙ সেই—লালে লাল—সব লালাকার। তখন লালে ও অন্ধকারে কোন পার্থক্য থাকবে কি? সুতরাং বৈচিত্র্যবোধ আছে বলেই যে ব্যবহারিক জগৎ আছে, এমন কথা বললে আশা করি খুব ভুল বলা হবে না।

যাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেন, তাঁরা এই ঐক্য বলতে কি বোঝাতে চান সে-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেকের মনে খটকা আছে—স্বীকার করতেই হবে। যেমন—আমি বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাই, ডান হাতে চামর দোলাই। যে-আমি ঘণ্টা বাজাই, সেই আমি চামর দোলাই—এটা মোটামুটি বুঝতে পারি। কিন্তু যখন আমি লিখছি আর আপনি আমার শ্রাদ্ধ করছেন—এই দুইজন যদি এক জনই হন, তাহলে দুইজনই হচ্ছে—'আমি' অথবা 'আপনি'; কেননা ফরমুলো বলছে—এক বিনা দুই নেই।

আমার হাত, আমার পা, আমার মস্তিষ্ক ইত্যাদি নানা কোষে অর্থাৎ নানা প্রাণীর সমবায়ে তৈরি হচ্ছে আমার শরীর। এই শরীরের নানা প্রাণীর খবর আমি রাখি না; কাউকে ঘৃণাও করি না, যদিও পেট একটা রীতিমত সেপটিক ট্যাংক। নিজের পেটকে কে আবার ঘৃণা করে? অতি বাস্তববাদীরা আবার পেটকেই মনে করেন—'আমি'।, কারণ, পেটের ওপর তাঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা। ভালবাসায় কিনা হয়? ভোটকা গন্ধও ভালবাসায় চন্দনের সৌরভ ছড়ায়। ভোটকা গন্ধ বলে সত্যি সত্যি কিছু আছে কিনা এই নিয়ে যথেচ্ছ বিতণ্ডা চালান যেতে পারে। সে-পথে যেতে চাই না, যাবার দরকারও নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য—এই দুই থিয়োরির কোন ঐক্য খুঁজে বের করা যায় কিনা তার চেষ্টাই করছি। বলতে চাই, আমার শরীরটা একটা প্রাণিসমাজ এবং এই সমাজের আয়তন আমার ক্ষুদ্র শরীরটুকু নিয়েই। এমন অবস্থায় আমি যদি পৌঁছাতে পারি যখন আমার বোধ হবে—আপনার শরীর, পেত্নীর শরীর, আমার পরম শত্রুর শরীর ইত্যাদি সকলের শরীর নিয়ে আমার এই শরীর অর্থাৎ সকলকে নিয়ে 'আমি'-বোধ—তখন সেই বিরাট 'আমি'ই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেছিলেন। তখন ঘৃণা বলে কিছু থাকতে পারে না—তখন শুধুই বাসনা-বিহীন ভালবাসা। তাই হয়তো বলা হয় প্রকৃত 'আমি' হচ্ছেন ভালবাসা-স্বরূপ। এই ভালবাসা থেকে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ—ভালবাসার দ্বারাই সৃষ্ট।

বর্তমান জাপানে নারী

আগের তুলনায় জাপানী নারীর জীবন বহুমুখী হয়েছে। সেখানে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পুরুষরা কাজ করবেন এবং মেয়েরা বাড়িতে থাকবেন—এইরকম বিশ্বাস যেসব মেয়ে করতেন তাঁদের সংখ্যা ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৪৮.৮ শতাংশ, ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে সে সংখ্যা নেমে এসে হয়েছে ৩৬.৬ শতাংশ। সেইরকম মেয়েরা পেশাদারী হবেন না, এরূপ বিশ্বাসীর সংখ্যা ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ৩৮.৭ শতাংশ থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; অপরপক্ষে যেসব মেয়ে পেশাদারী হওয়ার পক্ষপাতী, তাঁদের সংখ্যা ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ৫১ শতাংশ থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ৬৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। যেসব পুরুষ মনে করতেন মেয়েদের পেশাদারী হওয়া উচিত নয় তাদের সংখ্যা ৫৭.৭ শতাংশ হতে ৩৭.৫ শতাংশে নেমেছে, আবার যাঁদের মত বিপরীত, তাঁদের সংখ্যা ৩০.৬ শতাংশ থেকে ৫৫.২ শতাংশ হয়েছে। এই ধরনের মতের পরিবর্তন এইটাই নির্দেশ করে যে, বর্তমানে মেয়েরা ইচ্ছা করলে বাড়িতেও থাকতে পারেন, আবার কাজেও বের হতে পারেন, প্রতি বছরই জাপানে মেয়েদের চাকরিতে নিয়োগের হার বেড়ে যাচ্ছে।

সরকারি শ্রমদপ্তরের উইমেনস ব্যুরো থেকে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় বর্তমানে ১,৫৮,৪০০০০ জন নারী কাজে নিযুক্ত; এই সংখ্যা কর্মে নিযুক্ত সমগ্র স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার ৩৬.২ শতাংশ (যে সংখ্যা ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৩২ শতাংশ)। তাছাড়া উচ্চশিক্ষিত নারীর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে।

কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার ৩৫.২ শতাংশ হচ্ছে একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু ৩৫ শতাংশ হচ্ছে এক পরিবারের স্বামী অথবা স্ত্রী। যেসব নারী বিবাহ, সন্তান-প্রসব বা সন্তান-পালনের জন্য চাকুরি ছেড়ে দেন, তাঁদের সংখ্যা ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ছিল ২৫.২ শতাংশ, ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৫.৬ শতাংশ। অন্যদিকে অবসর-গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেছেন, এঁদের সংখ্যা ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১ শতাংশ, ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ২.৩ শতাংশ। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে গড়পড়তা মাসিক বেতন মেয়েদের ছিল ২০২৬৬৪ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা), পুরুষের ছিল ৩৮৪৪৯৯ ইয়েন। দেখা গিয়েছে বেতনের এই বিভিন্নতা কম বয়সের মেয়ে এবং পুরুষদের মধ্যে কম, তবে বেশি বয়সে বিভিন্নতা বেড়ে যায়।

বর্তমানে আংশিক সময়ের (Part time) কর্মী নারীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল ৩০.৪ শতাংশ, ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে দাঁড়িয়েছে ৫০.৪ শতাংশ। এই আংশিক সময়ের কর্মীদের মধ্যে ৩৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের নারীর সংখ্যা বেশি। ঘণ্টা হিসাবে এইসব কর্মী পান ৬১০ ইয়েন (১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে পেতেন ৪:৯ ইয়েন)। এই বেতন পুরো সময়ের নারী কর্মীরা যা পান (৪৩৭ ইয়েন) তার ৭২.৯ শতাংশ।

সংসারী মেয়েদের কর্মে নিযুক্ত হবার প্রধান আকর্ষণ আর্থিক স্বচ্ছলতা। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন—"অলস হয়ে বসে থাকতে চাই না", "দিন যাপনে নূতনত্ব আছে", "খালি সংসার নিয়ে থাকা ক্লান্তিকর।" অফিসে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (কম্পিউটার প্রভৃতি) চালু হওয়ায় মেয়েরা কর্মের পরিমাণ ভিত্তিতে (piece work) কাজ নিচ্ছেন।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, কর্মে স্ত্রী-পুরুষদের সমান সুযোগ দেবার আইন পাশ হয়েছে। অনেক কোম্পানি এর পরে চাকুরিগুলিকে দুভাগে ভাগ করেছে—'কম্প্রেহেন্সিভ', যাতে দেশের অন্যত্র বদলি করা যাবে, এবং 'জেনারেল' যাতে বদলি করা যাবে না। মেয়েরা দুটিতেই যোগ দিতে পারেন। এতে মেয়েদের কর্মে যোগ দেবার সুযোগ বেড়েছে। আগে যেসব কাজে কেবল পুরুষরা যোগ দিতেন (যেমন হেলিকপ্টারের পাইলট হওয়া, পার্লামেন্টে পাহারা দেবার সিকিউরিটি গার্ড হওয়া, জাহাজে নাবিক হওয়া), এখন সেসব কাজে মেয়েরাও যোগ দিচ্ছেন।

[Japan Calling, September 1989, pp, 10-11]

পোলিও টিকা সম্বন্ধে কিছু নূতন চিন্তা-ভাবনা

জলধিকুমার সরকার

পোলিও বা পোলিওমায়েলাইটিস (Polio-myelitis) কথাটি এখন অনেকেরই জানা. দেশের অশিক্ষিত কিছু লোক এই নামটির সঙ্গে পরিচিত না হলেও, সামান্য জ্বর হওয়ার পরে জীবনভোর কোন অঙ্গ (বিশেষ করে পা বা হাত) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারটির সঙ্গে তারা পরিচিত। ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ জনের পোলিও রোগ হয়. এ একটি ভাইরাস (Virus-জীবপরমাণু) ঘটিত অসুখ। রোগীর মলের সঙ্গে ভাইরাস নির্গত হয়ে পানীয়ের বা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে অন্ত্রে তারা বংশ-বৃদ্ধি করে ; তারপর রক্তস্রোতে প্রবেশ করে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডস্থিত সুসুম্নাকাণ্ডকে (spinal cord) আক্রমণ করে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে। মস্তিষ্কের নিম্নাংশ আক্রান্ত হলে (Bulbar paralysis) মৃত্যুও হতে পারে। এই অসুখের কোন নির্ধারিত ওষুধ নাই. তবে এই রোগের প্রতিরোধক ভাল টিকা আছে। পোলিও টিকা সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাভাবনাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Bacteria) বা জীবপরমাণুকে উত্তাপ বা ঔষধ দ্বারা মেরে ফেলে, তাকে শরীরে ইনজেকশন দিলে শরীরে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা জন্মে। একে মৃতজীবাণুটিকা বা মৃতজীবপরমাণুটিকা (Killed vaccine) বলে. যা টাইফয়েড বা জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। আর একভাবে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি করা যেতে পারে ঃ জীবাণু বা জীবপরমাণুকে ল্যাবরেটরিতে প্রতিকূল অবস্থায় বারেবারে চাষ করে এদের রোগসৃষ্টিকারী ক্ষমতা নষ্ট করা হয়, কিন্তু তাদের রোগপ্রতিরোধ-কারী ক্ষমতা থেকে যায়। এই অবস্থায় জীবাণু বা জীবপরমাণুকে মুখে খাইয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে টিকারূপে ব্যবহার করা যায়। কে জীবন্ত ক্ষতিহীন টিকা' (Living ıttenuated vaccine) বলে। ষাটের দশকে পোলিও রোগ নিবারণে মৃতজীবপরমাণু টিকা (আই, পি. ভি.—Inactivated Polio Vaccine ; অন্য নাম, আবিষ্কারকের নামানুসারে Salk vaccine বা 'সল্ক' টিকা) চালু হয় এবং এই টিকা ব্যবহারে আমেরিকায় পাঁচ বছরে রোগাক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ কমেছিল। তিন-মাত্রায় এই টিকা ইনজেকশন মাধ্যমে দেওয়া হয়। এর পরে আবিষ্কৃত হলো জীবন্ত ক্ষতিহীন টিকা (ও. পি. ভি.—Oral Polio Vaccine, আবিষ্কারকের নামানুসারে—Sabin বা 'সেবিন' টিকা) যা তিনমাত্রায় মুখে খাওয়ানো হয়। ও. পি. ভি. ব্যবহারে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল বা প্রায়-নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য সুইডেন, হল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড আই. পি. ভি. ব্যবহারের দ্বারাই রোগমুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে সর্বত্র এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ও. পি. ভি. ব্যবহৃত হয় এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে ই. পি. ই. (Expanded Programme of Immunisation) প্রোগ্রামে শিশুদের জন্য টিকা-দানের যে বৃহত্তর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তাতে ছয়টি রোগের টিকার মধ্যে ও. পি. ভি.-ও আছে। ও. পি. ভি. ব্যবহারে আই. পি. ভি. থেকে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে (ক) এতে শিশুকে ইনজেকশন দিতে হয় না বলে মায়েরা খুশি এবং টিকা দেওয়া সহজ ; (খ) শরীরে রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতাসৃষ্টি ছাড়া, জীবন্ত ভাইরাস অন্ত্রে বাসা বেঁধে থাকার জন্য এরা নবাগত রোগসৃষ্টিকারী (wild) পোলিওভাইরাসকে বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। তুলনামূলকভাবে, এতে অসুবিধা হচ্ছে ঃ (ক) শিশুর পেট খারাপ থাকা-না-থাকা অনুযায়ী ও. পি. ভি. ভাইরাস অন্ত্রে বংশবৃদ্ধি নাও করতে পারে ; সে-ক্ষেত্রে শরীরে প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি হবে না। (খ) ভাইরাসকে জীবন্ত রাখতে সবসময় টিকাকে নিম্ন-তাপমাত্রায় রাখা আবশ্যক ; আই. পি. ভি.-কেও ঠাণ্ডায় রাখতে হয়. তবে এবিষয়ে কড়াকড়ি অতটা নয়। পোলিও ভাইরাস জাতিগত-

ভাবে তিন শ্রেণীর আছে—টাইপ এ, টাইপ বি ও টাইপ সি (Types A, B & C)। তিন জাতের ভাইরাসেরই পক্ষাঘাত করার ক্ষমতা আছে বলে ও. পি. ভি. ও আই. পি. ভি.—উভয় টিকাই, তিনটির সংমিশ্রণে তৈরি হয়, কারণ এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অন্য শ্রেণীর ভাইরাস-আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। টিকা নেওয়ার পরে শরীরে সৃষ্ট রোগপ্রতিরোধক্ষমতা কালক্রমে কমে আসার জন্য উভয় টিকা শিশুদের তিন-চার বৎসর পরে আবার টিকা নিতে বলা হয়।

কয়েক বৎসর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভারতে ও অন্যান্য কিছু দেশে ও. পি. ভি. খাওয়ানো সত্ত্বেও সামান্য কিছু সংখ্যক শিশুর পোলিও রোগ হয়েছে। এব্যাপারে প্রথমে সন্দেহ হলো যে, ঠিকমত ঠাণ্ডায় না রাখার জন্য ও. পি. ভি.-র কিছু ভাইরাস জীবন্ত নেই। কিন্তু তাপমাত্রা ঠিক রাখা সত্ত্বেও এরূপ হতে দেখা গেছে। তাতে সন্দেহ হলো যে, জীবন্ত ভাইরাসগুলির মধ্যে কারো কারো হয়তো রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে আসায় সে রোগ সৃষ্টি করেছে; এটি প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় সন্দেহ হলো যে, যে-শিশুটি ও. পি. ভি. খাওয়া সত্ত্বেও রোগগ্রস্ত হয়েছে, তার আন্ত্রিক গোলযোগের জন্য টিকা কার্যকরী হয় নাই। টিকা কার্যকরী না হওয়ার কারণ যা-ই হোক, ও. পি. ভি. আবিষ্কারের পরে যে কথা শোনা গিয়েছিল—এই টিকা খাওয়ালে শিশু আজীবন অর্থাৎ 'দোলনা অবস্থা থেকে কবর পর্যন্ত' ("From cradle to the tomb") পোলিও রোগ হতে রক্ষা পাবে, সে-ধারণা কিছুটা ঘা খেয়েছে। এদিকে আই. পি. ভি.-র আবিষ্কারক ডাঃ সল্ক বরাবর তাঁর টিকার শ্রেষ্ঠতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলে আসছেন, কারণ এই টিকা ইনজেকশন দিলে আন্ত্রিক অবস্থার অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হয় না। তাছাড়া তিনি আই. পি. ভি. প্রস্তুতিকরণেও আগের চেয়ে অনেক উন্নতি সাধন করেছেন।

সে যাই হোক, উপরিউক্ত অবস্থার সমাধানে নানারূপ চেষ্টা চলছে—(১) তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে কয়েক জায়গায় শিশুদের ও. পি. ভি. খাওয়ানো হচ্ছে; অন্য অনুরূপ জায়গায় আই. পি. ভি. ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। কয়েক বছর এদের উভয় দলের উপর লক্ষ্য রাখা হবে—কোন্ দলে টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে পোলিও রোগ না দেখা যায়। (২) কেউ কেউ পরীক্ষা করে দাবি করছেন যে, ও. পি. ভি. তিন মাত্রায় না খাইয়ে চার বা পাঁচ মাত্রায় খাওয়ালে বেশি সুফল পাওয়া যায়। (৩) কারো কারো মতে ও. পি. ভি. টিকাতে তিন শ্রেণীর ভাইরাস না মিশিয়ে এক এক শ্রেণীর ভাইরাস দিয়ে তৈরি করা টিকার পর অন্য শ্রেণীর ভাইরাস টিকা পর পর খাওয়ালে ভাল ফল হয়। (৪) পোলিও ভাইরাসের কার্যকরী দেহাংশ নিয়ে তৈরি টিকাও (Sub-unit Polio vaccine) প্রায় তৈরি হয়ে আসছে। এতে টিকার প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে এবং টিকার ভাইরাস অংশ হতে পোলিও রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। (৫) কেউ কেউ বলেছেন যে, শিশুকে প্রথমে আই. পি. ভি. ইনজেকশন দিয়ে পরে ও. পি. ভি. খাওয়ানো আরও নিরাপদ, কারণ আই. পি. ভি. শরীরে খানিকটা রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা আগেই তৈরি করে রেখেছে।

পোলিও রোগের উভয় টিকাই মোটামুটিভাবে কার্যকরী। কিন্তু আমাদের মতো বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশে পোলিও দূরীকরণের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কিভাবে সারাদেশের প্রত্যেক নবজাতককে নিয়মমতো এই টিকা প্রয়োগ করা যায়। বর্তমানে দেশে যে ও. পি. ভি. চালু আছে, তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টিকরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যদি টিকা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, কর্তৃপক্ষ দেশের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে তা করবেন। তবে পোলিও টিকা সম্বন্ধে সারা বিশ্বে যেসব চিন্তা-ভাবনা চলছে তার সঙ্গে পরিচিত থাকলে টিকা সম্বন্ধে কোন পরিবর্তনকে মেনে নিতে পাঠকের সুবিধা হবে। বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও পুরাতন মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকা বিজ্ঞান-মানসিকতার অনুকূল নয়।

গ্রন্থ পরিচয়

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

জীবন মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ নৈঃশব্দ্যের রূপ ঃ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। ভাষান্তর ঃ সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পনের টাকা।

প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রচারক ও একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মিস মেয়ো 'মাদার ইন্ডিয়া' গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতকে পৃথিবীর সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগী হলে বিপ্লবী ধনগোপাল 'A Son of Mother India Answers' (1928) নামে গ্রন্থের মাধ্যমে এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। বিদেশীদের এই ধরনের কার্যকলাপ ও অপপ্রচারের জবাবে পরবর্তী কালে তিনি 'Visit with Me' (1929) নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'My Brother's Face' নামক গ্রন্থে তিনি অগ্রজ যাদুগোপালের বিপ্লব-জীবন ও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ জীবনপণ সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। বিদেশে তাঁর গ্রন্থগুলি ছিল যথেষ্ট জনপ্রিয়।

আলোচ্য গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ নৈঃশব্দ্যের রূপ'। গ্রন্থটি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Face of Silence' নামে ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত ক্ষুদ্র-পরিসর এই গ্রন্থে ধনগোপাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, দিব্যজীবন, ধর্মীয় আদর্শ, সমকালীন জনজীবনে তাঁর প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। অনুবাদের গুণে গ্রন্থটি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থটি বিদেশীদের জন্য লেখা—হয়তো এই কারণেই তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ না করে সহজভাবে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তিনি এই দিব্যপুরুষের জীবন ও শিক্ষা সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে ঘৃণ্য অপপ্রচারের দিনে ধনগোপালের এই গ্রন্থ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছিল।

একালের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বর্তমান গ্রন্থের কোন তথ্যই হয়তো নতুন নয়, কিন্তু এই বৃহৎ পরিমন্ডলের বাইরে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এই গ্রন্থ থেকে নতুন পথের সন্ধান পাবেন এবং সহজভাবে এক আলোকময় পুরুষের জীবন ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গ্রন্থের বেশ কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর এবং অযথার্থ। গ্রন্থের অনুবাদক পাদটীকায় কয়েকটি ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, বেশ কিছু ভ্রান্তি তিনি চিহ্নিত করেননি। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রামাণ্য সূত্রের আশ্রয় যেমন গ্রন্থকার নিয়েছিলেন, তেমনি অনেক তথ্য অন্যান্যদের কাছেও নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। তথ্যগত ত্রুটির প্রধান কারণ ঐ নির্বিচার গ্রহণের মধ্যেই নিহিত। তবে গ্রন্থটির আদ্যন্ত এক অনবদ্য অকপটতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবে মণ্ডিত। এবং সেটিই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, মূল ইংরেজী গ্রন্থটি পড়েই বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে প্রথম আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং সেই আকর্ষণের ফলশ্রুতি রোলাঁর সুপরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী।

বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ কৃষ্ণা সেন। গ্রাফিটেক ইন্ডিয়া লিমিটেড, ২১ বি, গুরুসদয় রোড, কলিকাতা ৭০০০১৯। কুড়ি টাকা।

ষাটের দশকে একজন বিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ জার্মান পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। নাম—ম্যাক্সিমিলিয়ান

ফন রগিস্টের। তিনি ভারতে এসেছিলেন 'সত্য' ভারতের সন্ধানে, ভারতের আত্মার অন্বেষণে। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি 'সত্য' ভারতবর্ষের অস্তিত্বে, একটি শাশ্বত ভারতাত্মার প্রবহমানতায়—যা সহস্র বিপর্যয় ও পরিবর্তনের তরঙ্গের মধ্যেও আজও বিদ্যমান এবং ভাবী কালেও বিদ্যমান থাকবে এবং তার জন্যই ভারত আজ 'বেঁচে' আছে, তার 'মৃত্যু' হয়নি। সেই সত্য ভারতবর্ষের সন্ধানে রগিস্টের ঘুরেছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, গিয়েছেন নানা মঠ-মন্দির-আশ্রমে, সদা-সতর্ক বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী এবং রচনাবলী। এই মনীষীদের মধ্যে আছেন রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং বিবেকানন্দ। আধুনিক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় লোকনায়ক ও মনীষীদের কেউই রগিস্টেরের বিবেচনায় 'সত্য' ভারতবর্ষের 'আত্মা'র যথার্থ প্রতিভূ নন। অবশেষে তিনি পেয়েছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে যিনি তাঁর জীবন ও বাণীতে প্রমূর্ত করেছিলেন 'সত্য' ভারত-বর্ষের 'আত্মা'কে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

হ্যাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণই। ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের প্রজ্ঞা, সাধনা, মনীষা তাঁর মধ্যে বিগ্রহায়িত হয়েছে বলে ভিনদেশী এই বিদগ্ধ পর্যটকের উপলব্ধি হয়েছে। তাঁর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণই 'সত্য' ভারতবর্ষ; শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতের শাশ্বত আত্মার সাকার বিগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাস্তবিকই তাই, সেকথা সহজ-ভাষায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন আলোচ্য 'লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি কথা নির্বাচন করে সেগুলি নিজের চিন্তা ও বিশ্লেষণ অনুসারে শ্রীমতী সেন ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে যেন ভারতবর্ষই কথা বলছে—যে-ভারত চিরন্তন, যে-ভারত পুরাতন আবার একই সঙ্গে যে-ভারত চির-নবীনও। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার বিশেষত্ব এইখানেই যে, তিনি সার্থকভাবে, নিখুঁতভাবে ভারতের শাশ্বত প্রজ্ঞাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কি অভিনবত্ব কিছু নেই? তাঁর নিজস্বতা বা মৌলিকতা কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। অভিনবত্ব তাঁর উপস্থাপনে; নিজস্বতা বা মৌলিকতা তাঁর নিখাদ অকপটতায় যা তাঁর অপরোক্ষ উপলব্ধি সঞ্জাত। রাসকিনের সেই পরিচিত কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "That virtue of originality that men so strive after, is not newness ···it is only genuineness."

তাঁর এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের একজন যথার্থ আচার্য হয়েছেন, হয়েছেন একজন আদর্শ লোকশিক্ষক। আদর্শ আচার্য বা লোকশিক্ষক তিনিই হতে পারেন যিনি মানুষকে আধ্যাত্মিক আলোকের পথের সন্ধান দেন, সেই পথে অগ্রসর করিয়ে দেন, খবর দেন ঈশ্বরের রাজ্যের। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সবই করেছেন। উপরন্তু একটি বিষয় সম্পর্কে তিনি জগৎকে অবহিত করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বর। তাঁর কথামৃতের নির্যাসকে যদি দু-এক কথায় প্রকাশ করতে বলা হয় তাহলে বোধ হয় বলা যায় যে, 'প্রত্যেক মানুষই অব্যক্ত ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরত্বকে জীবনে প্রকাশই জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর আমরা জীবনে হয়ে উঠি না বা হয়ে যাই না। অন্তর্নিহিত অর্থে ঈশ্বর আমরা আছিই। ঈশ্বর 'হয়ে ওঠা' অর্থাৎ ঈশ্বরত্বকে জীবনে প্রকাশ করা এবং অবশেষে 'হয়ে যাওয়া'-তেই জীবনের চরিতার্থতা।' বলা বাহুল্য, ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ধর্মশাস্ত্র উপনিষদেরও সারকথাও এটি। আপন জীবন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের সমক্ষে ভারতের সেই সনাতন বাণীকে সাকার করে দেখিয়ে গিয়েছেন। এবং সেকারণেই তিনি আদর্শ লোকশিক্ষক। আলোচ্য গ্রন্থটির লেখিকার সাফল্য এইখানে যে, অত্যন্ত বিনম্র ভঙ্গিতে, সহজ সরল ভাবে এবং গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভার-তাত্মার প্রতীক-পুরুষকে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি যে ব্যাখ্যাত্রী এভাব গ্রন্থটিতে কোথাও নেই। তাঁর ভাব যেন এইরকমঃ

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

(গীতা, ১০।৯)

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৯ ডিসেম্বর '৮৯ শ্রীশ্রীমায়ের ১৩৭তম আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানে অগণিত ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। দুপুরে ১৫,৫০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে স্বামী নির্জরানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ৬ ডিসেম্বর '৮৯ **মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের** নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

৭ ডিসেম্বর তিনি .মাদ্রাজ **স্টুডেন্টস হোম** পরিচালিত ছাত্রাবাসের নবনির্মিত দ্বিতল ও ত্রিতলের উদ্বোধন করেন।

গত ১৪ ডিসেম্বর পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ **কোয়েম্বাটোর** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পরিচালিত কলেজের রিসোর্স এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টারের 'কম্প্যুটোরাইসড রেল প্রোডাকস্যান সিস্টেম'-এর উদ্বোধন করেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর রাজমন্দ্রী (অন্ধ্রপ্রদেশ) আশ্রমের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তিটি উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে পরদিন তাঁর সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল গত ২৫—৩০ ডিসেম্বর '৮৯ কামারপুকুরে এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে ৭৫০ জন রোগীর মধ্যে ১২৪ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ২১ ডিসেম্বর আগরতলা আশ্রমও একদিনের একটি চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে মোট ৫৮ জন রোগীর ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ছাত্র-কৃতিত্ব

গত ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালিত বি. এসসি (অনার্স) পরীক্ষায় **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, সারদাপীঠ**-এর এক জন ছাত্র রসায়ন বিদ্যায় ৮ম স্থান অধিকার করেছে।

পরিদর্শন

মেঘালয়ের স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড-এর চেয়ারম্যান বি. বি. লিংদো গত ১৬ ডিসেম্বর **চেরাপুঞ্জী আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ: নেলোর জেলার কোন্ডা-পুরম মণ্ডলের ছয়টি গ্রামের একহাজার ঝঞ্ঝা-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের **রাজমন্দ্রী আশ্রমের** মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, পশমী-কম্বল, বাসন প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শৈত্য-ত্রাণ: **জয়রামবাটী ও কামারপুকুর** আশ্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকেদের ২০০টি পশমী কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি: গত জানুয়ারি শনি ও রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ ও ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং স্বামী গণেশানন্দ। গত ১৮ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি পূজা, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৮ জানুয়ারি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিও পালিত হয়।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার: গত ডিসেম্বর মাসের (১৯৮৯) রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, ১৭ ডিসেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং ২৪ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে যীশুখ্রীস্টের জীবন ও বাণী আলোচনা করা হয়। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় 'অপরোক্ষ অনুভূতি'র ওপর এবং প্রতি

মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী যতিরাজানন্দ (বেঙ্কট রামন) গত ১৬ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্ন বছর। হৃদরোগ জনিত কিছু সমস্যা থাকলেও তাঁর স্বাস্থ্য ইদানীং ভালই ছিল এবং স্বাভাবিক কাজকর্মও তিনি করছিলেন। বিশাখাপত্তনম থেকে তিনি রাজমন্দ্রী আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি-স্থাপন উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ঐ উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় নিজের আসনে বসেই তিনি গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন। স্বামী যতিরাজানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি চিঙ্গেলপত্তু আশ্রমের প্রধান নিযুক্ত হন। তার আগে তিনি কাণ্ডীপুরম আশ্রমের কর্মী ছিলেন। পরে তিনি মালদায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশাখাপত্তনম কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন এবং দেহত্যাগ পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলেন। তাঁর কার্য-কালে তিনি আশ্রমের মন্দির, চিকিৎসালয়, সাধুনিবাস নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়ন কার্যে হাত দিয়েছিলেন। সহজ-সরল অমায়িক স্বভাব এবং কঠোর সাধু[illegible] জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন

গত ৩ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ১২৫তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন হাজার ভক্ত নর-নারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাতটায় 'সারদানন্দ হল'-এ তাঁর জীবনের নানা বৈশিষ্ঠ নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী।

গত ১০ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

গত ১৮ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যা সাতটায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী।

জাতীয় যুবদিবস উদ্যাপন

গত ১২ [illegible] বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন)-এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় যুবদিবস উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ৬ জানুয়ারি আবৃত্তি ও বক্তৃতা (প্রতিটিতে দুটি বিভাগ) প্রতিযোগিতার [illegible] করা হয়। ১০০ জন যুবক-যুবতী (বয়স ১৫-৩০) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১২ জানুয়ারি যুবদিবসে 'স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও যুবসমাজ' বিষয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হয় এবং প্রতি-যোগিতার সংশ্লিষ্ট বিভাগে ১ম স্থানাধিকারীরা তাদের বক্তৃতা ও আবৃত্তি শ্রোতবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করে। [illegible]পতিত্ব করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান। তরুণ সাংবাদিক তরুণ গোস্বামীও ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উদ্বোধন-এর যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গ্রন্থাবলী পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। তাছাড়া অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকেই স্বামীজীর 'জাগো, যুবশক্তি' বইটি উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল এবং শ্রোতবৃন্দের মধ্যে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগে বরানগর মঠের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৯ অক্টোবর ১৯৮৯ বরানগর মঠ প্রাঙ্গনে (১২৫/১, প্রামাণিক ঘাট রোড) শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর বিশেষ পূজা হয়। এরপর বাৎসরিক উৎসব ১৯ নভেম্বর সারাদিন ব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ভজন, বাউল সঙ্গীত, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু। ১৭ ডিসেম্বর স্থানীয় যুবক-যুবতীদের নিয়ে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্বামী মেধসানন্দ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা।

গত **২২শে অক্টোবর,** ১৯৮৯ নদীয়া ও তৎসংলগ্ন উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচার পরিষদের চতুর্থ সম্মেলন **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ** সঙ্ঘের পরিচালনায় পরিষদের সভাপতি স্বামী অনাময়ানন্দের সভাপতিত্বে ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মোট ১২৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী কৌশিকানন্দ এবং স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ ভাষণ দান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (রামপাড়া, হুগলী)-এর উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর '৮৯ বিকালে মহেশটিকুরিয়া গ্রামে (তেঁতুলতলা) শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় পাঁচশো ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন কানাইলাল দে। উপজাতি-অধ্যুষিত এই গ্রামে এই সভা উপজাতিদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর, '৮৯, প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও ভজন, পরে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ, ও সন্ধ্যায় ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী প্রভাকরানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ ভাঙ্গড় (দঃ ২৪ পরগনা) গত ১ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচী মাধ্যমে দ্বাদশ বার্ষিক কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবে প্রায় ২০ হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছিল। প্রায় তের হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি এবং দুহাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বক্তা ছিলেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তিনাথানন্দ, স্বামী শুদ্ধরূপানন্দ ও স্বামী গোপেশানন্দ। অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী কৌশিকানন্দ।

গত ৭ জানুয়ারি '৯০ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উপলক্ষে কলকাতার **টালিগঞ্জ বাসীদের** পক্ষ থেকে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৭টায় গল্ফ ক্লাব রোড পল্লী থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। স্বামীজীর বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও স্বামীজীর বাণী পাঠ করতে করতে শোভাযাত্রাটি টালিগঞ্জের বিভিন্ন পল্লী পরিক্রমা করে। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন)-এর অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন-এর যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সহ ৭জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শোভাযাত্রায় যোগদান করেছেন। এবার ছিল এই অনুষ্ঠানের সপ্তম বর্ষ। এই অঞ্চলে শোভাযাত্রাটি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড) গত ১৯ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৭তম

জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় সিভিল হাসপাতালে উপজাতি রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শক্তিসাধন অধিকারীর পৌরোহিত্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দ। অধ্যাপক দেবাশিস দত্ত এবং জগদীশ ভট্টাচার্যও সভায় বক্তব্য রাখেন। সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য ১৫টি শাল স্বামী সুমেধানন্দের হাতে অর্পণ করা হয়।

সাহেবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (চম্পাহাটি দঃ ২৪ পরগনা) গত ১৭ ডিসেম্বর '৮৯ শ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৭তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে উৎসব উদযাপিত হয়। বিকালে কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। রজনী নস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেন কুমারেশ দাশশর্মা ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের যুব শাখার পরিচালনায় গত আগস্ট '৮৯ থেকে ডিসেম্বর '৮৯ পর্যন্ত তিনটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৬তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথম অনুষ্ঠান হয় ২৭ আগস্ট কাঁঠালতলা গ্রামে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় ৩ সেপ্টেম্বর চরসরাটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এবং তৃতীয় তথা মূল অনুষ্ঠানটি হয় ২৩ ডিসেম্বর কল্যাণীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যুব প্রতিনিধিগণ এইসব অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে। মূল অনুষ্ঠানের দিন ভারোত্তোলনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কুমারী সমিতা সাহাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী সত্যদেবানন্দ, ডঃ তাপস বসু প্রমুখ।

২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং দিবসত্রয় ব্যাপী ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন কৈলাসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সম্পন্ন হয়। এতে পরিষদের অধিবেশন, ভক্ত সম্মেলন, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন আশ্রমে অনুষ্ঠিত সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ১৭টি আশ্রমের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী শান্তিদানন্দ। প্রতিদিন ধর্মসভায় বিভিন্ন বক্তা ও স্বামী শান্তিদানন্দ ভাষণ দেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক **বনবিহারী ভট্টাচার্য** গত ২৭ ডিসেম্বর '৮৯ তাঁর লেকটাউন 'কালিন্দী'র (কলিকাতা) বাসভবনে করজপরত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। কর্মজীবনে তিনি কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুলেখক ও সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষতঃ বাগেরহাট (বাংলাদেশ) এবং কাঁথি (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তিনি তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে উদ্বোধনে (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন এবং তাঁর আশীর্বাদলাভে ধন্য হন। মৃত্যুর প্রায় পাঁচমিনিট পূর্বে তাঁর পুত্র-কন্যাদের একাধিকবার তিনি বলেছেন, 'ঠাকুর, মা এসেছেন'। 'গুরুদেবকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এই শিক্ষাব্রতীর সংস্পর্শে এসে বহু ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

দাঁতের অসুখ

দাঁতের যত্নের জন্য কি কি করতে হবে

(১) দাঁতের ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা শুরু হওয়া পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করবেন না। ব্যথা-বেদনা আরম্ভ হয় একেবারে শেষকালে—অর্থাৎ রোগ ছড়িয়ে পড়ার এটি অন্তিম-পরিণতি। মাড়ি থেকে রক্তপাত হওয়াই রোগের ইঙ্গিত।

(২) তামাক-পাতার গুঁড়ো বা যেসব টুথ-পাওডার দিয়ে ঘষে ঘষে দাঁত মাজলে ক্ষত তৈরি হয়, সেসব দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যেস পরিত্যাগ করুন। এগুলো দাঁতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) সমস্ত দাঁতই যাতে যথাযথ বর্তমান থাকে, সেদিকে মনোনিবেশ করবেন। দাঁত পড়ে গেলে, বাঁধিয়ে নেবেন। পড়ে যাওয়া দাঁতের শূন্যেস্থানটি মাড়ির রোগের পক্ষে অনুকূল।

(৪) দাঁতে গর্ত হলে, দেরি না করে ভরিয়ে ফেলুন। দেরি করলে, কাজটি আর সহজসাধ্য হবে না।

(৫) দাঁতে পাথরি জমা, মাড়ি লাল হওয়া বা তা থেকে রক্তপাত হওয়া মাড়ির রোগের বিপজ্জনক ইঙ্গিত। দাঁত স্কেলিং বা পরিষ্কার করা ক্ষতিকর নয়—বরং, যোগ্য দন্ত-চিকিৎসককে দিয়ে যদি আগে-ভাগেই করিয়ে নিতে পারেন, আপনি আরামই পাবেন।

(৬) পান খেলে, খইনি খেলে, ধূমপান করলে মাড়ির রোগের উৎপত্তি হয় না বটে, কিন্তু যদি রোগটি থেকে থাকে, তবে এগুলো তাকে বাড়িয়ে দেয়।

(৭) কঠিন, ছিবড়েযুক্ত বা অমসৃণ খাবার খাবেন—যেমন কাঁচা শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদি। এগুলো পুষ্টিকর এবং দন্ত-স্বাস্থ্যের সহায়ক।

(৮) সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও রাত্রিতে শুতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করা স্বাস্থ্যকর অভ্যেস। প্রতিবার খাদ্য-গ্রহণের পর ব্রাশ করা বাঞ্ছনীয়।

(৯) বৈজ্ঞানিক রীতিতে দাঁত ব্রাশ করবেন। ভুলভাবে ব্রাশ করলে দাঁতের ক্ষতি হবে। সিল্ক-ফ্লস বা খড়কে ইত্যাদির মধ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলোর ব্যবহারও জেনে নিন।

(১০) যে-কোন দুবার খাদ্য-গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে যাতে চটচটে, আঠালো কোন খাবার না-খায়, সে-বিষয়ে আপনার শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

[ডাঃ জি. বি. শাঙ্কওয়ালকার, প্রাক্তন ডিন এবং বর্তমান কন্সালট্যান্ট, গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, বম্বে ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭. ১২. ১৯৮৯, পৃঃ ৭]

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কর্মশক্তির উপর সমীক্ষা

স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় হায়দ্রাবাদের ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অফ নিউট্রিশন এক শিক্ষণ-শিবিরে স্ত্রী ও পুরুষ হকি খেলোয়াড় ও স্ত্রী-দৌড়বিদদের (track athelets) (মোট ১০০ জন) কর্মশক্তির (energy balance) উপর পরীক্ষা করেছিল। উনপঞ্চাশজন স্ত্রী-হকি খেলোয়াড়দের শরীরের গড় ওজন ছিল ৪৯.৮ ± ১ কেজি ; ২১ জন দৌড় খেলোয়াড়দের ছিল ৫০.২ ± ৪.৮ কেজি ; ৩৩ জন পুরুষ হকি খেলোয়াড়দের ওজন ছিল ৬০.২ ± ৭.১ কেজি। খাবারের মাধ্যমে শক্তি গ্রহণের (energy in-take) হিসাবে দেখা যায়—স্ত্রী-হকি খেলোয়াড়রা প্রতিদিন নিয়েছে ৩২০০ কে. ক্যালরি ; স্ত্রী-দৌড়বিদরা ৩৩০০ কে. ক্যালরি ; পুরুষ-হকি

খেলোয়াড়রা ৪২০০ কে. ক্যালরি। পুরুষরা প্রতিদিন মাংস, মাছ ও ডিম নিয়ে প্রোটিন খেয়েছে ২৩০ গ্রাম, স্ত্রী খেলোয়াড়রা ১৮০ গ্রাম। শক্তিক্ষয়ের (energy expenditure) হিসাবে দেখা যায়, তিন শ্রেণীর খেলোয়াড়রা শক্তি গ্রহণের চেয়ে শক্তিক্ষয় কম করেছিল। শারীরিক পরিশ্রম হিসাব করলে—স্ত্রী-হকি খেলোয়াড়রা দিনে ৫ ঘণ্টা খেলা অভ্যাস করেছে, অন্য দুদল করেছে দিনে ৩ ঘণ্টা। স্ত্রী-দৌড়বিদরা দৈনিক নিদ্রা-বিশ্রামে কাটিয়েছে ১৭.৪ ঘণ্টা, স্ত্রী-হকি খেলোয়াড়রা কাটিয়েছে ১৫.৪ ঘণ্টা। এইসব তথ্য থেকে শিক্ষণ-শিবিরে প্রতিদিনের খাবারের তালিকা ও খাবারে শক্তির পরিমাণ এইভাবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ঃ পুরুষ হকি-খেলোয়াড়দের ৭০ কে. ক্যালরি প্রতি কেজি প্রতিদিন এবং স্ত্রী-হকি খেলোয়াড় ও দৌড়বিদ ৬৫ কে. ক্যালরি প্রতি কেজি প্রতিদিন।

[Nutrition News, Vol. 10, No 4, July 1989]

পিঁপড়ে ও গাছের পারস্পরিক সহযোগিতা

গাছ ও কীট-পতঙ্গ কিভাবে রাসায়নিক দ্রব্যকে সংবাদ-প্রেরণের কাজে লাগায়, তা অনুসন্ধান করার জন্য স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক উইলিয়াম উড়, আফ্রিকার কেনিয়া দেশের নাইরোবিতে গিয়েছিলেন। বাবলা গাছের ডালে গোল ফলের মতো এক ধরনের জিনিস ঝুলতে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে সেগুলি পিঁপড়ার বাসা।

কিছু উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ কয়েক প্রকার ফিরোমন (Pheromon) তৈরি করে। অবশ্য কীট-পতঙ্গের ফিরোমন সম্বন্ধেই বেশি তথ্য জানা গিয়েছে। এই ফিরোমনগুলির কাজ নানা ধরনের। অনেক স্ত্রী-কীটের শরীর থেকে একরকমের ফিরোমন বের হয় যা পুরুষ-কীটকে আকর্ষণ করে; পুরুষ-প্রজাপতির গা থেকে নির্গত ফিরোমনের গন্ধে উড়ন্ত স্ত্রী-প্রজাপতি নেমে আসে। পিঁপড়েরা ভাল খাবারের সন্ধান পেলে যাতে অন্য পিঁপড়েরা সেখানে চিনে যেতে পারে, এজন্য ফেরার সময় ফিরোমন ছড়িয়ে যায়।

কেউ বাবলা গাছের ক্ষতি করতে গেলে পিঁপড়েরা তাদের গোলাকৃতি বাসা থেকে বের হয়ে তাকে আক্রমণ করে। পিঁপড়েরা যখন গাছের ডালে এদিক-ওদিক যায় তখন সোজা পথে যায়। কিন্তু উত্তেজিত হলে এলোমেলোভাবে ছোটে। তখন তারা ফিরোমন ছাড়তে থাকে; যাতে অন্যান্য পিঁপড়ে (এমন-কি ৩০ ফিটের মধ্যে অন্য গাছে থাকা পিঁপড়েরা পর্যন্ত সতর্কিত হয়। পিঁপড়ের শরীর-ব্যবচ্ছেদ করে কেবল মাথা-মুখ অংশেই ফিরোমন পাওয়া গেছে। ফিরোমন বিশ্লেষণ করে তাতে দুটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেছে (3-octanone এবং 3-octanol) এদের যে-কোন একটি বা দুটির সংযোগ পিঁপড়েকে উত্তেজিত করতে পারে।

বাবলা গাছ পিঁপড়েদের আশ্রয় দেয় ও খাবার যোগায়। বাবলাকাঁটাগুলি পিঁপড়েদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। এক-একটি গোল বাসায় প্রায় তিনশো প্রাপ্ত-বয়স্ক পিঁপড়ে থাকে। বাসা থেকে বের হবার একটি মাত্র পথ থাকে। বাবলা গাছের পাতার গোড়ায় যে মিষ্টি রস থাকে তাই পিঁপড়েদের খাদ্য, তবে প্রোটিন-খাদ্যের জন্য তারা গাছের নিচে থাকা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে হত্যা করে। এক একটি গাছে প্রায় ২০,০০০ পিঁপড়ে থাকে। পিঁপড়েদের একটি রানী পিঁপড়ে থাকে সে ডিম পেড়ে চলে; অন্য পিঁপড়েদের বেশিরভাগ খাদ্য সংগ্রহ করে ও বাচ্চাদের মানুষ করার কাজ করে।

বাবলা-কাঁটাকে অগ্রাহ্য করার একমাত্র বড় জন্তু হলো জিরাফ যা কাঁটাসমেত ডালে কয়েক কামড় দিয়েই তাড়াতাড়ি অন্য গাছে চলে যায়, যাতে পিঁপড়েরা আক্রমণ করার সুযোগ না পায়। স্থানীয় আফ্রিকানদের ধারণা—ভগবান পিঁপড়েদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন গাছে; আবার গাছকে রক্ষার জন্য হিংস্র পিঁপড়ে-সৈন্য দিয়েছেন।

[Animal Kingdom, Sept-Oct 1988 pp 46—49]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



চৈত্র
১৩৯৬
৯২ তম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজাব সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ—৩য় সংখ্যা   মার্চ, ১৯৯০   চৈত্র, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

বৈষ্ণব-লক্ষণ

তৃণ হৈতে নীচ হৈঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইবে॥

সদা নাম লইবে যথালাভেতে সন্তোষ।
এই তো আচার করি ভক্তিধর্ম পোষ॥

শ্রীচৈতন্য

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

কথাপ্রসঙ্গে

ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ভারতপ্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য, নূতন এক ধর্মান্দোলনের তিনি প্রবক্তা এবং প্রবর্তক, বঙ্গদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের তিনি নায়ক এবং নূতন এক ইতিহাসের স্রষ্টাও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য এক সাংস্কৃতিক রেনেশাঁসের উদ্গাতা। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তাঁহার সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা হইল এই: তিনি ছিলেন পৌরুষহীন এক পুরুষ। সারাজীবন তিনি শুধু কান্নাকাটি করিয়াই কাটাইয়াছেন। গয়ায় পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে যাওয়ার পর হইতে তাঁহার মধ্যে অদ্ভুত এক ধর্মোন্মাদনার আবেশ হয় এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় তাঁহার কান্না। সেই যে কান্নার সূচনা তাহা আর কোনদিন বন্ধ হইল না। অবশিষ্ট জীবনও শুধু কান্না আর কান্না। কিন্তু প্রামাণিক প্রাচীন জীবনীগ্রন্থগুলিতে তাঁহার যে চিত্র পাই তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে দেখি, তিনি ছিলেন পুরুষসিংহ। আকার ও আচরণ উভয় বিচারেই তিনি ছিলেন পৌরুষের সাকার বিগ্রহ। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন:

"চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥

একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার স্বামী সারদেশানন্দ আসাধারণের ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন: "সকল কার্যেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অপরিসীম বুদ্ধি, অপূর্ব চরিত্র, অতুল কর্মদক্ষতা, মহান হৃদয় ও অলৌকিক অধ্যাত্মসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ...তাঁহার জীবন বলবীর্যের উৎস, মৃতসঞ্জীবনী সুধা। আমরা এখন নির্বীর্য বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে পারি না।"

শেষের বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং আমরা যেন আমাদের নির্বীর্যতার কিছুটা অন্ততঃ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুরুষসিংহ চৈতন্যদেবের দিকে তাকাই। এইবিষয়ে তাঁহার প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থগুলি এবং সমকালের ঐতিহাসিক পটভূমির কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমাদের সাহায্য করিবে। সমকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ভূমিতে চৈতন্যদেবের সমুচ্চ অবদানের কিয়দংশ অন্ততঃ আমরা তখন অনুধাবন করিতে পারিব। দেখিব ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁহার কাছে কী বিপুল পরিমাণে ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি প্রায় উপেক্ষিতই রহিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা ও অবদান লইয়া কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিশেষ চোখে পড়িতেছে না। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার আবির্ভাবের পাঁচশতম বর্ষপূর্তি (তাঁহার জন্ম ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি—দোল পূর্ণিমার দিন) উপলক্ষে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ নদীয়া জেলায়, তাঁহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা-সভা ও স্মরণিকা-শ্রেণীর কিছু প্রকাশনা হইয়াছিল। কিন্তু সে-সকলই তাৎক্ষণিক উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলশ্রুতি এবং জয়ন্তী-উৎসবের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা যেমন অন্তর্হিত হইয়াছে, চৈতন্যদেব-সম্পর্কিত সকল সারস্বত প্রয়াসও যেন তেমনই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

একথা সত্য যে, শ্রীচৈতন্য প্রধানতঃ একজন ধর্মাচার্য এবং ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ধর্ম বা অধ্যাত্মক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের অবদান অপেক্ষাকৃত বহু-আলোচিত। তাই বর্তমানে আমরা তাঁহার বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রাণতার আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার অন্যতর অবদান লইয়া কিছু আলোচনা করিব। একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, চৈতন্য-পরবর্তী কালে তাঁহার ধর্মান্দোলনে অনেক আবিলতা প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁহার দীপ্ত জীবন অধঃপতিত জাতিকে উত্থানের পথ দেখাইয়াছিল, জাতি উত্থিতও হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অনুগামিগণ তৎ-প্রচারিত ধর্মান্দোলনকে তাঁহার অবর্তমানে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অযোগ্যতায় এই বৃহৎ ও মহৎ ধর্মান্দোলন ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। পতনের দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গদেশের সমাজে আসিয়াছিল এক চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের যুগ। হিন্দুধর্ম তখন যথার্থই, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "ভাতের হাঁড়িতে" আশ্রয় লইয়াছিল। উচ্চবর্ণের হাতে তখন ধর্ম পণ্যবিশেষে পর্যবসিত হইয়াছিল, জাতিভেদের পাপ সমাজকে করিয়া তুলিতেছিল পঙ্গু এবং আচার-সর্বস্বতার নাগপাশ সমাজজীবনের ভিত্তিকে

করিয়া তুলিতেছিল চূড়ান্তভাবে শিথিল। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল মুসলমান রাজপুরুষদের (শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই বঙ্গদেশ মুসলমান শাসনাধীনে আসিয়াছে। বঙ্গে তুর্কী বিজয়ের ফলে ইসলাম তখন এদেশের রাজধর্মে পরিণত হইয়াছে।) বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও আবার মুসলমান শাসকদের অনুগ্রহ লাভের জন্য স্বেচ্ছায় তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। অন্যদিকে ধর্মধ্বজী হিন্দুসমাজপতিরা কথায় কথায় মানুষকে, বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের মানুষকে. তাহাদের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া ...ত, সমাজচ্যুত করিয়া চলিতেছিলেন, অথবা তাহাদের তথাকথিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বিধান দিতেছিলেন যথেচ্ছ অর্থদণ্ডের বা নানা শারীরিক নির্যাতনের। গোঁড়া সমাজপতি-দের এবম্বিধ অত্যাচার ও মাত্রাধিক রক্ষণশীল-তায় অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা বাধ্য হইয়া দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিতেছিল নবাগত ইসলামধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের ছত্রছায়ায়। এইভাবে নিম্নবর্ণের বিরাট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুসমাজের সম্পর্ক শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। যাহারা দিবালোকে মানুষকে ধর্ম-বিচ্যুতি ও সামাজিক অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করিতেছিলেন, তাঁহারাই আবার ধর্মের নামে রাত্রির অন্ধকারে দেশজুড়িয়া বহাইয়া দিতে-ছিলেন বীভৎস বামাচারের, নির্লজ্জ যৌনাচারের নির্বাধ কর্দমাক্ত ধারা। সমাজ ও জাতির জীবনে বাস্তবিকই তাহা এক চরম অন্ধকার অধ্যায়।

ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহার বিরল প্রতিভা, দুর্জয় প্রত্যয় এবং গভীর প্রেমের ঐশ্বর্যে তিনি প্রচার করিলেন ভারতের তথা ধর্মের সেই পরম মর্ম-বাণী. তাঁহার পূর্বে চণ্ডীদাসও যাহার উচ্চারণ করিয়াছিলেন--"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" আচারসর্বস্ব মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার দৃঢ় নাগপাশকে ছিন্ন করিয়া উদার প্রেম-ভক্তির যে ধর্মাদর্শ তিনি স্থাপন করিলেন তাহা সমাজের সর্বস্তরের সর্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের মহামিলনের মধ্যে, মহাসমন্বয়ের মধ্যে রূপলাভ করিল। তিনি শুরু করিলেন এক অভিনব ভক্তি-আন্দোলন—দলবদ্ধভাবে হরিনাম সঙ্কীর্তন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে সেই প্রথম সম্মিলিত উপাসনা প্রবর্তিত হইল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাহাতে সকলের ছিল অংশগ্রহণের অবাধ অধিকার। সে যেন এক মহা ধর্ম-মহোৎসব। বহুদিন পর ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সাম্য আসিল সমাজে। কীর্তন হইয়া উঠিল সেই সাম্যের গণসঙ্গীত। তাহার স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল, ভাসিয়া গেল বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনুষ্যনির্মিত সকল ব্যবধানের প্রাচীর। হিন্দুসমাজের পতিত ও পদদলিত মানুষেরা, যাহারা ইসলামের আশ্রয় লাভ করিতেছিল অথবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, কঠোর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ইসলামের সুলভ সাম্য—এই উভয়কে দূরে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের পতাকাতলে আবার সমবেত হইল।

নীলাচলে যাইবার কালে চৈতন্যদেব ছোটনাগ-পুরের মধ্য দিয়া পথ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলের অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের তিনি তাঁহার প্রেমধর্মের মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এইভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ ও পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার অগণিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে নবজীবনের প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। তাহারাও যে মানুষ সেই আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা শ্রীচৈতন্য তাহাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের আস্বাদ পাইয়া তাহারা নববলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাহা ছিল এক প্রবল ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী বিদ্রোহ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সম-কালে আরও কয়েকজন সন্ত-সাধকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারাও নিজ নিজ অঞ্চলে ঐ একই ভূমিকা পালন করিতেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ্য যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনাম-সংকীর্তনের প্রবর্তন করিয়া চৈতন্যদেব ভারত-বর্ষের প্রথম জনসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই উহা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সংগঠিত গণ-আন্দোলন বা 'অরগানাইজড মাস মুভমেন্ট'। প্রয়োজনে এই আন্দোলনকে চৈতন্যদে অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধেও সংগঠিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজী-দলনের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করিতেছি।

চৈতন্যদেব এইভাবে সমকালীন হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব আনয়ন করিলেন তাহাকে তৎ-প্রচারিত নামধর্মের বা প্রেমধর্মের উপজাত বা 'বাই-প্রোডাক্ট' ভাবিলে ভুল করা হইবে। এই বিপ্লব ছিল একান্তভাবেই তাঁহার পরিকল্পিত। প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেব অঙ্গীকার করিয়াছিলেনঃ "ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন

পরচার"। অপর এক বিশিষ্ট জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ চৈতন্যদেবের জবানীতে লিখিয়াছেনঃ "জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।" তাঁহার আন্দোলনেব অন্যতম সেনাপতি নিত্যানন্দকে তিনি সাম্যের বার্তা প্রচার করিবার জন্য গৌড়বঙ্গে প্রেরণ করেনঃ

এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥
('চৈতন্যভাগবত')

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় শুনি—প্রেমভক্তি-লাভের অধিকার জাতি-বর্ণ-উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের সমান। কাহারও বিশেষ অধিকার বা অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রশ্ন সেখানে নাইঃ

নীচ জাতি হইলে নহে ভজনে অযোগ্য,
সৎ কুলে বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার॥

এইভাবে অনুদার, সংকীর্ণ, আচার ও প্রথা-সর্বস্ব তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসমাজের অচলায়-তনে সর্বশক্তি দিয়া আঘাত করিলেন চৈতন্যদেব। কিন্তু সহজে এই কাজ—এত বড় আন্দোলন সংঘটিত হইয়া যায় নাই। চৈতন্যদেবকে অনেক বাধা, অনেক সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইয়া-ছিল। একদিকে বিধর্মী রাজশক্তি, অপরদিকে হিন্দুসমাজেরই শীর্ষস্থানীয় কিছু মানুষ, বামাচারী দল এবং রক্ষণশীল স্মার্ত ব্রাহ্মণগোষ্ঠী কোমর বাঁধিয়া তাঁহার বিরোধিতায় নামিয়াছিল। অবশ্য যাহারা প্রগতির নায়ক হইয়া আসেন ইহা তাঁহাদের ললাটলিপি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, একই সময়ে ইউরোপে প্রথা-সর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন মার্টিন লুথার (জন্ম ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। চৈতন্যদেবের মতো সমকালীন ইউরোপের ধর্ম, সমাজ ও ভাবজগতে তিনিও একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করেন।

শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নহে, চৈতন্যদেব সামগ্রিকভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশের কৃষ্টিজগৎকেও বিরাটভাবে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সমকালীন ও পরবর্তী কালের বাংলার ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত—কৃষ্টি-সংস্কৃতিব সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রভা বিকীর্ণ হইয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়—"কানু বিনা গীত নাই।" চৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশেও শুধু গীতই নহে, চৈতন্য বা গৌর ভিন্ন কোন কিছুই হয় নাই। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতে যে বিশাল ধর্ম-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-সাহিত্য ও দর্শন-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা জানি। বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য ও দর্শনকে চৈতন্যদেব কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়া চলিয়াছেন। সাম্প্রতিককালের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখিয়াছেনঃ "বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে কিছু পরিচয় না থাকলে ষোড়শ শতক থেকে বাঙলা সাহিত্যের ধারা, গতিপ্রকৃতি একদম বোঝা যাবে না। বিশ্লেষণও করা যাবে না। এমনকি আধুনিক যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার শতকরা ৩০/৪০ ভাগ বৈষ্ণবভাবে ভাবিত—এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। 'ভানু সিংহের পদাবলী' শুধু উপলক্ষ মাত্র।" পদাবলী-কীর্তন তো সম্পূর্ণতঃ এবং বহু-সংখ্যক ভজন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও বৈষ্ণবভাবাশ্রিত, একথা নূতন করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া রহিয়াছে বাউল-সঙ্গীত। গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঠাটের কীর্তন সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণব সন্ত-সাধকদেরই সৃষ্টি। এইভাবে যখন সাহিত্য ও সঙ্গীত শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে তখনই পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ও নূতন ধারাও প্রসারলাভ করিতে শুরু করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলার শিল্প-ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন তথা বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণার বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইবে।

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পে দাক্ষিণী, রাজস্থানী এবং ওড়িশী উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির নেপথ্যে চৈতন্যদেবের পরোক্ষ প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। কারণ চৈতন্যদেবই দীর্ঘকাল পরে বাঙালীর আপন-গৃহকোণে-সুখী মানসিক-তাকে আবার বহির্মুখী করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা চৈতন্যদেবের ভারত-পরিব্রজ্যার বিষয়টি এখানে স্মরণ করিতেছি। ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিলেও শ্রীচৈতন্য কখনো ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটকে বিস্মৃত হন নাই। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন। গৌড়বঙ্গের পর উড়িষ্যা। অতঃপর দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট। তাহার পর

তাঁহার পরিব্রাজন-সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হইল হিন্দু-সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ এবং বারাণসী। পুরী এবং নবদ্বীপ হইতে বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবনের পথে পড়ে মুঙ্গের, পাটনা, আগ্রার মতো শিল্প, সঙ্গীত ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি। এখানে উল্লেখ্য যে, বহুকাল হইতে বাণিজ্যযাত্রাপ্রিয় বাঙালী বণিকদের বহির্বাণিজ্য তখন প্রায় অবলুপ্ত। ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক সংযোগও ছিন্ন। চৈতন্যদেবের এই পরিক্রমার ফলে একদিকে পুরী, অপরদিকে বারাণসী, বৃন্দাবন ও মথুরার তীর্থভূমি নূতন করিয়া যেন আবার বাঙালীকে আকর্ষণ করিল। ইহার অতিরিক্ত ফল বাঙালীর চিত্তবিকাশ এবং সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়।

প্রবীণ ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখিয়াছেন ঃ "বড় প্রচারক্ষেত্র ব্রজধাম ও পথে বারাণসী-প্রয়াগ। ব্রজধামের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম —মনে রাখতে হবে মথুরা ও বৃন্দাবন আগ্রা ও দিল্লীর কত কাছে। পাঠানসূর্য তখন অস্তমান, মোগলসূর্য সবে উঠছে। এ অবস্থায় হিন্দু রাজন্যবর্গের, বিশেষতঃ জয়পুরের একটা ভূমিকা তাঁর (চৈতন্যদেবের) চোখ এড়ায়নি। বারাণসী তো হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।...দিব্যোন্মাদে মত্ত হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র সদা প্রসারিত থাকত।" এইভাবে শ্রীচৈতন্য পূর্বভারত, দক্ষিণভারত, পশ্চিমভারত ও উত্তরভারতের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক এক সুদৃঢ় ভাববন্ধনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রমুখ পার্ষদ সহ তিনি নিজে রহিলেন পুরীতে, দক্ষিণে রাখিলেন রায় রামানন্দকে, গৌড়বঙ্গে নিত্যানন্দকে, বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে এবং রূপ সনাতন প্রমুখ সমকালের ছয়জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও উন্নত সাধককে প্রেরণ করিলেন বৃন্দাবনে। বস্তুতঃপক্ষে ইঁহারা ছিলেন তাঁহার ভাব-আন্দোলনের সেনানায়ক। প্রায় ছয় বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার দেশ-পরিক্রমা ও আন্দোলনকে সুরক্ষিত করার অতন্দ্র প্রয়াসের মধ্যে ছিল তাঁহার অসাধারণ ভারতদৃষ্টি। কেহ ইহার মধ্যে তাঁহার সুগভীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশও দেখিতে পারেন। জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি পুরীকেই তাঁহার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পুরী ছিল সমকালীন ভারতবর্ষে উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যতম প্রধান সঙ্গমস্থল। ভারত-পরিক্রমার পর সেই সঙ্গমস্থলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তিনি যখন মহাপ্রয়াণ করিলেন তখন তিনি বাস্তবিকই হইয়া উঠিয়াছেন 'ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য'।

শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ভারতদৃষ্টির সঙ্গে সংপৃক্ত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার সুগভীর সমন্বয়-দৃষ্টি। ভারত-পরিক্রমার সুদীর্ঘ পথে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, কৌমার প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নানা সম্প্রদায়ের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করিয়াছেন এবং সর্বত্রই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন। সব পথই যে একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে মানুষকে লইয়া যাইতেছে, সকলেই যে সেই এক-কেই ডাকিতেছেন তাহা তাঁহার আচরণ হইতে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইত। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন ঃ

> মহানুভবের হয় এই তো লক্ষণ
> সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্ট দরশন॥
> স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
> সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের তিনশ বৎসর পর এই বঙ্গদেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য যে সর্বভাবেই বিশ্বপথিক শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ পূর্বসূরী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সুগভীর সমন্বয়দৃষ্টি হইতে তাহা প্রমাণিত।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) পর সাড়ে চারশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এত দীর্ঘকালের ব্যবধানে শ্রীচৈতন্য কোন্ বিরাট অবদান রাখিয়াছিলেন তাহা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। কিন্তু সময়ের ধূলি সরাইয়া ইতিহাসের শ্রীচৈতন্যের যে চিত্রটি এতক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহা কিন্তু কম উজ্জ্বল নহে। চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি জগৎকে ঈশ্বরপ্রেমের বিশুদ্ধতম মার্গদর্শন। প্রসঙ্গটির আলোচনায় আমরা এইবার যাই নাই, তথাপি তাঁহার অন্যান্য ঐতিহাসিক অবদানের সঙ্গে ইহা আমাদের অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে, তিনি মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বাগ্রগণ্য সন্তপুরুষ যিনি ভারতবর্ষে ধর্মকে জীবন হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখেন নাই। তিনি ভগবানকে আমাদের ঘরের মানুষ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ধর্মকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করিয়া তাহাকে জীবনের অঙ্গ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন ঈশ্বরপ্রাণতা কত গভীর হইতে পারে। এই কীর্তি শুদ্ধ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত কিনা বলিতে পারি না, তবে ইহা যে বিশুদ্ধ ইতিহাসের মহত্তম অঙ্গ সেইবিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ

রামকথা-রামকৃষ্ণকথা

কৃষ্ণা সেন

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম।
কালাত্মকপরমেশ্বর রাম ॥

—হে রাম, তুমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি কালরূপী পরমেশ্বর।

শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথনন্দন বা জানকী-হৃদয়বল্লভ নন—তিনিই সেই অখণ্ড, অনাদি, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ পরমপুরুষ।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখি দেবতারা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করছেন, "ভগবন্, রাক্ষস রাবণ আপনার প্রসাদে বলদৃপ্ত হয়ে আমাদের পীড়ন করছে। সে যাতে বিনষ্ট হয় তার উপায় স্থির করুন।" প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বললেন,"রাবণ গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হাতে অজেয় হবার বর চেয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু অবজ্ঞাবশে মানুষের নাম সে করেনি। সেই মানুষই তাকে বধ করবে।" অতঃপর শঙ্খচক্রগদাপাণি গরুড়বাহন বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুকে দেবগণ স্তব করে প্রার্থনা করলেন, লোকের হিতকামনায় মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতার অবধ্য রাবণকে যেন তিনি বধ করেন। সেজন্য অযোধ্যাপতি দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু দেবকুলকে অভয় প্রদান করে রাবণকে সবংশে সংহার করতে স্বীকৃত হলেন। বিষ্ণু দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহায়তার জন্য দেবগণকে বীর সৃষ্টির নির্দেশ দেন। ইন্দ্র বালীকে, সূর্য সুগ্রীবকে, বিশ্বকর্মা নলকে, অগ্নি নীলকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, পর্জন্য শরভকে সৃষ্টি করলেন। বজ্রতুল্য দৃঢ়কায়, গরুড়তুল্য বেগবান, বানরগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বলবান হনুমানকে বায়ু জন্মদান করলেন।

নির্গুণ পরব্রহ্ম লীলায় সগুণ হন। সেই লীলাই নরলীলা। ত্রেতাযুগে ভরদ্বাজ ঋষি রামকে বলেছিলেন ঃ "তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। আমাদের কল্যাণের জন্য এই মানবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেছ।" এই অবতার-রহস্য এক দুর্বোধ্য রহস্য। এ রহস্যের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। একমাত্র বিশ্বাস ও তদ্গতপ্রাণ হলে তবেই অবতারের ভাব কিছুটা ধরতে পারা যায়।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে পার্বতী মহাদেবের কাছে রামের স্বরূপ কি তা জানতে চেয়েছেন। দেবাদিদেব রামকে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পুরুষোত্তম রূপে বর্ণনা করলেন। সেই আনন্দস্বরূপ রাম মানুষের অভ্যন্তরে এবং স্বসৃষ্ট এই জগতের সর্বত্র বিরাজমান। এই বিপুল বিশ্ব তাঁর মায়াশক্তির বিকাশ। মায়াশক্তির প্রভাবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। অবিদ্যাজাল ভেদ করে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে তবেই তিনি ভক্তের নিকট প্রকট হন। চুম্বক লোহাকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু লোহায় মাটি লেগে থাকলে চুম্বকের আকর্ষণ সে বোধ করে না। এই জগৎও সেইরকম পরমাত্মার চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ, কিন্তু জাগতিক সম্পর্ক ও সম্পদে জড়িত মলিন মানবহৃদয় হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকে উপলব্ধি করতে পারছে না। তাই প্রয়োজন সেই কল্মষ দূর করার। তাহলে তিনি প্রকাশিত হবেন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলা হচ্ছে, রামই অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি আনন্দস্বরূপ, নির্মলস্বরূপ, শান্ত, নির্বিকার এবং নিরঞ্জন। সীতা মূল প্রকৃতি ; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপা।

নারদ রামচন্দ্রকে বলছেন ঃ

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥
ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥
যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো।
নির্ঋতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥
রাম ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী মতা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্বসম্পৎ প্রকীর্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥
লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব ॥

তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥

(অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ২।১।১২-১৭)

—আপনি বিষ্ণু, জানকী লক্ষ্মী ; আপনি শিব, জনকতনয়া শিবানী ; আপনি ব্রহ্মা, সীতা সরস্বতী ; আপনি সূর্য, জানকী প্রভা ; আপনি শশাঙ্ক, শুভলক্ষণা সীতা রোহিণী ; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী ; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা ; আপনি কাল-রূপী যম, সীতা সংযমনী ; হে জগন্নাথ। আপনি নিঋতি, সীতা তামসী ; আপনি বরুণ, জানকী ভার্গবী ; আপনি পবন, সীতা সদাগতি ; আপনি কুবের, সীতা সর্বসম্পদ ; আপনি লোকসংহারক রুদ্র, সীতা রুদ্রাণী। হে রাঘব! জগতে স্ত্রীবাচক যা-কিছু আছে সে-সমস্তই জানকী এবং পুরুষবাচক যা-কিছু সবই আপনি। অতএব ত্রিভুবনে আপনারা দুজন ব্যতীত আর কিছুই নেই।

সাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে জানা বা অবতারকে চিনতে পারা যায়। পুরাণে আছে, অসংখ্য ঋষির মধ্যে ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ঋষি রামকে অবতার হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন।

রামায়ণ হিন্দুমাত্রেরই অতি প্রিয়। রামায়ণ বা রামকথা ভারতবর্ষের সর্বত্র এক শাশ্বত আসনে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, কম্ব প্রমুখ কবিরা নানা ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন। এই সব কবিরা সর্বত্র বাল্মীকির যথার্থ অনুসরণ করেননি। রামায়ণ-কাহিনীর অনেক অংশই তাঁদের অনেকেই পুরাণ থেকে নিয়েছেন। বাল্মীকির রাম বিষ্ণুর অবতার হলেও সুখ-দুঃখের অধীন, পুরুষোত্তম হলেও তিনি সংস্কারমুক্ত নন। পরবর্তী কবিরা কিন্তু প্রজানুরঞ্জক, ধর্মনিষ্ঠ, করুণাময়, পতিতপাবন রামকে ঐশী শক্তির বিশেষ প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী কালে রামায়ণ-মাহাত্ম্য রচনা করে কবিরা লিখেছেন: স্বর্গলোকে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ প্রভৃতি সকলেই সানন্দে রামায়ণ শ্রবণ করেন। শ্রাদ্ধবাসরে আয়ুবর্ধক সৌভাগ্যজনক পাপ-নাশক বেদসম রামায়ণ-পাঠ পণ্ডিতগণের অবশ্য-কর্তব্য। এই গ্রন্থপাঠে সন্তানহীন সন্তান এবং ধনহীন ধন পায়। এর একটি চরণ পাঠ করলেও লোকে সর্বপাপমুক্ত হয়। যিনি এই আয়ুবৃদ্ধিকর রামায়ণ পড়েন তিনি সন্তান-সন্ততির সঙ্গে ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করেন। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে রামায়ণ-পাঠ করলে বিষাদ দূর হয়। সুতরাং গৃহস্থের পরম পবিত্র কৃত্য রামায়ণ-পাঠ। শ্রীরামের আন্তরিক চিন্তা, একান্ত শরণাগতি মানুষকে মুক্তিমার্গে নিয়ে যায়।

ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী বিশ্বাস করে, ধর্মগ্লানি উপস্থিত হলেই যুগপ্রয়োজনে যুগাবতারের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরাবতার হিসাবে রামচন্দ্র যেমন ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণরূপেও তেমনি ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়েছিল। আবার কলিযুগেও ধর্মগ্লানি দূর ও ধর্মস্থাপন করতে ঈশ্বর অবতরণ করেছিলেন রামকৃষ্ণরূপে। রামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজমুখে তার অঙ্গীকারও করেছেন। কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি নরেন্দ্রনাথকে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন: "যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় জানতেন না তাঁর গৃহে যিনি গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত এবং নিত্যপূজিত, সেই রঘুবীর বা রামচন্দ্রই তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। অতি অদ্ভুত উপায়ে ক্ষুদিরাম আপন অভীষ্টদেব এই রঘুবীরকে প্রাপ্ত হন। একদিন কাজের জন্য তাঁকে অন্য এক গ্রামে যেতে হয়। ফিরবার পথে একটি গাছের তলায় শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে তিনি নিদ্রিত হন। তখন স্বপ্নে দেখেন: "তাঁহার অভীষ্টদেব নবদূর্বাদল-শ্যামতনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থানবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটিতে লইয়া চল। তোমার সেবাগ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" একথায় বিহ্বল ক্ষুদিরাম বালকবেশী রামচন্দ্রকে নিরস্ত করতে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর গৃহে প্রভুর যথা-যোগ্য সেবা কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামকে প্রসন্ন মনে অভয় দান করে তাঁকে নিয়ে যেতে বলেন। আবেগাকুল ক্ষুদিরাম কাঁদতে কাঁদতে জেগে ওঠেন এবং নিকটস্থ এক ধানক্ষেত দেখে বুঝতে পারেন যে, এটিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট জায়গা। সেখানে

পেঁছে ক্ষুদিরাম দেখতে পেলেন একটি সুন্দর শালগ্রাম-শিলার উপরে একটি সাপ ফণা বিস্তার করে রয়েছে। ক্ষুদিরাম সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সাপটি সেখান থেকে চলে গেল। ক্ষুদিরাম রঘুবীরকে স্মরণ করে সেই শিলা গ্রহণ করে দেখেন সত্যিই সেটি রঘুবীর-শিলা। আনন্দাপ্লুত ক্ষুদিরাম সেই শিলা স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কুলদেবতা রঘুবীরের পূজা ও সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব কামারপুকুরে অবস্থানকালেই রামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে, সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামে এক রামাইত সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসেন। জটাধারীর কাছে 'শ্রীশ্রীরামলালা' নামে শ্রীরামচন্দ্রের একটি বালবিগ্রহ ছিল। এই বালবিগ্রহের প্রতি জটাধারীর বিশেষ অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। বালক শ্রীরাম জটাধারীর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর সেবা গ্রহণ করতেন। জটাধারীর এই সৌভাগ্য ভাবরাজ্যের অধীশ্বর ঠাকুরের কাছে অবিদিত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জটাধারীর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে বাৎসল্যভাবে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন। বাৎসল্যভাবে অবস্থিত ঠাকুর রামলালার ধ্যানে তন্ময় হয়ে উপলব্ধি করেন ঃ

যো রাম দশরথকি বেটা,
ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সবসে নেয়ারা ॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নন, প্রতি শরীর আশ্রয় করে তিনি জীবভাবে প্রকাশিত হয়ে আছেন। আবার ঐভাবে জগৎরূপে নিত্য প্রকাশিত হয়েও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ থেকে পৃথক, মায়ারহিত, নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান। রামলালার জীবন্ত বিগ্রহ ভাবময় ঠাকুরকে ছেড়ে রামলালা জটাধারীর সঙ্গে ফিরে যেতে অস্বীকার করায় জটাধারী সাশ্রুলোচনে নিজ প্রাণপ্রতিম রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন। পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন ঃ

কখনো হইত তাঁর অপরূপ খেলা।
পিতল গঠিতমূর্তি লয়ে রামলালা ॥
রঘুবীর শ্রীপ্রভুর জীবন-জীবন।
স্বগ্রামে রামনাম কখন কখন ॥
কি মধুর রামনাম শ্রীবদনে তাঁর।
তুলনায় কিছু নহে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
ভাগ্যবলে বারেক যে শুনিয়াছে কানে।
হৃদিতন্ত্রী বাঁধা তার আছে রামনামে ॥

হনুমানের মতো অপরা ভক্তি দিয়েই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাওয়া যাবে, এই চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার প্রথম চার বৎসরের শেষের দিকে নিজের মধ্যে মহাবীর হনুমানের ভাব আরোপ করে দাস্যভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে হনুমানের ভাবে ভাবিত ছিলেন। দাস্যভক্তি সাধনার সময়ে পরমহংসদেব সীতাদেবীর দর্শনলাভ করেন। পঞ্চবটীতে বসে থাকার সময় প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতার মূর্তবিগ্রহ ত্রিলোকবরেণ্যা দেবী সীতা উত্তর দিক থেকে এসে ঠাকুরের শরীরে প্রবিষ্ট হন। ধ্যান-চিন্তা ছাড়া সাদা চোখে এমন দর্শন ঠাকুরের এর আগে আর কখনো হয়নি।

রামচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ এক এবং অভেদ। রামকৃষ্ণ এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘে রামচন্দ্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মতিথি 'রামনবমী'তে বেলুড় মঠে রামচন্দ্রের পূজা হয়। প্রতি একাদশীর দিন রামকৃষ্ণ মঠের সকল কেন্দ্রে সুমধুর ভক্তিরসাশ্রিত রামনাম গান পরিবেশিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি বাঙ্গালোরে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কালে রামনাম কীর্তন শুনে খুব আনন্দিত হন। তিনি এই রামনাম লিখে এনে মঠ ও মিশনের সর্বত্র তা প্রচলিত করেন। পরিশেষে 'মর্যাদাপুরুষোত্তম' রামচন্দ্রের পাদপদ্মে আমাদের প্রণতি জানাই। সকল-বিপদহারী, সর্বৈশ্বর্যদাতা লোকরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

আনন্দদাতা, আনন্দস্বরূপ, কল্যাণবিধাতা, বিষ্ণুস্বরূপ, রঘুনাথ, জগৎপ্রভু সীতাপতি রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। হে রাম, হে রঘুপতি, হে রাঘব, হে নরপতি, হে পতিতপাবন, সীতাপতি, তোমার জয় হউক।

বারংবার প্রণাম জানাই রামাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে। হে রামকৃষ্ণ, হে অকিঞ্চনগতি, হে সারদাবল্লভ, পৃথিবীর প্রতি নরনারীর ওপর তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

নিবন্ধ

আরাত্রিক প্রসঙ্গে

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ আরাত্রিক বা আরতি। প্রত্যেক বিশেষ পূজার পরেই আরাত্রিকের বিধান আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

ততশ্চ মূলমন্ত্রেন দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
মহানীরাজনং কুর্যান্মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ ।।
প্রজ্বলয়েৎ তদর্থং চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবার্তিকম্ ।।

তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সকাল ও সন্ধ্যায় দেবতার সম্মুখে আরতি করা হয়ে থাকে।

বলা হয় যে, দেব-দেবীর পূজার মধ্যে যে ত্রুটি থাকে তা আরাত্রিকের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়। স্কন্দ-পুরাণে বলা হয়েছে ঃ

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্বসম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ।।

অর্থাৎ মন্ত্রবিহীন ও ক্রিয়াবিহীন পূজাতে আরাত্রিক বা নীরাজন পূর্ণতা নিয়ে আসে। আরাত্রিক দর্শন করলে পরমার্থপথের যাত্রীদের জীবনে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এই ধারণার সপক্ষে 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থের কথা স্মরণযোগ্য ঃ

নীরাজনং চ যঃ পশ্যেদ্ দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
সপ্তজন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদম্ ।।

অর্থাৎ যিনি ভক্তিভরে ভগবান বিষ্ণুর আরাত্রিক সর্বদা দর্শন করেন, তিনি সাত জন্ম পর্যন্ত বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন এবং প্রয়াণকালে ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। যিনি বিধি অনুযায়ী আরাত্রিক করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ধূপ-দীপ ইত্যাদির আরাত্রিক দর্শন করেন, তিনি অন্তিমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করেন, এবং স্বকুল উজ্জ্বল করেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে আছে ঃ

ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ।।

বিভিন্ন অভিধান অনুযায়ী আরতি শব্দের অর্থ প্রায় অর্ধশত। আরতিকে নীরাজন বলা হয়। নীরাজন (নীঃশেষেন রাজনম্ প্রকাশনম্) শব্দের ব্যবহার খুবই সীমিত।

বিধিসম্মত আরতির প্রথমে দেবতার পদতলে চারবার প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত ঘৃত-প্রদীপমালা ভ্রামিত করা হয়। তারপর নাভিদেশে, মুখমন্ডলে ও সর্ব-গাত্রে যথাক্রমে দুইবার, একবার ও সাতবার দীপমালা ইত্যাদি ভ্রামিত হয়।

আদৌ চতুঃ পাদতলে চ বিষ্ণো-
র্দ্বৌনাভিদেশে মুখবিম্ব একম্।
সর্বেষু চাঙ্গেষু চ সপ্তবারা-
নারাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্যাৎ ।।

আরতি-অনুষ্ঠানটিতে তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি। প্রথমে ত্রিকোণমন্ডল অংকন করে ভূমি শুদ্ধ করা হয়। তারপর বিধিমতো দীপমালা স্থাপন করে দেবতাকে অর্পণ করা হয়। দেবতাদের মুদ্রা দেখালে সন্তুষ্ট হন বলে ঐ সময় মুদ্রা দেখানো হয়। শাস্ত্রোক্ত ভাবে মুদ্রা দেখালে নিজের কল্যাণ হয়।

মোদনাৎ সর্বদেবানাং দ্রাবনাৎ পাপসন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ।।

প্রথমে দেবতাকে ঘৃতযুক্ত দীপমালা দিয়ে আরতি করা হয়। দীপমালাতে পাঁচ, সাত প্রভৃতি বিষম সংখ্যার দীপশিখা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ শঙ্খপাত্র। তৃতীয়তঃ ধৌত বস্ত্র। চতুর্থতঃ আম্রপল্লব বা অশ্বত্থপল্লব এবং পঞ্চমতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এইস্থলে আম্রপল্লব ইত্যাদির পরিবর্তে কীটবিহীন পুষ্প দিয়ে আরতি করা হয়। যে-দেবতার যে-পুষ্প প্রিয় সেই দেবতার আরতি-অনুষ্ঠানে সেই পুষ্প দিয়ে আরতি করা হয়। (যেমন, নারায়ণের শ্বেতপুষ্প, কালীর রক্তপুষ্প প্রভৃতি।) পঞ্চমাঙ্গ

আরতির চতুর্থাঙ্গের পর চামর দিয়ে আরতি করা হয়। আরতির পঞ্চাঙ্গ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে আছে ঃ

> পঞ্চনীরাজনং কুর্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
> দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা ॥
> চূতাশ্বত্থাদি-পত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্তিতং।
> পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি ॥

তাছাড়া দেবতাবিশেষে বা স্থান-কালবিশেষে কর্পূর কুমকুম আবির প্রভৃতি দিয়ে আরতি করা হয়। এসব দিয়ে আরতি করা অশাস্ত্রীয় নয়। পদ্মপুরাণে আছে ঃ

> কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরঘৃতচন্দননির্মিতাঃ।
> বর্তিকাঃ সপ্ত বা পঞ্চ কৃত্বা বা দীপবর্তিকাম্ ॥
> কুর্যাৎ সপ্তপ্রদীপেন শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যকৈঃ।

ঘণ্টাবাদ্য সহ অন্যান্য বাদ্যের জয়-জয়কারের মধ্যে আরতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র না থাকলে শুধু ঘণ্টা বাজিয়েই আরতি করা যায়। কারণ ঘণ্টাকে বলা হয় "সর্ববাদ্যময়ী।" "সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ।" এই সময় পূজক নির্দিষ্ট দেবতার স্তব-স্তুতি বা দেবতার গায়ত্রী জপ করে থাকেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ তখন ঐ দেবতার আরাত্রিক-ভজন করে থাকেন। ভারতের প্রায় সমস্ত দেব-মন্দিরে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাগের আরাত্রিক-ভজন হয়। যেমন ভোরের মঙ্গল-আরতি ভজন—মূলতঃ ভৈরবী, সিন্ধু-ভৈরবী, বিভাস প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দুপুরে ভজন—মূলতঃ গৌর-সারঙ্গ, মধু-মাধবী-সারঙ্গ, বড়হংস-সারঙ্গ, আশাবরী প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যা-আরতির ভজন—ইমন, ইমন-পূরবী, কল্যাণ, ইমন-কল্যাণ, ভূপালী, ইমন-ভূপালী, দড়বারী-কানাড়া প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ করা যায় যে, আচার্যপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক-ভজনটি 'মিশ্র-কল্যাণ'-এর পর্যায়ভুক্ত। যেকোন আরাত্রিক-ভজন সাধকদের সহজেই অন্তর্মুখী করে তোলে। মনে অপারসীম শান্তি দিয়ে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা রীতি-অনুযায়ী ভারতের সর্বত্র আরতি-অনুষ্ঠানের রীতি এক নয়। যেমন, বাবা বিশ্বনাথের আরতির সঙ্গে মা কামাখ্যা দেবীর আরতির মিল নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, পূর্ব-ভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে শুধু ধূপকাঠি বা ধুনো দিয়ে আরতি করবার রীতি আছে এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পরিবর্তে নিজস্ব ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে মঙ্গল-প্রার্থনা করবার রীতি আছে।

ফুল-ফলাদি দ্রব্যের দ্বারা ভগবানের পূজা করার মধ্যে যেভাবটি বর্তমান তাহল ভগবানকে মানুষের মতো সেবা করা। এর দ্বারা বিরাটকে যেন ক্ষুদ্র আধারে সংস্থাপন করে তাঁর প্রীতি-বিধান করা হয়। বস্তুতঃ প্রাথমিক সাধকের পক্ষেই শাস্ত্রে বাহ্য-পূজাদির নির্দেশ আছে। কারণ, প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের বিরাটরূপের ধারণা করা সাধকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরকে সীমিত করে সেবা এবং উপাসনা করলেও তিনি যে অসীম, সর্বব্যাপী—বিশ্বের সর্ববস্তুতেই যে তিনি অনুস্যূত এভাবটিও সাধক বা পূজককে স্মরণ রাখতে হয়। না হলে বাহ্যপূজার উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কারণ প্রতিমাদি বাহ্য-পূজার মধ্যেও সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের মহিমা উপলব্ধিরই প্রয়াস। আর আরাত্রিকের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটিই ব্যক্ত করা হয়। কেননা আরাত্রিকের মধ্য দিয়ে ভগবানের লোকোত্তর মহিমারই অনুধ্যান করা হয়। আসলে আরাত্রিক একরকম সাংকেতিক পূজা। বিগ্রহের সম্মুখে যে প্রদীপ, শঙ্খস্থিত জল, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর দিয়ে দেবতার সংবর্ধনা করা হয় সেই উপচারগুলি প্রকৃতপক্ষে তেজঃ, অপ্, মরুৎ, ক্ষিতি ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রতীক। বস্তুজগতের মূল উপাদান এই পঞ্চভূত। মূল উপাদান এই পঞ্চভূত নিবেদনের মাধ্যমে সাঙ্কেতিকভাবে সমগ্র বিশ্বকেই ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করে তাঁর পূজা করা হয়। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সীমিত মূর্তি থেকে তাঁর বিরাট রূপের দিকে সাধকের দৃষ্টি প্রসারিত করার জন্যই এই সাঙ্কেতিক পূজার বিধান। এই হলো আরাত্রিকের তাৎপর্য।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

গহন বনে কত সুন্দর সুন্দর পুষ্প ফুটিয়া থাকে, তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা 'বনজ', বনের শোভা বর্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া, খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি আদি যে-সকল উপায় দ্বারা লোক-সকলকে পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধলাভে আনন্দিত হইয়া থাকিবেন।

এই মহাত্মা জিলা হুগলীর অন্তর্গত একটি গ্রামে (কামারপুকুর) জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় নাই। লোকে যে-সময় ভবিষ্যৎ জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে-সময় রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন।··· ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকা দর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রানী রাসমণি জাহ্নবীতটে কলিকাতার সমীপবর্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকা-মূর্তি স্থাপন করিলে, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা-পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ-নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিসহ এই অপূর্ব চিন্ময়ী মূর্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, বরং মন খুলিয়া প্রত্যেক জল-বিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন। রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র-হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে? আর কি সাধক বাহ্যজগতের বাহ্যব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, রিপু-মদমর্দিনী রণরঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্য-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ-মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরেই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি-আদি সকলে একে একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কাল নিবারণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎ-পদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মন-প্রাণ এক করিয়া ভাব-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তি-সোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য।··· কখনো হাস্য, কখনো রোদন, কখনো স্তম্ভন, কখনো উল্লম্ফন-আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অটল, অচল হইয়া মহামায়ার সহিত মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্যন্ত লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাঁহার

এই রোগের বাহ্য-চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল।… সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে মায়ায় বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? যাঁহার বাবা—(শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাটবাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যেকোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল। তাঁহার পাগলামিতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎ-মাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারি হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক একদিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, আর বলিতেন, মা! আমাকে ভক্তি দেও! আমি ভক্তি ভিন্ন কিছুই চাই না। কখনো কখনো তিনি প্রস্তরে মাথা কুটিতেন।—তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ-ভক্তির মূল্য বুঝে না, জগতের চক্ষু এ-ভক্তির সৌন্দর্য দেখিতে জানে না। ভক্তের মাধুরী তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকট বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি। যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্তচলাচল-শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনকে বস্তুতই 'কায়েন মনসা বাচা' পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দুর তাঁহার শরীরের সহিত সংসৃস্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে।… একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবনগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থীমাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী।*

[পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সেকালের একজন খ্যাতনামা ধর্মপ্রবক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎ তাঁর ধর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।]

* 'ভারতবর্ষ'—৪০শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃঃ ২০৩-২০৪

সংগ্রহ: চন্দনা সরকার

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

॥ ২ ॥

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর কথা

(১৮)

ক্রোধের তারতম্য

ঘোর বিষয়ী অজ্ঞানীর ক্রোধাদি থাকে সারা-জীবন এমনকি মৃত্যুর পরও পরজন্ম পর্যন্ত উহার প্রভাব চলিতে থাকে। জ্ঞানীর অন্যরকম—কাহারও থাকে এক মাস, কাহারও—এক সপ্তাহ, কাহারও থাকে তিনদিন, কাহারও থাকে নামমাত্র, কাহারও মোটেই হয় না।

অজ্ঞানীর যেন পাষাণের রেখা। যতদিন পাষাণ থাকে ততদিন রেখা আর মিটে না। জ্ঞানীর প্রথমটি যেন মাটিতে রেখা, কিছুদিনে মিটে যায়। দ্বিতীয়টি যেন বালির উপর রেখা। অল্প দিনেই মিটে যায়। বায়ুদ্বারা সমান হইয়া যায়। তৃতীয়টি ঐ বালির রেখার ন্যায়। চতুর্থটি যেন জলের উপর রেখা টানা। যখন তখনই উহা মিটিয়া যায়। আর পঞ্চমটি যেন আকাশে রেখা টানা। মোটেই রেখা পড়ে না। তেমনি ক্রোধের উদ্রেকই হয় না। ইহা খুব গভীর জ্ঞানের অবস্থা।

(১৯)

মনের খেলা

মন কত খেলাই খেলে। যখন অন্য কোন বস্তুর জন্য ব্যস্ত হয়, তখন বর্তমান বস্তুতে কত দোষ আবিষ্কার করে। এই মনই যেন মানুষকে বাঁদরের মতো নাচায়।

হৃষীকেশে দুই সাধু ছিলেন। বেশ ভজন বিচারাদি করেন। যখন শীত আসিল, তখন একজন অপরকে বলিলেন—"কি আছে এখানে? চল দেশে যাই। এখানে সত্রে ভিড়, রুটির জন্য কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা! কত কষ্ট!" দুজনে দেশে (পাঞ্জাব) চলিয়া গেলেন। শীতের সময় নানা-স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, মাধুকরী করিয়া খাইয়াছেন, ভজন করিয়াছেন। শীত শেষ হইয়া আসিল। দেশে পাঞ্জাবাদি স্থানে অত্যধিক গরম। তখন ঐ সাধুই বলছেন—'চল দেশ থেকে চলে যাই। কি আছে এখানে? কোন সাধুসঙ্গ নাই, কিছু নাই, চারিদিকে কেবল গৃহস্থ। সাধুদর্শন করিতে পারা যায় না। চল যাই হৃষীকেশ। আহা! অমন গঙ্গাদর্শন! হিমালয়, উত্তরাখণ্ড! কত সাধু মহাত্মা। তাদের পবিত্র সঙ্গ! আহা, হৃষীকেশের মতো জায়গা আছে? সত্রে ভিক্ষাও সুলভ। চল হৃষীকেশেই চলে যাই।'—তখন তাহারা আবার হৃষীকেশে চলিয়া আসিল। দেখ এই মনই আমা-দের ভাল মন্দ বুঝাইয়া কতই না নাচায়। আর আমরা তেমনি নাচি। সব মনের খেলা।

(২০)

'নরসি'র বাপের নাম

(শুকদেবানন্দজী ত্রেতাযুগে হনুমানের লঙ্কা-গমনের বিষয়ে কি একটা প্রশ্ন করাতে সহাস্যে স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী)—"দেখ, এ আর কোন প্রশ্ন পেল না। হনুমানের লঙ্কাগমন হলো কিনা এর বিচার্য বিষয়। এ পুরবিয়া কিনা! পুরবিয়াদের এরূপ স্বভাব। গ্রামশুদ্ধ লোক এসে এরূপ অন্ড-বন্ড প্রশ্ন করবে।"

একবার পণ্ডিত কেশবানন্দজী মণ্ডলী লইয়া পূর্বে কোথাও গিয়াছিলেন। রোজ কথা হয়, শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ হয়, আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর হয়—লোকে শোনে। একদিন গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! 'নরসি'র বাপের নাম কি?" কেশবানন্দ জানেন যে, ইহারা একেবারে মূর্খ। ইহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এরূপেই

হয়। ইহাদের জবাবও ঐরূপই চাই। বুদ্ধিমান কেশবানন্দ, তখনই জবাব দিলেন—"ওহ্, তা বুঝি জান না? 'নরসি'র বাপের নাম 'ফরসি'। তার বাপের নাম 'পরসি', তার বাপের নাম 'তরসি'। 'তরসি'র বাপের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। এ পর্যন্ত তো আমি জানি। এর আগে আরও চাও তো বল, আমি বই খুলে দেখে বলি।" গ্রামবাসীরা ভারি খুশি। তাহারা বলিল—'না মহারাজ, আর দরকার নাই। এতটা জেনেছি তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' পরে যখন সাধুরা জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি এসব কি বলিলেন, তখন কেশবানন্দ বলিলেন—'আর কি করব বল। এরা পুরবিয়া, এদের প্রশ্ন এরূপই। তাই তাদের জবাবও ঐরূপই দিলাম।' সাধুরা শুনিয়া হাসিয়া আকুল।

আমাদের শুকদেবানন্দও পুরবিয়া। তাই দেখ, কেমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

(শ্রোতৃমণ্ডলীর আকুল হাসি)

(২১)
ব্রহ্মাকারা বৃত্তি

বৃত্তি আবরণভঙ্গকারিণী। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি আবরণভঙ্গ একবারই করে। এইজন্য উহাকে অন্তিম বৃত্তি বা চরম বৃত্তি বলে। কাজেই সেই বৃত্তি একবারই হয়। সুতরাং জ্ঞানের পর যতদিন দেহ থাকে ততদিন ঐ জ্ঞানের কেবল স্মৃতি চলিতে থাকে। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি আর হয় না।

'তদ্বাসনাঃ নিমিত্তত্বং যান্তি বিদ্যাস্মৃতে-
ধ্রুবম্।' (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি)

অন্য পক্ষ বলেন—স্মৃতি ব্যবহিত বিষয়েই হইয়া থাকে। আত্মা অব্যবহিত, সুতরাং তাহার স্মৃতি হইবে কেন? আবরণ একবার ভঙ্গ হইয়া যাইলে আত্মা সদা অপরোক্ষ হইতে থাকিবে। এই পক্ষটি উত্তম পক্ষ।

(২২)
পূর্ব-মীমাংসায় আত্মা

জৈমিনীর মীমাংসাসূত্র ব্যাসসূত্রের চার গুণেরও অধিক। কিন্তু তাহার কোথাও দেহভিন্ন আত্মার কথা নাই। দেহভিন্ন আত্মা তাঁহারাও মানেন, তাহা না হইলে স্বর্গভোগ করিবে কে? তবে তাঁহাদের সূত্রে সে-কথা নাই। তাই তাঁহারা বলেন, যদিও আত্মার কথা আমাদের সূত্রে নাই, তবে আত্মার কথা পরমগুরু ব্যাসদেবের উত্তর-মীমাংসায় আছে, সেখানে দেখ। ব্রহ্মসূত্রে 'ঐকাত্ম্যাধিকরণম্' (৩।৩।৫৩-৫৪) প্রথম পূর্বপক্ষ করিয়া পরে সিদ্ধান্তসূত্রে দেহভিন্ন আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(২৩)
মৌন ব্যাখ্যান
(বাষ্কলি এবং রামচন্দ্র)

"বাষ্কলিনা চ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবচ ইতি শ্রূয়তে—'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি স তূষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচনে উবাচ—ব্রূমঃ খলু। ত্বং তু ন বিজানাসি। উপশান্তোঽয়মাত্মা।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৫।১৭ঃ শাঙ্করভাষ্য)

অদ্বয় ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত। বাক্যদ্বারা তাঁহাকে বলা যায় না। বলিতে যাইলেই দুটি আসিয়া পড়ে।

অধ্যারোপ ছাড়া বলা হয় না। তাই শ্রুতি নানা উপায়ে সেই তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বাধ্ব চুপ করিয়া সেই তত্ত্ব যেন বলিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রও বশিষ্ঠজীকে বলিয়াছিলেন—'যদি চুপ করে থেকেই সেই তত্ত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্য আপনার ছিল তবে প্রথমেই চুপ করলেন না কেন?' উত্তরে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন—'প্রথমেই চুপ করে থাকলে লোকে ভাবত আমি মূর্খ, কিছুই জানি না। তাই নানা কথা বলে, এখন চুপ করেছি। এখন তুমি চুপের মর্ম বুঝবে।' আসল তত্ত্ব মুখে বলা যায় না। তবে আচার্যরা ব্রহ্ম, আত্মা, সত্য ইত্যাদি নানা শব্দ কল্পনা করেছেন।

ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সংজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ॥

(মহাত্মনঃ=পরমাত্মনঃ)

(২৪)
নির্বিকল্প সমাধি ও জ্ঞান

নির্বিকল্প সমাধির উল্লেখ যোগশাস্ত্র ও বেদান্তের সাধনায় দেখা যায়। যোগমতে তীব্র

বৈরাগ্য সহায়ে ঐ সমাধি হইলে পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষ বিবেক ও তৎসম্মত মোক্ষ হয়। যাহারা বিভূতি চায় তাহারা সেসব পায়। কিন্তু উহা মোক্ষের প্রতিকূল। অষ্টাঙ্গ যোগ সহায়ে ঐ নির্বিকল্প সমাধি হয়।

আর বেদান্ত মতে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অনন্তর পরিপক্কাবস্থারূপ ঐ সমাধি। ইহাতে জ্ঞান দৃঢ় হয়। ক্ষণিকের জন্য হইলেও ঐ সমাধি সত্তা, চিৎ, আনন্দ ও অদ্বৈতের বোধক। ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ—এটি চিত্তে সুদৃঢ়রূপে ধারণা হয়। যিনি যত অধিক ঐ সমাধি অভ্যাস করেন তাঁহার জ্ঞান তত দৃঢ় হয়।

বার্তিক মতে নিদিধ্যাসন অর্থ বিজ্ঞান। সুতরাং শ্রবণ-মননের দ্বারাই যখন বিজ্ঞান হইয়া গেল তখন আর সমাধির প্রয়োজন কি? তবে ঠিক ঠিক বিজ্ঞান হওয়া চাই। এই বিজ্ঞান হইলে তখন তিনি সদাই সমাধিস্থ। ইহাই জ্ঞানসমাধি। তখন সদাই তাহার বৃত্তি চিদাকৃতি। বৃত্তি সর্বদাই সত্তা ও চিৎকেই বিষয় করে, নামরূপকে কখনই বিষয় করে না। ঘটের নামরূপ কেহ চোখে দেখে না, মৃত্তিকাকেই দেখে। তবে অজ্ঞানী একথা জানে না। সে মনে করে যে সে ঘট দেখিতেছে। জ্ঞানী সদা ব্রহ্মকেই দেখেন। কাজেই তাঁহার আর 'লাগানে-বালী সমাধি'র কি প্রয়োজন? তাঁহার তো 'লগী হুঈ সমাধি' সর্বদাই রহিয়াছে। সবকিছু করিয়াও তিনি সদা সমাধিস্থ।

(২৫)

ব্রহ্ম অবিনাশী কেন?

ব্রহ্ম অবিনাশী। 'বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি'। বিনাশ হয় বিরোধী বস্তুদ্বারা। যেমন ঘট, দণ্ডপ্রহার উহার বিরোধী। দণ্ডপ্রহার বা ভূমিপতন হইলে উহা ভগ্ন হয়। উহা ঘটের বিরোধী। মনে কর দুটি কলসি কেনা হইল। একটি তখনই নিচে পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল। বিরোধী সংযোগে উহা নষ্ট হইল। অপরটি সযত্নে সুরক্ষিত থাকায় ১০০ বছরেও নাশ হইল না। কেন? না, তার বিরোধী সহ সংযোগ হয় নাই বলিয়া। বিরোধী রহিয়াছে, কিন্তু তৎসহ সংযোগ হয় নাই।

তেমনি ব্রহ্মের কোন বিরোধী বস্তুই নাই, যাহার সঙ্গে সংযোগবশতঃ তাঁহার তৎকাল বা কালান্তরে নাশ হইবে। ব্রহ্মের নাশ নাই। বিরোধী বস্তু রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সংযোগের অভাববশতঃ নাশ নাই, তাহা নহে। বিরোধী কোন বস্তুই ব্রহ্মের নাই। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অন্য কোন বস্তুই নাই যাহা ব্রহ্মের বিরোধী হইতে পারে। ব্রহ্ম অসঞ্জাতবিরোধি। অনাদি বলে ব্রহ্ম নিত্য অবিনাশী, তাহা নহে। তাহার কোন বিরোধী নাই বলিয়া তিনি নিত্য। অনাদি বস্তুও বিনাশী হইতে পারে—যথা, ঘটের অনাদি প্রাগ্‌ভাব, ভবিষ্যতের অনাদি ভবিষ্যত্ব ধর্ম (সাংখ্যের দৃষ্টান্ত), গুহা মধ্যস্থ অনাদিকালের অন্ধকার ইত্যাদি। এসব অনাদিই বিরোধীর উদয়ে নষ্ট হয়।

(২৬)

অপৌরুষেয় বেদ

বেদ কোন পুরুষনির্মিত নহে। পরমেশ্বর হইতে অপ্রযত্নে উদ্ভূত। পূর্বকল্পে যেমন ক্রম-বিশিষ্ট বেদ ছিল, এ কল্পেও তদ্রূপ ক্রমে ঈশ্বর স্মরণ করিলে বেদ প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন কেহ গীতা মুখস্থ করিয়াছে। তাহার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন আর গীতা তাহার মনে নাই। মনই তখন লয় হইয়া গিয়াছে। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার স্মরণ করিয়া সেই গীতা আবৃত্তি করিতে লাগিল। তখন কি সে গীতার নির্মাতা হইল? তাহা নহে, পূর্বে গীতা যেরূপ ছিল সেরূপই সে আবৃত্তি করিয়া থাকে মাত্র। ঈশ্বরও সেরূপ বেদ যেরূপ ছিল সেরূপই স্মরণ করিয়া বেদ প্রকট করিয়া থাকেন মাত্র। অতএব বেদ কোন পুরুষ-নির্মিত নহে। উহা অপৌরুষেয়।

(২৭)

আত্মক্রীড়—আত্মরতি

ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষ ও রতি বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষভাবে বিষয়েতে প্রীতিমাত্র।

যিনি আত্মক্রীড় তিনি বাহ্যসাধন সৎশাস্ত্র

বেদান্ত, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সহায়ে আত্মচিন্তন অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যিনি আত্ম-রতি তাঁহার বাহ্যসাধন শাস্ত্র, সৎসঙ্গাদিরও প্রয়োজন নাই। যখন একান্তে থাকেন তখনও তাঁহার আত্মচিন্তন যেমন হয়, যখন ব্যবহার করেন তখনও তাঁহার তদ্রূপ আত্মচিন্তন অব্যাহত থাকে। একখানা বইও তাঁহার প্রয়োজন হয় না। আত্মাতে তাঁহার এত আসক্তি যে, সর্বাবস্থাতেই তাঁহার চিত্তে আত্মাকারাবৃত্তি জাগ্রত থাকে। আত্মানুভব প্রবল হইলে এই অবস্থা হয়।

ভক্তিশাস্ত্রে এই রতির নাম প্রেম। উহা সাধ্য নহে। ভক্তি দুই প্রকার। সাধনরূপা ভক্তি, যথা—শ্রবণ, মনন, কীর্তন, পাদসেবন ইত্যাদি। এগুলি পুরুষকারদ্বারা বাড়াইতে হইবে। এসব সাধ্য। আর যে দ্বিতীয় প্রেমলক্ষণা ভক্তি উহা সাধ্য নহে। যেমন বেদান্ত মতে জ্ঞান সাধ্যবস্তু নহে, অর্থাৎ পুরুষাধীন নহে, সেইরূপ প্রেম-ভক্তিও পুরুষাধীন নহে। জ্ঞানের সাধনসমূহ যেমন পুরুষাধীন, প্রেমের সাধনসমূহও সেই-রূপ পুরুষাধীন।

(২৮)

সর্বজ্ঞতা

সর্বজ্ঞতা দুই প্রকার। প্রথম—আমার হাতের মুঠির ভিতর কি আছে, বন্ধ ঘরের মধ্যে কি আছে, মাথায় কত চুল আছে ইত্যাদি বলিয়া দেওয়ারূপ সর্বজ্ঞতা। লোকে এইরূপই পছন্দ করে। এগুলি যোগসিদ্ধির দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু বেদান্তে যে-জ্ঞানে সর্বজ্ঞতা লাভ হয় বলিয়াছেন তাহা অন্যরূপ। উহা হইল এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। কারণকে জানা হইলেই সর্বকার্যকে জানা হইল। কারণ-ব্রহ্মকে জানা হইলে সর্বকার্য জানা হইল ; কারণ, সর্বকার্য ব্রহ্মে কল্পিত। কল্পনা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। উহা অধিষ্ঠানরূপই। কাজেই অধিষ্ঠানের জ্ঞানদ্বারাই সর্বপদার্থের জ্ঞান হইল। ইহাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সর্বজ্ঞতা।

(২৯)

পঞ্চবিধ পরিণাম বা বিকার (বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ)

সংক্ষেপ-শারীরকে চারটি বাদের কথা বলা হইয়াছে—সংঘাত, আরম্ভ, বিকার বা পরিণাম ও বিবর্ত।

সংঘাতবাদ—চার্বাক।
আরম্ভবাদ—ন্যায়-বৈশেষিক।

এই দুটি পক্ষই ব্যাসদেব উপেক্ষা করিয়াছেন।

বিকার বা পরিণামবাদ—সাংখ্য।
বিবর্তবাদ—বেদান্ত।

এই দুটি পক্ষই ব্যাসদেব উপেক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিকারবাদে পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত যোগবাশিষ্ঠ (পূর্বার্ধ : নির্বাণ-প্রকরণে) বলিয়াছেন।

১ **অতিরোহিত প্রাগবস্থা :** যথা সুবর্ণভূষণ বা মৃদ্‌ঘট। ভূষণ বা ঘট, সুবর্ণ বা মৃত্তিকার বিকার হইলেও এখানে ভূষণ বা ঘটের প্রাগবস্থা সুবর্ণ বা মৃত্তিকা তিরোহিত নহে। তাহাদের স্পষ্ট দেখা যায়। ভূষণ বা ঘট মনুষ্যনির্মিত। সুবর্ণ বা মৃত্তিকা ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

২ **প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থা :** যথা, বরফ। বরফ জলের বিকার বটে কিন্তু জল দেখা যাইতেছে না। ছুঁড়িয়া মারিলে মাথা ফাটিয়া যাইবে। জল ছুঁড়িয়া মারিলে মাথা ফাটে না। জলই বরফ হইয়াছে। বরফের প্রাগবস্থা জল এখানে প্রতি-বদ্ধ। জলকেও ফিরিয়া পাওয়া যায়।

৩ **প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থা :** যথা, রজ্জু-সর্প। সর্পের প্রাগবস্থা রজ্জু এখানে প্রচ্ছন্ন। রজ্জুই রহিয়াছে, শুধু সর্পরূপে প্রতীত হইতেছে মাত্র।

৪ **অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থা :** যথা, সমুদ্রের তরঙ্গ, বুদ্বুদাদি। তরঙ্গাদি সমুদ্রেরই বিকার। এখানে জলও দেখা যাইতেছে। তবে ইহা স্বাভাবিক। মনুষ্য-নির্মিত নহে। প্রথম (১নং) 'অতিরোহিত প্রাগবস্থা'র দৃষ্টান্তে যে ভূষণ বা ঘট বলা হইয়াছে সেখানেও সুবর্ণ বা মৃত্তিকা কার্যের সঙ্গে দেখা যায় বটে, তবে পার্থক্য এই যে, উহা স্বাভাবিক নহে, মনুষ্যনির্মিত, এই ভেদ।

৫ **বিনষ্ট প্রাগবস্থা** ঃ যথা, দুগ্ধ হইতে দধি। এখানে দধির প্রাগবস্থা দুগ্ধ আর নাই।

ইহাই যথার্থ পরিণাম। ইহাই পরিণামবাদের যথার্থ দৃষ্টান্ত। পূর্বের চারটি বিকার বা পরিণাম প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বিবর্তরূপ। সুতরাং ঐগুলি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্তরূপেও দেওয়া যাইতে পারে। 'অতত্ত্বতোঽন্যথাভানং বিবর্তঃ'। বিকার বলিলেও ঐগুলি বস্তুতঃ বিবর্তই। কারণ ঐ সকল স্থলে কার্যের প্রাগবস্থার কোন বিকৃতি বা যথার্থ পরিণাম হয় নাই।

যথার্থ পরিণামে প্রাগবস্থার বিকৃতি ঘটে।

'অপুনঃপ্রাগবস্থানং যৎ স্বরূপাবিপর্যয়ঃ।
তদ্‌বিকারাদিকং তাত যৎ ক্ষীরাদিষু বর্ততে॥'
(যোগবাশিষ্ঠঃ—পূর্বার্ধঃ নির্বাণ-প্রকরণ)

এই শ্লোকের টীকাতে পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার বিকারের কথা আছে।

বিবর্তে কার্যটি প্রতীতিমাত্র। উহা কোনকালেই হয় নাই। ইহাই তো অজাতবাদ। বিবর্তবাদই পরে অজাতবাদে পর্যবসিত হয়। কার্য কোনকালেই বস্তুতঃ নাই।

'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।'

(৩০)
গীতা শ্রুতি বা স্মৃতি ?

গীতা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই বটে। কারণ ব্যাস রচিত ও মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া উহা স্মৃতি। ঋষি-মুনিদের রচিত গ্রন্থই স্মৃতি হইয়া থাকে।

পুনঃ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া উহা শ্রুতিও বটে। কোন মনুষ্যনির্মিত গ্রন্থ তো উহা নহে? ব্যাস সংগ্রথন করিয়াছেন মাত্র।

শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রেও গীতাকে শ্রুতি বলা হইয়াছে। 'শব্দাৎ'—এইরূপে গীতাবাক্যকে বলা হইয়াছে। আর গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষেও দেখা যায় এরূপ লেখা আছে—'ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু'... ইত্যাদি। কাজেই গীতাকে শ্রুতি বলিয়াও মানা হয়।

(৩১)
অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল ?

বেদান্ত বলেন শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ, সদামুক্ত, নির্বিকার ইত্যাদি। তাহা হইলে ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য এই জগৎ কোথা হইতে আসিল—এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগে। যোগবাশিষ্ঠে দেখি, রামচন্দ্রের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তখন বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন ঃ

"কলঙ্কমাত্মনঃ কস্মাৎ কথং চেত্যাদি সংশয়ঃ।
নূনং নির্মূলতাং যাতো মৃগাঙ্কাগ্রে তমো যথা॥"
(নির্বাণ-প্রকরণ)

—অর্থাৎ আত্মাতে এই অবিদ্যাদি কলঙ্ক কেন ও কোথা হইতে আসিল এইসব সংশয় জ্ঞানোদয়ে, প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্রমার উদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া থাকে।

'ভ্রান্তিরেষা যথায়াতা তথায়াতু রঘূদ্বহ।
জ্ঞাস্যসে তৎ প্রবুদ্ধস্ত্বমেনাং কেবলমুৎসৃজ॥'
(উৎপত্তি-প্রকরণ)

—হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম! এই ভ্রান্তি যে প্রকারে আসিয়াছে, সেই প্রকারেই আসুক, অর্থাৎ তাহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। প্রবুদ্ধ হইলে তুমি সবই জানিতে পারিবে, এখন কেবল এই ভ্রান্তি কি করিয়া দূর হয় তাহার চেষ্টা কর। ভ্রান্তি ত্যাগের যত্ন কর। (জ্ঞান হইলে জানিতে পারিবে যে, এই অজ্ঞান শুদ্ধ আত্মাতে কোনকালেই ছিল না।)

অজ্ঞানাবস্থায় এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল—এই প্রশ্নই খাটে না। কেবল এই অজ্ঞান কি করিয়া যায় সেই চেষ্টা কর। পুনঃ জ্ঞান হইলে বোধ হয় যে, আত্মা নিত্যমুক্ত, তাঁহাতে অজ্ঞান কোনকালেই নাই।

সুতরাং এই প্রশ্নই নিরর্থক।

[স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর কথা সমাপ্ত]

স্মৃতিকথা

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ মাঘ, ১৩৯৬-এর পর]

বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা। মহারাজ শেষবার ভুবনেশ্বরে আছেন। আমিও তখন আমার এক বন্ধুর ভাড়া করা বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন ভুবনেশ্বরে ছিলাম। অধিকাংশ সময়টা মঠেই কাটাতাম। বিশেষ করে সকালে যখন মহারাজজী প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকতাম ছাতা নিয়ে। রামলাল-দাদাও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। একদিন মহারাজজীর সঙ্গে সকালে আমি একাই বেরিয়েছি। সঙ্গে আর কেউ নেই। তিনি মঠের প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে বাঁদিকে শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে মাঠ ভেঙে রেললাইন পার হয়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির রাস্তায় চলেছেন। জঙ্গলঘেরা এই ফাঁকা মাঠে প্রায়ই তিনি বেড়াতে যেতেন। সেই ফাঁকা নির্জন মাঠে যেতে যেতে তিনি আমায় হঠাৎ বললেনঃ "হ্যাঁরে, এখানে ঘুড়ি ওড়ালে কেমন হয়, বল দেখি?"

আমি বললামঃ "খুব ভাল হয়।"

তখন বললেনঃ "দেখ, এবার কলকাতায় গিয়ে আমায় খানকতক ঘুড়ি দিবি তো।"

আমি তখন ভাবলাম—মহারাজজীকে ঘুড়ি দেব, তাহলে লখনৌ থেকে কিছু ঘুড়ি আনিয়ে দেব। কারণ লখনৌর ঘুড়িই সবচেয়ে ভাল। পরে কলকাতায় ফিরে মঠের এক ভক্তকে (যাঁর ভাইরা লখনৌ থাকতেন) লখনৌ থেকে কিছু ঘুড়ি আনিয়ে দিতে বলি, ঐ ঘুড়িগুলি মহারাজজীকে দেব বলে। তিনি সানন্দে আনিয়ে দিতে রাজি হন।

তারপর মহারাজজী কলকাতা ফিরেছেন। বলরাম মন্দিরে আছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভবী ভোলবার নয়। আমাকে দেখেই বললেনঃ "কিরে, ঘুড়ির কি হলো?"

আমি বললামঃ "মহারাজজী, লখনৌ থেকে ঘুড়ি আনাবার ব্যবস্থা করেছি।"

উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, না, লখনৌ থেকে দরকার নেই। তুই কলকাতার ঘুড়িই নিয়ে আয়।"

এর অল্প কয়েকদিন পরেই মহারাজজী আঁটপুরে যান। আর শান্তিরামবাবুকে বলে ইন্দু (দেবাত্মানন্দ), ফণী ও আমাকে কৃপা করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর পূতসঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা হলো। এরপর মহারাজজীর অসুখ, আমাদেরও ম্যালেরিয়ায় পড়া, আর এরই প্রায় এক-দেড় মাস পরে মহারাজজীর স্বধামে প্রস্থান। তারপরেই লখনৌ থেকে ঘুড়ি এসে হাজির। সে ঘুড়ির একখানিও আমি স্পর্শ করিনি। আমি ঘুড়ি-পাগলা ছিলাম। এইভাবে দয়া করে তিনি আমার ঘুড়ি ওড়াবার তীব্র নেশাটি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন।

ভুবনেশ্বর মঠের সাহায্যকল্পে স্টার থিয়েটার একবার একটি সাহায্য-রজনী দেয়। ঐ উপলক্ষে মহারাজজী আমাকে কিছু টিকিট বিক্রি করে দেবার জন্য বলেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প কয়েকখানি টিকিট বিক্রির জন্য নিই। তখন তাঁর ছেলেমানুষের মতো এক মহা দুর্ভাবনা এসে হাজির হলো—যাদের কাছে টিকিটগুলি বিক্রি করব, তারা আগে ঐগুলি নিয়ে ছেলেমানুষ ভেবে পাছে আমায় ঠকিয়ে শেষে দাম না দেয়। তাই পাখি-পড়ানোর মতো আমায় বারবার বলতে থাকেনঃ "দেখ, আগে কক্ষনো টিকিট কাউকে দিবিনে। যে টিকিট দিবি, প্রথমে তার পুরো দামটা হাতে নিবি তারপর টিকিট দিবি।"

তাঁর তখনকার এ-অবস্থাটি দেখে বেশ একটু মজা উপভোগ করেছিলাম। ঐ সাহায্য-রজনীতে 'কিন্নরী' ও 'রামানুজ' নাটক দুখানি অভিনীত হয়েছিল। যাহোক, টিকিট বিক্রির কোন টাকা মারা না যাওয়ায় তিনি কতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন তা কিন্তু জানা যায়নি।

ভুবনেশ্বর মঠ তৈরি হলে নারায়ণ আয়েঙ্গার ব্যাঙ্গালোর থেকে মাঝে মাঝে এসে মহারাজজীর সঙ্গে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। মহারাজজী তখন ভুবনেশ্বরে। নারায়ণ আয়েঙ্গারও ছুটিতে

এসে তাঁর কাছে আছেন। মহারাজজীর ভক্ত বিনোদবাবু সপ্তাহে দু-তিনটে করে শাক-সবজি ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পার্শেল সেখানে পাঠাতেন। ঐ সময়ে কিছুদিন আমিও ভুবনেশ্বরে চেঞ্জে গিয়েছিলাম। বেশির ভাগ সময় মহারাজজীর সঙ্গেই কাটাতাম। একদিন ঐরকম একটা শাক-সবজির পার্শেল এসেছে। মহারাজজীর সামনে সেই পার্শেল খোলা হলো। তার মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ডেন্টনিক টুথ পাওডার-এর একটি কৌটোও ছিল। সম্ভবতঃ সেটা আয়েঙ্গার মশায়ের জন্য আনানো হয়েছিল। সকালবেলা—সাড়ে আটটা হবে। আয়েঙ্গার নিচে ঠাকুরঘরে বসে ধ্যানজপ করছিলেন। সেই টুথ পাওডার-এর কৌটোটি দেখে মহারাজজী ভবানী মহারাজকে (স্বামী বরদানন্দকে) বললেন: "দেখ, আয়েঙ্গার এখন ঠাকুরঘরে ধ্যানজপ করছে। তুই খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঐ কৌটোটি ওর সামনে রেখে দিবি। ও যেন টের না পায়। আবার সাবধানে পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঠাকুরঘরের বাইরে একটু অপেক্ষা করবি। লক্ষ্য রাখবি, ও ধ্যানজপ সেরে যখন উঠতে যাবে তখন ওকে গিয়ে বলবি—'your meditation has brought you this.'" ভবানী মহারাজও ঠিক তাই করেছিলেন।

মহারাজজীর কৃপাধন্য শিষ্য স্বামী মঙ্গলানন্দ একবার আমায় বলেছিলেন: "একদিন সকালে আমি বেলুড়ে পুরনো ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় জপ করছি। মহারাজ ক্বচিৎ কখনো ঠাকুরঘরে যেতেন। সেদিন কিন্তু কি মনে হয়েছে, ঠাকুরঘরে গিয়েছেন। তিনি আমার সামনে দিয়েই কিন্তু নিঃশব্দে ঠাকুরঘরে গেলেন। সরু বারান্দা। আমি চোখ খুলে দেখি তিনি। দেখে যেন মহা অন্যায় করেছেন এই ভেবে তিনি বলতে থাকেন—'দেখ বাবা, তুই জপ করছিলি; আর আমি তোর জপে বাধা দিলাম। তা তুই কিছু মনে করিসনি।' এই ছিলেন মহারাজ!"

ঐ মঙ্গলানন্দজীকেই তিনি একবার বলেছিলেন: "দেখ, যেখানেই যাস না কেন, যেখানে গিয়ে থাকিস না কেন, সেখানে এমন কিছু করিসনি যাতে অপরে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ওপর সামান্যমাত্র কটাক্ষপাত করতে পারে।" আর একবার তাঁকে বলেছিলেন—"দেখ, তোর চেয়ে বয়সে যদি কেউ ছোটও হয়, কিন্তু তোর চেয়ে একদিন আগে মঠে এসে যোগ দিয়েছে তবে তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবি।"

ভুবনেশ্বর মঠে এক শীতের বিকালে তাঁর ঘরের সামনে মহারাজজী পূবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; আর আমি তাঁর সামনে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য অস্ত যাবার আগে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সেই নিস্তেজ অস্তমিত কিরণ আমার মুখে পড়েছে। তখন মহারাজজী বলে উঠলেন: "ওরে, পড়ন্ত রোদ্দুর মুখে লাগাসনি।" অতি সামান্য একটি কথা। কিন্তু সে-কথা এমন স্নেহভরে বলেছিলেন যে, তা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

তখন শীতকাল। মহারাজজী ভুবনেশ্বর মঠে রয়েছেন। রোজই সকালে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে প্রায়ই রামলালদা, বিপিন জামাই প্রভৃতি আরও দু-একজন থাকতেন। আবার কোন কোন দিন তিনি একলাও বেড়াতে বেরোতেন। আমিও সকালে তাঁর সঙ্গী হবার চেষ্টা করতাম। প্রধানতঃ আমিই তাঁর ছাতাটা বইতাম। ভুবনেশ্বর মঠের প্রধান গেটটি দিয়ে বের হয়ে তিনি বাঁদিকে ধানের ক্ষেত আর রেললাইন পার হয়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির দিকে যেতেন। কোন দিন মেন গেট দিয়ে বের হয়ে স্টেশনের দিকে যেতেন। আবার কোন দিন বা স্টেশন অবধি গিয়ে সোজা রাস্তায় না ফিরে পেছনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে মঠে ফিরতেন।

একদিন তিনি সকালে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আর কেউ নেই, একা আমি তাঁর ছাতা বয়ে নিয়ে চলেছি। সেদিন তিনি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে পেছনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে মঠে ফিরছেন। তখন সকাল নটা-সাড়ে নটা। আর আট-দশ মিনিট চললেই পেছনের দরজা দিয়ে মঠে ঢোকা যাবে। এমন সময় কি একটা জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। তখন মহারাজজী ভয় পেয়ে আমাকে বললেন: "ওরে, কি ডাকছে রে? বাঘ নয়তো?" জন্তু-জানোয়ারের ডাকের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। সুতরাং আমি আর কি জবাব দেব? চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মহারাজজীর ভয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। [ক্রমশঃ]

ঋগ্‌বেদ-সংহিতা

মন্ত্র ও সায়নভাষ্য অবলম্বনে ভাবানুবাদ

প্রগতি রায়

প্রথম মণ্ডল ॥ প্রথম সূক্ত

প্রথম মন্ত্র

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ ।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥

আগুন জ্বালানো হয়েছে ।
আমার যজ্ঞগৃহের তিনধারে ।
বেদীর তিনদিকে আগুনের শিখা
আরও বেশি স্নেহ চায় ।
তারও বেশি স্নেহবিন্দু দিয়ে
বন্দনা করি—মধুচ্ছন্দা । অগ্নিকে ।
শতকোটি দেবতাকে ॥

অগ্নিই দেবতা ।
দেবতারাই অগ্নি ॥
শ্রদ্ধাজড়ানো আমার স্নেহ নিয়ে
অগ্নি গেছেন ওঁদের কাছে ।
ওঁদের আশিসে হয়েছেন পুরোধা ।—
আমার এ যজ্ঞে—
দেবতাদের যজ্ঞে—
পুরোহিত অগ্নি, এনেছেন
ওঁদের সসম্মানে ॥

দীপ্যমান সোনার বর্ণে
এক দীপ্ত রত্নধারী—
আমি অগ্নির স্তব করি

দ্বিতীয় মন্ত্র

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত ।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥

আমাদের সেই পূর্বপিতারা
যেদিন অগ্নিকে প্রথম পেলেন
নিজেদের মধ্যে, নিজের করে—
সেদিন তাঁদের সে বন্দনা,
হে অগ্নি ! তুমি গ্রহণ করেছ হৃষ্টচিত্তে ।
পেঁছে দিয়েছ
হৃদয়ের বাণী
দেবতার কাছে । পরম মহত্ত্বে ॥

এমনি করেই
পরম্পরায়
হৃদয়-অর্ঘ্য গ্রহণ কর,
নবীন হে অগ্নি ! নবীন আমরা-
নবীন স্তোত্র এনেছি শুধু
তোমারই জন্যে ॥
তোমার সহায়ে দেবেরা সুলভ,
তৃষিত-হৃদয় আমাদের কাছে ।
আমাদের এই যজ্ঞভূমিতে—
আসুন তাঁরা—
তোমার সঙ্গে ॥

প্রথম মণ্ডল ॥ দ্বিতীয় সূক্ত

সপ্তম মন্ত্র

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্‌ ।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥

গবাময়ন এই যে যাগ
বছর ধরে বিস্তৃত ।
সেই সে যাগের দ্বিতীয় দিনে
সকালবেলার সোম পেষা—'প্রাতঃসবন' ;
আড়ম্বরে ভরা ॥
বিশ্বামিত্রের পুত্র আমি মধুচ্ছন্দা—
সে প্রাতের সেই সোমসবনে,
ডাকি তোমাদের—হে মিত্র ! বরুণ ॥
পবিত্র বলে বলশালী তুমি—
হে মিত্র ! হে সূর্যদেব !
স্বীয় শক্তিতে
আরও বলীয়ান্‌
করেছ বিশ্বজগৎটাকে,
এস হে তুমি আমার যজ্ঞে—
সাজিয়েছি হবিঃ—
গ্রহণে সার্থক করে তোল তাকে ।
তুমিও এসো সাথে
হে বরুণদেব—আমার যতেক
শত্রুবিনাশী ।
তৃপ্ত হও এ সুমেধ হবিঃতে ॥
তাতে বর্ষিত হোক তোমাদের আশিস ।
বর্ষণ শুরু হোক এ ধরাতে ।
স্নান করে আমি সিক্ত হব ।
সিক্ত হবে এ জগৎ-সংসার ।
সিক্ত হবেন ধরিত্রীমাতা ॥

চতুর্থ মন্ত্র

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥

অগ্নিদেব—
হে পার্থিব দেবতা,
আমাদের এ যজ্ঞ তুমি রক্ষা কর ॥

এ ক্রতু—
রাক্ষস-হিংসায় যখন উত্তাল ; বারংবার
মাত্র তুমিই তাকে রক্ষা করেছ—
স্থাপিত হয়েছ
যজ্ঞভূমির চতুর্দিকে ॥

এসেছ তুমি—
সৌমিক-বেদীর পূর্বদিকে—
'আহবনীয়' ॥

দক্ষিণে এসেছ—'মার্জালীয়' ।
'গার্হপত্য' অগ্নি তুমি পশ্চিমে ।
'আগ্নীধ্রীয়' নাম উত্তরে ॥

তোমার বেষ্টনে
নির্বিঘ্ন যজ্ঞ—
অসুর-ভয়হীন সম্পূর্ণ ক্রতু ॥
এ যজ্ঞ দেবতাদের মনে ধরা ।
এ যজ্ঞে তাঁরা অভিলাষী ॥
এ ক্রতুর উত্তরণ হোক তাঁদের মধ্যে ॥

পরিক্রমা

আইসল্যাণ্ডে কয়েকদিন

স্বামী ভাস্করানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় আইসল্যাণ্ডেই। ৯৩০ খ্রীস্টাব্দে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর গণতান্ত্রিক কাঠামোতে শাসন চলেছিল ৩৩১ বছর ধরে। কিন্তু ১২৬২ খ্রীস্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক বিপদ দেখা দেয়। দেশের প্রতিষ্ঠাবান ও ক্ষমতাশালী কয়েকটি পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা-গ্রাসের লড়াই চলছিল কিছুদিন ধরে। ১২৬২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সে লড়াই-এর ফলে আইসল্যান্ড এক রক্তক্ষয়ী রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তখন জাতীয় পার্লামেন্টে ভোটের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সম্ভাব্য অরাজকতা ও রক্তক্ষয়ী রাষ্ট্রবিপ্লবকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আইসল্যান্ড নরওয়ের রাজার আধিপত্য মেনে নেবে। এবং কার্যতও তাই করা হয়।

১৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা নরওয়ে রাজ্য অধিকার করেন। ফলে আইসল্যান্ড ডেনমার্ক রাজ্যের অধিকৃত কলোনিতে পর্যবসিত হয়। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নেপোলিয়নের সম্প্রসারবাদী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এক সময় নরওয়ে সুইডেন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু আইসল্যান্ড ডেনমার্কের অধিকৃত কলোনি হিসাবেই থেকে যায়। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর বিনা রক্তপাতে শেষ পর্যন্ত আইসল্যান্ড আবার এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, ইনগোলফার আরনারসনের মতো 'ভাইকিং'রা আসার বেশ কিছুদিন পূর্বেই অল্পসংখ্যক আইরিশ খ্রীস্টান পাদ্রী আইসল্যান্ডে এসে তাঁদের মঠ স্থাপন করেছিলেন। আইসল্যাণ্ডের এক আদি ঐতিহাসিক আরি থর্গিলসন (১০৬৮—১১৪৮ খ্রীস্টাব্দ) লিখেছেন: "ভাইকিংরা এদেশে আসার পর আইরিশ পাদ্রীরা তাঁদের দেশে ফিরে যান, কারণ তাঁরা ভাইকিংদের অখ্রীস্টীয় 'প্যাগান' ধর্ম পছন্দ করেননি।" কিন্তু মনে হয়, পাদ্রীরা উগ্রস্বভাব ও যুদ্ধবাজ ভাইকিংদের দুর্ব্যবহারেই আইসল্যান্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

এ সংবাদ পাঠকদের সকলের জানা আছে কিনা জানি না; তাই তাঁদের অবগতির জন্য লিখছি, আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্তা স্পেনের কলম্বাস নন, ইটালীর আমেরিগো ভেসপুচিও নন। উত্তর আমেরিকা মহাদেশ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন স্কানডিনেভিয়ার 'ভাইকিং'রা। ক্যানাডার উত্তরাঞ্চলে 'ভাইকিং'রা যে কলম্বাসের বহুপূর্বে এসেছিলেন ইদানীং তা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

'ভাইকিং'দের ধর্ম, যা খ্রীস্টানদের ভাষায় 'প্যাগান' ধর্ম বলে পরিচিত, তার প্রধান দেবতা হচ্ছেন থর। থর মুখ্যতঃ নাবিক, চাষী ও মেষপালকদের দেবতা। এ-ছাড়া রয়েছেন ভূমি ও মানুষের উর্বরতার দেবতা ফ্রেইর, এবং যুদ্ধ ও কাব্যের দেবতা ওডিন। এঁদের সন্তুষ্টির জন্য বলি দেওয়ার প্রথাও ছিল।

সে যা হোক, আইসল্যান্ড থেকে আইরিশ পাদ্রীরা চলে গেলেও ৯৯৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে আইসল্যান্ডে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয়। নরওয়ের খ্রীস্টান রাজা ও লাফ ট্রিগভাসনের উৎসাহ ও সমর্থনে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক আইসল্যান্ডের কিছু প্যাগান অধিবাসীকে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। এ ধর্মান্তরিতকরণে থ্যাংব্র্যান্ড নামে একজন নরওয়েজিয়ান পাদ্রী এবং থরমুদুর নামে এক নব-ধর্মান্তরিত আইসল্যান্ডীয় খ্রীস্টান ধর্মযাজকের অবদান উল্লেখযোগ্য।

৯৯৯ খ্রীস্টাব্দ আইসল্যান্ডের ধর্মীয় ইতিহাসে এক প্রখ্যাত বৎসর। সে বছর খ্রীস্টধর্ম আইসল্যান্ড রাষ্ট্রের একমাত্র জাতীয় ধর্ম হিসাবে সর্বজনগৃহীত হয়। এর পূর্বে নব-ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ও অন্যান্য প্যাগান অধিবাসীদের মধ্যে স্বভাবতই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ ও বিরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছিল। এ-ছাড়া

খ্রীস্টানদের পেছনে পরাক্রান্ত নরওয়ের রাজার উন্মুক্ত সমর্থন ছিল বলে স্বল্পজনঅধ্যুষিত আইসল্যান্ড তার গণতান্ত্রিক কাঠামো ও জাতীয় একতা বজায় রাখার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার দেওয়া হয়েছিল থরগেইর থরকেলসন নামক জনৈক প্যাগান নেতার উপর। তিনি ছিলেন একাধারে ক্যাপটেইন এবং প্যাগান ধর্মের পুরোহিত। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকে ২৪ ঘণ্টা বসে গভীর চিন্তা বা ধ্যানের পর সিদ্ধান্ত নেন যে, আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা "রাষ্ট্রের একতা রক্ষা ও অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য" খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু খ্রীস্টান ও প্যাগান উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির জন্য তিনি মধ্যপন্থা গ্রহণের উপদেশ দেন। অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্যাগান ধর্মের কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলার স্বাধীনতা সবার থাকবে। তবে বলিদান, ইত্যাদি প্যাগান ধর্মের আচরণ প্রকাশ্যে করা চলবে না, গোপনে করতে হবে।

বর্তমানে আইসল্যান্ডবাসীদের ৯৭ শতাংশ ইভ্যানজেলিক্যাল লুথারান খ্রীস্টান। বাকি ৩ শতাংশ খ্রীস্টধর্মের অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ইদানীং বিগত দুই দশক ধরে আইসল্যান্ডের প্রাচীন প্যাগান ধর্মকে ভিত্তি করে একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মটির নাম আসাত্রু। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সোয়েইনবিয়র্ন বেইনটেইনসন দ্রাঘালস অঞ্চলের একজন মেষপালক ও কবি। প্রায় ১০০ জন এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে এবং ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই ধর্মটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান অধিবাসীরা এ ধর্মান্দোলনকে জনৈক ছিটগ্রস্ত কবির পাগলামি ছাড়া বেশি কিছু মনে করেন না।

৫ জুলাই (১৯৮৯) সকালের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিঃ ইয়ন আরনাল্ডস। তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। পেশাতে তিনি আইনজীবী, এবং বর্তমানে রেকিয়াভিকের সিটি-জজ। দু-চার বছর আগে তিনি আইসল্যান্ড রাষ্ট্রের একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। অতি সুশিক্ষিত ব্যক্তি; বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন।

একটু পরেই মিঃ হ্যারাল্ডসন আমার হোটেলে এসে পৌঁছলেন। বললেন: "স্বামীজী, আমরা আজ আপনাকে রেকিয়াভিক ও আশেপাশের কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আবহাওয়ার কোনও উন্নতি হয়নি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং তৎসঙ্গে ঝিরঝির করে বৃষ্টি। তাই আমরা বর্ষাতি পরে বেরোলাম দৃশ্য দর্শনে। মিঃ ইয়ন আরনাল্ডসের গাড়িতে।

প্রথমে আমরা গেলাম থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মন্দিরটি দেখতে। মন্দিরটি হোটেল থেকে গাড়িতে দু-মিনিটের পথ। এদেশে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে। কিছুসংখ্যক উদার প্রকৃতির লোক এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। সে-বছরই মন্দিরটিও তৈরি হয়। তেতলা বাড়ি, কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি। নিচের তলায় বক্তৃতাদির জন্য হল রয়েছে। উপর তলার ঘরগুলিতে লাইব্রেরী, অফিস, ইত্যাদি। বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৬৩০; কিন্তু তা ক্রমশঃ বাড়ছে। একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা এঁরা প্রকাশ করেন, তার গ্রাহক সংখ্যা ১৬০০।

এরপর আমরা গেলাম রেকিয়াভিকের একটি ইভ্যানজেলিক্যাল লুথারান চার্চ দেখতে। গির্জাটির স্থাপত্য অস্বাভাবিক ধরনের। আগ্নেয়গিরির মতো আকৃতি। আট-ন তলা উঁচু। লিফ্‌ট দিয়ে আমরা গির্জাটির চূড়ায় উঠলাম। চূড়া চারপাশে জানালা রয়েছে। জানালা দিয়ে রেকিয়াভিক শহর, ফাক্সা উপসাগর ও রেকিয়াভিকের অদূরে পর্বতমালা দেখা গেল। পাহাড়ের ওপর স্থানে স্থানে তখনও তুষার জমে রয়েছে। আমার সঙ্গীদের একজন বললেন: "বহু বছরের মধ্যে গ্রীষ্মকালে এমন শীত কখনো পড়েনি। তাছাড়া গেল বছর শীত ঋতুতেও বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছিল।" অপর সঙ্গীটি বললেন: "রেকিয়াভিকে সাধারণতঃ এসময় বেশ গরম পড়ে। শীতের সময়ও তেমন একটা তুষারপাত হয় না।"

এই গির্জাটির খুব কাছে 'ন্যাশন্যাল এইনার ইয়নসন গ্যালারী' নামে একটি মিউজিয়াম আছে। এইনার ইয়নসন আইসল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন। তাঁর তৈরি বহু মূর্তি এবং তার

সঙ্গে ওঁর আঁকা কয়েকটি তৈলচিত্রও মিউজিয়ামে রয়েছে। আমার সঙ্গীরা আমাকে মিউজিয়ামে নিয়ে গেলেন।

আইসল্যাণ্ডবাসী জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে, আইসল্যাণ্ডের বহু বছরের মিস্টিক ঐতিহ্য রয়েছে। এইনার ইয়নসনের প্রতিটি ভাস্কর্যে ও চিত্রে এই মিস্টিসিজম ও ধর্মীয় সিম্বলিজম-এর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা গেল।

রেকিয়াভিক শহরের কয়েক মাইল দূরে থিংভাল্লা-বাতন নামে একটি স্বাদু জলের হ্রদ রয়েছে। আইসল্যাণ্ডের এটিই সবচেয়ে বড় হ্রদ। এই হ্রদটি দেখার পর আমরা গেলাম একটি ঐতিহাসিক স্থান থিংভেল্লির দেখতে। এখানেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

শুধু রাজনৈতিক চেতনাতেই নয়, বিদ্যোৎসাহেও এদেশ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে অগ্রগামী। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এদেশে নিরক্ষর লোক নেই। আইসল্যাণ্ডিক ভাষাতে জনপ্রতি যত বই প্রতি বছর প্রকাশিত হয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তা হয় না।

আইসল্যাণ্ডিক ভাষা-প্রসঙ্গে এদের 'সাগা' (Saga) সাহিত্যের উল্লেখ অবশ্যই করা দরকার। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইসল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক হালদোর ল্যাকসনেস বলেন: "আমাদের দেশের সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে 'সাগা' সাহিত্য।" 'সাগা'কে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যধর্মী বলা হয়। 'সাগা' শব্দের অর্থ 'কথা' বা 'কাহিনী'। রামায়ণ ও মহাভারতকে শুধু মহাকাব্য নয় 'ইতিহাসও' বলা হয়েছে। 'সাগা'তেও রামায়ণ ও মহাভারতের মতো ঐতিহাসিক উপাদান, বীরত্বপূর্ণ ও নাটকীয় ঘটনাবলী এবং কিংবদন্তীর প্রাচুর্য রয়েছে। 'সাগা' সাহিত্যেও ভারতের দুটি মহাকাব্যের মতোই গদ্য ও পদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'সাগা'তে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো উৎকৃষ্ট ধর্মীয় উপাদানের অভাব রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তবৃন্দ শুনে সুখী হবেন যে, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর 'কর্মযোগ' আইস-ল্যাণ্ডিক ভাষায় অনূদিত হয়। স্থানীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির জনৈক সভ্য আমাকে বলেছিলেন: "আমার যখন পনের-ষোল বছর বয়স তখন আমার ঠাকুরদা আমাকে বলেন, 'তোমাকে আমি এমন একটি বই পড়তে দেব যার মতো ভাল বই এদেশে বিরল।' সে বইটি হলো স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ'।" বহু বছর পর ইদানীং বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। তবে স্বামীজীর অন্য কোন বই আইসল্যাণ্ডিক ভাষায় অনূদিত হয়নি। কিন্তু এদেশের বিদগ্ধ মহলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম অল্পবিস্তর পরিচিত। এদেশের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ঔপন্যাসিক হালদোর ল্যাকসনেস ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে আইসল্যাণ্ডিক ভাষায় অনূদিত স্বামীজীর 'কর্মযোগের' একটি রিভিউ (review) লিখেছিলেন যা আইসল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আইসল্যাণ্ডের দুজন প্রখ্যাত লেখক, ইয়ন থোরোড-সেন এবং থোরবেরগুর থোরডারসন, বইটির অনুবাদ করেছিলেন। মিঃ থোরডারসন স্বামীজীর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর লিখিত বহু প্রবন্ধে তিনি স্বামীজীর কথা উল্লেখ করেছেন।

এ-ছাড়া থিয়সফিক্যাল সোসাইটির জনৈক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ গ্রেটার ফেলস স্বামীজী সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখেছেন যা সোসাইটির ষাণ্মাসিক পত্রিকা 'গাংলেরি'তে ছাপা হয়েছে। গ্রেটার ফেলস খ্যাতনামা কবি ও লেখক ছিলেন। মিঃ হালদোর হ্যারাল্ডসন 'রাজযোগ'-এর কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন এবং স্বামীজী সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছি স্বামীজী-সম্পর্কিত ওঁর এবং অন্যান্য লেখকদের রচনাগুলি একত্রিত করে বই আকারে ছাপাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা মিঃ হ্যারাল্ডসনের কাছে শুনেছি। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে রেকিয়াভিকে মিঃ গেস্তুর আউস্কার ফ্রিডবার্গসন নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে হালদোর হ্যারাল্ডসনের পরিচয় হয়। ভদ্রলোকের বয়স তখন পঁচাত্তর ছিয়াত্তর হবে। তিনি একবার অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। ঘটনাটি হালদোর হ্যারাল্ডসনের ভাষাতেই বলি:

"স্বামীজী, আমি আজ আপনাকে যে ঘটনাটি বলছি তা এর আগে কাউকে কখনও বলিনি।

"মিঃ গেস্তুর ফ্রিডবার্গসন তাঁর বাড়িতে আমাকে

নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দেখলাম তাঁর বাড়ির ড্রইং-রুমটি নানা রকমের ধর্মপুস্তকে ভর্তি। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বত-সম্পর্কিত অনেক বই ওঁর বাড়িতে ছিল। তাঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবিও ছিল।

"মিঃ ফ্রিডবার্গসন সেদিন বললেন, 'হালদোর, আমি অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাই নিউ ইয়র্ক শহরে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। আমি তখন আমাদের দেশের একটি জাহাজের ইঞ্জিনিয়র ছিলাম। আমাদের জাহাজ নিউ ইয়র্ক বন্দরে নোঙর ফেলেছিল। আমি তখন দু-একদিনের ছুটিতে নিউ ইয়র্ক শহরে যাই। ম্যানহাটান এলাকার একটি পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম একটি বাড়ির সামনে লেখা রয়েছে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার'। দেশে স্বামী বিবেকানন্দের নাম আমি শুনেছিলাম। কৌতূহল-ভরে সে বাড়ির দরজায় ঘণ্টা বাজাতে একজন দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি বাড়িটি হচ্ছে একটি চার্চ বা মন্দির; নিচের তলায় বক্তৃতা দেবার হল রয়েছে। এক পাশে কিছু ধর্মপুস্তকও বিক্রির জন্য ছিল। তার মধ্যে 'Gospel of Sri Ramakrishna' নামে একটি বই আমার নজরে পড়ল। বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমি কিনি। এর আগে আমি সে বইটি কখনও দেখিনি।

"পরে আমি যখন আমার হোটেলে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমি চেয়ারে বসে আছি, আমার সামনে টেবিলের উপর 'Gospel'-এর কপিটি খোলা রয়েছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখতে পেলাম, আর তার ভেতরে দেখতে পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণকে। অল্পক্ষণ পরে তাঁর আলোকোদ্ভাসিত মূর্তি আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। আমি অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে পূর্বে কখনও হয়নি।"

ঘটনাটি শোনার পর আমি মিঃ হ্যারাল্ডসনকে জিজ্ঞেস করলাম: "মিঃ ফ্রিডবার্গসন কি এখনও বেঁচে আছেন?" তদুত্তরে মিঃ হ্যারাল্ডসন বল্লেন, "না স্বামীজী, ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বছর দুই পরে উনি মারা যান।"

"কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে", মিঃ হালদোর হ্যারাল্ডসন বললেন: "মিঃ ফ্রিডবার্গসন তাঁর দর্শনটি বর্ণনা করার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হালদোর, তুমিও কি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছ?' তাঁর প্রশ্নে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। সে-সময় আমি ছিলাম ঘোর সংশয়বাদী। অথচ মিঃ ফ্রিডবার্গসনের বর্ণিত ঘটনাটি আমি জনৈক বৃদ্ধের খেয়ালমাত্র অথবা নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিতেও পারলাম না। তিনি বৃদ্ধ হলেও তাঁর বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য তখনও অব্যাহত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মনিষ্ঠাতেও কোন ফাঁকি ছিল না। তদুপরি আমাদের মতো খ্রীস্টান-অধ্যুষিত দেশে স্বল্প-পরিচিত এই ভারতীয় সন্তের দর্শন-প্রসঙ্গের উল্লেখে মিঃ ফ্রিডবার্গসনের আধ্যাত্মিক মহিমা বাড়বার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। বরং অপরের কাছে তাঁর হাস্যাস্পদ হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু আমি দেখেছি যে, সত্যের একটি বিশ্বাস উৎপাদন করার শক্তি আছে। আমার সংশয়গ্রস্ত মনের অবিশ্বাসের মেঘ-স্তর ভেদ করে সে শক্তি ইতিমধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তাই তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি আমি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

"আমি তাঁকে বললাম, 'আমি সংশয়বাদী, আমার মন অগণিত সন্দেহে ক্লিষ্ট। আমার কোনও আধ্যাত্মিক দর্শন হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া আমার ভক্তি-বিশ্বাস আদৌ নেই।'

"তিনি তখন আমাকে বললেন, 'হালদোর, আমি লক্ষণ চিনি। তুমি সংশয়বাদী নও, মূলতঃ তুমি ভক্ত। ভবিষ্যতে তুমি তা জানতে পারবে।' "

রেকিয়াভিকের থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে ৫ জুলাই রাত্রিতে আমাকে একটি ভাষণ দিতে হয়। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সেদিন আমার পাশে বসে আমার ভাষণটি আইসল্যাণ্ডিক ভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক সবাই এদেশে ইংরেজী পড়তে ও লিখতে পারেন তবু অনেকেই ইংরেজী তেমন বলতে পারেন না; অথবা কেউ ইংরেজী বললে তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই দোভাষীর প্রয়োজন হয়।

পরের দিন ভোরবেলা রেকিয়াভিক থেকে ৬৫ মাইল দূরে ফ্লুদির শহরে আমাকে গাড়িতে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেখানেই চারদিন ধরে রিট্রিট হবে।

পথে একটি শহরে আমাকে একটি স্বাস্থ্যনিবাস দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার নাম ঃ 'ন্যাচারাল হিলিং সোসাইটি'। এখানে বহু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এসে ৫।৬ সপ্তাহ থাকেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসা, উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান ও মালিশের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। সবাইকে পুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হয়। আমরাও দুপুরের খাওয়া সেখানে খেলাম। টানা-দুধের দই থেকে তৈরি 'স্কীর' (skir) বলে একটি মিষ্টি-খাবার আইসল্যান্ডবাসীদের অতি প্রিয়। সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দিয়ে দই-এর জলীয় অংশটি বার করে নেওয়া হয়। এই জলীয় স্বচ্ছ অংশটি 'ফোলিক অ্যাসিড' ইত্যাদি পুষ্টিকর পদার্থে সমৃদ্ধ বলে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাদ অনেকটা ছানার জলের মতো। 'স্কীর' খেতে হুবহু উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রীখণ্ডের মতো। এর সঙ্গে ক্রিম মিশিয়ে খেতে হয়।

আইসল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য কোনও খরচা দিতে হয় না। তবে রুগীরা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাইলে তার জন্য কিছু অর্থব্যয় করতে হয়, যদিও তা যৎসামান্য। এই স্বাস্থ্যনিবাসে ভর্তি হতে হলে চিকিৎসকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

সন্ধ্যার দিকে আমরা ফ্লুদিরে এসে পেঁছালাম। প্রায় সমগ্র পথটি লাভা-প্রস্তর দিয়ে তৈরি। আইস-ল্যান্ডের সব রাস্তাই পিচ দেওয়া নয়। গ্রাম্য পথগুলি ভাঙা নুড়ি-পাথর অথবা ভাঙা লাভা-প্রস্তর দিয়ে তৈরি।

গ্রীষ্মকালে আইসল্যান্ডের সব স্কুল-কলেজ কয়েক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি সবই আবাসিক স্কুল। ছাত্রছাত্রীরা সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত স্কুলেই থাকে। শনি-রবিবার বাড়ি যেতে পারে। সব স্কুলই অবৈতনিক। তবে খাওয়ার খরচা দিতে হয়। এক পরিবারের তিনটি সন্তান একই স্কুলে ভর্তি হলে কিন্তু খাবার খরচা দিতে হয় না।

গ্রীষ্মকালে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই কম খরচার হোটেলে রূপান্তরিত হয়। একক ব্যক্তির জন্য একটি স্বল্প-পরিসর ঘরে একটি সাধারণ বিছানা, একটি ছোট টেবিল ও একটি চেয়ার থাকে। ঘরের এক পাশে হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য দেওয়াল-সংলগ্ন একটি বেসিন ও তাতে গরম ও ঠান্ডা জলের কল রয়েছে। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম, ইত্যাদি নেই। তবে প্রতি তলাতেই দু-তিনটে করে বাথরুম রয়েছে ; হোটেলের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য।

ফ্লুদিরের যে হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সে হোটেলটি এ ধরনের হোটেল। হোটেলটির নাম ঃ 'হোটেল ফ্লুদির'। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিচের তলায় ; হোটেলের অফিস ও 'লাউঞ্জ'ও সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিচের তলার রেস্তোরাঁয়।

রিট্রিটে যোগ দিতে জনা ষাটেক পুরুষ ও মহিলা এসেছিলেন। আইসল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে এর মধ্যে দু-তিনজন সঙ্গে করে তাঁবু এনেছিলেন ও তার সঙ্গে ঘুমোবার জন্য স্লিপিং ব্যাগ। অন্য সবাই হোটেলেই ছিলেন। কিন্তু সবাই একত্রে হোটেলের রেস্তোরাঁতেই খেতেন। নিরামিষ খাবার।

চারদিনব্যাপী রিট্রিটের প্রতিদিন ধ্যান, ভাষণ, প্রবন্ধ পাঠ, ইত্যাদি ভোরবেলা থেকে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলত। দিনে দুবার করে সম্মিলিত ধ্যানের ব্যবস্থা ছিল—ভোরে ও সন্ধ্যায়। আমাকে প্রতিদিন রাত্রিতে একটি করে ভাষণ দিতে হতো। সোসাইটির সভ্যদের অনেকেই প্রবন্ধ পাঠ করতেন।

রিট্রিটের শেষদিন প্রাতরাশের পর দেড়ঘণ্টা ধরে আমাকে ধর্মবিষয়ে নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই প্রশ্নোত্তরের অধ্যায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিট্রিটও শেষ হলো।

রিট্রিটের কদিন কিন্তু আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল না। প্রচন্ড হাওয়া ও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃষ্টি। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট রসিকতা করে বললেন, "স্বামীজী, বাইরের আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে সবাই এবার খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার বক্তৃতা শুনেছে।"

আবহাওয়া খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একদিন আমাকে মাইল পনের দূরে একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। জলপ্রপাতটির নাম গুলফস অথবা 'সোনালী জলপ্রপাত'। আইসল্যান্ডের এটিই নাকি সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাত।

ফ্লুদির থেকে অদূরে পৃথিবী-বিখ্যাত 'গাইসার' রয়েছে। কিছুক্ষণ পরপরই গরম জলের ফোয়ারা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। অনেক ফুট পর্যন্ত

উঁচুতে জল ওঠে। গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। গাইসার শব্দটি আইসল্যান্ডিক। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা এ শব্দটির জন্য আইসল্যান্ডের ভাষার কাছে ঋণী। স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ কেউ বললেন যে, আইসল্যান্ডের ভাষাতে কিছু সংস্কৃত শব্দও রয়েছে, যেমন সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতুটি আইসল্যান্ডিকেও রয়েছে; একই অর্থে তার প্রয়োগ হয়। মূলতঃ স্কান্ডিনেভিয়ান গোষ্ঠীর ভাষা হলেও গত হাজার বছর ধরে আইসল্যান্ডের ভাষার রূপান্তর বিশেষ কিছুই হয়নি। দুর্গমতার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি থেকে বহু বছর বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

আইসল্যান্ডের বিখ্যাত ঘোড়া যাকে 'আইসল্যান্ডিক পোনি' বলা হয়—একই কারণে তারও হাজার বছরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আইসল্যান্ডে যাঁরা প্রথম এসে বসতি করেছিলেন তাঁরা ও তাঁদের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে এই বিশেষ প্রজাতির ঘোড়া বহু শত বছর ধরে গতায়াতের মুখ্য বাহন হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন। আজও মেষ ও গবাদি পশুর ফার্মগুলিতে ঘোড়াই ব্যবহার করতে হয়। আমেরিকার ফার্মগুলির cowboy-দের মতো এদেশেও তাদের অনুকল্প 'horseman'-রা রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশুদ্ধ প্রজাতির ঘোড়া—যা একমাত্র এদেশেই পাওয়া যায়—তার বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। আইসল্যান্ডের গ্রাম্য পথে এই ঘোড়া আমি যথেষ্ট দেখেছি।

এদেশের লোকেরা এদেশটিকে 'আইসল্যান্ড' বলেন না 'ঈশল্যান্ড' বলেন। এদেশের জনৈক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ, যিনি সংস্কৃত জানেন, তিনি বলেন, "আমাদের এই দেশ "ঈশ্বরের দেশ' বা 'দেবভূমি', কাজেই আমি এদেশকে আখ্যা দিয়েছি 'ঈশল্যান্ড'!" এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, আইসল্যান্ডিক ভাষায় 'ঈশ্' শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'তুষার'।

ফনুদিরের রিট্রিট শেষ হওয়ার পর আমি ফিরে এলাম রেকিয়াভিকে। সেদিন ছিল ৯ জুলাই, রবিবার। অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সে-রাত্রিতে আবার আমাকে ভাষণ দিতে হলো। বিষয় 'বিশ্বজনীন ধর্ম'। সোসাইটির হলে বহু পরিচিত মুখ নজরে পড়ল। এঁদের সবাই রিট্রিটে যোগ দিয়েছিলেন। ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা আমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে এলেন।

দিন কয়েক আগে যখন আমি এদেশে এসে পেঁছাই এদেশের সবাই তখন ছিলেন আমার অপরিচিত। কিন্তু এই কদিনে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে, হৃদ্যতা হয়েছে। 'দূর' হয়েছে 'নিকট', 'পর' হয়েছে 'ভাই'!

আমাকে বিদায় জানাতে গিয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বললেন, "স্বামীজী, আমি জানি আপনাকে আবার আমাদের দেশে আসতে হবে।"

ওঁর এই কথাতে আমার অতীতের একটি ঘটনা মনে পড়ল। দেশ থেকে প্রথমবার আমেরিকা আসার পথে আমি আমাদের রেঙ্গুন আশ্রমে কয়েকদিন থেকেছিলাম। তার কয়েক বছর আগে ব্রহ্ম সরকারের নির্দেশে আমাদের রেঙ্গুনের আশ্রম থেকে সমস্ত সাধুদের ভারতে চলে আসতে হয়। অনেকদিন পর একজন সাধুকে পেয়ে স্থানীয় ভক্তদের তাই আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসার আগের দিন ভক্তেরা আমাকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত 'সোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যাগোডাটিতে খুব বড় একটি ঘণ্টা রয়েছে। আমার সঙ্গীরা বললেন, "মহারাজ, এ ঘণ্টাটি একবার বাজান! এ ঘণ্টা বাজালে আপনাকে আবার রেঙ্গুনে আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবেই!"

ওঁদের অনুরোধে ঘণ্টাটি বেশ জোরেই বাজালাম। ঘণ্টার পবিত্র গম্ভীর ধ্বনি ক্রমে ক্রমে রেঙ্গুনের আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি প্রকৃতিতে ভাবপ্রবণ নই; কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেদনা-সিক্ত এক নতুন ধরনের ব্যাকুলতা আমার প্রাণে অনুভব করলাম। ইচ্ছে হলো আবার সেখানে ফিরে আসার!

তারপর সুদীর্ঘ পনের বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়া আর আমার হয়নি। তবু সোয়ে ড্যাগন প্যাগোডার স্মৃতি আমার মনে এখনও অম্লান রয়েছে। ধূপকাঠি পুড়ে গেলেও তার সৌরভ যেমন কিছুকাল থেকে যায় ঠিক তেমনি!

১০ জুলাই ১৯৮৯ আইসল্যান্ডের কেফ্লাভিক বিমানবন্দর থেকে যখন সিয়াটলের পথে লন্ডন রওনা হলাম তখন অনুরূপ আকুলতা হৃদয়ে নিয়ে প্লেনে উঠলাম। [সমাপ্ত]

পার্বতীদেবীর মন্দিরে

পর্বতবাসী

অদূরে চিরতুষারাবগুণ্ঠিতা হিমাদ্রিশৃঙ্গ নন্দাদেবী, অস্তগমনোন্মুখ দিনকরের কোমল রশ্মিচুম্বনে আরক্তগ্রীবা। পার্বতীদেবীর মন্দিরের সান্ধ্যারাত্রিক, শঙ্খধ্বনি হিমালয়ের শিখর হইতে শিখরান্তর পূত করিয়া দেবীপট্ট গ্রামে প্রতিধ্বনিত হইল। পাহাড়ি বালকগণ "জয় পার্বতী মায়িকী জয়" শব্দে করতালিসহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া মার শ্রীচরণে বালক-সহজ অতি পবিত্র ভক্তিধারা ঢালিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মচারী শঙ্করনাথ ভিক্ষাদ্বারা যথাসম্ভব অর্থ-সংগ্রহ করিয়া এ মন্দির নির্মিত করেন। সে আজ দশ বৎসর। এতদিন তিনি মন্দির সমীপস্থ পর্ণ-কুটির আশ্রয় করিয়া অতিযত্ন সহকারে স্বপ্রতি-ষ্ঠিত পার্বতীদেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। আশা,—একদিন জগজ্জননীকে সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় শ্রীপদরাজীবযুগলে দেহ মন প্রাণ স্বীয় যথাসর্বস্ব অঞ্জলি দানে কৃতকৃতার্থ হন।

'প্রতিমা প্রস্তরময়ী,' এ চিন্তা মুহূর্তের জন্যও মনে উঠিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া 'মা চিন্ময়ী' বলিয়া মন নিরস্ত করিতেন। প্রত্যূষ হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আরতি, পূজা, ভোগ ইত্যাদি বহুবিধ সেবাকার্যতৎপর ব্রহ্মচারীর হিমালয়ে একান্ত বাস আরোপিতচৈতন্যবুদ্ধি প্রতিমার সহবাসে অনেকান্ত হইত।

শঙ্করনাথের কি যেন একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আরতির পর মাকে প্রণাম করিতে আজ তাঁহার বিস্মৃতি কেন? ভুবন-মোহিনীর বিমোহন রূপদর্শনে তিনি বিমুগ্ধ? না—তাঁহার ললাটে ঘর্মবিন্দু; এ কি কোন আন্তরিক বিষাদতাপের বহির্বিকাশ?

মন খেয়াল সত্য মানবে আর কত দিন? দশ বৎসরের ভক্তি, ব্যাকুলতা এখনও অফল; কখনও কি তাঁহার সফলতা হইবে? দশ বৎসর প্রস্তরে চেতনত্ব আরোপণ সত্ত্বেও প্রস্তরের জড়ত্ব জড়ত্বই রহিল; কখনও কি এ জড়ে চৈতন্য বিকাশ পাইবে? মনের এ দুর্নিবার সন্দেহে শঙ্করনাথ মর্মব্যথিত। প্রবল সন্দেহস্রোতে তাঁহার এতদিনের বিশ্বাস, ভক্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

রাত্রে দেবীর সেবা বন্ধ থাকিল। শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট রুদ্ধ করিয়া কুটিরে শয়ন করিলেন। মনকে কত বুঝাইতে লাগিলেন। কত মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা প্রতিমায় চিন্ময়ী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি কেন দেখিলেন না? তাঁহার সেবায় শ্রদ্ধার ত্রুটি আছে? তাঁহার ক্রন্দনে কি সরলতার অভাব? না, যাহারা প্রতিমায় চৈতন্য দেখিয়াছে, তাহারা বিকৃত-মস্তিষ্ক? শঙ্করনাথের নিদ্রা নাই।

প্রভাত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। চঞ্চল মনে দেবীপূজা অসত্যের পূজা; শঙ্করনাথ মন স্থির না হইলে পূজা করিবেন না।

সায়ংকাল আগতপ্রায়। "দশ বৎসর জীবন আকাশকুসুম লাভ চেষ্টায় কাটিয়া গেল! যদি গিয়া থাকে, আরও দশ বৎসর যাক; শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না।" শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট খুলিতে উদ্যত হইলেন। "না, মাকে পরীক্ষা করিব। সারাদিন আমি উপবাসী, সংশয়তাড়নে অস্থির। দেখি, মার প্রাণে সন্তানের দুঃখ প্রতি-ঘাত করে কিনা।"

দেবীপট্ট-পল্লীবাসী বালকবৃন্দ মন্দিরচূড়োপরি ন্যস্তস্থিরদৃষ্টি, আরতিশঙ্খধ্বনি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। সে ধ্বনি নাই ; বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি, করতালি, নৃত্য প্রণাম সবই রহিল।

এ রাত্রেও শঙ্করনাথ অনিদ্রিত। প্রাণের আরাধ্য সত্যে অবিশ্বাসরূপ আশীবিষ যাঁহাকে কভু দংশন করিয়াছে, তিনিই শঙ্করনাথের যাতনা বুঝিতে সক্ষম।

পররাত্রি পূর্ণিমা তিথি। নিশানাথের কিরণহাস্যে বসুমতী হাস্যময়ী। হৃদয়ের অমাবস্যা কি সে কিরণ দূর করিতে পারে! শঙ্করনাথ তীক্ষ্ণ-ছুরিকা হস্তে পাষাণময়ী দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। "মা, সত্য যদি তুমি, দেখা দাও ; নহিলে অভাগা হৃদয়রুধিরে তোমায় শেষ পাদ্য প্রদান করিবে।"

সহসা স্নিগ্ধকর জ্যোতিতে মন্দির ভাসিয়া উঠিল। বাহ্যজ্ঞানহারা শঙ্করনাথ তাহাতে নিমগ্ন। দূরে কর্কশস্বরে কে যেন বলিতেছে, "বালক, যিনি অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের আধার, যাঁহার মহিমাসাগরে আদ্যন্তরহিত বিশ্ব বারিবিন্দুসম, যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য কিছুই লভ্য থাকে না, মাত্র দশ বৎসরের চেষ্টা সে পরমপদ লাভে বিফল হইয়াছে বলিয়া তোমার ধৈর্যচ্যুতি! কোটি কোটি যুগ যাঁহার নিমেষকাল মাত্র, তল্লাভচেষ্টা কোটি বৎসর বিফল হইলেও ধৈর্যচ্যুতির ন্যায্যতা কোথায়? আত্মহত্যা—বাতুল, বিশ্বপ্রলয় যাঁহার ক্রীড়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মৃত্যুতে তিনি কি বিচলিত? সেবা—যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, তাঁহার কিসের অভাব? সেবক মহামাতৃসেবায় নিজেই ধন্য, মায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সেবা করিয়াছ, মায়ের প্রয়োজনবৃদ্ধিতে। অনন্ত মাকে সান্ত করিয়াছ, দেবীজ্ঞানে পিশাচী পূজা কর নাই? পিশাচীপূজকের দৃষ্টি দেবীদর্শনে অসমর্থ। যাও, এই দণ্ডে—বিশ্ববাসী মায়ের সন্তান—তাহাদের সেবা কর ; শরীর মন প্রাণ এক করিয়া, সর্বাধার মায়ের অঙ্কে তাহারা, এই দৃঢ় বুদ্ধিযোগে সেবা কর ; তাহাতে দৃষ্টি বিমল হইবে, তখন তুমি মায়ের দর্শনে অধিকারী।"

ক্রমে শঙ্করনাথের বাহ্যসংজ্ঞা আসিল। দেখিলেন, তিনি ভূপতিত ; মস্তক পার্বতীদেবীর চরণোপরি। দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কম্পিতকলেবরে মন্দির ত্যাগ করিলেন।

*

চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এতকাল তিনি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দরিদ্র ধনী মূর্খ জ্ঞানী নির্বিশেষে জগজ্জনের কায়মনোবাক্যে সেবা করিতেন। যেখানে যাইতেন, সংসারদুঃখতাপিত নরনারী পরমাত্মীয়-স্বরূপ তাঁহার সঙ্গে পরমা শান্তি লাভ করিত। জরাগ্রস্ত এখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর। শেষ দিন সন্নিকট বুঝিয়া আদরের পার্বতীদেবী দর্শনে তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন।

যে শিখরে পার্বতীদেবীর মন্দির, তাহার নিম্নে নাতিপ্রশস্ত তটিনী প্রবাহিতা। শঙ্করনাথ ফিরিয়া আসিয়াছেন ; নদীতে স্নান করিলেন। ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিলেন। দেখিলেন, মন্দির ভগ্নাবশিষ্ট, চতুর্দিকে জঙ্গল, বন্য পশুর আবাস। কৃচ্ছ্রাসহকারে লতাগুল্ম কণ্টক বনের মধ্য দিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিলেন—প্রতিমা বহুখণ্ডে বিভক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আর উঠিলেন না।

যোগদৃষ্টি থাকিলে দেখিতাম—শঙ্করনাথ চিরাভিলষিত শ্রীপদে সমাধিস্থ।*

* উদ্বোধন ৬ষ্ঠ বর্ষ (১৩১০), ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৯৭

নিবন্ধ

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সংসার

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

"স্বামীজীর সংসার" কথাটি শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন। কেউ কেউ হয়তো তীব্র আপত্তিও জানাবেন। সুতরাং প্রথমেই সংশয় নিরসন প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই ঐ স্থানে কোন সাধারণ সংসার গড়ে তোলেননি। ওটি বিশেষ অর্থে দিব্য সংসার—দিব্য তার পরিবেশ, দিব্য তার বাণী। শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) একবার জনৈক ভক্ত নাকি বলেছিলেন, 'মহারাজ! আপনারাই বেশ আছেন; আমাদের মতো সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো না।' তদুত্তরে মহারাজ নাকি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "সে কি গো! যতদিন এটা (নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) আছে, ততদিন সংসারও আছে।" সবাই জানেন, শরৎ মহারাজকে কতবড় সংসারের কতবড় দায়িত্ব কতদিন বহন করতে হয়েছিল।

স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) ছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ—১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। ঐ সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি এক আশ্চর্য সংসার গড়ে তুলেছিলেন। ঐ ক্ষণিকের সংসার আজও অমর হয়ে আছে। মিসেস মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) তাঁর 'Swami Vivekananda in the West—New Discoveries'-এর 'The World Teacher' নামক গ্রন্থখণ্ডে (Part I, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১০৪-১৮১) এর বিশদ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী যেসব বাণী দিয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ আছে 'Inspired Talks' বা তার বাঙলা অনুবাদ 'দেব-বাণী' গ্রন্থে। আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু ঐ সংসারের সদস্য কে কে ছিলেন, কবে এসেছিলেন, কতদিন ওখানে ছিলেন, কি ধরনের লোক ছিলেন; স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল; দ্বীপটির পরিবেশ তখন কেমন ছিল; তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচী কিরকম ছিল—এই সমস্ত বিষয়ে সিস্টার গার্গীর সংগৃহীত তথ্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করব। তাঁর বর্ণনার সরসতা ও সাবলীলতা বর্তমান লেখকের আয়ত্তের বাইরে। তবে ভরসা দুটো—এক, স্বামীজীর ব্যক্তিমাহাত্ম্য ও দিব্যপ্রভাব (যিনি একদা বলেছিলেন, "*I will continue to inspire men wherever I go*"); দুই, সিস্টার গার্গীর অনবদ্য তথ্য পরিবেশন।

সহস্রদ্বীপোদ্যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ও কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা-রচনাকারী সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যে একটি দ্বীপ। এই নদী মিশেছে অন্টারিও হ্রদে। তারই কাছাকাছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় দু-হাজার দ্বীপ। তাদের এক প্রান্তে আমেরিকা, অপর প্রান্তে কানাডা। শোনা যায়, জেমস কার্টিয়ার নামে এক ফরাসী ভ্রমণকারী 'সহস্রদ্বীপ' নামকরণটি করেছিলেন। দ্বীপগুলি আমেরিকার দিকে বিস্তৃত কেইটন থেকে অগডেনসবার্গ পর্যন্ত, আর কানাডার দিকে কিংসটন থেকে ব্রকভিল পর্যন্ত। মোট দ্বীপের সংখ্যা ১৮৭০, প্রায় ২৫০০ বর্গমাইল জুড়ে এদের মোট বিস্তার। দ্বীপাবলীর অন্যতম হলো ওয়েলেসলী দ্বীপ। এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এরই মধ্যে অবস্থিত সহস্রদ্বীপোদ্যান। স্বামীজী যখন এখানে এসেছিলেন (১৮৯৫ খ্রীঃ), তখন গ্রীষ্মাবাস হিসাবে দ্বীপের বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বছর। সহস্রদ্বীপোদ্যানের জমি বিক্রয়/লীজ শুরু হয় ১৮৭৫-এর ৯ জুন থেকে। গ্রীষ্মাবাস

হিসাবে সমস্ত দ্বীপগুলির মধ্যে এটি ছিল তখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হাজার হাজার যাত্রী গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য এখানে আসতে শুরু করেন। দ্বীপের আয়তন ৮০০একর—তার মধ্যে ১০০একর চিহ্নিত ছিল গৃহনির্মাণের প্লট হিসাবে। জনসংখ্যা গ্রীষ্মে বেড়ে দাঁড়াত দশ হাজারের মতো। ছয়শতাধিক বাড়ি, একটি বৃহদায়তন হোটেল এবং ডজনখানেক যাত্রীনিবাস তখনই গড়ে উঠেছিল। স্বামীজী পার্কটিকে মনোরম বলে বর্ণনা করেছিলেন—গ্রীষ্মে জনবহুলতাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 'সেন্ট লরেন্স' নামে একটি স্টীমারে দ্বীপে পৌঁছেছিলেন ১৮৯৫-এর ১৮ জুন মঙ্গলবার। তাঁকে স্টীমারঘাটে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রণকারিণী মিস মেরী এলিজাবেথ ডাচার স্বয়ং আরও দু-তিনজন ভক্ত (যাঁরা আগেই ওখানে এসেগিয়েছিলেন)।

মিস ডাচারের কুটিরে স্বামীজী উঠেছিলেন। কুটির বলতে এদেশে সচরাচর যা বুঝি তা কিন্তু নয়, বরং এদেশে যাকে বাংলো বলা হয় তারই সঙ্গে বেশি মিল। দোতলা বাংলোটির দূরত্ব থেকে মাত্র আধমাইলের মতো। স্বামীজীর আসার দশ বছর আগে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এটি প্রথম তৈরি হয়। অবশ্য তাঁর আগমন উপলক্ষে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল তিনটি স্বতন্ত্র কক্ষ—একটির উপরে আর একটি করে। প্রতিটি কক্ষের আয়তন ছিল ১২ ফুট/১৫ ফুট। কুটিরের বিশদ বর্ণনা ও ছবি মিসেস বার্কের বইতে আছে। দ্বীপটি জনবহুল হলেও মিস ডাচারের কুটিরটি ছিল নিরালা ; কারণ এটি বেশ খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত—পাহাড়ের (Sunrise Mountain) কোলে বিশাল একখণ্ড গ্রানাইট পাথরের উপর। (১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র কুটিরটি কিনে নিয়েছেন এবং বেদান্ত আশ্রমকেন্দ্রে পরিণত করেছেন। প্রতিবছর এখানে 'সামার রিট্রিট' হয়। একদিকে ক্লেইটন শহর, অপর দিকে নদীর দৃশ্য। বর্তমানে সমস্ত কটেজটি ঘিরে বিশাল তরুশ্রেণী—কাছেপিঠে কোন বসতি নেই। ধ্যানধারণার আদর্শ পরিবেশ। স্বামীজী যে-ঘরে থাকতেন তাতে বসানো হয়েছে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি। স্বামীজীর ব্যবহৃত কার্পেটটি এখনও সযত্নে রক্ষিত। কুটিরের বর্তমান নাম 'বিবেকানন্দ কটেজ')।

স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সম্মুখের বৈঠকখানার প্রবেশপথে বড় বড় হরফে লেখা ছিল —'Welcome Vivekananda'। স্বাগত তো বটেই, তবে ভক্তেরা তখনো জানতেন না, তাঁদের ভাগ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে আধ্যাত্মিকতার কী সমৃদ্ধ পরিবেশন (Spiritual Bonanza) অপেক্ষা করে আছে। সিস্টার গার্গী তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে পাঠকের কাছে তা তুলে ধরেছেন ; তারই সংক্ষেপিত চিত্র হলো নিম্নের বর্ণনা।

বারোজন ভক্ত ওখানে সমবেত হয়েছিলেন—অবশ্য সবাই এককালীন নয়। দ্বাদশ শিষ্যের নাম (একজন বাদে) হলো—

(১) মিস ডাচার (২) মিস সারা এলেন ওয়াল্ডো (৩) রুথ এলিস, (৪) ডঃ ওয়াইট, (৫) স্টেলা ক্যাম্পবেল, (৬) মাদাম মারী লুই (স্বামী অভয়ানন্দ), (৭) মিঃ ওয়াল্টার গুডইয়ার, (৮) মিসেস ফ্রান্সেস গুডইয়ার, (৯) মিঃ লিয় ল্যান্সবার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), (১০) মিসেস মেরী ফাঙ্কি, (১১) মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল (সিস্টার ক্রিস্টিন) এবং (১২) অজ্ঞাতনামা একজন ছাত্র (Unidentified Student) ।

স্বামীজীর দ্বীপে অবস্থান মাত্র সাত সপ্তাহের—তার মধ্যে কোনদিনই পুরো বারোজন হাজির ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি অবশ্য প্রতিদিন তাঁর শিক্ষাদান চালিয়ে গিয়েছিলেন, কেননা মিস ডাচার অনুকূল ও ঈপ্সিত পরিবেশ রচনা করেছিলেন।

এবার শিষ্য-শিষ্যাদের ধরন-ধারণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে সুন্দর বর্ণনা সিস্টার গার্গী দিয়েছেন, তার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই মিস ডাচার—তিনি ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টান,

নৈষ্ঠিক মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তিনি স্বয়ং স্বামীজীকে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য নিজের কুটিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর ব্যবহারের জন্য তাঁর আগমনের পূর্বে মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিজ-কুটিরের উপযুক্ত সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা, পারিবারিক ইতিহাস এবং যুগবিচার করলে তাঁকে একজন ছোটখাট বিদ্রোহী বলেই মনে হয়। বাইরে থেকে মানুষটি ছিলেন স্বল্পায়তন, ধীরস্থির এবং শান্তশিষ্ট। নিউ ইয়র্কের অস্‌ওয়েগো জেলায় তাঁর জন্ম হয় ১৮৩২ খ্রীঃ নাগাদ—সহস্রদ্বীপ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ১৮৯৫-এ তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৩। তিনি ছিলেন কৃষককন্যা; বাল্যকালে পড়াশুনা করেন পল্লীর এক এক-কামরা স্কুলে। প্রতি রবিবার গীর্জায় যাওয়া এবং মাঝে মাঝে পিতা-মাতার সঙ্গে মেথডিস্ট ক্যাম্পমিটিং-এ যোগদান করা তাঁর নিয়মিত কর্ম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই গ্রাম্য পরিবেশ অতিক্রম করে নিউ ইয়র্কের মতো বড় শহরের আর্ট স্কুলে পড়তে যাওয়া খুব সামান্য ব্যাপার ছিল না; কিন্তু মিস ডাচার ঐ অসামান্য কাজটিই করেছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্কের 'আর্ট স্টুডেন্টস লীগ' ও 'একাডেমী' অব ডিজাইন'-এ পড়তে গিয়েছিলেন। পিতার কৃষি ফার্মে ফিরে না এসে চিত্রশিল্পের শিক্ষয়িত্রী পদ নিয়ে চলে গেলেন রচেস্টারে। কখনো কখনো নিজের অঙ্কিত চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীও দেখাতে লাগলেন। এতে নিঃসন্দেহে তাঁর স্বাধীন চিত্ত ও সাহসিকতার পরিচয় মেলে। শিল্পকর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে নিজের ভরণপোষণ তো করেছেনই, উপরন্তু অর্থসঞ্চয় করে সহস্রদ্বীপোদ্যানের জমি ক্রয় করেছিলেন (তখন প্রতি প্লটের দাম ছিল ১০০ ডলার) এবং তার উপর কুটিরও নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর খ্রীস্টান প্রতিবেশীদের তোয়াক্কা না রেখে সেই আমলে একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী অতিথিকে আহবান করে এবং আশ্রয় দিয়ে যথেষ্ট তেজস্বিতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। শোনা যায়, ওখানের পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী এক পরিবারের জনৈকা ষোড়শী কন্যা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তার মা নাকি তাকে বলেন: "ওর কাছে যেয়ো না; ও তো হিদেন!" মিস ডাচার কিন্তু অনমনীয়—এক রবিবার স্বামীজীকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য তিনি বহু প্রতিবেশীকে আমন্ত্রণ করে বসলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি খুব সামান্য মহিলা ছিলেন না—মাথা উঁচু করে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকার মতো মনের বল তাঁর বিলক্ষণ ছিল। আবার 'মৃদূনি কুসুমাদপি'-ও ছিলেন; কারণ একটি সামান্য মাছি মারতেও তিনি নারাজ। তাঁর কুটিরে মাছি-ধরার একটি জাল ছিল। সারাদিনে যত মাছি তাতে ধরা পড়ত, সন্ধ্যা হলে সেগুলিকে বাড়ির ধারের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল।

স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসগুলিতে মিস ডাচার যোগ দিয়েছিলেন; সুতরাং আগে থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, নিজকুটিরে তাঁকে আমন্ত্রণ করে এক 'আধ্যাত্মিক ঘূর্ণিঝড়কে' (Spiritual tornado) তিনি বাড়িতে ডেকে আনছেন। তাঁর আশৈশব লালিত ধর্মীয় সংস্কার ও অনুভূতি সবই ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তিনি নিশ্চিত জানতেন, তৎসত্ত্বেও তিনি নিরস্ত হননি। সহস্রদ্বীপে তাঁর কুটিরে স্বামীজীর আলোচনাসমূহ বাস্তবিকই তাঁর মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজীর কোন কোন উক্তি তাঁর কাছে শুধু ঘোর নীতিবিরুদ্ধ (outrageous) বলেই মনে হয়নি, তীব্র ঈশ্বরনিন্দুকতার তুল্য (blasphemous) মনে হয়েছিল। ফল হয়েছিল এই, মাঝে মাঝে এক নাগাড়ে দু-তিনদিনের জন্য কুটির থেকে তাঁর অন্তর্ধান ঘটত (সম্ভবতঃ কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে চলে যেতেন)। অন্য যাঁরা তখন স্বামীজীর আলোচনা-সভায় উপস্থিত থাকতেন, তিনি তাঁদের ঐ সময়ে বলতেন, "দ্যাখো. এটা মিস ডাচারের কোন সাধারণ অসুস্থতা নয়; ওঁর মনের মধ্যে যে তুমুল ঝড় চলছে তার প্রতিক্রিয়া ওঁর শরীর সহ্য করতে

পারছে না।" এতৎসত্ত্বেও তিনি কিন্তু স্বামীজীকে অতি সমাদরে সাত সপ্তাহ তাঁর গৃহে রেখেছিলেন; তাঁর 'দেব-বাণী' (Inspired Talks) পরিবেশনে বিন্দুমাত্র বাধা দেননি। পাশ্চাত্যের প্রতি স্বামীজীর বাণীর সর্বোত্তম মহিমময় প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ডাচারের কুটিরে। তাই কুটিরের বর্তমান নামকরণ 'Vivekananda Cottage' বা 'বিবেকানন্দ কুটির' অতিশয় সার্থক।

ঐ কুটির ছাড়া যেমন সহস্রদ্বীপোদ্যানের সাত সপ্তাহের সংসার ভাবা যায় না, তেমনি মিস সারা এলেন ওয়াল্ডো অনুলিখিত Inspired Talks বা দেব-বাণী ছাড়া ঐ দিনগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। ঐ দ্বিতীয় শিষ্যাটির বয়স তখন পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি (স্বামীজীর মাত্র ৩২ বছর কয়েক মাস)। মিস ডাচারের মতো তিনিও কুমারী ছিলেন। ব্রুকলীনে ২৪৯ নং মনরো স্ট্রীটে তাঁর নিজস্ব একটি বাড়ি ছিল। মনে হয়, তাঁর অর্থোপার্জনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত পড়াশুনা করে। রালফ ওয়াল্ডো এমার্সনের রচনাবলীর একনিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন তিনি; দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল তাঁর সঙ্গে। এছাড়া, অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদীদের (transcendalists) রচনাবলীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের পুস্তকাবলীর মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারা ও বেদান্তদর্শনের পরিচয়ও তিনি আগে থেকেই পেয়েছিলেন। ব্রুকলীন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে স্বামীজীর ১৮৯৪-এর ৩০ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় ঐ অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এর পর থেকে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসগুলিতে তিনি নিয়মিতই আসতেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না; কিন্তু তার পরে আমরা দেখি তিনি নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর নিঃস্বার্থ সেবিকা এবং নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রারম্ভিক পর্বের অক্লান্ত কর্মী। দীর্ঘাঙ্গী, দক্ষ ও কথঞ্চিৎ প্রভুত্বপরায়ণ এই মহিলা সময়ে সময়ে কারো কারো কিঞ্চিৎ বিরক্তি উৎপাদন করলেও অধিকাংশ কাজ একাই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের আর এক শিষ্যার নাম রুথ এলিস। তিনি ছিলেন মিস ওয়াল্ডোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মেলে। রুথ নিউ ইয়র্কের একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কোমলপ্রকৃতির এবং অন্তর্মুখী চরিত্রের মানুষ ছিলেন, কথাবার্তা খুব কম বলতেন; কিন্তু তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অগাধ। মিস ওয়াল্ডো, মিস এলিস এবং ডঃ এল. এল. ওয়াইট (যিনি এলিসের কাছে প্রায় পিতৃতুল্য ছিলেন)—এই তিনজন একত্রে দর্শনের উপরে বক্তৃতাবলী প্রায় ত্রিশ বছর ধরে শুনে আসছিলেন। স্বামীজী যখন নিউ ইয়র্কে ক্লাস নিতে শুরু করলেন তখন এই তিনজন একত্রে তাও শুনতে লাগলেন, যে আলোর সন্ধান তাঁরা করে বেড়াচ্ছিলেন, অবশেষে স্বামীজীর ক্লাসগুলিতে তাই পেলেন। মিস ডাচারের কুটিরে প্রথমে এঁরাই সমবেত হয়েছিলেন। ডঃ ওয়াইটের বয়স তখন সত্তরের উপরে; কিন্তু তখনো তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা বালকের ন্যায়। সতীর্থগণ তাঁকে 'লিটল ওল্ড ডাক ওয়াইট' বলে সম্বোধন করতেন। স্বামীজীর শিক্ষায় তিনি এক বিস্ময়কর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতেন। ক্রিস্টিন লিখছেন, সহস্রদ্বীপে প্রতিদিন সকালের ক্লাসের শেষে খানিকটা বিরতি থাকত; তখন 'লিটল ওল্ড ডাক' খানিকটা সম্মুখ দিকে ঝুঁকে টাক মাথা নিচু করে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে কিঞ্চিৎ অনুনাসিক সুরে বলতেন: "তাহলে স্বামীজী, ফলকথা দাঁড়াচ্ছে, আমিই সেই পরম (Absolute)"। তাঁর মুখে এই কথাটি শুনবার জন্যই যেন সবাই অপেক্ষা করে থাকতেন। স্বামীজীও প্রতিদিনই তাঁর পিতৃসুলভ মৃদুহাস্যে (fatherly smile) সহযোগে এতে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন।

এছাড়া ছিলেন স্টেলা। কেবলমাত্র তিনিই ওই সমাবেশে ও পরিবেশে খানিকটা বেমানান ছিলেন। একদা তিনি ছিলেন অভিনেত্রী। ১৮৯৫-এ তাঁর যৌবন গত হয়েছিল। আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে অপগত যৌবন ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যাবে এরকম একটা আশার বশবর্তী হয়ে বোধ হয় তিনি এসেছিলেন। তাঁর মনোভাব স্বামীজী ধরতে পারবেন এরকমটা তিনি বা আর কেউ আশা করতে পারেননি ; কেননা তাঁর কথাবার্তা এবং আচরণ তখন অতিশয় উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। স্বামীজী কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে বলে বসলেন: "I like that baby, she is so artless." সবাই নীরবে কথাটি শুনলেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি ওকে বেবী বলছি এই আশা করে যে, এতে সত্যি সত্যি ও ছলাকলাবিবর্জিত শিশুসুলভ মানসিকতা পাবে।" সবার মনোভাবই যে তিনি ধরতে পারতেন এবং সবার জন্যই যে তাঁর অনুকম্পা ও আশীর্বাদ ছিল, এতে করে তা প্রমাণিত হয়। ক্রিস্টিন আরও লিখছেন, সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্টেলা নিচের একটা ঘরে থাকতেন। স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে মিস ডাচার তাঁর কুটিরে যে-অংশটি নতুন সংযোজন করেছিলেন তার একতলাতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ছিল। স্টেলা সেই ঘরটিতেই থাকতেন, না নিকটের পল্লীতে কোন একটি একতলা ঘরে থাকতেন, তা ক্রিস্টিনের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। সিস্টার গার্গী মনে করেন, দ্বিতীয় অনুমানটিই ঠিক ; কারণ ক্রিস্টিনের বিবরণে পাওয়া যায়, স্টেলা ক্লাসে কদাচিৎ আসতেন।

স্টেলার পুরো নাম ছিল স্টেলা ক্যাম্পবেল। সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে ফিরে এসে তিনি ডেট্রয়েটের কাছে অরচার্ড লেকের একটি দ্বীপে ছোট একটি কেবিন বানিয়ে তাতে একা যোগাভ্যাস করতেন। তাতে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। এর প্রায় বছর দুই বাদে স্বামীজীর এক পত্রে (১৮৯৭-এর জুলাই মাসে জোসেফিন ম্যাকলাউডকে ভারত থেকে লেখা) জানা যায় যে, তিনি স্টেলাকে ভোলেননি বা তাঁর অভিলাষকে হাল্কাভাবে দেখেননি। ঐ পত্রে তিনি লেখেন: "মিচিগানের অরচার্ড লেকে মিস ক্যাম্পবেল নাম্নী এক মহিলা থাকেন ; তিনি খুব কৃষ্ণভক্ত, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, উপবাসে ও প্রার্থনায় তাঁর দিন কাটে। তাঁর খুব ইচ্ছে একবার ভারতবর্ষ দেখার ; কিন্তু নিতান্তই দরিদ্র। তুমি এদেশে আসার সময় যদি তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আসো, আমি যেভাবেই হোক তাঁর খরচ চালিয়ে নেব।" মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে স্টেলার অবশ্য ভারতে আসা হয়নি। ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার বেশ কয়েকটি স্থানে স্টেলা সম্পর্কে আরও উল্লেখ আছে। স্বামীজী বেবীর (স্টেলার) কাছ থেকে ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বেশ কয়েকখানি পত্র তার কথাও আছে। এছাড়া আছে, স্টেলার পুনরায় অভিনেত্রী-জীবনে কিছুদিনের জন্য ফিরে যাওয়ার কথা এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ। ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার লেখা শুরু হয় ১৯২৭-এ এবং তাঁর নিজের মৃত্যু ১৯৩০-এ ; সুতরাং এর মাঝে কোন এক সময়ে স্টেলার প্রাণবিয়োগ হয়েছিল।

ঐ স্মৃতিকথায় সহস্রদ্বীপোদ্যানের অন্যান্য সহশিক্ষার্থীদের প্রায় সবাইরই উল্লেখ আছে, কেবল দুজনের নেই—মিঃ ওয়ালটার গুডইয়ার ও তাঁর পত্নী ফ্রান্সেস গুডইয়ার। এঁরা দুজন দু-সপ্তাহ ডাচারের কুটিরে থেকে স্বামীজীর ক্লাস করেছিলেন এর উল্লেখ আমরা অন্যত্র পাই। ঐ সময়ে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান দম্পতি। পরে ১৮৯৭-এ তাঁদের এক ছেলে হয়। নিউজার্সির আপার মন্টক্লেয়ারের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। খুব সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সূত্রপাত (১৮৯৪) থেকেই ওয়ালটার তার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে নিউ ইয়র্কে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করেছিলেন তিনি। কানাডার গুডইয়ার সেলাই-কল কোম্পানীর নিউ ইয়র্ক শাখার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। আর্থিক ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা স্বামীজীর খুব কাজে এসেছিল—পত্নী

ফ্রান্সেসও এতে খুব সাহায্য করেছিলেন। ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। তখন ওয়ালটার তার অন্যতম ট্রাস্টী নির্বাচিত হন।

জুনের শেষ সপ্তাহে বা জুলাই-এর গোড়াতে এলেন মাদাম মারী লুই। সঙ্গে তাঁর পোষা প্রিয় এক ছোট কচ্ছপ—আসার পরে সেটি ছাড়া পাওয়ামাত্রেই কাছের জঙ্গলে অন্তর্ধান করল ; অনেক খোঁজাখুঁজিতে তার সন্ধান আর মিলল না। এপ্রসঙ্গে স্বামীজী সেটি স্টার্জেসের কাছে পত্রে লিখলেনঃ "মারী লুই এই বিয়োগে প্রথমে বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছিল ; কিন্তু আমরা মুক্তির সপক্ষে এত জোরালো আলোচনা তখন করছিলাম যাতে তাঁর সেই ভাব কেটে গেল।" মারী লুই কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর পারিবারিক নামটি কখনই প্রকাশ করেননি। কিছুদিন বাদে তার প্রয়োজনও আর রইল না ; কারণ স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে তিনি স্বামী অভয়ানন্দ নামে পরিচিত হলেন। সিস্টার ক্রিস্টিন লিখছেনঃ "কোন কোন দিক থেকে তিনি সেই মুষ্টিমেয় শিষ্যদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট ছিলেন।" প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের এই দীর্ঘাকৃতি মহিলাটি চেহারায় এত পুরুষালি ছিলেন যে, সহসা পুরুষ বা নারী বলে তাঁকে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। ছোট কোঁকড়ানো চুল, মোটা হাড়, ভারি গলা এবং তদানীন্তন ভারতীয় পুরুষদের অনুরূপ পোষাক—এসব মিলিয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তিনি বলতেন, তাঁর পথ হলো উচ্চতম পথ—জ্ঞানের পথ। অতিপ্রগতিবাদী এই নারীর বিদ্যা এবং বাগ্মিতাও বেশ খানিকটা ছিল। ক্রিস্টিনের ধারণায় মারী লুই-এর আত্মম্ভরিতা ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ তাঁর শিষ্যত্ব ও স্বামীজীর আন্দোলনের উপযুক্ত হওয়ার পথে বিশেষ বাধা ছিল। এই অদ্ভুত ফরাসী মহিলা স্বামীজীর অন্য শিষ্য-শিষ্যাদের (পরবর্তী কালে এমনকি সিস্টার নিবেদিতাকে পর্যন্ত) উত্যক্ত করে তুলেছিলেন। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস! এই কারণে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ "এরকম অহমিকা আমি কল্পনাও করতে পারিনি!" এর থেকেও যা বেশি বিস্ময়কর ঠেকেছিল তাঁর কাছে, তা হলো মারী লুই-এর প্রতি স্বামীজীর ব্যবহার, যার জন্য তিনি আরও লিখেছেনঃ "ওঁর (মারী লুই-এর) প্রতি স্বামীজীর মধুর, বিনয়ী, মহান ক্ষমাশীল ব্যবহার আমার কাছে আরও অকল্পনীয়!"

সহস্রদ্বীপোদ্যানে ১৮৯৫-এর ৭ জুলাই রবিবার সূর্যোদয়কালে পূত হোমাগ্নি জেবলে স্বামীজী এই নারীকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে নামকরণ করেন স্বামী অভয়ানন্দ। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় ঐ সংবাদ বেরিয়েছিল ১৮৯৬-এর ১৯ জানুয়ারি। স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল এ-সংবাদ পাঠ করে বিস্মিত হয়ে পত্র দিলে স্বামীজী তার উত্তরে (মার্চ মাসে) জানান, সংবাদটি সঠিক এবং আরও জানান যে, মহিলাটি এককালে শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন। নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা পঁচিশ বছর আমেরিকান নাগরিক মারী লুই বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদী বলে (কোন কোন মহলে এমনকি নৈরাজ্যবাদী বলেও) সুপরিচিতা ছিলেন। নির্ভীকতা ও প্রগতিশীলতার জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর গর্ব ছিল, সমস্ত সংগ্রামে তিনি পুরোধা এবং সমকালের থেকে সবসময়েই অগ্রবর্তী। কবে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল, কবে থেকেই বা তিনি তাঁকে 'Mon Papa' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই যে তাঁর জীবনধারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদিও স্বভাবের পরিবর্তন সহজে হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সম্পর্কে রুথ এলিস মিসেস বুলকে ১৮৯৫-এর ২৯ জুলাই লিখেছিলেনঃ "উনি খুবই অধীর প্রকৃতির ; যখন ওঁকে আঘাত করার কথা কেউ কল্পনাও করেননি, তখনও উনি আহত বোধ করেন। আর ওঁর

অনেকগুণ ...সাধারণ লোককে প্রভাবিত করার খুব ক্ষমতা রাখেন ...দীক্ষার পরে অনেকটা কোমলও হয়েছেন এবং মনে হয় স্বামীজী এতেই মোটামুটি খুশি।"

আর একজনকেও সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি হলেন লিয়ঁ ল্যান্ডসবার্গ। তাঁর নাম দিয়েছিলেন স্বামী কৃপানন্দ। তিনি ওখানে এসেছিলেন ১১ জুলাই। দুটি সন্ন্যাস-দীক্ষার পরিণাম ও তাৎপর্য নিয়ে মেরী লুইস বার্ক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন; বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর তা বহির্ভূত। তবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, মাদাম মারী লুই ও ল্যান্ডসবার্গ উভয়েই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষার জন্য বিশেষ আবেদন জানিয়েছিলেন।

সর্বশেষ যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা হলেন মিসেস মেরী ফাঙ্কি ও মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল। তাঁদের নিয়ে মিস ডাচারের কুটিরে সমবেত শিষ্য-সংখ্যা দাঁড়ায় মোট এগারোজন, অথচ মিস ওয়াল্ডো তাঁর 'Inspired Talks'-এর ভূমিকায় (Introductory Narrative) পরিষ্কার লিখছেন, অদ্ভুত ঘটনাপরম্পরায় ঠিক 'দ্বাদশ শিষ্য'ই (তুলনীয়—Twelve Apostles of Jesus Christ) স্বামীজীর অনুগমন করেছিলেন ঐ দ্বীপে। কিন্তু এই দ্বাদশতম ব্যক্তিটি কে? তাঁর সঠিক নাম বা পরিচয় এখনও মেলেনি। তিনি কখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাই নিয়ে সিস্টার গার্গী কিছু অনুমান করেছেন মাত্র। খুব সম্ভবতঃ ঐ অজ্ঞাতপরিচয় শিষ্যটি (Unidentified Student) জুলাই-এর প্রথম দিকে এক সপ্তাহ, কি বড়জোর দিনদশেক ওখানে হাজির ছিলেন। দুর্যোগময় এক বর্ষার সন্ধ্যায় শেষ দুজন অর্থাৎ ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিন এসেছিলেন। যখন তাঁরা মিস ডাচারের কুটিরের সদর দরজায় ভীত সন্ত্রস্তভাবে করাঘাত করেছিলেন, তখন তাঁরা পথশ্রান্ত, বর্ষণসিক্ত এবং চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁদের ভাবনা, স্বামীজী তাঁদের মতো অপরিচিতা দুই তরুণীকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। সুদূর ডেট্রয়েট থেকে আগত এই দুই মহিলার আগমনবার্তা মিস ডাচার স্বামীজীকে দেওয়া মাত্রই তিনি সিঁড়ি বেয়ে একতলার বৈঠকখানায় নেমে এলেন। সারা পথ যেসব কথা বলবেন বলে মহড়া দিতে দিতে তাঁরা দুজন এসেছিলেন, স্বামীজীর উপস্থিতিতে সবই ভুলে গেলেন; উপস্থিত যে ভাষা তাঁদের মুখে যোগালো তা হলো এই: "We have come to you just as we would go to Jesus if he were still on the earth and ask him to teach us." - ভগবান যীশু এখন ধরাধামে থাকলে তাঁর কাছে আমরা যেমন যেতাম এবং আমাদের শিক্ষাদানের আবেদন করতাম তেমনিভাবেই আমরা আপনার কাছে এসেছি। মিসেস ফাঙ্কি লিখছেনঃ "তিনি আমাদের এমন মধুরভাবে গ্রহণ করলেন যে, আমাদের কাছে তা আশীর্বাদের মতোই মনে হলো এবং আমাদের ঐ কথার উত্তরে শুধু বললেন 'If only I possessed the power of the Christ to set you free now!'"—যদি অবশ্য যীশুর মতো তোমাদের এখনই মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকত! কয়েকটি প্রাথমিক কথাবার্তার পরেই স্বামীজী তাঁর সান্ধ্য আলোচনায় যোগদানের জন্য তাঁদের উপরে নিয়ে গেলেন। আলোচনার শেষে তাঁদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল—তাঁরা জানলেন, পরের দিন সকাল থেকেই তাঁদের আর কোন হোটেল বা বোর্ডিং হাউসে থাকতে হবে না; মিস ডাচারের কুটিরেই তল্পিতল্পা নিয়ে চলে আসতে হবে এবং থাকতে হবে। পরবর্তী কালে এঁদের সম্পর্কেই স্বামীজীকে বলতে শোনা গেছেঃ "যে শিষ্যরা আমাকে খুঁজে বার করতে শত শত মাইল ঘুরেছিল এবং রাত্রির অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে আমাকে খুঁজে পেয়েছিল!" [ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলীতে আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা

অনিলকুমার চক্রবর্তী

স্বামী তুরীয়ানন্দ বিভিন্ন সময়ে, নানা ভক্তের নানা প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে, সহজভাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পরা শান্তির পথ নির্দেশ করেছেন। আত্ম-সমর্পণের কথা, জ্ঞান, ভক্তি, যোগসাধনার কথা, শাস্ত্রাদির উল্লেখ করে, সহজভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর পত্রাবলীতে।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এক পত্রে তিনি লিখছেন: "খুব সাবধানে থাকিবে। সাবধানের বিনাশ নাই। একথা কখনো ভুলিবে না। সাবধানীকে প্রারব্ধ কাতর করিতে পারে না।"[১]

উদ্ধৃত পত্রাংশে মহারাজ সহজ আন্তরিকতায় জগতের বাস্তব জীবন-যাপনপদ্ধতি বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন। উদ্দেশ্য পরমার্থ লাভ হলেও উপায়কে উপেক্ষা করা চলে না।

পত্রে তুরীয়ানন্দজী মহারাজ আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন চলমান এই অনিত্য জীবনপ্রবাহকে সুপরিচালিত করে নেবার উপায়। তিনি লিখেছেন, "পড়াশুনা হইতে কখনো বিরত থাকিবে না এবং ধ্যান-ধারণা নিত্য অনলস হইয়া করিবেই করিবে। শুদ্ধ জীবন অতীব দুর্লভ—শুদ্ধতার দিকে বিশেষ নজর রাখিবে। কখনো আপনাকে নিরাপদ মনে করিবে না এবং সতত ভগবানের শরণাগত থাকিবে।"[২]

আমাদের মতো সংসারী মানুষের সর্বদাই নানা রকমের দুশ্চিন্তা লেগেই রয়েছে। বর্তমান অস্তিত্বের অতীত বর্তমানকে ঘিরে ভবিষ্যতের ভাবনা সর্বদাই আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষুব্ধ অবস্থায় রাখে। ভবিষ্যতের অনাগত অথচ কল্পিত শঙ্কা অহরহ আমাদের পীড়িত করছে। আমরা "দুবেলা মরার আগে"ই মরছি। স্বামী তুরীয়ানন্দ এরকম অবস্থায় কর্তব্য বিষয়ে জনৈক ভক্তকে লিখেছিলেন: "যে বিপদ উপস্থিত নাই, তাহাকে কল্পনা করিয়া ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ভবিষ্যতে মরণ হইবে নিশ্চয়—তাহা বলিয়া কেহ কি ভয়ে আত্মহত্যা করেন? পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই চিন্তায় চিন্তিত থাকিলে কার্যহানি মাত্র; কোন লাভ নাই। বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আমি ভগবানের শরণ লইয়াছি। আমার বিঘ্ন বিপদ সব দূর হইয়া যাইবে। আমার আবার বিপদ? সবল দুর্বল অধিকারী যেই হউক না, নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। …ভগবানের দিকে এক পা আগাইলে তিনি দশ পা আগাইয়া আসেন—একথাই তো আজীবন শুনিয়াছি ও জীবনে কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি।"[৩]

তাঁর পত্রাবলীতে তিনি বারবার বলছেন সাধনা ও শরণাগতির কথা। সর্বক্ষেত্রেই মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা আর পরমপদে শরণাগতি ভিন্ন কোন উপায় নেই। অহং-বুদ্ধিতে, কর্তৃত্বজ্ঞানে কর্ম সম্পাদনই বন্ধনের কারণ। আর এর বিপরীত প্রতীতি কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করতে সহায়ক হয়। কর্মী তখন অকর্তা-বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত চিত্তে কাজ করেন। তুরীয়ানন্দজী গীতোক্ত এই নিষ্কাম কর্মের কৌশল তাঁর সহজ উপলব্ধিতে ব্যক্ত করেছেন একটি পত্রে: "কাজকে কাজ মনে করিবে কেন? প্রভুর পূজা মনে করিবে। 'যৎ যৎ কর্ম করোমি তদ্ তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্'—(হে শম্ভো, আমি যে-কোনও কর্ম করি না কেন, সেই সমস্তই তোমার আরাধনা।) 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—কর্মে যে কৌশল তাহার নামই যোগ। এই কাজকে ভগবৎ-অর্পণ করিয়া পূজারূপে পরিণত করিতে পারিলেই যোগ হইল। ইহাই বাহাদুরি। তাঁহার অধীন হইয়া অহং-বুদ্ধি না করিয়া কাজ করিলেই সে কাজ পূজা।"[৪]

সাধু ও শাস্ত্রবাক্যের সর্বশেষ কথা শরণাগতি। একবার ঈশ্বরের শরণাগত হলেই সকল জীবন-সমস্যার

১ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, (১৩৮২), পৃঃ ১০
২ ঐ
৩ ঐ, পৃঃ ২৮
৪ ঐ, পৃঃ ১৪৬-১৪৭

সমাধান হয়ে যায়। তখন তাঁর ক্ষেত্রে জাগতিক কোন কর্তব্যও আর থাকে না। মহারাজ এ-বিষয়ে একটি পত্রে লিখেছেন: "সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তাহার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। 'দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য-কৃত্যম্॥'—ইহা ভাগবতোক্তি। ...ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তাঁতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করিও না। দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"[৫]

কিন্তু এই আত্মসমর্পণ এবং শরণাগতি আসে সাধনার দ্বারা। সাধনার অঙ্গ হিসাবে ভজন আর প্রার্থনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করেছেন তুরীয়ানন্দজী। তিনি জনৈক ভক্তকে উপদেশ দান করেছেন: "শরীর ভাল থাকুক আর না থাকুক, তাঁহাকে ডাকিতে যেন ভুল বা অবহেলা না হয়। কারণ 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো'—এ ঠাকুরের উপদেশ। আনন্দময়কে যেন স্মরণ করিতে ভুল না হয়। যিনি মনে করেন যে, শরীর ভাল হউক তাহার পর ভগবানকে ডাকিব। তাঁহার আর কোন কালে তাঁহাকে ডাকা হইবে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ॥

—অর্থাৎ যে মনে করে যে, এই গোলটা মিটিয়া যাক, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে স্মরণ-মনন করিব, তাহার দশা কিরূপ? না, যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে যে, তরঙ্গগুলো থামুক, তাহা হইলেই আমি স্নান করিয়া লইব। সমুদ্রে তরঙ্গ থামা হইতেই পারে না। সুতরাং তাহাতে স্নান কিরূপে হইবে? যিনি তরঙ্গের মধ্যে স্নান করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারই স্নান করা হইবে। সেইরূপ যিনি সুখ-অসুখ, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যেই ভগবানকে ভজন করিয়া লইতে পারিবেন তাঁহারই ভজন হইবে।"[৬]

অপর একটি পত্রেও মহারাজ ভজনের উপর জোর দিয়ে উপদেশ দান করেছেন: "শরীর সুস্থ থাকুক আর অসুস্থই থাকুক ভজন বন্ধ করিবে না। পরে দেখিতে পাইবে সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গিয়াছে। চেপে কিছুদিন নিরন্তর ভজন কর দেখি, শরীর টরীর সব ভাল হইয়া যাইবে। মন শুদ্ধ হইলেই শরীরও নীরোগ হইয়া যায়। ভজনই কেবল মন শুদ্ধ করিতে পারে। ভজন কর, ভজন কর। নিষ্কাম ভজনই ভজনের সার। তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি ভালবাসা করিতে হইবে। তাহা হইলেই অন্য সব জিনিস হইতে মন আপনি উঠিয়া যাইবে। শরীরের জন্য তখন আর তত চিন্তা থাকিবে না।"[৭]

তুরীয়ানন্দজী প্রার্থনার উপর খুব গুরুত্ব দান করেছেন। জনৈক ভক্তকে তিনি লিখেছেন: "সর্বদা প্রার্থনাশীল হওয়া প্রয়োজন। নিয়ত তাঁহাকে নিজের হৃদয়ের কথা জানাইলে তিনি উহা শুনিয়া থাকেন। ...তাঁহার নিকট প্রেম, ভক্তি, ভালবাসাই প্রার্থনা করিতে হয়। ইহারাই দুর্লভ জিনিস এবং ইহাদের পাইলে আর কিছুরই অভাববোধ হয় না। তখন হৃদয় মধুময় হয় এবং সকল অবস্থাতেই পূর্ণ শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকাই কাজ; পড়িয়া থাকিতে পারিলেই সব আপনি ঠিক হইয়া যায়। তিনি নিজেই সব ঠিক করিয়া দেন।"[৮]

অপর এক ভক্তকে মহারাজ লিখছেন: "একথা বিশ্বাস করিবেন, সর্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সে-প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আবার তাঁহার কৃপা না হইলে ঠিক ঠিক প্রার্থনা হওয়াও মুশকিল—একথাও খুব সত্য সন্দেহ নাই। তাঁহার শরণাগত হইলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয় এবং তিনিই তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করেন; গীতামুখে এবং ভক্তসঙ্গে একথা জানিতে পারা যায়। আপনারা প্রভুর শরণ লইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের কোন ভাবনাই নাই। কারণ, ইহা প্রভুর প্রতিজ্ঞা—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।"[৯]

৫ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ৩০৭
৬ ঐ, পৃঃ ৬৮
৭ ঐ, পৃঃ ৮৬
৮ ঐ, পৃঃ ২৫৩
৯ ঐ, পৃঃ ১১০

আত্মজ্ঞানলাভ হবে নিত্যানিত্য বস্তুবিচার-ভাবনা-সঞ্জাত তীব্র বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে। এই বৈরাগ্যলাভের সহায়ক সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন ও মনন। তুরীয়ানন্দজী ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে জনৈক ভক্তকে মানবজীবনের সার্থকতা বিষয়ে জানিয়েছেন[১০]—

"মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তব যাবন্নভিদ্যতে॥
যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ॥

—অর্থাৎ অনেক পুণ্যফলে দুঃখরূপ সমুদ্র পার হবার জন্য এই দেহরূপ নৌকা পেয়েছ—যতদিন না তোমার এই দেহ নষ্ট হচ্ছে ততদিন তার উপযুক্ত ব্যবহার কর।

যিনি উদ্ঘাটিত মুক্তিদ্বারস্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করে (পূর্ববর্ণিত) পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হন, পণ্ডিতেরা তাঁকে আরূঢ়চ্যুত (কোন উচ্চ পদবীতে আরূঢ় হয়ে তা থেকে পতিত) বলে জানেন।"

সংসার-বিমোহ থেকে আত্মত্রাণ এবং পরামুক্তি-লাভই সাধনার শেষ ফল। এই সাধনা ভক্তিযোগ সাধকের কাছে সগুণ ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, অদ্বৈত মতে সাধনপরায়ণ ব্যক্তির নিকট পরমাত্মাতে পরাস্থিতি। তখন সকল কর্মবন্ধন টুটে যায়। মহারাজ এ-বিষয়ে অতি সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে, এক পত্রে জানিয়েছেন জনৈক ভক্তকে ঃ

"তাঁহার পাদপদ্মে পূর্ণ মতি-গতি থাকিলে কোন ভয় ভাবনাই থাকে না, নচেৎ বিশেষ মুশকিল। ... একবার তাঁহাকে পাইলে তাহার পর সংসার-টংসার কিছুই করিতে পারে না। সংসারেও তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, 'তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম মর্ম কথা বোঝা গেছে'। তিনি যে সব হইয়াছেন তখন বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সুতরাং সব আপদ মিটিয়া যায়। দিন রাত খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে তাঁহাকে ডাক, তাঁহার চিন্তা কর। একবার প্রাণ ভরিয়া এইরূপ করিয়া লও দেখি। তাহার পর সব সোজা হইয়া যাইবে দেখিতে পাইবে। শরীর ভাল থাকুক মন্দ থাকুক, তাঁহাকে ডাকার বিরাম না হয়। বলিবে, 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেক'। এসব অভ্যাস করিতে হয়, তবে তো হয়।"[১১]

দ্বৈতভাবের সাধনাই হোক অথবা অদ্বৈতভাবের সাধনাই হোক, হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সিদ্ধির দ্বার উন্মোচিত করে দেয় এবং তখন সর্বভাবের সাধকই পরম উপলব্ধিলাভে ধন্য হয়ে যায়, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল মুহূর্তে লাভ হয়। তখনই সাধকের চিদ্‌জড়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে হৃদয় আলোকোদ্ভাসে পূর্ণ হয়ে যায়। সেই পরম উপলব্ধিটির কথা তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলেছেন এক ভক্তকে পত্রের মাধ্যমে। তিনি লিখছেন ঃ

"...বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে ক্রমে অন্তরতমে পেঁৗছিয়া সেখানেই আপনার যথার্থ স্থিতি বুঝিতে পারিলে পরাকার্য হইয়া যাইবে। তখন 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুঃ অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি' অবস্থা লাভ করিয়া জীব ধন্য হয়। আত্মারাম হইয়া 'ন ততো-বিজুগুপ্সতে'। যতক্ষণ দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আপনার সম্বন্ধ, ততক্ষণ ভাল মন্দ ইত্যাদি বোধ। পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে পারিলে ওসব আর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ উহাদিগকে আর আপনার বলিয়া অনুতপ্ত হইতে হয় না। 'আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়ং অস্মীতি পুরুষঃ কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরং মনুসংজ্বরেৎ।' আত্মা আমি এই জ্ঞান হইলে মন ও শরীর ক্লিষ্ট হইলেও

১০ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১০৮
১১ ঐ, পৃঃ ৮৫

জীব স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে। ...অনন্ত ধৈর্যসহকারে দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস বৈরাগ্যই একমাত্র সহায়। মন থাকিলে প্রভুর কৃপায় সব হইয়া যায়। ... একটি মাত্র দেশলাই একশ বছরের অন্ধকার ক্ষণমাত্রে নাশ করে। এক বিন্দু ভগবৎকৃপা জন্মজন্মান্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়—ঠাকুরের এই উক্তি কখনো ভুলিবে না। ব্যাকুলতার খুব দরকার, কারণ ইহাতেই সত্বর কার্যসিদ্ধি হয়।"[১২]

সাধনার ফলেই সিদ্ধি। অধিকারীভেদে সাধনাও নানা রকম হয়ে থাকে। যথার্থ সদ্গুরু শিষ্যকে, মুমুক্ষুকে, যথার্থ সাধনপথে পরিচালিত করতে পারেন। স্বসংবেদ্যভাবেই সাধনার অগ্রগতি উপলব্ধি হতে থাকে সাধনপথযাত্রীর। ভাগবতাদি গ্রন্থে সাধকের বিভিন্ন ভাবের সাধনার কথা সার্বজনীন-ভাবেও নির্দেশিত হয়েছে। এ-বিষয়ে তুরীয়ানন্দজী মহারাজের একটি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগবতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন ঃ

"ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই অধিক সহজসাধ্য ও আশুফলপ্রদ। দ্বৈতভাবেই উহার সাধনারম্ভ। পরে প্রভুর কৃপায় ইহা পরিপক্ব হইলে অদ্বৈতবোধ আপনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।"[১৩]

মহর্ষি রামানুজাদির মতে স্মরণ-মননই শ্রেষ্ঠ সাধন। কিন্তু এই স্মরণ-মনন, ভগবৎ-প্রীতি থেকে হয়; আবার ভগবৎ-প্রীতি আসে ভগবৎকৃপায়। তুরীয়ানন্দজী মহারাজও ভগবৎ-প্রীতির কথাই বলেন বিশেষভাবে—"প্রীতিঃ পরমসাধনম্"।[১৪] এই প্রীতি থেকেই আসে আত্মসমর্পণ বা অনন্যশরণ এবং তাথেকেই আসে পরা শান্তি, পরা সিদ্ধি। সেকথা অতি স্পষ্ট করে তিনি বলছেন ঃ "ভগবান কি শাক-মাছ যে, দাম দিয়া লাভ করিবে? তাঁহার সাধনের কি ইতি আছে যে, এইরূপ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কেবল তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাক, তাঁহার দিকে চাহিয়া—এই করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাঁহার দয়া আপনা আপনি হইয়া থাকে। নাক টিপিয়া বা অন্য কোন সাধনে কেউ তাঁহাকে পায় না। যে পাইয়াছে সে তাঁহার দয়াতেই পাইয়াছে। তিনি যদি দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দেন তবে অসীম কৃপা জানিবে। সাধন-ভজন আর কি? মন-মুখ এক করে তাঁকে ডেকে যাওয়া। ভাবের ঘরে চুরি হতে দিও না। ব্যাস। অন্য সাধন তিনি করাইয়া দিবেন—যদি দরকার হয়।"[১৫]

বিশ্বাস আর নির্ভরতা থেকেই আসে আত্ম-সমর্পণ। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী উভয় প্রকার অধ্যাত্মপথযাত্রীকেই এই বিশ্বাস নির্ভরতার সেতু বন্ধন করে আত্মসমর্পণের পাড়েই পৌঁছাতে হবে শেষ পর্যন্ত। তুরীয়ানন্দজী যথার্থ সন্ন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়েও একথারই উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি পত্রে লিখছেন ঃ "শুধু নামে সন্ন্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্ন্যাস বড় কঠিন সমস্যা। ঠাকুর বলিতেন, যাহারা গাছের ওপর হইতে হাত-পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে, তাহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী। বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে ওরূপ করা সম্ভব হয় না।"[১৬]

তুরীয়ানন্দ মহারাজের পত্র-পরিক্রমা করলে সাধু-সঙ্গের অপার আনন্দলাভ যেমন করা যায়, তেমনি আমাদের টলায়মান বিশ্বাস নতুন করে এক দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসহীন আমরা আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা পাই।

১২ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ৩১২-৩১৩
১৩ ঐ, পৃঃ ৭৬
১৪ ঐ, পৃঃ ২৭
১৫ ঐ, পৃঃ ২৬
১৬ ঐ, পৃঃ ১১৬

রন্তিদেব-কথা

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার

প্রাচীন ভারতে মহারাজ রন্তিদেব তাঁর মহাপ্রাণতার গুণে জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। অসাধারণ ছিল তাঁর মানবপ্রেম। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ। দাতা হিসাবে রন্তিদেবের ছিল বিপুল খ্যাতি। যথাযথ স্থান, কাল ও পাত্রে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে দান করাই সাত্ত্বিক দান বলে কথিত হয়; রন্তিদেব এই ধরনের দান করতেন বলেই সকলের কাছে দাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

একবার রন্তিদেব এক কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প করলেন। ক্রমান্বয়ে আটচল্লিশ দিন উপবাসী থেকে দান করবেন; এই হলো তাঁর ব্রত। শুভদিনে শুরু হলো ব্রত। দিনের পর দিন যায়, রন্তিদেব ভগবদারাধনায় মগ্ন থেকে দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে দিন কাটাতে লাগলেন। কয়েক সপ্তাহ অতীত হলে উপবাসের ফল-স্বরূপ তিনি নিতান্তই কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। সাত্ত্বিক লোকের মনে নাকি অদ্ভুত দৃঢ়তা থাকে। কিন্তু মনের জোর থাকলে কি হবে? শরীর তার ধর্ম অনুসারে দুর্বল হতে লাগল; অনাহারে কতদিন আর শরীর ভাল থাকতে পারে? মাসাধিক কাল অতীত হলে তিনি শারীরিক দুর্বলতায় শয্যাশায়ী হতে বাধ্য হলেন। কিন্তু উপবাস ও দানাদি কর্ম বন্ধ রইল না। অগণিত দীন-দরিদ্র মানুষ সাহায্যের প্রত্যাশায় তাঁর কাছে আসছেন এবং কাউকেই তিনি হতাশ করছেন না। ক্রমশঃ তিনি এমনই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, তাঁর হিতৈষী সকলেই তাঁর জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। রন্তিদেব তথাপি তাঁর সংকল্পে অচল, অটল। এত কষ্টেও তাঁর মুখে প্রশান্তির ছাপ স্পষ্ট।

তারপর একদিন এল বহু-প্রতীক্ষিত সেই শুভ-দিন—যেদিন তিনি তাঁর উপবাস-পর্বের আটচল্লিশ দিন পূর্ণ করেছেন। সংকল্পসাধনে সফল তিনি। প্রাতঃস্নানাদি করে ভগবদারাধনার পর সুদীর্ঘ-উপবাস ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হলেন তিনি। পরিজনেরা তাঁর জন্যে নিয়ে এলেন পরমান্ন, ক্ষীর প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু আহার্য ও পানীয়। আহারের ঠিক প্রাগ্‌মুহূর্তে তাঁর গৃহে এসে উপস্থিত হলেন এক ব্রাহ্মণ অতিথি। রন্তিদেব সাদরে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনাদি করালেন। ব্রাহ্মণও তাঁকে সানন্দে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। ব্রাহ্মণের বিদায় হওয়ার অব্যবহিত পরেই এক বুভুক্ষু মানুষ কতকগুলি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে এল। লোকটি শীর্ণকায়, চক্ষু কোটরগত। দারিদ্র্যের ছাপ তার সমগ্র চেহারায় সুস্পষ্ট। সে রন্তিদেবের আহার্যে লোলুপ দৃষ্টিপাত করে তা গ্রহণ করতে চাইল। রন্তিদেব তাঁর অবশিষ্ট আহার্য থেকে স্বয়ং তাকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। পরম তৃপ্তিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগল লোকটি। এই সময় রন্তিদেবকে মনে হলো যেন লোকটির ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়ে স্বয়ং তিনিও তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শারীরিক কষ্ট সব ভুলে পরম তৃপ্তিলাভ করছেন। তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠছে এক দিব্য আনন্দের ছাপ। অন্যের তৃপ্তিতেই তিনি যেন আপন অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করছেন।

আহার শেষে লোকটি বলল, "মহারাজ, আমার সঙ্গী এই ক্ষুধার্ত কুকুরগুলিকেও দয়া করে আপনি আহার করান।" একথা শোনামাত্র রন্তিদেব ক্ষুধার্ত কুকুরগুলিকেও তাঁর আহার্যদ্রব্যাদি ভাগ করে দিলেন। আর মাত্র এক পাত্র পানীয় অবশিষ্ট

আত্মীয়-পরিজনদের তিনি জানালেন: দীর্ঘ উপবাসের পরও নিজের জন্য সুরক্ষিত আহার্য তিনি যে ক্ষুধার্তকে তার জীবনরক্ষার জন্য দান করতে পেরেছেন, এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পরিজনবর্গের কি তাতে শান্তি

হয় ? তাঁরা জানালেন, উপবাসে তাঁর শরীর এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, যেকোন সময় তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হতে পারেন। রন্তিদেব অবশিষ্ট পানীয়টুকু হাতে নিয়ে বললেন, অন্যের সেবার জন্য যদি তাঁর জীবন শেষও হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি ? শরীরের প্রতি তাঁর এতটুকুও মমতা নেই। মৃত্যু অনিবার্যভাবে একদিন এসে তো এই শরীরকে গ্রাস করবেই ; সুতরাং তা যদি পরার্থে নিঃশেষে উৎসর্গিত হয় ; তাতে ক্ষতি কি ? শরীর তো একখণ্ড মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইসব কথা বলার সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো এক অস্পৃশ্য চণ্ডাল। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে টলায়মান সেই লোকটি শীর্ণ হাত বাড়িয়ে রন্তিদেবকে বলল : "মহারাজ, এই অস্পৃশ্যকে পানীয় দান করুন।" সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ রন্তিদেবও পরম আনন্দে বিগলিত হয়ে তাঁর সর্বশেষ আহার্যের পানপাত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন :

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্ধিযুক্তাম-
পুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন
ভবন্ত্যদুঃখাঃ।"

—আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত শ্রেষ্ঠগতি অথবা নির্বাণ-মুক্তি কামনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আমি অখিল দেহধারী প্রাণিগণের অন্তরে স্থিত হয়ে যেন তাদের দুঃখ প্রাপ্ত হতে পারি। জগতের সকল দেহধারীই যেন দুঃখরহিত হয়। সকলের দুঃখ যেন আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়ে আমি দিশাহারা হই ; আমার আর আহার্যের প্রয়োজন নাই।

পরিজনদের রন্তিদেব বললেন, "পরদুঃখ নিবৃত্তির দ্বারাই আমার সর্বদুঃখ নিবৃত্তি হবে। তার জন্য মৃত্যুকেও আমি গ্রাহ্য করি না। এইরূপ ক্ষুধার্ত, নিরন্ন দেবতার সেবায় আমার জীবনের শেষ ক্ষণটুকুও নিয়োজিত করতে আমি প্রস্তুত। দুঃখার্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি বারবার জীবন ধারণে প্রস্তুত।"

প্রকৃতপক্ষে রন্তিদেবের চরিত্রমাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে ব্রহ্মাদি দেবতা ব্রাহ্মণাদি-রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রন্তিদেবের হৃদয়বত্তা দেখে নিজ নিজ মূর্তি দর্শন করিয়েছিলেন।

মহারাজ রন্তিদেবের উপাখ্যান এক অত্যাশ্চর্য মানব-প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর জীবন সমর্পণ করেছিলেন দরিদ্র, আর্ত, পীড়িত, অবহেলিত আর উপেক্ষিত মানুষের জন্য। তার জীবনের সবটুকুই উৎসর্গিত হয়েছিল দুঃখে জর্জরিত বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের কল্যাণে। তাঁর বাণী ছিল, জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান। মানুষের সেবাই ভগবানের পূজা। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব ; আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর এরাই তোমার দেবতা হউক। এঁদের সেবাই পরম ধর্ম জানবে। সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ সাধন করা। তাঁর বিখ্যাত সেই বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবের মধ্যেই পরম প্রেমময় শিবের অধিষ্ঠান।

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আর সেই শিবরূপী জীবের সেবার জন্য তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সেই দরদী বাণী : "মানুষের কল্যাণের জন্য আমি লাখ নরকে যেতে প্রস্তুত।" স্বামীজীর মানবপ্রেমের মহান আদর্শ আবহমানকাল ধরে বিশ্ব-মানবের মনে প্রেরণা যোগাবে। যেমন যোগাচ্ছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ মহারাজ রন্তিদেবের জীবন ও কর্ম।*

* শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ ২১শ অধ্যায় অবলম্বনে।

প্রবন্ধ

কোম্পানী আমলের শহর কলকাতার কিছু লুপ্ত ও বিস্মৃত নাম

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

তিনশ বছরে কলকাতা থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। সেকালের কলকাতায় এক অঞ্চলের নাম ছিল 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার'। এই 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার' নাম কলকাতার বুকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাহেবরা কলকাতায় এসে লালদীঘির জল খেত। সাহেবরা লালদীঘিকে বলত 'ট্যাঙ্ক'। ট্যাঙ্ক থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার'। আঠার শতকের শেষে গ্রাঁ প্রী কলকাতায় এসে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের সৌন্দর্যের উচ্চ প্রশংসা করেন। গ্রাঁ প্রী লিখেছেন, ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে সুন্দর সুন্দর সাজানো বাড়ি, ট্যাঙ্কের চারপাশে নুড়ি বিছানো রাস্তা। বিকালবেলায় সাহেব-মেমরা এই অঞ্চলে বেড়াতে আসেন। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের নাম পরে হয়, 'ড্যালহাউসি স্কোয়ার'। বর্তমান নাম 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'।

কলকাতার প্রথম আদালত হলো মেয়রস কোর্ট। একজন মেয়র, নয়জন অল্ডারম্যান বিভিন্ন মামলার বিচার করতেন মেয়রস কোর্টে। এই মেয়রস কোর্টেই সুপ্রিম কোর্টের কাজকর্ম চলত। এখানেই মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি মেয়রস কোর্টে নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মেয়রস কোর্টের স্মৃতি বহুদিন ধরে বহন করে চলেছে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ আগস্ট খিদিরপুরে কুলিবাজারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। এক অস্থায়ী ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম তৈরির কাজে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত ছিল তারা যে অঞ্চলে বাস করত সেই অঞ্চলের নাম হয় কুলিবাজার।

কলকাতায় কসাইটোলা স্ট্রীটের নাম আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে আগে ছিল সারি সারি মাংসের দোকান। কসাইরা এখানে বসবাস করত, তাই অঞ্চলের নাম ছিল কসাইটোলা, রাস্তার নাম কসাইটোলা স্ট্রীট।

সেকালের কলকাতায় বর্তমান আদিগঙ্গার কাছে ছিল এক খাল। এই খালের নাম ছিল গোবিন্দপুর খাল। কাছেই গোবিন্দপুর গ্রাম। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম এলাকাই ছিল সেই গোবিন্দপুর গ্রাম। সরম্যান নামে এক সাহেব গোবিন্দপুর খালের ওপর এক সেতু তৈরি করেন। তিনি এই সেতুর কাছে করেন এক সুন্দর বাগান। বাগানের নাম হয় সরম্যানস গার্ডেন। গোবিন্দপুর খালের নাম হয় সরম্যানস নালা। পরে এই খাল চওড়া ও গভীর করার দায়িত্ব নেন কর্নেল টলি। তখন থেকে সরম্যানস নালার নাম হয় টলির নালা। কর্নেল টলির নামে বর্তমান টালিগঞ্জ অঞ্চলের নাম।

কলকাতায় ডানকান বস্তি, 'ডানকান বস্তির রাস্তা' আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডানকান বস্তি ভেঙে, ডানকান বস্তির রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হয়। সেই নতুন রাস্তাই বর্তমান ক্যামাক স্ট্রীট। কলকাতায় আহম্মদ জমাদারের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইলিয়ট সাহেব ছিলেন পুলিশ কমিশনার। তাঁর দাপটে কলকাতায় চোর-ডাকাতদের উপদ্রব কমে যায়। আহম্মদ জমাদারের রাস্তার নতুন নাম হয় ইলিয়ট রোড। কলকাতায় বাদামতলা আর নেই। বর্তমান পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলকে একসময় বলা হতো বাদামতলা।

টমাস লায়নস সাহেবকে কেউ মনে রাখেনি। টমাস লায়নসের স্মৃতি বহন করে চলেছে জমজমাট অঞ্চল লায়নস রেঞ্জ। তরুণ ইংরেজ কেরানিদের বলা হতো রাইটার। রাইটারদের থাকবার জন্যে বাড়ি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় টমাস লায়নসকে। তিনি যে বাড়ি তৈরি করে দেন সেই বাড়ির নাম হয় 'রাইটার্স বিল্ডিংস।' এখানে সরকারের বিভিন্ন অফিসও হয়।

মিঃ ওয়াটসন কলকাতায় খিদিরপুর অঞ্চলে প্রথম ডক প্রতিষ্ঠা করেন। খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ অঞ্চল ওয়াটসনের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

বাতায়ন

পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনঃ ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নতির শিখরে

যুদ্ধের পর ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর (পশ্চিম জার্মানীর) আশাতীত দ্রুত ও ব্যাপক উন্নয়নের বর্ণনা দিতে এখনও 'অর্থনৈতিক অলৌকিকত্ব' কথাটা ব্যবহার করা হয়। আজকের এই পুনরুজ্জীবন যে আদৌ সম্ভব হতে পারে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে কেউ তা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু অসম্ভব আজ সম্ভবপর হয়েছে।

তবে সত্য এই যে, কোনও অলৌকিক কারণে এই পুনরুজ্জীবন ঘটেনি, হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের বিবেচনাপ্রসূত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি, জনগণের অধ্যবসায় এবং 'সামাজিক বাজার অর্থনীতি'-র সাফল্যের ফলেই। প্রথম চ্যান্সেলর কনরাড আদেনাওয়ার, তাঁর অর্থনীতি মন্ত্রী লুডভিগ এরহার্ড, প্রথম প্রেসিডেন্ট থিওডোর হয়েস এবং ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহের নেতা হান্স ব্যোকার সেদিন কালের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। অনেক বছরের ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট নারী-পুরুষ সবাই সেদিন আস্তিন গুটিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে হাত লাগান দেশের পুনর্গঠনে। আদেনাওয়ার ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমুদয়ের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর এরহার্ড দেশের অর্থনীতিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার নিগড় থেকে মুক্ত করে 'সকলের জন্য সমৃদ্ধির' লক্ষ্যে করেন পরিচালিত। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ জুন পুরনো অর্থের যেদিন নতুন 'সবল' ডয়েৎশমার্ক (ডি. এম.)-এ বিনিময় সম্পন্ন হয়, তার ঠিক একদিন পরেই অধিকৃত জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিষদের ডিরেক্টর হিসাবে এরহার্ড অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেন। এরহার্ড তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচি ভালভাবেই তৈরি করেছিলেন। একে প্রথমে বলা হতো 'অবাধ' অর্থনীতি, পরে বলা হলো 'সামাজিক' বাজার অর্থনীতি। অবাধ এই কারণেই যে, এতে যেমন উৎপাদক ও ডিলারদের সেইসব জিনিস নিয়ে হাজির হওয়ার স্বাধীনতা আছে যা তারা ভাল বিকোবে বলে আশা করেন, তেমনি ক্রেতাদেরও স্বাধীনতা আছে প্রতিযোগী পণ্যগুলি থেকে সেইসব জিনিসকে বেছে নেওয়ার যা দাম ও অন্যান্য দিক থেকে তাঁদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। এই নীতিকে 'সামাজিক' বলা হয়েছে, কারণ, এতে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো দরদাম চাপিয়ে দেবে এমন বাজার-আধিপত্যকারী সংস্থার সৃষ্টির পথ রুদ্ধ।

এরহার্ডের মতে, শ্রেষ্ঠ সামাজিক নীতি হলো এমন একটা ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাপক বেকারি প্রতিহত করে। ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী তার ৪১ বছরের ইতিহাসে এরহার্ডের 'সকলের জন্য সমৃদ্ধি'-র লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি পেঁছে গিয়েছে। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফেডারেল জার্মানীর মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ প্রকৃত অঙ্কে ২১৩০ শো কোটি ডি. এম. (প্রায় ১৭ লক্ষ কোটি টাকা), ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে জনগণের মোট খরচযোগ্য আয়ের পরিমাণ ১৩২০ শো কোটি ডি. এম. (প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ কোটি টাকা), কর্মক্ষম জনসংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার ৩.৪ শতাংশ ছিল। বর্তমানে তিনটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী একটি।

অবাধ বাজার অর্থনীতিকে পুনঃসক্রিয় করে তোলার ফলে সবচেয়ে সাফল্য দেখা গিয়েছে কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে—১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে এ-পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। অলৌকিক কোনও কাণ্ডকারখানার ফলে এটা হয়নি, হয়েছে বিগত ছ-বছরে জার্মান অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনরায় যে গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে তার দরুনই। [আর এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই দেশের মানুষের গুণগত উৎকর্ষ, তাদের পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা, এবং দেশপ্রেম] বিলাসবহুল গাড়ি বা দ্রুত-গামী ট্রেন, মুদ্রণ-যন্ত্র বা বিমান—সব শিল্পেরই একেবারে উঁচু মানের প্রযুক্তি আজ ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর করায়ত্ত।*

* আজকের জার্মানী, ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কলকাতাস্থ কনসুলেস্ট জেনারেল দপ্তর, (কলকাতা ২৭ থেকে প্রকাশিত বাঙলা মুখপত্র) সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ ৫

প্রবন্ধ

ভক্তি

হরিপদ আচার্য

ভগবানলাভের নানা পথ শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। তার মধ্যে ভক্তিপথ সহজ ও সর্বোত্তম। 'যত মত তত পথ'—বলেছেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ভগবানকে লাভ করার জন্য যেমন বিভিন্ন ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, তেমনই হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব। মানুষের মননশীলতার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে সনাতন হিন্দুধর্মে উদ্ভাবন হলো অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের। আবির্ভাব হলো শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি মতবাদের। ইষ্টলাভের পথ বা উপায় নির্দিষ্ট হলো জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে কলিতে নারদীয় ভক্তিই মুখ্য পথ। অদ্বৈতনিষ্ঠ প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় প্রথমে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের অনন্যনিরপেক্ষতা প্রতিপাদন করে পরিণতিতে তাদের অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করলেও একাদশ অধ্যায়ের শেষে ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে বলা হয়েছে কেবলমাত্র অনন্যাভক্তিদ্বারাই ভক্তগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হয়—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ।।"[১]

এমনকি গীতার অষ্টম, অষ্টাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়েও এর সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে শুধু ভক্তিকেই নয় ভক্তকেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন—"তে মে যুক্ততমা মতাঃ।"[২] বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে আচার্য শংকরও ভক্তিপথকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পথ বলেছেন—"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"[৩] অবশ্য এখানে অদ্বৈতমতে 'ভক্তি' শব্দের অর্থ অন্য।

'ভক্তি' শব্দটি ভজ্‌ ধাতুর উত্তর ক্তিন্‌ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন। ভজ্যতে ইতি ভক্তি। ভজ্‌ ধাতুর অর্থ সেবা—বলেছেন মহর্ষি পাণিনি—"ভজ সেবায়াম্‌।"[৪] অতএব সেবাই ভক্তিশব্দের প্রকৃতিগত অর্থ। এই সেবা কারো মতে ভক্তিপূর্বক, কারো মতে প্রেমপূর্বক, কারো মতে বা ভজনপূর্বক। নিরুক্তকার যাস্কের মতে সেবা ভক্তিরূপা কিন্তু ভক্তিমার্তণ্ডকার গোপেশ্বরের মতে ভক্তিশব্দের অর্থ প্রেম—"ভক্তিশব্দস্য প্রত্যয়ার্থঃ প্রেম।"[৫] গোপালতাপনী উপনিষদে ভক্তিশব্দের অর্থ ভজন—"ভক্তিরিহ ভজনম্‌।"[৬] এরূপ সেবা বা ভজন ইহলোকের বা পরলোকের সকল বিষয়ে ফলকামনাশূন্যভাবে ভগবানে চিত্তসমর্পণের দ্বারা যথার্থ প্রেমে পর্যবসিত হয়। অতএব ভক্তিশব্দের প্রকৃতিগত অর্থ সেবা হলেও এর তাৎপর্যার্থ হলো সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যযুক্ত পরমপ্রেমময় শ্রীভগবানের প্রতি নির্বিশেষ ও সর্বকামনা বাসনাদি উপাধিবর্জিত প্রেম। সেই প্রেম বৈষ্ণবাচার্যদের মতে "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা।"[৭] তাই শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে—ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"[৮] শাণ্ডিল্যসূত্রের অনুরক্তি শব্দটির 'অনু' উপসর্গটি 'পশ্চাৎ' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রীভগবানের মহিমাবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভের পর পরমানন্দদাত্রী এই ভক্তির প্রকাশ ভক্তহৃদয়কে উদ্বেলিত করে বলেই তাকে অনুরক্তি বলা হয়েছে। পাতঞ্জলসূত্রে একে বলা হয়েছে, "সুখানুশয়ী রাগ।"[৯] শব্দকল্পদ্রুম নামক কোষগ্রন্থে 'ভক্তি' শব্দের অর্থবোধের জন্য বলা হয়েছে—পূজ্যবিষয়ে পরম অনুরাগই ভক্তি—"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিরিত্যুপদেশঃ।" ভাগবতকার আরও ব্যাপক অর্থে ভক্তিকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে যেকোন উপায়েই হোক

১ গীতা, ১১।৫৪ ২ ঐ, ১২।২
৩ বিবেকচূড়ামণি, ৩২
৪ পাণিনীয় ধাতুসূত্র, ১১৮
৫ ভক্তিমার্তণ্ড, প্রমেয় প্রকরণ (চৌখাম্বা), পৃঃ ৭৬
৬ গোপালতাপনী উপনিষদ্‌ (পুনী সং), পৃঃ ১৩
৭ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড
৮ শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র, ২
৯ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২।৭

শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই ভক্তি—"কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"[১০] মুক্তাফল গ্রন্থের বোপদেব প্রণীত কৈবল্যদীপিকাটীকায় শুনা যায় একই কথার অনুরণন। সেখানে বলা হয়েছে, কোন উপায় অবলম্বন করে ভগবানেতে মনকে স্থির করাই ভক্তি—"উপায়পূর্বকং ভগবতি মনঃ স্থিরীকরণং ভক্তিঃ।"[১১] নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা মনের একাগ্রতাবিধান হলেই শ্রীভগবানে পরম ভক্তির উদয় হয়। তখন সেই একনিষ্ঠ মন ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তাও করতে পারে না। আচার্য রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে ভক্তিকে বলেছেন ধ্রুবানুস্মৃতি—"এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে।"[১২] ধ্রুবানুস্মৃতি হলো নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান। জগতের সব কাজই তাঁকে ধরে সম্পন্ন করা। শ্রীচৈতন্যের সহজ কথায় "হাতে কর গৃহকাজ মুখে বল হরি।" শ্বাসে প্রশ্বাসে করতে হবে তাঁর নাম গুণগান। তবেই তাঁর সাথে একাকারকারিত হয়ে যাওয়া যায়। সাধক কবির ভাষায়—"শ্বাসে শ্বাসে সমীরণ কর।" আমাদের সকল চিন্তা ও কর্ম যেন তাঁরই প্রীতির জন্য, তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত হয়। রামপ্রসাদ বলছেন ঃ

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা
মাকে ॥"

শ্রীভাষ্যের টীকা যতীন্দ্রমত দীপিকায় 'ধ্রুবানুস্মৃতি'র ব্যাখ্যা করা হয়েছে তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির প্রবাহ—"তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপঃ।"[১৩] পঞ্চরাত্র পরমসংহিতায় স্নেহপূর্বক অবিরত ধ্যানকেই বলা হয়েছে ভক্তি—"স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।"[১৪] নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে মনের একাগ্রতার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে একীভূত করে ভগবান বিষ্ণুর সেবাকেই উত্তম ভক্তি বলা হয়। এই গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হয়েছে, বিষ্ণুর প্রতি অনন্যা মমতা অর্থাৎ বিষ্ণু ছাড়া আমার আর কেউ নাই এই ভাব, তার সঙ্গে চাই প্রেমসঙ্গতা অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতি কামনা—"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা। অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা, ভক্তিরিতি…॥"[১৫] গ্রন্থকারের মতে ভীষ্ম,প্রহ্লাদ,উদ্ধব, নারদ প্রভৃতিও এই মতই পোষণ করেন — "উচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।"[১৬] শ্রীরূপগোস্বামীর মতে সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে, জ্ঞান ও কর্মের সাথে সম্বন্ধশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্যই কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপের স্মরণ-মননাদিরূপ যে অনুশীলন তা-ই উত্তম ভক্তি—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"[১৭]

এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্নভাবে ভক্তিলক্ষণ নির্দেশ করলেও সবগুলির তাৎপর্যার্থই কিন্তু এক—ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগ। সে পরম অনুরাগই নারদ-ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমরূপে বর্ণিত হয়েছে—"সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।"[১৮] ভগবানের প্রতি সেই প্রেম অনির্বচনীয়, বাক্য ও মনের অতীত, অমৃতস্বরূপ, সত্ত্ব-রজঃ-তমাদি সকল প্রকার গুণের অতীত, কামনা-বাসনাদির পার, প্রতিক্ষণে ক্রমবর্ধমান, তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের অনুভবগোচর। তাই তো সূত্রকার বলেছেন—"গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্ অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরম্ অনুভবস্বরূপম্।"[১৯]

ভক্তিসহায়ে ভক্ত পরমপ্রিয়তম ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে পরমানন্দে হয়ে যায় উন্মত্ত, মৌন এবং আত্মারাম—"যজজ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।"[২০] তাঁকে লাভ করে ভক্ত হয় সিদ্ধ, অমৃত

১০ ভাগবত, ৭।১।৩১
১১ হরিদাসবিদ্যাবাগীশের মুক্তাফলগ্রন্থের বোপদেব রচিত কৈবল্যদীপিকাটীকা, ১১শ অধ্যায়
১২ শ্রীভাষ্য, ১।১।২৭
১৩ যতীন্দ্রমতদীপিকা, ৭ম অবতার
১৪ পঞ্চরাত্র-পরমসংহিতা, ৪।৭১
১৫ নারদ-পঞ্চরাত্র, ১।৪।২
১৬ ঐ
১৭ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ববিভাগ), ১।১১
১৮ নারদ-ভক্তিসূত্র, ২
১৯ ঐ, ৫৪
২০ ঐ, ৬

ও পরমপরিতৃপ্ত—"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।"[২১] যাঁকে লাভ করলে আর কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোন কিছু পাওয়ার জন্য দুঃখ হয় না বা দ্বেষ হয় না, কোন কিছু পাওয়ার জন্য আনন্দ হয় না, উৎসাহও হয় না —"যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।"[২২]

অদ্বৈতবেদান্তের প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর ভক্তির লক্ষণে বলেছেন, নিজের স্বরূপকে অনুসন্ধান বা নিজ আত্মার তত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি। এখানে, বলা বাহুল্য, ভক্তি বলতে আচার্য সরলভাষায় বুঝিয়েছেন যে, জীবাত্মাতে পরমাত্মার অনুসন্ধানই ভক্তি। বিবেকচূড়ামণির সাধন চতুষ্টয় পর্যায়ে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক; ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ থেকেই বৈরাগ্য; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্সম্পত্তিসম্পন্ন আর মুমুক্ষুত্ব বিষয়ে আলোচনার অবসরে মুক্তিলাভের অনেক উপায়ের মধ্যে ভক্তিকে সবচেয়ে বড় বলেছেন এবং সে-প্রসঙ্গেই ভক্তির লক্ষণে বলেছেন:

"স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ॥"[২৩]

জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশই আত্মসাক্ষাৎকার। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ব্রহ্মাস্বাদন সেই তত্ত্বের অনুসন্ধানের যে সাধন তারই নাম ভক্তি।

ভক্তিবাদের সূচনা বা ভক্তিশব্দটির প্রয়োগ কোন্ সুদূর অতীতে শুরু হয়েছিল এবিষয়ে নানা মত দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় বৈদিকসংহিতায় ভক্তিশব্দটির প্রয়োগ না পাওয়া গেলেও ভক্তিবাদের আভাস সংহিতার যুগেই লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের ঋষি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন—"হে ইন্দ্র, যে তোমার অনুকূল-কর্মা স্তবকারী সে তোমাকে অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলে উক্থদ্বারা সর্বদা স্তব করেন—

"স্তোতা যত্তে অনুব্রত উক্থান্যৃতুথা দধে।
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সো অদ্ভুতঃ॥"[২৪]

এই ঋক্মন্ত্রটিতে ভক্তিবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদের যুগে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিবাদ যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কঠোপনিষদে "তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই তাঁকে জানতে পারেন। তাঁরই কাছে আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"[২৫] মন্ত্রটির তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই জানতে পারেন অংশটিতে আর ঈশোপনিষদের "আমরা তোমাকে বারবার নমস্কার করি—ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম'[২৬] মন্ত্রাংশটিতে ভক্তির সুর সুপরিস্ফুট বলে রামানুজাদি আচার্যগণ মনে করেন। তবে এদুটি মন্ত্রের ভাবার্থবিষয়ে মতভেদ থাকলেও শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটিতে ভক্তিবাদের কথা এবং ভক্তিশব্দের প্রয়োগ উভয়ই পাওয়া যায়:

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"[২৭]

—যাঁর পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তি আছে এবং পরমে-শ্বরের প্রতি যেমন গুরুর প্রতিও তেমন ভক্তি আছে, সে-মহাত্মার নিকট উপনিষদে কথিত সকলতত্ত্ব প্রকাশিত এবং অনুভবযোগ্য হয়।

উপনিষদের পর এল পুরাণের যুগ। পুরাণ-গুলির তো উপজীব্য বিষয়ই ভক্তিবাদ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিত্বকে অবলম্বন করেই সাধারণভাবে বলা যায় আঠারটি পুরাণ রচিত। মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রাহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, বামন, বরাহ, বিষ্ণু, বায়ু, অগ্নি, নারদ, পদ্ম, লিঙ্গ, গরুড়, কূর্ম এবং স্কন্দ—এই আঠারটি পুরাণ ছাড়াও রয়েছে আঠারটি উপপুরাণ—সনৎকুমার, নারসিংহ, স্কান্দ, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঔশনষ, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর,

২১ নারদ-ভক্তিসূত্র, ৪
২২ ঐ, ৫
২৩ বিবেকচূড়ামণি, ৩২

২৪ ঋগ্বেদ, ৮।১৩।১৯
২৫ কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩
২৬ ঈশ উপনিষদ, ১৮
২৭ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।২৩

পরাশর, মারীচ, ভার্গব। এই ছত্রিশটি পুরাণ ও উপপুরাণেই ভক্তিবাদের ছড়াছড়ি।

বর্তমান হিন্দুধর্মের অনেকটাই পুরাণভিত্তিক। তাই সমগ্র ভারতেই পুরাণগুলির কোন-না-কোন একটা, কোথাও বা একাধিক বিশেষভাবে হিন্দু-সমাজে সমাদৃত। সুতরাং ভক্তিবাদও সমগ্র ভারতেই স্বীকৃত। তবে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ভক্তিবাদের সূচনা দ্রাবিড়দেশে। ভক্তি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "দ্রাবিড়দেশে আমার জন্ম, বড় হয়েছি কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে কিছুকাল কাটিয়েছি এবং গুজরাটে এসে জীর্ণ বা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
স্থিতা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥"[২৮]

এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে অনেকেই মনে করেন, আর্যাবর্তের আর্যগণ ছিলেন মননধর্মী জ্ঞানবাদী আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণ প্রেমধর্মী ভক্তিবাদী। পরবর্তী কালে দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এ ভক্তিবাদ আর্যদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। ভাগবতেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ভাগবতকার বলেছেন, "মহারাজ, কলিযুগে মানুষ নারায়ণেতে ভক্তিপরায়ণ হবে। দ্রাবিড়দেশে প্রচুরভাবে আর অন্যান্যস্থানে কোথাও কোথাও—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥[২৯]

যদিও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সবগুলি মতবাদেই ভক্তির প্রাধান্য, তবুও বৈষ্ণবদের মধ্যেই যে ভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়—একথা অনস্বীকার্য। বৈষ্ণবদের চারটি প্রধান সম্প্রদায়েরপ্রবক্তা রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্য। এদের মধ্যে বল্লভাচার্য বাদে তিনজনই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। অতএব ঐতিহাসিক দিকদিয়ে ও দাক্ষিণাত্যে ভক্তিবাদের উৎপত্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

ভগবানলাভের চারটি উপায়ের মধ্যে দুইটি সাধনপথ বিশেষ পরিচিত—জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ। বৈষ্ণব-দার্শনিক জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে, "জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করে যিনি কায়মনোবাক্যে সবসময় ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করতে পারেন তিনি অবশ্যই ঈশ্বরকে লাভ করেন।"[৩০] চৈতন্য-চরিতামৃতে রায় রামানন্দের মুখেও একই কথা উচ্চারিত হয়েছে—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তিমাত্র সার॥"[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তিকেই প্রেমময় ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় বলেছেন। তিনি তাঁর সরস, সরল ও সাবলীল ভাষায় বলেছেন, "জ্ঞান পুরুষ-মানুষ, বাড়ির বারবাড়ি পর্যন্ত যায়। ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।"[৩২] ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে হলে জ্ঞানের সহায়তায় বৈঠকখানা পর্যন্ত পৌঁছানো যায় কিন্তু ভক্তির সহায়তায় গেলে অন্দরমহলে গিয়ে পরমপ্রিয় পরমেশ্বরের নিকটতম সান্নিধ্যলাভ করে মানবজীবন ধন্য করা যায়। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যত আপন করে নেওয়া যায় জ্ঞানের দ্বারা তা হয়ে উঠে না। জ্ঞানীর ঈশ্বর সর্বৈশ্বর্যময়, প্রবল প্রতাপান্বিত, তেজপূর্ণ আর ভক্তের ভগবান পরমপ্রিয়। আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে এসে জ্ঞানী বলতে পারেন ঐ আমার সর্বৈশ্বর্যময় পরমেশ্বর কিন্তু ভক্ত বলেন এই আমার পরমপ্রিয় ভগবান।

ভক্তি একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৃত্তি। ভক্তি-দ্বারা আধ্যাত্মিক সাফল্য হয় অতীব সহজলভ্য। বৈষ্ণবাচার্যদের মতে, "সূর্যকিরণের স্পর্শে যেমন সরোবরের কমল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ভক্তির সংস্পর্শলাভ করে চিত্তে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। কূপ থেকে জল তোলা ঘটের দড়ি ছিঁড়ে গেলে যেমন ঘট অন্ধকূপে পড়ে যায় তেমনই ভক্তিহীন মানুষের আত্মা মোহময় সংসার-সাগরে নিমজ্জিত

২৮ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৯৩।৫০-৫১
২৯ ভাগবত, ১১।৫।৩৮-৩৯
৩০ ভাগবত, ১০।১৪।৩
৩১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ
৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৯।৩

হয়।"৩৩ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, ভগবানের অনুগ্রহলাভ করলে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-রাশি মুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'কৃষ্ণ-ভক্তিরসামৃত' গ্রন্থেও পাওয়া যায় অনুরূপ একটি উক্তি "যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা মুহূর্তে তুলারাশি ধ্বংস করে, তেমনই ভগবানের প্রতি ভক্তি ও মানবের বহু জন্মের পাপ ভস্মীভূত করে।"৩৪

ভক্তির সাহায্যে অনন্ত অসীমকে ও সীমার গণ্ডিতে এনে একান্তভাবে আপন করে নেওয়া যায়। মানুষের সীমিত বুদ্ধিদ্বারা অসীমের উপলব্ধি খুবই কষ্টসাধ্য। ঈশ্বর যতক্ষণ অনন্ত ও অসীম ততক্ষণ তাঁর স্বরূপ ও অপরিসীম মাধুর্য আস্বাদন করা একান্তভাবেই অসম্ভব। তাই পরমপ্রিয় ভগবানের রূপাতীত সত্তাকে রূপের সীমায় আবদ্ধ করা সম্ভব হলেই তাঁর আস্বাদন ও উপাসনা যথার্থভাবে সম্ভব। ভক্ত সেজন্যই যুগে যুগে উপাধিশূন্য প্রেম, ভক্তি ও প্রীতিদ্বারা অরূপকে রূপায়িত করে উপাধিহীনকে সোপাধিক করে সীমাহীনকে সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে স্তবস্তুতিদ্বারা জানিয়েছে আকুল প্রার্থনা। এতে কিন্তু তাঁর অসীমত্বের মহিমা বিন্দুমাত্রও কমেনি। কারণ পরম প্রেমময় ভগবান যে একাধারে নির্গুণ এবং গুণময়, রূপাতীত ও রূপান্বিত আর সীমার মাঝে অসীম। তাই তো শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঃ

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"

শাস্ত্র বলেন, ভক্তকে আনন্দিত করার জন্য সাধকদের কল্যাণের জন্য অসীম হন সসীম, অরূপ হন সরূপ আর অমূর্ত ভগবান যুগে যুগে মূর্তি পরিগ্রহ করে নরলোকে হন আবির্ভূত। সাধক ভক্তদের হিতসাধনই তাঁর কাম্য—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।"৩৫ সর্বৈশ্বর্যময় ভগবানের অতুল ঐশ্বর্য দেখে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যায়। ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে "ভীতভীতঃ প্রণম্য"৩৬ — ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বলে, "নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ"৩৭ —আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি।

পরমপ্রেমময় ভগবানের যিনি প্রীতিমান ভক্ত তিনি কিন্তু ভগবানকে ভয় করেন না। তাঁরই পক্ষে সম্ভব ভক্তিযোগ আশ্রয় করে শান্তভাবে ভাবিত হয়ে নারদ-শুকদেব-বিদুরাদির মতো ভগবানকে পরব্রহ্ম-রূপে দর্শন করা, দাস্যভাবাশ্রয়ে উদ্ধব-অক্রূর হনু-মানাদির মতো প্রভুরূপে তাঁকে ভক্তি করা, সখ্যভাবা-শ্রয়ে অর্জুন-শ্রীদাম-সুদামাদির মতো বন্ধুরূপে সৌহার্দ্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ করা। বাৎসল্যভাবাশ্রয়ে যশোদা-কৌশল্যা-মেনকাদির মতো সন্তানরূপে আদর করা আর মধুরভাবাশ্রয়ে মীরা-রাধিকা-অণ্ডাল প্রমুখ কান্তরূপে ভালবাসা। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমভাবে কিন্তু একটি অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মতো। তাতে দেখা যায়, ভগবানে এত ভালবাসা যে, সর্বদা বাহ্যশূন্য হয়ে জগৎকে ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় বস্তু তার ওপর থেকেও মমত্ববোধ চলে যায়। এ-অবস্থায় ভক্ত সূর্যালোকে দেখে ভগবানের জ্যোতিঃ, চন্দ্রের স্নিগ্ধতায় দেখে তাঁরই লাবণ্য, পাখির কলতানে আর ভ্রমরের গুঞ্জরনে তাঁরই প্রেম-গীতি। ভক্ত তখন পরমপ্রিয় ভগবানকে অন্তরে, বাহিরে, অণুতে, পরমাণুতে দর্শন করে হন কৃত কৃতার্থ।

পরিশেষে বলা যায়, ভগবানের প্রতি কামনাশূন্য ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের আশ্রয় না নিয়েও উপাধিবর্জিত প্রেমরূপ শ্রেষ্ঠফল দান করে এবং ভক্তের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সহজলভ্য করে তাঁর হৃদয়কে সর্বদা পরমানন্দে পরিপূর্ণ রেখে শাশ্বত শান্তির অধিকারী করে।

৩৩ ভক্তিরসের বিবর্তন, পৃঃ ৯৫
৩৪ তারাকুমার কবিরত্নের কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, ভক্তিমাহাত্ম্য, ১ম অধ্যায়
৩৫ কুলার্ণব তন্ত্র, ৬।৭২

৩৬ গীতা, ১১।৩৫ ৩৭ ঐ, ১১।৩৯



লজ্জা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"লজ্জা হয় না!... যে শরীর থাকবে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শেলষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না!"

এই লজ্জাটুকুই বারে বারে ঠাকুর জাগাতে চেয়েছিলেন গৃহীদের মনে। গৃহী হও, সংসারী হও; কিন্তু নিলর্জ্জ হয়ো না। সংসারীরও একটা আদর্শ থাকা চাই। সংযম থাকা চাই। ঈশ্বর শুধু সাধুর সম্পত্তি নয়, সাধনার প্রাপ্তি। যে সাধন করবে সেই পাবে। ঠাকুর বলছেন, তুমি তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি তোমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কে? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করছেন ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চোখে হয়?

ঠাকুর বলছেন, তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চোখে তাঁকে দেখে সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায়।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন হলো—কিভাবে কি হবে? এ তো বললে হবে না। শুনলেও হবে না। পড়লেও হবে না। একটি মাত্র উপায়—ভালবাসা। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা এলে তবেই তো চারদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারদিকে হলদে দেখা যায়। তারপর কি হয়? ধরে রাখতে পারলে—তিনিই আমি এইটি বোধ হয়। যেমন মাতালের নেশা বেশি হলেই বলে—আমিই কালী। গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলত—আমিই কৃষ্ণ। ঠাকুর বলছেন—তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারদিকে দেখা যায়—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো, তবে খানিকক্ষণ পরে চারদিকে শিখাময় দেখা যায়।

ভালবাসা বললেই তো আর ভালবাসা আসবে না। একটু বিচার চাই। বিচার হলো—মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছেন পথের শেষে—রাজা, উজির, ফকির, আমির সকলেরই ঐ এক গতি। ঠাকুর বলছেন—মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে—'এ বাগানটি আমাদের', 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোনও দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না। দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

বাবুর বাগান এই সংসার। রেখেছেন, বেশ ভাল কথা। আছি। থাকব ততদিন, যতদিন না তিনি আমাকে তুলে নিচ্ছেন। 'আমি, আমি' ততটুকুই করব যতটুকু না করলে নয়। এক ধরনের অহঙ্কার আছে যা বড়ই লজ্জার। চিটচিটে আমি। অন্ধ আমি। সেই আমির হাঁকডাকে নিতান্ত সাধারণ মানুষও হাসে। নীচ আমি। জ্ঞানীর আমি মশা-মারা ধূপের মতো ধোঁয়া ছাড়ে না। সে আমি ধূপের মতো। সেই আমি কিঞ্চিৎ ভীত এই ভেবে—কোথায় আমি—'আমি, আমার' করছি। জীবনের কাছাটি খুলে দিলে সব হম্বিতম্বির অবসান। এই বোধ থেকে আসে জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন—জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে? ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা। এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা—তাঁরই হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরনী, আমি ঘর; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনীয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। তুমিই সব। ঠাকুর বলছেন: "মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম—এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

সব সমর্পণ করে দাও। তবেই মিলবে তাঁর কৃপা। সব ছাড়লে, তবেই সব পাবে। জ্ঞানী থেকে ক্রমে বিজ্ঞানী। ঠাকুর বলছেন—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে ; এর উত্তর এই যে আমিত্ব যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেকড়ি বেরিয়েছে। জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়্‌দুড় করছে ; জীবের আমি নিয়েই তো অত যন্ত্রণা।

ঠাকুর এইবার একটি উপমা দিচ্ছেন—গরু 'হাম্বা' 'হাম্বা' ('আমি' 'আমি') করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙ্গলে জোড়ে, রোদ-বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় —তখন খুব পেটায়। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরির যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে তুঁহু তুঁহু। যখন 'তুমি, তুমি' বলে তখন নিস্তার।

'আমি'ই হলো মহাকাল। আমার সংসার, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার চাকরি, আমার নাম, আমার যশ, আমার খ্যাতি। ছোট্ট একটা আমি হাঁচড়-পাঁচড় করে সবকিছু ধরতে চায়। আর প্রতিপদে জীবন তাকে চাবকায়। তাহলে কোন্ ভাবটা নিয়ে চলতে হবে? সেই লজ্জা—আরে ছি ছি, আমি একটা বুড়ো দামড়া, এই পরবাসে এসে, আমি আর আমার করে মরছি। ধক্ করে হৃৎপিণ্ডটা একবার তালকাটা ছন্দে লাফ মারল। হাত থেকে খসে পড়ল চায়ের কাপ। চোখ কপালে। কান্নার সানাই বেজে উঠল চারপাশে। তারপরের দৃশ্য ঠাকুরই এঁকে দিয়ে গেছেন—বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে— 'তুমি তো চললে? আমার কি করে গেলে?' ঠাকুর বলছেন ঃ "আবার এমনই মায়া যে প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে, বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না।" ঠাকুর বলছেন—সংসারে হনুমান হয়ে থাক—'দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না ; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয় ; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়।' হনুমান কি বলেছিল—ঠাকুর গানে বললেন ঃ

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল ;
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে ॥
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন—হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

ঠাকুর বলছেন—সেব্য-সেবকভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক্ শালা—'দাস আমি' হয়ে। ঠাকুর বলছেন—লজ্জা! একটু লজ্জা বোধ করো—আমির দাসত্ব কোরো না। দাস আমি হও। আমির দাসত্ব মানে, 'আমি' তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচাবে। 'আমি ও আমার'—এই দুটি অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে যেন লজ্জা আসে। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা। আমার এই সব ঐশ্বর্য, এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এসব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, এসব তোমার জিনিস'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়। সংসারই মায়া। "ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয় —বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।" এই বেহুঁশ হয়ে থাকাটাই লজ্জার। বেহুঁশ অবস্থার প্রতি বিষম ঘৃণাই আনে ঈশ্বরে ভক্তি। তাই প্রথম উপপাদ্যটি হলো লজ্জা। বড় লজ্জা।

প্রাচীন ভারতে ব্যাধিচিন্তা

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ রোগ বা ব্যাধি। জন্ম, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মের মতো ব্যাধিকেও শরীরের একটি বিশেষ ধর্ম বলে মনে করা যেতে পারে। যদিও এই ধর্ম কোন বিশেষ বয়সের অধীন নয়। কখন, কিভাবে, কোন রূপে যে ব্যাধি মানুষের শরীরে দেখা দেবে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেহেতু শরীরকে আশ্রয় করেই মানুষের যাবতীয় জীবনপ্রবাহ সেহেতু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ চেষ্টা করে চলেছে রোগ বা ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার এবং যতটা সম্ভব তাকে দূরে সরিয়ে রাখার। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুপ্রাচীন অথর্ব-বেদের মধ্যেই আমরা পাই 'শত বৈদ্য' এবং 'সহস্র উদ্ভিজ্জ ঔষধের' কথা।[১] সুশ্রুত-সংহিতায় (সূত্র-স্থান, ১।২৩) রোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"তদ্দুঃখ-সংযোগা ব্যাধয় উচ্যন্তে"। অর্থাৎ যা শরীরে কোন-প্রকার কষ্ট বা দুঃখের উদ্রেক করে, তাই হলো ব্যাধি।

ব্যাধির আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে 'ত্রিধাতু' বা 'ত্রিদোষতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আসলে শারীরিক যেকোন সুস্থতা বা অসুস্থতার মূলে আছে বায়ু, পিত্ত এবং কফ—এই তিনটি ধাতুর বিশেষ ভূমিকা। এই কারণে আমাদের সুবৃহৎ চিকিৎসাশাস্ত্রজুড়েই ত্রিদোষতত্ত্বপ্রসঙ্গ কোন-না-কোনভাবে আলোচিত হয়েছে। জুলিয়াস জলি যথার্থই বলেছেন: "The principle of three *dosas* (*dhatus*) of human body goes like a red thread through the whole of medicine।"[২] অনেকসময় 'রোগ' বা 'ব্যাধি' শব্দকে দোষ বা ত্রিদোষের সঙ্গে এক করেও মনে করা হয়েছে। চরক-সংহিতায় (বিমানস্থান, ৬।৪) বলা হয়েছে—"সমানো হি রোগশব্দো দোষেষু চ ব্যাধিষু চ।"—'রোগ' শব্দটির দ্বারা যেমন দোষকে বোঝায় তেমনি ব্যাধিকেও বোঝায়। সুশ্রুত-সংহিতায় (সূত্রস্থান, ২৪।৮) বলা হয়েছে—"সর্বেষাং চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মান এব মূলম্"—অর্থাৎ সমস্ত রোগের মূল বা কারণই হলো—বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা। মাধবনিদানম্ গ্রন্থের মধুকোশ টীকায় (পঞ্চনিদান লক্ষণম্, ১৪) খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—"দ্বিবিধং হি রোগস্য কারণং বিপ্রকৃষ্টং সন্নিকৃষ্টং চ; তত্র বিপ্রকৃষ্টং বিরুদ্ধাহারাদি, সন্নিকৃষ্টং বাতাদি।"

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাকে যেমন রোগের কারণ বলা হয়েছে, ঠিক তেমনিই এই তিনটি ধাতুকে শরীর-গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবেও সর্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সুশ্রুত-সংহিতায় (সূত্রস্থান, ২১।৩) বলা হয়েছে—"বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ"—বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা এই তিনটির দ্বারাই আমাদের দেহযন্ত্র সচল থাকে। প্রশ্ন হতে পারে একই ধাতু কিভাবে কখনো দেহে রোগের সৃষ্টি করছে কখনো আবার দেহকে সংগঠিত করছে? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে অষ্টাঙ্গহৃদয়-এ (সূত্রস্থান, ১।২০) স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে—"রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং, দোষসাম্যমরোগতা"। অর্থাৎ দোষগুলির (বায়ু, পিত্ত এবং কফ) সমভাব না থাকলেই দেখা দেবে রোগ এবং সমভাব থাকলে মানুষ থাকবে নীরোগ। এক্ষেত্রে বায়ু বা পিত্ত বা কফ—যে-কোন একটির বৃদ্ধি বা ক্ষয় ঘটলেই বৈষম্য দেখা দেবে যার ফল হবে রোগসৃষ্টি। তবে কোন্‌টির বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়েছে, তা নির্ণয়ের দায়িত্ব চিকিৎসকের।

আয়ুর্বেদে এত বিভিন্ন প্রকারের রোগ এবং তাদের লক্ষণসমূহ আলোচিত হয়েছে যে, তা দেখলেই বোঝা যায়, কতটা গুরুত্ব এবং কতখানি সতর্কতা নিয়ে প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌গণ রোগনির্ণয়ের কথা

১ অথর্ববেদ, ১১।৯।৩: সায়নভাষ্য

২ Indian Medicine. 2nd Edn. (1977), P. 49

ভাবতেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি রোগবিভাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—সুশ্রুত-সংহিতায় (সূত্রস্থান, ১।২৪) বলা হয়েছে—"তে চতুর্বিধাঃ—আগন্তবঃ শারীরাঃ মানসাঃ স্বাভাবিকাশ্চেতি"। অর্থাৎ রোগ চার প্রকার—আগন্তুক (আঘাত প্রভৃতির ফলে বাইরে থেকে যেসমস্ত রোগ আসে), শারীর (শরীর থেকে যেসমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়), মানস (মানসিক আঘাত বা দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ভূত রোগ) এবং স্বাভাবিক (স্বভাব অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা প্রভৃতি থেকে জাত যেসমস্ত ব্যাধি)। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই তিনপ্রকার দুঃখের উপর ভিত্তি করে রোগকে আবার সাতটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—আদিবলপ্রবৃত্তি, জন্মবলপ্রবৃত্তি, দোষবলপ্রবৃত্তি, কালবলপ্রবৃত্তি প্রভৃতি। পিতা বা মাতা থেকে যেসমস্ত রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয়, যেমন অর্শ ইত্যাদি, তাদের বলা হয় আদিবলপ্রবৃত্ত। এই কারণে আদিবলপ্রবৃত্ত রোগ পিতৃজ এবং মাতৃজ ভেদে দ্বিবিধ। সুশ্রুত-সংহিতার (সূত্রস্থান, ২৪।৭) মতে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু পরিবর্তনের ফলে যেসমস্ত রোগের আবির্ভাব হয়, তাদের বলা হয় 'কালবলপ্রবৃত্ত'। চরক-সংহিতায় রোগকে নিজ, আগন্তুক ও মানস—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। (সূত্রস্থান, ১১।৪৫)।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি যেমন মানবদেহকে আক্রমণ করেছে, মানুষও তেমনি রোগপ্রতিকারের জন্য উপায় সন্ধান করে চলেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। শুধু ঔষধ আবিষ্কৃত হলেই রোগমুক্তি ঘটবে না, রোগমুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক রোগনির্ণয়ের। রোগ সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং সেই রোগ বিনাশের জন্য সঠিক ঔষধপ্রয়োগ করতে পারলে তবেই উত্তম ফল আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে রোগনির্ণয় যদি যথার্থ না হয় তাহলে রোগনিরাময়ও অনিশ্চিত। সেজন্য চরক-সংহিতায় (সূত্রস্থান, ২০।২) চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্" অর্থাৎ, প্রথমে ভালভাবে রোগের পরীক্ষা করতে হবে, তারপর ঔষধের চিন্তা। যে-চিকিৎসক এইভাবে রোগের বিশেষ স্বরূপটি নির্ধারণ করে সঠিক ঔষধ-প্রয়োগে সমর্থ হবেন, তিনি অবশ্যই রোগযন্ত্রণার হাত থেকে রোগীকে রক্ষা করে সুচিকিৎসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। অপরপক্ষে প্রকৃত রোগই যদি নির্ণীত না হয়, তাহলে ঔষধ-প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই রোগমুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক রোগনির্ণয়ের। চরক-সংহিতায় (সূত্রস্থান, ২০।২১) বলা হচ্ছে—চিকিৎসক রোগটি কি হয়েছে, তা না জেনেই তার চিকিৎসা আরম্ভ করেন, ঔষধ সম্পর্কে তিনি যতই অভিজ্ঞ হোন, চিকিৎসায় তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত হবে এমন কথা বলা যায় না।

সঠিকভাবে রোগনির্ণয় করা সম্ভব হলেও সমস্ত রোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-এ আমরা দেখি—সাধ্য এবং অসাধ্য-ভেদে ব্যাধিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেসমস্ত রোগের চিকিৎসার দ্বারা উপশম সম্ভব, তা সাধ্য। এদের চিকিৎসা ঔষধ ব্যবহার করেও করা হতো, আবার অস্ত্রোপচার করেও করা হতো। সাধ্য হলেও সব ব্যাধিকে উপশম করা সহজ নয় জেনে সুসাধ্য এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ভেদে সাধ্য-ব্যাধিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপ্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়, তাদের বলা হয়েছে কৃচ্ছ্র। যেসমস্ত রোগের সম্পূর্ণ উপশম সম্ভব নয়, সেগুলি অসাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, আসল রোগটি সেরে গেল অথচ কিছু নতুন নতুন উপসর্গের জন্ম দিয়ে গেল—এই সমস্ত উপসর্গকে বলা হয়েছে উপদ্রব। এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাধিকে বিশ্লেষণ করে এবং তাদের স্বরূপ বুঝে নিয়ে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানিগণ চেষ্টা করেছেন মানুষকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে।

গ্রন্থ পরিচয়

'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লিখি'

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপে বিবেকানন্দ : স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ। বঙ্গানুবাদ রবিশেখর সেনগুপ্ত। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সংগৃহীত স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনী সাধারণ পাঠকের কাছে অতি পরিচিত। এছাড়াও আছে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ যাদের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু তবু তাঁর কর্মবহুল জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও অনুদ্ঘাটিত। শ্রীমতী মেরী লুইস বার্ক আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে স্বামীজীর পরিভ্রমণের অনুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টায় আজও গবেষণারত। ইতিমধ্যেই শ্রীমতী বার্কের ছয়খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থে বহু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুও বিশেষ করে ভারতবর্ষে স্বামীজীর জীবনের বহু অনালোকিত তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর সাতখণ্ডে প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থে। আরও অনেক গবেষক নিজেদের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় নতুন নতুন সংবাদ সংযোজিত করে স্বামীজীর জীবন-কাহিনীকে সম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও অনেক সংবাদই রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ ইউরোপে স্বামীজীর চলার পথটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গবেষণাধর্মী ইংরেজী রচনাগুলি এক সময় (১৯৬৭-৭৭) 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থাকারে আজও তা গ্রথিত হয়নি। সেই রচনাগুলি বাঙলায় অনুবাদ করে 'ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন রবিশেখর সেনগুপ্ত, যিনি ক্রিস্টোফার ইশারউডের 'রামকৃষ্ণ এ্যান্ড হিজ ডিসাইপলস' ও অন্যান্য রচনা অনুবাদের মাধ্যমে অনুবাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

পুস্তকান্তর্গত মোট বারোটি অনুবাদ-প্রবন্ধ বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ। প্রথম প্রবন্ধদুটি স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের প্রস্তাবনারূপে উপস্থাপিত। পরবর্তী দুটিতে পাওয়া যাবে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সুইজারল্যান্ড পরিক্রমার বিবরণী। দুটি প্রবন্ধে প্যারিস কংগ্রেস, ব্রিটানী ও নরম্যান্ডি পরিভ্রমণের কাহিনী এবং এই সময়ে পরিচিত ব্যক্তিদের (পল ডয়সন, পিয়র হিয়াসান্থ লয়সন, জুল বোওয়া) সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিবিধ সংবাদ। শেষ প্রবন্ধটি রোমাঁ রোলাঁর একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে এমা কালভের কথা। রোমাঁ বলেছিলেন, শুধুমাত্র বই পড়ে ইউরোপের মনন ও চিন্তাশীলতা উপলব্ধি করা স্বামীজীর পক্ষে যথেষ্ট বলে তিনি (রোমাঁ) মনে করেন না। এই উক্তির মধ্যে স্বামীজীর ফরাসী সঙ্গীদের প্রতি যে কটাক্ষ আছে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ তা খণ্ডন করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন "বোওয়া, লয়সন এবং কালভে কি অক্ষম পথ-নির্দেশক ছিলেন?" এই প্রশ্নেরই উত্তর দান করতে গিয়ে এসেছে কালভে প্রসঙ্গ।

ঐতিহাসিক তথ্যাশ্রিত এই রচনাগুলিতে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ স্বামীজীর জীবনের এমন একটি দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন যা সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত না হলেও অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ছিল চিরন্তন এক অভিযাত্রী সত্তা। রহস্য ও দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই আকর্ষণেই তিনি শ্রীমতী সেভিয়ারের আপত্তি সত্ত্বেও জেনিভা মেলায় বেলুনে উড়েছেন। প্যারিসের আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বারবার দেখেছেন, আবার সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আল্পসের সর্বোচ্চ চূড়া মঁ ব্ল্যাঁ-তে ওঠা দুঃসাধ্য জেনেও আরোহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। ম্যাটার হর্ন শৃঙ্গের পাশ দিয়ে দুর্গম পথে মঁ বোজা গ্লেসিয়ার দেখে সেখান থেকে তুষার ফুল তুলে এনেছেন। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের লিটল সেন্ট বার্নার্ড খ্রীস্টিয় মঠটি দেখার জন্য ক্লেশসাধ্য পথ পরিক্রমায়। তাঁর মতে, লোকালয় হতে বহুদূরে আল্পসের ক্রোড়ে শান্ত গম্ভীর পরিবেশে এই ধর্মীয় মঠটিই স্বামীজীর মায়াবতী আশ্রম-পরিকল্পনার পটভূমিকা রচনা করেছে।

প্রবন্ধগুলিকে বাঙলায় অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য অনুবাদক ও প্রকাশক বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন। মূলানুগ হলেও অনুবাদ কোথাও আড়ষ্ট নয়, পরন্তু সহজ ও সাবলীল।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৮ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব **বেলুড় মঠে** উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন প্রায় ১৬ হাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ জানুয়ারি '৯০, বৃহস্পতিবার **আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনে** স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে বৈদিক-স্তোত্র-পাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষদ্‌ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকাল ৩টায় তরুণ-তরুণীদের দ্বারা স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা আকাশবাণী কেন্দ্রের সহ-অধিকর্তা নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক এবং আশ্রম-সচিব স্বামী শান্তিদানন্দ।

গত ১২ জানুয়ারি এবং ১৮—২১ জানুয়ারি '৯০ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে **বরানগর আশ্রমের** বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ১২ জানুয়ারি যুবদিবস উপলক্ষে সকালে পতাকা উত্তোলনের পর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় স্বামীজীর ওপর আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দিন ভক্তিগীতি, আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়, প্রাক্তন ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এই সঙ্গে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজিত হয়।

উদ্বোধন

গত ৭ ফেব্রুয়ারি '৯০ **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মন্দির-উদ্বোধনের আগের দিন সারাদিনব্যাপী বাস্তুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের দ্বারা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক অভিনীত হয়।

পরের দিন (৮ ফেব্রুয়ারি) মন্দিরের দারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এ-দিন সপ্তশতী হোম অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন বিভিন্ন শিল্পী ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিকালে ধর্মসভায় মন্দির-স্থাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী, দুই সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং স্বামী প্রভানন্দজীও সভায় বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যারতির পর রামায়ণগান পরিবেশন করেন প্রেমানন্দ দে সরকার। দুপুরে প্রায় ২০ হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে ছয়শো কাপড় বিতরণ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ২৫০ জন সাধু-ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেছেন।

গত ২২ ডিসেম্বর '৮৯ **বেলঘরিয়ায়** শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের পৈতৃক বাস্তুভিটায় নব-নির্মিত **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্মৃতিভবন**-এর উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে **বেলুড় মঠে** জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়েছে। প্রায় একহাজার কিশোর ও যুব-প্রতিনিধি স্বামীজীর ছবি ও তাঁর বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বেলুড় মঠে জমায়েত হয়। সেখানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চৌদ্দজন যুবক-যুবতী বক্তব্য রাখে ও তিনটি দল সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী।

১২ জানুয়ারি যুবদিবস উপলক্ষে **মাদ্রাজে** বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। মিলিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

গত ১৩ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে **নয়াদিল্লী আশ্রম** এক জনসভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মানেকা গান্ধী।

১২ জানুয়ারি '৯০ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে **গদাধর আশ্রমের** পরিচালনায় রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মাঙ্গলিক, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম প্রভৃতি সংস্থা ও ভবানীপুরস্থ স্কুলগুলি একযোগে সকাল ৬-৩০ মিঃ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রাটি গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং স্বামীজীর বাণী পাঠ সহযোগে বিভিন্ন পথ পরিক্রমান্তে হরিশ পার্কে সমবেত হয় এবং সেখানে স্বামীজীর ভাবাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী, ভক্ত ও অনুরাগী যোগদান করেন। সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে টিফিন-প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

১২ জানুয়ারি '৯০ **আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে** জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকালে প্রতিনিধি সম্মেলন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নের আলোচনাচক্রে ভাষণ দেন অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মনোরঞ্জন আদক, সৌরেন্দ্রনাথ সরকার, অজিত মিত্র। প্রায় ৩০০জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস (১৯৯০) উদ্‌যাপন করেছে। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল ফুটবল টুর্নামেন্ট, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং কিশোর যুব-সম্মেলন। মিশনের নিজস্ব মাঠেই ফুটবল খেলাগুলি হয়। জেলার ৮টি নামী দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে ১২ জানুয়ারি ফাইন্যাল খেলা হয়। বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রসূন ব্যানার্জী পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৪ জানুয়ারি 'ক' ও 'খ' দুটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। মিশনের বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবনে ২৬ জানুয়ারি প্রায় ছয়শত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কিশোর যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যার্থী আশ্রমের সচিব স্বামী অমলানন্দ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রহড়া বালকাশ্রমের সচিব স্বামী রমানন্দ। সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রশ্নোত্তর অধিবেশন পরিচালনা করেন। সম্মেলনের শেষপর্বে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের দ্বারা পরিবেশিত 'ধ্বনি-প্রতিধ্বনি' গীতি-আলেখ্য এবং মূকাভিনয়ের মাধ্যমে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

আন্তঃরাজ্য যুব-শিবির

গত ১৫ জানুয়ারি থেকে ২০ দিনের জন্য **চেরাপুঞ্জি আশ্রমে** একটি আন্তঃরাজ্য যুব-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে **মালদা আশ্রম** দুস্থদের মধ্যে ১২১টি পশমী কম্বল, ৮০টি সোয়েটার, ৫৬টি ধুতি, ২৫টি শাড়ি বিতরণ করেছে।

চক্ষু-শিবির

কাটিহার আশ্রম গত ২৪—২৯ ডিসেম্বর '৮৯ এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করেছে। ঐ শিবিরে মোট ১০৬ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে **আলং আশ্রম** বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র প্রথম ও একজন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

পরিদর্শন

ভারতের প্রধান বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জী গত ২ জানুয়ারি **বেলুড় মঠ** পরিদর্শন করেন।

গত ২৯ জানুয়ারি '৮৯ মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে **বেলুড় মঠ** পরিদর্শন করেন।

বহির্ভারত

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার: গত ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় 'অপরোক্ষানুভূতি'র ওপর এবং প্রতি মঙ্গলবার গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

৫ ফেব্রুয়ারি, আমেরিকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ করণ সিংহ **বার্কলী বেদান্ত সোসাইটি** পরিদর্শন করেন। সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দ, প্রধান সভ্য বিল করকরন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ডঃ করণ সিংহ কিছুক্ষণ শাস্ত্রীয় আলোচনা করেন। বেদান্ত সোসাইটির কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সোসাইটি সহ রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্রগুলি বিদেশে বেদান্ত প্রচারে যে ভূমিকা পালন করছেন তার প্রশংসা করেন।

ত্রাণ

পুনর্বাসন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে পুনর্বাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে একটি দোতলা দালান নির্মাণ করে মালেকান ঘুমটি গ্রামের ঝড়ে বিধ্বস্ত জুনিয়র হাইস্কুলটিকে সেখানে স্থানান্তর করা হবে।

বাংলাদেশ পুনর্বাসন: ঢাকা আশ্রমের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ৪২৪টি বাড়ি ও সমসংখ্যক পাকাপায়খানা নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর চিকিৎসাত্রাণ: গত ১১ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তি মেলায় **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের** সহযোগিতায় চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়েছিল। এই শিবিরে বহির্বিভাগে ৬৮১ জন এবং অন্তর্বিভাগে ৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

ক্যাসেট প্রকাশ

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের শিবানন্দ হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ** কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর গাওয়া বারটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন। ক্যাসেটটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। সভায় বক্তব্য রাখেন সোভিয়েত রাশিয়ার দুজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ ই. পি. চেলিশেভ এবং ডঃ আর. বি. রিবাকভ। ক্যাসেটটি পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার। যাঁরা গানগুলি গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর '৩০০ বছরের কলকাতায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের লিখিত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করে শোনান বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দ। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯০ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। তাছাড়া গত ২৮ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ৩০ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ, স্বামী গর্গানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর '৮৯ পর্যন্ত সর্বভারতীয় **শ্রীসারদা সঙ্ঘের** ২৬তম অধিবেশন জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জামসেদপুরের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা গীতা সান্যাল এবং সর্বভারতীয় শ্রীসারদা সঙ্ঘের অধ্যক্ষা স্নেহময়ী মহাপাত্র এবং সর্বভারতীয় শ্রীসারদা সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা সুভদ্রা হাকসার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঙ্ঘের জামসেদপুর শাখার সম্পাদিকা অণিমা মুখাজী। ভারতের ২২টি শাখা-কেন্দ্র থেকে ১১১জন সভ্যা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

রামপাড়া (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সহযোগিতায় গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ আঁইয়া বারোয়ারিতলা সংলগ্ন মহিষমর্দিনী মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গিরিজানন্দ, বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও ডঃ তাপস বসু। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁরা মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভায় প্রায় ৫০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (পিকনিক-গার্ডেন, কলকাতা-৩৯)-এর উদ্যোগে ২০ ও ২১ জানুয়ারি '৯০, তিলজলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভাব-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী আজকের সমাজ-জীবনে কতটা প্রাসঙ্গিক সেবিষয়ে আলোচনা করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা। দ্বিতীয় দিনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী অজরানন্দ এবং ডঃ নিমাইসাধন বসু। যুবছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্পণ করা হয়। অমিতাভ বাগচীর পরিচালনায় 'চিরভাস্বর বিবেকানন্দ' আবৃত্তি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

১ জানুয়ারি ১৯৯০, কল্পতরু দিবসে বর্ধমান জেলার **ময়না শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের** উদ্যোগে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, আলোচনাসভা এবং গীতিনাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় আজকের সমাজ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দ, ডঃ তাপস বসু। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। সভার শেষে 'সাধনপথে শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ।

দুর্গাপুর স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় যুবদিবস নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। বেলা ১১টায় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'স্বামীজীবন্দনা' নামে একটি অনুষ্ঠান করে। দুপুরে এগারশো ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী গিরিজাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন বিজয়কুমার চক্রবর্তী ও সহশিল্পীবৃন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১২, ১৩, ১৪ জানুয়ারি '৯০ **নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির** উদ্যোগে আকর্ষণীয় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১২ জানুয়ারি, যুবদিবসে সাতশো ছাত্র-যুবজনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ নবদ্বীপ শহর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ডঃ তাপস বসু। ১৪ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী

দিব্যানন্দ প্রশ্নোত্তর অধিবেশন পরিচালনা করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ এবং অধ্যাপক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ।

গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৮ দিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার **গাঁড়াপোতা শ্রীশ্রী'মা' সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের** বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সংঘ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা' ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী অমলানন্দ, মনোরঞ্জন গোস্বামী ও অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষের দিনে পাঁচ হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ৬ জানুয়ারি '৯০ **পূর্বদুর্গাপুর** গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভাকরানন্দ, বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং কানাইলাল দে। সভায় প্রায় ৪০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, হুগলী জেলার রামপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের ব্যবস্থাপনায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৭ জানুয়ারি বড়গাছিয়ায় **মানসিংহপুরে** রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবক-যুবতীদের নিয়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সমাবেশে সাড়ে পাঁচশ প্রতিনিধি যোগদান করেন। সমাবেশের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ, বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী সর্বগানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে স্বামীজীর ওপর বক্তব্য রাখেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবশঙ্কর চক্রবর্তী।

চিকিৎসা শিবির

গত ২৬ জানুয়ারি **রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ ধামে** (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উঃ ২৪ পরগনা) এক চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য ও ডাঃ তুষারকুমার মিত্র এই তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। আশ্রম সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা এবং স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ শচীন্দ্রকুমার পালও চিকিৎসাকার্যে অংশগ্রহণ করেন। ঐ চিকিৎসা শিবিরে মোট ১৭০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এটি ছিল রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ ধামে ৬ষ্ঠ চিকিৎসা শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি **পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** (বর্ধমান) বিনামূল্যে এক চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ কমলকুমার দাঁ ও ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য চল্লিশ জন রোগীর পরীক্ষা করেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন। এই উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। উল্লেখ্য, এইটি ছিল এই আশ্রমের পরিচালনায় তৃতীয় চিকিৎসা শিবির। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর '৮৯ আরো দুটি শিবির পরিচালিত হয়েছে। ঐ শিবিরগুলিতে যথাক্রমে ১০২ ও ১০০ জন রোগীকে পরীক্ষা ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছিল।

পরলোকে

নদীয়া জেলার উলাগ্রাম নিবাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নগেন্দ্রনাথ মিত্রমুস্তফী** গত ১৩ অক্টোবর '৮৯ ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ প্রয়াত মিত্রমুস্তফী নানা সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য জোরহাট (অসম) নিবাসী **সুরেশচন্দ্র সিংহ** গত ২ জানুয়ারি '৯০ দুপুর ১-১৫ মিনিটে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচানব্বই বছর। তিনি জোরহাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও অন্যান্য ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

খাদ্যে কৃত্রিম রঙ

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে সেগুলি নানা রঙের। রঙ দেখেই অনেক সময় খাবার ইচ্ছা জাগে, জিভে জল আসে। সে তো গেল খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতিগত রঙের কথা। কিন্তু আজকাল টিনে, বোতলে বা প্লাস্টিক আবরণীতে রক্ষিত খাবার সাধারণ গৃহস্থঘরেও ঢুকে পড়েছে; বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে একে বাধা দেওয়া অসম্ভব। এই ধরনের রক্ষিত খাবারের সুবিধা হচ্ছে, ঋতু-অধীন খাবারগুলি সারা বৎসর পাওয়া যায় এবং কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয় না। কিন্তু রক্ষিত করার নানা পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যের রঙ অনেক সময় বদলে যায়। সেজন্য তখন খাদ্যে রঙ মেশানো হয়। ঐ সব খাদ্য হজমকালে মিশ্রিত রঙও হজমের বস্তু হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে নানা কারখানায় কৃত্রিম রঙ তৈরি হয়। কৃত্রিম রঙগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় 'আলকাতরা (coal tar) রঙ', কিন্তু সেগুলির নাম হওয়া উচিত 'সংশ্লেষিত (synthetic) রঙ'। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কৃত্রিম রঙ তৈরি হয় (১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের হিসাবে):—

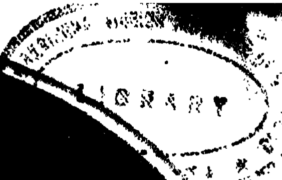
দেশ	টন
আমেরিকা (U.S.A.)	—২৫৭০
পশ্চিম ইউরোপ	—১১১৯
দক্ষিণ আমেরিকা	— ৮৭০
আফ্রিকা	— ৬২৫
ইউ. কে. (U.K.)	— ৪৯৫
অস্ট্রেলিয়া	— ২৫৫
পূর্ব ইউরোপ	— ২৪০
ভারতবর্ষ	— ১৩৫

ভারতবর্ষে তৈরি রঙকে জনপ্রতি এবং দিনপ্রতি হিসাব করলে দাঁড়ায় ০·৬ মিলিগ্রাম। এই পরিমাণ, আমেরিকার তুলনায় ৫০ গুণ এবং ইউ. কে.-র তুলনায় ৩০ গুণ কম।

অধিকাংশ রঙেরই বিষক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়েছে। সাধারণভাবে খাদ্যে খুব উচ্চ পরিমাণ (১—৫ শতাংশ) রঙ থাকলে তবে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। সেজন্য রঙ খেয়ে তাড়াতাড়ি অসুস্থ হওয়ার সংবাদ বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু রঙগুলির অধিকাংশই 'কারসিনোজেন' (carcinogen), অর্থাৎ এদের মধ্যে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিহিত। অস্ট্রেলিয়াতে ১৭ রকমের, রাশিয়ায় ৩ রকমের, আমেরিকায় ৭ রকমের, জাপানে ৮ রকমের, কানাডায় ৯ রকমের ও ভারতবর্ষে ১০ রকমের রঙকে খাদ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গ্রীসে কোন রঙকেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষে অনুমতিপ্রাপ্ত ১০টি রঙের মধ্যে কয়েকটির (ব্রিলিয়্যান্ট ব্লু, পনসো, কারময়সিন) কোন বিষক্রিয়া নেই; কয়েকটি (অমরনাথ, সানসেট ইয়েলো, ইরিথ্রোসিন) কারসিনোজেন নয়; বাকিগুলির ক্রিয়া মিশ্র ধরনের। রঙগুলির এইসব কুফল বিবেচনা করে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা শরীরের ওজনপ্রতি কোন্ রঙ কতটা পরিমাণে প্রতিদিন খাওয়া যেতে পারে তার তালিকা করে দিয়েছে। সরকারি সূত্রে, কোন্ কোন্ খাবারে রঙ মেশানো চলবে এবং রঙগুলির অনুমোদিত সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, খাবারের আবরণীতে যেন লেখা থাকে 'অনুমোদিত রঙ মেশানো আছে'। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ১১ বৎসর (১৯৬০—৭০) ধরে ১১৫৭৫টি রঙ মিশানো নানা ধরনের খাবার (দুগ্ধজাত, অ-দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন, পানীয়, ডাল, মশলা, চা, চাটনি ইত্যাদি) পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ খাবারে অনুমতি প্রাপ্ত নয়, এমন রঙ মিশানো আছে। সহরের চেয়ে গ্রামদেশে এইসব রঙ মিশানো খাবার আরও বেশি পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদে পরীক্ষার ফলও প্রায় এই ধরনের।

মাঝে মাঝে সরকারের উপর চাপ দেওয়া হয় যে, ভেজাল খাদ্য ধরার জন্য রঙ মিশানো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু আইন করলেই তো হবে না, সে আইন কার্যকরী হচ্ছে কিনা, তার উপর নজর রাখতে হবে এবং সে-কাজ সহজ নয়।

[Nutrition News, Vol. 9, No. 6, November-1988]



উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



বৈশাখ

১৩৯৭

৯২ তম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইলেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৯০ বৈশাখ, ১৩৯৭

দিব্য বাণী

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥

অপরের দুঃখনিবারণের তৎপরতা মহাপুরুষগণের স্বাভাবিক বৃত্তি। চন্দ্র যেমন তীব্র সূর্যকিরণে তাপিত পৃথিবীকে স্বাভাবিকভাবেই নিজের স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে তৃপ্ত করে, তেমনি মহাপুরুষগণও প্রার্থিত না হলেও স্বাভাবিকভাবেই অপরকে সহায়তা দান করে থাকেন।

শঙ্করাচার্য

(বিবেকচূড়ামণি, ৩৮)

কথাপ্রসঙ্গে

আচার্য শঙ্করের হৃদয়

আচার্য শঙ্করের অনন্যসাধারণ মস্তিষ্কের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁহার অমানুষী ধীশক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ বিচারশক্তি, সুগভীর জ্ঞান, সমাধিজ উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠার কাহিনী যেমন কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে, তেমনই তাঁহার চরিত্রের অপর একটি দিকও কিংবদন্তী হইয়াছে ; তাহা হইল তাঁহার নীরস ও শুষ্ক হৃদয়। কট্টর অদ্বৈতবাদী ও প্রেমহীন সন্ন্যাসী হিসাবেই তিনি সাধারণ্যে সুপরিচিত। হৃদয়ের কথা উঠিলে আমরা বুদ্ধের নামই বলি এবং জ্ঞানের প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করি। ব্যাপারটি এইখানে থাকিলে তো কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শঙ্করের জ্ঞান যে শঙ্করের হৃদয়হীনতার সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা হয়, হৃদয়, মানবপ্রেম প্রভৃতি শঙ্করের কাছে নিরর্থক। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মায়া—মিথ্যা। জগৎই যাঁহার নিকট অস্তিত্বহীন, জগতের মানুষকে তিনি ভালবাসিবেন কি করিয়া? মায়াবাদী তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁহার মায়াবাদ আসলে ব্রহ্মবাদেরই নামান্তর। তাই জগৎ সম্পর্কে তিনি কখনো উদাসীন হইতে পারেন না। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এবং অদ্বৈতবাদী কখনো প্রেমহীন হইতে পারেন না। কারণ অদ্বৈতবাদে আদি মধ্য ও অন্তে তো শুধু প্রেমই বিদ্যমান। কিন্তু অদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার উপজাত হিসাবে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ ব্যাপারটিই শুষ্ক এবং জ্ঞানের পথ মানুষকে হৃদয়হীন করিয়া দেয়। বস্তুতঃ জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিলে প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসাবে হৃদয় ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বৃত্তিসমূহকে বিসর্জন দিতে হইবে, এই ধারণাই সাধারণ্যে প্রচলিত। ধারণাটি এমনই গভীরে প্রোথিত যে, ইহার উৎসাদন সহজসাধ্য নহে। অনুরূপভাবে আচার্য সম্পর্কেও এই ধারণাটি সাধারণ্যে বদ্ধমূল যে, জ্ঞানের ঐশ্বর্যে তিনি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, হৃদয়ের দৈন্যে তেমনই তাঁহার তুলনা বিরল। কিন্তু সাধারণভাবে

অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানমার্গ সম্পর্কে ধারণাটি যেমন অযথার্থ, আচার্যের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও প্রচলিত ধারণাটিও সম্পূর্ণ অসত্য। আচার্য শঙ্করের হৃদয় মানুষের কল্যাণেচ্ছায় সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত।

প্রশ্ন হইবেঃ তাহা হইলে মানুষের প্রতি মমতায় তাঁহাকে গণমানুষের মধ্যে কখনো নামিয়া আসিতে দেখা যায় নাই কেন? প্রশ্নটি স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উত্তর জানিতে হইলে শান্তভাবে একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইল, যে যুগপ্রয়োজন সাধন করিবার জন্য তিনি দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন তাহা সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহার অন্য কোন ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তিনি জনারণ্যে মিশিয়া যাইলে আমরা তাঁহার হৃদয়ের ব্যাপ্তির একটি জ্বলন্ত ধারণা হয়তো পাইতাম, কিন্তু তাঁহার বিরাট মস্তিষ্ক ও সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ভূমিকার দিকটি আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে রহিয়া যাইত। তাহাতে ক্ষতি হইত ভারতবর্ষের, তাহাতে ক্ষতি হইত সনাতন ধর্মের, তাহাতে ক্ষতি হইত জগতের। পৃথিবীর মহত্তম ও সূক্ষ্মতম দর্শন অদ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনকে তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনারণ্যে নামিয়া আসিলে সেই ব্রত সুসম্পন্ন হইত না। গণমানুষের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিলে তাঁহার শক্তি ও সময় উভয়ই অপব্যয়িত হইত। সাধারণ লোকে তখন ধর্ম বলিতে বুঝিত যাগযজ্ঞকে, আচার-অনুষ্ঠানকে। ধর্মের মর্ম যে অনুভূতি, বিশ্বাত্মৈক্যবোধ তাহার অনুশীলন তখন প্রায় অবলুপ্ত। ধর্মের সেই মর্মবাণী তথা জগতের উচ্চতম তত্ত্বকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য প্রথমতঃ বিচারমূলক দার্শনিক সারস্বত কর্মের একটি ভিত্তি প্রয়োজন এবং তাহার জন্য চিন্তা, মনন ও ধ্যানের জগতে অবস্থান একান্তভাবেই অপরিহার্য। আচার্য তাহাই করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য, করিয়াছিলেন মানুষের বৃহত্তর স্বার্থেই। বর্তমান পৃথিবীর অবক্ষয়ের রূপ এবং সভ্যতার গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন আগামী দিনের পৃথিবীকে মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র বেদান্তোক্ত ঐক্যের বাণী বা অদ্বৈতবাদ। আচার্য শঙ্কর দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে তাঁহার অমানুষী প্রতিভা ও কর্মশক্তিতে তাহারই অকাট্য দার্শনিক ভিত্তিভূমি নির্মাণ করিয়াছিলেন লোকজীবন হইতে দূরে মনন ও ধ্যানেব আসনে অবস্থান করিয়া। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এই অবস্থান ছিল মানুষের প্রতি তাঁহার গভীরতম প্রেমের প্রেরণাতেই। বিখ্যাত জার্মান মরমিয়া দার্শনিক একহার্ট বলিতেনঃ "What you gain in contemplation, pour out in love"—যাহা তুমি ধ্যানে লাভ কর, তাহাকে তুমি প্রেমে উজাড় করিয়া দাও। শঙ্কর তাহাই করিয়াছিলেন। শুধু তাঁহার উজাড় করিবার ভঙ্গি ছিল পৃথক, পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। গণমানুষ তাঁহাকে পায় নাই সেকথা সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ (তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশি ছিল না) তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই প্রেম ও করুণার জীবন্ত বিগ্রহ। নিজ জননীর প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ছিল, সন্ন্যাসী হইয়াও জননীর কথা তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই। সে-কাহিনীও আমরা জানি। ইহাই শেষ নহে, আরও আছে।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার 'পরাপূজা'-য় জগৎকে শুনাইয়াছেন অদ্বৈতদর্শন তাঁহাকে কী দিয়াছেঃ

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি
কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং
মহাকল্পাম্বুনা যথা॥

—আমি কি করিব, যাইবই বা কোথায়? আমি কি গ্রহণ করিব, আর বর্জনই বা করিব কি? (কারণ) মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে নিখিল বিশ্ব যেমন প্লাবিত হয়, আত্মার দ্বারা সমস্তই যে তেমনই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে, পরিপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে।

এই একত্বদর্শন, এই বোধে প্রতিষ্ঠা, এই প্রজ্ঞানে স্থিতি অদ্বৈতভাবে জ্ঞানসাধনার লক্ষ্য। আচার্যের জীবনে সেই প্রেমানুভূতি কী আকার ধারণ করিয়াছিল বহু ঘটনাতেই তাহার প্রমাণ মিলে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইতেছে।

বৈদিক ধর্মের প্রচারকল্পে সশিষ্য ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য আসিয়াছেন দক্ষিণভারতের শ্রীশৈলে। শ্রীশৈল তন্ত্রসাধনার এক মহাপীঠস্থান। সেখানকার কাপালিক-সম্প্রদায়ের প্রধান উগ্রভৈরব অদ্বৈতাচার্য শঙ্করের আগমনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন বিচারে আচার্যের সম্মুখীন হওয়া নিছক মূর্খতা। স্থির করিলেন কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে। একদিন উগ্রভৈরব বিনীতভাবে আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে

অভিলাষী। আচার্য তৎক্ষণাৎ উগ্রভৈরবকে আশ্রয় দান করিলেন। উগ্রভৈরব আচার্যের শিষ্যগণের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই কপট সেবাদির দ্বারা সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন তিনি। একদিন আচার্যকে একাকী পাইয়া উগ্রভৈরব তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইলেন। দরদর ধারায় কপট অশ্রু তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছে। আচার্য বলিলেনঃ "উগ্রভৈরব, তোমার রোদনের কারণ কি?" উগ্রভৈরব করজোড়ে কাতরভাবে বলিলেনঃ "আপনি যদি অভয় দেন তাহা হইলে আপনার চরণে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি। একমাত্র আপনার দয়ার উপরেই আমার বহুদিনের অভীষ্টসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে।" আচার্য বলিলেনঃ "তুমি নিঃসঙ্কোচ বল, তুমি কি চাও। আমার দ্বারা যদি তাহা সম্ভব হয় নিশ্চয়ই আমি তাহা তোমার জন্য করিব।" উগ্রভৈরব অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদস্বরে বলিলেনঃ "আমি সারাজীবন মহাদেবের তপস্যা করিয়াছি। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব আমাকে বর দিয়াছেন যদি কোন রাজা বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ছিন্নমস্তক দিয়া তাঁহার হোম করিতে পারি তাহা হইলে আমার শিবলোক প্রাপ্তি হইবে। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। অতএব আপনি যদি দয়া করেন তাহা হইলে আমার আজীবনের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। নচেৎ আর কোন উপায় দেখি না।" উগ্রভৈরবের ঐ আর্তিতে অভিভূত হইয়া আচার্য ভাবিলেনঃ আমার এই নশ্বর দেহ যদি কাহারও উপকারে লাগে তাহা তো পরম আনন্দের কথা! তিনি উগ্রভৈরবকে বলিলেনঃ "তাহাই যদি তোমার প্রার্থনা হয় তবে আমার মস্তক দান করিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু সাবধান, আমার অপর শিষ্যরা তোমার উদ্দেশ্য অবগত হইলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে না। তাহারা যেন কোনক্রমে জানিতে না পারে।"

আচার্যের কথায় কাপালিক উল্লাসে অধীর হইয়া বলিলেনঃ "আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম। এখন আপনার অপর শিষ্যগণ যাহাতে কোনভাবে জানিতে না পারে সেইভাবেই ব্যবস্থা করিব। অদূরে অরণ্যমধ্যে একটি ভৈরবের স্থান রহিয়াছে। উহা অতি ভীষণ এবং দুর্গম বলিয়া কেহই সেখানে প্রায় যায় না। আগামী অমাবস্যায় আমি সেখানে পূজা-হোমাদির আয়োজন করিব। আপনি ঐ দিন মধ্যরাত্রে ঐ স্থানে দয়া করিয়া যাইবেন। আমি মধ্যপথে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব এবং আপনাকে লইয়া যাইব।" আচার্য বলিলেনঃ "তাহাই হইবে। তুমি আয়োজন কর।"

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। মধ্যরাত্রিও আসিল। শিষ্যগণ নিদ্রিত। আচার্য এই কয়দিন কাপালিকের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দিন গণনা করিতেছিলেন। আজ তাঁহার চোখে ঘুম নাই। আচার্য নিঃশব্দে কুটির হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে অরণ্যমধ্যে চলিলেন। উগ্রভৈরব যথাস্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আচার্যকে সত্যসত্যই আসিতে দেখিয়া উগ্রভৈরব আনন্দে বিহ্বল হইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইলেন। একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে আচার্য দেখিলেন পূজোপকরণ প্রস্তুত। ভীষণ দর্শন কাপালিকরা ত্রিশূল হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত। উগ্রভৈরব ব্যগ্রভাবে আচার্যকে বলিলেনঃ "আপনি প্রস্তুত হউন—আমি এখুনি আপনার ছিন্ন মস্তক লইয়া হোম করিব।" শঙ্করও প্রস্তুত। শান্ত সমাহিত হইয়া ধ্যানাসনে বসিলেন তিনি। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে। কিন্তু নির্বিকার আচার্যের মুখে তখন পরম প্রশান্তির হাস্যরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উল্লসিত উগ্রভৈরব খড়্গ তুলিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যেন ভগবদ্-প্রেরিত হইয়া আচার্যের অন্যতম শিষ্য পদ্মপাদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় উগ্রভৈরবের উদ্যত খড়্গ লইয়াই পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ উগ্রভৈরবের মস্তক ছিন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে পদ্মপাদকে অনুসরণ করিয়া আচার্যের অপর শিষ্যগণও আসিয়া পড়িয়াছেন। আচার্য তখনও সমাধিস্থ। ক্রুদ্ধ পদ্মপাদের গর্জনে শঙ্কর চোখ খুলিলেন এবং সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেনঃ "পদ্মপাদ, এ তুমি কি করিলে? উগ্রভৈরবের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমি মস্তক দানে সম্মত হইয়াছিলাম, তুমি কেন তাহাতে বাধা দান করিলে? আহা, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না! সে মহাদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল শিবলোকপ্রাপ্তি। সন্ন্যাসীর মস্তকদান করিতে পারিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, শিবের নিকট সে নির্দেশ পাইয়াছিল। আমার মস্তক দান করিতে পারিলে তাহার সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্তি হইত। কিন্তু তীরে আসিয়া তরী ডুবিল। দুর্ভাগা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।" বলিতে বলিতে আচার্যের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানের যথার্থ সাধনা মানুষকে নীরস বা শুষ্ক কখনো করিতে

পারে না। জ্ঞানে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন তিনি কখনই প্রেমশূন্য হইতে তো পারেনই না, উপরন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমে দিগন্তবিস্তৃত হইয়া যায়। সুতরাং শঙ্করকে যদি শুষ্ক সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করি তাহা হইলে তাঁহার উপর এবং জ্ঞানের সাধনের উপর আমরা চরম অবিচার করিব। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের চিরায়ত সাধনার মূল কথা হইলঃ জীবনের পরিপূর্ণতা জ্ঞানে, এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রেমে। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের নির্যাস যাহাতে বিধৃত সেই বেদান্ত বা উপনিষদে তাহাই উচ্চারিত হইয়াছে। উচ্চারিত হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি পরবর্তী কালের বিশাল ধর্ম-সাহিত্যেও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুনরুচ্চারণ করিয়াছে বা প্রতিধ্বনি করিয়াছে ঈশ উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রের:

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—যিনি নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যেই নিজেকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।

ইহাই অদ্বৈত এবং ইহার প্রধান লক্ষণ হইল—হৃদয়ের প্রসারতা। অন্য কথায়—আত্মব্যাপ্তি। আরও সহজ কথায়—প্রেম। ভারতবর্ষের নিত্য-দিনের প্রার্থনামন্ত্রেও পাই সেই ভাবনার, সেই চেতনার প্রকাশ:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ উপনিষদ্ (২।২।১০) বলিতেছেন, সর্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান:

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

—বায়ু যেমন (প্রাণরূপে) বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়া সেই-সেই দেহ অনুযায়ী আকারবিশিষ্ট হয়, তেমনই সর্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়—জীবদেহসমূহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মতো রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ তাহাদের অতিরিক্ত হইয়াও বর্তমান আছেন।

ফলকথা দাঁড়াইল যে, সকলের মধ্যে যখন তিনিই অথবা আমিই বিদ্যমান, তখন কে আমার আপন, আর কেই-বা আমার পর? এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল হইতে এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছে। ইহা তাহার কথার কথা নহে, ইহা ভারতবর্ষের উপলব্ধি। ইহাই ভারত-বর্ষের সাধনা, ইহাই ভারতবর্ষের সিদ্ধি। শঙ্কর সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পুষ্টি সংযোগ করিয়াছিলেন। আধুনিক কালেও সেই ধারারই প্রবহমানতা আমরা লক্ষ্য করি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে। সেই সিদ্ধির কাহিনী বাণীরূপ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে:

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!"

('বিদায়': কল্পনা)

আচার্য শঙ্করের উপলব্ধি জগৎকে সেই ভূমিতে উত্তরণ করিবার জন্যই আহ্বান করিয়াছে। পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়সে তরুণ কিন্তু প্রজ্ঞায় প্রাচীন সেই ভারতপথিক অক্লান্তভাবে পরিক্রমা করিয়া মানুষের কাছে প্রাচীন ভারতের সেই একত্বের মহাবাণী প্রচার করিয়াছেন: "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ব্রহ্মই, ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে সুকঠোর পরিশ্রমে যে বিশাল ভাষ্য, প্রকরণ ও স্তোত্র সাহিত্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্তকিছুর মূলেও ছিল তাঁহার অতুলনীয় প্রেমদৃষ্টির প্রেরণা। বিশেষতঃ শঙ্করের ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি পড়িলে বুঝা যায়, জগতের প্রতি তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না এবং মানুষের প্রতি সুগভীর প্রেমের প্রেরণাতেই তাহাদের সৃষ্টি; সেই প্রেমদৃষ্টিজাত সত্য হইতেই উৎসারিত হইয়াছে এই মহাবাক্য:

"মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥"

(অন্নপূর্ণা-স্তোত্র)

—দেবী পার্বতী আমার মাতা, দেব মহেশ্বর আমার পিতা, শিবভক্তবৃন্দ (অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান-সন্ততিরূপ নিখিল পৃথিবীর মানুষ) আমার প্রকৃত বন্ধু এবং ত্রিভুবন আমার স্বদেশ।

বস্তুতঃ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ শুধু এক-কেই সর্বত্র দেখে। দেখে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তাঁহার আসন বিস্তৃত; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে এবং তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে। এই উপলব্ধিকেই সমগ্র জীবন ধরিয়া আচার্য প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের শ্রেষ্ঠ আচার্যের উপলব্ধিই ছিল তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনই ছিল তাঁহার উপলব্ধি।

প্রবন্ধ

ভগবান বুদ্ধ

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্ম এদেশের জাতীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় ধর্মের উত্থান-পতনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতি বিশেষভাবে জড়িত। ধর্ম-বিপর্যয়ের ফলে ভারতীয় সমাজে নেমে আসে মহা অনিষ্টের করাল ছায়া এবং ধর্মের উন্নতিতে সমাজে বিরাজ করে সমৃদ্ধি। তাই ধর্মের গ্লানি আরম্ভ হলে যুগপ্রয়োজন অনুযায়ী তাকে নতুনভাবে পুনঃসংস্থাপন করতে আবির্ভাব হয় এক-একজন শক্তিশালী ধর্মীয় মহাপুরুষের। এই হলো ভারতীয় জনগণের চিরন্তন ধারণা। যাঁরা অবতারবাদে বিশ্বাসী, এরূপ মহাপুরুষেরা তাঁদের দ্বারা 'অবতার' বলে আখ্যাত হন। আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে এমনই একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ভগবান বুদ্ধ।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখন বৈদিক ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ও আদর্শ ভুলে মানুষ কেবল আচার ও অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল। ধর্মের প্রকৃত মহিমা ক্ষীণতর হয়ে শুধু অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হওয়ার ফলে সমাজের দুই প্রান্তে ফুটে উঠেছিল বিপরীত চিত্র। তখন উচ্চশ্রেণীর মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত। যাগযজ্ঞ ও নানা আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে তারা স্বর্গ ও ইহলোকের সুখসমৃদ্ধি খুঁজত। আর অপরদিকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদাহীন মানুষ আত্মসমর্পণ করত ভয় ও কুসংস্কারের নিকট। দেশের সর্বত্র পুঞ্জীভূত হয়েছিল লোভ, হিংসা ও ব্যাভিচারের কলুষ। এই পরিস্থিতির ফলে উদ্ভব হলো সুবিধাভোগী পুরোহিতশ্রেণীর। বৈদিক যুগের চতুর্বর্ণ বিভাগ থেকে ক্রমে উৎপত্তি হলো বহু জাতিবিভাগের। কঠোরভাবে তা বলবৎ হলো সমাজে। পুরোহিতেরা নিম্নবর্ণের এবং নারীজাতির সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিল। সমাজের এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হলেন। হিংসা-দ্বেষপূর্ণ মানবসমাজকে অহিংসা ও করুণার বারিধারায় শীতল করে, দুঃখময় মানবজীবনকে দুঃখশূন্য করার ব্রত নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন প্রেমের ধর্ম। নিপীড়িত মানুষকে তিনি দেখালেন আশার আলো ; শোনালেন অভয়বাণী—'সকলেই মুক্তিলাভ করে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে।' তাঁর করুণাধারা সূর্যালোকের মতো সকলের ওপরই সমভাবে বর্ষিত হতো। সেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না। ফলে সমাজের পতিত অস্পৃশ্য অবহেলিত মানুষ দলে দলে এই মহাপুরুষের চরণে শরণ নিল। শরণ নিল তারাও, যারা নানা ভোগোপকরণ উপভোগ করে ক্লান্ত—সেই উচ্চবিত্ত ধনী শ্রেষ্ঠীকুল ; শরণ নিল রাজন্যবর্গও। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরেও হাজার বছরের অধিককাল ধরে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর পদচ্ছায়ায় শরণ নিতে দলে দলে ছুটে এসেছিল। বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী বিতরণ করেই বৌদ্ধ-প্রচারকগণ প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর মানুষের মন জয় করেছিলেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশ বুদ্ধের মৈত্রী ও অহিংসার বাণীতে আলোকিত হয়েছিল। তাই প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধকে 'এশিয়ার আলোক' (The Light of Asia) বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমান নেপালের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নামে সমৃদ্ধশালী এক ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য ছিল শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের শাসনাধীন। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম মায়াদেবী। ৫৬৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দের এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কপিলাবস্তুর নিকটস্থ লুম্বিনীর এক উদ্যানে তাঁর জন্ম হয়। মায়াদেবী যখন কপিলাবস্তু থেকে পিতৃগৃহ দাবদাহে যাচ্ছিলেন, তখন লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম হয়। সদ্যোজাত পুত্রসহ মায়াদেবীকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা হলো। সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী লাভে মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তখন মায়াদেবীর ভগিনী মহা-

প্রজাপতি শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। মহাপ্রজাপতিকেও শুদ্ধোদন বিয়ে করেছিলেন। মহাপ্রজাপতির আর এক নাম ছিল গোতমী। গোতমীর দ্বারা পালিত বলে সিদ্ধার্থের আর এক নাম গোতম।

একদা পিতা শুদ্ধোদনের আজ্ঞায় জনৈক বিজ্ঞ জ্যোতিষী সিদ্ধার্থের ভাগ্যগণনা করে বললেন যে, শিশু বড় হয়ে রাজা কিংবা সন্ন্যাসী হবে। যদি সে রাজা হয়, তবে সে হবে রাজচক্রবর্তী অর্থাৎ একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি। আর যদি সন্ন্যাসী হয়, সে হবে এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। বলাবাহুল্য, পিতা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে রাজচক্রবর্তীরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। তাই নানা ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষায় পুত্রকে তিনি শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। সেইসঙ্গে পুত্রকে এমনভাবে যত্নে রাখার ব্যবস্থা করলেন যাতে গোতমের মনে কখনো কোন দুঃখের উদয় না হয়; এমনকি কোন দুঃখের দৃশ্যও যাতে তার চোখে না পড়ে। মহা আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থের দিনগুলি অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু তথাপি দেখা যেত সিদ্ধার্থ যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। কোন আমোদ-প্রমোদই যেন তাঁকে আনন্দ দিতে পারছে না। পুত্রের অবস্থা দেখে শুদ্ধোদন গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী ক্ষত্রিয় কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুত্রকে সংসারে বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য যাঁর আগমন সংসার-সুখ কি তাঁকে বাঁধতে পারে?

মাঝে মাঝে নগর-ভ্রমণ করতে ভালবাসেন গোতম। শুদ্ধোদন ছন্দক নামে একজন বিশ্বস্ত সারথির ওপর ভার দিলেন গোতমকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার এবং সাবধান করে দিলেন—পথে কোন দুঃখের দৃশ্য যেন গোতমের দৃষ্টিগোচর না হয়। কিন্তু নিয়তির বিধান কে খণ্ডাবে? নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে গোতম পরপর তিনদিন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু কবলিত মানুষের দৃশ্য দেখলেন এবং সারথি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, এই হচ্ছে মানুষের অনিবার্য পরিণতি। এদের হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই। খুবই ব্যথিত হলেন গোতম। ভাবতে লাগলেন, এই যদি মানুষের অনিবার্য পরিণতি হয় তবে জীবনে সুখ কোথায়? বিষাদে নিমগ্ন হয়ে রইল সিদ্ধার্থের মন। আরেক দিন ভ্রমণে বেরিয়ে দেখলেন শান্ত-সৌম্য এক সন্ন্যাসীকে। সিদ্ধার্থের মনে হলো এ-ব্যক্তির মনে যেন কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। শান্তিতে ভরপুর তাঁর মন। নিশ্চয়ই তিনি এমন কিছু লাভ করেছেন যার জন্য জরা-ব্যাধি-মৃত্যুতে তিনি অভিভূত হন না। ছন্দককে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, এ-ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসী। প্রকৃত সত্যের অন্বেষণে তিনি গৃহ-সংসার সব ত্যাগ করেছেন। তাই সংসারের কোন দুঃখ তাঁকে বিচলিত করে না। রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থ। স্থির করলেন সকল দুঃখকে অতিক্রম করার পথ খুঁজে বের করতে তিনিও সংসার ত্যাগ করবেন। ইতোমধ্যে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। পুত্রের নাম রাখা হলো রাহুল। সিদ্ধার্থ দেখলেন সংসারের আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়ছে। অবিলম্বে সংসার ত্যাগ না করলে ভবিষ্যতে সংসারের প্রতি আকর্ষণ আরো বাড়বে। তাই এক চৈত্রপূর্ণিমার গভীর রাত্রে সারথি ছন্দকের সাহায্যে মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে সকল জাগতিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চললেন সত্যের সন্ধানে—যে-সত্য লাভ করলে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সকল প্রকার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু পরিব্রাজক হয়ে উত্তরভারত পরিভ্রমণ করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানা সাধকের নিকট সাধনপ্রণালী ও শাস্ত্রশিক্ষাও করতে লাগলেন। বুদ্ধের সাধন-জীবনে যে-দুজন ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়—তাঁদের একজনের নাম আলাড় কালম, অপরজন রুদ্রক রাম (উদ্দক রামপুত্ত—এই নামেরও কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে)। এই দুজনেই তখন বড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আলাড় কালমের নিকট তিনি সাধনপ্রণালী—বিশেষতঃ ধ্যানপ্রক্রিয়া এবং রুদ্রক-রামের নিকট শাস্ত্রবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের নিকট ধর্মজগতের অনেককিছু জানলেও সিদ্ধার্থের মনে প্রকৃত শান্তি এল না। আরো কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি এলেন বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিল্ব গ্রামে। সেখানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি মনোরম স্থানে তিনি কঠোর সাধনা আরম্ভ করলেন। অতি কঠোরতায়

তাঁর শরীর ভেঙে গেল। তথাপি সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ হলো না। একদিন সুজাতা নামে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা পূজা দিতে এসে সিদ্ধার্থকে দেখলেন এবং তাঁর তেজঃপুঞ্জ শরীর দেখে তাঁকে বনদেবতা ভাবলেন। দেবোদ্দেশে আনীত পায়েস তাঁকেই নিবেদন করলেন সুজাতা। সেই পায়েস খেয়ে সিদ্ধার্থ শরীরে বল পেলেন। সুজাতার পায়েস খাওয়ার পর আবার ধ্যানে বসলেন গৌতম, এবং প্রতিজ্ঞা করলেন :

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি-মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

—অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে যাক, চামড়া, মাংস, অস্থি লুপ্ত হয়ে যাক ; তবু বহুজন্মদুর্লভ বোধিলাভ না করে এই আসন থেকে কিছুতেই উঠব না। অবশেষে এই আসনেই তিনি এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বোধি (জ্ঞান) লাভ করলেন। উপলব্ধি করলেন জরা-ব্যাধি-মৃত্যু—সকল প্রকার দুঃখের কারণ কি এবং দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি। দীর্ঘ ছয় বছরের নিরন্তর সাধনায় গৌতম হলেন 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী। পরিচিত হলেন গৌতম বুদ্ধ নামে। কঠোর তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে তিনি বুঝেছিলেন অতি কঠোরতায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সেজন্যই তিনি পরবর্তী কালে সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন।

দীর্ঘ সাধনায় যে-সত্য লাভ করলেন, তা কি করে বিশ্বমানবের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে-চিন্তায় বুদ্ধ ব্যগ্র হলেন। কিন্তু কাকে বলবেন তাঁর উপলব্ধির কথা। তাঁর মনে পড়ল আলাড় কালমের কথা। আলাড় কালম জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর উপলব্ধির বিষয় তিনিই সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলেন আলাড় দেহত্যাগ করেছেন। তারপর বুদ্ধ যাত্রা করলেন রুদ্রকরামের উদ্দেশে। কিন্তু তিনিও দেহরক্ষা করেছেন। রুদ্রকরামের নিকট শিক্ষাকালে কৌণ্ডণ্য, বাপা, ভদ্রাজিৎ, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামে রুদ্রকের পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচয় হয়েছিল। গৌতমের ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখে তাঁরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিছুদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গও করেছিলেন। মনে পড়ল তাঁদের কথা। ভাবলেন, তাঁরা হয়তো তাঁর উপলব্ধির কথা বুঝবেন এবং তাঁর কাজের সহায়ক হবেন। তাঁরা তখন মৃগদাবে (সারনাথে) অবস্থান করছেন। বুদ্ধ গেলেন তাঁদের কাছে। বললেন তাঁর উপলব্ধির বিষয়। ব্যাখ্যা করলেন চার আর্য সত্য, মধ্যপন্থা, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ ও তার স্বরূপ। বুদ্ধের কথায় তাঁরা নতুন আলোক পেলেন। গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁরা নতুন ধর্মপ্রচারে নামলেন। প্রবর্তন করলেন ধর্মচক্র। প্রচার-জীবন শুরু হলো তাঁর। সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকে তাঁর নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। অনেকে সন্ন্যাসী হলেন। শিষ্যদের বুদ্ধদেব নির্দেশ দিলেন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে মানব-কল্যাণের বাণী ছড়িয়ে দিতে। প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন ধর্মসংঘ। আরম্ভ হলো জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ধর্মীয় প্রচারকর্ম।

বুদ্ধদেব যে-ধর্ম প্রচার করলেন তাতে ঈশ্বর ও আত্মার স্থান নেই। কোন প্রকার বিশ্বাস বা মতবাদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মানুষ নিজ চেষ্টাতেই নির্বাণলাভ করতে পারে। মানুষ যদি দুঃখ থেকে মুক্তি চায়, তবে তাকে বুঝতে হবে চারটি আর্যসত্য এবং পালন করতে হবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। চারটি আর্যসত্য হলো (১) জগতে দুঃখ আছে ; (২) দুঃখের কারণ আছে। (৩) দুঃখের নাশ আছে এবং (৪) দুঃখ নাশের উপায় আছে। বুদ্ধ কার্যকারণবাদী ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন দুঃখের কারণ আছে। এই কার্যকারণবাদের ওপর ভিত্তি করেই বুদ্ধদর্শনের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নীতি স্থাপিত হয়েছে। দুঃখের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বুদ্ধ দ্বাদশ-কারণসম্বলিত কারণ-শৃংখলের কথা বলেছেন। যেমন—জরা-মরণাদি দুঃখের কারণ জন্ম। জন্মের কারণ ভব বা জন্মবাসনা। ভবের কারণ উপাদান। উপাদানের কারণ তৃষ্ণা। তৃষ্ণার কারণ অতীতের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা 'বেদনা'। বেদনার কারণ স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়-বিষয়-সংযোগ। স্পর্শের কারণ 'ষড়ায়তন' বা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ। নামরূপের কারণ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কারণ

সংস্কার এবং সংস্কারের কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান হয়। এই অজ্ঞান-নিবৃত্তি বা দুঃখ-নিরোধই হলো নির্বাণ। বুদ্ধের নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো (১) সম্যক্ দৃষ্টি—চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি। (২) সম্যক্ সংকল্প—জ্ঞানের আলোতে জীবন-নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ। (৩) সম্যক্ বাক্য—মিথ্যা ভাষণ, অপ্রিয় কথন এবং বৃথা বাক্যালাপ ত্যাগ করা। (৪) সম্যক্ কর্ম—সৎ আচরণ করা। (৫) সম্যক্ জীবিকা—সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করা। (৬) সম্যক্ ব্যায়াম—অসৎ চিন্তা যাতে মনে না আসে সেজন্য সর্বদা সৎ চিন্তার দ্বারা মনকে পূর্ণ রাখার চেষ্টা। (৭) সম্যক্ স্মৃতি—শরীর-ইন্দ্রিয়াদি এবং জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-বিষয়ে সর্বদা মনের সতর্কতা। (৮) সম্যক্ সমাধি—উপরি-উক্ত সাতটি নীতির অধিকারী হলে মন-সংযমের চরম অবস্থা লাভ হয়; তাকেই বলে সম্যক্ সমাধি। সম্যক্ সমাধি হলেই নির্বাণলাভ হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করলে দুঃখের মূল বা কারণকে জয় করা সম্ভব হয়, যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি বা দেবতার কৃপালাভদ্বারা নয়। আত্ম-নির্ভরতার দ্বারাই বোধিলাভ সম্ভব। এজন্য বুদ্ধদেব বেদকে অস্বীকার করেছেন, নিষিদ্ধ করেছেন বৈদিক কর্মকাণ্ডকে। বেদের অনুশাসন অনুসরণ না করে সদ্‌যুক্তির ওপরই নির্ভর করতে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি। বুদ্ধের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করে বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক নামে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থের সমষ্টিকে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের বহু বছর পরেও তাঁর বাণীগুলি শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা মুখে মুখে চলে আসছিল। পরে এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাধনার ক্ষেত্রে অতি আরাম-প্রিয়তা এবং অতি কঠোরতা বর্জনই মধ্যমার্গ। বুদ্ধদেব তাঁর জীবন-সাধনার দ্বারা বুঝেছিলেন যে, অতি আরামে জীবন-যাপন এবং অত্যধিক কঠোরতা উভয়ই মনের সমতা নষ্ট করে। প্রথমটি যেমন কামনা-বাসনা বৃদ্ধি করে মনকে বহির্মুখী করে, তেমনি সাধনার নামে অতি-কঠোরতা সাধকের শরীর-মনকে অসাড় করে। প্রথম জীবনে অত্যধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থের জীবন অতিবাহিত হয়। তখন কোনকিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। তবু তিনি সেসব ভোগের মধ্যে মনের তৃপ্তি পাননি। আবার সাধন-জীবনে অতি কঠোরতা করে বুঝেছিলেন যে, জীর্ণ-শরীর ও অসুস্থ মন ধ্যানের পক্ষে সহায়ক নয়। পরিমিত আহার-নিদ্রা ও ভ্রমণাদিই শরীর সুস্থ এবং মনের শান্তি ও সমতা রক্ষা করতে পারে। আর সুস্থ শরীর এবং শান্ত মনই সাধনার পক্ষে সহায়ক। তাই তিনি সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যমার্গ অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মকে মূলতঃ নৈতিক ধর্ম বলা যায়। নীতি ও যুক্তিনির্ভর হওয়ায় এই ধর্মে জাতিভেদ-প্রথার কোন স্থান রইল না। ফলে ঐ সময় ধর্মীয় নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ, পুরোহিতকুলের অত্যাচার ও জাতিভেদপ্রথার কঠিন নিয়মে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপকভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে আনন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যপ্রধানগণের সঙ্গে ঐ বংশের বহু নরনারীও এই ধর্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের বিমাতা গোতমী, পত্নী যশোধরা ও পুত্র রাহুল এই ধর্ম গ্রহণ করে সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ ভারতে মহান ধর্মের বাণীকে ছড়িয়ে দিয়ে বহু বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করে ভগবান বুদ্ধ আশি বছর বয়সে খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ঐ দিনটিও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর ধর্ম দেশের সর্বত্র এবং সর্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারের প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই তিনি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই বহু বৌদ্ধ-বিহার স্থাপিত হয়। তিনিই পৃথিবীতে প্রথম ধর্মীয় সঙ্ঘ-স্থাপক এবং গঠনমূলক ধর্মের প্রচারক। বৌদ্ধসঙ্ঘে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই যোগদান করেছিলেন। তাই বুদ্ধদেব ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য আলাদা সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় সঙ্ঘের জন্য তিনি নিজেই নিয়মাবলী প্রণয়ন করে যান। কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হতো। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের

তিনটি শ্রেণী ছিল। যথা—শ্রমণ, স্থবির ও অর্হৎ। সঙ্ঘে যোগদানকারী নবীন ভিক্ষুকে বলা হতো শ্রমণ, পরিণত বয়স্ক ভিক্ষুকে বলা হতো স্থবির এবং নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বলা হতো অর্হৎ। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই সম্ভবতঃ এই বিভাগ করা হতো।

বুদ্ধের সময়ে অনেক শাসকবর্গ এবং শ্রেষ্ঠীকুল এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় তিনশত বছর পরে সম্রাট অশোক এই ধর্ম গ্রহণ করে তার ব্যাপক প্রচার করেন। তিনিই প্রথম বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থে সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন। অশোকের পর কুষাণবংশীয় নৃপতিগণও বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক ছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে।

বৌদ্ধসঙ্ঘ আত্মোন্নতি এবং সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার—এই দুটি বিষয়ে প্রধানতঃ গুরুত্ব দিত। যখন এই ধর্মের পুস্তকাদি প্রণীত হয়নি, তখন সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুরাই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী। ত্যাগব্রতী শত শত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী গ্রাম-নগর পরিক্রমা করে বুদ্ধের বাণীগুলি মানুষের কাছে পেঁছে দিতেন। তাঁদের পরিক্রমা ও প্রচারের মধ্য দিয়ে এই নবধর্ম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রচার ও সংগঠনের এরূপ কর্মনিষ্ঠা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল।

বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বিহারগুলি যে শুধু ধর্মপ্রচারেই ব্রতী ছিল তা নয়, দেশে শিক্ষাবিস্তারেও তাদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। বিদেশ থেকেও ছাত্রগণ সেখানে আসতেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎকালীন সময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল দশহাজার। পাল রাজাদের সময়ে বিক্রমশীলা মহাবিহারও নালন্দার মতো ভারতের অন্যতম বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থান ছিল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের কয়েকশো বছর পর বৌদ্ধ-মতাবলম্বীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই দুই বিভাগ হীনযান ও মহাযান নামে খ্যাত। হীন-যানপন্থীগণ ভাবের দিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী এবং মহাযানপন্থীগণ উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক। মহাযানী বৌদ্ধগণই বুদ্ধের মূর্তিপূজার প্রচলন করেন। চীন, জাপান, কম্বোডিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে মহাযানী সঙ্ঘ এবং সিংহল, ব্রহ্ম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে হীনযানী সঙ্ঘের প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

যে-বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে ভারতের বুকে প্রসারলাভ করেছিল এবং যে-ধর্মের দ্বারা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক প্রভাবিত হয়েছিল সেই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের প্রথম দিকে বুদ্ধদেবকে অনেক প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই বুদ্ধের শিষ্য ও খুল্লতাতপুত্র দেবদত্ত ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে সঙ্ঘ থেকে সরাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য না হয়ে বিম্বিসার-পুত্র রাজা অজাতশত্রুর (যিনি বুদ্ধের তীব্র বিরোধী ছিলেন) সহযোগিতায় তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করেন। অবশ্য তিনি ব্যর্থ হন। তৎকালীন সময়ে কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল ব্যক্তি বুদ্ধের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে বুদ্ধের পূতচরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের মহিমার কাছে তাদের সে-সকল ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়।

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ বর্তমানে ভারত থেকে প্রায় অবলুপ্ত। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নষ্ট হওয়ার মূলে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের পতনের বীজ নিহিত ছিল। বুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ঈশ্বর, আত্মা ও বেদকে অস্বীকার করে-ছিলেন। যদিও তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁর যে-উপলব্ধির কথা বলেছেন তা বেদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মোপলব্ধি থেকে পৃথক কিছু নয়। তবু বেদকে অস্বীকার করার জন্য বুদ্ধকে 'নাস্তিক' অপবাদে আখ্যাত হতে হয়। অনেকে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না। সব রকম দার্শনিক বিতর্ক পরিহারপূর্বক ধর্মকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার জন্যই তিনি

এসব অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির অবলম্বন হিসাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই দেখা গেল বুদ্ধের মহানির্বাণের কয়েকশো বছরের মধ্যে বৌদ্ধগণই তাঁর মূর্তিপূজার প্রচলন করেন। পরবর্তী কালে কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি মীমাংসকগণের আবির্ভাবের ফলে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত হয়। অষ্টম শতকে শংকরাচার্যাদি অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের আবির্ভাবের ফলে উপনিষদের আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাধারণ এবং বুদ্ধিজীবী উভয়শ্রেণী মানুষেরই আকর্ষণ কমে যায়। বুদ্ধের বাণীগুলি নিয়ে যখন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয় তখন বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ শূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি নেতিবাচক ভাবগুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। যত যুক্তিই থাক না কেন, নেতিবাচক ভাবের ওপর ভিত্তি করে কোন ধর্মই বেশিদিন বাঁচতে পারে না।

নির্বিচারে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রবেশাধিকার পাওয়ায় অনেক অনধিকারী সন্ন্যাসগ্রহণ করে বুদ্ধসংঘে প্রবেশ করে। তার ফলে বুদ্ধদেব ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য সংঘের যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন পরবর্তী কালের সংঘবাসিগণ তা পালন করতে অক্ষম হন। সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শ খর্ব হওয়ায় বৌদ্ধধর্মে বামাচার প্রবেশ করে। তার ফলে সংঘের পতন ত্বরান্বিত হয়।

যদিও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংঘ বর্তমান ভারত থেকে প্রায় অবলুপ্ত, তথাপি বুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ মহিমান্বিত পূতচরিত্র, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ও শিক্ষা হিন্দুভারতবাসীর হৃদয়ে বিশেষ স্থানলাভ করেছে। হিন্দুগণ তাঁকে দশ অবতারের অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন। হিন্দুধর্মের ওপরও তার প্রভাব অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কখনো অবৈদিক বলতেন না। তাঁর মতে বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের মহান সংস্কারক। তিনি বলেছেন: "নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি (বুদ্ধ) বেদের সারমর্ম প্রচার করেন, ...নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।"[১] "তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।"[২] তাই স্বামীজী বুদ্ধকে প্রথাসর্বস্ব হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। বহু মনীষী হিন্দুধর্মের ওপর বুদ্ধের প্রভাব ও তাঁর অবদান স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, গৌতম বুদ্ধ হিন্দুধর্মের যে প্রভূত সংস্কার-সাধন করেছেন এবং হিন্দুধর্মের ওপর যে বিরাট প্রভাব-বিস্তার করেছেন তাকে অস্বীকার করা হিন্দু ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর অপরিমেয় হৃদয়বত্তা, অসাধারণ ত্যাগ ও স্বর্গীয় পবিত্রতার দ্বারা তিনি হিন্দুধর্মের ওপর একটি অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছেন। এজন্য হিন্দুধর্ম ঐ মহান আচার্যের নিকট চিরঋণী।

আধুনিক যুগের বহু চিন্তাবিদ্, সাহিত্যিক ও শিল্পীকে বুদ্ধ-চরিত্র ও তাঁর ভাবধারা প্রেরণা দান করেছে। বুদ্ধের জীবন ও বাণী নিয়ে রচিত হয়েছে বহু সাহিত্য, বহু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য-শিল্প। স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন বুদ্ধের গুণ-গ্রাহী ও তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বুদ্ধপ্রসঙ্গ। স্বামীজী নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে জীবসেবার আদর্শ যেমনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, তেমনি বুদ্ধের কাছ থেকেও তিনি এবিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন। যথার্থ কর্ম-যোগীর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বুদ্ধকেই যথার্থ কর্মযোগী বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন: "বাস্তবিক তিনিই (বুদ্ধ) আদর্শ কর্মযোগী—সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে—যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ—অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।"[৩]

মানবজাতির আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক-গুণাবলীর বিকাশ ও উন্নতিসাধন এবং বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে বুদ্ধের অবদান বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। সুতরাং তিনি শুধু এশিয়ারই আলোক নন—বিশ্বেরও আলোক।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড (১৩৭৯), পৃঃ ৩১৫
২ ঐ, পৃঃ ৩১
৩ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী

বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, অথবা তার কিছু কিছু অংশ খুবই প্রসিদ্ধ এবং জনসমাজে বেশ প্রচারিত। 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—যার দ্বারা আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কী করব ?—মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নটিকে ভারত-ভারতীর মর্মবাণী—আন্তরিক জিজ্ঞাসা বলে শ্রদ্ধা করা হয় ও উদ্ধৃত করা হয়। এর পরেই মৈত্রেয়ী যা বলেছিলেন তা হলো—অমৃতত্বের সাধন যদি আপনার জানা থাকে তা-ই আমাকে বলুন।—"যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

এর জবাবে ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে অনেকের কিছু কিছু বিভ্রান্তি দেখা যায়। তাঁরা হয়তো প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃদের অনুসরণ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, অথবা প্রাচীনদের সেই যথার্থ ব্যাখ্যা জানেনই না। তাই যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন। যাজ্ঞবল্ক্য জানতেন যে, তাঁর ব্রহ্মবাদিনী সাধ্বী পত্নী তাঁর পতি ও পুত্র প্রভৃতিকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলে মনে করেন। আবার সকল পতিই জায়াকে প্রিয়তমা বলে মনে করেন। এই বস্তুস্থিতিকে (fact-কে) স্বীকার করেই তিনি মৈত্রেয়ীকে বোঝাতে চাইলেন—এই প্রিয়তার ব্যাপারে, ভালবাসার ব্যাপারে আমাদের গভীর ভ্রান্তি রয়েছে। তিনি বললেন—পতির প্রয়োজনের জন্য পতি প্রিয় হয় না। আত্মার (নিজের=জীবাত্মার) প্রয়োজনের জন্যই পতি প্রিয় হয়। আবার জায়ার প্রয়োজনের জন্য জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার (নিজের=জীবাত্মার) প্রয়োজনের জন্যই জায়া প্রিয় হয়। এইভাবে তিনি দেখালেন যে, সবকিছুই তাদের প্রয়োজনের জন্য মানুষের প্রিয় হয় না, আত্মার (নিজের=জীবাত্মার) প্রয়োজনের জন্যই সেসব মানুষের প্রিয় হয়। এস্থলে সূচিত যুক্তি এই যে, পতির জন্য বা পুত্রের জন্যই যদি পতি বা পুত্র প্রিয় হতো তাহলে জগতে বহু পতি বা পুত্র আছে, তাঁরা তোমার সেরূপ প্রিয় হয় না কেন ? তাঁরাও তো পতি বা পুত্র। জবাব তো এই যে, তাঁরা পতি হলেও 'আমার পতি' নন, পুত্র হলেও 'আমার' পুত্র' নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পতিই হোক, পুত্রই হোক, জায়াই হোক, যা-কিছু হোক না কেন তারা 'আমার' অর্থাৎ 'নিজের' হলে তবেই প্রিয়, নতুবা নয়। সুতরাং নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে যে, এই যে 'আমার' বা 'নিজের' বলে যে 'আমি' টিকে বলা হচ্ছে সেই 'আমি' বা 'নিজ' বস্তুটিকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। সেই 'আমি' বস্তুটি যার সম্পর্কে এসে সবকিছু আমার প্রিয় হয়, যার সম্পর্কে না এলে প্রিয় হয় না, সেই 'আমি' বা 'নিজ' বস্তুটি যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়—প্রিয়তম তা নিঃসন্দেহ।

আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনে এই 'আমি' বা 'অহং'-ই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ (most important factor) এবং প্রিয়তম হয়ে বসে আছে—প্রথমতঃ এইটি—এই fact-টি—মৈত্রেয়ীকে বোঝানোই যাজ্ঞবল্ক্যের এ-সকল উক্তির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। কিন্তু এটাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য—প্রধান বক্তব্য নয়। এটা statement of fact বা বস্তুস্থিতির অনুবাদ মাত্র। যে উপদেশ বা বিধান দেবার জন্য এই অনুবাদ বা statement of fact করলেন তা পরে যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্যই বলবেন।

এখানে মীমাংসা-শাস্ত্রের একটু বিচার্য বিষয় আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। শাস্ত্রে (বা লোকেও) যেখানে যা-কিছু বলা হয়, তার কতকাংশ অনুবাদ অর্থাৎ বস্তুস্থিতির কথন (statement of fact)। আর কতক অংশ বিধান বা বিধি (instruction, injunction)—অর্থাৎ আমাদের যা করা উচিত বা করতে হবে, তার কথন। সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—'প্রাঙ্মুখো ভুঞ্জীত'—পূর্বমুখ হয়ে খাবে। এখানে যদিও বিধির বোধক

বিধিলিঙ্ 'ঈত্' (ভুঞ্জীত) প্রত্যয়টি রয়েছে ভোজনার্থবোধক ভুজ্ ধাতুর সঙ্গে ; তথাপি এটি ভোজনের বিধি (উপদেশ) নয়। কারণ ভোজন তো মানুষ ক্ষুধাবশতঃ বা লোভবশতঃই করবে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে মানুষ যে (ক্ষুধাবশতঃ বা লোভবশতঃ) ভোজন করে বা করবে, তা যেন সে পূর্বমুখ হয়ে করে। তাই ঐ বাক্যে প্রাপ্ত (ক্ষুধাপ্রাপ্ত বা রাগপ্রাপ্ত) ভোজনের অনুবাদ করে প্রাঙ্মুখত্বের বিধান দেওয়া হয়েছে, ভোজনের বিধান নয়। তেমনি যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে—"আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"—আত্মার (নিজের=অহং-এর) প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই সবকিছু প্রিয় হয়—এই বস্তুস্থিতির (fact-এর) অনুবাদ করে (এটা কোন বিধান বা philosophy নয়) পরে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিয়েছেন—বিধান করেছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—হে মৈত্রেয়ি, এমন (গুরুত্বপূর্ণ, প্রিয়তম) যে আত্মা তাকে জানতে হবে। কেন? তাকে তো 'অহং' বলে, 'আমি' বলে সবাই জানি। না, এ জানাতে অনেক গলদ আছে। আরোপ বা অধ্যাস রয়েছে। প্রকৃত স্বরূপে তাকে জানতে হবে। আমরা 'আমি' বলে যে আত্মাকে জানছি সেটা অধ্যস্ত অর্থাৎ অধ্যাস-যুক্ত আত্মা। অহংকার ইন্দ্রিয় দেহ প্রভৃতির মধ্যে আরোপ করে বা সীমাবদ্ধ করেই আত্মাকে 'অহং' বলে জানছি। আত্মার প্রকৃতস্বরূপ জানতে পারছি না। আত্মাকে (জীবাত্মাকে) তার প্রকৃতস্বরূপে জানতে হবে। কি উপায়ে জানা যাবে? তার উপায়রূপে বিধান করা হচ্ছে—"শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তা 'শ্রোতব্যঃ'—শ্রবণ করতে হবে—শ্রুতিবাক্য থেকে, গুরুবাক্য থেকে। শ্রবণ করে সেই বাক্যসমূহের তাৎপর্য নিশ্চয় হবার পর 'মন্তব্যঃ'—মনন করতে হবে যুক্তির দ্বারা। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু মননের ইচ্ছা ও মননশক্তি বিদ্যমান। সেটা প্রয়োগ না করলে, সেটা তৃপ্ত না হলে মানুষ অগ্রসর হতে চায় না। তাই শ্রবণের দ্বারা যা জানা গেল মননের দ্বারা—যুক্তির দ্বারা সেটা অসম্ভব নয়—যুক্তিযুক্ত; সেটা বুঝতে হবে। তাই বেদান্তে বলা হয় সে অসম্ভবনা-বুদ্ধি দূর করবার জন্যই মনন প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের দ্বারা বুঝলাম যে, আমাদের এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়-দ্বারা, বা অহমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই আত্মা সবকিছুরই আত্মা—সর্বব্যাপী। "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা"[১]—এই যা-কিছু আছে—সবই আত্মা। সুতরাং এই আত্মাকে জানলেই সবকিছু জানা হয়ে যায়। যুক্তি দিয়েও বুঝলাম—এটা অসম্ভব নয়, যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তবু চিরকাল এই দেহ, ইন্দ্রিয় বা অহংকেই আত্মা মনে করে এসেছি ; সেই সংস্কার তো অত্যন্ত প্রবল। কার্যকালে সেই সংস্কারই প্রবল হয়ে দেহ, বা ইন্দ্রিয়, বা অহংকেই আত্মা বলে ভেবে বসে বিকারগ্রস্ত হই। এই বিপরীত সংস্কার দূর করবার জন্যই 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—ধ্যান করতে হবে। শ্রবণ করা ও মনন করার পর সেই শুদ্ধমুক্ত-সর্বব্যাপী আত্মতত্ত্বের ধ্যান করতে হবে। এই ধ্যানকে সার্থক হতে হলে—অর্থাৎ বিপরীত সংস্কার দূর করে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করতে হলে—যোগশাস্ত্রোক্ত যম, নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে। এই ধ্যানেই—নিদিধ্যাসনেই—যোগশাস্ত্রের উপযোগিতা। যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ), নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান) প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত বিশেষ শুদ্ধ না হলে সাধারণভাবে ধ্যান করেও বিপরীত সংস্কার দূর হয়ে আত্মার শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বব্যাপীস্বরূপের উপলব্ধি হয় না।

আত্মার এই স্বরূপের কথা, এই স্বরূপের উপলব্ধির কথা, আত্মার প্রিয়তমত্বের কথা, আত্মোপলব্ধির উপায় বা সাধনের কথা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে বলে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের দুটি অধ্যায়ে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পুনরুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাই এই সংবাদের ওপর শ্রুতির বিশেষ আদর সূচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি—এই সংবাদটি যথাযথভাবে জানলেই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য জানা হয়ে যায়।

এই সংবাদের তাৎপর্য-বিষয়ে ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মসূত্রে (১।৪।১৯) একটি অধিকরণ (প্রসঙ্গ) রচনা করেছেন। সেইটি অধ্যয়ন করলেই প্রবন্ধে

১ বৃহদারণ্যক, ২।৪।৬

উক্ত যে তাৎপর্য দেখানো হলো, তা স্পষ্টরূপে বোঝা যাবে। সেখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই যে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বলা হয়েছে, এ কোন্ আত্মা ? সংসারী আত্মা, না শুদ্ধ পরমাত্মা। পূর্বপক্ষে বলা হয়েছে যে, এটি সংসারী আত্মাই হবে; কারণ, পতি জায়া পুত্র প্রভৃতি তো পরমাত্মার প্রিয় হয় না. পরমাত্মার কামনাও হয় না। সংসারী (জীব) আত্মারই কামনা থাকে বা কোন কিছু প্রিয় হয়। সুতরাং সেই আত্মাকেই 'দ্রষ্টব্যঃ' বলা হয়েছে। অপরপক্ষে বলা যেতে পারে যে, সংসারী আত্মাকে দর্শন করে তো অমৃতত্ব লাভ হতে পারে না! অথচ উপক্রমে "অমৃতত্বের সাধন বলুন" একথা বলে, এবং উপসংহারেও—"এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্"—এই অমৃতত্ব-লাভের কথা—একথা বলে তো পরমাত্মজ্ঞানেরই সূচনা করেছেন। সংসারী আত্মার জ্ঞানের দ্বারা তো অমৃতত্বলাভ হয় না। এসকল সংশয়ের সমাধান করে, সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, জীব ও ব্রহ্মের (পরমাত্মার) অভেদ বোঝাবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে সংসারী আত্মার অনুবাদ করে, তার পরমাত্মত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। এইসকল তাৎপর্য অনুশীলন না করে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে অনেকে—"আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"—এইসকল শ্রুতির অর্থ করেন—আত্মার জন্য—অর্থাৎ ভিতরে আত্মা আছে বলে, সবকিছু প্রিয় হয়। আত্মা আছে বলে পতি প্রিয় হয়, জায়া প্রিয় হয় ইত্যাদি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই অর্থ যথাযথ নয়, শ্রুতি বা যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রেতও নয়। আত্মা আছে বলে পতি, জায়া প্রভৃতি প্রিয় হয়—এটা বস্তুস্থিতি বা fact হলে, অপ্রিয়জনের—শত্রুর ভিতরেও আত্মা আছে বলে অপ্রিয়জন বা শত্রুও আমাদের প্রিয় হতো। কিন্তু তা তো বস্তুস্থিতি (fact) নয়।

কেউ বলতে পারেন ভিতরে আত্মা আছেন বলে শত্রুও প্রিয় হওয়া উচিত ; তাহলে সেটা তো ঔচিত্য (বিধান) হলো, fact তো নয়। অধিকন্তু 'আত্মনস্তু কামায়' শব্দের স্পষ্টার্থ আত্মার কামনাবশতঃ—আত্মার কামনার জন্য। 'আত্মার অস্তিত্বের জন্য'—এরূপ অর্থ হয় না। জীবাত্মার বা অহমের কামনা-সিদ্ধির জন্য সবকিছু প্রিয় হয়—এই হলো যথাযথ অর্থ। আরও লক্ষণীয় যে, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মশব্দ শুদ্ধাত্মা বা পরমাত্মাকে বোঝাতেই পারে না। কারণ, শুদ্ধাত্মার বা পরমাত্মার কিছুই তো প্রিয় (বা অপ্রিয়) হয় না—"অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ"—এই হলো বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। সুতরাং এখানে যেহেতু সকল পর্যায়েই আত্মার 'প্রিয়' হবার কথা রয়েছে—তখন 'আত্মা' শব্দটি জীবাত্মা বা 'অহম্' আত্মাকেই বুঝিয়েছে। সেই জীবাত্মার প্রথমে উল্লেখ (অনুবাদ) করে তার পরমাত্মত্ব উপদেশের জন্যই এই সংবাদ। তাই 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা'তে অতিসংক্ষেপে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

"সংসারিণমনূদ্যাতঃ পরেশত্বং বিধীয়তে ॥"

(১।৪।৬)

—সংসারী জীবের অনুবাদ করে তার পরমাত্মত্ব বিধান করা হয়েছে। তবে এই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপকে—পরমাত্মস্বরূপকেই জানতে বলা হয়েছে। অমৃতত্বলাভের জন্য বিহিত উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, শাংকরবেদান্ত মতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র বলে জ্ঞানের বিধি হতে পারে না ; শ্রবণাদিরই বিধি। সেগুলি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হলে জ্ঞান হয়েই যাবে। পুরুষের ইচ্ছাধীন ক্রিয়াতেই বিধি হতে পারে। জ্ঞান পুরুষেচ্ছাধীন ক্রিয়া নয় ; সুতরাং বিধির বিষয় হতে পারে না। জ্ঞানের উপায় বা সাধন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনেরই বিধি।



নববর্ষ

মধুসূদন পাল

যত পাপ মলিনতা সব মুছে দিয়ে
জীবনের হ্রদে খুশি-আলোড়ন নিয়ে
কল্পনা নীল-চোখে নিয়ে আশা-হর্ষ
খুশি-চিতে ধরণীতে এল নববর্ষ।

রোদঝরা আকাশের স্নেহ ঝরনায়
মাটি স্নান করে পাখি জয়গান গায়।
বাতাসে প্রাণের শব্দ-প্রহেলিকা ছোটে;
মানুষের মনে আশা, ভাষা-ফুল ফোটে।

স্বামীজী

শান্ত রায়

ধূপ জেবলে, প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
ছোট্ট ঘরে আমি আপনার আরতি করি।

আমার বুক ভরে গেলে
টের পাই
আপনার শ্বাস
হৃৎপিণ্ডের শান্ত ওঠানামা।

পরিব্রাজক বেশে আপনাকে দেখি—
হেঁটে যাচ্ছেন ঊর্ধ্বশির
মহাসমুদ্রের পারে।

বিভুপ্রসাদ বসু

এঁকেছি তোমারে রঙে কি সাহস সাজায়েছি পটে,
তুলির প্লাবন টানে তুলেছি ও শ্রীতনু ফুটায়েঃ
পলকে কখন এলে বুঝিনিকো নেমে পায়ে পায়ে
ঝলসিত মহিমায় ধূলিময় ধরণীর তটে।
এলে রসঘন কাছে—ধ্যানাতীত কত না নিকটে,
কি জানি কি দেখি চোখে
নিরুপায় নিজেরে হারায়ে—
এসেছি প্রান্তর পথ মরু বন অনেক পেরিয়ে,
জড়ানো এখনো ছায়া জীবনের শাখাময় জটে।

আছি চেয়ে অপলক প্লাবনের টানে ছোঁয়া তুলি,
ওঠে জ্বলে রঙে রঙে অপরূপ অরূপের শিখা—
নিচে মৃত্তিকায় পথ খোঁজে গাঢ় তরু শতমূলী,
বাহির অরণ্যে কাঁপে কিছু শ্যাম জীবন-কণিকা।
নিশ্চল ও পটে ধীর ধ্যান-আঁখি বুঝি যায় খুলি,
পায় ভাষা বর্ণে রাগে মনোময় এ মর তুলিকা।

সঙ্কেতে, সঙ্গতে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

বস্তু থেকে যেভাবে অপাবৃত দীর্ঘ তপস্যার শেষে প্রাণ
যেভাবে উন্মেষ লাভ করে প্রাণ গূঢ় চেতনায়
পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যেভাবে হঠাৎ কাঁপে চেতনার ঢেউ
সেভাবে আবার কোন সময়ের অশেষ সীমায়
চেতনা হঠাৎ যদি পুষ্পের মতন অন্য কিছু!
গানের মতন কিংবা অবিরত ভ্রমরের শব্দের মতন…
কিংবা তার অন্য কোন নাম হবে,
বোধি নয় অনুভবও নয়?
অথচ তখনো আমি হয়তো আশ্চর্যভাবে আছি;
সে-মুহূর্তে নদীগুলো নদী নয়,
বৃক্ষগুলো ঠিক নয় বৃক্ষের মতন,
অথচ তখনো সেই বৃক্ষ নদী বাতাস আলোক
অন্যপ্রবাহের মধ্যে থেকে যাবে অন্য কোন নামে
এবং আমিও আছি সেসময়ে; বস্তু নয় প্রাণ নয়
চেতনাধারায় নয়, অন্য কোন আলোকের
ভাষাহীন সঙ্কেতে, সঙ্গতে।

রাত্রির গভীরে

নমিতা ঘোষ রায়

রাত্রির গভীরে,
দূরে দিগন্তের এক তারা,
ঈশারায় ডাকে।
তখন দরজা বন্ধ, হঠাৎ হাওয়ায়,
জানালার পর্দা উড়ে যায়,
দেহভারহীন সত্তা—
নীলাভ আলোর পথ বেয়ে,
জ্যোৎস্না পেরিয়ে,
আরো দূরে পেঁছে যায়,
মায়ার অতীত লোকে।
সেখানে তো নেই নীলাকাশ,
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ আর তারা
আছে শুধু কায়াহীন ছায়াহীন
এক অপরূপ জ্যোতির উদ্ভাস।
সেথা নিত্য বহমান,
অনাদি অনন্ত মহাকাল ;
অরূপ অমৃত-স্রোতে,
সহসা প্রকাশ লভে,
আনন্দস্বরূপ অচঞ্চল।

অপরিচিতি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জিজ্ঞাসা মনের প্রশ্ন—
অথবা অজানার অনুসন্ধান।
কেন বলে থমকে থাকা—
অথচ দুচোখে জানার সমুদ্র।

কি কথাটা ঠোঁটের ফাঁকেতে ফসকে
ছিটকে আসছে কিন্তু আসলে অজ্ঞাত।
কোথায় ভাবনার ঢেউ—
আশ্চর্য সেখানেও থাকছে অজ্ঞাতির অপরিচয়।

কিসের আগ্রহ জাগছে আচমকা
আগাম না জেনেও অনুসন্ধিৎসু।
কার আসল সহায়তা চলমান
জেনে রাখা মনে হয়—তথাপি জহুরী-বিচার।

কেউ হাত ধরে পথ পার করে দেয়
পথিককে দীর্ঘজীবনে অথচ ছিল চেনার চিহ্ন।

কোন চিন্তার বেজায় বেগতিক উদ্ভব
অথাতো অধিকন্তুর দশদিক দৃষ্টিপাতের কচ্ছপ-মুখ।
যার কাছে প্রাণ আছে
হয় তো প্রয়োজনে পথ যে দূরের মতো অধরার।

সম্পর্ক

জয়নাল আবেদীন

রাতের জানলা খুলে খিলখিল হেসে ওঠে কে ?
ঈশ্বরের দূত।

আকাশে অসংখ্য মেঘ, মেঘের পাহাড়
সরলতায় বেঁধে নেয় চুল,
দেবদূতের হুঙ্কার ওদের থামাতে পারে না।

ভালবাসার কথা উঠলেই বুকের মধ্যে ভালবাসা
দানা বাঁধে, চোখের মধ্যে নক্ষত্রের নীল দিগন্ত।
রাতের জানলা খুলে খিলখিল হেসে ওঠে কে ?
ঈশ্বরের দূত।

আমি ঘুমোতে চাই, ঘুমোতে পারি না
দেবদূত আমাকে ঘুমোতে দেয় না
ঈশ্বরকে আমার নামে দুঃসংবাদ পাঠায়।

প্রেমে ও আগুনে

শিবসৌম্য বিশ্বাস

মানুষের সব সৌন্দর্য বহন করে
চলেছ তুমি স্বামীজী,
চলেছ তুমি মানুষেরই জন্যে
চলেছ তুমি সামনের দিকে ক্রমাগত
যোগ্য বাসভূমির সন্ধানে।
সহস্র বছরের বঞ্চনা, দুঃখ, কষ্টের ঝাঁপি খুলে
দেশ-দেশান্তরের মানুষের বুকে
প্রেমে ও আগুনে এঁকে দিয়েছ আলপনা।
বর্ণহীন গোত্রহীন মানুষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
'বিশ্ব-নীড়' উন্মোচনে
জীবনবেদ থেকে জীবনবোধে উত্তরণে
তোমারই জয়গানে
আগুনে-ফুলে রাঙা হয়ে উঠছে সব সকাল।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সংসার

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় আছে, তাঁরা ৬ জুলাই সন্ধ্যায় ওখানে পেঁৗছেছিলেন। কিন্তু মেরী লুইস বার্কের (সিস্টার গার্গীর) অনুসন্ধানে বেরিয়েছে, ঐ সন্ধ্যায় ওখানে কোন বৃষ্টি হয়নি। স্থানীয় নথিপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী বেশ কয়েক সপ্তাহ খরা চলার পর ঐ বছরে ওখানে প্রথম বৃষ্টি হয়েছিল ৮ জুলাই সন্ধ্যা ৮টার পরে (Watertown Times-এর রিপোর্ট অনুযায়ী)। লুইস বার্কের মতে ৮ জুলাই সন্ধ্যায়ও ঐ দুই নারী ওখানে পেঁৗছাননি; কারণ ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, লিয়ঁ ল্যান্ডসবার্গ তাঁদের আগে থেকেই ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানি, ল্যান্ডসবার্গ ১১ জুলাই-এর আগে ঐ দ্বীপে পেঁৗছাননি এবং তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা হয়েছিল ২২ জুলাই, সোমবার (ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় যার উল্লেখ আছে 'আগামী সোমবার' বলে)। ১৯ জুলাই শুক্রবার ২০ জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছিল। এই দুটি তারিখের মধ্যে কোন একটিতে ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিন দ্বীপে এসে পেঁৗছেছিলেন। সিস্টার গার্গীর (মেরী লুইস বার্কের) সিদ্ধান্ত, ১৯ জুলাই সন্ধ্যাতেই তাঁরা এসেছিলেন; কারণ ২০ জুলাই-এর সকালের ক্লাসের যে বর্ণনা Inspired Talks-এ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার বিবরণ অনেক জায়গায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। এছাড়া, ঐ স্মৃতিকথায় ২০ জুলাই-এর পূর্বের কোন ক্লাস বা ঘটনার উল্লেখ নাই। মেরী ফাঙ্কির স্মৃতিচারণ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে। তাতেও প্রথম যে তারিখের উল্লেখ আছে তা হলো ঐ ১৯ জুলাই, ১৮৯৫। সুতরাং সবদিক মিলিয়ে দেখলে ১৯ জুলাই ১৮৯৫ সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা যখন তাঁরা তাঁদের গুরুকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পরে পেঁৗছালেও কিন্তু তাঁদের কোন লোকসান হয়নি। স্বামীজীর দিব্যপ্রভায় তাঁরাও সমভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। ক্রিস্টিন লিখছেন: পরে কোন এক সময়ে স্বামীজী তাঁদের বলেছেন, সহস্রদ্বীপোদ্যানেই তিনি তাঁর সেরা আধ্যাত্মিক অবস্থায় ছিলেন।

ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিন স্বামীজীর বক্তৃতা প্রথম শোনেন তাঁদের নিজেদের শহর ডেট্রয়েটে ১৮৯৪-এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। তখন তিনি সেখানে আটটি public lecture দিয়েছিলেন। তার প্রতিটিতেই এই দুই বন্ধু যোগ দিয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় তখন তাঁদের হয়নি। তারপরে দীর্ঘদিন তাঁরা তাঁর কোন হদিস পাননি। এক বছরেরও কিছু বেশিদিন বাদে জনৈক বন্ধু তাঁদের জানান, স্বামীজী তখনও আমেরিকাতেই আছেন এবং সহস্রদ্বীপোদ্যানে গ্রীষ্মযাপন করছেন। এ-সংবাদ জানা মাত্র তাঁদের সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যায়—৫০০ মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে তাঁরা রওনা হন। এই দুই ডেট্রয়েট-তরুণীই স্বামীজীর নিকট বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে ক্রিস্টিনের পবিত্র চিত্ত, মৃদু প্রকৃতি ও ত্যাগী স্বভাব দেখে স্বামীজী প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন—উনি তাঁর ভারতীয় কার্যে সহায়িকা হবেন। আবার মেরী ফাঙ্কির যে অন্য পথ তাও বুঝেছিলেন। মেরীর রোমান্টিক কল্পনা ছিল, হিমালয়ের গুহায় যোগিনীর বেশে কাল কাটাবেন। স্বামীজী তাঁর জন্য নির্দেশ দেন: "তুমি গৃহী; ডেট্রয়েটে ফিরে যাও, তোমার স্বামী ও পরিবারের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে। আপাতত তোমার ঐ পথ।" পরে নিজমুখে মেরী কবুল করেছেন, স্বামীজীই ঠিক এবং তাঁর নিজের ধারণা ভুল ছিল। তিনি সুন্দরী ছিলেন—আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, বয়সে ক্রিস্টিনের থেকে খানিকটা বড়। পরবর্তী কালে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, বিধবা হন এবং একটি কন্যা রেখে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তাঁর চিঠিপত্র,

স্মৃতিচারণ ও ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন আশাবাদী, আনন্দোচ্ছল, কৌতুক-প্রিয় ও পরোপকারী। ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীকে খুঁজে বার করার মূল কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। ডাচারের কুটিরদ্বারে প্রথম করাঘাত করা এবং নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে যাওয়া,এও তাঁরই। দীর্ঘদিন পরে স্বামীজী ক্রিস্টিনের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "Mrs. Funke is a jewel—all blessings on her. (মিসেস ফাঙ্কি এক রত্নবিশেষ—তাঁর প্রতি অজস্র আশীর্বাদ)।

ফাঙ্কির মতো ক্রিস্টিনেরও অদম্য তেজ, সাহস ও বিনয় ছিল; কিন্তু তাঁর মতো সহজ, সাবলীল আনন্দোচ্ছলতা ছিল না। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী বশী সেনের বাড়িতে ক্রিস্টিন কিছুকাল ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ক্রিস্টিনের জীবনধারা কেমন ছিল তার বিবরণ কেবল বশী সেনের লেখাতেই পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই বশী সেন ক্রিস্টিনের মুখেই এসব কথা শুনেছিলেন। তাতে জানা যায়, ক্রিস্টিনের পিতা ছিলেন জার্মান—ফ্রেডারিক গ্রীণ-স্টাইডেল, নুরেমবার্গের বাসিন্দা। ক্রিস্টিনের জন্ম সেখানেই ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ আগস্ট। তিন বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা সপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং ডেট্রয়েটে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বাল্যকাল খুব সুখে কেটেছিল। পিতা ছিলেন বিদ্বান, স্বাধীনপ্রকৃতি এবং উদারচেতা। ক্রিস্টিনের চোখে তিনি দেবতুল্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিষয়-বুদ্ধির বেশ অভাব ছিল; ফলে সমস্ত সঞ্চয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি হারিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাত্র ১৭ বছর বয়সের সময় ক্রিস্টিনের স্কন্ধে এসে পড়ল গুরু দায়িত্ব—তাঁর মা ও চারটি ছোট বোনের ভরণপোষণের ভার একা বহন করার। ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করে তিনি সংসার চালাতে লাগলেন। সেই থেকে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল নিরন্তর সংগ্রাম এবং আত্মবিলোপের। স্বভাবতই তাঁর মধ্যে একটা অন্ত-র্মুখীনতা ও বিষাদের ভাব দেখা দিয়েছিল; কিন্তু এর সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিল এক অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি। বশী সেন লিখছেন, ক্রিস্টিন তাঁর প্রথম জীবনের গোঁড়া গীর্জাপ্রীতি কাটিয়ে উঠে ডেট্রয়েটের প্রথম খ্রীস্টান সায়েন্টিস্টদের অন্যতমা হন। অন্যান্য ধর্মীয় শাখাতেও তাঁর বিচরণ ছিল। ১৮৯৫-এ স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছু পূর্বে তিনি ডেট্রয়েটে মিসেস পিক নাম্নী এক ভূতপ্রেত আনয়নকারী ওঝার পাল্লায় পড়েছিলেন। সুতরাং সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর ক্লাসগুলিতে যখন শুধু ঈশ্বর, যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতির আলোচনাই শুনতে থাকলেন (ভূত-প্রেতের নামগন্ধও ছিল না তাতে), তখন অতিশয় আশ্বস্ত ও তৃপ্ত হলেন।

২০ জুলাই শনিবার সকালে ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিন মিস ডাচারের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার পরের দিন বিকালেই (অর্থাৎ ২১ জুলাই) স্বামীজী তাঁদের বলেন, তিনি তাঁদের যথেষ্ট ভাল জানেন না বলে পরদিন (২২ জুলাই) ল্যান্ডসবার্গের দীক্ষার সময় তাঁদেরও দীক্ষা দেবেন কিনা স্থির করতে পারছেন না। তবে তাঁদের যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে তো তিনি তাঁদের মানসিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখবার চেষ্টা করতে পারেন (ধ্যানে)। তিনি আরো বলেন, এই বিশেষ ক্ষমতা তাঁর আছে; কিন্তু কালেভদ্রে তা ব্যবহার করে থাকেন। ওঁরা সাগ্রহে তাতে সম্মতি দেন। স্মৃতিকথায় ক্রিস্টিন লিখছেন, স্বামীজী তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্ব-পূর্ণ বা তুচ্ছ যা-কিছু তখন বলেছিলেন তা প্রায় সবই অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ক্রিস্টিন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যাবে। বশী সেন (যিনি ক্রিস্টিনকে মাতৃসম্বোধন করতেন) আরও লিখেছেন, স্বামীজী ক্রিস্টিনকে আরও জিজ্ঞেস করেন, "তোমার ভবিষ্যৎ সবটাই কী বলব?" তিনি তাতেও সায় দিলে স্বামীজী নাকি বলে ওঠেন, "সাবাস মেয়ে! তোমার আর তিনটি মাত্র আবরণ সরে যাওয়া বাকি; এজন্মেই তোমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে।" পরের দিনই স্বামীজী তাঁকেও দীক্ষা দেন। তবে সন্ন্যাসদীক্ষা নয়।

মিস ওয়াল্ডোর স্মৃতিচারণায় পাই, সহস্রদ্বীপে তখন সমবেত সমস্ত শিষ্য-শিষ্যাদেরই স্বামীজী ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দিয়েছিলেন। একদিন প্রত্যূষে সূর্যোদয়-

কালে হোমাগ্নি জেনলে সামান্য উপকরণ ও পুষ্প সহযোগে অনাড়ম্বরভাবে এ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছিল। যে সাত সপ্তাহ স্বামীজী ওখানে কাটিয়েছিলেন তার বিবরণ প্রধানতঃ পাওয়া যায় তিনকন্যার স্মৃতিকথা থেকে—এলেন ওয়াল্ডো, মেরী ফাঙ্কি ও সিস্টার ক্রিস্টিন। এছাড়া, স্বামীজীর এই সময়কার কিছু চিঠিপত্রও আলোকপাত করেছে দিনগুলির ওপর।

সহস্রদ্বীপে পেঁছিার ঠিক পরদিন (১৯ জুন) থেকেই স্বামীজী ক্লাস শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যে ঘরটিতে থাকতেন তার ঠিক নিচের নবনির্মিত ঘরটিতেই ক্লাসগুলি হতো। অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে যে, প্রথম ক্লাসগুলিতে হাজির থাকতেন মাত্র চারজন—মিস ডাচার, মিস ওয়াল্ডো, মিস রুথ এলিস ও ডঃ ওয়াইট। ঘরটি ছিল বেশ বড় এবং আলোয় ভরা। পাঁচটি লম্বা জানলা দিয়ে বাইরের ঘন গাছপালাগুলি দেখা যেত। পাশের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি বারান্দা এবং আর এক পাশের দরজা দিয়ে বৈঠকখানায় (parlour) পেঁছানো যেত। স্বামীজীর বসার চেয়ারটি ঠিক কোথায় রাখা হতো তা জানার উপায় এখন আর নেই। অবশ্য আলোচনার সময় তিনি কখনই বসে থাকতেন না, ক্রমাগতই পায়চারি করতেন। সমস্ত ঘরটাই যেন তাঁর dias-এ পরিণত হতো। তাঁর চিন্তারাশির শক্তিই যেন তাঁকে সারা ঘরময় পরিক্রমা করাতো।

প্রথম দিন সকালে তিনি একখানা বাইবেল হাতে ক্লাসে ঢুকেছিলেন। শিষ্য-শিষ্যারা সবাই খ্রীস্টান; সুতরাং ওঁদের শাস্ত্রগ্রন্থ দিয়ে আলোচনা শুরু করা সমীচীন মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি বাছাই করে নিয়েছিলেন Gospel of St. John। অচিরেই কিন্তু তাত্ত্বিক দিক দিয়ে খ্রীস্টধর্ম ও বেদান্ত একাকার হয়ে দাঁড়াল। সিস্টার গার্গীর বর্ণনায় পাই: "Religion itself, unlabelled and eternal, poured from his lips—and for forty-three morning classes thereafter it continued to be so." (নিরুপাধিক শাশ্বত ধর্ম তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এবং তার পরে একাদিক্রমে তেতাল্লিশটি প্রাতঃকালীন ক্লাসেও তাই হতে থাকল)। অবশ্যই মিস ওয়াল্ডো তাঁর long hand-এ (তিনি short hand জানতেন না) স্বামীজীর বাক্‌নির্ঝর সম্পূর্ণরূপে ধরে রাখতে পারেননি তাঁর Inspired Talks-এ। তবুও যা রেখেছেন, তা-ও বিস্ময়কর। অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। তিনি শুধু সকালের ক্লাসগুলিরই নোট রেখেছিলেন—তা-ও সবদিনের নয়। সন্ধ্যার পরও প্রতিদিনই আলোচনা হতো। যথার্থ শিষ্য রূপে তাঁদের ধরে নিয়েছিলেন বলে যখনই সুযোগ মিলত তখনই স্বামীজী কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন, দিতেন নিজেকে উজাড় করেই। তবে সকালের ক্লাসগুলিতেই তাঁর শিক্ষার সেরা অংশ থাকত। বলতে গেলে পাশ্চাত্যের প্রতি স্বামীজীর বাণীর সারাংশ ঐ Inspired Talks-এ নিহিত আছে।

মিস ওয়াল্ডো কিন্তু ক্লাস-নোটগুলি প্রকাশ না করে তাঁর নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। মিস লরা গ্লেন (পরবর্তী কালে সিস্টার দেবমাতা) তাঁর কাছে এগুলোর পাঠ শুনে বলেন: "It is criminal for you to keep these notes to yourself; they belong to the world." (এই নোটগুলো তোমার কাছেই রেখে দেওয়া অপরাধ; এগুলো তো সারা পৃথিবীর সম্পত্তি)। ওয়াল্ডোর দ্বিধা ও কুণ্ঠা ছিল এই কারণে যে, তিনি স্বামীজীর অপূর্ব ভাব ও বাণী সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর ধারণায় এরা বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে; সুতরাং প্রকাশ সঙ্গত নয়। মিস গ্লেনের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি নোটগুলি তাঁকে দিয়ে দেন। গ্লেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এগুলির সম্পাদনা শেষ করেন এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। স্বামী আত্মঘনানন্দ ঐ ক্লাসগুলোর আর এক দফা নোট আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন ('Further Light on Swami Vivekanand's Inspired Talks', Vedanta Kesari, 1963)। এই নোটগুলোর লেখক-লেখিকার নাম জানা যায়নি। এগুলো খানিকটা বিক্ষিপ্তও বটে। মিস ওয়াল্ডোর নোটগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এই নোটগুলিতে ভাষার খানিকটা তারতম্য দেখা যায় এবং স্বামীজীর

বাণীর শক্তি ও সজীবতা আরও বেশি পরিস্ফুট হয়। ঐ দ্বিতীয় দফার নোটগুলির শুরু কিন্তু ২ জুলাই থেকে (ওয়াল্ডোর নোট ১৯ জুন থেকে)। এখন প্রশ্ন হলো—ঐ নোটগুলি কার লেখা! যাতায়াতের তারিখ বিচার করলে এতে দুইজনের একজনই এই সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে—হয় স্টেলা, নতুবা অজ্ঞাতপরিচয় দ্বাদশ সংখ্যক শিষ্য (unidentified student)। স্টেলাকে অবশ্য সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে; কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে, তিনি নিয়মিত ক্লাসেই আসতেন না। ক্লাসে না এলে স্বতন্ত্রভাবে নোট নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং বাকি থাকেন ঐ অজ্ঞাতনামা শিষ্যটি। ২ জুলাই থেকে ১০জুলাই দুদফা নোটগুলিতে ভাষাগত তারতম্য বেশি লক্ষণীয়, তারপর থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় হুবহু এক। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, ১০ জুলাই পর্যন্ত অজ্ঞাতনামা শিষ্যটি স্বতন্ত্রভাবে নোট নিয়েছিলেন এবং সহস্রদ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার দরুন পরের নোটগুলো মিস ওয়াল্ডোর কাছ থেকে পরে সংগ্রহ করেছেন (অথবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ৬ আগস্ট পর্যন্ত দ্বীপেই ছিলেন; কিন্তু কোন কারণে স্বতন্ত্রভাবে আর নোট নেননি)।

আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য সিস্টার গার্গী স্বামীজীর প্রাতঃকালীন ক্লাসগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্ব—১৯ জুন থেকে ৫ জুলাই; দ্বিতীয় পর্ব—৬ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই এবং তৃতীয় পর্ব—২০ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট। প্রথম পর্বে শিষ্য সংখ্যা—৩।৪; দ্বিতীয় পর্বের গোড়ায় ৬।৭ এবং বাকি দিনগুলিতে অন্যান্যদের আনাগোনা। তৃতীয় পর্বেই শেষ দুই শিষ্যার (ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিনের) আগমন ও যোগদান।

সিস্টার গার্গী একটি সংক্ষিপ্ত (এযাবৎ অপ্রকাশিত) পত্র আবিষ্কার করেছেন। এটি রুথ এলিস লিখে-ছিলেন তাঁর বন্ধু সারা বুলকে অন্টারিওর কিংসটন থেকে—তারিখ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ আগস্ট। এতে তিনি লিখছেন, স্বামীজী শিকাগো যাওয়া তখনকার মতো তিনি স্থগিত রাখায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে আরও এক সপ্তাহ বেশি থাকতে পেরেছিলেন। তিনি ৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৮টা ৪৫ মিনিটে নিউ ইয়র্ক রওনা হয়ে যান। রুথ তার পরের দিন (অর্থাৎ ৭ আগস্ট) সকালে কিংসটনে চলে আসেন। ঐ চিঠিতে তিনি আরও লিখছেন: "মিস ডাচারের কুটিরে আমাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা কখনো আটের কম ছিল না, মাঝে মাঝে দশ বা বারোতেও পৌঁছাত।" রান্নার সরঞ্জামের খুবই অপ্রতুলতা ছিল। সাহায্যকারিণী হিসাবে ছিল মাত্র একটি তরুণী পরিচারিকা। সুতরাং ক্লাস ও আলোচনার সময়ছাড়া দিনের বাদবাকি সময় তাঁদের গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতে হতো। বিভিন্ন মানসিকতার অধিকারী এই শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে এটা একটা পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। এলিস বলছেন, এতৎসত্ত্বেও সংঘর্ষ নয়, বরং বেশি বন্ধুত্বের ভাব হৃদয়ে নিয়েই তাঁরা দ্বীপ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। পুরো সময়টাই স্বামীজী ওখানে খুব আনন্দময় চিত্তে ছিলেন—তার স্পর্শ ওঁদেরও লেগেছিল।

একদিন দ্বীপের বিখ্যাত উপাসনা-তাঁবুটিতে (Tabernacle) রোববার সকালের প্রার্থনা সভায় মিস ডাচারের সঙ্গে স্বামীজীও যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন ছিল চাঁদা আদায়ের বিশেষ দিন। পাদরি সাহেব উপস্থিত সবাইকে রহস্য করে অনুরোধ করেন, যাঁর পকেটে যা মুদ্রা আছে প্রত্যেকে যেন তাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই ১০ সেণ্ট, কেউ বা বড় জোর ৫০ সেণ্ট চাঁদার পাত্রে জমা দিলেন। স্বামীজী কিন্তু অম্লানবদনে তাঁর পকেট থেকে কয়েকটি ডলার (প্রতিটি ১০০ সেন্ট মুদ্রা) বার করে ঐপাত্রে রাখলেন। তাই দেখে মিস ডাচার তো স্তম্ভিত; তিনি ফিসফিস করে স্বামীজীকে বললেন: "আপনি অতগুলো মুদ্রা কেন দিতে গেলেন! স্বামীজী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: "বাঃ! লোকটি যে বললে, যাঁর যা পকেটে আছে সব দিয়ে দিতে। আমার পকেটে যা ছিল, তাইতো দিয়েছি!"

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ

কালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রোলাঁর ঘনিষ্ঠ কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬) একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় তিনি তাঁর নানা ভাষণ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থে রেখেছেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার তিনি পরিচালক ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন সম্পর্কেও তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জন্মোৎসব নানা-স্থানে—বিশেষতঃ তাঁর সাধনপীঠ বরাহনগরে—সম্পাদিত হলো। সেই সম্পর্কে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রশ্ন ও সমস্যা, যা নিজের মনে নাড়া দিল —'বসুমতী'র মাধ্যমে সাধারণের কাছে তুলতে চাই। কলিকাতাবাসী আমাদের সেবিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি এবং এই নগরীর—তথা দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের—বিশেষজ্ঞগণও এইসব প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করবেন এটাও আশা করি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মেছেন ২৯ পৌষ ১২৬৯ (জানুয়ারি ১৮৩৬) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি এক বছর ৮ মাসের ছোট। এই দুই মহাপুরুষদের জীবনধারা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা খুব কমই হয়েছে—কেন জানি না। কিন্তু এবার নরেন্দ্রনাথের সিমুলিয়ার জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতিপূজো করতে গিয়ে বাড়ির লোকেদের কাছেই শুনেছি যে, তাঁর পিতা-পিতামহের যুগ থেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দত্ত পরিবারের যোগ ছিল। পরে নরেন্দ্রনাথ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশেছিলেন। ১৮৮১ খৃীস্টাব্দে দেখি কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথ রচিত—'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' গানটি নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে দেখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ (সঙ্গীতজ্ঞ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) ও নন্দলাল সেন (কেশব সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র) ও সর্বোপরি রাখালচন্দ্র (মহারাজ ব্রহ্মানন্দ) ঘোষ—যাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে নরেন্দ্রনাথ সবাইকে এমন মুগ্ধ করেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনতে ব্রাহ্মসমাজে ছুটে এসেছিলেন। ১৮৭৯ থেকেই—অর্থাৎ ১৬ বছরের নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজাদি নানা ধর্মসম্প্রদায়ে যাতায়াত শুরু করেন। তিনি তখন মাত্র এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কয়েক মাস Presidency College-এ F. A. পড়ে পরে General Assembly-তে আসেন ও ঐ কলেজ থেকেই F. A ও B. A (১৮৮১—১৮৮৩) পাশ করেন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পরে তুলনামূলক দর্শনের প্রবর্তক); দুজনেই Rev. Dr. Hastie নামক স্কচ দার্শনিকের শিষ্য; সেকালের কিছু আভাস আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে দিয়ে গেছেন। কিন্তু Presidency ও General Assembly-র খাতাপত্র দেখে কেউ নূতন তথ্য প্রকাশ করেননি। নরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড যুক্তিবাদ—এমন-কি তথাকথিত 'নাস্তিকতা'র কারণও অন্বেষণ করতে হলে, ১৮৭৯—৮৩ খৃীস্টাব্দের পাঠ্যতালিকা ও অধ্যাপকদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা আশু প্রয়োজন। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, খৃীস্টান পাদ্রী Rev. Hastie বোধ হয় জীবন্ত ধর্ম প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ছাত্রদের বলেছিলেন শিক্ষাভিমান-বর্জিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যেতে। সেখানে প্রথম দেখা ১৮৮১ জুন মাসে।[১]

মাত্র পাঁচটি বছর (১৮৮১—৮৬) গুরু-শিষ্যের

১ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে হয়নি, হয়েছিল কলকাতায় ১৮৮১-র নভেম্বর মাসে। বর্তমান প্রবন্ধে সন-তারিখ এবং অন্যান্য তথ্যেও আরো কিছু ভুল আছে। —যুগ্ম সম্পাদক

সম্বন্ধ, অথচ যেন জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা! নরেন্দ্রনাথ জন্মেছেন ১৮৬৩ আর ঠিক তার কুড়ি বছর আগে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সাত বছরে[২] পিতৃহীন গদাধর এলেন নাথের বাগানে তাঁর দাদা রামেশ্বর বা রামকুমারের বাসায় কলকাতাতে। রামকুমার পূজারী ছিলেন ঝামাপুকুরের 'মিত্রবাড়ী'তে ও গোবিন্দ চাটুয্যের মন্দিরে, কিন্তু সঠিক বিবরণী তার সংগ্রহ করা হয়নি। ১২৬২ জ্যৈষ্ঠে (১৮৫৫) রানী রাসমণি করলেন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা। রামকুমার ঝামাপুকুর থেকে কনিষ্ঠ গদাধরকে নিয়ে চলে গেলেন সেখানে; কিন্তু ঐ বছরের শেষে হলো তাঁর মৃত্যু এবং গদাধর—রামকৃষ্ণকেই প্রধান পূজারী করা হলো। এখন থেকে ঠাকুর তাঁর শেষশয্যা গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৮৫৫—১৮৮৫—পুরো ত্রিশটা বছর দক্ষিণেশ্বরের আশে-পাশেই কাটিয়েছেন। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে সারদামণির সঙ্গে বিবাহ এবং ২।৪বার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া ছাড়া—স্থায়িভাবে তাঁর কামারপুকুরে থাকা আর হয়নি। জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীর আগমন (১২৭৮ ফাল্গুন [চৈত্র] ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে)।

তার আগের ১২ বছর (১৮৬০-৭২) ধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কি কঠোর তপস্যা! অন্তরঙ্গদের কাছে তিনি নিজেই বলে গেছেনঃ "বারো বছর কখন সূর্য উঠেছে কখন অস্ত গেছে—কিছুই টের পাইনি। জগৎ-সংসার তো দূরের কথা, নিজের দেহেরই খেয়াল ছিল না।" তান্ত্রিক ভৈরবী যোগেশ্বরী, রামায়েৎ সাধু জটাধারী, ২৯ প্রকার বৈষ্ণবতত্ত্ব সাধন, অদ্বৈত বেদান্তী পাঞ্জাবী তোতাপুরী (১৮৬৪), সুফী গোবিন্দরায় ও ইসলামী সাধনা, যীশুখ্রীস্টের 'পিতা নোহসি' মন্ত্রে আত্মদান, রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা—একে একে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিখিল-ভারতের সাধনস্রোতকে নিজ জীবনে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। শুধু অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পড়েই মনে হয় যেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র জীবন্ত ইতিহাস শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নাস্তিকতার যুগে। সেই বারো বছরের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস লিপিবন্ধ করার মতো মানুষ সেকালে মেলেনি। হয়তো অতি সাধারণ আউল, বাউল, ফকিরের মধ্যে কেউ তাঁর স্পর্শ পেয়ে সেকালে ধন্য হয়ে গেছেন; হয়তো ঐ যুগের পত্রিকাদিতে তার অস্পষ্ট সাক্ষ্যও মিলবে—সেদিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন প্রথম কলিকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসীদের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে, ঠাকুর 'পাগল' নন—দিব্যোন্মাদে বিভোর! কেশবের সহপাঠী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একবার মাত্র তাঁর দেখা হয়; তার ভাল বিবরণী আমরা পাই না। শুধু মনে পড়ে, ১৮৫৮-তে বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম B.A. আর তার ঠিক ২৫ বছর পরে নরেন্দ্রনাথও 'দর্শন' নিয়ে B.A. পাস করেন (১৮৮৩ ['৮৪]); পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করেও অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু তখন লিখেছেন 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', কেশব দিয়েছেন 'নববিধান ও সর্বধর্ম সমন্বয়' পরিকল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র—শুধু দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি নভেল নয়, 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলনে' নব্য-হিন্দুত্বের প্রচার করেন এবং সর্বোপরি নরেন্দ্রনাথ দত্ত B.A.—১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শাশ্বত তত্ত্ব 'বেদান্ত' প্রচার করেছেন Chicage শহরের বিশ্বধর্মসভায় Parliament of Religions-এ।

১৮৮৩-তে কুড়ি বছরের Graduate নরেন্দ্রনাথ কেমন করে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিজয়ী ধর্মপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন—সে ইতিহাসও অনেকখানি অজ্ঞাত রয়েছে; ১৮৮৪-র মে [?]-তে পিতৃবিয়োগ ও দারুণ সাংসারিক সমস্যা ১৮৮৫-তে (এপ্রিল) শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে Cancer দেখা দেয় ও ১৮৮৬-তে (১৫।১৬ আগস্ট) মহাগুরু নিপাত। কাশীপুর থেকে বরাহনগর মঠে পাণিনি ও বেদান্তচর্চা ও কঠোর তপস্যা। ১৮৮৭-তে অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ; ১৮৮৮[?]-তে বরাহনগর ছেড়ে Dawn Society-র প্রতিষ্ঠাতা [?] সতীর্থ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গাজিপুরে অবস্থান ও যোগী 'পাওহারী বাবা'র সঙ্গে

২ গদাধর প্রথম কলকাতায় আসেন ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর বয়স তখন প্রায় সতের বছর। —যুগ্ম সম্পাদক

সংযোগ ;—'পত্রাবলী'র সূত্রপাত ও পরিব্রাজক-জীবনের বিকাশ—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তীর্থ পরিক্রমা ; সাধুসংযোগ ও দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ—এসবই ১৮৯৩-তে 'মহা অভিনিষ্ক্রমণে'র আগেই হয়েছে। অথচ ভারতের পত্রিকাদি থেকে তথ্যগুলি ভালরকমে সন্ধান ও উদ্ধার করা হয়নি। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের সঙ্গে পরিচয়, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের সঙ্গে আলাপ—এসবই ছায়ার মতো আভাসে আমরা ছাপার অক্ষরে পেয়েছি ; কিন্তু আধুনিক ভারতের ইতিহাসে যে যুগপ্রলয় হয়ে গেল সেদিকে হুঁশ জাগাবার মতো রচনা এপর্যন্ত কেউ দেয়নি।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেখি স্বামীজী বোম্বাইয়ে এবং ১৮৯৩-এ সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ৩১ মে বোম্বাই থেকে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা যাত্রা। তাঁর জীবনের এই শেষ দশটি বছরের ঘটনা, ভাবনা, সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাসই 'বিবেকানন্দ-জীবনী' বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর আগেকার ত্রিশ বছরের জীবন-সংগ্রাম—বাংলার তথা ভারতের নানা সমস্যা-নিয়ে বহু অনুসন্ধান ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তার যে-কোন একটি বিষয়ে গবেষণা করে যদি কেউ লেখেন সেটির জন্য প্রতি বৎসরে 'বিবেকানন্দ-পুরস্কার' দেবার ব্যবস্থা এই ৯০তম জন্ম বৎসর থেকেই সুরু হওয়া উচিত। Schopenhauer সমিতি এইভাবে বহু বৎসর অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন, সেগুলি মনীষী Roman Ralland আমায় দেখান যখন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জীবনী নিয়ে ইউরোপে কাজ করেছিলাম। রোলাঁর কাছেও মঠ-মিশন থেকে যেসব উপাদান পাঠানো হয়েছিল ও স্বামী অশোকানন্দজী মহাত্মা শিবানন্দের আদেশ মতো যে-উপাদানগুলি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন সেগুলি ও রোলাঁর পত্রাবলীতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা উচিত। ফরাসী পণ্ডিত-মহলে স্বামীজী ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই সুপরিচিত। কারণ ঐ বৎসর International Exhibition উপলক্ষে Congress of the History of Religions প্যারিসে বসে। তিনি হিন্দুসভ্যতা বিষয়ে বহু ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং সেখানে প্রথম সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বন্ধুরূপে লাভ করেন। তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতাও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধা হন এবং বসুজায়ার ক্রোড়েই ১৯১১-তে নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়ও অনেকখানি নূতনভাবে লেখা দরকার, সেকথা নিবেদিতার মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে আমি বলেছিলাম এবং তাঁরা আমাকে আশ্বাস দেন যে, Margaret Noble-এর জন্মস্থান আয়ারল্যান্ডে এক মৈত্রী-মিশন পাঠাবেন। ১৮৯৬ [?] (এপ্রিল [?]) খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দুবছর আমেরিকাতে বেদান্ত-প্রচার করে যখন লণ্ডনে আসেন, তখন E. T. Sturdy-র ভবনে [?] তাঁর প্রথম দেখা হয় Margart Noble-এর সঙ্গে ; তিনি ছাড়া Captain ও Mrs Sevier, Goodwin, Hammond প্রভৃতি ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যাগণও এই সময় থেকে, স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসে তাঁর কাজে যোগ দেবেন জানান। Max Muller-এর সঙ্গে দেখা করে ও রামকৃষ্ণ-জীবনী লিখিয়ে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দকে লণ্ডনের 'বেদান্ত সোসাইটি'র ভার দিয়ে স্বামীজী সুইস দেশ, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী (বৈদান্তিক Deussen-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ) পরিভ্রমণ করে কলোম্বোতে নামেন (১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭)। ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় পত্রিকাদির মধ্যে খোঁজ করলে অনেক নূতন তথ্য পাবার সম্ভাবনা। দেশে ফেরবার পূর্বে স্বামীজী নিবেদিতাকে লেখেনঃ "আমার দেশের মেয়েদের উন্নতিকল্পে কিছু পরিকল্পনা করেছি, সে কাজে তুমি খুব সাহায্য করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

গুরুর এই আহ্বানে ১৮৯৮-এ (জানুয়ারি) নিবেদিতা ভারতে এলেন। ঠিক এক বছর আগে স্বামীজী কলকাতায় ফিরে বেলুড়ে [?] রামকৃষ্ণ-মিশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯৭ মে) এবং সারদা-

দেবীকে বেলুড় মঠে প্রথম নিয়ে আসেন (১২ নভেম্বর ১৮৯৮)। ১৬ [?] মার্চ (১৮৮৯) নিবেদিতাকে দীক্ষা দিয়ে স্বামীজী তাঁকে ও শিষ্যদের নিয়ে উত্তর ভারত, কুমায়ুন ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন।

১৮৯৯ (ফেব্রুয়ারি) গোড়ায় নিবেদিতা 'Kali the Mother' প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বাগবাজারে নারীশিক্ষা মন্দিরের সূত্রপাত করেন। ঐ বৎসর (২০ জুন) তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) ও নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে শেষবার স্বামীজী বিশ্ব-পরিক্রমা করেন (জুন ১৮৯৯—ডিসেম্বর ১৯০০)। ইউরোপ-আমেরিকায় তাদের যেসব কেন্দ্রগুলি স্বামীজী স্থাপন করেছিলেন সেগুলি আবার দেখে ভবিষ্যৎ গঠনে সহকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে দেশে ফেরেন। অথচ নিবেদিতা বৎসরাধিক কাল ঐ দেশেই থেকে অর্থসংগ্রহাদি করতে থাকেন ; ১৯০২ জানুয়ারি মাসে মনীষী রমেশ-চন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে তিনি ভারতে ফেরেন ; সেই বৎসরেই নিবেদিতা ও ধর্মপাল, জাপানী পণ্ডিত Okakura প্রভৃতিকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শেষ তীর্থযাত্রা করেন বুদ্ধ-গয়া, সারনাথ, কাশী প্রভৃতি স্থানে। ১০ ফেব্রুয়ারি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ পদে বরণ করি ও গুরুভ্রাতার হাতে মঠ ও মিশনের ভার পূর্ণ সমর্পণ করে শিশুর মতো বিশ্বজননীর ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় বিবেকানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেন (৪ জুলাই ১৯০২)। সেটি আমেরিকার 'স্বাধীনতা দিবস' ; তাই আজ মনে পড়ে, ১৮৯৩ থেকে ১৯০২—এই কয়টি বছরের মধ্যে নূতন জগৎ আমেরিকাতে কত বড় কাজ স্বামীজী করে গেছেন। New York, Philadelphia, Brooklyn, Boston, Chicago, San Francisco প্রভৃতি বিরাট শহরে যেখানেই গিয়েছি—নিজে স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়েছি যে, সহায় ও বিত্তহীন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর আশীর্বাদে এবং অদম্য অধ্যাত্মপ্রেরণায় ভারতমাতার নাম ও কীর্তি কত স্থানে স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। চিন্তানায়ক Ingersole, দার্শনিক William James, অধ্যাপক Lanman (সংস্কৃতজ্ঞ) প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে যোগ-স্থাপনা করে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ইন্দো-আমেরিকা মৈত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূতগণ হয়তো এ বিষয়ে এখনও সজাগ হননি। অর্ধ-শতাব্দী আগে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী যে পরি-কল্পনা করেছিলেন, যে সতর্কবাণী ও উপদেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি নূতন চোখে দেখে নূতন গ্রন্থাদি রচনা করা উচিত। তাঁর তিরোধানের পর অর্ধশতাব্দী হয়ে গেল ; এখন থেকেই 'স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যানমালা' সুরু করা উচিত ; কারণ, আর দশ বছর পরে ১৯৬২-তে তাঁর শতবার্ষিকী পূর্ণ হবে। সেই কথা তাঁর ৯০তম জন্মোৎসবে বারবার মনে পড়েছিল বলেই 'বসুমতী' পত্রিকার ভিতর দিয়ে আমার ঐকান্তিক আবেদন দেশবাসীদের জানালাম।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কতভাবে ঋণী সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ৭ জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিবেদিতাকে লিখে-ছিলেন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য "মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বটি প্রচার করা ...নিদ্রিত ভগবান নিশ্চয়ই জাগবেন।" তিনিই আবার চিরনির্বাণের আগে দীপ্ত ভাষায় নিবেদিতাকে কাশী থেকে লেখেন—"সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উম্বুদ্ধ হউক! মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে ও বাহুতে অধিষ্ঠিত হউন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক।" স্বামীজীর এই শেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ শুধু নিবেদিতার জীবনে নয় এদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অপূর্ব প্রেরণা ও শক্তি এনেছিল এবং উচ্চ-নীচ ভেদ ভুলে তাই তারা দেশমাতৃকার দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যাঁরা এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের কথা আজ যেন স্বামী বিবেকানন্দ নূতন করে আমা-দের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন! 'আমরা সবাই নিজ নিজ ভাবে উৎসর্গীকৃত বলি।' অমর স্বামী বিবেকানন্দের জয় হোক'!*

* মাসিক বসুমতী, ৩০ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৫৮, পৃঃ ৬৩৭-৬৩৯

সংগ্রহ : প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

অজামিল ও নামমাহাত্ম্য

স্বামী শুদ্ধানন্দ

জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, সবই সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ ; তাঁহার সৃষ্ট জগতে বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা ইন্দ্রজাল, মিথ্যা বা ভ্রম বলি, তাহাও বাস্তবিক অসত্য নহে; কোন-না-কোন সত্যের আচ্ছাদিত প্রকাশমাত্র। তবে যে আমাদের দৃষ্টিতে অনেক জিনিস অসত্য বা সত্যাসত্যমিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা আমাদেরই দৃষ্টিহীনতার জন্য। যে-দৃষ্টি অবলম্বনে দেখিলে তাহাদের সত্যতা ও সৌন্দর্য বুঝিতে পারা যায়, তাহা আমাদের নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি না। যে প্রথম সেই বিষয়বিশেষে সত্য বুঝিয়াছিল, যে প্রথম সেই বিষয়বিশেষে সত্য দেখিয়াছিল—সে-ই সে মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাহার ন্যায় দৃষ্টি তোমার আমার নাই বলিয়াই আমরা এখন সেই তত্ত্বে ভ্রম দর্শন করিয়া থাকি। নতুবা আমরা জানি বা নাই জানি, প্রত্যেক অনুভবে সত্য পদার্থই স্পর্শ করিয়া থাকি এবং আমাদের প্রত্যেক ভাব, মত এবং কল্পনাও কোন-না-কোন সত্যাবলম্বনেই উঠিয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকটিই সেই সেই সত্যের বিকৃত দর্শনমাত্র—এবিষয়ে ভ্রম নাই।

জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, জগৎ ভাবময়—সুতরাং তিনি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া কিছুই দেখিতে পান না। কুৎসিত পাপাচারীর চেষ্টার ভিতরেও এইরূপে তাঁহারা দৃষ্টিহীনতাপ্রসূত বিকৃতভাবাপন্ন সত্যানুরাগই দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও সমুদয় বস্তু সহানুভূতির চক্ষে দেখিবার শক্তি হয়। যাঁহাদের এ দৃষ্টির বিকাশ হয় নাই, তাঁহারা জগতের প্রতি ভাব বা মতের ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্যসম্ভোগে বিশেষ বঞ্চিত, সন্দেহ নাই।

সর্বদেশের ধর্মেতিহাস আলোচনা করিয়াই দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের এখনকার দৃষ্টি ও যুক্তির সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না। আমাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়া সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখি না। হয়তো যিনি প্রথমে সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে যে-দৃষ্টিতে, যে-ভাবে দেখেন, আমরা যদি উহাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি, তাহা হইলে উহাতে যুক্তির বিরোধী কিছুই দেখিতে পাইব না! হয়তো দেখিব, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—হৃদয়ের কোন সৌন্দর্য দেখানো, বুদ্ধির নহে। বুঝিব হয়তো পরবর্তী টীকাকারগণ ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য হইতে বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া যাইবার অসম্ভব চেষ্টা করিয়া অসঙ্গতি দোষে পড়িয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে পুরাণের অজামিল উপাখ্যান লওয়া যাউক। চলিত কথায় আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, অজামিল পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না করিয়া মরণের পূর্বে কোন মতে একবার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সবকাজ হইবে—ঈশ্বরলাভ হইবে। কিন্তু একবার ভাগবতখানা খুলিয়া দেখিলে অন্যরূপ দেখিতে পাই। প্রথমে দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার রীতিমত শাস্ত্রজ্ঞান ছিল এবং স্বভাবও পূর্বে অতি সুন্দর ছিল। তিনি সদাচারী ও যমাদি নানাগুণসম্পন্ন ছিলেন। সর্বদা ব্রত আচরণ করিতেন এবং মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি ছিলেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়া সর্বদা গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। সকল প্রাণীর সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দভাব ছিল। তিনি অতি সাধু ও পরিমিত-ভাষী ছিলেন, কাহারও প্রতি কখনো হিংসা করিতেন না।

পূর্বাবস্থায় তাঁহার এত সদ্গুণ ছিল—আমাদের মধ্যে যাঁহারা অজামিল পদের প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পূর্বোক্ত সদ্গুণগুলির একটিরও দাবি করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাউক, অসৎসঙ্গে ইঁহার পতন হইল। দাসিগর্ভে যে দশপুত্র হইল, তাহার কনিষ্ঠটির নাম রাখা হইল নারায়ণ। এটি ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় ছিল। পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাতে বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ অসৎসঙ্গে পড়িয়া অসৎমার্গাব-

লম্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বের ভগবন্নিষ্ঠা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই।

তারপর ইঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ। ভাগবতে লিখিত আছে, প্রথমে যমদূত ইঁহাকে লইতে আসিয়াছিল, সেইক্ষণে নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইবামাত্র বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে সন্দেহ এই, অজামিলের হৃদয়ে কি নারায়ণ শব্দদ্বারা ভগবদ্ভাব কিছুমাত্র উদয় হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে আমরাও তো অনেক সময় নানা কারণে ভগবানের নামাত্মক বিস্তর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি, আমাদের কাছেই বা বিষ্ণুদূত আসেন না কেন? ইহাতে বোধ হয়, যদি এই গল্পটি একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তবে নিশ্চয়ই পুত্রচ্ছলে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবযোগে (Association of ideas) তাঁহার মনে নারায়ণের ভাবও আসিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যে, রোগে বিকারগ্রস্ত তাঁহার নিজের মনেরই দুই প্রকার বৃত্তি সাকার রূপ ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিয়াছিল। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময় আমাদের সকলেরই ঘটিয়া থাকে। যমদূত বলিতেছেন, "অন্যায় কার্য হইয়াছে, শাস্তি পাইতেই হইবে।" বিষ্ণুদূত বলিতেছেন, "ভগবদুপাসনায় সর্বপাপ ক্ষয় হয়।"

সাধারণের একটি সংস্কার আছে, অজামিল এই অবস্থায় মরিয়া বিষ্ণুদূত কর্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হন। কিন্তু ভাগবত অন্যরূপ বলিতেছেন। তাঁহার বিকার ছুটিয়া চেতনা হইল! কিন্তু যমদূত বিষ্ণুদূতাদিগের সেই কথোপকথন কখনো ভুলিতে পারিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি আপন পূর্বকৃত অসদাচারের জন্য অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ করিয়া আমার এইরূপ সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন ও এত সদুপদেশ শ্রবণ হইল। না জানি, প্রকৃতভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে কতদূর উন্নতি হয়। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আমি যাহাতে আবার ঘোর পাপে নিমগ্ন না হই, তজ্জন্য প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিব। অবিদ্যা ও কামকর্মজনিত এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্বপ্রাণীর সুহৃদ, শান্ত, দয়াবান ও আত্মবান হইয়া স্ত্রীরূপিণী নিজমায়াগ্রস্ত আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এক্ষণে সত্যবস্তুতে আমার বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহাদিতে আমি আমার বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা বিসর্জনপূর্বক চিত্তকে ভগবৎকীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব।"

এই বলিয়া তিনি সর্বত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন। তথায় আসন কল্পনাপূর্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে সংযোগ করিলেন।

এই সময়ে সেই পূর্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

যাঁহারা একবার মাত্র ভগবানের নাম করিয়াই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন অজামিলের ন্যায় সর্বত্যাগ ও যোগসাধনে প্রস্তুত আছেন?

এইরূপে ভাগবতে লিপিবদ্ধ অজামিলের জীবনেতিহাস চলিত কথার সহিত অনেক বিরোধী হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম-মাহাত্ম্যের উপর যে চলিত বিশ্বাস আছে, তাহাও ভাগবতকারের দৃষ্টিতে পরিবর্তনের যোগ্য বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু যে যে দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করে কে? সুখপ্রিয় মানুষ কষ্টের দিকে তাকাইতে চাহে না। আমাদের দেশের পণ্ডিতকুল, যাঁহাদের উপর সাধারণে ধর্মাধর্মের ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত, এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধারণের বিশ্বাস যাহাতে যথার্থ শাস্ত্রদৃষ্টির উপর স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। তাহার উপর গ্রহাচার্যগণের ভ্রমসঙ্কুল যুক্তিবিরোধী গণনা এবং কথক মহাশয়দিগের যথার্থ শাস্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত মূর্খের মনোরঞ্জনকারী অপরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের

বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আবর্তে ফেলিয়াছে, তাহা দেখে কে? এখন সাধারণের শিক্ষার প্রসার ভিন্ন এই আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য উপায় দেখি না।

দেখা গেল, ভগবানের নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করায় যুক্তিবিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু সাধারণে উহা যেভাবে দৃষ্টি করে, তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আর কত বহুকালাত্যস্ত হৃদয়ের প্রিয় বিশ্বাসনিচয়, আমরা যেভাবে সত্য বলিয়া দেখি, সেভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া, অন্য একভাবে, অন্য এক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পাঠক কি জানিবামাত্র সেই সেই নূতন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সেগুলি জীবনে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছেন? *

* উদ্বোধন ৬ষ্ঠ বর্ষ (১৩১০), ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৭৯

সংযোজন

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

উদ্বোধন-এর 'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে' বিভাগে গত বৈশাখ ১৩৯৬ সংখ্যা থেকে **'সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী'** শিরোনামে সরলাবালা দাসীর একটি পুরনো লেখা ধারাবাহিকভাবে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছিল। গত ফাল্গুন (১৩৯৬) সংখ্যায় তা শেষ হয়েছে। উদ্বোধন-এর পাঠকদের কাছে খুব সমাদৃত হয়েছে এই লেখাটি। অনেকে চিঠি লিখে বা মৌখিকভাবে জানতে চেয়েছেন সন্ন্যাসিনীর পরিচয়। "লেখিকা সরলাবালা দাসী কি স্বয়ং সন্ন্যাসিনী?"—এই প্রশ্নও অনেকে করেছেন। পাঠকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাদের নিবেদন এই: সন্ন্যাসিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে লেখিকা প্রবন্ধের সূচনায় (দ্রঃ বৈশাখ ১৩৯৬) লিখেছেন: "ইনি যোগিনী-মা নামে পরিচিতা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।" সম্প্রতি প্রকাশিত 'সরলাবালা রচনা সংগ্রহ' (দুই খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলি-৯, ডিসেম্বর ১৯৮৯) সম্পাদিকা চিত্রা দেব লিখেছেন: "ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সর্বজন-পরিচিত যোগীন-মা নন। সরলাবালার রচনাংশে উল্লিখিত যোগিনী-মা উচ্চকোটির সাধিকা এবং কাশীবাসিনী ছিলেন। তাঁর নিজের মুখের কথা বলে রচনাটি উত্তমপুরুষের জবানীতে লেখা। কিন্তু আসলে এটি জীবনচরিত ছাড়া আর কিছু নয়।" (রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮৮) প্রবন্ধের সূচনায় লেখিকার নিজের কথা থেকেই জানা যায় সন্ন্যাসিনী 'যোগিনী-মা'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং তাঁর মুখ থেকে শুনেই তিনি রচনাটি লিখেছিলেন। যোগিনী-মাকে নিয়ে লেখা লেখিকার আরও দুটি রচনা পরে (দ্রঃ রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি—'সন্ন্যাসিনী-মা' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৪) দ্বিতীয়টি—'সন্ন্যাসিনীর কাহিনী' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৬)। এই তিনটি লেখার মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্য আছে। উদ্বোধন-এর পরবর্তী সংখ্যা থেকে বাকি দুটি রচনা উপস্থাপিত হবে।

এবার লেখিকার পরিচিতি। লেখিকা সরলাবালা দাসীর জন্ম ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ, মৃত্যু ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১৫ অগ্রহায়ণ। প্রখ্যাত এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা রায়-বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহিত্যানুরাগী শরচ্চন্দ্র সরকারের সঙ্গে সরলাবালার বিবাহ হয়। সরলাবালার পিতা কিশোরীলাল সরকার ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত আইনজীবী। মাতা লীলাবতী ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের ভগিনী। সরলাবালার দাদা সরসীলাল সরকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য। সরলাবালাও কবির সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক অশোককুমার সরকার ছিলেন সরলাবালার কন্যা (একমাত্র সন্তান) নির্ঝরিণী সরকারের পুত্র। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গেও সরলাবালার ছিল নাড়ীর সংযোগ। ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সরলাবালা এসেছিলেন। বিদুষী এবং মনস্বিনী এই নারীর বহু রচনা উদ্বোধন সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে 'দাসী'-র পরিবর্তে তিনি 'সরকার' পদবী ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত মহিলা সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ পদবী ব্যবহার করতেন না। ব্রাহ্মণরা লিখতেন 'দেবী', অব্রাহ্মণরা লিখতেন 'দাসী'। সেই রীতি অনুসারেই সরলাবালার প্রথম দিকের বহু রচনায় তাঁর নামের সঙ্গে 'দাসী' কথাটি যুক্ত থাকত। এসম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন: "আমার নামের আগে সরলাবালা দাসী বলিয়া লেখা হইত, কিন্তু আত্মীয়বর্গের আপত্তিতে এখন দাসী পদবীর পরিবর্তে সরকারই ব্যবহার করি।" (রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬)।—যুগ্ম সম্পাদক

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে একমাত্র ছাতাটাই আমার হাতে আছে। ভাবলাম এই ছাতা দিয়েই প্রথমে রুখবার চেষ্টা করব, পরে যা হয় হবে। এভাবে ভয়ে ভয়ে দুজনে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিক থেকে চার-পাঁচজন স্থানীয় লোক আমাদের কাছ দিয়ে বড়গেরে গ্রামের দিকে ফিরছিলেন। মহারাজজী ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওটা কি ডাকছে?" তখন তাঁরা উত্তরে জানালেন—"মোষ ডাকছে"। এই বলে তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেলেন। এদিকে "মোষ ডাকছে" একথা শুনে মহারাজজী আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বললেনঃ "এ যে আরও ভয়ানক! নে, নে, শিগ্‌গির ছাতা বন্ধ কর।"

তারপর একবার মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে যাচ্ছেন। আবার কখনো ছোট কাঁটা-ঝোপের আড়ালে, কখনো বা বড় গাছের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই দারুণ ভয়ের সময়ে কাছে রয়েছি একমাত্র আমি। তিনি ভয়ে যে কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যদি সেই সময়ের ফটো তুলে রাখা যেত, তবেই তাঁর সে-ভাব-ভঙ্গি মুখ-চোখের হাব-ভাব দেখে তা কিছুটা অনুমান করা যেত। যা-হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ঐরকম করে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে কোন রকমে লুকিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে নিরাপদে মঠে পৌঁছাই ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কলকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকাকালে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সকালে ও বিকেলে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বেড়াতে যাবার সময় রাস্তার ধারে অশ্বত্থ বা বটগাছের তলায় যেসব দেব-দেবীর মূর্তি বা অন্য ঠাকুর-দেবতার মন্দির পড়ত, তিনি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন। কখনো বা বলতেন—"ওরে, দু-একটা পয়সা আছে কি রে? যদি থাকে তবে তা দিয়ে প্রণাম কর।" তখন প্রকাশ্যে ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে লজ্জা করত। কিন্তু তাঁকে ঐরূপ করতে দেখে ঐ সব দেব-দেবীকে প্রণাম করতে বাধ্য হতাম।

তিনি বলতেন—"দেখ, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আপনজন এলে যেমন তাদের আদর-যত্ন করে বসিয়ে খাওয়াতে হয়, তেমনি কোন দেব-দেবীকে আবাহন করলে ঠিক ঐভাবে তাঁকে বা তাঁদেরকে সেবাযত্ন ও পরমাত্মীয়বোধে আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হয়।"

তাঁর জন্য কোন কিছু নিয়ে যেতাম না। কিন্তু তিনি পাকেচক্রে কিছু আদায় করে ছাড়তেন। কোনদিন হয়তো বলতেন—"ওরে, তোদের বৌবাজারের দিকে টাটকা কচি ভাল ডুমুর পাওয়া যায় কি রে?"

"হ্যাঁ, পাওয়া যায়" বলে জানালে তিনি তখন হয়তো বলতেন - তা ঐরকম ভাল ডুমুর এক-আধ পয়সার কিনে আনিস তো।"

কোনদিন বা বলে বসলেন—"তোদের ওদিকে ভাল কাঁচা মুগের ডাল পাওয়া যায়, না রে?"

"হ্যাঁ, পাওয়া যায়" জানালে তিনি বলতেন—"তবে ঐরকম বেশ টাটকা কাঁচা মুগের ডাল আধপোয়া বা পোয়াটাক আনিস তো।"

বেশি দামের নয়, মাত্র দু-চার পয়সা দামের জিনিস আনতে বলতেন। এভাবে নিজগুণে কিছু গ্রহণ করতেন। আদায় করে ছাড়তেন।

সেটা আন্দাজ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের ইন্দু (পরে স্বামী দেবাত্মানন্দ), ফণী ও আমি পড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদকে জীবিকার্জনের

মাধ্যম করে তাতেই লেগে থাকতে ইচ্ছুক হই। কাজে লাগার আগে ইন্দু ও আমি ঐ বিষয়টি মহারাজজীকে জানাবার জন্যে একদিন সকালে বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে যাই। সুবিধামতো নিরিবিলিতে তাঁকে বলি—"লেখাপড়া আর ভাল লাগছে না।" সব কথা শুনে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—"তবে চলে আয় না।"

এসব বিষয়ে তিনি বড় চাপা ছিলেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁর মুখ দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বার হতো। কিন্তু মুখ দিয়ে একবার যে-কথা বার হতো সেটি ছিল অমোঘ অব্যর্থ; কখনো তা বিফলে যেত না। তাঁর ঐ কথা শুনে তখন আমরা বলি—"না, মহারাজজী, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদ করব বলে পরিকল্পনা করেছি।" তখন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তিনি চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নানা ধরনের পরামর্শাদি দিয়ে শেষে উপসংহার করলেন—'মন রে কৃষি কাজ জান না, / এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।'

একবার দুর্গাপূজার অল্প কয়েকদিন আগে (সালটা মনে নেই) এক সকালে ইন্দু ও আমি মহারাজজীকে দর্শন করতে বলরাম-মন্দিরে গিয়েছি। দু-একটা কথার পর তিনি আমাদের বললেন—"দেখ, সামনে পূজা। তোরা সব মঠে গিয়ে কাজকর্ম করবি, খাটবি। মঠ তো তোদেরই।" ঐবার পূজার সময় আমরা দুজনে মঠে রয়েছি। মহারাজজী, মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদ কয়েকজনও মঠে রয়েছেন। মঠে গিয়েই দুর্গাপূজার প্রধান যোগাড়দার ও ভাণ্ডারী দেবেনদা ও ভাব মহারাজের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে। তাঁরা আমাদের অতি আপনজন বলে গ্রহণ করেন ও খুব ভালবাসতেন। মঠকেও ধীরে ধীরে মহারাজজীর কথামতো আমাদের নিজেদের মনে হতে থাকে। দেবেনদা ও ভাব মহারাজ আমাদের জানিয়ে দিলেন—"যখনই তোমাদের যা খাবার দরকার হবে, তখনই তা আমাদের আর জিজ্ঞাসা না করে তোমরা নিজেরা প্রসাদ-ভাণ্ডারঘরে ঢুকে তোমাদের ইচ্ছেমতো নিয়ে খাবে।"

ঐবার মহানবমীর দিন নিজেদের সব কাজ সেরে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে ইন্দু ও আমি হাওড়ার খুরুট রোডে পূজা দেখতে যাই। সন্ধ্যার সময় মঠে ফিরে মহারাজজীকে প্রণাম করতে যাই। তিনি তখন দোতলায় স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে, সকালে জপটপ হয়েছিল তো?"

আমি গাঁইগুঁই করে বললাম—"একটু করেছিলাম।" তারপর ইন্দু প্রণাম করতেই তাকে প্রশ্ন করলেন—"তোর হয়েছিল তো?" সে চুপ করে রইল।

তাতে মহারাজজী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ও রেগে আমাদের দুজনকে ভীষণ ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন—"আমি ('আমি'র উপর খুব জোর দিয়ে) বলেছি রোজ নিয়মিত জপধ্যান করতে। আর তা না করে খালি হইহই করে বেড়ানো হচ্ছে? সারা দুনিয়া যদি ভেসেও যায়, তাহলেও জপধ্যান আগে করে তারপর আর কোন কিছু করবি।"

তিনি বলতেন—"ইষ্টকে সহাস্যবদনরূপে ধ্যান করতে হয়, তা না হলে সুঁটকো ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান করবার আগে আমি কখনো কখনো খুব হাসি ও মজার কথা কিছু মনে করে পরে ধ্যানে বসি।"

একাধিকবার তিনি হাসতে হাসতে আমাদের সামনে বলেছিলেন—"আমরা সব জাতসাপের বাচ্চা; যাকে একবার ছোবলাব, সে যদি তখনই না-ও মরে, তবে অন্ততঃ গর্তের মধ্যে গিয়েও মরে পড়ে থাকবে।"

যতবার তিনি ইন্দু ও আমাকে নির্জনে পেয়েছেন প্রায় ততবারই জিজ্ঞাসা করেছেন—"কিরে, যা বলেছি তা করেছিস তো? খুব করে যা, আবার নতুন কিছু বলে দেব।"

তখন প্রায় বছর খানেক বা বছর দেড়েক ধরে জোর করে তাঁর উপদিষ্ট পথে জপধ্যানাদি করে যাচ্ছি। এমন সময় একদিন বেলা আড়াইটা-তিনটার সময় বলরাম-মন্দিরে আমরা দুজনে মহারাজজীকে তাঁর ঘরের মধ্যে নিরিবিলিতে পেয়ে প্রণাম করি। ইন্দু সামনে ছিল। সে প্রথমে প্রণাম করলে

মহারাজজী তাকে সেই আগের মতোই প্রশ্ন করলেন —"কিরে, ধ্যানজপে লাভ কেমন হচ্ছে ?" তাতে সে উত্তর দিল—"না মহারাজ, আর বেশিক্ষণ ধরে বসতে ও ধ্যানজপ করতে ভাল লাগছে না।" তারপর আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠলে তিনি আমাকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন—"আর তোর ?" উত্তরে আমি বললাম— "ও যা বললে, বোধ হয় তার চেয়ে আরও খারাপ।"

আমাদের দুজনের উত্তর শুনে সামান্য একটু থেমে তিনি আমাদের বললেন—"আচ্ছা, কেন এমন হয় বল দিকি ?" এর উত্তর আমরা আর কি দেব ? দুজনেই চুপ করে রইলাম। তারপর তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—"দেখ, প্রত্যেক কাজেরই একটা reaction আছে। জপধ্যান করারও reaction আছে। কিন্তু তা মোটেই ছাড়া চলবে না। জোর করে লেগে থাকতে হবে, তাতেই সিদ্ধি।"

তিনি বলতেন—"খুব ব্যাকুল হয়ে কেঁদেকেটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।"

আর একটি খুব মূল্যবান কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন—"যা বলেছি নিষ্ঠার সঙ্গে regularly তা করে যা। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে যাসনি।" একথাটি জানিয়ে একদিকে যেমন তিনি আমাদের অভয় দিয়েছিলেন, আবার অন্য দিকে তেমনই লাভ-লোকসান খতাতে গিয়ে আমরা হতাশায় ডুবে না যাই সে বিপদ থেকেও রক্ষা করেছিলেন। তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকারও ইঙ্গিত সেই সঙ্গে করেছেন—আমাদের কল্যাণের জন্য।

তিরোধানের কিছুকাল আগে থেকে মহারাজজীকে একাধিকবার বলতে শোনা যেত—"এ-শরীরটা এক মহাবন্ধন। কত সব অতি সুন্দর উচ্চ উচ্চ মজাদার ভাব আছে, সেগুলো এই স্থূল শরীরটা অনুভব করতে বাধা দেয়। এটা গেলে তখন কি মজা, কত আনন্দ, কত কি সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন অনুভূতি!"

তিনি বলতেন—"ঠাকুরের খিস্তি-খেউড়ের মধ্য দিয়েও আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পেতাম?" ভাব-রাজ্যের কোন্ সুউচ্চ মহান পবিত্র স্তরে মন বিচরণ করলে এরূপ আভাস পাওয়া যেতে পারে তা ভোগসর্বস্ব আমাদের ভাবার বিষয়।

পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের প্রতি তাঁর কি অস্বাভাবিক রকমের টানই না ছিল! একবার আমি ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাওয়ার কথা তাঁকে জানালে তিনি বললেন—"বেশ, আমার জন্য মহাপ্রসাদ আনবি।" যথাসময়ে প্রসাদ নিয়ে ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছে তা তাঁকে দিলাম। এতে তিনি কি আনন্দিতই না হয়েছিলেন। পরে তাঁর সেবকদের মুখে শুনলাম: "দেখ, তোমার ট্রেন আসবার যখন সময় হয়ে আসছে, সেই সময় থেকে তিনি মহাব্যস্ত হয়ে কেবল ঘর-বার করছেন আর রেললাইনের দিকে তাকাচ্ছেন। কখন ট্রেন আসবে, আর কতক্ষণে তিনি মহাপ্রসাদ পাবেন।"

রসভঙ্গ করলে মহারাজ বড় বিরক্ত হতেন। একবার মঠে সন্ধ্যের পর কলকাতার দু-একজন বড় গাইয়ে মঠে গান গাইছেন। ঐ সময়ে দোতলার বারান্দায় আমি মহারাজজীর কাছে বসেছিলাম। তখন বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ—যিনি দোতলার বাবুরাম মহারাজের ঘরে থাকতেন—মহারাজজীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "মহারাজ, এটা কি সুর গাইছে?"

উত্তরে তিনি 'সোহিনী' বা 'সাহানা' কি একটা নাম বললেন আমার ঠিক মনে নেই; তিনি কিন্তু নির্দিষ্টভাবে একটি সুরের নাম বলেছিলেন, তারপর তিনি আমায় ইঙ্গিত করে বললেন—"যা তো, জিজ্ঞেস করে আয় তো, ওটা কি সুর?"

নিচে গেলাম। গান থামলে অম্বিকানন্দ-স্বামীকে (নীরদ মহারাজ) জিজ্ঞাসা করলাম: "এটা কি সুর গাওয়া হলো?"

তার উত্তরে মহারাজজী যে সুরের নাম বলেছিলেন স্বামী অম্বিকানন্দ সেইটিই বললেন। বলেই হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন: "কে জিজ্ঞাসা করছেন?" আমি বললুম: "মহারাজজী।" [ক্রমশঃ]

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

সঙ্কলক স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী সারদেশানন্দ কথিত

(১)

তপস্বী হরি মহারাজ

(স্বামী তুরীয়ানন্দজী)

একবার কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ গঙ্গার ধারে নাঙ্গলে তপস্যায় যাইতেছেন পদব্রজে। সঙ্গে কম্বল, সামান্য কাপড়-চোপড় ও একটি বইয়ের পুঁটলি। নিজেই সব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সঙ্গে স্বামী কল্যাণানন্দ। তিনি তাঁহাকে কিছুদূর আগাইয়া দিতে যাইতেছেন। জগদীশপুরের শেষ পর্যন্ত গিয়া বিদায়কালে কল্যাণ-স্বামী কিছু পয়সা-কড়ি সঙ্গে দিতে চাহিলে হরি মহারাজ তীব্র আপত্তি করিলেন। কিন্তু কল্যাণ-স্বামী লুকাইয়া একটি সিকি-মোহর হরি মহারাজের জামার নিচে পাশ-পকেটে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইয়া কল্যাণ-স্বামী চলিয়া আসিলেন। অনেকখানি পথ হরি মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন, চলিতে চলিতে হঠাৎ পকেটস্থ মোহরটি কিভাবে তাঁহার হাতে লাগিয়াছে। হরি মহারাজ পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন একটি সিকি-মোহর। বুঝিলেন ইহা কল্যাণ-স্বামীর কর্ম। তিনি আবার কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটিয়া কনখল সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং কল্যাণানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "কল্যাণ! এ তোমার কর্ম। কেন দিয়াছ? সঙ্গে পয়সা-কড়ি আমি রাখিব না। শুধু ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়াই থাকিব।" এই বলিয়া সিকি-মোহরটি ফিরাইয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন।

রাস্তায় নাঙ্গলের একটি লোক জুটিল। সে তাঁহার বইয়ের পুঁটলিটি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। লোকটির সাধুসেবার আগ্রহ। কিন্তু হরি মহারাজ কোনমতেই রাজি হইলেন না। কিন্তু লোকটিও নাছোড়বান্দা। শেষে হরি মহারাজের দয়া হইল। লোকটি যেন তাহাতে কৃতার্থ হইল। সে মহানন্দে হরি মহারাজের বইয়ের পুঁটলিটি বহন করিয়া চলিল।

(২)

রাজা মহারাজ ও নটরাজের নৃত্য

দক্ষিণদেশের মন্দিরে নটরাজের নৃত্যপর মূর্তি দেখিয়া রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। নটরাজের যেমন পা উঠাইয়া নৃত্যের ভঙ্গিমা, ঠাকুরও নাচিবার সময় ঐরূপ পা উঠাইয়া নাচিতেন। অদ্ভুত এই সাদৃশ্য দর্শনে মহারাজ অভিভূত হন।

(৩)

'আসনে সাধু, বিবরে সাপ'

পূজনীয়দের কাছে এই প্রবাদবাক্যটি বহুবার শুনিয়াছি—'আসনে সাধু, বিবরে সাপ।' বিবর অর্থাৎ সাপের গর্ত। সাপ যখন গর্তে থাকে তখন তাহার বল অসীম। তখন নিকটে কাহাকেও পাইলে আর রক্ষা নাই। সেইরূপ আসনেই সাধুর বল। যত সে নিজের আসনে থাকিবে তত সে বলবান। সাধু সকালে আটটার পূর্বে নিজের আসন ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইবে না। এবং বৈকালে সন্ধ্যার পূর্বেই ভ্রমণ শেষ করিয়া নিজের আসনে ফিরিয়া আসিবে। তবেই সাধুর বল অটুট থাকিবে। নতুবা বাহিরে নানা প্রলোভনের বিপদ। আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। তাই এই প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে—'আসনে সাধু, বিবরে সাপ'।

স্বামী জগদানন্দ কথিত

গীতায় সর্বযোগের সমন্বয়

গীতায় যোগ-চতুষ্টয়ের সমন্বয়ের কথা আছে। অর্থাৎ কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র-ভাবে মুক্তির সাধন—একথা আছে।

কর্মদ্বারাই মুক্তি

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ (৩।১৯)

জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি

"যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম ॥

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥
(১২।৩ ৪)

ভক্তিদ্বারাই মুক্তি

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।॥ (১১।৫৪)

রাজযোগের দ্বারাই মুক্তি

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥"
(৫।২৭-২৮)



বাতায়ন

সত্যের জন্য অনন্ত অন্বেষা

বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজেতা, দানিল গ্রানিন-এর সঙ্গে, ধর্ম ও নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে এবং বিজ্ঞানের ওপরে একজন পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সম্বন্ধে, আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার একটি সাক্ষাৎকার আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

ধার্মিক পণ্ডিত—ব্যাপারটা অনেকের কাছে আপাতবিরোধী বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীদের নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনের কাজে আপনি বহু বছর ব্যয় করেছেন। ধর্ম কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে আদৌ মানিয়ে চলতে পারে? আপনার কি মনে হয়?

বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে যেকোন বইয়ের পাতা উলটে গেলেই আপনি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু ধর্মবিশ্বাসীর নাম পাবেন। অপেক্ষাকৃত নিকট অতীতের কথাই ধরুনঃ আপনি পাচ্ছেন প্ল্যাঙ্ক, হেইসেনবের্গ আর আইনস্টাইনকে। মাত্র তিনজনের নাম করা গেল। তাঁরা যে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন, নিয়মিত গীর্জায় যেতেন, তাও নয়। কিন্তু তাঁরা দেখেছিলেন বাস্তব সম্বন্ধে সমস্ত মানবিক উপলব্ধির ওপরে এক ঐশ্বরিক অস্তিত্ব, মনীষার অতীত এক পরম মানস। বিশ্ব সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, জীবনের অর্থ সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব সব ধারণা ছিল। রুশ বিজ্ঞানেও এরকম অনেকে ছিলেন। পাভলভ কিংবা বিখ্যাত চক্ষুরোগ-চিকিৎসক ফিলাতভের নাম করলেই যথেষ্ট।

অত্যন্ত বিশিষ্ট 'বায়োমেট্রিস্ট' আলেকজান্দার লুবিশেচভ-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি জীববিদ্যার সঙ্গে গণিতকে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন; বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রজননবিদ্যা, অভিব্যক্তি আর ভ্রূণবিদ্যা সম্বন্ধে বহু বই ও নিবন্ধের রচয়িতা, এবং ছিলেন একজন অনন্য দার্শনিক আর সেই সঙ্গে অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি।

কিংবা ধরুন অগ্রগণ্য সোভিয়েত ভ্রূণবিজ্ঞানীদের অন্যতম পাভেল স্তেৎলভ-এর কথা। তিনিও ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের পাশাপাশি বাস করতে পারে? বহু বিজ্ঞানী নিজেরাই এর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। দেখতে পাবেন, হেইসেনবের্গ-এর কিংবা লুবিশেচভ-এর এ-সম্বন্ধে আগ্রহোদ্দীপক সব ধারণা ছিল। এ'রা বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরোধ দেখতে পাননি। তাঁদের কাছে ধর্ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রের

বাইরে বিস্তৃত এবং অজ্ঞাতের অনন্ত পরিসরে সে তার ইচ্ছা মতো জায়গা জুড়ে স্থান পেতে পারে। বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস কখনো পণ্ডিতদের মনে একে অপরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে না। সেই জন্যেই তারা সুপ্রতিবেশী, এবং সেই জন্যই নাস্তিকদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি কাজে লাগে না।

সময় কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অনেক নেতা ক্রমেই আরও বেশি করে ঐশ্বরিকতায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকে এমন-কি, ধর্ম অবলম্বন করছেন। ঠিক বলেছি কি?

ঠিক বলেছেন। সর্বাগ্রগণ্য জীবপদার্থবিদ্‌দের মধ্যে কয়েকজনের কথা বলতে পারি—যাঁদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার বড় প্রবল, তাই আমি তাঁদের চিনিয়ে দিতে পারিনে। যেমন, নেতৃস্থানীয় একজন সোভিয়েত জীবকোষবিজ্ঞানী ('সাইটোলজিস্ট') এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, কোষের আত্মা আছে। এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস এতই সুদৃঢ় যে, এমন-কি, কোষের স্তরেও তিনি এর অস্তিত্ব দেখে থাকেন।

প্রাকৃতিক বিষয়গুলির বিজ্ঞানীরা যে কিভাবে ধর্মে এসে পৌঁছান, সে-কথাটা আমি প্রায়ই ভেবে দেখেছি। আমি যতদূর জানি, বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি তাঁদের মনকে এই মহাবিশ্বের অলৌকিক সুসংগতি সম্বন্ধে মর্মগ্রাহিতায় ভরে তোলে। এবং সেটাকে যিনি এক নজরেও দেখেছেন, তিনি তার সামনে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি প্রাণীই এক জটিল শৃঙ্খলজালে অন্যসব প্রাণীর সঙ্গে যুক্ত। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যায়, রসায়নে আর জীববিদ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তনমূলক সিদ্ধান্ত-সূত্রগুলিকে সন্দেহ করেন। প্রাকৃতিক বিধানগুলির একবারে সারমর্মকেই তাঁরা সন্দেহ করেন—যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার বর্তমান স্তরে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। তাঁদের মন বাস্তবের গভীরে যতোই বেশি করে অনুপ্রবেশ করে, ততোই আরো বেশি করে তারা এই মহাবিশ্বের আর অণুবিশ্বের সৌন্দর্য আর সুসংগতি দেখে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েন। অনুসন্ধানী মন ফিরে তাকায় সেই আদি চালিকা শক্তির দিকে, নিখিল বিশ্বের সেই আদি আর অন্তের দিকে। তার পিছনে পরম শক্তির দিকে—মানুষের জ্ঞানের অতীত সব বিধান আর পার্থিব জীবনের ঐশ্বরিক উৎসের দিকে। বিজ্ঞান অসহায় বোধ করে বলেই যে ঐশ্বরিক জিনিসগুলির দিকে ধাবিত হয়, তা নয়। বরং উলটো। বিশ্লেষণাত্মক গভীরতা থেকেই বিজ্ঞান তা করে। কিছু পণ্ডিত মানুষের মনের পিছনে একটা অজ্ঞেয় শক্তি, বস্তুর পিছনে একটা প্রাথমিক যুক্তি অনুভব করেন।

এইসব দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচার করার সময়ে আমাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর সুকৌশলী বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা চাই। এক্ষেত্রে আমরা অগ্রগণ্য সব তাত্ত্বিক আর পরীক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করছি। খুব বড় রকমের সব মনীষাসংক্রান্ত কাজকর্ম স্থূল বস্তুবাদকে করে দেয়—যে স্থূল বস্তুবাদ আমাদের মধ্যে এত জনপ্রিয়। কারণ, সেই স্থূল বস্তুবাদ থেকে কোনকিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রথম দৃষ্টিতে, সভ্যতা তার রোবট, কম্পিউটার ইত্যাদি নিয়ে মানুষের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা নিতান্তই ভুল। প্রযুক্তিবিদ্যার যতই অগ্রগতি ঘটেছে, আমরা ততই মানুষের আত্মা সম্বন্ধে আরও বেশি করে চিন্তা-ভাবনা করছি। জয়যুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে, এটা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও সত্য যে, বিবেক আর হৃদয় একেবারে সম্মুখভাগে এগিয়ে এসেছে—এদের অযৌক্তিক প্রকৃতি সম্বন্ধে যে যতই আপত্তি তুলুক না কেন।

নিখুঁত এক যুক্তিসঙ্গত আর কর্মদক্ষ ইলেকট্রনিক পরিবেশে যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই

আরও বেশি স্পষ্টভাবে তার নিজের মধ্যে দেখছে একটা অযৌক্তিক জগৎকে—অনুভূতি, পূর্বানুমান আর আকুতির এক জগৎকে, ব্যাখ্যাতীত আচার-আচরণের এক জগৎকে।

এবং একথাটা যেন আমরা কখনো না ভুলি যে, মানুষ সব সময়েই প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে-প্রকৃতির সঙ্গে তার ব্যবহারটা হলো আক্রমণকারীর মতোই। পরিবেশ-সংবাদ প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল আর পরস্পরের সঙ্গে জোট পাকিয়ে যাওয়া যোগসূত্রগুলির দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, এবং তার রাজ্যে আমাদের স্থান কোথায়—সে-সম্বন্ধে পুনর্মূল্যায়ন করতে আমাদের উদ্যোগী করে তুলেছে।

মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্তি—একথা খ্রীস্টধর্ম আমাদের শিখিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত-সূত্রটি মানুষকে তার নিজের দৃষ্টিতেই উঁচু করে তুলেছে। কিন্তু এখন এর সদর্থক বাণীটি লোপ পেয়ে গেছে এবং এটা শুধু প্রকৃতির প্রতি মানুষের প্রভুত্বসূচক ধ্বংসাত্মক মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেয়। দেব-দেবীদের উপাসনা করতো যারা, তাদের ধর্ম ছিল প্রকৃতির প্রতি বেশি সহৃদয়—প্রকৃতির নানা উপাদানকে তাতে দেব-দেবী হিসাবে মূর্তরূপে দেওয়া হতো এবং মানুষকে দেখা হতো প্রকৃতিরই অংশ হিসাবে। এখন এধরনের ধারণা-ভাবনা খ্রীস্টীয় ধারণাগুলির চেয়ে কাজের হতে পারে। আর যাই হোক, আমরা মানুষেরা কেন নিজেদের প্রকৃতির চেয়ে বড় করে দেখব? শুধু বর্বরশক্তির জোরে?

সমসাময়িক বিজ্ঞান হলো সর্বদা পরিবর্তনশীল নানা সত্যের এক অসীম সমুদ্র। বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলির—যেসব ধারণাকে আমরা এত অকাট্য আর সঠিক বলে মনে করি—একের পর এক আমূল রূপান্তর ঘটে চলেছে। বৈজ্ঞানিক মনের পক্ষে এ এক নাটকীয় ব্যাপার। তাই পণ্ডিতেরা ধর্মের মধ্যে যেসব শাশ্বত সত্য দেখছেন, সেগুলির মুখাপেক্ষী হয়েছেন—অন্ততঃ আমি তো সেই ভাবেই দেখি। আপনার কি মনে হয়?

বাস্তবিক পক্ষে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পুরাতন সত্যগুলিকে ধূলিসাৎ করে না। সেগুলিকে বিবর্ধিত করে তোলে। মূল্যগুলি নিজেরা ততটা বদলায় না যতটা বদলায় সেই দাঁড়ি-পাল্লাটা—যেটাতে তাদের চাপিয়ে আমরা ওজন করি। অল্পকাল আগেও আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলাম যে, যতবেশি তথ্য সংগ্রহ করা যায়, ততই ভাল। জানাটা নিজেই একটি মূল্য, প্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নতুন অর্জিত জ্ঞানকে যেকোন লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত করা হবে, সেটা অন্য কথা।

এখন, অন্ততঃ আমি যা দেখছি, এই জানাটার রাশ টেনে ধরা দরকার। মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক জ্ঞান আহরণ করতে শিখেছে। অনুসন্ধানী মনকে এখন নৈতিকতার দ্বারা নিজেকে সংযত করতে হবে—তা সেই অনুসন্ধানী মন প্রজনন-ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়র পদার্থবিদ্যা অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন।

বৈজ্ঞানিক নীতিবিদ্যা আজ যতটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আগে আর কখনো তা হয়নি। পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর নিজের আত্মার মুক্তির জন্যে চিন্তা-ভাবনা করুন। অন্যথায়, তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে মারাত্মক সীমারেখাটির ওপারে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

জ্ঞান আহরণের জন্যে ছুটে চলার সময়ে কোথায় থামতে হবে, তা জানাটা ভয়ানক কঠিন। বাইবেলের জ্ঞানবৃক্ষের কাহিনী আজ আমাদের কাছে পূর্ববর্তী যেকোন সময়ের চেয়ে ঢের বেশি বিজ্ঞতায় ভরা বলে মনে হয়। আমাদের গবেষণায় উৎসাহের দ্বারা আমরা নিজেদের অভিভূত হয়ে যেতে দিতে পারিনে। এমন সব ক্ষেত্র আছে যেগুলি মনের পক্ষে অভেদ্য থেকেই যায়, এবং বিদ্যমান অবস্থার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে ভূমণ্ডলব্যাপী সংঘর্ষসংকুল মুখোমুখী অবস্থান

আর সদাবিরাজমান পারমাণবিক আশঙ্কা। পণ্ডিতের নীতিবিদ্যা বিশ্বের ভাগ্যের পক্ষে চূড়ান্ত নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পশুমনস্তত্ত্ববিদদের (ইথোলজিস্ট) মধ্যে যাঁরা শুশুকদের (ডলফিন) আচরণ-ব্যবহার সম্বন্ধে অনুশীলন করেন, একটি স্ট্র্যাটেজিক গবেষণা কার্যসূচীতে যোগ দেবার জন্যে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল—যে কার্যসূচীটির উদ্দেশ্য ছিল ঐ প্রাণীদের সামরিক কাজে লাগানো। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নৈতিক কারণে ঐ কার্যসূচীতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। এটাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়াক বলে আমি কামনা করি।

জগৎটা বড় উদ্ভট জায়গা হওয়ায় এ নিজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার জন্যেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই বিজ্ঞানের পক্ষে কতকগুলি নৈতিক বিধিনিষেধ প্রয়োজন। বিজ্ঞান আর মানবতাকে হাতে হাত মেলাতেই হবে। এক মানবতাবাদী পরিবর্তন আরও বেশি অপরিহার্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে—যেটা আমাদের চার পাশের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জনের সূত্রপাত।

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে যে ব্যবস্থা, তাতে সেটা ভাবগ্রাহী নবীন মনগুলিকে মানব মনীষার মহিমাকে প্রশংসা করতেই শেখাই। এটা তাদের এই কথাই বলে যে, সমস্ত বাধার বিলোপ ঘটানোই হলো বিজ্ঞানের কর্তব্য। শিশুদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি এক যুক্তিহীন শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া কি ঠিক? নিশ্চয়ই না। যথার্থ বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে, তার মহিমাকে আর রহস্যময় সৌন্দর্যকেই শ্রদ্ধা করেন।

মানুষকে অনুভব করতে হবে যে, সে এই বিশ্বেরই একাংশ, কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব প্রচার করে না, বিস্ময়ভরা শ্রদ্ধা জাগায় না, জাগায় আত্মাভিমান। তাই মানবজাতি আজ প্রাকৃতিক পরিবেশজাত সর্বনাশের মুখোমুখি। যারা যখন-তখন কোন নদীর গতিপথ বদলে দেবার পরিকল্পনা করে, কখনো বা আরেকটি নদীর বুকে বাঁধ বাঁধতে যায়, তারপরেই কোন পাহাড়কে ধূলিসাৎ করে দেবার ছক তৈরি করে, পরক্ষণেই কোন দুর্ভাগা গ্রামের এলাকা জুড়ে জলাধার তৈরির পরিকল্পনা করে, সেই চপলমতি বিশেষজ্ঞ-বাহিনীর জন্যে বিদ্যালয়গুলিই দোষী। সত্যিই মানুষ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী আর অমিতব্যয়ী ব্যবস্থাপক। কিন্তু যারা এই সচেতনতার মধ্য দিয়ে গড়ে বেড়ে উঠেছে যে, প্রকৃতি-জননী মানবজাতির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, শেষ পর্যন্ত তিনিই সর্বদা অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হন, এবং তাঁকে লঙ্ঘন করে আমরা পার পেয়ে যেতে পারিনে, তারা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির ও অন্যান্য বিষয়ের মোকাবিলা করে ভিন্নভাবে। তারা উপলব্ধি করে যে, প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্যে মানুষকে তার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের তৃষ্ণাকে সীমিত করতেই হবে। এই মানসিকতাই আজ আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞতর মানুষেরা যতোই আবেগের সঙ্গে আর অবিরাম ভাবে আবেদন করুন না কেন, মানবজাতি এখনও তার আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থগুলিকে অনুসরণ করে চলেছে, তার পরিণাম যাই হোক না কেন। বিজ্ঞানীদের আর শিল্পপতিদের লোভই আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার জন্যে, বৈজ্ঞানিক পুরস্কার লাভ আর অন্যান্য তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। *

* সোভিয়েত দেশ (ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগের মুখপত্র- কলকাতা থেকে প্রকাশিত), সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ২৬-২৮

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সুবর্ণযুগে' বিজ্ঞান-চেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য

অরুণকুমার বিশ্বাস

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে ভাবান্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে তার ব্যাপ্তি বহু শতাব্দী অতিক্রম করে যাবে বলে মনে হয়। সেই আন্দোলনের পূর্ণ স্বরূপ এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। ১৮৮২—১৮৮৬ এই কয়েকটি বৎসরকে আমরা উক্ত ভাবান্দোলনের 'সুবর্ণযুগ' বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ, ঐ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একে একে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং শ্রীঠাকুর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের উদ্বোধিত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মর্মার্থ নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে কিছুটা দ্বিমত ও মতান্তর ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্যই সকলে মেনে নিয়েছেন। জীবসেবা, দেশপ্রেম, সাম্য, আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে ঠাকুর বেশি কিছু প্রকাশ্যে বলে যাননি, তবে 'নরেন শিক্ষে দিবে' এই কথাটি স্বহস্তে লিখে গেছেন, যা আমরা বেদবাক্য বলে শিরোধার্য করেছি। আমরা আরও অনুধাবন করেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানকে জগদ্-হিতের অন্যতম সোপান বলে স্বাগত জানিয়েছেন। অতএব 'সুবর্ণযুগে' (১৮৮২—১৮৮৬) অর্থাৎ ঠাকুরের মরদেহের শেষ চার বছরে কলকাতা নগরীতে বিজ্ঞানচেতনা কিরূপ বিদ্যমান ছিল এই আলোচনাটি* সঙ্গত বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গটির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ একটি পৃথক গ্রন্থের বিষয়। এখানে কয়েকটি স্বল্পজ্ঞাত তথ্যের পরিবেশন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

॥ ২ ॥

আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর যাঁদের কথা উল্লেখ করব তাঁরা হলেন বিজ্ঞানসাধক মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার ইউজিন লাফোঁ (Father Eugene Lafont), জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় শিষ্য যথা রামচন্দ্র দত্ত, হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) ইত্যাদি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩—১৯০৪) এবং ফাদার ইউজিন লাফোঁ (১৮৩৭—১৯০৮)-কে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের (১৮৩৬—১৮৮৬) সমবয়সী এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক' বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা মৌলিক গবেষণার কার্যে তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' (এই প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানসভা') স্থাপনা তাঁদের অক্ষয় কীর্তি।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ক্যাথলিক (Society of Jesus -এর) পাদরী ফাদার লাফোঁ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বেলজিয়ামে তিনি পদার্থবিদ্যা-চর্চায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া (Meteorology) এবং বর্ণালী জ্যোতির্বিদ্যা (Spectro-telescopy) সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি দূরবীক্ষণ এবং অন্যান্য বহু যন্ত্রপাতির সমাবেশ করেন। ১৮৬৮ থেকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ফাদার লাফোঁর বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তৃতা কলিকাতাবাসীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিল। মহেন্দ্রলাল এক বিজ্ঞানসভার পরিকল্পনা করেন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। ফাদার লাফোঁর সহায়তায় এবং অনেকের বদান্যতায় বিজ্ঞানসভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। ২১০ বৌবাজার স্ট্রীটে স্থাপিত বিজ্ঞান-সভার গবেষণাগারে কাজ করেই অধ্যাপক সি. ভি. রামন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানসভা দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানসভা স্থাপনায় যাঁরা আর্থিক এবং অন্যপ্রকার

* গত আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৯৬) উদ্বোধন-এ এই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখেছেন দেবিদাস বসু ও জলধিকুমার সরকার।—যুগ্ম সম্পাদক

সাহায্যদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পাওয়া যায়, যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, যদুলাল মল্লিক, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। বিজ্ঞানসভা ছিল মহেন্দ্রলালের প্রাণ এবং এর প্রসঙ্গ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে বারবার উত্থাপন করেছেন। ফাদার লাফোঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার না হলেও, লাফোঁর ছাত্ররা যথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং বিজ্ঞানসভায় তাঁর সহকর্মী রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১—১৮৯৯) ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে সি. এইচ. উডের কাছে কুইনিন পরীক্ষা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ-কার্যের পাঠ নেন এবং তাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে তিনি কুর্চি নামক বৃক্ষের ছাল থেকে রক্ত-আমাশার ঔষধ কুর্চিসিন আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ইংলন্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য (F. C. S.) হিসাবে নির্বাচিত ও সম্মানিত হন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগমন করার আগে তাঁর বিজ্ঞানপিপাসু মনে নাস্তিকতার সংশয় ছিল। "দিনের আকাশে দেখা না গেলেও তারকার অস্তিত্বে সংশয় করা উচিত নয়"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিখ্যাত উপদেশে রামচন্দ্রের মনে ঈশ্বরবিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের সম্বন্ধে অনেকেই অল্পবিস্তর জানেন। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯৩৮)—পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট) সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য এই প্রবন্ধে পরিবেশিত হবে।

॥ ৩ ॥

Indo-European Correspondence (সংক্ষেপে 'Indo') ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা। কলকাতার ক্যাথলিক সমাজের মুখপত্র হিসাবে সুদীর্ঘকাল (১৮৬৫—১৯০২) প্রতি বুধবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

উক্ত পত্রিকাতেই পাই কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরের আদি বর্ণনা—যার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতার স্মৃতি বিজড়িত আছে:

"The room into which we pass (from the entrance on the left) is magnificent and planned with a view to house the skeletons of all the beasts in and out of Noah's ark".[১]

ঐ সময়েই (সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে) শ্রীরামকৃষ্ণ যাদুঘরে তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ এবং পাথর হয়ে যাওয়া জানোয়ারের দেহ দেখেছিলেন।[২]

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ফাদার লাফোঁ এবং তাঁর সহকর্মীরা, যথা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ফাদার অলফোনস ডি পেনারান্ডা (Father Alphonse de Penaranda) আবহাওয়া এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা অক্লান্তভাবে করে চলেছেন—তার বিবরণ Indoতে প্রকাশিত হতো।[৩] ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে লাফোঁ তাঁর প্রিয় শিষ্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্য certificate লিখে দেন যাতে শিষ্যের ইংলন্ডের পড়াশুনা করতে কোন অসুবিধা না হয়। চার বৎসর পরে জগদীশচন্দ্র কুশলী বিজ্ঞানী হয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৮০—১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানসভায় ফাদার পেনারান্ডার জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত এবং তারাপ্রসন্ন রায়ের রসায়ন-সংক্রান্ত বক্তৃতা সেদিনের তরুণ ছাত্র, উত্তরকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বহু কলিকাতাবাসীর চিত্তহরণ করে। ২৩ জুন ১৮৮১ তারিখে লাফোঁ 'The Truth about Galileo's Condemnation' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের 'সুবর্ণযুগ' শুরু

১ Indo, 'A Visit to Calcutta Museum', April 21, 1877, p. 303 (এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত এবং ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গীর বর্তমান বাসভবনে স্থানান্তরিত হয়।)

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (এর পরে 'কথামৃত' বলে উল্লিখিত), উদ্বোধন সংস্করণ (১৯৮৭), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৭২, ৪৭৬ এবং দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৯।

৩ পরবর্তী কালে এই সম্পর্কিত তথ্যাদি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল: E. Francotte, Meteorological Observations at St. Xaviers College, Calcutta (1868-1913), Part I, Calcutta, 1918

হয়েছে। তখনই দেখি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গবেষণাগারে দূরবীক্ষণের সাহায্যে "gigantic solar disturbances were recorded by electric pen" (২৫ এপ্রিল, ১৮৮২) এবং মে মাসে "first solar eclipse was studied at Calcutta with Steinheil equatorial spectro-telescope, and thermo-, photo- and spectrometric measurements made to study sunspots, sun's chromosphere, lunar mountains etc."[8] ১৯ অক্টোবর ১৮৮২ পেনারান্ডা কলিকাতার আকাশে পর্যবেক্ষিত ধাবমান ধূমকেতু সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ আগস্ট সুমাত্রার ক্রকটোয়া (Krakatoa) আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ হয়, যার প্রভাব কলিকাতায় আকাশের বায়ুর চাপে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রক্ষিত Secchi's Meteorograph-এ বায়ুর চাপের আন্দোলন নথিভুক্ত হয় এবং সেই তথ্য প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ মার্চ ২১০ বৌবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত বিজ্ঞানসভার গৃহে বক্তৃতাকক্ষের ভিত্তিস্থাপন করেন লর্ড রিপন এবং তিনিই ঠিক দু-বছর পরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ নবনির্মিত বক্তৃতাকক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এরপর থেকে বিজ্ঞানসভা-আয়োজিত মহেন্দ্রলাল ও লাফোঁর বক্তৃতাবলী কলিকাতাবাসিগণকে অধিকতর আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণা করেছেন:

"ঐ সময় (১৮৮৩-৮৪) সদর স্ট্রীটের বাসায় থাকাকালীন বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটি আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। Huxley-র রচনা হইতে জীবতত্ত্ব এবং Lockyer, Newcombe প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতাম।"[৫]

এই সময় রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন শিক্ষক পেনারান্ডা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা এবং বক্তৃতা করে চলেছেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'Brahmo Public Opinion'-এ ঘোষিত শুভসংবাদ মুদ্রিত হয় Indo-তে: "বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভ করে জগদীশচন্দ্র বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।"[৬]

|| ৪ ||

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) এবং হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এফ. এ. ক্লাসে যোগদান করেন ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ক্রমশঃ ফাদার লাফোঁ প্রমুখ বিজ্ঞানসাধক ও শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। আবার ঐ সময়ই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যে অভিভূত হন। সতীর্থ স্বামী সারদানন্দের সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশের আগে, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে 'পরমহংস-চরিত' (হিন্দিতে) লিখেছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। এটিই শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যের রচিত সর্বপ্রথম জীবনী। বিজ্ঞানানন্দজীর জীবন সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে।[৭]

'লীলাপ্রসঙ্গে' বর্ণিত হয়েছে সারদানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজীর (২৬ নভেম্বর ১৮৮৩) পরমহংস দর্শনের অপূর্ব স্মৃতি।[৮] তার পনের দিন পরে ১১ ডিসেম্বরের পুরস্কার বিতরণী সভায় হরিপ্রসন্নকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হয় এবং পুরস্কার দেওয়া হয়।[৯] প্রথম হন হেনরি মনিয়ার (Henry Monnier)। পরের বছর হরিপ্রসন্ন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তৃতীয় হওয়ার পুরস্কার পান।[১০] পরের বছর (১৮৮৫) হরিপ্রসন্ন এফ. এ. পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং সমগ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ২১তম স্থান অধিকার করেন। সতীর্থ (এবং উত্তরকালের 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' পত্রিকাদ্বয়ের প্রসিদ্ধ সম্পাদক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলে-জের আরো পাঁচজন ছাত্র হরিপ্রসন্নের চেয়ে ভাল ফল লাভ করাতে[১১] কি হরিপ্রসন্নের আত্মীয়েরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন? 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন'-এর

8 Indo, April 26, May 17 and 24, 1882, pp. 385, 483, 489, 494.

৫ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, ১৩৫০ সং, বিশ্বভারতী, ৪০৩ পৃঃ পাদটীকা, ৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠায় ফাদার পেনারান্ডা সংক্রান্ত স্মৃতি, Indo এবং বিজ্ঞান সভার রিপোর্ট ১৮৮৩-৮৪। ৬ Indo, November 19, 1884, p. 1107.

৭ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ: পূর্বাশ্রম-জীবনের একটি ঘটনা, জ্যোতির্ময় বসুরায়, উদ্বোধন, ১০৯৬, পৃঃ ৭৫১-৭৫৪

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ (১৩৫৮), পৃঃ ২৪

৯ Indo, Dec. 19, 1883, p. 1209 ১০ Indo, Dec. 24, 1884. p. 1233

ওপর তাঁরা বীতরাগ তো ছিলেনই। এফ. এ. পরীক্ষার ফল 'Statesman'-এ প্রকাশিত হয় ২৪ মে এবং Indo-তে পুনর্মুদ্রিত হয় তিনদিন পরে। ঐ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় রোগের সূত্রপাত।[১২]

আত্মীয়েরা স্থির করেছিলেন যে, হরিপ্রসন্ন তাঁর দিদির কাছে থেকে পাটনাতে বি. এ. পড়বেন। সারা ভারতবর্ষে তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের থেকে ভাল শিক্ষাব্যবস্থা আর ফাদার লাফোঁ ইত্যাদির থেকে ভাল অধ্যাপক কোথাও ছিল না বললেই হয়। তাই মনে হয় আত্মীয়দের এই সিদ্ধান্তের (হরিপ্রসন্নকে কলিকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার) মূল কারণ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। বিজ্ঞানানন্দ উত্তর-কালে স্মৃতিচারণা করেছেন—শেষ যে রাত্রি তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, সেই রাত্রে শ্রীঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হয়। এই তাঁর ঠাকুরকে শেষ দেখা। তারপরই তিনি বাঁকিপুর (পাটনা) চলে যান।[১৩]

পাটনায় চলে গেলেও হরিপ্রসন্নকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভোলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখের সময় জিজ্ঞাসা করতেনঃ "বেলঘরে হতে যে ক্ষয়া ক্ষয়া কালো রঙের টগরা বামুনের ছেলেটা আসত তার খবর কি?"[১৪] আবার তাঁর ওপর বিজ্ঞানসাধক ফাদার লাফোঁর প্রভাবও হ্রাস পায়নি। তিনি ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে অনেক গঠনমূলক কাজ করেছেন। বেলুড় মঠের পুরাতন গৃহ এবং মন্দিরগুলি সবই তাঁর কর্মকুশলতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে দুটি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, হিন্দু জ্যোতিষের গণনা পাশ্চাত্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষিত তথ্যের দ্বারা মধ্যে মধ্যে শোধিত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে "ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইংরেজী মানমন্দির (observatory) নির্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক"। এই বাক্যটি রচনার সময় তিনি সম্ভবতঃ সদ্য পরলোকগত (১৯০৮) প্রাক্তন শিক্ষক ফাদার লাফোঁর কথা চিন্তা করেছিলেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে (মাঘ ১৩১২) রচিত 'জল-সরবরাহের কারখানা' গ্রন্থে বিজ্ঞানানন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সেখানে নবীন ভারতে শিল্পবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন, এমনকি ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞান-চেতনা সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন যা পরবর্তী কালে বিশেষ-ভাবে আলোচিত বা উদ্ধৃত হয়েছে বলে মনে হয় নাঃ "ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কলকারখানার আভ্যন্তরিক শক্তি অনুভব করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতেন ও শিল্পাদি বিদ্যার বড়ই আদর করিতেন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, স্থাপত্য শিল্পাদি বিদ্যার অভ্যুদয় এবং প্রচার হইতেই জাতীয় উন্নতির প্রারম্ভ হয়। আমাদের দেশকে উন্নত করিতে হইলে আবার ঐ সকল বিদ্যার উন্নতি ও প্রচার আবশ্যক।"

॥ ৫ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন গলার অসুখের সূত্রপাতে ২৬ সেপ্টেম্বরের (১৮৮৫) পূর্বে কোনদিন তিনি চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে যান। তবে ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতেই ১২ অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখে মহেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম শ্রীঠাকুরের চিকিৎসা শুরু করেন।[১৫] তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতি-বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলালের সঙ্গে অধ্যাত্ম রাজ্যের কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাথমিক আলাপ গভীর অন্তরঙ্গতা ও সমমর্মিতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিভাষা অনুযায়ীঃ "নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয়বুদ্ধির নাম জ্ঞান। আর তাঁকে বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান।"[১৬] আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'সায়েন্স' এবং তাঁর মতে, আগে ঈশ্বরলাভ পরে সায়েন্স।[১৭] অর্থাৎ চরম উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক 'বিজ্ঞান', সাধারণ সায়েন্স নয়। আমরা এই প্রবন্ধে সায়েন্স অর্থে 'বিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেছি। [ক্রমশঃ]

১১ Indo, May 27, 1885, p. 481
১২ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২৯, ৯৫৩
১৩ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৫৪, পৃঃ ২২৫। 'শেষ রাত্রি'টি এপ্রিল মাসে অথবা মে মাসে—এফ. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবার আগে অথবা পরে? আগে হলে আত্মীয়দের তৎপরতা লক্ষণীয়।
১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৩ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭
১৫ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৮৫, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫, পাদটীকা।
১৬ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭৯, ১০৯৯; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০০, ৭৪৩-৪৪,
১৭ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১৫

জীবনের এপার-ওপার ও তার রহস্য

স্বামী জগদাত্মানন্দ

আমরা যে জীবনকে "জীবন" হিসাবে জানি তা এক সম্পূর্ণ বৃত্তের অর্ধাংশ মাত্র। বাকি অর্ধাংশ আমাদের চোখের আড়ালে, এই জীবনের ওপারে থেকে যায় বলে তা আমাদের অজানা। সাধারণ জীবন যাপনে আমরা অভ্যস্ত, তাই বাকি অর্ধাংশ সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। একটি নদীর উৎস থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমগ্র নদীটির গতিপথ সম্বন্ধে আমাদের ভাল ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু তা মোটেই নদীটির সম্পূর্ণ পরিচিতি নয়। নদীর জীবন-প্রবাহের আরও একটা দিক আছে, সেটা খুবই সূক্ষ্ম। আমরা জানি, সমুদ্র থেকে কিভাবে সূর্যের কিরণের দ্বারা জলকণাগুলি বাষ্পাকারে ওপরে উঠে মেঘ হয়ে পুনরায় বারিধারারূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এবং তা নদী-নালারূপে ধাবিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়। নদীর জীবনের এই অংশ আমাদের জানার বাইরে থাকে। এমনিভাবে আমাদের জীবন-প্রবাহেও অদৃশ্যে অনেক কিছুই ঘটে থাকে।

আমরা স্থূলশরীরকে সর্বস্ব বলে মনে করি, যা শুধুমাত্র জন্ম-মৃত্যু গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, স্থূলশরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় না। সাধনোপলব্ধ জ্ঞানিজনের যোগ-দৃষ্টিতে এটা কেবল নিছক কল্পনা বা ধারণা নয়। এটা তাঁদের প্রত্যক্ষানুভূতি। হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় মুনি-ঋষিদের ধারণা ছিল যে, মানুষ শরীরসর্বস্ব নয়, সে শরীরধারী। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, কোন এক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে জীবাত্মা শরীর ধারণ ও বর্জ্জন করে, এ-জগতে বার-বার আসা যাওয়া করে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির আলোকে এবিষয়ের সুস্পষ্ট একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। গত এক শতাব্দী ধরে পশ্চিমী দেশগুলিতে এই ব্যাপারে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে আসছে।

দেহাতীত কি কিছু আছে?

আমরা কি রক্ত-মাংস-অস্থি-সমষ্টিযুক্ত স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত শুধুমাত্র মানুষ? এমন কোন শক্তি কি আছে যা দেহখোলে অবস্থান করে আমাদের সজীব করে রাখে—যা আমাদের যাবতীয় শরীর-সম্বন্ধীয় কার্যের মূল? এই স্থূলশরীর কি শুধুমাত্র সেই চেতন-শক্তির বাইরের খোলস?

আমাদের জীবন্ত শরীর ও মৃত শরীরের পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাদের যথার্থ কারণ সম্বন্ধে আমরা প্রায়শই অজ্ঞ। এবং তা জানা খুবই কঠিন। তখন আমরা জানতে পারি, একজন জীবিত মানুষের শরীরকে কেন্দ্র করে চলছে অসংখ্য ক্রিয়াশক্তি। মৃত্যুর সময় ও পরে সেই শরীরের ভিতরের চেতন সত্তা বা জীবাত্মা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন পড়ে থাকে শুধুমাত্র জড় মৃতদেহটা। যে শরীরটা এতকাল ধরে এত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, সে এখন নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় তার মধ্যে জড়ের ধর্মানুযায়ী পচনজাতীয় সব ক্রিয়াগুলি পুরোদমে দেখা যায়। এটা ভাবতে খুবই অবাক লাগে—প্রাণশক্তি এবং চেতন-সত্তার (Life and Consciousness) সাহায্যে যে জীবদেহ সজীব ছিল সেই শক্তি এখন কোথায় গেল? অন্য কথায় বলতে গেলে তার নিজ ব্যক্তি-সত্তা কোথায় গেছে? অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত জগতের চিন্তাশীল বিদ্বজ্জনেরা এই প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে আসছেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মত

ইংরেজীতে মনোবিজ্ঞানকে আমরা সাইকোলজি (Psychology) বলি। এই বিজ্ঞান-শাস্ত্র বর্তমানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সাইকোলজি শব্দের অর্থ 'আত্ম-বিজ্ঞান' হতে পারে। এই আত্মবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছিল আত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে তা যথার্থ প্রয়োগ না হয়ে মানুষের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসম্বন্ধে একটা হাসির কথা ইংরেজীতে প্রচলিত আছে—"Psychology first lost its soul, then its mind, and then its consciousness, now it has only the body with behaviour

of a kind." (মনোবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান প্রথম হারিয়েছে তার আত্মাকে তারপর মনকে, চেতনাকে এবং এখন এসে দাঁড়িয়েছে একমাত্র দেহগত ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয়ে।) জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং মনের অস্তিত্ব বিষয়ে মস্তিষ্কের যে কোন ভূমিকা নেই—এই ধারণা এই বিজ্ঞানে বহু আগে থেকেই প্রচলিত। কিন্তু বর্তমানে যদি আমরা বলি মন মস্তিষ্ক থেকে আলাদা—তাহলে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে তা হাসির কথা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এটা তাঁরা আমাদের কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেন। যদি কোন একটা বিষয়বস্তু সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় তাহলে তা নিশ্চিত ভৌতিক বলে ধরতে হয়। অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তুগুলি তাদের কাছে সবই ভ্রম। অতীন্দ্রিয় অনুভবে কিছু পরিমাণে সত্য বিষয় থাকলেও তাঁদের কাছে এসব অনুশীলনের বস্তু নয়। ওঁরা বলেন ভৌত-রসায়ন-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি মেনে তাদের মাধ্যমেই মানসিক অনুভূতির এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু আবার তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের জীবনেও বহু অতীন্দ্রিয় ঘটনাসমূহের সমাবেশ দেখা যায়। বর্তমান বিজ্ঞানের নব নব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটা তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন না। মাথার খেয়াল বা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতেও তাঁরা অক্ষম। এ-রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এসকল রহস্যের উদ্ঘাটনের জন্যই প্যারাসাইকোলজির (Parapsychology) উদ্ভব হয়েছে। 'para' শব্দটির অর্থ 'beyond' অর্থাৎ অতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং প্যারাসাইকোলজির অর্থ হলো যে-বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

মিখেল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের একজন বিখ্যাত সোভিয়েত গবেষক। তাঁর ছিল অদ্ভুত অতি-প্রাকৃত জ্ঞান। মস্কোতে কলাবিদ্যা শাখার শিক্ষানবীশ থাকার সময় তিনি সতীর্থদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করতেন। একদিন শেষরাত্রে তিনি ঘুমের মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখেন। তাঁর মা-কে একটা ইঁদুর কামড়েছে এবং সেই ক্ষতস্থানটা বিষাক্ত হয়েছে, ঠিক সেই সময় তিনিও মায়ের কাছে রয়েছেন। তাঁর মা ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শুয়ে আছেন। মিখেল মনে করলেন যে, তাঁর মায়ের মৃত্যুসময় উপস্থিত ইত্যাদি। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। শয্যা ত্যাগ করে তিনি তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে স্বপ্নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। তারা সকলেই এই বলে সান্ত্বনা দিল, স্বপ্ন মিথ্যা; সুতরাং তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। মিখেল সান্ত্বনা পেলেন না। মনের ভয় দূর হলো না। সেদিনই তিনি বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম পেলেন—তাঁর মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ—তিনি যেন শীঘ্র বাড়ি চলে যান। সেদিনই রওনা হয়ে পরের দিন সকালে তিনি মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ঠিক যেমনটি তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন সেরকমই তিনি তাঁর মাকে শয্যাশায়ী দেখলেন। জানতে পারলেন মায়ের পায়ে ইঁদুরে কামড়েছে। ডাক্তার বলেছেন বিনা অস্ত্রোপচারে তিনি আরোগ্যলাভ করতে পারবেন না। মায়ের খুবই ইচ্ছা হয়েছিল পুত্র মিখেলকে দেখার জন্য এবং তিনি তাঁর কথা সবসময় ভাবছিলেন। এই স্বপ্নের মাধ্যমে মায়ের অসুস্থ হওয়ার ঘটনাটি মিখেলের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। এযাবৎ তিনি অন্যান্য বিষয়ে যা শিক্ষা করছিলেন সেসমস্ত ছেড়ে দিয়ে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

আমরা জানি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় অধিকাংশ স্বপ্নই মানসিক কল্পনা-প্রসূত, সুতরাং ভ্রমমাত্র। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন, স্বপ্নের ভাবগুলো আমাদের অবচেতন মনের ভাষা। কিন্তু আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না আমাদের এই স্বপ্নসমুদ্র কি বস্তু, এর মূলই বা কোথায়? এরকম দেখা যায় যে, স্বপ্নে যে-ঘটনা ঘটছে ঠিক সেই মতই তা হয়তো কিছুদিন পরে বাস্তবে রূপ ধারণ করে। এমনকি স্বপ্নে একটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। এটা কি করে সম্ভব হয়? এই চিন্তা-তরঙ্গও কি রেডিওর শব্দ-তরঙ্গের মতো কাজ করে থাকে? যদিও বর্তমান সময় পর্যন্ত ভৌতবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা এর রহস্য বের করতে আমরা অসমর্থ হয়েছি, তা বলে কি এসব মিথ্যা? একে কি কাল্পনিক আজগুবি বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারব? একটু গভীরে চিন্তা করে দেখা যাক।

চলমান চিন্তারাশি

বাইরের কোন মাধ্যম ছাড়া প্রেরিত চিন্তারাশি এক ব্যক্তি থেকে বহু দূরে অবস্থিত অপর ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তা বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিন্তারাশি প্রেরকের নাম কেমনস্কি, চারশো মাইল দূরে লেনিনগ্রাড শহরে নিকোলিভ ছিলেন গ্রাহক। তাঁরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কেমনস্কি মনোগত সাতটি শব্দ-সংকেত পাঠানোর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই সেই শব্দ-সংকেত নিকোলিভের মনে জেগে উঠেছিল। আবার এই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তিন সেকেন্ডেই মোট সংকেতটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিকোলিভের কাছে, মস্তিষ্কে ই. ই. জি. র (Electro Encephalography) সাহায্যে আর দু-সেকেন্ড লেগেছিল তার পুরো অর্থ বোধগম্য হতে। মস্তিষ্কের সামনের দিকে এই সংবাদ অস্পষ্টভাবে প্রবেশ করে, মধ্যভাগে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে পিছনের দিকে স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত থাকে। এই পুরো বিষয়টিই ই. ই. জি.-র পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। প্যারাসাইকোলজি বিজ্ঞানে চলমান চিন্তারাশির সুনিশ্চিত ধারক ও বাহক হিসাবে এই ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিকোলিভ এই ধারণার বশবর্তী হবার আগে নিজে শরীরচর্চায় প্রধানতঃ শবাসনের মাধ্যমে শরীরকে প্রভূত শান্তি দিতেন। তখন ই. ই. জি. তে আলফা তরঙ্গগুলি সূক্ষ্মাকারে থাকত। মানসিক কোন প্রকার চঞ্চলতার অবস্থা হলে প্রধানতঃ ভয়, উদ্বেগাদি বিন্দুমাত্র থাকলে প্রেরকের প্রেরিত চিন্তা-তরঙ্গগুলি নিকোলিভের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। এখানে প্রেরক তার শব্দচিন্তা-বিষয় পাঠাবার আগেই গ্রাহকের মুখাবয়বসহ তার উপস্থিতির সান্নিধ্য অনুভব করে সেই চিন্তা-তরঙ্গটি গ্রাহকের কাছে প্রেরণ করে। তখনই সেটি গ্রাহকের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। বর্তমানে বহু অত্যাধুনিক গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই চলমান চিন্তারাশির বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। জড়বিজ্ঞানের প্রমাণ যা দেশ-কালের সীমাবদ্ধ ঠিক সেরকম ভাবে এই বিষয় কখনই দেখানো যেতে পারে না। কারণ এই চিন্তাশক্তি দেশ-কাল ছাড়িয়ে বহুদূরব্যাপী সম্প্রসারিত। এখন যদি দেশ-কালের অতীত এই চিন্তাশক্তির গতিক্ষমতা হয় তাহলে এই চিন্তাশক্তির ধারক বা বাহক বলে আমরা যাকে জানি সেই মনের প্রকৃত অবস্থাটাই বা কি, এবং তার কার্যক্ষমতাটাই বা কি? মৃত্যুর পরও যা এই স্থূল চোখের গোচর নয় এরকম কোন বস্তুর অস্তিত্ব আত্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষকের দৃষ্টিতে দৃঢ়ভাবে ধরা পড়ে। বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা স্থূল মস্তিষ্ক ধ্বংস হবার পরও সূক্ষ্মতম বস্তুর প্রত্যক্ষ অবস্থান আছে বলে বিশ্বাস করেন।

দ্বারে করাঘাত

রাত প্রায় একটা। গোপাল গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ সে শুনতে পেল, "গোপাল ও গোপাল" বলে কে যেন ডাকে। পরিচিত সুর। তক্ষুণি বিছানা ছেড়ে দরজা খোলবার জন্য এগিয়ে গেল। "আমি রামেশ্বর। গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছি, রঘুবীরের সেবা পূজাদি ভালভাবে যেন হয়। তোমার দরজা খোলার দরকার নেই, আমি স্থূল শরীরে নেই। তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। আমি চললাম।" গোপাল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসব শুনল। রামেশ্বরের সঙ্গে গোপালের খুবই হৃদ্যতা ছিল। দরজা খুলে সে কাউকে বাইরে দেখতে পেল না। সে-ঘটনা সত্য কি মিথ্যা জানবার জন্য রামেশ্বরের বাড়ির দিকে রওনা হলো। রামেশ্বরের খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, বাস্তবিকই সে কিছুক্ষণ আগে মারা গিয়েছে।[১]

আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি যে, মানুষের স্থূল-শরীর ত্যাগ করার পরও তার মধ্যে জীবন্ত মানুষের মতো যাবতীয় গুণগুলি যথাযথরূপে অবস্থান করে থাকে, স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তা হারিয়ে যায় না। শুধুমাত্র আমরা এই খোলা চোখে তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি না—এই যা। উপরোক্ত উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায় যে, মানুষ শরীর নয়, শরীরধারী, দেহ নয়, দেহধারী; স্থূল

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, সাধকভাব (১৩৫৮), পৃঃ ৩৭৯-৩৮০

শরীরটা বহিরাবরণ মাত্র। পুরাকাল থেকে ভারতের যোগী-ঋষিরা অনুভব করেছিলেন আমাদের সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত।

জীবাত্মা

সিদ্ধ যোগীদের কাছে সূক্ষ্মদেহ প্রত্যক্ষানুভূত—শুধুমাত্র বিশ্বাসের বস্তু নয়। যোগশাস্ত্রে এই ধরনের অনুভবকে 'অলৌকিক প্রত্যক্ষ' বলে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এসব অভিজ্ঞতা একেবারে দেহাতীত কিছু তা নয় অর্থাৎ তা যে অনুপলব্ধ বিষয় তা নয় কখনই, কারো কারোর ক্ষেত্রে এই দেহাতীত বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যক্ষগোচরীভূত হয়ে থাকে। যেমন আমরা প্রায়ই শুনতে পাই প্রেতাত্মা (spirit) অপর কোন শরীরের ওপর ভর করে। এসমস্ত বহুলাংশে মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ, অতিরঞ্জিত দুর্বল মস্তিষ্কের খেয়াল হলেও সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেহেতু এর মধ্যে সত্যের আলোকরশ্মি আমরা অনেকাংশে পেয়ে থাকি।

আমেরিকার ট্রান্সপারসোনাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের গবেষকরা এসম্বন্ধে গবেষণাগারে কি কি ফল পেয়েছেন সেটা তাঁরা তাঁদের পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। টপেকার ভেটারন্স হসপিটালে সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডঃ স্টুয়ার্ট টয়েমলো বলেন বৈজ্ঞানিকদেরই নিজেদের দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধি করতে হবে। গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে দেহাতীত অনুভূতি এবং সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থিতির টয়েমলো বহুবার প্রমাণ পেয়েছেন।

তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেগুলির অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি রাশিয়ায় এবিষয়ের উন্নতিকল্পে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। সূক্ষ্মশরীরকে তাঁরা ইথারিক বডি বা এনার্জি বডি (Etheric body বা Energy body) বলেন। সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর বিনষ্ট হওয়ার সময় অর্থাৎ মানুষ মরে যাওয়ার সময় এই অস্থি মজ্জা-শোণিত-বেষ্টিত শরীর থেকে বের হয়ে যায়। স্থূলশরীর ত্যাগের পরেও ঐ সূক্ষ্মশরীরে চেতনা (consciousness) ও সূক্ষ্মক্রিয়া (activity) থাকে। এটা সোভিয়েত রাশিয়ার গবেষকেরা কীরলিয়ান যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন।

আমাদের সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এই সূক্ষ্মশরীরের ওপরই যথার্থ নির্ভর করে থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর যখন আমাদের স্থূলশরীরের মধ্যে থাকে তখন আমরা সেই শরীরধারীকে জীবন্ত বলে থাকি। নতুবা সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরকে ছেড়ে দিলে আমরা সেই শরীরকে মৃত বলে সাব্যস্ত করি। এই সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-শক্তি, মন, বুদ্ধিসহ আমাদের অসংখ্য অনুভবের সূক্ষ্ম-সংস্কার, আমাদের বাসনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃত সুকৃত-দুষ্কৃতের সংরক্ষণ রয়েছে। এটাকে সাধারণতঃ জীবাত্মা বলে থাকি। যাঁরা দেহত্যাগ করেছেন তাঁদের তীব্র সংবেদনশীলতা এবং জানবার শক্তি থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের নাশ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, মৃত্যু অর্থ যেন তরোয়ালের খাপ থেকে তরোয়ালকে সরিয়ে নেওয়া। তখন খাপ দেখলে তরোয়ালকে স্মরণ হয় কিন্তু তরোয়ালের অস্তিত্ব থাকে না। কর্মের দরুন অর্থাৎ কর্মের ঘূর্ণিপাকে জীবাত্মা বারে বারে এই জগতে শরীর ধারণ করে থাকেন। যেমন আমরা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করি, সেরকমই। এই সুখ-দুঃখরূপ কর্মের নিগড়ে বদ্ধ মানুষ স্ব-সংস্কার অনুযায়ী কর্মে প্ররোচিত হয়ে, ক্রমে মানসিক উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে মুক্তিলাভের প্রয়াসী হয়। আত্মতত্ত্ব-বোধ না করা পর্যন্ত এই জগতে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এই সনাতন নিয়ম খুবই রূঢ় বাস্তব, জটিল কিন্তু সার্বজনীন।

বিদেশে চার্চের বিরোধ সত্ত্বেও সেখানে এই মতের চিন্তাধারায় অনেকে বিশ্বাসী। গত ১৯৮৭-তে ডঃ রোজার জে. উলগার (Roger J. Woolger) এর "Other Lives, Other Selves" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা এসম্বন্ধে উৎসুক এবং আগ্রহী তাঁরা বইটি দেখতে পারেন। এই বইতে জাতিস্মরদের কথা আছে যাঁরা পূর্ব জন্মের স্মৃতিচারণ করেছেন।

গঙ্গোত্রী

অজিতকুমার মাইতি

গঙ্গোত্রীর নীল আকাশ। সামনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক পাহাড়ের সারি। নিচে অজস্র পাইন-চীর বৃক্ষের সবুজ স্বপ্নিল ছায়া। মাঝে গিরিকন্দর থেকে সদ্য নির্গতা গঙ্গার সরু রুপালী স্রোতোধারা। শত শত উপলখণ্ডের সংস্পর্শে একটানা কলসঙ্গীত। প্রকৃতির বুকে এক স্বর্গরাজ্য।

কয়েক ঘণ্টার জন্য এই রাজ্যের অতিথি আমরা। তীর্থের পুণ্য, মুক্ত জীবনের আনন্দ, নৈসর্গিক আকর্ষণ—কিসের টানে এসেছি এই গঙ্গোত্রীর বুকে তা সত্যি করে বলা মুশকিল। শুধু আমরা নই, এখানে এমনি টানে আসে আরও অনেক মানুষ অশেষ কষ্ট স্বীকার করে, নানা বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু এটা সত্যি যে গঙ্গোত্রীর অনির্বচনীয় রূপ ও অপার মাধুরী সবারই মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয় এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই।

ভগীরথ-শিলার কিছুটা নিচে একটি শিলাখণ্ডে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে উপভোগ করছিলাম গঙ্গোত্রীর সেই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য। ভাগীরথীকে মনে হচ্ছে যেন কিছুটা চঞ্চলা—তপস্বিনী লোকালয়ের সংস্পর্শে এসে যেন কিছুটা উচ্ছলা। এহেন মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগের জন্য শিবজটাজালবিচ্ছিন্না পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিশেষ প্রস্তুতি।

যুগে যুগে এই গঙ্গাই হিন্দুদের নিকট পতিতোদ্ধারিণী, সর্বপাপবিনাশিনী, মোক্ষদায়িনী। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর দীর্ঘ প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার গঙ্গার এই স্রোতোধারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সত্যিকারের প্রাণধারা। পতিতের উদ্ধার, পাপের বিনাশ, মোক্ষপ্রাপ্তি—এসব বিতর্কের। কিন্তু গঙ্গার জলধারা যে ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ১০,৩১৯ ফুট।

গোমুখ তুষার-গুহাই ভাগীরথীর প্রকৃত উৎস। গোমুখের উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার নেমে ভাগীরথী আত্মগোপন করেছে এখানকারই এক পর্বতকন্দরে। পরে পুনরায় এই গঙ্গোত্রীতেই আত্মপ্রকাশ করেছে পাহাড় চিরে কলকল ছলছল শব্দে বেরিয়ে। ভাগীরথীর প্রকাশ্য যাত্রা সুরু ধরতে গেলে এখান থেকেই। সেই যাত্রার শেষ গঙ্গাসাগর মোহানায়। এই দীর্ঘ পথে কত স্রোতোধারা আত্মসমর্পণ করেছে ভাগীরথীর বুকে তার হিসাব নেই। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে এসে মিলেছে মন্দাকিনী-অলকানন্দা। দেবপ্রয়াগ থেকেই ভাগীরথী পরিচিতা গঙ্গা নামে। গঙ্গোত্রী থেকে দেবপ্রয়াগ প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার। আরও প্রায় ৯৫ কিলোমিটার পার্বত্য পথ অতিক্রম করে গঙ্গা সমভূমিতে অবতরণ করেছে হরিদ্বারে।

গঙ্গা ভারতের প্রাণপ্রবাহ। এই গঙ্গাকে ঘিরেই ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ। এই গঙ্গাই নীরব সাক্ষী নানা রাজত্বের উত্থান-পতনের, বিবিধ সংস্কৃতির অনন্য সমন্বয়ের এবং সহস্র জাতির মিলিত সহাবস্থানের। এই গঙ্গারই স্রোতে বাঙ্ময় ভারতের ইতিহাস। ভারতীয় সাংস্কৃতির প্রত্যুষ থেকেই গঙ্গা ভারতের দেবী। সেই দেবীর প্রথম লীলানিকেতন এই গঙ্গোত্রী।তাই গঙ্গোত্রী দেবভূমি।

মন্দির থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। উন্মুক্ত আকাশতলে বসে আছি একদৃষ্টে মোক্ষদা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। মনে ভিড় করে আসছে তাঁর কত মাহাত্ম্য-কাহিনী।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন—"স্রোতসামস্মি জাহ্নবী"—অর্থাৎ স্রোতস্বিনীদের মধ্যে আমি গঙ্গা। পুরাণে বলা হয়েছে, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ গঙ্গার বিপুল বেগকে ধারণ করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিল স্বয়ং মহাদেবকে। মহাদেব তাঁর জটাজালে ধারণ করেছিলেন গঙ্গাকে। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট মহাদেব শেষ পর্যন্ত নিজ জটাজাল থেকে মুক্ত করেন তাকে।

পুরাণের সেই কাহিনী সকলের জানা। তবে পুরাণে বর্ণিত গঙ্গা-কাহিনীর আগেও আর্যদের কাছে দেবীরূপে পূজিতা ছিল গঙ্গা অপর দেবতাদেরই মতো। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে গঙ্গা-যমুনার নাম যমজ ভগিনী হিসাবে উল্লেখিত আছে। মহাভারতের যুগে গঙ্গার পরিপূর্ণ আবির্ভাব আমাদের ঐতিহ্যের রঙ্গভূমিতে। কুরু-পাণ্ডবদের পিতামহ ভীষ্ম সেখানে সরাসরি গঙ্গার পুত্র। অষ্টবসুর উদ্ধার মানসেই গঙ্গার মর্তে আগমন। রামায়ণে উমার ন্যায় গঙ্গা হিমালয় ও মেনকার কন্যা। স্বর্গের দেবতারা ভিক্ষা চান গঙ্গাকে হিমালয়ের কাছে। গঙ্গার মর্তে আগমনের কাহিনী সুন্দর চিত্রিত আছে দুই মহাকাব্যেই।

দেবীভাগবতের মতে রাধিকার ভয়ে একবার গঙ্গা আশ্রয় নেন কৃষ্ণের চরণে। পৃথিবীকে জলশূন্য হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ তাঁর নখকণার সম্মুখ দিয়ে মুক্তি দেন গঙ্গাকে। নানা পুরাণে নানাভাবে চিত্রিতা গঙ্গা। এক পুরাণের মতে গঙ্গা দ্রবীভূত বিষ্ণু। শিবের গানে বিষ্ণু আত্মহারা হয়ে দ্রবীভূত হন। ব্রহ্মা তা ধারণ করেন কমণ্ডলুতে। তা-ই গঙ্গা। কত কথাই যে মনে পড়ছে!

উত্তরকাশী গঙ্গোত্রীর পথে শেষ আধুনিক শহর। পথে পড়ে সেকালের ভাস্করপ্রয়াগ—একালের ভাটোয়ারী, সেকালের হরিপ্রয়াগ—একালের হর্সিল, ভাগীরথী ও দুধগঙ্গার সঙ্গম—ধরালী, আর দেবদারুর ঘন জঙ্গলের মধ্যে জাহ্নবীগঙ্গার বিখ্যাত 'ক্যানাল'। লঙ্কা—ভৈরোঘাঁটির মধ্যে এই জাহ্নবীগঙ্গার বুকে সরকারি পুল হওয়ার ফলে ইদানীং গাড়ি আসছে সরাসরি গঙ্গোত্রী। লঙ্কার উচ্চতা ৯০০০ ফুট। হরিদ্বারের যাত্রীরা আসেন হৃষীকেশ, নরেন্দ্রনগর. টিহরি, ধরাসু হয়ে উত্তরকাশী। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী। হরিদ্বার থেকে ধরাসুর দূরত্ব ১৪৪ কিলোমিটার। ধরাসু থেকে ভাগীরথীর তীর ধরে বরাবর গঙ্গোত্রী ১৩৬ কিলোমিটার।

টলেমী, পেরিপ্লাস, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ইত্যাদির বিবরণেও উল্লেখ দেখি গঙ্গার। চৈনিক গ্রন্থ 'ছিয়েন-হান-শু' ইত্যাদিতেও গঙ্গা উল্লেখিতা দেবীরূপে। স্ট্রাবো তাঁর 'জিওগ্রাফিকন' গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতের অধিবাসীরা গঙ্গানদীর পূজা করে। মহাকবি কালিদাস, আচার্য শঙ্করের লেখনীতে গঙ্গার মাহাত্ম্য কতরূপে প্রকাশিত।

কেবল গ্রন্থেই নয়, ভারতের শিল্প-ভাস্কর্য ধারণ করে রয়েছে গঙ্গার নানা মাহাত্ম্য-চিত্র। সম্প্রতি ওয়ার্ধায় খনন করে পাওয়া গেছে মকরবাহিনী গঙ্গার দেবীমূর্তি। এটি খ্রীস্টের জন্মেরও বহু আগের তৈরি বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। মহাবলীপুরমের স্থাপত্যকর্মে, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে, গুপ্তযুগের মুদ্রায়, এ্যালিফ্যান্টা গুহার চিত্রে—সর্বেতেই সেই গঙ্গা।

সেই পবিত্র গঙ্গার উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। গঙ্গার ডান তীরেই গঙ্গামায়ের মন্দির। বর্তমান মন্দির অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। গোর্খা জেনারেল অমর সিং থাপা তৈরি করিয়েছিলেন মন্দিরটি। মন্দিরের গর্ভগৃহে মকরবাহিনী গঙ্গার ছোট বিগ্রহ। আশেপাশে নাম-না-জানা অনেক দেবদেবীর বিগ্রহমূর্তি।

মন্দিরকে ঘিরেই গঙ্গোত্রীর ছোট বাজার, দোকান-পাট। ইদানীং পুল তৈরি করা হয়েছে বামতীরের সঙ্গে সংযোগের। বামতীরেও ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে কিছু। বেশিরভাগই সাধুসন্তের আশ্রম। সবুজ অরণ্যানীর ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের কোলে কোলে ঘরবাড়িগুলি দেখতে লাগে যেন ছবির মতোই। ওধার থেকে কেদারগঙ্গা এসে মিলেছে ভাগীরথীতে। একটানা ছলছল কলকল শব্দ। প্রকৃতির সে এক মনোমোহিনী রূপ।

বেলা পড়ে আসছে ক্রমশঃ। পথের গেট বন্ধ হয়ে গেলে ফেরা যাবে না উত্তরকাশী। তাই ড্রাইভাররা তাড়া দিচ্ছে ক্রমাগত। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হয় গঙ্গোত্রী থেকে।

কিন্তু মন পড়ে থাকে গঙ্গার সান্নিধ্যেই। থাকবেই তো। রক্তের মধ্যেই প্রত্যেক হিন্দুর কত সংস্কার গঙ্গাকে ঘিরে। গঙ্গাপূজা, গঙ্গাস্নান, গঙ্গা-দর্শন, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ, মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাবারি দান, মৃতের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরেও সেই গঙ্গা। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, পাপহারিণী গঙ্গা। গঙ্গা শাশ্বত ভারতের প্রাণপ্রবাহিনী।

সাধনা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর আমাদের কাছে আটটি জিনিস চেয়েছেন—(১) সাধনা (২) একটু লজ্জা (৩) সচ্চিদানন্দ প্রেম (৪) মৃত্যু-স্মরণ (৫) বিশ্বাস (৬) সতর্কতা (৭) ব্যাকুলতা (৮) অনুধ্যান। আমরা একটি কাগজে এই নির্দেশগুলি লিখে যত্রতত্র টাঙিয়ে রাখতে পারি। আমরা জ্ঞানের কথা শুনি। এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও-কান দিয়ে বের করে দি। পায়রার গলায় মটরের দানার মতো বিষয়-চিন্তা গজগজ করে। ঠাকুর বলছেন: পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম বদ্ধ জীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা তাদের ভিতর গজগজ করছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্মকথা ভাল লাগে না।

এই ভাল লাগানোটাই সাধনা। যেমন তুলসীদাস বলছেন:

"এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ।
তুলসী সঙ্গত্ সন্তকি, হরে কোটি অপরাধ॥"

—একঘণ্টা, আধঘণ্টা এমন-কি আধেরও আধঘণ্টা যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহলেই কাজ হয়। অসংখ্য অপরাধজনিত পাপবোধ নষ্ট হয়। একটু সাধুসঙ্গ। তুলসীদাস বলছেন:

"সঙ্গত কিজিয়ে সাধুকি, হরে আউর কি ব্যাধ,
সঙ্গত কিজিয়ে নীচ্‌কি, আঠো পহর উবাস॥"

—সাধুর সঙ্গ ব্যাধি হরণ করে। ভবরোগ হরণ করে। আর অসাধু সংসর্গে অষ্টপ্রহর উপবাসী থাকতে হয়।

তাহলে আমরা কার সঙ্গ করবো? এ প্রশ্ন নিজেকেই নিজের। ঠাকুর বলছেন, খুব সাবধান। 'যেসকল লোক নিজে কখনো ধর্মচর্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান-পূজা করতে দেখলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ধর্ম ও ধার্মিকদের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনো এরূপ লোকদের সঙ্গ করবে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকবে।' ত্রিসীমানা মাড়াবে না। তুলসীদাস বলছেন:

"যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি,
যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক নাহি মিলে,
রবি রজনী এক ঠাম॥"

—দিন আর রাত তো এক জায়গায় থাকতে পারে না। অসম্ভব সম্ভাবনা। সেইরকম যেখানে নিরন্তর রামের আরাধনা সেইখানে বিষয়বাসনা, ভোগবাসনা থাকে কেমন করে। আর যেখানে শুধুই ভোগ সেখানে রামের আরাধনা হয় কি করে!

যো পরবিত্ত হরে সদা,
সো কহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা,
সো কহু তীর্থ গয়া ন গয়া॥
যো পর আশ করে সদা,
সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো মুহুমে পরচুকুলি ওগারতা
সো মুহুমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

—যার ধান্দা কেবল পরস্বাপহরণ, তার নিরন্তর ভূরিদান বা অদান দুই সমান—কোনও ফল নেই। যে নিরন্তর পরস্ত্রীতে আসক্ত তার পক্ষে তীর্থ-দর্শন বা অদর্শন দুইই সমান। যে পরপ্রত্যাশী হয়ে বাঁচতে চায় তার বাঁচাও যা মরাও তাই। তার জীবন-মরণ দুইই সমান। আর যে-মুখে পরনিন্দা, সে-মুখে হরিনাম করা আর না-করা দুইই সমান।

ঠাকুর বলছেন: "দুরকম মাছি আছে—একরকম মধুমাছি, তারা মধু ভিন্ন আর কিছুই খায় না। আর একরকম মাছি মধুতেও বসে, আর যদি পচা ঘা পায় তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। সেই রকম দুই প্রকৃতির লোক আছে—যারা ঈশ্বরানুরাগী, তারা ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় কথা শুনতে শুনতে যদি কেউ কাম-কাঞ্চনের কথা কয়, তাহলে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাতে মত্ত হয়।"

মাছি আর মৌমাছি এই হলো জীবের উপমা। প্রথমে চাই বিবেক-বৈরাগ্য। আমার ভাল লাগছে না। সমস্ত কিছু মনে হচ্ছে বিস্বাদ আর আলুনি। ঠাকুর বলছেন: "বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।" বলছেন: "বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না। এইটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার করে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা—এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক।"

এইবার এক কঠিন প্রশ্ন, শাস্ত্রের অধিকারী কে? বিবেক-বৈরাগ্য কার ভিতর জাগবে? কিভাবে জাগবে। আর সেই জাগরণটা কি? এই দেহ পরিপাটি বিছানায় ঘুমোচ্ছিল, সকালে জেগে উঠল। সে জাগরণ আর এই জাগরণ এক নয়। এ হলো অন্তরে উঠে বসা। চৈতন্যলীলায় গিরিশচন্দ্র যে গানটি বেঁধেছিলেন, সেই গানে আছে তার সরল ইঙ্গিত:

আর ঘুমায়ো না মন।
মায়া-ঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥
কে তুমি, কি হেতু এলে আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছে অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দ হের প্রাণে
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন॥

যোগবাসিষ্ঠসার বলছেন: তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী, যাঁর মনে হয়েছে—

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি
যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজ্জ্ঞঃ
সোঽস্মিংচ্ছাস্ত্রেঽধিকারবান্॥

—সংসারবন্ধনে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি। এই বন্ধনদশা থেকে আমি মুক্ত হতে চাই। দৃঢ়সংকল্প আমার। আমি একেবারে অজ্ঞ নই, আবার তেমন তত্ত্বজ্ঞও নই। শাস্ত্রকার বলছেন এমন কৃতসংকল্প অভিলাষী এই শাস্ত্রে অধিকারী। শাস্ত্রটি কি? না, বেদান্ত। বেদান্ত কি? আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষ-লাভের উপায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বস্তুতত্ত্ব জানেন, শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই তাঁর। প্রয়োজন নেই উপ-দেশের। আর যে ঘোর বিষয়ী, তাকে উপদেশ দেওয়ার অর্থ হয় না। ঠাকুর যা বলে গেছেন একেবারে সহজ কথায়, একটু খোঁচা মেরেই—কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা হবার নয়। বলছেন—চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে। অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? তাদের মন সর্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুন জ্ঞানলাভ করতে পারে না।

শাস্ত্রকার অধিকারীদের আবার দুটি ভাগে ফেলেছেন: মুখ্য আর অমুখ্য। মুখ্যের গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান হয়। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলছেন:

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

একটি সর্ত। শিষ্যকে হতে হবে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় আর গুরুকে হতে হবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। এইরকম গুরুর উপদেশে ঐরকম শিষ্যেরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। নচেৎ নয়। আর তিনি কি উপদেশ দেবেন? সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের তত্ত্ব। শাস্ত্র-পাঠ করে পরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশ প্রয়োজন।

শাস্ত্রকার আবার অমুখ্যের দুটি ভাগ করেছেন, (১) বেদান্ত বিচারসমর্থ (২) বিচার যাঁদের ভাল লাগে না। যাঁর বিচার ভাল লাগে—তিনি বিচারের মাধ্যমেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করতে পারেন। এইখানে আমরা নিদিধ্যাসন বলে একটি কথা পাই। এর অর্থ ধ্যান নয়, অপরোক্ষজ্ঞান। প্রথমে আমার যথেষ্ট সংশয় ছিল। এই মায়ারূপিণী জগৎকেই আমার সত্য বলে মন হতো। জগৎকারণ ব্রহ্মকে আমার মনে হতো, সে আবার কি? যা আছে, যা ভীষণভাবে আছে তা নেই; আর আপাত দৃষ্টিতে যা নেই, সেইটাই পরম সত্য তা কেমন করে হয়। এ তো মহা ধন্দ। অথচ মনে হচ্ছে কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। যমরাজ নচিকেতাকে বললেন—

তুমি আমার কাছে অন্য কিছু প্রার্থনা কর, অন্য বর চাও ঃ

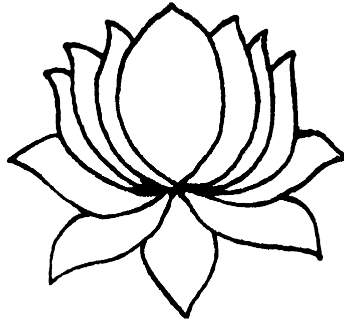
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥

প্রভূত বিত্ত নাও তুমি, বংশানুক্রমে জীবিকা-নির্বাহের উপায় অথবা সুদীর্ঘ জীবন। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমি রাজা হও, স্বর্গীয়, পার্থিব সমস্ত কাম্যবস্তুর ভোক্তা তুমি হও নচিকেতা। আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়ো না। সে বড় গূঢ়, গোপন কথা। এই পৃথিবীতে যেসকল কাম্যপদার্থ অতি দুর্লভ সেই সমস্ত তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা করো। যেমন ধরো রথারূঢ়, বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত রমণীসকল। তারা তোমার পরিচর্যা করবে। কিন্তু হে নচিকেতা, মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। নচিকেতা হেসে বললেন, প্রভু! আপনি যা আমাকে দিতে চান—তা অতি ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষয়কারী। আমাকে গলিত, জরিত করে দেবে। আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে? সে কত দীর্ঘ! অনন্ত-কালের তুলনায় কতটুকু! এই রথ, এই অশ্ব, নৃত্য-গীত, সুন্দরী রমণী সব আপনারই থাক ঃ

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

নচিকেতার এই ভাব আমাদেরও গ্রাস করে জীবন অনেকটা চলে আসার পর। সংসারকে মনে হতে থাকে ছায়াসংসার। তখনই তৈরি হয় সংশয়। তখনই মনে হয়, আচ্ছা, তাহলে দেখি ব্যাপারটা কি! তখনই বিচার, পুনঃপুনঃ বিচার। ধ্যান নয়, নিদিধ্যাসন। বিচারমার্গ। ঠাকুর বলছেন ঃ 'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। আমি কে!—ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোনটা আমি? যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে, আমি বলে কিছুই পাইনে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা, চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন।'

শাস্ত্রকার বলছেন দুটি মার্গ। মুখ্য আর অমুখ্য অধিকারীর দুটি পথ—'পিপীলিকামার্গ' আর 'বিহঙ্গম বা শুক-মার্গ'। আহা! সে বড় সুন্দর কথা। বড় আনন্দ।



নিবন্ধ

কলকাতা ঃ দুটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ

সুদীপ বসু

মিটমিটে শেজবাতি থেকে ঝলকিত বিজলী, ধীরগতি পালকি থেকে দ্রুতগামী মোটরগাড়ি, কিংবা আরও অনেক পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে কলকাতা একে একে নানা আভরণে তার অঙ্গ সাজিয়েছে। তাতে রূপ যে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়েছে, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। কারণ কলকাতার বড় হওয়া কোনদিনই জ্যামিতিক নকশা অনুসরণ করেনি। আচম্বিতে কিছু চমৎকারী বস্তু এখানে ওখানে বসিয়ে তার রূপবৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তাতে নেটিভপাড়া এবং সাহেবপাড়ার পার্থক্য কোনদিন ঘুচেছে কি? কিন্তু কলকাতা যে এক থেকে অপর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়নি। 'জীবন স্মৃতি'তে সেই চলমানতার ছবি তিনি এঁকে গেছেন ছোট ছোট স্কেচে। নানা বর্ণের সমাহারে সেখানে পুরনো কলকাতার শিহরিত স্পর্শ মেলে। মেট্রো রেলের কোন এক নিত্যযাত্রী ঐ বর্ণনা পড়তে পড়তে আজ হয়তো নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হবেন।

কলকাতাকে নিয়ে মোট দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। একটি 'চিত্রবিচিত্র'-এর অন্তর্গত 'চলন্ত কলিকাতা', অপরটি 'সহজপাঠ'-এর অন্তর্ভুক্ত। দুটিরই বিষয়বস্তু এক—স্বপ্নে কলকাতা শহরের চলমান রূপ। তারপর ঘুম ভেঙে কলকাতাকে সেই পুরনো চেহারাতে দর্শন। সেইসঙ্গে কবিতাদুটির শব্দগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

আপাতভাবে মনে হতে পারে কলকাতা সম্পর্কে কবির এই খেয়ালী কল্পনা শিশুচিত্তকে আনন্দ দেবার জন্য। নিশ্চয়ই তা সত্য। কিন্তু প্রতিভার স্পর্শে সামান্য বস্তু অসামান্যে পরিণত হয়, এটা বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। জীবনের এক একটা দিককে প্রতিভাবান মানুষেরা যখন ছুঁয়ে যান, তখন তার প্রাথমিক লক্ষ্য হয়তো থাকে জীবনের গণ্ডিতে যারা সদ্য প্রবেশ করেছে সেই শিশুরা, কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় তা বয়স্কদের বৃত্তকেও স্পর্শ করে।

বস্তুতঃ কবির মন কখনো নাগরিক জীবনের ভিত্তি-স্থল শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের খাঁচাকে মেনে নেয়নি। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সূত্রে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে—সেইজন্য মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি—সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চলতে পারিনে।" এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বলেছেন ঃ "কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মতো শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে না এবং তারপরে সয়ে গেলেও ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য থেকে যাবে। কিন্তু কি করি বলো··· কোন কালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না। সেই জন্যই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি··· এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না।" এই কারণেই "হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে" স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু কলকাতা তাঁকে আসতে হতোই। কিন্তু সে শহর সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোনদিন বদলায়নি। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ "আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম—এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছ্যাকড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড় ঘড়, হুড় মুড়, হৈ হৈ, সেই মাছি-ভনভন ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হযবরল-র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে,

কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে—তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট। মানুষের মরেও সুখ নেই।··· সেখানে একপ্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম।···কলকাতার সেই জনসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন।" এ-চিঠিতে কৌতুকের সুর স্পষ্ট। কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে তাঁর বিরূপ ধারণাও আরও স্পষ্টাকারে ধরা পড়েছে।

তাই বাস্তবে না হলেও স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শহরের বুকে শেকড় নামিয়ে থাকা বস্তুগুলোর স্থানচ্যুতি। "কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে—/ নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।" (সহজপাঠ)। সেই প্রলয় নাচের ঝোঁকে কলকাতা যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন কবি ভাবছেন ঃ

"আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লাহোর যাক, যাক না আগরা,
মাথায় পাগড়ি দেবো, পায়েতে নাগরা।
কিংবা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট হ্যাট কোটে।"

(সহজপাঠ)

'চলন্ত কলিকাতা' কবিতায় আছে—

"আমি ভাবছি যাক-না কেন, ভাবনা কিছুই নাই—
কোলকাতা নয় দিল্লি যাবে কিংবা সে বোম্বাই।"

কিন্তু এই দুই কবিতার মধ্যে কবির দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করব। 'চলন্ত কলিকাতা' কবিতায় শহর কলকাতার মূল্যায়ন তিনি করেছেন, যা সহজপাঠের কবিতাটিতে অনুপস্থিত। সেখানে আছে—

"ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে—ইঁটের আসন পাতা।"

কবিতায় কলকাতার এমন ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রণ বাস্তবিক দুর্লভ। ইঁটের আসনে ইঁটের টোপর মাথায় দিয়ে যে কলকাতা বসে আছে, ফাল্গুনের 'বসন্তবায়' তার হৃদয়কে কাঁপায় না, বৈশাখের প্রবল ঝড়ের দিনেও তার ভিত নড়ে না, শীতের হাওয়ায় তার থামগুলো ওঠে না শিউরে। এরই পাশাপাশি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ থেকে দু-এক পংক্তি উদ্ধার করব, যেখানে রবীন্দ্রনাথই কালিদাসীয় নাগরিক জীবনের প্রতি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত—

"সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী। অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে —আমরা কেবল সেই যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কার ধূপ উড়িয়া আসিতেছিল, তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকান্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি।" আপন মানসিক গঠন রবীন্দ্রনাথকে সেই ভূমিতে স্থিত করেছে, যেখান থেকে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন যে, মনে হয় ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী, বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করবার কোন পথ যদি থাকত, তবে এখনকার চারদিকের "ইতর কল-কাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।" কোন সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক। তাই বর্তমানের বাসভূমি কলকাতা তাঁকে পীড়িত করে। আর শতাব্দীর দরজা খুলে আহ্বান জানায় অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী।

মানুষের জীবন পাওয়া এবং না-পাওয়ার দুই মেরুতে দোলায়িত। যখন সে ভাবে আশা এবার পূর্ণ হবে, তখন বদ্ধমুঠি খুলে সব ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে সব আশাই ফলবতী। মানুষের অবচেতন মন তাকে সেই লোকে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের সুখসায়রে ভাসমান আমাদের এক মুহূর্তের জন্য আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সেইখানে, যেখানে নাগরিক জীবনবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। নগর তার পরিচিত চেহারাকে ভেঙে ফেলে নতুন আকার নেয়। কলকাতার দর্শনীয় বস্তুগুলি তখন প্যারেড করে যাত্রা করে দিল্লি, বোম্বাই, আগ্রার দিকে। পড়ে থাকে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখন্ড, যেখান থেকে হয়তো মানুষ তার জীবন আবার নতুন করে শুরু করবে।

আবার কবে গ্রহণ হবে

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

উত্তর খুবই সোজা। আজ যদি সূর্যগ্রহণ হয় তাহলে আজ থেকে ঠিক আঠার বছর এগার দিন পরে আবার সূর্যগ্রহণ হবে, যদি এই আঠার বছরের মধ্যে চারটে অধিবর্ষ (leap year) পড়ে। আর যদি এই আঠার বছরের মধ্যে পাঁচটা অধিবর্ষ পড়ে যায় তবে ঐ একটা বাড়তি অধিবর্ষের জন্যে গ্রহণ আরও একদিন এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আজ থেকে আঠার বছর দশ দিন পরে আবার সূর্য-গ্রহণ হবে। একথা শুধু যে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে সত্যি তা নয়, চন্দ্রগ্রহণের বেলাতেও একই নিয়ম খাটবে।

তাহলে কি এই আঠার বছর দশ-এগার দিনের মধ্যে আর কোনও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে না? না, না। তা একেবারেই নয়। এর মধ্যে আরও বহু গ্রহণ হবে। কিন্তু, প্রতি আঠার বছর দশ-এগার দিন অন্তর গ্রহণ হবেই। তা সে সূর্যগ্রহণই হোক বা চন্দ্রগ্রহণই হোক। এ কেউ ঠেকাতে পারবে না। ব্যাপারটা অনেকটা ল. সা. গু. অঙ্কের মতো। যেমন, ৪ আর ৫-এর ল. সা. গু. হলো ২০। অর্থাৎ ২০ হলো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে ৪ আর ৫ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। কিন্তু ১ থেকে ২০-র মধ্যে ৪, ৮, ১২, ১৬, ২০—আলাদাভাবে পাঁচটা সংখ্যাই ৪ দিয়ে বিভাজ্য। আবার ৫, ১০, ১৫, ২০—এই চারটে সংখ্যাও ৫ দিয়ে আলাদাভাবে বিভাজ্য। তেমনি গ্রহণের বেলাতেও প্রতি বছরই গ্রহণ হবে বটে। তবে সবচেয়ে কম কত সময় অন্তর সূর্য আর চন্দ্র দুয়েরই গ্রহণ নিশ্চিতভাবে হবেই হবে? তার উত্তরঃ আঠার বছর দশ-এগার দিন। যেমন ধরা যাক, ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তার মানে ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর আবার চন্দ্রগ্রহণ হবে। তবে সে গ্রহণ পূর্ণ হবে কি আংশিক হবে—তা এই পদ্ধতিতে বলা যাবে না। তবে গ্রহণ যে হবেই তা সুনিশ্চিত। একইভাবে ভবিষ্যবাণী করা যায় যে, ২০১৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ অক্টোবর আবার চন্দ্রগ্রহণ হবে।

মানুষ যখন চাঁদে গিয়ে ঘুরে আসছে, কলাম্বিয়া যখন মাত্র ৫৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৩৬ বার প্রদক্ষিণ করে আবার নিরাপদে প্রায় অক্ষত এবং পূর্ণব্যবহার-যোগ্য অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, তখন গ্রহণ লাগার আর ছাড়ার সময় একেবারে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয় আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, আজ থেকে বহু বছর আগে সেই ব্যাবিলনের সভ্যতার যুগে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদরা এই আঠার বছর দশ-এগার দিনের হিসাব জানতেন। এই পর্বকে তাঁরা বলতেন 'সারোস'। কিন্তু কি কারণে এই প্রতি আঠার বছর দশ-এগার দিন অন্তর গ্রহণ হয় তা খুব সম্ভবতঃ তাঁদের জানা ছিল না। আমরা কিন্তু এখন একটু চেষ্টা করলেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারি। গ্রহণ হবার একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, সূর্য, চাঁদ, আর পৃথিবীর কেন্দ্র একই সরলরেখায় থাকতে হবে।

একটা কথা। পূর্ণিমা ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অমাবস্যা ছাড়া সূর্যগ্রহণ হয় না। যদি কোন পূর্ণিমাতে পৃথিবী এসে দাঁড়ায় চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে তবেই হবে চন্দ্রগ্রহণ। আর যদি কোন অমাবস্যায় চাঁদ এসে দাঁড়ায় সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে তাহলেই হবে সূর্যগ্রহণ।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরে আসতে যে সময় নেয় তাকে এক 'চান্দ্রমাস' (lunar month) বলে। হরেক রকম মাপজোকের ওপর নির্ভর করে পাঁচ রকমের 'চান্দ্রমাস' হতে পারে। তার মধ্যে দুটো

মাস আমাদের হিসাবের কাজে লাগবে। সিনোডিক মাস (Synodic month) আর ড্র্যাকোনিক মাস (Draconic month)। চাঁদের দুটো সমান কলার (phase) মধ্যবর্তী সময়কালকে বলা হয় এক সিনোডিক মাস। কাজেই যে কোন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া থেকে পরবর্তী শুক্ল-পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পর্যন্ত সময়কে এক সিনোডিক মাস বলে। সিনোডিক মাসের মান হলো ২৯·৫৩০৬ দিন।

কক্ষপথের একই পাতে (node) ফিরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে তাকেই বলে ড্র্যাকোনিক মাস। চাঁদের কক্ষপথ আর ক্রান্তিবৃত্ত যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেটাকেই বলে চাঁদের পাত। ড্র্যাকোনিক মাসের মান হলো ২৭·২১২২ দিন। আজ গ্রহণ হলে আবার কতদিন পরে গ্রহণ হবেই—তা জানার উপায় হলো এই সিনোডিক আর ড্র্যাকোনিক মাসকে পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে এসে তাদের ল. সা. গু. বের করা। অর্থাৎ ২৯·৫৩০৬ আর ২৭·২১২২ এর ল.সা.গু. যত হবে ততদিন পরে আবার গ্রহণ হবেই। কিন্তু এতে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা আমাদের কাজে লাগবে না। কারণ অতদিন হয়তো এই সভ্যতাই টিকে থাকবে না।

কিন্তু আমরা চাইছি আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে একটা হিসাব, যখন গ্রহণ হবেই এবং তা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাব। তার জন্যে ছোট্ট একটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে। যদি মনে করা যায় যে, x সিনোডিক মাস আর y ড্র্যাকোনিক মাস পরে আবার গ্রহণ হবে, তবে সেই ছোট্ট সমীকরণটা হবে—২৯·৫৩০৬x=২৭·২১২২y। শেষের দিকের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলোকে বাদ দিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মতো করে কষলে এক সময়ে পাব $\frac{x}{y} = \frac{২২৩}{২৪২}$ (প্রায়)। কাজেই ২২৩ সিনোডিক বা ২৪২ ড্র্যাকোনিক মাস পর আবার গ্রহণ হবে। তার মানে ২২৩×২৯·৫৩০৬ দিন=২৪২×২৭·২১২২ দিন=৬,৫৮৫⅓ দিন=১৮ বছর ১০-১১ দিন ৮ ঘণ্টা। ১০ অথবা ১১ দিন, তা নির্ভর করবে ঐ ১৮ বছরে পাঁচটা অথবা চারটা অধিবর্ষ পড়বে তার ওপর। আজ যদি সন্ধ্যে ছটায় চন্দ্রগ্রহণ লাগে তবে ১৮ বছর ১০-১১ দিন পরের গ্রহণ লাগবে রাত দুটোয়। এইভাবে প্রতি ১৮ বছর অন্তর গ্রহণ প্রায় ৮ ঘণ্টার মতো পিছিয়ে যাবে।

প্রতি বছরে কমপক্ষে দুটো আর সর্বাধিক সাতটা পর্যন্ত গ্রহণ হতে পারে। যদি দুটো মাত্র গ্রহণ হয় তবে দুটোই হবে সূর্যগ্রহণ। আর যদি গ্রহণের সংখ্যা তিন থেকে সাতের মধ্যে থাকে তবে দুই বা ততোধিক সূর্যগ্রহণ হবে। আর বাকিগুলো চন্দ্র-গ্রহণ হবে। সাধারণতঃ প্রতি পাঁচবছরে একবার এরকম পাওয়া যায়, যে-বার কোন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে সাতটা গ্রহণ হয়েছিল। পাঁচটা সূর্যের, দুটো চাঁদের।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ৭½ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তবে পুরোগ্রহণ এমন-কি সাড়ে চার ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে।

গ্রহণ নিয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বহু সংস্কার আছে। তার কোনটা 'কু' কোনটা 'সু' সে মন্তব্য করে কারুর বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না। তবে একটা অজ্ঞতা কী মারাত্মক ফল দিতে পারে সেকথা বলি। খালি চোখে চন্দ্রগ্রহণ দেখার মধ্যে কোন বিপদ নেই, বাহাদুরিও নেই। কিন্তু খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা চোখের পক্ষে মারাত্মক। আর মারাত্মক বলেই অনেকে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে সাময়িক বা পাকাপাকি ভাবে দৃষ্টিশক্তি হারান। আমাদের অক্ষিপটের (retina) সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশগুলো সূর্যের তীব্র রশ্মি লেগে নষ্ট হয়ে যায়। একটা কথা। গ্রহণ না হলেও এমনি সময়েও কখনো খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো উচিত নয়। তাহলেও একই ফল হতে পারে। কত মানুষ যে এই কারণে অন্ধ হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু সূর্যই বা কেন? একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় চাঁদ বা অন্য কোন জ্যোতিষ্কের দিকেই তাকিয়ে থাকাটা চোখের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আর সূর্যগ্রহণ একান্তই যদি কেউ দেখতে চান, তবে চারটে উপায় বলতে পারি।

(১) ভালমতো ঘষা একটা কাঁচে প্রদীপ থেকে ভুষোকালি বেশ করে লাগিয়ে তার ওপর আর একটা

কাঁচ দিয়ে চারপাশ আঠালো কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে সাবধানে এর ভিতর দিয়ে গ্রহণ দেখা যেতে পারে।

(২) দুটো পরিপূরক রঙ-এর (বে-নী-আ-স-হ-ক-লা থেকে বা VIBGYOR) কাঁচকে সেঁটে নিয়ে অন্য তীব্র আলোতে পরীক্ষা করে তারপর তাকে গ্রহণ দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) ফটোর নেগেটিভে কাল অংশ বেশি থাকলে সেটাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) সবচেয়ে ভাল, নিরাপদে টিভিতে সূর্যগ্রহণ দেখা।

হিন্দুশাস্ত্র মতে চাঁদ আর সূর্য হলো ব্রাহ্মণ। ওদিকে রাহু আর কেতু হলো চণ্ডাল। চণ্ডালের হাতে ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাই গঙ্গাস্নান, শ্রাদ্ধ, হরিনাম সংকীর্তন ইত্যাদি করার বিধান আছে। অনেকে আবার চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ থাকাকালীন কিছু খান না বা মলমূত্রাদি ত্যাগ করেন না। কট্টর যুক্তিবাদীরা অবশ্য এসব বিধিনিষেধ মানেন না। পুরাণে আছে, সমুদ্রমন্থনের অমৃত ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর রাহু আর কেতু সেখানে এলেন। যখন দেখলেন যে তাঁদের জন্যে একটু ছিটেফোঁটাও অমৃত পড়ে নেই, তখন রাগে অন্ধ হয়ে চাঁদ আর সূর্যকে খেয়ে ফেললেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই বমি করে বার করে দিলেন। এই চলতে থাকল। গিলে ফেলা অবস্থাটাই গ্রহণ।

অন্যমতে, সমুদ্রমন্থনের পর দানব কেতু দেবতা সেজে দেবতাদের সাথে একাসনে বসে অমৃত পান করতে লাগলেন। চন্দ্র আর সূর্য এঁকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দিলেন। ভগবান বিষ্ণু তখন তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে কেতুর মাথাটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর থেকে তাঁর মাথার নাম হলো 'রাহু' আর ধড়টার নাম হলো 'কেতু'।

গ্রহণের কি প্রভাব আছে মানুষের দেহের ওপর? ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণের সময় এনকেফেলাইটিস্ রোগে আক্রান্ত কিছু শিশুকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখায় তাদের অনেকেই নাকি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণ, বিশেষতঃ পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে যত গবেষণা করেন চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে কিন্তু তার সিকিভাগও মাথা ঘামান না। গ্রহণের সময়, বিশেষতঃ মানসিক রোগী পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির আচরণে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা।

জুলভার্ন-এর 'ফারের দেশ'-এ দেখা যায়, এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্যগ্রহণ দেখতে মেরু অঞ্চলে গেছেন। কিন্তু হিসাব মতো সময়ে সে গ্রহণ হলো না। বিজ্ঞানী কিন্তু হতাশ হলেন না; তিনি বললেন, হিসাব নির্ভুল। তবে তাঁরা যে গ্রহণ দেখতে পেলেন না তার কারণ হচ্ছে, যে অঞ্চলে তাঁরা আছেন সেটা একটা বিশাল ভাসমান বরফের চাঁই। গ্রহণের সময় সেটা ভাসতে ভাসতে গ্রহণের ছায়াময় পথ থেকে সরে গেছে। তাঁর এই যুক্তি পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এইখানেই বিজ্ঞানের জয়। কাজেই এক গ্রহণের ১৮ বছর ১০-১১ দিন পর গ্রহণ দেখতে পান বা না পান হিসাবে কোনও গরমিল নেই—এটা নিশ্চিত। গ্রহণ হবেই।



দিব্যজীবনের অমৃতকথা

তারকনাথ ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায় ঃ নির্মলকুমার রায়। দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। মূল্য ঃ ষোল টাকা।

রামকৃষ্ণ-প্রণাম ঃ শ্রীকানাইলাল দত্ত (সম্পাদক); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট, নববারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। মূল্য ঃ তিরিশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (সঙ্কলক)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট, নববারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। মূল্য তিরিশ টাকা।

যথার্থ মহৎ জীবন আমাদের দুভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রথমতঃ দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত যে রূপ (শ্রীরামকৃষ্ণের মতো পুরুষের ক্ষেত্রে যেটিকে লীলা-রূপ বলা যায়) তা একযোগে আনন্দদান আর উদ্দীপনা-সঞ্চার করে। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের ভাবনা বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা বাণীরূপে ধরে প্রকাশিত হয়ে উৎসুক চিত্তকে জাগ্রত করে তোলে। মনোলোকের বিকাশ-সাধনে দুইয়েরই বিশেষ ভূমিকা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের যেটি মানবরূপ, সেটিও লীলাবৈচিত্র্যে অপরূপ। বিশেষতঃ তার শেষ পর্বটি যেমন বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে আকর্ষণীয়, তেমনই তাৎপর্যময়—রহস্যঘন বলাই সঙ্গততর। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আরও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা নির্মলকুমার রায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়' বর্ণনা প্রসঙ্গে মুখ্যতঃ বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন, কেবল গ্রন্থারম্ভে 'পূর্বাভাস' অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। মূল গ্রন্থ শুরু হয়েছে 'দক্ষিণেশ্বর পর্ব' থেকে। লেখক পানিহাটিতে চিড়ার মহোৎসবে যোগদান থেকেই অন্ত্যলীলার সূচনা অনুভব করেছেন, এর পর 'বাগবাজার পর্ব', 'শ্যামপুকুর পর্ব' ও 'কাশীপুর পর্ব'। লেখক বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক ক্রমে সন্নিবেশ করেছেন—অবকাশমত শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রধানতঃ ভক্তের ভূমিকা থেকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়ায় গ্রন্থটি অনুরাগী পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে আশা করা যায়। মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

পরের দুটি গ্রন্থই প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট, নববারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা যেমন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, তেমনই তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। নববারাক-পুরের শ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে ব্রতী হয়েই এই গ্রন্থদুটি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগ যথার্থই প্রশংসার্হ।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম' বিভিন্ন দেশনেতা, সাহিত্যিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সন্ন্যাসী ও অনুরাগী বা ভক্তের রচনা-সংকলন। সংকলন শুরু হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র দিয়ে—সমাপ্তিও তাঁরই 'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্'-এ।—প্রায় সব নিবন্ধই আহৃত রচনা, কয়েকটি রচনা দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকে সংকলিত। সেগুলির রচয়িতা বিশিষ্ট কয়েকজন পুরুষ—রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য বিনোবা ভাবে ও সুভাষচন্দ্র বসু। এই লেখাগুলি অবশ্যই আকর্ষণীয় এবং সঙ্কলনের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে।

আহৃত রচনাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমার প্রশংসনীয় প্রয়াস। দুটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে—রমেশচন্দ্র মজুমদার (অপর গ্রন্থটির সংকলক) ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বিরচিত। বাকি প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণের যে-কোন ভাবই অপরিমেয় এবং প্রত্যেকটি নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা বা গ্রন্থরচনাও করা যায়। তা সত্ত্বেও বিষয়গুলি সুনির্বাচিত এবং নিবন্ধগুলি নাতিদীর্ঘ হলেও সযত্নরচিত হওয়ায় জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা,

তাঁর সাধনার বিবরণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর অপরিসীম দান নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কয়েকটি নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এছাড়া, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবা ভাবের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সন্তানদের ও বিশিষ্ট কয়েকজন গৃহী ভক্তের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি'—সংকলনটি উল্লেখযোগ্য।

রুশ দর্শনবিদ্ ডি. ব্রভভ-এর 'সত্যদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ' (অনুবাদ) নিবন্ধটি সাম্প্রতিক কালে বিদেশীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিশ্লেষণের নিদর্শনরূপে মূল্যবান।

'শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা'—নিজমুখে আত্মকথা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—এই দুটি গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে নিজের জীবন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে সংকলক সেগুলি সংকলন করে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করেছেন। ঘটনাবলীর ক্রম নির্ধারণে লীলাপ্রসঙ্গের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কথামৃতের ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে—ঐ গ্রন্থ থেকে উৎকলিত অংশের পরিমাণই বেশি। লীলাপ্রসঙ্গের সাধুভাষাকে কথ্যভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে—এমন দক্ষতার সঙ্গে দুটিকে মেলানো হয়েছে যে পাঠক অনুভব করেন যেন আদ্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিজমুখের কথাই শুনছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে-ভাবের সাধনা করেছেন তখন সেই ভাবের সাধক ও ভক্তদের সমাগম হয়েছে—এই মূল সূত্রটি অনুসরণ করে সংকলক একান্ত সতর্কতা সহকারে ও তীক্ষ্ণ অনুমানশক্তির প্রেরণায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কালের দিক দিয়ে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নিরূপণ করা সম্ভবপর নয় (নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকায়), কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি অখণ্ড ধারার মতো রূপায়িত হয়েছে। অনুরাগী পাঠকমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করবেন।

কথামৃত থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত 'কথোপকথনে জীবনকথা' ও 'উপদেশ-শতক' আকর্ষণীয় ও মূল্যবান। পরিশিষ্টে সংকলকের (আলোকচিত্র সহ) পরিচয়, প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যাখ্যান ও নির্ঘণ্ট সংযোজিত হয়েছে।

'সংকলকের নিবেদন'-এর তারিখ ১৯৫৯। সংকলক রমেশচন্দ্র (ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র নন) রচনাসমাপ্তির পনেরো বছর পরে (১৯৭৪) পরলোক গমন করেছেন। তারও তের বছর পরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। রচনার দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হলেও এটি পাঠ করা মাত্রই অনুভব করা যায় যে, এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

প্রাপ্তি স্বীকার

অর্ঘ্য কুসুম : বটকৃষ্ণ বসু। মায়ের মন্দির (সংস্কৃতি সংস্থা), ১২।৫, গণেশ মাজী লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া-১। মূল্য : দশ টাকা।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (সংক্ষেপিত)। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। মূল্য : দশ টাকা।

রামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রভাসচন্দ্র সাহা জন্মশতবর্ষ স্মরণে : রামপ্রসাদ সাহা। ৮৯ নং সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিঃ-৭০০০৭৫। মূল্য : কুড়ি টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৫তম আবির্ভাব-উৎসব গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ **বেলুড় মঠে** নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। দুপুরে প্রায় ২২,৫০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজীর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ মার্চ সারাদিন-ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯০) থেকে সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের প্রথম দিন শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন প্রায় বারো হাজার নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর ওপর তিনদিন ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভার বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গোপেশানন্দ, অধ্যাপক জওহরলাল বেরা প্রমুখ। ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাছাড়া বেতারশিল্পী সুভাষ চক্রবর্তীর রামায়ণ গান, হাওড়া শিবপুর সারথির লীলাগীতি, এবং উত্তম পাত্রের বাউল সঙ্গীত ছিল অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম গত ২৩ থেকে ২৮ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চিরঞ্জীব বসু। পরে আশ্রমের সেবকবৃন্দ-কর্তৃক 'ধর্মসিংহাসন' পালা যাত্রাভিনয় হয়। ২৭ জানুয়ারি যুবসমাবেশে ৩৮টি সংস্থার ছাত্রছাত্রী ও যুববৃন্দ বক্তৃতা ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। অমিত বসুর পরিচালনায় যোগ-ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়। যুব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরে আয়োজিত শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। রাত্রে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ-কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবের শেষ দিন বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সংকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অপরাহ্নে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী রমানন্দ। রাত্রে শিশুদের দ্বারা অভিনীত হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং পরিশেষে 'মেঘনাদ বধ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উদ্বোধন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি **বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম** পরিচালিত তিনদিনের এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক।

২৮ জানুয়ারি **রাজকোট আশ্রমের** দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত বাড়ির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

পরিদর্শন

গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেঘালয়ের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পি. এ. সাংমা **চেরাপুঞ্জির শেলা আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

কোয়েম্বাটোর আশ্রম পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ন্যাশনাল এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রথম হয়েছে এবং আরেকজন ছাত্র সারা ভারত বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে।

বহির্ভারত

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন (বাংলাদেশ) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি ও বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অক্ষরানন্দ। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায়চৌধুরী; ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণে বিচারপতি রণধীর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ এস. ধর্মপাল মহাথের, রেভারেন্ড বিশপ বি. ডি. মণ্ডল, ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হুসেন, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। ২৮ তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা-সভায় সভানেত্রী ছিলেন চিত্রা ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ হাসনা বেগম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা। ডঃ অপর্ণা ভট্টাচার্য, রেবা সেন, ডঃ শওকত আরা হোসেন, রীণা দাস, মুকুলিকা সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ১ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে নেপালের রাষ্ট্রদূত ডঃ এম. পি. লোহানী, ডঃ রফিকুল ইসলাম, ডঃ প্রদীপকুমার রায়, বাসুদেব ধর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পিগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২ মার্চ সারাদিন নানা আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐদিন প্রায় ১১ হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেছেন।

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে গত ৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর ওপর আলোচনা হয়েছে এবং অন্যান্য রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ ও প্রতি মঙ্গলবার গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

ত্রাণ

মেঘালয় শৈত্যত্রাণ ঃ চেরাপুঞ্জি আশ্রমের মাধ্যমে শেলা গ্রামের নিকটবর্তী দুস্থ উপজাতিদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৭২২টি শীতের পোষাক পাঠানো হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ ঃ বিশাখাপত্তনম আশ্রমের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডে সর্বকিছু ভস্মীভূত হয়েছে এমন পাঁচটি পরিবারকে এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন ঃ উত্তর ২৪ পরগনার মালকানগুমটিতে বিদ্যালয়-গৃহ ও তৎসংলগ্ন আশ্রয়-গৃহের নির্মাণকার্য চলছে।

গুজরাট পুনর্বাসন ঃ রাজকোট আশ্রম পঞ্চমহল জেলার গোধার তালুকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৭টি হরিজন পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন

গত ১১ মার্চ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-তিথি এবং ১৫ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী প্রত্যেক মঙ্গলবার ভক্তিযোগ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণসংঘে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের সভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী, সারদা মঠের প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা এবং ঐতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন যুগলকৃষ্ণ কুণ্ডু, দীপংকর ভট্টাচার্য ও ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম, নাওরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে এই আশ্রমে বার্ষিক সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় আঞ্চলিক যুবসম্মেলন করা হয়। ঐ দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্বামী পুরাতনানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী। এই অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৬০০ জন ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে যোগদান করেছিল। ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী কমলেশানন্দ। বক্তা ছিলেন সনৎ চট্টোপাধ্যায়।

গোয়াবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাসংঘে (কলিকাতা-৬) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের ২য় দিনে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও উপনিষদ্ পাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন মধ্যাহ্নে প্রায় সাত হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের প্রতিদিনই ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। ২ মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী এবং বক্তা ছিলেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। ধর্মসভার পর ২০০জন দুস্থের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের (উঃ ২৪ পরগনা) দ্বিতীয় বার্ষিক মন্দির-প্রতিষ্ঠা দিবস এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৩ জানুয়ারি মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ, আলোচনা-সভায় ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। দুপুরে দুই সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কথামৃত পাঠ করেন স্বামী পুরুষানন্দ এবং স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী গিরিজাআনন্দ।

গত ২৩ জানুয়ারি **রামপাড়া (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-সংঘের** ব্যবস্থাপনায় তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি অধ্যুষিত **খন্দপুকুর** গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং বক্তা ছিলেন কানাইলাল দে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রায় ৫০০জন ভক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই সংঘের ব্যবস্থাপনায় **দক্ষিণডিহি** গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। প্রধান অতিথি হিসাবে ডঃ হোসেনুর রহমান এবং পিনাকী মৈত্র বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিগীতি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী চক্রবর্তী, শ্রাবণী নন্দী ও বীথিকা মালিক। সভায় প্রায় ৫০০জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১—২৩ জানুয়ারি **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার পরিষদ গোপীবল্লভপুর (মেদিনীপুর)** শাখার উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ কল্পতরু স্মরণোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার-সংঘের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক গীতিনাট্য ও জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র

প্রদর্শিত হয়। শংকর সোমের পরিচালনায় স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও নেতাজী স্মৃতি-সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক এক বিরাট প্রভাতফেরীরও আয়োজন করা হয়।

বঙ্কিমনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে গ্রাম-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩৫০০জন ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরের দিন ধর্মসভা, লীলাগীতি, রামায়ণ গান প্রভৃতির মাধ্যমে তিথি-পূজা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি **রাণীগঞ্জ** বাসন্তী দেবী গোয়েঙ্কা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের হিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিবেকানন্দ ছাত্র সম্মেলন। এই উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বামীজী সম্পর্কিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুরেশ অন্তর। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বামীজীর বাণী-সম্বলিত পুস্তিকা এবং অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি একই স্থানে 'সঙ্গীতে কথামৃত' শীর্ষক একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারকেন্দ্র বহড়াগোড়া, সিংভূম (বিহার) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ১৫৫তম জন্মোৎসব ৪ঠা মার্চ থেকে তিনদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ, স্বামী শশধরানন্দ এবং কালীপদ সিদ্ধ্যাচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীপ্রচার-সঙ্ঘ কর্তৃক গীতিনাট্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের জামশেদপুর শাখার সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

জয়নগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য ১৫৫তম আবির্ভাব বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ মার্চ এক মনোজ্ঞ ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীঃ আজকের জনজীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু, অধ্যাপক সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী কমলেশানন্দ।

নদীয়া জেলার **বড় জাগুলিয়া** গ্রামে 'মালঞ্চ শিশু শিক্ষা নিকেতন' গড়ে উঠেছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ। প্রথম বছর ৫৬জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি শুরু হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১০। রামকৃষ্ণ সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একটি স্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছে। দুঃস্থদের মধ্যে জামাকাপড়, শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণও প্রতিষ্ঠানটির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র উদ্বোধন কার্যালয় ও সারদাপীঠ প্রতিষ্ঠানটিকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা করে আসছে। এখানে পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে বিনাবেতন বা অর্ধবেতনে পড়ানো হয়। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী সনাতনানন্দ এবং ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর ভাবাদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং স্বামীজী সম্পর্কে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মহাপ্রয়াণের মাসখানেক আগে বড় জাগুলিয়া যান এবং সপ্তাহখানেক শিষ্যা এবং সম্পর্কিত ভগিনী মৃণালিনী বসুর বাড়িতে থাকেন। ঐ বাড়িটি বর্তমানে 'স্বামীজীর পদচিহ্ন' নামে পরিচিত।

পরলোকে

বহরমপুরের জনপ্রিয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক **শিশিরকুমার দত্ত** স্বল্প রোগভোগের পর গত ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ দুপুর ১-৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। বাল্যকালেই তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হন। খাগড়া শ্রীশ্রীসারদামণি পাঠচক্র তাঁরই উৎসাহ ও উদ্যোগে স্থাপিত হয়। দেহত্যাগের স্বল্পক্ষণ পূর্বেও গুরু মহারাজকে তিনি স্মরণ করেন। মিতভাষী, অমায়িক চিকিৎসক শিশিরকুমার দত্তের প্রয়াণে বহরমপুরবাসী মর্মাহত।

বিজ্ঞান সংবাদ

শিম্পাঞ্জী কি বিলুপ্তির পথে

আকারে ও প্রকারে মানুষের নিকটতম জীব শিম্পাঞ্জীর (Chimpanzee) সংখ্যা বর্তমানে এতই কমে এসেছে যে তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-সংখ্যা আফ্রিকার বিষুবরেখার কাছাকাছি ২৫টি দেশে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল লক্ষ লক্ষ, তা এখন ঐ অঞ্চলের মাত্র পাঁচটি দেশে সীমাবদ্ধ এবং সংখ্যায় প্রায় দুই লক্ষ। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে: (ক) মানুষের বসতি বেড়ে যাওয়া, বন-জঙ্গল কেটে ফেলা এবং নতুন নতুন খনি হওয়ায় শিম্পাঞ্জীর বাসোপযোগী জায়গা কমে যাওয়া; এর ফলে শিম্পাঞ্জীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় সন্তান-সন্ততি কম হওয়া এবং মানুষের থেকে পলিওমায়েলাইটিস প্রভৃতি সংক্রামক রোগ পাওয়া। (খ) মাংসের জন্য এবং ছোটখাট লোভনীয় দ্রব্যের (pet) জন্য এদের হত্যা করা; এবং (গ) সার্কাস, চিড়িয়াখানা এবং চিকিৎসা-গবেষণার জন্য ব্যবসার পণ্য হিসাবে জঙ্গল থেকে এদের ধরা।

আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে শিম্পাঞ্জী পাওয়া যায় না। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগল অঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলের তানজানিয়া ও উগান্ডা দেশ পর্যন্ত ৪০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকায় শিম্পাঞ্জীর দেখা পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে সিয়েরালিওন এবং আরও চারটি দেশে এদের দেখা যায়। সিয়েরালিওনই এখন শিম্পাঞ্জী ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুরকম প্রজাতির (species) শিম্পাঞ্জী আছে—ছোট বেশি। এরজন্য শিকারীরা রক্ষাকারিণী শক্তিশালিনী মাকে গুলি করে হত্যা করে; গাছ থেকে মুমূর্ষু মা পড়ে যাওয়ার সময় অবশ্য শিশু শিম্পাঞ্জীও অনেক সময় মারা যায়। কখনো কখনো খাবারে বিষ মিশিয়ে মা বা বাবাকে হত্যা করা হয়; স্তন্যপায়ী অবস্থায় থাকা শিশু মারা যায় না। তবে ধরার পরে শিশু শিম্পাঞ্জীকে ঠিক মতো দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে না পারায় এবং পণ্য হিসাবে পাঠানোর সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বেশ কিছু শিশু মারা যায়। দেখা গেছে দূরদেশের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পথে শতকরা পাঁচ থেকে দশটি শিশু শিম্পাঞ্জী উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য মারা যায়। শিম্পাঞ্জীর সন্তান-সন্ততি খুব কমই হয় এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমস্ত দল কৌতূহলী হয়ে নবজাতককে ঘিরে থাকে। চার বৎসর বয়স পর্যন্ত শিম্পাঞ্জীর শৈশবাবস্থা থাকে এবং মায়ের দুধ খায়; তার পরেও মায়ের সঙ্গে জীবনভোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। মাতৃহারা শিম্পাঞ্জী শিশুকে পিতা মানুষ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বর্তমানে শিম্পাঞ্জীর প্রয়োজন বেড়ে গেছে ডাক্তারি গবেষণার জন্য। বেশ কয়েকবৎসর আগে থেকেই হেপাটাইটিস-টাইপ বি ভাইরাস (যা এক রকমের জন্ডিস সৃষ্টি করে)-এর কাজে এই জন্তু ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই ভাইরাস মানুষ ছাড়া কেবল মাত্র শিম্পাঞ্জীর দেহেই বংশবৃদ্ধি করে বলে এদের সাহায্যে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি হয়েছে এবং সেই টিকার নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে শিম্পাঞ্জীর দেহেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমানে পৃথিবীতে ৩০ কোটি লোক (এবং আফ্রিকার ১০—২০ শতাংশ লোক) তাদের দেহে এই ভাইরাসকে বহন করছে এবং এদের মধ্যে ৩০—৬০ লক্ষ লোকের যকৃতের সিরোসিস (cirrhosis) বা ক্যান্সারে মারা যাবার সম্ভাবনা। এখন আবার শিম্পাঞ্জী ব্যবহার পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে এইডস (AIDS) গবেষণা ও তার বিরুদ্ধে টিকা তৈরির কাজে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীতে এখন আড়াই লক্ষ এইডস রোগী আছে; তাছাড়া রোগের ভাইরাস (HIV—1

এবং HIV—2) বহন করছে আরও কয়েক লক্ষ লোক, যাদের রোগলক্ষণ পরে দেখা দেবে। শিম্পাঞ্জীর দেহে (অন্য কোন জন্তুর দেহে নয়) এইডস ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু ভাইরাস-আক্রান্ত জন্তুটির এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাদের দেহে এমন কি আছে যা রোগ হওয়াকে বাধা দেয়? এটিও বর্তমানে একটি গবেষণার বিষয়। সে যাই হোক, গবেষণার কাজে শিম্পাঞ্জী অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যার জন্য এর ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। শিকারীরা স্থানীয় ব্যাপারীর কাছে একটি শিশু শিম্পাঞ্জীর দাম পায় ৫০—৫০০ ডলার, যেটি চালান হয়ে আসার পরে গবেষণাকারীকে কিনতে হয় ১৫০০০ ডলারে।

শিম্পাঞ্জীকে রক্ষা করার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন উঠছে, ও নানা উপায় গৃহীত হচ্ছে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে 'সাইটস' (CITES—Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার পর থেকে পৃথিবীর বিখ্যাত চিড়িয়াখানায় জঙ্গল থেকে ধরা শিম্পাঞ্জী আর রাখা হচ্ছে না। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে শিকাগোতে, শিম্পাঞ্জীর ওপর এক আলোচনা চক্রে তিরিশজন বৈজ্ঞানিক একটি 'সিসিসিসি' (CCCC—Committee for the Conservation and Care of Chimpanzees) নামে কমিটি করেন যার কাজ হলো জঙ্গলের শিম্পাঞ্জীকে রক্ষা করা ও ধৃত শিম্পাঞ্জীদের থাকবার ব্যবস্থার উন্নতি করা। 'সাইটস' নানারকম নিয়মকানুন করলেও সেইসব নিয়মকে এড়িয়ে যাওয়ারও নানা উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং আফ্রিকার জঙ্গল থেকে কিছু কিছু শিম্পাঞ্জী চালান হয়েই চলেছে। যে দেশে এই ব্যাপারে নিয়মকানুন তত কড়া নয় (যেমন রাশিয়ায় ও আফ্রিকাতে) সেখানে গবেষণাগার খোলার কথা ভাবা হচ্ছে। এদিকে শিম্পাঞ্জীর চাহিদা বেড়েই চলেছে। কারণ এইডস-এর টিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এক মতে, যে দু-হাজার শিম্পাঞ্জী বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে রয়েছে, তারাই টিকা তৈরির কাজে যথেষ্ট হতো; কিন্তু একদিকে ঔষধ তৈরির কোম্পানীগুলির তাড়াতাড়ি টিকা তৈরি করার প্রতিযোগিতা (যে আগে তৈরি করে, সে সারা পৃথিবীর বাজার দখল করে বসবে), অন্যদিকে গবেষকদের মধ্যে প্রথম টিকা তৈরি করে নোবেল পুরস্কার পাবার আকাঙ্ক্ষা, তা হতে দিচ্ছে না।

শিম্পাঞ্জী সংরক্ষণ প্রয়াসী কিছু কিছু লোক প্রশ্ন তুলছেন, পৃথিবীর পাঁচ হাজার কোটি মানুষের তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী কয়েক সহস্র প্রাণীকে নির্মূল করার কি অধিকার আছে? তাঁদের মতে যদি এইসব গবেষণা জড়বুদ্ধি মানুষের ওপর করা অনৈতিক হয়, তাহলে শিম্পাঞ্জীর ওপর করা কিছুতেই নৈতিক হতে পারে না। প্রজননবিদ্যা বিশেষজ্ঞ-(Geneticist) দের মতে, মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জী মাত্র এক শতাংশ জীন (gene—বংশগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান)-এর পার্থক্য আছে; বাকি ৯৯ শতাংশ উভয়ের সমান। অবশ্য এই এক শতাংশই একজনকে মানুষ করেছে, অন্যকে বানর জাতীয় শিম্পাঞ্জী।

এসব সত্ত্বেও গবেষণার জন্য শিম্পাঞ্জীর দরকার। তাই চেষ্টা চলছে, জঙ্গল থেকে না ধরে গবেষণাগারের পরিবেশে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না, কারণ ল্যাবরেটরির পরিবেশে মা তার সন্তানকে ভালভাবে পালন করছে না। কৃত্রিমভাবে তাদের মানুষ করলে, তারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হচ্ছে। এখন জোর দেওয়া হচ্ছে তাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক পরিবেশের ওপর। কারণ শিম্পাঞ্জী সামাজিক প্রাণী (Social animal) তাদের আলাদা করে রাখলে ফল ভাল হয় না। আমেরিকার এন. আই. এইচ. (NIH—National Institute of Health) এখন একটি কার্যসূচি নিয়েছে যাতে পাঁচটি শিম্পাঞ্জী উৎপাদন কেন্দ্রে বছরে তিন ডজন শিম্পাঞ্জী পাওয়া যায়। এতে ৩৫০টি শিম্পাঞ্জী ব্যবহৃত হবে এবং খরচ পড়বে বৎসরে ২৫ লক্ষ ডলার। এ ছাড়া চেষ্টা চলছে, শিম্পাঞ্জী ব্যবহার না করে অন্য উপায়ে—যেমন টিসু কালচার (Tissue Culture) এর মাধ্যমে কি করে প্রয়োজনীয় গবেষণা চালান যেতে পারে।

[Animal Kingdom, Jan.-Feb., 1989, pp. 38-51]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



জ্যৈষ্ঠ

১৩৯৭

৯২তম বর্ষ

৫ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।… ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ—৫ম সংখ্যা | মে, ১৯৯০ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

দিব্য বাণী

তস্যাশ্চ শরীরং ঘনীভূতঘৃতবদ্রজস্তমঃসম্পর্কশূন্যে-শুদ্ধসত্ত্বঘনীভাবরূপম্। অন্যাসাং শিবশক্তীনাং কতিপয়ানাং সাত্ত্বিকশরীরাণ্যপি সত্ত্বাধিক্যগুণান্তরাল্পত্বযুক্তানি ন পুনঃ শুদ্ধসত্ত্বানি। অতঃ **সর্বোত্তমৈবৈষা** পরব্রহ্মমূর্তিঃ।

ললিতাসহস্রনাম

তাঁর (ষোড়শীর) শরীর ঘনীভূত ঘৃতের মতো রজঃ তমঃ সম্পর্কশূন্য শুদ্ধসত্ত্বঘনীভূত মূর্তি। অন্যান্য শিবশক্তিদের কারো কারো সাত্ত্বিক শরীর আছে এবং তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যও আছে, কিন্তু তাঁদের সত্তায় রজঃ ও তমঃ গুণও অল্প পরিমাণে যুক্ত আছে। তাঁদের কারোরই শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি নয়। এই হেতু দেবী ষোড়শীই সর্বোত্তমা পরব্রহ্মমূর্তি।



কথাপ্রসঙ্গে

একটি পূজা এবং তাহার তাৎপর্য

আজ হইতে একশো সতের বৎসর পূর্বে (স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৮০/১৮৭৩ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ/২৫ মে, স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে ১২৭৯/১৮৫২ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ/জুন) পৃথিবীর বুকে একটি মহাঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং ঘটিয়া গিয়াছে সকলের অলক্ষ্যে, নীরবে, নিভৃতে। যে ঘটনার কথা বলিতে চাহিতেছি তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সারদাদেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজা। ঘটনাটি আজ পৃথিবীব্যাপী রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে কাহারও অজানা নহে, অবিদিত নহে রামকৃষ্ণ-জীবনীর সহিত সামান্য পরিচিতি-সম্পন্ন বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক নরনারীর কাছেও যাঁহারা সাধারণ অর্থে 'ভক্ত' নহেন।

কিন্তু ঘটনাটি 'মহাঘটনা' কোন্ হিসাবে? রামকৃষ্ণ-সংঘে ঘটনাটির বিশেষ তাৎপর্য থাকিতেই পারে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহার কোন্ তাৎপর্য রহিয়াছে? প্রশ্নটি স্বাভাবিক। আমরা প্রথমে পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

ইহা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রে নারীর একটি বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। পুরুষের ভূমিকাও কম নহে, কিন্তু পুরুষের ব্যক্তিমানস গঠনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই যে প্রধান তাহা অনস্বীকার্য। সেই নারী মুখ্যতঃ কখনও জননী, কখনও পত্নী। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে জাতি। ব্যক্তি গুণগত উৎকর্ষ অর্জন করিতে না পারিলে পরিবার, সমাজ ও জাতির গুণগত উৎকর্ষ আসিতে পারে না। সভ্যতার সূচনা হইতে প্রধানতঃ জননী এবং পত্নী হিসাবে নারী ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরিবার, সমাজ ও জাতিকে পরোক্ষভাবে গঠন করিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিঃশব্দে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহার জন্য সে কখনও কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে নাই। তাহার সমস্ত সত্তাকেই সে অকৃপণভাবে উজাড় করিয়া দিয়াছে। আপন আনন্দের কথা, সুবিধার কথা, স্বার্থের কথা, সে ভাবে নাই। বিচ্ছিন্নভাবে ইহার ব্যতিক্রম থাকিতেই পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নারী সম্বন্ধে কথাগুলির সত্যতা অবিসংবাদিত। প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেমন লোকলোচনের

অন্তরালে, লোককর্ণের অগোচরে ধানের শীষের উপর, গাছের পাতার উপর, প্রান্তরের তৃণগুচ্ছের উপর পড়িয়া তাহাদের সজীব করে, নারীও তেমনই নীরবে, নিঃশব্দে তাহার স্নেহ, প্রেম, পবিত্রতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা মনুষ্যসমাজকে পুষ্টি যোগাইয়া যায়, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করিয়া তোলে।

নারীর এই নীরব সেবা পাইতে পাইতে ক্রমে পুরুষ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা তাহার অধিকার, ইহা তাহার প্রাপ্য। নারী যেন পুরুষের ক্রীতদাসী—সে জননীই হউক, জায়াই হউক, ভগিনী হউক অথবা কন্যাই হউক। পুরুষপ্রধান সমাজে সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, লোকাচারাদির মাধ্যমে এই মনোভাব এমনভাবে প্রচারিত হইয়াছে যে নারীর মধ্যেও ইহাকে মানিয়া লইবার স্পৃহা যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

নারী সম্পর্কে পুরুষের এই ধারণা বেদনাদায়ক। কিন্তু ইহা ঘটনা। ইহার সূচনা কখন হইয়াছে বলিতে পারিব না, তবে বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে হইয়াছে তাহা বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের প্রমাণ হইতেই বুঝা যায়। সভ্যতার যত তথাকথিত অগ্রগতি হইয়াছে ততই যেন নারীর মহত্ত্বকে অস্বীকার করিবার, নারীর ব্যক্তিসত্তাকে অগ্রাহ্য করিবার, নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিবার প্রবণতা ও প্রয়াস বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রমশঃ পোশাকী সভ্যতার তুঙ্গশিখরের দিকে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। সেই অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য এক মাইলপ্রস্তর ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী। পাশ্চাত্যে এবং ভারতবর্ষেও—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজগ্রন্থে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে প্রশস্তি করিতে বহু মসী ব্যয়িত হইয়াছে—নারীর স্থান শোচনীয়ভাবে অবনমিত হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সারদাদেবীকে পূজা করিলেন তখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি যেমন হইতেছিল, তেমনই হইতেছিল মানবিক ও আধ্যাত্মিক মানের ক্রমাগত অবনয়ন। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কবিচারে পুরুষের অর্থহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মানসিকতা (superiority complex) ক্রমেই যেন মুখ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। জননী অথবা পত্নী, ভগিনী অথবা কন্যা যাহাই হউক, পুরুষের কাছে প্রতিবাদের অধিকারহীন বিনা বেতনের দাসী এবং সন্তান ধারণের যন্ত্রের অতিরিক্ত নারীর অন্য কোন সত্তার স্বীকৃতি পুরুষের অভিধান হইতে যেন অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। পাশ্চাত্যের মানুষের নারীর প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার বা শিভ্যালরির ঐতিহ্য বহুল প্রচারিত। কিন্তু তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোশাকী এবং কৃত্রিমতায় পূর্ণ। স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষের অভ্যন্তরটিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গভীর আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যে মানুষ নারীর পূজা করে, কিন্তু সে পূজা পবিত্রতার মন্ত্রে নহে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের মন্ত্রে নহে, সে-পূজা নিতান্তই কামের মন্ত্রে। বাস্তবিক, পাশ্চাত্যের সেই তরঙ্গ আজ প্রাচ্যকেও গ্রাস করিতে শুরু করিয়াছে। অধিকাংশ পুরুষের চিন্তা, চেতনা এবং আচরণে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদার বিষয়টি আজও অস্বীকৃত।

নারীর প্রতি, নারীত্বের প্রতি ইহা চূড়ান্ত অবিচার, চরম অসম্মান। এই অবিচারের বিরুদ্ধে, এই অসম্মানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহধর্মিণী সারদাদেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া। নারীর প্রতি জগতের পুরুষের যে ব্যবহারিক দৃষ্টি, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদকে তিনি বচনে পর্যবসিত করেন নাই, কাব্যে অলংকৃত করেন নাই; আপন আচরণে তাহাকে তিনি বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভবতারিণীর পূজা করিতেন তখন মন্ত্র, অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিতেন না। তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে 'ভাবের পূজা'। কিন্তু তিনি যখন সারদাদেবীর পূজা করিলেন তখন কোন অনুষ্ঠানেরই ব্যত্যয় হয় নাই; সমস্ত অনুষ্ঠান যথাবিধি নিখুঁতভাবে তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন ইহাই বুঝাইতে যে, নারীমাত্রেই বিশ্বধাত্রীর অংশ এবং তাঁহার সম্মুখে পূজার আসনে যিনি বসিয়া আছেন তিনি নিখিল নারীত্বের ঘনীভূত প্রতিমা। বিশ্বের সকল জননী, সকল পত্নী, সকল ভগিনী, সকল কন্যার তিনি প্রতীক-স্বরূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করিতেন নারীর মহিমার সর্বোচ্চ প্রকাশ জননীভাবে। পাশ্চাত্য নারীর জায়াভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। জায়া, ভগিনী, কন্যা—নারীর কোন ভাবকেই ছোট করা শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু জননীভাব যে নারীর সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব সে-সম্পর্কে বোধ করি কোন প্রশ্ন উঠিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর মধ্যে জগতের নিখিল মাতৃরূপের সারভূতা বিগ্রহকে পূজা করিয়াছিলেন। এবং

প্রত্যক্ষতঃ সেই বিগ্রহ মাটি, কাঠ বা প্রস্তর নির্মিত ছিল না ; তাহা ছিল জীবন্ত, চেতন। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে পূজা করিয়া তাঁহার মধ্যে নিখিল নারীত্বের এবং জগন্মাতৃস্বরূপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভবতারিণীর পূজা করিতেন তখন মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে ভাবিবার প্রয়াস ছিল, তাহার মধ্যে চিন্ময়ীকে জাগ্রত করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই হৃদয়ের ঐকান্তিক আর্তি ও ব্যাকুলতাই তাঁহার পূজার্চনাকে অধিকার করিয়া রাখিত। ফলতঃ মন্ত্র, মুদ্রা, অন্যান্য শাস্ত্রানুসারী অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভাবই সেখানে প্রাধান্য লাভ করিত। অবশ্য পূজায় অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভাবের গুরুত্বই অধিক এবং ভাবই পূজার শেষ কথা। জগৎকে তাহা দেখানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ঐভাবে মাতৃসাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সারদাদেবীর পূজা করিলেন তখন তাঁহার মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী ভাবিবার প্রয়াস করিতে হয় নাই, মৃন্ময়ীকে চেতনায়িত করিবার প্রয়োজন হয় নাই। জীবন্ত দেবীকেই তিনি পূজার আসনে বসাইয়াছিলেন। দীর্ঘ আটমাস কাল একত্র বাস করিয়া তিনি সারদাদেবীর শুদ্ধতা ও দেবীসত্তার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলেন। শুধু প্রয়োজন ছিল তাহার আনুষ্ঠানিক জাগরণের। তাই শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জাগরণের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপরন্তু আনুষ্ঠানিক পূজাদি না করিলে সনাতনপন্থীরা বলিবার অবকাশ পাইতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ পূজা পূজাই নহে, পূজার প্রহসন মাত্র। অবশ্য আনুষ্ঠানিক পূজাপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর সেক্ষেত্রেও শুরু হইয়াছিল তাঁহার ভাবের পূজা। পূজিতা এবং পূজক উভয়েই তখন গভীরতম ভাবরাজ্যে নিমগ্ন। বহুক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবরাজ্য হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমগ্র সাধনার ফল, তাঁহার জপমালা সারদাদেবীর চরণে সমর্পণপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সমাপ্ত হইল।

এই অভিনব পূজার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে বুঝাইয়া দিলেন নারীর স্থান কোথায়। প্রণিপাত আমরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টজনকে করি না, সমকক্ষকেও করি না ; করি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনকে। পূজা আমরা করি দেবতাকে অথবা দেবকল্প ব্যক্তিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন, নারীকে শুধু সমান ভাবা নহে, তাহাকে পূজ্য বা শ্রেষ্ঠের সম্মান দিতে হইবে। নারীকে এতবড় সম্মান জগতে আর কেহ কখনও বাস্তবে দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

নারীর সম্মান রক্ষিত না হইলে সভ্যতার জয়ডঙ্কা অর্থহীন হইয়া যাইবে— উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার অভিনব মহাপূজা সম্পন্ন করিয়া ভারতবর্ষ ও পৃথিবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাই বলিয়া যাইলেন। বাস্তবিক, সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, জাতিকে গঠন করিতে হইলে নারীর যথোচিত সম্মান ও মর্যাদাদানের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। সম্মান ও মর্যাদাদানের অর্থ ইহা নহে যে, বাড়িতে বাড়িতে জননী, পত্নী, ভগিনী ও কন্যার পূজা শুরু করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন আমাদের সামনে একটি আদর্শকে, একটি মহান দৃষ্টিভঙ্গিকে, উপস্থাপন করিবার জন্য। তিনি বলিতেন, তিনি আদর্শের ষোল আনা জীবনে পালন করিয়া দেখাইয়া যাইতেছেন, যাহাতে অপর সাধারণ অন্ততঃ এক আনা অনুশীলন করিতে তৎপর হয়। সারদাদেবীকে পূজা করিয়া নারী ও নারীত্বের পরম মর্যাদার চরম স্বীকৃতি তিনি দিয়াছিলেন এবং জগৎ যাহাতে নারীকে যথাযথ মর্যাদা দান করে সেইদিকে জগতের দৃষ্টিকে তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সারদাদেবীর 'ষোড়শী পূজা'র তাৎপর্যের প্রসঙ্গে আসিতেছি।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে অক্ষয়কুমার সেন অপূর্ব ভাষায় লিখিয়াছেনঃ

"যেন পূজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার,
পরিণাম সকলের শেষ।"

স্বামী সারদানন্দও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ "মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।"

পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সমতুল দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নাই। তাঁহার সাধনার সূচনা হইয়াছিল আদ্যাশক্তির এক রূপ কালীর সেবা-পূজার মাধ্যমে। কালী দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ। তাহার পর দেবীর দর্শনলাভ তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সাধনা সেখানে থামিয়া যায় নাই। রূপ হইতে রূপান্তরে তিনি ঈশ্বরকে সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন। অবশেষে রূপ হইতে গিয়াছেন অরূপে—সাকার হইতে নিরাকারে, সগুণ হইতে নির্গুণে, দ্বৈত

হইতে অদ্বৈতে। সুদীর্ঘ সেই সাধনার কাল, দুর্লঙ্ঘ্য সেই সাধনার এক-একটি স্তর। কিন্তু অবশেষে সব পথে, সব মতে তিনি সেই পরম এক-কেই দেখিয়াছেন। ঘোষণা করিয়াছেন সেই মহাবাক্যঃ "যত মত তত পথ"। সাধনার শেষ হইল। কিন্তু সাধনার ফল যে সিদ্ধি সেই সিদ্ধিও তো সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সমর্পণ কাহাকে? যাঁহার সাধনা তাঁহাকেই। সূচনা হইয়াছিল কালীর সাধনায়, শেষ হইল ষোড়শীর পাদপদ্মে সাধনার ফল সমর্পণে। কালীর বর্ণ কৃষ্ণ। সাধনার সূচনায় তো অন্ধকার পথেই সাধককে যাত্রা করিতে হয়। ষোড়শীর বর্ণ প্রভাতসূর্যকিরণের মতো। সাধনার সিদ্ধিতে সাধক তো জ্যোতির উজ্জ্বল রাজ্যেই প্রবেশ করেন। ষোড়শী দশমহাবিদ্যার তৃতীয় রূপ। যিনিই কালী, তিনিই ষোড়শী। শুধু নামভেদ, শুধু রূপভেদ। তাই ফল সমর্পণের জন্য, সাধনার পরিসমাপ্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বাছিয়া লইয়াছেন ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিকে। ভবতারিণীর বিগ্রহে তিনি আদ্যাশক্তির সাধনা শুরু করিয়াছিলেন, সারদাদেবীর পূজায় তিনি সেই সাধনার যবনিকা টানিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝাইয়া দিলেন আদ্যাশক্তিই এবার সারদাদেবীর মধ্যে আবির্ভূতা।

কালীতে যাহার সূচনা, ষোড়শীতে তাহার সমাপ্তি—ইহা কি শাস্ত্রসম্মত? হ্যাঁ—সর্বৈবভাবেই। দক্ষিণ ' যে তন্ত্রসাধনা তাহা 'শ্রীকুল' বলিয়া আখ্যাত, এবং বঙ্গদেশের যে তন্ত্রসাধনা তাহা 'কালীকুল' বলিয়া অভিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকুলের উপাসনায় সাধনা শুরু করিয়াছিলেন, শ্রীকুলের উপাসনায় সাধনার পরিসমাপ্তি করিলেন। পরশুরাম-কল্পসূত্রের মতে ইহাই শাস্ত্রসম্মত। কারণ পরশুরাম-কল্পসূত্রে শ্রীকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যাকে 'সম্রাজ্ঞী' বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কালীকে বর্ণনা করা হইয়াছে তাঁহার 'প্রধান' বা প্রধান সচিব বলিয়া। বলা হইয়াছে "প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হি কুর্যাৎ"—রাজার প্রসাদলাভ করিতে হইলে প্রথমে রাজার প্রধান সচিবের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তাই প্রথমে কালীর, শেষে ষোড়শীর পূজা। ললিতা-সহস্রনামের মতেও, দশমহাবিদ্যার সকল রূপের মধ্যে ষোড়শী শুদ্ধতমা এবং তাই সর্বোত্তমা।

দশমহাবিদ্যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ষোড়শীকে নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রতিষ্ঠানগত তাৎপর্য রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য শঙ্কর পুরী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মঠটি স্থাপন করিয়াছিলেন দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরীতে এবং শৃঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই শৃঙ্গেরী মঠে দেবী ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যা যন্ত্রে পূজিতা এবং কাঞ্চিপুরমে তিনিই কামাক্ষীরূপে বিগ্রহে পূজিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন পুরী সম্প্রদায় তথা শৃঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে যে ষোড়শী যন্ত্রে ও বিগ্রহে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা হইয়াছিলেন তিনিই মানববিগ্রহ ধারণ করিয়া সারদাদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। জীবন্ত সেই মানবপ্রতিমাকে পূজা করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আনুষ্ঠানিক অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ('উদ্বোধন'-এর শ্রাবণ, ১৩৮৫ সংখ্যায় বিষয়টি বিস্তৃততর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) আমরা পরবর্তী কালে দেখিব স্বামী বিবেকানন্দ সারদাদেবীকে 'সঙ্ঘজননী'রূপে আখ্যাত করিতেছেন এবং সঙ্ঘের 'রক্ষাকর্ত্রী' ও পালনকারিণী' রূপে অর্থাৎ সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রকাশ্যে তাঁহার পরিচয় ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রে সুগভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত একটি মহাঘটনা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ কি এই পূজার সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া সচেতনভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিব, শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কাজই সেই অর্থে পরিকল্পনা-প্রসূত নহে। জগদম্বার বালক শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগর্ষি শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই একটির পর একটি সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের তাৎপর্য লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই। শাস্ত্রসমর্থন বা তাৎপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারটি তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার জীবনই হইয়া উঠিয়াছে জীবন্ত শাস্ত্র, তাঁহার কর্মসাধনাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে বহুবিধ তাৎপর্যের আকর। শুধু তাহাই নহে, ভাবীকালের জন্যও তাহা উন্মুক্ত রহিবে নব নব তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কৃপা ও সাধনা

স্বামী ভূতেশানন্দ

সাধন-জীবনের একেবারেই প্রারম্ভিক অবস্থায় দু-একটি ছোট ছোট সংশয় অনেক সময়েই আমাদের মনে জাগে। তার মূলে আছে শাস্ত্র ও মহাজনদের কয়েকটি আপাতবিরোধী উক্তি। আমরা জানি 'যন সাধন তন্ সিদ্ধি', জানি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত কাঠুরিয়ার এগিয়ে চলার গল্প। আবার অপরদিকে জানি তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" গীতাতেও ভগবান বলছেন, কর্ম কর—যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধি করে—"পাবনানি মনীষিণাম্।" (১৮।৫) অথচ ভগবান এর আগে (১১।৫৩-৫৪) বলেছেন:

> "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
> শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।
> ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
> জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।"

—আমার যে বিরাট রূপ দর্শন করলে তা বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পুণ্যের ফলে দর্শন করা যায় না। হে পরন্তপ অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা এরূপ আমাকে জানতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষ দর্শন ও অন্তে আমার তাদাত্ম্যলাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তিও ভক্তির দ্বারাই সম্ভব।

কখনো বলছেন, তীব্র সাধনা ছাড়া তাঁকে পাবে না। কখনো বলছেন, যতই সাধন কর, কৃপা ছাড়া তাঁকে পাওয়া অসম্ভব, তাঁর কৃপাই তাঁকে পাওয়ার একমাত্র পথ। কখনো বলছেন, জ্ঞানের চেয়েও ভক্তি বড়। তিনি মুক্তি দিতে কাতর হন না, কিন্তু ভক্তিধন বিলোতে তাঁর কার্পণ্য আছে। কখনো বলছেন, জ্ঞানেই সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি। অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানসূর্যের উদয়ই হলো ঈশ্বরদর্শন। এইসব আপাতবিরোধী কথায় সাধক অনেক সময় দিশাহারা হয় বলেই বোধ হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ সরল সাবলীল ভাষায় সাধনপথে এই জ্ঞান ও ভক্তির এবং সাধনা ও কৃপার স্থান কি তা বলে গিয়েছেন।

জ্ঞান এবং ভক্তি অথবা সাধনা ও কৃপা পরস্পরের পরিপূরক, পাখির দুটি ডানার মতো। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি একই। কিন্তু যতক্ষণ সেই স্তরে না উঠছি, একটি আর একটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এ-সম্বন্ধে কথামৃতে একটি প্রসঙ্গ আছে। ঠাকুরকে একজন বলছেন, আমি আর কিছু চাই না, কেবল শুদ্ধা ভক্তি চাই। ঠাকুর বলছেন, যাঁকে ভক্তি করবি তাঁকে যদি না জানিস তো ভক্তি করবি কি করে? অর্থাৎ ভক্তির পাত্র যিনি তাঁর সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা দরকার। তবে কি ভগবানকে জেনে তারপর ভক্তি করবে লোকে? তাহলে তো কোনদিনই ভক্তি করা সম্ভব নয়। ভগবানকে জানার জন্যই সাধনা, জানার পরে সাধনা নিষ্প্রয়োজন। তাহলে তাঁর উক্তির অর্থ কি? না, ভগবান সম্বন্ধে একটি ধারণা মনের মধ্যে তৈরি করে নিতে হবে। কি ভাবে? শ্রবণ ও মননের দ্বারা। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা পাঠ করে বা শুনে সেইগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করলে তাঁর সম্বন্ধে একটি ধারণা জাগবে, সেটিকে কেন্দ্র করে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে হবে। আবার ভক্তিবিহীন জ্ঞানকে ঠাকুর তো বরাবরই নস্যাৎ করেছেন। তাঁর সেই বিখ্যাত প্রার্থনার কথা তো আমরা সবাই জানি—'মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনে, আমাকে রসে-বশে রাখিস।' ঠাকুরের এই কথা গীতায় ভগবানের—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্'-এর প্রতিধ্বনি যেন।

ভক্তিপথের সাধক ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণা নিয়ে তাঁকে ভক্তি করে এবং এভাবে এগোতে এগোতে ক্রমে ভগবানকে বুঝতে থাকে, ধীরে ধীরে ভগবানের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশিত হয়। তারপর সেই স্বরূপটি নিয়ে তার ভিতর ডুবে যাওয়াই হলো

সাধন। ঠাকুর বলছেন, উপর উপর ভাসলে কি হবে, ডুব দাও। তিনি গান করতেন ঃ

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে সেই রত্নধন।

যখনই তিনি এই গানটি গাইতেন সঙ্গে সঙ্গে সেই অতলে ডুবে যেতেন। কথা বন্ধ হয়ে যেত, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত, বাহ্যজ্ঞান থাকত না। 'আপনি আচরি' তিনি ভক্তদের শিখিয়ে দিতেন কি করে তাঁতে ডুবে যেতে হয়। এই ডুবে যাওয়ার সাধনার আর এক দৃষ্টান্ত তিনি দিতেন—শুক্তি মুখ খোলা রেখে জলে ভাসে, কখন তার ওপর স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল পড়বে। তারপর যেই এক ফোঁটা স্বাতী নক্ষত্রের জল পেল অমনি মুখ বন্ধ করে সে তলিয়ে গেল। আর এই তলিয়ে যাওয়ার পরের সংবাদই হলো শুক্তির মধ্যে মুক্তো।

ঠাকুর বলতেন, সাধক এই শুক্তির মতোই আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। গুরুর কাছে যে বীজমন্ত্র বা নামটি পেল তাই নিয়ে সে তন্ময় হয়ে যাবে—যতদিন না সিদ্ধিলাভ হয়। তাঁর কৃপায় বীজমন্ত্র লাভ হলো, একটি নির্দিষ্ট নাম বা রূপ পাওয়ার পর মনের যে অনিশ্চয়তা, ছোটাছুটি তা বন্ধ হলো। এবার সাধনার শুরু। সে-সাধনা অতি দুরূহ। দীক্ষা নিয়ে যাঁরা সাধনা শুরু করেছেন তাঁদের সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, মন সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র হয় না। তারজন্য চেষ্টা করতে হয়, আপ্রাণ চেষ্টা। এ সাধন কঠিন সাধন, দীর্ঘকালের সাধন, দু-চার দিনের কথা নয়। রামপ্রসাদ গাইছেন ঃ

ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥

*

রতন মাণিক্য কত
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে,
ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

ভাবটা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ফল না পেলে হতাশ হওয়া চলবে না, এখানে নগদ বিদায় নেই। ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে খুব আদরের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে চেষ্টা করে গেলে ধীরে ধীরে বস্তুর একটু আভাস মেলে এবং যেমন শুরুতে তেমনি শেষেও তাঁর দয়া হলে তবে বস্তুলাভ হবে। আদিতেও কৃপা—অন্তেও কৃপা, মধ্যে সাধন।

এখানেই অনেকের মনে সংশয় জাগে। হতাশ হয়ে সাধারণ মানুষেরা ভাবি, যদি কৃপাই শেষ কথা তবে আর সাধনের মূল্য কি? তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকি, যদি তাঁর দয়া হয়, তিনি যদি সাধন করান তো করব। এটি আমাদের মনের দুষ্টামি, আলস্যকে ঢাকবার প্রয়াস, ঘোর কপটতা। আমরা অর্থোপার্জনের সময়, রান্না-খাওয়ার সময়, পরিবার-প্রতিপালনের সময় তো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি না যে তিনি করালে তবে করব। অথচ ভগবানের নাম করার সময় বলি তিনি যদি করান তো করব। এ কি কপটতা নয়? আসল কথা মনে রাখতে হবে, যে তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারে সে-ই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে, নিজের অহং-কে একেবারে ধুয়েমুছে ফেলতে পারে। ঠাকুর বলতেন, "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।"

এই নির্ভরতালাভ অবশ্য সহজে হয় না। তা কঠোর সাধনার দ্বারাই লাভ করতে হয়। সে-সাধনার কথা ঠাকুর একটি উপমার মাধ্যমে বলছেন ঃ জাহাজের মাস্তুলে বসা পাখি ডাঙার খোঁজে চারদিক ঘুরে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে মাস্তুলেই এসে বসে রইল। ঠাকুর বলছেন, "যতক্ষণ বোধহয় ঈশ্বর 'হেথা সেথা' ততক্ষণ অজ্ঞান, যখন 'হেথা হেথা' তখনই জ্ঞান।" এই জ্ঞানলাভ হলে তবে তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা আসে। তখন বলতে পারি সাধনার দ্বারা কিছু হয় না, তাঁর কৃপার অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু তার আগে পাখির মতোই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিকে ঘুরে আসা চাই। এই হলো সাধন। সাধনার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ প্রথমটা একটু উঠেপড়ে লাগতে হয়। যতক্ষণ ঢেউ, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয় ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়। যখন বাঁক পার হলো আর অনুকূল হাওয়া বইল

তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে, তারপর পাল টাঙাবার ব্যবস্থা করে তামাক সাজতে বসে। ঐকান্তিক সাধনার পর অনুকূল কৃপা-বাতাস বইবেই। কিন্তু সাধন করা চাই খুব রোখ করে। এ-প্রসঙ্গেও ঠাকুরের দুটি উদাহরণ মনে পড়ছে। একটি স্যাকরার সোনা গলানোর, অপরটি চাষির ক্ষেতে জল আনার।

ঠাকুর বলছেন ঃ "কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গালাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, 'তামাক সাজ'। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে। খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

এখন স্যাকরা যদি সোনা গালাবার সময় বার-বার আসন ছেড়ে উঠে যায়, কি গল্প-গুজব করে, সোনা গালাবার জন্য উঠেপড়ে না লাগে তাহলে কি করে তার কার্যসিদ্ধি হবে? ঐ যে এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ সব দিয়ে হাওয়ার ব্যবস্থা, তাতেই সোনা গলে। কঠিন পরিশ্রমের ফলেই হাওয়া হয়। কৃপারূপ হাওয়া। আর সেই হাওয়াতেই সিদ্ধি। তখন আনন্দ।

চাষির গল্পেও ঐ একই কথা বলেছেন ঠাকুর। একবার দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। জলের অভাবে ফসল ফলানোর আশা নেই। চাষিরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। এক চাষির খুব রোখ। স্নান-খাওয়া সব ভুলে সে খানা কেটেই চলেছে। এদিকে স্নান-খাওয়ার সময় পেরিয়ে যায়। চাষির বৌ তখন মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বলল, 'বাবা, তেল মেখে নেয়ে নাও।' চাষি বলল, 'তুই যা, আমার কাজ শেষ হয়নি।' বেলা বেড়ে যাচ্ছে, চাষিও খানা কেটে যাচ্ছে। শেষে চাষির বৌ মাঠে এসে বলল, 'এখনও নাওনি, খাবে কখন? ভাত যে জুড়িয়ে গেল। আজ না হয়, কাল করবে, না হয় খেয়েদেয়ে করবে। তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি।' তখন চাষি বৌকে গালাগালি দিয়ে কোদাল হাতে তাড়া করলে। বললে ঃ 'বৃষ্টি হয়নি, চাষবাস কিছুই হল না। ছেলেপুলে সব যে না খেয়ে মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ মাঠে জল আনব, তবে নাওয়া-খাওয়া করব।' স্ত্রী তো চাষির মূর্তি দেখে ভয়ে পালাল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় সে খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। দেখল কুল কুল করে নদীর জল মাঠে আসছে। সে তখন বৌকে গিয়ে বলল, 'নে এখন তেল দে, আর তামাক সাজ।'

আর একজন চাষি—সেও মাঠে জল আনছিল। তার বৌ যখন ডাকতে গেল, সে কোদাল রেখে বলল, 'তুই যখন বলছিস তখন চল।' সে বাড়ি গেল। তেল মেখে স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোল। তার ক্ষেতে আর জল এল না।

সাধনা করতে করতে নির্ভরতা আসবে এবং সম্পূর্ণ নির্ভরতা এলে তবে পাওয়া যাবে তাঁর কৃপা। এই নির্ভরতালাভের জন্য, আগেই বলেছি, প্রয়োজন অহং-এর সম্পূর্ণ বিনাশ। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, অহঙ্কার এমন বস্তু যে, এই তাকে মনে করছ তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার পরক্ষণে সে জেগে ওঠে, যেন অশ্বত্থ গাছের ফেকড়ি। আবার এই অহংকার না গেলে তিনি কৃপা করলেও তা ধারণ করা যায় না। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর সেকথা বোঝাচ্ছেন—অহঙ্কার যেন একটা ঢিবি। ঢিবিতে জল জমে না, জল পড়লেই গড়িয়ে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপাধারা তো সর্বদাই বর্ষিত হচ্ছে—সেই কৃপাধারাকে গ্রহণ এবং ধারণ করে রাখার জন্যই প্রয়োজন সাধনা। সাধনার দ্বারা তিনি লভ্য নন, তাঁর কৃপার অধিকারী হওয়ার জন্যই সাধনা। গুরুকৃপারূপ মূলধনটি সুদে খাটালে তবেই তিনি সন্তুষ্ট হন, সব সম্পদ উজাড় করে দেন, বুকে তুলে নেন। কিন্তু সে মূলধন কাজে না লাগালে বা অপচয় করলে তিনি আর দেবেন কেন? "ভক্তি-মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবিরে আয়।" গানটি শুনতেই ভাল, কিন্তু দাম না দিয়ে জগতে কোন্ জিনিসটি পাওয়া যায়? আর বিশ্বজগতের সর্বোত্তম বস্তুটি বিনা আয়াসেই লভ্য হবে? সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সাধনা করে কি হবে, তাঁর ইচ্ছা হলে সাধনা হয় তো হবে'—এসব হলো ফাঁকির কথা। কপটতার কথা। এমন নিশ্চেষ্ট অলস ব্যক্তির ওপর

তাঁর কৃপা কখনো বর্ষিত হয় না। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে চাইলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনিই অন্তর্যামীরূপে তখন আর যা-যা করণীয় তা করিয়ে নেবেন। আমাদের দেবার জন্য তিনি অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে বসে আছেন। আমাদের কাছে চাইছেন শুধু ঐকান্তিক আগ্রহ ও ভালবাসা, এবং তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। এটিই সাধন, যার দ্বারা আমাদের আধার শুদ্ধ হবে, তাঁর প্রসাদ গ্রহণ ও ধারণ করার উপযোগী হবে। যদি সাধনার দ্বারা আধার শুদ্ধ না হয়, হৃদয় নির্মল না হয়, তবে তাঁর বিষয় শ্রবণের যোগ্যতাই হবে না, শুনলেও ধারণা হবে না। তাঁর কথা বলবার এবং বোঝবার—দুইপ্রকার লোকই বিরল। কঠ-উপনিষদে (১।২।৭) বলা হয়েছে ঃ

> "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
> শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ ।।
> আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
> শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ।।"

—চিত্ত বিশুদ্ধ না হওয়ার জন্য বহু লোক এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করতেও চায় না এবং শ্রবণ করেও অনেকে সে সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না। এই আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা অতি দুর্লভ। বিশুদ্ধচিত্ত অতি নিপুণ ব্যক্তিই আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা হন, কারণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

সুতরাং এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সাধন আমরা যতই করি না কেন—দান-ধ্যান-জপ-যজ্ঞ—এর কোনটির বিনিময়েই তাঁকে পাওয়া যায় না। এসবই করতে হবে, করে সব ফল তাঁকেই সমর্পণ করতে হবে। তার ফলে অহং বিনষ্ট হবে। তখন চিত্ত স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে তাঁর কৃপালাভের ও ধারণের উপযোগী হবে। কিন্তু তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে, সাধনা করতে করতে তবে তাঁর কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে দেখে মার দয়া হয়; মা লুকিয়েছিলেন, এখন ছেলের অস্থিরতা দেখে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ান।

ঠাকুর বলছেন, তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নেই। বাপের হাত ধরে গেলেও হয়তো ছেলে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে থাকে তাহলে আর পড়বার ভয় থাকে না। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহভঞ্জন করেন আর দেখা দেন তখন সব কষ্টের সমাপ্তি। কৃপা কি সহজে হয়? তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়, 'কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।' কিন্তু কোন্ মুহূর্তে যে তিনি কৃপা করবেন, জীবনের সেই শুভলগ্নটি যে কখন আসবে তা তো আমরা জানি না। তাই শুধু জীবনের সেই ধ্রুবতারাটির দিকে লক্ষ্য রেখে পরম নির্ভরতার সঙ্গে, ব্যাকুলতা সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসাদে বিষণ্ণ হয়ে তাঁকে চাওয়ার, পাওয়ার, তাঁর কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলবে না। অটুট ধৈর্য নিয়ে তাঁরজন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। এ যেন বাসকসজ্জায় জেগে থাকা—কখন বর আসবে। কবে যে প্রতীক্ষা সার্থক হবে জানি না, কিন্তু হবে যে তা নিশ্চিত। একদা বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যিনি কৃষ্ণরূপে জগৎকে অভয় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ।।"
> গীতা, ১৮।৬৫

এযুগে তিনিই আবার রামকৃষ্ণরূপে ঘোষণা করলেন—আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে। হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। হতেই হবে।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের জীবনে সেই শুভলগ্ন আসুক, যখন তাঁকে লাভ করে, তাঁকে সাক্ষাৎকার করে আমাদের জীবন ধন্য হবে।*

* গত ২১. ৪. ১৯৭৯, বাংলাদেশের শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।

ধারাবাহিক নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সুবর্ণযুগে' বিজ্ঞান-চেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য

অরুণকুমার বিশ্বাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঠাকুর আরও বলেছেন, "তাঁকে (ঈশ্বরকে) দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।"[১৮] আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান যেন নিচে অফুরন্ত প্রস্রবণের সঙ্গে যুক্ত পাতকুয়া, আর ঐহিক সায়েন্স বর্ষার জলেভরা পাতকুয়ার মতো, বেশিদিন থাকবার নয়, শুকিয়ে যেতে পারে।[১৯] হাঁড়িতে আলু, বেগুন আপনি নাচে না, লাফায় নিচের আগুনের জন্য। চৈতন্যস্বরূপ না থাকলে ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করে না।[২০] আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সায়েন্সের মতো সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।[২১] তাই এর প্রমাণ ভিন্নতর প্রক্রিয়ার (সাধনা) দ্বারাই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রলালের মারফৎ সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের উদ্দেশে কৌতুকোক্তি করেছেন: "ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা যে ওঁর সায়েন্সে নেই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?"[২২] খবরের কাগজে না লেখা থাকলে প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কি করে মেনে নেওয়া যায়?

অথচ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনীহা বা অশ্রদ্ধা ছিল না তার অনেক প্রমাণ আছে। তিনিই বলেছেন: "বিচার করবার সময় (বেলের) শাঁসকেই সার, এবং খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধ হয়… জীবজগৎকে বাদ দেবে কেমন করে? তাহলে যে ওজনে কম পড়ে। বেলের বিচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।… শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে। ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন।"[২৩]

মহেন্দ্রলালও একই কথা বলেছিলেন: "ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করতে পারি না।"[২৪] তাই প্রথমে মতান্তর হলেও শীঘ্রই মহেন্দ্রলাল ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অনেকটা মতৈক্য এসে যায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ছিল তার সাক্ষ্য 'জল-সরবরাহের কারখানা' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী দিয়েছেন, এবং সেই উক্তি আমরা আগেই উদ্ধৃত করে এসেছি। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং একটি টাকা তাঁর হাতের ওপর রাখতে বলেন, এবং এর ফলে কিভাবে তাঁর হাত বেঁকে যায় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তা ডাক্তার ভগবান রুদ্রকে দেখান।[২৫] ১৫ অক্টোবর ১৮৮৫ দুর্গাসপ্তমীর দিন মহেন্দ্রলাল এবং অপর একজন ডাক্তারবন্ধু সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করেন এবং অভিভূত হন।[২৬] ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রলালকে প্রশ্ন করেন এই বাস্তব সত্যকে (সমাধি, ভাব ইত্যাদি যা মহেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষ করলেন) "তোমার সায়েন্স কি বলে?… যদি ঢঙ মনে কর তাহলে তোমার সায়েন্স-

১৮ কথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০০

১৯ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৪

২০ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৬

২১ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১০২

২২ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪২

২৩ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯, ৩৯১, ৪৭০

২৪ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৮

২৫ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২১

২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৫৮), গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ২০ এবং ২য় ভাগ (১৩৫৮), ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৮১

সায়েন্স সব ছাই পড়েছে।”[২৭] আবার লক্ষ্য করি পরদিনই ২৭ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী যুবক-ভক্ত ছোট নরেন 'তাড়িত-যন্ত্র' এনে তাড়িতের (electricity) প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবহিত করেছিলেন।[২৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে মহেন্দ্রলালের অধ্যাত্মচেতনা কিভাবে জাগরিত হয় তার বর্ণনা আমরা 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' পাই।[২৯] ৩০ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রলাল সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "এখানকার (রামকৃষ্ণ-ভাবধারার) কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে।”[৩০] পরদিনই ৩১ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর মহেন্দ্রলালকে কৃপা করলেন, স্বয়ং ভাবাবিষ্ট হয়ে ভাবাবিষ্ট “ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।”[৩১]

॥ ৬ ॥

মহেন্দ্রলাল যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র স্পর্শে অধ্যাত্মচেতনায় প্রবুদ্ধ হন শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি মহেন্দ্রলালের আন্তরিক সততা এবং আধুনিক বিজ্ঞানে নিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রীত ও মুগ্ধ হন। ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণ তাড়িত-যন্ত্রের প্রদর্শনী দেখেছিলেন এবং বিজ্ঞানসভায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কথামৃতে লিপিবদ্ধ আছে:

“গিরিশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞানসভার কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাকে একদিন সেখানে লয়ে যাবে?

ডাক্তার—তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

—ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কাণ্ড দেখে।

শ্রী—বটে?”[৩২]

২৯ অক্টোবর নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান এবং উচ্চতর অধ্যাত্মবিজ্ঞান—দুই ক্ষেত্রেই সাধকেরা জীবন উৎসর্গ করেন আর ত্যাগ স্বীকার করেন।[৩৩] স্বামী সারদানন্দ বিবেকানন্দের মত সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন:

“পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত আধ্যাত্মিক মীমাংসাসকলের অধিকাংশ নরেন্দ্রনাথের অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইলেও জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মনোবিজ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বসকলের পরীক্ষাস্থলে উহাদিগের সহায়তা সর্বদা গ্রহণ করিতেন।”[৩৪]

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ নভেম্বরের প্রসঙ্গ শ্রীম 'কথামৃত'তে অন্তর্ভুক্ত না করলেও ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। সেই মূল্যবান প্রসঙ্গ উদ্ধার এবং পরিবেশন করেছেন স্বামী প্রভানন্দ।[৩৫] ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন যে, মহেন্দ্রলাল মূলতঃ একজন ভক্ত ও সমন্বয়বাদী। 'কেটেকুটে দেখেছেন সব এক'; শারীরবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের সাধনার মধ্যেও সেই একত্বের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। মহেন্দ্রলাল শ্রীম'কে Indian Association for the Cultivation of Science অথবা বিজ্ঞানসভার প্রদর্শনীর একটি টিকিট দিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'আমায়ও' (অর্থাৎ বিজ্ঞানসভায় যেতে তাঁকেও টিকিট কাটতে হবে)? মহেন্দ্রলাল বলেন, “হাঁ, তোমারও টিকিট।” মাস্টারমহাশয় (শ্রীম) বলেন: “ওঁকে আলাদাভাবে নিয়ে গেলে আপনি দেখিয়ে দেবেন।” মহেন্দ্রলাল সানন্দে সম্মতি জানান।

পাদটীকায় প্রভানন্দ লিখেছেন: “সম্ভবতঃ কোন ছোটখাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। Cultivation of Science-এর রেকর্ড অনুসন্ধান করে নিশ্চিত কিছু জানা গেল না।… কয়েক মাস পূর্বে লর্ড রিপন এসোসিয়েশনের লেকচার হল উদ্বোধন করেছিলেন।” (লর্ড রিপন দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন ১২ মার্চ ১৮৮৪।)

সম্প্রতি আমরা 'টিকিট'-এর রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি। এটি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত lecture-demons-

২৭ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬৩, ১০৭১
২৮ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭৬
২৯ কথামৃত, ১৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখের বর্ণনা; লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৭২-২৮১
৩০ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৮
৩১ ঐ, পৃঃ ১১০৪
৩২ ঐ, পৃঃ ১০৮৪
৩৩ ঐ, পৃঃ ১০৮৬
৩৪ লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৮৯
৩৫ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, উদ্বোধন, ১ম খণ্ড (১৯৮৩), পৃঃ ৮২-৮৪

tration বা বক্তৃতামালার টিকিট। যেদিন মহেন্দ্রলাল টিকিট নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান সেইদিনই অর্থাৎ ৪ নভেম্বর ১৮৮৫ তিনি 'Indo'-তে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন পাঠান যা ১১ নভেম্বর সংখ্যা Indo-তে মুদ্রিত হয় [৩৬] (দ্রঃ চিত্র নং ১)।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ঃ "Admission fee in advance, for all the courses of lectures to be delivered during the session [1885-86] Rs. 6/- ..." বারোটি বক্তৃতা শোনার জন্য এক টাকা আট আনা, একটি বক্তৃতার জন্য চার আনা, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে—যাতে সবকিছু করে দেখানো হবে—অংশগ্রহণ করবার জন্য চার আনা ইত্যাদি। স্বয়ং মহেন্দ্রলাল বক্তৃতা দেবেন ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার 'The Action of Voltaic Electricity on Magnet'-বিষয়ে। ফাদার লাফোঁর বক্তৃতা যথারীতি বৃহস্পতিবার, যেদিন সেন্ট জেভিয়াস' কলেজ বন্ধ থাকত, ১২ নভেম্বর তারিখে।

আমাদের কাছে উক্ত বিজ্ঞাপনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তথ্য এই ঘোষণাটি ঃ ১১ নভেম্বর বুধবার বিকাল চারটার সময় 'Practical Class in Chemistry under Babu Ram Chundra Datta, F. C. S.' (দ্রঃ চিত্র নং ১)। এই সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই জানতেন। তিনি নিজে বিজ্ঞানসভায় যেতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাঁর যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কয়েকজন শিষ্য ২৭ নভেম্বর ১৮৮৫ আলোকসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখতে বিজ্ঞানসভায় যান।[৩৭]

রামচন্দ্র দত্ত যে 'Practical Class in Chemistry' নেবেন তা ৪ নভেম্বর বা তার আগেই স্থিরীকৃত হয়। আমরা ধরে নিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শিষ্য রামচন্দ্রকে এবিষয়ে উৎসাহ এবং সম্মতিদান করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর গুরুর নিদারুণ পীড়ার সময় তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে এই গুরুভার নিতেন না।

'Indo'-তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় রামচন্দ্র আরও অনেকবার বিজ্ঞানসভায় 'Practical Class in Chemistry' নিয়েছিলেন ঃ ২৪ নভেম্বর, ৩, ১০ এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৫, আবার 'কল্পতরু দিবসের' পরে ১৩ ও ২০ জানুয়ারি, ১৩, ২০ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণের পীড়াবৃদ্ধির জন্য কিছুদিন রামচন্দ্র ক্লাস নিতে পারেননি। গুরুর তিরোধানের পর আবার ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে মৃত্যুর এক বৎসর আগে (১৮৯৮) পর্যন্ত রামচন্দ্র বিজ্ঞান-সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'Practical Class' ছাড়া জৈব এবং অজৈব রসায়ন বিষয়ে পূর্ণ বক্তৃতা দিতেন। 'Coochbehar Professorship-এর তহবিল থেকে 'honorarium' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।[৩৮] রামচন্দ্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করবার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। "বোধ হইত যেন তিনি কোন ক্রীড়া করিতেছেন।"[৩৯] রামচন্দ্র বাঙলা ভাষায়ও বিশেষ বক্তৃতা দিতেন, এবং মহিলাদের জন্য আলাদা 'Practical Class' নিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "তোমার সায়েন্স—এটা মিশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়"—সেই রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য তিনি তাঁর প্রথম এবং প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রকে বিজ্ঞানসভার কাজে উৎসর্গ করে-ছিলেন। বিজ্ঞানসভায় রামচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভূ, তাঁর আশীর্বাদ। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রের দুর্গোৎসবের পূজামণ্ডপে এবং বৌবাজার স্ট্রীটের বিজ্ঞানসভায় তাঁর স্থূলে উপস্থিতি ছিল না, ছিল সূক্ষ্ম প্রেরণা। তারই ফলে দেখি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের

৩৬ Indo, November 11, 1885, p. 1062.

৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২। 'Indo'-তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন (Nov. 25, 1885, p. 1113) অনুযায়ী জানা যায় যে ঐ সপ্তাহে মহেন্দ্রলাল, 'Electric current' সম্বন্ধে (24 Nov.) এবং লাফোঁ 'Barometer' সম্বন্ধে (26 Nov.) বক্তৃতা দেন। সুতরাং মনে হয় ২৭ নভেম্বর কোন বক্তৃতা ছিল না এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের সামনে Optics সম্বন্ধে বিশেষ demonstration দেওয়া হয়। ২৯ নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে তার ভক্তরা মহেন্দ্রলালের সঙ্গে আলোক-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

৩৮ A Century : Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta, 1976, pp. 18-19 & 24

৩৯ রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য, যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছি, ২য় সং: (১৩৪৪), পৃঃ ৬

THE INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE.

(210, Bow Bazar Street.)

(SESSION 1885 TO 1886.)

LECTURE by Dr Mahendra Lal Sircar, on *Tuesday, 10th instant*, at 7 P.M.

Subject : The Action of Voltaic Electricity on the Magnet. The current nature of Voltaic Electricity.

PRACTICAL CLASS in Chemistry under Babu Ram Chundra Datta, F. C. S., on *Wednesday*, the 11*th instant*; at 4 P.M.

LECTURE by the Rev. Father Lafont, S. J., C. I. E., on *Thursday* the 12*th instant*, at 7 P.M.

Subject : The Properties of Gases.

Admission Fee, in advance, for all the courses of lectures to be delivered during the session Rs. 6, for 12 consecutive lectures Rs. 1-8 ; for a single lecture annas 4.

The fee for the Practical Class from regular students is *annas* 4 : from casual students *annas* 8.

MAHENDRA LAL SIRCAR, M. D.,
Honorary Secretary

November 4th, 1885.

LORETTO HOUSE, CALCUTTA

WITH THE SANCTION OF

His Grace the Most Rev. Dr. Goethals, S. J.

A RETREAT FOR LADIES living in the world will commence on the evening of 18th. December 1885, and terminate on the morning of 22nd December 1885.

It will be conducted by the
REV. E. LAFONT, S. J.

The exercises will begin each day at 10 o'clock A. M., and terminate at 7 o'clock P. M. Ladies who would wish to remain in the Convent throughout the Retreat can be accommodated during the night, upon an early application.

To defray the expenses of the Retreat, eight rupees from extern ladies and fifteen rupees from those who remain during the night will be thankfully received.

It is expected that all who join the Retreat will conform to the full course of the exercises.

চিত্র নং ১ বিজ্ঞানসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের প্র্যাকটিকাল ক্লাস নেওয়া।
লরেটো হাউসে ও বিজ্ঞানসভায় বিজ্ঞানসাধক ফাদার লাফোঁ।

প্রারম্ভে বিজ্ঞানসভায় শুধু মহেন্দ্রলাল, লাফোঁ, রজনীকান্ত সেন, রামচন্দ্র দত্তই নন, লাফোঁ-শিষ্য, পরবর্তী কালের বিখ্যাত জগদীশচন্দ্র বসু ক্লাস নিচ্ছেন। জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম Physics Practical Class নিচ্ছেন ১৫ জানুয়ারি ১৮৮৬।[৪০] তারপর ১৭ ফেব্রুয়ারিও (চিত্র নং ২) দেখি জগদীশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অন্তরঙ্গতা ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপাত্র হয়ে ১০০ বছরের (১৭৮৪-১৮৮৪) বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের সমীক্ষা করেন। তাঁরই আবিষ্কৃত গরুমহিষানি খনির ওপর ভিত্তি করে টাটার লোহা-ইস্পাত কারখানার সূত্রপাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র

150 THE INDO-EUROPEAN CORRESPONDENCE. [FEBRUARY 17, 1886

THE INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE.

(210, Bow Bazar Street.)

(SESSION 1885 TO 1886.)

LECTURE by Dr. Mahendra Lal Sircar, on *Tuesday*, the *16th instant*, at 7 P.M.
Subject: Thermo-Electricity.

PRACTICAL CLASS in Physics under Babu Jagadish Chundra Bose, B. SC., on *Wednesday*, the *17th instant*, at 3-30 P.M.

LECTURE by the Rev. Father Lafont, S.J., C.I.E., on *Thursday*, the *18th instant*, at 7 P.M.
Subject: Optical Study of Musical Sound.

LECTURE by Dr. Rajani Kanta Sen, on *Friday*, the *19th instant*, at 7 P.M.
Subject: Iron Class of Metals.

PRACTICAL CLASS in Chemistry under Babu Ram Chundra Datta, F.C.S., on *Saturday*, the *20th instant*, at 3 P.M.
Subject: Metals of the 4th Group and their separation.

Admission Fee, in advance, for all the courses of lectures to be delivered during the session, Rs. 6; for 12 consecutive lectures, Re. 1-8; for a single lecture, annas 4.

The fee for the Practical Class from regular students is *annas* 4; from casual students, *annas* 8.

MAHENDRA LAL SIRCAR, M. D.,
February 13th, 1886. *Honorary Secretary.*

চিত্র নং ২ বিজ্ঞানসভায় জগদীশচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রলাল, ফাদার লাফোঁ প্রমুখের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের ক্লাস নেওয়ার সংবাদ

প্রমুখের সঙ্গে রামচন্দ্র 'Practical Class' নিচ্ছেন। ক্রমশঃ বিজ্ঞানসভায় গণিতের বক্তৃতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূতত্ত্বের বক্তৃতায় প্রমথনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন। লাফোঁ-শিষ্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের 'Gilchrist Scholar' প্রমথনাথ বসু হয়েছিল একথা আমরা অবগত আছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞান-আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক যোগের সূচনা শ্রীরামকৃষ্ণের সময় থেকেই।

॥ ৭ ॥

বিজ্ঞানসভার প্রাণপুরুষ ছিলেন দুজন—মহেন্দ্রলাল এবং ফাদার ইউজিন লাফোঁ।[৪১] ফাদার লাফোঁ

৪০ Indo, Jan. 13, 1886, p. 36

৪১ লাফোঁ প্রসঙ্গে দ্রঃ 'Eugene Lafont and Science in St Xavier's College, Calcutta (1860-1908), by Arun Kumar Biswas in Proceedings of National Seminar on 'Calcutta and Indian Science', held in Calcutta on 21-23 December 1989; Science in India, Arun Kumar Biswas, Calcutta, 1969, pp. 49-84; Modern Review 1960, pp. 42-52

সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর (১৮৬৫—১৯০৮) ধরে কলিকাতা শহরে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অজস্র জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবিত থাকাকালীন ফাদার লাফোঁর শেষ বক্তৃতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের ঠিক একমাস আগে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞানসভায় যে বক্তৃতা দেন তার বিষয়বস্তু ছিল: 'The History and Capabilities of Edison's Speaking Phonograph with Numerous Illustrations and Experiments.'[৪২] 'Indo' ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতেও এই অনুষ্ঠানের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩ জুলাই ১৮৮৬ 'The Statesman' পত্রিকায় ফাদার লাফোঁর নিম্নোদ্ধৃত চিঠিটি প্রকাশিত হয়:

The Phonograph

Sir,

It may perhaps interest some of your readers to know that on Thursday evening at 7.30 p. m,, I shall exhibit and work an excellent 'Phonograph' at the lecture hall of the Indian Association, 210, Bow Bazar.

I shall make this wonderful talking machine speak, cough, laugh and sing.

July 13, 1886 E. Lafont, S. J.

ফাদার লাফোঁর উপরোক্ত বক্তৃতাটির কথা উল্লেখ করার একটি বিশেষ কারণ আছে। তা হলো একটি আফশোষ। বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে যে, ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে গবেষণা ফাদার লাফোঁ ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে করছিলেন,[৪৩] এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথা, কাশি, হাসি ও গান' সবই ধরে রাখা যেত। নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে অন্ততঃ তিনজন—স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র ও মহেন্দ্রলাল—যুগপৎ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ফাদার লাফোঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর (ও উচ্চারিত কথামৃত) অনন্ত কালের জন্য ধরে রাখবার কথা তাঁদের মনে জাগরূক হয়নি। পরে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর রেকর্ডেড হলেও হারিয়ে গেছে, এমন-কি শ্রীমার (যিনি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সশরীরে ছিলেন) কণ্ঠস্বরেরও রেকর্ড করা হয়নি, এই দুঃখ ভক্তমণ্ডলী চিরকাল বহন করবে।

বিজ্ঞান-সাধক এবং নিজ শিক্ষক ফাদার লাফোঁর স্মৃতিচারণা করেছিলেন শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ)। তিনি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এফ. এ. পাস করবার পর ডাক্তারি বিদ্যা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মত না পাওয়ায় তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই সময়কার স্মৃতিচারণা করে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন:

"যখন কলেজে পড়তুম তখন Father Lafont-কে দেখতুম যে কলেজের ছুটি হয়ে গেলে তিনি ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেন, নানা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতেন ও মনের আনন্দে কখনো শিস দিতেন, কখনো গুন্ গুন্ করে গান করতেন। তিনি সায়েন্স নিয়ে একরকম পাগল হয়েছিলেন। বহির্জগতে মন থাকতো না। বিকেল হলো, সন্ধ্যা হলো, তবুও তাঁর কোন হুঁশ নেই। তিনি যেন কিসে মেতে রয়েছেন। জগৎ আছে কি নাই বা সময় বলে যে একটা জিনিস আছে সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না। এটা কি একপ্রকার সাধনা নয়?"[৪৪] ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিদ্যার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সারদানন্দ ফাদার লাফোঁর দৃষ্টান্ত

৪২ Indo, July 14, 1886, p. 658

৪৩ Thomas Alva Edison (Rotating Cylinder type) ফনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এবং North American Review-এর জুন ১৮৭৮ সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। ডিসেম্বর ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ফাদার লাফোঁ প্যারিস প্রদর্শনী থেকে একটি ফনোগ্রাফ কিনে আনেন। Disc Type Gramophone আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। শিকাগো থেকে লেখা ২৪.১.১৮৯৪ তারিখের পত্রে স্বামীজী লিখেছেন: "সম্প্রতি এডিসন ফনোগ্রাফের উন্নতিসাধন করিয়াছেন।"

৪৪ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৫৫, পৃঃ ৯-১১ ; এছাড়া দ্রষ্টব্য: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ১৩৭১ পৃঃ ১৫৫-৫৬

উল্লেখ করে বলতেন ঃ "ব্রহ্মকে এত সীমাবদ্ধ কর কেন ? অনেক পথ দিয়া সেই উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারা যায়। Father Lafont যে বিজ্ঞান নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মেতে থাকেন, সেটা কি তাঁহার সাধনা নয় ?"[৪৫] ফাদার লাফোঁ "স্বয়ং সযত্নে সারদানন্দকে বাইবেল পড়াইয়াছিলেন"[৪৬] আর "জীবন্ত সন্ন্যাসী ফাদার লাফোঁর সহিত থাকার জন্যই রোমান ক্যাথলিকদের ভাবটি সারদানন্দের ভিতর ঢুকিয়াছিল।"[৪৭]

ফাদার লাফোঁ তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও বক্তৃতার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব সংযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সতীর্থ ফাদার ই. ও. নেইল (Father E. O. Neill) স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন ঃ

"Many of us will remember how at the close of an interesting lecture, he would in accents of profound veneration, raise the thoughts of an enraptured audience to a feeling of thankfulness to the God of all truth who gives man a glimpse into the secrets of His own universe. ···Truth he often asserted, with that depth of conviction so characteristic of him, cannot be opposed to truth."[৪৮]

বর্তমান লেখক তাঁর অন্যতম শিক্ষক লাফোঁর একনিষ্ঠ সতীর্থ ফাদার এ. ব্রায়োটের কাছে (Father A. Briot) ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে শুনেছিলেন, লাফোঁ প্রায় প্রতি বক্তৃতাই শেষ করতেন জড় এবং জীবজগতকে "God's beautiful positive works" আখ্যা দিয়ে। সর্বোপরি লাফোঁ ছিলেন যীশুগতপ্রাণ। সাক্ষাৎকার হলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিজ্ঞানসাধককে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক যুগ্ম প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতেন।

শুধু বিজ্ঞানসভা নয়, আরও বহু প্রতিষ্ঠানের (যথা Asiatic Society, Bethune Society, Mohammedan Literary Society, Dalhousie Club, Catholic Club, Victoria Institution Loretto Convent ইত্যাদির) মাধ্যমে ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান-চর্চাকে জনপ্রিয় করতে চেষ্টা করেছেন। 'Indo' পত্রিকার পাতায় দেখি (চিত্র নং ১) ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ফাদার লাফোঁ লরেটো হাউসের মহিলাদের বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন।[৪৯] তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা ঠাকুর (পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী)। বর্তমান লেখককে লিখিত ১৫ নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের পত্রে ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী অতীতের স্মৃতিচারণা করেছেন ঃ "ফাদার লাফোঁ মাঝে মাঝে এসে আমাদের মাথায় সরল বিজ্ঞান ঢোকাবার চেষ্টা করতেন।"

॥ ৮ ॥

যুবক নরেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সচেতনতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। তিনি এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তাঁদের মধ্যে পরিচয় ছিল বলে জানা যায় না) একই বৎসরে এফ. এ. (১৮৮২) ও বি. এ. (১৮৮৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থাতেই গণিতবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করেন।[৫০] নরেন্দ্রনাথও ফলিত

৪৫ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬

৪৬ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৪

৪৭ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, পৃঃ ১১

৪৮ Science in India, Arun Kumar Biswas, p. 83. গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতিকথায় বলেছেন, রামকৃষ্ণ-শিষ্য এবং লাফোঁ-সতীর্থ রামচন্দ্র দত্তের রসায়ন সম্পর্কিত বক্তৃতার মধ্যেও "এক হইতে বহু, অনন্ত চৈতন্য প্রতি পরমাণুতে" এই ভাবটি বিকশিত হতো।

৪৯ Indo, Nov. 11, 1885, p. 1062

৫০ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দুইটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল কেমব্রিজের 'Massenger of Mathematics' পত্রিকায় Vol. 10, 1881, p. 122, এবং Vol. 13, 1884, p. 157

গণিত এবং গণিত-জ্যোতিষে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।[৫১]

আমাদের অনুমান, যুবক নরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-সভার কার্যকলাপ এবং মহেন্দ্রলাল ও ফাদার লাফোঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন। লাফোঁ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে বরাবরই ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহকারে বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারো ফিট ব্যাসের পর্দা (screen) ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটা বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Optical Projections as a Means to Teach Science to a Large Audience'। বলা বাহুল্য, বহুল প্রদর্শনী সহকারে বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল। এক দশক পরেই দেখি ২৮ মে, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আলাসিঙ্গাকে লিখছেন :

"Try to get up a fund, buy some magic lanterns, maps, globes etc., and some chemicals. Get every evening a crowd of the poor and low, and lecture to them about religion first and then teach them, through the magic lantern and other things, astronomy, geography etc."

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের দূরবীক্ষণাগার এবং ফাদার পেনারান্ডা ও লাফোঁর জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা ছাত্র নরেন্দ্রনাথের অগোচর ছিল না। 'গডফ্রেজ এস্ট্রনমি' বইটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।[৫২] তাই পরে দেখি বিবেকানন্দ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শিষ্য খেতড়ির মহারাজকে প্রাসাদস্থ টেলিস্কোপ এবং মাইক্রোস্কোপ সংক্রান্ত নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সাহায্য করছেন, মহারাজাকে পদার্থবিদ্যা শেখাচ্ছেন।[৫৩] আগেই বলা হয়েছে যে, ২৭ নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা বৌবাজার স্ট্রীটের বিজ্ঞানসভায় যান (৩৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আলোক-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখতে। নরেন্দ্রনাথও সেই দলের মধ্যে ছিলেন বলে আমাদের অনুমান।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে অগ্রণী হলেও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে যে ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়েছিল তা স্বামী বিবেকানন্দ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ পণ্ডিত শঙ্করলালকে লেখা চিঠিতে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন :

"In all our philosophies we always find hair-splitting arguments, taking for granted some general propositions…Independent thought we have almost none to speak of, and hence the dearth of those sciences which are the results of observation and generalisation."

স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের উক্তিটি (৩৪নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। ভারতে যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মতামত আলোচিত[৫৪] হলেও, তাঁর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-চিন্তা সম্বন্ধে সামগ্রিক পর্যালোচনা এখনও হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীবাহক ও ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-দর্শন এবং প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-চিন্তা সম্মিলিত হোক, এবং এবম্বিধ সংযুক্ত চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ করুক। সেই সম্মিলিত বিজ্ঞান-চেতনা এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি, যদিও তার উন্মেষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত কালেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সুবর্ণযুগে' হয়েছিল। [সমাপ্ত]

৫১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৭৬

৫২ ঐ

৫৩ A Pilgrimage to Khetri and the Sarasvati Valley, Arun Kumar Biswas, Calcutta 1987, p. 33 ; Swami Vivekananda—A forgotten Chapter of His Life, Benishankar Sharma, Calcutta 1982, p.3' ; Khetri Naresh aur Vivekananda (in Hindi), Pandit Jhabarmal Sharma, Calcutta 1984. p. 6

৫৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৮১, পৃঃ ২৪৩-২৬৬

ধারাবাহিক নিবন্ধ

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সংসার

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ (যথাক্রমে মাদাম মেরী লুই ও লিয়ঁ ল্যান্ডসবার্গ) স্বামীজীর পূর্বেই দ্বীপ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। শেষদিন (৬ আগস্ট) পর্যন্ত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন মিস ডাচার, মিস ওয়াল্ডো, মিস এলিস, ডঃ ওয়াইট, স্টেলা, ক্রিস্টিন ও মেরী ফাঙ্কি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন এর পরেও কিছুদিন ওখানে ছিলেন।

রান্নাবান্নার আয়োজন সামান্যই ছিল—দুপুরের খাবার সব সময়েই ছিল নিরামিষ। দুই-একজন ছাড়া সবাই ছিল গৃহকর্মে অনভিজ্ঞ, অথচ সব কাজ নিজেদেরই করতে হতো ; শেষটায় একটি তরুণী পরিচারিকা অবশ্য রাখা হয়েছিল। কোন কোন দিন সকালের ক্লাস শেষ হলেই স্বামীজী বলে বসতেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য রান্না করব !" স্বামী কৃপানন্দ (ল্যান্ডসবার্গ) সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠতেন—"ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন (Heaven save us) !" কারণ তিনি নিউ ইয়র্কে তাঁর সঙ্গে থাকার সময় থেকেই জানতেন, স্বামীজীর রান্না মানেই বহু বাসনকোসন নামানো ও ধোয়ামোছার ব্যাপার। অন্য শিষ্য-শিষ্যারা কিন্তু তাঁর হাতের রান্না খাওয়ার জন্য যে-কোন সংখ্যক তৈজসপত্র ধোয়ামোছাতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বামীজীর রন্ধন সম্পর্কে মেরী ফাঙ্কির খুব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে : "কী ধৈর্যসহকারে তপ্ত স্টোভের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং আমাদের জন্য রকমারি ভারতীয় খাদ্য তৈরি করতেন।...কত কৌতুকই না করতেন। আশ্চর্য রাঁধুনী—খুব সুস্বাদু রান্না, কিন্তু ঝাল-মশলাটা বেশি।...কিন্তু আমি ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে, দমবন্ধ হয়ে গেলেও আমি ঐ খাবারই খাব ; কারণ একজন বিবেকানন্দ যদি আমার জন্য রান্না করতে পারেন, তো আমার ন্যূনতম কর্তব্য হলো, তা গলাধঃকরণ করা !" এমন দিনে স্বামীজীর আনন্দের যেন তুফান বয়ে যেত হাতে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে তিনি মেঝেতে দাঁড়িয়ে রেলের ডাইনিং কারের খানসামাদের অনুকরণে সুর করে চেঁচিয়ে "Last call fo' the dining coh. Dinner served"—তাঁদের খাওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। খাবার টেবিলে বসেও কতরকম হাসিঠাট্টা করতেন—প্রত্যেকের ধরনধারণ নিয়ে তামাসা (বিদ্রূপ কখনো নয়) করতেন। ডঃ ওয়াইট হয়তো একটু দেরি করে ডাইনিং টেবিলে এসেছেন—অমনি স্বামীজী খুব গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, "Here is the Absolute !" অথবা, নিউ ইয়র্ক থিওজফিক্যাল সোসাইটির সম্মুখে ল্যান্ডসবার্গ প্রদত্ত 'শয়তান' শীর্ষক বক্তৃতার অনুকরণে নানান কথা বললেন। অপরের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বা কৌতুককর কোন ঘটনার কথা বলে সবাইকে হাসাতেন, নিজেও বালকের ন্যায় হাসিতে মেতে উঠতেন। আবার হয়তো হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে ভারতীয় ইতিহাস বা পুরাণের কাহিনী বলে শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করতেন। তাঁর কথোপকথন, রসবোধ, চিত্তাকর্ষক গল্পবলা, নিজের ভারতীয় জীবনের স্মৃতিকথা—সমস্ত কিছুই শিক্ষাপ্রদ, উচ্চাদর্শমণ্ডিত ও আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর স্বহস্ত-প্রস্তুত মশলাযুক্ত রান্না এবং তার সঙ্গে এই-সব যুক্ত হয়ে রীতিমত উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করত—পরিবারের মধ্যমণি যেন তিনি। মিস ওয়াল্ডো লিখছেন : "It was a perpetual inspiration to live with a man like Swami Vivekananda. From morning till night it was ever the same, we lived in a constant atmosphere of intense spirituality."

দুপুরের বিশ্রামের পরে বিকালে স্বামীজী

পড়াশুনো করতেন, চিঠিপত্র লিখতেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড ও তাঁর দিদির জন্য Camp Percy থেকে আনা বার্চগাছের ছালে মূল সংস্কৃত ও তাঁর ইংরেজী অনুবাদে দুটি পুঁথি ভরিয়ে ফেলেছিলেন; অন্যান্য লেখাও কিছু লিখেছিলেন। এক রবিবার অপরাহ্ণে তিনি মিস ডাচারের কুটিরে আমন্ত্রিত দ্বীপোদ্যান-বাসীদের সম্মুখে একটি ভাষণও দেন। কখনো কখনো আবার বাড়ির পিছনের জঙ্গলপথে বা নদী-তীরের দিকে বেড়াতেও যেতেন। সচরাচর কেবলমাত্র কৃপানন্দকেই সঙ্গে নিতেন। কদাচিৎ সবাইকে নিয়ে অথবা মাত্র ২।৩জনকে বাছাই করে নিতেন। সকালের ক্লাসের পূর্বেও একদিন তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন এবং হাঁটিতে হাঁটিতে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড স্টুডিওতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই স্টুডিওর বৈশিষ্ট্য ছিল এই কয়টি—'Portrait Photography, Instantaneous Pictures এবং Thousand Island Park View'। শিষ্যদের অনুরোধে এখানে তাঁর দুটি ফটো তোলা হয়—একটি তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি (পশ্চাৎপট—নদীতীর-দৃশ্য), দ্বিতীয়টি তাঁর আবক্ষ মূর্তি। দ্বিতীয় ছবিটির মূল অনুলিপিতে স্টুডিওর নাম দেওয়া আছে—Lamsom and Van Camp, 1000 Island Park, N. Y.।

মিসেস ফাঙ্কি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের একত্র ভ্রমণের আরও স্মরণীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। একদিন নিকটের পল্লীতে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা এক glass-blower-এর দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন স্বামীজী তাঁদের প্রধান সড়ক দিয়ে এগিয়ে যেতে বলে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে দোকানীর কানে কানে যেন কিছু বলেন। ফিরতি পথে তাঁরা লক্ষ্য করেন, স্বামীজীর হাতে দোকানী কয়েকটি প্যাকেট দিচ্ছেন। সেগুলি তিনি আবার তাঁদের হাতে তুলে দেন। বাড়ি ফিরে প্যাকেটগুলি খুলে তাঁরা দেখেন, প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে স্ফটিকের বল এবং তার গায়ে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম এবং তার নিচে "With the love of Vivekananda"। ঐদিন সারা সন্ধ্যায় স্বামীজীর ভাবখানা ছিল এইরকম—বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একখানা করে সুন্দর খেলনা উপহার দিয়ে বাবার যেমন আনন্দ হয় এবং মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে সেই রকম (যদিও তাঁদের অধিকাংশই তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন)।

সবচেয়ে প্রিয় বেড়ানোর পথ ছিল তাঁদের একটি। সেটিতে অন্য পথচারীদের দেখা মিলত না। কুটিরের পিছন দিকে পাহাড়ের নিচ দিয়ে নদীতে যাওয়ার গ্রাম্য পথ। সেই পথে যেতে যেতে তাঁরা মাঝে মাঝে থামতেন—ঘাসের ওপরে বসে পড়ে স্বামীজীকে ঘিরে তাঁর আশ্চর্য কথাবার্তা শুনতেন। একটি পাখি বা ফুল বা ফড়িঙকে উপলক্ষ্য করে হয়তো বেদের বা কোন ভারতীয় কাব্যের তিনি অবতারণা করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ বা তাঁর সঙ্গে তরুতলে উপ-বেশন তাঁদের কাছে ছিল অনবদ্য এক অভিজ্ঞতা। মেরী ফাঙ্কি লিখছেন: "We are taught to see God in everything, from the blade of grass to man—even in the diabolical man." তাঁর শিক্ষার ধরন ও তার মূল প্রেরণা সম্পর্কে বহু তথ্যই আমরা ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় পাই। সিস্টার গার্গী তাঁর গ্রন্থে ওগুলি থেকে অনেক চিত্তাকর্ষক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দেববাণী (Inspired Talks)-এর সঙ্গে সেগুলি এক সুরে বাঁধা। নমুনা হিসেবে ২।১টি দেওয়া যাক, যেমন, "Worship the terrible even as now worship the good. Then get beyond both." "Strength! I preach nothing but strength. That is why I preach the Upanishads."

মেরী ফাঙ্কি আরও জানিয়েছেন, কোন এক অপরাহ্ণে স্বামীজী ত্যাগের মহিমার কথা বলছিলেন এবং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রসঙ্গ তাঁদের কাছে করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁদের ছেড়ে তিনি উঠে যান এবং খানিকবাদে "Song of the Sannyasin" কবিতাটি রচনা করে এনে তাঁদের শোনান। সম্ভবতঃ এটি ২৩ জুলাই অপরাহ্ণের (দীক্ষাদানের পরের দিন) রচনা। কয়েকদিন বাদে ৩০ জুলাই কবিতাটি পাঠিয়ে দেন শিষ্য আলাসিঙ্গার কাছে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় ছাপানোর জন্য। ফাঙ্কির ভাষায়, "It was a most blessed summer. I have never seen our Master quite as he

was then. He was at his best among those who loved him."

সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থানকালে স্বামীজী আর কোথাও গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। হয়তো এক-আধদিন শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে বড়জোর সেন্ট লরেন্স নদীতে নৌকাবিহার করে থাকবেন। দ্বীপগুলির মধ্যে প্রতিদিন নৌকাবিহারের ব্যবস্থা ছিল তখন। অন্যত্র বক্তৃতাদানের দুটি আমন্ত্রণ স্বামীজী পেয়েছিলেন। প্রথমটি (১৩ জুলাই) টরেন্টোতে একটি ধর্ম মহাসভা—সেটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল, আর একটি একটু রহস্যে ঘেরা। দ্বিতীয়টি ওক আইল্যান্ড-বীচে (ওক আইল্যান্ড-বীচ একটি গ্রীষ্মাবাস শহর—নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড-এর ব্যাবিলনের ছোট দ্বীপ ফায়ার আইল্যান্ডে অবস্থিত) একটি ভাষণ। ১৮৯৫-এর ২৮ জুলাই Brooklyn Daily Eagle ও New York Tribune-এ স্বামী বিবেকানন্দের ওখানে বক্তৃতাদানের সংবাদ ছিল। ঐ সংবাদে মনে হয়, স্বামীজী ২৭ জুলাই (শনিবার) অপরাহ্নে ওক আইল্যান্ডে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অথচ, 'Inspired Talks'-এ আমরা পাই, ঐদিন সকালেই তিনি মিস ডাচারের কুটিরে কঠোপনিষদের ওপরে একটি ক্লাস নেন, আবার পরের দিন (রবিবার, ২৮ জুলাই) সকালেও তিনি আর একটি ক্লাস নেন ঐখানেই। সে আমলের দ্রুততম ট্রেনেও Thousand Island Park থেকে Oak Island Beach-এ ঐসময়ের মধ্যে পৌঁছানো এবং ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টারের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা তখনও তাদের জন্মই হয়নি। সুতরাং সম্ভাব্য একটি অনুমানই করা যায়—তা হলো, আহূত স্বামীজী সশরীরে ওক আইল্যান্ড বীচে উপস্থিত না হয়ে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত ভাষণ স্বনামে প্রেরণ করেছিলেন এবং সম্মেলনে অন্য কেউ সেটি পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন (সাংবাদিকরা তফাৎটা ধরতে পারেননি)। সশরীরে ঐকাজ করতে গেলে তাঁকে অন্ততঃ দুটিদিন এবং দুটি রাত্রি মিস ডাচারের কুটিরের বাইরে অতিবাহিত করতে হতো। 'Inspired Talks'-এর ক্লাসগুলো কিন্তু তার বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে।

মিস ওয়াল্ডোর বর্ণনায় পাই—রাত্রিতে খাওয়ার বাসনকোসন মাজা ধোয়া হয়ে যাওয়ার পর (এবং মিস ডাচারের সারাদিনে ধরা মাছিগুলি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার পর) স্বামীজীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় তাঁরা মিলিত হতেন। সম্মুখের ঘন জঙ্গলের গাছগুলির মাথা তখনও বড় হয়নি, তাই তাদের পাতাগুলিকে মনে হতো যেন পদপ্রান্তে সবুজ সমুদ্র; তার ওপর দিয়ে দেখা যেত সেন্ট লরেন্স নদীর সুবিশাল বিস্তার। নদীর মাঝে মাঝে দ্বীপগুলির হোটেল ও বোর্ডিং হাউসগুলির ভেসে আসা আলো। সমস্ত দৃশ্যটাই পটে আঁকা ছবির মতো মনে হতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী তাঁর ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে পাশে রাখা একটি বিরাট চেয়ারে বসতেন। চাঁদের আলো অথবা অগণিত তারার আলো এসে বারান্দায় পড়ছে। স্বামীজী ধীরে ধীরে নানান কথা বলছেন। কখনো তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং অনুভূতির কথা, কখনো তাঁর ভারতীয় কর্মপরিকল্পনার কথা। ঐ স্বল্পালোকে বসে ঐসব কথার নোট নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না; কেবলমাত্র কারো কারো স্মৃতিচারণে এইসব রাত্রির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাই। যেমন, ওয়াল্ডো লিখছেন: 'None of us can ever forget the uplift, the intense spiritual life of those hallowed hours.' কখনো তাঁর আশ্চর্য সুন্দর (wonderously beautiful) কণ্ঠে তিনি সেই স্বল্প পরিসর বারান্দাতে পায়চারি করতে করতে অনর্গল বলে যাচ্ছেন, আর যত রাত গভীর হচ্ছে ততই যেন তাঁর মন উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। এক রাত্রিতে (আগস্টের গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ) স্বামীজীর কথা শুনতে শুনতে তাঁরা সময়ের বোধও হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই 'glorious night'-এ তাঁরা প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত (চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পরেও) জেগেছিলেন। তিনি ঐ রাতগুলিতে স্নেহময় পিতার ন্যায় শিষ্য-শিষ্যাদের নানান শিক্ষা দিতেন। ক্রিস্টিন ছাড়া আর সবাই অবশ্য তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তরুণ গুরু তাঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে ধ্যানেও বসতেন। অল্পসময়ের মধ্যেই স্বামীজী ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। এক এক করে শিষ্যরা নীরবে উঠে পড়তেন; কারণ

তাঁরা বুঝে নিতেন, সেইরাত্রে স্বামীজী আর কথা বলবেন না।

জুলাই-এর শেষ কয়েকটা দিন ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার সঙ্গে বাতাস ও বৃষ্টি। সহস্রদ্বীপোদ্যানের হোটেলগুলিতে গ্রীষ্মাবকাশ-যাপনকারীরা অগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে বসে দিন কাটাতে লাগলেন—বাইরে বেরোবার সাধ্য নেই, নদীতে প্রমোদবিহারের নৌকা একটিও নেই। মিস ডাচারের কুটিরে অগ্নিকুণ্ড (fireplace) ছিল না—খানিকটা ওপরে পাহাড়ের পাদদেশে নিরালায় অবস্থিত বলে শীতের দাপট আরও বেশি ছিল। ২ আগস্ট থেকে অবস্থার উন্নতি হলো—দিনগুলি উষ্ণতর হলো, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণও বর্ষিত হতে লাগল। সুতরাং শেষের কয়েকটি দিন স্বামীজী ও তাঁর ভক্তদের ভালই কেটেছিল। কেবল একটি ব্যতিক্রম—ওর মধ্যেই আর একদিন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমে ঠিক ছিল, স্বামীজী ১ আগস্ট দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবেন—শিকাগো গিয়ে হেল-পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসবেন, যাতে করে মিঃ লেগেটের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সময়ে প্যারিসে রওনা হতে পারেন। পরে শিকাগো যাওয়া স্থগিত হয়ে যায় এবং সরাসরি নিউ ইয়র্ক যাওয়া সাব্যস্ত হলো। ফলে কয়েকটি অতিরিক্ত দিন (৬ আগস্ট বিকাল পর্যন্ত) মিস ডাচারের কুটিরেই অবস্থান করেন। ভক্তদের কাছে ছিল এটি একটি বাড়তি লাভ—এমন-কি ৬ আগস্ট সকালেও তিনি তাঁদের সঙ্গে ক্লাস করেন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার কিছু পরে তিনি অন্যদিনের মতো ঐদিনও খানিকটা হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন; সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র দুজনকে—মেরী ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিনকে (এঁরা দুজন সবাইয়ের শেষে দ্বীপে এসেছিলেন বলেই এই বাড়তি সম্মান কি।) আধ মাইল দূরে ছোট একটা পাহাড়ের ওপরে তাঁরা উঠে যান—চারদিকে গাছপালা এবং নিঃসীম নিস্তব্ধতা; একটা ওক গাছের ডালপালা একটা বড় পাথরের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে, সেখান থেকে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে নদীর ধার পর্যন্ত। স্বামীজী একটি নিচু ডালপালাওয়ালা গাছকে (সম্ভবতঃ ঐ ওক গাছটিই) বেছে নিয়ে তার তলায় তাঁদের নিয়ে বসলেন এবং বললেনঃ "Now we will meditate. We shall be like Buddha under Bo Tree." (আমরা এখন ধ্যান করব। বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধের মতো হয়ে যাব আমরা)। বলার কিছুক্ষণ বাদেই তিনি যেন নিশ্চল ব্রোঞ্জ-মূর্তির মতো হয়ে গেলেন। এদিকে আচমকা শুরু হয়ে গেল বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। স্বামীজী কিন্তু গভীর ধ্যানে মগ্ন। মেরী ফাঙ্কি লিখছেন, "আমি আমার ছাতা খুলে তাঁকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম।" কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য ভক্তরা তাঁদের বর্ষাতি ও ছাতা নিয়ে হৈহৈ করতে করতে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন তাঁদের খোঁজে। এই গোলমালে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হলো; আক্ষেপের সুরে তিনি বলে উঠলেন—"Once more I am in Calcutta in the rains."

ঐদিন সন্ধ্যায় পোনে নয়টায় তিনি মিস ওয়াল্ডোকে সঙ্গে নিয়ে স্টীমারে রওনা হলেন ক্লেইটনের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ওয়াল্ডো যাবেন আল-বানিতে এবং স্বামীজী ট্রেনে করে নিউ ইয়র্কে। কথিত আছে, তিনি নাকি বিদায়কালে বলেছিলেনঃ "I bless these Thousand Islands." ওখানেই কোন একদিন সকালের ক্লাসে তিনি বলেছিলেন—যেখানে ঈশ্বরভক্তরা সমবেত হয়ে তাঁর কথাই আলো-চনা করেন, সেস্থান পবিত্র হয়ে যায়। বিদায়-বাণীতেও তারই প্রতিধ্বনি। স্টীমারঘাটে হাজির ৫।৬ জন ভক্তকে তিনি টুপি তুলে অভিবাদন জানাতে লাগলেন, যতক্ষণ না স্টীমার মাঝনদীতে পেঁছাল। তারপর স্টীমার ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

[সমাপ্ত]

সূর্যের সন্ধান

মঞ্জু নন্দী মজুমদার

ছোট্ট দুটি কোমল হাত
তোমার গলা জড়িয়ে ধরল,
সমাধিমগ্ন ঋষির
সমাধি ভঙ্গ করে,
নামিয়ে আনল তোমাকে
এই পৃথিবীতে।

দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত করে,
হলো তোমার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব।
তারপর কি-না করেছ তুমি।
ঘুণধরা সমাজটার
শিকড় ও শাখা-প্রশাখা ধরে
দিয়েছ টান,
কথার চাবুকে
জড়ের বুকে সঞ্চার করেছ প্রাণ,
শুনিয়েছ মানবতার গান,
দিয়েছ ত্যাগের মন্ত্র।

আবার যে ভাঙ্গন ধরেছে সমাজে।
ভাঙ্গন নয়—পচন,
এবং আপাদমস্তক।
আবার তুমি এস,
আবার জেগে উঠুক নতুন প্রাণ,
আবার জন্ম নিক সেই সব আত্মবিশ্বাসী
মৃত্যুভয়হীন তোমার
আত্মজের দল—
চোখে যাদের স্বপ্ন
মুখে যাদের বজ্রের কাঠিন্য
বুকে যাদের দুর্জয় সাহস।
আর আমরা—
আমরা বুক ভরে শ্বাস নিই,
করি সূর্যের সন্ধান।

ডেকে নাও তোমার কঠিন পথে

পামেলা মুখোপাধ্যায়

বহু যন্ত্রণায় ছিন্ন হয়েছে
আমার প্রাণ,
ছাড়তে চাই নিরাপদ
গৃহকোণের সুখ।

তোমার বিচিত্র সংসারে,
বহু কণ্টকময় পথের
পথিক হতে চাই—
কিন্তু তবু কেন পারি না
এ বাঁধন কাটাতে।
এই নিরাপদের বন্ধনে
দেখি বাঁধা পরে আছে,
মৃত মানুষের দল।
তোমার পথে আছে জানি
বিপুল ঝঞ্ঝার ভীষণ আঘাত,
কিন্তু তারই সাথে আছে
তোমার আপন হাতের ছোঁয়া।

ঝড়ের মাঝে আছে
জীবন্ত জীবনের হোমানল,
একটি জ্বলন্ত জীবনকে
হৃদয়ে পেতে চাই
যার উৎস তোমারই
সূর্যসম সত্তায়।

প্রাণহীন মানুষের ভিতর থেকে
ডেকে নাও তোমার কঠিন পথে,
আপন হৃদয়ের অগ্নি জ্বালিয়ে,
মৃত্যুকে উপেক্ষা করে,
নিয়ে চলো চিরবিপদের মাঝে
তোমার প্রবাহিত সংসারে।

তিনি

অমলকান্তি ঘোষ

সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
আমি ছুটে গিয়ে ভিক্ষা চাই
—'ভিক্ষা দিন, মহাশয়, কিছু ভিক্ষা দিন

'কী আছে দেবার মতো!'—
সৌম্য বিহ্বলতা
ঝলসে ওঠে তাঁর স্বচ্ছ চোখে।

তখন স্পষ্ট করে বলে দিতে হয়—
'মহাশয়,
আপনার অহংকারশূন্যতা থেকে
আমাকে একটুখানি দিয়ে যান!'

যুগান্তরের শবরী

হিমাংশুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমণির চোখের মণি জুড়ায়েছে ঐ কার কোল।
(যেন) পরশমণির পরশ লেগে
মিটেছে মনের গোল।
মাতা যশোদা কি গোপালে লয়েছে,
যশোদা কামার-রমণী!
কোন ধনেতে হয়েছ ধনী,
জেনেছিলে কি তুমি ধনী?
গোপাল কেন জন্ম নিতেই নিজ-অঙ্গে মাখল ছাই
কেন ব্রাহ্মণের বর্ণ ছেড়ে তোমায় বলে—
ভিক্ষা চাই?
ছদ্মবেশে এলেন কৃষ্ণ—ছদ্মবেশে গোপনারী।
কামার-কন্যা! নহ নগণ্যা—
তুমি অনন্যা, যুগান্তরের শবরী॥

সুখ

শোভনা ভৌমিক

সুখ প্রিয়-মিলনে
বিরহে আরো সুখ।
সুখ তাঁরই তরে অশ্রু বরিষণে।
তৃপ্তি তাঁর কথা ভেবে
বিনিদ্র রজনী যাপনে।
তাঁকে পেয়ে সুখ, না পেয়েও সুখ,
তাঁকে পেয়ে হারিয়ে আরো সুখ।
তাঁকে দেখে সুখ, না দেখেও সুখ,
সে-ই সুখ সে-ই দুঃখ,
দুঃখ-ই সুখ।
সুখ আত্মত্যাগে, সুখ আত্মনিবেদনে।
সুখ সেবায়, সুখ পূজায়,
সুখ নয়নের পুতুলের সাগরে মেশায়।

ভাবা

বনবিহারী ভট্টাচার্য

বেভুল বাতাসে
কোন সুদূরের গন্ধ
আসে ভাসি,
আমি কোথা তুমি কোথা
ভাবিতেছি বসি বসি।

মিল চাই।
যেতে চাই তোমা পাশে,
ভাবিতেছি আছ বুঝি আকাশে।

আমি আছি এ-ও বলতে পারি না,
আমি নেই এ-ও বলতে পারি না,
এ-ও একরকম থাকা।

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

আমি বেশ খুশিমনে মহারাজজীর কাছে গিয়ে বললাম ঃ "মহারাজজী, আপনি যে সুরটির নাম বলেছিলেন সেই সুরই গাওয়া হয়েছে।"

মহারাজজী—কাকে জিজ্ঞাসা করলি ?

আমি—নীরদ মহারাজকে।

মহারাজজী—সে আর কিছু বললে ?

আমি—হ্যাঁ।

মহারাজজী—কি বললে ?

আমি—তিনি বললেন, 'কে জিজ্ঞাসা করেছেন ?'

"তুই কি বললি ?"—এই বলে মহারাজজী সাগ্রহে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, "মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছেন।" আমার উত্তর শুনে মহারাজজী খুব বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ "বোকা, বাঁদর, গাধা। তোর বলা উচিৎ ছিল বিজ্ঞানানন্দ স্বামীই জিজ্ঞাসা করেছেন।" মহারাজের কথাই ঠিক। কারণ বিজ্ঞান মহারাজ ঐ সুরের নামটা জানতেন না বলেই মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ভাবলাম, আমি সঠিক উত্তর দিইনি বলে মহারাজজী রাগ করেছেন। কিন্তু তখন জানতাম না যে, মহারাজজী এবং বিজ্ঞানানন্দজীর মধ্যে ছোট ছেলের মতো ভালবাসার খেলা চলত, আর মহারাজ প্রতি পদে তাঁকে হারিয়ে দিয়ে বালক-সুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন। সেকথা না জানায় আমি বলে দিয়েছিলাম, 'মহারাজজী জানতে চেয়েছেন।' বিজ্ঞান মহারাজ জানতে চেয়েছেন বললে বিজ্ঞান মহারাজ যে সেই সুরের নাম জানেন না তা নীরদ মহারাজকে বোঝানো যেত। তাতে মহারাজজীর জিত হতো। 'মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছেন' বলাতে দুই বালকের খেলায় আমি মহারাজকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। বিজ্ঞানানন্দজীকে নিয়ে মহারাজের খেলাটা আমি নষ্ট করে দিয়েছিলাম। সেই রসভঙ্গের জন্য মহারাজজীর ঐ রাগ ও বকুনি।

ভক্ত, আগন্তুক, দর্শনার্থী অল্প বা বহুসংখ্যক—দু-পাঁচজন থেকে শুরু করে চল্লিশ-পঞ্চাশজন—মহারাজজীর কাছে হাজির হলে তিনি তাঁদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসতেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা গল্প-গুজব হাসি-তামাসা প্রভৃতি করতেন। এসব সময়ে সাধারণতঃ ধর্মপ্রসঙ্গ বিশেষ কিছু হতো না। মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক খেতেন। এরূপ আসর বসার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। প্রধানতঃ ভক্তাদি সমাগমের ওপর তা নির্ভর করত। কখনো কখনো ঠিক ঐরকম আসর দিনে দু-তিন বার বসত। ঐসব আসরে ধর্মালোচনাদি বিশেষ না হলেও আনন্দের হাট-বাজার বসত। তাতে হয়তো কেউ উদ্বিগ্ন বা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এসেছে, কোন্ যাদুবলে যেন তাঁর দুশ্চিন্তা ও শোকদুঃখ সব কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত। সে এমন এক পবিত্র আনন্দে বিভোর হয়ে যেত যা সহজে হৃদয় থেকে মুছে যেত না। এমনই ছিল মহারাজজীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। আর তিনি স্বয়ং এত হাস্যরস কৌতুকাদি নিয়ে মেতে থাকলেও প্রায় প্রতি দশ-পনের মিনিট অন্তর তাঁর চোখ দুটি দিয়ে হঠাৎ যেন একটি বিদ্যুতের ঝলক খেলে যেত। তারপরই চোখ দুটি বুজে যেত এবং তাঁর সর্বশরীর একেবারে স্থির নিস্পন্দ হয়ে যেত। তামাক খেতে খেতে ঐরূপ অবস্থা হলে মুখ থেকে গড়গড়ার নল অজ্ঞাতসারে খসেও পড়ত। এরকম অবস্থায় তোলা তাঁর একখানি ফটো আছে। সেটি দেখলে তাঁর তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ধারণা করা যাবে। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ সমাধির কথা আছে। মহারাজজীর ঐ যে অবস্থা সেটি ঠাকুরের ঐ মুহুর্মুহুঃ সমাধির অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মহারাজজী আর দুটি আসরও জমিয়ে রাখতেন। তার মধ্যে একটি বসতো তাঁর নিজের ঘরে। যখন, যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে অতি প্রত্যুষে তাঁর নিজ ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে জপধ্যান ও স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ চলত। প্রয়োজনে তিনি সকলকে সাধন-ভজনাদি বিষয়ে অতি সরল, মূল্যবান ও কার্যকরী উপদেশাদি দিতেন। তখন তিনি যেন আধ্যাত্মিক ভাবের জমাট প্রবাহ বিস্তার করে বসে থাকতেন—যা সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করে তাদের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করত। দুই, সন্ধ্যারতির পর সাধু ও আগন্তুকদের নিয়ে তাঁর ঘরে আর একটি আসর বসাতেন। এটি হতো ভজন-কীর্তনাদির আসর। তখন কি গান হবে তা অনেক সময়ে তিনিই বলে দিতেন। তাঁর উপস্থিতি-মাহাত্ম্যে ঐ আসরটিও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠত; আর উপস্থিত সকলেও এক দিব্য বিমল আনন্দ উপভোগ করতেন।

আমরা তাঁর কাছাকাছি থাকি এটা যেন তিনি চাইতেন। তাঁর সঙ্গে একটু ভাব জমার পর আমি বেশ কিছুদিন যাইনি। পরে যখন যাই, তখন তিনি বললেন: "কিরে, এতদিন আসিসনি কেন? রাগ করেছিলি নাকি?" মহারাজজী ভুবনেশ্বরে থাকতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, সেকথা আগেই বলেছি। তিনি কলকাতা ফেরার পর একদিন ইন্দু ও আমি তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম; তিনি আমাকে দেখিয়ে ইন্দুকে বললেন: "দেখ দেখি, এ কেমন ভুবনেশ্বর ঘুরে এল। আর তুই এত ঘরকুনো কেন?"

একবার তাঁর সঙ্গে ইন্দু ও আমি আঁটপুরে গিয়েছিলাম। ১০-১২ দিন সেখানে কাটিয়ে ফিরেছি। সেবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন মঠে গিয়েছি, সারাদিন তাঁর কাছে ভক্তরা এসেছেন প্রণাম করতে। আমরা স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম ওখানেই। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যার পর মহারাজজীর সঙ্গে বাজি পোড়ানো দেখলাম। তারপর তিনি তাঁর ঘরের সামনে দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমরা তখন বাড়ি ফিরব বলে তাঁকে প্রণাম করছি। আমি প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই তিনি বললেন: "কিরে, এখন যাবি নাকি?" কথার ধরন দেখে তখন তাঁর ভাব সামান্য কিছু আন্দাজ করতে শিখেছিলাম। সেই হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থাতেই বললাম: "কিছু বলছেন কি?" তিনি বললেন: "দাঁড়া এক মিনিট। একটা thought উঠছে। সেটা develop করি।" ইন্দু তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললেন: "সূর্যিকে ডাক।" সূর্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ) এলে তাঁকে বললেন: "এদের দশটা টাকা দে। তোরা মঠের ছেলেরা সব আর এরা সকলে আজ খুব খেটেছিস। এই দশ টাকা দিয়ে কাল ভাল মাছ আনিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেব। (আমাদের বললেন) তোরা কাল প্রসাদ পাবি।"

এই বলে কি মাছ, কত বড়, একেবারে জীবন্ত—নড়বে চড়বে ইত্যাদি নানা কথা জানিয়ে শেষে তিনি বললেন: "তোরা তো আবার বড় বোকা। ঐ রকম ভাল মাছ আনতে পারবি কি?" তখন আমরা আমাদের বন্ধু ফণীর নাম করি। তাতে তিনি বলেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই ঠিক যোগ্য লোক। তাকে ডাক।"

তাকে খুঁজে বার করে আনলে কি রকম মাছ আনতে হবে মহারাজজী তা তাকে বুঝিয়ে বলে দিলেন। তাঁর নির্দেশমত পরদিন সকালে প্রায় মনখানেক মাছ কলকাতা থেকে কিনে এনে তাঁর সামনে রাখলাম। মনোমত মাছ পাওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন।

সেবার দোলপূর্ণিমার দিন ইন্দু, ফণী ও আমি মঠে যাই। মঠে খুব রঙ মেখে গঙ্গায় স্নান করতে নামি, সেসময় তিনজনেরই একসঙ্গে ভীষণ কেঁপে জ্বর আসে। কোন রকমে চারটি প্রসাদ মুখে গুঁজে পোর্ট কমিশনারের স্টীমার ধরে কোন রকমে বড়বাজার ঘাটে এসে যে যার গন্তব্যস্থলে ফিরি। (তখন পোর্ট কমিশনারের স্টীমার বেলুড় মঠে আসত)। তারপর প্রায় মাস খানেক ধরে তিনজনেই ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী থাকি। ইতিমধ্যে খবর পেলাম মহারাজজীর অসুখ—পেটের গোলমাল, কি সব হয়েছে। তারপর দিন কয়েক তাঁর আর কোন খবর পাইনি। পরে

শুনলাম তিনি ভীষণ অসুস্থ— ডায়াবেটিস হয়েছে। অনেকদিন আমাদের না দেখে ঐ ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থেকেও তিনি একদিন নির্বেদানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন : "সে ছোঁড়াগুলো আসছে না কেন ? এসময় এলে খসখসগুলোয় জল দিতে পারত।" দারুণ অসুখে ভোগার সময়েও তিনি কিন্তু আমাদের ভোলেননি।

প্রথম দু-এক বছর যখন মঠে যাই, তখন মহারাজজীর সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়েছে। তাঁকে প্রণাম করেছি মাত্র, কথাবার্তা তখন বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমার বরাবরই ধারণা ছিল তিনি আমায় চেনেন না, কারণ আমার এমন কিছু বিশেষ গুণ সত্যিই ছিল না যাতে আমি তাঁর নজরে পড়তে পারি। ঐ সময় একদিন—ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস হবে—আন্দাজ বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার সময় হাতিবাগানের কাছ থেকে হেঁটে বৌবাজারের দিকে আসছি। মোটামুটি রাস্তা ফাঁকা। আট-দশ হাত অন্তর দু-চারজন লোক যাতায়াত করছে আর পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর দু-একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বা ট্রাম যাচ্ছে। ঐ সময়ে কলকাতায় যান-বাহনের অবস্থা ঐ রকমই ছিল। চলতে চলতে আমি যখন ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছি, তখন বিপরীত (বৌবাজার) দিক থেকে রাস্তার মাঝ দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি আসতে দেখলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো—'এই গাড়িতে যদি মহারাজ থাকতেন।' গাড়িটি আমার কাছাকাছি আসতে আর বাঁদিকে চাইবামাত্র দেখি মহারাজজী মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। আমি তখন সেই গাড়ির দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু তিনি আমায় হাত নেড়ে বারণ করলেন। কিন্তু আমার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ছেলেকেও তিনি কৃপা করে মনে রেখেছেন এই ঘটনায় তা বুঝলাম। মন-প্রাণ বিপুল আনন্দে ভরে উঠল, বুকটা যেন গর্বে দশহাত ফুলে উঠল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

আন্দাজ ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল। মহারাজকে দর্শন করার জন্য বিদ্যার্থী ভবন থেকে ইন্দু ও আমি বৈকালে বলরাম মন্দিরে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে মহারাজ আমাদের বললেন : "ওরে, কিছু কপি মঠে দিয়ে আসতে পারিস ?" আমরা সানন্দে সম্মত হলাম। নৌকা ও মুটে ভাড়ার জন্য কিছু পয়সাও আমাদের দিলেন। তারপর ফুলকপিতে ভরা একটি বড় ঝুড়ি দেখিয়ে বললেন—"যা, এটা নিয়ে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে দিয়ে বলবি, 'মহারাজ এই সামান্য কটা কপি পাঠালেন। তাঁর ইচ্ছে যে নৌকা-ভরতি কপি পাঠান। কিন্তু তা আর হলো কৈ ? তবে আপনারা সাধু মানুষ, বিন্দুতে সিন্ধুজ্ঞান করেন—এই যা ভরসা। তাই তিনি সাহস করে এই সামান্য ক-টা কপি পাঠিয়েছেন ?' এই কথাগুলোই বলবি কিন্তু।" মহাপুরুষজীকে কপি-গুলো দিয়ে ঐকথা বলাতেই তিনি খুব হাসতে লাগলেন এবং মহারাজের কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করলেন। আর আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে যেতে বললেন। মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের কী মধুর সম্বন্ধই না ছিল। [ক্রমশঃ]



সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

ছেলেবেলায় শিবপুজো করতুম; রোজ শিব গড়তুম; ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পুজো করতুম, সাজাতুম, স্তবপাঠ করতুম—এই সব। গঙ্গাস্নান করবার সময় প্রাণায়ামের কুম্ভক করতুম, জলের ভিতর একটা ইট কি পাথর ধরে ডুবে থাকতুম।…তারপর ঠাকুরের দেখা—তিনি বলে দিলেন, 'অত সব করতে হবে না, ও-সব এ-কালের নয়। ভক্তি বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল।' ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরানগর মঠে সবারই তীব্র বৈরাগ্য, ঠাকুরের দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে, তারপর শ্মশানে সারারাত জপ-ধ্যান। চিচিকুচি—ভোরের পাখির জেগে ওঠা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মঠে ফিরে আসা। কোনদিন বা মঠেই সব চেয়ারে-মাদুরে বসে ঠাকুরের প্রসঙ্গ হতে হতে ধ্যান। যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ধ্যানে লেগে গেল।

হৃষীকেশে ছত্রের ঘণ্টি বাজত, উঠতে ইচ্ছা হতো না। অনেক পরে মাঈ-র কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াতাম। 'বাচ্চা, এতনা দেরি কাহে—ঘণ্টা নেহি শুনা?' 'মাঈ, ধেয়ান লাগায়া। নেহি উঠা।' 'অর ত কুছ নেহি। জাড়া সবুর কর্ বেটা, পাকায় কে ভেজ দেউঙ্গী।' এইরকম দিয়ে যেত। শেষে আমার জন্যে দুখানা রুটি রেখে দিত।

ছেলেবেলায় শিবলিঙ্গ গড়ে পুজো করেছি, পরে হিমালয়ে জীবন্ত শিব দর্শন করেছি—ঠাকুরই সবার ভিতর চলছেন-ফিরছেন—নারায়ণ। ঠাকুরের ভিতরই এই সেবাধর্মের বীজ—তাই এখনই চারিদিকে পল্লবিত। দেওঘরে মথুরবাবুকে বললেন, 'এদের খেতে দাও, পরতে দাও, একমাথা তেল দাও—নইলে তোমার কাশী যাওয়া। এখান থেকে আমি উঠব না।' তাই তো এই সেবাধর্মের যুগচক্র ঘুরল। তাই তো সবসময় বলি—কাজ কর, কাজ কর। Something positive, যার ফল হাতে-নাতে দেখা যায়। কি জপ-ধ্যান করবে? কত ধ্যান-জপ করবে? সে তো আমরা জানি।

স্বামীজী ও আমি—দুজনে চলেছি পাহাড়ে। এক জায়গায় দেখি একজন সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর বেশ সজোরে নাক ডাকছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন—ওরে, বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে! কম নয় তো, দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে—তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।

এসব দেখে-শুনেই তিনি বলতেন, "সত্ত্বের ধুয়া ধরে দেশ তমঃ সমুদ্রে ডুবতে বসেছে।" আর বলতেন, 'এর থেকে বাঁচতে হলে চাই—আপাদ-মস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী তীব্র রজোগুণ।' তাই তো কর্মের ওপর এত জোর। যা হবার হোক, কর্ম করে যাও, তবু কিছু নিশ্চয় হবে। সাহস নেই, শক্তি নেই, বিশ্বাস নেই—সর্বদা ভয়, যদি না পারি। এজন্যই তো পিছিয়ে যাও। আসুক না বিফলতা, বলুক না লোকে মন্দ, তুমি প্রভুর নামে কাজ করে যাও, সাহস বিশ্বাস আর নির্ভরতা নিয়ে।

হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে চলেছি। একটা চূড়া পেরিয়ে এসে দেখি—আর এক চূড়া দৃষ্টিপথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু বিশ্রাম করেই মনে হতো কতক্ষণে ওর পারে যাব। আবার চেষ্টা—আবার চলা। সত্যি বলছি, তোমাদের অধিকাংশই কর্মে অধিকারী—কর্ম কর, কর্ম কর, যতক্ষণ না ক্লান্ত হও। তবে ঐ—ভগবানের কাজ করছি, ঠাকুরের কাজ করছি—এ-ভাবটি সদাসর্বদা রাখা চাই। নইলে মুশকিল।

উদ্বোধনের সত্যেন (স্বামী আত্মবোধানন্দ) তখন অদ্বৈত আশ্রমের বই বিক্রি করত কলেজ স্ট্রীটে! বেলা দশটায় খেয়ে যেত দুটি ভাতে-ভাত—আর সারাদিন দোকানে থাকত। মনে ভারী কষ্ট—'একি করছি?' একদিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এইসা লেকচার দিলুম যে, এখনও বলে—'মহারাজ, সেই যা inspiration (উৎসাহ) পেয়েছি, তার জোরে এখনও চলছি।' বলেছিলাম—'একি তুমি সোজা কাজ করছ? এর ভিতর কত ত্যাগ, কত তপস্যা, কত সেবা রয়েছে। এই তো ঠিক সাধন। সকালে যা-হোক দুটি খেয়ে আসো, আর সবাই কত কি খায়!—এই তো ত্যাগ। তারপর একটি ছোট্ট ঘর—সারাটা দিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা [illegible] থাকতে পারা—এই তো তপস্যা। তারপর এইসব বই থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার হচ্ছে কত লোকের ভিতর— তামার হাত দিয়েই তো তা যাচ্ছে। একি কম ঠাকুরের সেবা? ঠাকুর ঘরের কাজেই কি ঠাকুরের সেবা?'

তোমাদের বলছি এভাবটি নিয়ে এসো—'যা করি তা-ই সাধন। যা সাধন বলে মনে করতে পারব না, তা করব না। খাচ্ছি—তাঁকে আহুতি দিচ্ছি, বেড়াচ্ছি কি নগর পরিভ্রমণ করছি—তাঁকে প্রদক্ষিণ করছি; এমন-কি শুয়েছি—ঘুমোচ্ছি তা-ও যেন তাঁকে প্রণাম করছি—তাঁর ধ্যান করছি।' সর্বদা তাঁর ভাবে ভরা। একটি গানে এই ভাবটি আছে:

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান;
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে।"

[সন্ধ্যায় রকে ক্যাম্প-খাটে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ উপবিষ্ট। উপস্থিত দু-একজন। বাবা বলিতেছেন:]

বেশি ঘুমোবে না। যোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা, ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা। সেদিন 'উদ্বোধনে' মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কথা মনে পড়ে ভারী আনন্দ হলো—তিনি বলছেন, '৪ ঘণ্টার বেশি ঘুম রোগ-বিশেষ—তার চিকিৎসা দরকার। তোমরা বলো, না ঘুমোলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক উল্টোটি—ঘুমোলেই দুর্বল হয়ে পড়ে; বিশেষতঃ দিনের বেলা। দুপুরে একটু বিশ্রাম—তার সঙ্গে পড়াশোনা।' ঠাকুরকে জানাও—'আমার সকল ভোগ-বাসনা দূর করে দাও।' ঘুম তো একটা ভোগ, সে ভোগও ছাড়তে হবে, যদি ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে চাও। যে ঠিক ঠিক ভগবানকে লাভ করতে চায়, সে ঘুমোবে কি করে? তার যে অহরহ এক চিন্তা বুকের মাঝে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে—'কই ঈশ্বর-লাভ তো হলো না, কই তাঁর দেখা তো পেলাম না আজও, কই এখনও তো তাঁর জন্যে কাঁদতে পারলাম না।'

ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাতেন—তাঁর সেই খাটের ওপর ছোট ছেলেটির মতো পা ছড়িয়ে বসে বলতেন, 'মা, দেখা দে, দেখা দে, মা। তোকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। ছোট ছেলেকে ফেলে কি করে তুই ভুলে আছিস, মা। মা, আয় মা, কোলে তুলে নে মা।' এইরকম ব্যাকুল হয়ে বলছেন আর কাঁদছেন, সত্যিই কাঁদছেন। সেই ভাবটা আমাদের দেখাতে দেখাতে সেই ভাবে তিনি ভরে গেছেন—ছোট ছেলের মতো মাকে দেখবার জন্য কাঁদছেন হাত-পা ছুঁড়ে। পরে স্থির, আবার সজল নয়নে কম্পিত কণ্ঠে বলছেন, 'মা, আমি সাধনহীন, আমি ভজনহীন। মা আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। মা আমায় তোর পায়ে অচলা মতি দে।'

[ক্রমশঃ]



সন্ন্যাসিনীর কাহিনী*

সরলাবালা সরকার

এ কাহিনী তাঁরই নিজের মুখে শোনা, তিনি যেমনভাবে বলে গিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই শোনাচ্ছি আমি তোমাদের। অবশ্য, এটুকু মাত্রই তাঁর কাহিনী নয়, আরও অনেক আছে।

বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান নবদ্বীপ সন্ন্যাস নিলে। সন্ন্যাস নিলে—অর্থাৎ বৈষ্ণব-সন্ন্যাস, 'ভেক' নিয়ে বৈরাগী হয়ে গেল।

নবদ্বীপের মাকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানতাম। তাঁর বাপের বাড়ি কালনায়, আমারও তাই। বিধবা মায়ের কোলে আমি মানুষ হয়েছি। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। বাড়িতে আছেন 'শ্যামসুন্দর-রাধারাণী'। আমাদের বাড়ির রান্না-বান্না, ঘর-সংসারের যা-কিছু কাজ, সবই শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য। মা বলতেন, "শ্যামসুন্দর জাগ্রত ঠাকুর।"···

তারপর বহুদিন চলে গিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, যোগ-দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছি। এখন সাদা কাপড় পরি না, পরি গেরুয়া দিয়ে রাঙানো কাপড়।

কিন্তু গেরুয়া পরলে কি মনটাও বদলে যায়? নবদ্বীপের মা আর তার বৌকে দেখে চোখের জল থামাতে পারলুম না কেন তবে?

কত কষ্ট করে বিধবা মা ঐ ছেলেকে মানুষ করেছেন, আর মানুষের মতই হয়েছে ছেলে। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, তিনটে পাস করেছে যে ছেলে, সেই কিনা ভেক নিয়ে বৈরাগীর দলে গিয়ে ভিড়ল? বৈষ্ণবধর্মেই যদি তার মতি হয়েছিল, বেশ তো, ঘরে বসেই ধর্মচর্চা করতে পারত। ঘর ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, তেরো বছর বয়সের বালিকা-স্ত্রীকে অনাথা করে এমনভাবে সে কেন নিরুদ্দেশ হলো? নবদ্বীপেও তো থাকতে পারত নবদ্বীপ, কিন্তু একেবারেই উধাও হয়ে গেল।

নবদ্বীপের মা খুব অল্প বয়সেই ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন, ছেলে এগারো বছরের, বৌটি তখন সাত বছরের।

আমি ওদের বাড়ির সব খবরই জানতাম, কেননা তখন আমি নবদ্বীপেই ছিলাম, বৃন্দাবন দাস বাবাজী এক নূতন আশ্রম করেছিলেন। তাঁরই আমন্ত্রণে আশ্রম দেখতে এসেছিলাম নবদ্বীপে, আর থেকেও গিয়েছিলাম কিছুদিন।

সে এক অপরূপ, ছোট ছোট ছেলেরাই সে-আশ্রমের বাসিন্দা, তিন-চার মাস বয়স থেকে তিন-চার বছর বয়সের সব ছেলে; আশ্রম ছেলেতে ছেলেতে ভর্তি, মেয়ে একটাও ছিল না।

বৃন্দাবনের শিষ্যও জুটেছিল অনেক। গুরুকে তারা ভগবানের মতো ভক্তি করত, শিষ্যেরাই সেই শিশুপালনের ভার নিয়েছিল, কেননা, গুরু বলেছেন, 'বহু ভাগ্যেই তোমরা এই গোপাল-সেবার অধিকারী হয়েছ। এরা সব পাথরের মূর্তি নয়, জীবন্ত বালগোপাল'।

বৃন্দাবন আমাকে মা বলত। হৃষীকেশে প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয়, গঙ্গায় স্নান করে উঠেছি ভিজে কাপড়ে, বৃন্দাবন এসে একখানা গেরুয়া কাপড় নিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে—কাপড়টা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'মা, কাপড়টা ছেড়ে ফেলে ভিজে কাপড়টা আমার হাতে দাও, আমি নিঙড়ে শুকুতে দেব ঐ বেড়ার উপর।'

এমনভাবে বললে, যেন সে আমার নিজেরই সন্তান। যেন এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

* পূর্ব-প্রকাশিত 'সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী' রচনায় যেসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে বর্তমান রচনায় সেগুলির পুনরাবৃত্তি যেখানে হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইসব অংশ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে, কোথাও বা সামান্য অংশ রাখা হয়েছে ধারাবাহিকতার স্বার্থে।— যুগ্ম সম্পাদক

অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি, আর আরও আশ্চর্য তার হাসি, আর মুখের ভাব—যেন একটা জ্যোতি এসে তার সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে।

সন্ন্যাস-জীবনে অনেক ছেলের সঙ্গ পেয়েছি, অনেক ছেলের মুখে মা শুনেছি, সেবিষয়ে আমার ভাগ্যের সীমা নেই—কিন্তু মনে হলো এখন, এমন প্রাণভরা 'মা' ডাক আগে কখনো শুনিনি।

প্রসাদ পেয়ে যখন ধর্মশালায় বিশ্রাম করছি, বৃন্দাবন এল আমার পা টিপতে; সহজভাবেই বললে, 'মা অনেক পথ হেঁটেছ কাল, তোমার পা-দুটো একটু দাবিয়ে দিই, আরাম পাবে।'

বৃন্দাবন আমার পায়ে হাত দিয়ে পা টিপবে? মনে এক মুহূর্তের জন্য সঙ্কোচ এসেছিল। ও যে সামান্য নয়, যোগভ্রষ্ট কোন মহাসাধু, ওর মুখের দিকে চেয়েই সে-কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার সে-সঙ্কোচ তখনই চলে গেল, মনে হলো, 'ছেলে যদি মায়ের পদসেবা করে তাতে সঙ্কোচের কি আছে? ও যদি মহাসাধু হয়, তাতেই বা কি? ওদের পক্ষে পা-ও যা, মাথাও তাই। আমার ভাগ্য যে ওর হাতের স্পর্শ পাব।

আর কি আশ্চর্য সেই স্পর্শ। সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুতের মতো কিসের প্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে আমাকে এক অপূর্ব অনুভূতিতে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। সে-অনুভূতির কোন বর্ণনা সম্ভব নয়।

সেই বৃন্দাবন এখন নবদ্বীপে এসে এই আশ্রম খুলেছে। সমস্ত নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজের যাঁরা মাথা, সেই গোস্বামী প্রভুরা ধিক্কার দিয়েছিলেন বৃন্দাবনকে। 'ছি ছি, এ কি ব্যাপার!—কতকগুলি বিধবা মেয়ে আর কুমারী মেয়ে—তাদের নিয়ে এ কি কেলেঙ্কারী! এমন গর্ভবতী অনেকেই হয়ে থাকে, তার উপায়ও আছে, ওষুধ আছে, জড়িবুটি শিকড়ও আছে, এইসব পাপের ভ্রূণ আবার এভাবে বাঁচিয়ে তুলে সমাজের আবর্জনা বাড়ানো কি সমাজের অকল্যাণ নয়? নবদ্বীপের মতো মহাতীর্থে এসব কোনমতেই সহ্য করা হবে না।'

কিন্তু সহ্য করতে হয়েছিল তাঁদের। নবদ্বীপের একপ্রান্তেই স্থাপিত হয়েছিল সেই আশ্রম।

মাড়োয়ারীরা মুক্তহস্তে টাকা দিয়েছিল, আর অনেক ধনীও বেনামে টাকা পাঠিয়েছিলেন। অনেক রাজা-মহারাজারাও ছিলেন বৃন্দাবনের শিষ্য। তাঁরাও অযাচিতভাবে টাকা দিয়েছিলেন। নবদ্বীপে বৃন্দাবনের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীরও রটনা হয়েছিল। সে দুই হাতে মুষ্টিভর্তি ধূলি নিয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলে ছড়িয়ে দিতে দিতে পথে যখন চলে, তখন যার গায়ে ধুলো লাগে সেই নাকি কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। কুকুর-বিড়ালরাও নাকি তার সংস্পর্শে এলে পশু-স্বভাব ভুলে যায়, ইত্যাদি।

নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবনের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রথমে ছিল বৃন্দাবন তার বন্ধু, শেষে হয়ে দাঁড়াল দীক্ষাদাতা গুরু, আর তারই কাছে দীক্ষা নিয়ে নবদ্বীপ সংসার ত্যাগ করল।

নবদ্বীপের মা তার এক বাল্যসখীর পাঁচ বছরের মাতৃহীনা মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছিল, সেই মরণকালে মেয়েটিকে তুলে দিয়েছিল সইয়ের হাতে।

নবদ্বীপের সঙ্গে কুটি-কুটি ঝগড়া আর মারামারি হতো সেই দুরন্ত মেয়ের। মেয়ের নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। ঝগড়া আর মারামারি মায়ের দখল নিয়ে।

কামড়, আঁচড়—এইসব অস্ত্র ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার, এখনও নবদ্বীপের গায়ে তার চিহ্ন আছে হয়তো।

দুজনের ভাবও ছিল সেইরকম। নবদ্বীপ বিষ্ণুপ্রিয়ার খেলার ঘর পেতে দিত নিপুণ হাতে, দোলনা টাঙিয়ে দিত তার দোলবার জন্য।

সাত বছরেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরের বৌ করে নিলে নবদ্বীপের মা। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে, ঘরে নতুন বৌ এসেই সতীন-ঝিকে তলব করেছে, তার হাত-নুড়কি চাই তো একটা, নইলে সংসারের কাজ চলে কি করে? বাধ্য হয়েই নবদ্বীপের মাকে নবদ্বীপের বিয়ে দিতে হয়েছিল অত ছোট বয়সে।

তখনও তাদের খেলাধুলাই চলছিল, ছুটোছুটি-মারামারিও চলছিল। পানে চুন দিয়ে বৌ ছুটে যেত দোলনায় চড়তে, বাতাসে পানের চুন শুকিয়ে যেত, দেখে নবদ্বীপের মা হেসেই অস্থির। 'দেখেছো

ভাই, বৌয়ের কাণ্ড ?' বলে কাছে যে থাকত তাকে সাক্ষী মানত। যেন এমনটি আর কারও বৌ করতে পারে না।

এইভাবে তাদের সুখের সংসার চলছিল, সেই সংসারে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হলো। মা-মরা মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছিল নবদ্বীপের মা, বৌ করেছিল তাকে, সেই বৌ এখন শেল হয়ে তার বুকে বিঁধে রইল। এখন এ বৌ নিয়ে কি করবে সে ?

নবদ্বীপের মা দুর্ভাগিনীকে বুক থেকে নামাতে পারেন না। আবার বুকে রাখতে গেলে বুক যেন পুড়ে যায়। বৌ তো নয়, এ যে জ্বলন্ত আগুন।

"হায় রে, তোর মা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম রাখলেন কেন মা তোর ? আর কি নাম ছিল না দেশে। এখন নিমাই যে গেল সন্ন্যাসী হয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে অকুল পাথারে ভাসিয়ে ? কি করলি রে নবদ্বীপ ? কি করলি তুই ? এমন করে মা-মরা মেয়েটাকে জলে ভাসালি ? আমার আদরিণী, কেনই বা আমি হতভাগিনী মায়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলাম তোর, আমার ভাগ্যেই তোরও কপাল পুড়ে গেল।"

আমি নবদ্বীপের মায়ের কাছে বসে এইসব আক্ষেপ শুনেছি, আর ভেবেছি বৃন্দাবনের প্রাণের কথা, কি পাষাণ তার প্রাণ। এদিকে তো এত দরদী, আর অন্যদিকে কি করে সে এত কঠিন হয় ?

আমার সন্ন্যাস-জীবনে এমন বহু বিচিত্র জীবনের সংস্পর্শে এসেছি, ভাল-মন্দ, সচ্চরিত্র-দুশ্চরিত্র কত ধরনের মানুষ। এইটুকু বুঝেছি যে, 'আছে, আছে, আছে, সবারি সবারি মাঝে।'

মনে পড়ছে, প্রথম যে-রাত্রে বাড়ি ছেড়ে যাই। যোগদীক্ষা নেবার পর খাঁচার পাখির মতো হয়েছিল মনের অবস্থা, দিন-রাত্রি যেন পালাই-পালাই। কালনায় থাকতে মাকে বলতাম 'মা, রাত্রে ঘরে তালা-চাবি দিয়ে রেখো, কি জানি যদি দুয়ার খুলে পালিয়ে যাই।'

মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, বলতেন, 'ছি মা, পাগলামি কোরো না অমন করে।'

কিন্তু পালাতেই হলো আমাকে শেষ পর্যন্ত, আর কেন যে পালাতে হলো সে-কাহিনী কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি ছত্র বারবার মনে পড়ে, 'শ্যামের মধুর মুরলী-ধ্বনি যে জন শুনেছে গো,/ ওরে সেও কি রহিতে পারে ঘরে ?/ কুলশীল না ত্যজিলে, আমার শ্যামধনে কি অমনি মেলে ?'

'বৃন্দাবনে যাব' এইটুকুই কেবল মনে হতো, কিন্তু যাব কোন্ পথে, কেমন করে—সেসব কথা আমার একবারও মনে হয়নি।

স্বপ্নের ঘোরেই যেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ... বৃন্দাবন যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু বৃন্দাবন যাওয়া সহজে ঘটেনি, বহু স্টেশনে আটক থাকতে হয়েছে মাঝে মাঝে, কেউ-বা দয়া করে টিকিট দিয়েছে একখানা, তাতে কিছুদূর এগিয়েছি, কেউ-বা এক ঘটি শরবত দিয়েছে—যখন দারুণ পিপাসায় ধুঁকছি।

এত কষ্টের পর হাতরাস স্টেশন, আর তারপরে সেই ব্রজভূমি, যেখানে বালগোপালের পায়ের চিহ্ন আছে পথের ধুলোয়।

বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের মন্দির। যেদিন প্রথম গোবিন্দ-দর্শন, আমার মাথার চুল এলিয়ে পড়েছে, মাথায় কাপড় নেই। সংজ্ঞাহারার মতো শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ দর্শন করছি, কে বলবে যে পাথরের মূর্তি ? কে বলবে যে সজীব নয় ? ঐ যে বাঁকা হাসি, মূর্তি কি হাসতে পারে ? অমন বাঁকা চাউনিতে চাইতে পারে ?

> 'অংশাবলম্বিত-বামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
> কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং।'

পড়ে যাচ্ছি এই শ্লোক।
মনের আনন্দে পড়ে যাচ্ছি,

> 'নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।
> সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ॥'

(সাধকমালা)*

[ক্রমশঃ]

*সরলাবালা রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৮৮৯, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৯

নিবন্ধ

আলাসিঙ্গা পেরুমল

এম. জি. শ্রীনিবাসন*

ভাষান্তর: নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাধারণভাবে 'আলাসিঙ্গা' নামে পরিচিত, এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল দাক্ষিণাত্যে ভারতীয় রেনেসাঁসের পথিকৃৎ হিসাবে সকলের কাছে ব্যাপকভাবে হয়তো আজ আর বিদিত নন; কিন্তু যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে দক্ষিণ-ভারতে তাঁর প্রব্রজ্যাকালের এবং সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সূচনার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা আলাসিঙ্গা পেরুমলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে সচেতন না হয়ে পারেন না। নথিভুক্ত জীবনকাহিনীর উপাদানের অভাবের দরুন এই মহান ও পবিত্র ব্যক্তিটি সম্পর্কে খুব সামান্য জানা গেলেও নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ও প্রধান ভক্তঅনুগামীদের অন্যতম।

সাধারণ অথচ শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার সন্তান আলাসিঙ্গা ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মহীশূরে রাজ্যের চিকামাগালুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা, মহীশূরের মাণ্ড্যগ্রামের আদিবাসিন্দা, নরসিংহাচারিয়ার এখানে এসেছিলেন পৌর অফিসের কেরানি হয়ে। পরে তিনি মাদ্রাজে কাজ পান এবং সেখানেই আলাসিঙ্গা শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজে পড়াশুনা করেন। আলাসিঙ্গা ছিলেন তৎকালীন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ডঃ উইলিয়ম মিলারের সর্বোত্তম ও প্রিয়তম ছাত্রদের অন্যতম। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর তিনি কিছুকালের জন্য আইন কলেজে যোগদান করেন। অভাবনীয় পরিস্থির জন্য আইনের পাঠ সাঙ্গ হবার আগেই তিনি কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন এবং সেই অল্পবয়সেই চাকরির সন্ধানে ব্যাপৃত হন। বিগত শতাব্দীর সেই নব্বই-এর দশকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদের জীবিকার্জনের কয়েকটি মাত্র পথ খোলা ছিল—তারই একটি শিক্ষকতা। প্রথমে তিনি কুম্ভকোণম-এর একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হন, কিন্তু পদটি স্থায়ী ছিল না বলে সেটি পরিত্যাগ করে চিদাম্বরমের পাচিয়াপ্পা স্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। মাত্র তিন বৎসর পরেই তাঁর শিক্ষাকুশলতার জন্য মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল, জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত, এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি পাচিয়াপ্পা কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি পাচিয়াপ্পা ট্রাস্টের কাজ গভীর আনুগত্যের সঙ্গে সম্পাদন করে যান এবং তাঁর ছাত্রমণ্ডলী ও সহকর্মীদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন।

কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিকতাহীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েই আলাসিঙ্গা নিরস্ত হননি—রাজনৈতিক নায়ক হওয়ার ক্ষেত্রকেও তিনি নির্বাচন করেননি। তার থেকে বেশি তিনি করে-ছিলেন। ভারতমাতার এই সুযোগ্য সন্তান শৈশব থেকেই মাতৃভূমির মহত্বের প্রকৃত অবস্থানটি জানতেন। তিনি উচ্চতর উদ্দেশ্যে—মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগরিত করার জন্য জীবন উৎসর্গের সংকল্প করেন। যে পরিমাণে চারিদিকে আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতি প্রসারিত হচ্ছিল—শিক্ষিত জনেরা পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক জড়বাদের উপাসক এবং অশিক্ষিতেরা পুরোহিততন্ত্র ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে উঠেছিল, তাতে তিনি বিশেষ অসন্তোষ বোধ করেন। জাতীয়তা-বিরোধী সংস্কার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেরই ভিতর পশ্চিমী জীবন-ধারা ও চরিত্র অনুকরণেরই তৎপরতা এবং তাদের সনাতন জাতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসের প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। পশ্চিমাগত খ্রীস্টান মিশনারীদের মুখে হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা হিন্দুদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কেন্দ্র থেকে দূরে

* লেখক আলাসিঙ্গা পেরুমলের পৌত্র।

সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দুসমাজের জটিল গঠনের মধ্যে যে-ধরনের বিকৃতি ও পরিত্যক্ত মতবাদ আত্মপ্রকাশ করছিল তা অকল্পনীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং তা হিন্দুধর্মকে অনাধ্যাত্মিক ও অর্থহীন কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানমাত্রে অধঃপাতিত করছিল। একটা নতুন শক্তি ও নতুন আলোকের প্রয়োজন ছিল যাতে হিন্দুধর্ম তার মৃত জঞ্জাল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে ও তার মধ্যে মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং বৃহত্তর জগতে সেই সত্য প্রতিষ্ঠালাভ করে। তরুণ আলাসিঙ্গার স্পর্শকাতর হৃদয় কালের এই প্রয়োজনকে সত্বর অনুভব করেছিল এবং তিনি সেই স্ব-নির্বাচিত মিশনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পথ মসৃণ ছিল না। যে প্রতিবন্ধকতা ও উপহাসের তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কার্যরূপায়ণে যে স্বল্পতম বিত্ত তাঁর অধিকারে ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আলাসিঙ্গার সাফল্যকে অভিনন্দিত না করে পারা যায় না।

বিশ বছর বয়সের আগে আলাসিঙ্গা বিশেষ জানতেন না যে, তাঁরই প্রায় সমবয়সী এক মহাপ্রাণ, যিনি তাঁর হৃদয়ের আগুনকে প্রদীপ্ত করে তাঁর সমগ্র জীবনের পরিচালক হয়ে দাঁড়াবেন, সুদূর বাঙলায় গভীর সাধনায় নিমগ্ন। ইনি আর কেউ নন, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বোত্তম শিষ্য স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। মহাগুরুর দিব্যহস্ত—যা স্বামীজীর মিশনের সাফল্যের পথ তৈরি করছিল,এই দুই সমগোত্র হৃদয়কে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে। পরিব্রাজক হিসাবে উত্তর থেকে দক্ষিণভারত পরিভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত) মাদ্রাজে উপস্থিত হন ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে। কন্যাকুমারিকায় তাঁর ঐতিহাসিক পরিদর্শন ও দিব্য অভিজ্ঞতা লাভের পর স্বামীজী তিরুভান্ডপুরমে উপস্থিত হন। এখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় সেকালের সুখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়ার। রঙ্গাচারিয়া ছিলেন আলাসিঙ্গার নিকট আত্মীয় (শ্যালক)। এর ফলেই সেই মহান গুরু ও মহান শিষ্যের মিলন হয়—যে-ঘটনা ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ১৮৯৩-এর শেষভাগে ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, এই সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছায়। সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ডঃ বারোজ এই ব্যাপারে ডঃ উইলিয়ম মিলারের কাছে পত্র দেন। আমেরিকার হিন্দু লীগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আলাসিঙ্গার পিতৃব্য, বৈষ্ণব পণ্ডিত যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার শিকাগোয় ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের খবর আলাসিঙ্গাকে জানান। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও আমেরিকার মতো দূর দেশে সম্মেলনের অনুষ্ঠান সেকালের ভারতীয়দের মধ্যে সামান্যই ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল—ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, যাঁরা লিখিত প্রবন্ধ পাঠিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু আলাসিঙ্গা এই ধরনের সর্বধর্মীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গুরুত্ব যথেষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেখানে ভারত থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের এই সুযোগটা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়াকে শিকাগো গিয়ে সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন, কিন্তু রঙ্গাচারিয়া সম্মত হলেন না। আলাসিঙ্গা অত্যন্ত নিরাশ হলেও আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন না। শিকাগো পার্লামেন্টে বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে পাঠাবার ব্যাপারে তিনি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর ছোটভাই এম. সি. কৃষ্ণমাচারির কাছে জানতে পারলেন যে, ইংরেজীভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রে-ব্যুৎপন্ন এক তরুণ সন্ন্যাসী মাদ্রাজের সহকারী একাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে এসেছেন। কে এই ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী তা জানার জন্য কৌতূহলী আলাসিঙ্গা জি. বি. নরসিংহাচারি, আর. এ. কৃষ্ণমাচার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একদিন সেখানে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বুঝতে পারলেন, এই মানুষটিকেই তিনি এতদিন খুঁজছেন। তিনি এই 'অপরিচিত' তরুণ সন্ন্যাসীকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুরূপে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্পণে অদম্য প্রেরণা অনুভব করলেন। স্বামীজীর চৌম্বক ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি আলাসিঙ্গার সমভিব্যাহারী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রত্যেকের মনে একটা গভীর ও চিরস্থায়ী রেখাপাত করেছিল। স্বামীজীর চোখের দ্যুতি আলাসিঙ্গার

ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। স্বামীজীর কথার ইন্দ্রজাল আলাসিঙ্গার রূপান্তর ঘটায়। তিনি স্বামীজীর অনুরাগিভক্তে পরিণত হন এবং সারাজীবন তাঁর সে শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল।

স্বামীজীকে যাঁরা বেষ্টন করেছিলেন তাদের সঙ্গে আলাসিঙ্গার পার্থক্য হলো, তিনি অতি সত্বর স্বামীজীর মধ্যে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি যে সাধারণ ব্যক্তিমাত্র নন, সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। যাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এবং তাঁকে বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন, এটা বুঝে আলাসিঙ্গা খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবজাত নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে স্বামীজীকে তিনি প্রশ্ন করেন, "স্বামীজী, আপনি কেন শিকাগো যাচ্ছেন না?" স্বামীজী ভাবতে লাগলেন, "সত্যই তো, কেন নয়?" একথাটা আলাসিঙ্গা ভিন্ন অন্য কারও মনে আসেনি। যে সামান্য কয়েকজন পার্লামেন্টের কথা জেনেছিলেন, তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেননি, শিকাগোতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব। কিন্তু আলাসিঙ্গা অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি স্বামীজীর কাছে প্রস্তাব করলেন, তাঁর শিকাগোয় ধর্মমহাসম্মেলনে যাওয়া উচিত।

এ-প্রস্তাবে প্রথমে সায় দেননি স্বামীজী, কিন্তু আলাসিঙ্গা যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, তাতে তিনি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে লাগলেন। স্বামীজী মাইলাপুরে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে তখন ছিলেন; আলাসিঙ্গা বারবার সেখানে গিয়ে সুযোগ-মত তাঁর কাছে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নটি উত্থাপন করতে লাগলেন। আলাসিঙ্গা বেশ বুঝতে পারছিলেন, একমাত্র স্বামীজীর শিকাগো পরিদর্শনেই বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতীয় সনাতন ধর্মের উপস্থাপনার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। সেদিন ছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শিবরাত্রি। সারাদিন ও রাত স্বামীজী গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—বেশি বাক্যালাপও করেননি। সেই পবিত্র যামিনীতেই স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণকরেন। সেদিন আলাসিঙ্গার আনন্দ সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছিল।

স্বামীজীর পাথেয় ও অন্যান্য খরচ সংগ্রহ সহজ কাজ ছিল না। আলাসিঙ্গা একজন সাধারণ স্কুল-শিক্ষক, তাঁর বন্ধুদেরও আর্থিক ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁরা সকলে স্বামীজীর খরচের একটা সামান্য অংশমাত্র দিতে পারেন—বাকি প্রধান অংশটার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলা প্রয়োজন। আলাসিঙ্গা অর্থসংগ্রহের কঠিন কাজে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছু যুবকের সহায়তায় তিনি স্বামীজীর পাথেয় সংগ্রহে অগ্রসর হলেন। একসময় একজন জমিদার আলাসিঙ্গাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি একাই সমস্ত খরচ বহন করবেন। তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করে আলাসিঙ্গা অর্থসংগ্রহে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর যাত্রার মাস দুই আগে সেই জমিদার আকস্মিক মত পরিবর্তন করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের একটা সামান্য অংশমাত্র দান করেন। এই ঘটনায় কিছু হতাশ হলেও আলাসিঙ্গা মানসিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেননি। দ্বিগুণ উদ্যমে, তাঁর সহজাত ধৈর্যশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে তিনি আক্ষরিকভাবেই সকলের কাছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করেছেন। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারেই এটা তিনি করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন,'মা যদি ইচ্ছা করেন আমি যেতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই পয়সা পেতে চাই, কারণ ভারতেরই মানুষের জন্য আমার পশ্চিমে যাওয়া—ভারতের জনসাধারণের ও দরিদ্রদের জন্য।' আলাসিঙ্গা ও তাঁর বন্ধুরা মাদ্রাজের বাইরে, এমন-কি সুদূর রামনাদ ও হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন এবং এসব জায়গায় স্বামীজীর বন্ধু ও গুণমুগ্ধরা সকলেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। মাত্র তিন-চারদিনে তিনি প্রায় তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। আলাসিঙ্গা স্বয়ং বোম্বাই গিয়ে স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার ভাড়া হিসাবে সেই টাকা টমাস কুক এ্যান্ড সন্সের কাছে জমা দেন। এবার তিনি সন্তুষ্ট যে স্বামীজীর ভারত ত্যাগের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশেষে যাত্রার দিন—৩১ মে ১৮৯৩ উপস্থিত হলো। স্বামীজীকে বিদায় জানাতে আলাসিঙ্গা মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই পৌঁছালেন। নানাবিধ মানসিক অনুভূতিতে স্বামীজীর মন তখন

ভারাক্রান্ত। তিনি জাহাজ-ঘাটার পথ অতিক্রম করে স্টীমার অবধি গিয়ে তাঁর যাত্রার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে রইলেন। জাহাজ ছাড়ার মুহূর্তে স্বামীজী সাশ্রুনেত্রে তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন—আলাসিঙ্গা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। না-জেনে না-বুঝে স্বামীজীকে যে কাজ গ্রহণ করার জন্য সেসময় তিনি পীড়াপীড়ি করেছিলেন তার তাৎপর্য তখন তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। আর দীর্ঘকালের ব্যবধানে এখন সুস্পষ্ট যে, তিনি (আলাসিঙ্গা) যা করেছিলেন তা তাঁর দেশ ও বৃহত্তর মানবজাতির পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলন পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে মহত্তম ঘটনাবলীর অন্যতম। আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিপুল অভিনন্দনের মাধ্যমে ভারত সেই সম্মেলনে তাঁর সাফল্যের সংবাদ পেল। সমগ্র দেশব্যাপী সেই আনন্দোৎসবে আলাসিঙ্গার আনন্দ অবর্ণনীয়। স্বামীজীকে আমেরিকাগমনের অনুরোধের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে যদিও তিনি গর্ব অনুভব করেছেন, কিন্তু তার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তিনি দাবি করেননি। আমেরিকায় স্বামীজীর আরও সাফল্য কামনা করে তিনি নীরবে প্রার্থনা করেছেন। ধর্মসম্মেলনের অব্যবহিত পরেই স্বামীজীর লেখা, বক্তৃতা, ক্লাসগ্রহণ ও আলাপচারিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষাদান সুরু করে প্রকৃত কর্তব্য পালন করেছেন। এই প্রচারণারই অংগ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। আমেরিকায় স্বামীজীর কার্যাবলীর বিস্তৃত রিপোর্ট তাঁর মাদ্রাজ ও কলকাতার গুরুভাই ও শিষ্যদের মারফৎ নিয়মিত ভারতে এসে পেঁছাচ্ছিল। এঁরা স্বয়ং স্বামীজী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এইসব রিপোর্ট পেতেন। সেই সময় মাদ্রাজ ও কলকাতা শহরে বড় বড় সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করছিলেন। হিন্দুধর্মের জন্য স্বামীজীর মহান কার্যাবলীর অভিনন্দনসূচক তাঁদের ভাষণ আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে পাঠানো হতো। প্রশস্তিগুলি পাঠ করে স্বামীজী তার উপযুক্ত উত্তর পাঠাতেন। স্বামীজী যখন আমেরিকায় কাজ আরম্ভ করেছেন তখন থেকেই বেদান্ত সম্পর্কে আমেরিকায় প্রদত্ত মূল্যবান বক্তৃতা ও রচনাগুলি ভারতীয় পাঠকের সুবিধার্থে ভারতে প্রচারের জন্য আলাসিঙ্গা একটি ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি আরও চাইছিলেন, এই পত্রিকাটিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও অন্যান্য সন্তদের বাণী, উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মর্মকথা প্রচারের ব্যবস্থা করতে। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আলাসিঙ্গা স্বামীজীর মূল্যবান সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আমেরিকায় শিক্ষাদান সুরু করেন তখন থেকে মাদ্রাজে বেশিরভাগ আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে অন্যান্য শিষ্যদের বেদান্ত সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদাত্ত ও উদ্দীপক আহ্বান জানাতেন। এমন-কি তিনি আমেরিকায় বক্তৃতা মারফৎ উপার্জিত অর্থ থেকে এই পরিকল্পনার জন্য সাহায্যও করেছেন। আলাসিঙ্গার কর্ম-ক্ষমতায় স্বামীজীর যথেষ্ট আস্থা থাকায় তাঁকেই তিনি পরিকল্পিত মাসিক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দেন। সেইমত ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে আলাসিঙ্গা ইংরেজী মাসিক পত্র 'ব্রহ্মবাদিন্' নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। তিনি আমৃত্যু অত্যন্ত দৃঢ় সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। পত্রিকাটিকে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সকল রকম ক্লেশ তিনি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অধ্যবসায় ও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন,"তোমার মোক্ষ নির্ভর করছে ব্রহ্মবাদিনের সাফল্যের ওপর, এইকথা মনে রেখে এর জন্য তোমার সব ভক্তি উজাড় করে দাও। এই পত্রিকাটিকেই তোমার ইষ্টদেবতা কর, দেখ সাফল্য আসে কিনা।"

আলাসিঙ্গা একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীজীর নির্দেশ অনুসরণ করেছেন এবং সত্যই তিনি ব্রহ্মবাদিনকে নিজ ইষ্টদেবতা বলে মনে করতেন। ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে সম্পর্কই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর কলেজের কাজ পারিবারিক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ব্রহ্মবাদিনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তাকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। প্রথম দু-বছর তাঁর প্রতিভাবান শ্যালক অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়া ব্রহ্মবাদিনে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তী দশ বছর ব্রহ্মবাদিনের ব্যবস্থাপনায় ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সি. জি. নরসিংহাচার, আর. এ. কৃষ্ণমাচার ও অন্যান্যরা আলাসিঙ্গাকে সাহায্য করতেন। তার পরবর্তী চার বছর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একা হাতে পত্রিকাটি চালিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা পাঁচ বছর পত্রিকাটি চালিয়ে যান—অবশেষে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মবাদিনের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

সে-সময় ব্রহ্মবাদিন্ ছিল দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ইংরেজী মাসিকপত্র। যেসময় পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয় মনকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল এবং ভারতীয়েরা তাঁদের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ করতেন, সেই সময় ব্রহ্মবাদিনকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ কিছু কম কঠিন কাজ ছিল না। আলাসিঙ্গার ওপর স্বামীজী যে-বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন, তিনি তাঁর যোগ্য হয়ে উঠে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই সাফল্যের দুটি কারণঃ প্রথমতঃ আলাসিঙ্গার কাছে লেখা উদ্দীপ্ত ও আলোকিত পত্রগুলির মাধ্যমে স্বামীজীর নির্দেশ, যা প্রায় তাঁর উপস্থিতিরই সমতুল্য এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মের প্রতি আলাসিঙ্গার নিষ্ঠা, স্বার্থবোধহীন আত্মত্যাগ ও স্বামীজীর প্রতি ভক্তি। আজও ব্রহ্মবাদিনের পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখলে এর সুযোগ্য সম্পাদকের যা বিশিষ্ট গুণ, সেই ভালবাসার জন্য পরিশ্রমের পরিচয় মেলে। ব্রহ্মবাদিন্ যে-আদর্শকে সম্মুখে রেখে চলত তার নীতি ও পরিচালনপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামীজী বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রহ্মবাদিন হিন্দধর্মের নবজাগরণে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গঠনমূলক শক্তি হিসাবে আপন প্রভাব বিস্তৃত করেছে। বক্তৃতা ও রচনায় স্বামীজী বিশেষ একটি দিকের ওপর জোর দিতেন, যথা কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদ নয় আন্তর্জাতিকতা, হিন্দুধর্ম নয় বিশ্বধর্মরূপ বেদান্ত—ব্রহ্মবাদিনে আলাসিঙ্গার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। সাধারণ রচনা ছাড়াও ব্রহ্মবাদিনে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন অংশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অগ্রগতি ও কার্যাবলীর সংবাদ থাকত। যখনই স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত রচনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রচারণার (propaganda) চিহ্ন খুঁজে পেতেন তখনই তিনি শিষ্যকে সতর্ক করে দিতেনঃ "ব্রহ্মবাদিনের কয়েকটি সংখ্যায় আমি একটু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি···আমার সঙ্গে ভণ্ডামি করো না··· আমার একজন মাত্র অনুগামী হলেও তাকে আমৃত্যু সত্যবদ্ধ ও বিশ্বস্ত হতে হবে, আন্দোলনকে সব সময় বিশুদ্ধ রাখতে হবে, তাতে যদি কেউ না থাকে, সেও ভাল··· এবিষয়ে আমি সংকল্পবদ্ধ। ব্রহ্মবাদিন্ বেদান্ত প্রচারের জন্য—থিয়োসফি প্রচারের জন্য নয়।"

প্রবুদ্ধ-ভারত পত্রিকার উদ্ভবও আলাসিঙ্গার কাছে ঋণবদ্ধ। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন, যেহেতু ব্রহ্মবাদিন্ অতিমাত্রায় উচ্চমানের পত্রিকা এবং সাধারণ ভাবে বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের উপযোগী, তাই যুবক ও অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের জন্য আরও একটি ইংরেজী সাময়িক পত্র দরকার যাতে সহজতর ও কম পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাদি থাকবে। আলাসিঙ্গাই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রথম সম্পাদক বি. আর. রাজম আয়ারকে নির্বাচিত করেছিলেন। 'প্রবুদ্ধ-ভারত' ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আলাসিঙ্গা, নঞ্জুণ্ড রাও ও জি. জি. নরসিংহাচারের যুক্তপ্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। কোন গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে পরিচিতি না থাকলেও আলাসিঙ্গার সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ-ভারতে'র সঙ্গে সংযুক্তি ছাড়াও তিনি 'ইন্ডিয়া', 'উইকলি রিভিউ' এবং 'নেটিভ স্টেট' প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনে এমন অবসর ছিল না যাতে তিনি চিরন্তন মূল্যের কোন সাহিত্যকর্ম করতে পারেন। তাঁর ভাষা ছিল সাধু, সহজ ও স্পষ্ট। তাঁর রচনাগুলিতে গভীর প্রত্যয় ও মানুষের আধ্যাত্মিক ভাগ্য সম্পর্কে প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

আলাসিঙ্গার জীবনে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অনুপম সম্পর্কের মধ্যে। গুরু তাঁর ওপর পরিপূর্ণ স্নেহ ও মনোযোগ বর্ষণ করেছেন আর শিষ্য গুরুর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন। যে যুবগোষ্ঠী স্বামীজীর প্রথম মাদ্রাজ আগমনকালে তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আলাসিঙ্গারই

হৃদয় প্রজ্বলিত হয়েছিল স্বামীজীর আগ্নেয় স্পর্শে। কেবলমাত্র অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও গুরুভক্তির জন্য মাদ্রাজের গৃহী ভক্তদের মধ্যে তিনি স্বামীজীর প্রিয় শিষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ তৈরি, চরিত্র গঠন, বৈরাগ্য ও কর্মের মূলমন্ত্রের আহ্বানে তাঁর তৎপর সাড়া ও বাস্তবরূপায়ণে এটাই প্রকটিত হয়েছে। স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করতেন, তাঁর চারিত্রনিষ্ঠা ও স্বার্থবোধহীনতার প্রশংসা করতেন। ভারত থেকে স্বামীজী যখন ধর্মসম্মেলনে গিয়েছিলেন তখন মাদ্রাজে কার্যপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য, প্রথমে 'ব্রহ্মবাদিন্' এবং পরে 'প্রবুদ্ধভারত' পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আলাসিঙ্গাকে নিয়মিত পত্র লিখতেন। প্রথম দিকের একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন: "একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর ···তোমাকে সমস্ত জিনিসটার ভার নিতে হবে—সরদার হিসাবে নয় সেবকভাবে···হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্যন্ত বেশ কাজ করেছ। প্রভু তোমাদের ভিতর সব শক্তি দেবেন।···বিশ্বাস রাখো, তুমিই সব। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ।" আমেরিকা থেকে আর একটি চিঠিতে লিখেছেন: "প্রাণ দিয়ে কাজ কর। তুমি কি করতে পার দেখি···তোমার ব্রতের প্রতি নিষ্ঠাবান হও। এপর্যন্ত তুমি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ—আরও ভালভাবে কাজ কর।" ব্রহ্মবাদিন্ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "কাগজটা যেন অসার বাক্যসমষ্টি না হয়, দৃঢ়, শান্ত ও উচ্চগ্রামসম্পন্ন (high toned) হওয়া চাই···সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও, দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাও। ভয় পেও না, আমরা অনেক বড় কাজ করব। আর একটা কথা—সকলের সেবক হবে···এগিয়ে যাও। তুমি চমৎকার কাজ করেছ। বৎস আমরা কাজ করে যাব। আত্মবিশ্বাসী, বিশ্বস্ত ও ধৈর্যশীল হও।" লন্ডন থেকে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন: "বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজ!" স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত 'পত্রাবলী'তে আলাসিঙ্গাকে লেখা এই ধরনের* চিঠি অনেক পাওয়া যায়।

যাতে মন নিবিষ্ট হতো তাতে আলাসিঙ্গা চিন্তা, কথা ও কাজে একান্তভাবে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বচ্ছন্দ কাজের অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। তিনি অনাড়ম্বর ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ। সকলকে বাদ দিয়ে নিজেকে কখনো বড় করে জাহির করেননি—প্রত্যাশা করেননি নিজের কাজের জন্য কোন প্রশংসা। ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নি অথবা পত্রের আড়ালে ফলের মতো সকলের অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। তিনি আদর্শ কর্মযোগী এবং মহান ভক্ত। কাজের আহ্বানে, কাউকে সাহায্য করার প্রয়োজনে তিনি যে-কোন মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতেন। সারাজীবনই তিনি বেঁচেছিলেন অন্যের জন্যে, কোন প্রতিদানে প্রত্যাশা না করে অন্যের সেবার জন্যে নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করতেন। নিজের অসুবিধা ঘটলেও অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁর মমত্বময় হৃদয়ের অগণিত দৃষ্টান্ত আছে—যেসব ঘটনায় তিনি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

আলাসিঙ্গার নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর এক বিরাট বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। ধনী ও নির্ধন, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী, সরকারি ও বেসরকারি মহল সকলের ওপরই তাঁর প্রভাব ছিল প্রসারিত। সকলেই পোষণ করতেন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। যত ক্ষুদ্র হোক না কেন, যে-কোন কাজেই তিনি ছিলেন সিদ্ধ। সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁর সহযোগিতা কামনা করতেন, কারণ নিজেকে অন্তরালে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাজ সম্পাদন করতে পারতেন। মতৈক্য ঘটুক বা না ঘটুক, কারও প্রতি কখনো কোন বিদ্বেষ তিনি পোষণ করতেন না—কারও সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করতেন না। দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ছিলেন একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী। নিজের মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন করে দেশকে ভালবাসতে পারে—তারই আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন উদার ও প্রগতিপন্থী। তাঁর কালের পক্ষে তিনি ছিলেন যথেষ্ট প্রাগ্রসর—একথা বললে

বাড়িয়ে বলা হবে না। তিনি নিজে কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও, তাঁর স্বাদেশিক চেতনা নানা খাতে প্রবাহিত হতো। তিনি মিসেস এ্যানি বেশান্ত ও ইয়ং মেনস ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তামিলনাদের দেশপ্রেমিক কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ছিলেন আলাসিঙ্গার বিশিষ্ট বন্ধু। কবি ভারতী আলাসিঙ্গার স্মৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নানা সময়ে তাঁর কাছ থেকে বিপুল সাহায্য পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি একজন সাধারণ স্কুলশিক্ষক মাত্র ছিলেন না, তাঁর পরিপক্ব অভিজ্ঞতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতার জন্য অনেক বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন। একবার কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ভগিনী নিবেদিতাকে প্রশ্ন করেন ঃ "মাদ্রাজে এমন কোন দেশপ্রেমিক নেতা নেই যিনি আমাদের মতো তরুণদের নির্দেশ দেওয়া বা পরিকল্পনার পক্ষে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। আমাদের কি করা উচিত?" উত্তরে নিবেদিতা বলেছিলেন, "কেন? আলাসিঙ্গা তো রয়েছেন। কোন সামাজিক বিষয়ে তোমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হলে তাঁর কাছে জিনিসটা বুঝে নিতে পার।"

সবসময় অভাবের মধ্যে থেকেও আলাসিঙ্গা যা সামান্য উপার্জন করতেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। অর্থ বা ক্ষমতার প্রতি লালসা তাঁর কাছে ছিল বিজাতীয় বস্তু। একবার স্বামীজীর এক ধনী আমেরিকান শিষ্য ভগিনী নিবেদিতার কাছে আলাসিঙ্গার আর্থিক অবস্থার জন্য সহানুভূতি জানিয়ে তাঁর অভাব মোচনের জন্য এক লাখ টাকা উপঢৌকন দেবার প্রস্তাব করেন। নিবেদিতা সে-কথা আলাসিঙ্গাকে জানালে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করেন, তারপর এই সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তা গ্রহণের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর বন্ধুদের তিনি বলতেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তিনি অনিচ্ছুক। ভারতীয় বেদান্ত-চিন্তার এক নিখাত জাতক ছিলেন আলাসিঙ্গা। জীবদ্দশায় যদিও তিনি নিজের স্মৃতিকে চিরজাগরূক করে রাখার উদ্দেশ্যে কিছু করেননি। যেসব বিরল আত্মা সনিষ্ঠভাবে মানবতার নিঃস্বার্থ সেবায় কর্মসাধনা করেছেন তাঁদেরই একজন হিসাবে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় ভগবদ্গীতার কর্মযোগের আদর্শ রূপায়ণের দ্বারা তাঁর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি প্রত্যয় প্রতিভাত হয়েছে। যে-স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন, তাঁর অগণিত বন্ধুরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে কেউ উন্নত না হয়ে ফিরে আসেননি। ১১ মে, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁর অকালমৃত্যু, যাঁরা তাঁকে জানতেন শুধু তাঁদের কাছেই নয়, সমস্ত দেশের পক্ষেই ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। যদি এত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু না ঘটত তাহলে আলাসিঙ্গা পেরুমলের মধ্যে দিব্য সত্তা কতখানি প্রচ্ছন্ন ছিল পৃথিবী সেটা জানার সুযোগ পেত। গৃহী হয়েও তিনি সাংসারিক মানুষ ছিলেন না। আলাসিংগা পেরুমল প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে রেখে গেছেন এক মহৎ আদর্শ যার মধ্যে আছে সেই সংকল্পের অগ্নিস্পর্শ—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

আলাসিঙ্গার এই ক্ষুদ্র জীবনালেখ্যের উপসংহার হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণীর চেয়ে সুপ্রযুক্ত আর কিছু হতে পারে না (স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যাগমন কালে মাদ্রাজে উপস্থিত হলে আলাসিঙ্গা তাঁর সঙ্গে জাহাজে মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যান—উদ্দেশ্য ছিল, ব্রহ্মবাদিন্ ও মাদ্রাজের কার্যাবলী আলোচনা) ঃ

"আলাসিংগা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরী রামানুজী 'রসম'-খেকো ব্রাহ্মণ। কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেংকলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি—দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়ে ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর! জাত বাঁচিয়ে ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠেনি…এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প, অমন নিঃস্বার্থ অমন প্রাণপণ-খাটুনি, অমন গুরুভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া!" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৬৯, পৃঃ ৮৭)

পরিক্রমা

অপরূপ নেপাল

ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী

পশুপতিনাথ দর্শনের একটি সুবর্ণসুযোগ এল গতবছর (১৯৮৯) ৬ মার্চ—শিবরাত্রির দিন।

গত ৪ মার্চ, ১৯৮৯ পশুপতিনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে আমরা বারাণসীধাম থেকে বাসে রওনা হলাম। বাস লাকসা থেকে ছাড়ল রাত বারোটা নাগাদ। পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা গোরক্ষপুরে পেঁৗছালাম। সেখানে গোরক্ষনাথজীর দর্শন হলো। সুন্দর শ্বেত মর্মর প্রস্তরের মন্দিরে গোরক্ষনাথজী আসীন। মন্দিরের সামনে বিশাল উদ্যানমধ্যে দেবদারু পরিবেষ্টিত স্বচ্ছ জলেভরা বৃহৎ চতুষ্কোণ পুষ্করিণী, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি, বহু মন্দিরশোভিত নয়নাভিরাম পরিবেশে বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে অতিবাহিত করে বাসে উঠলাম। বেলা ১০-৩০ মিনিট নাগাদ আমরা ভারত-নেপাল সীমান্ত সোনলীতে এসে গেলাম। এখানে নেপালে প্রবেশের জন্য মন্দিরের মতো দ্বার, তাতে লেখা 'শান্তিদ্বার'। দুই প্রান্তে দুই দেশের পতাকা উড়ছে। নেপালে প্রবেশের জন্য বাসের অনুমতিপত্র করাতে হলো। ভারতীয় মুদ্রা নেপালে চলবে না। নেপালের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে আমরা প্রয়োজন মতো নেপালী মুদ্রা নিলাম। এখানে আহারাদি সেরে নেবার পর বাস আবার ছাড়ল। কিছুদূর এগিয়ে বহু প্রতীক্ষিত হিমালয়ের চিত্তবিমোহন রূপ এবার নজরে এল। পটে আঁকা ছবির মতো হিমালয়ের ক্রোড়ে শোভিত নেপালের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কত কথাই না শুনেছি! এখন সে-রাজ্যে প্রবেশ করছি। রোমাঞ্চিত হচ্ছে মন। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে গন্তব্যপথে এগিয়ে চলেছি। সর্বদাই যে হিমালয় দৃষ্টিপথে আসছে তা নয়, তবু শহরের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে উন্মুক্ত প্রান্তর, দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ, সবুজের সমারোহ দেখে হৃদয়-মন জুড়িয়ে গেল। ক্রমে সন্ধ্যা ও রাতের গাঢ় অন্ধকার সবকিছুতে টেনে দিল ঘন যবনিকা, রইল শুধু বাসের তীব্রগর্জন। নীরব নিস্তব্ধ ধ্যানমৌন পর্বতরাজির মধ্যে সে গর্জন যেন তীব্র যন্ত্রণার হাহাকারের মতো বনস্থলীর মর্মমন্থন করে গুমরে গুমরে উঠছে। কিন্তু সে-আর্তনাদ শোনে কে ? ঐ অন্ধকারের বুক চিরে বিজলীবাতির আলোক আনছে আশার ঝলক, হয়তো বা পথ শেষ হতে চলেছে। দূর হতে বিজলীবাতির আলোর মালায় ঘেরা পাহাড়ের ওপর কাঠমাণ্ডু শহর দেখতে কি সুন্দর লাগছে! যেন হীরার গহনায় সজ্জিতা রূপসী রমণী। সারা রাত ও দিন বাসে চলার পর ক্লান্তি চরম পর্যায়ে উঠেছে। বাস রাত একটার সময় 'সুষুপ্তনগর' কাঠমাণ্ডুর দিল্লীবাজারে একটি গেস্টহাউসে গিয়ে পেঁৗছাল। জিনিসপত্র নামিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে গেলাম। ভোর পাঁচটার মধ্যে স্নানাদি সেরে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে শিবস্তোত্রাবলী একের পর এক আবৃত্তি করতে করতে পশুপতিনাথ দর্শনে আমরা অগ্রসর হলাম। ভীষণ ক্লান্তির মধ্যেও চমৎকার লাগছিল। বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন ৬ মার্চ। গাছের ফাঁকে আকাশে ক্ষীণকায় এককলা চতুর্দশীর চন্দ্র দর্শন হলো, তা পার্শ্ববর্তিনীকে দেখালাম। সাক্ষাৎ চন্দ্রচূড় বুঝি বা প্রত্যক্ষ হলেন! অনেকটা পথ চলার পরে আমাদের ডানপাশে আবছা অন্ধকারের মধ্যে মন্দিরের চূড়া দর্শন হলো। কিন্তু যা দেখে ভীষণ ভীত হলাম তা হলো দশনার্থীদের সুদীর্ঘ লাইন। ক্রমে রাতের আঁধার অপসারিত হলো। কিন্তু একটুও যেন অগ্রসর হতে পারছি না। অন্তর থেকে ব্যাকুল প্রার্থনা উঠছে—'হে প্রভো বিশ্বনাথ, হে পশুপতিনাথ, বহুদূর হতে তোমার দর্শনমানসে এসেছি, কৃপা করে দর্শন দাও।' সুদীর্ঘ পাঁচঘণ্টাকাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরে বেলা ১০-৩০ নাগাদ আমরা চলমান প্রচণ্ড জনস্রোতের ধাক্কায় যেন মন্দিরদ্বারে আছড়ে পড়লাম। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ ও স্পর্শের কোন অবকাশ নেই। বাইরে থেকে দেখলাম, ঈষৎ বাদামী রঙের চতুর্মুখী লিঙ্গ। মন্দিরাভ্যন্তর বেশ বড়, চারদিকে চারটি দরজা, সবগুলিতেই

দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড় যেন উপচে পড়ছে। চারজন পুরোহিত চারটি দরজা থেকেই ভক্তদের পুজাসামগ্রী গ্রহণ করছেন। প্রত্যেকেই স্থূলকায়, সুগৌর, রক্তাম্বর পরিহিত, বড়দানার রুদ্রাক্ষমালা মাথায় টায়রার মতো করে পরা। তাঁরা অবিরাম বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে পূজাগ্রহণ ও নিবেদনান্তর ভক্তদের 'পরসাদী' দিচ্ছেন, দিচ্ছেন সুগন্ধি চন্দন-তিলক। শ্রীঅঙ্গের স্নিগ্ধ সুরভিত চন্দন-তিলক ধারণ করে মন অত্যন্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠল। পশুপতিনাথের স্পর্শ যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম। শরীরের ক্লান্তিও যেন অনেকটা দূর হলো। পূজাদি নিবেদন করে করজোড়ে প্রার্থনা করলাম, 'হে নির্মল প্রশান্ত শুদ্ধজ্ঞানমূর্তি, হে জনম-মরণ-দুঃখচ্ছেদদক্ষ, আমার প্রণাম গ্রহণ কর।' কর্পূর ধূপ পুষ্পচন্দন-সুরভি ও প্রসন্নতায় সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ আমোদিত হয়ে আছে। দুধ ও অন্যান্য উপচার সহযোগে তাঁর স্নান-পূজাদি সর্বক্ষণই হচ্ছে। গর্ভমন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের জন্য প্রশস্ত অলিন্দ আছে। অলিন্দ সংলগ্ন দেওয়াল ও ছাদ ঝকঝকে ভারি রুপোর সুন্দর কারুকার্যে ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে ঝলমল করছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা ছন্দ সহকারে শাস্ত্রপাঠে রত। ভবানীদেবীর মন্দির সহ অন্যান্য অনেক মন্দির আশপাশে বিদ্যমান। কাঠমাণ্ডুর অধিকাংশ মন্দিরের গঠন প্যাগোডা ধরনের। পশুপতিনাথের মন্দিরের গঠন ত্রিতলিকা। মন্দিরের উচ্চচূড়ায় এক বিশাল ঘণ্টা শোভমান, তদুপরি একটি ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ, সবই সুবর্ণরঞ্জিত। তার বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মন্দিরের সামনে এক অতি বিশালকায় স্বর্ণরঞ্জিত বৃষ অবস্থিত। এরূপ বৃহদাকার বৃষ খুব কমই দেখেছি। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে নেমে বাসে নেপালের নদী বাগমতীকে দেখা যায়, বর্তমানে বিশীর্ণা, বর্ষায় সম্ভবতঃ স্ফীতা।

ধর্ম নেপালীদের জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাদেব ও বুদ্ধদেব নেপালবাসীদের জীবনে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিন্দুরা যেমন বুদ্ধচরণে ধূপদীপারতি অর্পণ করেন, বৌদ্ধরাও তেমনি হিন্দুমন্দিরে ও উৎসবে যোগদান করেন। তবে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় নেপালে শৈবধর্ম একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। নেপালের বহু রাজা নিজেদের পশুপতিনাথ-চরণসেবকরূপে গণ্য করতে গর্ববোধ করতেন ও তাঁর কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। অনেক রাজাই 'পরমশৈব', 'পরমমাহেশ্বর' প্রভৃতি উপাধিগ্রহণ করেছেন।

প্রচলিত কিংবদন্তী, ভগবান মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব নীল জলে পূর্ণ একটি সরোবরকে অপূর্ব সুন্দর উপত্যকায় পরিণত করেন। তারই নাম নেপাল। নেপালের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ এবং ধর্ম-. দর্শন শিল্প সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভবতঃ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নেপালে গোপাল, আভীর এবং কিরাত, লিচ্ছবী প্রভৃতি বংশ বহুকাল রাজত্ব করেছিলেন। সূর্যবংশীয় রাজা নিমিখ কিরাতদের পরাজিত করে দীর্ঘকাল নেপালে রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নেপালের ইতিহাস ঘন অন্ধকারে অবলুপ্ত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে নেপাল মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহামতি অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬) কন্যা চারুমতি ও জামাতা দেবপাল সহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নেপালে পদার্পণ করেন। তিনি কাঠমাণ্ডু শহর (দেওপাটন) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে চারটি বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন ও স্তূপপূজার প্রচলন করেন। মহামতি অশোকের আগমনে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত প্রসার সাধিত হয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় তাব্দীতে বৈশালী থেকে লিচ্ছবী রাজবংশ নেপালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা নেপালে ভারতীয় সভ্যতা কৃষ্টি ও ভাবধারার বাহক ছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খ্রীস্টাব্দ ৩৩৫-৩৮০) নেপাল ছিল তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের করদ সীমান্ত-রাজ্য। প্রথম জয়দেব তখন নেপালের রাজা ছিলেন।

লিচ্ছবী রাজবংশের ইতিহাসে প্রথম প্রখ্যাত নৃপতি ছিলেন রাজা বৃষদেব। তিনি নেপাল উপত্যকায় বহু বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শঙ্করদেব পশুপতি-

নাথ মন্দিরে বহুমূল্য ধর্মীয় উপহার-সামগ্রী প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্র মহাশক্তিশালী মানদেব যুদ্ধে পরাক্রমশালী মল্লদের ও সামন্তদের পরাজিত করে রাজ্য পূর্ব-পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করেন। তিনি শিল্পকলা কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তযুগের অবসানের পর পুষ্যভূতি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৮ খ্রীঃ) সময় সম্ভবতঃ নেপাল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য ছিল। এরপর নেপালের ইতিহাসের পাতায় বহু রাজার উত্থান-পতনের কাহিনী। প্রায় এক শতাব্দী পরে পূর্ব-ভারতের পালবংশের সঙ্গে নেপালের সংযোগ সাধিত হয়। কথিত আছে, রাজা ধর্মপাল নেপালের গোকর্ণ জয় করেছিলেন। নেপালের মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় পালস্থাপত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা দেবপালের রাজত্বকালে ধীমান ও তাঁর পুত্র বিট-পাল নামে দুজন খ্যাতনামা শিল্পী নেপালে এসে শিল্পকীর্তির বহু নিদর্শন রেখে গেছেন। হিন্দু দেবদেবী এবং বৌদ্ধমূর্তিতে পাল-ভাস্কর্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও দার্শনিক নেপালে ধর্ম ও দর্শন প্রচার করেছেন। একাদশ শতাব্দীতে ভারতের মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর নেপালে বৎসরাধিক-কাল অতিবাহিত করেন এবং জগদ্দলের মহা-পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁদের যুগ্মপ্রচারে বৌদ্ধধর্মে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার হয়। ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার থেকেও নেপালে বৌদ্ধচিন্তা-ধারা প্রবিষ্ট হয়।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে এবং হিমা-লয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের সর্বত্র শিব পূজিত। খ্রীঃ পূঃ মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, ঐ সময়েও শিব পশুপতিনাথরূপে পূজিত হতেন। লিঙ্গরূপে তাঁর পূজার্চনাও যে যথেষ্ট প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি থেকে তা জানা যায়। লিচ্ছবি বংশে শৈবধর্ম ছিল রাজধর্ম। গুপ্তযুগের কোন সময়ে পশুপতি-নাথ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশুপতি-নাথের 'চতুর্মুখ লিঙ্গ' গুপ্তযুগের শিল্পকলার নিদর্শন। ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সামসুদ্দীন ইলিয়স মন্দিরটিকে ধ্বংস করেন। আবার ১৩৬১ খ্রীস্টাব্দে জয়সিংহরাম মন্দিরটির পুনঃ সংস্কার করেন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যাগোডা রীতিতে মন্দিরটির পুনর্গঠন হয়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিচ্ছবী রাজা দ্বিতীয় জয়দেব পশুপতিনাথকে রৌপ্যনির্মিত সুচারুপদ্ম উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। ঠাকুরী রাজবংশের গুণকামদেব দশম শতাব্দীর শেষভাগে পক্ষকাল ধরে স্বর্ণপাত্রের জলধারায় পশুপতিনাথের স্নানের আয়োজন করেন। শিবদেব ১০৯৮-১১২৬ খ্রীস্টাব্দে রৌপ্যপদ্মসহ বহু বর্ণাঢ্য পুজোপকরণে পশু-পতিনাথের পূজা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শিবমূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নেপালে মল্লরাজবংশীয়েরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। তাঁরা প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন। জয়-সিংহ মল্ল (১২৭১-১২৭৪) পশুপতিনাথকে সুবর্ণনির্মিত 'কোমরবন্ধ' নিবেদন করেছিলেন। এবং বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত একটি সুদৃশ্য রথ তাঁর বিহারকল্পে নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী অনন্তমল্ল পশুপতিনাথ মন্দিরের ছাদ সুবর্ণ-মণ্ডিত করেন এবং মন্দিরে একটি পতাকাশোভিত দণ্ড নির্মিত করিয়ে দেন। ঐ মন্দিরের চার কোণে চারটি স্বর্ণধ্বজ স্তম্ভ তিনি নির্মাণ করান ও নন্দীশ্বরকে সুবর্ণে-মণ্ডিত করেন। ১৪৪১ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতির্মল্ল মন্দিরচূড়াটি সুবর্ণমণ্ডিত করেন। নেপাল অগণিত মন্দিরে শোভিত হলেও পশুপতিনাথ মন্দিরটি উজ্জ্বলতম রত্নবিশেষ যার শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাস্বর জ্যোতি দূর-দূরান্তের ভক্ত-গণকে আকর্ষণ করে আনে। যুগে যুগে যেমন বৌদ্ধ দার্শনিক ও ভিক্ষুদের আবির্ভাব হয়েছে নেপালে, তেমনি বহু শৈব সাধুসন্তের শুভাগমন ও ধর্মপ্রচার হয়েছে এখানে। ভারতের দুই আধ্যাত্মিক গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের

নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পুণ্য উপস্থিতিতে আধ্যাত্মিক ভাববন্যা অভাবনীয়রূপে স্ফীতিলাভ করেছিল। নেপালের হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, পশুপতিনাথ ও গোরক্ষনাথ অভিন্ন। একটি নেপালী-মুদ্রায় গোরক্ষনাথের চরণচিহ্ন মুদ্রিত আছে।

কি স্থাপত্যশিল্প, কি সংস্কৃতি, কি ধর্ম, কি বাণিজ্য—সর্ববিষয়ে ভারতের সঙ্গে নেপালের নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। নেপালই জগতে একমাত্র রাজ্য যেখানে অবিচ্ছিন্ন ধারায় হিন্দুরাজারা রাজত্ব করেছেন। যখন ভারতে মুসলমান আক্রমণের শুরু হয়, তখন বিহার ও বাংলার বৌদ্ধভিক্ষুরা হিমালয়ের ক্রোড়ে নেপালরাজ্যে বসবাসের জন্য চলে আসেন। চলে আসেন অনেক হিন্দুও। নেপাল হয়ে ওঠে তাঁদের নিশ্চিন্ত নীড়, আধ্যাত্মিকতার পাদপীঠ। আসার সময় তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন অমূল্য অনেক পুঁথি। আজ বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু পুঁথি যা ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য, তা সেই সুবাদে সংরক্ষিত হয়েছিল নেপালে। পশুপতিনাথ মন্দির থেকে ২ কি. মি.-র ব্যবধানে বিশাল মনোরম প্রান্তরে দেবী গুহ্যেশ্বরীর মন্দির। এটি প্রসিদ্ধ একান্ন পীঠের অন্যতম। সুশীতল নিবিড় ছায়াসম্পন্ন সুপ্রাচীন বৃক্ষবীথিকার মধ্যে মন্দিরটি। ভিতরে মন্দিরগাত্রে উজ্জ্বল রূপার কারুকার্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রপাঠ করছেন। একটি রৌপ্যাধারে রক্ষিত আছে, সেখানেই পূজাদির ব্যবস্থা হয়। আমরা পূজা ও প্রণাম করলাম।

পরদিন ৭ মার্চ। আমরা সকালে প্রথমে গেলাম কাঠমাণ্ডুর বোধনাথ দর্শনে। বুদ্ধদেবের বিশাল ধ্যানমূর্তি। শত শত নরনারী সুগন্ধি ধূপদীপ প্রজ্জ্বলিত করে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছেন। সন্নিকটে এক উচ্চশীর্ষ স্তূপ। স্তুপের ওপর উঠে দিকচক্রবাল বেষ্টিত চিরতুষারোজ্জ্বল হিমালয়ের নিরাবরণ শুভ্র সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে সম্ভ্রমভরে প্রণত হলাম।

এরপরে আমরা বুড়ো নীলকণ্ঠ দর্শনে গেলাম। কাঠমাণ্ডু থেকে ছয়/সাত কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে একটি জলাশয়ে বিশালকায় অনন্তশয়ন বিষ্ণুমূর্তি আছে। সম্ভবতঃ এই মূর্তি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর। বৌদ্ধভক্তেরা 'নীলকণ্ঠ-লোকেশ্বর' জ্ঞানে তাঁর পূজাদি করেন। সমুদ্রোত্থিত হলাহল পানে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। শৈবরা তাঁকে নীলকণ্ঠ শিবজ্ঞানে পূজা করেন। আবার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুমূর্তিরূপে তিনি বৈষ্ণব ভক্তেরও উপাস্য। একই দেবতা বৌদ্ধ-শৈব-বৈষ্ণব ভক্তের পূজা গ্রহণ করছেন।

এরপরে শ্রীস্বয়ম্ভূনাথ। লিচ্ছবীরাজবংশের রাজা ধর্মদেব স্বয়ম্ভূনাথের বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। সুবিশাল বৌদ্ধচৈত্যটি একটি উঁচু পাহাড়ে (৪,৬১৬ ফিট) অত্যন্ত মনোরম প্রদেশে অবস্থিত। বহুদূর থেকে মন্দিরের সুদৃশ্য গম্বুজটি দেখা যায়। এখানে চৈত্য বা স্তূপোপরি দুটি নেত্র অঙ্কিত দেখা যায়। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ সর্বত্র কৃপাকটাক্ষপাত করছেন।

কাঠমাণ্ডুর চিড়িয়াখানায় হরেক রকমের পাখি, তো আছেই—শিয়াল, সজারু হায়না, কুমীর, চিতাবাঘ, বাঘ, সিংহ সবই আছে।

পরদিন বুধবার ৮ মার্চ, নগরকোটের উদ্দেশ্যে আমরা ভোররাত্রে রওনা হলাম। এর উচ্চতা ৭,১৩৩ ফিট। রজতশুভ্র হিমালয়ের অঙ্গে প্রতিফলিত তরুণ অরুণের রশ্মিপ্রভার বর্ণচ্ছটা প্রত্যক্ষ করতে ভ্রমণবিলাসীরা এখানে আসেন। পথটিও বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে প্রশস্ত সিঁড়ির মতো স্তরে স্তরে পাহাড়ী প্রথায় চাষ করা হয়েছে, সে-চাষ বহুক্ষেত্রেই সরষের। দেখে মনে হচ্ছে, উজ্জ্বল পীতবর্ণের বিরাট তরঙ্গায়িত ভূভাগ, অথবা প্রকৃতির নিত্য উৎসবকে বর্ণবৈচিত্র্যে বরণীয় করতে সোপানাবলীতে হরিদ্রাভ গালিচা শোভিত করা হয়েছে। সে এমনই সৌন্দর্য যে দৃষ্টি ফেরাতে মন চায় না। প্রকৃতির অনাদি অনন্ত শোভার মধ্যে কোথাও একঘেয়েমি নেই। উত্তরে নীলাকাশের প্রেক্ষাপটে চিরতুষারাবৃত হিমশিখর-রাজি পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত অন্নপূর্ণা, মাউন্ট এভারেস্ট, গণেশহিমল, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে দণ্ডায়মান। তারপরেই চীনের সীমানা।

এরপরে ভক্তপুর। এই শহরটি নেপালের প্রাচীন রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ ৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই শহরটি পূজার শঙ্খের আকারে নির্মিত হয়েছিল এবং বহু সুচারু কারুকার্য-প্রকীর্ণ মন্দির এবং অট্টালিকা এই নগরের শোভা-বর্ধন করেছে। ৫৫টি বাতায়নশোভিত 'দরবার-স্কোয়ার' ভূপতীন্দ্রমল্লের অদ্ভুত কীর্তি। এখন এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গোল্ডেন গেট বা সোনার জলে সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত অপূর্ব সুন্দর ফটক দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখা যায় একটি শিবমন্দির। আরও অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় পশুপতিনাথ মন্দির। লাল দেওয়ালের গায়ে কৃষ্ণদারুময় সূক্ষ্ম কারুকার্যে পূর্ণ বাতায়ন ও দ্বারশোভিত মন্দির যা দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে আজও অক্ষত সুদৃশ্য। কাঠ-মাণ্ডুর পশুপতিনাথের মতো মূর্তি এখানেও। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে নৃপতি জিতমিত্রমল্ল এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এর সামনে গণেশের মন্দির। নিকটেই লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। এখানে ব্রোঞ্জের একটি সুবিশাল ঘণ্টা আছে। 'Bell of Barking Dogs' এর নাম। রাজপ্রয়োজনে এবং দেবার্চনায় যখন ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন কুকুররাও ঐ ঘন্টার তালে তালে ডেকে উঠত। তাই ঐ নাম। মন্দিরের সামনে রাজা ভূপতীন্দ্রমল্লের সুবর্ণ রঞ্জিত মূর্তি বিরাজমান। সুন্দর কারুকার্যখচিত একটিমাত্র দীর্ঘ প্রস্তরে তৈরি স্তম্ভের ওপর সিংহাসনে রাজছত্র শোভিত নৃপতি দেবোদ্দেশে সভক্তি জোড়হস্তে উপবিষ্ট। তাঁর হাতের আঙুলে অঙ্গুরীয়টিও সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। মনোহর সূক্ষ্ম কারুকার্য ও স্থাপত্যশিল্প নিদর্শনের জন্য এই রাজদরবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

এরপর আমরা এলাম পাটনে যার আর এক নাম ললিতপুর। এখানে একটি চমৎকার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির আছে। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন পুরীধামের সুসজ্জিত বিশালরথটি দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির-চূড়াও অবিকল পুরীর মন্দিরের মতো। মন্দিরের দ্বিতলে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, হাতে সোনার বাঁশী। দুপাশে রুক্মিণী ও সত্যভামা। মন্দিরের সামনে মসৃণ পাথরের স্তম্ভের ওপর পদ্ম। তার ওপর উজ্জ্বল স্বর্ণগড়ুড় করজোড়ে বীরাসনে সংস্থিত। ভক্তপুরের মতো এখানেও 'দরবার-স্কোয়ার', নৃত্যশালা প্রভৃতিতে অনুপম দারুশিল্প, কারু-শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। বহু ইউরোপীয় দর্শনার্থীও ঘুরে ঘুরে দেখছেন।

৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি। প্রত্যূষকাল হতেই আমরা অন্তরের প্রেরণায় অনেকগুলি ভজন করে ধূপ দীপ নৈবেদ্য নিবেদন করলাম তাঁকে। আড়ম্বর-হীন, আয়োজনহীন একটি নির্মল প্রশান্তিতে সেদিন আমাদের মন ভরে উঠেছিল। ঐদিন রাতে আমরা পোখরার উদ্দেশ্যে বাসে যাত্রা করলাম। পোখরার অর্থ হ্রদ। সারারাত ধরে বাসে যাওয়ার ফলে পথের সৌন্দর্য কিছুই দেখতে পাইনি। এটা একটা মস্ত বড় বঞ্চনা। তবে ভোর হতেই দেখি, শাশ্বতকালের বিস্ময়, মহাযোগী, ধ্যানমৌন হিমালয়ের অমল ধবল শৃঙ্গগুলি অবর্ণনীয় শোভা ধারণ করে আবির্ভূত। ধৌলাগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, মাউন্ট এভারেষ্ট প্রভৃতি বহু শিখর দৃশ্যমান এখানে। নেপালের সুবিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গটি, যার অদ্ভুদ নাম হলো মচ্ছপুচ্ছরে—ইংরেজীতে বলা হয় Fishtail, এখানে দেখতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুচ্ছের সাদৃশ্যহেতু এই নাম। দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য পিপাসু নর-নারী, পর্বতারোহীরা এখানে সৌন্দর্য শান্তি ও আনন্দলাভের আশায় আসেন। ঐদিন অর্থাৎ শুক্রবার বেলা দু-টো নাগাদ আমরা বাসে করে 'ফেওয়া' নামে পোখরার বিখ্যাত হ্রদটি দেখতে গেলাম। হিমালয়ের সানুদেশে এই হ্রদটি পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ এবং ঐ দ্বীপে একটি মন্দির আছে। বারাহীদেবী সেখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেকে নৌকারোহণে ঐ মন্দিরদর্শনে যাচ্ছেন এবং হ্রদের নীলজলে সুদৃশ্য নৌকায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন। আমি হ্রদের ধারে বসে অপার্থিব শোভা নির্বাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। সঙ্গিনীর ডাকে চমক ভাঙল, ব্যথাতুর হৃদয়ে পোখরাকে বিদায় জানিয়ে ফিরতে হলো। পরদিন ১০ মার্চ বারাণসীর পথে আমাদের রওনা হতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

(১৮৩৬-১৮৮৬)

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের ৩০২ বৎসর পরে, কবি রামপ্রসাদের মৃত্যুর ৬২ বৎসর পরে এবং রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হুগলী জেলায় কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি রামপ্রসাদের মৃত্যুর তারিখ ঠিকমতো জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এইরূপ—যে-বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ খ্রীঃ-কেই রামমোহনের জন্মতারিখ বলিয়া ধরা গিয়াছে। প্রবাদ সত্য হইলে, ঐ বৎসর কিংবা তার কাছাকাছি কোন এক বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমান করা যায়।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ও প্রধান গুরু একজন ভৈরবী। তাঁহার নাম যজ্ঞেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে যোগমায়ার অংশ বলিতেন। তিনি অনেক শাস্ত্র জানিতেন, যেমন বিদুষী ছিলেন তেমনি অসামান্যা রূপবতীও ছিলেন। তাঁহার বয়স ৩৫ হইতে ৪০ অনুমান করা গেলেও দেখিতে আরও অল্পবয়স্কা বলিয়া মনে হইত। তান্ত্রিক-সাধনার সমস্ত রহস্য তিনি জানিতেন। ৬৪খানা তন্ত্র হইতে যত রকমের সাধনা আছে, তা সমস্তই একে একে যুবক রামকৃষ্ণকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গীভূত যে মধুর ভজন,—তাও ভৈরবীর নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। তোতাপুরী প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি ভৈরবীর মনঃপুত হয় নাই ; কেন-না তিনি বলিয়াছিলেন—উহাতে ভক্তির হানি হয়। ভক্তিপন্থীদের এই অভিমত প্রাচীন এবং সর্বজনবিদিত।

ভৈরবীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এক আকস্মিক ঘটনা। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের কথা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের পরেই ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং প্রকাশও করিলেন। ভৈরবী বলিলেন ঃ

"এই তো গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৭৫)

শ্রীমথুর, রানী রাসমণির জামাতা, একথা মানিল না। ভৈরবী পণ্ডিতদের ডাকাইতে বলিলেন,—পণ্ডিতেরা আসিয়া সভা করিয়া বসিল। ভৈরবী যেমন সংস্কৃতভাষা খুব ভাল জানিতেন, তেমনি কঠিন শাস্ত্র-বাক্যসকল ব্যাখ্যা করিতেও অতিশয় নিপুণা ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের চোখে আঙ্গুল দিয়া—প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে রাগাত্মিকা ভক্তি-পথে যে মহাভাবের কথা আছে, সেই মহাভাবের চিহ্নসকল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে বিদ্যমান। ব্রজে এই মহাভাব শ্রীরাধিকার, এবং নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের হইয়াছিল। সুতরাং এই মহাভাবের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার-পুরুষ। ইহাই শাস্ত্রের প্রমাণ।

এই ঘটনার ১৪ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং পুরা ২০ বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের নিকটে আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আজও সে-সকল ভক্তেরা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার ফোটো ও তৈলচিত্রাদিকে রীতিমত ভোগ-রাগাদি দিয়া পূজা ও অর্চনা করেন, তাঁহাদের কর্তব্য—বাঙালীর গত শতাব্দীর এই নব্য নর-পূজার প্রথম প্রবর্তনকারিণী, অতি অদ্ভুত ক্ষমতাশালিনী, ভৈরবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে মস্তক অবনত করা। এই মহীয়সী মহিলার চিরপূজ্য মহিমাকে, এক স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত, অপর কেহ এতাবৎ যথেষ্ট সম্মান দেন নাই। কিন্তু এখন দেওয়া কর্তব্য।

আচার্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাস যেমন চৈতন্য-দেবকে অবতারের সিংহাসনে হুহুংকারে আহ্বান করিয়াছিলেন.—ভৈরবী শ্রীযজ্ঞেশ্বরীও তেমনি সিংহিনীর মতোই পণ্ডিতদের সহিত তর্ক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে, এক সঙ্গে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্তির প্রকাশে যেমন রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতারত্ব শ্রীচৈতন্যে সংক্রামিত ও আরোপিত হইয়াছে তেমনি ভৈরবীও শ্রীরামকৃষ্ণে যুগপৎ—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতারত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভৈরবী অর্থে সাধারণতঃ বুঝি তান্ত্রিক সাধনের সাধিকা—সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে আরোপ করিলেন যে অবতারবাদ তাহা বৈষ্ণবীয়। ইহা অতিশয় অদ্ভুত, তার কারণ ভৈরবী অসাধারণ।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের পরেই, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়াছেন। ঈশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ করিয়া বাংলাদেশের কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে অবতরণ করিয়াছিলেন কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষ হইয়া জন্মিতে পারিবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুতরাং তাঁহার মানুষ হইয়া জন্মিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। ঈশ্বরের মানুষ-রূপে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে—বাংলাদেশের ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশেষ প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। ইতিহাসের যোগসূত্র ঠিক আছে, ছিন্ন হয় নাই।

॥ ৩ ॥

কবি রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটা যোগের কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—ইতিহাস-পথে মহা-পুরুষদের আগমনের পূর্বে তার আভাস পাওয়া যায়। মহাপুরুষেরা যেন রূপ, আর কবিরা যেন সুর। সুর আগে আসে। রূপ পরে আসে। সুর আসিলেই বুঝিতে হইবে যে রূপ আসিতেছে। চিত্তরঞ্জন দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যেমন দেখ, চণ্ডীদাসে সুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্যে সেই সুরকে প্রাণময় করিয়া জীবন্ত রূপ। ঠিক তেমনি রামপ্রসাদে সুর, আর তার পরেই, রামপ্রসাদের সুরের অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের সুস্পষ্ট অভিমত যে, যাহা রামপ্রসাদে সুর, তাহাই রামকৃষ্ণে রূপ।

কবিকল্পনার বাহুল্য সত্ত্বেও, কথাটি ইতিহাস আলোচনার অভিজ্ঞতারূপেই অর্জিত হইয়াছিল। কাজেই অবহেলার বস্তু নয়।

॥ ৪ ॥

রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনার কালে, যেন রাজা রামমোহনকে অতর্কিতে অথবা সন্তর্পণে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া হইল, মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের অভিপ্রায় নয়।

রামপ্রসাদের সহিত রামমোহনের একটা যোগ ছিল, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন একথা প্রথম বলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দীনেশবাবুর কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোন যোগ নাই। ইহা লইয়া এককালে অনেক হইয়া গিয়াছে। তা যাক। কিন্তু রামমোহন ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিতে বসিয়া রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতকে বহুস্থানে অনুকরণ যে করিয়াছেন, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন "অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তাঁর বোধ।" রামমোহন অনুকরণে বলিলেন—"অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ" অথবা "অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ।" 'অজপা' ঠিক আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন—"অদ্য অব্দে শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে।" রামমোহন অনুকরণ করিলেন—"অবশ্য তেজিতে হবে কিছু দিনান্তর"। 'অবশ্য' ঠিক আছে। এই রকমের আরও দৃষ্টান্ত খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা গেল রামমোহন প্রসাদী-শ্যামা-সঙ্গীত অতিশয় অভিনিবেশসহকারেই পাঠ করিয়াছিলেন। "ধাতু পাষাণ মাটি মূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে?" রামপ্রসাদের একথাটাও রামমোহন গভীরভাবেই অনুধাবন করিয়াছিলেন। "তারা আমার নিরাকার প্রসাদীসঙ্গীতে এও তো

রামমোহন দেখিয়াছেন? কিন্তু "কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে"র সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ যে কালীর "প্রতিমূর্তিকে মনে কল্পনা করিতেন" এবং "বাহ্যেতেও প্রতিমা নির্মাণ করিয়া" পূজা করিতেন, ইহাও তো রামমোহন জানিতেন।

মূর্তিপূজা—মানসিক-রূপকল্পনা এবং নিরাকারা—এ তিন অবস্থাই যে রামপ্রসাদের "মনোময় যন্ত্রে"—একত্রে বিরাজ করিত, ইহা রামমোহন নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন। অতবড় ধর্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা জগতের বিবিধ, বিচিত্র ধর্মগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ যিনি সর্বপ্রথম করিলেন, তিনি রামপ্রসাদের মনের ও ধর্মানুভূতির তিনটি স্তর অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। কেননা, বিভিন্ন ধর্ম-সকলের শ্রেণীবিভাগে এই তিনটি স্তর সর্বত্রই রামমোহন স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ (১) কি মানস-মূর্তি অবলম্বন করিয়া (২) কি হস্ত নির্মিত মূর্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে"। (ব্রাহ্মণসেবধি) রামমোহন-সাকারের পক্ষপাতী নহেন, নির্গুণ নিরাকারের পক্ষপাতী। সাধারণ ব্রাহ্মেরা সগুণ নিরাকারের উপাসক। কিন্তু কি রামপ্রসাদ, কি শ্রীরামকৃষ্ণে নির্গুণ নিরাকার উপাসনা প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের কাছে রামমোহনের অভিপ্রায় অনুযায়ী "এসকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই।" এইখানেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এবং রামপ্রসাদের সুর—রামমোহনে নয়, পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ পাইয়া প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই কথাই মনে করাইয়া দেয়।

রাজা রামমোহন হইতে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণে পার্থক্য বুঝা গেল। রামমোহনে প্রত্যেক ধর্মের নিম্নস্তরগুলিকে বর্জন করিবার উপদেশ আছে। রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণে ধর্মের নিম্নস্তরগুলি বর্জনের কথা নাই। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব দুইজন শানাইদারের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, "একজনে পোঁ ধরিয়া সুর দিতে হয়। / অপরে বাজায় রাগ-রাগিণীনিচয়॥ / পোঁ ধরা এ ব্রাহ্মধর্ম একসুর তায়। / হিন্দুয়ানী নানা রাগরাগিণী বাজায়॥" (রামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ২৯৪)। বাংলা সাহিত্যে এমনি সহজ উপমা দিয়া কথা বলিবার ধরন শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম প্রচলন করিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দুই মহাপুরুষ হইতে গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে দুইটি আধুনিক ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা প্রত্যক্ষ। এই দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-দল আছে, সুতরাং দলাদলিও আছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নয়। রামমোহনের সম্প্রদায় মূর্তিপূজা-বিরোধী, এবং তাহাতে জাতিভেদ নাই। রামকৃষ্ণের সম্প্রদায় মূর্তিপূজক এবং তাহাতে জাতিভেদ আছে। রামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসীদের মধ্যে না থাকিলেও গৃহীদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। এইখানেই ভেদ বা পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কিন্তু রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণে যে এক অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে, তাহা উভয়েরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। চারিত্র-পূজার দিনে, মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

রাজা রামমোহন তাঁহার অমানুষিক প্রতিভাবলে জগতের বিবিধ ধর্মগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরে তাহাদের মধ্য হইতে সাধারণ সত্য বাহির করিয়া, উচ্চ ও নীচভেদ করিয়া ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু রামমোহনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা ধর্মবিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অশেষপ্রকারে সম্মানিত করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ মুলারের নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অতি উগ্র ও তীব্র বিশ্বগ্রাসী ধর্মপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য, যতগুলি পৃথক পৃথক ধর্ম হাতের কাছে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই নিজ জীবনে আচরণ ও অনুভূতি দ্বারা আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। নারীভাবেও সাধন করিয়াছেন, হনুমান-ভাবেও সাধন করিয়াছেন, এমন-কি কর্তা-ভজাদের দলে গিয়া মিশিতেও তাঁহার আপত্তি হয়

নাই। মুসলমান-ধর্ম সাধনকালে কোনরূপ মূর্তির কাছ দিয়াও তিনি যান নাই—দেখা বা পূজা করা তো দূরের কথা। দাড়ি রাখিয়াছেন, কাছা দেন নাই, মসজিদে গিয়া (ভাগিনেয় হৃদয়ের ভয়ে) লুকাইয়া নমাজ পড়িয়াছেন—অবশেষে এমন-কি সেই অর্ধ-উন্মাদ ব্রাহ্মণ গোমাংস ভক্ষণের জন্য পুনঃপুনঃ দারুণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মথুর (রাসমণির জামাতা) নানা অছিলায় তাঁহাকে গোমাংস খাইতে দেন নাই। নতুবা খাইতে তাঁহার কোন আপত্তিই ছিল না।

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন দিক হইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণে কি সাদৃশ্য নাই ?

॥ ৬ ॥

এক্ষণে ধর্মজগতের উন্নত ও আধুনিক মনোভাব হইতেছে এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতা নয়, সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। শুধু অপর ধর্মের প্রতি নয়, অপর ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইবেন। মুসলমান হিন্দুর নিকট ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না। রামমোহনের "প্রার্থনা পত্রের" ছত্রে ছত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

অপর ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে রামমোহন লিখিতেছেন ঃ "ভ্রাতৃভাব আচরণ করা কর্তব্য," "অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য", "বিরোধীভাব কর্তব্য নহে" ইত্যাদি। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মকেই নমস্কার করিয়া, রামমোহন প্রবর্তিত দেবেন্দ্র-কেশব পরিচালিত ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধেও বলিয়া গিয়াছেন ঃ

> "যতবিধ আছে ধর্ম সবে নমস্কার॥
> ইদানীং ব্রাহ্মধর্ম যাহা ছড়াছড়ি।
> ইহাকেও বার বার নমস্কার করি" ॥
> (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২৯৪)

সুতরাং রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণে সাদৃশ্য আছে বই কি। নাই বলা চলে না।

॥ ৭ ॥

এযুগের ধর্ম শুধু পারমার্থিক ব্যাপার নয়, ঐহিকেরও প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শুনি, বলিয়া গিয়াছেন, "যে ভগবান আমাকে পৃথিবীতে খাইতে দিতে পারেন না, তিনি যে পরকালে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, তা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি ?" বিশ্বাস করা কঠিন।

শ্রীচৈতন্যদেব মুসলমান, নারীজাতি ও অবনত শ্রেণীকে একত্রে তাঁহার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে টানিয়া আনিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। ফলে অনেক খ্যাতনামা মুসলমান বৈষ্ণব হইয়াছিল। নারীজাতি ও অবনত শ্রেণীও বৈষ্ণব হইয়া ধন্য হইয়াছিল। মুসলমানের বৈষ্ণব হওয়ার কোনই বাধা ছিল না।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মে মুসলমান ও অবনতশ্রেণী আসিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের নব্য হিন্দুধর্মেও মুসলমান বা অবনতশ্রেণী নাই। এই দুই ধর্মেই একটা পারমার্থিক সহানুভূতি অপর ধর্মের প্রতি থাকিলেও, ব্যবহারিক জগতে তার ফল কিছুই বেশি দেখা যায় নাই।

যদি মুসলমানধর্মাবলম্বী, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু অবনত শ্রেণী ও নারীজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম নবযুগের জাতীয়তাবোধসম্পন্ন একটা সহানুভূতির ভাব ও তার ফলে জাতীয় একতাবোধ না আনিতে পারে, তবে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের অত কাছে এবং এত দীর্ঘকাল থাকিবার পরেও, তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের "কামকাঞ্চন লোভ" দূর হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জন্মিলেও, আমাদের জাতীয় ভাবে উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই তো আশঙ্কা হয়। চারিদিকের অবস্থা কোনমতেই আশাপ্রদ বলিয়া তো মনে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জাতীয় জাগরণের পূর্বাভাস। স্বামী বিবেকানন্দ এই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আমরাও সেই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিব। এছাড়া অবতার-পুরুষকে দেখিবার এযুগে আর অন্য পথ নাই।*

* শনিবারের চিঠি, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪২, পৃঃ ৬৪১-৬৫০

আমেরিকায় রোগীর অধিকার

রোগী নিজের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে চায় ডাক্তারের কাছে, কিন্তু তার বেশির ভাগই তাকে জানতে দেওয়া হয় না তথাকথিত 'রোগীর স্বার্থে'। এই ব্যাপারে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে 'নিউ ইয়র্ক কোর্ট অফ অ্যাপিলস' অভিমত দিয়েছিল ঃ "প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমনা লোকের তার নিজের দেহটিকে নিয়ে কি করা হবে, তা জানার অধিকার আছে।" আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রোগীর 'সম্মতি' (consent) না নিয়ে ডাক্তার কোন কিছু করলে রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে পারে। তবে রোগীর অধিকারগুলি আমেরিকার সব রোগী জানে না। রোগীর কি কি অধিকার আছে তা এখানে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) **চিকিৎসাপদ্ধতি ঠিক করার অধিকার**—পূর্বের বহু মামলায় এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, রোগীদের পূর্ণ সম্মতি ছাড়া চিকিৎসক তাদের ওপর কোন চিকিৎসাই চালাতে পারেন না। 'সম্মতিদান' ব্যাপারে ভোট নেওয়া হলে দেখা গিয়েছে যে, ৫৯ শতাংশ ডাক্তারের মত হচ্ছে যে, কেবল রোগীদের অবস্থা ও কি চিকিৎসা পাচ্ছেন তাই জানানো ; তাঁরা 'সম্মতিদান' কথাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

তা সত্ত্বেও রোগীরা যা চিকিৎসা পাচ্ছে তার বদলে অন্য ধরনের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার তাদের আছে। এর অর্থ এই নয়, যে-ওষুধে ডাক্তার বিশ্বাস করেন না, রোগীর ইচ্ছায় তা-ই তাকে দিতে হবে। ডাক্তারকে তা-ই করতে বাধ্য করলে, তাতে ডাক্তারের অধিকারে হাত দেওয়া হবে। যদি রোগী তার ডাক্তারের দেওয়া চিকিৎসা নিতে না চায়, তাহলে কি ডাক্তার চিকিৎসা বন্ধ করে দেবেন ? না, তা নয়। আমেরিকার আইন অনুযায়ী, রোগী যতক্ষণ না অন্য ডাক্তারের হাতে পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আগের ডাক্তারকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

হাসপাতালে ভর্তি রোগীর এক্স-রে করা, পারগেটিভ খাওয়া, বারে বারে দেহে সূচ ফোটানো—এসবে রোগীর অসম্মত হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু বেশির ভাগ রোগী তা করতে সাহস পায় না। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতি ১০০ জনের চিকিৎসাকালে পাঁচ শতাংশেরও কম রোগী ডাক্তারের অনুমোদিত চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেছে। সাধারণতঃ রোগীদের ইচ্ছা ডাক্তার ও নার্সকে খুশি করা। এমনকি মানসিক হাসপাতালের রোগীদেরও চিকিৎসা না নেবার অধিকার আছে। যেসব মানসিক রোগের ওষুধে শরীরে অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি করে, সেগুলি না নেবার খানিকটা অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীদের ডাক্তারদের বোর্ডে প্রমাণ দিতে হয় যে তাদের ওষুধ সম্বন্ধে মতামত দেবার মতো মানসিক অবস্থা আছে।

(খ) **চিকিৎসাসংক্রান্ত কাগজপত্র (রেকর্ড) দেখার অধিকার**—এটাকে বলা যেতে পারে সত্যকে জানবার অধিকার। কিন্তু ডাক্তার বা হাসপাতাল ঐ সব রেকর্ড দেখতে দিতে চান না। মাত্র ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন' (এ. এম. এ.) বলেছে যে, রোগী দেখতে চাইলে তাকে রেকর্ড দেখানো উচিৎ। কিন্তু আমেরিকার ১৫টি স্টেট-এ ডাক্তারের রেকর্ড দেখানো এবং ২৩টি স্টেট-এ হাসপাতালের রেকর্ড দেখানো বর্তমানে আইন-স্বীকৃত। কিন্তু এর জন্যও রোগীকে বেশ লড়তে হয়। ডাক্তাররা বলেন যে, রেকর্ড দেখলে রোগীর বরং ক্ষতিই হবে। কিন্তু চারটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে মত

পাওয়া গেছে যে, রেকর্ড দেখালে ফল বরং ভালই হয়। যদি রেকর্ডে খারাপ খবরও থাকে, সে বিষয়ে 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন'-এ কয়েকজন মতপ্রকাশ করেছেন: "অজানাকে জানার ব্যগ্রতা, জানা খবরে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে বেশি মানসিক বিপর্যয় আনে।"

(গ) **সুবিবেচক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার দাবি**—অনেকসময় রোগীকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, ভিতরের ঘরে পোশাক খুলতে বলা হয়, ডাক্তার রোগীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পরীক্ষা করেন। রোগীকে এমন ধরনের কথা বলেন যে, রোগী যেন ছেলেমানুষ ইত্যাদি। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, যেসব ডাক্তার ভদ্র ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেন না তাঁদের পরিহার করাই ভাল। কারণ ডাক্তারকে ভদ্র ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে বাধ্য করার মতো কোন আইন নেই। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আইনের আওতায় পড়ে। রোগীর ব্যাপারটি একেবারে নিজস্ব (private) হলে রোগীর অবস্থা অন্যকে বলে দিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

(ঘ) **হাসপাতালে চিকিৎসা পাবার অধিকার**—উপযুক্ত পরিমাণে টাকা না থাকলে বা রোগীর ইনসিওর (বীমা) করা না থাকলে প্রাইভেট হাসপাতালে ইমার্জেন্সী রোগীকে নেওয়া হয় না, সরকারি হাসপাতালে যেতে বলা হয়। এখন প্রায় বেশির ভাগ ইমার্জেন্সী হাসপাতাল 'মেডিকেয়ার ও মেডিকেড' সংস্থার আওতার অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রায় সবগুলিই এখন বর্তমান আইনানুযায়ী সব ইমার্জেন্সী রোগীকে নিতে বাধ্য—রোগীর টাকা থাক আর না থাক।

(ঙ) **মৃত্যুর অধিকার**—এ. এম. এ. পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক ভোটে দেখা গেছে যে, যেসব রোগীর মৃত্যু হবেই, তাদের আত্মীয়রা যদি অনুরোধ করে, তাহলে ৭৩ শতাংশ আমেরিকাবাসী চান ঐ রোগীদের ওষুধপত্র বন্ধ করতে। বহু বড় বড় ডাক্তার পত্রিকায় লিখছেন যে, ওষুধের দ্বারা ঐসব রোগীকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা নিষ্ঠুরতা, এবং নীতির দিক থেকে ঐ রোগীদের ওষুধ বন্ধ করা উচিৎ। অনেকগুলি মামলায় রোগী বা তার লোকেরা ওষুধ বন্ধ করার দাবির মামলায় জিতেছে। ৩৮টি আমেরিকান স্টেট-এ রোগী আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার চিকিৎসা পাবে কিনা, সে ব্যাপারে আইনতঃ খানিকটা অধিকার রোগীকে দেওয়া হয়েছে। এইসব আইনে বলা হয়েছে যে, রোগীদের মানসিক অবস্থা ঠিক থাকাকালীন তারা যেন এবিষয়ে লিখিত নির্দেশ দেয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি বিষয় এসে যাচ্ছে। এবিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিচ্ছেন যে, প্রত্যেককে বছরে একবার করে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ যে, তাকে প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস সহায়ক যন্ত্রে (respirator) রাখা হবে কিনা।

(চ) **প্রশ্ন করার অধিকার**—এটি ছোট কথা, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে চিকিৎসা-পদ্ধতি নিরূপণে অংশীদার হওয়া। কিন্তু বহুকাল ধরে ডাক্তারের মত হচ্ছে, "ডাক্তারই সবচেয়ে ভাল জানেন", এবং তাঁদের অধিকাংশই রোগীর প্রশ্ন করা পছন্দ করেন না। রোগীর অধিকার সম্বন্ধে যতকিছু বলা হোক না কেন, আমেরিকান হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন্স পেসেন্টস বিল এবং আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর জুডিসিয়্যাল কাউন্সিল যেসব আইন বা নিয়ম করেছে সেগুলির বলে ডাক্তার ভাল বুঝলে খবর চেপে রাখতে পারেন।

আমেরিকার মানুষেরা মনে করছেন, এ-ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা দরকার। আইন রোগীকে নিজের সম্বন্ধে জানার অধিকার দিচ্ছে। এর দ্বারা কতটা জানা, কতটা প্রশ্ন করা বোঝায়?*

*Span, February 1990, pp. 6-7

জলধিকুমার সরকার

জ্বরের সঙ্গে পরিচিত নয়, এরূপ লোক বিরল। এর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত বলেই একে আমরা হালকাভাবে নিই ; অবশ্য জ্বর হলে সবাই উদ্বিগ্ন হই। জ্বর অবশ্যই একটা অসুখ (অ-সুখ বা dis-ease), কারণ এতে শরীরের সুখভাব বা স্বস্তি নষ্ট হয়। তবে টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়ার মতো জ্বর একটি সংজ্ঞাবদ্ধ অসুখ নয়, বিভিন্ন রোগের একটা সাধারণ লক্ষণমাত্র। অর্থাৎ জ্বরের পিছনে লুকিয়ে আছে জ্বরের সত্যিকারের কারণ। এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা করতে হলে আগে জানতে হবে জ্বর বলতে কি বোঝায় এবং জ্বর কেন ও কিভাবে হয়।

সাধারণ ভাষায় জ্বর বলতে বোঝায় গা গরম হওয়া, অর্থাৎ শরীরের ত্বকের উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়া। এরূপ বলার মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে—একজন গায়ে হাত দিয়ে 'তাপ বেড়েছে' বলতে পারে, অন্যে 'বাড়েনি' বলতে পারে। আবার কারো কারো মনে হতে পারে যে, তার জ্বর হয়েছে, কিন্তু অন্য কারণে হয়তো তার ঐরূপ মনে হয়েছে। এরূপ অবস্থা এড়াবার জন্য আমরা তাপ মাপার যন্ত্র থারমোমিটার ব্যবহার করি। থারমোমিটারের ধাতুনির্মিত অংশের মধ্যে পারদ থাকে যার আয়তন শরীরের তাপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পারদ ভিতরের কূপ থেকে ফাঁকের মধ্য দিয়ে কাঁচ অংশে চলে আসে, এবং কাঁচের কোন্ দাগ পর্যন্ত উঠল (অর্থাৎ পারদের আয়তন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে—অপরোক্ষভাবে ত্বক হতে কতটা উত্তাপ পেয়েছে), তা দেখে কতটা জ্বর হয়েছে বলতে পারা যায়। থারমোমিটারের ধাতুনির্মিত ও কাঁচনির্মিত অংশের সন্ধিস্থলের ফাঁকটি অত্যন্ত সংকীর্ণ করে তৈরি করা হয়, যাতে উত্তাপের প্রভাবে উপরে-উঠা পারদস্তম্ভ নিজের ভারে ধাতুনির্মিত অংশে ফিরে যেতে না পারে। সেজন্য ব্যবহারের পূর্বে থারমোমিটারকে ঝাঁকিয়ে পারদস্তম্ভকে অন্ততঃ ৯৮° ডিগ্রীর নিচে নামিয়ে নিতে হয়। বিভিন্ন থারমোমিটারের কাঁচে দুভাবে ভাগ করা থাকে—সেন্টিগ্রেড (C) এবং ফারেনহাইট (F) মাত্রায়। একই তাপমাত্রাকে দুভাবে প্রকাশ করা মাত্র। 'সেন্টিগ্রেড', 'ফারেনহাইট'—এগুলির অর্থ কি ? জল জমে বরফ হয় এবং উত্তাপে বাষ্প হয়। সেন্টিগ্রেড মাপে বরফ হবার তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রী (0°) এবং বাষ্প হওয়ার তাপমাত্রাকে ১০০ ডিগ্রী (১০০°) ধরে মধ্যবর্তী তাপকে ১০০ ভাগ করলে ১° সেন্টিগ্রেড (১°C) হয়। ফারেনহাইট মাপে বরফ হওয়ার তাপমাত্রাকে ৩২ ডিগ্রী এবং বাষ্প হবার তাপমাত্রাকে ২১২ ডিগ্রী ধরে মধ্যবর্তী তাপকে ১৮০ ভাগ করলে এক এক ভাগ হবে ১°F। অঙ্কের মাধ্যমে সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে এক থেকে অন্যে রূপান্তরিত করা যায় [$C^\circ = \frac{5}{9} (F^\circ - ৩২)$]। আগেকার দিনে সব থারমোমিটারই ফারেনহাইট মাপে থাকত ; এখন কোন কোন থারমোমিটারে সেন্টিগ্রেড মাপ থাকে। জ্বর মাপার থারমোমিটারকে 'ক্লিনিক্যাল থারমোমিটার' বলে। কারখানায় বা অন্যত্র ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নানারকম থারমোমিটার আছে, যেগুলিতে বিভিন্ন মানের তাপমাত্রা মাপা যায়।

শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা

প্রথমেই জানা দরকার যে শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির (অরগ্যান বা organ, যেমন যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি) কার্য চালু রাখার জন্য উত্তাপশক্তির প্রয়োজন, এবং এই উত্তাপশক্তি রক্তবাহিত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাগালে আসে। খাদ্যদ্রব্য হজম হবার সময় যে শক্তি (energy)-র সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবটাই শারীরিক উত্তাপাকারে পরিবর্তিত হয় ; ২০—২৫ শতাংশ মাত্র মাংসপেশীর কাজের জন্য ব্যয়িত হয়। হজম হবার সময় খাদ্যদ্রব্য চূর্ণিত হবার ফলে শরীরের মধ্যে উত্তাপ তৈরি হয়েই চলেছে। ৬০ শতাংশ উত্তাপ নষ্ট হয় বিকীরণের (radiation) মাধ্যমে, ১৫ শতাংশ হাওয়ার সংস্পর্শে, বাষ্পীকৃত (evaporation) হয়ে নষ্ট হয় ২২ শতাংশ এবং

অন্যান্য জিনিসের সংস্পর্শে ৩ শতাংশ। ত্বক এবং ফুসফুস (নিঃশ্বাস)-এর মাধ্যমে আধলিটারের কিছু বেশি (৬০০ মিলিলিটার) জল বাষ্পাকারে শরীর থেকে প্রতিদিন বার হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, শরীর থেকে ঘণ্টায় ১২—১৬ ক্যালরি উত্তাপ নষ্ট হয়।[১] ত্বক ও চর্বির নিচের মাংসপেশী ও ভিতরের অরগ্যানগুলির উত্তাপকে 'আভ্যন্তরীণ উত্তাপ' (core temperature) বলে, যার পরিবর্তন সাধারণতঃ হয় না বললেই চলে (±১°F); বাইরের ৫৫°F ঠাণ্ডায় অথবা ১৪০°F গরমেও আভ্যন্তরীণ উত্তাপের পরিবর্তন হয় না। শরীরের মধ্যে অতি সুন্দর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকার জন্য এটি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ত্বকের তাপমাত্রা (surface temperature) পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় খুবই পরিবর্তনশীল। সেজন্য বগলে থারমোমিটার দেওয়া কোন কারণেই উচিত নয়, কারণ ঘর্মাক্ত শীতল ত্বক বা বাইরের ঠাণ্ডা-গরম আবহাওয়ায় ত্বকের তাপকে প্রভাবিত করার ফলে থারমোমিটারের পারদের স্ফীতিকে প্রভাবিত করে।

সকল লোকের তাপমাত্রা সমান নয়, ৯৭°—৯৯°F হতে পারে। তবুও সাধারণ (normal) তাপমাত্রা অধিকাংশক্ষেত্রে ৯৮°—৯৮.৬°F (৩৬.৭°—৩৭°C) ধরা হয়—যদি থারমোমিটার মুখে জিহ্বার তলায় রাখা হয়। যদি মলদ্বারে থারমোমিটার রাখা হয়, তাপমাত্রা ০.৬°—১°F বেশি হয়। খুব ছোট শিশুদের বা রোগীর অজ্ঞান-অবস্থায় মলদ্বারে থারমোমিটার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। জিহ্বার তলায় থারমোমিটার রাখা হয় এইজন্য যে, বাইরে থেকে আসা প্রশ্বাসের হাওয়া মুখের মধ্যে ঢুকে যেন থারমোমিটারকে প্রভাবিত না করতে পারে। তবে মুখে থারমোমিটার দেওয়ার আগে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে মুখ ধোওয়া বা ঠাণ্ডা কিংবা গরম পানীয় যেন না খাওয়ান হয়, কারণ ঐ রকম কিছু খেলে, মুখের মধ্যের তাপ আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসতে একটু সময় নেয়। থারমোমিটারের গায়ে '½ মিনিট' লেখা থাকলেও জিহ্বার তলায় ১—২ মিনিট রাখাই ভাল।

শরীরের আভ্যন্তরীণ উত্তাপকে এক মাত্রায় রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা (ইনসুলেটিং সিস্টেম) আছে, তার মধ্যে ত্বকের নিচে চর্বির স্তরই প্রধান; অবশ্য এটি ত্বকের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিকে বাধা দিতে পারে না। অনেকেই জানেন যে, যাঁদের মেদবহুল শরীর তাঁদের শীত কম লাগে। তার কারণ বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তাঁদের শরীরের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ কম নষ্ট হয়। শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় চর্বির উত্তাপ-বহন ক্ষমতা (heat conduction) এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। শরীরের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি ও বাইরের আবহাওয়ায় সেই উত্তাপ নষ্ট হওয়া—এই দুটি প্রণালী সবসময়েই চলছে। উত্তাপ তৈরি হওয়ার পর তা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে, এবং বিশেষ প্রকার স্নায়ুশিরা (সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী (arterioles)-কে প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত করে ত্বকের রক্ত-সরবরাহকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এইভাবে বাইরের ঠাণ্ডা-গরম আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যাতে শরীরের উত্তাপ নষ্ট না হয়, সেজন্য রক্তনালীগুলির সঙ্কোচন খুবই প্রয়োজন; আবার বাইরের হাওয়া যখন বেশি গরম, তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘর্ম নিঃসরণ করে শরীরের উত্তাপ কমানো। রক্তনালীগুলির সঙ্কোচন হ্রাস করে উত্তাপ-সংরক্ষণ করে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুশিরা। এই স্নায়ুশিরাগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের একটি অংশ।

শরীরের তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রণের যে চমৎকার প্রণালী বলা হলো, তার নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রস্থল হলো মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ। এখানে খবর এসে পৌঁছালে, প্রয়োজনমতো ক্ষুদ্র রক্তনালীগুলিকে বিস্তৃত (dilated) করে বা ঘর্ম নিঃসৃত করে তাপমাত্রা কমায়; আবার ত্বকের রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে, কিংবা দরকার হলে শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি করার মাধ্যমে উত্তাপ সৃষ্টি করে, (কিংবা অন্যভাবে যেমন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে উত্তেজিত করে) হাইপোথ্যালামাস শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়।

১ Text Book of Medical Physiology, Guyton, Igaku—Shoin, Saunders International Edition, (1986), pp. 849-859

এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, জ্বর আসবার সময় যে কাঁপুনি হয়, তার অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে যে-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আছে, সেখানে যে-তাপমাত্রা নির্দেশিত হয়েছে, সেই তাপমাত্রায় তাড়াতাড়ি শরীরকে নিয়ে যাবার জন্য এই কাঁপুনির সৃষ্টি।

জ্বর কি ও কেন হয়

তাপমাত্রা ৯৮·৬°F-এর উপরে উঠলে তাকে জ্বর বলা হয়। যে যে কারণে জ্বর হয় তার মধ্যে আছে জীবাণু-ঘটিত অসুখ, মস্তিষ্কে টিউমার এবং বাইরের গরম আবহাওয়া যাতে হিট স্ট্রোক বা সর্দি-গর্মি হয়। অনেক ধরনের প্রোটিন বা তাদের ভগ্ন অংশ, জীবাণুর অংশ বা জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ (টক্সিন), অথবা ক্ষয়িষ্ণু জীবকোষের ধ্বংসাবশেষ, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামিক অংশকে উত্তেজিত করলে জ্বর (পাইরেক্সিয়া) হয়। জ্বরসৃষ্টিকারী ঐ সব দ্রব্যগুলিকে বলে 'পাইরোজেন' (pyrogen), এদের কতকগুলি বাইরে থেকে শরীরে ঢুকে (exogenous), আবার কতকগুলি শরীরের মধ্যে সৃষ্ট হয় (endogenous)। জীবাণুগুলি রক্তের শ্বেতকণিকার স্বীকার হওয়ার পর ঐ শ্বেতকণিকা-নিঃসৃত জীবাণুর ধ্বংসাবশেষও পাইরোজেন হতে পারে। শেষোক্ত পাইরোজেন হাইপোথ্যালামাসের জীবকোষে প্রোস্টাগ্লানডিন (prostaglandin) নামক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে জ্বর সৃষ্টি করে। অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধগুলি প্রোস্টাগ্লানডিন-এর কাজকে ব্যাহত করে জ্বর কমায়; সেজন্য ঐসব ওষুধ সুস্থ-লোকের তাপমাত্রাকে নামাতে পারে না। শরীরের তাপমাত্রা যদি ১০৬°—১০৮°F হয় (যেমন সর্দি-গর্মিতে), তখন সেই উচ্চ তাপমাত্রাই অনেক জীবকোষকে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের জীবকোষকে নষ্ট করে, যার ফলে মাথা ঘোরা, বমি ইত্যাদি হয়। শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে তাড়াতাড়ি নামানো দরকার এবং তার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ঠাণ্ডাজলে মাথা ও গা ধোয়ানো (বা স্পঞ্জ করা) এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাস করা। কেউ কেউ বরফজলে গা ডুবিয়ে রাখতে বলে। সাধারণতঃ যা করা হয় তা হচ্ছে—তাপমাত্রা নামানোর জন্য মাথা ভাল করে ধুইয়ে দিয়ে, (গরম বা বরফ দেওয়া জল নয়) তারপর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করে সদ্য ভিজা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে তারপরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হয়; সেই সময় শরীরের অন্য অংশ চাদরে ঢাকা থাকতে পারে এবং বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া থাকলে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্পঞ্জ করা হয়ে গেলে জামা পরিয়ে বা চাদর ঢাকা দিয়ে পাখা খুলে দেওয়া হয় অথবা মাথায় হাতপাখার বাতাস করা হয়। যখন তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা কমানো দরকার, তখন 'ঠাণ্ডা লেগে যাবে' ভেবে ভিজা তোয়ালে দিতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ আগে যা বলা হয়েছে, উচ্চ তাপমাত্রা বেশিক্ষণ থাকলে শরীরের নানা ক্ষতিসাধন করতে পারে। তাপমাত্রা কমানোর জন্য কেবলমাত্র মাথায় 'আইস ব্যাগ' দেওয়া খুব একটা কার্যকরী হয় না। তাপমাত্রা ১১৪°F (৪৫°C) উঠলে বা ৭৬°F (২৫°C)-এ নামলে জীবন রক্ষা সম্ভব নয়।

জ্বরের সাধারণ উপসর্গ হচ্ছে শরীর খারাপ বোধ হওয়া, মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, শীতবোধ করা ইত্যাদি। তবে কোন কোন জ্বরে বিশেষ বিশেষ উপসর্গ বেশি দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দিজ্বরে গায়ে হাতে ব্যথা হয়, হাঁচি হয়; টাইফয়েড জ্বরে মাথার যন্ত্রণা প্রচণ্ড হয় এবং একজ্বরী অবস্থায় দিন দিন জ্বর বাড়তে থাকে; হাম ও বসন্তে জ্বরের পরে গায়ে স্ফোটক দেখা যায়; জন্ডিস হলে জ্বরের পরে চোখ হলদে হয়; যক্ষ্মারোগে ঘুসঘুসে জ্বর (বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে) চলতে থাকে ইত্যাদি।

জ্বর হওয়া আমরা কেউ চাই না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, জ্বর যদি না হতো, তাহলে জীবাণু আক্রমণ বা অন্যান্য শরীরধ্বংসকারী প্রক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে শরীরের আরও বেশি ক্ষতিসাধন করে ফেলত। সেই হিসাবে জ্বরকে হিতকারী বলা যেতে পারে কিনা জানি না।

'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখি সব জীবের নিম্ন দৃষ্টি—সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্যে দৌড়ুচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দু-একজন দেখলাম উর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।"

৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। একশ সাত বছর আগে ঠাকুর এই কথাগুলি বলছেন মাস্টারমশাইকে। মাস্টারমশাই উত্তরে বললেন: "আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে, তাই অভাব বেড়েছে।"

পেটের জন্যে দৌড়াব, না ঈশ্বরের জন্যে? বিচারশীল মানুষকে আগে বিচার করে ঠিক করে নিতে হবে। একবার এ-নৌকোয়, একবার ও-নৌকোয় পা রাখলে, কি দু নৌকোয় পা রাখলে চলবে না। নিজেকেই ভুগতে হবে। লোকদেখানো কোনও কিছু ভাল নয়। নিজের সঙ্গে আগে একটা বোঝা-পড়া হওয়া চাই। সাধনা মানে নিজের দশটা হাত বেরনো নয়। পা ঠেকালেই তামার ঘটি সোনার ঘটি হবে না। টুসকি মারলেই নোটের তাড়া পড়বে না। এমন কিছুই হবে না যাতে দেহ-সুখ, জাগতিক ভোগ একবারে ফলাও হয়ে যাবে। এমন কিছুই হবে না, যা ঢাক পিটিয়ে, লোক জড়ো করে দেখানো যায়। যেমন দশ বছর তেড়ে সাধন ভজন করে এই আমার দশতলা বাড়ি হয়েছে, কি তিনখানা গাড়ি হয়েছে, কি কন্দর্পের মতো শরীর হয়েছে। ঠাকুর কোনও সংশয় না রেখেই বলছেন: "কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক-দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।" ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করছেন: "কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাটতে নিয়ে গিছল। একজন কাঠুরে পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে। তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের দর্শন পেলেন দেবকী। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।"

পরিষ্কার কথা। জাগতিক কোনও কিছুর আশা নিয়ে এ-পথে পা বাড়িও না। তিন দিনে তোমার নেশা ছুটে যাবে। ঠাকুর বলছেন: "জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তার নাম করো, তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধরব একটি কারণে, সংসার যেন আমাকে কলুর বলদ না করে ফেলে। উদয়াস্ত কেবল স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের চিন্তা। হা অন্ন, হা অন্ন। যেন আক্ষেপ করে গাইতে না হয়:

> লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
> দাস-খত লিখে নিয়েছে হায়।
> প্রাতঃকালে উঠি কতই কি যে করি
> দারা-পুত্র হল সুখেরই ছল।

ঠাকুর বলছেন: "দেখ, এক কৌপিন কা ওয়াস্তে যত কষ্ট। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকরি করতে হয়; সাধু কৌপিন নিয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা নিয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনা নেই, তাই আলাদা বাসা করতে হয়েছে। চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।" ঠাকুর মাস্টার-

মশাইকে দেখিয়ে সহাস্যে বলছেন : "ইনিও আলাদা বাসা করেছেন। তুমি কে, না, আমি বিদেশিনী, আর তুমি কে, না আমি বিরহিণী। বেশ মিল হবে। তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নেই। তিনিই রক্ষা করবেন।" ঠাকুর বলছেন—"সংসারে জ্বালা তো দেখছ, ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল। সাধুসঙ্গে শান্তি হয়। জলে অনেকক্ষণ কুমির থাকে; এক একবার জলে ভাসে, শ্বাস নেবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।" ঠাকুর বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা দেখে, যে ছোকরাটি বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলেপুলে?

বিদ্যা—আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরও একটি সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মধ্যে হল, গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে—সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত। সংসারে সুখ তো দেখছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্লশূল। যাত্রাওয়ালার কাজ করছ তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা! এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায়ই ওইরকম হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।

বিদ্যা হঠাৎ প্রশ্ন করছেন—'আজ্ঞে কাম আর কামনা তফাৎ কী?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা। এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহংকার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা অহংকার করতে হয়। সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো—কেন ঈশ্বরমুখী হব? সংসারী জীব আমি। আমি তো চাইব—ধন, জন, মান। আজ্ঞে না। তুলসী বলেছেন—

অর্থ অনর্থকরহিঁ জগত মাহী।
[এই সংসারে অর্থই অনর্থের মূল]
দেখহু মন সুখলেশো নাহি॥
[ওতে মনের লেশমাত্র সুখ নেই]
যাকো ধন তাকো ভয় অধিক।
[যার বেশি ধন আছে তার বেশি ভয়]
ধন কারণ মারত পিতু লড়িক॥
[টাকার লোভে ছেলে বাপকে মারতে পারে]
ধনতে পতিহিঁ বিঘাতহিঁ নারী।
[টাকার লোভে স্ত্রী স্বামীকে খুন করতে পারে]
ধনতে মিত্র শত্রুতা-কারী॥
[অর্থের জন্যে বন্ধু শত্রু হয়ে যায়]
ধনমদ নর অন্ধের জগ কয়সে।
[রাতকানা জানে না তার চোখের রোগটা কি]
দেখ নমি নহিঁ রতৌঁ ধি জেসে॥
[রাতকানার মতোই অজ্ঞ ধনমদে মত্ত অন্ধ মানুষ]

শেষে যোগ করলেন আমার ঠাকুর: "ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু অশান্তিই বেশি। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দহ, নৌকো দহে পড়লে আর রক্ষা নাই। শেকুল কাঁটার মতো একটি ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসাপোড়া হয়ে যায়।"

সাধনা করব একটি কারণে—কুমিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। ঠাকুর বলছেন: "বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বর সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য।"

এই বোধের সাধনাই সংসারীর সাধনা।

গ্রন্থ পরিচয়

জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে কম্যুনিজম

প্রণবেশ চক্রবর্তী

ভারতে কম্যুনিজম (১৯২০—১৯৮৬) : অমলেন্দু ঘোষ। পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য : ত্রিশ টাকা।

'ভারতে কম্যুনিজম' গ্রন্থের লেখক অমলেন্দু ঘোষ ইতিপূর্বে 'মার্কসবাদই শেষ কথা নয়' এবং 'বিপ্লব ও বিপ্লবী' শীর্ষক দুখানি যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ বই লিখে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর লেখা বর্তমান গ্রন্থখানি বাস্তব অর্থেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে কম্যুনিজমের ৬৬ বছরের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশ্লেষণ করার এক সাহসী উদ্যোগ। অকপটে লেখক নিজেই কবুল করেছেন : "এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোন তথ্যেরই বিকৃতি ঘটানো হয়নি। তবে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বা interpretation গ্রন্থকারের নিজস্ব। তাই তার দায়িত্বও স্বভাবতই তাঁর।"

লেখক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ঘটনাবলী অনুসরণ করে দেখিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে যে বিপ্লবীরা একদিন ভারতের মুক্তিযজ্ঞে জীবন নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), কিভাবে আমেরিকা হয়ে মেক্সিকোতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তারপর সেখানে জাতীয়তাবাদী একজন বিপ্লবী কিভাবে তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর প্রভাবে হয়ে উঠলেন কম্যুনিস্ট—সেই ইতিহাসও লেখক বিশ্লেষণ করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। মেক্সিকো থেকে তিনি এলেন মস্কোতে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে। সেটা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। এই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার তাসকন্দের মাটিতে প্রথম বপন করা হলো ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বীজ। ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস! ভারতের মাটিতে কম্যুনিজমের বীজ বপন করা সম্ভব হয়নি। রাশিয়ার মাটিতে এবং জলহাওয়ায় সেই বীজকে একটি চারাগাছে রূপান্তরিত করার পর ভারতের মাটিতে সেটিকে প্রোথিত করা হলো।

লেখক দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে কম্যুনিজমের ইতিবৃত্তকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তথাকথিত এবং মোহান্ধ কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকদের কাছে এই বইখানি যে আদরণীয় হবে না, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরে আজ যখন সেদিনের নবজাতকরা প্রৌঢ়ত্বের পথে পা বাড়িয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের কিশোররা যৌবনের পথে, তখন বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে এদেশের ইতিহাসকে তাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রয়োজন সত্যের মুখোমুখি তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে এই বইখানি এক ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা পাবে।

মোট ২৮০ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত এই বইটিতে মোট বাইশটি অধ্যায় আছে—যার শুরু 'মেক্সিকো থেকে মস্কো' দিয়ে এবং শেষ 'কম্যুনিস্ট বিপ্লব'-এ। তাছাড়া যুক্ত হয়েছে পরিশিষ্ট এবং একটি গ্রন্থসূচী।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিরঞ্জীব রায়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : "লেখকের ভাষা সাহিত্যধর্মী এবং খুবই সহজ, সংযত ও গতিশীল। গ্রন্থটির প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণও বিশেষ অর্থবহ। পড়তে আরম্ভ করলে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।"

এই গ্রন্থের 'কারাগারে জয়যাত্রা' এবং 'কৌশলী অনুপ্রবেশ' শীর্ষক অধ্যায় দুটি যেমন ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণ, তেমনি নির্মম সত্য উদ্ঘাটনের

নজির। 'কারাগারে জয়যাত্রা' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক বলেছেন:

"ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা ছিলেন দেশের জন্য সর্বসমর্পিত প্রাণ। জীবনে কোথাও ফাঁকি ছিল না তাঁদের। (স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে) দেশের স্বাধীনতা তাঁদের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হলেও স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শেও তাঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ। স্বামীজীর চোখ দিয়েই তাঁরা একদিন ভারতের 'দরিদ্রনারায়ণ'কে দেখেছিলেন। স্বাধীনোত্তর দিনগুলিতে এরা যাতে একটু ভাল-মতো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে—নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ···সে ভাবনাও···তাঁদের ছিল। তবে ভারতের যে 'দরিদ্রনারায়ণ'কে তাঁরা এতকাল দেখে-ছিলেন স্বামীজীর চোখ দিয়ে, এবার তাঁরা তাদের দেখলেন মার্কস-এর চোখে। ফলে সেসব জাতীয়তা-বাদী বিপ্লবীদের জাতীয়তাবোধ অনেকখানিই লুপ্ত হয়ে এলো। শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণী-পরিচয়েই যে মানুষ, মানুষ এই বোধ ক্রমশঃ তাঁদের দৃঢ় হতে থাকল।" (পৃঃ ১০১) এই বোধ তাঁদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তার কিছু দৃষ্টান্তও লেখক দিয়েছেন (পৃঃ ১০৬)।

'ভূমিকা'য় নিরঞ্জীব রায় লিখেছেন: "বর্তমান গ্রন্থে লেখক ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একেবারে গোড়া থেকে, মানে মানবেন্দ্রনাথের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ৬৬ বৎসরের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-কোণ থেকে। তাঁর এ দেখায় কোন আবিলতা নেই, কোথাও কোন সংশয়ও নেই। খুবই গভীরভাবে দেখেছেন তিনি এবং যা তাঁর কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে তা প্রকাশ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।"

ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন, তার বর্তমান অবস্থা এবং কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যা গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে করেছেন তা অনেককেই ভাবাবে। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি স্বয়ং একটি মূল্যবান ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থকারের নির্মোহ দৃষ্টি, গভীর বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং সাহসী সিদ্ধান্তদানের উদাহরণ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

কবির অনুভূতি

নিমাই মুখোপাধ্যায়

স্মরণেঃ শ্রীসুরেশ্বর পাল। প্রকাশকঃ **শ্রীজগদীশ্বর পাল,** ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট (সুইট নং-১৩, ব্লক নং-১), কলিকাতা ৭০০০০৩। মূল্যঃ পঁচিশ টাকা।

কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার উৎপত্তিস্থল অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতে কত অনুভূতির খেলা—অনুভূতি ছাড়া এই অন্তর্জগতে প্রবেশ করা যায় না। কবির কাজ পাঠকের চিত্তে এই ভাবের প্রকাশ—যাতে পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন হয়।

জীবন ক্ষণিক। কোন প্রিয়জনকে হারালে মানুষ যে শোক পায় তা-ই প্রকাশ পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে এই ভাবেরই প্রকাশ। কবির পুত্রশোক কবিকে বিহ্বল করে, কিন্তু সেই বিহ্বলতা অতিক্রম করে কবি সমর্পিত করেন নিজেকে সেই পরমেশ্বরের কাছে। এই সমর্পণে কবি শান্ত হয়ে যান, শান্তি পান।

এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রয়াত পুত্রের স্মরণে লিখিত কবিতাগুচ্ছ ছাড়া পারিপার্শ্বিক বহু বিষয় সংবেদনশীল কবিমনকে নাড়া দিয়েছে। পরিবেশ-দূষণ থেকে আরম্ভ করে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ, রাজনীতি, কম্পিউটার প্রভৃতি বহু বিষয়ই কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিশ্বচরাচরের রহস্য, জরাজীর্ণ দেহ প্রভৃতি বিষয় থেকে 'সত্যের পথে হবে হবে রে জয়'-তে এর পরিসমাপ্তি। এর শেষ চারটি পঙক্তি কবিমনের বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে:

'সত্যের পথে নাহিরে ভয়
কোনোদিন তাহা মুছে যাবে নারে
কালের কপোল পাবে না লয়,
সত্যের পথে হবে রে জয়।'

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকার এই কটি কথা এই কাব্যগ্রন্থের সার্থকতাকে প্রতিফলিত করে। তিনি লিখেছেন: "তাঁর এই কবিতাবলী অনেক পাঠকের মনে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ এগুলি তাঁর হৃদয়োৎসারিত।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

গত ২৫—২৭ ফেব্রুয়ারি '৯০ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব **কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠে** উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন সকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও ভক্তবৃন্দসহ দু-হাজার নরনারী শোভাযাত্রায় যোগদান করে। পরে সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে এক ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শিশিরকুমার দাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ, এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা ও দায়রা বিচারক অজয়কুমার গোস্বামী। সন্ধ্যায় ছিল স্বামীজীর ওপর গীতি-আলেখ্য ও পরে কাঁথি নিউক্লাবের নাটক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর লীলাগীতি পরিবেশন এবং বিকালে স্বামী আপ্তকামানন্দের সভাপতিত্বে মায়ের ওপর আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী ব্রজেশানন্দ। সন্ধ্যায় মায়ের ওপর একটি নাটিকা অভিনীত হয়। উৎসবের তৃতীয় দিন ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় ছয় হাজার ভক্ত-নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সুরেন্দ্রানন্দ ও ভবরঞ্জন ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কাঁথির বিশেষ বিচারক অলোক দত্ত। সন্ধ্যায় হাওড়া শিবপুরের কল্পনা মঞ্জিলের শিল্পীবৃন্দ-কর্তৃক 'শ্রীগৌরাঙ্গ' যাত্রাভিনয় হয়।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ অসমের **শিলচর আশ্রম** এবং **করিমগঞ্জ আশ্রম** বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেন। উভয় আশ্রমেই পর্যায়ক্রমে ধর্ম-সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। ৪ মার্চ উভয় আশ্রমের 'আনন্দ-উৎসব'-এ মোট ১৭ হাজার জন (শিলচরে ১০ হাজার, করিমগঞ্জে ৭ হাজার) বসে প্রসাদ পান।

জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুয়ারি '৯০ **রাজকোট, সালেম, ভুবনেশ্বর, কালাডি** এবং **জলপাইগুড়ি আশ্রম** সাড়ম্বরে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করেছে। রাজকোট আশ্রমের অনুষ্ঠানে ৩০০ এবং সালেম আশ্রমে ৩৫০ জন যুব প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। ভুবনেশ্বর আশ্রম ১২—১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত যুবসপ্তাহ পালন করেছে। এই উপলক্ষে উড়িষ্যার আট জায়গায় যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট সংখ্যক যুব-প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। কালাডি আশ্রম দশটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা ও নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বক্তৃতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর, অধিবেশন, যুবসমাবেশ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই যুবক-যুবতীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়। জলপাইগুড়ি আশ্রমের জাতীয় যুবদিবসের অনুষ্ঠানে ১২টি বিদ্যালয়ের ২২০০জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেছিল।

যুব-সম্মেলন

গত ১৭ মার্চ '৯০ **কোয়েম্বাটোর আশ্রম** এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। ঐ সম্মেলনে ১৫৩জন ছাত্র-প্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১৬ থেকে ২০ মার্চ কটক জেলার দোহলীতে নবম জাতীয়-সংহতি শিবির পরিচালনা করে। উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে মোট ২২৫জন শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশ্বর আশ্রম পুরী জেলার বলগড়ে অষ্টম শিবিরটি পরিচালনা করে।

রাঁচি আশ্রম গত ৯—১১ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের যুবসম্মেলন এবং জাতীয়-সংহতি শিবিরের আয়োজন করেছিল। শিবিরে আলোচনা, যোগ-ব্যায়াম প্রদর্শন, ছৌ-নৃত্য, নাটক, সামরিক কৌশল-প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৩৫০জন যুব-প্রতিনিধি শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য গত ১২ জানুয়ারি এই আশ্রমের জাতীয় যুবদিবসের অনুষ্ঠানে মোট ৩০০০ ছাত্র-প্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

সেবাকার্য

গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি **পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের** উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দাতব্য দন্ত-চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ কে. কে. পালের নেতৃত্বে এই শিবির পরিচালিত হয়। এই দুইদিনে দাঁত তোলা, ফিলিং ও অপারেশন সহ মোট ১২৩ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি মঠের পক্ষ থেকে স্থানীয় ৩০০জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী। রামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ ও সেবাধর্মের ওপর ভাষণ দেন স্বামী দীনেশানন্দ। ২৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে মঠের পক্ষ থেকে স্থানীয় সদর হাসপাতালে ২১০ জন রোগীকে ফল-মিষ্টি দেওয়া হয়। স্বামী বন্দনানন্দজী ফল-মিষ্টি রোগীদের মধ্যে বিতরণ করেন। পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি ভাষণ দেন। ঐদিন প্রায় ৪০০ জন ভক্তকে বসিয়ে অন্ন প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরিদর্শন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল সস্ত্রীক **ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন** পরিদর্শন করেন

বহির্ভারত

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার: গত এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি সানফ্রান্সিস্কো: প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা এবং প্রতি শনিবার 'গসপেল অব দ্য হোলি মাদার' আলোচনা করেছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া ২১ এপ্রিল ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি (সিয়াটল): প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'সেইন্টস অব ইন্ডিয়া' বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি **কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাই কমিশনার লখনলাল মেহরোত্রা।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ২৯ এপ্রিল আচার্য শংকরের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসংঘ, জামালপুর (মুঙ্গের, বিহার) প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বার্ষিক রামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব পালন করেছে। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী পূজা, ভজন-কীর্তন, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমরাত্মানন্দ। ২০ ও ২১ জানুয়ারি, ১৯৯০ স্বামীজী মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি, 'সাম্যবাদ ও বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষকে স্থানীয় যুব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বক্তা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুঙ্গের কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধানদ্বয় যথাক্রমে ডঃ কল্যাণী মণ্ডল ও ডঃ বি. কে. ঘোষ, সভানেত্রী ও মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ও ২৫ মার্চ, '৯০ জামালপুর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে একটি 'যুব-সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুব-সম্মেলনে' স্টুডেন্টস চ্যাপ্টার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ারস (ইণ্ডিয়া) এবং ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ ইনস্টিটিউট অব মেকানিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং জামালপুর শাখা সহযোগিতা করে। প্রথম দিন বক্তৃতা, কবিতা, গান ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ১৫ থেকে ৩০ বয়সের প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় দিন আই. আই. টি. খড়্গপুরের ডঃ বি. প্রধান, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল কোন্নগর শাখার প্রতিনিধিগণ, ডঃ কল্যাণী মণ্ডল এবং অন্যান্য বক্তা যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থ পারিতোষিক দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে একটি 'স্মরণিকা-পুস্তিকা'ও প্রকাশিত হয়েছে।

৪ মার্চ '৯০ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী পূজা, ভজন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্তন এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা বহু ভক্তজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী লোকনাথানন্দ এবং স্বামী অমরাত্মানন্দ।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ২৪ ও ২৫ মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দ। সন্ধ্যারতির পর রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা ধর্ম-মূলক সঙ্গীতের আসর পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনে প্রভাতফেরী, পূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরবেলা সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে বসিয়ে খিচুরি প্রসাদ এবং সহস্রাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐদিনে ধর্মসভায় অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ 'সাধন-পথে শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্গাইগাঁও (অসম) গত ১৮ মার্চ প্রতিবারের মতো রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ইজ্যানন্দ।

হাইলাকান্দী (অসম) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৪ মার্চ জন্মোৎসব সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সরভোগ (অসম)ঃ গত ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব, প্রভাতফেরী, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রমুখ ভাষণ দেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সুভাষনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাব বার্ষিকী উৎসব ২৩, ২৪ ও ২৫ মার্চ আশ্রম প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গর্গানন্দ। পরে গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

তেঁতুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (মুর্শিদাবাদ) আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব ১৯ ও ২০ মার্চ '৯০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুদিনের উৎসবের অঙ্গ ছিল

বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, আলোচনা-সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ ইত্যাদি। আলোচনাসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী ভৈরবানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নৈমুদ্দিন শাহ প্রমুখ। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন রেবতীভূষণ মণ্ডল ও করুণাসিন্ধু মণ্ডল।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব জয়ন্তী উৎসব একই সঙ্গে ১৬ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ '৯০ পর্যন্ত মহাসমারোহে কেন্দ্রের নবনির্মিত মন্দিরভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবের সূচনা হিসাবে ১০ মার্চ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের প্রতিকৃতিসহ ভক্তদের একটি প্রভাতফেরী বিধাননগর উপনগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ১৬ থেকে ১৮ মার্চ যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দিবসত্রয়ে সারাদিনব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠান যথা, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিকালে ধর্মসভা এবং সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ১৬ মার্চ ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। ১৭ মার্চ ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা এবং বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপিকা রুবি দাশগুপ্ত। ১৮ মার্চ তারিখের ধর্মসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্বামী গহনানন্দজী এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী সত্যঘনানন্দজী, স্বামী স্মরণানন্দজী এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ মার্চ মধ্যাহ্নে প্রায় তিনহাজার ভক্ত মন্দির ভবন চত্বরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যায় আরও প্রায় একহাজার ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি **সারদাপল্লী সারদা-রামকৃষ্ণ সংঘের (ভদ্রেশ্বর)** ব্যবস্থাপনায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পালিত হয়। এতদুপলক্ষে দুপুর ১-৩০ মিঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা গ্রাম-পরিক্রমান্তে সংঘের শ্রীমন্দিরে সমবেত হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উৎসাহী জনসাধারণ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। অপরাহ্ণ ৪টায় সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পার্থদেব ঘোষ ও স্বদেশমন্ত্র পাঠ করেন বাসব চক্রবর্তী।

বৈকালিক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন চন্দননগরের মহকুমাশাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শেষে ভারতশ্রী দেবদত্ত বিশ্বাসের পরিচালনায় যোগব্যায়াম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভানেত্রী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদামঠের প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডঃ প্রদীপ ঘোষ ও সম্প্রদায়।

স্যান্ডেলের বিল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি '৯০ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন সকালে কিশোর-কিশোরীদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিকালে শিশুদের নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় এবং মহিলাদের হস্তশিল্প, সূচীশিল্প ও স্থানীয় কৃষকদের কৃষি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এই তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন যথাক্রমে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কৃষি আধিকারিক। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা, গোষ্ঠী-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, গীতি-আলেখ্য ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দিব্যানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী ভবতোষানন্দ ও অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল। ঐদিন দুপুরে প্রায় দেড়হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

মাকড়সা তীব্রগতিতে অল্পক্ষণ দৌড়ায় কিন্তু ম্যারাথন দৌড়াতে পারে না

যদিও মাকড়সা বড় বড় জাল তৈরি করে, তারা একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাত্র ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড দ্রুত কাজ করার পরেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসার কারণ দুটি হতে পারে। এক মতে, মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়; অর্থাৎ মাংসপেশীর গ্লুকোজ (শর্করা) ফুরিয়ে আসে এবং ল্যাকটিক এ্যাসিড জমে যায়। দ্বিতীয় মতে, মাকড়সার অনেক গাঁটের কাছে মাংসপেশী নেই এবং সেই অঙ্গের আভ্যন্তরীণ জলীয় পদার্থের চাপ পরিবর্তনের দ্বারা তাদের অঙ্গ সঞ্চালিত হয়; চাপ কমে যাওয়ায় তাদের অঙ্গ নড়ে না। সম্প্রতি ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির কেনেথ প্রেস্টউইচ 'জার্নাল অব কম্পারেটিভ ফিজিওলজি'তে প্রকাশ করেছেন যে, চাপ পরিবর্তন অঙ্গ সঞ্চালনের মূলে নয়। মাকড়সাকে দুই মিনিট জোর করে দৌড়াতে বাধ্য করে তিনি দেখেছেন, মাকড়সারা হিসাব অনুযায়ী দূরত্বের অর্ধেক যেতে পারে, তবে প্রথম ২০ সেকেন্ডেই তাদের গতিবেগ দুই তৃতীয়াংশ কমে যায়; শেষে তারা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে নড়তে পারে না। তিনি একটি বড় জাতির মাকড়সার (Filistata hibernalis) পায়ের মধ্যে নল (catheter) ঢুকিয়ে দেখিয়েছেন যে, মাকড়সা চলার সময় ভিতরের চাপমাত্রা প্রথমে দশগুণ বাড়ে; কিন্তু ১৫ সেকেন্ড দৌড়ানোর আগে সেই চাপমাত্রা সর্বোচ্চ চাপমাত্রা অর্থাৎ ৪৫০ মিলিমিটার পারদ (বায়ুমণ্ডলের চাপমাত্রার প্রায় অর্ধেক)-এ পৌঁছায় না। এক মিনিট জোর করে দৌড়ালেও চাপমাত্রা উচ্চই থাকে।

কিন্তু এখানে অন্য একটি রাসায়নিক ব্যাপার ঘটে। মাংসপেশীর কাজের জন্য প্রয়োজন হয় উচ্চ-শক্তিবিশিষ্ট ফসফেট (Adenosine triphosphate) যা তৈরি হয় অক্সিজেনের সাহায্যে। অনেকক্ষণ অর্থাৎ একমিনিট দৌড়ালে ল্যাকটিক এ্যাসিড অবশ্য জমে, কিন্তু তার আগেই, ২০ সেকেন্ডেই মাকড়সা ক্লান্ত হয়। প্রেস্টউইচ দেখিয়েছেন, ২০ সেকেন্ডে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে না, কিন্তু ফসফেট খুব কমে যায়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, মাকড়সা অক্সিজেন ব্যবহার করে ফসফেট তৈরি করে না, বিনা অক্সিজেনে (anaerobically) ফসফেট তৈরি করে। এইটাই সব নয়, মাকড়সার মাংসপেশীতে অনেক ফসফেট মজুত করা থাকে যা ব্যবহার করে তারা তাড়াতাড়ি ছুটতে আরম্ভ করে। মজুত ফসফেট শেষ হলে তারা ক্লান্ত হয়।

[New Scientist, 4-February 1989, p. 36]

পাশ্চাত্যে বৃদ্ধদের বাড়িতে কি চুরি-ডাকাতি বেশি হয়?

প্রশ্ন হচ্ছে, বৃদ্ধরা না অল্পবয়স্করা চুরি-ডাকাতির (burglary) বেশি সম্মুখীন হন এবং এর ফলে কাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি বেশি হয়? আমেরিকাতে দেখা গেছে যে, বৃদ্ধদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি কম হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে পর পর ৩১৫টি চুরি-ডাকাতির ঘটনাকে নিয়ে একটি সমীক্ষা হয়েছে। সেখানে চুরি-ডাকাতির সময় আহত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। 'বৃদ্ধ' ধরা হয়েছে ৬৩—৯৩ বৎসর (গড়—৭৫) বয়স্কদের এবং 'অল্পবয়স্ক' ধরা হয়েছে ১৭—৬২ বৎসর (গড়—৩৭) বয়স্কদের। দেখা গেছে যে, বৃদ্ধরাই চুরি-ডাকাতির বেশি সম্মুখীন হন এবং তাঁদের মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা ও ভীতি বেশি হয়। ২২ শতাংশ বৃদ্ধ এবং ৮ শতাংশ অল্পবয়স্কদের বাড়িতে পূর্বের দু-বৎসরে আরও এক বা একাধিকবার চুরি-ডাকাতি হয়ে গেছে। বৃদ্ধরা কেন চুরি-ডাকাতির বেশি সামিল হন, তার কারণ হিসাবে দেখা গেছে যে, বৃদ্ধরা একলা থাকেন, তাঁদের রক্ষা করবার কেউ থাকে না এবং তাঁদের অজানা আগন্তুকদের সম্মুখীন হবার সাহস বেশি।

[British Medical Journal, 17 January 1989, p. 1618]

উদ্বোধন



আষাঢ়
১৩৯৭
৯২তম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
উদ্বোধন কার্যালয়



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন, ১৯৯০ আষাঢ়, ১৩৯৭

দিব্য বাণী

ঐ যে জগন্নাথের রথ, তা-ও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়োছিস না—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি' ইত্যাদি, 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে'—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে 'রথে চ বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিম্ভূতকিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্বদা 'আমি' বলে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হতো, তা হলে বছর বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ! তবে জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয়' বা 'মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্তি অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়। অতএব ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ



কথাপ্রসঙ্গে

সভ্যতার রথরজ্জু যাহাদের হাতে

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি খুব সুন্দর কথা বলিতেন। বলিতেনঃ ঈশ্বর দুই কথায় হাসেন। এক—সন্তান মুমূর্ষু, মা কাঁদিতেছেন। চিকিৎসক পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সহিত রোগীর মাকে বলিতেছেন, "ভয় কি মা, আমি আপনার ছেলেকে সুস্থ করে দেব।" তখন একবার হাসেন। এইজন্য হাসেন যে, আমি যদি মারি কাহার সাধ্য রক্ষা করে? আমি এখন উহাকে মারিতেছি, আর এই আহাম্মক চিকিৎসক বলে কিনা 'আমি বাঁচাব'! চিকিৎসক মনে করে সে কর্তা, কিন্তু সে জানে না যে, কর্তৃত্বের বল্গা রহিয়াছে ঈশ্বরের হাতে।

ঈশ্বর আর এক কথায় হাসেন। দুই ভাই দড়ি ফেলিয়া জমি-জায়গা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, আর বলে—'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার!' ঈশ্বর তখন তাহাদের এই নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসেন যে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাই আমার, তাহার বাহিরেও যা কিছু সেসবও আমার, অথচ ইহারা খানিকটা মাটি লইয়া বলিতেছে, "এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।" (কথামৃত, উদ্বোধন সংস্করণ, পৃঃ ৫৬,৩৬৩)

ঈশ্বরের আর একবারের হাসির সংবাদ আমাদের জানাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। উহাও ভারি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের সেই বহু-পরিচিত 'ভক্তিভাজন' নামক চার পঙ্ক্তির কবিতাটি আমরা স্মরণ করিতেছিঃ

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব,' রথ ভাবে 'আমি,'
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'—হাসে অন্তর্যামী।

ঈশ্বরের এই তিনবারেরই হাসির কারণ প্রকৃত-পক্ষে কর্তৃত্বে শক্তিহীন অথচ কর্তৃত্বাভিমানী সেইসব নির্বোধদের অহমিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অন্য পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের হাসির প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় এবং ক্ষেত্র তাহা হইতে ভিন্ন হইলেও উভয়ের নিকট হইতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে একটি বিশেষ ইঙ্গিত পাইতে পারি। তাহা হইল, ব্যবহারিক জগতে সভ্যতার মূল নিয়ামক-শক্তির ভূমিকা যাহাদের, তাহাদের অস্বীকার ও উপেক্ষা করিয়া আমরা অন্যদের সেই ভূমিকার ভাগীদার করি। তথাকথিত সভ্যতার সূচনালগ্ন হইতেই জগতে এই প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে। সভ্যতার তথাকথিত ধ্বজাবাহকদের এই নির্বুদ্ধি-

তায় ঈশ্বর হাসেন কিনা বলিতে পারিব না, তবে মহাকাল নিশ্চয়ই হাসেন। মহাকালের হাসি সাধারণ হাসি নহে। তাঁহার সেই হাসিতে মহাপ্রলয়ের সূচনা হয়, মনুষ্য-নির্মিত শৃঙ্খলার পরিচিত শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়া নূতন সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। তখন নূতন করিয়া যে শৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটে তাহাকে প্রথম প্রথম বিশৃঙ্খলা বলিয়াই পূর্বতন স্বার্থান্বেষীরা মনে করিতে থাকে এবং সেইভাবে তারস্বরে প্রচারও করে।

আমরা এখানে মেহনতী দরিদ্র গণদেবতার কথা বলিতে চাহিতেছি। নিতান্ত দৃষ্টিহীন অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যতীত সকলকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতার রথরজ্জুটি ইহাদেরই হস্তধৃত। ইহারাই তাহা আকর্ষণ করিয়া চলে এবং তাহারই ফলে সভ্যতা আগাইয়া চলে। সভ্যতার রথরজ্জুটি তাই যুগে যুগান্তরে, দেশে দেশান্তরে ইহাদের ঘর্মে পরিলিপ্ত হইয়া থাকে। তাহারাই সভ্যতার প্রকৃত স্থপতি ; কিন্তু তাহাদের সেই অবদান অস্বীকৃতই থাকে। এই প্রসঙ্গে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণে আসিতেছে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খৃীস্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট নাটক লিখিয়াছিলেন—নাম 'রথের রশি'। নাটকের বিষয় রথযাত্রা। 'রথযাত্রা'র শুভ মুহূর্তে উপস্থিত। দেশের রাজা স্বয়ং সৈন্যসামন্ত, পাত্রমিত্র-সভাসদ্‌বর্গ সহ রথের রশিতে টান দিলেন। কিন্তু রথের চাকা একচুলও নড়িল না। পুরোহিতবর্গ, শ্রেষ্ঠীকুল, নর্মদার মোহন্ত বাবাজী প্রমুখও হাত লাগাইলেন রথের রশিতে ; তথাপি রথের চাকা অনড়। শূদ্র—অন্ত্যজ, মুখে যাহাদের নাম উচ্চারণ করাও পাপ, রথযাত্রার দিন তাহাদের স্থান হয় রথের ত্রিসীমানার বাহিরে। রথের রশিতে হাত দেওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। অথচ অমানুষিক পরিশ্রমে রথ নির্মাণ করে তাহারাই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুইজন সোচ্চার—একজন সন্ন্যাসী, অপরজন কবি। অবশেষে রথস্বামীর আহ্বান শুনিয়াছে শূদ্রের দল। সমাজের উচ্চবর্ণের বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে অবহেলিত শূদ্ররা আসিয়া উপস্থিত রথের দড়িতে টান দিবে বলিয়া। পুরোহিত ও সৈন্যবাহিনী সর্বশক্তি দিয়া তাহাদের বাধা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বুদ্ধিমান মন্ত্রী বুঝিয়াছেন সদ্য-জাগ্রত এই গণদেবতাকে বাধা দেওয়ার প্রয়াস নিছকই বাতুলতা—তলোয়ারের প্রতিরোধ দিয়া বন্যাকে আটকানো যায় না। তাই সৈন্যদের নিরস্ত করিলেন তিনি। নাটকে রবীন্দ্রনাথ কি লিখিয়াছেন দেখি :

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি—আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী—তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি—এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়, দলে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।... এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর [রথের] রশি ধরতে।...

পুরোহিত—বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি—সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর ? মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার ?

মন্ত্রী—সংসার বলতে তো তোমরাই।... চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি। আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি—আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ। আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।...

মন্ত্রী—সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই, তোমরা নারায়ণের গরুড়।

অবশেষে রথ চলিল যখন রথের রশিতে হাত পড়িল শূদ্রদের। মন্ত্রীমশায়ও তাহাদের সঙ্গে রথের রশিতে হাত লাগাইলেন। কিন্তু পুরোহিত ও সৈনিকগণ তখনও আত্মম্ভরিতায় মিথ্যা আস্ফালন করিতেছেন। মন্ত্রী তাহাদের বলিলেন :

"ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে
সমান হয়ে।"

এমন সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কবি। তিনি বলিলেন :

"যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে,
তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে।"

পরিশেষে আসিলেন সন্ন্যাসী। তিনি করিলেন শেষ কথাটি উচ্চারণ : "জয়—মহাকালনাথের জয়।"

বলা বাহুল্য নাটকটি একটি রূপক। রূপকের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটি বলিবার প্রয়াস করিয়াছেন তাহা হইল, দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ভিন্ন দেশ কখনও অগ্রগতির পথে পদস্থাপন করিতে পারিবে না। তাহাদের উত্থানের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে দেশের শিক্ষিত এবং উচ্চস্তরে স্থিত মানুষদের। তাহারা স্বেচ্ছায় আসিলেই ভাল। কারণ এই গণ-অভ্যুত্থানকে

রোধ করার শক্তি কাহারও নাই। উহা অবশ্যম্ভাবী। মহাকালের রথের তলায় জীর্ণ সমাজ ভাঙিয়া চূরমার হইয়া যাইবে, আর সেই ভগ্নস্তূপ হইতে উদ্ভূত হইবে নূতন এক সমাজ, নূতন এক পৃথিবী।

অনেকের মনে হইতে পারে যে, এই নাটকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এদেশে শূদ্র-উত্থান বা সমাজ-তন্ত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পূর্বেই [illegible]ৎ, রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লিখিয়াছিলেন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে। তাহার বহু বৎসর পূর্বে বয়সে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তরুণ এক ভারতীয় সন্ন্যাসী বলিষ্ঠ ভাষায় এই সত্যটির প্রতি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন: "এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশি। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের ওপরে উঠে যাবে।... তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস। **এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে।** এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্ন-বস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?"

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ বিধৃত স্বামীজীর এই কথাগুলির প্রতিধ্বনিই আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ইতঃপূর্বে শুনিয়া আসিয়াছি। শুনিয়া আসিয়াছি মন্ত্রীর স্বীকৃতিতে যে, উচ্চবর্ণের মানুষেরা ইহাদের ঠকাইয়া ইহাদেরই পরিশ্রম-নির্মিত সভ্যতার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিজেরা এতকাল ভোগ করিয়াছে, আর ইহাদের সমস্ত কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের কত পূর্বে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া সেই বঞ্চনার ইতিহাসকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন! তাঁহার কথাই আবার বলি: "এরা... একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে। সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্যগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।... এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।

"তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, 'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।'...আদান-প্রদানে উভয়ে উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

"তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্রজাতদের) কল্যাণ নেই। এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রজাতদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! **তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে**; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।"

এই জনসাধারণ বা গণমানুষকেই স্বামীজী 'শূদ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের ভাবী উত্থান ও অবদান সম্পর্কে অন্যত্রও তিনি একই কথা বলিয়াছেন। 'বর্তমান ভারত'-এ (রচনা: ১৮৯৯-১৯০০) তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন: "শূদ্রদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য।" অর্থাৎ তাহারাই মানুষের সভ্যতার স্থপতি। কিন্তু "সমাজের সর্বাঙ্গ হইয়াও" ইহারা "সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' [অর্থাৎ ঘৃণ্য কুলে তাহাদের জন্ম] বলিয়া অভিহিত।" শূদ্রের ভবিষ্যৎ জাগরণকে স্বামীজী আর্ষদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া 'বর্তমান ভারত'-এ লিখিয়াছেন: "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে... শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

সভ্যতার বাহন এই শূদ্রসমাজকে অবহেলায় যে সমাজদেহটিই শক্তিহীন হইয়া যায় সেই কথাও তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ বলিয়াছেন: "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহু-বলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে-শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।"

সেই দুর্বলতা সম্পর্কে স্বামীজী ভারতবর্ষকে সচেতন করিয়া দিয়া প্রাণস্পর্শী স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন: "হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার

রক্ত, তোমার ভাই।... বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

স্বামীজী এই কথাগুলি তাঁহার আপন হৃদয়ের রক্ত দিয়াই লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণের প্রবল আবেগ নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু তাহা কোন-ভাবেই তাঁহার তাৎক্ষণিক আবেগ বা রচনার উচ্ছ্বাস ছিল না। তাহা মূলতঃ এবং সম্পূর্ণতঃ ছিল তাঁহার মর্মমূল-উৎসারিত। এই চিন্তা যে তাঁহাকে গভীর-ভাবে আলোড়িত করিতেছিল তাহার কিছু পরিচয় 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' হইতেও পূর্বে আমরা দিয়া আসিয়াছি। এখন 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (রচনাঃ ১৮৯৯—১৯০০, যাহা 'পরিব্রাজক' নামে পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছে) হইতে তাঁহার রচনার কিছু স্মরণ করিঃ "ঐ যারা চাষাভুষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষ—বিজাতি-বিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।...

"হে ভারতের শ্রমজীবি ! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিলন, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনেভা, বাগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য ! আর তুমি ? কে ভাবে একথা ? স্বামীজী ! ('স্বামীজী' সম্বোধনে এখানে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রত্যক্ষে এবং ভারতের উচ্চবর্ণ পরোক্ষে উদ্দিষ্ট) তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ঢাকের চোটে গগন ফাটছে ; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে ?

স্বামীজী যখন এই কথাগুলি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন তাহার পর নব্বই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। সভ্যতার বাহ্যিক উৎকর্ষের নিরিখে পৃথিবী এখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে, শূদ্রের জাগরণও ঘটিয়াছে ; কিন্তু সেই জাগরণে উচ্চবর্ণ কতখানি সহযোগী হইয়াছে—সেইটাই প্রশ্ন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, শূদ্রজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নাই তাহার প্রতিরোধ করে। কিন্তু স্বামীজী চাহিয়াছিলেন উচ্চবর্ণেরা যেন স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিয়া শূদ্র-উত্থানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ব্যাপক অর্থে এবং প্রকৃত অর্থে তাহা হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ যুগের প্রভাবেই হইয়াছে। সভ্যতার রথরজ্জু-আকর্ষকদের আমরা আজও মন হইতে, প্রাণ হইতে প্রাপ্য আসন ও মর্যাদা দিই নাই। দিতে যাহা হইয়াছে তাহা বাধ্য হইয়াই আমরা দিয়াছি। কিন্তু এখনও সময় আছে। এখনও যদি সমাজের উপর তলার মানুষেরা স্বেচ্ছায় ও সাদরে তাহাদের বুকে টানিয়া না লই তবে অদূর ভবিষ্যতে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহারা মহা-অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে। রক্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া যাইবে, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীই দুর্বল হইয়া যাইবে। শ্রেণী-সংগ্রাম কখনও শান্তি আনিতে পারে নাই, পারিবেও না। স্বামীজী তাই নিচের তলার মানুষকে তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত অর্পণ করিবার জন্য বারংবার সমাজের উপরের তলার মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাহাতেই নিহিত রহিয়াছে জগতের কল্যাণ, সভ্যতার কল্যাণ। শ্রেণী-সংগ্রাম নহে, শ্রেণী সমন্বয় ; উপর তলার মানুষকে জোর করিয়া নিচে নামাইয়া ('levelling down') 'স্টীম-রোলার সাম্য স্থাপন' নহে, নিচের তলার মানুষকে প্রেম ও মমতায় উপরে অধিষ্ঠিত করাই ('levelling up') হইল স্বামীজীর পদ্ধতি। এবং সেই পদ্ধতির রূপায়ণের মধ্যে রহিয়াছে সভ্যতার বাঞ্ছিত উৎকর্ষ, সভ্যতার রথচক্রের নির্বাধ অভিগমন। ভাবীকালের সভ্যতার যাহারা নায়ক তাহাদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ 'বিলাতযাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজক'-এ তাঁহার প্রণতি রাখিয়া গিয়াছেনঃ

"লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই ? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয় ; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য —সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।" 'ভারত' এখানে 'পৃথিবী'ই।

কথিত আছে, উড়িষ্যার জগন্নাথদেব—যাঁহার রথযাত্রা-অনুষ্ঠান জগৎপ্রসিদ্ধ—নীলাচল বা পুরীতে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সীমান্ত-বর্তী অঞ্চলে অন্ত্যজ শবর উপজাতিদের দ্বারা পূজিত হইতেন। সুতরাং জগতের প্রভুর রথরজ্জু (অবশ্য তখন তাঁহার রথযাত্রা হইত কিনা জানা যায় না) যে শূদ্ররাই আকর্ষণ করিবার আদি-অধিকারী উপরোক্ত কিংবদন্তীতে তাহারই সংকেত রহিয়াছে।

সকলের মা সারদা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

চল্লিশবছর আগের একটি ঘটনা। দেরাদুনের কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন কুটিরের একান্তে একটি বাড়ি। সময় সকাল ৭-৩০ টা। শীতকাল। সবে মিঠে রোদের আমেজ দিচ্ছে। দূরে শিবালিক পর্বতমালা তখনো যেন ধ্যাননিমগ্ন। পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত আশ্রম। কিছু নিচে জলধারা সতত কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে। দুচারটি পাখি প্রভাতী রাগিণী গাইছে। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি আগতপ্রায়। কম্বলের ওপরে উপবিষ্ট শ্রীমা সারদা-দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত বেদান্তনিষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ। তাঁর সামনে বেদান্ত শিক্ষার্থী এক তরুণ—এক নবীন সন্ন্যাসী। নবীন সন্ন্যাসী বললেন ঃ "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের গভীর আধ্যাত্মিকতা একটা বুঝে নেওয়া যায়, ধরে নেওয়া যায়—কিছু অনুমানসিদ্ধ তো হয়ই। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বৃত্তান্ত যতই ভাবা যায় ততই দেখি থৈ পাওয়া যায় না। ঠাকুরের কাছে এসেছেন কত সাধু-সন্ত, কত ত্যাগি-তপস্বী, কত বিদ্বান-পণ্ডিত। তাঁর সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কি এক অপূর্ব সৃষ্টি! কিন্তু শ্রীশ্রীমা অতি নীরবে, অতি সহজ সামান্য সাধারণ দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে কি গভীর আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তবায়িত করেছেন। সত্যি মহারাজ, এ অদ্ভুত। অদ্ভুত! এর কোন নজির নেই। অতুলনীয়।' "ঠিক বলেছ। মাকে ধরা যায় না। মাকে বোঝা যায় না। মা যে কত বড়, মা যে কত গভীর, কে এই মা, সত্যি কিছুই বোঝা যায় না; কিন্তু বোঝা যায় ইনি মা।" উত্তর দিলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী এবং দেখা গেল এমন একজন বেদান্তী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমায়ের কথায় কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন। শুধু বিহ্বলই হলেন না, দুই চোখ বেয়ে নামল সুন্দর মতির ঝরনা। সুতরাং নেহাৎ মূর্খ না হলে কেউ কি এমন মায়ের বিষয়ে কথা বলতে সাহস করে? আবার মা এমনই জিনিস যে, সকল সন্তানই জানে সে তার মাকে চেনে। শুধু তাই নয়, তার মতো আর কেউ তার মাকে জানে না। মা-ও কোন সন্তানকে অস্বীকার করেন না। অতএব বিদ্বানের যেমন অধিকার, মূর্খেরও তেমনি অধিকার এই একটি দরবারে। 'আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা, আমি সু-এর মা, আমি কু-এর মা, আমি শরতের মা, আমি আমজাদের মা। আমি মা। যে-ই মা বলে ডাকে আমি তারই মা। আমি সকলেরই মা।' দেখা যাক এই লজ্জাপটাবৃতা, চির-অবগুণ্ঠিতা মহাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী, জগজ্জননীর জীবনালেখ্যে সামান্য তিমিরান্ধ বুদ্ধিতে কি প্রতিভাসিত হয়।

ইতিহাস ও পুরাণ সতীত্বের ও পাতিব্রত্যের কি ভূয়সী প্রশংসাই না করেছে। রামের সঙ্গে সীতার বনগমন, সত্যবানের জীবনের প্রশ্নে সাবিত্রীর দৃঢ়তার কাছে যমের নতিস্বীকার, বিষ্ণুপ্রিয়ার তপস্বিনী জীবন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীদের কথা, খ্রীস্টীয় এবং বৌদ্ধ লিপিতে সন্ন্যাসিনীদের কথা কত মহিমান্বিত। কিন্তু মাতৃত্বের কথা, বিশ্বমাতৃত্বের কথা, মানুষের ইতিহাসে বিশেষ সূচিত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে। গর্ভধারিণী মায়ের অপরিসীম স্নেহ, ত্যাগ ও সেবার কথা অবিদিত নয়, কিন্তু 'সকলের মা' কথাটি সত্যি নতুন নয় কি? ভগবান সকলের একথা নতুন নয়। কিন্তু 'সকলের মা' একথাটি মহা আশ্চর্য। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে দেখা যায় গৃহে ও সমাজে কত রকমের সম্পর্ক ঃ পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, যজমান-পুরোহিত, প্রভু-ভৃত্য, চিকিৎসক-রোগী, দোকানী-ক্রেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন নজির কি কোথাও আছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কোন এক নারী সকলের প্রতি সমানভাবে সন্তানভাব রক্ষা করেন অথবা নিজেকে সকলের মা মনে করেন? একি সম্ভব? এ প্রসঙ্গই বোধহয় অভিনব। কিন্তু অভিনব হলেও এযে ঘটেছে। এযে বাস্তব। এ অনস্বীকার্য।

ছোট ছোট ঘাস, আর বিরাট বটগাছ। দুয়ের জন্ম পৃথিবীর মাটিতে। কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাস ও

দোলনচাঁপা জন্মে মাটিতে। বাঁচেও মাটিতে। তাই ধরিত্রী ধরিত্রীমাতা। পৃথিবীর মাটি জন্ম দেয়, পুষ্ট করে, ধারণ করে রাখে। ত্যাগ আর গ্রহণের বিচার জন্মদাত্রী হিসাবে ধরিত্রীমাতার নেই।

ভগবান নাকি অবতার হয়ে আবির্ভূত হন। অবতারে ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ একথা শাস্ত্রে কথিত, বিশ্বাসে গৃহীত। অবতারে অঙ্গীকারঃ সাধুদের পরিত্রাণ ও সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতের বিনাশ। অবতারত্বে গ্রহণ-বর্জনের কর্মসূচীর প্রবর্তনা। অবতারে শক্তির বিশেষ প্রকাশ।

মাতৃত্ব শক্তিরূপা। শক্তির আভরণে মাতৃত্বের প্রকাশ ভাবলে ব্যাপারটি জটিল হয়ে যায়। শক্তি আর মাতৃত্ব একার্থক। শক্তিই সৃষ্টির উৎস। শক্তি বৈচিত্র্য-জননী।

যুগে যুগে কত অবতার কত রূপে, কেউ কেউ শিষ্টের পালনে ও দুষ্টের দমনে অবতারত্ব অঙ্গীকারের নিদর্শন রেখেছেন। কেউ বা থেকেছেন প্রচ্ছন্ন—ছদ্মবেশে, দুষ্টদমনে সংহারমূর্তি প্রকাশ করার দরকার হয়নি।

কিন্তু আমরা যদি মা সারদার জীবনের দিকে তাকাই, দেখি স্নেহপরায়ণা, সরলা মায়ের মূর্তি। কেবলমাত্র মা। অন্য বিশেষণের দরকার হয় না। মা মায়ের পরিচিতি ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব পালনের কথা তোলেননি। অবতারত্বের গুণাগুণের বিচার মাতৃজীবনে ওঠে না। মা যে নিজেই শক্তিরূপা। কোন শক্তির আধার হয়ে অবতীর্ণ হতে হয়নি। সৃষ্টির আদিভূতা শক্তি, সৃষ্টির উৎস। কাজেই সদা অবতীর্ণা। যুগ বেছে বেছে প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্যের চাপে অবতীর্ণ হতে হয় না। যেখানেই সৃষ্টি, সেখানেই সন্তান, সেখানেই মাতৃত্ব। মাতৃত্বের প্রথম কারণ বলে কিছু নেই।

তাই কি মা সারদা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর মনকে প্রকাশ করলেন একথা বলেঃ "আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা। আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুয়ে মুছে নিতে হবে।" সার্বিকভাবে দ্বন্দ্বাতীতা (Total dichotomy transcendence)। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান এসব দ্বন্দ্ব কাটাবার জন্য তপস্যার জটিল আবর্ত মাকে স্পর্শ করে না। একই শক্তি ভাল-মন্দ বৈচিত্র্যের জনয়িত্রী। সেই শক্তির পূর্ণ রূপ মা সারদা। তাই তো অবতারের অঙ্গীকারের পরিবর্তে সকলের জন্য মাতৃক্রোড়ের চিরন্তন ভরসা। মা কাউকে কোল থেকে ফেলে দেন না। কোলে তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত করে নেন। মার কাছে শাসনের হুমকি নয়, আশ্রয়ের প্রশ্রয় সকলের জন্য, সর্বকালের জন্য।

মাতৃশক্তি সনাতনী। জাত-পাতের লঘুত্ব গুরুত্ব তার সর্বব্যাপকতাকে খর্ব করতে পারে না। সমকালীন সামাজিক রীতিনীতির সংকীর্ণতার কাঠিন্য মাতৃস্নেহে বিগলিত। মাতৃস্নেহের প্রবাহে সব বাঁধ ভেসে যায়। তাই মা সারদার কোলে স্বামী সারদানন্দ ও আমজাদ, মার বুকে গোপালের মা ও পাগলী মা, মার পাদপদ্মে নরেন ও পদ্মবিনোদ। ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়, এই মা সারদা সেই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী যিনি প্রথম ভবতারিণীর প্রসাদ খেতে বসে শুধু লুচি তরকারি প্রসাদ খেতেন, অন্য প্রসাদ নয়। খেতে খেতে সাশ্রুনয়নে ভবতারিণীকে বলেনঃ "মা আমাকে শেষ পর্যন্ত কৈবর্ত্যের অন্ন খাওয়ালি!"

মা সারদা অবশ্য মা হিসাবে সকলকে নিজের সন্তান বলে নিজের কোলে তুলে নিলেও নষ্ট করতেন না সন্তানদের ভাব। বৈচিত্র্যের জননী স্বীকার করতেন ভাব-বৈচিত্র্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু কিছু আচার মেনে চলতেন। শ্রীমা-ও সে-আচার রক্ষা করে চলতেন। একবার ভোগের জন্য বাইরে থেকে আনা মিষ্টি গরুর গাড়ি থেকে নামাবার সময় পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। মা বলেন অন্য জাতের স্পর্শ লেগেছে। ঠাকুরতো অমন খেতেন না, তাই পড়ে গেল। দুঃখের কিছু নেই।

মা বলেই তো তিনি বলতে পারতেনঃ "শেষকালে আমি তো আছি। তবে যদি এখন শান্তিতে থাকতে চাও তাহলে যা বলছি তা কর।" সকলের শেষকালের জন্য পবিত্রতাস্বরূপিণী—শোধন করে নেবার দায়িত্ব নিয়েই তো মা।

শ্রীমাকে তাঁর সর্বগ্রাসী, সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী মাতৃত্বে বসিয়েছেন স্বয়ং অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমায়ের নিজের উক্তিঃ "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব

জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

সকলের মা সারদা বলেই কি এবারে অবতারের তপস্যার পূর্ণাহুতি মাতৃপূজায়—মা সারদার পূজায়? অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যস্ত আচারশুদ্ধ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত। বড় কড়া মেজাজ। একটি মেয়ে যেন কেমন কেমন। সে তাঁর খাবার এনেছে তাই খেতে আপত্তি। মাকে সেকথা বলতে মায়ের উত্তরঃ "আমায় 'মা' বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।" 'মা' ডাকলেই সে মায়ের। না ডাকলেও অজ্ঞাস্তে সে মায়ের। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয় জেনেও ঐ মেয়েটির 'মা' ডাকে সাড়া দেন মা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের এই মাতৃত্বের পরিচয়ে মনে মনে কিন্তু খুশিই।

দক্ষিণেশ্বরে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আছেন শ্রীমা-ও। যৌবনে দুষ্কৃতকারিণী এক বৃদ্ধা যাতায়াত করেন শ্রীমায়ের কাছে। কিন্তু তা একেবারে অপছন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনি সাবধান করে দেন শ্রীমাকে—"ওটাকে এখানে কেন? ছিঃ ছিঃ! বেশ্যা। ওর সঙ্গে কি কথা?" শ্রীরামকৃষ্ণের সতর্কবাণী বুঝলেও শ্রীমা মাতৃস্থানে সস্নেহে আশ্রয় দেন ঐ বৃদ্ধাকে তাঁর মাতৃকোলে। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হন তাঁর মাতৃত্বে। মাতৃভাবে ভাবিতা শ্রীমা ফল-মিষ্টি বিলিয়ে দিতেন দক্ষিণেশ্বরে আগত স্ত্রীভক্তদের মধ্যে। এ-নিয়ে খরচের প্রশ্ন তুলে শ্রীরামকৃষ্ণ খোঁটা দিতেন। কিন্তু শ্রীমায়ের তা একেবারে না-পসন্দ। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করেন শ্রীমায়ের মহিমা-মণ্ডিত মাতৃশক্তির কাছে।

মায়ের স্নেহ-শাসন শুদ্ধ করে নেয় সন্তানকে। মা সারদার বগলারূপ ধারণ হরিশের পাগলামী সারাতে। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভু তো নয়। প্রয়োজনে শাসন। কিন্তু অভিশাপ কখনো নয়। মায়ের সম্পর্ক বাৎসল্যসূত্রে। আর এই সন্তানস্নেহ দেয় তাকে শাসন অধিকার। শ্রীমায়ের মাতৃস্নেহ অপরিসীম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ছোট চৌকিখানিতে। ঝাড়ু দিচ্ছেন শ্রীমা। আশ-পাশে কেউ নেই। ঝাট দিতে দিতে শ্রীমা প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকেঃ "আমি তোমার কে?" বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" শ্রীমা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মা—এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক—যা জগতে কস্মিনকালেও কেউ দেখেনি, শোনেনি। আবার এই দক্ষিণেশ্বরে পদসংবাহনরতা শ্রীমায়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ-শরীরে জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে কখনও 'তুই' বলেননি। স্ত্রীর প্রতি যেরূপ স্বামীর কর্তব্য করা উচিত, সবই করেছেন তিনি। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীমা হলেন সাক্ষাৎ আনন্দময়ী, মা জগদম্বা, আর শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন জগৎসমক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণের মা হলেন শ্রীমা।

শ্রীমা হলেন তাঁর নিজ পরিবারের মা। শ্রীমায়ের জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী। নিজ কন্যার প্রতি স্বভাবতঃই তাঁর স্নেহদৃষ্টি সমধিক। প্রত্যেক জননী নিজ কন্যাকে আদর করে 'মা' ডাকেন। শ্যামা-সুন্দরীর বেলায়ও ছিল না এর কোন ব্যতিক্রম। সেই শ্যামাসুন্দরী দেবীও অনুধাবন করতে পেরে-ছিলেন তাঁর নিজ দুহিতা শ্রীমায়ের আসল রূপটি। তাঁর দুহিতা সামান্যা মানবী নন—স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী'। বলেছিলেন শ্যামাসুন্দরী দেবীঃ "মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি মা?" "তোর মতন আমার যেন (জন্মান্তরে) একটি মেয়ে হয় মা।" "তোকেই যেন আবার আমি পাই মা।" শ্রীমায়ের সেজ ভাই কালীমামারও একই সুরঃ "দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" প্রসন্ন-মামার মেয়ে নলিনীদিদির দৃষ্টিতে তাঁর পিসীমা শ্রীমা 'অন্তর্যামী'। শ্রীমায়ের বেয়াই রাধুর খুড়শ্বশুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীমাকে ডাকেন 'মা' বলে। মনে পান আনন্দ। শ্রীমায়ের ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী ও সুবাসনা দেবীর কাছে শ্রীমা 'ঈশ্বরী।'

জয়রামবাটীর রামহৃদয় ঘোষাল অতি সাধারণ লোক। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় উপস্থিত আছেন। শ্রীমায়ের বাড়িতে। পূজা হচ্ছে। শ্রীমা প্রতিমার পাশে ধ্যানে বসে আছেন। প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী আর

পাশে ধ্যানরতা শ্রীমার অভেদরূপ দর্শন করলেন ঘোষালমশাই। জয়রামবাটীর ভানু-পিসি। বাল-বিধবা। শ্রীমায়ের আবাল্যসঙ্গিনী। ব্রজগোপীভাবে ভাবিতা তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। তিনিও লাভ করেছেন তাঁর কৃপা। সেই ভানু-পিসি শ্রীমাকে দেখলেন 'চতুর্ভুজারূপে'। জয়রামবাটীর মৃগেন্দ্রের মা লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী। শ্রীমায়ের অনুরাগিণী অশিক্ষিতা মৃগেন্দ্রের মা শ্রীমায়ের বাড়িতে মুড়ি ভাজেন। টুকিটাকি কাজও করতেন শ্রীমায়ের সংসারে। শ্রীমায়ের দিব্যরূপ নিত্য দর্শন করেন তিনি। সামান্যা মৃগেন্দ্রের মার কাছে শ্রীমা ছিলেন 'রাজ-রাজেশ্বরী', 'সাক্ষাৎ ভগবতী'। শ্রীমা হলেন জয়রামবাটীর মা।

নিজ শ্বশুরকুলেরও মা ছিলেন শ্রীমা। শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদাদা শ্রীমায়ের ভিক্ষাপুত্র। শিবুদাদা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভালবাসতেন তাঁকে। কামারপুকুর থেকে তিনি জয়রামবাটীতে এসেছেন শ্রীমায়ের দর্শনে। বিকালে ফিরে যাচ্ছেন কামারপুকুরে। খানিকটা গিয়ে শ্রীমায়ের কাছে আবার উপস্থিত শিবুদাদা। এসেই শ্রীমায়ের চরণতলে পতিত হয়ে কাঁদছেন। আর বলছেন, "আমার কি হবে?" শ্রীমা অভয় দিচ্ছেন তাঁকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা শিবুদাদা শ্রীমার শ্রীমুখ থেকে জানতে চান: "বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা।" বিচলিত শ্রীমার ভাবান্তর হলো শিবুদাদার ব্যাকুলতায়। শিবুদাদার মাথায় হাত দিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন শ্রীমা: "হাঁ, তাই।" করজোড়ে স্তবপাঠ করলেন শিবুদাদা—"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" ইত্যাদি। শিবুদাদার কাছে শ্রীমা ছিলেন 'সাক্ষাৎ কালী', 'সাক্ষাৎ কপালমোচন', মুক্তিদাত্রী। বৈষ্ণবভাবাপন্না লক্ষ্মীদিদি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি। রাধাকৃষ্ণভাবে ভাবিতা লক্ষ্মীদিদি, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা। মা শীতলার অংশে জন্ম তাঁর। তিনি শ্রীমায়ের দোসর, সঙ্গিনীও বটেন। লক্ষ্মী-দিদির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা ছিলেন অভিন্না। শিবুদাদা, লক্ষ্মীদিদিরও মা সারদা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু কামারপুকুরের জমিদার ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী। বালবিধবা সর্বজন-মানিতা ও পূতচরিত্রা প্রসন্নময়ী। স্বামীহারা শ্রীমায়ের বালা ও সরু লালপেড়ে বস্ত্র ব্যবহারে পল্লীবাসিনী মহিলাদের কলরবে মুখরিতা কামারপুকুর। সেই মুখর কলরব নীরব হলো প্রসন্নময়ীর সসম্ভ্রম উক্তিতে—"গদাই, গদাই-এর বউ—এঁরা দেবাংশী।" শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা নীচজাতীয়া ধনী কামারনী ও তাঁর বোন শংকরী ছিলেন প্রসন্নময়ীর দলে। শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠশালার সহপাঠী গণেশ ঘোষালের বোধগম্য হয়েছিল শ্রীমায়ের আসল রূপটি। তাঁকে শ্রীমা প্রণাম করতে উদ্যত হলে ঘোরতর আপত্তি করে গণেশ বললেন: "তিনি মা, মা সন্তানকে প্রণাম করলে তাঁর অকল্যাণ হয়।" গণেশ প্রণাম করলেন শ্রীমাকে। অতএব কামারপুকুরেও শ্রীরামকৃষ্ণের সহপাঠীরও তিনি মা।

১৮৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করেছে জয়রামবাটীকে। শ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র দরিদ্র, দয়ালু, সরল ও পরোপকারী। গরিব গ্রাম-বাসীদের হাহাকারে বিচলিত রামচন্দ্র। তাঁর নিজের মরায়ে সঞ্চিত ছিল কিছু ধান। নিজের পরিবারদের ভরণপোষণের কথা একবারও চিন্তা করলেন না। আরম্ভ করলেন অন্নসত্র। কলায়ের ডালের গরম খিচুড়ি পরিবেশিত হতো দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে। ক্ষিদের জ্বালায় একটুও তর সইত না তাদের। মাতৃস্নেহে অভিষিক্তা বালিকা শ্রীসারদা বাতাস করতেন। জুড়িয়ে যেত খিচুড়ি। তৃপ্ত করে আহার করত লোকেরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লোকক্ষয়ে শ্রীমা ছিলেন বিশেষ ব্যথিত। দেশের দুঃখ-দুর্দশায় অস্থির হয়ে উঠত তাঁর মাতৃ-হৃদয়। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন তিনি। দামোদরের বন্যায় সর্বস্বান্ত বহুলোকের কান্নায় করুণায় বিগলিত শ্রীমা। বলতেন: "দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস।" শ্রীমা ছিলেন দুঃখীদের মা।

ডাকাতদের মা হলেন শ্রীমা সারদা। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে স্বামী সন্নিধানে চলেছেন হেঁটে হেঁটে জয়রামবাটী হতে। সুদীর্ঘ পথ। আরামবাগের পরেই ভয়সঙ্কুল কুখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ। সঙ্গীরা দ্রুত হেঁটে মাঠ পেরিয়ে চলে গেছেন তারকেশ্বরের দিকে। শ্রীমা পিছিয়ে। সন্ধ্যা ঘেয়ে এল ঠিক

তেলোভেলোর মাঠে। বিষম উৎকণ্ঠিতা তিনি। তবুও পার হচ্ছেন জনবসতিহীন ডাকাতদের মাঠ। হঠাৎ সামনে রুখে দাঁড়াল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঝাকড়া ঝাকড়া চুল এক ভয়ংকর বাগদী ডাকাত। প্রশ্ন-উত্তর আদান-প্রদান হলো দুজনের মধ্যে। শ্রীমায়ের সামনে এল ডাকাতটি। শ্রীমায়ের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার। কি হলো কি জানি, নিচু হলো ডাকাতের মাথা। কাছে এল ডাকাতের স্ত্রী। শ্রীমা সরলভাবে পরিচয় দিলেন "তাদের মেয়ে"। তারাও সহজ হলো তাঁর কাছে। এখন তিনি ডাকাতদম্পতির কন্যা। শ্রীমায়ের মধ্যে কি দেখেছিল ডাকাতদম্পতি। শ্রীমা-ই জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁদেরকে। উত্তর দিয়েছিলেন তাঁরা: "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখেছি।" জয়রামবাটীর অদূরে শিরোমণিপুর। তুঁতে চাষী মুসলমানদের বাস। বিদেশী শাসনে তুঁতের চাষ বন্ধ। নিরুপায় মুসলমানরা আরম্ভ করল ডাকাতি। তাদের দাপটে সকলে ত্রস্ত। সেই ডাকাতরা শ্রীমার স্নেহ-স্পর্শে হলো অন্য মানুষ। তাদের নিরীহ ব্যবহারে গ্রাম-বাসিরা পর্যন্ত বলেছিল, "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীমাও আছেন ওখানে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত এক পাগলী। তিনিও সহানুভূতির সঙ্গে আলাপাদি করতেন তাঁর সঙ্গে। জানা গেল, পাগলী মধুর ভাবের সাধিকা। একদিন তিনি তাঁর অন্তরের কথা নিবেদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। স্বভাবতই সদা মাতৃভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণের মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। পাগলীর বিজাতীয় ভাবে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায়। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। আর তার প্রতি বর্ষিত হলো গ্রাম্য ভাষায় অকথ্য নিন্দা। পাগলীও কিংকর্তব্যবিমূঢ়া—লজ্জায় তার মুখ লাল বর্ণ। শ্রীমার সব কর্ণগোচর হচ্ছিল নহবত থেকে। কন্যাসম পাগলীর অপমানে শ্রীমাও লজ্জিতা। আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। গোলাপ-মাকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন পাগলীকে। পাগলী এলে স্নেহভরে শ্রীমা বললেন: "বাছা, উনি তোমায় দেখে যখন বিরক্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে, আমার কাছে এলেই তো পার।" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিরস্কৃতা পাগলী শ্রীমার কাছে পেল স্নেহাশ্রয়।

রাধুকে নিয়ে শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে আছেন। জগদম্বা আশ্রম খুব নির্জন। জঙ্গলও বেশ। মাঝে মাঝে উপদ্রব হতো ভালুকের। রাত্রি দশটা। মেঘলা আকাশ—বৃষ্টি পড়ছে। শ্রীমা গল্প করছেন সঙ্গীদের সঙ্গে। তিনি নিজেই শিহড়ের পাগলাটার কথা পাড়লেন। নবাসনের বউ-এর আশংকা, হয়তো এখনই আসতে পারে পাগল। শ্রীমার আশা—আমোদরের নদী ভেঙে তার আসার সম্ভাবনা কম। ওমা, এই না বলতেই শিহড়ের পাগল এক বোঝা সজনে শাক নিয়ে হাজির শ্রীমায়ের কাছে। সকলেই ভয়ে অস্থির। কেউ কেউ আবার ঘরে ঢুকে দরজায় দিল খিল। শ্রীমা কিন্তু অচঞ্চল। আদর করে বসতে বললেন পাগলকে। সে বলল: "তোমার জন্য সজনে শাক নিয়ে এনু।" শ্রীমা তাঁর অবোধ পাগল ছেলেকে আবদারের সুরে বললেন, "যা, যা, এত রাত্রে গোল করিসনে।" যেতে চাইল না পাগল। ভরা নদী। সাঁতরে এসেছে কোন রকমে। ওভাবেই ফিরে যেতে বলল কেউ। শ্রীমা তখন অতি মিষ্টস্বরে বললেন: "লক্ষ্মীটি, গোল করিস নে।" মাতৃস্নেহে দ্রবীভূত পাগল শ্রীমার কাছে বিদায় নিল শান্ত মনে। অবহেলিত শিহড়ের পাগল হলো মা সারদার সন্তান।

শ্রীমা আছেন দোতলার ঘরে। সন্ধ্যাকাল। আপনমনে জপ করছেন বারান্দায়। ঘরের বিপরীত দিকে সপরিবারে কুলি-মজুরদের বাস। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল শ্রীমায়ের জপ। দেখতে পেলেন—এক কুলি বেধড়ক প্রহার করছে তার স্ত্রীকে। লাথির চোটে মেয়েটির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আর থাকতে পারলেন না শ্রীমা। রেলিং-এ দাঁড়িয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সুরে জোর গলায় বললেন: "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি? আঃ মলো যা!" যাঁর গলার স্বর ঘনিষ্ঠ ভক্তেরাও কোনদিন শুনতে পাননি, তাঁর এই উচ্চ স্বরে সকলে চমকিত। ক্রোধোন্মত্ত কুলির দৃষ্টি পড়ল শ্রীমার ওপর। সাপের মাথায় ওঝা ধুলোপড়া দিলে যেমন হয়, ঠিক সে-অবস্থা হলো তার। ছেড়ে দিল নির্যাতিতাকে। স্বামীর কাছে অবহেলিত স্ত্রী মাতৃ-সহানুভূতি পেল শ্রীমায়ের কাছে। শ্রীমা ছিলেন অবহেলিতদের মা।

[ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

তন্ত্রসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সচ্চিদানন্দ ধর

তন্ত্রসাধনা সুপ্রাচীন এবং বহুবিস্তৃত

তন্ত্রসাধনা বৈদিক উপাসনা থেকে অভিন্ন। অনেকের মতে প্রাক্‌বৈদিক কাল থেকেই পৃথিবীর নানা স্থানে তন্ত্রসাধনা প্রচলিত এবং তার শাখা-বিশেষ মহেঞ্জদারো এবং ঋক্‌বেদের উপাসকগণ দ্বারা অনুসৃত। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, চীন, মহাচীন (মঙ্গোলিয়া) এবং আমেরিকার অধুনালুপ্ত প্রাচীন জাতিদের ধর্মীয় সাধনার পদ্ধতি কোন-না-কোন তন্ত্রকে অবলম্বন করেই প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালেও এই তন্ত্রসাধনা সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান এবং ইসলাম ধর্মে জীবিত আছে। সনাতন হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি বেদ-বেদান্তকে যতটা অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশি করে তন্ত্রকে। মূর্তিপূজা, জপ, ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম, হোম, বলিপ্রদান, উপবাস, পুরশ্চরণ, স্বস্ত্যয়ন—প্রভৃতি সব কিছুই তন্ত্রসাধনার রূপ বিশেষ। বার-তিথির বিচার, জপের সংখ্যা, জপমালার উপাদান, দেবতাবিশেষে পূজার উপচার, জপ-ধ্যান-পূজার সময় ও দিক্‌ বিচার, হোমের কুণ্ড, আহুতির দ্রব্যবিধান, মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার, আসন-মুদ্রাদির বৈচিত্র্য— তীর্থস্নান, মন্দির ও দেবতাদি-পরিক্রমা, তর্পণাদি পিতৃকর্ম এবং সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম—সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কোন-না-কোন তন্ত্রেরই নির্দেশে।

প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোন ধর্মেই পূজা, ধ্যান, জপ, বলিদান, কাল ও স্থানবিশেষে প্রার্থনা (যেমন মুসলমানের নামাজ—কাবা অভিমুখে পাঁচ-বার—শুক্রবারে এবং রমজান মাসে বিশেষভাবে; খ্রীস্টানদের গীর্জায় প্রার্থনা, রবিবারে মেরী বা যীশুর মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে—বক্ষে 'ক্রশ' ধারণ করা ইত্যাদি) সবই ব্যাপক অর্থে তন্ত্রসাধনার রূপান্তর মাত্র। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের সম্প্রদায়-বিশেষ মালা-জপ করেন—এও তান্ত্রিকতাই। বৌদ্ধরা —বিশেষতঃ মহাযানীরা তো ঘোর তান্ত্রিক। বেদের নানা জাতীয় যজ্ঞানুষ্ঠান তান্ত্রিকতার একটা প্রাচীনতম নিদর্শন। তন্ত্র এবং তান্ত্রিকতা সম্পর্কে আমাদের একটা অজ্ঞতাহেতুক ভয়, বিদ্বেষ এবং নিম্নমার্গীয় সাধনা মনে করে কথঞ্চিৎ হেয়ভাবে দেখার প্রবণতা আছে। আসলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতিটি চিন্তা এবং চেষ্টাই তন্ত্রের বিষয়বস্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তন্ত্রকে এক অভিনব মর্যাদা দান করেছে

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র সাধনায় যুগযুগান্তের সকল সাধকের সকল সাধনার ধারাই মিলিত হয়েছে। যেহেতু মূলতঃ প্রতিটি সাধন-পদ্ধতিই কোন-না-কোন তন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত এবং যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিটি সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করেছেন সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিকবরিষ্ঠ। আনুষ্ঠানিকভাবে যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট তন্ত্রসাধনা আরম্ভ করার পূর্বেই, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজক হিসাবে নিজের তীব্র সাধনার একাগ্রতার ফলেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আপন সত্তার একত্ব অনুভব করে জীবন্মুক্ত সিদ্ধযোগীরূপে 'ভাবমুখে' অবস্থান করছিলেন। বাল্যেই ব্রাহ্মণসন্তান গদাধরের গায়ত্রী দীক্ষা হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পূজকপদ গ্রহণের পূর্বে তিনি শাক্ত তন্ত্রসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেনারাম ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু এবং যোগেশ্বরী ভৈরবী ঠাকুরানী তাঁর তন্ত্রসাধনার শিক্ষাগুরু বা আচার্য। তন্ত্রদীক্ষা নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার আরম্ভ।

আধ্যাত্মিক সাধনার চরম ফল—"সর্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শন"। শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তী কালে বহুবিধ মতপথের সাধনা করে—সর্বভূতে একই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করলেও তাঁর প্রথম সিদ্ধি এসেছিল ভবতারিণীর পূজার ফলশ্রুতি হিসাবেই। তিনি মনে প্রাণে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—এই তান্ত্রিক শাস্ত্র-নির্দেশকে জীবনে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন

ভবতারিণীর পূজায় নিরত থাকা কালেই। দেবীর পূজা আর নিজের পূজা তাঁর কাছে তখন এক হয়ে গিয়েছে। নৈবেদ্য মা-কালীকে খাওয়ানো এবং বিড়ালকে খাওয়ানোর মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে। লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে, নারী এবং পুরুষে, শুচি এবং অশুচিতে ভেদ ঘুচে গিয়েছে। এক কথায় দেবী ভবতারিণীর পূজার মাধ্যমেই গদাধরের 'সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন' হয়ে গিয়েছে।

জীবন্মুক্ত সিদ্ধসহজ অবস্থার স্থায়ী মহাভাব অনুভবের পরও তিনি যোগেশ্বরীর অনুরোধে এবং 'ভবতারিণীর অনুমোদনক্রমে' দীর্ঘ দুইবৎসরকাল ধরে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের পরপর সাধনা করলেন এবং প্রতিটিতেই সিদ্ধ হলেন। তাঁর তন্ত্রসাধনা আধুনিক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসাকে একটি দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তন্ত্রের ভীতি ও অপযশকে দূর করেছে।

ভৈরবী যোগেশ্বরী শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংসত্ব প্রচারক

তন্ত্রসাধনার মধ্যেই সর্বপ্রকার সাধনা নিহিত। সুতরাং তন্ত্রসাধনায় যথার্থ সিদ্ধ অন্য যে-কোন মত-পথের সাধনায় সিদ্ধকেও সহজেই চিনতে পারেন। বৈষ্ণব সহজিয়া তান্ত্রিকরা বলেন—"সহজ না হইলে সহজকে যায় না চেনা।" যোগেশ্বরী ভৈরবী সর্বতন্ত্রসিদ্ধা ছিলেন বলেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন মাত্রেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মদর্শী, সিদ্ধ, অবতারকল্প মহাপুরুষ। 'ভাবমুখে' এবং 'মহাভাবে' সর্বদা স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সকল আচার আচরণ এবং দৈহিক বিকারকে সাধারণ মানুষ ব্যাধি বলে বৈদ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থার উপদেশ দিত, সেখানে ব্রাহ্মণী শাস্ত্রজ্ঞান এবং নিজ সাধনার অনুভব থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐ সকল দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিরই ফলশ্রুতি। তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং নানা সম্প্রদায়ের সিদ্ধ সাধকদের সভায় প্রমাণ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুরই ন্যায় ভগবানের অবতার। "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"[১] যোগেশ্বরীই নবাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বপ্রথম পরমহংসত্ব প্রচার করেন।

ঠাকুর বলতেন ঃ "সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বর দর্শন শেষকালের কথা। সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়।"[২] ভবতারিণীর সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে 'সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন' হয়েছিল—পরবর্তী কালে বিভিন্ন তন্ত্র সাধনার ফলেও সেই ব্রাহ্মীস্থিতি তাঁর লাভ হয়েছিল। 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কুণ্ডলিনী শক্তি 'হংস' অবলম্বন করে জীবাত্মাকে ধারণ করে আছেন। তন্ত্রমতে 'হংস', 'সোহং' এবং 'ওঁ' একার্থক। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শীই বলতে পারেন—'সোহং'—'আমিই সেই', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম। তন্ত্রমতে 'পরমহংসের' অর্থ হলো জ্ঞানমুক্ত, নির্বিকার, সমদর্শী ও জীবন্মুক্ত। তন্ত্রের এই শ্লোকে পরমহংস অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্বমত-সমদর্শী 'কৌল'—তন্ত্রসিদ্ধ আর কে আছেন? তন্ত্র সিদ্ধ সমদর্শীই পরমহংস।

যোগেশ্বরী ভৈরবীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের চৌষট্টি তন্ত্রের সাধন

যোগেশ্বরীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয় প্রসঙ্গ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা এক অজ্ঞাত দৈব ইচ্ছার নির্দেশেই সম্পাদিত হয়েছিল। তন্ত্রসিদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁর সাধনার উপলব্ধিকে জগৎকল্যাণে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তার করবার জন্য দৈবাদিষ্ট হয়ে গঙ্গার তীরে তীরে যোগ্য সাধকের সন্ধানে রত হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই ব্রাহ্মণী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "বাবা তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম—এত দিনে দেখা পাইলাম।... তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৮০), সাধকভাব, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৯৪
২ ঐ, পৃঃ ১৮

করিতে হইবে, একথা জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুইজনের দেখা পূর্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।”[৩]

ভৈরবীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। কারণ তিনি দেবী ভবতারিণীর পূজার মধ্য দিয়েই সমগ্র বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করে দিব্যানন্দে 'ভাবমুখে' অবস্থান করছিলেন। 'লব্ধানন্দী' শ্রীরামকৃষ্ণের আর কিছু প্রাপ্তব্য ছিল না। আপ্তকাম সর্বজ্ঞের আর কিছুই কামনা ছিল না। কিন্তু যোগেশ্বরী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের পূর্ণ অবতার জেনেও এবং তাঁর অবতারত্ব শাস্ত্র ও নিজ অনুভব-সহায়ে পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠা করেও শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে কেন দীর্ঘ দুই বৎসরকাল চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধন করিয়েছিলেন তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার মনে করলেও সময় সময় তিনি নিজেকে স্নেহশীলা মাতার এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে পুত্রের আসনে বসিয়ে পুত্রের অধিকতর কল্যাণ কামনায় তাঁকে দিয়ে তন্ত্রসিদ্ধির রসাস্বাদন করাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তন্ত্রসাধনার পূর্বে মা-কালীর পূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক অনুভবকে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন শাস্ত্র নির্দিষ্ট সাধনা পরম্পরার স্তর বা ক্রিয়াক্রমের মাধ্যম দিয়ে লাভ করেননি। তাই তিনি ব্রাহ্মণীর প্রমাণের পূর্ব পর্যন্ত নিজ দিব্য অনুভব-সকলকে সরল বালকের ন্যায় যে যা বলত সেভাবেই গ্রহণ করতেন। এইজন্যই তিনি নিজ যোগজ সাত্ত্বিকভাবকেও সাধারণ লোকের কথায় দেহজ ব্যাধি মনে করেই বৈদ্যের দ্বারা দেহ-চিকিৎসায় কোন আপত্তি করেননি। তন্ত্রসাধনার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণকে আরও বহু মত ও পথের সাধনা করতে হয়েছিল। তান্ত্রিক সাধনার স্তর পরম্পরায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজেই ঐ সকল দিব্য অনুভবকে যথাযথভাবে দৃঢ় প্রত্যয় দিয়ে গ্রহণ করে জগদ্বাসীর কাছে সর্বধর্মের ও সাধন-পদ্ধতির সত্যতাকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। তন্ত্রসাধনার প্রতি সাধারণ মানুষের যে বিপরীত ভাব ছিল—এবং তন্ত্রসাধনা যেভাবে বিকৃত ও নিন্দিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় তন্ত্রশাস্ত্র সেই অপবাদ এবং দুরাচার থেকে মুক্তিলাভ করেছে। তন্ত্রসাধনা 'মাতৃ-তন্ত্রে' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্ত্রী মূর্তিতে দেবী-জ্ঞানসিদ্ধি এবং জগতে মাতৃভাব প্রচার দ্বারা তন্ত্রসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনার এক নবদিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। “অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দেশ লাভ-পূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।”[৪]

চৌষট্টি তন্ত্রের তালিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন যে, বিষ্ণু-ক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪খানা তন্ত্রের যত সাধনার কথা আছে ব্রাহ্মণী একে একে শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে তার সব কয়খানিরই সাধন করিয়ে নেন।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ ৬৪খানা তন্ত্রের সাধন করেছিলেন তার নামের তালিকা আমাদের সঠিক জানা নেই। বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা এই তিনটি হলো তন্ত্রশাস্ত্র-চর্চার তিনটি ভৌগোলিক দেশবিভাগ। রথে চড়ে যে-সকল দেশে চলাফেরা করা যায় তা হলো রথক্রান্তা, যে-দেশে অশ্বের ওপর নির্ভর করে চলতে হয় তা অশ্বক্রান্তা এবং বাকি সব দেশই —বিশেষতঃ যে-সকল দেশ নদী ও জলযান নির্ভর, সেই সকল দেশই হলো বিষ্ণুক্রান্তা। পূর্বভারতের কামরূপ, শ্রীহট্ট এবং উড্ডীয়ান (উড়িষ্যা?) তন্ত্র-প্রধান দেশ। পূর্বভারত থেকে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সমগ্র এলাকাই বিষ্ণুক্রান্তা বিভাগের অন্তর্গত। প্রাচীন যামল এবং কোন কোন তন্ত্রে ৬৪খানা আগম এবং তন্ত্রের তালিকা আছে। শ্রীকণ্ঠী সংহিতাতে আছে চতুঃষষ্টি ভৈরবাখ্য অদ্বৈতাগমের

৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৮০), সাধকভাব, পৃঃ ১৮৮—১৮৯

৪ ঐ; পৃঃ ২১০—২১১

৫ ঐ, পৃঃ ২০৪

কথা। ভগবান শঙ্করাচার্য আনন্দলহরী স্তোত্রে (শ্লোক ৩১) কুলমার্গানুসারী চৌষট্টি তন্ত্রের সংখ্যাটির মাত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্ত সেই ৬৪খানা তন্ত্রের নাম কি?

'চতুঃশতী'তে আমরা চৌষট্টিখানা তন্ত্রের নিম্নরূপ একটি তালিকা পাইঃ— ১ মহামায়া, ২ শম্বর, ৩ যোগিনীজাল শম্বর, ৪ তত্ত্বশম্বর, ৫ সিদ্ধি ভৈরব, ৬ বটুক ভৈরব, ৭ কঙ্কাল ভৈরব, ৮ কালভৈরব, ৯ কালাগ্নি ভৈরব, ১০ যোগিনী ভৈরব, ১১ মহাভৈরব, ১২ শক্তি ভৈরব, ১৩ ব্রাহ্মী, ১৪ মাহেশ্বরী, ১৫ কৌমারী, ১৬ বৈষ্ণবী, ১৭ বারাহী, ১৮ চামুণ্ডা, ১৯ শিবদূতী, ২০··· (?), ২১—২৮ যমলাষ্টক ২৯ চন্দ্রজ্ঞানতন্ত্র ৩০ মালিনী বিদ্যা, ৩১ মহাসম্মোহন, ৩২—৩৬ বামজুষ্টতন্ত্র, মহাদেব, বাতুল, বাতুলোত্তর, কামিক, ৩৭ হৃদ্ভেদতন্ত্র, ৩৮ তন্ত্রভেদ, ৩৯ গুহ্যতন্ত্র, ৪০ কলাবাদ, ৪১ কলাসার, ৪২ কুণ্ডিকামত, ৪৩ মতোত্তরমত, ৪৪ বীণাখ্যতন্ত্র, ৪৫ ত্রোতলতন্ত্র, ৪৬ ত্রোতলোত্তর, ৪৭ পঞ্চামৃত, ৪৮—৫২ রূপভেদ, ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ, কুলচূড়ামণি, ৫৩—৫৭ সর্বজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, অরুণেশ, মোদনীশ, বিকুণ্ঠেশ্বর, ৫৮—৬৪ পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, নিরুত্তর বিমল, বিমলোথ, দেবীমত।[৬] এই তন্ত্রগুলি মুখ্যতঃ ঐহিক শক্তিলাভের উপায় বলে আধ্যাত্মিক কল্যাণকামী সাধকের পক্ষে ইহাদের সাধনা গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয় না। এই তন্ত্রগুলি মুখ্যতঃ বিভিন্ন 'সিদ্ধাই' লাভের উপায় মাত্র। সুতরাং যোগেশ্বরী নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে এই জাতীয় তন্ত্রের সাধনা করাননি। সিদ্ধাইকে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই নিন্দা করেছেন।

তোড়লতন্ত্রে যে ৬৪ খানা তন্ত্রের উল্লেখ আছে তার অধিকাংশেই শক্তি ও শিবকে অবলম্বন করে সাধনার নির্দেশ আছে। এদের মধ্যে রাধাতন্ত্র ও নারায়ণীতন্ত্র বৈষ্ণব মতের পোষক। জ্ঞানদীপ তন্ত্র, নির্বাণতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র এবং আরও কয়েকটি নিরাকার ব্রহ্মসাধনার নির্দেশক। তালিকাটি এরূপ ঃ

১ কালী, ২ মুণ্ডমালা, ৩ তারা, ৪ নির্বাণ, ৫ শিবসার, ৬ বীর, ৭ নিদর্শন, ৮ লতার্চন, ৯ তোড়ল, ১০ নীল, ১১ রাধা, ১২ বিদ্যাসার, ১৩ ভৈরব, ১৪ ভৈরবী, ১৫ সিদ্ধেশ্বর, ১৬ মাতৃভেদ, ১৭ সময়া, ১৮ গুপ্ত সাধন, ১৯ মায়া, ২০ মহামায়া, ২১ অক্ষয়া, ২২ কুমারী, ২৩ কুলার্ণব, ২৪ কালিকা-কুলসর্বস্ব, ২৫ কালিকাকল্প, ২৬ বারাহী, ২৭ যোগিনী, ২৮ যোগিনী-হৃদয়, ২৯ সনৎকুমার, ৩০ ত্রিপুরাসার, ৩১ যোগিনী-বিজয়, ৩২ মালিনী, ৩৩ কুক্কুট, ৩৪ শ্রীগণেশ, ৩৫ ভূত, ৩৬ উড্ডীশ, ৩৭ কামধেনু, ৩৮ উত্তম, ৩৯ বীরভদ্র, ৪০ রামকেশ্বর, ৪১ কুলচূড়ামণি ৪২ ভাবচূড়ামণি, ৪৩ জ্ঞানার্ণব, ৪৪ বরদা, ৪৫ তন্ত্রচিন্তামণি, ৪৬ বাণীবিলাস, ৪৭ হংসতন্ত্র, ৪৮ চিদম্বরতন্ত্র, ৪৯ ফেৎকারিণী, ৫০ নিত্যা, ৫১ উত্তর, ৫২ নারায়ণী, ৫৩ ঊর্ধ্বাম্নায়, ৫৪ জ্ঞানদীপ, ৫৫ গৌতমীয়, ৫৬ নিরুত্তর, ৫৭ গর্জন, ৫৮ কুব্জিকা, ৫৯ তন্ত্রমুক্তাবলী, ৬০ বৃহৎস্ত্রীক্রম, ৬১ স্বতন্ত্র, ৬২ যোনি, ৬৩ কামাখ্যা, ৬৪··· (?)।[৭]

যোগেশ্বরী ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে এই সকল তন্ত্রেরই সাধন করিয়েছিলেন নিঃসন্দেহ। কারণ বিষ্ণুক্রান্তায়—পূর্ব-ভারতে এখনও এই সকল তন্ত্রের অনেকগুলিই প্রচলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত তন্ত্রের আচার ও ক্রিয়ার পরিচয়

তন্ত্রসাধনায় প্রথম প্রয়োজন গুরু। তারপর দীক্ষা এবং বিশেষ দীক্ষা বা অভিষেক। অভিষিক্ত শিষ্যই উচ্চগ্রামের তন্ত্রসাধনার অধিকারী। যোগ্য গুরুই শিষ্যের যোগ্যতা বিবেচনায় বীরাচারের তন্ত্রসাধনার নির্দেশ দিতে পারেন। বীরাচারই উচ্চতম তন্ত্রসাধনা।

কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন ভবতারিণীর পূজকপদ গ্রহণের পূর্বে। যোগেশ্বরীর কাছে হয় তার 'অভিষেক' দীক্ষা। যোগেশ্বরীর আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করে

৬ তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্দর্শন—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, পৃঃ ৬০

৭ ঐ, পৃঃ ৬১

"ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।"[৮] অভিষেক দীক্ষার গুরু দুর্লভ।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী এবং বেলতলায় দুটি পঞ্চ মুণ্ডাসন ব্রাহ্মণী নির্মাণ করান। "ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের ওপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল।"[৯] পুরঃ-মন্ত্রসিদ্ধির প্রথমে যৎ 'চর্য্যতে'—আচরণীয় ক্রিয়া-সমষ্টিই পুরশ্চরণ। কুলার্ণবতন্ত্র মতে পূজা, জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণভোজন পুরশ্চরণের কৃত্য। পুরশ্চরণের কোন অঙ্গ বাদ পড়লে তা জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পঞ্চমুণ্ডাসন তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ প্রয়োজন। জপ এবং ধ্যানই তন্ত্রের মানসিক প্রস্তুতির উপাদান। বাহ্য উপাদান—শব, মদ্য, মাংস, মুদ্রা ইত্যাদি গৌণ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়-প্রলোভন, ইন্দ্রিয়াসক্তি ইত্যাদি থেকে মনকে মুক্ত করার জন্য বাহ্য উপাচারের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দুবৎসরকাল তন্ত্রসাধনার দুষ্প্রাপ্য পদার্থ-সকল সংগ্রহ করে, ৬৪খানা তন্ত্রের খুঁটি-নাটি সব সাধনাই তাঁকে দিয়ে করিয়েছিলেন। যে পঞ্চ-'ম'-কারকে দুঃসাধ্য মনে হয়, তাতেও তিনি সিদ্ধ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পঞ্চ-'ম'-কার সাধন

শ্রীরামকৃষ্ণ সব তন্ত্রের সকল সাধনাই করেছিলেন যোগেশ্বরীর নির্দেশে। পঞ্চ-'ম'-কার সাধন সম্পর্কে সাধারণ তান্ত্রিকের সাধনার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পার্থক্য আছে। পঞ্চ-'ম'-কারের তালিকা নিয়েও মতভেদ আছে। সাধারণ অর্থে পঞ্চ-'ম'-কার হলো মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা প্রসঙ্গে পঞ্চ-'ম'-কারের উল্লেখ আছে। তন্ত্রসাধনায় পূর্ণ সিদ্ধ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তী কালে সাধারণ সাধককে তন্ত্রসাধনার পথে যেতে নিষেধ বা সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ, সকলের পক্ষে এই কঠিন সাধনার অনুষ্ঠান উপযোগী নয়। এই সম্পর্কে তাঁর উক্তি—"কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে-সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।"[১০] এ-সকল কঠিন সাধনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

স্ত্রী-মূর্তিতে দেবীজ্ঞান সিদ্ধির জন্য ভৈরবী ব্রাহ্মণী কোন এক পূর্ণযৌবনা নারীকে বিবস্ত্রা করে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে, তার কোলে বসে জপ করতে বলেন। মাতৃভাবে আপ্লুত শ্রীরামকৃষ্ণ সহজেই এই সাধনায় উত্তীর্ণ হন।

ঘৃণা ত্যাগের জন্য শবের খুলিতে মৎস্য রন্ধন করে দেবীকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে গ্রহণ করান। একদিন গলিত নরমাংস খণ্ড দেবীর প্রসাদ জ্ঞানে তাকে গ্রহণ করতে হয়। গভীর অন্ধকার রাত্রে ভৈরব কর্তৃক নানাপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। শিবানীর উচ্ছিষ্টকে দেবীর প্রসাদরূপে গ্রহণ করেছেন।

অপর নারী-পুরুষের সম্ভোগানন্দ দর্শন করেই তিনি ইহাকে "শিব-শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ" হয়ে পড়েছিলেন। পঞ্চ-'ম'-কারে এইরূপ সিদ্ধ হবার পর ব্রাহ্মণী তাঁকে বলেছিলেন ঃ "বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন।"[১১] মদ্য বা 'কারণ' দর্শন ও শ্রবণ মাত্রেই তিনি জগৎকারণের উপলব্ধিতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। অন্য তন্ত্রসাধকেরা 'মদ্য' এবং 'মৈথুনকে' যেভাবে গ্রহণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেইভাবে গ্রহণ না করেও তন্ত্রসিদ্ধ হন। নারীমাত্রেই মাতৃজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রেখে তন্ত্রোক্ত বীরভাবে সাধনের অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই একমাত্র সম্ভব হয়েছিল।

তন্ত্রসাধন কালে নানারূপ সিদ্ধাই এবং অলৌকিক দিব্যদর্শনও তাঁর হয়েছিল। সিদ্ধাই লাভকেই

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ২১৬
৯ ঐ, পৃঃ ২০৩
১০ ঐ, পৃঃ ২০৪
১১ ঐ, পৃঃ ২০৬

হীনশ্রেণীর তান্ত্রিকেরা সাধনার চরম অবস্থা মনে করে পতিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাইকে সর্বদাই নিন্দা করতেন। নিজ জীবনে আগত সিদ্ধাইকে তিনি 'মার' কাছে প্রার্থনা করে দূরে সরিয়ে রেখে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পথেই এগিয়ে গেছেন। অনেকগুলি তন্ত্র এই সিদ্ধিলাভের উপরই প্রাধান্য দিয়েছে।

তন্ত্রসাধন কালে অন্যান্য অলৌকিক দিব্যদর্শন

এই সময় কিছুদিন তিনি নিজেকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দেখেছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তী কালে নিজ অভিজ্ঞতাবর্ণনা করেছিলেন। ষড়্দল পদ্মের জাগরণের প্রতিটি ধাপ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। ব্রহ্মযোনি দর্শন, কুলাগারে দেবীদর্শন—এই বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাখ্যা এবং অভিজ্ঞতা। তাঁর মোহিনীমায়া দর্শন—একই নারীর সন্তান প্রসব এবং নিজ সন্তানকে গ্রাস করা—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় রহস্যের এক বিস্ময়কর ব্যাখ্যা। ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর মাতৃরূপ দর্শন তাঁকে যে মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—তারই পরিসমাপ্তি দেখি শ্রীমা সারদাদেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজার মধ্যে। এই সময় দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, নিজের অঙ্গকান্তির অস্বাভাবিক প্রকাশ প্রভৃতি ও তাঁর বিভূতিরূপে দেখা দিয়েছিল। তন্ত্রসাধনার দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তিনি সর্বত্র সমদর্শিত্ব দৃষ্টিলাভ করেন। "তুলসী ও সজিনা গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।"[১২]

নিজে তন্ত্রসিদ্ধ হয়েও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে সতর্কবাণী

বিশ্বের যাবতীয় অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনা করে যে-সত্যে উপনীত হয়েছিলেন তা বেদ-উপনিষদের সাধনার উপলব্ধি থেকে অভিন্ন হলেও তিনি সাধারণ অধিকারীকে এই সাধনা থেকে বিরত থাকতেই পুনঃপুনঃ সাবধান করেছেন। "সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্পবিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন।"[১৩] 'বিরল' আধিকারীকে 'কোন কোন' ক্রিয়ার উপদেশ দিলেও ঐ পথে না যাওয়ার কথাই তার উপদেশে পুনঃপুনঃ প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলছেন: "তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।"[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রমতের সাধক জেনে তাঁর কাছে অনেকে তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসলেও তিনি এই বিষয়কে খুব আমল দিতেন না। মাতৃভাবের ভক্তিসাধনার ওপরই জোর দিতেন। তান্ত্রিক অচলানন্দকে বলেছিলেন: "কে জানে বাপু আমার ওসব ভাল লাগে না। আমার সন্তান ভাব।"[১৫] স্বামীজীকে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, সে-কথাই আমাদের কাছে চরম নির্দেশ—"তোর আর এসব কথা শুনে কাজ নাই। কর্তাভজা, ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী আবার ভৈরব-ভৈরবী এরা ঠিক ঠিক সাধনা করতে পারে না, পতন হয়। ও-সব পথ নোংরা পথ, ভাল পথ নয়। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।"[১৬] তন্ত্রসাধনার নির্যাস মাতৃভাব। তন্ত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত মাতৃভাবের আদর্শেই নিতে হবে।

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২১৫

১৩ ঐ, পৃঃ ২১১

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬২

১৫ ঐ, পৃঃ ১১৮৩

১৬ ঐ, পৃঃ ১১৮২

রোমাঁ রোলাঁ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন

স্বামী অলোকানন্দ

"I look upon Swami Vivekananda as a dynamo of spiritual force and Sri Ramakrishna as a river of love. Both of them reveal God and life Eternal.···I wish to dedicate to them a book which would make them known to the great masses of the West."[১]—স্বামী বিবেকানন্দ যেন অধ্যাত্ম-শক্তির একটি বিদ্যুতাধার আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি প্রেম-স্রোতস্বিনী। এভাবেই আমি তাঁদের দেখি। দুজনেই ঈশ্বর ও অনন্ত জীবনকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের নামে একটি গ্রন্থ আমি উৎসর্গ করতে চাই, যা পাশ্চাত্যের বহু-সংখ্যক মানুষের কাছে তাঁদের পরিচিত করবে।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে প্রচার করলেনঃ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" এই বাণী ভারতবর্ষের বাণী। এই বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ। পৃথিবীর স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে গেল বিবেকানন্দ-প্রচারিত সেই প্রেম ও মৈত্রীর বাণীকে। যেমন করে একদিন যীশুর প্রেমের বাণীকে অবজ্ঞা করে তারা 'ক্রুসেড' নামে এক কলঙ্ককে গ্রহণ করেছিল, তেমনি ভাবেই আবার বিশ্বের বুকে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। চতুর্দিকে বিদ্বেষ, হিংসা আর সংঘর্ষের মেঘ দানা বাঁধতে থাকল। নীতি, ধর্ম সব ভুলে মানুষ মেতে উঠল মারণ মহোৎসবে। সেই আসুরী প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারল না পৃথিবী। পরিণামে ঘটল বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ছিলেন এই সংঘর্ষ-পর্ব ব্যক্তি। প্রাক্-সংঘর্ষ ও উত্তর-সংঘর্ষ দুই অবস্থার সঙ্গেই তাঁর সমান পরিচয়। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে রোলাঁ জন্মগ্রহণ করেন ফরাসী দেশে। নদীমাতৃক দেশে জাত রোলাঁ নদীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন আদি অন্তহীন 'প্রাণময় এক ঐক্য'-শক্তিকে—যা পৃথিবীর বুকে মৈত্রী স্থাপনে সক্ষম। সেই কথা তিনি মসীপ্রভাবে বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর করেছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রেমিক, বীঠোফেনের অনুরাগী রোলাঁ শব্দ-তন্ত্রীর ঐক্যের মাধ্যমে যে সুরলহরীর সৃষ্টি হয় তাদের পৃথক সত্তায় তারা বিভিন্ন বলে জানতেন। তথাপি তাদের ঐকতান আমাদের মনে যে-আনন্দ-ধারা প্রবাহিত করে তা সত্যই অপূর্ব। সেই দৃষ্টান্তে তিনি বিশ্বের বিবিধ ধর্ম, ভাব, ভাষা সমন্বিত মানুষের মধ্যে বীঠোফেনের সুর-সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল মনের মণিকোঠায় এক সুন্দর ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর ধ্যান করতে করতে রোলাঁ এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন—'জাঁ ক্রিসতফ'। দশ পর্বে লিখিত এই গ্রন্থের সর্বত্র তিনি জীবের অন্তরতম সত্তা আত্মার জয়গান গেয়েছেন। সঙ্গীতজ্ঞ, ঐক্যের পূজারী ক্রিসতফকে যখন স্বার্থান্বেষী, নরপশুর দল নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত সেই সময় 'সাক্ষী-চেতা-কেবল-নির্গুণ' পরমাত্মা ক্রিসতফকে যা জানিয়ে দেন তা রোলাঁর লেখনীতে এইরূপে বিবৃত হয়েছেঃ "ওরে তুই একা নস। কে এই দোসর? কার এ আত্মা? চেন নাই, ক্রিসতফ? এ যে 'অহং বিশ্বরূপো ভবামি, বিশ্বং ভুবনং জানামি'—তোমারি আত্মার এই বাণীরূপ।"[২]

লেখার মধ্যে লেখকের আত্মভাবের প্রতিফলন

[১] উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৭১৩

[২] জাঁ ক্রিসতফ, ৩য় খণ্ড, ১৯৫১, অনুবাদঃ পুষ্পময়ী বসু, পৃঃ ২২৮

ঘটে। রোলাঁর এই লেখায় আত্মতত্ত্বের জয়গান কি তাঁর নিজ মনের প্রতিফলন নয়? সেই ঐক্যের পূজারী রোলাঁ সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করলেন ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে। অন্তরে তিনি পোষণ করলেন, বিশ্ববাসী খ্যাতিদানের মাধ্যমে তাঁর এই ভাব বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কালচক্র অন্যভাবে আবর্তিত হলো। বিশ্বাত্মৈক্যের আনন্দে যখন রোলাঁ বিভোর, তখনই 'জাঁ ক্রিসতফে'র বিরোধী স্বার্থান্বেষীর দল, আসুরী সম্পদে বলীয়ান, হিংস্র নরপশুরা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে এগিয়ে এল। প্রেম, মৈত্রী, করুণার কুসুমকলিকাকে নির্মমভাবে দলিত মথিত করে হিংসার বীজ ছড়িয়ে দিল তারা। শুরু হলো বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ। সেই সংর্ষের ফল হিসাবে মানুষ লাভ করল দুঃখ, নির্যাতন, মরুভূমির রুক্ষতা আর জীবনের প্রতি চরম হতাশা। প্রেম-মৈত্রীর সর্গোদ্যানে চলল তখন বিভীষিকার নারকীয় লীলা।

বিশ্বের প্রতি বিতৃষ্ণ, হতাশ এই মনীষী তখন শান্তি, ঐক্য, মৈত্রীর অনুসন্ধানে এক গভীর তপস্যায় নিয়োজিত করলেন নিজেকে। এজন্য তিনি গিরি-গুহায় গেলেন না। মনোসমুদ্রে ডুবে গেলেন। সময়মতো হাতে এল ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'নীরবতার মুখ' (The Face of Silence) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ থেকে ভগিনী মর্দেলিনের সাহায্যে রোলাঁ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারেন। শুধু জানা নয় অন্তররাজ্যে এক প্রেরণা অনুভব করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জারক-রসের মতো রোলাঁর অন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। সমস্ত আধুনিক শিক্ষা বর্জিত, এক পল্লী-ব্রাহ্মণ কিভাবে বিশ্বশান্তির উপায়গুলিকে এমন করে উপস্থাপিত করলেন, কেমন করে তাঁর মধ্যে শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমদর্শী ভাব এল সেই তত্ত্ব জানবার ইচ্ছায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি হাত বাড়ালেন সভ্যতার ধর্মভূমি এশিয়ার দিকে। 'এশিয়ার আলো' হিসাবে বুদ্ধদেবের বাণী যেমন এককালে বিশ্বকে প্রেম ও মৈত্রী দান করেছিল, তেমনিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রজ্বলিত সেই আলো পাশ্চাত্যকে পুনর্বার জ্ঞানালোক প্রদান করছে। এতদিন যে আত্মার অমরত্বের কাহিনী রোলাঁ সাহিত্যের পাতায় ধরে রেখেছিলেন তা যে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না ব্যবহারিক জগতের বাক্যাড়ম্বরের মাধ্যমে, পাওয়া যায় একমাত্র নীরবতায়—যে-নীরবতায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত, যে-নীরবতার সান্নিধ্যে বিবেকানন্দের তড়িৎরূপে বিচ্ছুরণ, সেই নীরবতাকে গভীরভাবে জানবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন রোলাঁ।

ভারতাত্মার দিকে মুখ ফিরিয়ে রোলাঁ প্রাচীন ভারতের আত্মকাহিনীকে জানবার জন্য হিমালয়ে অধিষ্ঠিত 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর স্বারস্থ হলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তখন স্থূলশরীরে নেই, কিন্তু ভাবরূপে অধিষ্ঠিত তাঁরা তখন ভারত-ভারতীর ধমনীতে সঞ্চারিত। ক্ষত-বিক্ষত ইউরোপ তখন শান্তির প্রলেপলাভের জন্য উপস্থিত হলো ভারতের কাছে। রোলাঁর প্রার্থনা ভাষায় প্রকাশিত হলোঃ "আমরা এখন ইউরোপে রইছি, আর এসময় জগতে একটা প্রবল সামাজিক ঝড়ের পূর্বলক্ষণ, যেটার প্রবর্তক হচ্ছে আর একটা বিরাট কর্মের ঘূর্ণাবর্ত, যা গত ঝঞ্ঝা থেকে অনেক শক্তিশালী, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ লোক নিপুণ কর্ণধার চায়। এখন এই রক্ষা নির্দেশ করতে হবে স্পষ্ট সহজ এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে। এর জন্য অপেক্ষা করবার সময় নেই, কারণ সেই প্রচণ্ড আবর্ত কারও জন্য দাঁড়াবে না।··· আজ এই সন্ধিক্ষণে যদি স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত—এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"[৩]

রোলাঁ কিন্তু আপন শান্তিতেই ক্ষান্ত হলেন না, 'আমটি খেয়ে মুখ মুছে ফেলা'র দলের লোক ছিলেন না তিনি। সেই মনীষী চেয়েছিলেন বিশ্বকে সেই শান্তির পথ দেখাতে। প্রাচ্য ঋষির মহান বাণীকে স্বার্থমগ্ন, বলদর্পীর দেশে প্রচার করার গুরুদায়িত্ব নিলেন তিনি। বীঠোফেনের চির অনুরাগী রোলাঁ সপ্তস্বরীর বিভিন্নতার ঐক্যসাধনে অগ্রসর হলেন। সেই আদর্শের নায়ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সাহিত্যে গ্রহণ করলেন তিনি। "কাজটা খুব কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ" হলেও রোলাঁ সেই কঠিন সাধনায় ব্রতী হলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর

৩ উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৭১০

সম্পাদককে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ সংকল্পের কথা উল্লেখ করে উল্লিখিত কথাগুলি জানান। ঐ পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবানুরাগীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছাও তিনি জ্ঞাপন করেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরিচয়লাভের আকাঙ্ক্ষাও এই চিঠিতে দেখা যায়।

যে-কালের কথা আমরা বলে চলেছি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থূল শরীরে বর্তমান। স্বামী শিবানন্দ তখন মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে গভীরভাবে জানার উদ্দেশ্যে রোলাঁ তাঁর কাছে এক পত্র লেখেন। রোলাঁ লিখছেন: "প্রেম ও জ্ঞানের আধার, সেই মহা-পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবনকথা আজ আমি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট প্রকাশ করিতে চাই। সমস্ত ধর্মমতের মৌলিক ঐক্য অপেক্ষা বর্তমান যুগে নানা জাতির অধিকতর শিক্ষণীয় আর কিছু হইতে পারে না। আজ সকলকে একথা ভাল করিয়া জানিতে হইবে যে, জীবের প্রাণস্বরূপ সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও বহুরূপে আপনাকে জগৎমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্যানযোগে অন্তরমধ্যে সকলকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক স্রোতোধারা যে-খাতে প্রবাহিত হয়ে প্লাবিত করল বিশ্বকে সেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও জানবার আকাঙ্ক্ষা জাগল রোলাঁর।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর বাণীর রূপায়ণ কতদূর ঘটেছে তা জানবার জন্য আগ্রহী রোলাঁ প্রবুদ্ধ ভারত সম্পাদককে ১৩ জুলাই, ১৯২৭-এর চিঠিতে মঠ-মিশনের কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণী জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। সেই চিঠির উত্তরে তাঁকে সমূহ খবর জানানো হলে তিনি সানন্দে প্রাপ্তি স্বীকার করে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ৪ অক্টোবর, ১৯২৭ লেখেন: "জগতের ও ভারতের সামাজিক সমস্যা সমাধানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থান সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতার অবকাশ ছিল তা বোধ হয় এমন সুন্দর-ভাবে আর কিছুই পূরণ করতে পারত না।"[৫] এই পত্রে তিনি তাঁর আরও কিছু ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: "চিন্তা-জগতের পবিত্র স্রোতে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ডের আহুদী স্পিনোজার চিন্তাধারাকে যুক্ত করতে চাই, যার পরিপূর্ণ বিকাশ এক শতাব্দী পূর্বে হয়েছিল গ্যেটের ভিতর দিয়ে—যে-ভাব এখনও আমরা নিঃশেষিত করতে পারিনি, এবং যার সঙ্গে আমরা আরও যোগ করতে চাই ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান বিজ্ঞানবাদকে।"[৬] স্বামীজীর পাশ্চাত্যের কারিগরী বিদ্যা ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মচিন্তার মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয় কি উপরোক্ত ঐ কথাগুলি। সমগ্র বিশ্বের মিলন ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে-অবদান, তাকে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন রোলাঁ। উত্তর-ম্যাক্স-মুলারীয় যুগে পাশ্চাত্যজগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের পথিকৃৎরূপে আমরা তাঁকে দেখি।

স্বামীজী বলেছিলেন: "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।" কথাটি আমাদের দেশে সহজগ্রাহ্য হলেও পাশ্চাত্যের পক্ষে তা দুরবগাহ্য। জড় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যে পুণ্যাত্মা ও পাপীর যে সীমা-রেখা অঙ্কিত ছিল তা পাদ্রীদের নিত্যশাসনে দৃঢ়তা লাভ করে। অর্থকৌলীন্যই যে-দেশের উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি সেখানে ঐ ভাব গ্রহণ করা অতি কঠিন। তথাপি কখনো কখনো কঠিন প্রস্তরের বুকে কোমল লতিকার মতো জাগ্রত হয় বিবেক-বিচারসম্পন্ন অসাধারণ মনীষা, যাঁরা আপন প্রতিভাবলে সকল মানুষের অন্তরতম শক্তির একত্ব অনুভব করেন। রোলাঁ সেই অদ্ভুত মনীষার অধিকারী ছিলেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের তীব্র আলোকে বিশ্বের মানব-সমাজের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বুঝতে পারেন ভারতীয় উপনিষদের সেই মূল সত্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'কে। তাই বিবেকানন্দ-ভাবনিষ্ণাত রোলাঁ বলেন: "ভারতেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তম্ভ বর্তমান। ভারতই একতা ও মিলনের মন্দির—

৪ উদ্বোধন, ৩১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২১৮ঃ স্বামী শিবানন্দকে লিখিত পত্র

৫ উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪৩ ৬ ঐ, পৃঃ ৪৪৬

আধ্যাত্মিকতার হিমালয়।"[৭]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের পটভূমিকায় রোমাঁ রোলাঁ তাঁর উপলব্ধ সত্যরাশিকে একত্র করে 'জ্বর-বিকারগ্রস্ত বিনিদ্র ইউরোপের কর্ণে' প্রবেশ করাতে চাইলেন। দীর্ঘ সাধনার ফল হিসাবে তাঁর লেখনী-মুখে সৃষ্ট হলো অপরূপ দুই সাহিত্যকর্ম 'The Life of Ramakrishna' এবং 'The Life of Vivekananda and the Universal Gospel'। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি বলছেন: "আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন শরতের ফসল আনিয়াছি, আনিয়াছি আত্মার এক নূতন বাণী, ভারতের মহা-সঙ্গীত। এ মহা-সঙ্গীতের নাম রামকৃষ্ণ।"[৮] আরও দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঘোষণা করে বললেন: "যে মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশ কোটী নরনারীর দুই সহস্র বৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি।"[৯]

'মানবজাতির মিলন সাধনের জন্য' সমর্পিত জীবন রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনকে অনুধ্যান করে 'জ্বরবিকারগ্রস্ত ইউরোপের কর্ণে' অমরতার বাণী শোনালেন। ১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি পর্যন্ত) সেই অমরত্বের স্রোতোধারাকে প্রবাহিত করে 'মহা-সঙ্গীতের' মূর্ছনায় একটি যতি টানলেন রোলাঁ। কিন্তু এ যতি চিরবিরামের নয়। তাই তিনি বলছেন: "মানুষটি আর নাই। কিন্তু তাঁহার আত্মা মানুষের সমাজগত জীবনের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে।"[১০] এবং 'এই আত্মার যাত্রাকে' রোলাঁ বিবৃত করলেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে— যে-গ্রন্থের নায়ক 'অধ্যাত্মশক্তির বিদ্যুদাধার' স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর সম্বন্ধে কলম ধরতে গিয়ে তিনি কতখানি গভীর অনুধ্যানে ডুবেছিলেন তা তাঁর দু-একটি কথার মধ্যেই পাওয়া যায়: "তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী।... তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারত-বর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।... তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ ছিল এক।"[১১]

স্বামীজীর রচনাবলীর প্রতিটি ছত্র পড়তে পড়তে মুগ্ধ রোলাঁ লিখছেন: "ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজও সেই সকল কথা পড়িতে পড়িতে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, একটি বৈদ্যুতিক শিহরণ অনুভব করি এবং মনে হয় যখন সেই মহাবীরের মুখ হইতে ঐ জ্বলন্ত কথাগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন তাহারা কি শিহরণ, কি উন্মাদনারই না সৃষ্টি করিয়াছিল!"[১২]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব যে শেষ হয়ে যায়নি রোলাঁর সেবিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শুধুমাত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবগত ঐক্য সংস্থাপনের যে-বাণী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দিয়ে গিয়েছিলেন, যা ছিল প্রাচ্যের চিরন্তন সুর সেই মিলন-মৈত্রীর বাণীবাহক হিসাবে রোলাঁ স্থান করে নিলেন প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে চিরকালের জন্য। এশিয়ার কাছ থেকে যে-জ্ঞানালোক তিনি লাভ করলেন, জ্বরবিকারগ্রস্ত ইউরোপকেও সেই আলোকের সন্ধান দিয়ে তাকেও অমরতার যাত্রায় পথ দেখালেন। 'জাঁ ক্রিসতফ'-এর মধ্য দিয়ে যে-আত্মার বাণী তিনি ঘোষণা করেছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের জীবনীর মাধ্যমে তার পূর্ণতা লাভ হলো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে রোমাঁ রোলাঁর নাম চির উজ্জ্বল হয়ে রইল।

৭ উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৭৬

৮ রামকৃষ্ণের জীবন, অনুবাদ: ঋষি দাস, ১৯৪৯, পশ্চিমদেশীয় পাঠকগণের প্রতি।

৯ ঐ

১০ রামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ২৮৫

১১ বিবেকানন্দের জীবন, অনুবাদ: ঋষি দাস, ১৩৬০, পৃঃ ১৩১

১২ দ্রঃ The Life of Vivekananda, 1979, p. 146

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোন বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোন বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যেসব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোন উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করল তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হলো। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বারবার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। গরিব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থ-নৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কোঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্ক-মূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খ্রীস্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বারবার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজো-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরি-সমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রে অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এসব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তঃহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ-দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এসব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং

[১] বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্যধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছায়নি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এইসব 'টোলো' 'বিটেল বামুন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর'—লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে-বিধানের সামাজিক মূল্যেও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণিজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালীজাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন:

> এদানির ব্রাহ্মধর্ম যার ছড়াছড়ি
> তাহারেও বারবার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খ্রীস্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে-যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে-বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন-কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে-যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খ্রীস্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশি হলে, ভদ্র মিশনারী হয়তো তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়্দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দু-ধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে-কথা বলা শক্ত; কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে-যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শংকরের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রীস্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অলবিরুনী, মোগল সুফী দারাশিকো (ঔরঙ্গজীবের

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:

> আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
> যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জার্মান দার্শনিক শোপেন-হাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যেসব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে-সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এস্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তি-তর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে-রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এসব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তারই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী, হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জার্মান গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়, তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে-আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষায় আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্ম-সাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোন প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন-কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোন ব্রাহ্ম কখনো কোন দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বারবার নমস্কার করি।

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে: "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দুপাশের কোন অলকগুচ্ছ (জুলফ দিয়ে) ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥'-রই অনুবাদ।

৫ বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোন ব্রাহ্মভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এযুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খ্রীস্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন— কিন্তু একথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যেকোন কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশি, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মতো বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দু ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় [ব্রাহ্মধর্মে] দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরিব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কিনা এবিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিতজনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তাহলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদন করতে হয়।[৭]

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সবাকছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তি-তর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন:

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। সেকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব— একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এস্থলে অবান্তর।

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবল, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন: 'ডুব, ডুব, ডুব'।

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার একঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল আছে তা জেনে তোমার কি হবে ?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মতো পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন ? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীনপ্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরি হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রীস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলায়ও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হলো। সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন-কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে সুধুমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরিয় পিউরিটানিজম থেকে। তখন কে জানত পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।[১০]* [ক্রমশঃ]

৯ এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ ইজ স্মল ; বাট আই ড্রিংক অফনার।'

১০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দুরকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে খেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি', ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যেসব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

* সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৩৮৯, কলকাতা সংগ্রহ : কমলাকান্ত রথ

যে সত্য বিবেকানন্দ বলেছিলেন

দেবী রায়

ছল ! ছল ! ছল !
কেবল ছুঁৎমার্গের দল !
অমন আচার—
ঝাঁটা মার তার মুখে—লাথি মার !

গরিব-গুর্বোর জন্য, কেউ কি ভাবে ?
—নারে, কেউ ভাবে না রে !
একদিনেই হাহাকার রব ওঠে—
হরিজনরা হাত গুটিয়ে নিলে শহরে !

ইচ্ছে হয় ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে—
এক্ষুণি ছুটে যাই।
এরা না উঠলে, এরা না জাগলে
জাগবেন না, মা-ঈ !

চলে আয়, দে—সকলে মিলে
এদের 'জ্ঞান-চক্ষু' খুলে !
সর্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চার না হলে
উঠেছে কোথায়, কোন্ দেশ ?—কোন্ কালে ?

ঐ শরীরে, কোন বড় কাজ ?
মাত্র একটি অঙ্গ থাকলে সবল
আরেক অঙ্গ পড়ে গেলে !

পতিত-কাঙাল, কে কোথায়
ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আয় !
ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আয় !

শব্দের শ

অটলচন্দ্র দাস

শব্দ।
মাত্র একটা অভিধা,
কয়ে যায় অজস্র গল্প ;
গভীর ভাবের কবিতা !
সব অবশ্য নয়,
নয়ও সব সময়,
নয় আবার সর্বস্থানে !

মানুষের মর্মের মাঝখানে
যে-আনন্দ, যে-দুঃখের বিন্দু
আঁকা রয় গুপ্ত হয়ে,
যেন ঐ অমাবস্যার ইন্দু—
অন্য গাঢ় ভাবাবেগ-অন্ধকারের তলে,
একটু বাইরের হাসি-কান্নায় পলে
জেগে উঠে উত্তাল বারিধির আকারে
সমস্ত হৃদয়টাকে ডুবিয়ে
তার উচ্ছ্বাসের ভারে !
ঈশানের একটুখানি কালো মেঘের ফোঁটা
যেমন ঢেকে ফেলে কৃৎস্ন নভটা !

তার পর ?
ঝরিয়ে বৃষ্টি ঝরঝর
পৃথিবীর তলটাকে জল ডুবিয়ে দিয়ে যায়,
তেমনি ধারায় !

যদিও দু-অক্ষরে গড়া শব্দ—হরি,
ধ্যানজপের বলে
আসে স্বকীয় আকার লয়ে ধরনীতে অবতরি ॥

নীড়ভাঙা পাখি

সুহাসিনী ভট্টাচার্য

আমি এক নীড়ভাঙা পাখি
সন্ধ্যায় বসে থাকি যবে আঙিনায়
চেয়ে দেখি আকাশের পানে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরছাড়া পাখি
ফিরে যায় আপনার গৃহপানে।
তারি সাথে মোর মন যায়, যায় উড়ে যায়
যেথা ছিল মোর সুখ নীড়।
গভীর নিশীথে যবে ঘুম ভেঙে যায় একা শয্যায়
কালের শীতল স্পর্শ, প্রাণে ছোঁয়া দিয়ে যায়।
বড় ভয় লাগে মনে
মনে হয় আমি বড় একা।
টুপটাপ শিশিরের বিন্দু
ঝড়ে পড়ে বকুল তলায়।
আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে,
গগনে ছড়ায়ে কালো কেশ
যামিনী কাঁদিছে বুঝি হায়,
সেও বুঝি মোর মতো একা।
শন শন হিমেল হাওয়া
বয়ে যায় বাঁশের বনে
চকিতে চমকি মনে হয়,
কে বুঝি কাঁদিছে ঐখানে,
অশরীরী কোন বিরহিণী
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কাঁদিয়া।
বেদনার ঝড় বয়ে যায় সহে না বিরহ যাতনা
দূরে ঐ পলাশের ডালে
নাম-না-জানা এক রাতজাগা পাখি
নিশীথের বুক চিরি,
বারবার ওঠে ডাকি
প্রিয় সাথী বুঝি হারিয়ে গিয়েছে হায়,
সেও বুঝি মোর মতো একা।
নিশাশেষে গগনের কোণে
শুকতারা মিটি মিটি জ্বলে
কুয়াশায় ঢাকা তার ছলছল আঁখি
সাথীহারা ব্যথা তার মনে।

বিদায়বেলার কবিতা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

প্রতিদিন ফুল ফোটে,
পারিজাত কিংবা যোগন্ধায় প্রতিদিন
গাঁথা হয় মালা।
যে বৃদ্ধ বৈতরণী পেরিয়ে মেঘের ঝরনা মেখে
নক্ষত্রের বনে
লুকোচুরি খেলতে খেলতে আজ অথবা কালকেই
অভ্যর্থনা-সভায় পেঁছিবে ;
তার জন্যে হয়ত
মালা গাঁথা সাঙ্গ হলো।

সদ্য ভূমিষ্ঠ যে শিশু মায়ের কোলেতে শুয়ে
চাঁদের রোমাঞ্চ দেখছে, মালাকারেরা এখন
তার জন্যে যোগন্ধার ফুল তুলতে ব্যস্ত।

প্রত্যেকেই একটা করে মালা পায় ;
দুদিন আগে কিংবা পরে।
দেবরাজ ইন্দ্র স্বহস্তরচিত মালায়
সকলকে বরণ করে নেয়।

এখন আমি
পঁচিশ বছরের তরুণ যুবক।
এ-বয়সে অনেকের মতো আমিও ভাবতাম
বরণের মালা বুঝি অর্ধসাঙ্গ হলো ;
কিন্তু জীবন তো ছকে বাঁধা অংক নয়,
হঠাৎই একদিন
উড়ো চিঠি এল—
দেবতারা লিখেছেন ঃ
"তোমার মালা প্রস্তুত ;
যাত্রা শুরু করো।
দেরি করলে মালা বাসি হবে,
বাসি ফুলে অভ্যর্থনা হয় না।"

তাই আজ যাত্রা শুরু হলো।
নীল-নির্জন পেরিয়ে নক্ষত্রের বনে
লুকোচুরি খেলতে খেলতে অশ্রুভেজা চোখে
সকলকে বিদায় দিয়ে চললাম দূরে—বহুদূরে।

রথ দেখা কলা বেচা

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

যে রথ দেখতে গিয়েও কলা বেচেছিল,
সে বাড়ি ফিরে নিজের সুবুদ্ধির ব্যাখ্যান
ইনিয়ে বিনিয়ে শোনাল নিজের স্ত্রীকে।
ছেলেরাও হাঁ করে শুনল—
কেমন করে ভিড়ের স্রোতে পচা কলাও
বিক্রি হয়ে গেল। রথের গল্প শিকেয়
তোলা রইল। আজ তার সর্বাধিক লাভ।

আর যে গিয়েছিল কলা বেচতে এবং
কলা বেচতে গিয়েই রথ দেখেছিল সহসা,
বাড়ি ফিরে সে কেবল রথেরই গল্প শোনাতে
বসল ঘরের সবাইকে। শোনাতে শোনাতে
সবার খাওয়া দাওয়া সারা, শোনাতে শোনাতে
ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। কলা বিক্রির হিসাব
সে রাতের মতো করাই হলো না তার।

নতুন পৃথিবী

নিমাই মুখোপাধ্যায়

তোমার কাছেই শিখেছি ভয় করতে নেই
শক্তি তোমার ভিতরে।
তাকেই জাগিয়ে তোল,
দেখবে ভয় কোথায় পালিয়ে গেছে।
তোমার কাছেই শিখেছি পৌরুষ,
চিত্তশক্তির উদ্বোধন ঘটলেই নতুন সূর্যোদয়।
প্রকৃতির উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে
সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।
তুমি শেখালে চিত্তশক্তির উদ্বোধনে সব সম্ভব
আজ বিশ্বব্যাপী ভয়—
এই বুঝি সব সভ্যতার অবসান ঘটল।
প্রতি মুহূর্তের এই ভয় থেকে
মুক্তি পেতে তুমিই পথ দেখিয়েছিলে।
বলেছিলে: "বিবাদ নয়—সহায়তা,
বিনাশ নয়—পরস্পরের ভাবগ্রহণ,
মতবিরোধ নয়—শান্তি ও সমন্বয়"।
আজ বিশ্বশান্তির জন্য পৃথিবী উন্মুখ।
একের পর এক রাস্তা দিয়ে
হেঁটে যেতে যেতে দেখছে অন্ধকার।
তোমার আচার্যের মন্ত্র "যত মত তত পথ"
মানুষ যেদিন হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে
সেদিন বিশ্বশান্তি আসবে,
মানুষে মানুষে হানাহানির শেষ হবে।
নতুন সাম্রাজ্য সৃষ্টি হবে—
যে সাম্রাজ্য তোমাদেরই আলোয় উদ্ভাসিত।

আসছে সে যে

মানসী বরাট

অন্ধকারে বন্ধদ্বারে
দিচ্ছি ঘা ; পথ দেখাও।
নিকষ নিশা—আলোর দিশা
পাচ্ছি না, পথ দেখাও।

বজ্র মেঘ ঝড়ের বেগ
খুব আওয়াজ, খুব আওয়াজ।
অন্ধকার, বন্ধ দ্বার,
চলছে জোর বাইরে তার
ছয় প্রহরীর কুচকাওয়াজ।

তার যে আসার লগ্ন আজ।
তাইতো আছি মগ্ন আজ।
প্রভঞ্জনের খঞ্জনী—
নূপুর ধ্বনি ঐ শুনি।

আসছে সে যে, আসছে সে যে
বাঁশরী তার উঠছে বেজে
আলোর রথে, পথ দেখাতে
আসছে সে যে, আসছে সে যে।

ঘা পড়েছে বন্ধ দ্বারে
ঐ শোন তার চরণধ্বনি।
মৃত্যু-শীতল অন্ধকারে
জাগছে জীবন, জাগছে জীবন.
মধুর মধুর বাঁশীর সে সুর
ছড়ায় মৃতসঞ্জীবনী।

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মন বিক্ষিপ্ত হতো না. তবু ঠাকুর শেখাচ্ছেন—"দেখ, ধ্যান করতে করতে মন এদিক ওদিক গেলে তখন মনযোগে জপ করবি খুব ভাল করে। তাতেও না হলে জপের ওপর ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে মন যেভাবে চায়, সেইভাবে ধ্যান করবি। এইভাবে জপও থাকবে আর ভিতর ভিতর ধ্যানও থাকবে। ভাববি যেন হৃদয়মন্দিরে ইষ্ট দেবতা রয়েছেন—সুন্দর শান্ত হাসি-হাসি মুখ; এই তাঁর আরতি হচ্ছে প্রদীপ দিয়ে, কর্পূর দিয়ে, ফুল দিয়ে, চামর দিয়ে। আরতি যেন আর ফুরোয় না। অনেক পরে যদি আরতি হয়ে গেল তো অমনি ফুলের মালা গাঁথতে বসে গেলি—এই সুন্দর সুন্দর ফুল—যেমন দেখতে তেমনি সুগন্ধ; বড় বড় যুঁই-এর গোড়ে, আরও সব ফুল এলো। এই তাঁর পাদপদ্মে মুঠো মুঠো পদ্মফুল অঞ্জলি দিচ্ছিস—রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম। পদ্মফুল নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল তো জবা আরম্ভ হলো; জবার স্তূপ হয়ে গেল। তারপর আরও সব ফুল—সাদা ফুল, নানাবিধ। একটার পর একটা—শেষ হতে দিবিনি। ফুলের পর এল ফল-মূলে মিষ্টি। নানাবিধ—বেশ করে সাজিয়ে নিবেদন করছিস। এইরকম করে মনটা লাগিয়ে রাখতে হয়। মনের গতিই বিষয়-ভোগের দিকে (রূপ, রস, গন্ধ শব্দ, স্পর্শ)—সেই ভোগটা ভগবানের সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে করলে তার দোষ কেটে যায়।"

সর্বদা ভগবানের স্মরণ মনন, তাঁর উপর একান্ত নির্ভর—এই তো সাধন, এই তো শেষ কথা।

*

তখনও মঠ নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে। একদিন রাত দুটো পর্যন্ত বেদান্ত আলোচনা চলছে—মানবাত্মার অধোগতি হয় কিনা? পুনর্জন্ম আছে কিনা? স্বামীজী তর্ক লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে চুপ করে হাসছেন, আর যখন যে-পক্ষ পারছে না, তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে উসকে দিচ্ছেন। রাত দুটোর পর আলোচনা ভেঙে দিলেন। তারপর সব ঘুম। চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীজী আমাকে তুলে দিলেন। দেখলুম তিনি এর মধ্যেই সব সেরে-সুরে পায়চারি করছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন। আমাকে বললেন, "লাগা ঘণ্টা। সব উঠুক। শুয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না।" আমি তাও একবার বললুম, "এই দুটোর সময় শুয়েছে, ঘুমোক না একটু।"

স্বামীজী কঠোর স্বরে বলছেন, "কি? দুটোর সময় শুয়েছে বলে ছটার সময় উঠতে হবে নাকি? দাও আমাকে, আমিই ঘণ্টা দিচ্ছি। আমি থাকতেই এই, ঘুমোবার জন্য মঠ হলো নাকি?" তখন আমি খুব জোরে জোরে ঘণ্টা দিলাম। সব ধড়মড় করে উঠেই চিৎকার—"কে রে, কে রে?" আমায় বোধ হয় ছিঁড়েই ফেলত। কিন্তু দেখে আমার পেছনে স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তখন সব চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওদিককার ঘরে চলে গেল।

এটা বোধ হয় বেলুড়ে—হরি মহারাজ একদিন ধ্যানে যাননি, কি যেতে একটু দেরি হয়েছে। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, "একটু সর্দিজ্বরের মতো হয়েছে।" প্রথম তো স্বামীজী খুব একচোট বকলেন—"এখনও এই দেহ দেহ! ছিঃ!" হরি মহারাজ আমাদের মধ্যে সব চেয়ে কঠোরী, তপস্বী, সহ্যশীল। সব শুনে তিনি ম্লান হয়ে চুপ হয়ে গেছেন। পরে স্বামীজী আদর করে বোঝাচ্ছেন, "তোদের কেন বকি জানিস? তোরা ঠাকুরের ছেলে। তোদের দেখে জগৎ শিখবে। তোদের এতটুকু খুঁত দেখলে আমার বড় লাগে। তোদের এতটুকু আলগা দেখলে ওরা আরও আলগা দেবে।

ঠাকুর যেমন বলতেন—আমি ষোল টাং করলে তোরা যদি এক টাং করিস। তেমনি আবার তোরা যদি এক টাং করিস, ওরা তার ষোল ভাগের এক ভাগ করবে। সেটুকুও যদি না করিস তা হলে ওরা দাঁড়ায় কোথা।'

*

স্বামীজী জানতেন, তাই সাবধান করে দিতেন এবং বলতেন—'monastic indolence (সন্ন্যাসীদের অলসতা) বড় ভয়ঙ্কর জিনিস, ঐটিকে বড় ভয়। আর ঐটিই আমাদের কাল হবে।' শুধু খাওয়া আর ঘুম। উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব ধারণার শক্তিও চলে যাবে। কত বড় আদর্শ নিয়ে এসেছ, একবার ভাব দিকি। আর এই নিয়ে ভেবেই স্বামীজীর সঙ্ঘের সেবা করবে? ধ্যান-ধারণা না পার, কোদাল কুপুতেও না পার তো language (ভাষা) শেখ—দেশ বিদেশের ভাষা—English, French, German (ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান)। অতদূর কেন—সংস্কৃত, হিন্দী এগুলোও তো ভাল করে শিখতে পার, তাতেও অনেক কাজ হয়। —কে হিন্দী শিখতে বলেছিলাম। সে এখন কেমন শিখেছে—অনর্গল বলে। একটা কিছু কর। নইলে অকর্মণ্য জড় হয়ে যাবে, তখন কিছুই হবে না, এ-ও না, ও-ও না। তোমরা youngmen (যুবকদল), লজ্জা করে না বলতে—(রাত) ৯টার পর আর কিছু করতে পারব না। দেখছ না চেখের সামনে বুড়ো মানুষটা খেটে খেটে মরে যাচ্ছে? দেখেও একটু শেখ। আচ্ছা, ৯টার সময় শোবে—বলতে পার ৩টার সময় উঠে একটু (ধ্যান-জপে) বসবে। তাও পারবে না। সেই ৬টার সময় উঠবে। আবার দুপুরে বিশ্রাম, অর্থাৎ তিন ঘণ্টা ঘুম। এরা সব বিকেল ৩টার সময় ঘুম থেকে উঠে এসে বলে—বিশ্রাম করছিলাম। আমরা তো বাপু বিশ্রাম বলতে বুঝি—কার্যান্তর, এই একটু শুয়ে বসে পড়াশুনা।

*

শিব। শিব। শিব শৌর্য-বীর্যের দেবতা,—রুদ্র, মৃত্যুঞ্জয়, মদনজয়ী, বীর—শ্রেষ্ঠ বীর। ওঁর সঙ্গে কেউ পারে না। সব ওঁর শরণাগত। উনি লয়ের কর্তা, কিনা শেষ গতি। আগে আগে শিবের ছবি আঁকত কি বিশ্রী। শিবের কোন idea (ভাব)-ই নেই—এতখানি ভুঁড়ো পেট, চোখগুলো অসম্ভব রকমের ঢুলো ঢুলো—গাঁজাখোর ভাঙখোর শিব। যেমন দেশ, তার তেমনি ঠাকুর। এখন art (চিত্র-শিল্প) অনেক improve (উন্নতি) করেছে আমাদের সময়ের চেয়ে। কি সুন্দর সুন্দর শিবের ছবি দেখেছি। একদিকে যেমন শক্তিমূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে শান্তমূর্তি। ভারী চমৎকার। দুরকম দুখানা ছবি এই ঘরে রয়েছে। হিমালয় না দেখলে শিবকে কিছুই বোঝা যায় না। হিমালয় যেন শিবের মূর্তি। শিব শিব শংকর, শিব শিব শঙ্কর—আহা। শিব কি সুন্দর। ঠাকুর আমায় দেখিয়েছিলেন চৈতন্যময় শিব। দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে নিয়ে একদিন দেখালেন—'এই দেখ চৈতন্যময় শিব।' সত্যিই সেদিন কি যে দেখলাম। কি আনন্দই যে ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন। তারপর স্বামীজী দেখালেন—জীবে জীবে শিব, জীবন্ত শিব। অসহায়, দরিদ্র, রুগ্ন, অভুক্ত, অন্নহীন বস্ত্রহীন—সব নারায়ণ। স্বামীজীর চোখই আলাদা। সত্যিই বলছি—সবাইকে খাওয়ালে ঠাকুর খান, এ বিশ্বাস আমার আছে—এ আমি দেখেছি। হয়তো ঠাকুরের জন্যে কিছু এনেছে—ভোগ দেওয়া হবে, দেরি আছে, আমি সবাইকে খাইয়ে দিয়েছি—এতটুকু মনে কিছু হয়নি। আমাদের ঠাকুর লক্ষ মুখে খান। ঠাকুরকে ঐভাবে খাইয়েই আমার অধিক আনন্দ। ঠাকুরঘরে ভোগ দেওয়ার চেয়ে এই ভাবেই আমার ভাল লাগে। ঠাকুরঘর তো প্রথম করতেই চাইনি—সেসব তো শুনেছ। সন্ন্যাসীদের আবার ঠাকুরঘর কি? সব ব্রহ্মময়। ঠাকুরঘরে ভোগ না দিলে যে তাঁর খাওয়া হবে না, তা কেন? ঠাকুর সবার মুখে খাবেন—'ব্রহ্মার্পণম্'।

আলমবাজার মঠে খুব গরম—কারও ঘুম হচ্ছে না। আমি উঠে পাখার হাওয়া করি ও realise (উপলব্ধি) করি—দশের সুখে আমার সুখ, দশেতে আমি, দশের সেবায় ঠাকুরের সেবা—সবাইকে বাতাস করলুম, তারা সুখে ঘুমুতে লাগল, আর আমার ক্লান্তি দূর হলো। [ক্রমশঃ]

সন্ন্যাসিনীর কাহিনী

সরলাবালা সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

…বৃন্দাবনের কথা বলতে বলতে একেবারে অন্য কথায় এসে পড়েছি, এবার আবার তার কথাই বলছি।

বৃন্দাবনের আশ্রমে 'জ্যান্ত বালগোপাল'দের দেখলাম। তাদের চিৎকার, দুরন্তপনা সবই সাধারণ ছেলেদের মতো। ছোট ছোট অতগুলো ছেলের পালকে সামাল দেওয়া তো কম কথা নয়—নাওয়ানো, খাওয়ানো, এমনকি কাঁথা-কাপড় কাচাও আছে। "এতগুলো ছেলের ভার আছে কার উপর ?" জিগ্যেস করলাম বৃন্দাবনের সেই শিষ্যটিকে, সে-ই আমাকে আশ্রম দেখাচ্ছিল।

দেখলাম সে মহা দার্শনিক। সে বললে, "মাতাজী, এ সংসারে কে কার ভার নিতে পারে, সেই একজনই তো সকলের ভার বইছেন, যিনি গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন।" গুরুও যেমন, শিষ্যও সেইরকম।

বৃন্দাবন এলে তাকে বললাম, "দেখলাম তোর এই জাদুঘর, তুই দেখছি মস্ত এক জাদুকর। এই ছেলের পাল চরাস কেমন করে ?"

আমার কথা শেষ না হতেই বৃন্দাবন মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। বললে, "মা, জানি তোমার এত ছেলের পাল চরাচ্ছ তুমি কেমন করে ? হরেক রকমের ছেলে তোমার, কেউ গৃহী, আবার কেউ-বা সন্ন্যাসী। কেউ পাপী, আবার কেউ-বা মহাসাধু। কাকে তুমি ফেলে দিয়েছ ?"

বৃন্দাবন সত্য কথাই বলেছিল। বিচিত্র এই সংসার। "কিসকো নিন্দি, কিসকো বন্দি, দোনো পাল্লা ভারী।"

হেম সেন বলে একটা ছেলে, মেসের একটি ঘর নিয়ে আছে কলকাতায়, ডাক্তারি পড়ে। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, হাসপাতালে একটি রোগী ভর্তি করবার সময়।

চেনা নেই, শোনা নেই, আমার গেরুয়ার দিকে চেয়ে বলে উঠেছিল, "কাপড়টাকে রঙ দিয়ে না ছোপালেই কি চলত না ?" আমি ভাবলাম, "অদ্ভুত ছেলে তো !"

তারই সেই ঘরে একদিন আশ্রয় নিতে হয়েছিল। একদিন রাত্রে, মরণাপন্ন রোগীকে ভর্তি করেছি, হাসপাতালের কাছেই হেম সেনের আস্তানা, তার ঘরে গিয়ে বললাম, "বাবা, রাত্রিটার মতো কাছেই একটা জায়গা দেখে দিতে পার আমাকে।"

সে বললে, "এই ঘরেই থাকো না কেন ! এতবড় ঘর, আমি তো একাই থাকি।" বলেই বললে, "রাত্রে কি খাও তুমি।" তুমিই বললে, আপনি নয়।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে তার খাটের পাশে মেঝেয় একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়েই পড়লাম, দুরাত্রি খুবই পরিশ্রম গিয়েছে আমার।

হেম আগেই তার খাটে শুয়েছিল, খাটটা বেশ বড়, গদি ও তোশক দিয়ে পাতা পুরু বিছানা।

আমাকে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়তে দেখে উঠে এল তার খাট থেকে, বললে, "ওকি ? মাটিতে শুয়ে পড়েছ কেন, খাটে এসে শোও, অনেক জায়গা আছে খাটে।"

জায়গা তো আছে, কিন্তু আমি কি করে খাটের উপর গিয়ে শুতে পারি ? কি করে তাকে বোঝাবো যে ওভাবে খাটে শোওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সে বললে, "খাটে শুতে বাধাটা কি ? বুঝেছি, মর্কট বৈরাগ্য ! খাটে শোব না, বিছানায় শোব না—এই হলো আমাদের দেশের বৈরাগ্য ! সাদা কাপড় পরলে বৈরাগ্য থাকে না। গেরুয়া রঙে ছুবিয়ে কাপড় পরতে হবে। ছিঃ ছিঃ, এসব কি ? তোমার একটু বুদ্ধি আছে ভেবেছিলাম, দেখছি তুমিও ঐ দলে উঠে এস শিগগির। আমার কাছে ওসব খাটবে না।"

অনেক উপদেশেও যখন বিছানায় উঠতে রাজি হলাম না, তখন নিঃশ্বাস ফেলে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। "থাকো তুমি ঠাণ্ডায় শুয়ে নিউমোনিয়া বাধাও, নিউমোনিয়া রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে এলে, এবার নিজেও গিয়ে ভর্তি হও। হাসপাতালের ডাক্তাররা কিন্তু তোমাকে খাটেই শোয়াবে, তারা অত বৈরাগ্যের মহিমা বোঝে না।"

আমি তার কথায় কোন উত্তর দিলাম না, আর উত্তর দেবার কথাও ছিল না কিছু। এই হলো হেম সেন।

আবার, বিহারীর ছিল দারুণ নিষ্ঠা। বিহারী চক্রবর্তী, পূর্ববঙ্গের ছেলে। বিয়ে করেছে, একটি ছেলে আর একটি মেয়েও হয়েছে। বিপত্নীক বাপ তান্ত্রিক সাধনা করেন, তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক কপালে আর দুই বাহুতে।

ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রস্নানে এসেছিলাম লাঙ্গল-বন্ধের যোগের সময়। কিন্তু যোগের স্নান হলো না আমার, মোষের শিঙে সরষে রাখলে যতক্ষণ গড়িয়ে না পড়ে ততক্ষণ মাত্র যোগ থাকবে। তাই যোগে স্নানের জন্য হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলির সে এক বিপর্যয় ব্যাপার। আমি দাঁড়িয়ে সেই হুড়োহুড়ির দৃশ্য দেখছিলাম আর ভাবছিলাম যে, পুণ্যলাভের জন্য মানুষ সবকিছুই করতে পারে। খুনও করতে পারে, আবার নিজেও খুন হতে পারে।

ধাক্কাধাক্কিতে একটা বুড়ি পড়ে গেল সিঁড়ির উপর, মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কে তখন তার দিকে তাকাবে, তাকাতে গেলে যে যোগ চলে যায়!

বেচারা বুড়ি! এত আশা করে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে এসেছিল, তারও পুণ্যলাভ হলো না, আর তার জন্য আমারও যোগে ব্রহ্মপুত্র-স্নান হলো না।

সেই সময়ই বিহারী চক্রবর্তীর বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য। বিহারীর বাবা দেখলাম আমার উপর বিষম সদয়, দিনরাত তদারক করছেন, আমার যেন কোন অযত্ন না হয়; সুবিধা পেলেই ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছাকাছি বসছেন শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনার জন্য। তারপর দেখি রুদ্রাক্ষে জপ ছেড়ে তুলসীর মালা এনেছেন জপের জন্য, অনবরত ঠোঁট নড়ছে নাম জপ করছেন, আর মাঝে-মাঝে আমার দিকে চাইছেন, আমি তাঁর এই হরিভক্তি সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছি কিনা!

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! শেষে হরিই তাঁর ঘাড়ে চেপে বসলেন? রসিক চূড়ামণি শ্রীহরি, হাতে হাতে তার পরিচয় পেলাম। একদিন দেখি 'হরি হরি' বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, আমার পায়ের কাছে সটান উপুড় হয়ে পড়ল। আমি সসঙ্কোচে 'এ কি, এ কি' বলে উঠে দাঁড়াতেই দেখি আকুল হয়ে তার দুই হাতে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরেছে, "সন্তানকে মাপ কর মা, আমি যে কুভাবে তোমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলাম, সে পাপ আমার কিসে যাবে বল।"

বাপের তো এই অবস্থা, আর ছেলে বিহারী; হঠাৎ দেখি সে-ও মৌনব্রত নিয়ে কথা বলা ছেড়ে দিলে। আগে অবশ্য আমাকে 'মা' বলত, আর যোগের দীক্ষাও নিয়েছিল আমার কাছে, কিন্তু সাধনায় খুব যে উৎসাহ—সেরকম মনে হয়নি। কিন্তু দেখলাম এদের মানসিক প্রবাহ ফল্গু নদীর মতো অন্তঃশীলা, উপর থেকে বোঝা যায় না।

আমি ওখান থেকে কাশী এলাম, বিহারীও এল আমার সঙ্গে। আমি আমার অশ্বত্থতলার ঘরে উঠলাম, বিহারী গিয়ে বসল দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরে আসন করে। সেই যে আসনে বসলে, আসন ছেড়ে আর উঠলে না।

কাশীর মানুষ সাধু-সন্ন্যাসীর ভক্ত, ওর ভক্তের অভাব হলো না। এক মাড়োয়ারী একটা ছোট কাঠের কুঠরি বানিয়ে দিলে, একজন মানুষ সেই ঘরে বসে থাকতে পারে, শুতেও পারে কোনরকমে ঠেস দিয়ে। কিন্তু শুনেছি, ও নাকি একবার মাত্র আসন ছাড়ত বাইরে যাওয়ার আর গঙ্গায় স্নানের সময়, অন্য সময় আসন করেই বসে থাকত।

আমি ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়লাম। ওর একটা প্রকাণ্ড ফোড়া উঠেছে, সেই ফোড়া নিয়েই আসন করে আছে; আমি কত বোঝালাম, "হাসপাতালে দিয়ে আসি চল।" নিরুত্তরে বসে থাকে। শেষে ফোড়ার অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হতে বোধ হয় আর সহ্য করতে না পেরে ইশারায় জানালে হাসপাতালে যেতে রাজি আছে। তখন স্ট্রেচারে করে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে এলাম। ডাক্তার বললে ভিতরে সুড়ঙ্গের মতো গর্ত হয়েছে, অস্ত্রের পর ঘা পুরতে মাস তিনেক লাগবে। এই তিনমাস ধরে ওর জন্য আমাকে হাসপাতালে আনাগোনা করতে হলো। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবামাত্রই আবার আসনে এসে বসলে। কাশীতে বিহারী সাধুর নামে 'জয় জয়' পড়ে গেল।

যে পূর্ববঙ্গের মেয়েটি আমার কাছে যোগের দীক্ষা নিয়ে গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল, তার নাম সুধন্যা। আগে তার কি নাম ছিল তা আমি জানি না, 'সুধন্যা' নাম সে নিজেই নিয়েছিল।

এবিষয়ে তার অসামান্য সরলতা। সে বলত, "আমি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো ভক্ত, তাই নিজের নাম নিয়েছি সুধন্যা।"

বিহারী-সাধুর উপর তার অত্যন্ত ভক্তি। সে তাকে বলত উনি তো দেহধারী বিশ্বনাথ। বিহারী অযাচিতভাবে যে ফলমূল-দুধ পায় তাইতেই সে জীবন ধারণ করে, শুনেছি সে নাকি নিজে হাতে নিয়ে খায় না, অন্যে মুখে তুলে দিলে তবে খায়। সুধন্যাও নক্ত-ব্রত নিয়ে সমস্ত দিন উপবাসে থেকে সূর্যাস্তের পর ছাতু আর গুড় জলে ভিজিয়ে খেতে আরম্ভ করলে। গাওয়া ঘি যবের ছাতু মেখে গুড় দিয়ে ঢেলা পাকিয়েও খেত—যদি একটু গাওয়া ঘি জুটত। তবে মাসের মধ্যে দুই দ্বাদশীতে অন্নগ্রহণ করত, বলত গুরুর প্রসাদে দোষ নেই। সেই দুদিন আমি সুধন্যার জন্য তিন-চারটে তরকারি রাঁধতাম, এবং এক বোগনো ভর্তি ভাত রাঁধতাম, সুধন্যা তৃপ্তির সঙ্গে খেত। একদিন আবার তার ভিজে-ভাত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, সেদিন তারই জন্য লেবু দিয়ে কিছুটা ভাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু দ্বাদশী ছাড়া অন্যদিন কিছুতেই অন্নগ্রহণে রাজি হতো না।

কাশীর সেই ছোট ঘরটি, প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ ডালপালা মেলে রয়েছে ঘরটির উপর ছাতার মতো। অশ্বত্থের গোড়াটি বাঁধানো, তারই সঙ্গে একটু রোয়াকের মতো, সেই রোয়াকের লাগোয়া ছোট একটা ঘর, আর ঘরের সঙ্গেই একটা ফালিমত লম্বা ঘর। সেইখানে আমি রাঁধতাম তোলা উনুনে। সুধন্যাই আমার বাসনপত্র মাজত আর ঘরটা পরিষ্কার করত, এটি ছিল তার গুরুসেবা। এই কাশীই ছিল আমার তখনকার স্থায়ী আস্তানা।

কাছেই চৌষট্টি মায়ের মন্দির, আর মন্দিরের কাছেই দিঘাপাতিয়ার রাজার প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। তিনতলা ঠিক নয়, দুটি তলা আরও আছে, সেগুলি রাস্তার নিচের দিকে গঙ্গার গড়েনে নেমে গেছে।

আমার ঘরটির কাছেই ছিল বিখ্যাত এক স্বামীজীর আশ্রম। তাঁর আশ্রমও গঙ্গার একেবারে ধারে, তাই সিঁড়ি দিয়েই আশ্রমে নামতে হয়।

এই স্বামীজী পূর্বাশ্রমে আমার মামা হতেন, আমাকে খুবই স্নেহ করেন, আর তাঁকে এখনও 'মামা' বলি, তাঁর শিষ্যরা এবিষয়ে খুবই বিরক্ত, তারা বলে, "সাধুদের সঙ্গে পূর্বাশ্রমের সম্বন্ধ পাতানো মহাপাপ। যে-সম্বন্ধ বিরজা হোমের কুণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, আবার তা নিয়ে নতুন করে সংসার পাতিয়ে তোলা—এ তোমার কি প্রবৃত্তি?"

বিশেষ করে আমার মাথায় চুল আছে আর আমি সেই চুলে তেলও মাখি, এটা তাঁদের পক্ষে যেন অসহ্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা আমার আরও একটি বিশেষ অন্যায়ের কথা তখনও জানতেন না, সেটি হলো—আমি প্রতিদিন চা খাই। বরং ভাত না খেয়ে দু-চারদিন বেশ থাকি, কিন্তু চা আমার প্রতিদিনের মৌতাত। যে আধ সের দুধ আমার ঘরে রোজ আসে, সে-দুধে প্রকাণ্ড এক গামলায় এক গামলা চা তৈরি করে নিজে খাই, আর ঘরে যেসব অতিথি আসেন সবলকেই ছোট ছোট পিতলের বাটিতে ভাগ করে দিই। চায়ের সঙ্গী না হলে চা খেয়ে আরাম নেই।

মা বলতেন, "লুকিয়ে কিছু করতে নেই।" সেই কথাটা মনের মধ্যে সবসময় গেঁথে ছিল। শেষে একদিন আমি স্বামীজীর কাছে বলে বসলাম, "মামা, আমি কিন্তু রোজ চা খাই," সকলে স্তম্ভিত। অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল।

মামা একটু হেসে বললেন, 'পাগলী'।

সভাভঙ্গের পর সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠছি, একটি ছেলেও উঠছিল সেই সময়। ছেলেটির বাড়ি আসামে, কিন্তু কাশীতেই থাকে, স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত।

'মাতাজী!' এই সম্বোধন শুনে তার দিকে চাইলাম, মনে হলো সে যেন কিছু বলবে আমাকে, কিন্তু সংকোচ হচ্ছে তাই বলতে পারছে না।

"আমাকে কিছু বলবে বাবা?"

ছেলেটি এসে আমাকে প্রণাম করলে, তারপর জানালে যে, আমার কাছে তার একটি প্রার্থনা আছে। আমি যদি অপরাধ গ্রহণ না করি তাহলে সে জানাতে পারে।

প্রার্থনাটি হলো এই যে, তাদের দেশে তার বাড়িতেই চায়ের বাগান আছে, সে চায়ের গন্ধ খুবই ভাল। চা খাওয়াটা তারা অনাচার বলে মনে করে না, তাদের দেশে সকলেই চা খায়। আমি যদি দয়া করে তাকে অনুমতি দিই, তাহলে সে আমার প্রতি মাসে যত চা লাগে সবই দেশ থেকে পার্সেলে আনিয়ে দেবে।

আর সেই অবধি যতদিন সে কাশীতে ছিল প্রতি মাসেই আমাকে তিন-চার পাউন্ড চা আনিয়ে দিত।*

[ক্রমশঃ]

* সরলাবালা রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৬০০-৬০৩

বাতায়ন

অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্যত্র সমুদ্র-কিনারের শহরগুলির বিপদ নিয়ে ভাবনা

প্রশান্তমহাসাগরের তীরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের ঠিক উত্তরে ওয়ারিঙ্গাসায়ার কাউন্সিল। এই কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ সিডনির ৬৫ শতাংশ সমুদ্র কিনারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। উত্তাল তরঙ্গ উঠলে এবং প্রচণ্ড ঝড় হলে সমুদ্রতটবর্তী দুলক্ষ অধিবাসী এবং মূল্যবান ২৫ কিলোমিটার সমুদ্রতটের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কাউন্সিল উদ্বিগ্ন।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন-অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লুরোকার্বন প্রভৃতি 'গ্রীনহাউস' গ্যাসগুলি উচ্চ বায়ুমণ্ডলে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি হারে জমা হচ্ছে। পৃথিবী যে উত্তাপ বিকিরণ করছে—তা এই সব গ্যাস ধরে রাখছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। এজন্য আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর হিমবাহগুলি গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে যাবে।

ওয়ারিঙ্গাসায়ার কাউন্সিল পরিকল্পনা নিয়েছে কিভাবে ঠিকাদাররা গ্রীনহাউস প্রভাবের কথা ভেবে সমুদ্র তটভূমির উন্নতিসাধন করবে। পরিকল্পনাগুলির মধ্যে আছে—নতুন যেসব বাড়ি হবে তার একতলা অনেক উঁচু করে তৈরি করা, খুব নিচু জায়গাগুলি বাড়ির জন্য বা হোটেলের জন্য ব্যবহার না করে গল্ফ খেলার মাঠ বা গাড়ি রাখার জায়গা করা প্রভৃতি।

অবশ্য, কত শীঘ্র সমুদ্রতল উঁচু হবে বা কতটা উঁচু হবে, এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা একমত নন। মোটামুটিভাবে এটা ধরা যেতে পারে যে, ২০৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমুদ্র তটরেখা ১৫—৫০ সেন্টিমিটার উঁচু হবে। ইউ. এস. এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির প্রজেক্ট ম্যানেজার জিম টিটাস-এর মতে ২১৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উচ্চতা ৫০ সেন্টিমিটার থেকে দু মিটার হতে পারে।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফিজিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক অ্যাকসেল উইন নিলসন টিটাসের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেছেন: "পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য যে সমুদ্রতলরেখা উঠছে, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।" মাপযন্ত্রে দেখা গেছে যে, গত একশ বছরে সমুদ্র-তলরেখা ১০—১৫ সেন্টিমিটার উঠেছে, কিন্তু এইরকম ওঠা যে চলতে থাকবে, তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কি হারে সমুদ্রতলরেখা উঠবে, এসম্বন্ধেও মতবিরোধ রয়েছে। কলোরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, সমুদ্রতলরেখা যেরকম উঠবে বলা হয়েছে, তারচেয়ে কম হারে উঠবে। অন্যদিকে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল টুলি অনেক তথ্য দিয়ে অভিমত দিচ্ছেন যে, কয়েকসপ্তাহের মধ্যে এই তল-রেখা ২৩ সেন্টিমিটার উঠতে পারে, আবার কয়েক বছরে কয়েক মিটারও উঠতে পারে। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, কত মিটার কখন উঠবে এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এমন পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে যেমন যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যাবে সেইমত ব্যবস্থারও পরিবর্তন করা যেতে পারে। সেইজন্য অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় গবেষণাসংস্থা কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অরগ্যানাইজেশন (CSIRO) অস্ট্রেলিয়ার চারদিকে দক্ষিণ প্যাসিফিকের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের নানা জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। গত ডিসেম্বরে ভেনিস-এ বৈজ্ঞানিকেরা ও নগরপরিকল্পনাকারীরা এবিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য মিলিত হয়েছিলেন। এই মিটিং-এর নাম দেওয়া হয়েছে 'জলের ওপরে শহর-গুলি সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।'

প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও ক্যারিবিয়েন সাগরে অবস্থিত যেসব দ্বীপের স্থলভূমি কম তাদের বিপদের কথা ভাবতে হচ্ছে। মালদ্বীপের অ্যাটল স্টেট-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র তিন মিটার উঁচু। এইরকম আরও ছোট ছোট দ্বীপ আছে।

নানা জায়গায় নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লন্ডনের টেমস নদীতে একটি কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। লেনিনগ্রাড-এর জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভেনিস শহরের তিনটি নদীমুখে এই শতাব্দীর শেষে স্টীল-এর গেট করা হয়ে যাবে।*

* **New Scientist, 3 Februrary, 1990, pp. 46—49**

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৭ ॥

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল রাত্রি প্রায় নটার সময় ঠাকুরের চির আদরের মানসপুত্র 'ব্রজের রাখাল', স্বামীজীর 'রাজা' নরলীলা সংবরণ করে চিন্ময়ধামে চলে গেলেন। শেষ সময়ে সকলে মিলে তাঁকে যে নাম শোনাচ্ছিলেন, তা থামলে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ একটিও কথা না বলে বলরাম মন্দিরের দ্বিতলের বড় হলঘরটি থেকে গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজজী তার একটু পরেই শ্রীশ্রীমহারাজজীর সেই শায়িত দেবদুর্লভ মূর্তির দিকে একটু গিয়ে এবং তা অপলক দৃষ্টিতে দর্শন করে নিজের ভাবেই বলতে লাগলেন: "আ-হা-হা। কী বিরাট দেহ, কী বিশাল বক্ষ! যেন শেষশায়ী নারায়ণ, শেষশায়ী নারায়ণ! কে বলবে যে এ-শরীরে কোন রোগ ছিল?" এই কথাগুলো বার-বার বলতে বলতে তিনিও ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

*

কলকাতা বিদ্যার্থী-ভবনের (স্টুডেন্টস হোমের) কয়েকজন ছাত্র রাজা মহারাজের কাছে যাতায়াত করত। মহারাজও ছেলেগুলিকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি লীলা সংবরণ করে স্বধামে চলে যেতে ঐ ছাত্রদলটি প্রাণে বিশেষ আঘাত পায়। তাঁর অদর্শনের চার-পাঁচ দিন পরে ঐ দলের ইন্দু ও আমি খুব শোকার্ত হৃদয়ে বিকালের দিকে বেলুড় মঠে যাই। মহাপুরুষ মহারাজজী তখন মঠবাড়ির দোতলার ঘরখানি কালী মহারাজজীকে (স্বামী অভেদানন্দজীকে) ছেড়ে দিয়ে 'গিরিশ মেমোরিয়াল'-এর নিচের তলার ঘরটিতে বাস করছেন। আমরা ঐ ঘরটিতে ঢুকে দেখি মহাপুরুষ মহারাজজী হাত জোড় করে মা গঙ্গার দিকে মুখ করে স্থিরভাবে চেয়ারে বসে আছেন। তারপর আমি "মহারাজ, মহারাজ তো চলে গেলেন"—মাত্র এই কথা কটি বলে আমাদের মনোবেদনা জানালাম। তিনি কতকটা তাঁর স্বভাবসুলভভাবেই প্রথমে বলতে সুরু করলেন: "দেখ, যদি একথা সত্য হয় যে তাঁর কৃপায় আমরা এগোচ্ছি—(সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে)—যদি? যদি-ফদি এতে নেই। প্রত্যক্ষ দেখছি যে, তাঁর কৃপায় আমরা দিন দিন এগোচ্ছি, এতে কোন সন্দেহই নেই। আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঠিক এগোচ্ছ। কারণ আমরা তোমাদের ভালবাসি, তা তোমরা এটা বুঝতে পার, আর নাই পার।"

ঐ কথাগুলো বারবার দৃঢ়ভাবে বলতে বলতে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। ভাবাবেগে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি কখনো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠছেন, কখনো আবার বসছেন। ভাবে আত্মহারা হয়ে যেন নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হলো সন্দেহবাচক ঐ 'যদি' শব্দটি নিজ অজ্ঞাতসারে একবারমাত্র উচ্চারণ করেই যেন তিনি মহা অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর দারুণ অবিচার করেছেন আর সেজন্য যেন তিনি মহা অনুতপ্ত হয়েছেন।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও প্রেমে তিনি এতই বিভোর, তন্ময় ও তদ্‌গতচিত্ত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, ঠাকুর ভিন্ন মহাপুরুষ-আর অন্য কোনও পৃথক সত্তা ছিল না। ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ফলে তিনি ঠাকুরময়ই হয়ে গিয়েছিলেন। একবার জনৈক সাধু মহাপুরুষ মহারাজজীকে কোন ভক্তের কথা বলছিলেন। তিনি কিন্তু ঠিক তাকে চিনতে পারছেন না দেখে সাধুটি তখন তাঁকে বলেন: "সে আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে।" ঐ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি অবাক হয়ে দৃঢ়স্বরে বলেন: "কী, আমি দীক্ষা দিয়েছি! আমি তো কাউকে দীক্ষা দিই না! ঠাকুরই তো দীক্ষা দেন, ঠাকুরই তো সকলকে কৃপা করেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতোই মহাপুরুষ মহারাজজীও প্রার্থনা এবং শরণাগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন: "প্রার্থনা কখনো বিফলে যায় না। সত্যিই দেখেছি প্রার্থনা কখনো বিফল হয়নি। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, দেখবে তা কখনো বিফলে যাবে না, তাঁর দয়া হবে।" তিনি যে এই দুটি বিষয়ে কেবল মৌখিক উপদেশ দিতেন তা নয়, নিজজীবনে তা করে দেখাতেন।

অনেকেই তাঁকে হাত জোড় করে আবেগময় কণ্ঠে বলতে শুনেছে : "প্রভু, শরণাগত, শরণাগত।"

মঠের পুরনো বাড়ির দোতলায় স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমের ঘরে বসে আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে সম্মুখে উপবিষ্ট দু-একজন ভক্তকে বলেছিলেন : "দেখ, কৃপা আর আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের আর কিই বা আছে? আমাদের সবটাই তো আশীর্বাদ।" একবার তিনি বলেছিলেন : "প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর নাম আর প্রার্থনা (জগৎকল্যাণে) চলছে।"

স্বর্ণকণা যেমন স্বর্ণই, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিই; তারতম্য কেবল প্রকাশে। তেমনি অবতার ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে বাহ্যতঃ কিছু পার্থক্য লক্ষিত হলেও মূলতঃ ঐ একই সত্তা। ভগবান অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ। অবতার নরদেহে ভগবান স্বয়ং। স্বামীজীর ভাষায় ঠাকুর যেমন ছিলেন— "Love Personified"—মূর্তিমান প্রেম, স্বামীজী নিজে এবং তাঁর গুরুভাইরাও প্রত্যেকেই তেমনি ছিলেন তা-ই।

কলকাতা বিদ্যার্থী-ভবনের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই যে ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠে যাতায়াত শুরু করে, সেকথা প্রথমেই বলেছি। এর পর থেকে যেসব ছাত্র বিভিন্ন সময়ে এসে ঐ বিদ্যার্থী-ভবনে থাকে এবং তাদের মধ্যে যারা মঠে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতে থাকে তাদের প্রত্যেকেরই প্রতি মহাপুরুষ মহারাজজীর কী গভীর স্নেহ-ভালবাসা আর শুভেচ্ছাই না ছিল। প্রয়োজনবোধে তাদের শাসনও করতেন, আর যতদিন না একটু মানুষের মতো হয়ে ওঠে ততদিন তাদের জন্য কী দুর্ভাবনাই না তাঁর ছিল!

তখন কলকাতা বিদ্যার্থী-ভবনের জনৈক ছাত্র মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কয়েকবার জেলে গেল। এভাবে রাজনীতি নিয়ে বছর দুই কাটাবার পর তার আর ওসব ভাল লাগে না। শেষে সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সে একদিন মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করে। মহাপুরুষজী তার মুখে সব শুনে বললেন, "ও-সবে কিছু হবে না—কিছু হবে না।" মহাপুরুষজীর কথা শুনে ছাত্রটি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "মহারাজ, তাহলে এখন উপায়!" মহাপুরুষজী গম্ভীরভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন :

"তুমি ঠাকুরকে মান কি?"

উত্তর এল—"হ্যাঁ, মহারাজ।"

তিনি দ্বিতীয়বার তাকে প্রশ্ন করলেন—"শ্রীমাকে মান তো?" উত্তর এল—"হ্যাঁ, মহারাজ।" (ঐ ছাত্রটি এসব রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিল)। তিনি শেষ ও তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন : "স্বামীজীকে মান তো?" ছাত্রটি এবারও দৃঢ়ভাবেই উত্তর দিল— "হ্যাঁ, মহারাজ, মানি।" ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে মানে জেনেই মহাপুরুষ মহারাজজী খুব প্রসন্ন হয়ে তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "তবে আর ভয় নেই, কোন ভয় নেই। আমি বলছি আর কোন ভয় নেই। হবে হবে, সব হবে। আর কিছু ভেব না।" এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে ছাত্রটি মঠে যোগ দিয়ে যথাকালে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

জনৈক ভক্তের কনিষ্ঠ পুত্রটি আটমাসে ভূমিষ্ঠ হয়। তার বাঁচবার আশা নেই, বড় বড় ডাক্তাররাও কিছু ভরসা দিতে পারছেন না। মহাপুরুষ মহারাজজী তখন (সম্ভবতঃ ১৯২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে) রয়েছেন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে। কোন উপায় না দেখে ভক্তটির বৃদ্ধা মা নিরুপায় হয়ে ছুটলেন অগতির গতি মহাপুরুষ মহারাজজীর কাছে তাঁর কৃপাভিখারী হয়ে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—তাঁর আশীর্বাদে ও চরণধূলিস্পর্শে তাঁর নাতিটি নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।

ঐ আশ্রমে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজজীকে প্রণাম করে বৃদ্ধা নিজ আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে অতি কাতরভাবে তাঁর আশীর্বাদভিক্ষা করলেন। মহাপুরুষ মহারাজজী স্থিরভাবে দুঃখের কাহিনী সব শুনে শেষে তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন : "না, এ ছেলের তো মরবার কথা নয়। যে কালসাপের বিষ (মহামন্ত্র) পেটে পড়েছে (ঐ নবজাত শিশুটি গর্ভে থাকাকালে তার মাকে মহাপুরুষ মহারাজজী দীক্ষা দিয়েছিলেন, ঐ ঘটনাকে উদ্দেশ করেই তিনি ওকথা বলেছিলেন) তাতে ওকে (নবজাত মৃতকল্প শিশুটিকে) পাথরে আছাড় মারলেও ওর কিছুই হবে না। তুমি কিছু ভেব না, মা, ঠাকুরের কৃপায়

ও ভাল হয়ে যাবে।" এই আশ্বাস ও অভয় পেয়ে বৃদ্ধা তাঁর শ্রীচরণধূলিগ্রহণে অগ্রসর হলেন। মহাপুরুষ মহারাজজী তখন শিবতলে কার্পেট-বিছানো ঘরে মোজাপায়ে বসেছিলেন। বৃদ্ধাকে পদধূলিগ্রহণে উদ্যত দেখে তিনি রহস্য করে বললেন, "পায়ে ধূলো কোথায় যে নেবে?" বৃদ্ধা কিন্তু তখন আঁচল প্রসারিত করে ভক্তিভরে তাঁর চরণ দুটি স্পর্শ করে বললেন, "এতেই হবে, বাবা।" মহাপুরুষ মহারাজজীও বৃদ্ধার ঐ কাণ্ড দেখে এবং কথা শুনে বালকের মতো হাসতে লাগলেন।

তাঁর আশীর্বাদের ফলে ঐ মুমূর্ষু শিশুটি অতঃপর ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে।

মহাপুরুষ মহারাজজীর অশেষ কৃপায় শিশুটি ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে প্রায় নবছরে পড়েছে। এই সময়ে সে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়টি মুখস্থ করেছে। একদিন বিকেলে (সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ) ছেলেটিকে নিয়ে তার বাবা মঠে এসেছেন। মহাপুরুষ মহারাজজীকে দর্শন ও প্রণাম করে ছোট ছেলেটিকে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়টি আবৃত্তি করে মহাপুরুষজীকে শোনাতে বললেন। আবৃত্তি শুনে মহাপুরুষ মহারাজ মহাখুশি হয়ে যাকেই সামনে দেখছেন তাকেই ডেকে বলছেন: "দেখেছ, দেখেছ, এইটুকু ছেলে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়টি কেমন সুন্দর আবৃত্তি করল!" এদিকে সন্ধ্যার সময় গ্রহণও লেগে গেল।

শ্রীগুরুদেবকে খুব খুশি দেখে ছেলেটির বাবা তখন ছেলের দীক্ষার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে আবদার করে ধরে বসলেন। এই কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজজী বললেন: "সে কি কথা! এইটুকু ছেলে, এর আবার দীক্ষা! ও দীক্ষার কি বোঝে? বড় হলে, পরে হবে।" উনি তবু ছাড়ছেন না দেখে মহারাজ বললেন: "ব্রাহ্মণের ছেলে, এখনো পৈতে হয়নি, পৈতে না হলে দীক্ষা কি করে হয়?" ওঁরা তখন বললেন: "মহারাজ, আপনি কৃপা করে ওকে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে দিন, তা হলেই তো হবে। পরে যথাসময়ে যথাশাস্ত্র ওর উপনয়ন—সংস্কারাদি কাজ করব।"

আশুতোষ ও কৃপাঘনমূর্তি মহারাজজী ভক্তটির প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ছেলেটিকে গায়ত্রীমন্ত্র বলে ও তাকে দিয়ে তা উচ্চারণ করিয়ে নিয়ে পরে তাকে 'দীক্ষামন্ত্র' দিলেন। ঐ মন্ত্রদানকালে তিনি ছেলেটির বাবাকে ডেকে বললেন, "দেখ, এ ছেলেমানুষ, মন্ত্র ভুলে যেতে পারে, তাই তুমিও এর মন্ত্রটি শুনে রাখ। আর এর মন্ত্রটি ঠিক মনে আছে কিনা তা মাঝে মাঝে দেখবে, ভুল করলে তা শুধরে দেবে।" তিনি চেয়ারে বসেই ঐ দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করলেন।

মন্ত্র তো বইতেও লেখা আছে। কিন্তু ঐ মন্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে তা রূপান্তরিত হয় 'সিদ্ধমন্ত্রে'। ঐ মন্ত্রের অমোঘ শক্তি সাধককে ভববন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত করে দেয়—নিয়ে যায় ভবনদীপারে।

তাঁর প্রেম করুণা ও শুভেচ্ছাদি কি শুধু মঠের গণ্ডীর মধ্যে যাঁরা এসে পড়তেন কেবল তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাঁদেরই ওপর কেবল বর্ষিত হতো? তা হলে তাঁর মহাপুরুষত্ব আর কোথায়? বড়জোর না হয় তিনি হতেন কিছু উচ্চস্তরের একজন সাধুমাত্র। কিন্তু সত্যই মহারাজজী 'মহাপুরুষ' ছিলেন। তাঁর প্রেম ও করুণাপূর্ণ বিশাল হৃদয়ের প্রসারতা ছিল অনন্ত; কোন সীমা বা সংকীর্ণতার স্থান তাতে আদৌ ছিল না। সর্বজীবে করুণা তাঁর চরিত্রের অন্যতম মাধুর্য।

একবার গ্রীষ্মে দীর্ঘকাল ধরে দারুণ খরা চলেছে, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। চারদিকে হাহাকার রব উঠেছে। মহাপুরুষ মহারাজ তখন ছিলেন বাংলার বাইরে। জনৈক যুবক পত্রে তাঁকে ঐ অনাবৃষ্টির কথা জানাতে সে-সংবাদে তিনি বিশেষ দুঃখিত হন আর ঐ অনাবৃষ্টিজনিত দুর্দৈব থেকে মুক্তিলাভের জন্য তিনি ঐ যুবকটিকে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুলসী দিতে বলেন। তাঁর শুভেচ্ছাবলে শীঘ্রই বৃষ্টি হওয়ায় মঠে শ্রীঠাকুরের চরণে ঐ তুলসী দেবার আর প্রয়োজন হয়নি।

তাঁর অযাচিত প্রেম ও করুণা থেকে পশু-পক্ষীরাও বঞ্চিত হতো না। তাদের প্রতিও তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। মঠে 'কেলো' নামে তাঁর যে কুকুরটি ছিল, তার ওপর তাঁর যে কত দরদ ও ভালবাসা ছিল, তা তখন মঠে যারা যেত তারা অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে। [ক্রমশঃ]

পরীক্ষা

স্বামী গোপেশানন্দ

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জীবনে কোন পরীক্ষা দেয়নি অথবা পরীক্ষা নেয়নি। বাজারে আলু-পটল কিনতে গেলেও ভাবতে হয় ঠিক জিনিস নিচ্ছি তো? আবার পরপারের ডাক এলেও আমাকে পরীক্ষা করা হবে—মরেছি তো? এখন এই পরীক্ষা ও তার ফলাফল নিয়ে একটু চিন্তা করব।

চামড়া ফুঁড়ে সূচ ঢুকল, কিছু রক্ত টেনে নিল। প্রয়োজন বোধে মাংসও তোলা হলো। রক্ত গেল, মাংসও গেল। দাঁত তো ভদ্রভাবে বিদায় না-নিলে সাঁড়াশি দিয়ে তাকে হামেশা গদিচ্যুত করা হচ্ছেই। হৃৎপিণ্ড ভরতুকি হিসাবে পেসমেকার পাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে পুরনো হৃৎপিণ্ডকে সমূলে উৎপাটন করে নামী কোম্পানীর পাম্প বসানোর চিন্তা অনেকের মাথায় কিলবিল করছে। পৈতৃক সম্পত্তির বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। যাঁরা বলেন শরীরই আত্মা তাঁদের বংশে বাতি দেবার জন্যে অরিজিন্যাল কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো? পুনর্জন্ম যদি উঠে যায় তা হলে 'আহা মরি শিশুকাল' আর আসবে কি? যাই হোক এখনও রুগীকে পরীক্ষা দিতে দিতে ঘরবাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে। চিকিৎসার দৌলতেই হোক অথবা বাড়ির শোকেই হোক শেষ পর্যন্ত ভবলীলা সাঙ্গ করে রুগী রোগ থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে। জীবন থাকলেই মৃত্যু আছে এই সনাতন আপেক্ষিকতত্ত্ব কস্মিন কালেও পাল্টাবে না। শুনেছি আগেকার দিনে এমন সব ডাক্তার-বদ্যি ছিলেন যাঁদের চোখ অথবা প্রজ্ঞা বিনা-পরীক্ষায় রুগীর চিকিৎসা করত। এখন সে-ডাক্তারও নেই, বোধ হয় সে-রোগও নেই, আছে শুধু ডাক্তারি মেশিন।

শুধু ডাক্তার কেন, আমিও পরীক্ষক হয়ে কি বিভ্রাটেই না পড়েছিলাম। সে-কথা একটু আপনাদের শোনাই।—টেবিলের ওপর জ্বলজ্বলে ছলছলে একই রকম দু-টুকরো জিনিস রেখে আমাকে বলা হলো—"বল তো কোনটা হীরে আর কোনটা কাঁচ?" হীরের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না—"হীরে এই প্রথম দেখছি।" কাঁচ জন্ম থেকেই দেখে আসছি, এখনো দেখছি। শুধু দেখছি না, এই শেষ বয়সে কাঁচের ভেতর দিয়েই দেখে থাকি। অনেক দেখে ও নাড়াচাড়া করেও যখন কাঁচ ও হীরেকে আলাদা করে সনাক্ত করতে পারলাম না, তখন ঠিক করলাম পরীক্ষা করব।—জলে তো কোনটাই গলবে না। আচ্ছা, হীরে তো আদতে কয়লা। আগুন দিয়ে দেখব কি? পুড়বে তো? আপনি কি বলেন? যাই হোক আমাকে কিছুই করতে হলো না। আমাদের রামবাবু কাছেই ছিলেন। আড়চোখে দেখেই বলে দিলেন—কোনটা হীরে আর কোনটা কাঁচ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বুঝলেন কেমন করে? উনি বললেন—"রতনে রতন চেনে, শুয়রে চেনে ঘেঁচু।" তাঁর বদনের দিকে তাকিয়ে দেখি—"ধূর্জটির মুখে যেন পার্বতীর হাসি।"

আমাদের পরীক্ষার কথায় আর নাই বা গেলাম। এখন এমন একজনের কথা বলতে চাই যিনি পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়রূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদেরই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ইত্যাদি ইত্যাদি মহাসিদ্ধেরা প্রথম দর্শনেই আঁচ করতে পেরেছিলেন—তাঁরা কোন্ মহাপুরুষের কাছে এসে পড়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা নিজের নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কোন পরীক্ষার দরকার হয়নি। কিন্তু সেকালের আধুনিকেরা নিজের নিজের পরীক্ষা-পদ্ধতি অম্লান বদনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রয়োগ করেছেন। আর করবেন

নাই বা কেন? বিনা-পয়সায় এমন পরীক্ষাগার কোথায় কবে পাওয়া গেছে? আবার শ্রীশ্রীঠাকুরই বলছেন—ভাল করে পরীক্ষা করতে, যাচাই করতে। সুতরাং পরীক্ষা কর, ভাল করে কর, বারবার কর। সাবধান! ভুল যেন না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখে রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর ধারণা হলো যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের জন্যেই ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে সুন্দরী বারনারীদের সাহায্য নিলেন। কিন্তু হায়! উল্টা সমঝলি রাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকের মতো স্বভাব দেখে ও ঐ বালকের মুখে মা মা ডাক শুনে তারা নিজেদের কথা ভুলল। কাঁদতে কাঁদতে তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়ল। সীতার অগ্নিপরীক্ষাও বোধ হয় এর কাছে পরাভূত। ধন্য বারনারী, তোমরা ধন্য! রানী ও মথুরবাবুর মহাভুলে তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সজল নয়নে প্রণাম করার মহাসুযোগ পেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তখন সমাধিস্থ হতেন। এই সমাধি নিয়ে তর্ক-বিতণ্ডা লেগেই থাকতো। দুই ডাক্তার তর্ক-বিতণ্ডায় কোন মীমাংসাতে আসতে না-পেরে পরীক্ষায় লেগে গেলেন। একজন বুকে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে কোন সাড়া পেলেন না। ভাগ্যিস বুকটাকে ফুটো করে হৃৎপিণ্ডটা টেনে বের করে আনেননি। তবে আরেক জন একটি মহৎ কর্ম করলেন। তিনি ঠাকুরের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। চোখ কিন্তু নির্বিকার। সিদ্ধান্ত হলো—সমাধি অবস্থার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বহির্ভূত। নতুন সিদ্ধান্ত বটে! যাই হোক, এই দুজন ডাক্তারবাবুর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কারণ, পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখদুটো কানা করে ফেলেননি!

স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করেছেন—একবার নয়, অনেকবার। যখনই সন্দেহ হয়েছে তখনই, তবে খুব সাবধানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ত্যাগ করার দু-দিন আগে স্বামীজীর মনে চিন্তা এল এই অবস্থায় যদি ইনি বলতে পারেন—'আমি ভগবান'—তাহলেই বিশ্বাস করব। স্বামীজীর মনের কথা বুঝতে পেরে করুণাময় ঠাকুর বরাবর যে-কথা বলে এসেছেন সেই কথাই আবার বললেন—"যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।"

অন্যের মনের কথা বুঝতে পারার জন্যে এখন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঠাকুর যে অন্তর্যামী সে-প্রমাণ এর আগে অনেক পাওয়া গেছে। আর ঠাকুর আসামীও নন এবং স্বামীজী পুলিসও নন যে এই অবস্থায় শেষ কথা জেনে নেওয়া খুব দরকার। এবং এও জানা কথা যে, ঠাকুর টিয়া পাখি নন যে শেষকালে ট্যাঁ ট্যাঁ করবেন। তিনি যা ছিলেন, তাই হয়েছেন ও তাই বরাবর বলেছেন। স্বামীজী সে-কথা ভালভাবেই জানতেন এবং তার জন্যেই তিনি ঠাকুরকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসতেন। কিন্তু এই অন্তিম সময় এ-পরীক্ষা নেওয়া কি নিষ্ঠুরতা নয়?

"ওগো নিঠুর দরদি! এ কি খেলা খেলছ অনুক্ষণ!" অনেকে বলেন, এ-পরীক্ষা পরীক্ষাই নয়। এ হচ্ছে লীলাবিলাস। কার লীলাবিলাস? ঠাকুরের, না স্বামীজীর, না দু-জনেরই?

যাঁরা লীলাবিলাস ভাল বোঝেন না তাঁরা বলেন স্বামীজী মোটেই নিষ্ঠুর ছিলেন না। বরঞ্চ তাঁর মতো প্রেমেভরা হৃদয় নিয়ে পৃথিবীতে এর আগে খুব বেশি কেউ আসেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর কি ছিলেন তা আমাদের মতো সন্দেহবাতিকদের বুঝবার জন্যেই তিনি শেষকাল পর্যন্ত এমন-কি শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। সে অনেক কথা।

প্রশ্ন হচ্ছে—লীলাবিলাসই হোক আর পরীক্ষাই হোক, আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের এসব পড়ে ও শুনে কিছু লাভ হচ্ছে কি? কেউ কেউ বলেন—আমাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন, কিছু হয়নি—তাঁদের আশা আছে। আর যাঁরা মনে করেন, কিছু হয়েছে—তাঁদের হয়েছে। আপনি কি বলেন?

'মন্মনা ভব'

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

আমাদের জীবনে শান্তি বা আনন্দ কোথায় ? মনের চাহিদা যতটা, ততটা আমরা পাই কি ? আমরা জানি, এর উত্তর, না। মনের চাওয়ার কোন সীমা নেই, যতই তাকে দেওয়া যাক, সে আরো চাইবে—পৃথিবীতে যত ধন সম্পদ শস্যাদি আছে, একজন মানুষের মনের তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়। এখন যা পেলে তৃপ্ত হবে বলে আমাদের মন ভাবছে, তা পেলে কিছুদিন মাত্র তৃপ্ত থেকেই সে আরো চাইবে, সেটুকু পেলে আরো বেশি চাইবে, যতই পাক, তার চাওয়া কোন দিন থামবে না—সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুকেই সে করায়ত্ত করতে চাইবে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মন বিশ্লেষণ করে দেখলে এবং পৃথিবীর যে-কোন দেশের দিকে, যে-কোন সমাজের দিকে, যে-কোন কর্মক্ষেত্রের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালেই মানুষের মনের এই চির অতৃপ্ত তৃষ্ণাকে স্পষ্টরূপে, অতি স্পষ্টরূপে দেখতে পাই।

তাছাড়া যে-কোন বিষয়ভোগের আনন্দই ক্ষণস্থায়ী, অধিকতর বুভুক্ষা সৃষ্টিকারী, মনের আনন্দ উপভোগের চাহিদার তুলনায় অত্যল্প, এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ও বিষণ্ণতা তার অনিবার্য অনুগামী। আবার অত্যধিক ভোগের পরিণামও বিষময়। মানুষের ভোগতৃষ্ণার তুলনায় ভোগের শক্তিও সীমিত। একটি জীবন সে-তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে কিছুই নয়। এদিকে শরীর জীর্ণ হয়। ভোগতৃষ্ণা কিন্তু সেই সঙ্গে জীর্ণ হয় না, তাই, মানুষের দেহাতীত সত্তায় অবিশ্বাসীর কাছে, বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান যে পায়নি তার কাছে এর পরিণাম অধিকতর বিষময়। তবু মন ঘা খেয়েও, পরিণাম জেনেও এই আপাতসুখলাভের পথেই জীবনকে বারবার পরিচালনা করে। কারণ আনন্দলাভের অন্য কোন পথ তার জানা থাকে না। জানা-অর্থে কেবল শোনা, এই শোনা সত্য হতেও পারে বা না হতেও পারে, বিষয়ভোগে আনন্দ পাওয়া যায়—এ-বিশ্বাস তার যতখানি দৃঢ়, ততখানি সত্য। যেভাবেই হোক এ-বিশ্বাস যদি মনে একবার আসে, যদি সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয় যে, বিষয়ভোগ ছাড়াও আনন্দলাভ সম্ভব, যে-আনন্দ বিষয়ভোগে পেয়েছি তা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি আনন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন স্থায়ী আনন্দলাভ সম্ভব। তাহলে সে আনন্দলাভের জন্য বিষয় আহরণার্থে উদগ্র লালসা নিয়ে হিতাহিতশূন্য হয়ে আর কখনো অগ্রসর হবে না। অন্ততঃ সে ইচ্ছাকে যথেষ্ট সংযত রাখতে পারবে। মানুষের সমস্যা মেটাবার জন্য তাই মূলকথা হলো মনকে এই আনন্দের আস্বাদ একটু দিয়ে মনের বিশ্বাস উৎপাদন করা।

কিন্তু সত্যই কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দলাভের অন্য কোন পথ আছে ? মনকে কি তাতে আকৃষ্ট করা যায় ? নিশ্চয়ই আছে এবং নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু তার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় একটু জোর দিতে হয়। এই জন্য ভারতের বিভিন্ন মহাপুরুষেরা শুধু অনুমান-সহায়ে নয়, মানুষের মন ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করে কয়েকটি সার্বজনীন পদ্ধতি দিয়ে গেছেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো দুটি—নিয়মিতভাবে মনকে স্থির করা এবং মন যা চায় তাকে তা না দেবার অভ্যাস, যার অপর নাম একাগ্রতা ও সংযম-অভ্যাস। দুটি নাম ভিন্ন হলেও এদুটি মূলতঃ একটি চেষ্টারই দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মাত্র। চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কর্মের ক্ষেত্রে মনকে তার ইচ্ছামত চলতে না দিয়ে নিজের বশে নিয়ে আসবার চেষ্টা। কোন একটি মাত্র বিষয়ে মন স্থির করতে গেলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, মন কোন্ ফাঁকে আমাদের অজ্ঞাতসারেই সেখান থেকে সরে অন্য বহু চিন্তায় চলে গিয়েছে। অবশ্য যে-বিষয় চিন্তা মনে ভাল লাগে তাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই কিছুক্ষণ লেগে থাকে। অর্থাৎ সে আমাদের কথা শুনবে না, নিজের ইচ্ছামত চিন্তা করবেই। চেষ্টা করে কোন একটি বিষয়ে তাকে স্থির করবার সময় যখনই আমরা টের পাই যে, সে অন্য চিন্তায় চলে

গিয়েছে, তখনই তাকে পূর্ব চিন্তায় ফিরিয়ে আনতে হয়। এটাই একাগ্রতার অভ্যাস। চেষ্টা আরম্ভ মাত্রই মন স্থির হবে না সত্য কথা, কিন্তু নিয়মিতভাবে এই অভ্যাসের ফলেই ক্রমে মানুষ মনের অধীশ্বর হয়ে ওঠে। যতবার আমরা মনকে ধরে এনে পূর্ব চিন্তায় নিয়োগ করি, ততবারই যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছাশক্তি—মনকে বশে আনার শক্তি কিছুটা বেড়ে যায়। আবার সংযমের বেলায়ও তাই। মন যখন যা চাইছে, তখন তাকে তা না দিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশক্তি কিছুটা বাড়বেই। ছোটখাট জিনিস নিয়ে, যেমন বিশেষ দিনে উপবাস, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ পালন, ইত্যাদি নিয়ে এই অনুশীলন আরম্ভ করতে হয়, যা আমাদের সকলেরই সাধ্য। এটি ইচ্ছাশক্তি বাড়াবার একটি উপায়। একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে মন একটু স্থির হলেই সে বিমল আনন্দের আস্বাদও একটু পায়। এ আনন্দ তার সচরাচর পরিচিত বিষয়ভোগজনিত আনন্দ থেকে পৃথক। কারণ এই আনন্দ আমাদের ভেতর হতেই আসে। আমাদের মন সচরাচর যে আনন্দের সঙ্গে পরিচিত তার জন্য বহির্জগতের কোন কিছু পাওয়ার ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়—কোন স্থূল ভোগ্যবস্তু, অথবা প্রশংসা, আধিপত্য ইত্যাদি। কিন্তু একাগ্রতা-জনিত আনন্দের জন্য বাইরের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দলাভের জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ, সংরক্ষণ ও অধিকার নিয়ে অপরের সঙ্গে কোন সংঘর্ষেরও প্রশ্ন ওঠে না, অপরকে ভালবাসার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা আনে না। অবশ্য সব আনন্দ ভেতর থেকেই আসে, আনন্দ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। বিষয়ানন্দের ক্ষেত্রে বহির্বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে মনে এই পরিবর্তন আসে, একাগ্রতাজনিত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয় নিরপেক্ষ-ভাবেই, মন আপনা আপনি পরিবর্তিত হয় এই মাত্র প্রভেদ।

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের সঙ্গে পরিচিত নয় বলেই বিষয়ানন্দের জন্য উন্মত্ত হয়। একাগ্রতাজনিত আনন্দ বিষয়ানন্দের চেয়ে উচ্চতর, প্রতিক্রিয়াহীন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী আনন্দ। একবার এই আনন্দের আস্বাদ পেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মন নিজেই তা পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করবে, যেমন সে করে থাকে বিষয়ানন্দ লাভের ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: মিছরির পানার আস্বাদ একবার পেলে কেউ আর চিটেগুড়ের পানা খেতে চাইবে না। মনের ষোল আনা শক্তি ঈশ্বরলাভের জন্য খরচ করতে পারলে তবেই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের ষোল আনা মনই চান। গীতার পরম তত্ত্ব তো অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে। আমরা কৃতার্থ হই ভগবানের অনুগ্রহে। এই অনুগ্রহ অন্য-নিরপেক্ষ। তাঁর করুণা বিত্তের অপেক্ষা রাখে না, পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না, বংশমর্যাদারও অপেক্ষা রাখে না। সেই পরমানন্দ-ঘনমূর্তি অনন্ত ভগবানকে ভজনা করতে হয় চিন্তার দ্বারা। ওপরে গীতার যে দুটি শ্লোকের কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি শুরু হয়েছে, 'মন্মনা ভব' দিয়ে। দ্বিতীয় শ্লোকটির গোড়াতেই বলা হয়েছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'। ঈশ্বরের শরণাগতি এবং তাঁর করুণা তো নিঃসংশয়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় আমাদের শেষ সম্বল। আমাদের অন্তরে কামনার এবং অহঙ্কারের অসুর খাড়া থাকতে দিব্যজীবন যাপন অসম্ভব। কোন মানুষই জোর করে বলতে পারে না, সংসারসমুদ্রে আমার জীবনতরী চলবে আমারই ইচ্ছায়। ঈশ্বরের দরজায় পৌঁছানোর পথে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড দুর্লঙ্ঘ্য গুঁড়ি এবং ঠাকুরের ভাষায় এই গুঁড়িটা হচ্ছে অহঙ্কার। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও শরণাগতির ওপরে এতটা জোর দিয়েছেন। বারংবার বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। বলেছেন, "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু"! কিন্তু 'মামেকং শরণং ব্রজ'—শরণাগতি, ভগবদনুগ্রহের সঙ্গে আর একটা সত্য অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে আছে, 'মন্মনা ভব'। ভগবানের করুণার দরজা, আমি ঢুকতে চাইলে খুলে যাবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে সেই দরজায় আঘাত করতে হবে। খৃীস্টের কথায়, তুমি চাও, তবেই তো পাবে। ভগবানের অনুগ্রহ আমি পাবই পাব, কিন্তু সেই অনুগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। এই দৈব অনুগ্রহলাভের জন্য সাধনের সার্থকতার

কথা এসে পড়ে। ভগবানের করুণা লাভ করতে হলে নিজেকে নিয়ত জাগ্রত ও উদ্যত রাখার প্রয়োজন আছে। কথামৃতের পাতায় পাতায় যেমন শরণাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের কথাও আছে। নির্জনবাস এই সাধনের পক্ষে অনুকূল বলেই ঠাকুর বারংবার বলেছেন 'ঠাঁইনারা' হয়ে বাস করতে। মানুষ ভগবানের জন্য কোন সাধনাই করবে না, নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে এবং তাঁর করুণাধারা আপনা থেকেই মানবজীবনে নেমে আসবে, এমনটি হবার নয়। ঠাকুর পুরুষকারের ওপরে, কর্মের ওপরে তাই বিশেষ জোর দিয়েছেন।

সাধন-ভজনের কথায় প্রশ্ন উঠবেঃ সাধন ভজন বলতে আমরা কি বুঝব? ঠাকুর সাধনের জন্য বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। ঠাকুর বলতেনঃ "কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে-খরচ হয়ে পড়ে।" মন নিয়েই তো সব। ঠাকুর বলতেন ঃ "মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত।" ধর্মসাধনার সমস্ত নাট্যলীলাই তো মনেরই রঙ্গমঞ্চে। এই মনের ক্রমাগত বাজেখরচ হয়ে যাচ্ছে। মন ছড়িয়ে আছে বিত্তে, খ্যাতিতে, ক্ষমতায় আরও কত কিছুতে। এসবই মনের বাজেখরচ। ইতস্ততঃ ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করতে না পারলে তো তাঁর কাছে কখনই পৌঁছানো যাবে না। গীতায় ভগবান বলেছেনঃ 'মন্মনা ভব'। অর্জুন তোমার ষোল আনা মন আমাকে দাও। তবেই আমাকে তুমি পাবে। এই 'মন্মনা' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী লিখেছেনঃ "সর্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদ্‌ বিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়।" ভগবানের কাছে পৌঁছাতে হলে মনের বৃত্তি হওয়া দরকার তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন। চেতনার ক্ষেত্রে যে চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, তার মধ্যে এমন ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও থাকবে না, যে ছিদ্রপথে বিষয়-চিন্তা ঢুকতে পারে কখনো। ভজন বলতে মধুসূদন সরস্বতী অনুক্ষণ চিন্তার দ্বারাই ভজনার কথা বলেছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। তিনি বলতেনঃ "ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটি হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়। এক চিন্তা ঈশ্বরের, অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না।" মনের ষোল আনা শক্তি যদি বিষয় চিন্তা করতে করতেই ফুরিয়ে যায়, সেই শক্তির সমস্ত যদি চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্য অনির্বাণ দীপশিখার মতোই অম্লান দীপ্তিতে জ্বালিয়ে রাখতে ব্যয়িত না হয় তবে জাগতিক সম্পদের অনুগ্রহ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নয়। সেইজন্য ঠাকুর বলতেনঃ "সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে।" অতএব তিনি আমাদের ষোল আনা মনই চান, এক পাইও কম নয়। ভগবান যীশুখ্রীস্টের বাণীতে ঠিক গীতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তোমরা ঈশ্বরকে ভালবাস সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে।

শূন্যের প্রতি প্রকৃতির একটা বিতৃষ্ণা আছে। প্রকৃতি শূন্যস্থান ঘৃণা করে, কিন্তু ঈশ্বরের লোভ এই শূন্যতার প্রতি। আমাদের শূন্য হৃদয়ের দিকে তাঁর সদা জাগ্রত লুব্ধ দৃষ্টি। কবে আমরা বলতে পারব, দুঃখ-সুখের বিচিত্র এই জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ না থাকে? এই কথাটি শুনবার জন্য আমাদের হৃদয়ের দ্বারদেশে উৎকর্ণ হয়ে তিনি বসে আছেন যুগ-যুগান্তর ধরে। তিনি আমাদের শুধু ভালবেসেই খুশি নন। তিনি তো আমাদের দিকে দশ পা এগিয়ে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তাঁর দিকে অন্ততঃ এক পাও এগিয়ে যেতে হবে।

এখানে আর একটা কথা যোগ না করে দিলে সত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটা হচ্ছে, আমরা তাঁকে শুধু ভালবাসব না, ষোল আনা হৃদয় দিয়ে ষোল আনা মন দিয়ে ভালবাসব তাঁকে। ঈশ্বর চান, ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবি করেন, আমরা কেবল তাঁকেই ভালবাসব, আমরা

আমাদের দিবারাত্রির চিন্তায় কেবল তাঁকেই রেখে দেব, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে কেবল তাঁরই আসনটি আমরা সযতনে পেতে রাখব। ভগবান ঈর্ষান্বিত, আমাদের হৃদয়ে তাঁর সাম্রাজ্য হওয়া চাই অসপত্ন। হৃদয়ের দরজায় নিশিদিন অপেক্ষা করে তিনি বসে আছেন কখন আমরা দরজা খুলে অন্তরের মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করব। এ বিশ্বভুবনে তাঁর তো কোন অভাব নেই। তিনি তো শুধু রাজা নন রাজার রাজা—রাজাধিরাজ। এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মানুষের ভালবাসা পাবার জন্য তার হৃদয়ের দরজায় তিনি নিত্য জেগে আছেন। তার জন্য অন্তরে তো কোন জায়গা রাখিনি, জাগতিক সম্পদ হৃদয়ের সবখানি যে দখল করে আছে, ধনে, জনে, মানে, অনুক্ষণ যে জড়িয়ে আছি। কত রকমের আসক্তি হৃদয়কে কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগতিক সুখের কত কামনা মর্মের গভীরে গিজগিজ করছে পায়রার গলায় মটরের মতো। আর বাসনাগুলোকে হৃদয়মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারছি না বলেই ভগবান সেখানে ঢুকতে পারছেন না। হৃদয়কে একদম খালি করে না ফেললে তিনি সেখানে ঢুকবেন কেমন করে?

এই বাসনাগুলোকে মন থেকে অপসারিত করে মনটাকে খালি করতে পারলেই কেল্লা ফতে। ভগবানের লুব্ধ দৃষ্টিতো আমাদের ঐ খালি মনটার ওপরে। মনে বিষয়চিন্তার লেশমাত্র যখন থেকে আর রইল না, মনের বাজেখরচ একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো এই জন্মেই দিব্যজীবনের যে আনন্দ তার সূচনা হলো। কামনার আবর্জনারাশিতে মন্দির ভরে ছিল বলে যে ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্যে অপেক্ষা করছিলেন ভেতরে প্রবেশ করতে, আর তো তাঁর কুণ্ঠার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভক্তকে তিনি তো প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, 'মন্মনা ভব'—ষোল আনা মন আমাকে দাও, তাহলেই আমাকে তুমি পাবে। ভগবান সৎ। তিনি সত্যনারায়ণ। নারায়ণ কখনো সত্যভ্রষ্ট হতে পারেন? তাই মন থেকে সমস্ত বিষয়-চিন্তা সরে গিয়ে সেই মন ঈশ্বর-চিন্তায় যখন কানায় কানায় ভরে গেল তখন সে তো বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হলো। বৈকুণ্ঠে ঢুকতে ভগবান কুণ্ঠিত হবেন কেন? ভগবান হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভক্তবৎসল ভগবান। গীতার 'মন্মনা ভব' কথাটিই তো প্রাঞ্জল ভাষ্য "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পাতায় পাতায় কোহিনুরের মতই জ্বলজ্বল করছে। মধুসূদন সরস্বতী ঐ 'মন্মনা' শব্দটির ভাষ্য প্রসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার উপমা দিয়েছেন, উপমাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু কথামৃতের উপমাগুলির বুঝি তুলনা নেই! সারাদিন শত-কর্মের মধ্যে অনুক্ষণ চিন্তায় ভগবানকে ধরে রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম তত্ত্বটিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ঠাকুর ছবির পর ছবি তুলে ধরেছেন। আমাদের জীবনে দৈনন্দিন যেসকল ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে, সেই ঘটনাগুলিই ঠাকুরের উপমাগুলির মালমশলা। কষ্ট করে তাঁকে কোন কল্পনার আশ্রয় নিতে হতো না।

কোন সত্য তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সত্যের প্রতিফলন তিনি দেখতে পেতেন বাইরের প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে। অনাসক্তির আদর্শের কথা মনে হতেই তিনি দেখতে পেতেন পাঁকাল মাছের ছবি। বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন আকাশে বহু উঁচুতে উড়ন্ত চিল-শকুনিতে। স্মরণমননের আদর্শের তিনি প্রতিফলন দেখেছিলেন বড়-লোকের বাড়ির দাসীতে যার মন দিবানিশি পড়ে আছে তার গাঁয়ের কুটিরে যেখানে তার হরি কি রাম রয়েছে। 'মন্মনা' কথাটির ব্যাখ্যায় গ্রামের সেই ছুতারনীর দৃষ্টান্তটিও প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। ছুতারনী ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটছে, ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে দর কষাকষি করছে, কিন্তু মন তার পড়ে আছে ঢেঁকির ঐ মুষলের দিকে। হাতে পড়লে হাত ছেঁচে যাবে। গীতার পরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ঠাকুর সহজ উপমার পর উপমার সাহায্যে করেছেন, যাতে বিষয়টি আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে।

আবার বলি, সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা

'মন্মনা ভব'। ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয় তো সে-লক্ষ্যে পৌঁছানোর অপরিহার্য পথ হচ্ছে অনুক্ষণ চিন্তার দ্বারা তাঁর ভজনা। সাধন মানেই স্মৃতিসাধন, নিরন্তর ঈশ্বরের স্বরণ-মনন। এটা খুবই কঠিন। মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এ দুয়েরেই অদ্ভুত মিশ্রণ। মানব প্রকৃতিতে কিছুটা মাটি, কিছুটা নক্ষত্রখচিত আকাশ। তাই আমাদের মন শুধু যে ভূমার জন্য ক্ষুধিত তা নয়, সেই মন মত্ত হস্তীর মতো দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। শ্রীশ্রীমাঠাকরুন বলতেনঃ "মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে, তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে।" অর্জুন বলেছিলেন, মনকে সংযত করে রাখা বায়ুকে শাসনে রাখার মতোই দুঃসাধ্য। অথচ সমস্ত মনটা ভগবানে না দিলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে না। ভগবান অবশ্য অর্জুনকে অভয় দিয়ে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ আনা যায়।

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই মানুষের মনেরই ব্যাপার। অধ্যাত্মসাধনার সমস্ত নাট্যলীলার অভিনয় মনেরই মঞ্চে। চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তার দীপশিখাকে অম্লান রাখার পুনঃপুনঃ প্রযত্নই অভ্যাস। কিন্তু কি কঠিন মনকে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ! বাইরে থেকে বিষয়-চিন্তার ঝাপটা পড়ছে মনের ওপরে আর সেই ঝাপটায় ঈশ্বর-চিন্তার দীপশিখা নিভে যাচ্ছে। যতবার আমরা আলো জ্বালাতে চাই, কবির ভাষায়, তা যে "নিবে যায় বারে বারে।" কিন্তু খানদানী চাষী অনাবৃষ্টিতেও কখনো চাষ ছাড়ে না। সাধকও তেমনি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় অবিচলিত থাকবে। যেমন বাইরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তেমনি অন্তরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ের একই মন্ত্রঃ মনের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন। অবশ্য দিব্যজীবনে পৌঁছানোর পথে মনের শাসন ব্যাপারটি ক্ষুরের ধারের শাণিত পথে যাত্রার মতো দুর্গম এবং দুষ্কর, উপনিষদে বলা হয়েছে। তবে দুর্গম এবং দুষ্কর হলেও তা যে সম্ভব সেকথাও উপনিষদ, গীতা এবং সন্ত-সাধকগণ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।



পরিক্রমা

মহাতীর্থ বৈষ্ণোদেবী

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সেই পর্বতশীর্ষের পুণ্যস্থান যেখানে দেবদেবীগণ বিরাজ করেন। আরও উত্তরে মহিমান্বিত নগাধিরাজের সুউচ্চ চূড়া। বাণগঙ্গায় অবগাহনের শেষে পাইন, পপলার ও দেবদারুর ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্য পথে পথে পরিভ্রমণ, ওপরে উদার উন্মুক্ত নীলাকাশ দর্শন এবং সর্বক্ষণ 'জয় মাতাদী' ('জয় মাতাদী' কথাটি জয় মাতাকী'র পাঞ্জাবী সংস্করণ।) ধ্বনি দিতে দিতে পর্বতশীর্ষে মন্দিরদ্বারে যাত্রা শেষ; আবার দেবীদর্শন করে রক্তবর্ণের উড়ানি কণ্ঠে প্রলম্বিত অবস্থায় পুনর্বার 'জয় মাতাদী' ধ্বনি সহকারে প্রগাঢ় তৃপ্তি বুকে নিয়ে সমতলে অবতরণ, এই হলো বৈষ্ণোদেবী যাত্রার সার-সংক্ষেপ।

প্রতি বছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী বৈষ্ণোদেবী দর্শন করে পরম পুণ্য অর্জন করেন। শীতের দুই মাস বাদ দিলে সারাবছরই বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী সমাগম হয়। এমনকি শীতে বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গেও বৈষ্ণোদেবী দর্শনের জন্য লোকসমাগম নেহাৎ কম হয় না। ভারতবর্ষের পার্বত্য তীর্থগুলির মধ্যে অত্যন্ত জাগ্রত, জনপ্রিয় ও অপূর্ব মহিমান্বিত জম্মুর এই বৈষ্ণোদেবী মন্দির। ভারতীয় হিন্দুর আকর্ষণের কেন্দ্র যেমন

অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি, তেমনি প্রতিটি হিন্দুর কাছে পরম বরণীয় এই মাতা বৈষ্ণোদেবীও। দেবীদর্শনের আকর্ষণ অনেকদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। অবশেষে সে-সুযোগ এসে গেল যখন সরকারি কাজে জম্মু শহরে তিন সপ্তাহের জন্য অবস্থান করতে হলো।

জম্মু শহর থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে ত্রিকূটা পর্বতের পাদদেশে কাটরা একটি বর্ধিষ্ণু শহর। এই কাটরা থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার হাঁটাপথে প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার ফুট ওপরে ত্রিকূটা পর্বতচূড়ায় বৈষ্ণোদেবীর মন্দির। সাধারণতঃ তীর্থযাত্রীরা জম্মু শহর থেকে বাসে বা অন্য কোন যানে কাটরা শহরে এসে পৌঁছান। এখানে প্রচুর হোটেল এবং ধর্মশালা আছে। এখানে পুলিসের কাছ থেকে বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো পর্বতশীর্ষে একই সময়ে বিপুল জনসমাগম যেন না হয় সেটা দেখা। সাড়ে পাঁচহাজার ফুট ওপরে ওঠার রাস্তা মাত্র ১৪ কিলোমিটার লম্বা পাহাড়ী পথে। এ থেকেই বোঝা যাবে যে ওঠার পথ বেশ খাড়াই।

একটি গাড়ি জোগাড় হয়েছিল। তাতে চেপে সকাল এগারোটা নাগাদ কাটরা এসে পৌঁছালাম। এখানকার পুলিস অফিস থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে সকলে একটি করে লাঠি ভাড়া করলাম। পাহাড়ী পথে লাঠি ছাড়া ওঠা অসম্ভব। প্রথমেই পড়ল বাণগঙ্গা নদী ; ঘোর রবে বয়ে চলেছে। কথিত আছে মাতা বৈষ্ণোদেবী মাটিতে একটি বাণ মেরে জলের ধারা সৃষ্টি করেন এবং তা থেকেই বাণগঙ্গা নদীর উৎপত্তি। তীর্থযাত্রীরা অনেকেই এই নদীতে পুণ্যস্নান করে যাত্রা শুরু করেন। বেশিরভাগ মানুষ হাঁটাপথে যাওয়াই পছন্দ করেন। তবে বহুলোক ঘোড়াও ব্যবহার করেন। এতে পরিশ্রম কম হয় এবং সময়ও কম লাগে। তবে কিছুটা কষ্ট করে হাঁটাপথে তীর্থ পরিক্রমার একটা আলাদা মাধুর্য আছে। দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকলে যাত্রার কোন কষ্টই তেমন অনুভূত হয় না। আমরা হাঁটাপথেই যাত্রীদের সঙ্গে 'জয় মাতাদী' ধ্বনি দিতে দিতে বাণগঙ্গার ওপরের ছোট সেতুটি অতিক্রম করে চড়াইয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। জম্মু অঞ্চলের জনজীবনে পাঞ্জাবী সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। এখানকার ভাষা যদিও হিন্দী তবে বাচনভঙ্গির মধ্যে পাঞ্জাবী টান লক্ষ্য করা যায়। পুরো রাস্তাটি চমৎকার পিচঢালা অথবা কংক্রীটের। তবে কিছুটা অপ্রশস্ত। অর্থাৎ মোটর বাহিত হয়ে যাওয়া চলবে না। রাস্তার কোন কোন বাঁকে খাবার দোকান সাজিয়ে বসেছে পসারীরা। গরম গরম পুরী, হালুয়া, মিঠাই প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে। কিছু দূর অন্তর পানীয় জলের সরকারি ব্যবস্থা। আগস্ট মাসের গরমে কিছুটা হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে বটে, তবে আকাশ বেশ পরিষ্কার, দূরে দূরে পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং যত ওপরে উঠছি বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে বুঝতে পারছি।

মাতা বৈষ্ণোদেবীকে নিয়ে অনেক প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে মোটামুটি যেটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেটা হলো এইঃ প্রায় সাতশো বছর আগে শ্রীধর নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ পান যে, মাতা বৈষ্ণোদেবী ত্রিকূটা পর্বতের গুহায় অধিষ্ঠান করছেন এবং স্বপ্নেই তাঁর দর্শন হয়—মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর প্রস্তর মূর্তির। স্বপ্নাদেশে অভিভূত শ্রীধর কি করবেন দিশা না পেয়ে ঠিক করলেন প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় পাঁচটি বালিকাকে ভোজন করাবেন, তিনি সেইরকম নিয়মিত করে যাচ্ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি আবিষ্কার করলেন রক্তবর্ণবস্ত্রাবিভূষিতা আরেকটি মেয়েও একই সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করছে। মেয়েটির পরিচয় এবং নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই সে কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে শ্রীধরকে জানাল তাঁকে যেন তিনি অনুসরণ করেন। মেয়েটিকে অনুসরণ করে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে শ্রীধর এসে পৌঁছালেন এক গুহায়। কিন্তু তারপরেই মেয়েটি অন্তর্হিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী

হলো যে, শ্রীধর যেন মাতা বৈষ্ণোদেবীকে এই গুহায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁর অস্তিত্ব প্রচার করেন। শ্রীধর সেই গুহায় অনুসন্ধান করে তিনটি প্রস্তরমূর্তি উদ্ধার করেন। এই তিনটি প্রস্তরমূর্তি হলো মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী। আরেক মতে, এই কুমারী কন্যাটির মধ্যেই পরম মহাশক্তির প্রকাশ ঘটে। ভগবতীর অংশ-স্বরূপা এই কুমারীর নাম বৈষ্ণোদেবী। ইনি রামচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন এবং কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করেন। কিন্তু ভৈঁরো নামে এক দানব তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হয়। তখন বৈষ্ণোদেবী হিমালয়ের কোলে চলে আসেন। কিন্তু ভৈঁরো তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানেও এসে হাজির হয়। তখন বৈষ্ণোদেবী ভীষণা কালীমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভৈঁরোকে বধ করেন। অতঃপর ত্রিকূটা পর্বতে তিনি অধিষ্ঠিত হন।

আলাদাভাবে বৈষ্ণোদেবীর কোন মূর্তি নেই। তিনটি প্রস্তরমূর্তি আসলে তিনটি প্রস্তরখণ্ড। ভাব, গল্প, গাথা, কাহিনীতে এবং বহুল প্রচলিত ছবিতে বৈষ্ণোদেবীর যে চেহারাটি সাধারণ্যে প্রচলিত সেটি এই রকমঃ

দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। দেবীর ছয়টি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তরবারি ও ধনু বিধৃত আছে। এ ছাড়াও সম্মুখের আরও দুটি হস্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রা এবং বাম হস্তে ফুলমালা ধৃত। রক্তবর্ণের পোশাক পরিহিতা দেবীর স্কন্ধে রক্তবর্ণের সুদীর্ঘ উত্তরীয়। মস্তকে রত্নখচিত মুকুটসহ মাল্যাভরণভূষিতা দেবীর মুখশ্রী প্রসন্ন হাসিতে

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বৈষ্ণবীশক্তির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারেঃ

"বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥"
(চণ্ডী, ৮।৪৭)

—বৈষ্ণবীও যুদ্ধে চক্রের দ্বারা এবং ঐন্দ্রী অসুররাজকে গদার দ্বারা আঘাত করলেন।

ওপরে উঠবার কথা বলছিলাম। দলে দলে লোক যেমন ওপরে উঠছে তেমনি বহু লোক দেবীদর্শন করে নিচে নেমে আসছেন। ওপরে উঠবার রাস্তা যেমন আছে, তেমনি আবার সিঁড়িরও ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ একটু কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে উঠলে হয়তো এক কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হয় না। প্রায় অর্ধেক রাস্তা হেঁটে এসে পোঁছেছি আধ্কুনওয়ারি মন্দিরে। পিছন ফিরে নিচে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাটরা শহর এবং বহু তীর্থযাত্রী যাঁরা আমাদের মতই ওপরে উঠছেন।

আধ্কুনওয়ারী মন্দির সম্বন্ধে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে সেটি হলো এই—ভৈঁরো দানবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৈষ্ণোদেবী এক সাধুর গুহায় প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘ নয়মাস সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু ভৈঁরো সেখানেও এসে তাঁকে খুঁজতে থাকে। তখন দেবী গুহার অভ্যন্তরে ত্রিশূলের সাহায্যে বহির্গমনের এক পথ খনন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। এই গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা এবং অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য বিরাট 'কিউ' পড়ে যায়। এতে পরম পুণ্য অর্জন করা যায় বলে তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস। সেজন্য এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয় এবং খাওয়া-দাওয়ারও এলাহি আয়োজন আছে, যদিও পাহাড়ের খাঁজে জায়গাটি খুব বেশি বড় নয়।

এখানে খাওয়াদাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলাম। সম্প্রতি এখানে একটি হেলিপ্যাড হয়েছে। অর্থাৎ ১৪ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা হেলিকপ্টারে এসে বাকি ৬ কিলোমিটার রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করে বৈষ্ণোদেবী পোঁছানো যায়। ব্যাপারটা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নেই এবং পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রার রোমাঞ্চ এবং সকলের সঙ্গে একাত্মতা এতে অনেকটাই হ্রাস পায়। আধ্কুনওয়ারী অতিক্রম করার পরই মেঘরাজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হলো। মাঝে মাঝেই গা ভিজিয়ে দিয়ে মেঘপুঞ্জের দল চকিতে উধাও হয়ে যেতে লাগল, অথচ আকাশে সূর্যদেবেরও দর্শন মিলছে। এখন সামনে পিছনে

যতদূর দৃষ্টি যায় উত্তুঙ্গ পর্বতমালা হিমালয়ের অভ্রভেদী মহিমাকে সগৌরবে আমাদের সামনে যেন মেলে ধরছে। ত্রিকূটা পর্বত বিখ্যাত জানস্কার রেঞ্জের অংশ যা কাশ্মীর ডিভিশন ও জম্মু ডিভিশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রায় ৫০০০ ফুট উঠে এসেছি এবং চতুর্দিকে পাইন, দেওদার ও পপলার গাছের ছড়াছড়ি। পথে কয়েকটি ছোটখাট মন্দির পড়েছে। যেমন হানসালিতে ভূমিকা মন্দির। এখানেই একটি ঝরনার ধারে শ্রীধর পণ্ডিত দেবীর দর্শন পান। এছাড়া চিন্তামণি মন্দিরে বৈষ্ণোদেবীর একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে এবং একটি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও আছে। আরেকটি মন্দিরের নাম চরণপাদুকা। এখানে দেবীর চরণচিহ্ন পাথরে খোদিত আছে।

প্রায় ছয় হাজার ফুট ওঠার পর দেখলাম রাস্তা প্রায় সমতল। রাস্তা সামান্য ঢালু হয়ে কিছুটা আঁকাবাঁকা পথে এসে মিশেছে ভবন-প্রাঙ্গণে অর্থাৎ মন্দিরদ্বারে। মন্দিরের সামনে বিরাট ধর্মশালা। বহু যাত্রী সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মন্দিরে প্রবেশের জন্য তীর্থযাত্রীদের বিরাট লাইন পড়ে গিয়েছে। মন্দিরের অফিসে যেতে কাগজের চাকতি দিয়ে বলল, "আরামসে ইন্তেজার কিজীয়ে। কাল সামকে পহলে আপকো দর্শন নেহি হোগা"। সর্বনাশ, বলে কি আজ দেবীদর্শন করে কাটরায় ফিরে যাব! সেখানে গাড়ি থাকতে বলেছি। যা বুঝলাম সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টার আগে দেবীদর্শন সম্ভব হয় না। অনেক সময় আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। যাই হোক পরিচয়পত্রের দৌলতে মন্দিরে প্রবেশ সম্ভব হলো। চরণগঙ্গা ঝরনার জলকে পাইপের মাধ্যমে বন্দী করে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জলে স্নান করে দোকান থেকে ডালি কিনে নিলাম। এছাড়া প্রত্যেকেই রীতি অনুসারে একটি রক্তবর্ণের উত্তরীয় বা স্কার্ফ কিনে নিলাম। পাহাড়ের ওপর মন্দিরদ্বারে অর্থাৎ গুহামুখে একটি সুন্দর বাঁধানো চাতাল আছে। সেখানে আমরা সবাই বসে গেলাম। সেখানে সর্বক্ষণ ভজন হচ্ছে। আমরাও আমাদের গলা মিলিয়ে দিলাম সেই ভক্তিনম্র ভজনের সুরে। প্রায় আধঘণ্টা পর ভেতর থেকে সঙ্কেত এল, অর্থাৎ পূর্ববর্তী দল দর্শন করে চলে গিয়েছেন। আমরা সারি বেঁধে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম। খুব নিচু ও অত্যন্ত অপরিসর গুহাপথ। পায়ের নিচে ঘোররবে প্রবাহিত হচ্ছে চরণগঙ্গা। প্রবল স্রোতোধারা গোড়ালি ছাপিয়ে উঠছে। একটু অসতর্ক হলে পিছলে পড়া অস্বাভাবিক নয়। প্রায় তিরিশ ফুট পথ হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করবার পর প্রশস্ত গুহাপথ পেলাম এবং ৪।৫ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হলাম। বহুদিনের আশা পূরণ হবার মুখে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা বিপুল পরিমাণ সিন্দুর ও পুষ্প মাল্য ভূষিতা তিনটি প্রস্তরপিণ্ড। জিজ্ঞাসা করে জানলাম মূর্তি বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই। তিনটি প্রস্তরপিণ্ড, মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহা-সরস্বতীর প্রতীক। আমরা দেবীর সামনে আমাদের ডালি নিবেদন করলাম। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে আমাদের ডালি নিবেদন করলেন এবং আবার আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের প্রত্যেকের ললাটে তিনি সিন্দুর রঞ্জিত করে দিলেন। আমরা নতজানু হয়ে দেবীকে প্রণাম করতে না করতেই পিছন থেকে প্রবল গুঞ্জন উঠল। বিপুল জনতা পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা প্রণাম করে দেবীর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে রক্তবর্ণের উত্তরীয় গলদেশে প্রলম্বিত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। গুহা থেকে বেরোবার রাস্তা অবশ্য আলাদা এবং বেশ প্রশস্ত, সেই চাতালেই এসে মিশেছে।

মন এখন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। নেমে আসার আগে মন্দির-দেওয়ালে প্রণাম করে মনে মনে বললাম ঃ 'হে দেবি, তোমার কৃপাতেই তোমার দর্শন ঘটল। তোমাকে প্রণিপাত করি।' স্মরণ করলাম নারায়ণী-স্তুতি ঃ

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"
(চণ্ডী, ১১।৫)

—হে দেবি, অনন্ত তোমার শক্তি ; বৈষ্ণবী শক্তিরূপে তুমিই বিশ্বের পালনকর্ত্রী ; আবার বিশ্বের সৃষ্টির কারণ পরমা মহামায়াও তুমি। তুমিই তো সমস্ত লোকসংসার মায়ায় বিমোহিত করে রেখেছ। আবার প্রসন্ন হলে তুমিই এই পৃথিবীকে মোহমুক্তি দিয়ে থাক।

চাতালে দাঁড়িয়ে দেখলাম চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সুউচ্চ পর্বতের সারি আমাদের ঘিরে রেখেছে। মন্দিরভবনের নিচেই গভীর খাদ, ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ। চরণগঙ্গার জল প্রবল শব্দে সেই খাদে পড়ছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘোর কুয়াশায় সর্বত্র আচ্ছন্ন। অলক্ষিতে মেঘরাশি আমাদের সিক্ত করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মন গেয়ে উঠল, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা'। সত্যিই এ যেন এক সাধনা। দেবীর দর্শনলাভে সেই সাধনার পরিপূর্ণতা।

অতঃপর 'জয় মাতাদী' ধ্বনি দিতে দিতে অবতরণ সুরু হলো। এবারে সময় অনেক কম লাগল। কারণ প্রায়ই সিঁড়ির সাহায্য নিচ্ছিলাম যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কাটরায় গিয়ে পৌঁছালাম। তারপর সেখান থেকে জম্মু এসে যাত্রা শেষ হলো।



বিজ্ঞান-নিবন্ধ

বৃত্তিগত স্বাস্থ্য

বিশ্বনাথ ভড়

আমরা যখন কোন রোগী দেখতে যাই তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি—কি তাঁর কষ্ট, কতদিন থেকে তিনি ঐ কষ্ট পাচ্ছেন, কি কারণে কষ্টটা হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়, তাঁর পায়খানা পরিষ্কার হয় কিনা, তিনি কি কি খেয়েছেন ইত্যাদি। পূর্ণ বয়স্ক (Adult) রোগী হলে এর পর আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তা হচ্ছে তিনি কি করেন, তার পেশা কি অর্থাৎ বৃত্তি (Vocation) কি ?

আধুনিক চিকিৎসা-জগতের গুরু হিপক্রেটিস ২৫০০ বছর পূর্বে প্রথম উল্লেখ করে গেছেন যে, মানুষের জীবিকাই কোন-না-কোন জীবন-হানিকর রোগের কারণ হতে পারে। একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, অন্ধকার খনিগর্ভে যে শ্রমিক বছরের পর বছর কঠোর শ্রম করে বা আগুনের হল্কার সামনে যে ফায়ারম্যান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পেটে, কিংবা রেলের স্টীম ইঞ্জিনের ড্রাইভার ঐ অবস্থায় দিনের পর দিন রেলগাড়ি চালায়, তার স্বাস্থ্য বেশি দিন অটুট রাখা সম্ভব নয়। ধোড়ী কোলিয়ারীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বেশি দিনের কথা নয়। সেখানে বিষাক্ত গ্যাসের বিস্ফোরণের ফলে প্রায় চারশ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছিল। কৃষকদের মধ্যেও যে বৃত্তিগত রোগ হয় না এমন নয়। এই কিছুদিন আগে নদীয়া জেলার কৃষক পরিবারের মধ্যে একরকম অদ্ভুত অসুখ দেখা দিয়েছিল। তা কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, যে রাসায়নিক বস্তু তারা ফসলের কীট-পতঙ্গ মারবার জন্য ব্যবহার করত, তা তাদের খাদ্যের সঙ্গে অজান্তে মিশে গিয়ে ঐ রোগের সৃষ্টি করেছে ও কয়েক জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কথা এখনো আমরা ভুলিনি। ঐ দুর্ঘটনায় মিথাইল আইসোসায়ানাইড গ্যাসে প্রায় আড়াই হাজার লোক, অনেক পশুপাখি মারা যায় এবং বহু লোক অক্ষম হয়ে যায়। রাশিয়ার চের্নোবিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে গত ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল যে বিস্ফোরণ হয়েছিল আধুনিক কালে তার কোন তুলনা নেই। এর রিয়্যাকটার টারমিনাল গৃহটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ দশদিন ধরে প্রায় ৩০ কিলোমিটার

পরিধি অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বহু মানুষ মারা যায় এবং প্রায় এক লক্ষের ওপর মানুষ ক্যান্সার, মানসিক বিকার প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ ও দুর্ঘটনা আমাদের পেশা বা বৃত্তির জন্য সৃষ্টি হয় এবং আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয়।

এখন দেখা যাক আমরা স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝি? অনেকেই হয়তো বলবেন যে, যার দেহে শারীরিক ও মানসিক রোগ নেই তাকেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যাবে। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক নয়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে; সুস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা-বোধ ("a feeling of well being—physical, mental and social".)। আমরা ২৪ ঘণ্টাকে যদি তিন ভাগ করি, তাহলে সাধারণভাবে বলতে গেলে আট ঘণ্টা ঘুমোই, আট ঘণ্টা কাজ করি এবং বাকি আট ঘণ্টা আমরা খেলাধুলা কিংবা আমোদ-প্রমোদ করে অবসর যাপন করি। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে আমাদের কর্মক্ষেত্র বা বাসস্থানের পরিবেশের ওপর। এছাড়া নির্ভর করে আমরা আমাদের অবসর-সময় কেমনভাবে ও কাদের সঙ্গে কাটাই। আমরা আমাদের পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি এবং তাদের আচরণের ওপর আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে। এছাড়া আমাদের নির্ভর করতে হয় আমাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর, যেমন পানীয় জল, বাজার, বিদ্যুৎ। এছাড়া আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদিরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে আমাদের কাজ, নিদ্রা এবং অবসরের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করতে হবে এবং তার সঙ্গে পরিমিত খাদ্যও খেতে হবে। বৃত্তি-গত স্বাস্থ্য (Vocational Health) হচ্ছে চিকিৎসা-জগতের সেই শাখা যা মানুষ ও বৃত্তির সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। রোগ ও আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করে তার সুস্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা ও সামাজিক সমতার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই শাখা কাজ করে। বৃত্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে আমরা বুঝব যে, আমাদের কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশ বা এমন যন্ত্রপাতি থাকবে যাতে বৃত্তিগত রোগ বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারবে না। যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কায়িক শ্রম অনেক কমেছে এবং অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকিও আগের তুলনায় মানুষকে কম নিতে হয়। কিন্তু শিল্পোন্নতির ফলে জীবিকা-জনিত রোগের হ্রাস পেয়েছে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। বিভিন্ন শিল্প স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং এইসব রোগের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজিজ (Industrial Disease) বা শিল্পরোগ।

আমাদের যন্ত্রশিল্পে (Engineering Industry-তে) আমরা এইরকম অনেক বৃত্তিগত অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। প্রথমে বৃত্তিগত অসুস্থতার বিষয়টি আলোচনা করছি:

(১) শুরুতে গরম পরিবেশে কাজ করার (Heat Stress) জন্য যে অসুস্থতা হয় তাকে সাধারণভাবে আমরা সর্দিগর্মি বলি। এর তিনটি স্তর আছে—হিট ক্র্যাম্পস (Heat Cramps), হিট এক্সজশন (Heat Exhaustion) এবং হিট স্ট্রোক (Heat Stroke)। জুন-জুলাই মাসে যখন আবহাওয়ার আর্দ্রতা খুব বেশি থাকে এবং বাতাস না বইবার জন্য গুমোট থাকে, সেসময় যেসব শ্রমিক গরম পরিবেশে কাজ করে, তাদের মধ্যে কিছু শ্রমিকের সর্দিগর্মি অসুখ হয়। এই অসুস্থতা প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শ্রমিক নিয়োগের সময় উপযুক্তভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঠিক করা দরকার কারা গরম পরিবেশে কাজের উপযুক্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের একটানা কাজ করতে না দিয়ে তাদের মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পরিবেশে বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অনেক জায়গায় ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে নুনের বড়ি (Salt Tablet) দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা সাধারণভাবে এত বেশি নুন খায়, যাতে দেখা গেছে বাড়তি নুনের বড়ি (Salt Tablet) দেবার কোন প্রয়োজন হয় না। পরিবেশের উন্নতি করবার জন্য নানা রকম

ব্যবস্থা করা যেতে পারে—যেমন কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ব্যবস্থা, গরম উৎপাত্তি স্থানের ব্যবস্থার পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সর্দিগর্মি অসুখ ছাড়াও অত্যন্ত গরম পরিবেশে কাজ করার ফলে অল্প বয়সে চোখে ছানি (Cataract) হতেও দেখা গেছে কাঁচ তৈরির কারখানায়, লোহা গলানোর কাজে, লোহা রোল করা এবং তা খুব নিকট থেকে দেখার (inspection) কাজে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত থাকে তাদের ৩০-৩৫ বছর বয়সেই ছানি হতে দেখা গেছে।

(২) খনিজ তৈল (Mineral Oil) : যন্ত্রশিল্পে জ্বালানী (Fuel) হিসাবে, ঠাণ্ডা করবার জন্য (Coolant) এবং পিচ্ছিলকারক (Lubricant) হিসাবে কারখানার সর্বত্র খনিজ তৈল ব্যবহার করা হয়। এই তেল শ্রমিকদের চর্মরোগ এবং ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এই খনিজ তেল চামড়ার সংস্পর্শে এসে অনেক শ্রমিকের এক প্রকার চর্মরোগ সৃষ্টি করে যা সময় মতো প্রতিরোধ বা প্রতিকার না করলে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি হতে পারে। যন্ত্রশিল্পে প্রতিরোধ হিসাবে চেষ্টা করা হয় যাতে এই তেল শ্রমিকদের গায়ে না লাগে। যেখানে সে-ব্যবস্থা সফল হয়নি সেখানে শ্রমিকদের কাজে যাওয়ার আগে গায়ে হাতে প্রতিরোধক ক্রিম (Barrier Cream) লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এই খনিজ তৈল তাদের চামড়ার সংস্পর্শে না আসতে পারে। কাজের শেষে তাদের গা, হাত, পা ধোবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। কর্মে নিয়োগকালে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়; যেসব শ্রমিকের চামড়ার অসুখ থাকে তাদের উপরোক্ত কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যেসব শ্রমিকের এই বৃত্তিগত অসুখ হয় না তাদেরই কেবল উপরোক্ত কাজে যদি নিয়োগ করা হয়, তাহলে খনিজ তৈলজাত বৃত্তিরোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৩) সায়ানাইড-এর বিষক্রিয়া (Cyanide Poisoning) : আমাদের যন্ত্রশিল্পে সায়ানাইড দু জায়গায় ব্যবহার করা হয়—(ক) ইলেকট্রো প্লেটিং করার জন্য এবং (খ) যন্ত্রাংশ শক্ত করার জন্য। সকলেই জানেন যে সায়ানাইড আমাদের দেহের পক্ষে মারাত্মক বিষ এবং এর ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা-মূলকভাবে না করলে শ্রমিকদের দেহে এর বিষক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

(৪) ট্রাইক্লোরইথিলিন (Trichlorethylene)-এর বিষক্রিয়া : আমাদের শিল্পে বহু যন্ত্রাংশ তেল-কালি মুক্ত করতে ট্রাইক্লোরইথিলিন ব্যবহার করা হয় কিন্তু এই রাসায়নিকটির ধোঁয়ায় শ্রমিকরা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে—প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিকদের সংস্পর্শে যাতে এই ধোঁয়া না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) অম্ল ধোঁয়ার (Acid Fumes) বিষক্রিয়া : লোহার রড বা লোহার তার থেকে নানারকম যন্ত্র, নাট ও বল্টু তৈয়ারি করবার পূর্বে তাকে জংমুক্ত করে নিতে হয়। তার জন্য একটি ট্যাঙ্কে গরম এ্যাসিড-এ ঐ রডগুলিকে কিছু সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখতে হয়। এর পর সেগুলিকে ক্রেন-এর সাহায্যে তুলে জলে ধুয়ে পরে খার (Alkali) ট্যাঙ্কে দেওয়া হয়। এই কাজে নিয়োজিত কর্মীকে এ্যাসিড বাষ্পের সংস্পর্শে আসতে হয়, যার ফলে তার সর্দিকাশি প্রায়ই হতে পারে এবং বহুদিন ঐ কাজ করলে তার দাঁত আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে পারে। এই ক্ষয় (Erosion of Teeth)-এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ক্রেনটি যাতে দূর থেকে চালনা করা যায় (Remote Control) তার ব্যবস্থা অনেক শিল্পে করা হয়েছে।

(৬) ঢালাই (Welding) : যন্ত্রশিল্পে ঢালাই-এর ব্যবহার এবং তার রশ্মি লেগে চোখ ওঠা অত্যন্ত পরিচিত বৃত্তিরোগ। যার ফলে যেসব শ্রমিক এই কাজ করে তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চোখে ঢাকনা (Welding Shield) ব্যবহার করতে ভোলে না। কিন্তু তার সহকারী বা উৎসুক দর্শক যদি এই কাজ কিছুক্ষণের জন্য বিনা ঢাকনায় দেখে তবে তার পরের দিনই তার চোখের অসুখ হতে পারে।

ঢালাই-এর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বন্ধ জায়গায় কাজ করে। এর ফলে নানারকম রাসায়নিক ধোঁয়ায় তাদের ফুসফুসের রোগ হতে পারে। এর প্রতিরোধক

ব্যবস্থা হলো তাদের বাতাসযুক্ত মুক্ত জায়গায় কাজ করতে দেওয়া।

বৃত্তিগত স্বাস্থ্য ও ব্যাধির দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় চিকিৎসক বার্না দির্নো রামাজানি (১৬৩৩—১৭১৪)। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে 'বৃত্তিগত স্বাস্থ্যের জনক' বলা হয়। বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন পরিবেশে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ওপর কি রকম বিচিত্র ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় এ-সম্বন্ধে রামাজানি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে জানান যে, কার-খানার বাইরে আলো-বাতাসহীন বস্তিতে স্যাঁৎসেঁতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কঠোর পরিশ্রম ক্লান্ত শ্রমিকের দেহকে আরও ভেঙে দেয়। তিনি বলেন শুধু কারখানার ভেতরটাই রোগের ও দুর্ঘটনা আশঙ্কামুক্ত রাখলেই যথেষ্ট করা হয় না, কারখানার বাইরেও শ্রমিক যাতে সুস্থ, কলুষমুক্ত জীবনযাপনের সুযোগ পায় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

বৃত্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা বা তার আরও উন্নতি করার জন্য যে যে ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেগুলি হলো ঃ

(১) প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগের পূর্বে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং শারীরিক ও মানসিক মান অনুযায়ী যে যে-কাজের উপযুক্ত, তাকে সেই কাজে নিয়োগ করা। তা করলে সেই শ্রমিকের ক্ষতি হবে না, পরন্তু সে তার সহকর্মীরও ক্ষতির কারণ হবে না। সামান্য উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। একটি গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়োগ করার সময় পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সে কোনটা কি রঙ তা চিনতে পারে না—যাকে ইংরেজীতে Colour blind বলে, তাকে ড্রাইভারের কাজে নিয়োগ করলে সে আলোর সিগন্যাল বুঝতে পারবে না এবং দুর্ঘটনার কারণ হয়ে নিজের এবং অনেকের প্রাণ-হানির কারণ হবে। মৃগী (Epilepsy) রোগ-গ্রস্তকে (যে মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ফিট হয়) কোন চালু মেসিনে বা উঁচুতে ক্রেন চালাবার কাজে নিয়োগ করলে সে যেকোন সময় একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। উপরোক্ত দুই রকম ব্যক্তিকেই কিন্তু কেরানির কাজ কিংবা স্টোরম্যানের কাজ দিলে তার নিজের বা অপরের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ থাকবে না।

(২) শ্রমিক নির্বাচন ও তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে কাজে নিয়োগের আগে তার কাজ সম্বন্ধে কিছুদিন ভালভাবে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিতে হবে, বিশেষ করে তার কাজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে।

(৩) বৃত্তিগত রোগ যেখানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের স্বাস্থ্য, মাঝে মাঝে বছরে দুতিনবার বা প্রয়োজন হলে আরও বেশি পরীক্ষা করতে হবে যাতে এই সব রোগ শুরুতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৪) যেসমস্ত কাজে শিল্পরোগ বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে তার জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে তা সম্ভব হয় না সেখানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুখোশ, চশমা, উপযোগী পোশাক-পারিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৫) কলেরা ও টাইফয়েড নিরোধ করবার জন্য প্রতিরোধমূলক টিকা বছরে একবার করে শ্রমিকদের দেওয়া যেতে পারে। যেসমস্ত কাজে ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায়ই হয় সেখানকার শ্রমিকদের ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)-এর প্রতিরোধমূলক ইনজেকশন (Tetanus Toxoid) দেওয়া যেতে পারে।

(৬) বেশিরভাগ শ্রমিকরাই ভাল পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় না। সুতরাং কারখানার বা খনির ক্যানটিন থেকে স্বল্পমূল্যে বা ন্যায্যমূল্যে একটি দুপুরের খাবার দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে পুষ্টির ব্যাপারে অনেকটা সুরাহা হয়। এতে শ্রমিকরা সারাদিনের খাবারের অর্ধেক ক্যালোরি অন্ততঃ পেতে পারবে।

(৭) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, মাঝে মাঝে বক্তৃতা (প্রয়োজন হলে স্লাইডের সাহায্যে) দিতে হবে।

উপসংহারে এই কথাই বলব যে, দেশের শ্রমিকরা জাতীয় সম্পদ এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানসিক সুস্থতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখা কর্তব্য।

কাতরে কর করুণা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

র, বড় দ্রুত সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। আপনি জানেন কি, আমরা যৌথ পরিবার ভেঙে ফেলেছি। একালে সব একক পরিবার। স্বামী, স্ত্রী, একটি-দুটি সন্তান। দয়া করে কেউ কেউ মা-বাবাকে একটু আশ্রয় দেন চক্ষু-লজ্জার খাতিরে। সে বড় করুণ দৃশ্য! তাঁরা সংসারে থাকেন পরবাসীর মতো। উদাস হয়ে। পরিবারের ভালমন্দ সম্পর্কে কথা বলার কোনো অধিকার তাঁদের থাকে না। সাধ্যমতো তাঁরা শ্রমদান করেন। তাঁদের এই নিরুপায় উপস্থিতির জন্যে নিত্য অশান্তি হয়। তাঁরা সহ্য করেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবেন কবে 'ডাক' আসবে। শিক্ষিত বাঙালী বলবেন, আমরা সব ধীরে ধীরে সাহেব হচ্ছি তো! বিলেতে এইরকমই হয়। সেখানে বুড়ো মা-বাবার খবর শিক্ষিত, উচ্চ উপার্জনকারী, প্রগতিশীল যুবকরা রাখে না। ওসব হলো বাজে ভাবালুতা। যতদিন শক্তি, ততদিন পৃথিবীর ভোগ-সুখাদি তোমার। যখন অথর্ব তখন তুমি জঞ্জাল। যৌথ পরিবার ভাঙা মানে প্রাচীন বিশ্বাস, আদর্শ ও সংস্কারের অন্তর্জলি। একটা ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। আদর্শহীন ভাবে বাঁচা মৃত্যুরই সামিল। একালের কজন মানুষ প্রকৃত জীবিত! মানুষ বেঁচে নেই, বেঁচে আছে তার অভ্যাস। একালের মানুষ হলো কতকগুলো অভ্যাসের সমষ্টি। খানিকটা লোভ, খানিকটা হিংসা, কিছুটা মিথ্যা, আলস্য, ফাঁকিবাজি, ধাপ্পা, ধান্দা প্রভৃতির সমাহার। মানুষের ভেতর থেকে, আমের ভেতর থেকে যেমন আঁটি বেরিয়ে যায়, সেইরকম হুঁশটা বেরিয়ে চলে গেছে। মানুষের মানটা আছে। আমি মানুষ, এই গর্বটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুর, আপনি ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আপনি জানতেন কৃপা ছাড়া মানুষের স্বভাব পাল্টাবে না। সেকাল আর একাল, সবকালের মানুষেরই স্বভাব এক। একমাত্র গুরুকৃপায় মানুষের হুঁশ আসতে পারে, নইলে নয়।

ঠাকুর, আপনি তিরস্কার করে বলছেন—স্ত্রী-সন্তানের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কান্নার তিনটি বস্তু পাওয়া গেল—স্ত্রী, সন্তান, টাকা। যৌবনের তিনটি প্রবল নেশা—স্ত্রী, সন্তান, অর্থ। কি সেকালে, কি একালে। অতঃপর আপনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের স্বরূপও উন্মোচন করেছেন। বলছেন—"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে—'তুমি তো চললে, আমার কী করে গেলে?' "

তার মানে সর্বকালেই স্বার্থ। একালে একটু বেশি। মানুষের বার্ধক্যের সেই একই চিত্র—তুমি আমার জন্যে কী করে গেলে? নিঃস্বার্থ প্রেম বলে কিছু নেই। ছিল না কোনও কালে। সংসার মানে একটা রফা। দেওয়া আর নেওয়ার সম্পর্ক। গরু যতদিন দুধ দেবে, ততদিনই তাকে দলাই মলাই—কুঁড়ো দেবে, জাবনা দেবে, ভেলি গুড়ের ঢেলা গেলাবে। বুদ্ধিমান সেইকারণে রেস্তোটি ঠিক রাখে। শেষদিন পর্যন্ত সেইটা বাজায়। বাজনা শুনে এগিয়ে আসে সেবা করতে, লোভে লোভে। বুড়ো মরলে সব আমার হবে। আপনার জন কেউ না এলেও পর আসে। তাই তো প্রবাদ—আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়েও বন ভাল।

সময়ের পথ ধরে আরও অতীতে গেলে দেখব সেই এক হতাশ চিত্র। রামপ্রসাদ গাইছেন—"যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।" 'কেউ কারো নয়' এই বোধ সে-যুগের

সমাজও গেঁথে দিতে পেরেছিল অন্তর্মুখী মানুষের মনে কাম আর কাঞ্চনে মানুষের প্রবল আসক্তি সহজে যাবার নয়। সব যুগের মানুষই ছোঁক ছোঁক করে সারা জীবন। করবেই, কারণ— 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সমানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।' পশু আর মানুষে খুব একটা পার্থক্য কোথায়! তাই আপনি বারে বারে আঘাত করেছেন কঠিন কঠোর ভাষায়। বলেছেন, বিচার কর। নিজের সঙ্গে বিচার। বলছেন, 'বস্তুবিচার'। পুরুষভক্তদের কাছে বলছেন তো? তাই প্রথম বিচারের বিষয় কামিনী। বিচার কর। ঠাকুরের বিচার আবার সাংঘাতিক। বলছেন—একেবারে এই ভাবে : "মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে—রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মূত, বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের ওপর ভালবাসা কেন?"* স্বামীজী হলেন আগুন। তিনি আরও কঠিন ভাষায় বলছেন, বলছেন শ্রীমকে—নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না।... যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ
নিরন্তকান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া
বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

কী অপূর্ব কথা আচার্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে বলছেন! কী সুন্দর উপমা!

"লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা॥"

অসাধারণ চিত্র! আমি একটা বল নিয়ে সিঁড়ির উচ্চধাপে দাঁড়িয়ে আছি। বল হলো আমার মন, আমার চিত্ত। আমি সেই বলটা লোফালুফি করছি। হলো কি, বলটা হঠাৎ আমার হাত ফসকে সিঁড়ির ধাপে পড়ে গেল। আর কি কোনও উপায় আছে। সেই বল লাফাতে লাফাতে সোজা চলে যাবে নিচের দিকে। একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে। আচার্য শঙ্কর বলছেন—বহির্মুখ চিত্তও বিষয় হতে বিষয়ান্তরে এই ভাবেই নিম্ন-গামী হবে। তাকে আর ফেরানো যাবে না।

"বিষয়েষ্বাবিশচ্চেতঃ সংকল্পয়তি
তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ
প্রবর্তনম্॥"

ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রসেস' বা প্রক্রিয়া, 'সাইকেল' বা চক্র, আচার্য শঙ্কর সেইটি দেখিয়ে দিয়েছেন। মনে বিষয়-স্মৃতি জাগল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চিন্তা, বিষয়টি কেমন, তার গুণ, রমণীয়তা। সঙ্গে সঙ্গে কামোদ্রেক। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বিষয় লাভের জন্য।

ঠাকুর এইবার কাঞ্চন বিচার করছেন—"টাকায় কী হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান-লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার ; বুঝেছ?"

মাস্টারমশাই বলছেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ ; প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তু বিচার।"

ঠাকুর বলছেন—"হ্যাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ টাকাতেই বা কী আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কী আছে। বিচার কর সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল-মূত্র এই সব আছে। ঈশ্বরকে ছেড়ে এই সব বস্তুতে মানুষ কেন মন দেয়?"

সেকাল আর একাল, মানুষ আর মানুষের সমাজ কিছু মাত্র বদলায়নি। ঠাকুর সমাজের আর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। সেটি হলো অকারণে

* শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মহিলাভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন তাঁদের 'পুরুষ-কাঞ্চন' সম্পর্কে কঠোরভাবে সচেতন করে দিতেন, এই সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলাভক্তদের সূত্রে আমরা অবগত আছি। এথেকে এটিই বোঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষকে নারী থেকে ভয় এবং নারীকে পুরুষ থেকে ভয় সম্পর্কে অবহিত করে দিতেন। স্বামীজী তাই ঠাকুরের মূলভাবকে বোঝানোর জন্য 'কামিনী-কাঞ্চন' নয়, 'কাম-কাঞ্চন' ব্যবহার করতেন। আসল তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে পুরুষও নয়, নারীও নয়, বর্জনীয় যা তা হলো—কাম অর্থাৎ বিষয়সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখ লালসা।—যুগ্ম সম্পাদক

পরের ব্যাপারে নাক গলানো। ঠাকুর স্বামীজীকে প্রশ্ন করছেন—"নরেন্দ্র, তুই কী বলিস ? সংসারী লোকেরা কত কী বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। হাতি কিন্তু ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কী মনে করবি ?"

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর উত্তর—"আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।"

কি ঠাকুরের কালে, কি আমাদের এই কালে, দেব-মানব ও পশু-মানবের সহঅবস্থান। তারও আগে তুলসীদাসের কালেও সেই একই চিত্র—যব হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ফুকে হাজার। সাত্ত্বিকের ওপর তামসিকের অত্যাচার মানব-সমাজের এক বৈশিষ্ট্য। নিরীহ, অক্রোধী মানুষকে মানুষ মারবে। অহিংস মানুষের মৃত্যু হবে সহিংস মানুষের হাতে। মানুষের সমাজ এই নীতিতেই চলে। অভ্যাস করে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এই মানুষ। অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য মনস্তাত্ত্বিক উইলহেল্ম রাইখের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষের উত্তরাধিকারটি কি—"You are heir to a dreadful past. Your heritage is a burning diamond in your hand." ভয়ঙ্কর অতীতের আমরা উত্তরাধিকারী। আমাদের ঐতিহ্য একখণ্ড জ্বলন্ত হীরের মতো আমাদের হাতের তালুতে। এই হলো মানুষের সর্বকালের পরিবেশ। রাইখের বর্ণনায় চিত্রটি সুপরিস্ফুট—মানুষের হাতেই মানুষের নির্যাতন। গ্রহান্তরের মানুষ এসে আমাদের নির্যাতন করে না—"He suffers and rebels, he esteems his enemies and murders his friends, wherever he gains power as a representative of the people, he misuses this power and makes it into something more cruel than the power which previously he had to suffer at the hands of individual sadists of the upper class."

এই প্রসঙ্গেই ঠাকুরের সেই সাপের গল্প। রাখালরা দৌড়ে এসে বললে—"ঠাকুরমশাই! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।" ব্রহ্মচারী বললেন—"বাবা তা হোক। আমার তাতে ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি।" সাপের গুরু হলেন ব্রহ্মচারী। মন্ত্র দিলেন। বলে গেলেন, "মা হিংসি"। অহিংস হয়ে যাও। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে দেখেন, সাপ মরো মরো। রাখালেরা প্রথম প্রথম ইট মেরে, পরে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে আধমরা করে দিয়েছে। অবস্থা দেখে ব্রহ্মচারী হিংস্র সমাজে অহিংস হয়েও বেঁচে থাকার কৌশলটি বলে গেলেন—"আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়।"

ঠাকুর হলেন সর্বকালের গুরু। কাল সেই একই আছে। হিংস্র সমাজ। কাম-কাঞ্চনের দাস মানুষ। তার হাতে জ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মতো তার ঐতিহ্য। গণপ্রতিনিধি অতীত সংস্কার করতে গিয়ে গড়ে তুলবে নিষ্ঠুরতম বর্তমান। সংসারের অন্তঃসারশূন্যতা দেখেও উটের মতো কাঁটাগাছ চিবোবে। দু-কষ বেয়ে রক্ত গড়াবে। গেল গেল বলে মানুষ চিৎকার করবে আবার ছুটেও যাবে সেই হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে। অমলিন আনন্দের উৎস ঠাকুর। বলছেন—বিচার কর। বস্তুবিচার। একটা হাত সংসারে আর এক হাত ঈশ্বরের পায়ে। অনিষ্ট করো না, কিন্তু ফোঁস ছেড় না। আর,

"মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥"

আচার্য শঙ্করের কথা, আশ্বাসবাণী—ভয় পেয়ো না। তোমার বিনাশ হতে পারে না। সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবার উপায় আছে। বিচারসহায়ে বিষয়-ভোগবিমুখ হও। অতঃপর শরণ নাও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের। আত্মানন্দ-বিভোর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ তখন তোমাকে অবশ্যই করুণা করবেন। কারণ তোমার করুণ অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হবে।

ঠাকুর! কাতরে করো করুণা॥

গ্রন্থ পরিচয়

মহাজন-প্রসঙ্গ

শোন কিছু শ্রীশ্রীঠাকুর রামভাইয়ের কথা : সুকৃষ্ণা গুহ। প্রসূন গুহ, বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক—'আর', ফ্ল্যাট নং ৬, কলিকাতা-৭০০০৩৭। মূল্য : কুড়ি টাকা।

লেখিকা রামঠাকুরের শিষ্যা। তিনি কিশোর-কিশোরীদের জন্য গ্রন্থটি লিখেছেন বলে মুখবন্ধে জানিয়েছেন। গ্রন্থটিতে রামঠাকুরের অলৌকিক জীবনের নানা কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে নানা ঘটনা পরিবেশন করে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে রামঠাকুর ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে কত মানুষকে তাঁর করুণা বর্ষণ করেছেন। শুধু মানুষই নয়, প্রেতাত্মা, বানর, হনুমান, সাপ প্রভৃতিও কিভাবে তাঁর ভালবাসা পেয়েছে সে-সম্পর্কেও লেখিকা পাঠকবৃন্দকে অবহিত করেছেন।

গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ এর সহজ ভাষা। শুধু কিশোর-কিশোরীদের জন্য গ্রন্থটি লেখা হলেও রামঠাকুরের বয়স্ক ভক্তবৃন্দও গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ পাবেন বলে মনে হয়। গ্রন্থটিতে পরিবেশিত রামঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই অতি-লৌকিকতার মাত্রাযুক্ত। এটি গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্যও। রামঠাকুরের ভক্তজনের কাছে পরিবেশিত অলৌকিক কাহিনীগুলির একটি আলাদা তাৎপর্য থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভক্ত-পরিধির বাইরে অন্যরা আবার ঘটনাগুলিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখবে। অলৌকিকতার বাতাবরণ প্রায় প্রত্যেক সাধু-মহাত্মার জীবনীকে ঘিরে থাকে; কিন্তু তাই যদি প্রাধান্য পায় তাহলে সংশ্লিষ্ট মহাজীবনের মধ্যেকার আসল ব্যক্তি-মানুষটির হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। লেখিকা এই দিকটি যেন ভেবে দেখেন।

পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী

চৈতন্যময়ী পরিচয় : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। সুনীলকুমার সেনগুপ্ত, সি-৫৭, বাঘাযতীন পল্লী, কলিকাতা-৯২। মূল্য : কুড়ি টাকা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অসীমের যাত্রী' বইখানি পড়ে সাধক নগেন্দ্রনাথের পুণ্যজীবনীতে যাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে 'চৈতন্যময়ী পরিচয়' স্বাভাবিক সহায়ক গ্রন্থ। চৈতন্যময়ী দেবীর (অন্য নামে 'ননী মা') সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা এই ভক্তি, সরলতা ও পবিত্রতার দিব্যপ্রতিমাকে এ বইয়ের মাধ্যমে আবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জীবন্তরূপে দেখতে পাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিতা এই সাধিকা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আশ্রয়ে এসে, 'চৈতন্যময়ী'—নাম লাভ করেন এবং তাঁর গুরুর কাছে একখানি গৈরিকবস্ত্রও পেয়েছিলেন। এই একজন মহিলা শিষ্যাকেই তিনি গৈরিকদান করেছিলেন বলে আমরা জেনেছি। সবসময় না পরলেও গেরুয়াকাপড়খানি চৈতন্যময়ী ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্মোৎসবে বা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই পরিধান করতেন। বাইরে সৌম্য শুভ্রবেশধারিণী এই সাধিকা সংসারের মধ্যে থেকেই সংসারের ঊর্ধ্বে এক ভাবলোকে অবস্থান করতেন। সাধারণ সংসারধর্ম থেকে দূরে থেকেই তিনি সেবায় শ্রদ্ধায় স্নেহে তাঁর পরিপার্শ্বের সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। লেখক এঁকে মাতৃরূপে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন এবং চৈতন্যময়ী দেবীও লেখককে পুত্ররূপে বিশেষ স্নেহের মর্যাদা দিয়ে আজীবন তাঁর মাতৃভাব-সাধনার প্রসাদ দিয়েছেন।

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ), স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী পরমানন্দ (স্বামীজী-শিষ্য) প্রভৃতি অধ্যাত্মসাধকদের কৃপালাভে ধন্যা এই সাধিকার আধ্যাত্মিক আলাপচারী, চিঠিপত্র, ঘরোয়া সংলাপ —সবকিছুর মধ্যেই গঙ্গার সমীরস্নিগ্ধ প্রশান্তি আভাসিত ছিল।

তাই বইখানি পড়লে এই কলরবমুখর সংসারের অন্তর্লোকে স্থিরশিখার মতো দীপ্যমান এক মহিমোজ্জ্বল জীবনের প্রকাশ অনুভব করা যায়।

এমন জীবনকথা চয়ন ও লেখনের দ্বারা লেখক আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। লেখকের পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও অনুরাগের সার্থক প্রকাশে এই গ্রন্থটি অধ্যাত্মসাহিত্যের বিশেষ গৌরব লাভ করেছে।

অসীমের যাত্রী: দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। সুনীলকুমার সেনগুপ্ত, সি-৫৭, বাঘাযতীন পল্লী, কলিকাতা-৯২। মূল্য: পঁচিশ টাকা।

'অসীমের যাত্রী' বা 'মহাতাপস নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা' এই গ্রন্থটি পাঠ করা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবধারার অনুবর্তী ও স্বামী সারদানন্দজীর কৃপাধন্য সাধক নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিভাবে লোকলোচনের সামনে থেকেই সবার অগোচরে ভগবৎ-তন্ময় জীবন-যাপন করে গেছেন, সেকথা তাঁর এক অন্তরঙ্গ অনুরাগীর স্মৃতিচারণে সরসমধুর ভাষাভঙ্গিতে এ বইয়ের পাতায় পাতায় বিধৃত। পরিচিত সাধু-মহাপুরুষদের জীবনীর সঙ্গে এ বইয়ের মিল না থাকলেও, জগতের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মহাজীবনের ভাবানুষঙ্গে অনুপ্রাণিত নগেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও প্রজ্ঞাবাণীর রূপায়ণে লেখক বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছেন। যে-আধ্যাত্মিক পরিবেশ-রচনা নগেন্দ্রনাথের জীবনব্রত ছিল, 'অসীমের যাত্রী' সে-পরিবেশ পাঠক-হৃদয়ে সার্থকভাবে সঞ্চার করে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ভক্তি ও যুক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে এ গ্রন্থে পরমসুখপাঠ্য এক ভক্ত-জীবনকাহিনী রচনা করে পাঠকগোষ্ঠীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ কাহিনীর শুরু পূর্ববঙ্গে, তারপর সমগ্র ভারত পরিক্রমান্তে কন্যাকুমারী হয়ে কলকাতায় বাঘাযতীন পল্লীতে। তাপস নগেন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনের ও পরিণত জীবনের চিত্র দুটিও মনোজ্ঞ। ভাষাভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় ও সহজাত মনস্বিতায় এ গ্রন্থ পাঠকহৃদয়কে নানা দিক থেকে পূর্ণ করে। এ গ্রন্থের সর্বত্র সমাদর প্রার্থনীয়।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

সাহিত্যে মানবিকতা ও কুমুদরঞ্জন কাব্য: বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণ, মাইকেল নগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। মূল্য: সাত টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাটির পঞ্চমাংশে প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে মানবিকতার অভিব্যক্তি এবং দ্বিতীয়াংশে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যে এই অভিব্যক্তি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে। বহু সুন্দর দৃষ্টান্তের সহযোগে আলোচনাটি চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে। এই ধরনের বই সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষায় এই প্রথম। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের অনেক মণিমুক্তা এই গ্রন্থ-মঞ্জুষায় সঙ্কলিত হয়েছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য এই পুস্তিকাটি সকল ব্যক্তিগত ও সাধারণ পাঠাগারে স্থান পাবার উপযুক্ত। আলোচনায় মানবিকতার সুরটি সর্বত্র ধ্বনিত।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ: হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ৮১, বান্ধবনগর, কলিকাতা—৭০০০২৮। মূল্য: দশ টাকা।

বীক্ষণ: শিশির বসু। মন্দাক্রান্তা, ২৭/১৪, ওলাবিবিতলা ১ম বাই লেন, হাওড়া—৭১১১০৪। মূল্য: দশ টাকা।

দেবীকরুণাময়ী: যূথিকা ঘোষ। উত্তমাশ্রম, গ্রাম ও পো: ডুমুরদহ, জেলা: হুগলী। মূল্য: দশ টাকা।

ঘূর্ণি ঝড়: সুনীলকুমার দে। গ্রাম: নয়াগ্রাম, পো: হলুদপুকুর, ভায়া—টাটানগর, জেলা: সিংভূম (বিহার)। মূল্য: পাঁচ টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্র

রায়পুর আশ্রমের উপকেন্দ্ররূপে পরিচালিত মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার **নারায়ণপুর** কেন্দ্রটি গত ১ এপ্রিল, ১৯৯০ রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্র হিসাবে গৃহীত হয়েছে। নতুন এই শাখাকেন্দ্রটির নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মিশন' (অবুজমার ট্রাইব্যাল সার্ভিস), নারায়ণপুর।

উদ্বোধন

গত ২৭ এপ্রিল **ইটানগর** আশ্রমে নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ হল'-এর উদ্বোধন করেন অরুণাচল-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং। ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি নার্সিং ছাত্রীদের 'ক্যাপিং' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বও করেন।

রাঁচীর মোরাবাদী আশ্রম ইন্দিরা আবাস যোজনা অনুযায়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য ১৭টি স্বল্প-মূল্যের বাড়ি ও একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করেছে। গত ১১ এপ্রিল এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

পরিদর্শন

গত ১৭ মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ক্লার্ক ও তাঁর পত্নী **বেলুড় মঠ** পরিদর্শন করেন।

গত ৭ এপ্রিল ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলাল **ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন** পরিচালিত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং ও তাঁর মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অসম অগ্নিত্রাণ: **করিমগঞ্জ** আশ্রমের মাধ্যমে **পাথরকান্দি** বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পঁয়ত্রিশটি পরিবারকে ১৩৯ কিলো: চাল, ৩৯টি ধুতি, ৩৫টি শাড়ি, ৩৫ সেট্ বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার **হিঙ্গলগঞ্জ** ব্লকে ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিদ্যালয় ও আশ্রয়গৃহ হিসাবে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মিত হচ্ছে তার একতলার অংশতঃ ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণশিবির পরিদর্শন করেন এবং শ্রীদাশগুপ্ত একটি ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

রাজকোট আশ্রম গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার গোধার তালুকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হরিজনদের জন্য ১০টি বসতবাড়ি নির্মাণ করে দশটি পরিবারের হাতে সেগুলি তুলে দিয়েছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি: গত এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মালোচনা হয়েছে। এছাড়া বুধবারগুলিতে রাজযোগ এবং মুণ্ডক উপনিষদের ওপর ক্লাস নিয়েছেন যথাক্রমে স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ; এবং শনিবারগুলিতে তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। ৩ এপ্রিল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমী পালন করা হয়। ঐদিন শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, আলোচনা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন সিঙ্গাপুর: মাসের প্রথম রবিবার স্বামী পরাশরানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত, অন্যান্য রবিবার স্বামী অভিরামানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা করছেন। তাছাড়া প্রতি রবিবার সকাল ১০-৩০ মি: সময়ে ৬ থেকে ১২ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে ক্লাস, এবং প্রতি মঙ্গলবার ভজন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া: গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে এই বেদান্ত সোসাইটিতে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ৪ মার্চ বেলা ১১টায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া ২৩ ফেব্রুয়ারি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করা হয়। গত ৫ মে এই

আশ্রমের উদ্যোগে শান্তি আশ্রমে বার্ষিক তীর্থযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। এ উপলক্ষে শান্তি আশ্রমে সেদিন দুপুরে পুজা, পাঠ, জপ-ধ্যান, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভজন-সঙ্গীত ভাষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করে-ছিলেন স্বামী সর্বগতানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বুয়েনস এয়ারস (আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আমেরিকা:) ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত এই আশ্রমটি দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানকার রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দ অনুরাগীদের মধ্যে তাঁদের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচার করে আসছে। এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন পালন করা হয়। গত বছর (১৯৮৯) দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোও অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বক্তৃতা, গান, প্রবন্ধরচনা প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে। গত বছর শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ওপর ছয়টি আলোচনা-সভা হয়েছে। প্রত্যেকটি সভায়ই যথেষ্ট সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বরিষ্ঠানন্দ (কমল): গত ৭ এপ্রিল সকাল ৫-৩৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

স্বামী বরিষ্ঠানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাঁকুড়া কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া কেন্দ্রে দীর্ঘ ৩৭ বছর কাজ করার পর ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে যান এবং ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানকার কর্মী ছিলেন। বেলুড় মঠে আসার পর তিনি অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। সরল ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী প্রেমাত্মানন্দ (মহাবীর): গত ৮ এপ্রিল রাত ১-১০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বোম্বাই আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত জানুয়ারি মাসের শেষদিকে তিনি থ্রোট ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য বোম্বাই আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি হৃৎপিণ্ডে রক্তাল্পতা রোগেও ভুগছিলেন।

স্বামী প্রেমাত্মানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কুয়ালালামপুরে বিবেকানন্দ আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে আসেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে অদ্বৈতাশ্রম, কাঞ্চিপুরম, উতকামণ্ড, কনখল, ইনস্টিটিউট অব কালচার, কাতারাগম (শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। একবছর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলম্বো কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। ভদ্র, মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ৯ মে ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৫—১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত **কল্যাণী রামকৃষ্ণ সেবাসংঘে** শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৫তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূজা, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিন ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী মেধসানন্দ, স্বামী বিরজাত্মানন্দ এবং প্রব্রাজিকা পবিত্রপ্রাণা। কথামৃত পাঠ করেন অধ্যাপক দীপক গুপ্ত। শংকর সোম সঙ্গীতানুষ্ঠান ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবৃন্দ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। পূজা-হোমাদি পরিচালনা করেন স্বামী বরিষ্ঠানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘ (রামপাড়া হুগলী) গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ এবং বক্তা ছিলেন শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা, বক্তব্য রাখেন আমেরিকার সুসান ওয়ালটারস। সভা দুটিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, গায়ত্রী চক্রবর্তী, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী চক্রবর্তী, শ্রাবণী নন্দী ও বীথিকা মালিক। সভাগুলিতে প্রায় পাঁচশো ভক্ত উপস্থিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া (পূর্ণিয়া, বিহার) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ ও ৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের প্রথম দিন ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, পাঠ, ভজন-সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামী মঙ্গলানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৭—১৯ মার্চ '৯০ **রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী আশ্রমে (কান্দরা, বর্ধমান)** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রামায়ণ গান, স্বামী দেবদেবানন্দ কর্তৃক সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীসারদা-লীলাগীতি পরিবেশন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ভক্তিগীতি প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।

মনোহরপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, (মেদিনীপুর) গত ২৪ ও ২৫ মার্চ '৯০ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ২৫ মার্চ দুপুরে প্রায় ছয়হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সোমাত্মানন্দ এবং স্বামী কমলেশানন্দ। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে হরেন্দ্রকুমার প্রধান, প্রধান শিক্ষক, মনোহরপুর বান্ধব হাইস্কুল ও অরবিন্দ অধিকারী, প্রধান শিক্ষক, মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠ। প্রশ্নোত্তর সভা পরিচালনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ।

পান্ডু (অসম) বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৬—১৮ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের শেষ দিনে বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় চার হাজার নরনারী বসে খিচুড়ি প্রসাদ পান। তিন দিনই সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ, অধ্যাপক দিলীপ চৌধুরী, অধ্যাপক প্রিয়াংশু উপাধ্যায়, আর. শ্রীনিবাসন এবং এম. আর. রঙ্গনাথ। প্রতিদিন ধর্মসভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

গত ১৮ মার্চ, '৯০ রবিবার **সাহাপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কমিটির** পরিচালনায় শিবধাম মন্দিরে, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৫তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন প্রায় একহাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গোপেশানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন অজয় দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন স্বামী অচ্যুতানন্দ।

গত ২৪ ও ২৫ মার্চ, '৯০ **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘে** শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীর জন্মোৎসব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধ-

প্রাণা। ২৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। তিনি ঐদিন সেবাসঙ্ঘের নতুন বিদ্যালয়-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং হিন্দু-মুসলমান মিলে সাতজন বয়স্ক নিরক্ষরকে 'হাতে খড়ি' দিয়ে সেবাসঙ্ঘের 'বয়স্ক শিক্ষা' প্রকল্পের শুভারম্ভ করেন।

গত ৭ এপ্রিল **বড়জাগুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (নদীয়া)** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম আবির্ভাব উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। সকালে নগর পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও কথামৃত পাঠ, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে ভক্তিগীতি, শিশুদের নৃত্য, আবৃত্তি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রমের কর্মী অসীম দত্ত এবং স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দিব্যানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সভায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পুস্তক দান করা হয়।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯০, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্কটিশচার্চ কলেজের অগিলভি হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে গঠিত সংস্থা **সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অব কালচারের** উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। কৃষ্ণদাস পালিতের পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৭ম বার্ষিক সম্মেলন গত ৬—৮ এপ্রিল **শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি** প্রাঙ্গণে এবং চার্চ রোডস্থিত পঞ্চায়েত ভবনে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই সম্মেলনে বেলুড়মঠ, মালদহ, কাটিহার ও জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং পরিষদভুক্ত উত্তরবঙ্গ, বিহার ও অসমের ২৮টি আশ্রম থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী ঋদ্ধানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ ও স্বামী জগন্নাথানন্দ। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শঙ্কর সোমের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী প্রচার সংঘ গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

পরলোকে

উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়ি-স্থিত শ্রীশ্রীতারকনাথ-অন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ও সেবায়েত **শ্রীমতী উমাশশী দেবী** গত ৮ মার্চ '৯০, দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং মাত্র একুশ দিনের মধ্যে পতিবিয়োগ ঘটে।

উমাশশী দেবী বত্রিশ বছর বয়সে বেলুড় মঠে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেন। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজও তাঁকে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে বিশেষ প্রেরণা দেন। অবশেষে তিনি উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করে আজীবন দেবারাধনা, সাধুসেবা ও সাধন-ভজনে নিযুক্তা থাকেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৮৮ সালে শারদীয়া (আশ্বিন) সংখ্যায় 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি'-নিবন্ধে উমাশশী দেবী প্রদত্ত কিছু বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। নিজ নাম প্রচারে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই উক্ত নিবন্ধে তাঁর নাম অপ্রকাশিত রয়েছে। তাঁর পবিত্র জীবনচর্যা ও নম্র-মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশ্রিতা **শ্রীমতী নির্মলা মিত্র** গত ৮ মার্চ '৯০ বিকাল পাঁচটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একানব্বই বছর। তিনি ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। বেথুন স্কুলে (তটিনী দাস ওঁর সহপাঠিনী ছিলেন) পড়তে পড়তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মিত্রের (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহোদর উপেন্দ্রলাল মিত্রের পৌত্রের) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অল্পবয়স থেকেই তিনি 'উদ্বোধন'-এ যাতায়াত করতেন এবং সেই সূত্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের স্নেহ-সান্নিধ্যে আসেন। নির্মলা মিত্র বহু দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর অমায়িক নম্র স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

আন্দামান-নিকোবরে আজব আদি জাতি—ওঙ্গি

আন্দামান এবং নিকোবর ইউনিয়ন টেরিটরিতে মোট ৩০৬টি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৭০০ কিলোমিটার। দ্বীপগুলির মাঝামাঝি ১৭৫ কিলোমিটার বিস্তৃত সমুদ্র থাকায় এগুলি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—একদিকে আন্দামান ও অন্যদিকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। আদি উপজাতিগুলি—আন্দামানী, জেরোয়া (Jerwas), ওঙ্গি (Onges) এবং সেন্টিনেলি, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে দলগতভাবে বাস করে। হয়তো এরা অতীতে বর্মাদেশ, ফিলিপাইন, বা মালেশিয়া থেকে কোন একসময় এসেছিল। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দুটি মঙ্গোলিয় উপজাতি বাস করে—নিকোবরী ও সোম্পেন। অতীতে এই সব দ্বীপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে—'সোনার দ্বীপপুঞ্জ', 'সৌভাগ্যের দ্বীপপুঞ্জ' প্রভৃতি। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চিং এই সব দ্বীপের অধিবাসীদের 'উলঙ্গদেশের নরখাদক' বলে অভিহিত করেছিলেন। রামায়ণে এদেরই 'কাঁচা মাছ-মাংসখাদক কিরাত' বলা হয়েছে।

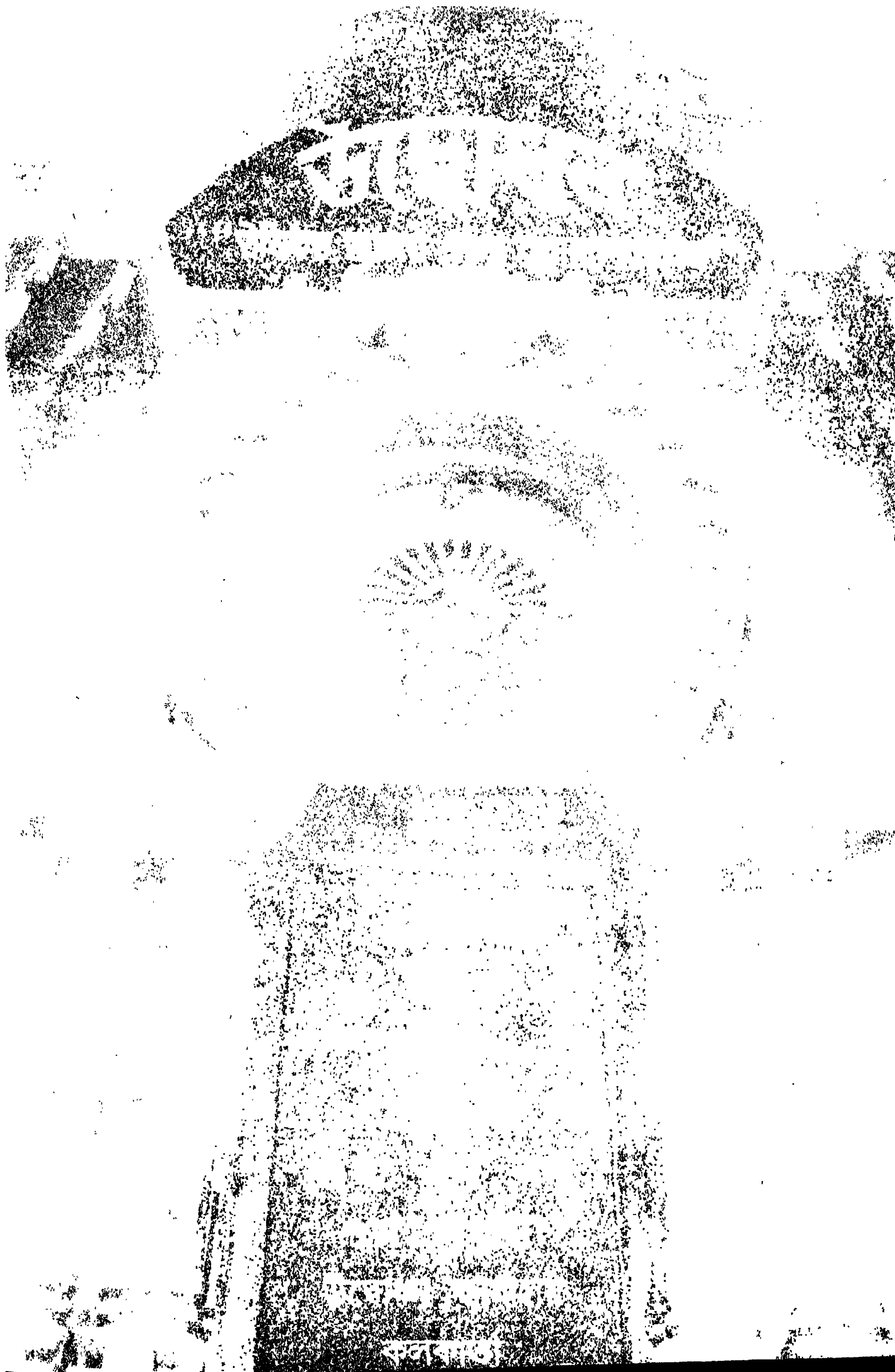
৬০০ বর্গ-কিলোমিটার বিস্তৃত 'লিটল আন্দামানে' বসবাসকারী ওঙ্গিরা শিকার, মাছধরা ও খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। কথিত আছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদের সংখ্যা ছিল ৫০০০, কিন্তু আন্দামান সরকার (Andaman Administration) এদের শাসনভার নেবার পর এদের ২৯ জনকে পাওয়া গিয়েছিল। আগে ওরা বন্যবরাহ, ভক্ষণযোগ্য বৃক্ষশিকড় ও মধু সংগ্রহের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করে বেড়াত, কিন্তু বর্তমানে, ডুগং ক্রিক ও সাউথ বে অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। চাষ, বাগান করা বা ব্যবসা-বাণিজ্য এরা জানে না। বর্তমানে এরা ৩২ পরিবারে ৯৮জন আছে। আন্দামান সরকার এই উপজাতিদের তাড়াতাড়ি উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছে—নারকেল চাষ, বিনামূল্যে রেশন ও পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া, এদের জন্য সমাজকর্মী, চিকিৎসক ও চিকিৎসকের সাহায্যকারী নিয়োগ প্রভৃতি।

ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন (হায়দ্রাবাদ) ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে, ওঙ্গি, নিকোবরী, সোম্পেন ও আন্দামানীদের পুষ্টি ও খাদ্যবিষয়ে একটি সমীক্ষা করে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল (১) ওঙ্গিদের পুষ্টির পরিমাপ করা (২) পরিবর্তিত জীবনধারা এদের ওপর কি প্রভাব ফেলেছে তা দেখা (৩) উন্নতির প্রচেষ্টা ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন এদের পুষ্টির ওপর কি প্রভাব এনেছে তা দেখা, এবং (৪) উপজাতিদের উন্নতির হার কি ভাবে রক্ষিত হতে পারে তা নির্ণয় করা। ৯৮ জন ওঙ্গিদের মধ্যে ৯২ জনের ওপর এই পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতবাসীর তুলনায় ওঙ্গিরা খর্বকায়। ২০—২৯ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ও ৩০—৩৯ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকদের বাদ দিলে এদের ওজন কম। কিছু কিছু বালক-বালিকার মধ্যে ভিটামিন 'এ' কম পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ ওঙ্গির স্বাস্থ্য সাধারণ ধরনের। খাবারের মধ্যে এরা মাংস ও ফল কম খায়। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে এই ধরনের একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আগের তুলনায় এরা মাংসের চেয়ে শষ্য-খাদ্য বেশি খাচ্ছে। আগে তারা খাদ্যে ১৮৬২ ক্যালরি পেয়েছে, এখন ২২৬৩ ক্যালরি পায় (নিয়মিত রেশন পাওয়ার জন্য)। প্রোটিন ১৪০ গ্রাম থেকে কমে ৬৯ গ্রাম হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ওঙ্গি উচ্চতায় ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের তুলনায় ২ সেন্টিমিটার বেড়েছে; ওজনে ৪-৫ কেজি বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে তাদের জীবনধারায়—যাযাবর জীবন হতে এক জায়গায় স্থায়ী জীবন। তারা এখন ডাক্তারি চিকিৎসা নেয়।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ওঙ্গিরা সংখ্যায় ছিল ২৫০; ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ১৫০; ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ১২৯; ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে ১১২। ওদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ওদের বন্ধ্যাত্ব, স্ত্রী-পুরুষের বয়সের তারতম্য, স্ত্রী-পুরুষের একনিষ্ঠ এককামীত্ব (monogamy), প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত নানা রোগ প্রভৃতি।

[Nutrition News, Vol. 10, No. 4, July 1989]





বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা জুলাই, ১৯৯০ শ্রাবণ, ১৩৯৭

দিব্য বাণী

যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।... তিনিই শিক্ষা দিবেন।

...লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? [আদেশ হলে] সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিনকতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



কথাপ্রসঙ্গে

লোকগুরু

'গুরু' শব্দটি ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে সর্বাধিক পরিচিত শব্দগুলির অন্যতম। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, ইংরাজী অভিধান ও কোষ গ্রন্থগুলিতে অন্তর্ভুক্তির সুবাদে বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতেই শব্দটি জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বস্তরে বিরাজমান। বস্তুতঃ, আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান বলিয়া অন্ততঃ দুই সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ বহির্বিশ্বে স্বীকৃত। বহির্ভারতে ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি বুদ্ধের মহান অনুগামী সম্রাট অশোকের সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; এবিষয়ে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। তাহারও পূর্বে আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখনও ভারতীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিকদের সমুচ্চ আধ্যাত্মিক মহিমা, নির্লোভতা, নির্ভীকতা এবং প্রজ্ঞা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিতগণের বিবরণেও এই বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। পরবর্তী কালে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ এবং অন্যান্য বিদেশী লেখকদের সাক্ষ্য হইতেও ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। মধ্যবর্তী সময়ে প্রধানতঃ মুসলমান-অধিকারে আসিবার পর হইতেই হিন্দু ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি অজ্ঞতার যবনিকা ভারত এবং বহির্ভারতের মধ্যে স্থাপিত হয়। ইংরাজ শাসনাধীনে এই যবনিকাটি উত্তোলিত হয় এবং হিন্দু ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা সংবাদ বহির্বিশ্বে, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছাইতে থাকে। খুবই দুঃখের বিষয়, সেই সমস্ত সংবাদের অধিকাংশই ছিল নির্জলা মিথ্যা অথবা ভ্রমপরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য, ইহা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি হীন কৌশল এবং খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকগণ এবং কিছু ইংরাজ পণ্ডিত ও প্রশাসক এই বিষয়ে অত্যুৎসাহীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনলস প্রয়াসে পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য দেশ। সে-দেশের মানুষ অগণিত কুসংস্কারের দ্বারা কবলিত। তাহারা পুতুল গড়িয়া পূজা করে; সাপ, বাঘ, গাছ, পাথরের নুড়ি প্রভৃতি তাহাদের উপাস্য। তাহারা 'গুরু' নামধেয় মূর্খ, লম্পট, বামাচারী তান্ত্রিকদের ক্রীতদাসগিরি করে, উঁহাদের পা ধুইয়া জল খায়। মিথ্যায় পূর্ণ এই তালিকাটি অতি-বৃহৎ। শুধু

দুই-চারিটির আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম। 'অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত' এই 'হিদেন'-দিগকে সভ্যতার আলোক প্রদান করিবার জন্য 'স্বর্গস্থ পিতা এবং তাঁহার একজাত সন্তান যীশু' কর্তৃক তাঁহারা নির্দিষ্ট বলিয়া ইংরাজ ধর্মযাজক-বৃন্দ এবং ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধিবর্গ সাড়ম্বরে প্রচার করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের অপপ্রচার অবশ্যই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। একদিকে তাঁহাদের স্বদেশ-বাসিগণ এই ভাবিয়া পুলকিত বোধ করিতেছিলেন যে, ইংরাজ আসিয়া এই অসভ্য বর্বর দেশের মানুষগুলিকে সভ্যতার আলোক প্রদান করিতেছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরু-গণের সকল কথাই নির্বিচারে গলাধঃকরণ করিতে-ছিলেন। পাশ্চাত্য-প্রচারের কল্যাণে তাঁহাদের বদ্ধ-মূল ধারণা হইল, ভারতের সমস্ত কিছুই নিকৃষ্ট, অতএব পরিত্যাজ্য; ইংরাজদের তথা পাশ্চাত্যের সমস্তকিছুই উৎকৃষ্ট এবং নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ ও সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে যে যত বেশি সংযোগ নষ্ট করিতে পারিবে সে তত সভ্য, তত প্রগতিশীল। ফলে দেশব্যাপী পাশ্চাত্য-অনুকরণের প্রবল প্লাবন শুরু হইল।

নব্য-শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে এই প্লাবনকে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে প্রবাহিত করিতে কৃতসংকল্প। সংস্কারমুক্তির অহংকারে আত্মহারা এই বিরোচনের দল ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়িতে গোমাংস ছুঁড়িয়া দিয়া আমোদ-উল্লাসে মাতিয়া উঠিতেন। প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান, নিষিদ্ধ আহার্য-গ্রহণ, সভা-সমিতি ও রচনাদির মাধ্যমে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বল্গাহীন নিন্দা-বর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসকে তাঁহারা প্রকট করিয়া তুলিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের গুরু ডিরোজিওর প্রভাবে ১৮৩১ খৃীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের) চারশত ছাত্রের মধ্যে দুইশতেরও বেশি খৃীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিস্থিতির এই হেন রূপ দেখিয়া ভারতে ইংরাজী শিক্ষার পথিকৃৎ লর্ড মেকলে গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে লিখিলেনঃ "ভারতে পাশ্চাত্য ভাবের জোয়ার যেভাবে বহিতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, আগামী ত্রিশ বৎসরে মূর্তি-পূজায় বিশ্বাসী একজন শিক্ষিত ভারতবাসীকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

কথাগুলি ১৮৩৬ খৃীস্টাব্দে মেকলে লিখিয়া-ছিলেন। মেকলে তথা পাশ্চাত্যের আত্মম্ভরিতার সমুচিত জবাব দিবার জন্যই বোধ করি ঐ বৎসরেই জন্মগ্রহণ করিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মূর্তিপূজক শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন বঙ্গদেশের এক অখ্যাত গ্রামে। কলিকাতা হইতে সত্তর মাইল বাহ্যিক দূরত্বে গ্রামটির অবস্থান হইলেও আধুনিক সভ্যতার নিরিখে তাহার অবস্থান কলিকাতা হইতে তখন লক্ষ যোজন দূরে। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া সেখানকার মানুষ কৃষ্ণ অথবা কালীর মূর্তির অথবা শিবের লিঙ্গদেহের সম্মুখে প্রতি সন্ধ্যায় আরতি করে। মূর্তিপূজা বিরোধী, নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বৃদ্ধা-ঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সনাতন ভারতবর্ষের আদি ও অকৃত্রিম লোকসংস্কৃতির প্রবাহ ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া আসিলেন ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায়। ১৮৩৬ খৃীস্টাব্দের এই জাতক মেকলে সাহেবের বড় সাধের ইংরাজী শিক্ষাকে প্রবল ঘৃণার সহিত সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন। অপরদিকে সনাতন ভারতীয় শিক্ষার মর্মকে আত্মসাৎ করিয়া পাশ্চাত্যের সম্মুখে স্বয়ং ভারতাত্মার সাকার বিগ্রহ হইয়া তিনি উপ-স্থিত হইলেন। কলিকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর এক প্রতিনিধি যে ইতঃপূর্বে সর্বদাই হিন্দুশাস্ত্রাদির নিন্দা করিত, একদিন তাঁহার সম্মুখে অকস্মাৎ ভগবদ্গীতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে শুরু করায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওষ্ঠে ঝলসিয়া উঠিল কঠোর বিদ্রূপ-বাক্যঃ "কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে বুঝি!"

ইঁহাকেই বলে গুরু। গুরু সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা আচ্ছন্ন আমাদের দৃষ্টিকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলন করিয়া দেন। সেই একই ব্যক্তি, কিন্তু গুরু যখন তাহার চোখ খুলিয়া দেন তখন সে জগৎ-সংসারকে ভিন্নভাবে দেখিতে থাকে। নিজেকেও যেভাবে সে দেখিতে এতকাল অভ্যস্ত ছিল গুরু চোখ খুলিয়া দেওয়ায় এখন হইতে নূতনভাবে নিজেকে সে আবিষ্কার করে। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন। গল্পটি তিনি তাঁহার গুরু তোতাপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। তাহা হইল বনের বাঘ কর্তৃক ছাগলের দলে পালিত বাঘের আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অরণ্যের ঐ শার্দুল যিনি আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাণীই ধারণ ও বহন করিয়া একাধারে মহাদেব ও ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণপূর্বক

স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন পাশ্চাত্যের বিদ্বৎসভায়। বলিষ্ঠ ভঙ্গি ও ভাষায় তিনি একের পর এক উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রিটিশের তথা পাশ্চাত্যের হীন অপকৌশল ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়াসের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষ যে কত মহান, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ, ভারতের ধর্ম, দর্শন, ঐতিহ্য এবং সমাজ-ব্যবস্থা যে কত উদার এবং বৈজ্ঞানিক তাহা তিনি অভ্রান্ত প্রমাণ-সহযোগে সেখানে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দুর্বলতা কোথায়, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ধকার দিকগুলি কি সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তিনি তাহা বলেন নাই, যেমন বলিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ববর্তী একাধিক স্বনামধন্য ভারতীয় নেতা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত বলিয়া যাঁহারা ইতিহাসে বন্দিত। ভারতের দুর্বলতার কাহিনী তো ইতঃপূর্বে পাশ্চাত্যের ধর্মযাজকবৃন্দ ও ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কল্যাণে যথেষ্টের চাহিতেও বেশি শুনিয়াছেন পাশ্চাত্যের মানুষ। স্বামীজী তাঁহাদের কাছে নূতন কথা শুনাইলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন সভ্যতা-গর্বিত পাশ্চাত্যের আস্ফালন কত শূন্যগর্ভ। সভ্যতার আলোকবিস্তারের নামে ভারতবর্ষের কত ক্ষতি বৃটিশ করিয়াছে তাহার জ্বলন্ত খতিয়ান তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় তুলিয়া ধরিলেন। নির্ভীক কণ্ঠে তিনি বলিলেনঃ "এক হাতে বাইবেল আর অপর হাতে বিজেতার তরবারি লইয়া তোমরা আমাদের দেশে গিয়াছ... আমাদের পায়ের তলায় দলিয়াছ, ধূলার মতো তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ, তোমরা মাংসাশী জানোয়ার ! মদ খাওয়াইয়া তোমরা আমাদের অধঃপাতিত করিয়াছ, আমাদের নারীকে করিয়াছ অসম্মান, আর বিদ্রূপ করিয়াছ আমাদের ধর্মকে।" ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে কি দিয়াছে? পাশ্চাত্যের সভ্যসমাজকে কঠোর বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি শুনাইয়াছেন : "তিনটি 'ব'—বাইবেল, ব্র্যান্ডি আর বেয়নেট !"

পাশ্চাত্যে ইহার ফল হইল যুগান্তকারী। ইংরাজ ভারতবর্ষে কি করিয়াছে তাহার পরিচয় পাইয়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাশীল মানুষ একদিকে যেমন গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি পোষণ করিতে শুরু করিলেন, তেমনই অপরদিকে ভারতের মহিমার আকার সম্পর্কে অবহিত হইয়া ভারতের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা বলিলেনঃ "আমরা ইঁহারই দেশের মানুষের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাই! বরং উঁহারা যদি আমাদের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান তো তাহাই শোভন হয়।"

ইঁহাকেই বলি গুরু। পাশ্চাত্যের নয়নসম্মুখে ভারত সম্পর্কে যে অজ্ঞানের কুয়াশা বিস্তৃত হইয়াছিল তাঁহার অমানুষী শক্তিতে স্বামীজী তাহা সূর্যের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। একই সঙ্গে ইহার প্রভাব গিয়া পড়িল আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর উপরেও। আসমুদ্র ভারতবর্ষের নিদ্রিত মানুষ যেন নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহাদের নিজের যে বাস্তবিক এত ঐশ্বর্য রহিয়াছে, এত সমৃদ্ধ তাহাদের আপন ভাণ্ডার, ইহা তো তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষ ও তাহার শিক্ষিত মানুষ যাঁহাদের অনেকেই ভারত সম্পর্কে গভীর হীনম্মন্যতায় ভুগিত, এখন হইতে আবার নিজেদের সম্পদের দিকে তাহারা ফিরিয়া তাকাইল। ভারতবর্ষ যেন নিজেকে নূতনভাবে আবিষ্কার করিল। গুরু এই আত্ম-আবিষ্কারই করান।

স্বামীজী ফিরিয়া আসিলেন ভারতবর্ষে। ভারত সম্পর্কে যে মহিমার কাহিনী পাশ্চাত্যকে তিনি শুনাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেশবাসীকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন কোথায় তাহাদের দুর্বলতা, কোথায় তাহাদের অপদার্থতা, কোথায় তাহাদের অপকৃষ্টতা। হীনম্মন্যতা, অনুকরণপ্রিয়তা, স্বদেশ ও স্বজাতির নিন্দাপ্রিয়তা, দেশ এবং দেশের ঐতিহ্য ও মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, ধর্মের নামে ধর্মবিকৃতির প্রশ্রয়দান—সকলকিছু এমন কঠোর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি নির্দেশ করিলেন যে, ভারত ও ভারতবাসী তাহাতে হৃত চেতনা ফিরিয়া পাইল। তিনি বলিলেনঃ

"একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য-সম্পন্ন হইব ; অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন —মূর্খ ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

"একদিকে নব্যভার বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল ; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান !"

স্বামীজী যাহা বলিলেন তাহা খুবই উচিত কথা, কিন্তু এই দোষদর্শনেই যদি তিনি তাঁহাকে

সীমিত রাখিতেন তাহা হইলে তিনি লোকগুরু হইতে পারিতেন না। লোকগুরুত্ব হইল বস্তুর যথার্থ রূপ দর্শানোর পারঙ্গমতায়। স্বামীজী তাহাই করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

"তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র?

"শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [শিখিবার] আছে—কিন্তু ভয়ও আছে।"

সেই 'ভয়' হইল অন্ধ "পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ"। সেই মোহগ্রস্ততা কিভাবে যাইবে? স্বামীজী বিধানপত্র দিলেন ঃ "এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর ; তাহার নাশ কে করে?"

এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের লোকগুরুত্ব। তিনি যেমন কণ্টককে দেখাইয়াছিলেন, তেমনই দেখাইয়াছিলেন তাহা কিভাবে ও কোথায় দেহে বিঁধিয়াছে, এবং কিভাবে তাহার উৎপাটন করিয়া দেহকে সুস্থ ও স্বস্থ করিতে হইবে।

লোকগুরুগণ জগৎকে বারংবার সতর্ক করিয়া দেন—অসংযমী ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা পরিণামে অশেষ দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং ভোগে নহে, ত্যাগেই পরম শান্তির মূল। পাশ্চাত্যের মানুষকে সাবধান করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত। জড়শক্তির লীলাভূমি পাশ্চাত্য যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে।"

বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে, স্বামীজী-কথিত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতার বনিয়াদকে শিথিল করিয়া দিয়া গিয়াছে।

স্বামীজী বলিয়াছেন, জগৎকে পথ দেখাইবে ভারতবর্ষ। বলিয়াছেন ঃ "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" বলিয়াছেন ঃ "এখন সময় আসিয়াছে যখন ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীর-ভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে।... আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে।" সেই বিজয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী স্বয়ং। অরবিন্দ সেই কথাই লিখিয়াছেন ঃ বিবেকানন্দের [পাশ্চাত্য-] যাত্রা-যে-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁহার গুরু বলিয়াছিলেন, তিনি জগৎকে দুই হাতে ধরিয়া বদলাইয়া দিবার মতো শক্তিধর পুরুষ—ছিল জগতের সমক্ষে প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ যে, ভারতবর্ষ জাগিয়াছে—শুধু তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিবার জন্য নহে, জাগিয়াছে জয় করিবার জন্য।"

অরবিন্দের কথাগুলির মধ্যে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা হইল জগতের গুরু হইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দকে নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কাশীপুরে তিরো-ধানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত নির্দেশনামা বা 'চাপরাশ'-প্রদানের কথা স্মরণে আসিতেছে। গুরুতর অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সন্ধ্যায় একটি কাগজ ও পেন্সিল লইয়া স্বয়ং লিখিলেন ঃ "নরেন শিক্ষা দিবে, যখন দূরে (ঘুরে?) বাহিরে হাঁক দিবে।" কথাগুলি লিখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিচে আঁকেন একটি রেখাচিত্র—এক বলিষ্ঠ আয়তচক্ষু যুবাপুরুষের আবক্ষমূর্তি যাহার পশ্চাতে ধাবমান একটি দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর। আবক্ষমূর্তিটি স্পষ্টতই নরেন্দ্রনাথের তথা স্বামী বিবেকানন্দের যিনি অদূর ভবিষ্যতে দূর পাশ্চাত্যে ভারতের অধ্যাত্মবিজয়ের রণক্ষেত্রে দেবসেনাপতি কার্তিকের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন ; ময়ূরের ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের যিনি সেই রণক্ষেত্রে সর্বদা স্বামী বিবেকানন্দকে বহন করিবেন। ময়ূর শক্তির প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণই তো স্বামীজীর সকল শক্তির উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ চাপরাশ ভিন্ন লোক-শিক্ষার অধিকার আসে না এবং সেই চাপরাশ দেন স্বয়ং ঈশ্বর। লোকশিক্ষক তখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহ হইয়াই কাজ করেন। তাহাতেই লোকশিক্ষকের চরম সার্থকতা। স্বামী বিবেকানন্দকে চাপরাশ দিয়াছিলেন স্বয়ং সচ্চিদা-নন্দ-মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দও হইয়া গিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ। তাই তো তাহার কথার অত শক্তি—যেন "পর্বত টলিয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলিতেছেন ঃ আমার সব শক্তি তো তাঁহারই—"আমি শুধু দেহহীন এক কণ্ঠস্বর" ("I am a voice without a form")—"বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

ধারাবাহিক নিবন্ধ

সকলের মা সারদা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ চিহ্নিত করলেন তাঁর ভাবী সঙ্ঘের ত্যাগী ভক্তদের। একে একে এসে জুটলেন নরেন, রাখাল, শরৎ, শশী, লাটু, যোগীন, সারদা, কালী প্রভৃতি। প্রথম থেকেই তাঁদের নিজ সন্তানের দৃষ্টিতে দেখতেন শ্রীমা। তাঁদের প্রতি একটা অনুপম স্নেহাকর্ষণ বোধ করতেন তিনি।

তাঁদের সযত্নে ও একান্ত আপনার জ্ঞানে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন শ্রীমা। শ্রীমা যে তাঁদের 'আপন মা' এবং ততোধিক হবেন, এতো স্বাভাবিক। প্রথমাবধি তাঁদের হৃদয়কন্দরে দৃঢ়ভাবে অংকিত ছিল—শ্রীমা সামান্যা মানবী নন, শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী; স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া, মানবীরূপে ধারণ করে মর্ত্যলীলা প্রকট করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমায়ের জন্মজন্মান্তরের দাস। সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যার পূর্বে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকা যাত্রার আগে শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন নির্দেশপত্রের। প্রণাম জানিয়েছেন, "দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে" বলে। গুরুভাইদের বলেছেন শ্রীমা 'জ্যান্ত দুর্গা'। পাছে পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীমায়ের পবিত্রতার হানি হয়, বিবেকানন্দ শ্রীমায়ের কাছে যাবার আগে বারবার গঙ্গাজলে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন করে পবিত্র করে নিতেন নিজেকে; স্পর্শ করতেন না শ্রীমায়ের পূত চরণযুগল। শ্রীমাকে প্রণাম করতে ভাবে বেহুঁশ হয়ে যেতেন তিনি। শ্রীমায়ের দিব্যস্বরূপের আবরণ তিনি উন্মোচন করেছেন তাঁর পত্রে পত্রে। নির্দেশ ও নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন শ্রীমাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীমঠ গঠনের। উদ্দেশ্য নারীজাতির নবযুগের সূচনা করা। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবে থরথর কাঁপতেন শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে। তাঁর কাছে শ্রীমা ছিলেন শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী। তিনি বলতেন, "মা হলেন সাক্ষাৎ জগদম্বা, নরদেহে স্বয়ং ভগবতী।" শ্রীমায়ের প্রথম সেবক লাটু মহারাজের 'নিজ জননী' ছিলেন শ্রীমা। তাঁর আশ্চর্যমধুর অনুভূতি: "মাকে মানা কি সহজ কথা রে। তাঁর (ঠাকুরের) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যেপার। মা-ঠাউন যে কি, তা একমাত্র তিনি বুঝেছিলেন, আর কথিৎ স্বামীজী বুঝেছিল। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী।" শ্রীমায়ের প্রথম 'ভারী' স্বামী যোগানন্দজী কখনও শ্রীমাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতেন না। শ্রীমা চলে গেলে সে-স্থান হতে ধুলো নিয়ে মাথায় দিতেন। শ্রীমায়ের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেহধারিণী স্বয়ং আদ্যাশক্তিকে। শ্রীমায়ের সেবক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ শ্রীমায়ের জন্য হঠকারিতা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অম্লানবদনে নিজের দেহ রেখেছিলেন খানার ওপর, যাতে নির্বিঘ্নে পার হতে পারে শ্রীমায়ের গাড়ি। শ্রীমায়ের জন্য লংকা আনতে গিয়ে নিজের জিভ ফুলে ঢোল করতে কুণ্ঠিত হননি তিনি। তাঁর কাছে শ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বাণীমালা—"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।" শ্রীমায়ের 'ভারী' ও 'দ্বারী' স্বামী সারদানন্দের অমর দিব্যানুভূতি: "যথাগ্নের্দাহিকা শক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা। সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।" মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমা ছিলেন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়—হাইকোর্ট। তাঁর ভাবোন্মত্ত অনুভব: "তিনি (শ্রীমা) সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। সেই নিত্যা সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক প্রকাশ; যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি তেমনি।" স্বামীজীর সেবাব্রতের সূচনাকারী স্বামী অখণ্ডানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি: "মা হলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী।" গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেন: "ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী। মা সর্বশক্তিময়ী।" প্রেমের সাগর স্বামী প্রেমানন্দের

াসিক্ত মর্মানুভূতি : "শ্রীশ্রীমাঠাকুরনকে দেখেছি রের চেয়েও আধার বড়, তিনি শক্তিস্বরূপিণী না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মাঠাকুরনের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন? তাঁর ধারণ করবার শক্তি কত!" বেদান্তকেশরী স্বামী অভেদানন্দের ভক্তিরসাপ্লুত মাতৃস্তোত্র সর্বজন-বিদিত। তাঁর কাছে শ্রীসারদা ছিলেন "সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, আবার মুক্তিদাত্রী, মহামায়া।" দাস্য-ভক্তির অধিকারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অপূর্ব অন্তিম দর্শন—"হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী। / বরাভয়করা দিতেছে অভয়।" ব্যাঙ্গালোরের এক ভক্তকে তিনি লিখেছিলেন: "You should never lose this very rare and unexpected opportunity to worship the Motherhood of God in her. She is your real Mother.··· It is so fortunate you are to have the Mother of the Universe at your very door!" দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধায়ক স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীমাকে সেবা করতেন পরম শ্রদ্ধায়। নিঃসংকোচে তিনি কথা বলতেন শ্রীমায়ের সঙ্গে। বেদান্তের প্রতিমূর্তি স্বামী তুরীয়ানন্দের শ্রীমায়ের প্রতি প্রেমরসঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি: "কি মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন! যে মনকে আমরা এখানে (কণ্ঠদেশে) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে 'রাধু রাধু' করে জোর করে নাবিয়ে রেখেছেন। বোঝ ব্যাপারটা কি! জয় মা মহাশক্তি!" ঈশ্বরকোটি স্বামী নিরঞ্জনানন্দই শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন ভক্তমহলে। শ্রীমা যে শুধুমাত্র গুরুপত্নী নন, জগজ্জননী, আদ্যাশক্তি, জগদম্বা—শ্রীমায়ের এই দেবীমহিমা সগৌরবে, সোচ্চারে অকুণ্ঠচিত্তে প্রচার করেছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। শ্রীমায়ের 'খোকা' স্বামী সুবোধানন্দ শ্রীমায়ের মহিমা কীর্তন করেছেন: "এখানকার পূজারীরা নকল অন্নকূট করে। আর যিনি আসল জগজ্জননী তাঁর অন্নকূট কত বড়, যিনি সমস্ত জগতের লোককে এবং জীবজন্তু সকলকে খাওয়াইতেছেন। ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে (মন) যে শরীর থেকে কোথায় চলিয়া যায় তার কিছু ঠিক থাকে না। ঠাকুর কখনো কখনো বলিতেন, 'এবার স্বয়ং মহামায়া নররূপে বেড়াতে এসেছেন, যখন সকল রকম সম্প্রদায়ের লোক আসিবে, তখন আর থাকিবে না'।" শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদেরও মা ছিলেন শ্রীমা সারদা।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্যদেরও মা সারদা। মাস্টার মহাশয়, নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, অক্ষয় সেন, মনোমোহন, নবগোপাল, হরমোহন, দেবেন্দ্র প্রভৃতিরা শ্রীমায়ের আদরের প্রিয় সন্তান। ধীরে ধীরে তাঁরা সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীমায়ের দিব্যস্বরূপ—শ্রীমা শুধুমাত্র গুরুপত্নী নন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য লীলাসঙ্গিনী। তাঁদের অভূতপূর্ব দর্শনানুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছেন শ্রীমা। শ্রীমা তাঁদেরও মা। কথামৃতকার মাস্টার মহাশয়ের কাছে শ্রীমা-ই নিজ জননী। তাঁর ডায়েরীর পাতা আরম্ভ করতেন, "শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমা চরণ ভরসা।" মাস্টার মহাশয় শ্রীমাকে কথামৃত নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করেছিলেন। উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছিলেন: "মা, তুমি জগতের মা, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিন্তা করিয়া দেশে দেশে ও সর্বকালে, তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ হয় ও শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হয়।" দীনতার প্রতিমূর্তি নাগ মহাশয়ের মাতৃভক্তি অপূর্ব। শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাক্যহারা নাগ মহাশয়ের মুখে শুধুমাত্র 'মা, মা' রব। শ্রীমা-ই তাঁকে প্রসাদ খাইয়ে দেন। কখনো বা নাগ মহাশয় প্রসাদের শালপাতাটি শুদ্ধ খেয়ে নেন শ্রীমায়ের প্রসাদ বোধে। তাঁর কাছে, "বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল।" শ্রীরামকৃষ্ণের রসদ্দার বলরাম বসু। বলরামও সেবা করেছেন শ্রীমাকে। বলরামসহ তাঁর পরিবারের সকলেই ধন্য হয়েছেন শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে। বলরামের কাছে শ্রীমা ছিলেন "ক্ষমারূপা তপস্বিনী।" স্বামীজীর আদরের 'শাঁকচুন্নী' শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয় সেন বন্দনা করেছেন শ্রীমাকে:

"জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগতজননী।
গুণময়ী গুণাতীতা ব্রহ্ম সনাতনী॥
অখণ্ডা অরূপা তুমি, তুমি নিরুপমা।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি মা প্রধানা॥

সৃষ্টির অঙ্কুর তুমি, সকলের মূল।
তুমি মা চব্বিশ তত্ত্ব, তুমি সূক্ষ্ম-স্থূলে ॥
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতিতে পালন।
পুনঃ রাখ কোলে লয়ে করিয়া নিধন ॥
খেলার ডালি মা তোমার গোটা সৃষ্টিখানি।
লীলাময়ী লীলাপরা লীলাস্বরূপিণী ॥"

ভক্ত মনোমোহন মিত্র শ্রীমায়ের দিব্যরূপ দর্শন করতেন লক্ষ্মীরূপে। সাহিত্যিক ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী দেবেন্দ্র মজুমদার এন্টালীর শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমা বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন দেবেন্দ্রের সাদর আহ্বানে। সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবেন্দ্র পূজা করেছেন শ্রীমাকে:
"এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে।
বেড়াই খেলে যেথা সেথা, মা বুঝি তাই কসুনে কথা,
শুনি নাই এমন কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র মূলে।"

স্বামীজীর সহাধ্যায়ী হরমোহন মিত্র অকাতরে ব্যয় করতেন শ্রীমায়ের সেবায়। শ্রীমায়ের হাতের হোগলা পাকের বালা দীর্ঘ ব্যবহারে অযোগ্য হওয়ায় হরমোহন শ্রীমাকে নতুন বালা গড়িয়ে দেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র ভক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন শ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে শ্রীমায়ের সঙ্গে। গিরিশের স্বীকারোক্তি: "আমরাই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলে।" সেই থেকে গিরিশের কাছে শ্রীমা সাক্ষাৎ জগদম্বা, যিনি ছিলেন তার বাল্যকালের রক্ষাকর্ত্রী। গিরিশের স্পষ্ট জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমায়ের সুস্পষ্ট উক্তি: "আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।" এ উক্তি শুধুমাত্র গিরিশের প্রতি নয়। এ উক্তি শ্রীমায়ের সকল সন্তানের প্রতি। পুত্রশোকের জ্বালা জুড়াতে নিরঞ্জনানন্দজী গিরিশকে নিয়ে গিয়েছিলেন জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের কাছে। সেখানেই মহাকবি গিরিশের আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল শ্রীমায়ের মাহাত্ম্য। গিরিশ দৃঢ়স্বরে কালীমামাকে বলেছিলেন: "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এ"আমি মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও।" তেজস্বী গিরিশ আপন শ্রীমায়ের কাছে 'ছোট্ট শিশু'। তাই শ্রীমা তাঁর কাছে তো "জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।" গোলাপ মার ভ্রূকুটি ও ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে গিরিশ প্রণাম করতেন শ্রীমাকে। শ্রীমায়েরও প্রাণ জুড়াত সন্তানের দর্শনে। গিরিশের একান্ত ইচ্ছা দুর্গাপূজায় শ্রীমা উপস্থিত থাকেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। নাহলে তিনি পূজা করবেন না। সন্তানের আবদার উপেক্ষা করতে পারলেন না শ্রীমা। গিরিশ-ভবনে পূজার কদিনে শ্রীমা গ্রহণ করলেন সকলের ভক্তির অঞ্জলি। সন্ধিপূজার প্রাক্কালে শ্রীমা অসুস্থ। আসতে পারবেন না। গিরিশ দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু সন্ধিপূজার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গিরিশভবনে উপস্থিত শ্রীমা। সার্থক হলো গিরিশের মহাপূজা। আনন্দে মাতোয়ারা সকলকে গিরিশ বলে বেড়াতে লাগলেন: "আমি ভেবেছিলুম আমার পূজোই হলো না—এমন সময় মা দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন, 'আমি এসেছি'। গিরিশের দুর্গাপূজা ও শ্রীমা-পূজা একাকার হয়ে গেল। গিরিশের মা সারদা।

শ্রীমায়ের লীলাপার্ষদ ও লীলাসহায়িকাদের মা ছিলেন সারদা—এতো সকলের জানা। প্রাচীন ভারতের প্রতীক গোপালের মা। বাৎসল্যভাবের সাধিকা তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করেন গোপালরূপে। শ্রীমা ছাড়া তাঁর গোপাল কিন্তু অপূর্ণ। বলতেন: "তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না।" গোপালের মার কাছে শ্রীমা হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া। গোপালের মার অন্তিম সময়। শ্রীমা দেখতে এসেছেন। তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, "গোপাল এসেছ?... আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।" শ্রীমা গোপালের মায়ের মাথা তুলে নিলেন কোলে। গোপালের মা হাত দিয়ে শ্রীমায়ের পাদস্পর্শ করবার চেষ্টা করছেন। সেবিকা বুঝতে পেরে শ্রীমায়ের পদধূলি দিলেন গোপালের মার মাথায়। গোপালের মার ইষ্ট গোপাল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সব এক হয়ে গেল—সব অভেদ। গৌরী-মা—শ্রীমায়ের 'গৌরদাসী' তাঁর সঙ্গিনী ও সখী। গৌরী-মার দৃষ্টিতে শ্রীমা 'জ্যান্ত জগদম্বা', 'স্বয়ং লক্ষ্মী', 'মা

রী'। শ্রীমায়ের নামেই গৌরী মা প্রতিষ্ঠা করলেন সীমিত দের আশ্রম—"শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম।" হইতে ায়ের সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছরের সঙ্গিনী ও সেবিকা যথার্থ গোলাপ-মা। শ্রীমায়ের 'জয়া'। শ্রীমায়ের সংসারের কর্ত্রী। গোলাপ-মা শ্রীমাকে পূজা করতেন ইহকালের মুক্তিদাত্রী মহামায়ারূপে। প্রচার করতেন শ্রীমায়ের সীতারূপে আবির্ভাবের। শ্রীমায়ের অপর সঙ্গিনী যোগীন-মা। শ্রীমায়ের 'বিজয়া'। তাঁরও উপলব্ধি—শ্রীমা একাধারে জননী ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহামায়া।

শ্রীমা সারদা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘজননী। দক্ষিণেশ্বরে ভবিষ্যতের ত্যাগী বালক ভক্তদের ভূরি-ভোজনের অনুযোগ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্থাপন করলে মাতৃস্নেহে আপ্লুতা শ্রীমার স্পষ্ট উক্তি: "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর ভাবী সংঘের ভার শ্রীমা স্বয়ং নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণই নির্বাচন করে-ছিলেন শ্রীমাকে সংঘজননী হিসাবে। আর স্বামীজী শ্রীমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন 'সংঘ-জননী' রূপে। বলেছিলেন: "আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি (শ্রীমা) তার রক্ষাকর্ত্রী, পালন-কারিণী, তিনি আমাদের সংঘজননী।" শ্রীমায়ের প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমায়ের অসীম মাতৃস্নেহ ও সংঘপ্রীতি। সংঘের মহিমা ও সম্ভাবনায় তিনি ছিলেন দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁর ইচ্ছাই ছিল শেষ কথা। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে সকলেই ছিলেন শ্রীমায়ের আদেশপালনে সদা তৎপর। স্বামীজী মঠ থেকে চাকরকে তাড়িয়েছেন। সে গিয়ে হাজির বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে। শ্রীমায়ের আদেশে বাবুরাম মহারাজ তাকে নিয়ে গেলেন মঠে। শ্রীমায়ের আদেশ মাথা পেতে নিলেন স্বামীজী। শ্রীমায়ের অনিচ্ছায় প্লেগ সেবাকার্যের সময় স্বামীজী মঠ বিক্রি করতে পারলেন না। শ্রীমায়ের অনুমতিতে মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা করলেন স্বামীজী। কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষকে 'পেঁচোয়া বুদ্ধি' চালাতে মানা করেছেন শ্রীমা। ভালবাসতে বলছেন কর্মীদের। বলছেন, ভালবাসাতেই 'তাঁর' সংঘ গড়ে উঠেছে। ত্যাগী ছেলেদের সন্ন্যাস দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন: "এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড়ে, পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" কোন সন্ন্যাসী স্বামীজীর কর্ম-যোগের প্রতি অনীহা প্রকাশ করলে শ্রীমায়ের সুস্পষ্ট অভিমত: "ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন, তেমনি চলবে। মঠ এমনি ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না, তারা চলে যাবে।" জনৈক আশ্রমাধ্যক্ষকে বলছেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত রাখতে। দুর্গাপূজার সময় সেবককে বলছেন তাঁর সকল জানা-অজানা সন্তানদের নাম করে পায়ে অঞ্জলি দিতে। কার্তিক মাসে তপস্যায় উদ্যত সন্তানকে মাতৃস্নেহে অনুমতি দিচ্ছেন না শ্রীমা। বললেন, এই মাসে যমের চার দুয়ার খোলা থাকে। কেমন করে তিনি সন্তানকে বাইরে যেতে অনুমতি দেবেন। একজন সন্ন্যাসীকে সংঘত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে। শ্রীমা তাঁকে অভয় দিচ্ছেন: "মা কি কখনও ভুলতে পারে? জেন, আমি সব সময় তোমার কাছে আছি। কোন ভয় নেই।" সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি শ্রীমার সতর্ক দৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন: "অসুস্থ হয়েছ বলে গৃহস্থ বাড়িতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ।" প্রয়োজনবোধে শ্রীমা কঠোরও হতেন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রতি। সংঘের সর্বদিকের উন্নতিতে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান ও জয়রামবাটীতে তাঁর নিজের জন্মস্থান বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরের ব্যবস্থা শ্রীমা-ই করেছিলেন। শ্রীমা একটি সংশয় নিরসন করে দিয়েছেন সংঘের ধর্মসাধনার। একটি চিঠিতে শ্রীমা লিখেছেন: "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।" শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সংঘের চালক ছিলেন শ্রীমা।

সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলের প্রতি সমান স্নেহ-ভালবাসা শ্রীমায়ের। যাঁরা তাঁর দীক্ষিত নন, তাঁরাও অনুভব করেছেন শ্রীমায়ের ভালবাসা। শ্রীমা সন্ন্যাসীদেরও মা। আবার তিনি গৃহীদেরও মা। সব সন্তানের সকল আবদার রাখতেন শ্রীমা। সন্তানদের

রুচি অনুযায়ী খাওয়াতেন। যিনি যা চান, সেভাবে শ্রীমা পূরণ করেন তাঁদের ইচ্ছা। তিনি সকলের মা। সকলেরই অনুভব—শ্রীমা তাঁকে আন্তরিকভাবে বেশি স্নেহ করেন। শ্রীমা তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে :

"হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখ। এ সংসারে বড় দুঃখ কষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।"

"ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখ, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই কোরো।" ছেলেদের প্রতি এত স্নেহ যে শ্রীমা নিজের জন্মদিনেও শত অনুরোধ সত্ত্বেও আগে খেতে পারতেন না। বলতেন শ্রীমা,"ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার নিচে যায় না।" দীক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোন জাত বিচার নেই। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, কুলি, বাগদী, মূর্খ, পণ্ডিত, খ্রীস্টান, পার্শী —সকলের জন্য তাঁর ছিল অবারিত দ্বার।

সন্ন্যাসী সন্তানরা পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের অহৈতুকী স্নেহ-ভালবাসা। স্বামী বিরজানন্দের মনে হয়েছিল : "এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মা-ও বাসিতে পারেন? বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসিতাম, তিনিও কত ভালবাসিতেন; কিন্তু এযে জন্মজন্মান্তরের, চিরকালের আপনার মা!" সন্ন্যাসী সন্তানদের এঁটো পরিষ্কার করছেন শ্রীমা। কেউ অনুযোগ করলে শ্রীমায়ের সহজ-সরল উত্তর: 'আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?" শ্রীমা কোয়ালপাড়ায়। জয়রামবাটীতে জনৈক ব্রহ্মচারী অসুস্থ। তিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। শ্রীমা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। পাছে শ্রীমায়ের ভগবতী তনুতে রোগ সংক্রামিত হয়, তিনি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন সঙ্কোচে। শ্রীমা তাঁকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলোতে বললেন। তখন শ্রীমায়ের মন শান্ত হলো। শ্রীমায়ের স্নেহে বিগলিত ব্রহ্মচারী। শ্রীমা কখনও সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকতেন না। বলতেন : "আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।" জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমাকে, কেমনভাবে দেখেন তিনি তাঁদের? শ্রীমায়ের উত্তর : "নারায়ণভাবেও দেখি, সন্তানভাবেও দেখি।" শ্রীমায়ের সেবক স্বামী অরূপানন্দের প্রশ্ন ছিল, "তুমি কি সকলের মা?" শ্রীমায়ের সুস্পষ্ট উত্তর—'হ্যাঁ'। সন্ন্যাসীদের মা শ্রীমা সারদা।

এক গৃহী ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করছেন : "আমি জানতে চাই তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কিনা?" শ্রীমায়ের উত্তর : "আপনার মা নয় তো কি? আপনারই মা।" গৃহীদের আপন মা সারদা। জনৈক ভক্তের জননী শ্রীমাকে খোঁটা দিচ্ছেন তাঁর ছেলের খাওয়া নিয়ে। অমনি বলে উঠলেন শ্রীমা : "আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারী রমণী; আমার ছেলেদেরকে আমি যা খেতে দিই, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।" কোন স্ত্রীভক্ত গরমে শ্রীমায়ের কাছে এসেছেন, শ্রীমা নিজের শ্রীহস্তে তাঁকে হাওয়া করছেন পাখা দিয়ে। এক অব্রাহ্মণ ভক্তমহিলা রান্না করে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এসেছে। কেউ বললেন, 'তুমি তো চাও, তাই আনে।" উত্তরে শ্রীমা বলতেন, "তা ওদের কাছে চাইব না?—আমার মেয়ে।" নোংরা করে দিয়েছে কোন ভক্তমেয়ের ছোট মেয়ে। শ্রীমা নিজেই পরিষ্কার করছেন। আর বলছেন প্রাণস্পর্শী ভাষায়—"কেন ধোব না? ও কি আমার পর।" জনৈক ভক্তের অসৎ আচরণের জন্য কেউ শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—সেই ভক্তটি যেন না আসেন জয়রামবাটীতে। শ্রীমায়ের ঝটিতি উত্তর—"তা হবে না।" কোন যুবক-ভক্তের চরিত্রে লিপ্ত হয়েছে কালিমা। সকলেই শ্রীমাকে বলছেন জয়রামবাটীতে আসতে নিষেধ করতে। শ্রীমা দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন : "মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।" প্রবল দুর্যোগে ভক্তেরা বাড়ি যাচ্ছেন। তাঁদের কল্যাণের জন্য শ্রীমায়ের আকুল প্রার্থনা : "দোহাই ঠাকুর, একটু মুখ তুলে চাও, আমার বাছাকে রক্ষা কর।" কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাওয়া নিয়ে ভক্তদের মধ্যে ঝগড়া। যোগোদ্যান-কর্তৃপক্ষ (যোগোদ্যান তখন বেলুড় মঠের অধীনে আসেনি) আমন্ত্রণ করেছেন শ্রীমাকে। শ্রীমা-ও গেলেন সেখানে। কোন ভক্ত এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলে শ্রীমা বললেন : "তোমাদের ঝগড়া, বাপু, আমি কি ওদের মা নই?" জনৈক ভক্ত অশৌচ অবস্থায় শ্রীমায়ের নির্দেশ চাইলেন খাওয়া সম্বন্ধে। শ্রীমার স্নেহসিক্ত নির্দেশ—"তাতে দোষ কি বাবা? আমিও তো মা! আমি দিচ্ছি। এখানে কোন দোষ নেই।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স যখন পঁচিশ-ছাব্বিশ তখন তিনি দিব্যোন্মাদে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা হলেন উৎকণ্ঠিত। তাদের আশংকা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। এই সংশয় ও সংকটের মুখে দৈবাদিষ্ট হয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিধাতৃনির্দিষ্ট একটি ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্য-তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন পরমাসুন্দরী এবং অসামান্যা বিদুষী। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। নাম যজ্ঞেশ্বরী বা যোগেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন "যোগমায়ার অংশসম্ভূতা।" শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে "বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।"[১] ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) নিবাসিনী। কিন্তু কোন্ কুল তিনি ধন্য করেছিলেন, তাঁর পিতামাতা কে ছিলেন, তাঁদের বসতি কোথায় ছিল, কার কাছে তিনি নানা শাস্ত্র ও সাধনায় অসামান্য পারদর্শিতা-লাভ করেছিলেন এবং কখন কোন্ বয়সে কার অপ্রতি-রোধ্য প্রভাবে সন্ন্যাস-ব্রত অঙ্গীকার করেন তার কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত সম্মিলন ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। দেখিতে পাই, ঐ সময় হইতেই তিনি শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে যেমন দৃঢ় ও দ্রুতপদে অগ্রসর, তেমনি আবার তাঁহাতে গুরুভাবের বিশেষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ।"[২] ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের গতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হতো তা অনুমান করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'অনেক বৎসর' অবস্থান করে তাঁকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর সাধন শিক্ষা দেন, নানাপ্রকার যোগসাধন শেখান—তিনি "এই বেগবতী ধর্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে যেন পরি-চালিত ও প্রণালীবদ্ধ করিলেন।"[৩]

প্রথম দর্শনেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন—উভয়ের মধ্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো মাতা-পুত্রের সুমধুর অকৃত্রিম সম্বন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী আনন্দ ও আবেগে অভিভূতা হয়ে পড়লেন এবং সজল নয়নে বললেন: "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ। তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে বসে বালক যেমন অন্তরের কথা মাতার নিকট প্রকাশ করে, সেইরূপ নিজের অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজগৎ লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি শারীরিক বিকার প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনু-ভূতির কথা বলতে বলতে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: "হ্যাগো, আমার এসব কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম?" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে তাঁকে বললেন: "তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? সেইজন্যই এই প্রকার বলে।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় ৮ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৩৯১

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ (১৩২৫), পৃঃ ৪

৩ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯২

ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারানীর; ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।"[৪] স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন: "বৎস, তোমার মতো উন্মত্ততা যাহার আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র বিশ্বই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য। সে-ই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ মানুষ বড়ই দুর্লভ।"[৫]

পরম বিস্ময়ের কথা এই যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণীই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পুত্রসম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করেন—"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।" ভৈরবী সর্বপ্রথম বিদগ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সপ্রমাণ করেন।

মাতৃসমা ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে এই অবতারই আবার তাঁর সাধনমার্গে ভৈরবীকে গুরুরূপে বরণ করেন। ঘটনা অভূতপূর্ব। তাৎপর্য নিগূঢ়। স্ত্রী-গুরু গ্রহণ রামকৃষ্ণাবতারের বিরল বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী-গুরু গ্রহণের তাৎপর্য যে কি তা নির্দেশ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন: "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রী-গুরু' গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।"[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিরাট অবদান অবিস্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অধ্যাত্মসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছ থেকেই 'প্রথম সহায়তা' লাভ করেন এবং তাঁর অপরিমেয় সহায়তার ফলে যুবক রামকৃষ্ণের "হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ" হয়। এ-কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণীই শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে চৌষট্টিখানা তন্ত্রশাস্ত্রে যেসব সাধন গুহ্যায়িত, সেই সব সুকঠিন সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাবের সাধনার সময়ও ভৈরবীর কাছে তিনি অকৃপণ ও অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছিলেন।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আকর্ষণে দৈব-প্রেরিত সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধানে কতদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছিলেন, তা নিয়ে নানা মহলে নানা সংশয় আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'অনেক বৎসর' ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বলেন: "ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গা-ঘাট—যথা দেবমণ্ডল ঘাট প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি।"[৭] স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের "ধর্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে যেন পরিচালিত ও প্রণালী-বদ্ধ" করেন। এর পরে আসেন তোতাপুরী। তোতাপুরী কয়েক মাস শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে তাঁকে বেদান্ত শিক্ষা দান করেন এবং সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে চলে যান। ভৈরবী ব্রাহ্মণী "ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।'[৮] এই উক্তি হতে মনে হবে, তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করবার পূর্বে বা অব্যবহিত পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর হতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তোতা-পুরীর অবস্থানকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকেই জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় এই সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলেছে 'আরে,

৪ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব (১৩২০), পৃঃ ১৮৪-১৮৫
৫ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯২
৬ ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ১৯৮-১৯৯
৭ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ (১৩২৯), পৃঃ ২৪৯
৮ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯২

এ কেয়ারে'। পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও।' ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল—আমি সেই অবস্থায় বললাম, বেদান্তবোধ না হলে তোমার যাবার যো নেই। তখন রাতদিন তার কাছে কেবল বেদান্ত। বামনী (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) বলত, 'বাবা বেদান্ত শুনো না। ওতে ভক্তির হানি হবে'।"[৯] স্বামী সারদানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনায় ব্রতী হন তখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরস্ত করতে বিশেষ প্রয়াস করেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ "ওর (তোতাপুরীর) কাছে বেশি যাওয়া-আসা করো না। বেশি মেশামেশি করো না ; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাবপ্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথায় কর্ণপাত করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি এবার এসেছিলেন ছদ্মবেশে 'গুপ্তভাবে'। তাই সন্ন্যাসগ্রহণ করেও তিনি সংসার ত্যাগ করেননি, পত্নীকে পরিত্যাগ করেননি, গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেননি এবং তোতাপুরীর নিকট থেকে সন্ন্যাসগ্রহণের কথা স্বীয় গর্ভধারিণী মাতার মতো ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছেও গোপন রেখেছিলেন।[১০]

ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। প্রশ্ন হলো, ভৈরবী ব্রাহ্মণী আনুমানিক কত বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। এই সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দের পরস্পরবিরোধী দুটি উক্তি পাওয়া যায়। স্বামী সারদানন্দ এক জায়গায় লিখেছেন, 'ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার (ঠাকুরের) নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১১] অন্যত্র লিখেছেনঃ "তিনি (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখনো কখনো ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে পর্যন্ত যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যেও বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।"[১২] পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেছিলেন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে। সুতরাং ভৈরবী ব্রাহ্মণী যদি ছয় বৎসর দক্ষিণেশ্বরে বাস করে থাকেন তাহলে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে এবং যদি তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায় দ্বাদশবর্ষ থেকে থাকেন, তাহলে তিনি দক্ষিণেশ্বর হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৬৭ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রাদি বিষয়ে সংস্কার মান্য করতেন। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি পৌষমাসে প্রত্যাবর্তন করেননি। প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মাঘ মাসে—১৫ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি রানী রাসমণির দেহরক্ষা হয়। রানী রাসমণির দেহাবসানের কিছুদিন পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন।[১৩] সুতরাং স্বীকার করতে হবে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারির অল্প কিছুদিন পরে। শ্রীম লিখেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।[১৪] কিন্তু তা যে ঠিক নয় স্বামী সারদানন্দের লেখা থেকে তা বোঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেনঃ 'সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রানী রাসমণির দেহরক্ষার পর ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয় (১৯৮৬), পৃঃ ১০০৬

১০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৬২-২৬৩

১১ ঐ, সাধকভাব, পৃঃ ৩১৬

১২ ঐ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৫০

১৩ ঐ, সাধকভাব, পৃঃ ১৭৭-১৮৪

১৪ কথামৃত, পৃঃ ৪

করিয়াছিলেন। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"[১৫] দেখা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা চলেছিল ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুবছর। এরপরে আরম্ভ হয় বৈষ্ণব সাধনা। বৈষ্ণব সাধনা সমাপ্ত হবার পরে মহাত্মা তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। স্বামী সারদানন্দের তথ্যানুসারে তোতাপুরী সম্ভবতঃ ১২৭১ সালের শেষভাগে অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেন। তোতাপুরী প্রায় ১১ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন অর্থাৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত অথবা ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগ পর্যন্ত।[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৭৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন, ১৮৬৭) কামারপুকুর গমন করেন। সঙ্গে গিয়েছিলেন ভাগিনেয় হৃদয় এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তিনি অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর—ডিসেম্বর, ১৮৬৭) দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন। কামারপুকুরে অবস্থানকালে আত্মাভিমানবশতঃ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর ভ্রম উপলব্ধি করেন। "অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে এক দিবস তিনি (ভৈরবী) ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচর্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত হইয়া মন-প্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ ধরিলেন।"[১৭] বুঝতে পারা গেল, ভৈরবী ব্রাহ্মণী কাশীধাম যাত্রা করেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে।

কামারপুকুর হতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের স্বল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগে—১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করেন। স্বামী সারদানন্দের মতে, সঙ্গে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক মথুরবাবু, ভাগিনেয় হৃদয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননী। বৃদ্ধা জননী সঙ্গে গিয়েছিলেন কিনা এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দের সংশয় ছিল। পাদটীকায় তিনি লিখেছেন: "কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিলেন।"[১৮] সন্দেহ নেই স্বামী সারদানন্দ হৃদয়ের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছেন। স্বামী সারদানন্দকে অনুসরণ করেই সম্ভবতঃ 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৯৮৬) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা জননী চন্দ্রমণিদেবী তীর্থে গিয়েছিলেন (পৃঃ ৯২৯)। এই প্রসঙ্গে কথামৃতকার শ্রীমর বক্তব্য আমাদের মনোযোগ দাবি করে। শ্রীম কথামৃতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমবারের তীর্থযাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর জননী গিয়েছিলেন—হৃদয় যাননি। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় যাত্রায় সঙ্গে ছিলেন হৃদয়। সেবার চন্দ্রাদেবী সঙ্গে যাননি।[১৯] স্বামী সারদানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রায় চন্দ্রাদেবীর যাওয়ার ব্যাপারে অন্যমত শুনেছিলেন তখন মনে হয় বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তীর্থে যে রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রাদেবী যাননি এবং দক্ষিণেশ্বরে নহবতে ছিলেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিক উক্তি হতেই সপ্রমাণ হয়। এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো:

(ক) "গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে বলত—ইনি সাক্ষাৎ রাধা-দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় 'দুলালী' বলে ডাকত। তাকে পেলে আমার খাওয়া-দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক এক দিন বাসা

১৫ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ২১২
১৬ ঐ, পৃঃ ২৭৭
১৭ ঐ, পৃঃ ৩১৫-৩১৬
১৮ ঐ, পৃঃ ৩১৭
১৯ কথামৃত, পৃঃ ৪-

থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত—সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত।··· গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিকঠাক।··· হৃদে বললে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে। গঙ্গামায়ী বললে—কেন, আমি দেখব, আমি সেবা করব। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে ; এমন সময় মাকে মনে পড়ল। মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর নবতে। আর থাকা হলো না। তখন বললাম—না, আমায় যেতে হবে।"[২০]

(খ) "মা কি কম জিনিস গা ?··· বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসবার ইচ্ছা হলো না। গঙ্গা-মার কাছে থাকবার কথা হলো। তখন হৃদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গা-মা আরেক দিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা করব, নিশ্চিন্ত হয়ে।"[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ (মে, ১৮৬৮) পর্যন্ত কাশীতে অবস্থান করেন। মাঝে প্রয়াগ ও বৃন্দাবনেও তিনি গিয়েছিলেন। "কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল এবং চৌষাট্টি যোগিনী নামক পল্লীস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন।···শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে··· অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছেলেন।"[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় চার মাস তীর্থ পরিক্রমা করে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে—১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মে-র শেষে অথবা জুনের প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন [২৩] এবং এর অল্পকাল পরেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী পরলোক গমন করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী সম্ভবতঃ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বা তার কিছুকাল পরে দেহরক্ষা করেন।

উপরি উক্ত আলোচনা হতে দেখা গেল, সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে এবং তিনি রামকৃষ্ণের সন্নিধানে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন পর্যন্ত—প্রায় ছয় বৎসর। দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর অবস্থানকালে এবং তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় গ্রহণ করবার পরেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন—১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন পর্যন্ত। তাঁর দেহাবসান হয় আনুমানিক ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রায় 'দ্বাদশবর্ষ' দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছিলেন এই ধারণা ঠিক নয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী আনুমানিক প্রায় ছয় বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছিলেন এ কথাই স্বীকার্য।

২০ কথামৃত, পৃঃ ৮৭-৮৮
২১ ঐ, পৃঃ ৭০৬
২২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৩২০-৩২১
২৩ ঐ, পৃঃ ৩২২



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সৈয়দ মুজতবা আলী

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজো করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সর্বকিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, "কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সর্বকিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।"

"কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকি থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকি থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ' এসবের খবর থাকে না।"

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, "'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।"[১১] আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[১২]

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র 'The Stars are blotted out !'—আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪ ?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

১২ ডগমাটিজম না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে:

'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥'

"আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না,

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার-সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন—জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বারবার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বারবার স্বীকার করা উচিত : যেখানেই যেকোন মানুষ যে-কোন পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন-কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতীপূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এযুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি ? বাংলাদেশে আজ আর কজন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে-পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাংলার কত গুণিজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার-নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি ?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলা-মেশা না থাকলে খ্রীস্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাংলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যেকোন মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টিঃ' হয় ; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে-যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন ? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সেযুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয়নি ? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে ?

এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।"—গম্ভীরানন্দ, চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মতো মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন ; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বারবার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বারবার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, "কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ।" এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নেই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বারবার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি'?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখির মতো, দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞান-মার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যেসব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বারবার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলেই একথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছাতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের কজন বাদ দিলে আর কটি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছাতে পারবে সেবিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরংকুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুধু জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। একথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলব, যে-সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোন মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ-তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

১৪ এবিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, ['কথামৃতে'র] অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্য প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

যে-পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হলো মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব।' কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষজনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পরও কোন কোন মানুষ লোকহিতার্থে এ-সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।" একথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, একথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

*

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মতো পরে 'আল্লা-আল্লা'ও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সেই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে-দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমুলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সবকিছু, আবার যখন 'আল্লা আল্লা' করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোন বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সবকিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ-যুগের হিন্দু সম্বন্ধে একথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান—ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।*

* সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৩১৫-৩২৯

সংগ্রহ: কমলাকান্ত রথ

একটি শিশিরকণার স্বপ্ন

অরুণকুমার বরাট

তুমি কে বলতো ?
পৃথিবীর সব জীবন-প্রদীপের
আবেগ-অনুভূতি আলোর স্পন্দন ?
পৃথিবীর ধূপের সৌরভের উজ্জ্বল মহিমায়
অনন্তকে সুরভিত করার স্বপ্নে
চিরদীপ্যমান নক্ষত্র সুষমা ?
সূর্য-প্রতিশ্রুতি ?
সবার হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা শান্তি ?
মধুময় আনন্দের ব্যাপ্তি ?
তুমি কে বলতো ?
অন্তহীন জীবন-সমুদ্রের হীরা-মুক্তা-দ্যুতি ?
সতত অস্থির মন ও দেহের চঞ্চল প্রবাহে
ব্যতিক্রমী অচঞ্চল আলো ?
তুমি কি বহ্নি ?
ওঁকারের ধ্বনি ?
কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা, বাক্ শ্রী সুধৃতি ?
গায়ত্রী-মহানাম-বেদের ঝংকার ?
সবই কি তোমার মাঝে দীপ্তিময় ?
শুধুমাত্র একটি কণায়
এই সর্ববিশ্ব সতত স্পন্দিত ?
এই অনন্তকে মন বুদ্ধি দিয়ে
কে ধরবে বল ?
তবু কেন এই রূপ কল্পনা ?
শব্দের মালায় ক্ষুদ্র আলিম্পন ?
শিশির হয়ে মহা-সূর্যকে অনুভব করার উচ্ছ্বাস ?
তবু শিশির সূর্যকে অনুভব করতে গিয়ে
তার আলোর উত্তাপে মগ্ন হতে হতে
একদিন শূন্য হয়ে আলোর মাঝেই হারিয়ে যাওয়া।
সেই কি জীবনের চরম প্রেয় অথবা শ্রেয় ?
তবু এই জীবন-শিশির
সূর্যে লীন হতে চায় না।
সূর্য-সুরভিত একটি অতি ক্ষুদ্র শিশিরকণা হয়ে
তোমার অনন্তে চিরদীপ্ত হতে চায়।

দূরে, বহু দূরে

সঞ্জীব কাঞ্জিলাল

তোমাদের মাঝে—
বহুকাল করিয়াছি বাস
তবু, তোমাদের জানিবার অবকাশ
পাই নাই কভু। গিরিশৃঙ্গের ন্যায়
তুলিয়া আপন শির গগনতলায়
অহর্নিশি রহিয়াছি ব্যস্ত উপচারে,
আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যর্থ অহংকারে।

যতবার ডাকিয়াছ পাশে আসি—
"ওঠ, ওঠ আজি, দাঁড়া দেখি পাশাপাশি
হাতে হাত রেখে, পায়ে রেখে পা
চল সেরে ফেলি কাজ, করণীয় যা।
ঘরে ঘরে ফিরে, মা-ভাই-বোনে ডেকে
বল—'তোমাদের সাথে জন্মজন্মান্তর থেকে
সংসারের বিরামহীন স্রোতে আমি
ছুটে চলেছি দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমি।
সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় ভাগাভাগি
করি, দানিব আমি মানবের লাগি
আপনারে। ছিন্নবৃন্ত জবাটির মতো
মানুষের পদতলে লুটাব অবনত।'"

কিন্তু, হায় এ-জীবনে—
পারিনি তো বলিতে কভু মনে
চিরদিনই আপনার অন্ধকার কোণে
ফিরিয়াছি ঘুরি। বর্ষ বর্ষ ধরি
জীবন্ত আমি রহিয়াছি মরি।
তোমাদের কোন আহ্বানে, মোর—
হৃদয় কোনদিনই দেয়নি উত্তর।
তোমা হতে মোরে, হীনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে
রাখিয়াছে চিরদিন দূরে, বহুদূরে।

অনন্ত পথ আসার পর

কঙ্কাবতী মিত্র

অনন্ত পথ ঘাসের বুকে পা রেখে এসে দেখি
সামনে শুধু অনন্ত বিস্তৃত কাঁটার ঝোপ।
রুক্ষ শুষ্ক কী ভয়ঙ্কর কঠিন!
কোমলের স্পর্শ তবু চোখে পড়ে না আমার
আমি স্তব্ধ হই, থমকে যাই
নির্জীব নির্লিপ্ত অকরুণ দৃষ্টি নিয়ে একবার
তোমাকে মনে করে এগিয়ে যাই।
কিছু পথ আসার পর ফিরে এসে দেখি
এ তো ঝোপ নয়, কাঁটা নয়,
এ তো তোমারই দেওয়া পথ।
তোমারই সৃষ্টির এক অন্য রসে
এ যে কাঁটা নয়,
শুধু রুক্ষ কিছু ঘাস।

সাহারার আকাশে ফোটাই

নিভা দে

এমন অনিকেত মানুষ কখনো হয়নি আগে।
যেন সাহারায় পথ হাঁটা দিবানিশি—
চারদিকে শুধু ধুলো, ধোঁয়া আর বালি
কী করে যে ভেঙে গেল রম্য বাসভূমি!
ভেঙে যায় এভাবেই বুঝি—এভাবেই
সব কালে কালে!
স্নায়ুতে স্নায়ুতে হাহাকার—দুরন্ত খরা—
ভিতরে ও বাইরে—অনিঃশেষ দহন।
ভীষণ দুরন্ত ইচ্ছা তাই মাথার ভিতরে
জেগে ওঠে—
সাহারার আকাশে ফোটাই অজস্র মেঘের পদ্ম
মাটিতে পুঁতে দিই গোপন প্রেমের যত অভিলাষ
চারদিগন্ত জুড়ে শান্তির শ্বেত পারাবত
উড়ুক শুধু ডানায় দীঘল শব্দ মেলে মেলে।
এইভাবে গড়ে তুলি আর এক অলকাপুরী
আর এক মানস সরোবর তীরে।

জীবন

জয়নাল আবেদীন

চেয়ে থাকি নীরব নিঃসঙ্গ বুকে
একরাশ ভাষা নিয়ে চেয়ে থাকি,
উড়ে যায় স্বপ্নে মোড়া আনন্দ, নিথর ভালবাসা।
উড়ে যায় পাখি।
ভয়ে থাকি
কি কোমল প্রতিক্রিয়া ঘটে গেছে।
ভয়ে থাকি তাই।
সয়ে আছি
কাউকে বলি না, সয়ে আছি,
গুপ্ত কষ্ট নিজে পাই।
ডাক দেয়
মাথার ওপর চিল, ডাক দেয় যুদ্ধ মাথায় রাত,
চেয়ে থাকি
খেয়াল রাখেন, রাখেন খেয়াল শনি বৃহস্পতি।
আমি জানি নরম বুকের নিচে
নেই আমার নেই নেই উমেল হৃদয়
শুধু শুধু কঠিন কর্কশ পিণ্ড
পাথরের, সদ্য ফোটা স্থলপদ্ম নয়।
দিয়ে দাও
তোমার যা আছে তা, আমাকে না—পাঁচজনকে দিয়ে
নাচ গাও
উপভোগ কর, নিজের জীবন ধর
আগুন ও ঘিয়ে।

অনন্ত যেখানে ভেঙে

শান্তিকুমার ঘোষ

দিনান্তের অভ্র মেশে নিরঞ্জনা তীরে
দূরে জমাট ব্রহ্মজ্ঞানী পাহাড়…
কেবল অখণ্ড গরিমা অশ্বত্থমূলে
আমি কি পারব ছায়া-ছদ্মবেশ ছিঁড়ে
মিশে যেতে অবিকার শূন্যের শূন্যে,
অনন্ত যেখানে ভেঙে সহস্রধারায়
আনন্দে নেমে যায় আপন উৎসে?

প্রবন্ধ

বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

তপোব্রত সান্যাল

বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যায় কূটাভাস রয়েছে, এমন ধারণা শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশের মধ্যেই বদ্ধমূল। ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই বিরোধের উৎস। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের সমর্থনে যেসব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে যতটা আবেগ, শাসন ও স্বতঃশ্রদ্ধার ভাব থাকে, ততটা যুক্তি থাকে না। ফলে, এইসব ধর্মের অন্তরালে অবাঞ্ছিত মৌলবাদ প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় লাভ করে। আসলে প্রত্যেক ধর্মেরই একটা দার্শনিক আধার থাকে যাকে আশ্রয় করে সেই ধর্মমত গড়ে ওঠে। সাধারণজন ধর্মের বহিরাবরণটিকেই দেখেন, এর আত্মা-রূপী 'দর্শন'কে দর্শন করতে চান না বা পারেন না। অন্যদিকে, জড়বিজ্ঞান যুক্তি ও প্রমাণের দৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবেগ বা কল্পনার স্থান জড়-বিজ্ঞানে নেই। অভিজ্ঞতালব্ধ বা পরীক্ষানির্ণীত ঘটনার নৈর্ব্যক্তিক, যথাযথ ও আনুপূর্বিক বর্ণনা এবং তা থেকে কোন তত্ত্বের উপস্থাপনা হলো সাধারণ-ভাবে জড়বিজ্ঞানের কাজ। ঘটনাপরম্পরার প্রতি অবিচল আনুগত্য, বৈচারিক স্বচ্ছতা ও নিরাবেগ মানসিকতা বিজ্ঞানমনস্কতার অপরিহার্য শর্ত। সভ্যতার প্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করতে চাইছে স্বাভাবিক কারণেই, অপ্রত্যক্ষ ধর্মীয় ধারণা তাকে আর আকর্ষণ করছে না। জড়-বিজ্ঞান যে মানুষকে শারীরিক সুখ এনে দিয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই। স্বাভাবিক কারণেই দুঃখ-জর্জর মানুষ জড়বাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ আমরা এমন একটি ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছি যখন শুধু মানুষের ধর্মীয় ধারণারই পরিবর্তন ঘটছে তা-ই নয়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত নানা ধারণাও উন্মূলিত হতে চলেছে। জড়বিজ্ঞানের—বিশেষ করে ভৌত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের—সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে অভ্রান্ত ইঙ্গিত মিলেছে যে শুধু প্রজ্ঞা নয়, স্বজ্ঞার (intuition) উপযোগও জড়বিজ্ঞানে অপরিহার্য। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান ও ঔপনিষদ দর্শন যেন আজ খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে ভৌত-বিজ্ঞানের বর্তমান অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, বেদান্তদর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

এই শতাব্দীর শুরু থেকে ভৌতবিজ্ঞানের অপ্রতিহত জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মতো অব্যর্থ নিয়মানুবর্তিতায় ঘূর্ণ্যমান (mechanomorphic universe)। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের আবিষ্কার একদিকে যেমন উদ্‌ঘাটিত করে দিল বিশ্বপ্রপঞ্চের রহস্যের রুদ্ধ দ্বার, অন্যদিকে হাইসেনবার্গের তত্ত্ব উন্মোচিত করল অণু-ব্রহ্মাণ্ডের গুহাহিত গুহ্যস্বরূপ। অতিবিস্তারী কবিকল্পনাও আজ সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-ভাবনার কাছে হার মেনেছে। ভাবা যায়, মহাবিশ্বের জন্মলগ্নের ১০-⁴³ সেকেন্ড পরের পরিস্থিতি নিয়ে এখন বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। পরমাণুকে একসময় পদার্থের অবিভাজ্য মৌল উপাদান বলে মানা হতো। আজ সেই পরমাণুকে দুশোরও বেশি উপপরমাণুকণায় বিভাজন করা সম্ভব হয়েছে। ভৌতবিজ্ঞানীরা এইসব উপপরমাণু-কণাকে আর কণা বা particle বলতে চাইছেন না। তাঁদের মতে পরমাণুর এই বিভাজন, উপপরমাণু-কণায় পরমাণুর এই রূপান্তর ঘটনা বা event-এর নামান্তর, গতিময়ী শক্তির পরস্পর-সম্বন্ধিত বিন্যাস ("inter connected patterns of dynamic energy"—ফ্রিটজফ ক্যাপরা)। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব উপপরমাণুকণার স্থায়িত্ব ১০-²³ সেকেন্ডের দুই বা তিন-গুণ মাত্র। এইসব উপপরমাণুকণাকে আবার তরঙ্গ বা wave রূপেও কল্পনা করা হচ্ছে।

আজকের ভৌতবিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির উৎস অনু-সন্ধানে নিরত। বিজ্ঞানীদের মত হলো, এক মহা-বিক্ষোভ বা মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সূত্রপাত। মহাকাশ জুড়ে যুগপৎ ঘটেছিল

এই মহাবিস্ফোরণ একই মুহূর্তে। দেশকালের সম্প্রসারণের সঙ্গে এই মহাবিক্ষোভজাত কণাগুলি কোন এক আশ্চর্য বিকর্ষী শক্তিতে চালিত হয়ে ভীম-বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাকাশের নিঃসীম শূন্যতায়। বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় নিশ্চিত যে, মহাবিস্ফোরণের আদিম মুহূর্তে (এক সেকেন্ডের এক শতাংশ সময় পরে) ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা ছিল দশ হাজার কোটি ডিগ্রী 'সেলসিয়াস'। এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রীণগুলি (nucleus) ভেঙে যাবার কথা। ঐ সময়ে যেসব কণার অস্তিত্ব ছিল, তাদের বলা হচ্ছে মৌলকণা। আধুনিক উচ্চশক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রীণ-সংক্রান্ত গবেষণাগারে এইসব মৌলকণা নিয়ে গবেষণা চলছে। আদি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন পরম বৃহৎ ও চরম ক্ষুদ্রের, ভূমা ও অল্পের এক আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র।

সৃষ্টির আদিম মুহূর্তে শক্তি থেকে উপপরমাণু-গুলির সৃষ্টি ও প্রায় তাৎক্ষণিক বিনাশ ঘটতে থাকে। এইসব উপপরমাণুকণার সংখ্যা তখন নির্দিষ্ট ছিল না। সৃষ্টি ও লয়—এই দুই প্রক্রিয়ার ভারসাম্য থেকেই এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই মহা-বিস্ফোরণের স্মারকরূপে আজও ছড়িয়ে আছে আকাশময় এক ক্ষীণ অস্ফুট বেতার-গুঞ্জন। এই বেতার-গুঞ্জন পরে গবেষণাগারে শক্তিশালী গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়েছে। এর মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে বিশ্বসৃষ্টির তিন মিনিট পরে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ছিল তীব্র আলোকরশ্মি, নিউট্রিনো (neutrino) নামে এক ধরনের ভরহীন, তাড়িত আধানহীন প্রায় অশরীরী কণা ও প্রতি-নিউট্রিনো কণা। একথা আজ স্বীকৃত, মহাবিস্ফো-রণের ফলে সৃষ্ট জ্যোতিষ্কসমূহের বিবর্তন ঘটেছে তাদের আভ্যন্তর উত্তাপজনিত নানা জটিল কেন্দ্রীণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মহাবিক্ষোভে বিশ্লিষ্ট জ্যোতিষ্করা আবার সংহত হয়ে নতুন কোন জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করেছে। তাই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেছেন যে, আমরা সকলেই জ্যোতিষ্করেণুর (stardust) সৃষ্টি।

মহাবিস্ফোরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনো অপ্রতর্ক্য নয়। সৃষ্টির প্রত্যন্ত প্রত্যূষে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের এক শতাংশ সময়ের মধ্যে কি ঘটেছিল, সে-সম্বন্ধে অস্পষ্টতা আজও কাটেনি। এক মুহূর্তে যুগপৎ হঠাৎ সর্বকিছু কেন সৃষ্টি হলো, তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলেনি আজও। কেমন ছিল এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মহাবিস্ফোরণের প্রাক্‌কালে তা আজও স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে এটা ঠিক যে, মহাবিক্ষোভের পূর্বমুহূর্তে বিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম। সে-অবস্থায় আইনস্টাইনের বিশ্বতত্ত্বের সূত্রগুলি প্রযোজ্য হয় না। বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা—কি পরিণতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের? কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা? সম্প্রসারণশীলতা প্রতিরুদ্ধ হলে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হতে থাকবে শীতলতর, আরও নিষ্প্রাণ, আরও শূন্যগর্ভ?

সত্য কথা বলতে কি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টির মূল রহস্য আজও বিজ্ঞানীদের কাছে স্বচ্ছ নয়। অণু-ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণু ও উপপরমাণুকণাসমূহের গতি-প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রপঞ্চে কৃষ্ণগহ্বরের (black holes) অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবাচ্ছে। একথা আজ স্বীকৃত যে, মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা ছিল বহু লক্ষ কোটি 'কেলভিন'।[১] অধুনা আবিষ্কৃত উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণাত্বরণযন্ত্রে (particle accelerators) ঐ প্রচণ্ড তাপ, অতি অল্পক্ষণের জন্য হলেও, সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই ত্বরণযন্ত্রে মৌলকণাদের মধ্যে প্রবল সংঘাত ঘটিয়ে তাদের অবশেষ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, শক্তি যতই বাড়ানো যায়, মৌলকণাগুলির গঠন ও প্রকৃতির প্রভেদ ততই কমে আসে। ঐসব কণার ওপর কার্যকর বলসমূহের পার্থক্যও ক্রমশঃ হ্রাস পায়। প্রকৃতিতে কার্যকর বলের সংখ্যা চারটিঃ (১) মহাকর্ষজনিত বল (gravitational force), (২) তড়িচ্চুম্বকীয় বল (electro-magnetic force), (৩) প্রবল কেন্দ্রীণ-বল (strong nuclear force) ও (৪) ক্ষীণ মিথ-স্ক্রিয় বল (weak inter-action force)। প্রথম দুটি বল আমাদের অতি পরিচিত। প্রবল কেন্দ্রীণ-বল কেন্দ্রীণস্থ উপপরমাণুকণাগুলিকে সংহত করে

১ 'কেলভিন' তাপমাত্রার একক। 'সেলসিয়াস'-এককে তাপমাত্রার সঙ্গে ২৭৩·১৫° যোগ করলে 'কেলভিন'-এককে তাপমাত্রা পাওয়া যাবে।

রাখে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের বিরুদ্ধে। এই বল না থাকলে সৃষ্টি হতো না কেন্দ্রীণের, গঠিত হতো না অণু-পরমাণু, জীবকোষ ও জীব। ক্ষীণ মিথস্ক্রিয় বল তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে উপপরমাণুকণাদের বিচ্ছুরণের জন্য দায়ী। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রে যে-প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয়, তাতেও এই ক্ষীণ বলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই চারটি বলের উৎস অভিন্ন। এই উৎস অন্বেষণেই আজ সারা পৃথিবীর ভৌতপদার্থবিদ্‌রা নিরত।

বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধেয় বিষয় প্রথমে কিন্তু ছিল বিশ্বসৃষ্টির মূলে পদার্থের অবিভাজ্য মৌল উপাদান-এককের আবিষ্কার। আগেই বলা হয়েছে, যে-পরমাণুকে পদার্থের মৌল উপাদান ভাবা হতো, তাকে দুশোরও বেশি উপপরমাণুকণায় বিভাজন সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তে (প্রথম সেকেন্ডের দশ লক্ষ অংশের পরে) তাপমাত্রার প্রচণ্ডতা ও ঘনত্বের প্রাবল্য হেতু নিউট্রন ও প্রোটন কণার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সবকিছু একাকার হয়ে তখন পরিব্যাপ্ত ছিল মহাজাগতিক যূষে (Cosmic soup)। এই যূষের মূলে উপাদানের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়ার্ক-গ্লুঅন-প্লাজমা (Quark gluon-plasma)। কোয়ার্ক ও গ্লুঅন প্রায় সব কেন্দ্রীণগত পদার্থের মৌল উপাদান। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে মারে গেলমান ও জর্জ জোয়াইগ এই কোয়ার্ক মডেলের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কোয়ার্ক শব্দটি তাঁরা চয়ন করেন জেমস জয়েসের 'ফিনিগানস ওয়েক' ('Finnegan's Wake')-শীর্ষক রচনা থেকে যার "Three quarks for muster mark"—এই উক্তিটি ঐ নামকরণের প্রেরণা। যা হোক, তাঁদের অভিমত, ফোটন ও লেপটন কণারা ছাড়া (অর্থাৎ ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনো কণা) বাকি সব কিছুই কোয়ার্ক ও প্রতি-কোয়ার্ক-কণা দিয়ে তৈরি। কোয়ার্ক-কণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর তাড়িত আধান ইলেকট্রনের আধানের ভগ্নাংশরূপে থাকে ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ ইত্যাদি), গুণিতকরূপে নয়। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এরা সবসময়ে যূথবদ্ধ হয়ে নিউট্রন-প্রোটন-রূপে থাকে। বিজ্ঞানীদের অস্বস্তি, কোয়ার্ক-কণাদের এখনো পর্যন্ত মুক্ত ও একক অবস্থায় ধরা যায়নি। এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক নাম—কোয়ার্ক-অবরোধন সমস্যা (Quark confinement problem)। এ-সমস্যার গ্রন্থিমোচন আজও সম্ভব হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে যে মহাবিস্ফোভের এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ অংশ সময় পরে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আস্তীর্ণ ছিল মহাজাগতিক যূষ। তার আগে তাপমাত্রা ছিল যখন প্ল্যাঙ্ক-মানের সমান (10^{32} ডিগ্রী), তখন সবই ছিল এক অজ্ঞাত অবস্থায়। বিজ্ঞানীদের অতি-সাম্প্রতিক অনুমান, চরম প্রলয়ের অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড ছিল দশমাত্রাবিশিষ্ট এবং এই দশমাত্রিক ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করেছিল সূত্রপ্রতিম কিছু মৌল পদার্থ (Strings দেশ-কাল-পদার্থের ভেদরেখা তখন ছিল অস্পষ্ট ও অবোধ্য। যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞানীরা পদার্থের মৌল উপাদান অন্বেষণ করতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। এজন্য অনাপ্ত মৌল উপাদানের পেছনে অন্তহীন অন্বেষার চেয়ে প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল চারটি বলের উৎস-সন্ধান সহজতর ও যুক্তিবহ—একথা অনেক বিজ্ঞানীই আজ বলছেন।

নোবেল-পুরস্কারজয়ী আবদুস সালাম-শেলডন গ্ল্যাশো-স্টিফেনওয়াইনবার্গ প্রমাণ করেছেন, তাপমাত্রা 10^{15} ডিগ্রীতে পৌঁছালে তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও ক্ষীণ মিথস্ক্রিয় বলের প্রভেদের অবলোপ ঘটবে। অর্থাৎ ঐ তাপমাত্রায় এ-দুটি বল একীভূত হয়ে এক অভিন্ন বলে রূপান্তরিত হবে। ঐ তাপমাত্রায় তখন কার্যকর বলের সংখ্যা দাঁড়াবে তিনটি—প্রবল কেন্দ্রীণ বল, মহাকর্ষজনিত বল ও তাড়িত ক্ষীণ বল (electro weak force)। সাম্প্রতিক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, 10^{27} ডিগ্রী তাপমাত্রায় প্রবল কেন্দ্রীণ বল ও তাড়িত ক্ষীণ বলের পার্থক্য অবলুপ্ত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সমন্বয় বা একীভবনকে বলা হচ্ছে পরম সমন্বয়। (grand unification)। অবশেষে তাপমাত্রা প্ল্যাঙ্ক-মানে (10^{32} ডিগ্রী) পৌঁছালে ঘটবে চরম সমন্বয়। কার্যকর চারটি বল তখন এক ও অদ্বিতীয় বলে পর্যবসিত হবে। বিজ্ঞানীদের অন্বেষার অন্ত ঘটবে তখনই।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মৌলিক চারটি বলের সমন্বয়ের সূত্র অনুস্যূত আছে কিছু গাণিতিক প্রতিসাম্যের (symmetry) মধ্যে। কোন বস্তু যত সুষম ও সমঞ্জস, তার গঠন-বৈচিত্র্যও তত কম। বৈচিত্র্যহীন সত্তা থেকে নব নব সৃষ্টির মূলে আছে

এই প্রতিসাম্যের স্বতোবিপর্যয় (spontaneous symmetry breaking)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির মূল কারণও সুষম বিন্যাসের স্বতোনাশ। জ্যামিতিক প্রতিসাম্যের মতই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলীভূত গাণিতিক সৌষম্য—যার নাম দেওয়া হয়েছে মাত্রা সৌষম্য (gauge symmetry)—অল্প তাপে লুপ্ত হয়ে উচ্চতর উষ্ণতায় পূর্বাবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক বলের মধ্যে অনুসংহিত প্রচ্ছন্ন সমঞ্জসতা প্রকট হয়ে বিশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের পুনঃসমন্বয় সম্ভব করে।

বিজ্ঞানীদের কাছে আজ যে-প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো, এই প্রসার্যমান ব্রহ্মাণ্ড কি অনন্তকাল সম্প্রসারিত হতে থাকবে, নাকি আবার সংকুচিত হতে হতে আগের মতো তাপকুণ্ডে পরিণত হবে। ব্রিটিশ লেখক জন গ্রিবিন 'ওমেগা পয়েন্ট' (omega point) নামে এমন এক অবস্থার কথা কল্পনা করেছেন যখন প্রসারণ নিবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সংকোচনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে। এই 'ওমেগা পয়েন্ট' কবে আসবে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। তাঁরা হিসেব করে দেখেছেন, ব্রহ্মাণ্ড-সংকোচনের জন্য যে-পরিমাণ পদার্থ প্রয়োজন, বিশ্বপ্রপঞ্চে দৃশ্যতঃ আছে সেই ন্যূনতম পরিমাণের কুড়ি-শতাংশ মাত্র। তাই তাঁদের অনুমান, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জ ছাড়াও আছে একধরনের তমোময় অদৃশ্য পদার্থ যাদের কোন ভর নেই। এদের নাম দেওয়া হয়েছে অনুদ্দিষ্ট ভরের (missing mass) পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এই ভর-হারা পদার্থের খোঁজে ব্যাপৃত আছেন।

চরম সমন্বয় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর এক ধরনের কণার অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। এদের বলা হয় 'মনোপোল' (monopole)। মনে করা হচ্ছে, পরম সমন্বয়ের সময়ে (যখন তাপমাত্রা ১০^{২৭} ডিগ্রী) এই মনোপোলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তারপর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (১০$^{-৩২}$ সেকেন্ডের মধ্যে) ব্রহ্মাণ্ডের অপ্রত্যাশিত বিপুল স্ফীতি (inflation) ঘটে। এই অকস্মাৎ স্ফীতির ফলে মনোপোল-গুলির ঘনত্ব এতই কমে যায় যে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্রহ্মাণ্ডের এই আকস্মিক প্রচণ্ড স্ফীতির অনুমান ছাড়া অনুদ্দিষ্ট ভরের পদার্থও হারিয়ে যাওয়া মনোপোল-এ দুয়ের সমস্যা সমাধান করা কঠিন।

এই স্ফীতির অনেক ব্যাখ্যা এ-পর্যন্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, প্রাক্-প্রসারণ সময়ে ব্রহ্মাণ্ড ছিল সুষম ও সমঞ্জস, দেশ ছিল নির্বিশেষ, সমসত্ত্বসম্পন্ন (homogeneous), দিক-নিরপেক্ষ (isotropic), কাল ছিল নিবর্তনসাধ্য (reversible) অর্থাৎ ভূত থেকে ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ থেকে ভূতের ছিল নির্বাধ সংযোগ। স্ফীতির ফলে এই প্রতিসাম্যের ঘটে প্রথম ব্যত্যয়। শূন্যগর্ভ দেশ তখন ব্যাপ্ত হলো কোটি কোটি মৌল কণায়, তাপ-শোষণ ক্রিয়া (entropy) গেল প্রচণ্ড বেড়ে। এই হলো প্রথম অনিবর্তনীয় ঘটনা (irreversible event)। কালের পেছনে ফেরা সেইক্ষণ থেকে বন্ধ হলো। তার অনিবার্য ভবিষ্যৎচারী গতি এগিয়ে নিয়ে চলল ব্রহ্মাণ্ডকে অমোঘ ক্রম-বিবর্তনের পথে। বিজ্ঞানী আন্দ্রেই লিন্ডে কল্পনা করেছেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য জগতের। এদেরই একটি হলো আমাদের ত্রৈমাত্রিক পৃথিবী, প্রাণহীন অসংখ্য নভোবস্তুর মধ্যে যেখানে ঘটেছে প্রাণের স্ফুরণ, হয়েছে চৈতন্যের সঞ্চার। কি করে এমন হলো—এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও কেউ জানেন না। হয়তো মৌলিক বলগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম সমাবৃত সাম্যভাব এই পৃথিবী সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। জানা নেই কারো এটা কি নেহাতই আপতিক ঘটনা, না কোন অদৃশ্য মহাশক্তির বিচিত্র লীলা।

ব্রহ্মাণ্ড নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়—এই বদ্ধমূল ধারণাই ছিল মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে বিজ্ঞান-গ্রাহ্য করার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই ধারণার মূলে ছিল প্রোটন কণার অবিনাশিতার তত্ত্ব। আজ কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, প্রোটন কণারও ক্ষয় আছে। ভারতের কোলার স্বর্ণখনির নিরালোক গভীরে, মন্ট ব্ল্যাঙ্কের গহন সুড়ঙ্গে, ক্লীভল্যান্ডে ঈরি হ্রদের ধারে লবণখনির অভ্যন্তরে যে-গবেষণা চলছে, তাতে প্রোটন-কণার বিনাশিতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রোটনের স্থায়িত্বকাল নিরূপিত হয়েছে ১০^{৩২} বছর বলে, ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান বয়সের যা কোটি কোটি গুণ বেশি। [ক্রমশঃ]

সন্ন্যাসিনীর কাহিনী

সরলাবালা সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

কাশীতেই বিমল এসেছিল। দুবার কি তিনবার। বিমল ইঞ্জিনিয়ার; রেঙ্গুনে তার কাজের জায়গা। তারই জন্যে আমার ব্রহ্মদেশও দেখা হয়ে গেল। মায়ের পাঁচটি ছেলে পাঁচরকম হয়, তার মধ্যে কোনটি ধীর-স্থির, কোনটি বা বিষম আবদারের। বিমল ছিল দারুণ আবদেরে।

একদিন একটা মুটের মাথায় মোট-মুটরা সঙ্গে নিয়ে একেবারে এসে হাজির হলো আমার ঘরের সম্মুখে।

"কখন এলি? কোথায় উঠেছিস?"

বিমল বললে: "উঠব আবার কোথায়, মা যখন রয়েছে কাশীতে। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করতে আসিনি, জানই তো এতদূর থেকে এসেছি কেবল তোমার হাতের রান্না খেতে।"

আমি বললাম: "তা বেশ করেছিস, জুতো না খুলেই যেন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়িসনি।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে: "ও:, জুতো? ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোমার আবার শুচিবাই আছে। যাকগে, আগে একটু চা কর, স্টোভটা সঙ্গে এনেছি। তা বলে শুধু চা নয়, লুচি ভাজ, আর একটা যা হয় কিছু ভাজাভাজি কর।"

আমি বললাম: "চা করছি, কিন্তু লুচি হবে কি করে? ঘরে কি আমার ময়দা আর চাকি-বেলুন আছে?"

"চাকি-বেলুন রাখ না কেন? যাক্ আজকের মতো যা আছে তাতেই চালিয়ে নেব। কাল সকালেই কিন্তু চাকি-বেলুন কেনা চাই।" যে কয়দিন সে থাকে কাশীতে, তার আবদারের জ্বালায় আমাকে অস্থির হতে হয়। নানা ফরমাশ—"মুলোর ঘণ্ট রাঁধ, সেবার যেমন কচুরি করেছিলে ঠিক সেইরকম কচুরি কর। রেঙ্গুনে খেতে বসে কেবলই তোমার রান্নার কথা মনে হতো, আর চোখে জল এসে যেত।"

সুধন্যার খাটুনি বাড়ত বিমল এলে, কিন্তু বিমল এলে সুধন্যা খুবই খুশি হতো, বলত, "বিমলদাদার মতো কি মানুষ হয়?"

বিমল সুধন্যাকে ছাতু ছেড়ে ভাত ধরাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, বলেছিল: "লক্ষ্মী বোনটি আমার, আমার কথা শোন। তুমি তো বাঙাল দেশের মেয়ে, তিনবেলা ভাত খাওয়া অভ্যাস, ছাতুর দেশে এসে কি ছাতুখোর হয়ে যাবে? মার হাতের এমন সব তরকারি, গন্ধেই জিভে জল আসে, তোমার কি লোভও হয় না? আমি এবার তোমায় বিন্ধ্যাচলে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়ে নিয়ে আসব, আর যদি 'কল্পবাস' করতে চাও, এই মাঘ মাসেই প্রয়াগে নিয়ে যাব। 'কল্পবাস' করার কিরকম পুণ্য তা শুনেছো তো, 'মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী'— এতো শাস্ত্রের কথা। তুমি ছাতু খাওয়া ছেড়ে ভাত খাও, তোমার পুণ্য একটুও কমবে না, বরং গুরুর প্রসাদ পেয়ে আরও বেড়ে যাবে।"

কিন্তু সুধন্যা অচল-অটল, সে তার ব্রত ভঙ্গ করবে না। হতাশ হয়ে শেষে একদিন আমাকে বলেছিল: "মা, সুধন্যার জন্যে আমার ভারি ভাবনা হচ্ছে, সে যে কি করে ভবসমুদ্র পার হবে তাই ভাবছি।"

আমি তার বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিলাম: "সুধন্যার ভাবনা তো ভাবছিস, আর তোর নিজের ভাবনা ভেবেছিস কি? তুই কি করে ভবসমুদ্র পার হবি বল দেখি।" আমি এই কথা বলবামাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, "কেন, তোমার কোলে চড়ে পার হয়ে যাব। মা থাকতে আবার ভাবনা কি!"

আমি বলেছিলাম: "তোর মা কি যে নিজে পার হবে, আবার তোকেও পার করবে?"

উত্তরে বললে: "মা যখন হয়েছ, তখন ছেলে কোলে করতে নিশ্চয়ই জান, আর সাঁতারও জান খুব

ভাব। তোমার পারের ভাবনা তুমি জান, কিন্তু আমি জানি, আমার মা আছে, আমার আবার পারের ভাবনা কি? কিন্তু মা, সুধন্যা যে নিজেই সাঁতরে পার হতে চায়, শেষে বেচারি মাঝসমুদ্রে ডুবে মরবে আর কি।"

কিন্তু বিমল একটি দিনও আমাকে প্রণাম করেনি, সুধন্যা বললে বলত: "মাকে আবার নাকি প্রণাম করতে হয়?"

আর-একটি ছেলেকে দেখেছিলাম, প্রয়াগে গঙ্গার পারে, ঝুঁসির আশ্রমে।

হিন্দুস্থানী বলে মনে হয়েছিল, কচি-কচি মুখ, বয়স বোধহয় আঠারো কি উনিশ হবে, এই বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছে।

আমার তখন ঝোঁক হয়েছিল উগ্র তপস্যার দিকে। হয়তো একবাটি গাওয়া ঘি চুমুক দিয়ে খেয়ে ধ্যানে বসেছি, আর একাসনেই কেটে গিয়েছে তিন কি চারদিন। এসব কাহিনী তোমাদের গালগল্প বলে মনে হবে।

হয়তো মনে একটা দম্ভও হয়েছিল সে-সময় যে, আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করেছি।

আমি একটা ঝোপড়ায় থাকতাম, পাশের ঝোপড়ায় থাকত সেই তরুণ সন্ন্যাসী। সে আমার ঘরের ভিতর আসেনি একদিনও, কিন্তু ঘরের বাইরে থেকেই আমার যা দরকার জুগিয়ে যেত। ঘুঁটের স্তূপের উপর বসানো থাকত একটা মাজা-ঘষা বাটলো, কাছেই থাকত দেশলাই কাঠি, একটা তেলের কুপি। আর বাটলোয় চাল, ডাল, মাখন, আলু কি কন্দ এবং নুন ও জলটি পর্যন্ত দেওয়া থাকত। সমস্ত দিন আসনে থেকে সন্ধ্যায় উঠে গঙ্গায় স্নান করে কোনদিন হয়তো ঘুঁটের আগুন ধরাতাম, আবার হয়তো কোনদিন যেমন সাজানো ছিল তেমনিই পড়ে থাকত। কিন্তু আমি উনুন ধরাই বা না-ধরাই, প্রতিদিনই দেখতাম বাটলো মেজে নতুন করে চড়ানো আছে সেই ঘুঁটের উনুনে।

একখানা পঞ্জিকা ছিল, একাদশী তিথিটা পাছে ভুল হয়ে যায়।

সংসার ছেড়েছি, কিন্তু একাদশী তিথির মমতা ছাড়তে পারিনি। একাদশী। সে যেন এক মহা-পবিত্র তিথি। বিশেষভাবে দেবপূজার পুণ্য তিথি। সেদিনের উপবাসের মধ্যেও যেন এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ।

আমি ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, একদিন বিয়ে হয়েছিল, স্বামী ছিলেন, এসবই ভুলে গিয়েছি, কিন্তু একাদশী যেন গত জন্মের স্মৃতি, গত জন্মের সঙ্গে এ-জীবনের বন্ধন-সূত্র।...

বৃন্দাবনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, "মা একবার কলকাতায় এসো।" সে তার কলকাতার ঠিকানাও জানিয়েছে চিঠিতে।

প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়ি, বোধহয় খুব বড়লোকের বাড়ি। বাগানের মধ্যে মস্ত বড় দিঘি, শুনলাম বাড়ির মালিক নাকি কলকাতার এক মহা-সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, মহারাজকুমার খেতাবধারী। তিনিই কলকাতায় আমন্ত্রণ করে এনেছেন সশিষ্য বৃন্দাবনকে। বুঝলাম যে বৃন্দাবনের নাম আর খ্যাতি বাংলাদেশে ভাল করেই প্রচার হয়েছে।

কিন্তু নবদ্বীপ কোথায়? নবদ্বীপকে তো দেখতে পেলাম না শিষ্যদের মধ্যে। বৃন্দাবনের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীও শুনেতে পেয়েছি নানা জনের মুখে তবে কি বৃন্দাবন এখন একটা মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বৃন্দাবনকে দেখে সেরকম কিছু মনে হলো না। হাসিমুখে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে, বললে, "মা, আমার বহু ভাগ্য, তোমার দর্শন পেলাম।"

ওর মুখটা কেমন মলিন বলে মনে হলো। জিগ্যেস করলাম: "তোর আশ্রমের খবর কি? বালগোপাল-সেবা চলছে তো এখনও?"

ও বললে: "গোপালের সেবার ভার তো গোপালেরই উপর, তাঁর কাজ তিনিই করেন। কিন্তু মা নবদ্বীপ যে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তুমি যদি কোন উপায় করতে পার।"

"কি করেছে নবদ্বীপ? সে কি পথভ্রষ্ট হয়েছে নাকি?" আমার আশঙ্কা হলো, কি জানি অল্প বয়স, রূপবান ছেলে, তেমন কিছু ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়।

বৃন্দাবন দুঃখের হাসি হাসলে। বললেঃ "নবদ্বীপের মাথা-খারাপ হয়েছে, শুনেছি পাই সে দিনরাত 'গুরু গুরু' জপ করছে, কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, আমার আসবার কথা জানতে পারলেই সে আস্তানা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কি যে তার দারুণ অভিমান, কেন যে এ অভিমান, সে-ই তা জানে। বল তো মা, আমি কি অপরাধ করেছি তার কাছে যে, সে প্রাণ দিতে বসেছে আমারই জন্যে। বলে নাকি যে, 'প্রভুর চরণ দর্শনের অধিকার আমার নেই, তাঁর অনেক শিষ্য আছে যারা তাঁর চরণের কাছে বাস করবার ভাগ্য লাভ করেছে, আমি অভাগা, এই ছার দেহে আর আমার সে ভাগ্য হবে না, সাধনা করে যদি পরজন্মে সে ভাগ্য পাই।' বল তো মা, এসব কথার মানে কি ?"

আমি জিগ্যেস করলামঃ "সে এখন কোথায় আছে ?"

বৃন্দাবন বললেঃ 'কলকাতাতেই আছে, কিন্তু আমি যে কলকাতায় এসেছি বোধহয় তা জানে না, জানলে অন্য কোথাও চলে যেত। শুনেছি কাশী মিত্তের ঘাটের কাছাকাছি একটা খোলার বস্তির একটা ঘরে আছে, বাড়িওয়ালী বিনে-ভাড়াতেই থাকতে দিয়েছে তাকে। কিন্তু সে পীড়িত, বিছানা ছেড়ে সবদিন ভিক্ষায় বের হতে পারে না, ভিক্ষান্ন ছাড়া অন্য অন্ন গ্রহণ করে না, তাই প্রায়ই নাকি উপোসই করতে হয় তাকে। মা, তুমি একবার গিয়ে দেখে এস তাকে, এরকম করলে সে কদিন বাঁচবে ? কি তার দুঃখ যে, সে আত্মহত্যার পথ নিলে ?'

বৃন্দাবনের এক শিষ্য নবদ্বীপের সন্ধান জানত, সে-ই আমাকে নিয়ে গেল সেখানে, দূরে থেকে তার ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

পাড়াটা শ্রমিক পল্লী, কলের মজুরের আস্তানা, বাড়িওয়ালীও হিন্দুস্থানী।

দেখলাম নবদ্বীপকে সকলেই চেনে, আর সকলেই ভক্তি করে। সাধু মহারাজকে খোঁজ করছি শুনে এক হিন্দুস্থানী এসে বললে, 'সাধু মহারাজ উস্ কোঠারি পর হ্যায়, লেকেন বহুত দুবলা হো গিয়া।"

বহুত দুবলা! কিন্তু এ যে একেবারে কঙ্কাল-সার। নবদ্বীপকে যে আর নবদ্বীপ বলে চেনা যায় না, আমার মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গেল নিজের অজ্ঞাতেই।

নবদ্বীপ চোখ বুজে শুয়ে ছিল, চমকে উঠে বসল। "এ কি মা, তুমি এসেছ ?" বলেই বিছানা থেকে উঠে আমাকে প্রণাম করবার জন্য এগিয়ে এল, মনে হলো এত দুর্বল যে দাঁড়াতেই তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খুশিতে।

বললেঃ "মনে মনে কদিন ধরেই ডাকছিলাম তোমাকে, তাহলে মা, মনের ডাকও দেখছি শুনতে পাও। কেন ডাকছিলাম ? তোমার হাতের রান্না খাবার লোভে। নিজের রান্না খেয়ে অরুচি হয়ে গিয়েছে, তাই খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি আজকাল।"

আমি বললামঃ "তোর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারছি।"

সেদিন সেখানেই থাকলাম, রেঁধে খাওয়ালাম নবদ্বীপকে। একটু সুস্থ বলে মনে হলো তাকে, তার পরদিন একটা গাড়ি ডেকে তাকে নিয়ে চললাম সেই বাগানবাড়িতে, বললামঃ "চল তোকে দেবদর্শন করিয়ে আনি।"

বালকের মতো সরল আমার কথায় বিশ্বাস করে দেবদর্শনে এসে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি দেখে ঢুকবে কিনা ইতস্তত করছিল, আর বৃন্দাবন এসে ওর সম্মুখে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নবদ্বীপ, যেন পাথরের মূর্তি। বৃন্দাবন ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে, বললেঃ "ভাই নবদ্বীপ, আমি কি অপরাধ করেছি তোর কাছে, তাই আমাকে ত্যাগ করলি ?" বৃন্দাবনের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল।

নবদ্বীপ যেন আছড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে, তারপর এপাশে একবার প্রণাম করলে ওপাশে একবার প্রণাম করলে, আর নিমিষের মধ্যে ছুটে পালিয়ে গেল।

"ধর ধর, ওযে পড়ে যাবে" বলে আমিও ছুটেছিলাম তার পিছনে, কিন্তু কোথায় সে, তাকে

আর দেখতে পেলাম না। যে মানুষ এত দুর্বল, জানি না কোথায় সে ছুটে পালিয়ে গেল।

নবদ্বীপের সেই ঘরে গিয়েও খোঁজ পেলাম না, তার বিছানা, তার ভিক্ষার ঝুলি পড়ে আছে, কিন্তু বিছানায় একখানা কাঁথা পাড়া ছিল, সেইখানাই শুধু নেই, সেইখানাকে গায়ে জড়িয়েই সে গিয়েছিল।

কাঁথাখানা দেখেই আমি চিনেছিলাম, বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতের তৈরি। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁথাটায় নানা রঙের সুতো দিয়ে অনেক কারুকার্য করেছিল।

এক বছর নবদ্বীপের কোন সংবাদ পাইনি। পরের বছর দোলের সময় বৃন্দাবনে গিয়ে তার খোঁজ পেলাম।

বৃন্দাবনের হোলি উৎসব, ব্রজবাসী আর ব্রজনারীদের মধ্যে আবির যুদ্ধ। বর্ষানা গ্রামে উৎসবটা খুব জমকালো হয়।

বর্ষানা, শ্রীমতী রাধিকার বাপের বাড়ি, বৃষভানু রাজার রাজভবন ছিল এইখানেই।

দেখলাম দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসী আসছেন লোটা হাতে কম্বল ঘাড়ে করে। এঁরা সব বনবাসী বৈষ্ণব সাধু। ঘরে ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াই ভরা দুধ চাপানো রয়েছে চুলায়। মোষের দুধ, উপরে পুরু সর পড়েছে। সাধুরা ঘরে ঢুকছেন আর ঘটি-ভর্তি দুধ নিয়ে আসছেন, যেন তাঁদের নিজেরই আস্তানা।

একজন সাধু বলছিলেন তাঁর সঙ্গী সাধুকেঃ "উনি ব্রজে দেহ রাখবেন বলেই এসেছেন এখানে, চল আজই ওঁকে দর্শন করে আসি।"

এঁরা দুজনেই বাঙালী, এঁদের কথার ভাবে মনে হলো যে সাধুর কথা ওঁরা বলছেন তিনি বাঙালী সাধু।

বাঙালী সাধু? দেহ রাখবেন? কে তিনি? নবদ্বীপ নয়ত? কেন জানি না, এই কথাটাই মনে হলো।

আমিও তাঁদের সাধুদর্শনের সঙ্গী হলাম, জিগ্যেস করেছিলামঃ "সাধুটি কোন দেশের মানুষ?"

তাঁরা হেসেছিলেনঃ "সাধুর কি আবার নিজদেশ পরদেশ আছে?"

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, বহুজন-পরিবেষ্টিত হয়ে যে সাধুটি শয্যায় লীন হয়ে আছেন, তিনিই নবদ্বীপ; এই সেই ছেলে, যাকে ছোট যখন ছিল কোলে করেছি, যার মা ছিল আমার সই।

বিছানায় পড়ে আছে যেন একখানি কঙ্কাল, তবু তার মুখখানা যেন কোন অপার্থিব জ্যোতিতে উজ্জ্বল, কি প্রসন্ন, কি প্রশান্ত সে মুখ! মুমূর্ষুর মুখ কে বলবে!

ভিড় ঠেলে কাছে পেঁছানো যায় না, চারপাশে পদধূলি-প্রার্থী ভক্তমণ্ডলী। কোনরকমে দুই হাতে মানুষ ঠেলতে ঠেলতে পথ করে পেঁছালাম তার কাছে, বিছানার পাশে। বিছানায় সেই কাঁথাখানি পাতা রয়েছে, পরিষ্কার ধপধপ করছে।

"নবদ্বীপ!" যেন একটা আর্তনাদের মতো কথা বেরুল আমার মুখ দিয়ে। সন্ন্যাসিনীরও কি পুত্রশোক হয়?

নবদ্বীপ চাইলে আমার দিকে, মৃদুকণ্ঠে বললেঃ "মা এসেছিস? পায়ের ধুলো দে আমার মাথায়।"

আমি বললামঃ "বাবা আমার, চললি তবে? চৈতন্য-চরণে মিশতে চললি?"

গর্জন করে উঠল যেন সিংহের মতো। উঠে বসবার চেষ্টা করলে একবার। "কি বললি মা, চৈতন্য-চরণ? তোদেরই থাক চৈতন্য-চরণ, রাধাকৃষ্ণে যুগল-চরণ। বৃন্দাবন দাসের চরণ ছাড়া নবদ্বীপের আর অন্য কোন আশ্রয় নেই।"

কে বলবে যে, এই মানুষটিই একটু আগে দুর্বল মৃদুস্বরে কথা বলছিল।

একটু শান্ত হলো, যেন সমস্ত উত্তেজনার অবসান হলো তার। মৃদুস্বরে বললেঃ "মা ওদের বলে যা, যখন সমাধি দেবে, এই কাঁথাখানা যেন আমার গায়েই জড়ানো থাকে।"

এই তার শেষ কথা। আর একটিও কথা বলেনি সে। আমার কথাও শেষ করলাম এইখানে, যদিও কথার কোন শেষ নেই।*

* সরলাবালা রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৬০৩—৬০৭

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক : স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মঠে একদিন শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দজীর) সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমাদের জীবন যেন মনে হয়েছিল ঠাকুরের সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর শুরু হলো সাধন-ভজন—গুরুভাইরা মিলে কখনো বরানগরে, কখনো পাহাড় নির্জনে তীর্থে তীর্থে। তারপর স্বামীজীকে ঘিরে—মঠ মিশন এইসব। স্বামীজীর সঙ্গেই সত্যি মনে হয়েছিল, এবার বুঝি শেষ হয়েছে। শরৎ মহারাজ বললেন—সত্যি আমাদের জীবন তাঁদের সঙ্গেই চলে গেছে। এসব যেন বাইরের; ভেতরের কথা—ওঁরা; ঠাকুরের কথা, স্বামীজীর কথা, সাধন-ভজনের কথা, এই সব যতই 'জাবর কাটা' যায় ততই ভাল, ততই আনন্দ।

যখন ভ্রমণ করেছি, ইচ্ছে করে বিপদের পথে গেছি। শক্ত পথে, কেন জান? মনে মনে যখনই সন্দেহ আসত (ঠাকুর সহায় আছেন কিনা) তখনই তাঁকে ঐরকম করে পরীক্ষা করতাম, যেন চ্যালেঞ্জ করতাম। প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে জয়ী হয়েছেন।

এক একসময় ভাব-ভক্তি ভাল লাগত না—অদ্বৈত-তত্ত্ব ভাবছি। হঠাৎ দেখলাম দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ঠাকুর যশোদা ও গোপালের দিকে তাকিয়ে ভাবস্থ, অপলক। গদগদভাবে আমায় ডেকে বলছেন—'দেখ দেখ কি ভাব!' দেখলুম গোপাল হামা দিয়ে পালাচ্ছে, আর যশোদা ননী হাতে পিছু পিছু যাচ্ছেন আর ডাকছেন, দেখতে দেখতে ঠাকুর তন্ময়, আর অস্ফুট স্বরে এক একবার বলছেন, 'দেখ দেখি কি ভাব'

হিমালয় দেখেছিলাম হরগৌরীর লীলাভূমি—শিব ও শক্তি, শিবশক্তি। শত শত পাহাড়চূড়া—যেন শত শত অনাদিলিঙ্গ! ধ্যানমগ্ন শিবমূর্তি! আদি লীলাস্থল! ঐখানেই তো গৌরীর তপস্যা, ঐখানেই তো সব!

সোজা হয়ে বসতে হয়—এমনি 'সমং কায়শিরোগ্রীবম্'। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসতে নেই, ঝুঁকে বসতে নেই। যারা ব্রহ্মচারী তারা কখনো ব্যাঁকা হয়ে বসতে পারে না, মেরুদণ্ড সোজা। দেখ না, কি ভাবে বসি? পা নাচাতে নেই, হাত পা কিছু নড়বে না। গুরুজনের সামনে স্থির বিনীত।

কখনো দমে যাবে না—শত দুঃখেও কখনো সুখের প্রার্থনা করবে না। তিনি ঘা সইয়ে সইয়ে নিয়ে যান। তুলসীদাসের একটি দোঁহা অতি দুঃখের সময় দিনরাত মনে মনে বলতুম—'সুখমে বাজ পড়ু দুঃখ রহু সঙ্গ!' সুখ তাঁকে ভুলিয়ে দেয়, দুঃখ কেবলি তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।

ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। হৃদয়ে ধ্যানই প্রশস্ত—যেন তাঁকে দেখছি এই সামনাসামনি। আবার যেন হৃদয়-মন্দিরে তিনি রয়েছেন—আমি এসে দেখছি। যাদের ইচ্ছে, তারা দীক্ষাগুরুকেও প্রথম ভেবে নিতে পারে, যদি চিন্তার সুবিধা হয়; ওর কিছু নিয়ম নেই। তাঁর চিন্তারই দরকার।

হিমালয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম, তিথি নক্ষত্র জানতাম না, তবে বছরের একটি দিনের হিসেব রাখতাম—শিবরাত্তিরের পর দ্বিতীয়া; উপোস করতাম—ব্যাস্। দিন মাস বছর কোথা দিয়ে আসত—কোথা দিয়ে চলে যেত!

প্রণাম কত রকম আছে,—কি জানো তোমরা? 'জানুভ্যাং তথা পদ্ভ্যাং উরসা শিরসা ধিয়া।' দাঁড়িয়ে প্রণাম অগ্রাহ্য। কত লোককে শেখাতে হয়েছে। প্রণামের কত নিয়ম আছে—শুয়ে থাকলে, বা চলন্ত অবস্থায়, কি তেল মাখলে, কি যখন অন্যমনস্ক তখন প্রণাম করতে নেই। অশুচি, অসুস্থ অবস্থায়ও প্রণাম করতে নেই। আজকাল কেউ বা করে কুড়ুলে প্রণাম, আর কেউ বা ভক্তির আতিশয্যে যখন তখন, যেখানে সেখানে। কেউ জানে না এসব। মঠে শুয়ে আছি—বেলা দুটোর সময়—না বলে না কয়ে একজন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। আমি তো চমকে

উঠেছি। ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই।

দিল্লিতে সন্ধ্যাবেলা একটা পার্কে বেঞ্চে বসে আছি। ঠাকুরের ভক্ত না হলে কারো বাড়িতে উঠব না—ভাবটা এই। দুজন মাড়োয়ারী বাঙালী সাধু দেখে পাশে এসে বসল। একথা সেকথা—খানিক পরে টাকা দিতে চায়। বলি—'না'। তখন বলে—'দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একবার টাকা দিতে গেছলাম—তিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।' তখন পরিচয় হলো—ও সেই লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারী।

কাজের সময় কথা বলবে না, শুনবেও না। স্বামীজী একদিন কাগজ পড়ছিলেন—আমি ঠেলা দিয়ে ডাকছি। একমনে পড়ছেন, শেষে বললেন, 'আমার কটা মন?' যখন যেটা করবে সারা মনটা তাতেই ঢেলে দেবে, তখন কথাবার্তা সব বন্ধ।

মেয়েরাই বেশি ভক্ত, তাদের খুব নিষ্ঠা ও বিশ্বাস।

কমলা নেহেরু জওহরলালকে লুকিয়ে লুকিয়ে জপ করত, কাঁদত। দাদার (স্বামী শিবানন্দজীর) অসুখের সময় দেখা। কঠিন রোগে ভুগছে, কিন্তু মুখে কি হাসি! বলে—'বড় দুঃখ, কাঁদতে পারি না।' বললাম, 'ঠাকুরঘরে যাও, ঠাকুর আশা পূর্ণ করবেন।' চলে যাবার সময় আবার প্রণাম করে গেল—দেখি চোখ দুটি জবাফুল।

নফর কুণ্ডুর স্মৃতিসভায় গেছি শরৎ মহারাজের সঙ্গে। শেষে কিছু বলতে হলো। সকলে দৃষ্টান্ত দিচ্ছে—স্যার ফিলিপ সিডনি, ইত্যাদি সব। এঁরা খুবই বড়, কিন্তু আমার কেমন লাগল। কেন, আমাদের দেশে কি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ নেই? দধীচির কথা বললুম। এই তুচ্ছ হাড় মাংস—এ তো মরবেই, এ তো শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য।* এর দ্বারা যদি কারো কোন উপকার হয় তো হোক না। দেবতারাও মানুষের ত্যাগের অপেক্ষা রাখে।

'পরোপকার' কেন? পর কে? সবই আপন। 'উপকার', 'পর-হিতব্রত' কেন? লোক-হিতব্রত। পর-উপকারে কার উপকার?—আমার নিজের। এই তো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম। ত্যাগ ও সেবাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের স্বার্থটা ত্যাগ, আর আত্মবুদ্ধিতে সবার সেবা, দয়া নয়। এই তো কর্মযোগ—এরই নাম সেবাধর্ম। উপায়ও যা, উদ্দেশ্যও তাই। সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন।

আত্মজ্ঞান হলে তবে বিশ্বপ্রেম। আজকাল সব বিশ্বপ্রেমের ছড়াছড়ি। ঠাকুর বলতেন, 'প্রেম নয়, প্যাম্।' আত্মজ্ঞানের পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায়—স্বামীজীর 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।... জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবসেবাই শিবসেবা। জীব আর আছে কে? সবই তো শিব।

আমরা তো পাহাড়ে সব ভুলে থাকতুম। কিন্তু ঠাকুর যখন 'সংসার' করালেন তখন সংসারীকেও হার মানাতে হবে। খুঁটিনাটি সব করতে হবে।

আবার "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—উপনিষদের এই কথা। বৈরাগ্যের দিনক্ষণ নেই, বয়স ধরাবাঁধা নেই। "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—আচার্য শঙ্কর বলেছেন। এসব বৈরাগ্যের কথা। বৈরাগ্য হলে বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে যেদিকে খুশি—প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী—দিকটিক ঠিক নেই। আবার আছে—'ব্যুত্থায়... ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'। ভিক্ষার নিয়ম আছে—ভিক্ষার জন্য যখন তখন যাবে না। বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে গেলে যাবে—'ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে'—আগুন নিভে গেলে, এঁটো-কাঁটা উঠে গেলে। তখন যতটুকু পাবে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে। [ক্রমশঃ]

* শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৬।১০।৯-১০) দধীচির উক্তি ঃ

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥

—যে ব্যক্তি অপর প্রাণিগণের শোককালে শোকগ্রস্ত এবং হর্ষকালে হর্ষযুক্ত হয়, তার এ জাতীয় ধর্মকেই পুণ্যকীর্তি মহাজনেরা অব্যয় বা সনাতন বলে বর্ণনা করেছেন। মরণশীল মনুষ্যাদি প্রাণী যে পরকীয় অর্থাৎ পরিণামে অপরের ভোগ্য এবং স্বার্থসাধনের অনুপযোগী ক্ষণভঙ্গুর ধনসম্পদ, পুত্রাদি পরিজন ও দেহদ্বারা পরের উপকার করে না—এটাই অতিশয় দৈন্য ও অতিশয় দুঃখের কথা।

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৮ ॥

লালগড়ের কোন ভক্ত পরিবারের একটি এগার-বছরের মেয়ে তার বাবার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে মহাপুরুষ মহারাজজীর কৃপালাভে ধন্য হয়। তার দীক্ষা সম্বন্ধে সে পরে বলেছেঃ "অত কম বয়সে তখন ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখিনি। তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতেন মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে। আমাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে তিনি নিজেই অনেকক্ষণ পূজা করলেন। তারপর ঠাকুরঘরে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের যে পাদুকা ছিল, তাতে হাত রেখে তিনি আমায় বললেনঃ 'বল, ঠাকুর! আজ থেকে আমার সব ভালমন্দ পাপপুণ্য তোমায় অর্পণ করলাম, আমার জীবনের সব ভার তোমাকে দিলাম।' তখন অত ছোট বয়সেও আমার মনে হলো যেন নবজন্ম লাভ করলাম।"

আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে বহুজনকে মহাপুরুষ মহারাজজী কৃপা করে দীক্ষা দিয়ে তাদের মুক্তির পথ সহজ, সুগম ও প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন। তাদের কল্যাণসাধনে তিনি কিন্তু স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর অতি কঠোর তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিকশক্তি, পুণ্যাদি ও সুকৃতি, আর তার প্রতিদানে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্মজন্মান্তরের অর্জিত দুষ্কৃতির বোঝা। ফলে, প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনেছি, তাঁর ঐ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেবশরীরে হয়েছে নানা কঠিন ব্যাধির অতি তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ। বাস্তবিক, সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি যে রোগের কত দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণাদি হাসিমুখে ভোগ করে গেছেন!

শেষকালে তিনি দীর্ঘকাল ধরে শয্যাশায়ী, দক্ষিণাঙ্গ-অবশ ও বাক্‌শক্তি-রহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে দর্শন করলে স্বভাবতই মনে হতো যেন ব্রহ্মলীন একটি অবোধ শিশু। ঠাকুরের সেই 'বিড়ালছানার' মতো তিনি তাঁর মায়েরই মুখ চেয়ে পরম নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ও আনন্দে সদা বিরাজ করতেন। যে-তিনি পূর্বে "প্রভু, শরণাগত, শরণাগত" বলে স্বয়ং সদা সর্বদা প্রার্থনা করতেন আর তাঁর কাছে আগত অন্য সকলকেও শরণাগত হবার উপদেশ দিতেন, সেই তিনিই তখন স্বয়ং মূর্তিমান শরণাগতি-রূপেই সকলের সামনে প্রত্যক্ষ-ভাবে অবস্থান করতেন। তাঁর তখনকার এই অপরূপ অপার্থিব মূর্তিটি যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তারাই জেনেছে—'শরণাগত' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য কি। ঐকালে আগত দর্শনার্থীদের দেখে কী এক অপূর্ব মধুর হাসিই না তাঁর শ্রীমুখে ফুটে উঠত! অক্ষম হলেও তিনি সে-সময় বাম হাতটি অতি কষ্টে সামান্য একটু তুলে অভয় ও আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দেখাতেন আর সেই সঙ্গে থাকত কী গভীর আন্তরিক স্নেহ করুণা ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি! তাঁর এই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত দেবমূর্তিটি দর্শন করার সৌভাগ্য তখন অনেকেরই হয়েছিল।

"কৃপা আর আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের আর কি-ই বা আছে?" তাঁর এই উক্তিটি যে কেবল মৌখিক নয়, এটি যে তাঁর স্বভাবগত, তারই প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ তিনি জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামীর শেষ অসুখের সময় মহাপুরুষ মহারাজজী বলেছিলেনঃ

"...তোমরা তো ঠাকুরকে দেখনি। তাঁর এইসব সন্তানদের দেখলে তবেই ঠাকুর সম্বন্ধে একটু-আধটু

যা হয় ধারণা করতে পারবে।" এ উক্তিটি যে তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য তা আর বলার কোন অপেক্ষাই থাকে না। এভাবে ঠাকুরের সন্তানগণের বিরাট ও গভীর ভাবের সামান্য একটু-আধটু বহিঃপ্রকাশ দেখেই অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের হতে পারে। ঠাকুরের সন্তানগণকে ধরেই আমাদের তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

তাঁরই শ্রীহস্তে লিখিত অভয় ও আশীর্বাণী নিজে স্মরণ করি এবং এবিষয়ে অন্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি ঃ

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরসা

গোদাবরী হাউস
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
২৬. ৮. ১৯২৬

শ্রীমান্ বলাই,

...ঠাকুর ভক্তের প্রাণের প্রার্থনা নিশ্চয় শোনেন —এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস। প্রার্থনার বিশেষ ফল এই যে, ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে আছেন—এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ক্রমে ক্রমে তাঁর existence (অস্তিত্ব) হৃদয়ে feel (অনুভব) করা যায় স্পষ্টরূপে। এর অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে? সুতরাং প্রার্থনা খুব করবে। ব্যাকুলতা তাঁর কৃপায় অধিক হবে সন্দেহ নাই। ...তিনি অহেতুকী দয়াল ঠাকুর, দয়া করবার জন্য তাঁর নররূপ ধরে ভূতলে আসা এবং জীবকে এই সব বিশ্বাসের কথা বলবার জন্যই আমাদের জগতে রেখেছেন, তাই তোমাকে এসব বলছি।...

ইতি
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

বেলুড় মঠে কিছুকাল যাতায়াতের পর দু-একজনের কাছে শুনি যে স্বামীজীর কথা যদি শুনতে হয়, তবে তা কানাই মহারাজের (স্বামীজীর শিষ্য ও সেবক স্বামী নির্ভয়ানন্দ) কাছে শুনতে হয়। একথা শোনার পর ইন্দু ও আমি তাঁর মুখে স্বামীজীর কথা শোনার সুযোগ খুঁজতে থাকি। একদিন দুপুরে জ্ঞান মহারাজজীর ঘরে পূর্বদিকের তক্তপোশে কানাই মহারাজজী বসে আছেন। ইন্দু ও আমি তখন তাঁকে বলি ঃ "মহারাজ, স্বামীজীর কথা কিছু বলুন।" তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ "স্বামীজীর কথা শুনবে?" কিন্তু কিছু বললেন না। আরো কয়েকবার অনুরোধ করলেও তিনি কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। আমরা কিন্তু তখন নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর কাছে কিছু শুনবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকি। খানিকক্ষণ এরকম জেদাজেদি চলবার পর তিনি একটু একটু করে নরম হতে থাকেন। তাঁর ভাবও একটু একটু করে গাঢ় হতে থাকে। তিনি তখন ক্রমশঃ বলতে থাকেন ঃ "হ্যাঁ, স্বামীজীর কথা শুনবে! বীর সন্ন্যাসী, বিশ্ববরেণ্য, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ এমন সব অনেক কথা তোমাদের স্বামীজীর সম্বন্ধে শুনেছি। অত সব কে বুঝতে চায়? (এই কথাগুলো যখন বলতে শুরু করেছেন, তখন তাঁর ভাব জমতে থাকে, মুখ-চোখ লাল হয়ে যায় আর হাঁপানি থাকাতে হাঁপাতে থাকেন)। হুঁ, দেখেছি বটে কি বিশাল উদার মহান হৃদয় ছিল তাঁর! কি অপার করুণা, সহানুভূতি ছিল তাঁর সকলের ওপর! সেইটে দেখেই মজেছি, দাস হয়েছি তাঁর। একবার এক সাহেব স্বামীজীর কাছে এসে রয়েছে। সে কিন্তু একেবার পাঁড় মাতাল।"

কানাই মহারাজজী বলে চলেছেন ঃ "স্বামীজী আমায় ডেকে বললেন—'দেখ, একটা কাজ কর। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে একে নিয়ে চন্দননগরে যা। গিয়ে মদের দোকান থেকে ও যে মদটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবে, সেই মদের কয়েকটা বোতল কিনে আনবি।' তখন চন্দননগরে সবচেয়ে ভাল ও দামী ফরাসী মদ পাওয়া যেত এবং তার নমুনা চাখতে দিত বিনা পয়সায়।"

"আমি তখন ব্রহ্মচারী, সাদা কাপড় পরি। কিন্তু স্বামীজীর আদেশ! তাই সে বেটাকে নিয়ে তো চললুম আর একটা দোকানে ঢুকলুম। এ দোকান সে দোকান ঘুরি আর সব দোকানেই এক-একটা

নমুনা চাখতে দেয় আর ও বেটাও fine, nice, good, excellent, grand এইসব বলতে বলতে চাখতে চাখতে তখনই প্রায় অচেতন অবস্থা। যে মদটা তার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, সেটার পাঁচ ছয় বোতল কিনলুম। মঠে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল।"

"এদিকে সন্ধ্যার পর রাত্রি যত বাড়ছে, স্বামীজীর চিন্তা তত বাড়ছে। ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ঘর-বার করছেন। ভাবছেন—তাই তো এই মাতালটার সঙ্গে ছেলেটাকে পাঠিয়ে কি অন্যায়ই না করেছি। এমনি করতে করতে খাবার সময় হয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় স্বামীজী বিশেষ কিছু খেতেও পারেননি। সামান্য কিছু খেয়ে তা থেকে আমার জন্য প্রায় সবকিছু তুলে রেখে দিয়েছিলেন। আমি যখন ফিরলুম তখন রাত্রি সাড়ে নটা-দশটা হবে। আমাকে দেখে তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর আমায় বললেনঃ 'দেখ বাবা, অনেক কষ্ট করেছিস, ওর জন্য আর একটু কর। তুই খেয়েদেয়ে ও বেটা যে ঘরে আছে, সেখানে গিয়ে রাত্রিটা ওর কাছে কাটাবি। বেটা বমি-ফমি কি করবে তার ঠিক নেই। আর এক কাজ করবি—সব কটা বোতল ওকে দিসনি। দু-একটা লুকিয়ে রেখে দিবি। খোঁয়াড়ি কাটাবার সময় সেগুলো দরকার হবে। তখন সামান্য একটু করে ওকে দিবি।' এই তোমাদের বিবেকানন্দ! কি অপার করুণা। মাতালের প্রতিও কি অসীম দরদ!"

এই বলে তিনি ভাবের আবেগে চুপ করে গেলেন।

তুরীয়ানন্দজী মহারাজ তাঁর সেবকদের ভয়ানক বকতেন বলে শুনেছি। হয়তো একঘর ভদ্রলোক বসে রয়েছেন সেই সময় তিনি বলতে আরম্ভ করলেনঃ "দেখুন, এই ছোঁড়াটা এমন লোভী যে 'মিটসেফে' আমার জন্য যে খাবার থাকে, সেখান থেকে আমায় না বলে খাবার বার করে খায়।"

তুরীয়ানন্দজীকে একবার স্বামী নির্বেদানন্দ প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'আপনি সেবকদের এত ভীষণ-ভাবে বকাঝকা করেন কেন মহারাজ ?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "দেখ অনাদি, ওরা আমায় শরীর দিয়ে সেবা করে। আমি তো ওদের শরীর দিয়ে সেবা করতে পারি না। তাই মন দিয়ে আমি ওদের সেবা করি।"

একথা নির্বেদানন্দজীর মুখ থেকেই শুনেছি। শেষবার কাশীধাম যাবার আগে তুরীয়ানন্দজী মহারাজ বলরাম মন্দিরে মহারাজজীর কাছে কিছুকাল ছিলেন। তখন তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। সেই সময়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে নখকুনি হওয়াতে সেটা অপারেশন করতে হয়। এসব কারণে তিনি কিছুকাল শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময়ে একদিন ইন্দু ও আমি মহারাজজীকে দর্শন করতে গিয়ে হরি মহারাজজীর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। কি স্বাধীনচেতাই না তিনি ছিলেন! কোনরকম বন্ধনই তিনি চাইতেন না। সেই শায়িত, দুর্বল অবস্থায় পড়ে থেকে শুয়ে শুয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করে আমাদের শোনালেন।

কবিতাটি এইঃ

"শতেক গৃধিনী যদি সহস্র বৎসর,
হৃৎপিন্ড করে বিদারিত, প্রীত বরঞ্চ
হইব তাহে,
তবু, হা ঈশ্বর! একদিন—একদিন জন্মান্তরে,
নাহি হই পরাধীন, যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি নর-গৃধিনীর করে।"

এটা আবৃত্তি করেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কোথায় আছে বল দেখি ?"

আমাদের দুজনেরই বাইরের বই খুব একটা পড়া ছিল না। তাই উত্তর দিতে পারিনি। বললেনঃ "নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে'।"

তাঁর ঘরে আর একদিন বিকেলে আমরা গেছি। পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য লাল টকটকে হয়ে ডুবছে। আর সেই রক্তিম আভা যেন সমস্ত ঘরকে ছেয়ে ফেলেছে। এই দৃশ্য দেখে হরি মহারাজজীর সেই বৃন্দাবনের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বললেনঃ "দেখ, যখন বৃন্দাবনে ছিলুম, তখন এই গোধূলির সময় ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ করে ফিরে আসার কথা স্মরণ করে বলত, 'লালাজী আয়া হ্যায়, বাত্তি জ্বালা'।" [সমাপ্ত]

বাতায়ন প্রাচীর দিয়ে জাতির হৃদয় ও কৃষ্টিকে বিভাগ করা যায় না

বার্লিন-বিভাজন ঘুচল, খুলল ব্রাণ্ডেনবুর্গ দ্বার

আকাশভাঙা বৃষ্টিও সেদিন [৯ নভেম্বর ১৯৮৯] বার্লিনবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দমিয়ে রাখতে পারেনি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণ খুলে দেওয়ার বহুপ্রত্যাশিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ছুটে এসেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের হাজার হাজার অধিবাসী। বার্লিন প্রাচীর তৈরির পর ২৮ বছর ধরে এই তোরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ঐতিহাসিক ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণের দুদিকেই প্রাচীর ভেঙে ফেলা বস্তুতঃ বার্লিনের দু-টুকরো হয়ে থাকার দিন শেষ হওয়ারই প্রতীক হয়ে উঠল।

গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী হান্স মড্রভ আর ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোলের নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা তোরণ পার হলো। জার্মানীর বিভাজনের প্রতীক পরিণত হলো সেই বিভাজন অবসানের প্রতীকে।

ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণ উন্মুক্ত হওয়ার কয়েকদিন আগেই বিখ্যাত 'পটসডামের প্লাৎজ'-এ বার্লিনের ২৮ বছরের বিভাজনের ইতি ঘটে যায়। বলতে গেলে সেটা বার্লিনের রেনেসাঁস। ভিড়ের জন্য বার্লিন প্রাচীর ফুঁড়ে নতুন পথ তৈরির কাজ শুরু হতে সেদিন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল। সমবেত হাজার হাজার মানুষ সবাই নিজের চোখে দেখতে চাইছিলেন কিভাবে প্রাচীরে গর্ত করা হয়। ঘণ্টা দুয়েক দেরি অবশ্য কারোরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়নি। বহুদিনের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার আনন্দে অভিভূত এক প্রবীণা বলেই ফেললেন, 'অনেক দেরি হোক ক্ষতি নেই, একেবারে না হওয়ার থেকে সেটা ভাল।' প্রাচীর যখন সত্যিই ভাঙা হলো, তখন তাঁর চোখ জলে ভরে গিয়েছে। মহিলা বললেন, 'এই মুহূর্তটির জন্য আমরা ২৮ বছর ধরে অপেক্ষা করছি।'

পটসডামের প্লাৎজেই সেদিন জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে হাত মেলালেন পশ্চিম বার্লিনের মেয়র ভাল্টের মোম্পের আর পূর্ব বার্লিনের মেয়র এরহার্ট ক্রাক। ফেডারেল জার্মানীর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ফন ভাইৎ-স্যাকারও এই পথেই সীমান্ত পার হলেন। এর কোনটিই কাকতালীয় ঘটনা নয়। উনবিংশ শতকে বার্লিনের এক কবি ও ঔপন্যাসিক থিওডোর ফন্টানে লিখেছিলেন, 'পটসডামের প্লাৎজই শহরের সবথেকে ঘটনাবহুল এলাকা—আর ঘটনার বেশি কোনও শহরের আর কিই বা দেওয়ার আছে!' সত্যি বলতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পটসডামের প্লাৎজই ছিল ইউরোপের সবথেকে ব্যস্ত চত্বর—জার্মানীর পিকাডিলি সার্কাস বা টাইমস স্কোয়্যার। এই শতাব্দীর দুই ও তিনের দশকে শহরের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের আনাগোনা লেগেই থাকত এই চত্বরের কাফে আর হোটেলগুলিতে।...

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে বার্লিন প্রাচীর তৈরি হওয়ায় এই চত্বর তিনদিক থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানী থেকে পশ্চিম অভিমুখে উদ্বাস্তুস্রোত ঠেকাতে সে দেশের নেতারা চত্বরটি ঘিরে ফেলেন। পটসডামের প্লাৎজ পরিণত হয় 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ—তার চারদিকে তখন কাঁটাতারের বেড়া আর পাহারাদার কুকুরের ঘোরাফেরা।

এসবই এই মুহূর্তে অতীত ইতিহাস। গণ-প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর নতুন নেতৃত্ব উভয় দেশে বেড়ানোর স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছেন, চলাচলের নতুন নতুন পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। বার্লিনের দুই অংশের অধিবাসীরাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অতীতের পুনরাবৃত্তি তাঁরা আর হতে দেবেন না। পটসডামের প্লাৎজ দিয়ে উভয়দিকেই লোকচলাচল শুরু হওয়ার পর মোম্পের মন্তব্য করেন, 'এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি আনন্দিত। পটসডামের প্লাৎজ বার্লিনের হৃদপিণ্ড—এবার তা ফের স্পন্দিত হবে।' সত্যিই তাই ঘটল—একের পর এক পুনর্মিলন আর উচ্ছ্বসিত আনন্দের দৃশ্য জাগালো সেই স্পন্দন। মেয়রের কথায় সেই অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি, আমরা জার্মানরা এখন পৃথিবীর সবথেকে আনন্দিত মানুষ।'

পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের 'সিটি হল' দুটির মধ্যে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে। দুই মেয়র জানিয়েছেন, দুই অংশের প্রশাসন সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী।...*

আজকের জার্মানী (ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কলকাতাস্থ দূতাবাসের মুখপত্র), ২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯০, পৃঃ ১-৩

নিবন্ধ

গুরু ও গুরুশক্তি

শোভারানী দাশগুপ্ত

'গুরু' শব্দটি উচ্চারণ করলেই ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মনে যেন সম্ভ্রমপূর্ণ একটি ভাব উপস্থিত হয়। গুরু নিশ্চয়ই মনুষ্যদেহধারী, কিন্তু মানুষ হয়েও যেন তিনি মানুষ নন। শিষ্যের কাছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিরূপ। গুরু কে? 'গুরুগীতা'য় গুরুর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ঃ

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংস কং ব্রহ্মগুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥

—'গু' শব্দ অন্ধকারের বাচক, আর 'রু' শব্দ তেজ অর্থাৎ আলোর বাচক। অতএব গুরু হলেন অজ্ঞাননাশক ব্রহ্ম। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'গুরুগীতা'য় আরও বলা হচ্ছে ঃ

গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

'গুরু' শব্দের 'গু' অংশটির অর্থ অন্ধকার, 'রু' অংশটির অর্থ সেই অন্ধকারের নিরোধক। অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে যিনি নিবারণ করেন তাঁকে 'গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

দুটি শ্লোকেই বলা হচ্ছে যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যান তিনিই গুরু। 'গুরুগীতা'তেই আবার বলা হচ্ছে ঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের (অথবা তিমির রোগের) দ্বারা অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা (কাজল লাগানোর কাঠির দ্বারা) উন্মীলিত করে দেন (অর্থাৎ যিনি জ্ঞান দান করে অজ্ঞানান্ধ জীবকে মুক্ত করে দেন), সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

এখন কথা হলো, কি সেই অজ্ঞান বা অন্ধকার যা দূর হলে জ্ঞান বা আলো পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়—"দ্যাখ যে দুধের নাম শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার দুধের জ্ঞান হয়েছে, আর যে খেয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।" অর্থাৎ যে নাম শুনেছে সে কিছুই বোঝেনি—সে 'অজ্ঞান', যে দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে, আর যে খেয়েছে সে 'বিজ্ঞানী'—সে অন্তরে বেশ উপলব্ধি করেছে, দুধ কেমন।

এখন আমাদের অজ্ঞান বা অন্ধকারটা কি? সেটা হলো—আমরা আমাদের জানি না। আমরা 'আমি' বলতে এই রক্তমাংসের স্থূল দেহটাই বুঝি এবং এর মালিক আমাকেই মনে করি—এর বেশি আর কিছু নয়। আমরা বাইরের পুঁথিগত বিদ্যাদ্বারা কত কি জানতে চাই, কত কি খুঁজে বেড়াই—আকাশ, মহাকাশ, সাগর, নদ-নদী ইত্যাদি। কবিগুরুর একটি ছোট্ট কথা মনে পড়ে—"ঘরের দুয়ারের ঘাসের উপর যে শিশিরবিন্দুটি কি তা জানলাম না—সাগর-সন্ধানে চললাম।" সেইরকম আমরা একবারও আমাদের নিজের দিকে অর্থাৎ অন্তরের দিকে একবারও চাইলাম না। এই যে 'আমি' নামক একটি জীব এটি কি। আমি কি রক্তমাংস-হাত-পা-বিশিষ্ট একটি জড়প্রাণী? যদি জড় হতাম তাহলে প্রাণী আখ্যা পেতাম না, বা চলতে ফিরতেও পারতাম না—বিশেষ কোন অনুভূতিও থাকত না। আমরা বাইরের চোখ দুটো দিয়ে বাইরের সব পদার্থ দেখতে পাই—সেটা বাইরের জগৎ, আমাদের অন্তরেও কিন্তু একটা জগৎ আছে—সে জগৎ আলোয় আলোময়—অথচ সেখানে নাকি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র কিছুই নেই, সে জগৎ নিজেই দীপ্তিমান। সেই আলোতে সাধকরা এক জায়গায় বসে পৃথিবীর সবকিছু জানতে ও দেখতে পান। এখানে 'আলো'র অর্থ জানা বা জ্ঞান। এই অন্তর্জগৎ দেখতে বা জানতে চাইলে অর্থাৎ 'আমি' কি বা কে—এই প্রশ্ন যখন অন্তরে উদিত হয়—তখনই বলতে ইচ্ছা হয় ঃ

"আমারে এই আঁধারে এমন করে চালায় কে গো
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি
সে জন কে গো।"

যখন মনে এরূপ আকুলতা আসে—কে আমাকে বলে বা দেখিয়ে দেবে আমি কে—তখনই গুরুর প্রয়োজন। গুরুই তখন সেই জ্ঞান দেন বা পথ দেখিয়ে দেন।

বাইরের পুঁথি পড়তে গেলে প্রথম যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন, তেমন অন্তরেও এক পুঁথি আছে—যার শিক্ষা নিতে হলে শিক্ষকের প্রয়োজন। এই শিক্ষকই গুরু, আর তিনি দেন 'আত্মজ্ঞান' যার দ্বারা আমার 'আমি'-কে জানা যায়। সকলেই কি গুরু হতে পারেন? যিনি নিজ তপস্যার দ্বারা 'আত্মজ্ঞান' অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জানতে পেরেছেন, তিনিই অধ্যাত্মগুরু পদবাচ্য। তিনিই পারেন তাঁর তপস্যালব্ধ ফল শিষ্যকে দিয়ে মুক্তি দিতে। নিজস্ব জিনিস না হলে তা অপরকে দান করা যায় না।

অধ্যাত্মগুরু মন্ত্র দান করে শিষ্যকে দেন মুক্তি অর্থাৎ আমরা যে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে যন্ত্রচালিতের মতো চলি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী থাকায় আমরা বাইরের জগৎ নিয়েই চলি, অধ্যাত্মগুরু মন্ত্র দিলে সেই মন্ত্রই আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী মুখ-গুলিকে ঘুরিয়ে দেন অন্তরের বা অধ্যাত্মজগতের দিকে। তখনই একটু একটু করে আমাদের আসে চেতনা, এ জগৎ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তারপর আসে সাধনার প্রবৃত্তি এবং শক্তি। সে-শক্তি কার?—ঐ মন্ত্রশক্তির। এইভাবে যত সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় ততই ভিতরে আনন্দ এবং ভিতরের বন্ধ দুয়ারগুলি অলক্ষ্যে খুলতে থাকে। তবে গুরুকৃপা ও পুরুষকার দুয়েরই যখন মিলন হয় তখনই সার্থ-কতা। পুরুষকার অবশ্যই প্রয়োজন। পুরুষকারের প্রয়োগ অবশ্য তখনই হয় যখন গুরুকৃপা আরম্ভ হয়। গুরুকৃপা ব্যতীত কোন উপায় নেই। গুরু মন্ত্র দিলেন—আর আমি সেই আহ্লাদে বসে আছি, যেন নিজের কিছুই করণীয় নেই, তাতে কিছু ফল হয় না। তবে ঠাকুর বলেছেন, কেউটে সাপে ধরলে ব্যাঙ তিন ডাকেই শেষ। তাই যথার্থ অধ্যাত্মগুরু হলে তিনি তাঁর নিজ শক্তি ও প্রেরণা দিয়ে শিষ্যকে মুক্তিমার্গে ক্রমেই অগ্রসর করিয়ে দেন।

পরিশেষে গুরু ও গুরুশক্তি সম্পর্কে লোকগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কয়েকটি কথা স্মরণ করি:

"প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে; তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে যে পথে পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধন-কালীন নানাপ্রকার বিঘ্নের সময় শিষ্যকে বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চ উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃত গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত—সদ্‌গুরুর মন্ত্র-দান ও সাধারণ কুলগুরুর মন্ত্রদানের বিশেষ পার্থক্য আছে। সদ্‌গুরুগণ মন্ত্রদানের সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন এবং সেই মন্ত্র সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন।

"প্রকৃত গুরুগণ শিষ্যগণের আর এক উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শিষ্যগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিষ্য বিপথে যাইলেও যাহাতে সে পুনরায় সৎপথে আগমন করে, তাহার জন্য লৌকিক অলৌকিক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।…

"ব্রহ্মবিৎ গুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন যে, তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেই দিন হইতে তাহার নূতন বিশ্বাস—নূতন জীবন আরম্ভ হয়।…

"হিন্দু যেদিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সেদিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনো ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি সহায়েই হইবে, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য হইব তাহা নহে, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।"

হাত ধর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সমর্পণ। তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দাও। আর কোনও ভাবনা নেই। এইবার আমি বেড়ালছানা। মা যখন বিছানায় তুলছেন তো আমি বিছানায়। মা যখন ছাইয়ের গাদায় ফেলছেন , আমি তখন ছাইয়ের গাদায়। মা আমার হাত ধরেছেন। ঠাকুর বলছেন—মা যখন ছেলের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে নিয়ে যান্ সে হাত খুলে ছেলের পড়ে যাবার ভয় থাকে না। আর ছেলে যদি মায়ের হাত ধরে, ভয় আছে। অন্যমনস্ক হলেই পতন। মা, তুমি আমার হাত ধর।

তিনি ধরবেন কেন ? কেনই বা ধরবেন না ! আমি যে বলেছি। কিভাবে বলেছি ? মুখে বলিনি। মনে বলেছি। মন আমার কেঁদেছে। ঠাকুর বলছেন, খুব কাঁদ। কেঁদে কেঁদে বল। একটিই অস্ত্র—কান্না। কান্না মানেটা কি ? ব্যাকুলতা। জগৎ-সংসারে আমার কেউ নেই। আমি বড় একা। সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ঘুরছি অকারণে। 'বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেহ নয় আপন।' এই বোধই আমার ব্যাকুলতার কারণ। মা আমাকে পুতুল দিয়েছিলেন, মাকে ভুলে থাকার জন্যে। হঠাৎ মনে হয়েছে—এ তো পুতুল ! আমি মায়ের কাছে যাব। আমি আমার মাকে চাই। তাই আমার তারস্বরে কান্না। সব কাজ ফেলে মাকে ছুটে আসতে হবেই।

আচ্ছা, এই বিশ্বাসটাই বা আমার এল কোথা থেকে ? ঠাকুর বলেছেন। বললেই হবে ? না, তিনি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমার গুরু। গুরুবাক্য অভ্রান্ত। গুরু বললেন—এই কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে নদীর ধারে যা। নৌকো নেই তো কি হয়েছে, জলের ওপর দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যা। শিষ্য সত্যিই হেঁটে পার হয়ে গেল নদী—বিশ্বাসের এত জোর। যার বিশ্বাসের তেমন জোর ছিল না, সে নদীর মাঝ বরাবর এসে মোড়কটা খুলে দেখলে। লেখা আছে শুধু একটি কথা—রাম। রামনামের কি এত জোর ! যাঁহাতক মনে হওয়া ডুবে গেল ভুড়ভুড় করে।

বিশ্বাসে অবিশ্বাস পথ পায় কেমন করে ? ঢুকিয়ে দেয়, ইনজেকশান করে দেয় অবিশ্বাসী, বিষয়ী মানুষরা। ঠাকুর বলছেন—বিষয়ী, অবিশ্বাসী মানুষদের এড়িয়ে চলবি। নিবাত, নিষ্কম্প দীপশিখায় তারা ফুঁ মেরে চঞ্চল করে দেবে। যুক্তিজাল বিস্তার করে বলবে—কিছু নেই। ও-তে কিছু নেই, সব আছে এ-তে। জন্ম-ভোগ-মৃত্যু, এই হলো তিন সত্য। তা, তোমার কথা মানব কেন ? তুমি কে ? কাম-কাঞ্চনের দাস। তুমি এক লেজ-কাটা শৃগাল। সকলের লেজই কাটাতে চাও। বিষয়ীর শেষ অবস্থা তো দেখেছি আমি। অনুভূতিশূন্য পশুর মতো। এক তিল শান্তি নেই জীবনে। জ্বলন্ত লোভ-পিণ্ড। পড়ে আছে বিছানায়। একটু পরেই মরবে। বউ বলছে—তুমি তো বেশ চললে, আমার জন্যে কি রেখে গেলে ! ছেলে এসে বালিশের তলায় সিন্দুকের চাবি খুঁজছে। আমি জানি, তখনো তোমার চৈতন্য হবে না। তুমি এদিকে, ওদিকে তাকিয়ে বলবে, ওরে ! দু-একটা আলো নেবা। তেল বেশি পুড়ছে।

দর্শন, বিচার, বিশ্বাস। দর্শন কোনও বই নয়। জীবন-দর্শন। যে জীবনে আছি সেই জীবনকে দর্শন। চলচঞ্চল, অস্থির এক অস্তিত্ব। আজ একরকম তো কাল একরকম। আজ যে আছে, কাল সে নেই। কোনও কিছুই ধরে রাখা

যায় না। জীবন, যৌবন, ধন, মান। আমার ছেলে বলে যিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন, 'তুমি রইলে' বলে তিনি চলে গেলেন। 'সখা আমার', 'প্রিয় আমার' বলে যাকে আঁকড়ে ধরতাম, মহাকাল তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন। আর প্রতিদিন নিজের অজ্ঞাতেই জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে একটি করে দিন। জন্মদিন মানে বেঁচে থাকার একটি দিন নয়। হিসেবটা উল্টো, মৃত্যুর দিকে একটি দিন এগুনো। আমার বয়স পঞ্চান্ন, মানে মৃত্যুর দিকে পঞ্চান্ন বছর এগিয়েছে জীবন। আর হয়তো পড়ে আছে পাঁচ কি দশ বছরের পথ। জীবনের হাত ধরে মৃত্যুই হাঁটছে। আমি বসে পড়লেও সে বসছে না। আমাকে কোলে করেই এগিয়ে চলেছে। ক্ষণকাল গিয়ে মিলবে মহাকালে।

জনম-মরণ জীবনের দুটি দ্বারে
উদয় অস্ত আসে যায় বারে বারে।
হেথা আশা সেথা নিরাশার শুধু বাণী,
পথিকেরে লয়ে দুই পথে টানাটানি
এ যদি বাঁধেগো জীবনের বীণা
ও ছেঁড়ে বীণার তার॥

ঠাকুর বলছেন—মৃত্যুকে সব সময় স্মরণে রাখবে। মৃত্যু-স্মরণ। না, ভয় নয়। সব ছেড়ে একদিন চলে যে যেতেই হবে, এই কথাটি স্মরণে রেখে সব কাজ করবে। বাবুর বাগানের মালী আমি। বলছি, 'আমার পুকুর, আমার আম গাছ'। বাবু যদি বিদায় করে দেন তো আমার আমকাঠের সিন্দুকটি লয়ে যাবারও ক্ষমতা থাকবে না। 'মৃত্যু-স্মরণ' হলে ইহ সংসারে পরের বাড়ির দাসীর মতো থাকা সম্ভব হবে। মুখে বলছি, 'আমার গোপাল', 'আমার রাখাল', মনে জানি এরা আমার কেউ নয়। আসল যারা, তারা সব আছে দেশের বাড়িতে, নিজ নিকেতনে। মন চল নিজ নিকেতনে। ঠাকুর বলছেন—সংসারে ভাব দেখাবে যেন কতই তুমি ওদের—স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের। কত ভাব, কত ভালবাসা। মনে মনে জানবে, ওরা তোমার কেউ নয়। ওরা ওরাই। আসল যিনি, তিনি আছেন আড়ালে।

এই দর্শনের পরেই নিত্য, অনিত্যের বিচার। কেউ বলে দিলে হবে না। ওতে বিশ্বাস হবে না। ধাক্কা খাব, হোঁচট খাব। বিচার করব। নিজের সঙ্গে নিজের বিচার। ঠাকুর বলছেন—বিচার করবে। সংসারের এক-একটা জিনিস ধরবে। খুঁজবে, তার মধ্যে সত্য আছে কি? টাকা? টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, পরিধানের বস্ত্র হয়, একটা বাসস্থান হয়। এর বেশি তো কিছু হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ—অপচয়। পাঁচ ভূতে সাবড়ে দেয়। ঠাকুর বলছেন—তুমি সংসারী—পঞ্ছিও নও, দরবেশও নও, ওদের সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই; কিন্তু নীড়ের পাখি সঞ্চয় করে তার শাবকের জন্যে, যতদিন না তার ডানায় জোর আসছে, যতদিন না সে উড়তে পারছে, ততদিন। তোমারও সেই পথ। ততটুকুই উপার্জন করবে, যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি নয়। যত বেশি টাকা, তত বেশি অশান্তি। তাহলে কাঁচ আর কাঞ্চনে কোনও তফাৎ নেই।

সংসার! সেই একই ব্যাপার। একটা মায়া। বিরাগ আনার জন্যে ঠাকুরের নির্দেশিত বিচারের পথটি আরও নির্মম। আধেয় বস্তুর ক্রম বিশ্লেষণ। ঠাকুর বলছেন—আচ্ছা, পুরোপুরি ত্যাগ, সম্পূর্ণ বিরাগ, তুমি সংসারী, হয়তো পারবে না। সংস্কার দোষ। বহুকালের অনুসৃত অভ্যাস। সংসারেই থাক। না হয় ইন্দ্রিয় সুখভোগ হলো, কিন্তু সেই ফকিরের মতো। পরস্ত্রী বা পরপুরুষ যতই লোভ দেখাক, নির্মম প্রত্যয়—প্রাতঃকৃত্যের সময় যে গাড়ুটির কাছে লজ্জা সমর্পণ করেছি, সেই গাড়ুটি ছাড়া, অন্যে প্রয়োজন নেই।

বিচারেই অনিত্যের প্রকাশ। হাতে রইল বিশ্বাস। মা তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই। তুমি আমার হাত ধর।

...র জলপ্রপাত-ভূমি চেরাপুঞ্জিতে

চিত্রা বসু ও পার্থসারথি বসু

সূচনারও একটি সূচনা থাকে। সূচনার সূচনায় আসি। কিছুদিন আগে আমরা আসাম ও মেঘালয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছি। সে-সময় চেরাপুঞ্জি, সোবারপুঞ্জি, শেলাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মের এবং অনেক স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচার ও প্রসারের যেসব পীড়াদায়ক বিবরণ শোনা যায়, তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা ও সেবার আদর্শে নিবেদিত কর্মযজ্ঞের অপরূপ নিদর্শন ঐ অঞ্চলে দেখে, এবং জাতীয় সংহতিতে তার প্রভাব লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই অভিজ্ঞতা ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ অনেক গভীরতায় আমাদের মনে দাগ কেটেছে বলে অনুভব করি। সেইসঙ্গে আমাদের অভিভূত করেছে ত্যাগ ও সেবায় উৎসর্গীকৃত কেতকী মহারাজ বা স্বামী প্রভানন্দ এবং তারিণীকুমার পুরকায়স্থের মহৎজীবনের কাহিনী যার খুবই সামান্য অংশ অল্প কয়েকদিন চেরাপুঞ্জিতে অবস্থান করে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তখনই মনে হয়েছে এসবের সন্ধান বাঙালী সমাজের কয়টি মানুষই বা রাখেন। অথচ সমগ্র দেশের গর্ব ও প্রেরণার বস্তু খাসিয়া পাহাড়ে মিশনের কর্মযজ্ঞ এবং কেতকী মহারাজ ও তারিণীকুমারের কাহিনী— ত্যাগ ও সেবার আদর্শের সঙ্গে যেখানে যুক্ত হয়েছে এ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ।

অল্প সময়ের সামান্য পরিচিতির প্রয়াসে ঐ নিবন্ধটি লেখা হয়েছে। ফলে প্রকৃতচিত্রের খুব অল্পই আমাদের অতিসীমিত সামর্থ্যে প্রকাশ পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমন্ডলে গৃহী-ভক্ত ও অনুগামীমহলে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন এবং কিছু পরিমাণে কেতকী মহারাজ ও তারিণী-কুমারের নাম হয়তো পরিচিত। কিন্তু বৃহত্তর বাঙালী সমাজে সামগ্রিকভাবে খাসি ও জয়ন্তীয়ার পার্বত্য অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট সেবাব্রত সম্পর্কে অজ্ঞতা এখনো রয়েছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে চেরাপুঞ্জি মিশন, কেতকী মহারাজ ও তারিণীকুমার বাঙালীর যে গর্ব ও প্রেরণার উৎস তার বহুল পরিচিতি প্রয়োজন।

শিলং থেকে আসা টুরিস্ট বাস ও ট্যাক্সি চেরা-পুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশন চত্বরে আধ ঘন্টার জন্য ভ্রমণ পিয়াসীদের উগরে দেয় প্রায় প্রতিদিনই। বছরে অন্ততঃ চার-পাঁচ মাস চেরাপুঞ্জির আকাশে মেঘের আনাগোনা, কলকাতার কাজের দিনে অফিস পাড়ার ভিড়ের মতোই। বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া চেরাপুঞ্জির বাসিন্দাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়; কিন্তু যখন এর জোর বাড়ে তখন সমতল থেকে বেড়াতে আসা মানুষের কাছে কিছুটা বিপর্যয়কর হয় বইকি! সারা আকাশ থেকে নামে যেন একটা জলপ্রপাত, দৃষ্টির পরিধি কয়েক গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ; বাতাস ও বৃষ্টির আওয়াজে মনে হয় যেন একটা ছোটখাট প্রলয় ঘটতে চলেছে। জলে ভিজে ছোটাছুটি করে মন্দির, মিশন, স্কুল এবং শো-রুম দেখা শেষ করার মধ্যেই বাস, ট্যাক্সি হর্ন দেওয়া শুরু করে; কারণ প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে 'মৌসমাই' জলপ্রপাত ও 'মৌসমাই' গুহা দেখে শিলং ফিরে যেতে হবে। ভাগ্যক্রমে যাঁরা এসে পড়েন এমন একদিন যখন টিভির রামায়ণ-মহাভারতের সময়ের জনবিরল পথের মতো চেরাপুঞ্জির আকাশ পরিষ্কার, তাঁরা অভিভূত হয়ে দেখেন একদিকে সবুজে মোড়া পাহাড় আর তার গা বেয়ে ঝরে পড়া ঝরনার দৃশ্য, অপরদিকে কয়েক হাজার ফুট নিচে বাংলাদেশের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি। কিন্তু এই আধঘন্টার ঝাঁকি-দর্শনের মধ্যে টুরিস্ট দলের জানবার সুযোগ হয় না

চেরাপুঞ্জির সর্বোচ্চ শৈলশিখরে মেঘ-বৃষ্টি-বাতাসের মধ্যে গড়ে ওঠা রামকৃষ্ণ মিশনের কাহিনী।

ছেলেবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া চেরাপুঞ্জির নাম সবারই স্মৃতির এক কোণে স্থায়ী আসন পেতে থাকে। পূর্বতন আসাম রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, অধুনা মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের এই অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণসারি একেবারে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার বিশাল সমতলভূমির উত্তর সীমানায়। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু সোজাসুজি এসে ধাক্কা খায় এই পাহাড়ের দেওয়ালে। গভীর বনে ভরা গিরিখাত-গুলির মধ্যে ঢুকে পাক খাওয়া মেঘের দল যেন জ্যামজটে পড়ে পালাবার তাড়ায় পুঞ্জে পুঞ্জে ভেসে ওঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে; শেষপর্যন্ত সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতায় চেরাপুঞ্জির খোলা আকাশে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে হাঁপ ছাড়ে। 'মৌসিনরাম' আর একটি জায়গা যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ চেরাপুঞ্জির মতোই। দুটি জায়গার সোজাসুজি দূরত্ব ছয় কিলোমিটার হলেও, মাঝের দুর্গম বন-পাহাড়-গিরিখাতের জন্য মৌসিনরাম যেতে হয় শিলঙের রাস্তা ঘুরে।

শুধু ভূগোল নয়, চেরাপুঞ্জির ইতিহাসও বেশ বৈচিত্র্যময়। একদিকে গারো পাহাড়, অপরদিকে জয়ন্তীয়া পর্বতমালার মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলে যাবার রাস্তা ছিল পূর্ব-বাংলার শ্রীহট্টের দিক থেকে। ঐ পথ দিয়েই উঠে এসেছিলেন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ডেভিড স্কট। সে অঞ্চলের রাজার সঙ্গে স্কটের সাক্ষাৎ হয় ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, তাঁর প্রজাদের শ্রমদানে শ্রীহট্ট-চেরাপুঞ্জি-শিলং-গোহাটি চলাচলের পথ তৈরি করে দিতে খাসিয়া রাজা স্বীকৃত হন। সমতলভূমি থেকে বন-পাহাড়ের গা বেয়ে, জায়গা-বিশেষে গভীর গিরিখাতে নেমে, জলস্রোত অতিক্রম করে, পাথর বাঁধানো পায়ে চলা পথগুলি এখনো ব্যবহারযোগ্য এবং বহিরাগত মানুষের নিকট বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে খাসিয়া দলপতি তিরোত সিং-এর নেতৃত্বে ইংরেজ-অধীনতা অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশশক্তি তখন অপ্রতিরোধ্য। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে চেরাপুঞ্জিকে আসামের রাজধানী শহর করা হয়। আবহাওয়া-জনিত এবং অন্যান্য কারণে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে শিলং-এ রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

গুয়াহাটি বা গৌহাটির সমতল থেকে শিলং যাবার রাস্তা পাহাড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘালয় রাজ্যের শুরু। পথের প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি রমণীয়। গৌহাটি-শিলং রোড ভারতের একটি সেরা পাহাড়ীপথ বললে অত্যুক্তি হবে না। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। এই রাস্তায় সবুজ পাহাড়ের সারি আর বৃষ্টির জলে স্ফীত ঝরনা-গুলির সৌন্দর্য যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি আবার বুক দুরদুর করে যখন গাড়ি গভীর খাদ ঘেঁসে বাঁক নেয়। চেরাপুঞ্জির পর সোবারপুঞ্জি (১৮ কিলোমিটার) ও শেলা (৫৫ কিলোমিটার) যাবার পথে এই সৌন্দর্য ও ভয়াবহতা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। চেরাপুঞ্জি ছোট শহর, পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো upper ও lower চেরাপুঞ্জি এই দুইটি অংশে বিভক্ত। এ অঞ্চলে পাহাড়ের উপরের স্তরেই কয়লা পাওয়া যায়। তা ছাড়া খাসিয়া পাহাড়ে আছে লোহা এবং চুণাপাথর। ইংরেজ রাজত্বের আগেই স্থানীয় মানুষ লোহা গালিয়ে ব্যবহার করতে শিখেছিল। Lower চেরাতে বা চেরাপুঞ্জিতে একটি সিমেন্টের কারখানা রয়েছে। চেরাপুঞ্জির Welsh Mission-এর গির্জা একশ বছরেরও বেশি পুরনো। শহরের উচ্চতম অংশে—যেটি table top-এর মতো—সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে এবং দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবাক লাগে, যখন দেখা যায় যেখানে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেই upper চেরাপুঞ্জি অঞ্চলকে আধুনিক পরিবেশ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞরা 'বর্ষণসিক্ত মরুভূমি' বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, 'ঝুম' চাষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকোপে চেরাপুঞ্জি শহর ও তার আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ গাছপালাশূন্য হয়ে পড়েছে। ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টির জল ধরে রাখার

প্রকৃতিদত্ত উপায় মানুষ ধ্বংস করেছে। মেঘ ঝরা জলসম্পদের বৃহৎ অংশই পাহাড়ের নেড়া মাথা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ অঞ্চলকে সারা বছর পরিপূর্ণ করে রাখে। বর্ষায় প্রবলভাবে স্ফীত ঝরনাধারাগুলি শীতের শুরু থেকেই শীর্ণকায়া হতে থাকে; চেরাপুঞ্জি শহরে মাঝে মাঝে জলাভাব দেখা দেয়। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য মেঘালয় সরকার বড় আকারের বনসৃজন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বছরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাসেরও বেশি ক্রমাগত বর্ষণের ফলে বৃক্ষহীন পাহাড়ের উপরদিকের মাটি ধুয়ে ক্রমশঃ জমা হয়েছে চেরাপুঞ্জির অনেক নিচের gorge অর্থাৎ গিরিখাতগুলিতে। এই উর্বর গিরিখাতে চাষ-আবাদ হয় নানান শস্যের এবং কমলালেবু, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফলের। পাহাড়ে পাওয়া যায় তেজপাতা, গোলমরিচ, সুপারি এবং বাঁশ। প্রায় ২৫০ রকমের অর্কিড জন্মায় খাসিয়া পাহাড়ে। তাছাড়া আলুর চাষও হয় কিছু পরিমাণ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মিশনের উপর থেকে রাত্রিবেলায় কয়েক হাজার ফুট নিচে বাংলাদেশের সমতলে শ্রীহট্ট ও ছাতক শহরের আলোর সারি চোখে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের দক্ষিণ দিকের রাস্তার পাশেই গভীর খাদ, যার একপাশের অনাবৃত শিলাগাত্র কয়েক-শ ফুট একেবারে খাড়া নেমে গেছে। এটির নাম 'Riat-Maw-Yiew gorge'। ভূতাত্ত্বিকের মতে পাথরটির বয়স নাকি হিমালয়ের চেয়েও প্রাচীন। জোর বৃষ্টি হলে উপত্যকার জলপ্রবাহগুলি এই পাথর বেয়ে একটি বিশাল জলপ্রপাতের আকার নেয়। পাঁচ কিলোমিটার দূরে রয়েছে 'নোহকালিকাই'— আর একটি আকর্ষণীয় জলপ্রপাত। পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতগুলির মধ্যে চতুর্থ এই ঝরনাধারার সঙ্গে জড়িত আছে 'কা-লিকাই' নামে এক দুঃখিনী জননীর আত্মবিসর্জনের করুণ কাহিনী। নয় কিলোমিটার দূরে বহুখ্যাত 'মৌসমাই' জলপ্রপাত যার অপর নাম 'Fall of Seven Sisters.' —অনেকগুলি ধারা হয়ে নিচে ঝরে পড়ার জন্য। এখান থেকে কাছেই মৌসমাই Stalactite গুহা— একটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। আরো কিছু দূরে সোবারপুঞ্জির রাস্তায় পড়ে 'Mot-Trop', যেখান থেকে টুরিস্টরা অবাক হয়ে দেখেন নিচে সমতলের দৃশ্য এবং একটি বিশাল শিবলিঙ্গাকার প্রাকৃতিক শিলাস্তূপ।

চেরাপুঞ্জি থেকে বাসরাস্তায় ১৮ কিলোমিটার দূরে, রাস্তা থেকে পাহাড়ের গায়ে পায়ে চলাপথ ধরে অনেকটা নেমে সোবারপুঞ্জি গ্রাম—যেখানে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে একটি আশ্রম, স্কুল ও ছেলেমেয়েদের হস্টেল রয়েছে। বাসরাস্তার শেষ সোবারপুঞ্জি ছাড়িয়ে আরো ৩৭ কিলোমিটার গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে শেলা গ্রামের কাছে। শেলার পথে বাসরাস্তার পাশেই অনেক উঁচু থেকে প্রায় খাড়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 'কেন্দ্রাম' জলপ্রপাত যা বেশি বৃষ্টির দিনে বাসের জানালা দিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ঝরনার জলের ঝাপটায় যাত্রীদের কাপড়জামা ভিজিয়ে দেয়। শেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে শেলা নদী। এই খরস্রোতা নদীটি বাংলাদেশের সুর্মা নদীতে মিশেছে এবং এই নদী দিয়ে বাংলাদেশী নৌকায় শেলা থেকে চুণাপাথর রপ্তানী হয়। শেলা নদীর তীরে পাহাড়ের গায়ে শেলা গ্রাম। আজ থেকে একশ বছরেরও আগে শেলা একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। খাসিয়া পাহাড় অঞ্চল ও শ্রীহট্ট-সমতলের ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র ছিল শেলা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ অবধি শেলাতে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে বাঙলা ভাষা অন্যতম প্রধান পাঠ্য ছিল। শেলার স্থানীয় খাসিয়া বাসিন্দারা বাঙলা ভাষাতেও কাজকর্ম চালাতে পারদর্শী হতেন। শ্রীহট্ট থেকে ব্যবসা এবং শিক্ষকতার কাজের জন্য ছাড়াও, ধর্মপ্রচারে বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্ম প্রচারকেরা শেলার গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে শেলা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বিগতশ্রী, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামের দরদী সুহৃদরূপে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সমর্থনপুষ্ট খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকরা আসেন এবং বেশ কিছুকাল এখানে এঁদের ধর্মপ্রচার এবং ধর্মান্তরিতকরণ অব্যাহত ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা-প্রচার তথা সেবাব্রতের সূত্রপাত হয় শেলা গ্রাম থেকেই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে।

খাসিয়া পাহাড়, বিশেষ করে চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি মহৎজীবনের ত্যাগ ও সেবাব্রতের কাহিনী। ১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন দুজনকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিক্ষার প্রসার ও সেবার দ্বারা দরিদ্র অবহেলিত অনুন্নত ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে দেশের যুবকদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তাঁদের প্রেরণা এবং বিস্ময়কর কর্মশক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দিয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রথমজন রামকৃষ্ণ মিশনের কেতকী মহারাজ, পরবর্তী কালে যাঁর সন্ন্যাস নাম হয়েছিল স্বামী প্রভানন্দ; অপরজন তারিণীকুমার পুরকায়স্থ—যিনি খাসিয়া পাহাড়ে 'বাবু' নামে পরিচিত। এঁদের কাহিনী এ্যাডভেঞ্চার গল্পের মতোই রোমাঞ্চকর, সেইসঙ্গে প্রেরণায় ভরপুর। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ অধিকাংশ বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীহট্টের সমতল সংলগ্ন শেলা গ্রামে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কেতকী মহারাজ আসেন এবং তাঁর চেষ্টায় স্থানীয় খাসিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন এবং জাতীয়তাভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। তাঁর কর্মযজ্ঞে সহায়ক ছিলেন শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রমের ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য—পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসী—স্বামী প্রেমেশানন্দ। কেতকী মহারাজের নিরলস পরিশ্রম এবং খাসিয়া গ্রামবাসীদের আগ্রহ উদ্যমে ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ক্রমশঃ পাহাড়ী অঞ্চলে শেলা, নংওয়ার এবং আরও কয়েক জায়গায় নিম্ন ও মধ্য প্রাথমিক এবং নৈশ স্কুল শুরু হয়। এই সময় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে চেরাপুঞ্জি এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমেরও সূত্রপাত হয়। এ ইতিহাস একাধারে প্রেরণাময় ও রোমাঞ্চকর। বৃটিশ সরকারের সাহায্য-পুষ্ট খ্রীস্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধাচরণ, কিছু খাসিয়া সমাজপতির নৈরাশ্যজনক নির্লিপ্ততা, চরম অর্থাভাব, এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পাহাড়ী গ্রাম্য মানুষের মন জয় করেছিলেন স্বামী প্রভানন্দ। আশ্রম কেন্দ্রগুলি হয়ে উঠেছিল ঐ অঞ্চলের শিক্ষা, সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞের পীঠস্থান। চেরা-পুঞ্জির রাজদরবারের নিয়ম অনুসারে কোন অ-খাসিয়ার জমি অধিগ্রহণ করে স্কুলবাড়ি তৈরি করা সম্ভব ছিল না কিন্তু চেরাপুঞ্জি দরবারে রাজা (SYIEM) ও অন্যান্য প্রধানগণের সর্বসম্মতিক্রমে KHLICH SHNONG (চেরাপুঞ্জির উচ্চতম স্থান) রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁদের পরিচালিত উচ্চ ইংরেজী স্কুল-এর জন্য নির্বাচিত হয়। কঠোর পরিশ্রমে এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামী প্রভানন্দের দেহান্ত হয় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মাত্র সাইত্রিশ বছর বয়সে। স্বামী প্রভানন্দের দরদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে দুর্গাপূজার সময় প্রতিবছর খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বহু নরনারী শ্রীহট্ট শহরে পূজা দেখতে যেতেন। সেখানে তাঁদের হিন্দু হোটেলে জায়গা দেওয়া হতো না। মুসলমান হোটেলে থেকে, বিশেষ অমর্যাদার সঙ্গে তাঁরা দুর্গাপূজা দেখতেন। এই অমর্যাদা থেকে তাঁদের রক্ষার জন্য স্বামী প্রভানন্দ ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে শেলা আশ্রমে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। আজও প্রতি বছর মহাসমারোহে সে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। স্থানীয় খাসিয়াভক্তদের মধ্যে এই পূজা খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া কালীপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসবও খুবই উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

তারিণীকুমার পুরকায়স্থ অসহযোগ আন্দোলনের যুগে কলেজ ছেড়ে দেশসেবায় ব্রতী হন। বেলুড় মঠের সংস্পর্শে এসে তিনি স্বামী সারদেশানন্দের উপদেশে খাসিয়া পাহাড়বাসীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে চেরাপুঞ্জি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গায়ে সোবার-পুঞ্জি নামক গ্রামে ছোট্ট একটি স্কুল শুরু করে-ছিলেন। গ্রামবাসীদের সমর্থন ও সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যে স্কুলটি বেড়ে ওঠে। একসময় অর্থাভাবে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করে সংগৃহীত চাল, তরকারি ইত্যাদির দ্বারা তারিণীকুমারকে ছাত্রাবাসের ও নিজের খরচ চালাতে হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দে নিবেদিত প্রাণ তারিণীকুমার সোবারপুঞ্জি আশ্রমের নাম দেন—'বিবেকানন্দ কুটির'। স্কুলটির নাম দেওয়া

হয় 'নিউ ইন্ডিয়া স্কুল'। স্থানীয় খ্রীস্টানসমাজ ও পাদ্রীদের বিরোধিতা সরকারি সাহায্য পাবার পথে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। স্কুলটির জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে তৎকালীন আসামের ইংরেজ সরকার ঐ অঞ্চলে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় (M. E. School) শুরুর প্রয়াস করলে দেখা যায় যে স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা নিউ ইন্ডিয়া স্কুলে পড়ার জন্য বেশি আগ্রহী। শুধু বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নয়, গ্রামসেবা ও গ্রামোন্নয়ন তারিণীকুমারের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। সোবারপুঞ্জি জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের গায়ে যেন একটি ঝুলন্ত গ্রাম। নিচের দিকে তাকালে শ্রীহট্ট জেলার সমতল ভূমি চোখে পড়ে। উপরের সড়কে যাবার জন্য পায়েচলা পথরেখা দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হয়। গ্রাম থেকে চেরাপুঞ্জি—শিলং সড়কে যোগাযোগের জন্য স্কুলের ছাত্র ও গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে তারিণীবাবু এক সড়ক নির্মাণের সূচনা করেন, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী আসাম সরকারের আনুকূল্য লাভ করে। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে সোবার-পুঞ্জি আশ্রম ও বিদ্যালয় চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কঠোর পরিশ্রমে ভগ্নদেহ তারিণী-কুমার ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পরলোক গমন করেন।

খাসিয়া পাহাড়ের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় এবং বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ওতপ্রোত সম্পর্ক এবং জাতীয় সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনৈক প্রাদেশিক সরকারি অফিসারকে তারিণীবাবু বলেছিলেন: "আমি যদি বাঙালী, তুমি খাসিয়া, অন্যেরা কাশ্মীরী ও মাদ্রাজী, তাহলে আমাদের মধ্যে ভারতীয় কোথায়?" স্বামী প্রভানন্দ খাসিয়া ভাষায় তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপযোগী পুস্তক ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপ-দেশাবলীর অনুবাদ রচনা করেন। পরে স্বামী চণ্ডিকানন্দ অনেক ভজন ও দেশাত্মবোধক গান খাসিয়া ভাষায় রচনা করে তাতে প্রচলিত ভারতীয় গানের সুর সংযোজন করেন। এই সমস্ত গান খাসিয়া পাহাড়ে সমাদৃত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পরে, খাসিয়া ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এবং খাসিয়া ধর্মবিষয়ে পুস্তকাবলী রচনায় হাত দিয়েছেন স্থানীয় মিশন-কর্তৃপক্ষ। মেঘালয় সরকার খাসিয়া পাহাড়ের স্কুলগুলিতে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 'খাসিয়া' ও 'বাঙলা' ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই শ্রেণীগুলিতে বাঙলার মাধ্যমে পড়াশুনা করে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, জয়ন্তীয়া, পার্বত্য কাছাড় ইত্যাদি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

শিক্ষা, সেবা, উন্নয়ন ও সংহতির আদর্শের প্রসারে নিরলস প্রয়াসী চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা প্রেরণা সঞ্চার এবং অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী ভূতেশানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ। চেরাপুঞ্জি মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দ। মিশনের হাইস্কুলে প্রায় ৬৫০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকয়টি রাজ্য থেকে আগত ১৫০ জন ছাত্র স্কুল-হস্টেলে রয়েছে। তাছাড়া সোবারপুঞ্জিতেও ২০ জন ছাত্র ও ৬০ জন ছাত্রীর জন্য হস্টেল রয়েছে। সোবারপুঞ্জি এবং অন্যান্য দূরবর্তী গ্রাম থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী চেরাপুঞ্জি হাইস্কুলে পড়তে আসে, তাদের জন্য বিনা ব্যয়ে স্কুলবাসের ব্যবস্থা আছে। দশম শ্রেণীর পর ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে মেঘালয় শিক্ষাপর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। চেরাপুঞ্জি হাইস্কুল ছাড়া খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের বিভিন্ন দুর্গম গ্রামে ছড়ানো রয়েছে ৩৪টি নিম্ন প্রাথমিক ও ১৪টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়। শুধুমাত্র পড়াশুনার ব্যবস্থা নয়, কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে কর্মশালা, যেখানে তাঁতবোনা, সেলাইয়ের কাজ, কাঠের কাজ ওয়েলডিং, মোটরকার ও ইলেকট্রিক মেরামতি এবং টাইপ-রাইটিং শেখানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য রয়েছে গ্রন্থাগার এবং ল্যাবরেটরি। এছাড়া শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় সহ একটি দাতব্য

চিকিৎসালয় পাহাড়ী মানুষের কাছে চিকিৎসা সহজলভ্য করতে প্রয়াসী, কিন্তু স্থায়ী ডাক্তারের অভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠছে না। মিশনের প্রেস আধুনিকীকরণের দ্বারা খাসিয়া ও ইংরেজীতে বইপত্র ও অন্যান্য ছাপার কাজের অনেক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হয়েছে। মিশনের নিজস্ব গোশালা ও হাঁস-মুরগীর খামার থেকে প্রয়োজনমতো দুধ ও ডিম যাতে পাওয়া যায় সেজন্য পরিকল্পনা ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মিশনের বেকারিতে তৈরি হয় বিস্কুট, কেক ইত্যাদি। ব্যাঙের ছাতা (mushroom) চাষের ব্যবস্থা এবং সুপারি Processing Plant—এই দুটি পরিকল্পনা সম্প্রতি হাতে নেওয়া হয়েছে। সোবারপুঞ্জি পাহাড়ী পথে প্রচুর সুপারির ফলন হয়, যেগুলি সাধারণতঃ জলে ডুবিয়ে রেখে fermented হলে এক ধরনের নেশার বস্তু হিসাবে পাহাড়ী লোকেরা ব্যবহার করে। বর্তমান মিশনকর্তৃপক্ষ চাইছেন গ্রামাঞ্চল থেকে যত পরিমাণ সম্ভব সুপারি কিনে সেগুলি Processing Plant-এর দ্বারা মশলার উপযোগী করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করতে। সোবারপুঞ্জি ও শেলার পথের পাহাড়ে এক ধরনের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ প্রচুর পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদের দ্বারা সেগুলি সংগ্রহ করান এবং ঝাড়াই-বাছাই করে প্লাস্টিক ফিতা বাঁধানো ফুলঝাড়ু তৈরি প্রভৃতি ছোটখাট কুটিরশিল্পের আকারে গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের বাজারে এসব জিনিসের চাহিদা প্রচুর। পাহাড়ের মানুষ তাঁদের আর্থিক উন্নতির জন্য এভাবে মিশনের সাহায্য পাচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে পাহাড়ী অঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করা, মিনি কম্পিউটার ব্যবহারিক জীবনে ও কাজকর্মের উন্নতিতে প্রয়োগ করার শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনাচক্রের কেন্দ্র হিসাবে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়োজনীয়তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দূর-দুর্গমে—যে অঞ্চলের অনেক জায়গাই বছরের অধিকাংশ সময়ে ধারাবর্ষণে সিক্ত—মুষ্টিমেয় সাধু-ব্রহ্মচারী ও কর্মীর দ্বারা এই বহুমুখী কর্মযজ্ঞ পরিচালনার অসুবিধা ও ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মিশনের কাজে অর্থের প্রয়োজন তো আছেই—তার চেয়ে জরুরী প্রয়োজন স্বেচ্ছাকর্মীর—শহরের চটকদার পরিবেশের আকর্ষণ থেকে দূরে গিয়ে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও পাহাড়ের মানুষের মাঝে অর্থবহ জীবনযাপনে যাঁদের উৎসাহের অভাব হবে না।

মেঘ-বৃষ্টির দিনে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে এসে প্রথমদিকে হয়তো মনের কোণে কিছু অসুবিধাজনিত বিরক্তির সঞ্চার হয়। অনুসন্ধিৎসুজনের ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়েই সেই স্বল্প বিরক্তি মুছে গিয়ে জেগে ওঠে বিস্ময় ও আনন্দ। তাঁরা অনুভব করেন চেরাপুঞ্জির আবহাওয়া শহরের মানুষকে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে যেন পরিবেশ দূষণের গ্লানিমুক্ত করে অনেক সজীব, সতেজ করে তুলছে। বৃষ্টি-ধোয়া পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ঝরনার ধারা পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বিস্মিত হয়ে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন ভারতের সীমান্তবাসী পাহাড়ী উপজাতির মানুষ এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির প্রকাশ। চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং ফিরে আসার পথে পাহাড়ী সড়কে বাঁক নেবার সময় গাড়ির জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ দেখা যায় দূরে শৈলশিখরে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন—ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এক মহান আদর্শ—সেবাধর্মের প্রতীক। কদাচিৎ কেউ জানতে পারেন এসবের পশ্চাৎপটে আছে দুজন অজ্ঞাত মানুষের অপরূপ নিষ্ঠা, ত্যাগ ও পরিশ্রমের কাহিনী, একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী এবং অপরজন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস না নিলেও ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত ত্যাগব্রতী মানুষ। সমতল থেকে দুর্গম পর্বত-অরণ্যপথে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পতাকাধারী নিঃসহায় দুটি মানুষ পাহাড়ে উঠে এসেছিলেন। তাঁদের একমাত্র সম্বল ছিল মানুষের জন্য বুকভরা ভালবাসা—যা তাঁরা অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন পাহাড়ী মানুষের কল্যাণে।*

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার: স্বামী সুমেধানন্দ (অধ্যক্ষ, চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম) এবং খগেশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

শারীরবিদের দৃষ্টিতে মাদকের ক্রিয়া

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

শারীরবিদ্যা বিজ্ঞানেরই অংশ। আমাদের বোধ, চেতনা, প্রেরণা, ক্রিয়া ইত্যাদির দায়িত্ব প্রধানতঃ স্নায়ুতন্ত্রের (নার্ভাস সিস্টেম-এর)। প্রধানতঃ বলার কারণ কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—"রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

তবে, বোধ ইত্যাদির দায়িত্ব প্রধানতঃ স্নায়ুতন্ত্রের হলেও দেহের প্রতিটি অংশেরই সে দায়িত্ব বহন করার শক্তি খানিকটা রয়েছে।

স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়েছে অনেকগুলি স্নায়ু (নার্ভ) দিয়ে। প্রতিটি স্নায়ুর গঠনে লাগে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ (নিউরন)। অর্থাৎ এক একটি স্নায়ুকে কল্পনা করা যেতে পারে বহু স্নায়ু-কোষের শৃংখলরূপে। এই শৃংখলের দুটি স্নায়ু-কোষের জোড়ের (সাইন্যাপস) মুখে একটি ফাঁক আছে (সাইন্যাপটিক ক্লেফট)। স্নায়ু দিয়ে গঠিত হবার সময় একটি রাসায়নিকদ্রব্য উত্তেজনাকে দুটি স্নায়ুর মাঝের ফাঁক পার করে দেয়। কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহনে বাধা দিতে আবার কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহন করতে। একটি সংবাদ প্রেরণ সম্ভব তখনই যখন যে কোষগুলি বাধা দিচ্ছে তাদের সংখ্যা, যে কোষগুলি যেতে দিতে চাইছে তাদের সংখ্যার চাইতে কম। প্রতিটি প্রেরণা কতটা বাহিত হবে সেটা নির্ভর করবে প্রেরণার শক্তির উপর।

এক্ষেত্রে তাহলে মাদকের ভূমিকা কি?

মস্তিষ্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন দৈহিক আর মানসিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে—মন, মস্তিষ্ক আর সর্বদেহ মিলিয়ে আসলে একটি সংগঠিত একক (unit)। ভিন্ন ভিন্ন মাদক ভিন্ন ভিন্ন এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে। এই উত্তেজনা এবং অবদমন অনেকাংশে নির্ভর করে স্নায়ুকোষের জোড় এবং মাঝখানের ফাঁকের ভিতরে মাদকের ক্রিয়ার উপর। ফলে কোন মাদক উত্তেজিত করে আবার কোন মাদক অবদমিত করে। তার ফলে এই সংগঠিত একক বিশৃংখল হয়। তাছাড়া এক-একটি মাদক এক-একটি বিশিষ্ট এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে। ফলে তাদের ক্রিয়াও হয় বিভিন্ন।

উদাহরণ—হাইপোথ্যালামাস নামে একটি মস্তিষ্কের অংশ আছে। তার কোন অংশকে উত্তেজিত করলে তৌর সুখানুভূতি হয়; আবার অন্য অংশ-গুলি চিন্তা, দৃষ্টি, স্মৃতি, সমন্বয় ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে কোন মাদকের ক্রিয়া কার প্রতি কিরকম হবে ডাক্তারদের পক্ষে প্রতি ক্ষেত্রে সেটা বলা সম্ভব নয়। নানা কারণে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কমবেশি হতে পারে। এর কারণ হতে পারে মাদকের নিজস্ব গুণাগুণ—যেমন, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা, ঘনত্ব ইত্যাদি। তাছাড়া মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করে দেহে প্রবেশপথের ওপর। একই মাদক একই পরিমাণ মুখে খেলে একরকম ক্রিয়া হবে আবার ইঞ্জেকশন নিলে ক্রিয়া হবে অন্যরকম। ইঞ্জেকশন আবার শিরাপথে নিলে যেরকম ক্রিয়া হবে মাংসপেশীর ভিতরে নিলে ক্রিয়া সেরকম নাও হতে পারে।

নেশার জন্য দেহে মাদক প্রবেশ করানোর অনেক-গুলি পথ আছে। যেমন ধূম হিসাবে পান করা, নস্যির মতো নাকে নেওয়া, মুখে দিয়ে গিলে ফেলা, চিবানো, ঠোঁটের ফাঁকে রেখে দেওয়া, মাংসপেশীতে কিংবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন নেওয়া ইত্যাদি।

কিছু ক্রিয়া আছে যেগুলি ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক অবস্থানির্ভর। বেশি পরিমাণে মাদক খেলে নেশা বেশি হবে আবার মাদকে যদি ভেজাল থাকে তাহলে ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত বস্তুর ধর্মের উপর মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করবে।

ঘনত্ব ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। পানীয় মদের ক্রিয়া নির্ভর করে প্রধানতঃ তার ভিতরে সুরাসারের পরিমাণের উপর। বিয়ারে যদি শতকরা পাঁচ ভাগ সুরাসার থাকে আর ভোদকায় যদি থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ তাহলে যে পরিমাণ ভোদকা খেয়ে একটা লোক মাতাল হবে, বিয়ার খেয়ে মাতাল হতে হলে তাকে খেতে হবে তার আটগুণ। অঙ্কটা অবশ্য অত সহজ নয়, নেশার অন্যান্য কারণ বিচার করলে

ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হবে। গাঁজা, ভাঙ, চরস, সিদ্ধি এগুলি একই গাছ থেকে হয় এবং এগুলির মাদকতা অর্থাৎ ক্রিয়াশীল রসায়ন সর্বক্ষেত্রেই এক। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদক-রসায়ন প্রায় নেই বললেই চলে। সেই গাঁজা যতই খাওয়া যাক নেশা হবে না। গাঁজা গাছের প্রকারভেদ অনুসারে মাদকের পরিমাণেরও প্রকারভেদ হয়। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা প্রায় পনের ভাগ। তাহলে একজন যদি এমন গাঁজা খান যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা আধভাগ মাত্র, আর অন্য একজন যদি একই পরিমাণ গাঁজা খান কিন্তু সে গাঁজাতে মাদকের পরিমাণ যদি থাকে শতকরা পনের ভাগ তাহলে দুজনের নেশার তারতম্য হওয়া উচিত ত্রিশগুণ। এইরকম হিসাব আফিম সম্পর্কেও দেওয়া যায়। মাদক যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে যা হওয়া উচিত এ হিসাব তাই। কিন্তু মাদক যাঁরা বিক্রি করেন তাঁরা কেউই সচ্চরিত্র নীতিবাগীশ নন। ভেজাল দিতে তাঁরা কসুর করেন না। এক গ্রাম সাদা হেরোইন যদি আড়াইশ টাকায় বিক্রি করা যায় তাহলে তার সঙ্গে এক গ্রাম গ্লুকোজ মিশিয়ে বিক্রি করলে তার দাম পাঁচশ টাকা হবে।

জীবনের সর্বোচ্চ প্রকাশ মনে। এই মনের উপরই মাদকের প্রভাব সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মাদক অনেক সময় উপস্থিত মানসিক অবস্থাকে উত্তেজিত করে বাড়িয়ে দিতে পারে আবার মনের গভীরে যে চাপা ভাব ছিল তাকে উসকেও দিতে পারে। তবে যে নেশা করছে তার পরিবেশের উপর মাদকের প্রতিক্রিয়া অনেকটা নির্ভর করে। লোকটি যদি ক্লান্ত থাকে কিংবা সে যদি খালিপেটে নেশা করে তাহলে নেশা তার অনেক বেশি জোরদার হবে।

নেশা, যৌনজীবন এবং অপরাধ

নেশার সঙ্গে যৌনজীবনের কি কোন সম্পর্ক আছে?

সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। যৌনজীবনের অর্থ যদি পরিবারভিত্তিক সুস্থ সামাজিক জীবন হয় তাহলে যে-কোন নেশাতেই তার ক্ষতি হবার কথা। তবে সব নেশার ক্রিয়া একরকম হয় না। শুধুমাত্র যৌনক্রিয়ার দৈহিক দিক বিচার করলে বলা যায়, যে-কোন নেশাতেই শেষ পর্যন্ত যৌনক্ষমতা হ্রাস পায়, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসামাজিক অপরাধের সঙ্গে নেশার সম্পর্ক:

নেশাখোর সাধারণতঃ হয় ভীরু, কাপুরুষ। চুরি-ডাকাতি করার প্রবৃত্তি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তবে দেহে ও মনে যখন তারা মাদকের অভাব বোধ করে তখন মাদক সংগ্রহের জন্য যে-কোন উপায় তারা গ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থায় অপরাধ-জগতের নেতারা অনেক সময় তাদের ব্যবহার করে। এই একই কারণে তারা যৌন-অপরাধের সঙ্গেও জড়িত হতে পারে।

নেশাখোরের ব্যক্তিত্ব:

প্রতিটি মানুষের চেহারায় যেমন পার্থক্য রয়েছে মনের গঠনও রয়েছে তেমনি পার্থক্য। তবুও চিকিৎসকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের শ্রেণী-বিন্যাস করেন। নেশাগ্রস্তদের কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। আবার উল্টো করে বলা যায় সবরকম ব্যক্তিত্বই নেশাগ্রস্তদের ভিতর পাওয়া যায়। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে এরকম কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে, সে মাঝে মাঝে মদ খেলে তার মদের নেশা জন্মাতে পারে কিনা, তাহলে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা খুঁজে পাব না। নেশাখোরের যেমন কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব নেই তেমনি নেশারও কোন জাত নেই। সেইজন্যই কোন বিশেষ মাদকের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সাধারণভাবে মাদক নিয়ে আলোচনা করছি। এর অর্থ হলো—এরা জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিদিনের বাঁচার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। তারা চায় সে লড়াই থেকে পালাতে। তার জন্য প্রয়োজন হলে সে জীবন থেকেও পালাবে অর্থাৎ বেছে নেবে মৃত্যুকে।

সাধারণভাবে নেশাটাই যে আসল সমস্যা, কোন বিশেষ একটি মাদক সে সমস্যা নয়—এ তথ্য বোঝা যায় আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন—বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন রোগীকে একটি নেশা

ছাড়তে বাধ্য করলে সে অন্য নেশায় অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে। সে নেশা তার মূল নেশার সমধর্মী না হলেও ঐ চেষ্টা সে করে। মদ্যপানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যে মদ্যপ আর মদ ছুঁতে পারবে না, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সে বারবিটিউরেট, মিথাকুয়ালোন কিংবা আফিম জাতীয় নেশা শুরু করবে। এর অর্থ আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। এগুলি সবই স্নায়ুতন্ত্র অবদমনকারী, সুতরাং একটার বদলে অন্যটা চলতে পারে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই যদি সে না পায় তাহলে সে স্বচ্ছন্দেই গাঁজা, চরস কিংবা সিদ্ধি খাওয়া শুরু করতে পারে। অথচ মদ এবং গাঁজার চরিত্রে পার্থক্য অনেক। তাছাড়া অনেক সময়ই দেখা যায় কোন এলাকায় কোন নতুন নতুন নেশা উপস্থিত হলে নেশাগ্রস্তরা অনেকেই সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রেও বোঝা যায় কিছু ব্যক্তির পলায়নী মনোবৃত্তি তাদের বাস্তব থেকে পলায়নে উৎসাহিত করে। মদ, মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাক্স, প্রোডম) আর হেরোইন এইগুলিতে নেশাগ্রস্তরা হামেশাই তাদের নেশা বদলে নেয়।

নেশাগ্রস্তদের মনের গতি দুর্বোধ্য। আসলে মন সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। বিজ্ঞান-পূর্ব যুগে মন সম্পর্কে গবেষকরা নানারকম প্রতিরূপ গঠন করতেন। বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের কল্পিত প্রতিরূপ সেই প্রচেষ্টারই একটি সামান্য অংশ। বুদ্ধঘোষ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ প্রমুখ প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে একটি প্রতিরূপ আমি উল্লেখ করছি।

এই প্রতিরূপে মনের তিনটি অংশ কল্পনা করা হয়েছে—স্পর্শ, বেদনা এবং চেতনা। স্পর্শ (পালিতে ফস্‌স) বলতে এঁরা বুঝেছেন জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বসম্পর্কীয় সমগ্র উপলব্ধি। অবশ্য বৌদ্ধদের সমস্ত বক্তব্যই তাঁদের ক্ষণিকবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ স্পর্শ এবং সমগ্র মনই ব্রহ্মাণ্ডের মতো ক্ষণস্থায়ী এবং সদা পরিবর্তনশীল। বুদ্ধঘোষ তাঁর 'অত্থসালিনী' বইয়ে এর সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাসাদের প্রধান স্তম্ভের সঙ্গে আর মনকে তিনি তুলনা করেছেন প্রাসাদের সঙ্গে। এই মূল স্তম্ভের উপরই দেওয়াল-কড়ি-বর্গাসমেত সমগ্র প্রাসাদ অর্থাৎ মনের প্রতিষ্ঠা।

বুদ্ধঘোষ বলেছেন এই স্পর্শ থেকেই বেদনা অর্থাৎ বোধ এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় প্রেরণা আর উদ্যম। ব্যাপারটা অবশ্য সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্কের মতো সহজ নয়। বৌদ্ধযুক্তি আমাদের মতো স্বল্পবুদ্ধি লোকের কাছে বেশ জটিল, হয়তো দুর্বোধ্যও বটে। তবে আমাদের আলোচনার পক্ষে বেদনা সম্পর্কে এইটুকুই জানলে চলবে—চেতনা বলতে ওঁরা বোঝাচ্ছেন মনের ক্রিয়াশীল অংশ। সংকেতটা অনেকটা এই রকম—উত্তেজনা → প্রেরণা → ক্রিয়া। নেশাতে বিকৃত হয় স্পর্শ—অর্থাৎ বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা বিকৃত হয়। ফলে বিকৃত হয় প্রেরণা এবং তার ফলশ্রুতি অস্বাভাবিক ক্রিয়া। মানসিক রোগেও একই পদ্ধতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু কারণে। মানুষের বেঁচে থাকতে হলে সুস্থ চেতনা এবং বিচারবুদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন। এখানে চেতনা শব্দ আধুনিক বাংলা অর্থে প্রয়োগ করছি, বৌদ্ধ দার্শনিকদের অর্থে নয়। নেশার প্রধান আক্রমণ চেতনার বিরুদ্ধে।

এইবার সাধারণ ভাষায় একজন নেশাখোরের চরিত্র বিচার করা যাক। প্রথমতঃ বলে রাখা উচিত এই রকম অবস্থায় পেঁছাতে হলে নেশা শুরু করার আগে তার বিশেষ কোন রকম ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক নয়। তবুও রোগীর মূলগত ব্যক্তিত্বের উপর নেশাগ্রস্ত হবার পর তার চরিত্রের পরিবর্তন খানিকটা নির্ভর করে। তবে এই ধরনের পরিবর্তন কম-বেশি অধিকাংশ নেশাগ্রস্তের ভিতরেই দেখা যায়। যে নেশাখোর নয় তার জীবনে নানারকম আকর্ষণ থাকে — যেমন, ভাল খাওয়া-পরা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলাধুলো ইত্যাদি। এগুলির ভিতর একটি-দুটির আকর্ষণ প্রধান, অন্যগুলির আকর্ষণ অপ্রধান। মা-বাপের প্রধান আকর্ষণ হয়তো সন্তান, সন্তানের প্রধান আকর্ষণ হয়তো মা, স্বামীর প্রধান আকর্ষণ স্ত্রী, স্ত্রীর প্রধান আকর্ষণ হয়তো স্বামী। সত্যিকারের নেশাগ্রস্তের প্রধান আকর্ষণ নেশা। সামাজিক মানুষ খোলাখুলি এমন কোন কাজ করে না যার সামাজিক অনুমোদন নেই। তার কারণ সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, সমাজকে সে ভালবাসে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাকে সে ভয়

পায়। সে খোলাখুলি পরস্ব অপহরণ করবে না, বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেবে সামাজিক বন্ধন, তার পারিবারিক বন্ধন। নেশাগ্রস্তের প্রধান আকর্ষণ মাদক, তার প্রধান বন্ধন মাদক। সুতরাং সামাজিক বাধা অতিক্রম করা তার পক্ষে কোন সমস্যাই নয়—যেমন সমস্যা নয় পারিবারিক বাধা অতিক্রম করা। তার সংগঠিত ব্যক্তিত্ব অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল হয়েছে, তার মানসিক ভারকেন্দ্র হয়েছে নেশা। তার নানারকম বিকৃত ব্যবহার হয়তো আমরা দেখতে পাব। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকলে নিজের রোজগার করা টাকায় স্ত্রীর সংসার-খরচ, ছেলের দুধের দাম আর সিগারেট-মদের খরচ এগুলির ভিতরে কার অগ্রাধিকার সেটা শেখাতে হয় না। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মানুষকে চেষ্টা করেও সেটা শেখানো যায় না। সুস্থ মস্তিষ্কে যার মুরগি-কাটা দেখতেও খারাপ লাগে সে নেশা করে মানুষও খুন করতে পারে।

সুস্থ মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সান্নিধ্য উপভোগ করে। তাদের আকর্ষণ তাদের দিনের শেষে ঘরমুখী করে। নেশাগ্রস্তকে টানে নেশা। এমনকি বাড়িতে থাকলেও নেশা তাদের মনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে পরিবার পরিজন থেকে।

তারা পরস্ব অপহরণ করে অর্থাৎ চুরি করে নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য। নেশার পক্ষে খানিকটা অগ্রসর হবার পর একদিকে বাড়ে নেশার প্রয়োজন অন্যদিকে বাড়ে আর্থিক অভাব। তখন হয়তো সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কর্মক্ষমতা তার কমেছে। সুতরাং চুরি আর মিথ্যা কথা বলা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই তার। এই কারণে নেশাগ্রস্ত মেয়েরা নিস্পৃহ-ভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে। আকাঙ্ক্ষা তাদের যৌন-আনন্দ নয়—তারা চায় মাদক। তাদের মূল্যবোধের ব্যাপারে মাদকেরই অগ্রাধিকার। চরিত্রের দিক থেকে এদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—মিথ্যাকথা বলা। কখনো মনে হয় মিথ্যাকথা বলা এদের সহজাত বৃত্তি, কখনো মনে হয় সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্যবোধ এদের নেই। অসুবিধা হয় চিকিৎসকদের। এদের তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না। অথচ রোগীর সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তাদের আচরণের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। চিকিৎসকের কাছে এ এক উভয়সংকট। এরা হয় যেমন নোংরা তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীন। ভালবাসার বন্ধনের অভাব এদের চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় দিক। স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা, চাকরি, অর্থ, বিত্ত—এসবের চাইতে বেশি আকর্ষণ এদের মাদকে। অন্য কোন আকর্ষণ, কোন ভালবাসাই এদের নেশা করা বন্ধ করতে পারে না। বোঝা যায় মাদক ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়েই এদের স্পৃহা কম।

নেশাগ্রস্তের সংখ্যা

এদেশে কত লোক নেশা করে সে সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই. ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছু কিছু পরিসংখ্যান করা হয়েছে। তবে চা, কফি, তামাক (সিগারেট, বিড়ি, খইনি, জর্দা, নস্যি ইত্যাদি) মদ, গাঁজা (সিদ্ধি, ভাঙ, চরস ইত্যাদি) আফিম (মরফিন, কোডিন, পেথিডিন, হেরোইন ইত্যাদি) মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাক্স, প্রোডোম ইত্যাদি), এ্যাম্ফিটামিন ইত্যাদি সব মিলিয়ে হিসাব করলে মনে হয় আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই কোন-না-কোন মাদকে আসক্ত। অনেকের আসক্তি একাধিক মাদকে। যেমন—চা, সিগারেট, মদ এই তিনটে নেশা অনেকেই করেন। তাছাড়া সানাইয়ের পো-এর মতো প্রায় সব মাদকাসক্তই অন্যান্য নেশার সঙ্গে এগুলি খান।

প্রতিরোধ

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চেতনা। তার বিরুদ্ধে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপায় কি? এর বিরুদ্ধে পূর্ণ জয়লাভের সম্ভাবনা কতটা? দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা ভাল। পূর্ণ জয়লাভ অর্থাৎ মানুষের সমাজে সুস্থ চেতনার পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে রয়েছে বলে মনে হয় না, তবে পূর্ণ জয়লাভ নাই বা হলো, আংশিক জয়লাভের চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন—চীনদেশে আসবাসক্ত নেই। ওদেশের সব চাইতে বিখ্যাত মদ মাওতাই অনেকেই খায়। শুনেছি এ মদ তারা বিদেশেও রপ্তানি করে। ওদেশের জনসংখ্যা ১০০ কোটির বেশি। অথচ আসবাসক্ত অর্থাৎ মদে অত্যাসক্ত (এ্যালকোহলিক) ওদেশে নেই। ওদের সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধির হার ভয়াবহ। শুনেছি ইউরোপের

তথা পৃথিবীর বহু দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের একটা কারণ মদে অত্যাসক্তি। এ তথ্যের সাধারণীকরণ করে বলতে ইচ্ছে হয় জীবনযুদ্ধে যারা জীবন-বিরোধী পথ নিয়েছে জীবন তাদের পরিত্যাগ করছে। পৃথিবীর দুটি জাতের ভিতরে মদে অত্যাসক্তি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। তারা হলো চীনা আর ইহুদী। আমেরিকায় যে দু-একজন চীনা আসবাসক্ত পাওয়া যায় তাদের পূর্বপুরুষ আমেরিকায় এসেছে কয়েক পুরুষ আগে। চীনা অধিবাসীদের (যাঁরা চীন ছেড়ে এসে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছেন অর্থাৎ ইমিগ্র্যান্ট) প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের ভিতরে মদে অত্যাসক্তি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। এর কারণ সম্পর্কে গবেষণা করলে হয়তো আমরা মদ তথা অন্যান্য নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিছু অস্ত্র পেতে পারি।

অথচ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভারতীয় মুৎসুদ্দিরা চীনাদের আফিমের নেশা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় বেশ সফল হয়েছিলেন। চীন থেকে আফিম তাড়াতে প্রয়োজন হয়েছিল একটি সশস্ত্র বিপ্লব। এ দুটি ক্ষেত্রেই জয় হয়েছিল—তবে সে জয় ছিল আংশিক। তবে জয় আংশিক হোক বা পূর্ণই হোক প্রতিরোধের সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। সব-সময়েই মনে রাখতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু সুস্থ চেতনা রক্ষার সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর এবং গভীরতর চেতনার সপক্ষে এ সংগ্রাম। এ সংগ্রাম পরিত্যাগ করা আর মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করা সমার্থক। এই সংগ্রামকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) নেশাগ্রস্তের চিকিৎসা করে তাকে নেশার বন্ধন থেকে মুক্ত করা।

(২) লোকের নেশাগ্রস্ত হওয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা।

নেশাগ্রস্তের চিকিৎসা

এ সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য—

নেশা একটি রোগ। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হওয়া একটি বিশেষ রোগগ্রস্ত হওয়া। এই রোগ শুধু শারীরিক কিংবা শুধু মানসিক নয়, তা আক্রমণ করে শরীর এবং মন উভয়কেই।

নেশা সম্পূর্ণ সারে না, তবে চেষ্টা করলে এ-রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় মধুমেহ অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগের। ডায়াবেটিস সারা জীবনেও সারে না তবে চেষ্টা করে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে একজন রোগী কর্মক্ষম, ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। নেশা-রোগ সম্পর্কেও একথা বলা যায়।

চিকিৎসকরা নেশা-রোগের চিকিৎসাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

প্রথম ধাপে সাধারণতঃ রোগীকে তার মাদক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। সম্ভব হলে সুরক্ষিত হাসপাতালেই একাজ করা সুবিধাজনক, তবে এরকম হাসপাতালের সংখ্যা এত অল্প যে প্রয়োজনে রোগীর বাড়িকেও হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়! এই ধাপকে অনেক সময় বিষমুক্ত (Detoxification) করা বলে। এই সময় প্রধানতঃ মাদকের দৈহিক কুফলের চিকিৎসা করা হয়। মাদকের জন্য মানসিক আকাঙ্ক্ষা রোগীর আজীবন থাকে এবং তার চিকিৎসাও আজীবন করতে হয়। তবে প্রাথমিক স্তরে মাদক থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা খানিকটা কমে। দ্বিতীয় ধাপে রোগীর মানসিক আকাঙ্ক্ষা কমাবার জন্য তাকে একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এই গোষ্ঠীতে সাধারণতঃ তাঁরাই থাকেন যাঁরা নিজেরা মাদকাসক্ত কিন্তু বর্তমানে মাদক গ্রহণ করেন না এবং নিজেরা মাদকের আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। মাদকাসক্তদের আমরা এই প্রসঙ্গে দুই ভাগে ভাগ করি—মাদকসেবী মাদকাসক্ত এবং মাদকত্যাগী মাদকাসক্ত। আগেই বলা হয়েছে যেহেতু মাদকাসক্তি রোগ সারে না সেইজন্য একজন রোগী মাদক ত্যাগ করার পর সারাজীবন মাদক গ্রহণ না করলেও চিকিৎসকের দৃষ্টিতে সে মাদকাসক্তই থেকে যায়। তবে তাকে বলা হয় মাদকত্যাগী মাদকাসক্ত। এই গোষ্ঠীগুলি অনেকসময়ই একজন বিশেষজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তবে সাধারণতঃ মানসিক চিকিৎসকের প্রয়োজন এই স্তরে খুবই কম। চিকিৎসার তৃতীয় ধাপ হলো জীবনের মূলস্রোতে এদের ফিরিয়ে আনা।

এর পরেই প্রশ্ন হতে পারে 'জীবনের মূলস্রোত' কথাটার অর্থ কি? সেটা নির্ভর করে রোগীর বয়স, সামাজিক অবস্থান, নেশা-পূর্ব পেশা ইত্যাদি বহু উপাদানের উপর। এইভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু এদেশে এ-ব্যবস্থা কতজনের পক্ষে করা সম্ভব? ব্রিটেনে দ্বিতীয় ধাপের চিকিৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে পঞ্চাশ জনের চিকিৎসা হতে পারে। তাহলে সেখানে প্রায় এক হাজার রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ওখানে শুধুমাত্র নথিভুক্ত হেরোইন-আসক্তের সংখ্যাই এক লক্ষের বেশি। এ ছাড়া রয়েছে মদ, কোকেন এবং অন্যান্য মাদকাসক্ত লক্ষ লক্ষ রোগী।

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার অনুপাতে এ ব্যবস্থা আরও কম। আমাদের দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ নেশাগ্রস্তের সংখ্যা এদেশে কোন দেশের চাইতে কম নয়। চিকিৎসার প্রথম ধাপ অর্থাৎ রোগীর দেহকে বিষমুক্ত করা এবং দৈহিক যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ করার পর যদি চিকিৎসা বন্ধ করা যায় তাহলে কি কোন লাভ হয়? লাভ নিশ্চয়ই হয়। সম্পূর্ণ নেশামুক্তি না হলেও আংশিক নেশামুক্তিও একটা লাভ। তবে যেহেতু এই রোগ সারে না সেইজন্য চিকিৎসার দ্বিতীয় ধাপের ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন। যদি ব্যক্তি হিসাবে একজন নেশাগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসার কথা বিবেচনা করা যায় তাহলে দ্বিতীয় ধাপের ব্যবস্থা ছাড়া সে চিকিৎসা চিন্তা করাও মূর্খতা।

রোগীর বয়স হয়তো ১৫।১৬ থেকে ত্রিশ-বত্রিশের ভিতরে। সে নেশা করে জগৎ থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন। নেশাই তার জীবনের প্রধান অভিমুখ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভালবাসা, পরিবার, জীবন-সংগ্রাম কোন বিষয়েই তার স্পৃহা নেই। সাধারণ সামাজিক সততা এবং ব্যবহার সে ভুলে গিয়েছে। পরিণত হয়েছে অসামাজিক জীবে। সমাজবিরোধীদের তার অনাত্মীয় মনে হয় না। মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদির ব্যবসায়ীদের ভিতরে বেআইনী কারবারীরাই সংখ্যাগুরু। তাদের সঙ্গে এই নেশাগ্রস্তদের নিত্য সম্পর্ক। এইরকম এক ব্যক্তির দেহকে বিষমুক্ত করে দৈহিক চিকিৎসার পর্ব শেষ করতে দু থেকে আট সপ্তাহ লাগে। কেউ কি আশা করতে পারেন এইরকম পূর্ণবয়স্ক একজনের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হবে আট সপ্তাহে? যদি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সম্ভবও হয় তাহলে তার জন্য খাটতে হবে বহুদিন। তাহলে এটা একটা উভয়সংকট।

দ্বিতীয় ধাপে চিকিৎসাব্যবস্থা না করলে নেশাগ্রস্ত রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ এদেশে প্রয়োজন অনুসারে সে ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা আরও কম। এই উভয়সংকট চিকিৎসার তৃতীয় ধাপ আরও প্রকট। আমাদের মনে আছে তৃতীয় ধাপ বলতে আমরা বুঝি জীবনের মূল স্রোতে মিলে যেতে সাহায্য করা। কিন্তু মূলস্রোত কাকে বলে? সবার ক্ষেত্রে এ স্রোত এক নয়। সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী, বয়স, পেশা, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি নানা উপাদানের উপর নির্ভর করে একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার জীবনের মূলস্রোত। একজন নেশাগ্রস্ত রোগীকে জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কজনের ক্ষেত্রে এ সাহায্য করা সম্ভব? এদেশে কজন কর্মীর সে প্রশিক্ষণ আছে? তাছাড়া প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রয়োজন দরদ দিয়ে দেখা। তেমন লোক কি আছে? থাকলেও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাহলে উপায়? চেতনার বিরুদ্ধে কি এ আক্রমণ চলতেই থাকবে? না, উপায় আছে। যদি এমন কোন সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয় যে আন্দোলনের উত্তেজনায় চেতনা বিকৃত করার প্রয়োজন হবে না, যে আন্দোলনের প্রভাবে মাদকের কারবারীদের প্রভাব থাকবে না। যার ফলে মানুষ নেশা ধরবে না—সুতরাং নেশা ছাড়াবার প্রশ্ন থাকবে না। থাকলেও সে প্রয়োজন হবে অত্যন্ত অল্প, তাহলে হয়তো এ-সমস্যা সমাধানের সূত্র একটি মিলতে পারে। অর্থাৎ রোগ হবার পর চিকিৎসা-ব্যবস্থার চাইতে রোগ না হবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনেক বেশি। চীন-বিপ্লবের সময় বিপ্লবের উন্মাদনা ছিল। তাছাড়া বিপ্লবে অন্যান্য সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে আফিমের চোরা-কারবারীরাও ধ্বংস হয়। সুতরাং ধ্বংস হয় আফিম জাতীয় মাদকে আসক্তির সমস্যাও। ভিয়েৎনামের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই ধরনের সংগ্রাম জনসাধারণের উন্নততর জীবনের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

তবে একক ব্যক্তির চিকিৎসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে আমরা যে সমস্যা দেখেছি, এধরনের সংগ্রাম সে সমস্যারও সমাধানে সাহায্য করে। অর্থাৎ দেহ বিষমুক্ত করার পর সুস্থজীবনমুখী সংগ্রামীদের সাহচর্যের অভাব হয় না। তাছাড়া জীবনের মূল-স্রোতের অভিমুখে, জীবনের সপক্ষে পরিবর্তনের ফলে নেশাসক্তের মূলস্রোতে মেশা সহজ হয়। হয়তো সামান্য কিছু লোকের কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হবে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বে-আইনী চোলাই মদের দাম চায়ের দামের চাইতে কম। কিন্তু সেই মদের ব্যবসা বন্ধ করলে গ্রামাঞ্চলের বেকারি বাড়বে।

বিড়ি, খইনি, তামাক চাষ বন্ধ করলেও গ্রামের বেকারি বাড়বে। হেরোইনের ব্যবসাও শহরের বস্তি অঞ্চলের বেকারি ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত। অথচ আমরা জানি, নেশার ব্যবসায়ে সমাজের এক শ্রেণীর বেকারি কমলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের দারিদ্র্য এবং দুর্দশা বাড়ায়। অর্থাৎ নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ—শৃংখল ছিন্ন করার সংগ্রামেরই এক অংশ। এ সংগ্রাম শক্তিশালী হলে শুধুমাত্র একক নেশাসক্তের চিকিৎসারই সুরাহা হবে না—সমাজও এগিয়ে যাবে আরো কয়েক ধাপ।

এর পর পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন এ সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কি? সে-কথা বলেই আজকের কথা আমরা শেষ করি। সুস্থতর এবং উচ্চতর চেতনার সংগ্রাম চলছে হয়তো জীবনের আবির্ভাবের শুরু থেকেই। এমনকি আমরা সূত্রপাত ধরতে পারি চেতনারই যে আদিম চিহ্ন জড়েও রয়েছে সেখান থেকেও। এই চেতনার বিকৃতি আদিমকাল থেকে চলে আসছে। অসহনীয় এই জীবনসংগ্রাম থেকে সাময়িক অব্যাহতিই ছিল তার কারণ। ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক, শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক সমাজ যত অগ্রসর হয়েছে, মানুষের এই আদিম দুর্বলতাকে ততই বেশি করে ব্যবহার করেছে সমাজের মালিক শ্রেণী। এই চেতনাবিকৃতির রূপ বহু। নেশা যেমন তার আদিমতমরূপ, প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক প্রচারযন্ত্র তেমনি তার আধুনিকতম রূপ। সুতরাং সার্বিক সংগ্রাম শুধু নেশার বিরুদ্ধে নয়। এ সংগ্রাম সর্বপ্রকার চেতনাবিকৃতির বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম শুধুমাত্র সুস্থ চেতনা রক্ষার সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর এবং গভীরতর চেতনার সপক্ষে সংগ্রাম।

সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ সংখ্যার উদ্বোধন-এ অনবধানতা-বশতঃ কয়েকটি ভুল থেকে গিয়েছে। এই ভুলগুলির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।—যুগ্ম সম্পাদক

পৃষ্ঠা: ২৪১, বাঁদিকের স্তম্ভ ওপর থেকে পঙ্‌ক্তি ৪:

মুদ্রিত—মতে ১২৭৯/১৮৫২ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ/জুন)

হবে—মতে ১২৭৯/১৮৭২ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ/৫ জুন)

পৃষ্ঠা: ২৭০ পাদটীকা:

মুদ্রিত—১৮৮৯

হবে—১৯৮৯

পৃষ্ঠা: ২৭২, বাঁদিকের স্তম্ভ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পঙ্‌ক্তি ১৮:

মুদ্রিত—(শ্যালক)

হবে—(ভগ্নীপতি)।

পৃষ্ঠা: ২৭২, ডানদিকের স্তম্ভ ওপর থেকে পঙ্‌ক্তি ৫:

মুদ্রিত—হিন্দু লীগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আলাসিঙ্গার পিতৃব্য,

হবে—হিন্দু লীগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আলাসিঙ্গার মাতুল,

পৃষ্ঠা: ২৯৯, ডানদিকের স্তম্ভ

মুদ্রিত—স্যান্ডেলের বিল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) পাঠচক্রের

হবে—স্যান্ডেলের বিল (উত্তর ২৪ পরগনা) পাঠচক্রের

শ্রীমা সম্পর্কে নতুন আলোচনা

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

সনাতনী সারদা ঃ রবীন্দ্রনাথ হাজরা। শিশু-সাহিত্য প্রকাশনী, ৪জি/১বি, শীলস গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৭০০০০২। মূল্য পঁচিশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে চব্বিশটি অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দিকগুলি হলো ঃ ত্রয়ী (ঠাকুর, মা, স্বামীজী), দাম্পত্যজীবন, আদর্শ গৃহিণী, সঙ্ঘজননী, জীবনচর্যা, নিবেদিতা, লোকশিক্ষা, নববেদান্ত, সমন্বয়, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, সীতা ও সারদা, প্রাচীন ও নবীন আদর্শের সমন্বয়, ব্যক্তিত্ব ও বর্তমান বিশ্ব।

শ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে উৎসুক পাঠকের কাছে এখন বহু প্রামাণ্য পুস্তক রয়েছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ছাড়া সেগুলি হলো ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ লিখিত জীবনী ও স্মৃতিগ্রন্থগুলি। এছাড়া রয়েছে 'শতরূপে সারদা'র মতো প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। তবু আরও বই লেখা হয়েই চলেছে। লেখকরা বোধ হয় আপন তাগিদেই লেখেন। একথা ঠিক যে, সন্ধানী পাঠক পূর্বোক্ত বইগুলি থাকতে সাধারণতঃ অন্য বইতে মন দিতে চাইবেন না। তবু বলব শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজন আছে। তাঁর জীবন ও চরিত্র যত বেশি আলোচিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। বর্তমান লেখকের ধ্যান ও প্রয়াস প্রশংসনীয়।

বিবেকানন্দ-চর্চায় প্রয়োজনীয় বই

পলাশ মিত্র

A Pilgrimage To Khetri And The Sarasvati Valley. by: Arun Kumar Biswas. Sujan Publications, 7B Lake place, Calcutta 700 029. price Rs. 80/-

স্বামীজীর প্রতি খেতড়িরাজার অপরিসীম শ্রদ্ধা, খেতড়িরাজ তথা সেখানকার মানুষের প্রতি স্বামীজীর অফুরান ভালবাসা এবং খেতড়িরাজার সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে স্বামীজীর নানা অমৃতবাণী জীবনী-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। দুজনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিয়েও একাধিক গ্রন্থে স্বামীজীকে প্রথম যে-প্রশ্নটি করে খেতড়িরাজ তাঁর তৃষিত অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন, তা হলো—"স্বামীজী, জীবন মানে কি?" এর উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—"প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি চেষ্টা করছে জীবনকে দাবিয়ে রাখতে, আর তাদের গ্রাহ্য না করে অন্তঃশক্তি স্বীয় আবরণোন্মোচন বা ক্রমবিকাশ করে চলেছে—তাকেই বলে জীবন।"

বলা বাহুল্য, তারপরেও প্রশ্নকর্তা অজিত সিংহের প্রশ্নের বিরাম ছিল না এবং স্বামীজীও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানগম্ভীর সহাস্য মানসিকতা নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাজাকে যেন নবজীবন দান করলেন।

খেতড়ি জয়পুরের অন্তর্গত একটি ছোট রাজ্য। এখানে স্বামীজী গিয়েছিলেন মোট তিনবার। আমেরিকা যাবার আগে দুবার ও ফিরে এসে একবার। প্রথম সাক্ষাৎকার ৪ জুন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৯২, পৃঃ ২২২)। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন ঃ "খেতড়িতে আগমনের স্বল্পদিন পরেই রাজা স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূর্বক তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ ও মধুর ছিল; অজিত সিংহ স্বামীজীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন—স্বামীজীর সম্মুখে তিনি জানু পাতিয়া অভিবাদন করিতেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।"

বস্তুতঃ রাজপুতানা তথা খেতড়ির প্রসঙ্গ স্বামীজীর জীবন আলোচনায় এক উল্লেখযোগ্য

বিষয়। আলোচ্য ইংরেজী গ্রন্থটির প্রথম ভাগে স্বামীজী, রাজস্থান ও খেতড়ির নানা প্রসঙ্গ যেমন বিস্তারিতভাবে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে আলোচিত হয়েছে, তেমনি এর দ্বিতীয় ভাগে আছে সুপ্রাচীন সরস্বতী উপত্যকা-সভ্যতার ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ।

ভারতের ইতিহাসে ও রামকৃষ্ণ আন্দোলনে খেতড়ির ঐতিহাসিক অবদান লেখক বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানে রাজস্থানের অবদান, রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে স্বামীজীর শ্রদ্ধা, খেতড়িতে স্বামীজীর অবস্থানের ঐতিহাসিক দিনগুলি, রাজা অজিত সিংহের প্রশ্ন এবং স্বামীজীর উত্তর, স্বামী অখণ্ডানন্দের খেতড়িগমন-প্রসঙ্গ এবং আরও বহু তথ্য এই অংশে স্থান পেয়েছে। জওহরলাল নেহরুর জন্মের পরে পিতা মতিলাল নেহরুকে লেখা অজিত সিংহের পত্রের কথাও এখানে জানা যায়। জওহরলালের জন্মকোষ্ঠীর ব্যাপারে খেতড়িরাজার ভূমিকার বিষয়ও এখানে অনুক্ত থাকে না। খেতড়ির সঙ্গীতপ্রেমীদের সম্পর্কে লেখকের আলোচনা মনোগ্রাহী। ঠিক তেমনই আকর্ষক, খেতড়িতে স্বামীজীর প্রিয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গে লেখকের আলোচনা। সুরদাসের যে দুটি ভজন এবং অজিত সিংহের লেখা একটি ভজন স্বামীজীর খুবই প্রিয় ছিল, লেখক সেবিষয়েও জানাতে ভোলেননি। সুরদাসের ভজন দুটি বাঙলায় স্বামীজীর হস্তাক্ষরে বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত। খেতড়ি-অংশে বহু আলোকচিত্র গ্রন্থের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করেছে। অজিত সিংহকে প্রেরিত স্বামীজীর শুভেচ্ছাপত্র এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ-সরল ও আন্তরিক। বর্ণনাকে অকারণ দীর্ঘ করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি কদাপি ঘটাননি তিনি। ঠিক যতখানি প্রয়োজন ততটাই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বলেছেন। বক্তব্যকে প্রামাণিক ও তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের সহায়তাও নিয়েছেন তিনি এবং সূত্রনির্দেশে সততই তৎপর থেকেছেন। 'খেতড়ির অজিত সিংহ সম্পর্কে' স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন : "স্বামীজীও আশা রাখিতেন—এই শিষ্যের দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; তাই তিনি শুধু তাঁহার ধর্মজীবনের ভার গ্রহণ করেন নাই, লৌকিক জ্ঞানার্জনেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

অরুণকুমার বিশ্বাসের এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব খেতড়ি ও অজিত সিংহ এবং এইসূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনের কয়েকটি স্বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠার সঙ্গে পাঠক পরিচিত হবার আনন্দ পাবেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের বিষয় হলো সরস্বতী উপত্যকা-সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য। বিভিন্ন শিরোনামে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে তিনি এই সভ্যতার বিস্তারিত রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। পুরাতাত্ত্বিক ও ধাতুবিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের তথ্যাও আমাদের গোচরে এনেছেন তিনি। সুপ্রাচীন সরস্বতী নদী সম্পর্কে তাঁর আলোচনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। আগের অংশের মতোই এই পর্যায়েও মানচিত্র ও আলোকচিত্র গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তবে শুদ্ধিপত্র থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠারস-গ্রহণে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটায় নিঃসন্দেহে। এমন একটি মহৎ গ্রন্থের প্রকাশমান (দাম অনুপাতে) শোভন ও নয়নসুখকর বলতে পারলে সুখী হতাম। তৎসত্ত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই গ্রন্থের প্রকাশকে স্বাগত জানাই।

খেতড়িরাজার প্রতি জাতির ঋণ বড় কম নয়। খেতড়িতে এক অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন : "ভারতের উন্নতিকল্পে আমি সামান্য যাহা করিয়াছি, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমি তাহা করিতে পারিতাম না।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪২) রাজপুতানার কথা, রাজপুতের বীরত্বের কথা, সরস্বতী নদীর তীরে সেই সাধককণ্ঠের অমৃত বাণী ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিষয়ে (Complete Works, Vol. IV, 1989, p. 329) স্বামীজী কি অনুপম ভাষায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন, বিবেকানন্দ-পাঠকদের তা অজানা থাকার কথা নয়। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে সেই সব প্রসঙ্গ আবার যেন নতুন করে মন ও মননে তৃপ্তি আনে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিল **রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন** আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। উৎসবে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ ও অরুণকুমার সিংহ। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বহু সুন্দর বস্তু প্রদর্শনীতে দেখিয়েছে। প্রসাদ বিতরণের দিন প্রায় বারো হাজার ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বাউল গান, নাটক, গীতি-আলেখ্য, যাত্রা, শোভাযাত্রা, যাদু, কীর্তন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়ে আনন্দ পান। আশ্রম ও ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গত ১ মে '৯০ রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৩তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে **বলরাম মন্দিরে** সারাদিন ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, হোম এবং নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতির মাধ্যমে সকালের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্রে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপঙ্কর চৌধুরী। বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দের স্বাগত ভাষণের পর মিশন প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুহৃদ রুদ্র। সন্ধ্যায় ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন প্রফুল্লকুমার দাস এবং 'যুগ-নায়ক বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়। এই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন

গত ২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার এবং সংসদীয় মন্ত্রী পি. উপেন্দ্র **দিল্লী আশ্রম** পরিদর্শন করেন। ঐ দিন এক জনসভায় তিনি 'প্রবুদ্ধ নাগরিকতা' নামে একটি হিন্দী বই প্রকাশ করেন (বইটি 'দি এনলাইটেন্ড সিটিজেনশিপ' বইয়ের হিন্দী অনুবাদ)।

গত ১১ মে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজা রামান্না **আলং আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

গত ১১ মে কেরালার রাজ্যপাল স্বরূপ সিং সস্ত্রীক **কালাডি আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্টেন্সি ও অডিটিং (ভোকেশনাল) গ্রুপের দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের পাবলিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ ঃ বিশাখাপত্তনম আশ্রমের মাধ্যমে এই জেলার সোমলিঙ্গাপালেম, কোট্টাপালেম এবং ত্রাণশিবিরের আশপাশের চারটি গ্রামের ১২৮২টি পরিবারের মধ্যে ২২৫০ কিলোঃ চাল এবং ধুতি ও শাড়িসহ ৪২৭৫টি কাপড়-চোপড় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল ঝড়ে আহত রোগীদের শুশ্রূষা করছে। সন্নিহিত অঞ্চল-গুলিতেও ত্রাণকার্য বিস্তৃত করা হয়েছে।

রাজমহেন্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে গুন্টুর জেলার কারালাপালেম, রাপালে এবং পান্ডুরঙ্গপুরম অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে ১৮০০ কিলোঃ চাল, ১১০০ কিলোঃ আলু, ১১ কিলোঃ পেঁয়াজ, ৮০০ কিলোঃ লংকা, ৮০০ কিলোঃ তেঁতুল, ২৪০ কিলোঃ সংরক্ষিত খাদ্য এবং ৯৫০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলায় ৩০০০ শাড়ি, ৩০০০ ধুতি এবং ৩৬৩২টি বিভিন্নরকম পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

বোম্বাই আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার বান্দুর, কারনার ও সিন্ধনেরলি গ্রামে ৭১টি বাড়ি নির্মাণের জন্য ৬০৭১২টি ম্যাঙ্গালোর টালি দেওয়া হয়েছে। ঐ বাড়িগুলি বন্যায় নষ্ট হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গুমটিতে বিদ্যালয় ও আশ্রয়গৃহ হিসাবে নির্মীয়মাণ বাড়িটির একতলার ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এখন অন্য অংশের কাজ আরম্ভ

হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি ঝড়ে যারা গৃহহীন হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি : (সিয়াটল) গত মে মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা এবং মঙ্গলবারগুলিতে 'সেইন্টস অব ইন্ডিয়া' বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ২৬ মে সিয়াটল থেকে ৪৫ মাইল দূরে স্নোহোমিশ কাউন্টিতে একদিনের এক সাধনশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি মাসেই একবার একদিনের জন্য এই সাধনশিবির সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

টরন্টো বেদান্ত সোসাইটি : এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বুধবারগুলিতে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর ওপর ক্লাস নেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন মরিশাস : গত ৪ মার্চ মরিশাসের গভর্নর জেনারেল বীরসামী রিঙ্গাডু প্রস্তাবিত সাধুনিবাসের শিলান্যাস করেন। এই অনুষ্ঠানে মরিশাসে নিযুক্ত ভারতের হাই-কমিশনার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সেন্টার : গত মে মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি : মে মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা হয়েছে এবং সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। বুধবারগুলিতে রাজযোগের ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং মুণ্ডক উপনিষদের ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১২ ও ১৯ মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ৯ মে পূজা, বুদ্ধজীবন আলোচনা ও ভক্তি-গীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

দেহত্যাগ

কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান **স্বামী সম্প্রজ্ঞানন্দ** (সুরী) গত ১৯ মে রাত ২-৫৫ মিনিটে কলম্বোর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। গত ১৫ মে সকালে তিনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে আঘাত পান এবং তার ফলে তাঁর রক্তবমি হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি নিকটবর্তী নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং প্রয়োজনীয় রক্ত দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। অবশেষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে গুরুর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ এবং সালেম (তামিলনাড়ু) আশ্রমের কর্মী ছিলেন। পরে তিনি সালেম কেন্দ্রের প্রধান হন। কলম্বো আশ্রমের প্রধান হওয়ার আগে তিনি আলমোড়া এবং পোনামপেট আশ্রমের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। অমায়িক ব্যবহার, সাধুচিত গুণাবলী ও অক্লান্ত কর্মী হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু রামকৃষ্ণ সংঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ তপোদ্যান আশ্রম (গড় বালিয়া, হাওড়া) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মতিথি-উৎসব পালন করে। উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি ছিল—৩ মার্চ সকালে পল্লী পরিক্রমা ও সন্ধ্যায় মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়-কর্তৃক গীতি-আলেখ্য পরিবেশন; ৪ মার্চ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ডোমজুড় প্রেমিকতীর্থ-কর্তৃক কালীকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার ওপর বক্তব্য রাখেন তপোদ্যান আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবনারায়ণানন্দ। অপরাহ্নে প্রায় তিনহাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, কাঁচড়াপাড়ায় ঐতিহ্যমণ্ডিত হরিসভা প্রাঙ্গণে **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের** (কাঁচড়াপাড়া) উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী রমানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় দিন পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ। দুপুরে দু-হাজারেরও বেশি ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে ধর্ম-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী নিত্য-রূপানন্দ ও স্বামী সত্যদেবানন্দ। সন্ধ্যায় বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১৭ মার্চ '৯০ দক্ষিণ ২৪ পরগনার **গীতি গ্রামে** শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। উৎসবে ঐ অঞ্চলের প্রায় তিন হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছিল। ঐদিন গীতিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গত ১ এপ্রিল **উত্তর বাঁটরা** (হাওড়া) **শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে** ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। এদিন অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নিমাইসাধন বসু ও ডঃ নীরদ-বরণ চক্রবর্তী।

গত ৭ ও ৮ এপ্রিল **রঘুনাথগঞ্জ** (মুর্শিদাবাদ) শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে ধর্মসভা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলা প্রদর্শন, প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী কমলেশানন্দ এবং স্বামী দেবরাজানন্দ। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন।

গত ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল '৯০ **কুচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী নিবৃত্যানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান বক্তার ভাষণ দেন। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুর, দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমা ও তৃতীয় দিন স্বামীজীর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য আলোচিত হয়। ৮ এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ২৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রতিদিনই ধর্মসভার পরে শিবপুর শিল্পীতীর্থ-কর্তৃক গীতি-নাট্যাভিনয় পরিবেশিত হয়।

গত ৮ এপ্রিল '৯০ মেদিনীপুর জেলার **কলাবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে** শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রায় তিন হাজার ভক্ত ঐদিন প্রসাদ পান। এই উপলক্ষে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত

হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক'-এর সৌজন্যে 'সবার স্বামীজী' বইটি উপস্থিত সকল প্রতিযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবক ও অভ্যাগতদের 'স্মরণিকা'র সঙ্গে প্রদান করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ এবং বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, মজফ্‌ফরপুর (বিহার) গত ৩—৫ এপ্রিল এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে। বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, সপ্তশতী হোম, শোভাযাত্রা, বৈদিক-স্তোত্রপাঠ, ধর্মসভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। উৎসবের দ্বিতীয় দিন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এদিন দুপুরে প্রায় দশহাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী ভূতেশানন্দজী একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন ও আশীর্বাণী দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং বাঙলায় ভাষণ দেন স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ এবং হিন্দীতে ভাষণ দেন স্বামী নিখিলাত্মানন্দ ও স্বামী সত্যরূপানন্দ। ৫ তারিখের বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ এবং ভাষণ দেন স্বামী ভাগবতানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ ও কেদারনাথ লাভ। উক্ত উৎসবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৫০ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

গত ২৭ এপ্রিল শুভ অক্ষয়তৃতীয়ায় **ঘাটশিলা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে** পূজা, পাঠ ও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেন জামশেদপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আদিনাথানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় এক হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী আদিনাথানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী, স্বামী উমানন্দ এবং আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। সভান্তে জামশেদপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্টুডেন্টস হোমের স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় ও শংকর সোমের গ্রন্থনায় সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়।

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭ তম জন্মদিবস ও জাতীয় যুবদিবস **ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের** উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার মালাতোড় গ্রামে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এদিন ছিল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর রচনা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ৭২ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) দিব্যজ্যোতি দাশগুপ্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী শ্রেয়সানন্দ।

গত ২৭ ও ২৮ এপ্রিল **গৌরহাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ২৭ তারিখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী পুরাণানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। শংকর সোমের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সংঘ-কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বেহালা সুরপীঠ লীলাগীতি পরিবেশন করে।

ইসলামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (পশ্চিম দিনাজপুর)-এর পক্ষ থেকে গত ১ বৈশাখ ১৩৯৭ (১৪ এপ্রিল ১৯৯০) স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্বিভাগীয় রোগী, রোগিণীদের মধ্যে মোট ১৫০জনকে ফল, ডিম, মিষ্টি, বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ও জাতীয় যুবদিবস এবং ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে 'বিবেকানন্দ পুরস্কার' ও 'নিবেদিতা পুরস্কার' প্রদানের জন্য এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। ইংরেজী ও বাঙলা যে-কোন ভাষায় প্রবন্ধ, দুই হাজার শব্দে নিম্নলিখিত বিষয়ে ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। প্রবন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যায়তনের প্রধানের পরিচয়পত্রসহ ১৫ আগস্ট ১৯৯০-এর মধ্যে জমা দিতে হবে। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য তিনটি পুরস্কার মোট ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার) দেওয়া হবে। বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবেঃ শ্রীধীরাজ বসু, সাধারণ সম্পাদক, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ১৮/১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, গোরাচাঁদ ভবন, কলিকাতা-৬, ফোনঃ ৫৫-৪০৮৫।

১. 'বিবেকানন্দের দেশপ্রেম'—(দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)।

২. 'বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা'—(স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)।

৩. 'বিবেকানন্দ ও জাতীয় সংহতি'—(৩৫ বছরের কমবয়সী জনসাধারণের জন্য)।

৪. 'নিবেদিতা ও নারীশিক্ষা'—(দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য)।

৫. 'নিবেদিতা ও ভারতীয় নারীর আদর্শ' (স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য)।

৬. 'ভারতীয় পুনর্জাগরণে নিবেদিতার অবদান' —(৩৫ বছরের কমবয়সী নারীদের জন্য)।

বহির্ভারত

কুয়েত কথামৃত পাঠচক্রে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে বলে সেখানকার ভক্তরা জানিয়েছেন। পাঠ ও আলোচনার পর ভক্তরা ভজন পরিবেশন করেন। সভ্য-সভ্যারা প্রতিবছর কিছু আর্থিক দান সংগ্রহ করে বেলুড় মঠে পাঠান। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে এই পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

পরলোকে

বারাসত নিবাসী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ফণীন্দ্রনাথ বসু** গত ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের দর্শনলাভ এবং শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়** গত ২৪ জানুয়ারি '৯০ জব্বলপুরে (মধ্যপ্রদেশ) দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর পিতা মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং মাতা সরলাদেবী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর শহরে তাঁর জন্ম হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি লাহোরের বীর ভগৎ সিং, কানপুরের বটুকেশ্বর দত্ত এবং কলকাতার তরুণসংঘের সংস্পর্শে এসে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নানা রচনাদি লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি স্মৃতিকথা উদ্বোধন পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর পিতার স্মৃতিকথা বাঙলায় উদ্বোধন পত্রিকায় ও ইংরেজীতে বেদান্তকেশরীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১৫ এপ্রিল ভাঙ্গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **সত্যরঞ্জন সাধুখাঁ** বিকাল ৪-৩০ মিনিটে পরলোক গমন করেন। ভক্তসংঘের নিজস্ব বাড়ি-ঘর না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তাঁর বাসভবনেই ভক্তসংঘের কাজকর্ম ও অনুষ্ঠানাদি চলে এসেছে। প্রয়াত সাধুখাঁ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

পরিবেশ ভাবনা

মানুষের শরীরে যেমন একটি তাপমাত্রা আছে, তেমনি পৃথিবীরও একটি স্বাভাবিক তাপমাত্রা আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীর উপর তাপমাত্রা বিগত দশ বছরে ২'৫ সেলসিয়াস ডিগ্রী বেড়ে গিয়েছে। তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল। আগামী ৬০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও ২—৪ সেলসিয়াস ডিগ্রী বেড়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন। এর ফলে পৃথিবীর দুই মেরুতে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করবে, এবং বরফগলা জল সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়িয়ে দেবে। তাতে বহু জনপদ, নগর, সভ্যতা জলের তলায় তলিয়ে যাবে।

পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বেড়ে যাবার কারণ পৃথিবী থেকে দ্রুত সবুজের বিলোপ। অন্যদিকে শক্তির (এনার্জির) অস্বাভাবিক বেশি ব্যবহার। সবুজ কমবে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়বে। ফলে উত্তাপ বাড়বে। ওজন-স্তরে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। ফলে সূর্যরশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার সুযোগ পাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এর ফলে ক্যান্সাররোগ প্রাণিদেহকে বেশি আক্রমণ করছে।

ইউরোপ, আমেরিকায় প্রতি মিনিটে ৩২ হেক্টর অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। ভারতবর্ষেও প্রতি বছর ১½ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। সবুজ ধ্বংসের ফলে পৃথিবী এক সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র গাছই হচ্ছে একই সঙ্গে জেনারেটর ও ফিলটার। প্রাণী যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে, গাছ তা গ্রহণ করে। শুধু গ্রহণই করে না প্রাণিজগতের গ্রহণীয় অক্সিজেন সে আবার বাতাসে ত্যাগ করে।

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-নির্গত বর্জ্য-পদার্থের দ্বারা পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়, হরিদ্বার থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার জল এখন সর্বত্রই দূষিত। কলকারখানার বর্জ্য-পদার্থের দ্বারা শুধু জলই নয় মাটি ও বাতাস দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষ ও প্রাণী নানা ধরনের ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই দূষণ ভোগবাদী সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী কুফল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশভাবনায় আমরা যদি এখনই মনোনিবেশ না করি, তাহলে সমগ্র পৃথিবী ও সভ্যতার চূড়ান্ত বিপর্যয় ত্বরান্বিত হবে। পৃথিবীকে বাঁচানোর দায়িত্ব মানুষেরই; সবুজকে রক্ষা করে এবং নতুন করে সবুজ সৃষ্টি করে আমরা তা করতে পারি।

[বর্তমান, ১১ জুন ১৯৯০, পৃঃ ৬]

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার পরামর্শ

শহরে

☐ যতটা পারেন পায়ে হেঁটে চলুন। এতে পয়সা বাঁচে শরীরও ভাল থাকে।

☐ আপনার গাড়ি থাকলে নিয়মিত সার্ভিস করান এবং ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমাতে সাহায্য করুন। যেক্ষেত্রে সম্ভব সিসেহীন পেট্রল ব্যবহার করুন।

☐ শব্দদূষণে নিজের শ্রবণশক্তির ক্ষতি তথা স্নায়ুপ্রণালীরও ক্ষতি হয়। আপনার মোটর বাইকের তর্জন-গর্জন বা স্টিরিও অথবা টেলিভিশনের শব্দমাত্রা বাড়ানোর আগে অন্যান্য মানুষের কথা স্মরণ রাখুন।

☐ যেসব জঞ্জাল কাজে লাগানো যায় (যথা কাচ ও কাগজ) সেগুলো বেছে রাখুন। আপনার পল্লীতে যদি এর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত চালু না হয়ে থাকে তো শুরু করার পরামর্শ দিন।

☐ আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখুন—পথেঘাটে ময়লা না ফেলে জঞ্জালের বিনে ফেলুন। পথের নোংরা অগোচরে ড্রেন বুজিয়ে দেবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি জঞ্জালের বিন দিতে বলুন।

☐ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত জলবায়ু দূষণমাত্রা পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুন—কোন কিছু ত্রুটি থাকে তো সেবিষয়ে ব্যবস্থা করতে বলুন।

☐ ড্রেনেজ সিস্টেমের ক্ষতিকর কেমিক্যাল ড্রেনে ফেলবেন না। এবিষয়ে সন্দেহ থাকলে স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

☐ আপনার কুকুর যেন পথে মলমূত্র ত্যাগ না করে—তাতে পরিবেশ ভাল থাকে, আরও ভাল হয় আপনার বারান্দা ও অলিন্দে ফুলগাছ লাগালে।

বাড়িতে

☐ বন্ধ জায়গায় তামাক খাওয়া এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন অপ্রত্যক্ষ ধূমপান (নিজে না করলেও) গোটা পরিবারের ক্ষতি করে। তাছাড়া ধূমপান আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

☐ বাড়িতে খোলা আগুনের আঁচে রান্না করলে যথাযথ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন। তাতে ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া এড়াতে পারবেন।

☐ খাদ্য-বাহিত রোগ থেকে বাঁচতে হলে কাঁচা খাবার আর রাঁধা খাবারে ঠেকাঠেকি করবেন না। এক বেলার বাড়তি খাবার বা অনেকক্ষণ পড়ে থাকা খাবার ভালভাবে গরম করে খাবেন।

☐ রান্নাঘর বা খাবার তৈরির মেঝে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন রাখুন। বাসনপত্র, কাটারি/বঁটি একটা কিছু কাটার পর, নতুন কিছু কাজের আগে এক দফা সাফ করে তবে ব্যবহার করুন—তাতে বিরুদ্ধ-সংক্রমণ বা পুনঃ সংক্রমণ এড়ানো যায়।

☐ খাবার রিফ্রিজারেটরে না রাখলে ঢেকে রাখুন যাতে পোকা-মাকড় বা ইঁদুর-বেড়ালে মুখ না দেয়।

☐ কাঁচা দুধের চেয়ে পাস্তুরাইজড দুধ পরিবারের পক্ষে নিরাপদ। কাঁচা দুধ ছাড়া অন্য দুধ না পেলে ফুটিয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন।

☐ গরম এলাকার বাসিন্দা হলে মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য কীটনাশক ছড়িয়ে আত্মরক্ষা করুন ও মশারি খাটিয়ে ঘুমোন।

☐ গার্হস্থ্য জঞ্জাল যাতে শিশু বা পশু খুলতে না পারে এমন ঢাকনা দেওয়া বিনে বন্ধ রাখুন।

☐ সাধারণতঃ যেসব পাত্রে খাদ্য বা পানীয় রাখা হবে এমন কোন পাত্রে (মদের বা লঘু পানীয়ের বোতল) বিষাক্ত কিছু রাখবেন না।

☐ যেখানে বৃহৎ পরিবার বা ঘেঁষাঘেঁষি বহু পরিবারের বাস সেখানে বাড়ির শিশু ও বৃদ্ধদের সুবিধার্থে টেলিভিশন সেট বা গার্হস্থ্য মেশিন অনুচ্চ গ্রামে চালান।

☐ মেঝে ধুলো-ময়লামুক্ত রাখুন, নইলে পোকা-মাকড় হবে। বাড়ির চারপাশে বা বাগানে জল জমতে দেবেন না। জমা-জলেই মশার জন্ম ও বাড়বাড়ন্ত।

পল্লী অঞ্চলে

☐ জল সরবরাহে সন্দেহ থাকলে জল ফুটিয়ে খান। নদীর জলের ক্ষেত্রে রোগ ও ক্রিমি থেকে বাঁচতে হলে ব্যবহারের আগে ফিল্টার করে নিতে হবে।

☐ বেসরকারি বা পাঁচজনের মালিকানাধীন জলাধারকে সংক্রমণ (ধুলো, কাদা, পাতা, অম্লবর্ষণ ইত্যাদি) থেকে রক্ষা করা চাই। ঘরোয়া জলাধারের বেলাতেও একই কথা—ঢেকে রাখতে হবে।

☐ জলের উৎসের কাছাকাছি বাইরের পায়খানা বা গর্ত প্রস্রাবাগার রাখা চলবে না—অন্ততঃ ৫০ মিটার দূরত্ব রাখুন।

☐ সর্বদা প্রস্রাবখানা বা পায়খানা ব্যবহার করুন। মাঠে বা নদীতে মলমূত্র ত্যাগ কেবল জল-সরবরাহ বা পরিবেশকে দূষিত করে না পরন্তু রোগ-বাহী পোকা-মাকড়কেও ডেকে আনে।

☐ বাড়িতে মেঝে বা দেওয়ালে ফুটো, ফাটা, ফাটল দেখলে বুজিয়ে ফেলুন তাতে পোকা-মাকড়, সাপখোপের বিপদ ঘুচবে।

☐ কীটনাশক ব্যবহারের আগে সযত্নে ঐ সম্পর্কিত পুস্তিকা পড়ুন। তার শূন্যপাত্র অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না।

☐ কীটনাশক বা গাছপালার কীটনাশক ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন—ওষুধ লাগানো সদ্য কোন স্থানে তাদের খেলাধুলো করতে দেবেন না।

☐ কীটনাশক বা গাছপালার ওষুধ স্প্রে করার সময়ে যথাসম্ভব গা-ঢাকা হাল্কা পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করুন।

☐ প্রবল হাওয়ার সময়ে শস্যে স্প্রে করবেন না, কীটনাশক হাওয়ায় উড়ে নিকটস্থ মানুষ, পশু বা বাসস্থান পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

☐ স্প্রে করার পর হাত-পা ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং বাড়িতে ঢোকার আগে সংক্রমিত কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন।

☐ খালি হাতে কীটনাশক নাড়বেন না অথবা হাত ডুবিয়ে ঐ সব তরল গুলবেন না।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯০, পৃঃ ৮]

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নির্মিত
॥ বিবেকানন্দ পল্লী ॥
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ জী মহারাজ
॥ ৫ মে, ১৯৯০ ॥
॥ ২১ বৈশাখ, ১৩৯৭ ॥
সহযোগিতায় - জন কল্যাণ সমিতি, রামবাগান

উদ্বোধন











বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



৯২তম বর্ষ—৮ম সংখ্যা আগস্ট, ১৯৯০ ভাদ্র, ১৩৯৭

দিব্য বাণী

হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর [কলিকাতা তখন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল] অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি।... হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ



কথাপ্রসঙ্গে

ত্রিশত বার্ষিকীর প্রশ্ন

কলকাতার ত্রিশত বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে যেমন কলকাতা সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইতেছে, তেমনই উত্থাপিত হইতেছে নানা প্রশ্নও।

কলকাতা একদা ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী ছিল। পরবর্তী কালে কলকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু কলকাতা তাহার পরেও বহুকাল সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলিয়া বেসরকারিভাবে স্বীকৃত হইত। কিন্তু সেই মর্যাদা কলকাতা ক্রমে হারাইয়াছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, কলকাতার মতো প্রাণবন্ত কোন শহর ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আর একটিও নাই। কলকাতার এই প্রাণোচ্ছলতার মূল কোথায়? মূল তাহার সংস্কৃতিতে। দিবার ও লইবার, অপরকে আপন করিবার, অপরকে অঙ্গীভূত করিবার যে উদার মানসিকতা কলকাতার রহিয়াছে তাহা ভারতের অপর কোন শহরের নাই। ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির অধিবাসীরা হয়তো একথা স্বীকার করিতে চাহিবেন না কিন্তু বিদেশী অতিথি অথবা পর্যটকরা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে একথা বলেন। এবং তাঁহারা বলেন ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তুলনা করিয়াই। কলকাতায় দারিদ্র্য রহিয়াছে, অভাব রহিয়াছে, বহু সমস্যা রহিয়াছে ; কিন্তু সব জড়াইয়া, সব ছাড়াইয়া তাহার রহিয়াছে এক অদ্ভুত জীবনরস-রসিকতা। সমস্যা, অভাব-অনটন যে তাহাকে স্পর্শ করে না তাহা নহে, ভাল করিয়াই করে ; কিন্তু সমস্যা, অভাব-অনটন তাহার প্রাণশক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারে না। কলকাতা যেন সেই অর্থে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, শস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। কলকাতাও যেন সেইরূপই। কোন সমস্যাই কলকাতার প্রাণশক্তিকে হরণ করিতে পারে না। আত্মার সঙ্গে তুলনা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক। তবে কলকাতার কথা ভাবিলে যেন ঐ ধরনের একটি ধারণা মনে আসিয়া উদয় হয়। কলকাতার এই "অটল জীবনীশক্তি"-র উৎস, আগেই বলিয়াছি, নিহিত রহিয়াছে তাহার উদার গ্রহীষ্ণু মানসিকতার মধ্যে। কলকাতা সম্পদকে যেমন গ্রহণ করে, সমস্যা-কেও তেমনই অস্বীকার করে না। বাঙালী যেমন তাহার নিজস্ব, বিহারী, মারাঠী, মাদ্রাজী অথবা পাঞ্জাবী তেমনই তাহার নিজস্ব, পরস্ব নহে। সবই তাহার।

বাঙালী ভিন্ন ভারতের অপরাপর প্রদেশের মানুষেরাও তাই কলকাতাকে 'তাহাদের' বলিয়া ভাবিতে ভালবাসেন। ইহা কলকাতার গর্ব এবং গৌরব দুই-ই। এই সূত্র হইতে আমরা এখানে একটি প্রশ্ন তুলিতে চাহিতেছি। তাহা হইল কলকাতা কাহার?

আমরা কলকাতার জব চার্নকের পদার্পণের

সময় হইতেই বিচার শুরু করি। কলকাতা কি জব চার্নকের? নগর-কলকাতার সূচনা তাঁহার পদার্পণ হইতে হইয়াছিল—কথাটা ঠিক হইলেও আমরা কি এতকাল এই বিদেশী ভদ্রলোক সম্পর্কে কোনরকম মাথা ঘামাইয়াছি? কলকাতার কোথায় তিনি ইহজীবনে থাকিতেন, কলকাতার কোথায় তাঁহার সমাধিস্থান এসব আমরা কয়জন জানি? অধিকাংশই জানি না। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের এক-অংশও আমরা অবহিত নহি। যত জানাজানি, যত আলোচনা বিগত এক অথবা দুই-তিন বৎসর ধরিয়া। তাহা হইলে 'কলকাতা জব চার্নকের' কি করিয়া বলি? বলিতে পারি না। অতএব কলকাতা জব চার্নকের নহে।

জব চার্নকের সূত্র ধরিয়াই ক্রমে কলকাতায় তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা। সেই অর্থে 'জন্ম' হইতেই প্রায় ইংরাজদের অধিকারে কলকাতা রহিয়াছে বলা যায়। ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার উপর ইংরাজদের অধিকারও চলিয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক অর্থে ভারত এখনও ইংরাজের অধিকারে। তাহা হইলে কলকাতার ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ কলকাতা এখনও ইংরাজের। ইংরাজ আমলের বাড়ি-ঘর, অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, স্থাপত্যকর্ম প্রভৃতি এখনও কলকাতায় বেশ কিছু রহিয়াছে বটে, কিন্তু মানসিক দিক হইতে কলকাতা এখনও ইংরাজের ইহা আমরা স্বীকার করি না। কলকাতার উপর ইংরাজ-অধিকারের সকল লক্ষণই অন্তর্হিত। শুধু কলকাতার জন্মটিই আমরা জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছি। সেই দিক হইতে জব চার্নক তথা ইংরাজের কলকাতার উপর একটি অধিকার রহিয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কলকাতা যেমন জব চার্নকের নহে, তেমনই ইংরাজেরও নহে।

তবে কলকাতা কাহার? অনেকে বলেন, কলকাতা নাকি অবাঙালী ব্যবসায়ীদের। তাঁহারা নাকি কলকাতাকে প্রায় কিনিয়াই লইয়াছেন। এই বিষয়টির সত্যতা আমাদের জানা নাই। তবে কলকাতা শুধু অবাঙালী ব্যবসায়ীদের যে নহে তাহা আমরা বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। কলকাতা সকলের—অবাঙালী ব্যবসায়ীদের যেমন, তেমন অবাঙালী অন্যান্যদেরও। সবাই কলকাতাকে ভালবাসেন, দ্বিতীয় মাতৃভূমি জ্ঞান করেন। তাঁহাদের ভালবাসা বাঙালীদের চাহিতে কম নহে। সুতরাং 'কলকাতা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের,' একথা স্বীকৃত হইতেছে না।

অনেকে বলেন, কলকাতা নাকি এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের। বিষয়টি স্পর্শকাতর। সুতরাং মন্তব্য করিব না। তবে কলকাতা কোন রাজনৈতিক দলের হইতে পারে না, তাহার ঐতিহ্যই একথা বলে।

অনেকে বলেন এবং সঙ্গত কারণেই বলেন যে, কলকাতা রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার সর্বাংশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার কবিতা, তাঁহার গান, তাঁহার সাহিত্য ভারতের মহান গর্ব, ভারতের অতুল সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার জাতক বলিয়া এবিষয়ে কলকাতার বিশেষ গৌরব থাকিবেই এবং বিশ্বনাগরিক হইলেও রবীন্দ্রনাথের উপর কলকাতার বিশেষ অধিকারও থাকিবেই। কিন্তু তিনি কলকাতার কতখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিতে যাইলে আমাদের দুঃখ হয়। দুঃখ আমাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত দিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্যবান করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা কি দিয়াছে? শুধু পঁচিশে বৈশাখের কলকাতাকে বিচার করিলে চলিবে না; বৎসরের বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন আমরা তো রবীন্দ্রনাথকে প্রায় ভুলিয়াই থাকি। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান কলকাতায় অগণিত. কলকাতার একাধিক রাস্তা, কলকাতার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ-সেতু, কলকাতায় একটি সরোবর, একটি প্রেক্ষাগৃহ, কলকাতার বুকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত। এই বিচারে কলকাতা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই। কিন্তু নিত্যদিনের চর্চায়, সভা-সমাবেশে, ঘরোয়া বৈঠক বা আলোচনায় কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিতে হইলে আমাদের গবেষণা করিতে হইবে। ইহা যেমন গভীর দুঃখের, তেমনি গভীর লজ্জারও। আবার পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের যে উপস্থিতি তাহার পিছনে কলকাতার সাধারণ মানুষের আগ্রহ যতখানি. তাহার চাহিতে বেশি রহিয়াছে সরকারি প্রয়াসের ভূমিকা এবং কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের একদিনের রবীন্দ্রপ্রীতি। নতুবা রবীন্দ্র-স্মরণ শুধু ঐ পঁচিশে বৈশাখেই সীমিত রহিত না। কলকাতার মানুষের রবীন্দ্রপ্রীতি আন্তরিক হইলে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া 'নিত্য-উৎসব' হইত। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে যতখানি আমরা আজ দেখিতে অভ্যস্ত তাহার পশ্চাতে সরকারি ভূমিকার বিষয়টি বাদ দিলে কলকাতা কতখানি রবীন্দ্রনাথের তাহা বিচারের ভার আমরা কলকাতার মানুষের উপরেই ছাড়িয়া দিতেছি।

সরকারের বদান্যতা, আনুকূল্য, পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কি কোন ব্যক্তি আছেন যাঁহার প্রভাব কলকাতায় প্রবলভাবে অনুভূত; যাঁহার সম্পর্কে বলা

যায় কলকাতা তাঁহার? হ্যাঁ, যায়। যদি একজনের নাম করা হয় তাহা হইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি দুইজনের নাম করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এবং যদি তিনজনের নাম করা হয় তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, এবং সারদাদেবী। সরকারের বদান্যতা, আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ, আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষায় এই তিনজন ব্যক্তি কলকাতাকে বিগত একশো বছর ধরিয়া অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই অধিকারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ক্রমবর্ধমান। শুধু তাঁহাদের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করিয়া এক-এক দিনের স্মরণ-উৎসব নহে, কলকাতায় অন্ততঃ পঁচিশটি ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে বৎসরের প্রত্যেকটি দিন তাঁহাদের সম্পর্কে, অন্ততঃ তাঁহাদের কোন একজন সম্পর্কে, আলোচনা হইতেছে। প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক আলোচনা ভিন্ন কলকাতার বহু বাড়িতেও নিয়মিত তাঁহাদের লইয়া ঘরোয়াভাবে চর্চা হইয়া থাকে। অগণিত প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের নামে অথবা তাঁহাদের আদর্শে কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে, অলিতে-গলিতে সাধারণ মানুষের আগ্রহে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কলকাতায় বাঙালীদেরই স্বভাবতই সংখ্যাধিক্য। কলকাতায় এমন একটি বাঙালী পরিবার পাওয়া যাইবে না, যেখানে তাঁহারা নাই, অথবা তাঁহাদের সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধার আসন পাতা নাই। এবং এইক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হইল, এই গ্রহণে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, কোন দিক হইতে কোন প্রভাব বিস্তারের ব্যাপার নাই, রাষ্ট্রক্ষমতা এবং অর্থক্ষমতার বিন্দুমাত্র ভূমিকা নাই। বাহিরের প্রভাব গ্রহণকে কখনও এরূপ সর্বাত্মক করিতে পারে না। কলকাতার ইংরাজী অথবা বাঙলা যেকোন বিখ্যাত দৈনিকের 'সভা-সমাবেশ' জাতীয় অনুষ্ঠান-সূচীর দিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব কলকাতার কোন তন্ত্রীকে তাঁহারা অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। কলকাতার বুকে তাঁহাদের লইয়া কিছু জন-সমাবেশ, আলোচনা-সভা, যুব-সম্মেলন দেখিবার অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়া থাকে। নিছকই আলোচনার ব্যবস্থা সেইসব অনুষ্ঠানে থাকে, তাহাতে বিনোদনমূলক কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে না। উপরন্তু বেশ কিছু অনুষ্ঠানে প্রবেশ অবাধও নহে, সেখানে নির্ধারিত মূল্যের প্রবেশপত্র আবশ্যিক। কিন্তু দেখা গিয়াছে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া বিপুল সংখ্যক শ্রোতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নীরবে এবং সাগ্রহে আলোচনা শুনিতেছেন, যে-আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক। উপরন্তু জাগতিক কোন কিছু পাইবার প্রলোভন সেখানে ক্রিয়াশীল থাকে না, ক্ষমতার সিংহাসনে বসিবার কোন প্রতিশ্রুতিও সেখানে থাকে না। অর্থের প্রলোভন, পেশীর ভয়ের কোন ভূমিকাও এইসব জনসমাগমে থাকে না। অথচ দলে দলে মানুষ সেখানে আসেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদা এবং রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের প্রতি গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ইহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত যে, কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদার। এবং এই অধিকার তাঁহারা পাইয়াছেন কলকাতার প্রতি তাঁহাদের গভীর মমতা ও ভালবাসার জন্যই।

জীবনের দীর্ঘতম অংশ শ্রীরামকৃষ্ণ অতিবাহিত করিয়াছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে; কিন্তু সেখান হইতে কলকাতায় তিনি বারবার ছুটিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারের বলরাম বসুর বাসভবনটিকে (বর্তমানে 'বলরাম মন্দির'কে) তিনি তাঁর 'কলকাতার কেল্লা' করিয়াছিলেন। কেল্লায় শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনই সাধিত হয় না, কেল্লা আক্রমণ সংগঠনের জন্যও। কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের আসা এবং অবস্থান উভয় প্রয়োজনেই। এবং সেই প্রয়োজন তাঁর নিজের জন্য নহে, কলকাতার মানুষের প্রতি পরম মমতায় তিনি কলকাতাকে তাঁহার কেল্লা হিসাবে নির্বাচন করিয়াছিলেন। এখানে কলকাতার মানুষকে উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের মানুষকে নিজেদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার পরামর্শ যেমন তিনি দিয়াছেন, তেমনই প্রেম ও সমন্বয়ের পতাকা লইয়া বিশ্ববিজয়ের ক্ষেত্রও তিনি সেখানে রচনা করিয়াছিলেন। সেই মহৎ প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহার অন্তিম দিনগুলি তিনি কাটাইয়াছিলেন শ্যামপুকুর এবং কাশীপুরে। কাশীপুরে শেষ অসুখের সময় একদিন তিনি সারদাদেবীকে মিনতি করিয়া বলিলেন: "দেখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো, কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" সারদাদেবী সসঙ্কোচে বলিলেন: "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর আবেগের সহিত নিজেকে দেখাইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন: "এ আর কি করেছে? তোমাকে এরচেয়ে অনেক বেশি করতে হবে।"

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন দেবাদিদেব শঙ্কর। বিষের প্রভাবে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়াছিল বটে, কিন্তু রক্ষা পাইয়াছিল জগৎ-সংসার। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের কাহারও কাহারও বিশ্বাস ছিল যে, কলকাতার "পোকার মতো কিলবিল করা" মানুষদের পাপ গৃহীত হইয়াই

অপাপবিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় দুরারোগ্য ক্যানসার-রোগরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভীষণ রোগ-যন্ত্রণায় দলিত হইতে হইতে একদিন স্মিতহাস্যে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "তোমাদের সকলের হইয়া আমিই ভোগ করিয়া যাইলাম যাহাতে তোমাদের আর কষ্ট পাইতে না হয়!" সেখানে উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন সকলেই কলকাতার মানুষ। ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে কে কথা বলিতে-ছিলেন? ভগবান শঙ্কর অথবা ঈশ্বরপুত্র ঈশা? আমাদের মনে হয় উভয়েই।

কলকাতার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার দায় অকাতরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরম প্রেম ও ক্ষমায় বহন করিয়াছিলেন সারদাদেবী। 'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত' কথাগুলি আক্ষরিকভাবেই সত্য। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে তাঁহার আবাসে—"মায়ের বাড়ীতে" শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাঁহার শেষ অমৃতবার্তাঃ "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপরে আছে।"

এই পরম আশীর্বাদ কলকাতাতেই উচ্চারিত। সুতরাং কলকাতার মানুষ যে তাহার বিশেষ ভাগী-দার তাহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। কলকাতার মানুষদের দেখিবার ভার যে তাঁহারই উপরে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন। তাই মরতনু ত্যাগ করিলেও কলকাতাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে বেলুড় মঠের অন্যান্য মন্দির হইতে লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হিসাবে তাঁহার মন্দিরটি পূর্বমুখী বা গঙ্গামুখী কেন? মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, সারদা-দেবীর বিশেষ গঙ্গাপ্রীতির জন্যই এই ব্যতিক্রম। শুধু কি তাহাই? আমাদের মনে হয় ইহার গভীরতর একটি কারণ রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কলকাতার মানুষদের 'দেখিতে' মিনতি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মন্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখী। মরতনু ত্যাগের পরেও কলকাতার দিকেই সেই কারণেই তাঁহার বাৎসল্য-দৃষ্টি নিবদ্ধ। এবং কল-কাতার মাধ্যমেই সমগ্র জগতের প্রতি তাহা প্রসারিত।

আর স্বামী বিবেকানন্দ?

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্লেগ-মহামারী কবলিত কলকাতার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা শহর ছাড়িয়া মৃত্যুভয়ে পলায়মান। ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামী বিবেকানন্দ তখন চিকিৎসকের নির্দেশে স্বাস্থ্যোদ্ধা-রের জন্য দার্জিলিঙে। কলকাতার সংবাদ পৌঁছাইল সেখানে। চিকিৎসকের সমস্ত অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তৎক্ষণাৎ (৩মে ১৮৯৮) তিনি নামিয়া আসিলেন কলকাতার আতঙ্কগ্রস্ত ভাইবোনেদের পাশে। আসার পূর্বে দার্জিলিং হইতে মিস ম্যাকলাউডকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮) জানাইয়া দিলেনঃ "আমি যে শহরে জন্মিয়াছি সেখানে যদি প্লেগ আসিয়া পড়ে [তখনও সম্পূর্ণ সংবাদ তিনি পান নাই—পাইবেন দুই-তিন দিন পরেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের ২৯ এপ্রিলের চিঠি হইতে] তাহা হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য আমি আমার জীবনপাত করিব বলিয়াই স্থির করিয়াছি।" জীবন তো তুচ্ছ। জীবনের চাহিতেও বিবেকানন্দের প্রিয়তর আরও একটি বস্তু ছিল। তাহা হইল সদ্যক্রীত বেলুড় মঠের জমি। সেখানে তাঁহার প্রিয়তম প্রভুর সঙ্ঘদেহ স্থাপিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি। কলকাতার মানুষ-দের সেবার জন্য তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্ন-ভূমিটিকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন তিনি। অথচ কত কান্না, কত ঘাম, কত রক্ত তাঁহার ঝরিয়াছে, এই সাধের বেলুড় মঠের জন্য। কত বিনিদ্র রজনী তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে ঐ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষায়! কিন্তু সব একদিকে, আর কলকাতার মানুষ একদিকে। ঘটনাটি হইল এই--কলকাতায় আসিয়াই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনকে প্লেগের ত্রাণকার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন স্বামীজী। এই ব্যাপক সেবাকার্যে স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন উঠিল। কিন্তু স্বামীজী নির্দ্বিধায় বলিলেনঃ "কেন? দরকার হলে নতুন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির; মুষ্ঠিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?" সৌভাগ্যের কথা, অর্থের অভাব হয় নাই। পরের বছর পুনরায় কল-কাতায় প্লেগের প্রকোপ দেখা দিলে বস্তির অসহায়, অশিক্ষিত মানুষদের সাহস জোগাইবার জন্য প্লেগ-রোগাক্রান্ত কলকাতার একটি বস্তিতে বাসা লইয়া-ছিলেন স্বামীজী।

এ-সমস্তই বিবেকানন্দের মহাপ্রাণতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু মহাপ্রাণতা ছাড়া আরও একটি ব্যাপার আছে। তাহা হইল তাঁহার আপন শহরের প্রতি পরম প্রীতি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও সেই প্রীতি তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কারণ উহা যে তাঁহার মহান আচার্যের নিকট হইতে দায়স্বরূপ তিনিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভালবাসা যে তাঁহার উত্তরাধিকার।

তাই কলকাতা তাঁহাদেরই। কলকাতা রামকৃষ্ণ সারদা-বিবেকানন্দের।

একটি স্বপ্নের রূপায়ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

উত্তর কলকাতার রামবাগানে বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যকর ও উন্নততর আবাসে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নতুন বাসভবন প্রকল্পের আজ উদ্বোধন হলো। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে যাঁরাই যোগদান করতে পেরেছেন সকলেই যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করছেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি নিজের অন্তর থেকে তা বুঝতে পারছি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে রামবাগান অঞ্চলে বস্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের এই যে বিরাট কাজ এখানে চলছে তা হয়তো সকলে বিশদভাবে জানেন না। কিন্তু তাঁদের এই বহুমুখী প্রচেষ্টা যে কত সার্থক হচ্ছে তা আজ আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি তারা জানতে পারছি। বস্তিবাসীদের জন্য গৃহনির্মাণের যে কাজটি তাঁরা হাতে নিয়েছেন, তা বাস্তবিকই একটি বিরাট কাজ। বিরাট এক কর্মযজ্ঞ তাঁদের চেষ্টায় কিভাবে গড়ে উঠছে তার চাক্ষুষ পরিচয় আজ আমরা পেলাম। ওঁরা বিশেষ সহায়-সম্বল নিয়ে যে আরম্ভ করেছেন তা নয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টায় কাজ। কাজেই ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর সম্বল কি থাকবে? কিন্তু চারিদিক থেকে অভাবনীয়ভাবে প্রভূত সহায়তা এসে পড়েছে এবং তার দ্বারা প্রকল্পটি বর্তমান আকার নিয়েছে। সন্ন্যাসীই হোন অথবা অসন্ন্যাসীই হোন যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁদের আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার ভাব এত প্রবল ছিল যে, ভগবানের আশীর্বাদ তাঁদের ওপর বর্ষিত হয়েছে অকুণ্ঠভাবে। সবচেয়ে আশার কথা, বস্তিবাসীরাও পরম আগ্রহে নিজেদের বাড়ি-নির্মাণের কাজে হাত লাগিয়েছেন। গৃহনির্মাণের প্রতিটি স্তরে তাঁরাও সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থেকেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাঁদের ওপরেও অকাতরে বর্ষিত হয়েছে। আমরা এখন কাজের যে রূপ দেখতে পাচ্ছি তা সম্ভব হয়েছে উভয়পক্ষের আন্তরিকতার মণিকাঞ্চন সংযোগে। এখানে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, নরেন্দ্রপুর আশ্রম এখানে অর্থসংগ্রহ করে বাড়িগুলি তৈরি করে দিয়ে তাঁদের কাজ শেষ করে দেননি। তাঁরা স্থানীয় বস্তিবাসীদের এই প্রকল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়েছেন। তাঁরাও অর্থদান করেছেন, কায়িক শ্রমদান করেছেন, প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে নিজেদের সংযুক্ত ও সহযোগী রেখেছেন। ফলে নবনির্মিত বাসভবনগুলির প্রতি তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা এসেছে। উদ্যোক্তারা যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পেরেছেন সেজন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই। এই প্রকল্প এখানে আরো বেশ কিছুকাল চলবে। এর সবে আরম্ভ হয়েছে মাত্র। তাহলেও আরম্ভ দেখে আমরা কল্পনা করতে পারি যে, এর পরিণতি কত ব্যাপক হবে এবং কত জনকল্যাণমুখী হবে।

এই বিরাট কাজের পেছনে রয়েছে, আগেই বলেছি, আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার ভাব। বলা বাহুল্য, এই ভাবের উৎস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ। সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া, সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এরকম বিশাল কাজে সাফল্য সম্ভব নয় এবং সেই সহযোগিতা যে আসছে সেকথা আগেই বলেছি এবং বিশ্বাস করি তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এদেশে আমাদের অধিকাংশের কাজের একটি খারাপ দিক হচ্ছে এই যে, আমরা বড় বড় পরিকল্পনা করি, সাড়ম্বরে কাজ শুরুও করি, কিন্তু পরিকল্পনা প্রায়ই বাস্তবে পরিণত হয় না, কাজ আর সার্থক সমাপ্তির মুখ দেখে না। এই ব্যাপারটি এখন আমাদের প্রায় জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যেতে পারে। আমাদের বিশেষ আনন্দ ও আশার বিষয় যে, এক্ষেত্রে ঐ ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এখানে এঁদের প্রকল্পটি বিরাট, কিন্তু তুলনায় প্রগতি বেশ দ্রুতই হয়েছে বলা যায়। অল্পদিন আগে এই বাসভবনগুলির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটি বাসভবন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। বস্তিবাসীদের একটা অংশ সেগুলিতে এখন থেকে বাস করতে শুরু করবেন। এই প্রকল্পে আরো কয়েকটি বাসভবন নির্মিত হবে। ফলে আরো বহু লোক এর থেকে লাভবান হবেন।

আসল কথা হচ্ছে কাজের ভেতরে প্রাণ থাকা চাই। কাজের মূল্যায়ন কেবল পরিধি দেখে, বিশালতা দেখে হবে না। তার পিছনে কতখানি নিঃস্বার্থ ভাব, কতখানি সেবাপরায়ণতা, কতখানি অনুন্নতদের প্রতি হৃদয়ের সমবেদনা পরিচালক ও কর্মীবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করেছে তার দ্বারাই কাজের মূল্যায়ন হবে। প্রকল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপকতা ও বিশালতা অধিকতর স্ফীত হতে থাকবে, কিন্তু আমরা আশা করব, যে-আদর্শ এই প্রকল্পের পশ্চাতে প্রথম থেকে ক্রিয়াশীল আছে তা প্রকল্পের পরিচালকবৃন্দ কখনোই ভুলে যাবেন না।

কাজের শেষ নেই। আমাদের দেশ অনুন্নত। অনুন্নত সম্প্রদায়, অনুন্নত সমাজ দেশের চারিদিকে ছড়ানো। সেবার ক্ষেত্র চারিদিকে প্রসারিত। এর ভেতরে কতটুকুই বা আমরা করতে পারি? কিন্তু যতটুকু পারি ততটুকু যদি নিঃস্বার্থভাবে ঐকান্তিক সেবাবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে এবং যাঁদের জন্য এই সেবার আয়োজন তাঁরাও লাভবান হতে পারবেন। শুধু তাঁরাই যে লাভবান হবেন তাই নয়, যাঁরা এই প্রকল্পকে রূপদান করবেন তাঁরাও লাভবান হবেন এইজন্য যে, তাঁরা এই মহৎ সেবাযজ্ঞে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। আমরা দেখছি ঠাকুরের আশীর্বাদে নানাদিকে এরকম শুভ প্রচেষ্টা আজ চলছে। বড় বড় সব কাজ গড়ে উঠছে। এসবের ফলে সমাজের কল্যাণ নানাদিক দিয়ে হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন জগতের, বিশেষ করে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য। এই কলকাতার উপকণ্ঠে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেছেন। এই কলকাতার পথে পথে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁরই হাতে গড়া স্বামী বিবেকানন্দ এই কলকাতারই ভূমিতে জন্ম নিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সেবাদর্শ পালিত হবার জন্য কলকাতাই উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তার সীমা এখানেই যে থেমে থাকবে তা নয়, কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরে এবং ক্রমে ভারতবর্ষের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে। এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে দেশের নানা প্রান্তের মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে। বলা বাহুল্য তখন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-কর্ম তরান্বিত হবে।

আমি সবশেষে এই প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাকাজের উদ্বোধন এই রামবাগানেই তাঁর বালক-বয়সে করেছিলেন। তিনিই সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত থেকে তাঁদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, মা সারদাদেবীর কাছে, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁদের আশীর্বাদ এই প্রকল্পের কর্মীদের ওপর সতত বর্ষিত হোক। যাঁরা বিভিন্নভাবে এই প্রকল্পে সহযোগিতা করছেন তাঁদের ওপর বর্ষিত হোক। নতুন বাসভবনগুলির ভিত্তিস্থাপনের আগেই রামবাগান পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ এই পল্লীর নামকরণ করে রেখেছেন 'বিবেকানন্দ পল্লী'। আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ নামে এই পল্লী পরিচিত হবে এই তাঁদের ইচ্ছা। স্বামীজীর স্মৃতিধন্য এই পল্লীর নতুন আবাসগুলিতে যাঁরা এসে বসবাস করবেন এবং যাঁরা এখন অপেক্ষা করছেন অদূর ভবিষ্যতে গৃহনির্মাণ প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে এই পল্লীতে বসবাস করবেন বলে, তাঁদের সকলের ওপর ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদ চিরন্তন প্রবাহে বইতে থাকুক। বস্তিবাসীদের জন্য এই গৃহনির্মাণ-প্রকল্প যা সমগ্র ভারতবর্ষের বস্তি-উন্নয়ন প্রকল্পের ইতিহাসে আজ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তা ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে একটি বহুদিন-লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপলাভ করল। আমি বিশ্বাস করি, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর আশীর্বাদে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রয়াস একটি শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হবে এবং দেশ ও সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।*

* গত ৫ মে ১৯৯০ উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তিতে বস্তিবাসীদের জন্য নবনির্মিত বাসভবন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ঐ পল্লীর 'বিবেকানন্দ পল্লী' নামকরণ উপলক্ষে আজাদ হিন্দ বাগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আয়োজিত সভায় প্রদত্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ভাষণ।

মানুষের সেবাই যেখানে ধর্ম

জ্যোতি বসু

আজ আপনাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ মিলিত হতে পেরেছি এবং একটা শুভকাজে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। রামকৃষ্ণ মিশন একটি আলাদা ধরনের সংস্থা। বিভিন্ন সময় তাঁদের কর্মসূচীতে যোগ দিতে আমি অনেক সুযোগ পেয়েছি। বিদেশেও অনেক জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র আছে। আমি দু-চার জায়গায় গিয়েছিও। সর্বত্র তাঁদের কাজের ধারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সব জায়গায় গিয়ে দেখেছি ওঁরা মানুষকে ভালবাসেন। ওঁরা শুধু প্রার্থনা করার মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রাখেন না। আমরা বুঝেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন। আমাদের দেশে রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে যে-সংস্থা স্বামী বিবেকানন্দ গড়েছিলেন তার সদস্যদের সেই উপদেশই তিনি বারে বারে দিয়েছিলেন। একথা আমরা জানি যে, তাঁদের আদর্শ শিরোধার্য করে সেবামূলক এইসব কর্মকাণ্ড রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে—আজকে নয়, বহুদিন ধরেই।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। যেমন অনেকেরই ছিল তখন। সে বহু বছর আগের কথা। তখন আমি স্কুলে পড়ি বা কলেজে পড়ি। ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ) যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, আমার মনে আছে তিনি সেসময় মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসতেন, আলাপ আলোচনা করতেন। ছেলেবেলায় আমি তাঁকে দেখতাম এবং পরবর্তী কালেও আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকেছে।

যাই হোক, রামকৃষ্ণ মিশনকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি এবং সমর্থন করি এই কারণে যে, ওঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে থেকে, মানুষকে ভালবেসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওঁরা সুনাম অর্জন করেছেন। ওঁরা হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, অন্ধ বালক বিদ্যালয় প্রভৃতি চালাচ্ছেন। আমি কামারপুকুরে গিয়েছিলাম। সেখানে ওঁদের পল্লীমঙ্গলের কাজ দেখেছি। সেখানে দেখলাম এক অভিনব ব্যাপার। তা থেকে আমরাও শিক্ষা নিয়েছি। আমরা কিছু সাহায্য করেছিলাম, কিন্তু এখন আবার আমরা ওঁদের থেকে শিক্ষা নিচ্ছি। ওঁরা একটি ছোট চটকল করেছেন সেখানে। এসব দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে এগুলো আরো ছড়িয়ে দেওয়া যায় যেখানে পাটচাষ হয় সেইসব জায়গায়। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ানরাও তাই বলছেন। এটা একটা দৃষ্টান্ত। তাছাড়া বন্যার সময় আমরা দেখেছি যে, আমাদের ওঁদের ডাকতে হয় না, ওঁরা নিজেরাই এগিয়ে আসেন। শুধু যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে হয়তো ওঁরা আসেন। কিন্তু ওঁরা যেখানে যান, অন্ততঃ আমার কাছে তাই রিপোর্ট যে, সেখানে মানুষ সন্তুষ্ট হয়। সন্ন্যাসীরা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা এইসব কাজ করেন তাঁদের ব্যবহারের ফলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যদি ওপর থেকে মানুষকে হুকুমদারি করি বা মনে করি যে তাদের ওপর বসে উপকার করছি, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক হওয়া উচিত তা যদি গড়ে না তোলবার চেষ্টা করি তাহলে মানুষ কখনোই আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না। মানুষের কাছে মানুষ ব্যবহারের জন্যেই গ্রহণযোগ্য অথবা বর্জিত হয়। আমার মনে হয়, এইজন্যেই ওঁরা এই সব সেবাকার্যে সুনাম অর্জন করেছেন। ওঁরা কিছুক্ষণ আগে বললেন যে, আমার অনেক সময় নষ্ট করে আমি এখানে আজ এসেছি। আমি বলব, তা একেবারেই নয়। আমি আজকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এইটাই তো আমাদের কাজ হওয়া দরকার। কারণ আমরা নিজেদের বলি জনগণের সরকার এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা জানেন—আমরা নিপীড়িত, শোষিত, পিছিয়ে-পড়া মানুষের পক্ষে। যাঁরা ওপরতলার মানুষ তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কিন্তু শতকরা আশি-পঁচাশি ভাগ মানুষ যাঁরা সমাজে আজও পিছিয়ে-পড়া তাঁরা তা পারেন না।

আমাদের দেশ অনেক এগিয়েছে, অনেক পরিণত

হয়েছে। এসব আমরা জানি। কিন্তু এখনো এদেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন এবং তাঁদের জন্য আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। নানা পরিকল্পনা হচ্ছে। আমরাও সরকার থেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার সঙ্গে আমরা এটা বুঝে নিয়েছি যে, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য আমরা যদি না পাই, ওঁদের যদি আমরা অনুপ্রাণিত করতে না পারি, ওঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না পারি, তাহলে অনেক কাজ—যেসব কাজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় তা পড়ে থাকবে। কেউ করবে না। রামকৃষ্ণ মিশন তো বিরাট প্রতিষ্ঠান—সবাই এর কথা জানেন, দেশে-বিদেশে এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। আমি তের বছর সরকারে আছি। আমি প্রথম থেকে দেখছি যে, আরও অনেক ছোট-বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভাল কাজ করছে। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে সরকারে আসবার আগে আমার এটা জানা ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এইসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন। কেউ শিশুদের, কেউ নারীদের দেখছেন, কেউ এমন সব রোগীদের মধ্যে কাজ করছেন যাদের কেউ ছোঁয় না। আমাদেরই কলকাতার আশেপাশে এইসব হচ্ছে এবং এই সেবামূলক প্রয়াসের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

রামকৃষ্ণ মিশন বস্তিবাসীদের জন্য সুন্দর একটা কাজ করলেন। সরকার কিছুটা সাহায্য করেছেন বলে আমি শুনলাম। কলকাতা কর্পোরেশনও কিছু সাহায্য করেছেন, জনপ্রতিনিধি যাঁরা আছেন, তাঁরাও সাহায্য করেছেন। খুবই ভাল কথা। কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা একটা কর্মসূচী নিয়েছি। সে-কর্মসূচী চলছে। রামকৃষ্ণ মিশনও সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতার বস্তিতে বাস করে। অপরিকল্পিতভাবে কলকাতা গড়ে উঠেছে তিনশ বছর ধরে। স্বাধীনতার পর কিছু ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছে। সঠিত পরিকল্পনা কিছু হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরেও আমাদের যতটা করা উচিত ছিল তা করে উঠতে পারিনি। আমাদের আগেও মনে হতো—এখনও মনে হয় এই মানুষগুলি কিভাবে মানুষের মতো বাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা তো অপরাধী। বিবেক ও চেতনাসম্পন্ন কোন মানুষই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। ভাবি, এই মানুষগুলি এইভাবে থাকছেন কি করে? এক মানুষের মতো থাকার অবস্থার মধ্যে থাকা নাকি? ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি আইন তৈরি করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—বস্তি-সংস্কার না করে আমরা বস্তিগুলো সব দূরে সরিয়ে দেব। ওঁদের অন্য কোথাও আশ্রয় দিয়ে সেখানে আমরা বহুতল বাড়ি তৈরি করে ওঁদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করব। কিন্তু সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে যেটা করতে পেরেছেন, আমি তাতে খুব অবাক হয়েছি। কারণ বস্তিবাসীরা যেখানে ছিলেন আপনারা তাঁদের সেই জায়গাতেই আশ্রয় দিয়েছেন। ও'রা চোখের সামনে দেখেছেন যে, তাঁদের জন্য ভাল বাড়ি হচ্ছে। তাঁরা সেখানে ঢুকবেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। তখনকার দিনে আমরা বলতাম এ'দের সরাব কোথায়? এই মানুষগুলিকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাঁদের কর্মসংস্থানের কি হবে? খাওয়াদাওয়ার কি হবে? এই এলাকায় রেখে যদি এইভাবে ওদের বাড়ি তৈরি করা যায় তো তাই হবে সবচেয়ে ভাল। রামকৃষ্ণ মিশন তাই করলেন। এটা ঠিক যে, এত সংখ্যক বস্তিবাসীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা সহজ নয়। সেজন্য প্রচলিত অবস্থার মধ্যেই আমরা অন্ততঃ এই কাজগুলি করার চেষ্টা করি—যেমন বস্তির মধ্যে যাতে আলো, পরিশ্রুত জল, পয়ঃপ্রণালীর পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির উন্নতি ঘটানো যায় ইত্যাদি। এখন এখানে শুনলাম শিশুদের ও মায়েদের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা এ'রা করেছেন যাতে অসুখ-বিসুখ যতটা কম হয়। এখন দেখা দরকার যে, বস্তিবাসীদের যাতে কেউ বিতাড়িত করতে না পারে।

দেশে বেকার-সমস্যা বেড়েই চলেছে। সব বেকারদের চাকরি দেওয়াও সম্ভব নয়। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম থাকলে সরকার থেকে পঞ্চাশ টাকা করে

ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু পঞ্চাশ টাকায় কি হবে? স্বনির্ভরতার জন্য আমরা যদি কিছু করি তাহলে কাজ হয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা করেছি যাতে স্বনির্ভরতার কিছু কিছু কর্মসূচী আমরা বেকার ছেলেমেয়েদের দিতে পারি। দেখতে হবে তারা যেন কাছাকাছির মধ্যে কিছু করার সুযোগ পায়।

আমি একবার সাংহাই গিয়েছিলাম অনেক বছর আগে। সেখানে দেখলাম বিরাট সব বস্তি। এখানকার মতোই বা তার চেয়েও বিরাট। আমি বললাম, 'কি ব্যাপার, আপনারা সব বিপ্লব করেছেন, কম্যুনিস্ট সরকার হয়েছে। অথচ এইরকম সব বস্তি এখনো কেন?' ওঁরা বললেন, 'দশ বছর পরে আসবেন আপনি, দেখবেন নতুন সাংহাই গড়ে উঠেছে।' আমি পরবর্তী কালে দেখেছি যে সে-সাংহাই আর নেই। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনো এখানে তা করে উঠতে পারিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ—নারী-পুরুষ, শিশু কি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে এই সব বস্তিতে বাস করছেন। সেজন্য আর একবার রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ দিই। তাঁরা যে কয়েক বছর আগে এরকম একটা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এখন সেটা কার্যে রূপায়িত করলেন। শুধু কার্যে রূপায়িত করেননি, এখানে এসে শুনলাম বস্তির দরিদ্র মানুষেরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তাঁদের আত্মমর্যাদা যাতে থাকে সেদিকটাতেও ওঁরা লক্ষ্য রেখেছেন। যাঁরা এই নতুন ফ্ল্যাটগুলির প্রাপক, এই যে চাবি তুলে দিলাম ওঁদের হাতে—ওঁরাও একাজের অংশীদার। এইটিই দরকার। গ্রামের কাজ হোক বা বস্তির কাজ হোক, তা দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। তাঁরা যাতে মাথা তুলে চলতে পারেন তাঁদের সেই মানসিকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে শুধু কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না। রামকৃষ্ণ মিশন সেই লক্ষ্য নিয়েই চলেছেন বলে আমার ধারণা হয়েছে। সেজন্যে আপনাদের সঙ্গে আমরাও সংশ্লিষ্ট আছি। যতটুকু আপনাদের সাহায্য করার তা আমরা করেছি। আরো যতটা পারি তা আমরা নিশ্চয়ই করব।

আর একটা জরুরী কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে, এখন এই নতুন বাড়ি হয়ে যাবার পর আজ যাঁরা চাবি পেলেন, নতুন বাড়িতে ঢুকবেন, আরো অনেক-গুলো ফ্ল্যাট হবে বলে শুনছি, সেই সব ফ্ল্যাটে যাঁরা বাস করবেন তাঁদের দেখতে হবে, পাড়ায় পাড়ায় যেন পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয়, ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য যেন কমিটি তৈরি করা হয়। তাঁদের রাজনৈতিক ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। কে কাকে ভোট দেন তা দেখার দরকার নেই। নিজের পাড়ার টিউবওয়েলটা খারাপ হয়ে গেলে করপোরেশনে গিয়ে খবর দেওয়া দরকার যে, টিউবওয়েলটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমি জল পাচ্ছি না বা আমার এখানে নোংরা পড়ে আছে এসব তো জানাতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে। এই মনোভাব আমাদের গড়ে তুলতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন বলেন তাঁদের লক্ষ্য মানুষ তৈরি করা, মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করা। এই লক্ষ্যে আমরা নিশ্চয় পৌঁছাতে পারব, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

আর একটা কথা বলে আমি শেষ করব। তা হলো এই যে, রামকৃষ্ণ মিশনের একটা ধর্মীয় দিক আছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ধর্মকে বিচার করেন, বিশ্লেষণ করেন; কিন্তু তাঁদের বৈশিষ্ট্য হলো—ধর্মের জগতের লোক হয়ে তাঁরা মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যার সময় আর্ত-মানুষের এঁরা সেবা করেন। তাঁরা হাসপাতাল, অনাথাশ্রম ইত্যাদি চালান। এঁরা মানুষের সেবাকেই ধর্ম বলে মনে করেন। এটি একটি অভিনব ব্যাপার। ধর্মাচরণ যে তাঁরা করেন, সে তাঁরা করুন। কারণ, আমাদের সংবিধানে আছে যে, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেই সংবিধানেই আছে যে, ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ মানুষকে দিতে হবে। আমরা গর্বিত যে, এইরকম বিধান আমাদের সংবিধানে আছে এবং সেজন্য আপনারা জানেন যে, কোন ধর্মীয় সমাবেশ হলে—যেমন আমাদের গঙ্গাসাগরের মেলাতে অনেক লোক আসেন—সরকার থেকে তাঁদের আমরা সহায়তা করি। গঙ্গাসাগরে সকলের স্নানের আমরা ব্যবস্থা করে দিই। শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানদের ঈদের সময় নামাজ পড়ার জন্য তাঁরা রেড রোড কয়েক ঘণ্টার জন্য চান এবং আমরা তার ব্যবস্থা করে দিই। তেমনি

যখন পোপ কলকাতায় এসেছিলেন তখন খ্রীস্টানরা এসে আমাকে বললেন, 'এই প্রথম উনি কলকাতায় আসছেন। আপনি আমাদের একটু সাহায্য করুন। আমরা ওঁকে দেখতে চাই, আমরা একটা সমাবেশ করতে চাই।' সেসব তাঁরা করলেন। আমরা তাঁদের সাহায্য করলাম। এই বস্তুটি এখন পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলি। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি নিয়েই ভারতবর্ষ। আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের মানুষ আছেন। বর্তমানে কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আমরা দেখছি, ধর্মের নামে মানুষকে যাঁরা ভাগ করতে চাইছেন। এটা খুব দুঃখের বিষয়, খুব ক্ষোভেরও বিষয়। আমরা এর ঘোরতর বিরোধী। মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে হবে। কিন্তু যদি ঐভাবে আমরা মানুষকে ভাগ হতে দিই তাহলে ভারতবর্ষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ ধরনের কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটছে, মানুষের মনটাকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সেইভাবে প্রচারও চলছে। আমাদের সবাইকে এর প্রতিরোধ করতে হবে। বিশেষতঃ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যুবসম্প্রদায়কে এবিষয়ে সজাগ হতে হবে। আমরা গর্বিত যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যেসব মনীষীদের জন্ম হয়েছে, যাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি, যাঁরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে —সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে, তাঁরা কখনো মানুষকে এইভাবে ভাগ করতে বলেননি, মারদাঙ্গা করতে বলেননি। এই মৌলবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধেই তাঁরা প্রচার করেছেন। এইগুলি আমরা কি ভুলতে পারি?

আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, যারা এই ফ্ল্যাটগুলোর প্রাপক তারা কি তপসিলী জাতি? মিশন থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, বেশির ভাগই—ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত।' এটাও আমাদের সবার পক্ষে গর্বের বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের যেসব কথা আমরা পড়েছি তা কি আজও বাস্তবায়িত হয়েছে ভারতবর্ষে? হয়নি। দেশে আজও জাতপাতের লড়াই হচ্ছে। গান্ধীজীর যেখানে জন্ম সেখানেও হচ্ছে। তপসিলী জাতি-উপজাতির ওপর আক্রমণ হচ্ছে। আজ কোথায় সেসব কথা?—"নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" অছ্যুৎ বলে এখনো তো মানুষকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি। গান্ধীজী তাদের 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছেন। আখ্যা দেওয়া ভাল। কিন্তু তারা কি সত্যি-সত্যিই 'হরির জন'? এখনও তো ভারতবর্ষে অনেক জায়গা আছে যেখানে ডোমরা যদি একটা গ্লাসে জল গড়িয়ে দেয় তো কেউ খাবে না। তারা বলে, 'আমরা উঁচু জাতির লোক।' সৌভাগ্যবশতঃ পশ্চিমবাংলায় আমরা তার থেকে অনেকটা মুক্ত। ভারতবর্ষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এসব আমাদের দূর করতে হবে। ভারতবর্ষকে দুনিয়ার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অস্পৃশ্যতার মতো এত বড় পাপ, এত বড় অপরাধ আমাদের দেশে আছে—এ আমাদের চরম লজ্জা।

মানুষ গরিব হোক, মূর্খ হোক, মানুষকে সেবা করতে হবে, ভালবাসতে হবে, মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আমরা জানি কি কি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে এঁরা গরিব, এঁরা মূর্খ। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সেই মানুষের সেবার কাজ চলছে। মানুষের সেবাকে তাঁরা বলেন ধর্ম। সেই হিসাবে আমি আগেই বলেছি, রামকৃষ্ণ মিশন একটি আলাদা ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আমার পক্ষ থেকে, আমার সরকারের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর বলছি যে, আমাদের পক্ষে যতটা সহযোগিতা করা সম্ভব তা আমরা সবসময় রামকৃষ্ণ মিশনকে করে যাব।*

* গত ৬ মে ১৯৯০ উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তিতে বস্তিবাসীদের জন্য নবনির্মিত বাসগৃহগুলির আনুষ্ঠানিক বণ্টন এবং 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আজাদ হিন্দ বাগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ।

ধন্য তুমি কলিকাতা

প্রণব ঘোষ

পূবে পশ্চিমে উত্তরে দখিনে মধ্যে জুড়িয়া ক্ষেত্র যার,
দেবী কালিকা তোমারে প্রণাম, তোমারে প্রণাম—নমস্কার।
উত্তাল এই কলিকাতা আজ করিছে প্রণাম মুকতি-তৃষ্ণ,
পথে পথে তার ধূলিতে ধূলিতে অভয় বিলান শ্রীরামকৃষ্ণ।
কলিকাতা নাম, হেথা মহাধাম 'ক্ষমাস্বরূপিণী' সারদা মার,
'উদ্বোধন' যে তাঁরই স্নেহকোল, সকল-তীর্থ এখানে সার।
বিশ্ববিজয়ী বিবেকের বাণী ছুটিয়া গিয়েছে হেথা দিয়ে,
এই সে শহর তিনশ বছর বয়সের ভার দেহে নিয়ে।
এই শহরের হৃদয়-কমলে পূজা-বেদী তাঁর আছে পাতা,
সেবা মমতার মুরতি-প্রতিমা ভারত-ভগিনী নিবেদিতা।

কলকাতাঃ একটি সন্ধ্যা

নিভা দে

সেই সন্ধ্যায় আশ্চর্য রহস্য ছিল
অসংখ্য ক্ষতময় সহিষ্ণু প্রাচীনা
আমাদের কলকাতার আকাশে—
বসন্ত আসছিল পা টিপে টিপে
পোষা কোকিলের শিক্ষিত গলায়
—আচমকা এসে হাঁকাডাকি করেছিল কিছু—
পথের বাতিদণ্ড ছিঁড়ে তারাবাতির
আলো ঝলকাচ্ছিল—
লোকেরা ঠেলাঠেলি করে বাড়ি ফিরছিল
সিনেমা নাটক চলছিল পাশাপাশি
ছিনতাই গুণ্ডামি—তার সাথে ভালবাসাও।
ফিরোজা বেগমের কণ্ঠের চাপা ব্যথার মীড়
আকাশের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কলকাতায় নামিয়ে আনছিল সেদিন এক
মায়াবী সন্ধ্যা।
ন্যাফথালিনের নস্ট্যালজিক গন্ধ ছিঁড়ে
বেরিয়ে আসছিল
অগুরু কস্তুরী—জীবনের অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠেছিল
কী চমৎকার বিমিশ্র সুর—কার অঙ্গুলি-সংঘাতে।
আলাদিন সে বাদকের হাত ধরে—
কোন কোন দিন হয়তো ভুলে যাওয়া যায়
নিরন্ধ্র দিনগুলির অপমান ভার ···।

শুভেচ্ছাঃ কলকাতাকে

প্রভাকর মাঝি

থুত্থুরে না, নড়বড়ে না,
যদিও শ-তিন উমের হয়—
কলকলিয়ে ছলছলিয়ে
ফিরছে, আহা, সব সময়॥

হৈ হুল্লোড়, সিজিল-মিছিল,
দুদ্দাড় বেগ ছুটন্ত ঃ
নেতিয়ে-পড়া স্যাঁতানো না—
টগবগিয়ে ফুটন্ত॥

কোথাও খানাখন্দ কি নেই?
নেই কি ঝুপসি অন্ধকার?
সব মিলিয়ে সব ছাপিয়ে
জীবন পরিপূর্ণ তার।

যার খুশি সে নিন্দে করুক—
কারুক্কে সে ফেরায় না মুখ,
আলোয় কালোয় ভালই জানে
বেঁচে থাকার দারুণ সুখ।

রাস্তা সরীসৃপ যতো না,
প্রাণে ততো উচ্ছলতা,
থাকুক হাজারেতেও অটুট;
শুভেচ্ছা এই, কলকাতা।

কলকাতা

শান্তি সিংহ

আমার এক চোখে ঈগল হাউসের তীক্ষ্ণতা
অন্য চোখে ভিক্টোরিয়া পরীর স্বপ্ন
ইডেনের চিবুক ছুঁয়ে গড়ের মাঠ
আমার হৃদয় যেন ঘাস।

সারা শরীরে জেগে থাকে
মেট্রো-রেলের ধমনী স্পন্দন
সন্ধ্যার কুয়াশা-মাখা আলো-অন্ধকারে
হাওড়া ব্রিজের দিকে তাকিয়ে
দৃষ্টি ছড়িয়ে যায়
দূরে— বহুদূরে…

চিৎপুর থেকে কালীঘাট
হোগলার বনে শুনি বাঘের গর্জন,
চিতে ডাকাতের মশাল-জ্বালানো চিৎকারে
আট বেয়ারার পালকি থেমে যায়।

পার্কস্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভেসে ওঠে
জঙ্গলগিরি, চৌরঙ্গী বা ডিয়ার পার্কের ছবি,
ঘোড়দৌড়ের মাঠে ডুয়েল লড়াইয়ের
বিষাদান্ত পৌরুষ।

আর বৌবাজারের জ্যামজটে
কালীমন্দিরে দাঁড়িয়ে শুনি
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির গান,
কিংবা মাণিকতলায় রামমোহনের বাড়িতে
জাগরণের প্রথম নির্ঘোষ।

স্পষ্ট দেখতে পাই
বীরসিংহ থেকে চল্লিশ মাইল ঠেঙিয়ে
বাবার সঙ্গে হনহন হেঁটে আসছেন
বালক ঈশ্বরচন্দ্র
কলকাতার পলিমাটিতে 'রেঢ়ো' যুবক
ক্রমে হয়ে উঠেছেন
বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর।

কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর টোলে গেছেন
আরেক 'রেঢ়ো'-বামুন
তারপর শ্মশান-জাগানো শিশুর কান্নায়
গঙ্গাতীরে গড়েছেন বিশ্বতীর্থ।
তিনিই খালবিল পেরিয়ে মিলেছেন সাগরে,
গেছেন কমল-কুটিরে,
সার্কাস-চিড়িয়াখানায়-জাদুঘরে বা
পাথুরিয়াঘাটা-ঠনঠনে জমিদারবাড়িতে
আর রঙ্গালয়ে নিমাইসন্ন্যাস পালা দেখে
ভাবাবিষ্ট চেতনায় ঘনঘন চেয়েছেন জল।

চৌরঙ্গীর সদর স্ট্রীটের
বিশাল বাড়ির ঝুলবারান্দায়
এক কিশোর কবির মনে ঘটেছে
সৌন্দর্যের উদ্ভাসন
চেতনা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করেছে
এক আশ্চর্য সকাল।
ঠাকুরবাড়ির 'বিচিত্রা'—
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আসছে নতুন যুগ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দা এক্সকারশন' কবিতা
পড়াচ্ছেন হেস্টি সাহেব
তরুণ ছাত্রদের বোঝাচ্ছেন
'ট্রান্স' কথাটির অর্থ,
সেই শব্দটির সূত্রে ঘটেছে বিশাল সূত্রপাত-
এক উজ্জ্বলন্ত তরুণ প্রবল জিজ্ঞাসায়
ছুটে গেছেন এক ভাবুকের কাছে
যেন পশ্চিম এসেছে পূর্বে,
উত্তর মিলেছে দক্ষিণেশ্বরে।

কলকাতা তুমি

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কলকাতা, তোমার বয়স কত ?
বেশ কিছুকাল ধরে শুনছি
কিছু লোক বলছে
তোমার বয়স নাকি এখন
তিনশ বছর।
ষোলোশো নব্বই-এর চব্বিশে আগস্ট
জব চার্নক যখন সুতানুটির ঘাটে নেমেছিলেন
সেদিন থেকে ওরা তোমার
জন্মদিনের হিসেব করছে।
আচ্ছা, কলকাতা, তুমিই বলো
এই হিসেব কি করে ওরা করে ?
ইংরেজরা বলেছে বলে ?
তাদের পেটোয়া কিছু এদেশীয় মুৎসুদ্দি
ইংরেজের সানাইয়ে পোঁ ধরেছিল বলে ?
তুমি যে কথা বল না,
অথবা তুমি বল, কিন্তু
ওরা শুনতে পায় না,
অথবা শুনেও শোনে না।

মানুষ যখন হিসেব করে'
শহর বানায়, নগর নির্মাণ করে
তার একটা জন্মদিন
থাকতে পারে,
কিন্তু মানুষের পরিকল্পনা-মাফিক
যে জনপদ ধরিত্রীর বুকে আসেনি
কোন নির্দিষ্ট সন-তারিখে
তার জন্মদিন চিহ্নিত করা
চলে কি ?
সুখ্যাত পল্লী কলকাতার
বিশ্বখ্যাত মহানগরীতে রূপান্তর
জব চার্নককে ধরেই—
তা তুমিও যেমন জান,
আমরাও তেমনি জানি।
কিন্তু জব চার্নকের সুতানুটিতে আসার
দুশো বছর আগে
বিপ্রদাস লিখেছেন, 'মনসা-বিজয়'-এ,
দেড়শ বছর আগে
আবুল ফজল লিখেছেন 'আইন-ই-আকবরী-তে,
একশ বছর আগে
কবিকঙ্কণ লিখেছেন 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ
[সময়ের হিসেব দশ-বিশ বছর
এদিক-ওদিক হতে পারে]
যে কলকাতার কথা,
সে কলকাতা কি ভারতের আর কোথাও ?
সে তো তুমিই।
আরও আগে বল্লাল সেনের সময়
কালীঘাটের কালীকে প্রণাম করতে
আসত দলে দলে তীর্থযাত্রীরা,
তোমার পথে পথে রয়েছে তাদের পদচিহ্ন,
সময়ের ধুলো উড়িয়ে দেখলে
তা এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে।
তাই বলি
ফিরিঙ্গি সদাগর তোমার
জনক হতে পারে না কখনো।
সেই কোন কালে কে জানে
সতীর দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি
তোমার বুকের ওপর খসে পড়েছিল,
সেই দিন থেকেই তো তুমি
'কালীক্ষেত্র'—'কালীকোঠা',
আর তা থেকেই তোমার নাম হলো
'কলিকাতা'—'কলকাতা'।
মহাকাল স্বয়ং তোমার জনক,
জননী তোমার মহাকাল-জায়া মহাকালী,
তোমার পথের ধূলি নিয়েই তো
ললাটে ভস্ম-তিলক এঁকেছেন মহাকাল,
আর তুমি—
তোমাকে মহাকালী রেখেছেন
তাঁর ললাটের সিন্দুর-বিন্দুতে।
সময় আসবে, সময় যাবে—
তুমি থাকবে চিরন্তন হয়ে
কাল ও কালীর সঙ্গে
নিত্য-সংযুক্ত।

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলকাতা নামক গ্রাম বা অঞ্চল বেশ পুরনো; তবে সাহেব-স্থাপিত 'শহর কলকাতা'র বয়স ৩০০ পূর্ণ হয়েছে। এই সূত্রে সরকারি বেসরকারি নানা মহলের আয়োজনে নানা আলোচনা হয়েছে, রচনাদিও বেরিয়েছে। ইতিহাস আমাদের জানা দরকার, আর যেহেতু দেহবাদের প্রকোপে আছি তাই কলকাতার দেহের হাড়হদ্দ জেনে ফেলেছি—প্রধানতঃ সাহেব-কলকাতার কথা, বা সাহেবদের চোখে ভারতীয় কলকাতার চেহারা, কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য জনগোষ্ঠী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। মাঝে-মধ্যে কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাহিত্যিক এবং আন্দোলনকেন্দ্রিক ধর্মের উল্লেখও পেয়েছি। কিন্তু কলকাতার আত্মার ইতিহাস কতটুকু পেয়েছি ঐসব বিবরণ থেকে? আত্মার অস্তিত্ব সন্দেহজনক, এই ধারণায় বোধহয় কলকাতার আত্মিক সাধনার উল্লেখ করতে দেহবাদীরা বিরত থেকেছেন।

কিন্তু কলকাতা তীর্থভূমি, কেবল বৃহত্তর ভারতের কাছে নয়, বৃহত্তর পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষের কাছেও। কেন? ধরা যাক, অন্য অনেক কারণের মধ্যে, তা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান বলেও। ভারতের রাষ্ট্রপতি, মহান দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দেশপ্রিয় পার্কে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সভায় (২০।১।১৯৬৩) বলেছিলেন ঃ

"এই কলিকাতা শহর শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বহু প্রতিভাধর পুরুষের জন্ম দিয়েছে। **তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ।** (স্থূলাক্ষর লেখকের) এই দেশের আত্মার প্রতিভূ তিনি। এর আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির বিগ্রহ তিনি। সেই চেতনাই অভিব্যক্ত হয়েছে আমাদের ভক্তদের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায়। বিবেকানন্দ এই ভারতের চিরন্তন আত্মার স্পন্দধ্বনিত কণ্ঠস্বর।"

কলকাতাসূত্রে এখানে 'আত্মা' কথাটা এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় আত্মার প্রতিভূ', সেকথা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু কলকাতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসূত্রে সেই আত্মার উৎসের কাছে উপনীত হতে হবে—সে উৎসের নাম—সন্দেহ না রেখে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্য ও অনুবর্তী মানুষদের সাধনা, সত্যদর্শন ও সেবার দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে এই শহরের বিস্তৃত অংশ। এর শিকড়ে শিকড়ে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। শহর কলকাতার জন্মোৎসবে সে-ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ার অর্থ সত্যকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এই শহরে জন্মাননি। কিন্তু তরুণ যৌবনে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে এই শহরের উপকণ্ঠে এসেছেন—এবং তাঁর মহাপ্রয়াণও হয়েছে এই শহরের এক প্রান্তেই। তিনি এই শহরের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন 'মানহুঁশের' সন্ধানে—এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সেকালের ভারতের সর্বোত্তম বহু মানুষের। এঁদের মধ্যে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল, মধুসূদন দত্ত, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শশধর তর্কচূড়ামণি। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ শিষ্যমণ্ডলী তো ছিলেনই।

এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, সিদ্ধি এবং বাণীর বিস্তার হয়েছে এই শহরের প্রান্ত ও মধ্যভাগ হতে। এই যুগের প্রধান ধর্মপুরুষ তিনি, তাঁর জীবনে মিলিত হয়েছে নানা ধর্মের ধারাগুলি, রচিত হয়েছে মহা-সঙ্গমতীর্থ, উচ্চারিত হয়েছে যুগের মহামন্ত্র—'যত মত তত পথ'—এবং মানবতার সত্যসার—'যত্র জীব তত্র শিব'—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। তাঁর পুণ্যাবির্ভাবের ক্ষেত্ররূপে এই শহর পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে সম্মুখ-স্থান গ্রহণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশীনগর—এই কলকাতাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় উপনীত হয়ে জীবনের

শ্রেষ্ঠাংশকে এখানে অর্পণ করলেন—সে কি কেবল ঘটনাচক্রে? তাঁর দাদা রামকুমার, গ্রামের পাঠশালা-পালানো ভাইটিকে শহরে এনেছিলেন তাঁর অন্নবস্ত্রের সুরাহা করে দেবার অভিপ্রায়ে—এই আপাত কারণটিই কি মূল কারণ? শ্রীরামকৃষ্ণের মতো 'বহু যুগের ওপার হতে' আসা মানুষের পক্ষে কথাটা সর্বাংশে সত্য হতে পারে না। বলা উচিত—তিনি কলকাতাকে 'নির্বাচন' করেছিলেন। সে কোন্ কলকাতা? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি যে-ভারতবর্ষ, তার রাজধানী কলকাতা। ইংরেজের শোষণ ও শাসনের কেন্দ্রভূমি। সেইসঙ্গে সেখানে বাঙালীদের জীবনের একাংশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তার ঘটে মনোলোকে তুফান উঠেছে। প্রথমে উদ্‌ভ্রান্তি, তার সঙ্গে কিছুটা স্থিতি। শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংস্কার-আন্দোলনে, ব্রাহ্ম-আন্দোলনে, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষে, টগবগে টলমলো কলকাতা। নব্যভারতীয় কলকাতা বলতে তখন বিশেষভাবে বোঝায় উত্তর কলকাতা—'বাংলার এথেন্স' নামে যা তখন কথিত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থান নিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার উত্তরতর উপকণ্ঠে। সেখান থেকে তিনি ছুটে আসতেন কলকাতায় মানুষের সন্ধানে—দামী পোশাকে ঢাকা নামী মানুষগুলি সত্যই কতখানি মানুষ? অথবা দরিদ্র, প্রায় অর্ধোলঙ্গ মানুষগুলির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে কোন্ আশ্চর্য মনুষ্যত্ব? 'দ্বারে দ্বারে ছোটেন প্রভু, নেইকো অপমান'। তাঁর শুধু সন্ধান—কোথায় পাব 'মানুষ রতন'। কী দুঃসাহস, কী স্পর্ধা! প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য এক পুরোহিত, তিনি যাচাই করছেন নানা রঙের আলোকে দীপ্যমান শহুরে বিখ্যাতদের!! একজন রামকৃষ্ণের পক্ষেই তা সম্ভবপর—মহাসাম্যের অবতার তিনি—একটি ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ভেদরেখা তিনি মুছবেনই। কিন্তু কোন্ মাপে? একমাত্র মাপ-কাঠি, চরিত্র। সেই মাপে বড় ছোট হয়ে যায়, ছোট হয়ে ওঠে বড়। এই কঠিন বিচার সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ আপত্তির নিরসন আজো হয়নি। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির অনুবর্তীই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ প্রকার বিচারমূলক সিদ্ধান্তে রুষ্ট। তাঁদের ক্রোধের ওপরে জ্বলছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য। অহঙ্কারী কলকাতার জানা দরকার ছিল—পদ বা পদমর্যাদা কত তুচ্ছ হতে পারে, অন্ততঃ একজন মানুষের কাছেও। "তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও কিছুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত [কথা] শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল।" [ধর্মতত্ত্ব (ব্রাহ্মপত্রিকা), ৩১ আগস্ট ১৮৮৬]। আচণ্ডালে প্রবাহিত ছিল তাঁর 'প্রেমপ্রবাহ'। যে-ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পরে গ্রামে কামারনীর কাছে ভিক্ষা নিয়েছেন, যাঁর দিব্যতার প্রথম পূজা করেছেন সেখানে এক শাঁখারি, যিনি দক্ষিণেশ্বরে আশ্রয় পেয়েছেন মাহিষ্যজাতীয় রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর কালী-মন্দিরে, বিলাতফেরত বৈদ্য কেশব সেনের বাড়িতে আহার করেছেন, যাঁর অধিকাংশ শিষ্য অব্রাহ্মণ—সেই তিনি যখন একদিন পতিতা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন এই পরম উচ্চারণে—"তোমার চৈতন্য হোক"—কিংবা নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে কোলের কাছে বসিয়ে তাঁর 'অশুচি' ওষ্ঠে স্বহস্তে খাবার তুলে খাইয়েছেন—তখন তাঁর পক্ষে সে-কাজ অস্বাভাবিক না হতে পারে, কিন্তু কলকাতার অভিজাত রক্ষণশীলতার বেড়ার মধ্যে তা বৈপ্লবিক ছিল নিঃসন্দেহে।

কলকাতার পথে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই থেমে যেতেন বাগবাজারের একটি কায়স্থ-বাড়িতে; সেখানে 'শুদ্ধ অন্ন' গ্রহণ করতেন, রাত্রিবাসও করতেন। সেই বলরাম বসুর ভবন (এখন 'বলরাম মন্দির') কলকাতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভবন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শতাধিকবার এসেছেন; যেখানে বহুদিন বাস করেছেন শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ; যেখানে অতুলনীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা হয়েছে (১ মে ১৮৯৭)—সেই ভবনের তুল্য গৌরব কলকাতার আর কোন্ ভবনের—যদি আমরা দেহ অপেক্ষা প্রাণ, প্রাণ অপেক্ষা সত্তাকেই অধিক মূল্য দিই? আবার এও বলব, 'রামকৃষ্ণ মিশন' সূচনার দ্বারা এখানে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ ও সত্তার মেলবন্ধন ঘটাবার আয়োজনও করেছিলেন—তার সূচনা এই ভবনেই হয়েছিল রামকৃষ্ণ-কর্তৃক রথ টানার ঘটনায়। জগন্নাথের পুরুষানুক্রমিক ভক্ত এই বসুভবনে জগন্নাথের রথ ছিল—সেই রথ এখানে টেনেছিলেন গদাধর—তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তিনি

দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আপামর মানুষের স্পর্শেই জগন্নাথের রথ চলে। রামকৃষ্ণ—'রামকৃষ্ণ মিশন' হয়ে সেই আপামর মানবসাধারণের মধ্যে প্রসারিত।

॥ ৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাও নিয়েছেন। তারপর শ্যামপুকুরের বাড়িতে, শেষে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের দেহান্ত পর্যন্ত তাঁর সেবা-পূজা করে গেছেন। তারও পরে বহু বছর নানা সময়ে উত্তর কলকাতার নানা বাড়িতে কাটিয়েছেন—শেষ অবস্থিতি বাগবাজারে স্ব-ভবনে—স্বামী সারদানন্দের আনন্দে গড়া সারদার সেই ভবনটিতে, 'মায়ের বাড়ীতে', তাঁর মহাপ্রয়াণ। গাঁয়ের মেয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন কলকাতায় থাকতে, কেননা কলকাতার 'পোকার মতো কিলবিল করা' মানুষগুলিকে দেখতে হবে তাঁকে। তিনি যে মাতা। তিনি কেবল সংঘজননী নন, তিনি বিশ্ব-জননী। কামনায় যন্ত্রণায় আশায় নৈরাশ্যে জর্জর পৃথিবীর একটি খণ্ড এই কলকাতা—সেখানে স্থাপিত হলেন তিনি—নিখিল মাতৃত্বের প্রতিমা। কেউ ফিরে গেল না মায়ের কাছ থেকে—শুচি-অশুচি, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলের জন্য তিনি—মা সারদা। প্রজ্ঞারও প্রতিমা তিনি। তাঁর পদার্পণ এবং আশীর্বাদের গৌরব নিয়েই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূচনা। তিনি চির বৈরাগিনী—তাঁকে কেন্দ্র করে স্বামীজী-আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী-মঠের সূচনা—যা বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠে আকারিত। বিশ শতকের প্রথম দশকে নিবেদিতা পুলকিত হয়ে দেখেছিলেন, নতুন ভারত তার যাত্রা-পথে 'মাতাদেবী'র কাছে আসছে—প্রণাম করতে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কণ্ঠে উদাত্ত হয়ে উঠেছিল 'চলো চলো' আহ্বান :

"…চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমনি মা-লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্র-মণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও, আর তাহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশীসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, গৃহ-সংসার ভাঙছে, ভাঙবে। সারা বিশ্বজোড়া সেই ভাঙার খেলা থেকে ভারত-বর্ষও অব্যাহতি পাবে না। সমুদ্রঝড়ে দিশাহারা পাখির যেমন মাস্তুলের আশ্রয়, তেমনি সম্পর্ক-ছেঁড়া উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের শান্তির আশ্রয়—মা। নিজের ঘরে সেই মাকে যখন মানুষ না পায়, আদর্শলোকে তাঁকে অন্তত সে যেন পায়। চির-মাতৃত্বের সেই আদর্শ-প্রতীককে শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গিয়েছিলেন—এবং এই কলকাতায় তাঁর পুণ্যপীঠ নির্মিত হয়েছিল। দেবকীর কোল-হারানো কৃষ্ণের জন্য ছিল যশোদার স্নেহাঞ্চল। আর সাধারণ ঘরের সাধারণ মায়ের কোল-হারানো কৃষ্ণের জীবগুলির জন্য ছিল, এখনো রয়েছে, জগতের মা সারদার আঁচল।

॥ ৪ ॥

বিবেকানন্দের জন্ম এই কলকাতা শহরে। তিনি খাঁটি 'কলকাত্তাই'। দেশ-বিদেশ-জোড়া খ্যাতির উষ্ণীষ খুলে ফেলে তিনি যখন শোভাবাজারে সম্বর্ধনা-সভায় বলেছিলেন—"আমি এই কলকাতার ছেলে—এখানে পথের ধুলায় বসে খেলা করেছি"—তখন তাঁর স্নায়ু-শিরা-রক্ত এবং প্রাণসত্তা একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। ঐকালে তিনি নিশ্চয় তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কলকাতাকে দর্শন করেছিলেন এক লহমায়। গৌরমোহন মুখার্জির পিতৃভবন; সেখানে বাল্যজীবন; কত মজা, কোচম্যানের কিংবা রাজার সাজে সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে বসে স্ফূর্তি; টাট্টুঘোড়ার পিঠে চড়ে হৈ-হৈ ছোটা; বাড়িতে সার সার সাজানো নানা জাতের হুঁকোর সবকটি টেনে বাল্য-গবেষণা—'জাত কোথা দিয়ে উড়ে যায় দেখি', কেননা বলা হয়েছিল, এক জাত অন্য জাতের হুঁকো টানলে জাত চলে যায়; ব্রহ্মদত্যির সুখনীড় বলে কথিত চাঁপাগাছে দোল খেয়ে ব্রহ্মদত্যির সাক্ষাৎ-বাসনা এবং সাক্ষাৎ না পেয়ে নৈরাশ্য; তারই মধ্যে ঘরের ভিতরে একান্তে ধ্যান, হঠাৎ জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন (বুদ্ধদেব নাকি!); স্কুলে অসম্ভব চঞ্চলতা; সত্যরক্ষার মূল্য দিতে শিক্ষক-প্রহারে রক্তাক্ত কর্ণমূল; হিন্দুমেলার আখড়ায় ব্যায়াম, ট্রাপিজে দোল খেয়ে পুরস্কার লাভ; আরও বড়ো পুরস্কার—পাগলা

ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝুলে পড়ে গাড়ি থামানো, যাতে আরোহীদের প্রাণরক্ষা হয়; প্রেসিডেন্সি কলেজ; তারপর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) পাঠ; সঙ্গীতচর্চা, গায়ক-খ্যাতি; ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে নিকট পরিচয়; ব্রাহ্মসমাজে গান, অভিনয়; অসাধারণ প্রতিভার-শক্তিতে সেই সময়েই দেশ-বিদেশের ধর্ম দর্শনের গভীরে প্রবেশ; কিন্তু অশান্ত প্রাণ-মন—'কোথায় আছে সেই পরম সত্য, কোথায় সেই নিত্য ঈশ্বর, কে আমাকে দেখিয়ে দেবেন তাঁকে'; হিন্দুধর্মের বিরোধী অথচ ছাত্রপ্রেমিক প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড হেস্টির মুখে আশ্চর্য এই সংবাদ লাভ—দক্ষিণেশ্বরে আছেন এমন এক সাধক যাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো সমাধি হয়; কেশবচন্দ্র সেনের কাগজেও সে-ধরনের সংবাদ বেরিয়েছে, কিন্তু মনে গেঁথে যায়নি; তারপর একদিন বাগবাজারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে সেই মানুষটির সাক্ষাৎলাভ—পরমরহস্যের চাবি তাঁর হাতে ধরা; তারপর দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর—শ্যামপুকুর এবং কাশীপুর; শেষোক্ত স্থানে উদ্ভাসিত এই প্রত্যয়লাভ—ঈশ্বরই রামকৃষ্ণদেহে অবতীর্ণ—এবং তাঁর কাছ থেকে এই দায়লাভ—'নরেন শিক্ষে দিবে', অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ আচার্য—'নরেন হাঁক দিবে', অর্থাৎ নরেন রামকৃষ্ণ-ঈশ্বরের বার্তাবহ প্রফেট। কখন 'হাঁক দিবে'? 'যখন ঘুরে বাহিরে' যাবে—অর্থাৎ ভারত-পরিব্রজ্যা সমাপ্ত করে বাইরে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে উপস্থিত হবে।

এইসঙ্গে এবং এর পরেও স্বামীজীর মনে পাক-খাওয়া ছবিগুলি ছিল—পিতার মৃত্যুর পরে দারিদ্র্য, অনাহার, বরাহনগর মঠে অর্ধাহারের মধ্যেও সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে 'পৃথিবীতে অসামান্য সমষ্টি-সাধনা', 'ঠাকুরের ভস্মাস্থি রাখবার মতো একটুকরো জমিও গঙ্গার ধারে জোগাড় করতে পারলাম না' এই কান্না—

এসবই কলকাতায়—এই কলকাতায় !!

নিঃস্ব পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কলকাতা ছেড়েছিলেন। ধর্মোদ্ধারক মহিমান্বিত বিবেকানন্দ ফিরে এসেছিলেন। তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে যুবকেরা সেই গাড়ি টেনেছিল। শোভাবাজারে সম্বর্ধনা সভায় উঠে দাঁড়িয়ে 'কলকাতার পুরনো ছোকরা' নতুন ছোকরাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

"কলিকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠ জাগ, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে।... সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানে 'অভীঃ', এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।... ওঠ জাগ, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করিতেছে। যুবা—আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী ... কলিকাতায় এইরূপ শত-সহস্র যুবা রহিয়াছে।... ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বর্তমান।... ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করে—মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।... ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যতকিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে সবই সাধারণ মানুষের মধ্যে...।"

"এসেছে সে একদিন।" সত্যই সে দিন এসে গেল। কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ মিশন, ১ মে ১৮৯৭। স্বামীজীর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ ছুটে গেলেন মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষসেবার কাজে। কিন্তু এদিকে কলকাতার ওপরে ক্রমে ঘনিয়েছে করাল ছায়া। ১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে প্লেগ-মহামারী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে, তার কঙ্কাল-হাত ছড়াল পূর্বভারতে, কলকাতায় তার প্রথম নখের আঁচড় পড়ল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামীজীর কবিতার লাইনগুলো তাঁরই ওপরে অট্টহাস্য করে ফেটে পড়ল—"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী—সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।" "মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে।" কিন্তু না, রচনার অন্য অংশও ছিল—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?"

অসুস্থতার জন্য স্বামীজী দার্জিলিঙে ছিলেন। সেখান থেকে মিস ম্যাকলাউডকে

লিখলেন (২৯. ৪. ১৮৯৮) ঃ

"আমি যে শহরে জন্মেছি সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে তবে তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি।"

কলকাতার অবস্থা ভয়াবহ—যতখানি প্লেগের জন্য, ততোধিক প্লেগের ভয়ের জন্য। চারিদিকে শুধু পলায়নপর বিপুল জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে দুলক্ষ লোক পলায়িত। ধনী পর্দানসীন মহিলারা পর্যন্ত পর্দাবন্ধন ফেলে প্রাণভয়ে ছুটেছেন। "সবাই পালাচ্ছে, শুধু পালাচ্ছে, প্রাণভয়ে।" ('মরাঠা', ৮.৫.১৮৯৮ ; অমৃতবাজার ৪. ৫. ১৮৯৮)। এরই মধ্যে কলকাতায় নামলেন স্বামীজী। মঠবাসীদের উদ্বুদ্ধ করলেন প্লেগ-সেবার জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অভয় দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হলো ঃ

"কলিকাতা-নিবাসী ভাইসকল। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী।··· যে-মহা-রোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে-করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি।··· ধনী লোক পালায় পালাক ; আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি।··· হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে···।"

প্লেগের সত্যকার আক্রমণ ঘটল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতিতে ২২ এপ্রিল ১৮৯৯ স্বামীজী এলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সভায় সভাপতিত্ব করতে। অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তবু ধিক্কার ও আহ্বানে পূর্ণ কণ্ঠ তাঁর। বলেছিলেন ছাত্রদের সম্বোধন করে, বাঙালীরা প্লেগ দূর করার জন্য কিছুই করেনি, কেবল আদুরে ছেলের ভাব দেখিয়েছে। এখন এসেছে কাজের সময়। কলকাতার যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে—তারা কাচে-ঢাকা পুতুল নয়, প্রমাণ করতে। কাপুরুষের নরকেও স্থান নেই। সভার মূল বক্তা ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে ছিল আগুনের ভাষা। বর্ণনা করেছিলেন শহরের নরককুণ্ডের মতো বস্তিগুলির কথা, যেখানে কাতারে কাতারে "আমাদের অসহায় ভাইবোনেরা মরছে।" "ধিক সেই বস্তির মালিকদের যারা ঐ নরকে মানুষকে বাস করতে বাধ্য করে। ধিক সেই পৌর-কর্তাদের যারা বস্তির মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না।" তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা", যিনি "ব্রাহ্মণ হয়েও মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন নিজের মাথার চুল দিয়ে।" তারপর শুরু হয়ে গিয়েছিল নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে বস্তি-সেবার কাজ ; মুমূর্ষু প্লেগাক্রান্ত বালককে কোলে নিয়ে নিবেদিতার বসে থাকা। কলকাতা-পুরাণের মহত্তম এক অধ্যায় রচিত হয়েছিল সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবার কাজ দিয়ে। কলকাতার ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথম ব্যাপক বস্তিসেবার কাজ।

॥ ৫ ॥

কলকাতা শহর স্বামীজীকে সুখ দিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু ভালবাসা কেড়ে নিতে পারেনি। কলকাতার বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন—স্বামীজী ধন্যধ্বনি দিয়েছেন দূরে প্যারিস থেকে। তিনি কলমের লড়াই করেছেন কলকাতায় কথিত বাঙলা ভাষাকে শিক্ষিত বাঙালীর ভাবপ্রকাশের বাহন করবার জন্য। "যদি বল··· বাংলা দেশের নানা স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে—অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।··· যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।" কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া গঙ্গা তাঁর কাছে প্রাণ-প্রবাহিণী। সেই গঙ্গায় জল পান, স্নান, সন্তরণ এবং ঝড়ে নৌকায় বৈঠা বেয়ে রামকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা। এই গঙ্গার শোভায় তিনি মশগুল। কলকাতা বন্দর থেকে স্বামীজী পাশ্চাত্যে যাচ্ছেন, দুচোখ ভরে গঙ্গার শোভা দেখছেন ; কখনো ঝরঝরানি বর্ষায় গঙ্গার ধারে গাছপালার রূপ, ভেকের ঘর্ঘর ; তারপরে নীল আকাশে সাদা কালো সোনালী কিনারাদার মেঘের

শোভা ; নিচে তাল-নারিকেল-খেজুরের পাতার চামরের মতো দুলতে থাকা ; গঙ্গার পাড়ে শ্যাম-শ্যাম ঘাস যার সৌন্দর্যের কাছে ইয়ারকান্দি, ইরানী, তুর্কিস্তানি গালচে হার মেনে যায় ; সেই পাড় ছুঁয়ে-যাওয়া গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল, দেখে রঙের নেশা ধরে যায়, "যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে।" এর পরেই স্বামীজীর কণ্ঠে বিষাদের সুর ঘনিয়েছে, সৌন্দর্যের ভাবী সুনিশ্চিত বিনাশ দেখছেন দূর-দৃষ্টিতে, তাতে অশ্রুর আভাস—আমার কলকাতার সেরা সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটবে, ঘটবেই—

"হুঁ, বলি, এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না, দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট ঢেউ-গুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট আর গাধাবোট। আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!"

স্বামীজী একবার না বলেছিলেন, (৯.৮.১৮৯৫) : "ভারতকে আমি সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলন্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি!" ঠিক, অবশ্যই ঠিক। ব্রহ্মজ্ঞ মানবপ্রেমিকের উপযুক্ত কথা, সন্দেহ নেই। তবে এর কিছুদিনের মধ্যে ভারতের প্রান্ত স্পর্শ করতে না করতেই কেন বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এই কথাগুলি : "যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে··· তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি।" আর এই পুণ্য মাতৃভূমির মধ্যে একটি বিশেষ পুণ্যভূমি কলকাতা, কেননা রামকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের স্থল ; এবং তা একান্ত প্রিয়ভূমি, কেননা নিজের জন্ম ও আত্ম-বিকাশের স্থল—সেই কলকাতা স্বামীজীর ভিতরে একেবারে গেঁথে ছিল। তাই যখন পাশ্চাত্যে অসুস্থ, সেখান থেকেই চিরবিদায় ঘটবে এমন সম্ভাবনা, তখন মিস ম্যাকলাউডকে সকৌতুকে সার কথাটি বলেছিলেন, (৩.৮.১৮৯৯) : "আমার রোগ সারাতে দু-একটা পাঁজরা কেটে বাদ দেবে নাকি? উঁহু, তা হচ্ছে না।··· আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, আমার বরাতে লেখা আছে।"

॥ ৬ ॥

বলরামভবনের বারান্দায় স্বামীজী একদিন তন্ময় হয়ে পায়চারি করছিলেন, গুনগুন করে গান গাইছিলেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আর অস্ফুটে বলছিলেন, "ওরে আমার যন্ত্রণা কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে না।" সৌভাগ্যের বিষয়, একজন কাছেই ছিলেন স্বামীজীর সেই মূর্তি দেখে নেবার এবং তাঁর কথাগুলি শুনে নেবার জন্য। তিনি আর কেউ নন, স্বামীজীকে গভীরে বুঝতে যাঁরা সমর্থ তাঁদেরই একজন—স্বামীজীর এক গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ। দৃশ্যটি বর্ণনা করে তুরীয়ানন্দ মথিত স্বরে বলেছেন :

"একটি তীরের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আমি··· যেন চকিতে বুঝিলাম। যে-করুণা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছিল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগলিত হইত।

"এই যে রক্তধারা—অশ্রুধারা হইয়া বিগলিত হইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁহার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করিবে। এই বীরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিবে।"

॥ ৭ ॥

কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুল, ভারতবর্ষও বৃহৎ দেশ। বিবেকানন্দের প্রস্থানের পরে বহমান কালের ওপরে, এবং পরিবর্তমান পৃথিবী ও ভারতের ওপরে, বিবেকানন্দের অশ্রু-রক্তের কোন্ প্রভাব হয়েছে, তা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু বিবেকানন্দের অশ্রুর রক্তবীজ-স্বরূপ রামকৃষ্ণপন্থীরা এই কলকাতায় কোন্ আকারে মানবসেবার কাজ করে চলেছেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করতেই হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর একটা বড় অংশ কলকাতাকে

কেন্দ্র করেই, কারণ তাঁরা মনে করেন, কলকাতার জন্য যতটুকু সেবা করবেন তা হবে রামকৃষ্ণ-তীর্থের সেবা।

রামকৃষ্ণপন্থীরা এই শহরে ও উপকণ্ঠে জনসেবাকর্মের যেসব প্রয়াসে ব্রতী, সংক্ষেপে তাদের কয়েকটির উল্লেখ করা যায়।

তাঁরা স্থাপনা ও পরিচালনা করছেন ঃ

শহরের উত্তর প্রান্তে রহড়ায় ভারতের সর্ববৃহৎ অনাথ বালকাশ্রম।

দক্ষিণ কলকাতায় ভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি হাসপাতাল—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান।

দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার।

শহরের দক্ষিণপ্রান্তে নরেন্দ্রপুরে বিশ্ববিদ্যালয়-তুল্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যার অন্তর্গত রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আবাসিক কলেজ, স্কুল, এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অন্ধ বালক বিদ্যালয়।

পূর্বোক্ত রহড়ায়—একটি বৃহৎ কলেজ, এবং বি. টি. কলেজ।

বরাহনগরে বৃহৎ বিদ্যালয়।

গঙ্গার অপর তীরে বেলুড়ে বি. টি. ও ডিগ্রী কলেজ, পলিটেকনিক।

শহরের উত্তরপ্রান্তে বেলঘরিয়ায় পলিটেকনিক, স্টুডেন্টস হোম (যার পরিচয় কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম নামে)।

বড়িষায় বৃদ্ধ-আশ্রম।

অব্যাহতভাবে প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র—উদ্বোধন। (১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা, বর্তমানে ৯২তম বর্ষ চলছে)। কলকাতা থেকেই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ হতে প্রকাশিত হচ্ছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন ইংরেজী মাসিক প্রবুদ্ধ ভারত, যার পরিচালনভার রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রহণ করে; ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রথমে আলমোড়া ও পরে মায়াবতী থেকে বেরিয়েছে।

ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে ভারতের সুবৃহৎ (বৃহত্তম?) প্রকাশনালয় উদ্বোধন কার্যালয় ও অদ্বৈত আশ্রম।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অথবা রামকৃষ্ণ মিশন প্রভাবিত বহুসংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেকদিন উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী, শ্রীশ্রীমায়ের কথা এবং অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনার দ্বারা ভারতের চিরায়ত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপের সঙ্গে অগণিত মানুষের পরিচয় ঘটাচ্ছেন, সেইসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে আধুনিক কালে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন।

'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছেন।—ক্ষুধিত বঞ্চিত মনুষ্য-নারায়ণের সেবায় স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান করেছেন। তিনি সচেতন করে দিয়েছেন একটি বিষয়ে—সারা পৃথিবীর ধনরাশি কোন একটি জায়গায় ঢেলে দিলেও তার দারিদ্র্য দূর হবে না, যদি না সেখানকার মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। স্বামীজীর সেই আদর্শে এই শহরে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা আর্থ-সামাজিক প্রকল্প। কলকাতার উত্তর প্রান্তে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি পলিটেকনিক কলেজের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। রহড়ায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নরেন্দ্রপুর আশ্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের একাধিক সংগঠন রয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ, যাঁরা কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দেড় হাজার গ্রামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্রতী।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সূচনা হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার একটি ছাত্রাবাসকে অবলম্বন করে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা নিকটবর্তী রামবাগান বস্তিতে শিক্ষাবিস্তার, সেইসঙ্গে অল্পাধিক সেবাকাজ আরম্ভ করেন। এই বস্তিটির অনেক অধিবাসী তথাকথিত ডোম-জাতীয়। পাথুরিয়াঘাটায় তরুণ ছাত্ররা যখন এই পল্লীতে সেবাকাজ আরম্ভ করেন তখন তাঁরা জানতেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে এই পল্লীতে সেবাকাজ করেছেন। ["নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া (স্বামীজী) বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোম পাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন।"—('ভারতে বিবেকানন্দ', ১৯৭৩, ১৫শ সংস্করণ, পৃঃ ৪১২)। স্বামীজী ১০ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন ঃ "কলিকাতার

মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, ঐ ফেমিন-এতে পাঠাও, বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাহাদের সাহায্য কর"]। অল্পকালের মধ্যে স্বামীজীর ঐ বিশেষ কাজ বা ইচ্ছার কথা জেনে কর্মীরা আবেগে আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। সেই রামবাগান বস্তিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নসংস্থান এবং গৃহনির্মাণের ব্যাপারে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন যে-কাজ করছেন, এবং এখনো করে চলছেন, তার চমকপ্রদ ইতিহাস বলবার স্থান এ নয়। তাঁদের কাজ এখন ছড়িয়েছে কলকাতার আরও ১৪টি বস্তিতে। এককথায় বলা যায়, বস্তি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ প্রকল্পে কাজ করছেন রামকৃষ্ণ মিশন এই কলকাতাতেই।

॥ ৮ ॥

তবু কতটুকু। কী বিশাল প্রয়োজন—তার কী সামান্য অংশকেই স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে! কী বিরাট ছিল বিবেকানন্দের বেদনা, আর ভালবাসা! যে-হেদুয়া ছিল বিবেকানন্দের শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র এবং যৌবনের বিচরণক্ষেত্র, রামকৃষ্ণের স্পর্শে সর্বভূতে চৈতন্যের অনুভব করে তিনি একদিন তরুণ বয়সে যে-হেদুয়ার লোহার পাঁচিলে মাথা ঠুকেছিলেন পাগলের মতো, কেননা পথ-ঘাট, গাড়ি, মানুষজন এবং লোহার বেড়াও সমান জীবন্ত —সেই হেদুয়াতেই তিনি তাঁর দেহান্তের মাত্র ৬ মাস আগে একদিন বেঞ্চে বসেছিলেন। তাঁর যৌবনের বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কাছে এসেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব বন্ধুকে বলেছিলেন, আমি ভাই তোমার জন্য আসর সাজাব, তুমি একবার সেই আসরে এসে বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোল। স্বামীজী কাতর স্বরে বলেছিলেন: "ভবানী-ভাই, আমি আর বাঁচব না। যাতে আমার মঠটি শেষ করে কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করে যেতে পারি, তার জন্য ব্যস্ত আছি, আমার অবসর নেই।"

বিবেকানন্দের তখনকার ছবিটি গভীর রেখায় এঁকেছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়:

"সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা।... ঐ ব্যথার কথা ভাবি, বেদনার কথা চিন্তা করি, আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে?"

ব্রহ্মবান্ধব উত্তর দিয়েছেন: "দেশের জন্য ব্যথা কি শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

এইখানেই যদি লেখাটি শেষ করে দিতে পারতাম, সুন্দর সমাপ্তি হতো। কিন্তু—বিবেকানন্দ 'বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল' না তুলে 'মঠটি' শেষ করে যাবার জন্য উৎকণ্ঠা দেখালেন, আর ব্রহ্মবান্ধব তার থেকে বিবেকানন্দকে 'দেশের জন্য শরীরিণী ব্যথা'-রূপে অনুভব করলেন কিভাবে? এই ফাঁকটুকু পূরণ করা যায় এইভাবে—অধ্যাত্ম-মনীষার মহাবিগ্রহ বিবেকানন্দ বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তুলেছেন, আর দুঃখী মানুষের প্রেমিক-ভ্রাতা বিবেকানন্দ সেই বেদান্তকে জনজীবনে কর্ম-পরিণত করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেই বেদান্তকে কর্ম-পরিণত করার যন্ত্র-বজ্র। তাই স্বামীজী মঠটির সুবন্দোবস্ত করবার জন্য অত ব্যাকুল। আর রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা-সহ ভারতব্যাপ্ত কর্মধারা বিবেকানন্দের বেদনার উত্তরাধিকার গ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবু 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর একটুকরো রচনা এই:

"কাল—১৯০২। আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে পাইল—কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরীটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে তালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা। বালকের মতো উহা খাইতে-খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী—একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন-ঝাল আছে।"

জীবনপ্রান্তেও সেই পথের ধুলায় খেলা-করা বালক!!

সেই ধূলিকে নমস্কার করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ / দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি; / এ পুরীর রাজপথের ধূলিরে / মোরা কহি রাজ-রাজেশ্বরী।"

কলকাতার সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

ইতর, মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি নীচুজাতির মানুষেরাই জাতির মেরুদণ্ড—বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এদের বিদ্যাদান, জ্ঞানদান প্রভৃতির সাহায্যে সর্বতোভাবে উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন তিনি। এদের দুঃখ দূর করতে 'হাজারো জন্ম' নিতে দ্বিধাবোধ ছিল না স্বামীজীর। এদের এক-জনকেও মানুষ তৈরি করতে তিনি 'লক্ষ জন্ম' নিতে প্রস্তুত ছিলেন। এদেশে ইতরজনের উন্নতির কাজে অগ্রদূত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দই। আর সে-কাজ তিনি করেছিলেন বাল্যকালেই। ডোমপাড়ার লোকে-দের জন্য নানা কল্যাণপ্রয়াসে নিজেকে অল্প বয়স থেকেই নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি। একথা স্বামীজী নিজেই জানিয়েছেন।[১] এই 'ডোমপাড়া' হলো তাঁর নিজের পল্লী সিমলার কাছাকাছি রামবাগানের বস্তি। সুতরাং কলকাতার বস্তিতে সেবাকাজের সূচনাকারী স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমেরিকায় গিয়েও স্বামীজী ভুলে যাননি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী বস্তির মানুষদের কথা। শিষ্য ও গুরুভাইদের তিনি তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বেলগাঁও-র শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখছেন (২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩): "ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো?"[২] এর কিছুকাল পরে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছেন: "শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটা-কতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিব, অনুন্নত, এমনকি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড় কর। তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও. তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলতি ভাষায় শিক্ষা দাও।"[৩] স্বামীজী তাঁর গুরু-ভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন: "সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে কত গরিব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও।"[৪] (চিঠির তারিখ ১৮৯৪ গ্রীষ্মকাল)। আলমোড়া থেকে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন (১০ জুলাই ১৮৯৭): "কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল-ফল—ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা করবার তা করবেন।"[৫]

বছর দুয়েক পরেই স্বামীজীর নির্দেশ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল কলকাতার বস্তিতেই। ১৮৯৯ ও ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্লেগত্রাণ সেবার কাজ রামকৃষ্ণ মিশন করেছিল কলকাতার বস্তিতে। ঐ ত্রাণসেবাই ছিল কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ত্রাণসেবা। তার পূর্বে কোন সংস্থা কলকাতার বস্তি অঞ্চলে কাজ করেছেন বলে লিখিত কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

তবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে কলকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব। প্লেগের আতঙ্কে মহানগরীর মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত। ভয়ে লোকে ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে পলায়মান। স্বামীজী তখন স্বাস্থ্যের কারণে দার্জিলিং শহরে। বিশ্রাম নিচ্ছেন সেখানে। স্বামীজীকে সব কথা জানিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ চিঠি লিখলেন ২৯ এপ্রিল (১৮৯৮): "এখন কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পালাইতেছে। একটা খুব

১ দ্রঃ—ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৬শ সং (১৩৮৩), পৃঃ ৪১২; 'পাঞ্জাব ও কাশ্মীর' নামক স্বামীজীর কথোপকথনের প্রতিবেদন থেকে স্বামীজীর এই অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী আর্যসমাজের প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দ ও স্বামীজীর এক বিশেষ ভক্তের ডায়েরী থেকে।

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সং (১৩৭১), পৃঃ ৩৮৯

৩ ঐ, পৃঃ ৪৩১-৪৩২ (চিঠির তারিখ ২৮ মে ১৮৯৪)

৪ ঐ, পৃঃ ৪৫২

৫ ঐ, ৭ম খণ্ড, ২য় সং (১৩৭১), পৃঃ ৪১৪

panic হইয়াছে। বোধহয় ২'৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে।"[৬] তার আগেই স্বামীজীকে অভিহিত করা হয়েছিল তারবার্তার মাধ্যমে। প্লেগের প্রকোপ কিরূপ হয়েছিল, তা জানতে পারা যায় কথামৃতকার মাস্টার মহাশয়ের লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন কাশীর পণ্ডিত ও স্বামীজীর অতি পরিচিত প্রমদাদাস মিত্রকে ১৭ মে (১৮৯৮)ঃ "We continue to be under the cold shadow of the plague regulations."[৭] প্লেগরোগের বিভীষিকাময় সংবাদে স্বামীজীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দ একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেনঃ "স্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি —একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু তাঁরা কোন রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না তাঁর; একটা বালিশের ওপর মাথা গুঁজে সারাদিন বসে রইলেন। তারপর শুনলাম, কলকাতার প্লেগে তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে—শুনে অবধি এই। সেসময় স্বামীজী বলেছিলেনঃ "সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের সেবা করতে হবে। আমরা যে-গাছতলার ফকির ছিলাম, সেই গাছতলাতেই থাকব।"[৮]

দার্জিলিং থেকে স্বামীজী শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন ২৯ এপ্রিল (১৮৯৮)ঃ "আমি যে-শহরে জন্মেছি, সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকার-কল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি;…।"[৯] অসুস্থ অবস্থায় স্বামীজী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন ৩ মে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ সেবায় আত্মোৎসর্গ করবে। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে (বর্তমানে 'পুরাতন মঠ' নামে পরিচিত)। তিনি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের এক সভা আহ্বান করলেন। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন স্বামীজীঃ "দেখ, আমরা সকলে ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব প্লেগ-রোগীদের সেবা করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করাতে আমাদের এই নতুন মঠের জমিও যদি বিক্রি করতে হয় এবং আমাদের জীবন যদি বিসর্জন দিতেও হয়, তাতেও আমরা প্রস্তুত।"[১০] যে-স্বামীজী তাঁর সাধের মঠ-স্থাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে সদ্য জমি কিনেছিলেন, সেই স্বামীজী প্লেগ-আক্রান্ত মানুষের সেবায় সে-জমি বিক্রি করতেও উদ্যত হয়েছিলেন। সেবাকাজকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তা এথেকে বোঝা যায়। অবশ্য অন্য সূত্রে সেবাকাজের জন্য অর্থ আসায় জমি বিক্রি করতে হয়নি।

সভাতে স্থির হলো—বাংলা ও হিন্দিতে একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হবে জনসাধারণের মধ্যে। আবেদনপত্রটি ইংরেজীতে লিখলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর আদেশে তৎক্ষণাৎ হিন্দিতে অনুবাদ করে দিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখা হয়েছিল[১১]—

"কলিকাতা-নিবাসী ভাইসকল।

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী, এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতেছে,সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোন প্রভেদ নাই। যে অহংকারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে

৬ ব্রহ্মানন্দ-চরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১ম সং (১৯৮২), পৃঃ ১৫৭-১৫৮ ৭ ঐ.

৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ২য় সং (১৩৮৯), পৃঃ ১৫১

৯ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ২য় সং (১৩৭১), পৃঃ ৩৫

১০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫২; স্বামী সারদানন্দও প্লেগ-সেবার জন্য স্বামীজীর মঠ-বিক্রির সংকল্পের কথা বলেছেন। দ্রঃ—উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ২০২

১১ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, ৩য় সং (১৯৮৩), পৃঃ ২৪৪-২৪৫

করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"…

আবেদনপত্রে আটটি বৈজ্ঞানিক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। যথা—বাড়ি, ঘর, গায়ের কাপড়, বিছানা ও নর্দমা পরিষ্কার রাখা; পচা-বাসী খাবার না খাওয়া; বাজারে গুজবে বিশ্বাস না করা; মহামারীর দিনে ক্রোধাদি থেকে বিরত থাকা; জাতি-ধর্মনির্বিশেষে ও নারীদের হাসপাতালে রাখা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থাদি করা প্রভৃতি। সবশেষে বলা হয়েছিল:

"হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থ সাহায্যও সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম সংকীর্তন করিবে।"[১২]

এই আবেদনপত্রটির সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন: "রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রচারপত্রটিকে আমি একটি মূল্যবান দলিল বিবেচনা করি। এই কালের সংবাদে বা সাময়িক পত্র খুললে সেখানে দেখা যায়—হয় কেবলই সেগুলিতে সর্বরোগহর হরিনামের ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে, নয় ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সমালোচনার দ্বারা জনসাধারণকে সরকারের প্রতিষেধক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হচ্ছে—সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈজ্ঞানিক।"[১৩]

সরকারি ব্যবস্থা ছিল টিকাদানের। লোকের ভুল ধারণা ছিল যে, এই টিকা দ্বারা সকলকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই ভ্রান্ত ধারণায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিলেন জনসাধারণ। এই অজ্ঞতা দূর করবার জন্য আবেদনপত্র-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন স্বামীজী। আবেদনপত্র-প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। অকুতোভয়ে তিনি প্রচার করেছিলেন হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড), স্ট্র্যান্ড রোডে টাঁকশালের (এখন নেই) কাছে ও কালীঘাটে। এসকল স্থানে তাঁকে পড়তে হয়েছিল কলকাতাবাসীদের বিক্ষোভ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যে। তাঁকে জর্জরিত হতে হয়েছিল 'সরকারের চর', 'টাকা খেয়েছে' ইত্যাদি বাক্যবাণে। তিনি কিন্তু পিছোবার পাত্র নন। নির্ভীক চিত্তে আবেদনপত্র-প্রচার কাজটি সমাধা করলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।

এই প্লেগ-সেবাকাজে ভগিনী নিবেদিতার নিপুণ নেতৃত্ব ও স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দের প্রাণপণ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম সফলতা এনে দিল। বিশেষজ্ঞ Dr. Haffkein-এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্লেগ-রোগীদের জন্য ব্যবস্থা হলো আলাদা বাসস্থানের। সরকারও তুলে নিলেন বিধি-নিষেধ। কমে গেল প্লেগের প্রকোপ। স্বামীজীর নির্দেশে যে-আবেদন-পত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং তাতে যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যে-পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল প্লেগের প্রকোপ হ্রাসের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বামীজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এরপর স্বামীজী চিকিৎসকদের নির্দেশে গেলেন উত্তরভারত ভ্রমণে। ওখান থেকেও স্বামীজী প্লেগসেবার খোঁজ-খবর নিয়েছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন। আলমোড়া থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখছেন ২০ মে (১৮৯৮): "ওখানে যে দু-একটি case (রোগের আক্রমণ) এক্ষণে হইতেছে, তাহার জন্য সরকারি প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ward-এ ward-এ (মহল্লায় মহল্লায়) ও [সাময়িক] হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। সকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তবে বাগবাজারে কে কি বলছে, তাহা public opinion (জনসাধারণের মত) নহে জানিবে। …আবশ্যক-কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়—এই সকল দেখিয়া কাজ করিবে।"[১৪] শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৭ জুলাই স্বামীজী লিখছেন:

১২ স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ২৪৬

১৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ১২৯

১৪ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬

"কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"[১৫] ১ আগস্ট আবার স্বামীজীর নির্দেশ: "প্লেগ সম্বন্ধে সব লিখেছি। মিসেস বুল ও মুলার প্রভৃতির মত যে যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে কতকগুলো টাকা খরচ কেন? We will lend our services as nurses etc."[১৬]

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে মার্চে কলকাতায় ভয়ঙ্কররূপে আবার প্লেগ উপস্থিত। প্লেগের বিভীষিকা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "কি ভয়ঙ্কর। চারদিকে মানুষ মরছে অথচ কিছু করবার নেই!"[১৭] স্বামীজীর নির্দেশে তাঁর সৈনিকদল সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লেগ সেবাকাজে। তিনি বললেন: "বাংলাদেশ সফর করে তিনি সকলকে উদ্দীপ্ত করবেন। এই প্লেগ-সেবার কাজে যার মরণ হবে সে হয়ে দাঁড়াবে আমাদের আদর্শের স্তম্ভ।"[১৮] সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নেতৃত্বের ভার অর্পিত হলো ভগিনী নিবেদিতার ওপর। গঠিত হলো একটি কমিটি। কমিটির সম্পাদক করা হলো ভগিনী নিবেদিতাকে। কার্যপরিচালক স্বামী সদানন্দ। সহকারী—স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ ও স্বামীজী-শিষ্যদ্বয় স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ।

প্লেগ নিবারণের প্রথম ও প্রধান উপায় দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত ও নোংরা বস্তিগুলির বাড়ি, অঙ্গন, নর্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা। প্লেগ-জীবাণুর আস্তানা ছিল নালী ও বস্তির বাড়িগুলি। রামকৃষ্ণ মিশন বস্তি অঞ্চলে কাজ শুরু করলেন গুডফ্রাইডের দিনে ৩১ মার্চ ১৮৯৯। সেবাকাজ শেষ হয়েছিল ৩০ এপ্রিল। জনসাধারণের মনোবল বাড়াতে এবং সেবা-কর্মীদের উৎসাহ দিতে স্বামীজী নিজে দরিদ্র পল্লীতে এসে বাস করতে লাগলেন।[১৯]

স্বামীজী নিজেই প্লেগ সেবা তহবিলে দিলেন ১০০ টাকা। সেবাকাজের অর্থের জন্য নিবেদিতা কলকাতার সাহেবী পত্রিকা স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্লেগ-আক্রান্ত বস্তির বর্ণনা দিয়ে আবেদন করলেন। তিনি কাজের নমুনা দিলেন—যেসব নোংরা জঘন্য গলি ও নালীর পাশ দিয়ে লোকেরা হাঁটতে ভয় পেত, সেখানে ইংরেজ মহিলারা স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারেন। ফলে তহবিলে অর্থ সাহায্য এল। এর মধ্যে কলকাতার চার্টার্ড ব্যাঙ্কের (Chartered Bank) ৫০ টাকা ও অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত ২৩৫ টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০] তখনকার দিনে এই অর্থের মূল্য ছিল অনেক।

স্বামী সদানন্দ মাত্র সাত জন ধাঙড় নিয়ে প্রথম বাগবাজারে বোসপাড়ার বস্তিতে সেবাকাজ আরম্ভ করেছিলেন। প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়ায় নিযুক্ত হলো আরো পাঁচজন ধাঙড়। মোট ধাঙড়ের সংখ্যা হলো বারো। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে শ্যামবাজারে অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধময় নিকিড়ীপাড়া বস্তি পরিষ্কৃত হলো। শিয়ালদহ রেল স্টেশনের কাছে বহুদিনের অবহেলিত মুচিবাগান বস্তির নালী সাফ করলেন নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দের দল ১৯—৩০ এপ্রিলের মধ্যে। এই সেবাকাজে ধাঙড় ছাড়া অনেক কুলিও নিযুক্ত হয়েছিল।[২১]

এর মধ্যে একদিন (৭ এপ্রিল) স্বামীজী কলকাতায় এলেন নিবেদিতার আবাসে। উদ্দেশ্য প্লেগ-বিষয়ে আলোচনা করা। সব শুনে স্বামীজী নিবেদিতাকে বললেন একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে। তিনি কলকাতার ছাত্রসমাজকে তাতাতে চাইলেন—"সারা কলকাতার ছাত্রেরা আসবে। তারা ঘর ছেড়ে বেরুবে, নিজের হাতে পরিষ্কার করবে শহর। তাদের ধরাতে হবে মৃত্যু-জ্বর।"[২২] বক্তৃতার দিন নির্দিষ্ট হলো

১৫ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪২ ১৬ ঐ, পৃঃ ৪৩

১৭ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০১

১৮ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃঃ ৪৫১

১৯ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০১

২০ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, Edited by Sankari Prasad Basu, 1982, pp. 105, 120

২১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৩২৩ ২২ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃঃ ৪৫২

২১ এপ্রিল।[২৩] স্থান—বিডন স্ট্রীটে ক্লাসিক থিয়েটার। সভাপতি—স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। প্রধান বক্তা—ভগিনী নিবেদিতা। বিষয়—'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য'। ভীষণ অসুস্থ শরীর নিয়ে সভাতে এলেন স্বামীজী। ছোট বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু অগ্নিময়। তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজী 'এমপ্রেস' ও ভারতীয় সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এ। 'এমপ্রেস' কাগজে স্বামীজীর বক্তৃতার রিপোর্ট—"স্বামী বিবেকানন্দ অবিলম্বে সুস্পষ্ট কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাত্রদের মনে গেঁথে দেন। তিনি বলেন, এ-পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি তত্ত্বকথা লাভ করা গেছে, কিন্তু বাঙালীরা প্লেগ নিবারণের জন্য কোন বাস্তব কাজ করে উঠতে পারেনি। জনৈক ইংরেজ সংবাদদাতা সম্প্রতি বাঙালীদের বিষয়ে কঠিন নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন, তাতে বাঙালীরা একেবারে ক্ষেপে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ না বাঙালীরা নিজেদের আলস্য ঝেড়ে ফেলে বাস্তব কাজের দ্বারা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করছে—যতক্ষণ-না তারা প্রমাণ করছে যে, তারা কাচের আলমারিতে রাখা সাজানো পুতুলবিশেষ নয়—ততক্ষণ তারা তাদের গায়ে ছিটানো কলঙ্ক দূর করতে, বা স্বদেশের উপরে চাপানো গ্লানি মোচন করতে পারবে না।"[২৪]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, কিছু ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতাও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। তিনি বস্তি-গুলির পূতিগন্ধময় দৃশ্যের বর্ণনা করেছিলেন ওজস্বিনী ভাষায় আবেগমথিত কণ্ঠে ছাত্রদের জানিয়েছিলেন কিভাবে স্বামী সদানন্দের দল ঐ ভটভটে নোংরা বস্তি ও নালীগুলি অসীম সাহসে দিনের পর দিন পরিষ্কার করে চলেছেন। সবশেষে ছাত্রদের রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে নিবেদিতা ঝলসে উঠলেন: "কলকাতার ছাত্রবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কতজন আছ যারা আমাদের ভ্রাতৃগণের জীবনের এই মহা দুর্দৈবের কালে বিশ্বাসের জ্বলন্ত শক্তি নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারবে? আমাদের মধ্যে এখানে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সগর্বে ভাবেন—আমরা যতই যা-কিছু করি না কেন কদাপি সেই পরমগুরুর (শ্রীরামকৃষ্ণের) দৃষ্টান্তের তুল্য কিছু ঘটাতে পারব না যিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও গভীর রাত্রে মেথরের বাড়ি গিয়ে নিজের মাথার চুল দিয়ে গোপনে তার পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন। সে-ধরনের সেবা সাধারণ তপস্যা নয়—তপস্যার শিরোরত্ন। সে-কাজ সম্ভব নয়। তবু তোমাদের মধ্যে কতজন আছ বল, যারা বস্তি পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে আসবে? এক্ষেত্রে যদি উঠে দাঁড়াতে হয়—একসঙ্গে উঠব; যদি লুটিয়ে পড়তে হয়—একসঙ্গে পড়ব। বিপদের দিনে যে-মানুষ নিজের ভাইকে ত্যাগ করে, অচিরে দুর্ভাগ্য গ্রাস করে তাকে। দরিদ্রের প্রয়োজনই আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—এস, বাস্তব কাজের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ করি।"[২৫]

এই সভায় বক্তৃতার ফলে পনরো জন ছাত্র প্লেগ-স্বেচ্ছাসেবক হন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা নিজেদের পাড়ায় অপরিষ্কার বাড়ি ও বস্তির খোঁজ নেবেন। প্রতি রবিবার কলকাতার বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে নিবেদিতা ঐ সকল ছাত্র-স্বেচ্ছা-সেবকদের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা বলতেন।[২৬]

প্রায় এক মাসের মতো প্লেগসেবা চলল স্বামী সদানন্দের পরিচালনায়। এ-কাজে সরকারি-বেসরকারি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং প্রশংসাও করেছিলেন। কলকাতার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (Health Officer) ডাঃ জে. নীল্ড কুক (Dr. J. Nilld Cooke) বস্তিতে মিশনের প্লেগ-সেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। স্থানীয় সরকারি প্লেগ অফিসার ডাঃ মেহনী (Dr. Mahoney) মিশনের কাজ পরিদর্শন করলেন ৯ ও ১৫ এপ্রিল। পরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন পরম অনুরাগী ভক্ত হয়েছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ব্রাইট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মিশনের সেবা

২৩ ব্রহ্মানন্দ-চরিত, পৃঃ ১৫৯ এবং উদ্বোধন পুনর্মুদ্রণ, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৭৬তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। কিন্তু বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষের ৪র্থ খণ্ডে (পৃঃ ১৩১) আছে ২২ এপ্রিল।

২৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩২

২৫ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃঃ ৪৫৪

২৬ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৩২৩

কাজের। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিষ্কৃত বস্তিগুলি 'আদর্শ' (Model) বস্তি বলে তিনি ঘোষণা করলেন। এসম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন: "আমরা যা করেছিলাম, তা তিনি (মিঃ ব্রাইট) পূর্বে না দেখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমরা জানতাম না যে তিনি আমাদের এখানে আসবেন। আমরা জনসাধারণকে সহায়তা করতে চেয়েছিলাম, অকারণে হৈ-চৈ করার জন্য নয়।"[২৭]

নিরলস কর্মী স্বামী সদানন্দের সাহায্যে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্লেগসেবা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করেছিলেন। এজন্য তিনি সদানন্দের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। নিবেদিতা সদানন্দের কাজের পরিচয় দিয়েছেন: "সাহসী পরিচালকের মতো সদানন্দ ও তাঁর ধাঙ্গড়ের দলবল অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়েন। পরিষ্কার করার পর ছোটবড় রাস্তাগুলির চেহারা অন্যরকম—তাঁকে ধন্যবাদ। গতরাত্রে প্লেগ সম্পর্কীয় বাংলা আবেদন-পত্রগুলি এসেছে। আজ আমরা সেগুলি বিতরণ করছি। সেই সঙ্গে প্লেগ জীবাণুনাশক দ্রব্যাদিও। গতরাত্রে কয়েকঘণ্টা তিনি একটি বাড়ির দরজার সামনে বসে সকল পথচারীদের নিকট আবেদনপত্র বিতরণ করেছেন।"[২৮] নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন (৫ এপ্রিল ১৮৯৯): "স্যানিটেশনের কাজে সদানন্দ চাকরের মতো কাজ করছেন।... ধাঙ্গড়ের দল তাঁকে ভালবাসে, মেয়েরা তাঁকে স্বাগত জানায়, ছেলে-মেয়েরা পালন করে তাঁর নির্দেশ এবং মানুষেরা বিশ্বাস করে তাঁকে। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন আমার ভয় হয়। কিন্তু তা তিনি যদিও হন, আমার বিশ্বাস, তিনি আবার কাজ আরম্ভ করে দেবেন।"[২৯] সদানন্দের নামই হয়ে গেছল 'স্ক্যাভেঞ্জার (ঝাড়ুদার) স্বামী'।

প্লেগ সম্বন্ধে নিবেদিতা বহু চিঠি তাঁর চেনা-শোনা জনকে লিখেছেন। অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি। এসব প্রবন্ধ তৎকালীন সাহেবী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। নিবেদিতা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কাজের তদারকি করতেন। বাড়ি পরিশোধনের জন্য তিনি নিজেই মই দিয়ে বাড়ি চুনকাম করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার একদিন দেখেছিলেন সাদা চামড়ার এক মহিলাকে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে। তাঁর হাতে ঝাড়ু। সেদিন ধাঙ্গড়রা অনুপস্থিত। নিবেদিতাই ছিলেন সাদা-চামড়ার সেই মহিলা। তখন বিদেশিনীর দৃষ্টান্ত অনুকরণে আমাদের দেশীয় পাড়ার ছেলেরা লজ্জায় রাস্তায় নেমেছিল বস্তি পরিষ্কার করতে। প্লেগ-সেবায় নিযুক্ত তদানীন্তনকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ রাধা-গোবিন্দ কর নিবেদিতার অনুপম কাজের নমুনা শুনিয়েছেন: "সেইদিন প্রাতে বাগবাজারের কোন বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ব্যাধি পূর্বেই শিশুকে মাতৃহীন করিয়াছিল। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। তাঁহার প্রতি কথায় ব্যাকুল করুণা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন। বাগদী বস্তিতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা সম্ভব তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র জীর্ণ কুটিরে, নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনিও স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।...রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুই দিন পরে মাতৃহীন শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহতপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।"[৩০]

যখন স্বামীজী আমেরিকা-ইউরোপে, তখন কলকাতায় আবার প্লেগের আবির্ভাব হলো ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে। নিবেদিতাও নেই। তিনিও ভারতের কাজে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত পাশ্চাত্যে। কিন্তু ছিলেন স্বামী সদানন্দ। কলকাতার এই প্লেগ সেবা-

২৭ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, pp. 107, 120 ২৮ Ibid, pp. 99-100 ২৯ Ibid, p. 101

৩০ উদ্বোধন, ৯৪তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫; History of Ramakrisbna Math and Ramakr shna Mission, Swami Gambhirananda, 3rd Revised Edition 1983, p. 105

কাজের পুরো দায়িত্বে ছিলেন তিনি। আবার বস্তির আবর্জনা ও নালী পরিষ্কার করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'সদানন্দের দল'। কাজ আরম্ভ হয়েছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি। শেষ হলো জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।[৩১] উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রীট, দর্জিপাড়া ও মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের কাঠমার বাগান-বস্তিগুলিতে প্লেগের আকার ছিল ভয়াবহ। সদানন্দের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক কুমুদবন্ধু সেন বর্ণনা দিয়েছেন: "বাইরে মুদিখানা আর খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময়, আর দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল।...বস্তির সংলগ্ন একটা সংকীর্ণ খালি জমি, সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা। এই খালি জমির পাশেই দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। যতকিছু আবর্জনা সব পচিয়া দুর্গন্ধময়।"[৩২] এই সকল বস্তিতে সদানন্দের দল প্রত্যেক বাড়ির ভিতরের পায়খানা ও নালী রোগ-জীবাণুমুক্ত ওষুধ দিয়ে সাফ করেছিল। যেসব বস্তিতে ঝাড়ুদার ও মেথররা পর্যন্ত আবর্জনা পরিষ্কার করতে ভয় পেয়েছিল, সেখানে সদানন্দের দল পরিষ্কার করেছিল অকুতোভয়ে। তখন মেথরদের হুঁশ হলো। তারা বুঝতে পারল তাদের ভুল। আবার তারা কাজে যোগ দিল। এ-কাজের জন্য সদানন্দদের ভদ্রশ্রেণীর কাছ থেকে কম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনতে হয়নি। সদানন্দের কাজে বস্তিবাসীরা 'নির্বাক, বিস্ময়াবিষ্ট'। "তাহারা একে একে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাইতে লাগিল। স্বামী সদানন্দের মুখ-চোখ দেখিয়া বোধ হইল সমবেদনায় তিনি ব্যথিত। তখন তিনি কাহাকেও চাউল বা পথ্যাদির জন্য সাহায্য করিলেন।"[৩৩]

সেবাকাজের বিবরণ:[৩৪]

মোট কর্মীর সংখ্যা: ১৩ জন
(2 Gullypit boys, 1 Bhisty, 3 Dhangars, 6 Methars & 1 Matee)
নর্দমাদি সাফ ও জীবাণুমুক্ত বস্তির সংখ্যা: ১৩০০
আবর্জনা পরিষ্কৃত পাকা সংখ্যা: ৪০
আবর্জনা সরিয়েছিল এমন গাড়ির সংখ্যা: ১৬০
প্লেগ-কলেরা আক্রান্ত বাড়ি জীবাণুমুক্ত করা হয়েছিল: ২৪

এই সেবাকাজে মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এ্যান্ড কোম্পানী রামকৃষ্ণ মিশনকে বিনামূল্যে সরবরাহ করেছিল Perchloride of Mercury এবং Phenyl।[৩৫]

কলকাতা কর্পোরেশনের Health Officer ডাঃ জে. নীল্ড কুক এবং District Medical Officer (Plague Department) ডাঃ হোস্যাক (Dr. Hossack) মিশনের প্লেগ সেবাকাজ পরিদর্শন করেছিলেন। ডাঃ হোস্যাক এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যে, বাবু বটকৃষ্ণ পালকে চিঠি লিখে সংস্থার নাম জানতে চেয়েছিলেন। তিনি কাউকে না জানিয়ে বস্তিতে গিয়েছিলেন এবং সে বস্তিতে রামকৃষ্ণ মিশন যে কাজ করছেন, তাও তিনি জানতেন না। এই চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। পুরো চিঠিটি এখানে দেওয়া হলো:[৩৬]

Babu Buto Kristo Pal

130 Lower Chitpur Road
12-5-00 (1900)

Dear Sir,

Today on going to disinfect a house in which a suspicious death had occurred, I found it already disinfected. I was informed that this had been done by the Staff of an association of native gentlemen who have taken up disinfection, and that you were suppling disinfectants gratis. If this is so, It is an admirable idea and I should be glad to know something more of the association and its work. Could you please give me the name and address of

৩১ Vivekananda in Indian Newspapers (1893-1902), Edited by Sankari Prasad Basu & Sunil Behari Ghosh, 1969, pp. 321, 551.

৩২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩

৩৩ ঐ, পৃঃ ১৩৪

৩৪ Vivekananda in Indian Newspapers, p. 552.

৩৫ Ibid, p. 321.

৩৬ Ibid, p. 552.

some leading gentlemen in connection with the movement that I may get full information about it.

Yours truly,
(Sd.) W. M. C. Hossack, MD.

কলকাতা কর্পোরেশনও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি দিয়েছিলেন :[৩৭]

No. 611 Municipal Office
Calcutta, the 30th April, 1900

To Babu Narendra Nath Mitter,[৩৮] B L.
Hon. Secy., RAMAKRISHNA MISSION,
CALCUTTA CENTRE

With reference to your letter dated the 24th instant, forwarding copy of a Report of the Sanitary Work[৩৯] done in Calcutta by the "Ramakrishna Mission", I am directed by the Chairman to state that he is much obliged to you for the report sent to him and which has his cordial sympathy.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servent
(Sd.) W. R. MACDONALD
Secy. to the Corporation.

রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ সেবাকাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান মিরর'—"The Ramakrishna Mission has its plague-volunteers likewise. They are to be met within Calcutta in the dirtiest Streets and filthiest Bustees, helping to clear plague-spots encouraging the people, consoling them in their affliction and teaching them to live clean lives. And this is done without the expenditure of much money."[৪০]

প্লেগ ছাড়া কলকাতায় যখনই কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে, তখনই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকাজ করেছেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (১৯৮৯-১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় কোন ত্রাণ-কাজের প্রয়োজন হয়নি।) যেসকল ত্রাণকাজ হয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। তালিকা দেখলে জানা যায় ত্রাণসেবা হয়েছে বস্তি বা দরিদ্র অঞ্চলে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৮-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে শরণার্থীত্রাণ। দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য পাঞ্জাব, করাচি প্রভৃতি স্থান থেকে মিশন ঝুঁকি নিয়ে চাল ইত্যাদি এনেছিল। এই সেবাকাজে সরকার, বিভিন্ন সংস্থা, উদারহৃদয় ব্যক্তিরা অর্থ ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী মিশনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রিপোর্ট, ফাইল ইত্যাদি থেকে যতটা সম্ভব পরিসংখ্যান দেওয়া হলো। তবে বলা বাহুল্য, এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়।[৪১]

৩৭ Vivekananda in Indian Newspapers, p. 552.

৩৮ নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য 'ছোট নরেন'।

৩৯ মিশন যেসব বস্তিতে কাজ করেছিল, সেগুলির Block & Ward No. : Block No. 4, 7, 19, 36 of Ward No. 1, 13, 14 of Ward No. 3. And 2 of Ward No. 2.

৪০ Vivekananda in Indian Newspapers, p. 552.

৪১ দ্রঃ (i) The Ramakrishna Mission Distress Relief in Bengal & Elsewhere, 1943-1945, Issued by the General Secretary, from Belur Math, Howrah.
(ii) The Ramakrishna East Pakistan Refugee Relief Works, 1950-1954, Issued by the General Secretary, from Belur Math, Howrah.
(iii) Relief works of the Ramakrishna Mission : Report for the years 1971 to 1975, Issued by the General Secretary, from Belur Math, Howrah.
(iv) Ramakrishna Mission Relief Services, 1968-1988, Issued by the General Secretary, Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah.
(v) ব্রহ্মানন্দ চরিত-স্বামী প্রভানন্দ (১ম সং), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
(vi) বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয় ও রিলিফ অফিসে সংরক্ষিত ফাইল।

কলকাতা এবং কলকাতার উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণসেবা (১৯০০—১৯৮৮)

কি ধরনের ত্রাণসেবা	পরিচালন-কেন্দ্র	সময়	ত্রাণসামগ্রী	গ্রহীতার সংখ্যা	মন্তব্য
বন্যাত্রাণ	বেলুড় মঠ	১৯০০ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজার সময়	প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি	বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সদানন্দ ছিলেন ত্রাণকার্যের পরিচালক।
	৭টি কেন্দ্র : অদ্বৈত আশ্রম, উদ্বোধন কার্যালয়, রহড়া, নরেন্দ্রপুর, বেলঘরিয়া, বরাহনগর ও সেবা প্রতিষ্ঠান	৩ সেপ্টেম্বর— ২৭ অক্টোবর ১৯৭০	খিচুড়ি, শুকনো খাদ্যদ্রব্য (আটা, চাল, ডাল, চিড়ে প্রভৃতি) ও চাদর, কম্বল এবং বয়স্ক ও শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ	১৫,৩০০ পরিবার	
	৮টি কেন্দ্র : উপরোক্ত কেন্দ্রসহ গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অব কালচার	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮— ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯	খিচুড়ি (চাল ও ডালের পরিমাণ—২৯,৫০০ কেজি) ; শুকনো খাবার (চিড়া-গুড় ৫০৬২ কেজি ও পাঁউরুটি ১৯৪৬ পাউন্ড)	১৮,৯৩১ পরিবার	
	ইনস্টিটিউট অব কালচার	৫ জুন— ২৪ অক্টোবর ১৯৮৪	শুকনো খাবার—৭৬৯ কেজি দুধ—৩২ পাউন্ড বস্ত্রাদি—৪০০০টি	৩১২৬ পরিবার	
	বেলঘরিয়া ও বড়িষা	১৫-২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪	বস্ত্রাদি—৭৮৫টি	৩৫০ পরিবার	
	অদ্বৈত আশ্রম ও ইনস্টিটিউট অব কালচার	সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	খিচুড়ি, চিড়া-গুড়, বেবিফুড	৭০০ পরিবার	
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক শিবির (Air Raid Protection Relief)	বেলুড় মঠ	এপ্রিল ১৯৪২— ডিসেম্বর ১৯৪৪	প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী	—	৪টি কেন্দ্র : ৩সি ও ১০ নলিন সরকার স্ট্রীট, অপর দুটি কেন্দ্রের নাম জানা যায়নি
নিরন্নত্রাণ (Destitute Relief)	বেলুড় মঠ	ডিসেম্বর ১৯৪৩— ডিসেম্বর ১৯৪৪	ঐ	২১,০০০জন	২টি কেন্দ্র : ৩সি ও ১০ নলিন সরকার স্ট্রীট একটি কেন্দ্র ছিল শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের জন্য। ১২০০ অনাথকে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।*

* হাতিবাগানে ১০ নলিন সরকার স্ট্রীটের কেন্দ্রে তদানীন্তন বড়লাট-পত্নী মিসেস ওয়েভেল (Mrs. Wavell) মিশনের ত্রাণসেবা পরিদর্শন করেন এবং খুব প্রশংসা করেন

কি ধরনের ত্রাণ	পরিচালন-কেন্দ্র	সময়	ত্রাণসামগ্রী	গ্রহীতার সংখ্যা	মন্তব্য
দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ	বরাহনগর, বাগবাজার মঠ, গদাধর আশ্রম, ইনস্টিটিউট অব কালচার, কাঁকুড়গাছি, পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস হোম, শিশুমঙ্গল (বর্তমানে সেবা প্রতিষ্ঠান)	ক) ২২ সেপ্টেম্বর—৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৩ খ) ৮ আগস্ট ১৯৪৩—ডিসেম্বর ১৯৪৪ গ) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩—১০ মে ১৯৪৪ ঘ) ১৯ অক্টোবর ১৯৪৪—মে ১৯৪৫ ঙ) অক্টোবর ১৯৪৩—মার্চ ১৯৪৪	খাদ্যদ্রব্যাদি : ১৬৮৬ মন ৩০ সের রান্না করা খাবার বস্ত্রাদি—৮১২টি অল্পমূল্যে খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়—২০৪ মন ২৯ সের ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা দুগ্ধ বিতরণকেন্দ্র	সপ্তাহে ৫২৫২ জন দৈনিক ২৬১৬ জন দৈনিক ৩০০০জন প্রথম দিকে, পরে ১০০০জন ৩১০০ রোগী ২৯,৯৪২ জন	১১টি কেন্দ্র : ক) ত্রাণকাজ হয়েছে বস্তি অঞ্চলে : বরাহনগর, পার্শীবাগান, হাতিবাগান খ) বাগবাজার, হাতিবাগান, মানিকতলা, বরাহনগর গ) ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, গড়পাড় ঘ) বরাহনগর, কাঁকুড়গাছি পাথুরিয়াঘাটা ঙ) বরাহনগর, হাতিবাগান, বাগবাজার
পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী-ত্রাণ	রহড়া বালকাশ্রম	মে-অক্টোবর ১৯৪৮ ৬ জুন ১৯৫০—২৭ আগস্ট ১৯৫০	কম্বল-বস্ত্রাদি—২৫১৭টি চিকিৎসাদি, বাড়ি তৈরির জন্য জমি ও অর্থ রান্নাকরা খাবার (খিচুড়ি)	১২৮৫ জন ১০ পরিবার ৩২ পরিবার দৈনিক গড় ১২,০০০ জন	বরাহনগর, নৈহাটি ও শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন
ঘাটতি-ত্রাণ (Scarcity Relief)	বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর ও রহড়া	১০ অক্টোবর ১৯৭৪—১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫	রান্না করা খাবার শুকনো খাদ্যদ্রব্যাদি—২১,০২৪ কেজি বস্ত্রাদি—৪০৪৮টি	৮০৪৬ জন	দরিদ্র অঞ্চলে
শৈত্য-ত্রাণ (Winter Relief)	রহড়া	ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫	বস্ত্রাদি—৩৪৪৭টি	৫৩০ পরিবার	ঐ
অগ্নিত্রাণ	বেলুড় মঠ ইনস্টিটিউট অব কালচার	এপ্রিল ১৯৮৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮	খাদ্যদ্রব্যাদি—৪২৬ কেজি বস্ত্রাদি—৩৯১টি বাসন (অ্যালুমিনিয়াম) ইত্যাদি—৫৪টি সেট	৫৪ পরিবার	বাগমারি বস্তি—উত্তর কলকাতা নেতাজীনগর, কসবা

কলকাতা ও শহরতলীর মন্দির

ডেভিড ম্যাককাচিয়ন

॥ ১ ॥

"আমাদের জানাশোনার মধ্যে শহরে হিন্দুদের তেমন কোন মন্দির নেই", মন্তব্যটি করা হয়েছে নিউম্যানের 'হ্যান্ডবুক অফ ক্যালকাটা' নামক পুস্তকে। পুস্তকটির প্রকাশকাল হলো ১৮৭৫। এই পুস্তকে কলকাতার একুশটি খ্রীস্টান গীর্জা সম্বন্ধে আটাশ পাতা ব্যাপী বিবরণ আছে। উক্ত মন্তব্যটি অবশ্য একেবারে অবাস্তব নয়, কারণ তখনকার আমলে কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর কলকাতা শহরের বাইরেই ছিল। পক্ষান্তরে কলকাতা শহরে দেবমন্দিরগুলির গির্জা বা মসজিদের মতো দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিরাটত্ব ছিল না। কলকাতার মধ্যে একমাত্র গোবিন্দরাম মিত্রের নির্মিত মন্দিরই ছিল যা যেকোন বহিরাগত ইউরোপীয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই মন্দির ব্ল্যাক প্যাগোডা নামে খ্যাত ছিল। অবশ্য ১৭৮০-তেই এই মন্দির জীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং জানা যায় যে ১৮২০-র ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়। কলকাতা সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রকাশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির কলকাতায় ছিল। এই বিষয়ে ম্যাকরাবির ১৭৭৫-র চিঠির কথা স্মরণ করা যেতে পারেঃ "ফ্রান্সিসের বাড়ির চারিদিকে মসজিদ ও মন্দির রয়েছে যেগুলি থেকে দিবারাত্র নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে এমন অবস্থা হয় যাতে মনে হয় যেন শয়তানেরা কোন উৎসব পালন করছে।" আজকাল কলকাতায় অসংখ্য ছোট-বড় মন্দির, কোন কোনগুলি কেবলমাত্র গৃহসংলগ্ন একটি মাত্র ঘর যাতে দেব বা দেবী অধিষ্ঠান করছেন, এবং যা মোটেই রাস্তার দিকেও নয়। সন্ধ্যাকালে সারা শহরের আকাশ-বাতাস কাঁসর ঘন্টা ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এবং কালী বা রাধাকৃষ্ণ নিওন আলোতে বিচ্ছুরিত হন।

এইসব দেবতাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন গৃহদেবতা, এই কারণে বিরাটাকারের মন্দিরের অপ্রতুলতা। বিশেষ করে কৃষ্ণ অধিকাংশ পরিবারেরই গৃহদেবতা। শেঠ পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন গোবিন্দ। যেসমস্ত সম্পদশালী রাজারা কলকাতায় বসবাস করতে এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের গৃহদেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ না করে নিজেরা যেরকম প্রাসাদের মতো বাড়িতে বাস করতেন, দেবতাদের জন্যও সে-রকম বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আঠারো শতকের দ্বিতীয় পাদে রাজা নবকৃষ্ণ দেব কর্তৃক নির্মিত দুটি বৃহৎ ঠাকুরবাড়ি—একটি গোবিন্দজীর, অপরটি গোপীনাথজীর জন্য। বিরাট চারকোণা দালান, মাঝখানে উঠোন। উঠোনের দিকে মুখ করে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত (দুর্গাপুজার সময় ছাড়া)। গোপীনাথজীর বাড়ির উঠোন লম্বায় ১১৭ ফুট ও চওড়ায় ৬৪ ফুট এবং গোবিন্দজীর উঠোন লম্বায় ১০৯ ফুট ও চওড়ায় ৬৬ ফুট। গোবিন্দজীর মন্দিরের বহিরঙ্গের আকৃতি নিম্নরূপঃ লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০০ ফুট। কলকাতার মধ্যে এটাই বৃহত্তম মন্দির। আর একটি এরকম ঠাকুরবাড়ি হচ্ছে মদনমোহন দেবের মন্দির। এই মদনমোহন মূর্তিটি বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট বাঁধা রেখেছিলেন, এটাও আঠারো শতকের মাঝামাঝির কথা। অষ্টধাতুর এই মূর্তিটির বেশির ভাগই হচ্ছে সোনা। উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট। লম্বা একটি ঘরের শেষপ্রান্তে চিত্র-বিচিত্র মেঝের ওপর কারু-কার্যময় বেদী, তাতে রুপোর সিংহাসনে দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

এই বাড়ির বাইরে অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ উনিশ শতকীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। বাগবাজারে চিৎপুর ব্রীজের কাছে হরিদাস সাহার ঠাকুরবাড়িও এরকম। বৈষ্ণবদাস শেঠের পুরনো ঠাকুরবাড়িও এ. কে. রায়ের 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' অনুযায়ী টাঁকশালের পিছনদিকে ১৯০১ অবধি ছিল। এই সমস্ত কৃষ্ণের

সঙ্গেই রাধা আছেন এবং নারায়ণের প্রতীকরূপে শালগ্রামশিলাও আছেন। কোথাও কোথাও একাধিক মূর্তিরও অবস্থান দেখা যায়। যেমন গ্রে স্ট্রীটের বলদেবের মন্দির। এই পারিবারিক মন্দিরে বলদেবের সঙ্গিনী রেবতীও আছেন—মৃন্ময়ী প্রতিমা, ২ বা ৩ ফুট উঁচু। ঠিক এর নিচেই রয়েছে পাঁচ জোড়া রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, নিতাই-গৌর, গিরিধারী এবং আটটি শালগ্রামশিলা। কলকাতার অনেক মন্দিরেই মূল দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীও থাকে। যেমন শিবলিঙ্গের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বা কালীর সঙ্গে নারায়ণশিলা।

গ্রে স্ট্রীটের বলদেবের মন্দিরের তিন জোড়া রাধাকৃষ্ণ দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছে। যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা তার মদনমোহনদেবকে বাগবাজারের মিত্রদের কাছে হারিয়েছিল, তেমনি আবার রাজা নবকৃষ্ণ কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গোপীনাথজী বিগ্রহ নিয়ে নিয়েছিলেন তিন লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য। কিছু দেবতা এইভাবে স্থানান্তরে নীত হয়েছেন—আবার কিছু দেবতা এক বিশেষ স্থানের হয়েও জরুরী সময়ে স্থান পরিবর্তন করেছেন যেমন দাঙ্গার পর ঢাকার ঢাকেশ্বরী দুর্গা কলকাতার কুমারটুলীতে আনা হয়েছে। এমন-কি কালীঘাটের কালীও দুবার স্থান পরিবর্তন করেছেন বলে অনুমিত হয়। স্ট্র্যান্ড রোড থেকে ভবানীপুর (চৌরঙ্গী ?) ও তারপর বর্তমান স্থানে।

এই কালীক্ষেত্র হচ্ছে অন্যতম পীঠস্থান। কথিত আছে যে এখানে দেবীর ডান পায়ের বুড়ো [মতান্তরে কড়ে আঙুল] আঙুল পড়েছিল। মনে হয় এই দেবীই এই এলাকার প্রাচীনতম দেবী, যদিও দ্বাদশ শতকের কিছু পরে লেখা নিগম-কল্পের পীঠমালায় বলা হয়েছে যে, একটি ত্রিভুজের তিন কোণে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু এবং মধ্যস্থলে কালী।

এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধরে নিতে পারি যে লৌকিক দেবদেবীর মন্দিরও ছিল। যেমন—ওলাই-চণ্ডী, ধর্মঠাকুর বা বিপ্রদাস পিপলাই-র (১৪৯৫) মনসামঙ্গলে উল্লিখিত সর্বমঙ্গলা যিনি এখনও চিৎপুরে অর্চিত হচ্ছেন। চৌরঙ্গীতে হয়তো চৌরঙ্গীনাথের মন্দিরও ছিল, যদিও তা হয়তো মাটির কুঁড়ের বেশি কিছু নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, চব্বিশ পরগনার পাল ও গুপ্ত আমলের পাকা এবং কারুকার্যময় মন্দিরও পাওয়া গেছে। ১৬৯৮-এ যখন ইংরেজরা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর খরিদ করল তখন একমাত্র জমিদারি কাছারি বাড়িটিই ইষ্টক নির্মিত ছিল। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দিরটি শোনা যায় যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের কোন আত্মীয় ষোড়শ শতকে নির্মাণ করিয়ে ছিল, অনুমান এটিও ইটের ছিল। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উপরোক্ত গ্রাম তিনটি বিক্রয় করেছিল, তারা লালবাজারে এমন দোল খেলত যে, বাজারটি এবং তৎসহ যে দীঘিটি ছিল তা কার্যত লাল রঙের হয়ে যেত। লালবাজার এবং লালদীঘির নামকরণ এই থেকেই। মনোহর ঘোষ নামক রাজা তোডরমলের জনৈক কর্মচারী ১৫৮৬তে চিৎপুরে চিত্তেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিমা দশহস্তবিশিষ্ট এবং কাষ্ঠনির্মিত, নাম শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গা—মনে হয় মূলতঃ জয়চণ্ডী দেবী। কালীঘাটের মন্দির ছাড়াও কলকাতায় আরও অনেক কালীমন্দির আছে—তবে কোনটাই খুব বেশি পুরানো নয়। স্থানীয় জনশ্রুতির দাবি যদিও বিপরীত।

চিৎপুরের ডাকাতে কালী, বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালী, ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী বা নিমতলার আনন্দময়ী কালীর মন্দির—এর কোনটাই শতকের বেশি পুরনো নয় এবং তুলনামূলকভাবে মন্দিরগুলি অর্বাচীন। এছাড়াও কলকাতায় অসংখ্য জনপ্রিয় লৌকিক দেব-দেবী ছড়িয়ে আছেন যেমন—শীতলা, পঞ্চানন, ষষ্ঠী, মনসা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি। শিবের মন্দিরও আছে—পাকা বাড়ি হতে গাছতলায় মাটির ঢিবি অবধি। পি. ডব্লু. ডি-র ১৮৯৫ তালিকা থেকে জানা যায় যে ধর্মতলা স্ট্রীটে একটি জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে এবং 'বাংলায় ব্রাহ্মণ' থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গঙ্গার ধারেও আছে—যদিও এর কোনটারই দেখা মেলেনি। অবশ্য কালীঘাটে নেহাৎই অনুল্লেখ্য কিছু জগন্নাথের মন্দিরের দর্শন মিলেছে।

স্থাপত্যরীতির দিক দিয়ে কলকাতার মন্দিরগুলি হতাশাব্যঞ্জক। কলকাতা যখন গড়ে উঠছে অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ দিকে, বাংলাদেশে হিন্দু-স্থাপত্যরীতি যার বিকাশ ষোড়শ শতক হতে, তার তখন অন্তিম দশা। ১৭৪২-এ মারহাট্টা খাল খননের পর কলকাতার জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময়কার মন্দির যেগুলি নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছে সেগুলির গঠনের দিক দিয়ে ঐতিহাসিক মূল্য প্রায় কিছুই নেই। আঠারো শতকে নিমতলার আনন্দময়ী কালী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৩৯-এ পুনর্নির্মাণ হয়েছে। মন্দিরের ছাদ সমতল আর সামনের দিকে আছে একটা ছোট শিখর মাত্র। ডাকাতে কালীর অধিষ্ঠান দুপাশের ঘিঞ্জি গৃহশ্রেণীর ভেতরকার একটা ছোট ঘরের মধ্যে যা চোখেই পড়ে না। অন্যান্য কালীরও এই অবস্থা।

ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী ও শিবের মন্দির যথাক্রমে ১৮০৩ ও ১৮০৬-এ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে শুধু শিবের মন্দিরটিই আছে, কালী একটি ঝকঝকে আধুনিক ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। ফিরিঙ্গিকালীর চালা আধুনিক মন্দিরের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিব ও মধুসূদন প্রাচীন দেবতা হলেও আধুনিক সমতল ছাদবিশিষ্ট ঘরে বাস করছেন—জনৈক শিখ নকুলেশ্বরের এবং উদয়-নারায়ণ মণ্ডল মধুসূদনের এই বাড়ি ১৮৪৩-এ নির্মাণ করিয়েছিল। এরকম আরও দেখা যাবে।

মুঘল আমল হতে বাংলাদেশে প্রচলিত চালা ও রত্নশ্রেণীর মন্দিরই কলকাতায় দেখা যায়। এর মধ্যে আটচালা বিশিষ্ট মন্দিরগুলিই কলকাতায় সবচেয়ে নজরে পড়ে। এবং এটাই স্বাভাবিক—কারণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় এই রীতিই সবচেয়ে প্রচলিত। লেখক কলকাতায় একটিও চার-চালার (বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে প্রচলিত) মন্দির দেখেননি এবং বাগবাজারের চিৎপুর ব্রীজের কাছে একটি দো-চালা শিবের মন্দির দেখেছেন। জোড়বাংলা মন্দির বা উড়িষ্যার রেথ মন্দির কলকাতায় নেই—যেমন বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরে আছে।

কালীঘাটের কালীমন্দিরই হচ্ছে কলকাতায় বৃহত্তম আটচালা মন্দির—এর গাঁথনি চওড়ায় ২৫½ ফুট আর লম্বায় ৪৬ ফুট। সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় এর নির্মাণ শুরু করেন আর শেষ করেন তাঁর পুত্র ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৯০ ফুট, ছুঁচালো কার্নিস আর ছাদের ধারগুলো বাঁকানো। এর আশেপাশে আরও দশটি ছোট ছোট আটচালা মন্দির আছে—অধিকাংশতেই শিবের অধিষ্ঠান—এছাড়া সমতল ছাদের কিছু মন্দির আছে যেগুলিতে শিব, ভুবনেশ্বরী, জগন্নাথ, শীতলা, নবগ্রহ প্রভৃতি দেব-দেবী আছেন। কালীঘাট মন্দির অপেক্ষাও বড় আটচালা মন্দির আছে খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দির, এর গাঁথনির আকার চওড়ায় ৫১½ ফুট আর লম্বায় ৩৫ ফুট। দেখে মনে হয় এই মন্দিরও কালীঘাটের সমসাময়িক।

কলকাতার অধিকাংশ আটচালা মন্দিরই আকারে ছোট, যে কটি বড় আছে সেগুলি সবই উত্তর কলকাতায়। মদনমোহন দত্তের দুই ছেলে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে নিমতলায় আনন্দময়ী মন্দিরের পেছন দিকে দুর্গেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর গাঁথনির মাপ চওড়ায় ২৩ ফুট ৪ ইঞ্চি, লম্বায় ২৮ ফুট ৪ ইঞ্চি আর উচ্চতা ৫০ ফুট। এই মন্দিরের সামনের দিক সাধারণ, কিন্তু থামগুলোয় কিছু কারুকার্য আছে—কলকাতার অন্যান্য মন্দিরে যেমন দেখা যায়। ভেতরে একটিমাত্র ডোম, কোন খিলান নেই। মন্দিরের শিবলিঙ্গটি মসৃণ কালো পাথরে তৈরি, উচ্চতা আট ফুট, লেখা থেকে মনে হয় লিঙ্গটিও ১৭৯৪-এ নির্মিত। মন্দিরটি এখনও হাটখোলার দত্তদের কর্তৃত্বাধীনে আছে এবং দিনে চারবার পূজা দেওয়া হয়। আর একটি বড় আটচালা মন্দির হচ্ছে ৫১ নং নন্দরাম সেন স্ট্রীটে অবস্থিত রামেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের একটি উৎকীর্ণ পাঠ হতে জানা যায় যে, নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দিরটি ১৮৫৪-তে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একটি আধুনিক ফলকে লিখিত হয়েছে যে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৫৪ (অনুসন্ধান সাপেক্ষ)। মন্দিরের পরিমাপ হলো লম্বায় ৩৭½ ফুট ও চওড়ায় ৩১ ফুট, এবং লিঙ্গের উচ্চতা ৫ ফুট। মন্দিরের

বাইরের অংশ মস্ণভাবে সিমেন্টে বাঁধানো তবে ভেতরের মেঝে কারুকার্যময়, এছাড়া টেরাকোটার কাজও কিছু আছে। চিৎপুরে সর্বমঙ্গলার মন্দিরও আটচালা বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ—এই মন্দিরের উঠানে আরও তিনটি ছোট আটচালা মন্দির আছে—দুটি শিবের ও একটি গণেশের। আঠারো শতকের শেষ দিকে ড্যানিয়েল প্রকাশিত 'ভিউ অন দি চিৎপুর রোড, ক্যালকাটা' নামক পুস্তকে কালীঘাটমন্দির সদৃশ একটি বড় আটচালা মন্দিরের কথা বলা হয়েছে, সেটা মনে হয় এই সর্বমঙ্গলা মন্দিরেরই প্রসঙ্গ। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির অনুকরণে উনিশ শতকেই বাগমারির শিবমন্দির গঠিত বলে অনুমান। আরও পাঁচটা বড় আটচালা শিবমন্দির টালিগঞ্জের ফিল্ম স্টুডিওগুলির কাছে দেখা যায়। এই মন্দিরগুলি ঘোষ পরিবার কর্তৃক নির্মিত; চারটি আছে একসঙ্গে, এদের মধ্যে বড় মন্দিরটি লম্বায় চওড়ায় যথাক্রমে ১৮ ফুট ও ১৬½ ফুট, শিবলিঙ্গ একটি ১ ফুট ৪ ইঞ্চি ইটের মঞ্চের উপর, উচ্চতা ৩½ ফুট—এটি সীতারাম ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—আর অপরটি বলরাম ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—লম্বা চওড়া যথাক্রমে ২২½ ফুট ও ২ ফুট ৩ ইঞ্চি।

টালির নালার এপারে ছ-টি খসে পড়া আটচালা শিবমন্দির আছে—আর ওপারে আছে একটি কালী-মন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির। কথিত আছে যে, সাবর্ণ চৌধুরীরা এগুলি করিয়েছিলেন। চৌধুরী-দের বসবাস যেখানে ছিল সেই বড়িশায় আরও অনেক আটচালা মন্দির দেখা যায়।

কালীঘাটের এক মাইল দক্ষিণে আদিগঙ্গার পূর্ব-তীরে আর একটি বড় আটচালা মন্দির আছে—এটি রাধামোহন দেবের। এই মন্দির বাওয়ালির উদয় নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই মণ্ডল পরিবারের আরও অনেক মন্দির দক্ষিণ কলকাতায় আছে। রাধামোহনের মন্দির বর্তমানে একেবারে নতুন করে গড়া হয়েছে—পুরানো কোন ছাপই আর নেই। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে তিন দিকে শিবমন্দির দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা আছে—১৪ বর্গ ফুট হিসাবে বারটি আটচালা শিবমন্দির, এছাড়া একটি পঞ্চরত্ন ও একটি চারচালা দোলমঞ্চ। এগুলি প্রায় খসে পড়া অবস্থায় রয়েছে, মনে হয় রাধামোহনের সমসাময়িক কালের এই মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উভয় দিকে আচ্ছাদিত প্রবেশদ্বার। কালী বা কৃষ্ণের মূল মন্দিরের সঙ্গে ছোট ছোট আট-চালা শিবমন্দির স্থাপন এখানকার প্রথা বলেই মনে হয়, যেমন করুণাময়ী বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। রাধামোহনের মন্দিরের সামান্য উত্তরে মণ্ডল পরিবার কর্তৃক নির্মিত আর এক সারি মন্দির আছে। গোপালজীর একটি নবরত্ন মন্দির ও তার দুপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির, এছাড়া আরও দশটি আটচালা মন্দির—এই মন্দিরগুলি একটি চত্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পিয়ারীলাল মণ্ডল ১৮৪৫-এ এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখনো এগুলি সযত্নে পরিচালিত। এই মন্দির-শ্রেণীর ১০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় একই সময়ে ব্যানার্জি পরিবার একটি আটচালা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির করিয়েছিলেন। এই মন্দিরের চূড়া ও ছাদ একটু বিশেষ আকৃতির। চক্রবর্তী পরিবার কর্তৃক নির্মিত বেলগাছিয়ার ওলাইচণ্ডী (১৮৯১) মন্দির—এটা আটচালা—এই আটচালার ওপরেও এক চূড়া আছে যার ফলে এটা বারচালা হয়ে গেছে। এই মন্দিরটি মোটামুটি ঐতিহ্যবাহী (১৬ ফুট×১৪ ফুট ২ ইঞ্চি) এবং লৌকিক দেব-দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত—এই মন্দিরে ওলাইচণ্ডী ছাড়াও আছেন পঞ্চানন, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী এবং ছটি ঘট; চত্বরে একটি গাছতলায় হলো ষষ্ঠীতলা এবং হাঁড়িকাঠ। ১৯৩০-এর দশক অবধি কলকাতায় আটচালা মন্দির তৈরি হয়েছে—শেষটি ১৯৩৪-এ নিমতলা স্ট্রীটে। ছোট ছোট আটচালা শিবমন্দির কলকাতায় অনেক আছে। সেন্ট্রাল এভেন্যুতে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস অফিসের পাশে একটি আটচালা কালীমন্দির আছে।

রত্নশ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে পঞ্চশৃঙ্গ অপেক্ষা নবশৃঙ্গ মন্দিরই কলকাতায় প্রচলিত। এর মধ্যে-সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হলো গত শতকের মধ্য-ভাগে নির্মিত কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর টালি-গঞ্জে রাধানাথের এবং উত্তর শহরতলীতে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।

দুটি মন্দিরেরই পরিমাপ হলো আয়তনে ৪৬ বর্গফুট এবং উচ্চতায় ১০০ ফুটের ওপর। এই মন্দির

দুটি কলকাতার অন্যতম বৃহত্তম। মন্দিরদ্বয়ের আকৃতি ও ছাদ কম-বেশি একই রকম, যদিও পুনর্নির্মাণের ফলে টালিগঞ্জ মন্দিরের পুরাতন বহিরঙ্গসজ্জা বিনষ্ট হয়েছে। রাধানাথ মন্দিরের সঙ্গে আছে কেবলমাত্র একটি অষ্টবাহু রাসমঞ্চ (বর্তমানে পরিত্যক্ত)। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্নানের ঘাটের উভয় পাশে আছে বারোটি ছোট ছোট (১০´ ১০´´× ১৫´ ২´´) শিবমন্দির এবং এই সারির উভয় প্রান্তে আছে সমতল ছাদবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণ-মন্দির ও একটি খোলা মণ্ডপ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা(১৮৫৫) হলেন রানী রাসমণি ও রাধানাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামনাথ মণ্ডল (PWD তালিকা অনুযায়ী)। গোবিন্দরাম মিত্রের বিখ্যাত ব্ল্যাক প্যাগোডাটি নবরত্ন শ্রেণীর ছিল, কথিত আছে ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দ হলো এর প্রতিষ্ঠাকাল। ড্যানিয়েলের সূত্র থেকে জানা যায়, এই মন্দিরটি যথেষ্ট উঁচু ছিল। সম্ভবতঃ মূল মন্দিরের দুপাশে সংযুক্ত দুটি উপমন্দিরও ছিল, মূল মন্দিরের সামনে ও ডানদিকে দুটি ছোট আকারের নবরত্ন মন্দির ও গড়ানে ছাদের আটচালা মন্দির ছিল। উইলিয়াম হিকির (১৭৮৯) লেখা হতে আরও একটি টাওয়ার-এর কথা জানা যায়। মন্দিরের ছাদ বরাবর সম্মুখভাগে আরও একটি ছাদ, এবং এর মাথায় অনেকটা ইউরোপীয়ান ছাঁদের ত্রিভুজাকৃতি চূড়া ছিল। হিকির লেখা থেকে একথাও মনে হয় যে, মন্দিরটি যথেষ্ট উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও নবরত্ন শ্রেণীর ছিল না। এবং আটচালা মন্দিরটি চিৎপুর রোডের অপরদিকে ছিল। তবে কি সেটিই ছিল আদি ডাকাতকালীমন্দির? 'বাংলায় ব্রাহ্মণ' থেকে জানা যায় উনিশ শতকে পুরানো মন্দিরটি ভেঙে পড়ার পর অভয়চরণ মিত্র আর একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করেন। বাস্তবিকই এখন একটা উঁচু নবরত্ন মন্দির আছে, আপজনের ১৭৯৪-এর মানচিত্র অনুযায়ী মনে হয় এটাই সেই প্যাগোডার জায়গা, কিন্তু সবকিছু সম্প্রতি এমনভাবে মেরামত হয়েছে যে চেনাই যায় না। এখন একই ছাদের নিচে রয়েছে গোপেশ্বর শিবের লিঙ্গ এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত ঘরে রয়েছে রত্নেশ্বর শিব, শীতলা, হনুমান ও রাধাকৃষ্ণ। মন্দির এখন উত্তর প্রদেশের রাম পিয়ারী দুবের হাতে রয়েছে এবং পূজারীরা হচ্ছে হিন্দুস্থানী।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সার চার্লস ডি'ওয়লির 'চিৎপুর বাজারে হিন্দু মঠ' শীর্ষক চিত্রাবলী হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, চিত্তেশ্বরী মন্দির একটি নবরত্ন শ্রেণীর মন্দির ছিল। যাই হোক, এটা ঠিক যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে চিৎপুরে উক্ত শ্রেণীর একটি মন্দির এবং মন্দিরটি তখনই যথেষ্ট পুরানো ছিল। এমন-কি মন্দিরের গা দিয়ে গাছও বেরিয়েছিল, যদিও চিত্তেশ্বরীর বর্তমান মন্দির একেবারে আধুনিক। দুর্গামন্দিরের উভয় পার্শ্বে আছে জগন্নাথ (পঞ্চরত্ন) ও রামসীতার (আটচালা) মন্দির। ডি'ওয়লির চিত্রাবলী হতে স্ট্র্যান্ডরোডে অবস্থিত আর একটি নবরত্ন মন্দিরের কথা জানা যায়, এটিও বর্তমানে নেই। ত্রিলোকরাম পাকড়াশী কর্তৃক ১৭৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত একটি নবরত্ন ও দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির এখনও সেন্ট্রাল এভেন্যু সংলগ্ন কেন্ডারডাইন লেন-এ আছে, ১৯৪০-এ মেরামতির পরও মোটামুটি আদি রূপেই আছে। নবরত্ন মন্দিরটির আয়তন তুলনা করলে ছোট, মাত্র ১৪ বর্গফুট ও একটিমাত্র প্রবেশ পথ। উক্ত প্রতিটি মন্দিরেই প্রায় পাঁচফুট লম্বা শিবলিঙ্গ আছে। এর থেকে খানিকটা বড় আকারের নবরত্ন মন্দির আছে শ্যামপুকুর পুলিশ থানার পাশে। দয়াময়ী দেবী কর্তৃক মন্দিরটি ১৮৪৮-তে প্রতিষ্ঠিত,ভবতারিণী কালী এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মন্দিরের সম্মুখভাগে গোলাকৃতি থামের ওপর তৈরি খোলা বারান্দা এবং মন্দিরের বহিরঙ্গের সম্মুখভাগ খুবই কারুকার্যময়। মন্দিরের আয়তন হলো ২১ বর্গফুটের কিছু বেশি, এছাড়া সাড়ে নয় বর্গফুটের দুটি আটচালা শিবমন্দিরও আছে। আটচালার মতো নবরত্ন-বৈশিষ্ট্যও উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে ক্রমবৃদ্ধি হারে রূপ বদল করেছে। কালীঘাটের মৈমনসিংহ স্মৃতিস্তম্ভ ও ক্রম রূপ বদলের একটি উদাহরণ—কাঁচ ও লোহার কাজের সঙ্গে গোলাকৃতি খিলান, আবার বাঁকানো কার্নিস ও ঐতিহ্যময় চূড়া। চূড়ান্ত রূপ বদলের উদাহরণ হলো বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ-এর সোজা কার্নিস আর কোন টাওয়ার (Cone Tower)—পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ। আলিপুর ব্রীজ থেকে আদিগঙ্গার তীর বরাবর কিছু

পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা গেলেও ছোট আটচালা শিব-মন্দিরই বেশি চোখে পড়ে।

॥ ৩ ॥

বাংলাদেশের মধ্যযুগের শেষদিককার মন্দির-গুলির পোড়ামাটির সাজ-সজ্জাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কলকাতার কোন মন্দির এই সাজে সজ্জিত কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতার মন্দিরগুলি প্রায় সবই উনিশ শতকের সৃষ্টি, যখন ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে টেরাকোটা শিল্প মৃতপ্রায়। এই অবক্ষয় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কলকাতায় দ্রুত হয়েছে।

১৮১৪ নাগাদ তৈরি বাসুদেব মন্দিরের পাশেই বাঁশবেড়িয়ারাজের হংসেশ্বরী মন্দির-এর মসৃণ করে মাজা গা থেকে বোঝা যায় পোড়া মাটির ফলক তখনই সেকেলে হয়ে গেছে। এমন-কি আঠারো শতকের শেষাংশে নির্মিত হুগলী জেলার বকশা (১৭৯৩) ও দিঘসুইর (১৭৯২) মন্দিরেও টেরাকোটার কোন সাজ নেই। কলকাতার আশপাশে উনিশ শতকের পর কোন টেরাকোটার কাজই চোখে পড়ে না, অথচ মেদিনীপুর ও বীরভূমে বিশ শতকের প্রথম অবধি টেরাকোটার কাজ হয়েছে। তাছাড়া কলকাতায় পুরানো মন্দিরগুলি ব্যাপকহারে এমনভাবে মেরামত হয়েছে যে, আদিতে মন্দিরগুলির কি রূপ ছিল এখন আর তা জানা সম্ভব নয়। তবে আমরা যতদূর জানি তাতে বলা যায় যে, সমসাময়িক অন্যান্য মন্দিরের মতো কালীঘাট মন্দিরেও বর্তমান রঙিন টালিগুলির জায়গায় টেরাকোটার কাজ ছিল। শোনা যায় কেন্ডার-ডাইন লেনের মন্দিরের মেঝেতে টেরাকোটার কাজ ছিল, তবে বর্তমানে সিমেন্ট করা। আঠারো শতকের মন্দির হওয়া সত্ত্বেও গোবিন্দরামের 'প্যাগোডা' বা চিৎপুর মঠ-এ টেরাকোটার কাজ নেই, যদিও ডি'ওয়ালির স্ট্র্যান্ড রোডস্থিত নবরত্ন মন্দিরের দোতলার প্রবেশপথের উভয় পাশে দুটি মূর্তি আছে।

প্রাচীন টেরাকোটার কাজের একটি নিদর্শন দেখা যাবে ২।৫নং কেবলকৃষ্ণ সুর স্ট্রীট (কুমারটুলি)-এর একটি আটচালা শিবমন্দিরে, এই মন্দিরটি পলাশী যুদ্ধেরও আগে তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের অন্যতম অংশীদার সন্ন্যাসী বিশ্বাসের বিবরণ অনুযায়ী এই মন্দির নির্মাণ করেছিল পাটনা রেসিডেন্টের দেওয়ান ও পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার বনমালী সরকার। ১৭৪০ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে নির্মিত কুমারটুলিতে তার প্রাসাদতুল্য বাড়ি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মন্দিরটিও আঠারো শতকের মাঝামাঝি তখনকার প্রচলিত ঢঙে তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের ছাদ ও কার্নিস আগে-আলোচিত আটচালা মন্দিরগুলোর মতো নয়। পরিমাপ হলো লম্বায় ২২ ফুট, চওড়ায় ১৯½ ফুট ও উচ্চতায় ৩৫ ফুট, মোটামুটি বড় আকার। আগে এই মন্দিরের প্রবেশপথ ছিল দক্ষিণে, বর্তমানে একটি পাঁচিল তুলে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিমে একটা দরজা হয়েছে, ভেতরে একটা ভাঙা প্রাচীন লিঙ্গ প্রতিদিন পূজা পান। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরের সম্মুখভাগের উপরাংশ ভেঙেচুরে গেছে বোঝা যায়, আর নিম্নাংশের কাজের ওপর সিমেন্ট করা হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগের উপরাংশে তিন সারি ছোট ছোট মূর্তি আছে আড়াআড়ি ফ্রেমের মধ্যে। এগুলি আবার ফুলের কাজ ও স্ক্রলের কাজ দিয়ে আলাদা করা। খাড়া খাড়া স্ক্রলের কাজের নিচে আরও মূর্তি আছে। মোটমাট ৩৭টি মূর্তি। এছাড়া প্রতি কোণে একটা করে ময়ূর। কতকগুলি মূর্তি বড় অদ্ভুত ও মজাদার : এখানে শিল্পী তার কল্পনাশক্তির চর্চা করেছে। বিভিন্ন ভঙ্গিমার কতকগুলি যোগী মূর্তি আছে। যেমন, কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর হাত দুটো মাথার ওপর তোলা, কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর একটা পা মাথার ওপর তোলা ইত্যাদি। আর একজন সাধু নগ্ন হয়ে বসা, হাত দুটো মাথার ওপর তোলা আর পেছন থেকে একটি মেয়ে উঁকি মারছে (এই মূর্তিটি সম্প্রতি চুরি হয়ে গেছে)। আর একটাতে দেখা যায় একজন মাথার ওপর পা দুটো তুলে রয়েছে, আর একজন তার পা থেকে কাঁটা তুলছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি হলো গলবস্ত্র হওয়া এবং ইউরোপীয়ান পোশাক পরা একটি নারী। জানালার ধারে নাকছাবি পরা একটি নারীমূর্তিও আছে, মনে হয় প্রেমিকের চিন্তারত। এছাড়া আরও অনেক মূর্তি আছে যেমন—নর্তকী, সঙ্গীতজ্ঞ, বাদ্যবাদক, দারোয়ান, কৃপাণধারী যোদ্ধা

প্রভৃতি। দেব-দেবীর মধ্যে আছেন নরসিংহ, বলরাম ও সরস্বতী।

১৭৮৮-তে প্রতিষ্ঠিত টালিগঞ্জে ঘোষ পরিবারের চারটি মন্দির জীর্ণ হয়ে পড়া সত্ত্বেও টেরাকোটার কিছু নিদর্শন এখনও ধরে রেখেছে। প্রবেশপথের চার পাশে ইতস্ততঃ পদ্ম ও কিছু কাজকর্ম রয়েছে। কেবলমাত্র বড় মন্দিরটিতেই মূর্তির কাজ আছে। যেমন—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধরত রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বলরাম, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, গরুড় ও হনুমান। ১৮০৭-এ বলরাম ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে টেরাকোটার কোন কাজ নেই। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে কালীঘাট-মন্দির নির্মাণের সমসময়ে সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার বড়িশায় বারোটি আটচালা শিবমন্দির নির্মাণ (বা মেরামত) করেন, এই বারোটির মধ্যে তিনটি মূর্তির কাজ আছে—দরজার দুপাশে ও ওপরে এক সারিতে। এই মন্দিরগুলিতে টালিগঞ্জ-মন্দিরের অনুরূপ ঢং চোখে পড়বে—এছাড়াও যা কাজ আছে তা হচ্ছে বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস, মহিষমর্দিনী, শিব, মাতৃকা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি। আবার কিছু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক মূর্তিও আছে, যেমন—খাঁচা হাতে একজন অশ্বারোহী আর অশ্বের পায়ের কাছ থেকে একটি মূর্তি উঠছে বা গণ্ডার, শিয়াল বা হরিণে আরোহিণী মাতৃকামূর্তি। এই মন্দিরগুলির কয়েকশ গজ উত্তর-পশ্চিমে আরও ছটি আটচালা শিবমন্দির আছে। এগুলির নির্মাতা হলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের দেওয়ান-পরিবার দত্তরা, নির্মাণ প্রায় একই সময়ে। এর মধ্যে তিনটিতে টেরাকোটার কাজ আছে, দুটির ঢং ও বিষয়বস্তু আগের মন্দিরগুলির মতো, বাকিটিতে আছে—বানর, নর্তকী, ঢোল-বাদক, নন্দসাধু, নরমুণ্ডশিকারী, জলবাহক, বন্দুকধারী সৈনিক ইত্যাদি। চৌধুরীদের বড়বাড়িতে একটি বড় পঞ্চরত্ন অন্নপূর্ণার মন্দির ও দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে, এগুলিতে টেরাকোটার কোন কাজ নেই, প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ।

ইতিমধ্যে টেরাকোটার স্থান নিচ্ছিল সাধারণ প্লাস্টারের কাজ। চিৎপুর ব্রীজের কাছে শিবমন্দিরগুলিতে প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা, পার্বতী, চণ্ডী ও যমুনার মূর্তি আছে। বাগবাজারের চারটি আটচালা শিবমন্দিরের প্রবেশপথের উভয় পাশে অদক্ষ হাতের মূর্তি অঙ্কিত আছে। বিশ শতকে ক্রমবৃদ্ধি হারে মন্দিরকে রঙিন টালি দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এর উদাহরণ কালীঘাট মন্দিরে তো আছেই, তাছাড়া ছোট মন্দিরেও আছে যথেষ্ট। যেমন, নিমতলার শীতলা ও শিবমন্দির বা কুমারটুলির শ্যামচাঁদের মন্দির। বাংলার মন্দিরের আর একটি ঐতিহ্য হলো মাথার দিকে বক্রাকৃতি কাঠের দরজা: কালীঘাট-মন্দিরের দরজায় রুপোর পাতের ওপর মহাবিদ্যার আটটি মূর্তি খোদাই আছে।

বাংলার ঐতিহ্যের মন্দির-শিল্প আজ মৃতপ্রায়। মন্দির কলকাতায় এখনো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তা হচ্ছে প্রাচীন ধারার সঙ্গে বর্তমান স্থাপত্য-কৌশলের অসফল সংমিশ্রণ। এর উদাহরণ হলো রাসবিহারী এ্যাভিনুর মহানির্বাণ মঠ বা বৌবাজার-ওয়েলিংটনের সংযোগস্থলের কালীমন্দির। কালীঘাটের নিকট চিত্তরঞ্জন-স্মৃতিস্তম্ভ হলো ওড়িষ্যার রেখ ঢঙের ওপর বাংলার আটচালা-কৌশল। আর একটা বিচিত্র মিশ্রণের উদাহরণ হলো চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনুর ওপর সি. আই. টি. কর্তৃক এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নির্মিত শিবমন্দির। পাইকপাড়ার গৌরাঙ্গ মন্দির, বয়স বছর বারো-তেরো হবে—পঞ্চরত্ন ও তাজমহলের এ এক কুৎসিত মিশ্রণ। ইউরোপও এই শতকের গোড়ায় একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং মাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই নূতন স্থাপত্যরীতিকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। উদাহরণ—লিভারপুলের রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল। এখন ভারত পুরানোকে আঁকড়ে থাকবে, না নতুনকে গ্রহণ করবে তা নির্ভর করছে কল্পনাশক্তি ও সামর্থ্যের ওপর। বর্তমানে দেবমন্দিরের তুলনায় বিদ্যালয় ও কারখানা নির্মাণেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়—এবং সারা পৃথিবীতেই এয়ারটার্মিনাল ও প্রদর্শনীকক্ষতেই স্থাপত্যকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।*

* অম্বিষ্ট, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৭৭, দশম সংখ্যা, পৃঃ ৫৯-৭১। [অম্বিষ্টে প্রদত্ত ডেভিড ম্যাককাচিয়নের এই প্রবন্ধটি অরিজিত ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।]

সংগ্রহ : তাপস বসু

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

রাজধানী কলিকাতা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

"তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক-সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাস-কালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূরে হিমালয়ের নির্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।"

এই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পুস্তক হইতে গৃহীত। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের —সম্ভবতঃ ১৮৮০-১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের কথা, কেননা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তখন বাঁচিয়া আছেন (মৃত্যু-১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। কবির চোখে সেই সময়কার কলিকাতা ইঁট-সুরকি-পাথর-সিমেন্টের হর্ম্যরাজি দ্বারা বিকীর্ণ হইলেও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরে ('গোরা' লিখিবার কাল—১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) 'বণিক-সভ্যতা'র অভিঘাত আসিয়া পেঁৗছিয়াছে, তখন গঙ্গার ধারে রেলের লাইন এবং গঙ্গার জলে 'ব্রিজের বেড়ি'—শুধু এইটুকুই কবির চোখে রাজধানী কলিকাতার শ্রী হরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহার পর কবি আরও প্রায় ৩৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং বণিক-সভ্যতার পরবর্তী কীর্তিকলাপ আরও অনেক দেখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য স্বাধীনতার পরবর্তী কলিকাতাকে দেখিতে হয় নাই। অনেক কারখানা, অনেক রাস্তা, অনেক বাড়ি-ঘর দোকানপাট স্কুল কলেজ হাসপাতাল এই কলিকাতায় বাড়িয়াছে—আনন্দের কথা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার বীভৎস 'কুশ্রীতা' আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনকে কি পরিমাণে স্তম্ভিত এবং বেদনাহত করিত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বণিক-সভ্যতা'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তখনকার ইংরেজ বণিকের প্রতি প্রযুক্ত। সে বণিকদের অনেকেই এখন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে—রাজধানী কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার কিন্তু বাঙালীরা পায় নাই (বা নেয় নাই)—পাইয়াছে অপর ধনিককুল। এখনকার কুশ্রীতার জন্যও দায়ী 'বণিক-সভ্যতা'ই। কিন্তু ইংরেজদের যেটুকু চোখের পর্দা ছিল এখনকার বণিকদের তাহাও নাই। এখনকার বণিক-সভ্যতার মূলমন্ত্র—টাকা টাকা—যেকোন উপায়ে টাকা। নীতি, সত্য, স্বাদেশিকতা, সামাজিক দায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য—এ সবই অবান্তর প্রসঙ্গ। মাটির উপর টান, মানুষের কল্যাণ, ন্যায়পরতা—এসকল প্রশ্নের কোনও বালাই নাই। টাকা যখন চাই-ই তখন নিজের পরিবার এবং গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং স্বার্থটুকু বজায় রাখিয়া বেপরোয়া-ভাবে টাকার আবাহন করিব—ইহাই এখনকার বণিক-সভ্যতার কর্ম-নীতি। যদি হাজার হাজার মানুষকে গৃহচ্যুত বা জীবিকাভ্রষ্ট হইতে হয়—উপায় নাই, যদি হাজার হাজার মানুষকে ছাগল ভেড়া গরুর মতো বাস করিতে হয়, খাদ্য এবং চিকিৎসার অভাবে শিয়াল কুকুরের মতো মরিতে হয়—আমাদের মাথা ব্যথা কিসের? 'লাভ' যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে মানবিকতাকে ঘুম পাড়াইয়া না রাখিলে চলিবে কেন?

মাস ছয়েক আগে আমেরিকার 'টাইম' (Time) সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্তমান কলিকাতা শহরের একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম 'ঠাসা মড়কপুরী' (Packed and Pestilential Town)। কলিকাতাবাসী বাঙালীদের—যাঁহারা প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের রাগ এবং মন খারাপ হইবার কথা, হইয়াও ছিল। ব্যক্তিগত সমষ্টিগত কিছু কিছু প্রতিবাদের কথাও শোনা গিয়াছিল। কলিকাতার ভাগ্য বাঙালীদের হাতে না থাকিলেও ইহার নিন্দা-স্তুতি—বিশেষ করিয়া নিন্দা তো বাঙালীদের প্রাপ্য। নিজের নিন্দা অপরের মুখে শুনিতে কাহার ভাল লাগে? ঐ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক কয়েকটি ভুল তথ্য ছাড়া নিছক বানানো মিথ্যা কথা বোধ করি একটাও ছিল না, কিন্তু তথাপি 'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতির দিক দিয়া স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম শহরের কুদিকটা

অমন ফলাও করিয়া সারা বিশ্ববাসীর কাছে বর্ণনা করা সমীচীন হয় নাই।

কিন্তু আজকালকার যুগে মানুষের মুখ চাপিয়া রাখাও মুশকিল। মানুষের চোখই বা বন্ধ করিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের এখন একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, ভারত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে কৌতূহল জাগিতেছে, বিদেশী মুসাফিররা দলে দলে সময়ে অসময়ে ভারত সফরে আসিতেছেন। তাঁহারা শুধু নয়াদিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থানে ফুল-মালা দিয়া এবং ভাকরা নাঙল তিলাইয়া বাঁধ, চিত্তরঞ্জনের কারখানা বা সিন্দ্রী জামসেদপুরের কারখানা দেখিয়া ভারতবর্ষের প্রগতির সার্টিফিকেট দিবেন—এমন কড়ার করিয়া তো আসেন না। দিল্লীর রাজপুরুষদের কলিকাতায় যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয় তখন তাঁহাদের গতাগতির রাস্তা আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখা চলে, তাঁহাদের চোখে যাহাতে কুদৃশ্য না পড়ে—সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয় না। কিন্তু বিদেশী মুসাফিররা অনেক বেশি চতুর। তাঁহারা ভারতবর্ষের বৃহত্তম শহর না দেখিয়া ছাড়িবেন কেন? এবং এই শহরের 'স্বাভাবিক' রূপটি তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখাই বা কি করিয়া সম্ভবপর? তাই রাজধানী কলিকাতার প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার অকল্পনীয় ঘনত্ব, রাস্তায় স্তূপীকৃত নোংরা, রাজপথে গো-জাতির অবাধ গতি, ফুটপাথের ধুলাবালির মধ্যে তেলেভাজা ও কাটা ফলের দোকান, সর্বত্র ভিখারির ভিড়, মোটরগাড়ির সামনে ঠেলা-গাড়ির অভিযান, অট্টালিকার পাশাপাশি দীর্ণ বস্তির সারি এবং তুচ্ছ কারণে জনগণের হৈ-হুল্লোড় হুজুগ ধর্মঘট এ সবই তাঁহাদের চোখে পড়িয়া যায়।

আরও একটি জিনিস অতি সহজেই তাঁহাদের চোখে ঠেকে—বাঙালী চরিত্র এবং বাঙালীর ভাগ্যের একটি সুস্পষ্ট দিক—অপ্রিয় সত্য, কিন্তু অপ্রত্যাখ্যেয় সত্য। 'টাইম' পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি লাইন:

"কলিকাতার বাসিন্দারা অধিকাংশই বাঙালী। যখন হৈ-হাঙ্গামা থাকে না তখন এরা অতি অমায়িক স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় লোক। নিজেদের শহরের হুজুক-হুল্লোড় এরা পছন্দ করেন এবং খাওয়ার চেয়ে বরং আড্ডা দেওয়াটাই বেশি ভালবাসেন। অন্য যা কিছু এঁরা করতে রাজি, কিন্তু শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের কথা এঁদের বলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা ভিড় করেন, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে অধিকাংশ কাজ বিহারীদের হাতে। শহরের প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজের অনেকটাই করে ওড়িষ্যাবাসীরা। চতুর মারোয়াড়ীদের দখলে ব্যবসাবাণিজ্য এবং ব্যাংক। উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের কেউ কেউ সরকারি বড় বড় চাকরিতে আছেন বটে—এবং অনেকে আইন, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশাও গ্রহণ করেন, কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে সামান্য কেরানিগিরি ও বেকার অবস্থা ছাড়া আর কিছু জুটে না।"

স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার Discovery of India পুস্তকে (প্রথম প্রকাশ—১৯৪৬) লিখিয়াছিলেন:

"এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালীরা সরকারি চাকরি এবং আরও অন্যান্য কাজ লইয়া তাঁহাদের প্রদেশের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে এই ধারা উল্টাইয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোকেরা বাংলাদেশ চড়াও করিল; এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িল। ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখনও তাই, তবে মারোয়াড়ী ও গুজরাটীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতেছে। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ও কলিকাতায় প্রায়শই অবাঙালীর হাতে। কলিকাতার হাজার হাজার ট্যাক্সিচালক শিখ।"

দুই বৎসর আগে জনৈক সাংবাদিক আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকায় (Saturday Evening Post) তাঁহার কলিকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাঙালীদের তিনি অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও চোখ এড়ায় নাই যে—

"কায়িক শ্রমের প্রতি বিরূপতার জন্য বাঙালীরা তাদের নিজেদের জন্মভূমিতে পরদেশীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্পের মালিক হয় ব্রিটিশ, নয় মাড়োয়ারীরা। সমস্ত পার্কস্ট্রীটে কিংবা বড়বাজারে একটিও বাঙালীর দোকান নেই বললেও চলে। পাটের কলের মজুর সব বিহারী, শহরের জল, আলো প্রভৃতি ব্যবস্থার কাজ সবই প্রায় ওড়িয়াদের দখলে। কলকাতার সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বাংলার বাহির থেকে আগত অবাঙালীরা।"

রাজধানী কলিকাতার কুশ্রীতা এবং বাংলাদেশের রাজধানীতে বাঙালীর অসহায়তার জন্য দায়ী যাহারা বা যে ঘটনাচক্র হউক, দুর্নাম সবটাই বাঙালীকে

লইতে হইতেছে। এই দুর্নাম এবং দুর্ভাগ্য মোচনের দায়িত্বও বাঙালীর হইয়া অপর কেহ লইবে না। বাঙালীকেই বুকে বল বাঁধিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। রাজধানী জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-সমাজ বল—জাতির এই সকল দিকের প্রসার রাজধানীর সুসংহতির উপর নির্ভর করে। এই সুসংহতির জন্যে তাহারাই ভাবে এবং কষ্ট স্বীকার করে—যাহাদের বাংলার মাটির উপর দরদ আছে, বাংলার সংস্কৃতির উপর ভালবাসা আছে। যাহারা শুধু টাকার জন্য রাজধানীতে বাস করিতেছে, রাজধানীর যশ-নিন্দার দিকে তাহাদের মাথায় ভাবনা না থাকিবারই কথা। কলিকাতা তাহাদের নিকট বেওয়ারিশ কামধেনু। যতটা পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, যেভাবে পারা যায় দুহিয়া লইয়াই তাহারা খালাস।

কিন্তু বাঙালীর চিত্তে কলিকাতা নগরী অন্য ভাব বহন করিয়া আনে। কলিকাতার মাটি বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। এই কলিকাতায় বাঙালীর রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র পাদচারণ করিয়া গিয়াছেন, এই নগরীর সুখ-দুঃখের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম এখানে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার গৌরব, কলিকাতার ঐতিহ্য বাঙালী ভুলিতে পারে কি? কলিকাতার অপমান বাঙালীর বুকে শেলের মতো বাজা স্বাভাবিক নয় কি?

কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র বাঙালীর হাতে—বাঙালীর পুরা দখলে লইয়া না আসিলে এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। প্রশ্ন জাগে—রাজধানী কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান, শান্তিশৃংখলা এবং শাসন প্রধানতঃ বাঙালীর হাতে তো এখনই রহিয়াছে, তবু প্রতিকার হয় না কেন? ইহার অতি বেদনাদায়ক উত্তর এই যে, কলিকাতার এবং তথায় বাঙালীর ভাগ্য পৌর-প্রতিষ্ঠান, পুলিশ-সংস্থা এবং শাসন-যন্ত্রের মুঠার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতি আশ্চর্য, কিন্তু অতি স্পষ্ট সত্য। কলিকাতার কলকাঠি নড়িতেছে বণিক-সভ্যতার অঙ্গুলি-হেলনে। উহারই স্বার্থে কলিকাতায় এত লোক-ঠাসাঠাসি, বাসগৃহের অপ্রাতুল্য, বস্তির বীভৎসতা, খাদ্যে এবং ঔষধে ভেজাল, বাঙালীর এত দীনতা, অসহায়তা, জীবন্মৃত অবস্থা। এই 'বণিক-সভ্যতা'র পরিচালক ও পৃষ্ঠ-পোষক বাঙালী ও অবাঙালী দুইই।

প্রতিকার করিতে পারে শুধু বাংলা-দরদী, বাংলার দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর একলক্ষ্য একপ্রাণ একতাবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান উৎসাহী বাঙালী;—হৈ-হুজুগ মাতাইয়া নয়, রাজদ্বারে প্রায়োপবেশন করিয়া নয়; নিজেদের শক্তি সংহত করিয়া নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের চরিত্রকে দৃঢ় ও নির্ভীক করিয়া, বাংলা ও বাঙালীর গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া।

কলিকাতার কলকারখানা, পরিবহন, নাগরিক ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় কেন? বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজস্থান, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র কোথাও তো এরূপ দেখা যায় না। যে যে রাজ্য—সেই সেই রাজ্যের লোক রাজ্যের সব কাজ করিয়া আসিতেছে—মসনদের কাজ, স্কুল-কলেজের কাজ, দোকান-পাটের কাজ, আবার মিস্ত্রিগিরি, মুটেগিরি, ফিরিওয়ালার কাজ। সমস্ত পৃথিবী আজ মানুষের মর্যাদার নূতন মান নির্ণয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনও মানুষই ছোট নয়, জীবিকার দ্বারা মানুষের সম্মান নিরূপিত হয় না। কোনও কাজই ছোট নয়—আমেরিকা বল, জাপান চীন বল, রাশিয়া বল, ইউরোপের অন্যান্য দেশ বল সকল দেশের মানুষ এই সত্য বুঝিয়াছে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এই চেতনা পরিস্ফুট—শুধু বাংলাদেশেই দৃষ্টিভঙ্গি এখনও সেই সাবেককালের ভ্রান্ত আত্মসম্মানকে ঘিরিয়া বাঙালী জাতিকে মরণের পথে আগাইয়া দিতেছে। এই অলস পচা মোহগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে এখনই, এই মুহূর্তেই চিরদিনের জন্য কবর দিতে হইবে। কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞাসূচক সমস্ত শব্দ বাঙলাভাষা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—ইহা না বাংলারই অমর কবির ঘোষণা? রিক্সা টানিলে, মোট বহিলে, জলের কল

সারিলে, রাজধানী কলিকাতার পথে পথে বাসন গামছা মনোহারী দ্রব্য ফিরি করিলে, মানুষের চুল-দাড়ি কামাইলে, রাস্তা মেরামত করিলে, ফ্যাক্টরির মজুর মিস্ত্রী হইলে বাঙালীর মনুষ্যত্ব খর্ব হইবে না। কাজের সময় কাজ, বাড়ি ফিরিয়া যে সংস্কৃতিমান বাবু নিশীথনাথ ভাদুড়ী—এই দ্বৈত-সমন্বয় তো অসম্ভব নয়। আমেরিকায় জাপানে চীনে দেখিয়া এস—কি করিয়া কাজের সহিত সংস্কৃতির সমন্বয় হয়।

কলিকাতার বাজারে সবজির দোকান, ডিমের দোকান, মিঠাই-এর দোকান বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া যাইবে কেন? মনোহারীর দোকান, ঔষধালয়, হোটেল, ডাইং-ক্লিনিং এগুলিও ক্রমান্বয়ে অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইবে কেন? কারণ যাহাই হউক সেই কারণকে বাঙালীর জাগ্রত সংহত শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বাঙালীর প্রাণস্পন্দন দেখিবার জন্য শুধু বেলা ৯টা হইতে ১০টা এবং বিকাল ৫টা হইতে ৬টায় শুধু ট্রাম-বাসের দিকে, আর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের প্রেক্ষাগৃহগুলির দরজায় তাকাইয়া থাকিতে হইবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অবশ্য জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর চাপে বাঙালীর ছেলেরা কিছু কিছু আত্মসচেতন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কায়িক শ্রমের কাজে বাংলার নওজোয়ানরা ক্রমশঃ নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নয়। আরও চাই, ব্যাপকভাবে চাই। সমগ্র বাঙালী-মানস হইতে ছোট কাজের প্রতি নাক সিঁটকানো মনোবৃত্তিটিকে একেবারেই বিসর্জন দিতে হইবে। সেই নয়ন-জুড়ানো দৃশ্যটি কবে রাজধানী কলিকাতায় বাস্তব হইয়া উঠিবে—বাঙালী মোট বহন করিতেছে। হকার, মিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, পানওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, সবজিওয়ালা—এসব পেশা কি বাঙালী সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে?

মুষ্টিমেয়ের উৎসাহ ও সদিচ্ছা এই আকাঙ্ক্ষিত ছবিকে বাস্তব করিতে পারে না। সমগ্র বাঙালী জাতির মনে একটি বলিষ্ঠ সহানুভূতি, একটি নূতন জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইহা প্রাদেশিকতা নয়, আত্মবিশ্বাস—আত্মসম্বিত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঘর গুছাইতেছে, বাঙালীর ঘর কোন নিশ্চিন্তপুরের পিসিমা আসিয়া গুছাইয়া দিয়া যাইবেন? ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? এক এক রাজ্যের লোক ভারতের বৃহৎ স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ না বাধাইয়া নিজ নিজ অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি নিজেদের মনীষা ও শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া যাইবে—ইহাই নয় কি? কলিকাতা শহরের যদি বর্তমানের এই অবস্থাই হইবে—বাংলার রাজধানীতে বাঙালীকে যদি এত অসহায়তা, দীনতা ও দুর্বলতার মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে বাঙালী বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে এত হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল কেন? বাঙালী যদি বাংলার মাটি, বাংলাভাষা, বাংলার জীবন-ধারা, বাংলার অনুভূতি-আবেগ, বাংলার সমাজ-পরিবার, বাংলার সংস্কৃতি ভালবাসে তাহা হইলে দুর্জয় সাহস, উৎসাহ, কর্মোদ্যম ও সর্বোপরি স্বার্থত্যাগের দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে হইবে। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে বল সঞ্চার না হইলে উহাদের কোনটিকেই রক্ষা করা যায় কি?

এমন শত শত সহৃদয় বিত্তবান বাঙালী ভদ্রলোক চাই, যাঁহারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সদর রাস্তার উপরে নিজেদের বাড়ির একটি অংশ বাঙালীর ছেলেকে ছাড়িয়া দিবেন পানের দোকান করিতে, ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকান করিতে। বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে ও দাঁড় করাইতে বাঙালী ক্রেতা-সাধারণের তরফে প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইবে। বাঙালী মজুরের শারীরিক বল কম, বাঙালী কর্মীর দলাদলি বুদ্ধি বেশি, এসব তো জানা কথা। এসব জানিয়াও বাঙালীকেই ডাকিতে হইবে। উৎসাহ দিয়া, ভালবাসিয়া তাহার কর্মদক্ষতা, নৈতিক বুদ্ধি বাড়াইতে হইবে। একই টাকা খরচ করিয়া অবাঙালী কর্মীর নিকট বেশি কাজ পাওয়া যায়, বেশি বাধ্যতা পাওয়া যায়, অনেক বেশি নিশ্চিন্ত থাকা যায়, ইহা হয়তো সত্য কথা—কিন্তু তবুও বাঙালীর এই সামগ্রিক বিপত্তির দিনে এই ধরনের বিচারপ্রণালী বাঙালীকে ত্যাগ করিতে হইবে। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার দুর্বল রুগ্ন সন্তানকে বিরক্তির চোখে দেখেন না, অকুণ্ঠিত ভালবাসা, সহানুভূতি ও সেবা দিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, আজ বাংলার ভাগ্যবান এবং সম্পন্ন

ব্যক্তিদিগের ভাগ্যবিড়ম্বিত দরিদ্র দেশবাসিগণের প্রতি অনুরূপ মমতাবোধ আনিতে হইবে। 'আমি তো নিরাপদে আছি, আমি যদু মধু মালতী মাধবীর কথা ভাবিব কেন?' বাংলার সৌভাগ্যের দিনে এই চিন্তাকে সহ্য করিলেও করা যাইত, কিন্তু আজ বাংলার ব্যাপক সর্বনাশের দিনে এই চিন্তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

বাঙালীর ছেলেদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের মান নূতনভাবে নির্ণীত হউক। ভুখন সিং এক মন বোঝা বহিতে পারে, সুজিত মিত্র তাহা পারে না। সুজিত মিত্র ১৫ সের মোট বহিতে পারে; বেশ, বাংলাদেশে সুজিত মিত্ররা যাহাতে ১৫ সের মোট বহিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারে এমন ব্যবস্থা কেন হইবে না? সুজিত মিত্ররা কলিকাতার রাজপথে ছোট রিক্সায় একজন সওয়ারি টানিয়া কেন রুটি রোজগার করিতে পারিবে না? ভুখন সিংদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা তুলিও না। ভুখন সিংদের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে বাংলার শ্রমিককে রক্ষা কর। কতরকমের 'সংরক্ষণ' ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙালীর জন্য 'শ্রম-সংরক্ষণ' কি এমনই একটি অসম্ভব ও আজগুবী কল্পনা? বাংলায় ট্রামে বাসে ও প্রেক্ষা-গৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই আইন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোক বাংলার এই আইনকে কটাক্ষ করে না, করিলেও বাংলার কিছু আসিয়া যায় না, কেননা বাংলাকে নিজস্ব প্রয়োজনে উহা করিতে হইয়াছে। বাঙালী শ্রমিকরা যাহাতে না মরিয়া, খাটিয়া খাইতে পারে, তাহার জন্য বাংলায় শ্রমের মান নূতনভাবে চালু করা কি অন্যায়?

ভুখন সিংদের কি হইবে? কেন, বিশাল ভারত-বর্ষে এক মন মোট বহিবার কি অপর জায়গা নাই? 'ঠাসা মড়কপুরী' ছাড়া আর কি কোন আশ্রয় নাই? বাংলা তো বহু বৎসর ধরিয়া হাসিমুখে অতিথিসৎকার করিয়াছে, কিন্তু এখন যে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত! এখন যদি সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করে, তাহা ভারতীয় সংবিধানে বাধা হওয়া উচিত নয়, অপর রাজ্যবাসীদেরও মুখ ভার করা সঙ্গত নয়।

কিন্তু তথাপি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বাংলাদেশের রাজধানীতে যদি বাঙালীর প্রাধান্য হয়, বাঙালীর হাসিমুখ দেখা যায়, বাঙালীর মেধা, বীর্য, শক্তি, সংহতি জাগিয়া ওঠে—তাহা হইলে বাংলার রাজনীতির কি হইবে? বাংলার কীটদষ্ট রাজনীতির স্বার্থ যে পুরাপুরিই হাজার হাজার বহিরাগতের উপর নির্ভর করে!

এই প্রশ্নের সহজ সরল সবল উত্তর এই— বাংলার রাজনীতি অপেক্ষা বাংলা ও বাঙালী অনেক বড় এবং বাংলার রাজধানী কলিকাতার কল্যাণও অনুরূপই বড়।*

* উদ্বোধন, ৬১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৫, পৃঃ ৩২—৩৭

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে

বর্তমান (ভাদ্র ১৩৯৭) সংখ্যা এবং আগামী আশ্বিন ১৩৯৭ সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় গত শ্রাবণ ১৩৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী আত্মস্থানন্দের ধারাবাহিক নিবন্ধ 'সকলের মা সারদা' এবং তপোব্রত সান্যালের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ'-এর বাকি অংশ আগামী কার্তিক, ১৩৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।—যুগ্ম সম্পাদক

পরমপদকমলে

কলকাতা এবং রামকৃষ্ণলোক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলুম। আপনি কি আমাকে গ্রহণ করবেন? প্রথমেই তো আপনি আমার মন দেখবেন। দেখবেন আমি কতটা বিষয়াসক্ত। আমার আসক্তি ঘুচেছে কিনা! সুপুরিগাছের বেল্লো। না শুকোলে তো খুলে পড়বে না। দেখবেন আমি ঝুনো হয়েছি কিনা! ঝুনো হলেই না শাঁস আর খোলা আলাদা হবে। নাড়ালে খটখট শব্দ হবে। ঝুনো কাকে বলে? সংসারে আর রস পাই না। শুকনো মনে হয়। ভাল লাগে না। এক ঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন এক অস্তিত্ব। গাইতে ইচ্ছে করেঃ

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীত সুধারসে এস॥

সবকিছুর মধ্যে থেকেও ভেতরে সদাই এক হাহাকার। ঠাকুর, আপনি আমার এই হাহাকারকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমার নিবেদন, আমার এই শূন্যতা। আপনি আমাকে নতুন আশায় বাঁচতে শেখাবেন। ধন, জন, মান, সম্মান নয়, আনন্দে বাঁচার কৌশল শেখাবেন! ভয় থেকে যে মুক্ত হতে পারে সেই তো থাকে আনন্দে। কিসের ভয়! হারাবার ভয়। আমরা তো হারাতেই বসেছি। একটা একটা করে খসে পড়ছে জীবনের দিন। 'যাহা যায় তাহা যায়।' দিন গেলে তো আর ফেরে না। এগিয়ে আসে অনিবার্য জরা। এই সংসারের যা-কিছু সবই তো অর্জন করেছি শরীর দিয়ে। শরীর দিয়েই ধরে রাখতে হবে। প্রথম প্রথম মনের সায় ছিল। দেহ যা করছে, মন তাতে উল্লসিত হচ্ছে। হঠাৎ সেই মন পড়েছে মুষড়ে। দেহনির্ভর সুখ তো চিরস্থায়ী হতে পারে না। ভোগের অশ্বের লাগাম ধরা হাত শিথিল হলেই তো ছিটকে পড়ে যাব। অবিরত নৃত্য কারই বা ভাল লাগে! কিন্তু যে প্রান্তরে সব অশ্বারোহীই ছুটছে সেখানে আমি এক পাশে দাঁড়াই কি করে! বেঁচে থাকার এই অসিযুদ্ধে নিজের তরোয়াল তো খাপে ভরার উপায় নেই। প্রথমে পেয়েছি। অর্জন করেছি বিষয়। এখন চলেছে ধরে রাখার সংগ্রাম। যেন না হারাই!

ঠাকুর হয় তো বলবেন: 'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই জনপদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। কলকাতার ভগ্নদশা দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। জীবনযন্ত্রণা প্রখর হচ্ছে। যেখানে সমস্যা ছিল না সেখানেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সরল আর কিছুই নেই সবই জটিল। সহানুভূতি, ভালবাসা উবে গেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত। হানাহানি, কাটাকাটি ছাড়া মানুষ আর কিছুই ভাবতে পারছে না। মানুষ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছে মনে। যা তোমার মন চায় তার কিছুই তুমি পাবে না। কোথাও শান্তি নেই। সেই তো ভাল। এই তো তোমার উপযুক্ত পরিবেশ: বাইরের মোহিনী-মায়ায় তুমি আর আত্মবিস্মৃত হবে না। নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। তোমার ইচ্ছে আরও উদগ্র হবে। তুমি বাইরে থেকে সরে আসবে ভেতরে। সেখানে তুমি আমাকে দেখবে। শুনতে পাবে আমার কণ্ঠস্বর। কলকাতার উপকণ্ঠে, বনে, কলকাতার দিকে আমি হাত বাড়িয়েছিলুম কেন জান? অশান্তিতেই মানুষ শান্তি খুঁজবে, বিক্ষিপ্ততায় খুঁজবে শৃঙ্খলা, অধর্মের পটভূমি-তেই ধর্ম উজ্জ্বল হয়। মহা ভাগ্য তোমার। এই শহরে মিশে আছে আমার পদরেণু। এই শহরেই ঘটেছিল উনিশ শতকের জাগরণ।'

ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি তো কলকাতার মানুষ?'

'হ্যাঁ ঠাকুর, একেবারে খাস কলকাতার না হলেও, সংলগ্ন এলাকায় বসবাস।'

'কলকাতা তো এখন অনেক দূর ছড়িয়েছে! কিলবিল করছে মানুষ। তুমি তো তাদেরই একজন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার সময়েই কলকাতার মানুষ খুব কথা বলত—লম্বা, চওড়া কথা। বকে বেশি। সে-অভ্যাস তো যাবার নয়। বরং এখন আরও বেড়েছে।'

'(অবশ্যই আমি মাথা নিচু করে থাকব।) বেড়েছে মানে? সাংঘাতিক বেড়েছে। আমরা যে যেখানে আছি, অনন্ত বকুনির স্রোতে ভেসে চলেছি। শব্দ আর শব্দ। উত্তাল, উন্মাদ শহর।

কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। সবই এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল। কোন কিছুই আর বশে নেই। লাগামছাড়া জীবনস্রোত আইন-কানুন, সংঘ-সংগঠন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।'

'তোমার জীবনে তো তাহলে কোনও নির্জনতা নেই বাপু! নিভৃতে, একান্তে নিজেকে নিয়ে বসতে পারো কি?

'আজ্ঞে না। কোনও উপায় নেই। আমরা এখন বাস করি পায়রার খোপে। কলকাতার জীবনকে আমরা এখন পোস্টাপিসের চিঠির খোপের চিঠির মতো রেখেছি। ঠাকুর আপনি কতবার কত ভক্তের গৃহে পদার্পণ করে তাঁদের ধন্য করেছেন। মহামান্য কেশব সেন, বলরাম বসু, কাপ্তেন। আপনি ঝামাপুকুর রাজবাড়িতে কলকাতার জীবন শুরু করেছিলেন। আপনার সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, রানী রাসমণির কালীবাড়িতে। শ্যামপুকুরে যে অন্ত্যলীলার শুরু, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তার পরিসমাপ্তি। সঙ্কীর্ণ পরিবেশ আপনি পছন্দ করতেন না। তেলচিটে সংসার আপনি ঘৃণা করতেন। সংসার আর সংসারীকে আপনি ঘৃণা করতেন না। ঘৃণা করতেন দুখচেটে সংসারীকে। আপনি বলতেন সংসার হবে শিবের সংসার। আমাদের পায়রার খোপে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবার সাহস আমার নেই। অতিশয় অপবিত্র। আদর্শভ্রষ্ট। নিষ্ঠাশূন্য জীবনযাপন মাত্র। কোথায় চলেছি আমরা জানি; কিন্তু ফেরাতে পারি না কিছুতেই নিজেকে। এই খোপই শুধু সঙ্কীর্ণ নয়, আমাদের মন ও মানসিকতাও ততোধিক সঙ্কীর্ণ। নিভৃত, নির্জন পরিবেশ কোথায়! স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের চাপাচাপি। আরাধ্য একটাই—অর্থ। সাধনা হলো নিদ্রা—ভগবান একটু ঘুম দাও।'

'আমি যে বলেছিলুম, সংসার থেকে মাঝে মাঝে একটু দূরে চলে যাবে। মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে দেবে। ধর, তোমাদের ময়দানে চলে গেলে। কোনও পার্কে গিয়ে, একপাশে একটা গাছতলায় নীরবে বসে রইলে কিছু সময়। নিজের ভাবে রইলে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে। এক সময় ফিরে এলে আবার তোমার সেই সংসারে।'

'ঠাকুর, সেই কলকাতা আর নেই। যে-কলকাতায় আপনি ফিটনে চেপে আসতেন। চিৎপুর রোড ধরে যাবার সময় আপনি শিশুর আনন্দে বলতেন—চালাও, চালাও, জোরে চালাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। আপনার দুপাশ দিয়ে খেলে চলে যেত ঊনবিংশ শতকের আলোকিত জনপদের ছবি। আপনি দেখতেন কলকাতার টেরিকাটা যুবকের জটলা। বন্ধু-বান্ধবদের নাম ধরে ডাকছে। দেখতেন সাজানো দোকানপাট। বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা হাঁটছেন ইঙ্গবঙ্গ পোশাকে। কারোর মাথায় গোলদার ছাতি। ময়দানে দেখতে গেছেন বেলুন ওড়া। সেখানে দেখেছেন সাহেবদের ফুটফুটে ছেলে। দেখে কৃষ্ণভাবের উদ্দীপন হয়েছে আপনার। আপনি থিয়েটার পাড়ায় গিয়েছেন। থিয়েটার দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশে। সে-কলকাতা যে আর নেই! পার্ক ও ময়দানের পরিবেশ ভীতিপ্রদ। ভাগীরথীর তটভূমি ব্যবসায়ীদের দখলে। পারিবারিক পরিবেশ বিক্ষিপ্ত। ততোধিক বিক্ষিপ্ত সামাজিক পরিবেশ। সর্বত্রই কোল [illegible]। হানাহানি, হামলা।'

'তাহলে, কি হবে। আদর্শ পরিবেশ যখন নেই, আদর্শ মানুষও তাহলে হবে না। তাহলে একটা গল্প শোন—একজন ধ্যানে বসেছে পঞ্চবটীতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা-চরিত্রের পর হতাশ হয়ে উঠে এল। কি হলো, না ধ্যান হলো না। ধ্যান করাই গেল না। মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে কাকের ডাকে। এমন কোন দেশ আছে যে-দেশে কাক ডাকে না! সেই দেশে গিয়ে ধ্যান জমাতে হবে!'

'বুঝেছি যা বলতে চাইছেন আপনি। [illegible]মীজীর ধ্যান চাই। পিঠে কম্বল। না কম্বল নয়, মশা। তবু ধ্যান ভাঙেনি তাঁর।'

কর্মজীবী তুমি। উদয়াস্ত তোমাকে জীবন আর জীবিকার লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে। তুমি যদি আমাতে সমর্পিত হতে চাও, তাহলে নিজের অন্তরে খুঁজে নাও অদ্ভুত সেই নির্জনতা।'

'সেই নির্জনতার নাম রাখব রামকৃষ্ণলোক। যে-লোকেই থাকি না কেন, এই রামকৃষ্ণলোক আমার হৃদয়াসীন। আর প্রভু আমার, সখা আমার, প্রিয় আমার শ্রীরামকৃষ্ণ।'

কলকাতায় মায়ের বাড়ীতে মাকে প্রথম দেখি

সরযূ

মাস, তারিখ আজ আমার স্মরণে নেই. আনুমানিক বাংলা ১৩১৯ ও ইংরেজী ১৯১২ সাল হতে পারে। বয়স তখন আমার নয়-দশ বছর। তবে সেই পবিত্র দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে, যেদিন শ্রীশ্রীমা তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে কৃপা করে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছিলেন।

শৈশব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুরাগ জন্মায় আমাদের গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে। উদ্বোধন পত্রিকা ও তৎকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমাদের গল্পচ্ছলে তাঁর কথা বলতেন। কেন জানি না, শুনতে ভাল লাগত। পড়াশুনার চাইতে ঐ বয়সেই একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম সেই সমস্ত আলোচনায়। তারও পূর্বে আমার পিতামহ জগবন্ধু সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের অনুরাগী ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্টীমার-ভ্রমণে ভক্তসঙ্গে আমার পিতামহেরও স্থান হয়েছিল। এরই প্রভাবে আমাদের পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একটা যোগ ছিল। আমার ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর গঙ্গাস্নানের অভ্যাস ছিল। আমাদের পিত্রালয় চাঁপাতলা (শিয়ালদহ) থেকে প্রায়ই বাগবাজার ঘাটে তিনি স্নান করতে যেতেন। সুযোগ পেলেই ফেরার পথে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গী হলেও, আমার শৈশবত্বের কথা চিন্তা করে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, আমাকে শ্রীমার কাছে তিনি নিয়ে যেতেন না। একবার আমি জেদ ধরায় তিনি রাজি হলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের ঈপ্সিত দিন। আজ জীবনসায়াহ্নে এসে স্মরণ করলেও মনটা সজীব হয়ে উঠে, অপূর্ব সুখানুভূতিতে ভরে যায়।

সেদিন গঙ্গাস্নানান্তে গিয়েছি, সঙ্গে আমার ঠাকুরমা। শ্রীশ্রীমা বসে আছেন পাশের ঘরটিতে। প্রণাম করেছি, কতক্ষণ ধরে জানি না। আমার অজান্তে আনন্দাশ্রু এসেছে, আমি রোধ করতে পারিনি। ঐ বয়সে অত বোধশক্তি ছিল না, তবে কেন জানি না, মনে হয়েছে—ইনি যে আমার অনেক চেনা, আমার সবথেকে আপনজন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, সম্বিৎ ফিরলে বুঝতে পেরেছি, মা বলছেন—"তুই কাঁদছিস কেন, এই তো আমি," আর মাথায় স্নেহস্পর্শ দিচ্ছেন। সমস্ত শরীর অপূর্ব আবেশে শীতল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মা ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জানার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"এটি কাদের বাড়ির মেয়ে ?" শোনার পর, একদিন স্নান করিয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সেখানে গোলাপ-মা, যোগীন-মা উপস্থিত ছিলেন। স্নান করিয়ে নিয়ে আসার অর্থ তাঁরা জানতেন। সেই সময়ে কোন কারণে মা নাকি অনূঢ়া কন্যাদের কৃপা করতেন না। মাকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, তিনি বললেন, "এর-জন্যে লাগবে না।" অযাচিত কৃপায় আমি ধন্য হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছি। কোন কারণে আমাদের পৌঁছাতে কিছুটা দেরি হয়েছিল। দেখি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের রাস্তায় পায়চারি করছেন। আমাদের আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে সঠিক সময়ে না আসার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। জানালেন, শ্রীমা আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। মাস্টারমশাই সবিনয়ে বিলম্বের কারণ জানালে, আশ্বস্ত হয়ে আমাকে উপরে পৌঁছে দিতে বললেন।

উপরে গেলাম, মা পূজার আসনে, পাশেও একটি আসন পাতা। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সস্নেহ আহ্বান, কোন অনুযোগ নেই। আমার শিশুমন তখনই ভরে গেল আনন্দে। মা উঠে দ্বার রুদ্ধ করলেন, সেখানে আর কেউ নেই। আমি আর মা। আমাকে অন্য আসনটিতে বসতে বলে, নিজে পূজার আসনটিতে বসে কিছুক্ষণ পূজা করলেন। আমি পাশে বসে

ভাবছি—মা তো আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেবেন, কিন্তু কি সে মন্ত্র। আমি যে ঠাকুরকে বড় ভালবাসি, অন্য কোন নাম পেলে অনুরাগ আসবে কি! অন্তর্যামিনী জগজ্জননী আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারলেন। পূজা সাঙ্গ হলে আমাকে সচকিত করে বললেন—"ওরে, ঠাকুর ছাড়া আমাদের আর কে আছে! তুই যা চাইছিস, সেই নামই পাবি।" আমি অবাক হলাম। দীক্ষিত হলাম মহামন্ত্রে, মহামায়ার কাছ থেকে। সস্নেহে করজপ করা দেখিয়ে দিলেন। হাতে কিছু ফুল দিয়ে গুরুপূজা করতে বললেন। কিভাবে পূজা করতে হয় আমি তো কিছুই জানি না। ইতস্ততঃ করছি দেখে মা তাঁর শ্রীচরণ দুটি বাড়িয়ে দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য দিতে বললেন। প্রাণভরে অর্ঘ্য দিলাম। আমার হাতে একটি হরীতকী দিয়ে গুরু-দক্ষিণা দিতে বললেন। দু-হাত পেতে মা সেটি গ্রহণ করলেন। আবার আমি কৃতার্থ হলাম। নিচে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফেরার আগে পুনরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন।

প্রসাদ ধারণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। মা-ও সেই সময়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সময় হলে সকলের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে উপরে গেলাম। প্রাণভরে প্রণাম করলাম, মা আমার সঙ্গীদের বলে দিলেন, মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে। যাওয়ার আগে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে নির্দেশ দিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে উনি মার একটি ছোট্ট ফটো দিয়ে বলেছিলেন—"এটি বুকের মধ্যে করে নিয়ে যাও, কাউকে দেখিও না।" বোধ হয় মায়েরই সেরূপ কোন নির্দেশ ছিল। পরিপূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এর পরে বেশ কয়েকবারই বাগবাজারে মাকে দর্শনের ও প্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতেই একটা অনাবিল স্নেহ, এবং তা হৃদয় মথিত করত। আহ্বানে কত আপনকরা ভাব, আর তাঁর শ্রীচরণ দুখানি। কি কোমল আর একটা গোলাপী আভা! মুখে কিছু বলার প্রয়োজন হতো না, তিনি অন্তর্যামিনী, সবই অনুভব করতেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে গল্পে-পড়া ডাকাতবাবার কথা ভেবে মনে হয়েছে, এই কি সেই মা। যাকে ডাকাতে ধরেছিল! কালীরূপে মা তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। মা বলে উঠেছেন, "হ্যাঁরে, আমিই সেই ডাকাতের মেয়ে, তোদের ঠাকুর আমার ডাকাতবাবাকে কত শ্রদ্ধা করতেন।" মা নিজে বুঝিয়ে না দিলে তাঁকে বোঝার উপায় ছিল না। কি সহজ আর কত সাধারণ!

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অহেতুকী কৃপা আমি অনুভব করেছি, এখনও করে চলেছি। আমার বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না। বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কেন জানি না, মনে হতো অন্যান্য ভাই-বোনের থেকে তাঁর ওপরে অধিকার আমার যেন একটু বেশিই ছিল। আমার মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কখনো জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতেন না। সেই সময়ে সমাজে একটি কন্যা অনূঢ়া থেকে যাবে, এটা কষ্ট-কল্পনাই ছিল। পরিবারের বয়স্করা শঙ্কিত হয়ে তাঁকে অনুযোগ করলেও তিনি নির্বিকার থাকতেন আমার কথা ভেবে। পরে সকলের উৎকণ্ঠায় স্থির হয়, আমাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে সমস্যার সমাধানের জন্য। বাবা আমাকে সেই সিদ্ধান্ত জানানোয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হয়। তখন আমার বয়স বেশ বেড়েছে, প্রায় ১৬।১৭-এর মতো। সেকালের সমাজে প্রায় পতিত হওয়ারই কথা।

মা ধৈর্য ধরে আমার বাসনা শুনলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: "দেখ, তুমি সংসারী হবে, আর যার সঙ্গে সংসার করবে সেও তোমার ভাবে ভাবিত"—মা কি তাঁর অর্বাচীন কন্যাটির জন্য পাত্রও নির্বাচন করে রেখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যাঁর সঙ্গে আমার ভাগ্য যুক্ত হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি প্রয়াত খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। মঠে প্রবীনদের কাছে খগেনবাবু নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ)। কাছেই সারগাছি আশ্রম, অখণ্ডানন্দজী সেখান থেকে সেবাকার্য শুরু করেছেন। আশে-পাশের তরুণরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবানুরাগী হয়েছে। তরুণ খগেনবাবু তাঁদেরই একজন ছিলেন। অখণ্ডানন্দজীই তাঁকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠান। তিনিও শ্রীশ্রীমার কৃপালাভে ধন্য হন। এখন ভাবি এটা কি অলৌকিক নয়। শুধু তাঁর কৃপাতেই সম্ভব।

কবিতায় কলকাতা

সঙ্কলক : পলাশ মিত্র

কলকাতার তিনশততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 'উদ্বোধন' (ভাদ্র ১৩৯৬) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে কলকাতা-বিষয়ক কিছু কবিতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন সংকলিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই রচনা-সংকলন। শেষে ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা।

এবারের সংকলনের (অংশবিশেষ) শুরুতে আছেন রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ। সবশেষে আছেন বিস্ময়কর তরুণ-প্রতিভা সুকান্ত ভট্টাচার্য। সাম্প্রতিককালের কয়েকজন কবির কবিতা এবারে সংকলিত হলো। তথাপি অনেক উল্লেখ্য কবির কবিতা যে উপস্থিত করা গেল না, সে-বিষয়ে সচেতন আছি। ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন এবারে অনুপস্থিত। এই সংকলন আরও একটু সম্পূর্ণ করার জন্য পরবর্তী প্রয়াসে সচেষ্ট হবার বাসনা রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁটের টোপর মাথায় পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন পাতা।
ফাগুনে বয় বসন্তবায় না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন।
শীত-বসন্তে সমানভাবে করে ঋতু-যাপন।
অনেক দিনের কথা হলো স্বপ্নে দেখেছিনু
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে বললে আমায় বিনু
'চেয়ে দেখো', ছুটে দেখি চৌকিখানা ছেড়ে—
কোলকাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল,
ট্রাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে করছে টলোমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ যাচ্ছে সারি সার
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল, উল্টায়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) কলকাতায় জন্মেছেন এবং দেহরক্ষাও করেছেন এখানে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে কলকাতার দেহ থেকে গেঁয়ো গন্ধ মুছে গিয়েছে বলা যাবে না। এবং শহর কলকাতা তাঁর মন ভোলাতে পেরেছিল—এমন কথাও বলা যাবে কিনা সন্দেহ। কলকাতার শহুরে স্বভাবও রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। পছন্দ ছিল অন্য জায়গায়। "দেখিলাম একটা অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্র তরঙ্গিত।" তারপরেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।']

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মরি হায়রে—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা,
(হেথায়) বুদ্ধিমানে করে চুরি, বোকায় পড়ে ধরা।
(মরি হায়রে)

ভাবতাম কলুটোলায় কলু আছে—আছে তাদের ঘানি,
দেখি কলুর বলদ বদ্যি সেথায় করে তেল আমদানি।
মুরগীহাটায় চুপ করে যাই কিনিতে রাম পাখী,
দেখি সারি সারি স্টেশনারী আসল জিনিস ফাঁকি।
চীনে বাজারেতে ভাবতাম চীনে থাকে খালি,
দেখি—ঘরে ঘরে দোকান করে যত সব বাঙালী।
লালবাজারে গিয়ে তবু ঘুচলো একটু ধাঁধা,
লালবাজার তো নাই—লোকের মাথায়
লাল পাগড়ী বাঁধা।

লালদীঘিতে ভাবলাম দেখবো জলটি লাল টকটকে,
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠকে।
গোলদীঘিতে গিয়ে আমার লাগলো ভারী গোল,
চারকোণা দীঘিকে এরা সবাই বলে গোল।
পটলের ক্ষেত নাইকো তবু পটলডাঙা বলে,
(তবে) বিনু পটলেই বছর বছর লোকে পটল তোলে।
শিয়ালদহের নামটা এরা দিলে কেমন ভুয়া,
(তবে) ট্রেনের গাড়ি শ্যালের মতো করে হুয়া হুয়া।

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৮৮০—১৯৬৮) দাদাঠাকুর নামে বিশেষভাবে পরিচিত। পৈত্রিক বাসভূমি মুর্শিদাবাদে হলেও বীরভূমে তাঁর জন্ম। বাঙলায় বলিষ্ঠ সাংবাদিকতায় এক বিশেষ ধারার স্রষ্টা হিসাবে তিনি স্মরণীয়। তাঁর 'জঙ্গীপুর সংবাদ', 'বিদূষক' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতায় এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজে কাগজ বিক্রি করে

বঙ্গবাসীকে বিস্মিত করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই খাঁটি মানুষটিকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচনায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। এখানে এমনই একটি অতি বিখ্যাত রচনা উপস্থিত করা হয়েছে।]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী মন্ত্র জপিছে মৃত্যুঞ্জয়ে,
পূরবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে
একটি বিপুল সমন্বয়ে ;
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্বে গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
"তত্ত্ববোধের" "প্রচারে" ঢেলেছে "নবজীবনের"
"সাধনা" হবি।
এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি।
রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে,
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে
ইহারি বুকে।
অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে
করিল খাঁটি।
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বুলাইয়া দিল
সোনার কাঠি।
রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ সব বাঙালীরে
শুনাল শ্রুতি ;
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল ভারতের মণি
ভারত পুঁথি।
দীপংকরের দীপখানি হেথা চির উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে,
নব রসায়নে এ মহানগরী—নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে।

[একদা কবিতার রাজ্যে অসাধারণ জনপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) মাত্র চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হলেও কবিতার নানা ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার অনুকূলে অনেক বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে 'ছন্দের রাজা' বলতেন।]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাত্রি তখন অধিক হয়েছে ছক্কু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে।
আমি ও বন্ধু নির্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে মরে অলিগলি।
পেঁছি বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
"বলো বলো ভাই মুক্তি কোথায় ? চরকা না বন্দুকে ?"

[রবীন্দ্রযুগে নিজস্ব প্রতিভা ও মহিমায় নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪)। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কবিতায় পোশাকী সংস্কার ত্যাগ করে বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে কঠিন-কঠোর এক স্বতন্ত্র আবেদন আনলেন তিনি। মানুষের প্রতি অফুরান ভালবাসা তাঁর কবিতায় অন্য মাত্রা এনেছে।]

জীবনানন্দ দাশ

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড় বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চলে যাব মানে-মানে।
—বলে সে বাড়িয়ে দিল অন্ধকার হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে
যেতে যেতে চেয়েছিল তাঁত।
তবুও তো নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোঠা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হলে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—বলে সে বাড়িয়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—
আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখারীর ভুলে ঃ
এক পৃথিবীর ভুলচুক।

[জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪) বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতায় আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থকে অনেকে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে থাকেন। তাঁর 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বেলা অবেলা কালবেলা' বহুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।]

বনফুল

কলকাতাটা কি—
ছি ছি ছি ছি ছি।
নোংরা মানুষ, নোংরা গলি
কারো হাতে র‍্যাশন থলি
ও মা,
কারো হাতে পিস্তল আর বোমা।
দেওয়ালেতে শ্লোগান লেখে খচখচ
ইস্কুল আর অপিস করে তছনছ
বাপ-দাদাদের মুখে দিয়ে কালি
ভাবছে ওরা খালি
কেল্লা ফতে হবে।
'হয় যদি হোক'—বলছে রামা শামা
কিন্তু মোদের মেরো নাকো—আমরা তোমার মামা
পিসতুতো, মাসতুতো
প্রমাণটা তার এক্ষুণি দিচ্ছি।
কলকাতাটা কি
ছি ছি ছি ছি ছি—।

['বনফুল' (১৮৯৯—১৯৭৯) ছদ্মনামের আড়ালে আছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যের নানা শাখাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। মূলতঃ কথা-সাহিত্যিক। কিন্তু কবিতাও লিখেছেন অনেক।]

অমিয় চক্রবর্তী

চীৎকার করে কে দোতলায় ডাকছে
"অ-ম-র-দ-ত্ত"
মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক ; দেখি
হঠাৎ এ কী
নিজের চোখ আর বাইরের লোক
একতলার গলি আর কুমোরতলি
যা কিছু আছে, যা থাকছে
সমস্তই তাই।
দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই,
অগাধ বিস্ময়ে
অপ্রমত্ত।
জানি না ভদ্রলোক কে, গেলেন কার কথা কয়ে।

[কবি-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর 'খসড়া', 'পারাপার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রসিকমহলে পরিচিত। কয়েক বছর আগে পরিণত বয়সে তিনি প্রয়াত হন।]

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

কোথায় সেই নারকোলডাঙ্গা
আর কি সর্পিল চিপা গলির মধ্যেই তার বাড়ি।
এক পাশে খোলার চালের বস্তি
আরেক পাশে কাঁচা নর্দমার পাঁক।
পেলুম খুঁজে নম্বর
এক ফালি ছোট রোয়াকে একতলা একটি বাক্স।
সামনে এক টুকরো জমিতে
জিনিয়া আর জিরিনিয়াম রয়েছে ফুটে
ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া—
ইংরিজি পড়া হাল আমলের মেয়ে
পড়েছে গরিবের সংসারে।

[অচিন্ত্যকুমার (জন্ম ১৯০৩) কবি-কথা-সাহিত্যিক হিসাবে যেমন খ্যাত, উত্তরকালে তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিলেন।]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে,
আমার শহর নেমেছিল কাদামাখা পায়ে
এইতো সেদিন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।
এইতো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূরে,
অনেক শিশির ঝরে গেছে
তাতিয়ে গেছে কত না রোদ্দুরে।
অনেক ধুলোর মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।
তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন,
দমকা হাওয়া থেকে থেকে
ছন্দ-ছাড়ানো গাছের মায়ায় লাগে,
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।

[একালের অন্যতম সাহিত্যপ্রতিভা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা বজায় রেখেছেন। কবির কবিতাটি 'জীবনানন্দ' কবিতাপত্রিকা থেকে সংগৃহীত।]

বুদ্ধদেব বসু

একদা কলকাতা ছিল আমার চোখে অপরূপ
আশ্চর্য সুন্দর।
স্বপ্নের উন্মেষের মতো কল্পনার বৃন্তে ফোটা ফুল।
তার ধুলোর আর হাওয়ায়, তার উত্তপ্ত ধাতব নিশ্বাসে
চীৎকার করে উঠেছে আমার বাসনা।
সন্ধ্যায় চৌরঙ্গির আলো, দুপুরের অ্যাসফল্ট সৌরভ,
ফুটপাতে অদ্ভুত জনতার ফেনিল বিশাল খরস্রোত
আর হাজার সাদা ছাদের উপর নীল মেঘের
নেমে আসা আমাকে পাগল করে দিতো আনন্দে।

[আধুনিক কবিতাকে যাঁরা সস্নেহে লালন করেছেন, বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন কাব্যসাধনার নান্দীপাঠ করেছিলেন— এমন কথাও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলে থাকেন।]

বিষ্ণু দে

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরঙ্গীর গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।
এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা।
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না দুঃসহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে
লক্ষ-লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদেব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝি-বা ভূকম্পে আসে কংসের স্পন্দন।

[আধুনিক কবিতার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯) বাগ্‌ভঙ্গিমায় অভিনবত্ব এনেছিলেন। কবিতায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বেদ, পুরাণ এবং কখনো সংস্কৃত পঙ্‌ক্তির ব্যবহারে তিনি অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তোমাকে ছড়িয়ে দিতে পারতাম যদি
অন্য এক রৌদ্রে মেধায়,
অন্য অন্ধকারের গভীরে।
যদি পারতাম! তবে দেখতে না আর
পার্ক স্ট্রীট, কুহকিনী রাত্রি ডেকে আনে,
নিরেট চৌরঙ্গী আনে খরশান দিন।
সময়ের এই সব দিনরাত্রি মুছে ফেলে কবে
তোমার অগাধ চোখ, যেই চোখে চেয়ে আছি আমি।

['পূর্বাশা' পত্রিকার সুখ্যাত সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯—১৯৬৯) কবি হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে 'চোখ' নামের এই কবিতাটি 'জীবনানন্দ' কবিতাপত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি প্রেরণ করেছিলেন।]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালো মেঘের ফিটন চড়ে
কালীঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় করে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধরে
বেহুঁশ পড়ে আছে
আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া—
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল।

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত কবি।]

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কলকাতায় শান্তি নেই
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।
হৃৎস্পন্দনধ্বনি দ্রুত হয়;
মূর্ছিত শহর এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ;
স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ
আলো দেয় নিভায় সভয়ে।
কোথায় দোকানপাট? কই সেই জনতার স্রোত?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা আজ আর তোলে নাকো
জলতরণীর পাল শহরের পথে।

[মাত্র একুশ বছর বয়সে এই প্রতিভাধর কবি প্রয়াত হন। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তার জনপ্রিয়তা এখনো অসীম।]

বিজ্ঞান : প্রতিবেদন-নিবন্ধ

কলকাতার মশা-সমস্যা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে (৯ এপ্রিল ১৯৯০) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্-এর বক্তৃতাকক্ষে 'কলকাতার মশার সমস্যা' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় মশার প্রকোপ যে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি মশাবাহিত রোগও ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে—একথা আমরা সকলে জানি। এবিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ তাই প্রচারে নেমেছেন।

ডাঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ তন্ময় মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ অমিয়কুমার হাটি।

তাদের বক্তব্য পেশ করার আগে মশার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো দরকার। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মশার আবির্ভাব ঘটেছে। মশা প্রধানতঃ তিন জাতের : (১) কিউলেক্স্—এরা আমাদের অতি পরিচিত, দিনরাত এরা কামড়ায়, ঘরবাড়ি ও জনবসতির বাইরে জলা জায়গায় এদের দেখা যায় ; (২) অ্যানোফিলিস—এরা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু 'প্লাজামোডিয়াম' নামক পরজীবীর বাহক। এদের কামড়ে ওই পরজীবী অসুস্থ

বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মশার আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ সেদিন থেকেই মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। 'মশা মারতে কামান দাগা' আগে কথাটাকে হেঁয়ালি বলে মনে হতো। এখন আর হয় না। আধুনিক নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করেও মশাকে জব্দ করা দূরে থাক, তার আক্রমণ ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অনেকের ধারণা, শহরাঞ্চলে মশার দাপট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর যত মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, তার ৫০ ভাগ কলকাতার।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা গত ৩১ মার্চ কলকাতায় একটি মিছিলের আয়োজন করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কর্মসূচী হিসাবে ৯ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। সভায় বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কলকাতায় মশার প্রকোপ এবং তার দমন ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনা চক্রের সভাপতিমণ্ডলিতে ছিলেন মঞ্চের সভাপতি ডাঃ জয়ন্ত বসু, কার্যকরী-সভাপতি ডাঃ তপন সাহা এবং ডাঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ দেবেশ দাস, ডাঃ নিমাই দত্তগুপ্ত,

থেকে সুস্থ মানুষের

হয়। অবশ্য পুরুষ অ্যানোফিলিস মানুষকে কামড়ায় না, এরা প্রধানতঃ গাছের রস খেয়েই বাঁচতে পারে। কিন্তু জীবনচক্রের একটি সময়ে অর্থাৎ ডিম্বাণু তৈরির কালে এদের স্ত্রী-মশার স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত দরকার : (৩) এডিস—এরা পীতরোগ ও ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে

একটি প্রাচীন রোগ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস এই রোগের কথা জানতেন। চরক সংহিতায় এই ধরনের রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—'জনোগদোদ্ধংসনীয়' বা আগন্তু-বিষমজ্বর।

কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। সবই এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল। কোন কিছুই আর বশে নেই। লাগামছাড়া জীবনস্রোত আইন-কানুন, সংঘ-সংগঠন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।'

'তোমার জীবনে তো তাহলে কোনও নির্জনতা নেই বাপু! নিভৃতে, একান্তে নিজেকে নিয়ে বসতে পারো কি?

'আজ্ঞে না। কোনও উপায় নেই। আমরা এখন বাস করি পায়রার খোপে। কলকাতার জীবনকে আমরা এখন পোস্টাপিসের চিঠির খোপের চিঠির মতো রেখেছি। ঠাকুর আপনি কতবার কত ভক্তের গৃহে পদার্পণ করে তাঁদের ধন্য করেছেন। মহামান্য কেশব সেন, বলরাম বসু, কাপ্তেন। আপনি ঝামাপুকুর রাজবাড়িতে কলকাতার জীবন শুরু করেছিলেন। আপনার সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, রানী রাসমণির কালী-বাড়িতে। শ্যামপুকুরে যে অন্ত্যলীলার শুরু, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তার পরিসমাপ্তি। সঙ্কীর্ণ পরিবেশ আপনি পছন্দ করতেন না। তেলচিটে সংসার আপনি ঘৃণা করতেন। সংসার আর সংসারীকে আপনি ঘৃণা করতেন না। ঘৃণা করতেন দুখচেটে সংসারীকে। আপনি বলতেন সংসার হবে শিবের সংসার। আমাদের পায়রার খোপে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবার সাহস আমার নেই। অতিশয় অপবিত্র। আদর্শভ্রষ্ট। নিষ্ঠাশূন্য জীবনযাপন মাত্র। কোথায় চলেছি আমরা জানি; কিন্তু ফেরাতে পারি না কিছু-তেই নিজেকে। এই খোপই শুধু সঙ্কীর্ণ নয়, আমাদের মন ও মানসিকতাও ততোধিক সঙ্কীর্ণ। নিভৃত, নির্জন পরিবেশ কোথায়! স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের চাপাচাপি। আরাধ্য একটাই—অর্থ। সাধনা হলো নিদ্রা—ভগবান একটু ঘুম দাও।'

'আমি যে বলেছিলুম, সংসার থেকে মাঝে মাঝে একটু দূরে চলে যাবে। মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে দেবে। ধর, তোমাদের ময়দানে চলে গেলে। কোনও পার্কে গিয়ে, একপাশে একটা গাছতলায় নীরবে বসে রইলে কিছু সময়। নিজের ভাবে রইলে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে। এক সময় ফিরে এলে আবার তোমার সেই সংসারে।'

'ঠাকুর, সেই কলকাতা আর নেই। যে-কলকাতায় আপনি ফিটনে চেপে আসতেন। চিৎপুর রোড ধরে যাবার সময় আপনি শিশুর আনন্দে বলতেন—চালাও, চালাও, জোরে চালাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। আপনার দুপাশ দিয়ে খেলে চলে যেত ঊনবিংশ শতকের আলোকিত জনপদের ছবি। আপনি দেখতেন কলকাতার টেরিকাটা যুবকের জটলা। বন্ধু-বান্ধবদের নাম ধরে ডাকছে। দেখতেন সাজানো দোকানপাট। বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা হাঁটছেন ইঙ্গবঙ্গ পোশাকে। কারোর মাথায় গোলদার ছাতি। ময়দানে দেখতে গেছেন বেলুন ওড়া। সেখানে দেখেছেন সাহেব-দের ফুটফুটে ছেলে। দেখে কৃষ্ণভাবের উদ্দীপন হয়েছে আপনার। আপনি থিয়েটার পাড়ায় গিয়েছেন। থিয়েটার দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশে। সে-কলকাতা যে আর নেই! পার্ক ও ময়দানের পরিবেশ ভীতিপ্রদ। ভাগীরথীর তটভূমি ব্যবসায়ীদের দখলে। পারিবারিক পরিবেশ বিক্ষিপ্ত। ততোধিক বিক্ষিপ্ত সামাজিক পরিবেশ। সর্বত্রই কোল :। হানাহানি, হামলা।'

'তাহলে, কি হবে। আদর্শ পরিবেশ যখন নেই, আদর্শ মানুষও তাহলে হবে না। তাহলে একটা গল্প শোন—একজন ধ্যানে বসেছে পঞ্চবটীতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা-চরিত্রের পর হতাশ হয়ে উঠে এল। কি হলো, না ধ্যান হলো না। ধ্যান করাই গেল না। মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে কাকের ডাকে। এমন কোন দেশ আছে যে-দেশে কাক ডাকে না! সেই দেশে গিয়ে ধ্যান জমাতে হবে!'

'বুঝেছি যা বলতে চাইছেন আপনি। স্বামীজীর ধ্যান চাই। পিঠে কম্বল। না কম্বল নয়, মশা। তবু ধ্যান ভাঙেনি তাঁর।'

'কলকাতার কর্মজীবী তুমি। উদয়াস্ত তোমাকে জীবন আর জীবিকার লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে। তুমি যদি আমাতে সমর্পিত হতে চাও, তাহলে নিজের অন্তরে খুঁজে নাও অদ্ভুত সেই নির্জনতা।'

'সেই নির্জনতার নাম রাখব রামকৃষ্ণলোক। যে-লোকেই থাকি না কেন, এই রামকৃষ্ণলোক আমার হৃদয়াসীন। আর প্রভু আমার, সখা আমার, প্রিয় আমার শ্রীরামকৃষ্ণ।'

স্মৃতিকথা

কলকাতায় মায়ের বাড়ীতে মাকে প্রথম দেখি

সরযু দেবী

মাস, তারিখ আজ আমার স্মরণে নেই, আনুমানিক বাংলা ১৩১৯ ও ইংরেজী ১৯১২ সাল হতে পারে। বয়স তখন আমার নয়-দশ বছর। তবে সেই পবিত্র দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে, যেদিন শ্রীশ্রীমা তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে কৃপা করে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছিলেন।

শৈশব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুরাগ জন্মায় আমাদের গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে। উদ্বোধন পত্রিকা ও তৎকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমাদের গল্পচ্ছলে তাঁর কথা বলতেন। কেন জানি না, শুনতে ভাল লাগত। পড়াশুনার চাইতে ঐ বয়সেই একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম সেই সমস্ত আলোচনায়। তারও পূর্বে আমার পিতামহ জগবন্ধু সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের অনুরাগী ছিলেন। সেই সূবাদে তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্টীমার-ভ্রমণে ভক্তসঙ্গে আমার পিতামহেরও স্থান হয়েছিল। এরই প্রভাবে আমাদের পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একটা যোগ ছিল। আমার ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর গঙ্গাস্নানের অভ্যাস ছিল। আমাদের পিত্রালয় চাঁপাতলা (শিয়ালদহ) থেকে প্রায়ই বাগবাজার ঘাটে তিনি স্নান করতে যেতেন। সুযোগ পেলেই ফেরার পথে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গী হলেও, আমার শৈশবত্বের কথা চিন্তা করে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, আমাকে শ্রীমার কাছে তিনি নিয়ে যেতেন না। একবার আমি জেদ ধরায় তিনি রাজি হলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের ঈপ্সিত দিন। আজ জীবনসায়াহ্নে এসে স্মরণ করলেও মনটা সজীব হয়ে উঠে, অপূর্ব সুখানুভূতিতে ভরে যায়।

সেদিন গঙ্গাস্নানান্তে গিয়েছি, সঙ্গে আমার ঠাকুরমা। শ্রীশ্রীমা বসে আছেন পাশের ঘরটিতে। প্রণাম করেছি, কতক্ষণ ধরে জানি না। আমার অজান্তে আনন্দাশ্রু এসেছে, আমি রোধ করতে পারিনি। ঐ বয়সে অত বোধশক্তি ছিল না, তবে কেন জানি না, মনে হয়েছে—ইনি যে আমার অনেক চেনা, আমার সবথেকে আপনজন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, সম্বিৎ ফিরলে বুঝতে পেরেছি, মা বলছেন—"তুই কাঁদছিস কেন, এই তো আমি," আর মাথায় স্নেহস্পর্শ দিচ্ছেন। সমস্ত শরীর অপূর্ব আবেশে শীতল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মা ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জানার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"এটি কাদের বাড়ির মেয়ে ?" শোনার পর, একদিন স্নান করিয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সেখানে গোলাপ-মা, যোগীন-মা উপস্থিত ছিলেন। স্নান করিয়ে নিয়ে আসার অর্থ তাঁরা জানতেন। সেই সময়ে কোন কারণে মা নাকি অনূঢ়া কন্যাদের কৃপা করতেন না। মাকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, তিনি বললেন, "এর-জন্যে লাগবে না।" অযাচিত কৃপায় আমি ধন্য হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছি। কোন কারণে আমাদের পেঁছাতে কিছুটা দেরি হয়েছিল। দেখি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের রাস্তায় পায়চারি করছেন। আমাদের আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে সঠিক সময়ে না আসার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। জানালেন, শ্রীমা আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। মাস্টারমশাই সবিনয়ে বিলম্বের কারণ জানালে, আশ্বস্ত হয়ে আমাকে উপরে পেঁছে দিতে বললেন।

উপরে গেলাম, মা পূজার আসনে, পাশেও একটি আসন পাতা। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সস্নেহ আহ্বান, কোন অনুযোগ নেই। আমার শিশুমন তখনই ভরে গেল আনন্দে। মা উঠে দ্বার রুদ্ধ করলেন, সেখানে আর কেউ নেই। আমি আর মা। আমাকে অন্য আসনটিতে বসতে বলে, নিজে পূজার আসনটিতে বসে কিছুক্ষণ পূজা করলেন। আমি পাশে বসে

ভাবছি—মা তো আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেবেন, কিন্তু কি সে মন্ত্র! আমি যে ঠাকুরকে বড় ভালবাসি, অন্য কোন নাম পেলে অনুরাগ আসবে কি! অন্তর্যামিনী জগজ্জননী আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারলেন। পূজা সাঙ্গ হলে আমাকে সচকিত করে বললেন—"ওরে, ঠাকুর ছাড়া আমাদের আর কে আছে! তুই যা চাইছিস, সেই নামই পাবি।" আমি অবাক হলাম। দীক্ষিত হলাম মহামন্ত্রে, মহামায়ার কাছ থেকে। সস্নেহে করজপ করা দেখিয়ে দিলেন। হাতে কিছু ফুল দিয়ে গুরুপূজা করতে বললেন। কিভাবে পূজা করতে হয় আমি তো কিছুই জানি না। ইতস্ততঃ করছি দেখে মা তাঁর শ্রীচরণ দুটি বাড়িয়ে দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য দিতে বললেন। প্রাণভরে অর্ঘ্য দিলাম। আমার হাতে একটি হরীতকী দিয়ে গুরু-দক্ষিণা দিতে বললেন। দু-হাত পেতে মা সেটি গ্রহণ করলেন। আবার আমি কৃতার্থ হলাম। নিচে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফেরার আগে পুনরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন।

প্রসাদ ধারণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। মা-ও সেই সময়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সময় হলে সকলের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে উপরে গেলাম। প্রাণভরে প্রণাম করলাম, মা আমার সঙ্গীদের বলে দিলেন, মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে। যাওয়ার আগে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে নির্দেশ দিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে উনি মার একটি ছোট্ট ফটো দিয়ে বলেছিলেন—"এটি বুকের মধ্যে করে নিয়ে যাও, কাউকে দেখিও না।" বোধ হয় মায়েরই সেরূপ কোন নির্দেশ ছিল। পরিপূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এর পরে বেশ কয়েকবারই বাগবাজারে মাকে দর্শনের ও প্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতেই একটা অনাবিল স্নেহ, এবং তা হৃদয় মথিত করত। আহ্বানে কত আপনকরা ভাব, আর তাঁর শ্রীচরণ দুখানি! কি কোমল আর একটা গোলাপী আভা! মুখে কিছু বলার প্রয়োজন হতো না, তিনি অন্তর্যামিনী, সবই অনুভব করতেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে গল্পে-পড়া ডাকাতবাবার কথা ভেবে মনে হয়েছে, এই কি সেই মা! যাকে ডাকাতে ধরেছিল! কালীরূপে মা তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন! মা বলে উঠেছেন, "হ্যাঁরে, আমিই সেই ডাকাতের মেয়ে, তোদের ঠাকুর আমার ডাকাতবাবাকে কত শ্রদ্ধা করতেন!" মা নিজে বুঝিয়ে না দিলে তাঁকে বোঝার উপায় ছিল না। কি সহজ আর কত সাধারণ!

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অহেতুকী কৃপা আমি অনুভব করেছি, এখনও করে চলেছি। আমার বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না। বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কেন জানি না, মনে হতো অন্যান্য ভাই-বোনের থেকে তাঁর ওপরে অধিকার আমার যেন একটু বেশিই ছিল। আমার মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কখনো জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতেন না। সেই সময়ে সমাজে একটি কন্যা অনূঢ়া থেকে যাবে, এটা কষ্ট-কল্পনাই ছিল। পরিবারের বয়স্করা শঙ্কিত হয়ে তাঁকে অনুযোগ করলেও তিনি নির্বিকার থাকতেন আমার কথা ভেবে। পরে সকলের উৎকণ্ঠায় স্থির হয়, আমাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে সমস্যার সমাধানের জন্য। বাবা আমাকে সেই সিদ্ধান্ত জানানোয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হয়। তখন আমার বয়স বেশ বেড়েছে, প্রায় ১৬।১৭-এর মতো। সেকালের সমাজে প্রায় পতিত হওয়ারই কথা।

মা ধৈর্যধরে আমার বাসনা শুনলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেনঃ "দেখ, তুমি সংসারী হবে, আর যার সঙ্গে সংসার করবে সেও তোমার ভাবে ভাবিত"—মা কি তাঁর অর্বাচীন কন্যাটির জন্য পাত্রও নির্বাচন করে রেখেছিলেন! পরবর্তী জীবনে যাঁর সঙ্গে আমার ভাগ্য যুক্ত হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি প্রয়াত খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। মঠে প্রবীনদের কাছে খগেনবাবু নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ)। কাছেই সারগাছি আশ্রম, অখণ্ডানন্দজী সেখান থেকে সেবাকার্য শুরু করেছেন। আশেপাশের তরুণরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবানুরাগী হয়েছে। তরুণ খগেনবাবু তাঁদেরই একজন ছিলেন। অখণ্ডানন্দজীই তাঁকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠান। তিনিও শ্রীশ্রীমার কৃপালাভে ধন্য হন। এখন ভাবি এটা কি অলৌকিক নয়! শুধু তাঁর কৃপাতেই সম্ভব।

কবিতায় কলকাতা

সঙ্কলক : পলাশ মিত্র

কলকাতার তিনশততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 'উদ্বোধন' (ভাদ্র ১৩৯৬) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে কলকাতা-বিষয়ক কিছু কবিতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন সঙ্কলিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই রচনা-সঙ্কলন। শেষে ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা।

এবারের সংকলনের (অংশবিশেষ) শুরুতে আছেন রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ। সবশেষে আছেন বিস্ময়কর তরুণ-প্রতিভা সুকান্ত ভট্টাচার্য। সাম্প্রতিককালের কয়েকজন কবির কবিতা এবারে সঙ্কলিত হলো। তথাপি অনেক উল্লেখ্য কবির কবিতা যে উপস্থিত করা গেল না, সে-বিষয়ে সচেতন আছি। ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন এবারে অনুপস্থিত। এই সংকলন আরও একটু সম্পূর্ণ করার জন্য পরবর্তী প্রয়াসে সচেষ্ট হবার বাসনা রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁটের টোপর মাথায় পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায় না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন।
শীত-বসন্তে সমানভাবে করে ঋতু-যাপন।
অনেক দিনের কথা হলো স্বপ্নে দেখেছিনু
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে বললে আমায় বিনু
'চেয়ে দেখো', ছুটে দেখি চৌকিখানা ছেড়ে—
কোল্‌কাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল,
ট্রাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে করছে টলোমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ যাচ্ছে সারি সারি
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল, উল্টায়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) কলকাতায় জন্মেছেন এবং দেহরক্ষাও করেছেন এখানে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে কলকাতার দেহ থেকে গেঁয়ো গন্ধ মুছে গিয়েছে বলা যাবে না। এবং শহর কলকাতা তাঁর মন ভোলাতে পেরেছিল—এমন কথাও বলা যাবে কিনা সন্দেহ। কলকাতার শহুরে স্বভাবও রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। পছন্দ ছিল অন্য জায়গায়। "দেখিলাম একটা অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্র তরঙ্গিত।" তারপরেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।']

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মরি হায়রে—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা,
(হেথায়) বুদ্ধিমানে করে চুরি, বোকায় পড়ে ধরা।
(মরি হায়রে)

ভাবতাম কলুটোলায় কলু আছে—আছে তাদের ঘানি,
দেখি কলুর বলদ বদ্যি সেথায় করে তেল আমদানি।
মুরগীহাটায় চুপ করে যাই কিনিতে রাম পাখী,
দেখি সারি সারি স্টেশনারী আসল জিনিস ফাঁকি।
চীনে বাজারেতে ভাবতাম চীনে থাকে খালি,
দেখি—ঘরে ঘরে দোকান করে যত সব বাঙালী।
লালবাজারে গিয়ে তবু ঘুচলো একটু ধাঁধা,
লালবাজার তো নাই—লোকের মাথায়
লাল পাগড়ী বাঁধা।

লালদীঘিতে ভাবলাম দেখবো জলটি লাল টকটকে,
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠকে।
গোলদীঘিতে গিয়ে আমার লাগলো ভারী গোল,
চারকোণা দীঘিকে এরা সবাই বলে গোল।
পটলের ক্ষেত নাইকো তবু পটলডাঙা বলে,
(তবে) বিনু পটলেই বছর বছর লোকে পটল তোলে।
শিয়ালদহের নামটা এরা দিলে কেমন ভুয়া,
(তবে) ট্রেনের গাড়ি শ্যালের মতো করে হুয়া হুয়া।

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৮৮০—১৯৬৮) দাদাঠাকুর নামে বিশেষভাবে পরিচিত। পৈত্রিক বাসভূম মুর্শিদাবাদে হলেও বীরভূমে তাঁর জন্ম। বাঙলায় বলিষ্ঠ সাংবাদিকতায় এক বিশেষ ধারার স্রষ্টা হিসাবে তিনি স্মরণীয়। তাঁর 'জঙ্গীপুর সংবাদ', 'বিদূষক' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতায় এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজে কাগজ বিক্রি করে

বঙ্গবাসীকে বিস্মিত করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই খাঁটি মানুষটিকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচনায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। এখানে এমনই একটি অতি বিখ্যাত রচনা উপস্থিত করা হয়েছে।]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী মন্ত্র জপিছে মৃত্যুজয়ে,
পূরবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে
একটি বিপুল সমন্বয়ে ;
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্ত্বে গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
"তত্ত্ববোধের" "প্রচারে" ঢেলেছে "নবজীবনের"
"সাধনা" হবি।
এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি।
রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে,
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে
ইহারি বুকে।
অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে
করিল খাঁটি।
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বুলাইয়া দিল
সোনার কাঠি।
রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ সব বাঙালীরে
শুনাল শ্রুতি :
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল ভারতের মণি
ভারত পুঁথি।
দীপংকরের দীপখানি হেথা চির উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে,
নব রসায়নে এ মহানগরী—নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে।

[একদা কবিতার রাজ্যে অসাধারণ জনপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) মাত্র চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হলেও কবিতার নানা ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার অনুকূলে অনেক বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে 'ছন্দের রাজা' বলতেন।]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাত্রি তখন অধিক হয়েছে ছক্কু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে।
আমি ও বন্ধু নির্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে মরে অলিগলি।
পৌঁছি বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
"বলো বলো ভাই মুক্তি কোথায় ? চরকা না বন্দুকে ?"

[রবীন্দ্রযুগে নিজস্ব প্রতিভা ও মহিমায় নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪)। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কবিতায় পোশাকী সংস্কার ত্যাগ করে বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে কঠিন-কঠোর এক স্বতন্ত্র আবেদন আনলেন তিনি। মানুষের প্রতি অফুরান ভালবাসা তাঁর কবিতায় অন্য মাত্রা এনেছে।]

জীবনানন্দ দাশ

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড় বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চলে যাব মানে-মানে।
—বলে সে বাড়িয়ে দিল অন্ধকার হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে
যেতে যেতে চেয়েছিল তাঁত!
তবুও তো নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোঠা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হলে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—বলে সে বাড়িয়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—
আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখারীর ভুলে :
এক পৃথিবীর ভুলচুক।

[জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪) বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতায় আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থকে অনেকে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে থাকেন। তাঁর 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বেলা অবেলা কালবেলা' বহুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।]

বনফুল

কলকাতাটা কি—
ছি ছি ছি ছি ছি।
নোংরা মানুষ, নোংরা গলি
কারো হাতে র‍্যাশন থলি
ও মা,
কারো হাতে পিস্তল আর বোমা।
দেওয়ালেতে শ্লোগান লেখে খচখচ
ইস্কুল আর অপিস করে তছনছ
বাপ-দাদাদের মুখে দিয়ে কালি
ভাবছে ওরা খালি
কেল্লা ফতে হবে।
'হয় যদি হোক'—বলছে রামা শামা
কিন্তু মোদের মেরো নাকো—আমরা তোমার মামা
পিসতুতো, মাসতুতো
প্রমাণটা তার এক্ষুণি দিচ্ছি।
কলকাতাটা কি
ছি ছি ছি ছি ছি—।

['বনফুল' (১৮৯৯—১৯৭৯) ছদ্মনামের আড়ালে আছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যের নানা শাখাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। মূলতঃ কথা-সাহিত্যিক। কিন্তু কবিতাও লিখেছেন অনেক।]

অমিয় চক্রবর্তী

চীৎকার করে কে দোতলায় ডাকছে
"অ-ম-র-দ-ত্ত"
মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক ; দেখি
হঠাৎ এ কী
নিজের চোখ আর বাইরের লোক
একতলার গলি আর কুমোরতলি
যা কিছু আছে, যা থাকছে
সমস্তই তাই।
দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই,
অগাধ বিস্ময়ে
অপ্রমত্ত।
জানি না ভদ্রলোক কে, গেলেন কার কথা কয়ে।

[কবি-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর 'খসড়া', 'পারাপার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রসিকমহলে পরিচিত। কয়েক বছর আগে পরিণত বয়সে তিনি প্রয়াত হন।]

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

কোথায় সেই নারকোলডাঙ্গা
আর কি সর্পিল চিপা গলির মধ্যেই তার বাড়ি।
এক পাশে খোলার চালের বস্তি
আরেক পাশে কাঁচা নর্দমার পাঁক।
পেলুম খুঁজে নম্বর
এক ফালি ছোট রোয়াকে একতলা একটি বাক্স।
সামনে এক টুকরো জমিতে
জিনিয়া আর জিরিনিয়াম রয়েছে ফুটে
ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া—
ইংরিজি পড়া হাল আমলের মেয়ে
পড়েছে গরিবের সংসারে।

[অচিন্ত্যকুমার (জন্ম ১৯০৩) কবি-কথা-সাহিত্যিক হিসাবে যেমন খ্যাত, উত্তরকালে তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিলেন।]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে,
আমার শহর নেমেছিল কাদামাখা পায়ে
এইতো সেদিন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।
এইতো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর,
অনেক শিশির ঝরে গেছে
তাতিয়ে গেছে কত না রোদ্দুর।
অনেক ধুলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।
তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন,
দমকা হাওয়া থেকে থেকে
ছন্দ-ছাড়ানো গাছের মায়ায় লাগে,
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।

[একালের অন্যতম সাহিত্যপ্রতিভা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯04—১৯৮৮) কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা বজায় রেখেছেন। কবির কবিতাটি 'জীবনানন্দ' কবিতাপত্রিকা থেকে সংগৃহীত।]

বুদ্ধদেব বসু

এককালে কলকাতা ছিল আমার চোখে অপরূপ
আশ্চর্য সুন্দর।
স্বপ্নের উন্মেষের মতো কল্পনার বৃন্তে ফোটা ফুল।
তার ধুলোর আর হাওয়ায়, তার উত্তপ্ত ধাতব নিশ্বাসে
চীৎকার করে উঠেছে আমার বাসনা।
সন্ধ্যায় চৌরঙ্গির আলো, দুপুরের অ্যাসফল্ট সৌরভ,
ফুটপাতে অদ্ভুত জনতার ফেনিল বিশাল খরস্রোত
আর হাজার সাদা ছাদের উপর নীল মেঘের
নেমে আসা আমাকে পাগল করে দিতো আনন্দ।

[আধুনিক কবিতাকে যাঁরা সস্নেহে লালন করেছেন, বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন কাব্যসাধনার নান্দীপাঠ করেছিলেন— এমন কথাও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলে থাকেন।]

বিষ্ণু দে

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরঙ্গীর গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।
এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা!
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না দুঃসহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে
লক্ষ-লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদেব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝি-বা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন।

[আধুনিক কবিতার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯) বাগ্‌ভঙ্গিমায় অভিনবত্ব এনেছিলেন। কবিতায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বেদ, পুরাণ এবং কখনো সংস্কৃত পঙ্‌ক্তির ব্যবহারে তিনি অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তোমাকে ছড়িয়ে দিতে পারতাম যদি
অন্য এক রৌদ্রে মেধায়,
অন্য অন্ধকারের গভীরে।
যদি পারতাম! তবে দেখতে না আর
পার্ক স্ট্রীট, কুহকিনী রাত্রি ডেকে আনে,
নিরেট চৌরঙ্গী আনে খরশান দিন।
সময়ের এই সব দিনরাত্রি মুছে ফেলে কবে
তোমার অগাধ চোখ, যেই চোখে চেয়ে আছি আমি।

['পূর্বাশা' পত্রিকার সুখ্যাত সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯—১৯৬৯) কবি হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে 'চোখ' নামের এই কবিতাটি 'জীবনানন্দ' কবিতাপত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি প্রেরণ করেছিলেন।]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালো মেঘের ফিটন চড়ে
কালীঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় করে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধরে
বেহুঁশ পড়ে আছে
আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া—
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল।

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত কবি।]

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কলকাতায় শান্তি নেই
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।
হৃৎস্পন্দনধ্বনি দ্রুত হয়;
মূর্ছিত শহর এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ;
স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ
আলো দেয় নিভায় সভয়ে।
কোথায় দোকানপাট? কই সেই জনতার স্রোত?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা আজ আর তোলে নাকো
জলতরণীর পাল শহরের পথে।

[মাত্র একুশ বছর বয়সে এই প্রতিভাধর কবি প্রয়াত হন। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তার জনপ্রিয়তা এখনো অসীম।]

কলকাতার মশা-সমস্যা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে (৯ এপ্রিল ১৯৯০) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতাকক্ষে 'কলকাতার মশার সমস্যা' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় মশার প্রকোপ যে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি মশাবাহিত রোগও ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে—একথা আমরা সকলে জানি। এবিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ তাই প্রচারে নেমেছেন।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মশার আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ সেদিন থেকেই মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। 'মশা মারতে কামান দাগা' আগে কথাটাকে হেঁয়ালি বলে মনে হতো। এখন আর হয় না। আধুনিক নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করেও মশাকে জব্দ করা দূরে থাক, তার আক্রমণ ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অনেকের ধারণা, শহরাঞ্চলে মশার দাপট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর যত মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, তার ৫০ ভাগ কলকাতার।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা গত ৩১ মার্চ কলকাতায় একটি মিছিলের আয়োজন করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কর্মসূচী হিসাবে ৯ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। সভায় বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কলকাতায় মশার প্রকোপ এবং তার দমন ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনা চক্রের সভাপতিমণ্ডলিতে ছিলেন মঞ্চের সভাপতি ডাঃ জয়ন্ত বসু, কার্যকরী-সভাপতি ডাঃ তপন সাহা এবং ডাঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ দেবেশ দাস, ডাঃ নিমাই দত্তগুপ্ত, ডাঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ তন্ময় মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ অমিয়কুমার হাটি।

তাদের বক্তব্য পেশ করার আগে মশার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো দরকার। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মশার আবির্ভাব ঘটেছে। মশা প্রধানতঃ তিন জাতের: (১) কিউলেকস্—এরা আমাদের অতি পরিচিত, দিনরাত এরা কামড়ায়, ঘরবাড়ি ও জনবসতির বাইরে জলা জায়গায় এদের দেখা যায়; (২) অ্যানোফিলিস—এরা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু 'প্লাজামোডিয়াম' নামক পরজীবীর বাহক। এদের কামড়ে ওই পরজীবী অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে সুস্থ মানুষের দেহে পরিবাহিত হয়। অবশ্য পুরুষ অ্যানোফিলিস মানুষকে কামড়ায় না, এরা প্রধানতঃ গাছের রস খেয়েই বাঁচতে পারে। কিন্তু জীবনচক্রের একটি সময়ে অর্থাৎ ডিম্বাণু তৈরির কালে এদের স্ত্রী-মশার স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত দরকার; (৩) এডিস—এরা পীতরোগ ও ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে।

ম্যালেরিয়া একটি প্রাচীন রোগ। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস এই রোগের কথা জানতেন। চরক সংহিতায় এই ধরনের রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—'জনোগদোদ্ধংসনীয়' বা আগন্তু-বিষমজ্বর।

ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব ঘটে আফ্রিকা মহাদেশে, তারপর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হয়ে ভারতে এবং ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হলেও ভারতসহ অনুন্নত দেশগুলিতে প্রতি বছর এর প্রাদুর্ভাব ঘটছে। কলকাতাবাসী হিসাবে আমাদের শুনতে খারাপ লাগবে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর যত লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তার ৫০ ভাগ দেখা যায় কলকাতায়। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জব চার্নক যখন কলকাতার পত্তন করেন, তার এক বছরের মধ্যে তাঁর ১২০০ ব্রিটিশ সহকর্মীর অর্ধেক মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসেও আমরা পড়েছি, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গের কত গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে।

ইংরেজীতে 'ম্যালেরিয়া' কথাটির মানে হলো খারাপ বাতাস। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসি সেনাবিভাগের চিকিৎসক লাডেরান প্রথম বলেন যে, খারাপ বাতাস ম্যালেরিয়ার কারণ নয়, ম্যালেরিয়ার কারণ হলো একরকম জীবাণু। জীবকে আমরা দুশ্রেণীতে ভাগ করি—প্রাণী ও উদ্ভিদ। প্রাণী শ্রেণীর জীবাণুকে বলা হয় প্রোটোজোয়া, আর উদ্ভিদ শ্রেণীর জীবাণুকে বলে ব্যাকটিরিয়া। এই ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে প্রোটোজোয়া কিছু বড় হলেও এদের খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। প্রোটোজোয়া প্রাণিদেহের রক্তের লালকণিকায় বাসা বাঁধে এবং দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে, লালকণিকা ধ্বংস করে, আর যে বিষ তৈরি করে তার জন্যে জ্বর হয়।

মশার দেহে যে-জীবাণুর কথা লাডেরান বলেছিলেন, সেবিষয় ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস্ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতে এসে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানি স্মৃতি হাসপাতাল) গবেষণারত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন, অ্যানোফিলিস জাতীয় মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে রস-কে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ৯ এপ্রিলে আয়োজিত 'কলকাতার মশা-সমস্যা' শীর্ষক আলোচনাচক্রের প্রারম্ভে বিজ্ঞান মঞ্চের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ দেবেশ দাস তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন ঃ আমাদের অভিজ্ঞতায় এটা খুব স্পষ্ট যে, গত কয়েক বছরে কলকাতায় মশা খুব বেড়েছে এবং এই মশা কলকাতার মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি রোগের বাহক এই মশা। গত কয়েক বছরে কলকাতায় রাস্তাঘাট, বাড়ি, নর্দমার কিছুটা উন্নত হয়েছে ; কিন্তু যেভাবে উন্নতি হয়েছে, তাতে কতকগুলো সমস্যাও তৈরি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—(১) বিপুল পরিমাণে সেপটিক ট্যাঙ্ক ঃ খাটা পায়খানার জায়গায় অনেক অঞ্চলে সেপটিক ট্যাঙ্ক হয়েছে। খাটা পায়খানায় যেহেতু জল জমে থাকে না, সেহেতু মশা জন্মাতো না। এখন সেপটিক ট্যাঙ্কে মশা জন্মাচ্ছে। (২) খোলা নর্দমা ঃ কলকাতার রাস্তায় গত কয়েক বছর ধরে বহু কিলোমিটার নর্দমা তৈরি হয়েছে। এই নর্দমায় মশা জন্মাচ্ছে। (৩) মেট্রোরেল ঃ এই বিষয়টা অস্থায়ী ব্যাপার হলেও বর্তমানে একটা সমস্যা তৈরি করছে। মেট্রোরেলের কাজ হওয়ার জন্যে বহু জায়গায় জল জমে থাকছে—যেটা মধ্য কলকাতায় মশা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

মশা দমনে বিজ্ঞান মঞ্চের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ মশার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে হলে দুটি পথ আছে—প্রথমতঃ মশার জন্ম আটকানো, দ্বিতীয়তঃ মশাকে মারা। আমরা প্রথম পথটির ওপর জোর দিতে চাই। এখন মশা দমনে চারটি পদ্ধতি আছে—(১) প্রযুক্তিগত, (২) রাসায়নিকভাবে, (৩) জৈবিকভাবে, (৪) সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ আজকাল আমরা

মশা তাড়াতে নানারকম ধূপ, ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করছি। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সমস্ত বিষয়-গুলি মানুষের শরীরের ক্ষতি করে কিনা, করলে কতটা করে তার তথ্য আমাদের জানা নেই। আমাদের মনে হয়, এই বিষয়টা বিশেষজ্ঞদের দেখা উচিত। আমরা শুনেছি যে, যেখানে ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, সেখানে মানুষের ব্যবহারিক সীমানার বাইরে যে কম্পাঙ্ক তরঙ্গ নির্গত হয়, তা মানুষের শরীরের ক্ষতি করে। এই সমস্ত বিষয়ে মানুষকে আমাদের সচেতন করা দরকার।

'মশাঃ বর্তমান সমস্যা ও আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ নিমাই দত্তগুপ্ত বলেন ঃ মশা ও মশাবাহিত রোগ প্রতি-রোধ ও দমন সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হলে প্রথমে মশা ও তার জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা দরকার। মশা একটি পতঙ্গ। এর গতিবিধি আশ্চর্যজনক। সমুদ্রতলের ১৪০০ ফুট উপরে, এমন-কি খনিগর্ভের ৪০০ ফুট নিচেও এদের দেখা যায়। এদের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত —মাথা, বুক ও পেট। মাথার সামনেই রয়েছে রক্তপানের শুঁড় বা প্রোবাসিস। এদের জীবন-চক্রে চারটি অবস্থা দেখা যায়—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশা। স্ত্রী-মশা সাধারণতঃ নোংরা জলা জায়গায় রাতে ডিম পাড়ে। প্রথমে ডিমগুলি থাকে সাদা দানার মতো, পরে কিছুটা কালো হয় এবং দু-তিনদিনের মধ্যেই ডিম পরিণত হয় লার্ভায়। লার্ভাগুলি বেশ চটপটে, জলজ শ্যাওলা ও জৈব আবর্জনা খেয়েই বেঁচে থাকে। পাঁচদিন পর লার্ভা পরিণত হয় পিউপা বা পুত্তলী কীটে। পিউপা খাবার না খেলেও সাঁতারে দক্ষ, এমন-কি ডুব সাঁতারে। এরা ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় পূর্ণাঙ্গ শিশু-মশায় রূপান্তরিত হয়।

অ্যানোফিলিস মশা কিভাবে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ এদের স্ত্রী-মশাই রক্তপানের উদ্দেশ্যে জনবসতি-পূর্ণ এলাকায় ও ঘরবাড়িতে ঢোকে। মানুষের দেহের গন্ধ ও উষ্ণতার জন্যে এরা আকৃষ্ট হয় এবং প্রতিটি মশা একবারে ০·৩—০.৮ মিলি-লিটার রক্ত চুষতে পারে। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত কোন মানুষের রক্তপানকালে স্ত্রী-অ্যানো-ফিলিসের লালাগ্রন্থিতে পরজীবী জীবাণু প্রবেশ করে। এরপর ঐ বাহক মশা অন্য কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে মশার শুঁড় দিয়ে লালাসহ ঐ জীবাণু তার রক্তে প্রবেশ করে। কামড়ানোর সাত থেকে তিরিশ দিন পর জ্বর আরম্ভ হয়। কখনো কখনো প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শ্বাস ও নাড়ীর গতি দ্রুততর এবং খিঁচুনিও দেখা দেয়। মনে রাখা দরকার যে, এজাতীয় জ্বর অন্য কারণেও হতে পারে। তাই এসব উপসর্গ থাকলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই হলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়। জনস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মশা ও মশাবাহিত রোগ আমাদের দেশে আজ একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণে দরকার—মশা ধ্বংস করা, মশার জন্মহার বৃদ্ধি কমানো এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। একাজ সরকার, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, চিকিৎসক ও জন-সাধারণের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। ডাঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ তন্ময় মুখোপাধ্যায় সভায় পঠিত তাঁদের 'মশা দমন ও প্রতিরোধঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' নিবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন ; মশা কিভাবে দমন ও প্রতিরোধ করা যায় একথা ভাবতে হলে প্রথমেই মশার সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণগুলি জানা দরকার। আমাদের দেশে মশার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণসমূহ হলো (১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে অনুন্নত এলাকাগুলি ব্যাপক ও দ্রুত পৌর-সভার আওতায় আনার জন্য জলজমা ও খারাপ নিকাশী ব্যবস্থা সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সেখানে মশা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। (২) মশা ।মনকারী রাসায়নিক পদার্থগুলির অনিয়মিত ও বাছবিচারহীন ব্যবহার মশাকে ঐ পদার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ ঘটনা আমাদের দেশে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৮ খৃীস্টাব্দে হেক্টর প্রতি ৩০০ গ্রাম ডি ডি টি ব্যবহার কালে দেখা গিয়েছিল। এতে একদিকে ঐ ডি ডি টি-তে মশার সহ্য-

গুণ অনেক বেড়ে গেছে। তাই আর পূর্বের মাত্রাতে মশা মরছে না। অন্যদিকে বেশি মাত্রায় ব্যবহারের জন্য ডি ডি টি-র সুদূরপ্রসারী বিষক্রিয়াও দেখা গেছে। (৩) দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা আজও আসেনি। ফলে মশা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সেভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের মতে কলকাতার জন্য আদর্শ পদ্ধতি হলো লার্ভা দমন। এই কাজ একদিকে জৈবিক উপায়ে এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ মশার জন্মস্থানের উৎস কমিয়ে (প্লেন সার্ভিং, ল্যান্ড ড্রেনেজ ইত্যাদি) করা যায়। এছাড়া জৈব ফসফরাস ঘটিত কয়েকটি কম ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সঠিক পরিমাণে ও নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রয়োগ করেও মশার সংখ্যা কমানো যেতে পারে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হেল্থ অ্যান্ড হাইজিন-এর ডাঃ অমিয়কুমার হাটি তাঁর 'কলকাতার ম্যালেরিয়া বাহিকা মশা নিয়ন্ত্রণ' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ আগে কলকাতায় তিন ধরনের অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া ছড়াতো—(১) অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই, (২) অ্যানোফিলিস সানভাইকাস, ও (৩) অ্যানোফিলিস ভারুনা। এখন শুধু অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশা-ই ম্যালেরিয়া ছড়ায়। অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশা সৃষ্টির জন্যে দায়ী মানুষেরা। এই মশা তার বংশবৃদ্ধির জন্যে মানুষের তৈরি পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করছে। মধ্য কলকাতার ১০০টি বাড়ির ভেতরে সারা বছর ধরে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, সারা বছর ঐ সব বাড়ির আনাচে-কানাচে, ঘরে, ছাদে মশারা জন্মাচ্ছে। সবথেকে বেশি জন্মায় আগস্ট মাসে, ১০০টি বাড়ির মধ্যে ২৭টিতে মশার আঁতুড় ঘর খুঁজে পাওয়া যায়। শীতে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় পাঁচে। আগস্টে যেসব জলজমা পাত্র থাকে, তার ১৭ শতাংশের মধ্যে পাওয়া গেছে অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশার লার্ভা। ১০০টা ঘরে সব জলজমা পাত্রের হিসাব যদি নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে আগস্ট মাসে এরকম ৮৬টি জায়গায় জন্মাচ্ছে অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই। আমরা কিভাবে এই মশার বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করছি, এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে অতি সহজে তা বুঝতে পারা যায়।

তাহলে নিয়ন্ত্রণের উপায় কি? আমি বলব, ঐ যে উৎস-আঁতুড়ঘর, সেগুলো কমানো। এ দায়িত্ব কিন্তু জনসাধারণের। প্রতি ঘরে আমরা যারা বাস করি, সকলকে সজাগ থাকতে হবে এবং লার্ভার বাসস্থান ধ্বংস করবার ব্রত নিতে হবে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে। একটা ঘরেও যেন অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই লার্ভা কখনো খুঁজে না পাওয়া যায়। এটা কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। বোম্বাই শহরের সমস্যাও এক। সেখানে কোন বাড়ির ভেতর অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই জন্মাতে দেওয়া হয় না। এর জন্য আইন আছে। কোন বাড়িতে লার্ভা পাওয়া গেলে বসবাসকারী বা বাড়ির মালিকদের জরিমানা করা হয়। কলকাতা করপোরেশনেও এই আইন ছিল। খুঁজে দেখতে হবে, চালু করতে হবে।

পরিশেষে ডাঃ হাটি বলেনঃ নানা ধরনের প্রচারের ভিত্তিতে জনসাধারণকে এবিষয়ে সামিল করতে হবে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, সঙ্ঘ-সমিতি, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এত সহজ এ মশা দমন করা, কিন্তু এত কঠিন। কলকাতার মানুষের একটু লজ্জাও হওয়া উচিত—বোম্বাই যা পেরেছে, কলকাতা পারবে না কেন?

অন্য উপায় হলো রাতে মশা যাতে না কামড়ায় তার জন্যে মশারি ব্যবহার। কৃত্রিম ঝরনা, জলাশয়, কুয়ো ইত্যাদিতে গাম্পি, তেলাপিয়া মাছ ছাড়া (তারা মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে)। মশাকে দূরে রাখে এমন কোন জলজ বা লোশন গায়ে মাখা। যেখানে মশার লার্ভা পাওয়া যাবে, অথচ জল নষ্ট করা যাবে না, সেখানে কীটনাশক পদার্থ বা তেল ছড়ানো উচিত। অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই থাকা মানে কলকাতার কলঙ্ক। কলকাতার মানুষ কি এই কলঙ্ক মেনে নেবেন, না অপনোদন করার চেষ্টা করবেন?

[কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা জেলা কমিটি ; ভারতকথা, ১৪ জুন, ১৯৯০]

শ্রীময়ী কলকাতা

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

কলকাতা কল্পতরু—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কথামৃত প্রকাশনী, ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। কুড়ি টাকা।

কলকাতার বৌদ্ধিক জগতে কলকাতার ত্রিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী যথার্থই এক ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করেছে। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বহুবিধ বিচিত্র উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে এই মহানগরীর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে নিবন্ধও অনেক প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে, যাতে গভীর গবেষণার চেয়েও চলতি হাওয়ায় মনোরঞ্জনের প্রয়াসই অধিক। মহানগরীর কুলজি-সন্ধানের ধারায় এক বিশেষ সংযোজন আলোচ্য গ্রন্থ। গবেষক-সাহিত্যিক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ১০টি অধ্যায়ে কলকাতার উৎস ও বিবর্তন অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ১১৩ পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। "কলিকাতা" নামের উৎস-সন্ধানে তাঁর ঐতিহাসিক বিচারণা বেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য। যদিও লেখক এই মহানগরীর গোড়াপত্তনের যুগের এক বিশেষ অভিজাত পরিবারের সন্তান, তবুও নির্মোহ দৃষ্টিতে সেকালের ধনীদের জীবন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন সেকালের বহু অধুনালুপ্ত গ্রন্থ ও সংবাদপত্র থেকে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত অনেকের জীবনকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের গবাক্ষপথে তিনি বিহঙ্গাবলোকন করিয়েছেন। বাণিজ্যের ধারা পথে মহানগরীর রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হবার ইতিহাসটিও সুন্দরভাবে এখানে বিধৃত। সেই সঙ্গে লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যও মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। কল্লোলিনী কলকাতার কলধ্বনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে ভালভাবেই শোনা যায়। সাহিত্যের ভাষায় ইতিহাসকে তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস অভিনন্দনীয়। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, কলকাতা আজ যে জঞ্জালনগরী তারও ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। এখানে সবাই অর্থোপার্জনে এসেছেন, থেকেছেন, কিন্তু শহরকে সাজাতে কেউ চাননি। দূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে পৌর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় আজকের মতোই সেদিনেরও নগর-নায়কেরা ছিলেন অনীহ।

ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "ধর্মার্থকাম-মোক্ষাণাম্ উপদেশ-সমন্বিতম্।
> পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তম্ ইতিহাসঃ প্রচক্ষতে ॥"

ইতিহাস থেকে চতুর্বর্গ সমৃদ্ধ, কাম্য, পূর্ণ জীবনের পাথেয় পাঠক সংগ্রহ করেন। তাই ইতিহাসকে হতে হবে সর্বতঃপ্রসারী। বর্তমান গ্রন্থে সামাজিক এবং বাণিজ্যিক দিকের প্রতিই লেখক মুখ্যতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ধারারও পরিচয় বিশেষভাবে এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মননশীলতার প্রাধান্যের জন্যই মনীষী গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সেই বাণী আজও স্মরণীয়—"বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত কাল তাই ভাবে।" বাংলার মর্মকেন্দ্র কলকাতা। কলকাতার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ভারত বহুদিন চলেছে। পরবর্তী সংস্করণে শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্মের ত্রিধারায় কলকাতার বিবর্তন এই গ্রন্থে সংযোজনের প্রতীক্ষায় আমরা আগ্রহী। সুন্দর প্রচ্ছদ, বাঁধাই মনোজ্ঞ। সুন্দর এই গ্রন্থে যেসব গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি নির্ঘণ্ট পেলে তথ্যানুসন্ধানীদের তৃপ্তি হতো। বাঙালীর আত্মপরিচয়ের একটি অধ্যায় এই গ্রন্থে মননশীল লেখক উদ্ঘাটিত করে গৌড়জনকে উপকৃত করেছেন।



'উদ্বোধন'-কে প্রদত্ত বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯০ প্রদান অনুষ্ঠান

(রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ দ্রষ্টব্য)

আলোকচিত্র ঃ উপরে (বাঁ দিক থেকে) ঃ মানপত্র, ট্রফি

নিচে — (বাঁ দিক থেকে) ঃ অনুষ্ঠান-সভাপতি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ,

"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"
– *Swami Vivekananda*



INDIAN EPIC CULTURE CENTRE
167/22, SOUTH SINTHI ROAD, CALCUTTA-700 050, INDIA

VISWA NAYAK VIVEKANANDA

Epic Award : 1990

PAY UDBODHAN 4 July 1990

रुपये RUPEES TEN THOUSAND AND ONE ONLY या धारक को OR BEARER

रु.Rs. 10,001/-

खाता न A/C No 2191

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
साउथ सिन्थी, कलकत्ता (प. बं.) South Sinthee, Calcutta (W.B)
QCV

For INDIAN EPIC CULTURE CENTRE
Biswanath Dutta
Founder & General Secretary

⑈497574⑈ 700024040⑆ 10

বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯০
(রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ দ্রষ্টব্য)
আলোকচিত্র ঃ উদ্বোধন-কে প্রদত্ত ১০,০০১ টাকার চেক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কলকাতায় বস্তিবাসীদের জন্য বাসভবন প্রকল্প এবং 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা' প্রদর্শনী

উত্তর কলকাতার রামবাগানে গত ৫ মে সকাল ৯টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এবং প্রস্তরফলকের আবরণ উন্মোচন করে নরেন্দ্রপুর আশ্রম পরিচালিত বস্তি-বাসীদের জন্য বাসভবন-প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। পরে আয়োজিত একটি জনসভায় (আজাদ হিন্দ বাগ-এ) তিনি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবে সেবাকাজের আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। (তাঁর ভাষণটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।) স্বাগত ভাষণে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ ও পদ্ধতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। বস্তিবাসী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে স্থানীয় জনকল্যাণ সমিতির কার্যকরী সম্পাদক পান্নালাল মাণিক রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে বস্তিবাসীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী রামবাগান বস্তিতে পাঁচের দশকের প্রথমে কত বাধা-বিপত্তির মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার ছাত্রাবাসের ছাত্রদের বস্তিতে কাজ শুরু করতে হয়েছিল তা উল্লেখ করেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন মেয়র ও রামবাগানের অধুনা 'বিবেকানন্দ-পল্লী' জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দে। ঐ দিন সন্ধ্যায় মিঃ ইন্ডিয়া বিশ্বনাথ দত্তের পরিচালনায় 'সচ্চিদানন্দ' ও 'মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ' নামক দুটি ব্যায়াম-নাটিকা পরিবেশন করেন ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টার।

৬ মে বিকেল ৫টায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি ফলকের আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের জন্য নবনির্মিত বাসগৃহ বন্টনের সূচনা করেন। পরে তিনি আজাদ হিন্দ বাগ-এ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন। তার আগে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা' শীর্ষক প্রদর্শনীটির তিনি উদ্বোধন করেন। কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশে তিনি নরেন্দ্রপুর আশ্রম প্রকাশিত 'কলকাতার বস্তি-উন্নয়নে রামকৃষ্ণ মিশন' শীর্ষক একটি স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং নবনির্মিত ৬টি বাড়ির ৯৬টি পরিবারের ৬ জন প্রতিনিধির হাতে চাবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অর্পণ করেন। (তাঁর ভাষণটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।)

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী, অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের আদর্শ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও বিধায়ক সাধন পাণ্ডে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ঐদিন সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ-পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ভজন পরিবেশন করেন কেয়া ঘোষ।

৭ মে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার সূচনা করেন স্বামী অসক্তানন্দজী। বেলুড় মঠের স্বামী বিমলাত্মানন্দজী ('শ্রীরামকৃষ্ণ ও কলকাতা'), উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মা-নন্দজী ('শ্রীমা ও কলকাতা'), অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ('স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতা') এবং শিব-শঙ্কর চক্রবর্তী ('কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-কার্য') বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী ব্যাখ্যা করেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন কলকাতায় কোন ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। সন্ধ্যায় গোয়াবাগান অঞ্চলের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

৮ মে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত 'বস্তি-উন্নয়ন তথা দরিদ্রের গৃহসমস্যা ও আয়বৃদ্ধির উপায়' শীর্ষক আলোচনাচক্রে পৌরোহিত্য করেন সি এম ডি এ-র প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা ডঃ সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়। হাডকো-র আঞ্চলিক অধিকর্তা পি. আর. দাস, প্রখ্যাত স্থপতি চন্দন মৈত্র ভাষণ দেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম পরিচালিত উত্তর কলকাতা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মিগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। বস্তিবাসীদের প্রতিনিধি রেবা ঘোষ আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের

প্রভাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজিতকুমার পাঁত। সন্ধ্যায় সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্পের শিশু ও কর্মিগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

৯মে (২৫ বৈশাখ) সকালে আশ্রমের কর্মিগণ ও বস্তিবাসিবৃন্দ কথায়-গানে ও কবিতাপাঠে রবীন্দ্র-স্মরণ করেন। মেনকা ঠাকুর তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি অধিগ্রহণ করে একটি জাতীয় স্মৃতিমন্দিরে পরিণত করার আহ্বান জানান সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশনকে। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি তিনি ঐ সভায় পরিবেশন করেন।

বিকালে 'বস্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি' শীর্ষক আলোচনাসভায় পৌরোহিত্য করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপিকা মীরা রায়। স্বাগত ভাষণ দেন শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-কল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (কারা) মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যান্ড পাবলিক হেল্থ-এর অধ্যাপক এ. কে. আচার্য, কলকাতা নার্সিং কলেজের অধ্যাপিকা শুভা দাশগুপ্তা ও কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য ডঃ সুবোধ দে। সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের শিবানী চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা সাহা এবং বস্তিবাসীদের পক্ষ থেকে সন্ধ্যা বসাক তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যায় মনোহরপুকুর ও তিলজলার শিশু-কিশোর-কিশোরীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

১০মে বিকেল ৪টায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও উজ্জ্বলতর কলকাতার সংকল্পে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। কিন্তু পদযাত্রা শুভারম্ভের কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ একটি অগ্নিকাণ্ডে সভামণ্ডপটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। কলকাতার বিভিন্ন বস্তি থেকে জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। বহু মুসলমান নারীও বোরখা পরে এই পদযাত্রায় সামিল হন। সকলের হাতে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারের বাণী। গৌরীমাতা উদ্যান থেকে যাত্রা আরম্ভ করে বলরাম মন্দির, বাগবাজার স্ট্রীট, শ্যামবাজার, বিধান সরণী হয়ে পদযাত্রাটি আজাদ হিন্দ বাগ-এ এসে সমাপ্ত হয়। ভস্মীভূত সভামণ্ডপের অনতিদূরে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী অসক্তানন্দজী এবং স্বামী অক্ষরানন্দজী। শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ও বিধায়ক সাধন পাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা', শীর্ষক প্রদর্শনীটি অগণিত কলকাতাবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ উৎসাহ সহকারে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

'উদ্বোধন'কে 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯০' প্রদান

গত ৪ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা ১৫মিনিট-এ উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হলে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টার তাঁদের এবছরের 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার' উদ্বোধনকে অর্পণ করলেন। উদ্বোধনের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন উদ্বোধনের যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পুরস্কারের অর্থমূল্য—দশ হাজার এক টাকা, তৎসহ একটি মানপত্র এবং ধাতুনির্মিত পদ্ম ও ভূগোলকের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-মূর্তি সম্বলিত একটি সুদৃশ্য ট্রফি। ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টারের পক্ষ থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যথাক্রমে পুরস্কার কমিটির সভাপতি ডি বি. সেন, সংস্থার সহ-সভাপতি এস কে. রায় এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক মিঃ ইন্ডিয়া বিশ্বনাথ দত্ত। মানপত্র পাঠ করেন বাণী দত্ত। (মানপত্রটি পাঠোদ্ধার করে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।)

প্রারম্ভিক ভাষণে বিশ্বনাথ দত্ত বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীজীর আদর্শে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন পত্রিকাকে এবছরের বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার অর্পণ করা হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে উদ্বোধন

প্রাচীনতম। আমরা জানি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারক, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধনকে পুরস্কার দেওয়া যায় না। আমরা এই পুরস্কার অর্পণের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রতি আমাদের তথা জাতির কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে নিজেরাই সম্মানিত ও ধন্য বোধ করছি।

পুরস্কার গ্রহণ করে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন, উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শরীর। উদ্বোধন একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা পালন করে চলার চেষ্টা করছে—একটি মহাদেবের, অপরটি ভগীরথের ; মহাদেবের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গকে উদ্বোধন ধারণ করেছে, আবার ভগীরথের মতো ঐ তরঙ্গকে সে বহন করে চলেছে লোককল্যাণের জন্য। প্রসঙ্গতঃ তিনি উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের স্বপ্ন ও সাধনার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, তাঁরা যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ তাকে সযত্নে লালন করেছেন। আজ উদ্বোধন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা তাঁদেরই সাধনার ফলশ্রুতি। তার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়েছে উদ্বোধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী, অ-সন্ন্যাসী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা ও অগণিত শুভানুধ্যায়ীর শুভেচ্ছা। এই পুরস্কার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনের ঐতিহ্য এবং আদর্শের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা বর্ধিত হলো।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, উদ্বোধন বর্তমানে একটি জনপ্রিয় বড় পত্রিকা; কিন্তু মনে রাখতে হবে, উদ্বোধন শুধু একটি পত্রিকাই নয়, উদ্বোধন একটি মন্দির, একটি বিগ্রহ। এর সেবা হলো দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহুতি ও অঞ্জলি। কয়েক বছর ধরে আমি যে নিয়মিত 'পরমপদকমলে' স্তম্ভটি উদ্বোধনে লিখছি তা এই দৃষ্টি থেকেই লেখার চেষ্টা করছি। প্রসঙ্গতঃ তিনি উদ্বোধনের সঙ্গে তাঁর প্রায় চার দশক আগে আকস্মিকভাবে স্থাপিত নিবিড় ও আত্মিক যোগাযোগের স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, সেই যে উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত হলাম তা আমাকে ক্রমে স্বামীজীর সঙ্গেই যুক্ত করে দিল এবং আমার জীবনের মোড় ও ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। মাঝে কিছুদিন উদ্বোধনের সঙ্গে আমার যোগাযোগে ছেদ পড়েছিল, কিন্তু পূর্বজন্মের যে সুকৃতি আমার সঙ্গে উদ্বোধনের যোগাযোগ ঘটিয়েছিল তা-ই আমাকে উদ্বোধনের তথা স্বামীজীর সেবায় আবার নিয়ে এসেছে।

সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, উদ্বোধন হলো স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খ। সমুদ্রের প্রতিটি ধ্বনি নানা রেখায় মুদ্রিত হয়ে থাকে শঙ্খের ভিতরে ও বাইরে। শঙ্খ বাজালে তাই সমুদ্রের ধ্বনিই তার মধ্য থেকে শোনা যায়। তেমনি বিবেকানন্দ-সমুদ্রের ধ্বনি বিগত একানব্বই বছর ধরে উদ্বোধন প্রকাশ করতে সচেষ্ট। বিবেকানন্দের চিন্তা কোন ব্যক্তির চিন্তামাত্র নয়, তা বিশ্বচিন্তা। সেই বিশ্বচিন্তাকেই উদ্বোধন আমাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে উদ্বোধনের একটি বিরাট ভূমিকা আছে, বিরাট অবদান আছে বাঙলা সাহিত্যের নতুন গতিপথ নির্মাণে এবং সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা গঠনে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিকদের দ্বারা এখনো তা স্বীকৃত হয়নি। স্বামীজীর প্রিয় দিন ৪ জুলাই এই অনুষ্ঠান হলো। ৪ জুলাই আমেরিকা পরাধীনতার শৃংখল ভেঙেছিল। সেকথা স্মরণ করে ১৮৯৮-এর ৪ জুলাই স্বামীজী একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার প্রতিটি ছত্রে তিনি স্বাধীনতার বন্দনা করেছিলেন। আপন দেহের শৃংখল মুক্তির জন্যও তিনি নির্বাচন করেছিলেন এই দিনটিকেই চার বছর পর। উদ্বোধনের মাধ্যমে তিনি জাতিকে সকলরকম পরাধীনতার শৃংখলমুক্তির বাণীই শুনিয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গোপালচন্দ্র দেবনাথ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডি. বি. সেন। উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে অমিত ঘোষ এবং অসীম দত্ত। তবলায় সহযোগিতা করেন অশোক মুখোপাধ্যায়। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বেলুড় মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসী, সারদা মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিনী ও বহু ভক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিপুল শ্রোতৃসমাগমের জন্য সারদানন্দ হলের বাইরেও বহু অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৩—১৬ এপ্রিল **চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতি (কলকাতা-২৭)** কর্তৃক চেতলার পরমহংসদেব রোডস্থ সারদাতীর্থ পার্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫১তম জন্মোৎসব ও মণ্ডপ সমিতির ৭৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী প্রভাকরানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ এবং প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণা বিভিন্ন দিনে উপস্থিত থেকে ধর্মালোচনা করেছেন। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন তপন সিংহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সম্প্রদায় এবং অরুণকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় সুরপীঠ গোষ্ঠী।

গত ২ জুন ১৯৯১ সন্ধ্যায় কলকাতাস্থ **শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ সমিতির** বার্ষিক উৎসব সভায় ১৮-এ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এ (কলকাতা-১৯) কথামৃত পাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর একটি অপ্রকাশিত ভাষণ পাঠের পর স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই সমিতির অনুদানে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসর গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ হলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বিষয়—'স্বরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ'। বক্তা ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

যুব শিবির

গত ২৪—২৬ মে ১৯৯১ উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে **অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের** আঞ্চলিক ৫ম বার্ষিক যুব শিক্ষণ-শিবির পরিচালিত হয়। এই শিবিরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ও যুবক যোগদান করেছিলেন। শিবিরে বিভিন্ন দিনে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ওপর আলোচনা করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ, অমিয়কুমার মজুমদার, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, নীরদবরণ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞান সংবাদ

কলকাতার বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে পরাগরেণু সংক্রান্ত অ্যালার্জি নিয়ে গবেষণা

সুইডেনের স্টকহোমে অ্যারোবায়োলজি (Aerobiology)-র এক বিশ্ব-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগস্টের শেষে। **কলকাতা বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের** বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুনির্মল চন্দ সুইডেনের ঐ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অ্যারোবায়োলজির এক বিশেষ শাখা হলো প্যালিনোলজি (Palynology) বা পরাগতত্ত্ব বিদ্যা। অধ্যাপক চন্দের নেতৃত্বে প্যালিনোলজির গবেষণা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলেছে।

মানুষের প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে ভাসমান কিছু পরাগরেণু ফুসফুসে চলে যায়। পরাগরেণুর মধ্যস্থ এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন রক্তস্রোতের মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছালে সংবেদনশীল ব্যক্তির দেহে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জিজনিত রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। বদ্ধ ঘরের বা বাতানুকূল ঘরের অন্ধকার কোণে, আদ্র পর্দায়, চামড়ার অংশে বিশেষ ধরনের ছত্রাক জন্মায়। পাটগুদাম এবং চা তৈরির কারখানাতে ঐ ধরনের উদ্ভিদের সূক্ষ্ম আঁশের সংস্পর্শেও কিছু অ্যালার্জিজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হয়, যেমন হাঁপানী, মাথাধরা, পেটের গণ্ডগোল, চর্মরোগ, হাঁচি ইত্যাদি। ভারতের পূর্বাঞ্চলে পরাগরেণু এবং অ্যালার্জির উপসর্গ সংক্রান্ত কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেন অধ্যাপক সুনির্মল চন্দ। ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ, বি. আর. সিং হসপিটালের সহযোগিতায় বসু-বিজ্ঞানমন্দির নিম, কুমড়ো, পেঁপে, ধুতরোর পরাগরেণু থেকে কতকগুলি ভ্যাকসিন তৈরি করেছে যা রোগীকে অ্যালার্জির উপসর্গের হাত থেকে রক্ষা করবে।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন ১৯৯০]


শারদীয়া সংখ্যা
উদ্বোধন
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
আশ্বিন ১৩৯৭ ৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।… ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



আশ্বিন, ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি (ন্ধ) তরসে নমঃ॥

আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্টা অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে অর্থাৎ তেজে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণি, হে সংসার-ত্রাণকারিণি দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। **কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্ (২।২)**



কথাপ্রসঙ্গে

সত্যের অপিহিত মুখ

মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর উপাখ্যান পৌরাণিক উপাখ্যান। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, বামন-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ এবং দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতার দেহজাত তেজঃরাশি সম্মিলিত হইয়া মহিষাসুর-বিনাশের নিমিত্ত মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষ-মর্দিনীর আবির্ভাব সংঘটিত করিয়াছিল। তবে এই সুবিখ্যাত উপাখ্যানের সুপ্রসিদ্ধ আকরগ্রন্থ হইল 'চণ্ডী' যাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত তেরটি (৮১—৯৩) অধ্যায়। 'দেবীমাহাত্ম্য' এবং 'দুর্গাসপ্তসতী' নামেও চণ্ডী সুপরিচিত। চণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় দেখি মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলিতেছেন:

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥

—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর ছিলেন, তখন দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে পূর্ণ একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল।

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥

—সেই যুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ দেবসৈন্যকে পরাজিত করেন এবং সমস্ত দেবতাকে পরাজিত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করেন অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি হন।

কে এই মহিষাসুর? মহিষাসুরের জন্ম-সম্পর্কে পুরাণাদিতে যে কাহিনী রহিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মহিষীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। চণ্ডীতে মহিষাসুরের জন্মকথা নাই। বরাহ-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, বামন-পুরাণ এবং দেবীভাগবতে মহিষাসুরের যে জন্মবৃত্তান্ত রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ:

(১) আদি কল্পে সম্বৎসর নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্রের নাম সিন্ধুদ্বীপ। ঋষির বংশে জন্ম

হইলেও সিন্ধুদ্বীপ ছিলেন অসুর। সিন্ধুদ্বীপের কন্যার নাম মাহিষ্মতী। তিনি ছিলেন দৈত্য বিপ্রচিত্তির অগ্রজা। [চণ্ডীতে (১১।৪৩—৪৪) দেবীর মুখে বিপ্রচিত্তির-বংশীয় দানবগণকে বধ করার অঙ্গীকার রহিয়াছে।] মাহিষ্মতী একদিন অস্বর নামে এক ঋষির আশ্রমে সখীগণ-সহ ভ্রমণ করিতে যান। আশ্রমের রমণীয় পরিবেশ দেখিয়া তাঁহার তথায় বাস করিবার সুতীব্র লোভ হয়। তিনি মহিষীর রূপ ধারণ করিয়া ঋষিকে ভয় দেখাইতে উপস্থিত হইলে ঋষি ধ্যাননেত্রে মাহিষ্মতীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, 'পাপীয়সি! তুই যেমন মহিষীরূপ ধারণ করিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস, তেমনই আমার অভিশাপে শতবর্ষ পর্যন্ত মহিষীরূপেই অবস্থান করিবি।' অভিশাপ শুনিয়া মাহিষ্মতী আতঙ্কিত হইয়া ঋষির চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং শাপমুক্তির জন্য কাতর অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঋষির দয়া হইল। তিনি বলিলেন, মহিষীরূপে এক পুত্র প্রসবান্তর তাঁহার শাপমুক্তি ঘটিবে। মাহিষ্মতীর গর্ভেই মহিষাসুরের জন্ম হয়। (বরাহ-পুরাণ, ৯৫ অধ্যায়)

(২) রম্ভ নামে এক দৈত্য দীর্ঘকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে অপুত্রক রম্ভাসুর তাঁহার তিন জন্মে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্রসন্তান লাভের বর প্রার্থনা করেন। মহাদেব রম্ভাসুরের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। উপর্যুপরি তিন জন্মে (তিন কল্পে বা মন্বন্তরে) রম্ভাসুর রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতি জন্মেই মহিষীর গর্ভে তাঁহার পুত্ররূপে মহিষাসুরের জন্ম হয় এবং দেবগণের তেজসম্ভূতা হইয়া দেবী আদ্যাশক্তি যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী এবং দুর্গা রূপে প্রতি কল্পে মহিষাসুরকে বধ করেন। (কালিকা-পুরাণ, ৬০ অধ্যায়)

(৩) রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই প্রবল পরাক্রান্ত অপুত্রক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় পুত্রলাভের জন্য বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব হারাইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি তপস্যারত করম্ভকে হত্যা করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে রম্ভ ক্রোধ ও দুঃখে আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলে অগ্নি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং রম্ভের কঠোর তপশ্চর্যার জন্য বরদান করিতে চাহিলেন। তখন রম্ভ অগ্নিদেবকে বলিলেনঃ 'আমার যেন ত্রিলোকবিজয়ী এক পুত্র জন্মায় এবং শক্তি ও তেজস্বিতায় সে যেন দেবতাদেরও অতিক্রম করে।' অগ্নি বলিলেনঃ 'তথাস্তু'। অতঃপর রম্ভাসুর এক সুন্দরী মহিষীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। সেই মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। (বামন-পুরাণ, ১৭শ অধ্যায়) মহিষাসুরের জন্ম সম্পর্কে প্রায় একই কাহিনী দেবীভাগবতেও পাওয়া যায়। (৫ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়)

অতঃপর মহিষমর্দিনীর জন্ম-প্রসঙ্গ।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহিষাসুর অপ্রতিরোধ্য পরাক্রম ও শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। ক্রমে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইল। অতঃপর তিনি স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাদের পরাভূত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলেন। স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া মহিষাসুরের ক্ষমতাগর্ব গগনচুম্বী হইল। তাঁহার নির্যাতন ও অত্যাচারে বিতাড়িত দেবগণের নাভিশ্বাস উঠিল।

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ॥
(চণ্ডী, ২।৪)

—অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে যাইলেন।

মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে তাঁহারা যে দুর্দশা ও দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন শিব ও বিষ্ণুর নিকট তাহা বর্ণনা করিয়া দেবগণ প্রার্থনা জানাইলেন ঃ "শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্ম বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম" (চণ্ডী, ২।৮) —আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন আপনারা দেবশত্রু মহিষাসুরের বিনাশের উপায় বিশেষভাবে চিন্তা করুন।

দেবতাদের কাতরোক্তি এবং মহিষাসুরের

অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া দুই পরম-দেবতা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীতে (২।৯-১২) অপূর্বভাবে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে:

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছতঃ॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগম্বরম্॥

—[ব্রহ্মা প্রমুখ] দেবগণের মুখে এই প্রকার বাক্য-সকল শুনিয়া মধুসূদন এবং মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সেই ক্রোধে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল)।

অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নিঃসৃত হইল।

ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল।

সেই (সম্মিলিত সুবিপুল) দীপ্যমান্ তেজঃপুঞ্জকে সেখানে দিগন্তব্যাপী লেলিহান শিখাযুক্ত জ্বলন্ত পর্বতের মতো দেবতারা অবস্থিত দেখিলেন।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
(চণ্ডী, ২।১৩)

—সকল দেবতার শরীর-নির্গত ত্রিলোকব্যাপী সেই অতুলনীয় তেজরাশি সংহত হইয়া ক্রমে একটি নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হইল।

সেই নারীই দুর্গা। মহিষাসুরের নিধনার্থে তাঁহার আবির্ভাব হইল। দেবগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দুর্গাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর এক রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মহিষাসুর তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। বামন-পুরাণ (১৮ অধ্যায়), দেবী ভাগবত (৫।৮) এবং কালিকা-পুরাণে (৬০ অধ্যায়) মহিষমর্দিনীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি এইরূপই। তবে চণ্ডীর বর্ণনা কাব্যগুণ এবং ভাবগাম্ভীর্যে উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমরা চণ্ডীর বর্ণনাই উল্লেখ করিলাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মন্খম নামে এক প্রাচীন জাতির কাছে মহিষ অত্যন্ত পবিত্র পশুরূপে পরিগণিত হইত। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে দেবী ভির্গো (দুর্গা?) ইহাদের জয় করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর কোন সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা গবেষকগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

দেবীর এই আবির্ভাব কখন হইয়াছিল? পুরাণমতে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগের আদিতে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে তেজঃরূপে দেবী প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (কালিকা-পুরাণ, ৬০।৫৬, ৭৯) পরবর্তী শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উক্ত তেজঃপুঞ্জ হইতে দেবী দুর্গামূর্তি ধারণ করেন এবং নবমী তিথিতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। (কালিকাপুরাণ, ৬০।৮০-৮১)

বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এই কাহিনীকে অবাস্তব এবং কল্প-কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবে। বস্তুতঃ যেভাবে আমাদের পুরাণগুলিতে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ ঘটা আদৌ সম্ভব কিনা সেবিষয়ে যে-কেহই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। প্রশ্ন উঠুক ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাতে মহিষাসুর এবং মহিষাসুরমর্দিনীর জন্মকথা অলীক হইয়া যাইবে না। কারণ পুরাণ-কাহিনীগুলির প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ঐতিহাসিক সত্যতা অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে পুরাণকাহিনীগুলির মূল তাৎপর্য সেইখানেই। পুরাণগুলিতে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কালিকা-পুরাণে (৬০।৪০-৪৩) রাম কর্তৃক রাবণবধ প্রসঙ্গে কথিত বক্তব্যটি এখানে স্মরণীয়।

পুরা কল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা।
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ।
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ॥
এবং রামো সহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
ভাবিভব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে॥

—পূর্ব কল্পে যেমন ঘটিয়াছিল (দেবী কর্তৃক মহিষাসুর প্রভৃতি দানবগণকে নিধন), প্রতি-কল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (যেমন ত্রেতাযুগে আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে রামচন্দ্রের প্রার্থনায় দেবীর আবির্ভাব এবং নবমীতে তাঁহার আশীর্বাদে রাবণ-নিধন)। প্রতিকল্পেই দৈত্য-গণের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্তা হন এবং রাবণরূপী রাক্ষস ও রামও প্রতিকল্পে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতিকল্পে উভয়ের ঐরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্বের মতো দেবতাদিগের সঙ্গে রামচন্দ্রের মৈত্রী হয়।

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; অতীত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি।

উপরি-উক্ত পুরাণ-প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর সংগ্রাম এবং পরিশেষে মহিষাসুরমর্দিনী কর্তৃক মহিষাসুরের পরাভব প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর-স্থিত দেবতা ও দানবের—শুভশক্তি ও অশুভ-শক্তির সংগ্রাম এবং পরিশেষে শুভশক্তির নিকট অশুভশক্তির পরাজয়ের প্রতীক। পুরাণের সংগ্রাম-কাহিনীর বাস্তবতা লইয়া অবশ্যই বিচার চলিতে পারে, কিন্তু আমাদের অন্তর্জগতে যে নিরন্তর শুভ ও অশুভের সংঘর্ষ চলিতেছে এবং সেই সংঘর্ষে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হইতেছি তাহার বাস্তবতা আমরা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? এই সংগ্রাম যেমন অনাদি, তেমনই ইহা অনন্তও। এবং এই সংগ্রাম পুরাণ-কথিত সংগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর। যতদিন সৃষ্টি রহিবে ততদিন মানুষের মধ্যে এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

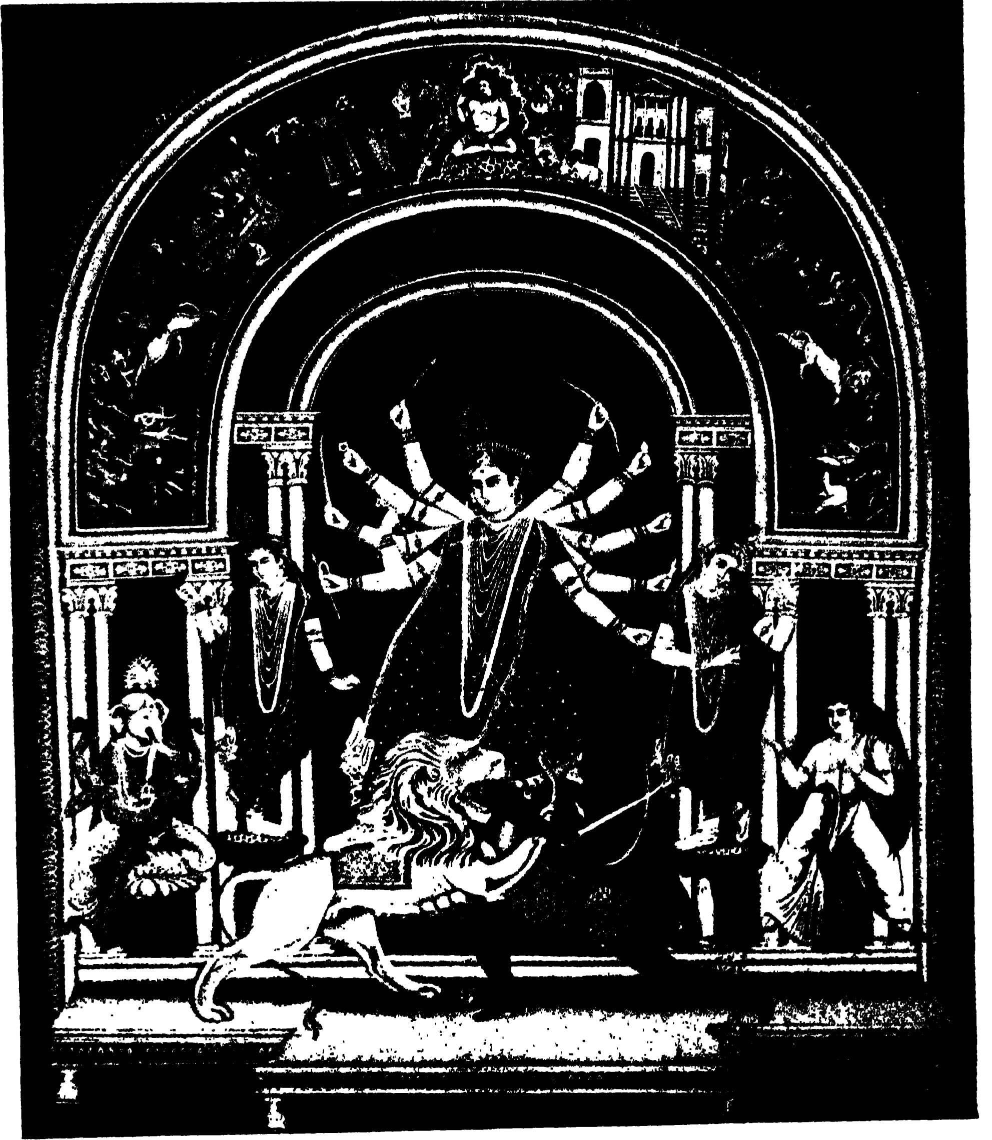
পুরাণ-প্রমাণ অনুসারে মহিষাসুরের জন্মের পশ্চাতে তাঁহার অসুর জনক-জননীর অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল ভোগলিপ্সা, ইন্দ্রিয়-পরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা। পক্ষান্তরে দেবতেজঃসম্ভূতা মহিষমর্দিনীর জন্মের পটভূমিতে ছিল সকল দেবতার জগৎ-কল্যাণেচ্ছা। সেই হেতু আমাদের পুরাণকারগণ আমাদের অন্তরস্থিত অশুভশক্তিকে পশুরূপে অর্থাৎ ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগসর্বস্ব, ক্ষমতালোলুপ মহিষাসুররূপে এবং শুভশক্তিকে সকল দেবগণের অঙ্গ-নিঃসৃত তেজঃ-পুঞ্জের সাকার প্রকাশরূপে অর্থাৎ নিখিল দেব-সত্তার সমষ্টিভূত বিগ্রহ দুর্গারূপে কল্পনা করি-য়াছেন। উভয় শক্তিই মানুষের মধ্যে নিহিত রহি-য়াছে। যখন অশুভশক্তি কর্তৃক শুভশক্তি নির্জিত হয় (যেমন মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গস্থ দেবগণ হইয়াছিলেন), তখন ব্যক্তিজীবনে, পরিবারজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনে ঘোর অধঃপতন নামিয়া আসে; যখন ইহার বিপরীতটি সংঘটিত হয় অর্থাৎ শুভশক্তি কর্তৃক অশুভশক্তির পরাভব হয় তখন সর্বত্র কল্যাণ ও মঙ্গল প্রবাহিত হয়।

এই সংগ্রাম অবশ্যই ক্লান্তিহীন; কিন্তু সংগ্রাম না থাকিলে যে জীবনও অর্থহীন হইয়া যায়। তবে যাহাতে সেই সংগ্রামে মানুষ হতোদ্যম না হইয়া পড়ে শুভের প্রকাশ ও প্রভাব সম্পর্কে আস্থা না হারাইয়া ফেলে তাই দেবী চণ্ডীতে (১১।৫৪-৫৫) নিজমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন:

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—এইভাবে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া দেবশত্রু বিনাশ করিব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গীতাতেও (৪।৭-৮) ভগবানের স্বকণ্ঠে অনুরূপ অঙ্গীকার আমরা শুনিয়াছি। কুরুক্ষেত্র আসলে মানবের হৃদয়রূপ চিরন্তন রণক্ষেত্র এবং কৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সমষ্টিভূত শুভশক্তির প্রতীক। চণ্ডী ও গীতায় যে ঐশী অঙ্গীকার উচ্চারিত তাহা বস্তুতঃপক্ষে একই মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠভূমিমাত্র। উভয়েই এক অব্যয় সত্যের নিত্য উচ্চারণ। অর্থাৎ পুরাণ-কাহিনীর অন্তরালে অপিহিত অর্থাৎ নিহিত এক পরম গভীর সত্যের মুখ।



কুমারটুলির জনৈক পটুয়া কর্তৃক অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র

সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী

কবিরাজ ৺কালীভূষণ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

ভগবানলাভের উপায়

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভক্তেরা প্রায়শই আমাদের প্রশ্ন করেন, জপ-ধ্যানে মন বসে না, কি করব? এই প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে ওঠে। তার উত্তরে আমরা বলি, মন এমন একটি যন্ত্র যে তাকে যেভাবে ব্যবহার করি সে সেইভাবেই কাজ করে। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে জপধ্যানের চেষ্টা আমরা কতক্ষণ করি আর কতক্ষণই বা অন্য কাজে ব্যয় করি এটা ভাবতে হবে। মন সর্বদা যে-বিষয়ে চিন্তা করে জপধ্যানে বসলেও সেই বিষয়েরই ফুট উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাই জপধ্যান করতে বসলে ভগবানের কথা মনে আসে না, মন তাঁতে স্থির হয় না।

কিন্তু এর প্রতিকার কি? প্রতিকারের একটি সোজা উপায় হচ্ছে মনকে আরো কিছু বেশি সময় ভগবৎচিন্তায় নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মন কিরকম জান? যেন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে যে রঙে ফেলে রাখবে সে সেই রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে। মনকে যদি বেশি সময় সাংসারিক চিন্তায় ফেলে রাখি ধ্যানজপের সময় সেই চিন্তাই চলবে। তাই উপায় হলো যত বেশি সম্ভব ঈশ্বর-চিন্তার অভ্যাস করা। ঠাকুর বলতেন যে, খানিকটা মন সবসময় তাঁর দিকে ফেলে রাখতে হয়। মনে যাতে স্থায়িভাবে ভগবানের চিন্তা চলতে থাকে তার চেষ্টা করতে হয়। আমাদের মনে হবে তাহলে সংসারের কাজ চলবে কি করে? ঠাকুর বলেছেন, "যদি চোদ্দ আনা মন ভগবানের কাছে রেখে দু-আনা দিয়ে সংসারের কাজ কর তো ভেসে যাবে।" কিন্তু আমরা তার ঠিক বিপরীতই করি। চোদ্দ আনা বা পনেরো আনা মন সংসারে ফেলে রাখি আর দুই-এক আনা দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে চাই। কোন মূল্যবান বস্তুই সুলভে পাওয়া যায় না আর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুকে অত সহজে কি পাওয়া যায়? সুতরাং তাঁর চিন্তা করতে হলে মনকে তাঁর দিকে সর্বক্ষণ না পারি, সবচেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে রাখতে হবে। তাতে সংসারের কাজ ব্যাহত হবে না, বরং আরো সুষ্ঠুভাবে হবে। তাঁর দিকে মন রাখলে মনে স্বার্থপরতা আসবে না। আর কাজ যখন নিঃস্বার্থভাবে করা যাবে তখন কাজটি যথোচিত হবে। এইজন্য দরকার একটি আগ্রহী মন যা ভগবানের চিন্তা করতে চাইবে, তার জন্য চেষ্টা করবে এবং বলা বাহুল্য, সেই চেষ্টার মধ্যে সংসারের কাজও চলতে থাকবে। এটি অভ্যাস করতে হয়। কোন একসময় জপ করতে বসলাম, কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম, ভাল লাগল না উঠে পড়লাম। এতে কাজ হবে না। আসল কথা, তাঁর নামে রুচি হওয়া দরকার। কিন্তু রুচি কেমন করে হবে?

অরুচিকরকে রুচিকর করতে গেলে মনকে সেদিকে চালনার চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে করতে ক্রমে রুচি আসে। একজন ঠাকুরকে বলছেন, সংসারী লোকের কি কোন গতি নেই? 'সংসারী' বলতে যারা বিবাহ করে গৃহস্থ হয়েছে কেবল তারাই নয়, যারাই সংসার নিয়ে লিপ্ত তাদের কথা বলছি। ঠাকুর বলছেন, উপায় থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। উপায় কি তাও বললেন—ঈশ্বরের নামগান করা, সাধুসঙ্গ করা, আর মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা। তাঁর নামগান করা মানে ধ্যান-জপ, পূজার্চনা করা, দেবস্থানে যাওয়া, দেবসেবার কাজ করা। সাধুসঙ্গ মানে যাঁরা ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁকে ভালবাসেন, তাঁদের সঙ্গ করা। আবার সঙ্গ করা মানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসে থাকা নয়, তাঁদের ভাব গ্রহণ করে, তাঁদের জীবনচর্যা অনুসরণ করা। না হলে সাধুসঙ্গ

হয় না। তৃতীয় উপায়, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। সংসারে বাস করে অন্য চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না। এইজন্য মাঝে মাঝে একটু নির্জন-বাস দরকার। আমরা অবকাশ পেলে হয়তো দার্জিলিং-এ যাই বা অন্য কোন দর্শনীয় জায়গা দেখতে যাই। আর যদি বা কখনো তীর্থে যাই তখন তীর্থের চিন্তা থাকে না, কোথায় ভাল জায়গায় থাকতে পারব, কোথায় ভাল জিনিস পাওয়া যাবে সেইসব চিন্তা নিয়েই সময়টা কেটে যায়। কাজেই তীর্থে গিয়েও ভগবানের চিন্তা হয় না। এইভাবে জীবনযাপন করলে ভগবানের দিকে যাবার প্রবৃত্তি বাড়বে না। এইজন্য ঠাকুর যা বলেছেন সেগুলি ভাবতে হবে।

প্রথমে যে বললেন, তাঁর নামগান মানে তাঁর চিন্তা, তাঁর পূজা—এগুলি ভক্তিলাভের উপায়। ঠাকুর একে বলেছেন বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে ক্রমশঃ তাঁর ওপর অনুরাগ আসে। ভাগবতে একটি শ্লোক আছে যে, "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্তি"—ভক্তির দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়। বৈধী ভক্তির দ্বারা রাগাত্মিকা ভক্তি—অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ আসে এবং তার ফলে শরীরে ভক্তির চিহ্ন—পুলক, রোমাঞ্চাদি প্রকাশ পায়। বৈধী ভক্তির দ্বারা তাঁর উপর ভালবাসা আসা, এটি যেন পুতুলখেলার মতো। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুলগুলির কেউ ছেলে হয়, কেউ মেয়ে হয়, নানা সম্বন্ধ। তাদের খাওয়ায়, পরায়, শোয়ায়, আবার পুতুল যদি ভেঙে যায় তাহলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। খেলতে খেলতে তাদের পুতুলের ওপর ভালবাসা আসে। আমাদের পূজা-অর্চনাও ভগবানকে নিয়ে পুতুলখেলা। তাঁকে জীবন্ত বলে আপনার বোধ তখনো হয়নি, কিন্তু এইভাবে চেষ্টা করতে করতে ক্রমশঃ সে-বোধ আসে। এইভাবে বৈধী ভক্তি থেকে রাগাত্মিকা ভক্তি আসে।

ঠাকুর বলেছেন, অনুরাগ এলে আর চিন্তা নেই। অনুরাগ বাঘ কামক্রোধাদি খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ অনুরাগের ফলে ভগবানের পথে যাওয়ার অন্তরায়গুলি অপসারিত হবে। আমরা বলি সংসারে প্রবল বাধা। প্রবল বাধা সংসারে নয়, মনে। মনে অনুরাগের সঞ্চার হলে কোন বাধাই আর প্রতিরোধ করতে পারে না। অনুরাগ নেই বলেই বাধা। ভাগবতে আছে, গোপীরা গৃহকাজে ব্যস্ত, এমন সময় অরণ্যের ভিতর থেকে বংশীধ্বনি শোনা গেল। ভগবানের আহ্বান অমোঘ। গোপীরা যে যা কাজ করছিলেন সব ফেলে রেখে চললেন। তাঁর আহ্বান এসেছে ঘরের কাজে আর মন নেই। কেন ? না, মনটা তাঁর দিকে চলে গিয়েছে।

এই অনুরাগ আসবে কি করে ? না, বিধি-পূর্বক তাঁর সেবা, শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে করতে অনুরাগ এলে তখন সংসারের কোন বাধা আর আটকাতে পারে না। যেমন গৃহকর্ম গোপীদের আটকাতে পারেনি। ভাগবতে আরও আছে, একজন গোপীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ভগবানের আহ্বান এসেছে, সে যেতে পারছে না। সে ভাবল, আমার যাবার পথে অন্তরায় কি ? এই দেহ। তখনই সে দেহত্যাগ করে ভগবানের কাছে চলে গেল। এমন আকর্ষণ যে শরীর পর্যন্ত তাকে বাধা দিতে পারল না। এরই নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ এক কথায় হয় না, তাঁর চিন্তা করতে করতে হয়। গানে আছেঃ

'এই হরিনাম নিতে নিতে
প্রেমের মুকুল ফুটবে চিতে।'

ভগবানের নাম, তাঁকে চিন্তা করতে করতে, জীবনটা সেইভাবে পরিচালিত করবার চেষ্টা করতে করতে অনুরাগ আসে। যখন অনুরাগ এল, ঠাকুর বলছেন, তখন অরুণোদয় হলো। পূবের আকাশ লাল হলে বোঝা যায় সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা এলে কোন প্রতিবন্ধকই আর ভক্তকে আটকাতে পারে না। আমরা যে সংসারের প্রতিবন্ধকের কথা বলি তার কারণ আমাদের অনুরাগ নেই। মাস্টারমশায় বলছেন, পরিবার যদি ভগবানের দিকে যাবার পথে বাধা হয় তাহলে কি করব ? ঠাকুর বললেন, তাকে বোঝাবে, বুঝিয়ে তোমার ভাবে ভাবিত করবার চেষ্টা করবে। মাস্টারমশায় বলছেন, যদি কিছুতেই না মানে তাহলে কি

করব? ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, তাহলে তাকে ত্যাগ করবে। মাস্টারমশায় স্তম্ভিত। একটা সহজ উপায় বলে দিলে হতো, কিন্তু এ যে একেবারে চরম উপায়। মাস্টারমশায় ভাবছেন, অতদূর কি করে যাব? একটু পরে আবার বললেন, দেখ, যে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তিনি তার সব অনুকূল করে দেন। মাস্টারমশায় লিখছেন, মাস্টারের চিন্তাগ্নিতে যেন জল পড়ল। তাহলে উপায় আছে। তাঁকে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি সব প্রতিকূলতা দূর করে দেন, বাধাবিঘ্নগুলি সব অনুকূলে হয়ে যায়। কাজেই আমরা যখন সংসারকে দোষারোপ করি তখন আত্মসমীক্ষা করি না, দেখি না যে দোষটা সংসারের নয়, নিজেদের। এসব কথা ভাবতে হয়, ভেবে নিজেকে তৈরি করতে হয়। জগৎটা তো বদলাবে না, যেমন আছে তেমনই থাকবে, দৃষ্টিকে বদলাতে হবে। ভগবানে অনুরাগ হলে দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। এই হলো উপায়। এই উপায় অবলম্বন করলে ভগবানের কৃপালাভ বা তাঁর সাক্ষাৎকার সবই হয়। তিনি আমাদের অন্তরকে দৈবী-সম্পদে ভরে দেন যে সম্পদের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। সবই ভিতরে আছে কিন্তু আমরা সেসব ভুলে অন্য কাজে ব্যস্ত, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই—ঠাকুরের ভাষায়, 'খপর' নেই।

উপনিষদের একটি কাহিনীতে আছে, অমূল্য সম্পদ মাটির নিচে পোঁতা আছে। একজন সেই মাটির ওপর দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু সে-সম্পদ তার কোন কাজে লাগে না। কারণ সেই ধন সম্বন্ধে সে জানে না। জানলে, অবহিত হলে তা তার কাজে লাগত। আমাদের ভিতরেও ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সংসারের দিকে মনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সব চাপা পড়ে গিয়েছে। ছড়িয়ে যাওয়া মনকে গুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন। সে-চেষ্টা করার নামই সাধনা। যে-মন সংসারে ছড়িয়ে আছে ক্রমশঃ তাকে টেনে এনে ভগবানে স্থির করার প্রয়াসই সাধনা। এ হঠাৎ হবে না। উপনিষদে আছে, ধীরে ধীরে মনকে বিষয় থেকে বিরত করতে হবে। হঠাৎ হবে না, ধৈর্য ধরে করতে হবে। এর দ্বারা মন ক্রমশঃ ভগবানের দিকে যাবে। আর সেই সঙ্গে সে-পথে যাবার প্রেরণাও আসবে। যাওয়ার উপায় সম্বন্ধে ধারণা হবে।

একদিন উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নবাগত এক ভক্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বলছেন, আমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। তিনি তাঁকে বললেন, বাপু, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে কর্মচারীরা বছরের পর বছর থেকেছে। অথচ তাদের জীবনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখা যায় না। সুতরাং তুমি আজ এসে সাধুসঙ্গ করে তার ফলটি পকেটে করে নিয়ে যাবে, এরকম করে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ মানে কেবল সাধুর কাছে থাকা বা তাঁর কাছে যাওয়া নয়। তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে তাঁর জীবনকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করা।

যাঁর কাছে গেলে ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ হয় তিনিই সাধু। তিনি যেভাবে ভাবিত তাঁর সংস্পর্শে যারা আসে তাদের ভিতরেও সেই ভাব সংক্রামিত হয়। সেইজন্য সাধুসঙ্গ ফলপ্রসূ। সাধুরা সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। তাঁদের দৃষ্টান্ত না থাকলে ভগবানের অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাসই হবে না। ভগবানকে আমরা দেখিনি, শুনিনি। পুঁথিতে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু পুঁথির ভেতরে প্রাণ নেই। সেই ভাব আমাদের কাজে লাগে না। সাধুর জীবনে ভগবানের ভাব সজীব, স্পষ্ট। এইজন্য ঠাকুর সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন।

তবে সেই প্রেরণা গ্রহণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা চাই। সাধুকে অনুসরণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধুসঙ্গ না করলে সাধুসঙ্গ ফলপ্রদ হয় না। সাধুর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে থেকে তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে যে-শিক্ষা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবার চেষ্টার নাম সাধুসঙ্গ। সাধুর মধ্যে ভগবৎ ভাবটি মূর্ত। তাই তাঁর সঙ্গ পেলে সেই ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়, মনে প্রেরণা জাগে এবং তাঁকে অনুসরণ করবার ইচ্ছা হয়। একটি শ্লোকে আছে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষ্ণুর

পরমপদকে আকাশে বিস্ফারিত চোখের মতো সর্বদা দেখেন। একথার তাৎপর্য হলো এইরকম—একটি-আধটি লোককে কখনো যদি দেখতে পাই তাহলে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাব, মনে বিশ্বাস হবে যে, নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। না হলে এই ব্যক্তিটির জীবন কেমন করে এইভাবে রূপায়িত হলো?

সাধু ভগবানকে নিয়ে আছেন তাতে আমার লাভ কি? আমার লাভ এই, তাঁকে দেখে আমার বিশ্বাস হবে যে, ভগবান আছেন, ভগবানকে ভাবলে আমার জীবনটা এঁর মতো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সাধু কি বলেন, কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ইত্যাদি দেখে সেই পথে চলার প্রেরণা ও নির্দেশ লাভ হয়। তাই সাধুসঙ্গ না হলে ভগবানে বিশ্বাস আসে না। বিশ্বাস আসা বড় কঠিন। যে-বস্তুকে কখনো দেখিনি, জানি না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবেই। কিন্তু কোন একজনের জীবনে তাঁর স্পষ্ট প্রকাশ যখন দেখি, ভগবানকে চিন্তা করলে জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় লক্ষ্য করি তখন মনে হয়, এই আদর্শ। যেমন বুদ্ধদেব জরা ব্যাধি মৃত্যু দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তারপর এর থেকে উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করছেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসীকে দেখে প্রভাবিত হলেন। এই তো! দুঃখময় সংসারের ভিতরে থেকেও মানুষ এমন আনন্দময় হতে পারে। তখন তিনি সেই পথ অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করলেন। সাধুসঙ্গের এই পরিণাম।

ঠাকুর তৃতীয় উপায় বলেছেন, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। তাঁকে ভুলে থাকতে থাকতে আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধ আমাদের অনুভূতি নেই। ঠাকুর যেমন বলেছেন, কোন কোন মাছ জালে পড়ে কাদায় মুখ গুঁজে ভাবে বেশ আছি। জানে না জেলে এক্ষুণি তাকে হিড়হিড় করে ডাঙায় টেনে তুলবে, আর তার প্রাণ যাবে। এই হলো বদ্ধ জীব। তাই নির্জনে গিয়ে আমাদের ভাবতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য কি? কিভাবে জীবন কাটাচ্ছি। মাঝে মাঝে সংসারের বাইরে না গেলে সংসারের নশ্বরত্ব অনুভব করার অবকাশ থাকে না। গীতায় ভগবান বলেছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥" (৯।৩৩)—এই জগৎ অনিত্য, দুঃখময়, এখানে এসে আমার ভজনা কর। আমাদের কি এই বোধ হয়েছে? প্রত্যহই দেখছি সব চলে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, কত লোক তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে দুঃখে হাহাকার করছে, আর আমি ভাবছি ওদের হয়েছে আমার হবে না। অনিত্য বোধ হচ্ছে না। সুখেও বোধ হচ্ছে না, দুঃখেও না। কাজেই নির্জনে গিয়ে জীবনের পাতাগুলিকে উল্টে উল্টে দেখে যদি তার অসারত্ব ভাবতে শিখি তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারব জগৎ অনিত্য। সুতরাং এতে মন ফেলে রেখে আমরা পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি। জগতের নশ্বরতা দুঃখময়ত্ব বোধ হলে জগৎ আমাদের মনকে আর আকৃষ্ট করতে পারবে না। এই নয় যে সকলেই সংসার ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু সংসারের প্রতি যে তীব্র আসক্তি ভগবানকে ভুলিয়ে রেখেছে এবং সংসারের ভয়াবহ রূপকে বুঝতে দিচ্ছে না—যেন গলিত শব ফুল দিয়ে ঢাকা রয়েছে—এটি বুঝলে তখন আর সংসারের প্রতি মনের টান আসবে না। তাহলে সংসার কি লোপ পেয়ে গেল? কোথায় লোপ পেল? সংসারের সারবস্তু যিনি তাঁর দিকে যখন মন যাবে তখনই আমাদের পথ হয়ে যায়। এইভাবে চেষ্টা করলে মন আর সংসারে ব্যাপৃত থাকতে পারবে না, তাঁর জন্য ছটফট করবে। এই তো ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা যখন আসবে তখন আর কেউ আমাদের সংসারের সুখভোগে আটকে রাখতে পারবে না, সেই হোমা পাখীর মতো আমরা চোঁচা তাঁর দিকে দৌড় দেব। তার আগে পর্যন্ত যাওয়াটা একটা পোশাকী চেষ্টা মাত্র, পোশাকী ধর্মে কাজ হবে না। ব্যাকুলতা এলে ঈশ্বরকেই সত্যবস্তু বলে মনে হয়। জাগতিক বিষয়কে তুচ্ছ বোধ করে ভগবানকে সারবস্তু বলে বোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হবে না, গৃহস্থেরও নয়, সন্ন্যাসীরও নয়।*

* গত ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৮ শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রবন্ধ

দেবীসূক্তে মহাশক্তির আত্মপরিচয়

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী" —প্রতি বৎসর শরৎকালে একটি মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে আমাদের এই বঙ্গদেশে। এই মহাপূজা বঙ্গবাসীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। সারা বছর ধরে আমরা যেন এই উৎসবের প্রতীক্ষায় ও আয়োজনে ব্যাপৃত থাকি। আমাদের এই জাতীয় উৎসবই হলো দুর্গোৎসব।

কিন্তু কে এই দুর্গা ? কী তাঁর পরিচয় ? অনেকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করে বলেন, অনেক দুঃখে-কষ্টে বহুবিধ সাধনায় যাঁকে লাভ করা যায় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই 'দুর্গা'— 'দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগসর্বকর্ম-উপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা।" এই দুর্গার দুর্গমত্ব বিঘোষিত হয়েছে এই বলে—"তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীম্।" কেউ বলেন তিনি দুর্জ্ঞেয়া, অগম্যস্বরূপা, তাই দুর্গা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁকে "দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা" (চণ্ডী, ৪।১১)—অর্থাৎ এই দুর্গম ভবসাগরের পারে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয়রূপ নৌকা, এইভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। নৌকা তো স্বয়ং পার করতে পারে না, তাকে চালাবার জন্য একজন মাঝির দরকার হয় যে সেই নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ নৌকার কোন মাঝির দরকার করে না, যার সঙ্গ বা সান্নিধ্যের ফলে নৌকা চলতে পারে। তার কারণ হলো এ "নৌঃ অসঙ্গা"—সঙ্গরহিতা, অদ্বিতীয়া, অন্য কিছুর সঙ্গেই তার সংসর্গ নেই, তার বাইরে দ্বিতীয় বলে অন্য কিছু নেই যার দ্বারা সে পরিচালিত হবে বা যার সঙ্গে সে সংযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত হবে। অদ্বিতীয়া এই দেবীর স্বরূপ তাই কে উদ্ঘাটন করবে ? কেমন করেই বা জানা যাবে "কা হি সা দেবী ?"—কে সেই দেবী ? একান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আটটি ঋকে বা মন্ত্রে স্বয়ং তিনিই আত্ম-পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন যেটি 'বাক্‌সূক্ত' বা 'দেবীসূক্ত' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেদের মন্ত্রমালা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক। দেবতা যখন দৃষ্টির বাইরে, তখন পরোক্ষভাবে প্রথম পুরুষে সে বা তিনি বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন "স জনাস ইন্দ্রঃ", হে জনগণ, তিনিই হলেন ইন্দ্র। আবার এইভাবে পরোক্ষভাবে তাঁর স্তুতি করতে করতে কখনো বা সেই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে যেন সামনে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে মধ্যম পুরুষে তুমি বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন "ত্বম্ অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি"—হে অগ্নি, তুমি আমাদের মঙ্গল করবে। আবার বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে—এরকম সূক্ত বা ঋকের সংখ্যা খুবই কম—উপাস্য দেবতা উপাসকের সঙ্গে এক বা অভিন্ন হয়ে উত্তম পুরুষে আমি-রূপে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাই এই-জাতীয় সূক্তের নাম 'আধ্যাত্মিক' অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য বা সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করে সেখানে সবকিছু বলা হয়েছে। বক্তব্যের বিষয় সেখানে বাইরের কোন বস্তু নয়, নিজের থেকে পৃথক কিছু নয়, এখানে নিজেরই কথা নিজেই বলা। তাই আমিরূপেই আত্মপরিচয়দান এই সূক্তগুলির বৈশিষ্ট্য।

দেবীসূক্ত এইজাতীয় বিরল আধ্যাত্মিক সূক্তেরই একটি। এখানে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা

বাক্, পিতৃপরিচয়ে যিনি 'বাগ্ আম্ভৃণী', আপন পরম স্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্য বা অভিন্নতা অনুভব করে একদিন এই আত্ম-বিঘোষণ করেছিলেন। অহং-এর ঝঙ্কারে মুখরিত এই আটটি মন্ত্রের আশ্চর্য দেবীসূক্তটি তাই বাকেরই আত্মপরিচয়দানে ব্যাপৃত। 'দেবী' শব্দের মূল অর্থও যিনি দ্যোতমানা, প্রকাশমানা। কারণ দেব শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" সুতরাং দেবতার মর্মগত কর্ম হলো দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ উদ্ভাসন বা জ্যোতিঃ বিকিরণ, আলোকের প্রসারণ। এই জ্যোতিঃ বা আলো বাক্‌রূপ জ্ঞানেরই আলো, যার অভাবে সমস্ত জগৎই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে তাই যথার্থই বলেছেনঃ

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

—এই সমগ্র ত্রিভুবনই অন্ধ তমসায় ডুবে যেত, যদি শব্দ নামক এই জ্যোতিঃ বা প্রকাশ সমগ্র সংসার জুড়ে দীপ্যমান না থাকত।

সৃষ্টিক্রমের বর্ণনাতেও আমরা লক্ষ্য করি যে, আত্মা থেকে সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয় আকাশ—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" এই আকাশের স্বরূপ দৃষ্টও হয় না, স্পৃষ্টও হয় না অর্থাৎ আকাশকে দেখাও যায় না, ছোঁওয়াও যায় না। তাহলে আকাশ যে আছে তার প্রমাণ কী? শব্দই তার প্রমাণ—"শব্দগুণকম্ আকাশম্।" বায়ুকে যেমন চোখে দেখা না গেলেও আমরা তাকে স্পর্শের দ্বারা চিনি বা জানি, তেমনি আকাশকে স্পর্শ না করা গেলেও শব্দের মাধ্যমেই আমরা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে থাকি। এই শব্দই তাই আদিম স্পন্দন, মূল শক্তি।

শব্দ বা বাক্ তাই শক্তিরই অপর নাম। বৈদিক ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে তাই প্রতিভাত হয়েছিল যে, সমস্ত সৃষ্টিরই উদ্ভব শব্দ থেকে। সৃষ্টি তাই শব্দপ্রভব বা শব্দমূলক অর্থাৎ স্পন্দনাত্মক বা শক্ত্যাত্মক। সেই বাক্‌রূপিণী মহাশক্তিই এখানে আত্মপরিচয় দিচ্ছেনঃ "অহমেব স্বয়মিদং বদামি"—আমি নিজেই এই কথা বলছি বা জানাচ্ছি। এই আত্মবিঘোষণে আমরা প্রথম মন্ত্রেই লক্ষ্য করি যে, সমস্ত দেবতা এই মহা-শক্তিতেই বিধৃত ও তাঁর দ্বারাই পরিচালিত। বেদে দেবতাদের তিনভাবে লাভ করা যায়ঃ গণভাবে, যুগ্মভাবে এবং এককভাবে। রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ—এঁরা গণদেবতা, দলবদ্ধ হয়ে যেন বিচরণ করেন। একাদশ, দ্বাদশ, ঊনপঞ্চাশৎ—এমনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংখ্যার যেন এক একটি গণ বা গোষ্ঠী বা দল। এমনিভাবে অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতি হলেন এক এক গোষ্ঠীবদ্ধ গণদেবতা। আবার কোন কোন দেবতার পরস্পর সখ্য বা সম্বন্ধ এত গভীর যে তাঁরা একে অন্যকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারেন না। এইরকম যুগ্ম মধ্যে মিত্রাবরুণ ও অশ্বিদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়া একক দেবতা যে কত আছেন তার তো সংখ্যাই নেই। অগ্নি, ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি বড় ছোট কত দেবতাই রয়েছেন এই বৈদিক দেবশালায়!

দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্রে বাক্‌রূপিণী মহাশক্তি এইভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছেনঃ

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত
বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী
অহমশ্বিনোভা॥ ১

দেবী বাক্ এই প্রথম মন্ত্রটিতেই জানিয়ে দিলেন যে গণদেবতাই বল, যুগ্মদেবতাই বল আর একক দেবতাই বল, এই সমস্ত দেবতার মধ্য দিয়ে আমিই বিচরণ করছি—'চরামি', আমিই তাদের ধারণ করে আছি—'বিভর্মি'। এই বিচরণ ও বিধারণ দুইটিই তাঁর কর্ম। বিচরণ করা আর ধারণ করা, এই দুটি ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, দেবতাদের গতি এবং স্থিতি উভয়ই এই মহাশক্তির উপর নির্ভর-

শীল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও তাই তাঁকে 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্তি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, নিঃশেষে সমস্ত দেবতাদের শক্তি সমূহিত বা একত্রিত হয়ে এই দেবীমূর্তিটি নির্মাণ করেছে। বরং দেবীর আত্মশক্তিরই বিচ্ছুরণ এই বিবিধ দেবগণ। অসুরপীড়নে বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন, পৃথক পৃথক দেবগণ সংঘবদ্ধভাবে অসুরকে পরাভূত করবেন বলে আজ একত্র হয়ে তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছেন। শুম্ভও বিভ্রান্ত হয়েছে, দেবীকে সে স্বরূপে চিনতে পারেনি। তাই সে ভেবেছে, সমস্ত দেবতার বল বা শক্তিকে আশ্রয় করে এই দেবী এত শক্তি-অভিমানিনী হয়ে উঠেছেন, নিজস্ব কোন শক্তি তাঁর নেই। তাঁর যে শক্তি, সবই হলো ধার করা, অপরের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি। তাই শুম্ভ তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি করেছে এবং তারই উত্তরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে সেই অতুলনীয় অপরূপ আত্ম-উদ্‌ঘোষণ :

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'
(চণ্ডী, ১০।৫)

এই মহাশক্তি তাই একা এবং অদ্বিতীয়া, তাঁর থেকে অপর বা পৃথক কিছুই নেই। দেবগণ যে তাঁরই বিভূতি, তাঁরই বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র, তা তিনি প্রত্যক্ষই দেখিয়ে দিলেন, যখন নিজের মধ্যে নিখিল দেববৃন্দকে তিনি প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করলেন। দেবতারা তাঁরই বক্ষঃস্থলে গিয়ে আশ্রয় লাভ করলেন। এই মহাশক্তির হৃৎকেন্দ্র থেকেই যে দেবতাদের উদ্ভব, তাঁরই প্রাণদায়িনী স্তন্যরসে যে তাঁরা সঞ্জীবিত, লালিত, পালিত ও পরিপুষ্ট, তা তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে দিলেন। হিন্দুর সমস্ত অধ্যাত্মসাধনায় এই অদ্বৈতভাবনাতেই যে সবকিছুর প্রতিষ্ঠা তা বারংবার এভাবে দেখানো হয়েছে :

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত
পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

—সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি দেবতাদের যে তিনি ধারণ করেন তা প্রথম মন্ত্রের আলোচনাকালেই বলা হয়েছে। চৈতন্যময়ী এই মহাশক্তি শুধু যে যজনীয় দেবগণের ধারয়িত্রী ও কারয়িত্রী তাই নন, একদিকে তিনি যেমন দেবগণকে ধারণ করছেন ও তাঁদের কর্মে নিযুক্ত রাখছেন, তেমনি অপর দিকে যজমান, যে যজন করছে, দেবতাদের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উত্তম হবিঃ দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করছে, তাকেও যজ্ঞফলরূপ ধনসম্পদ বা 'দ্রবিণ' দান করে তিনিই যজ্ঞসম্পাদনে সামর্থ্য যোগাচ্ছেন। দেবীসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে তাই তিনি ঘোষণা করলেন :

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

ধনসম্পদের তিনিই মূল উৎস—'সংগমনী বসূনাম্', যেন মহাসম্রাজ্ঞী, সাক্ষাৎ রাষ্ট্রস্বরূপিণী—'রাষ্ট্রী'। আবার তিনিই 'চিকিতুষী প্রথমা'—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময়ী। বিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে অদ্বৈতভাবনা তা তাঁরই স্বভাবভূতা। বিত্ত ও বিদ্যা, সম্পদ ও জ্ঞান, এই উভয়েরই মূলে তিনি। যজ্ঞার্হগণের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা। দেবতারা তাই যেন 'পুরুত্রা ব্যদধুঃ'—বহুস্থানে স্থাপন করলেন তাঁকে, যিনি স্বভাবতই 'ভূরিস্থাত্রা'—প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিত, আবার 'ভূর্যাবেশয়ন্তী'—ভূরি ভূরি রূপে, প্রচুরভাবে নিখিল জগতে আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

প্রবিষ্ট তিনি প্রতি জীবেই, শুধু জগতে নন। বৈশ্বানররূপে সমস্ত অন্নের, সবকিছু ভোগ্যের তিনিই অত্তা, অদনকর্তা, ভোক্তা। বেদান্তসূত্রেও তাই তাঁর এই রূপের পরিচয়

দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'। মানুষ যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে কার দ্বারা? 'ময়া', আমিই ভোজনশক্তি বা পরিপাকশক্তিরূপে তার মধ্যে আছি বলেই তার পক্ষে অন্নভক্ষণ সম্ভব হয়। তেমনি তার দেখা, শোনা অর্থাৎ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ক্রিয়া এই চৈতন্যশক্তি আছেন বলেই সম্ভব হয়। 'বিপশ্যতি', 'শৃণোতি', 'প্রাণিতি'—দেখে, শোনে, প্রাণধারণ করে, সবই 'ময়া'—আমারই দৌলতে, আমারই শক্তিতে। অথচ হায়! 'অমন্তবঃ মাম্'—তারা আমাকে জানে না, মানে না, যদিও তারা আমাতেই বাস করে। 'ত উপক্ষিয়ন্তি'—আমারই আশ্রয়ে থাকে। আবার আর এক অর্থও করা যায়। তাঁকে না জানার ফলে, তাঁকে অবজ্ঞা করার ফলে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়ে যায়। 'ক্ষি' ধাতুটির অর্থ নিবাস বোঝায়, ক্ষয় অর্থও বোঝায়। যে-অর্থই গ্রহণ করি না কেন, তাৎপর্য দাঁড়ায় একইঃ আমাদের নিবাস বা আশ্রয় তিনিই অথচ আমরা তা জানি না। আবার তাঁকে না জানা-ই আমাদের ক্ষয়ের বা বিনাশের কারণ। তাই যেন আত্ম-পরিচয় দিতে মা ব্যগ্র হয়েছেন। বলছেনঃ 'শ্রুধি,' শোন, তুমি তো 'শ্রুত,' তুমি তো কীর্তিমান, শ্রদ্ধাবান, তুমি তো আমাকে মান, তাই তোমাকে বলছি।

> অহমেব স্বয়মিদং বদামি
> জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
> যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
> তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

—দেবতাগণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত ও প্রার্থিত এই তত্ত্ব আমি স্বয়ং তোমাকে বলছি, "অহমেব স্বয়মিদং বদামি।" আমাকে না মানলে যেমন ক্ষয়, আবার আমারই ইচ্ছার প্রসাদে সকলের অভ্যুদয়। আমি যাকে চাই—"যং কাময়ে" তাকে "উগ্রং কৃণোমি"—বড় করে তুলে ধরি, কাউকে করি ব্রহ্মা, কাউকে করি ঋষি, কাউকে করি মনীষী, যিনি সুমেধামণ্ডিত- "তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।" সমস্ত কিছুই তাই নির্ভর করছে তাঁর ইচ্ছার উপরে। সেই ইচ্ছার অঙ্গুলিহেলনে কেউ খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হন, কেউ বা পলকের মধ্যে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হন। সুতরাং তিনি যেমন 'চিকিতুষী' বা জ্ঞানময়ী, তেমনি 'কাময়ে' অর্থাৎ কামনাময়ী বা ইচ্ছাময়ী।

> অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
> ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
> অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
> দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

শুধু ইচ্ছা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন না, সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি ক্রিয়াশক্তি-রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। "ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা"—ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী হিংস্রপ্রকৃতি অসুরকে বিনাশ করতে তিনি রুদ্রের ধনুকে আতত (আরোপ) করেন—"রুদ্রায় ধনুরাতনোমি।" তাঁর ইচ্ছাকে যারা প্রতিহত করতে চায় সেইসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের জন্য তিনিই দশপ্রহরণ-ধারিণী হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণা হন। নইলে রুদ্রের ধনুতে এত শক্তি যোগায় কে? মানুষই বা জীবন-সংগ্রামে কার শক্তিতে নিরন্তর যুঝে চলেছে এবং অবশেষে জয়ীও হচ্ছে? আসলে সন্তানের হয়ে তিনিই লড়ছেন—"অহং জনায় সমদং কৃণোমি।" স্বয়ং রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনিই সংগ্রাম করে চলেছেন এবং সর্বদা আশ্বাস ও ভরসাও দিয়ে রেখেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপসংহারে যে, যখনই প্রতিকূল শক্তি বা দানবের থেকে বাধা আসতে থাকবে তখনই তিনি অবতীর্ণা হয়ে অরি সংক্ষয় করবেন, শত্রু বিনাশ করবেনঃ

> ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥
> (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)

সুতরাং জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপে যেমন এই দেবীসূক্তে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তেমনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যাপিনীশক্তিরূপে দ্যুলোকে-ভূলোকে, স্বর্গে-মর্ত্যে তিনি আবিষ্ট বা অনুস্যূত হয়ে আছেন—

'দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ'। শক্তির এই আবেশ বা অনুপ্রবেশই সৃষ্টির পরম রহস্য। অন্য সমস্ত মনুষ্যকৃত সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট বস্তু পরস্পর পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে স্থির অনড়রূপে বিরাজ করে। কবির রচিত কাব্য, শিল্পীর আঁকা ছবি বা সুর-সাধকের মধুর সঙ্গীত সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়, জন্ম লাভ করেই যেন মৃত্যুবরণ করে। তা আর বিকশিত হতে পারে না, আরও ফুটে উঠতে পারে না, কারণ স্রষ্টার যে প্রাণ-স্পন্দন, তা তিনি এইসব সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্যশক্তির এইখানেই চমৎকারিতা, এইখানেই তাঁর অনন্য মহিমা যে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশের ফলে তা নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ঋগ্বেদের ভাষায় দেবতার এই কাব্য তাই "ন মমার ন জীর্যতি," না মরে, না জীর্ণ বা পুরাতন হয়, সহস্রদল পদ্মের মতো পর্বের পর পর্বে নিজেকে সে উন্মোচিত করেই চলতে থাকে। তার কারণ ঐ "আবিবেশ হ"— চৈতন্যশক্তির আবেশ।

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥"৭

এই শক্তি প্রথমা, আদিতমা, সকলের পূর্বভাবিনী কৌমারী মহাশক্তি যিনি কিনা পিতাকেও প্রসব করেন, জন্ম দেন সৃষ্টির সূচনায়, সেই সৃষ্টির মাথার উপরে তাঁকে বসিয়ে দেন, "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্।" যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা পিতা ব্রহ্মা বলে জানি, তিনিও এই শক্তিরই সন্তান, সেই শক্তি থেকেই প্রসূত বা সৃষ্ট। কিন্তু সেই শক্তির সৃষ্টি কোথা থেকে? তাঁর উদ্ভবস্থান কোথায়? তারও সংকেত দিচ্ছেন: "মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।" আমার যোনি বা উদ্ভবস্থানের যদি সন্ধান করতে চাও, তবে ডুব দিতে হবে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে, সেই অতলান্ত চৈতন্যসাগরে। উপনিষদের ভাষায় "সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ"—সমুদ্রই এঁর বন্ধু বা বন্ধনস্থান, সমুদ্রই এঁর যোনি বা উদ্ভবস্থান। সেই চৈতন্য-সাগর থেকে উদ্ভূত হয়ে এই শক্তির তরঙ্গ যেন বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ বিশেষ ভাবে অবস্থান করতে লাগল, "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা।" আবার বিশ্বভুবনকে, এই ভূলোককে ছাপিয়ে গগনচুম্বী এই শক্তিতরঙ্গ আপন আকৃতি বা দেহ দিয়ে যেন ঐ সুদূর দ্যুলোক-কেও গিয়ে স্পর্শ করল, "উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।" কী অসীম এই শক্তির বিস্তৃতি, ব্যাপিনী রূপের কী অপরিমেয় মহিমা!

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা
ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী
মহিম্না সংবভূব॥" ৮

এই ব্যাপিনী রূপ তাঁকে ধারণ করতে হয় সৃষ্টির সূচনাতেই, বায়ুর মতো তখন তিনি যেন সূক্ষ্মভাবে বয়ে যান, বিশ্বচরাচরে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। তাই এখানে বলছেন: "অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।" সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত বিশ্বভুবনে তিনি প্রাণরূপে সঞ্চরমাণা। এইটিই আদিম স্পন্দন যাকে ঋগ্বেদের গহনতম নাসদীয় সূক্তে 'আনীদবাতম্,' এইভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখনো তো বায়ু সৃষ্টি হয়নি, তাহলে তিনি স্পন্দিত হলেন কিভাবে? 'অবাতম্' অর্থাৎ বায়ুহীন এই প্রাণস্পন্দন আপনাতেই আপনি স্থিত সেই একের মধ্য থেকে যেন ফুটে উঠল, "স্বধয়া তদেকম্।" এখানেও "বাত ইব," বায়ুর মতো বলে সেই 'অবাতম্' বায়ুহীনের অনন, প্রাণন বা স্পন্দনেরই সংকেত দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির জন্যই সেই পরমা শক্তির এই বায়ুর মতো প্রবহমানতা, তাঁর এই স্পন্দিত, ছন্দিত

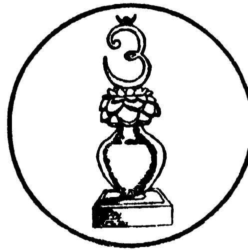
রূপ ধারণ। স্বরূপতঃ তিনি কিন্তু এই দ্যুলোক-ভূলোক ছাপিয়ে, সবকিছুকে অতিক্রম করে, সকলের 'পর' বা শ্রেষ্ঠ, সবকিছু থেকে পৃথক বিলক্ষণরূপে বিরাজ করছেন, "পরো দিবা পর এনা পৃথিবী।" এইটিই তাঁর উন্মনী রূপ, সর্বাতিশায়ী পরম রূপ, যার কোন পার বা অন্ত পাওয়া যায় না। আর 'এতাবতী', আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রসারিত এই যে বিশাল ব্যাপক সৃষ্টি, এ তিনি আপন 'মহিমা সংবভূব', আপন মহিমা দ্বারা হয়েছেন বা প্রকাশ করেছেন।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও সেই পরম পুরুষের প্রসঙ্গে ঠিক একই ভাবে বলা হয়েছেঃ "এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ," এই পর্যন্ত বা এতখানি তাঁর মহিমা, এর চেয়েও 'জ্যায়ান্' বা শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষ। সৃষ্টির মধ্যেই তিনি নিঃশেষ হয়ে যাননি, সৃষ্টি তাঁর সামান্য মহিমা বা ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র, সেই মহিমার ঊর্ধ্বে তাঁর অনন্ত অপরিসীম শুদ্ধ স্বরূপ। যতই ব্যাপক বা বিস্তৃত হোক, এই মহিমা সর্বত্রই 'এতাবতী' বা 'এতাবান্', এই পর্যন্ত অর্থাৎ তা সীমাবদ্ধ। সৃষ্টি সেই অসীম অনন্তের যেন "একাংশেন স্থিতঃ", এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর স্বরূপতঃ তিনি সবকিছুর 'পর' বা 'পার', 'জ্যায়ান্'।

দেবীসূক্তে তাই আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে এই বাক্‌রূপিণী মহাশক্তি সমগ্ররূপেই নিজেকে উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর সমস্ত বিভাব বা বিভূতিই তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং সবশেষে উপসংহার টেনে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সর্বাতিক্রান্তা, অনন্তা, অপরিমেয়া। দার্শনিক পরিভাষায় একটি তাঁর সর্বানুগ (Immanent) রূপ, অপরটি সর্বাতিগ রূপ (Transcendent)। এই উভয় রূপে তাঁকে চিনলে বা জানলেই "অসংশয়ং সমগ্রং মাম্"-কে চেনা বা জানা হয়।

দুর্গাপূজা বা শক্তি-উপাসনা হলো এই পরমা শক্তিকে আপন আত্মস্বরূপের মধ্যে উপলব্ধিরই প্রয়াস। সেই উপলব্ধি জাগলে পূজার উপকরণ কোশা-কুশি, ফুল-চন্দন, ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য এবং পূজার কর্তা যজমান বা পূজক স্বয়ং তথা পূজার যিনি কর্ম বা বিষয় অর্থাৎ আরাধ্যা দেবী, সবই একই চৈতন্যশক্তির প্রকাশ-রূপে অনুভূত হয়। এই অদ্বয় অনুভূতিতেই সব পূজা-অর্চনার পর্যবসান।

বর্তমান যুগে ভবতারিণীরূপে স্বয়ং মহাশক্তির অদ্বয় ভাবনায় সেই পূজার অনুষ্ঠান করে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের কাছে পূজার এই পরম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। সেই দিব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি শক্তি-পূজায় ব্রতী হতে পারি, তাহলেই আমাদের দুর্গোৎসব সার্থক হয়ে উঠবে।



বিশেষ রচনা

রাত্রিসূক্ত ঃ ঋষির অনুভূতি

প্রগতি রায়

শক্তি-আরাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু পুরনো ধারণা। এপর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন যে সভ্যতার নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে সেই সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শাক্তবাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়। নানা আকৃতি এবং ভঙ্গিমায় দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেখানে। তারই প্রভাবস্বরূপ হয়তো পরবর্তী কালে বৈদিকযুগে পুরুষশক্তির প্রবল প্রাধান্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে নারীশক্তি তথা দেবীপূজার উত্থান ঘটেছে।

ঋগ্বেদ মূলতঃ পুরুষ-দেবতাদের শক্তির জয়গানে সমৃদ্ধ। সেখানে ইন্দ্রের শৌর্য, অতুল বিক্রমে রাক্ষসনিধন কিংবা বরুণের ঐশীশক্তি অথবা অগ্নি ও সূর্যের অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ-শক্তির বন্দনা গীত হয়েছে। সেখানে ঊষা কিংবা সরস্বতীর মতো স্ত্রীদেবতার শুধুই সৌন্দর্য কিংবা কর্মকুশলতার গুণগান; নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিশেষ উল্লেখ সেখানে নেই।

এসবই হলো বৈদিকযুগের প্রথম দিকের কথা। তারপর সভ্যতা যত এগিয়েছে তত বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। ঘটেছে আর্য-পূর্ববর্তী সংস্কৃতির মিশ্রণ। হয়তো সেজন্যই দেখতে পাই ঋগ্বেদের একেবারে শেষতম যে দশম মণ্ডল—তাতে রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তের উপস্থিতি। এই দুটি সূক্তেই স্ত্রীদেবতার ঐশী শক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। দেবীসূক্তের ঋষি যিনি নিজে একজন নারী, স্বয়ং নিজেকে দেবীরূপে ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে রাত্রিসূক্তে ঋষি কুশিক রাত্রিদেবীকে নানা স্তুতির মাধ্যমে প্রথমে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। পরে অন্ধকার রাত্রির প্রবল মহিমা ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখানে সায়ণভাষ্য অনুসারে ঋষি কুশিকের একান্ত অনুভূতিকেই কবিতার আকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা

১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক ঃ ১২৭ সূক্ত

রাত্রিসূক্ত

রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

রাত্রীব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥

—রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন।

শর্বরী—
নিশা জাগ্রত,
সোনালী সূর্যের পর
বর্ণহীন এক অভিব্যক্তি।
সৌন্দর্যে মহান নক্ষত্রপুঞ্জে চোখ রেখে
খুঁজে বেড়িয়েছেন আপনি
অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির কল্যাণ।
আপনাকে পথ দেখিয়েছে তারা—
সমৃদ্ধ করেছে।
সমৃদ্ধা রাত্রি সর্বাঙ্গসুন্দরী—
কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, মঙ্গলকারিণী।
কুশিক ঋষির বর্ণনায়, গায়ত্রী ছন্দে
সুর তাল লয় নিয়ে
রাত্রি এসেছেন।
আমি কুশিক, হে রাত্রি!
আপনার নির্মুক্ত শোভা দেখে
হয়েছি বিমুগ্ধ। ধন্য ॥ ১ ॥

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥

—দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন, যাঁরা নিচে থাকেন, অথবা যাঁরা ঊর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে বিনাশ করেছেন।

বিস্তীর্ণা রাত্রি।
গভীর প্রবন্ধে বিস্তার্যমান।

বিস্তৃত অন্তরীক্ষ তমসাচ্ছন্ন তাতে—
আরও, আরও বিস্তারে।
তমসার সুমহান তেজে বন্দিত
গুল্মলতা। ধরিত্রীর অর্ঘ্য। বনস্পতি।
তাদের শীর্ষ বেয়ে
রাত্রি নেমেছেন যখন
ঠিক তখনই
নক্ষত্রের আলোয়
দিগন্ত উদ্ভাসিত হলো।
পথ চিনে নিলেন রাত্রি—
সোভরি-পুত্র কুশিকের আরাধনায় ॥ ২ ॥

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥

—রাত্রিদেবী এসে ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন।

মায়াজালে আচ্ছন্ন
দিগন্ত পরিব্যাপিনী নিশা—
স্নিগ্ধ তাঁর তমসার আবরণ সরিয়ে—
সলজ্জ ঊষার
কম্পিত পদক্ষেপ,
শঙ্কায় ধীর।
কুশিক ঋষির গায়ত্রী ছন্দে
তাঁর প্রকাশ।
সহোদরার লজ্জা ভেঙে
রাত্রি যখন
মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে—
শপথ করেছিলেন প্রকাশের,
তখন—
যৌবনবতী ঊষা অঙ্গীকারাবদ্ধ—
সহোদরা রাত্রিকে মুক্ত করেন
জগতের কল্যাণে।
অজ্ঞানের তমসা
হোক বিদূরিত ॥৩॥

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্ন্যবিক্ষ্মহি
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥

—পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে সুখে বাস করে, সেরূপ যাঁর আগমনে আমরা সুখে শয়ন করেছি, সে-রাত্রি আমাদের পক্ষে শুভকরী হোন।

রাত্রি এসেছেন—
কল্যাণময়ী।
তোমরা, যারা কৃপাপ্রার্থী
তাদের জন্য করুণা করেন। রাত্রি এসেছেন।
এসেছেন রাত্রি—
জননী ! বিভাবরী !
মঙ্গল করুন জগৎ সংসারের।
সর্বভূতের। সকল প্রাণীর।
সুখের হোক
এ ঘোর নিশা।
মধুময় হোক
নিশার স্বপন।
নীড়ের পাখি
নিশ্চিত আশ্রয়ে
ঘুমিয়ে থাকে আপনার কোলে।
আমরা সূর্যের সন্তান,
এসেছি আপনার শরণ নিতে।
মঙ্গল আসুক
আমাদের জীবনে।
সমৃদ্ধি, সুখ আর শান্তিতে
ভরুক তা ॥ ৪ ॥

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥

—গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে। পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছেন ॥

অব্যক্তা জননী।
অনুভবে অধরা—
তবু, প্রতিদিন অনুভবে পাই আপনাকে।
হে ক্ষপা, বিবশা—
স্থাবর জঙ্গমের আশ্রয়দায়িনী রাত্রি—
আপনার নিশ্চিত আগমনে
স্বস্তি হোক সকলের।
স্বস্তি হোক পথচারীর।
পাখি ও গৃহস্থের।

স্বস্তি হোক গ্রামের,
ব্যস্ততাভরা শ্যেনপাখির
আর সন্তানের ;
শান্ত স্নিগ্ধ হয়েছে তারা
আপনার আগমনে।
মুছে গেছে তাদের প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা।
অবসান হোক শ্রান্তির।
ক্লান্তির।
দূর গগনে ছেয়ে যাক তমসার আবরণ।
সোভরি-পুত্র আমি—
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরি। এ দান আপনার ॥৫॥

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥৬॥

—হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যান, চোরকে দূরে নিয়ে যান। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টভাবে শুভকরী হোন॥

বিশ্রান্ত শয়ানে নিশ্চিত আমরা।
উর্ম্যা! মাতঃ!
আপনার মহত্ত্বে
আমরা স্বস্থ, অহিংসিত।
স্তব্ধ রাত্রি—
চতুষ্পদ শ্বাপদের হিংস্রতা। চতুর্দিকে।
অগণিত তস্করের অপশাসন—
আপনাকে করে না অপ্রিয়।
আপনার করুণা বর্ষিত হোক।
এ ঘোর যামিনী
মঙ্গলকর হোক।
হোক সুখকর এবং শান্তিপূর্ণ।
চৌর্য হোক দূরিত।
নির্ভয় হোন সৌভরি কুশিক॥ ৬॥

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয়॥৭॥

—কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে উষাদেবি, আমার ঋণকে যেমন পরিশোধ করে নষ্ট করেন সেরকম অন্ধকারকে নষ্ট করুন।

রজনী।
আশ্লিষ্ট হয়েছে বিশ্বচরাচর
কখন—ধীরে ধীরে,
তার ছন্দোময়ী মায়ায়।
আমাকে আকুল করেছে
তমোনিশার সে গাঢ় কালিমা।
দীপ্ত অন্ধকার ক্রমে ক্রমে
গ্রাস করে এসেছে আমাকে,
হে উষা! উর্ম্যা! আলোকের জন্মদাত্রি! মাতঃ!
প্রতিদিন ধনের আশ্বাসে
আশ্বস্ত করুন আমাকে। অনন্ত সম্পদের
ঠিকানা আপনি।
আমার ঋণকে দূর করুন।
জীবনের অন্ধ তমোরাশি নিশা দূর করুন।
আমি কুশিক, কৃপা করুন আমাকে॥ ৭॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥ ৮॥

—হে আকাশের কন্যা রাত্রি! আপনি যাচ্ছেন, আপনাকে গাভীর ন্যায় এ-সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম। আপনি গ্রহণ করুন।

বন্দি আপনাকে—
কত যুগ ধরে, একইভাবে।
বন্দনা করে চলেছি আমি, সোভরি-সন্তান
কুশিক।
আমরা সূর্যের সন্তান।
অনন্তকালের সে ভালবাসা। মাতঃ!
জননি!
জীবনের আশ্বাস। জীবনের প্রতিশ্রুতি।
আকাশের কন্যা আপনি। পরমাত্মা-দুহিতা।
গাভীর পয়োধারার মতো
এনেছি স্তুতিবর্ষণ আপনার কাছে।—
হে রাত্রি! সূর্যের কন্যা অপরা—
গ্রহণ করুন তাকে।
আপনাতে নির্ভর করি আমি।
আঁধার শত্রুদের জয় করব।
আপনারই মহত্ত্বে। আপনার কুশল মাহাত্ম্যে॥৮॥

কুমারীপূজা

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

তন্ত্রে কুমারীকে সাক্ষাৎ যোগিনী, সাক্ষাৎ পরমদেবতা বলা হয়েছে—"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা।"১ আর কুমারী-পূজার মাহাত্ম্য-কীর্তনে তো তন্ত্র একেবারে পঞ্চমুখ। সেখানে আছে :

"হোমাদিকং হি সকলং কুমারীপূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরু-সদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন
ভোজিতম্॥"২

—কুমারীপূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি কর্ম পরিপূর্ণ ফল প্রদান করে না। কুমারীপূজার দ্বারা হোমাদি কর্মের কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করলে তাতে সুমেরু পরিমাণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে ভোজন করালে সমস্ত ত্রৈলোক্যকে ভোজন করানো হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এ সমস্তই অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাচক, তথাপি কুমারী-পূজা যে সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেবীর 'কুমারী' নাম অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই নামের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে রয়েছে : "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যা-কুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ"৩—হে দুর্গে, তুমি কন্যা ও কুমারী। আমরা কাত্যা-য়নকে জানব। সেজন্য তোমাকে ধ্যান করি। তুমি আমাদের শুভ কর্মে প্রেরণা দাও। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও সেই পরমাত্মাকে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"৪—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার আবার তুমিই কুমারী বলা হয়েছে। এসব থেকে অনুমান করা যায় যে, দেবীর কুমারী নাম অতি প্রাচীন। আর দেবীর কুমারী নাম যেমন প্রাচীন, তাঁর পূজা-আরাধনার ধারাও তেমান প্রাচীন এবং বহুব্যাপক।

তন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। যেকোন প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠে দেবীকে কুমারীরূপে পূজা করা ঐসব পীঠস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য। কামরূপের কামাখ্যাধামে দেবীর মন্দিরে কুমারী-পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানে নিত্যই বহু পুণ্যার্থী দেবী-তীর্থ দর্শনের অঙ্গ হিসাবে ভক্তিভাবে এই পূজা করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্নভাবে এই পূজার প্রচলন রয়েছে নেপাল, ভুটান ও সিকিমে। বিশেষ করে নেপালের কুমারীপূজা ওখানকার বহু ধর্মীয় উৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতের সর্ব দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত কুমারিকা অন্তরীপ। সেখানে দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। দেবী সেখানে কুমারীরূপে বিরাজ করছেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-মতে রাবণবধের নিমিত্ত দেবীকে প্রবোধিতা করবার উদ্দেশ্যে দেবগণসহ ব্রহ্মা দেবীর স্তব করেন। স্তবে তুষ্টা দেবী কুমারীরূপে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন—"কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।"৫ কন্যারূপী দেবীই বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করবার জন্য দেবতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা পৃথিবীতে আগমন করেন। পৃথিবীতে এসে তাঁরা এক নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষের শাখায় সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা অপরূপা সুন্দরী নিদ্রিতা এক বালিকামূর্তির দর্শন পেলেন :

"তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুবনমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং
নবমালিকাম্॥"৬

১ বৃহৎ তন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৪৪
২ ঐ, পৃঃ ৬৪২
৩ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।২।৩৪
৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪।৩
৫ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২১।৬২
৬ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।২

দেবগণ তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। তাঁদের স্তবে প্রসন্না হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন এবং তাঁর বাল্যভাব ত্যাগ করে উত্থিতা হয়ে উগ্রচণ্ডা নাম্নী যুবতীতে রূপান্তরিতা হন। এই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকা। ইনিই প্রবুদ্ধা হয়ে সবংশে রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র সবংশে রাবণ নিধন করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—"পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব কন্যাং বালাং তথৈব চ"৭—দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাবিহিত পূজা করবে। বাংলার বহু ঐতিহ্যপূর্ণ পূজামণ্ডপে কুমারীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী—এই তিন দিনই অথবা এই তিন দিনের যেকোন দিন কুমারীপূজা করা যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ পূজা অনুষ্ঠিত হয় অষ্টমীর দিনে, কোথাও কোথাও বা নবমীতে। এক বৎসর থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালিকারা ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীরূপে পূজিতা হওয়ার যোগ্য। এক এক বয়সের কুমারীকে এক এক নামে ও দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। যেমন একবর্ষীয়া কন্যাকে সন্ধ্যা নামে, দ্বি-বর্ষীয়াকে সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়াকে ত্রিধা, চতুর্বর্ষীয়াকে কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়াকে সুভগ্যা, ষড়্‌বর্ষীয়াকে উমা, সপ্তবর্ষীয়াকে মালিনী, অষ্টবর্ষীয়াকে কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়াকে কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়াকে অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়াকে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়াকে ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়াকে মহালক্ষ্মী, চতুর্দশ-বর্ষীয়াকে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়াকে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়াকে অম্বিকা নামে পূজা করা হয়।৮

পূজার বিধানে আছেঃ

"পাদ্যমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুঙ্কুমং চন্দনং শুভম্।
ভক্তিভাবেন সংপূজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েৎ॥"৯
—পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, কুঙ্কুম ও উত্তম চন্দন ভক্তিভাবে অর্চনা করে কুমারীকে নিবেদন করবে।

পূজার দিন সকালে পূজার জন্য নির্দিষ্ট কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় এবং ফুলের গয়না ও নানাবিধ অলঙ্কারে তাঁকে সাজানো হয়। পা ধুয়ে পরানো হয় আলতা, কপালে এঁকে দেওয়া হয় সিন্দুরের তিলক, হাতে দেওয়া হয় মনোরম পুষ্প। কুমারীকে মণ্ডপে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখা হয় বেলপাতা, ফুল, জল, নৈবেদ্য ও পূজার নানাবিধ উপচার। কুমারীর একটি ধ্যানমন্ত্রে আছেঃ

"বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্॥"
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্॥
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"১০
—ত্রিলোকশ্রেষ্ঠা-সুন্দরী, শ্রেষ্ঠ বর্ণধারিণী যে বালিকামূর্তি, যাঁর দেহাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারের ভারে অবনতা, যিনি মঙ্গলবিদ্যা প্রকাশিনী, মনোহরহাস্য-যুক্তা, মহানন্দময়ী, মঙ্গলদায়িনী, মঙ্গলময়ী, পরমানন্দস্বরূপিণী—সেই কুমারী-রূপী জননীকে ধ্যান করবে।

ঢাকঢোলের বাদ্য, উলুধ্বনি, পূজকের মন্ত্রোচ্চারণ ও আরাত্রিকের মধ্যে কুমারীপূজা সম্পন্ন হয়। ধ্যান ও প্রণাম-মন্ত্রে সাধারণ কুমারী হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ দেবী, ভক্তগণ তাঁর মধ্যে জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুর্গাকে অনুভব করে কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন।

৭ দেবীপুরাণ, ৩২।৪৪
৯ ঐ, পৃঃ ৬৪৪
৮ বৃহৎ তন্ত্রসার, পৃঃ ৬৪৩
১০ বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, নারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮১-৮২

মাতৃবন্দনা

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

দেবি সারদে, সুখদে শুভদে,
চরণে প্রণতা জনতা।
ক্রোড়ীকুরুতান্ অবনতমনুজান্
বরদা তব বাগমৃতা ॥

ভয়াপহকরে, দুঃখদুর্জরে
তাপদূরেকারি বারি।
কারণরূপিণি, জগতী জননী,
ত্বমেব সকলা নারী ॥

সুমধুর-বচনে, সুস্মিতবদনে,
স্নেহমহোদধিনয়নে।
দয়ার্দ্রচিত্তে, সতীত্ববিত্তে,
রামকৃষ্ণগতমননে ॥

মায়া-মানবি, করুণাজাহ্নবি
পত্যুরুত্তর-সাধিকে।
ভবহিতে যোগি তপস্বি-ত্যাগি
মানসপুত্রপালিকে ॥

বিশ্বেশ্বরি জয় ধরণিং পাবয়
পুনরপি দর্শয় রূপম্।
পরমে প্রকৃতে, শোকহতকৃতে
আনয় সান্ত্বনবাচম্ ॥

অজ্ঞানদুঃখনাশায় সারদা সারদা স্বয়ম্।
দধতী মানবীং মূর্তিং লোকহিতাদিহাগতা ॥

গৃহিণো রামকৃষ্ণস্য গেহহীনস্য গেহিনী।
জন্মদানমৃতে মাতা পুত্রাণাং কর্মযোগিনাম্ ॥

তস্যৈ বিজ্ঞানদায়িন্যৈ কল্যাণপ্রতিমূর্তয়ে।
বিশ্বমাত্রে জগদ্ধাত্র্যৈ দেব্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ॥

ধ্যানের মন্ত্র

কণিকা দেব

ধ্যানের মন্ত্র শিখতে হলে
শিখে নাও তা গাছের কাছে।
নিজের ভিতর মগ্ন হয়ে
অহর্নিশ সে দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃস্বার্থ, নিরাসক্ত, যেসব কথা
গীতায় আছে,
সেসব কথা শিখতে হলে
শিখে নাও তা গাছের কাছে।

এত যে ফল ফলছে তাহার,
একটিও নয় নিজের তরে,
সবকিছু সে বিলিয়ে যে দেয়
আপনাকে রিক্ত করে।

সূর্যদেবের অগ্নিবান
অচঞ্চলে বইছে শিরে
মেঘের ধারা বইছে যখন,
তখনো তা সইছে ধীরে।

দেহখানা ছড়িয়ে দিয়ে
পথিকজনে বলছে 'এসো
শ্রান্ত হয়ে যদিই থাকো
আমার ছায়ায় একটু বসো।'

আঁচলখানা বিছিয়ে দিয়ে
চক্ষু বুজে এলিয়ে থাকো,
আমার শীতল বাতাস পেয়ে
শ্রান্তি তোমার থাকবে নাকো।

তাইতো বলি, এমন সুজন
ক-জন আছে এ-ধরাতে
নীরব ভাষায় জগৎ-জনে
ধ্যানের মন্ত্র শিক্ষা দিতে।

প্রপঞ্চ

দেবীপ্রসাদ মৈত্র

নিস্তরঙ্গ শান্ত নদী, অনেক দূরে চাঁদ
একটি চাঁদের একটি ছায়া সারাটা রাত ভাসে
নদীর জল এবং মন বাতাসে যেই দোলে
দোলায়মান জলের বুকে অসংখ্য চাঁদ হাসে।

প্রাণের মধ্যে প্রবহমান অদৃশ্য এক নদী
অন্ধকারে অজ্ঞানে সে যেদিকে চঞ্চল
হাজার প্রশ্ন এবং দ্বন্দ্বে মন যে তোলপাড়
সত্য নিয়ে মিথ্যা মায়া খেলছে অনর্গল।

যেদিকে প্রাণ শুদ্ধজ্ঞানে নিস্তরঙ্গ স্থির
সিংহাসনে কূটস্থে তার মগ্ন অভিষেক
দুচোখ বুজে দৃষ্টি খুলে বিস্ময়ে সে দেখে
শাশ্বতকাল সত্য যে সে নিত্য এবং এক।

তোমার গানের সুরের পরশ

শেখ সদরউদ্দীন

তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব—
আমার হৃদয়-তন্ত্রী মাঝে বাজে যে বীণ তব !

তোমার গানের গুলবাগিচায় হাওয়ায় ওঠে দুলি
হতে পারি যেন তোমার সুরেরই বুলবুলি !
ঝরাপাতায় যে সুর ঝরাও, আমি তুলে লব—
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব !

তোমার সুরের হিল্লোলে ওই দরিয়ায় ঢেউ ওঠে—
কল্লোলিত জীবন-নদী সাগর পানে ছোটে !
আলোর বাজনা সূর্য বাজায় আঁধার-অসুর নাশি-
নীল-সবুজের বনে বনে বাতাস বাজায় বাঁশি !

তুমি অপার সুরের সাগর, আমি কি বা কব—
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব !

জীবিকা ও জীবন

বিনম্র বিশ্বাস

জীবন যেন নয়রে জীবন,
জীবিকাতেই পূর্ণ,
জীবিকারই নিষ্পেষণে
হচ্ছে জীবন চূর্ণ !
মনটা তবু জীবন খোঁজে
জীবিকারই মাঝে,
জীবনের ওই নূপুর নাকি
জীবিকাতেই বাজে !

হতে চাই

রমলা বড়াল

বুড়ো মাঝি, খুশি আছ ?
যদি চাই দেবে আজ বর ?
করে দাও নিপুণ ধীবর।
সব পাকা মাঝি হয় নিপুণ নুলিয়া
নুলিয়া ডুবুরী হয়
ঝাঁপ দেয় সময়ের সাঁড়াসাঁড়ি বানে—
শুক্তির ফসল আর প্রবালের বোল চুঁড়ে আনে।
যদি কিছু নাই পাই, অদূরে নাই যেতে পারি—
তবুও লবণ জলে মাছের রঙিন পুচ্ছ খুঁজে খুঁজে
দূরে চলে যাব—
ডুবুরী না হতে পারি—
ডিঙি থেকে ছুঁড়ে দেব জাল
মেঘলা আকাশ আর উদিলা আঁশটে ছেঁড়া পাল
নিয়ে যাবে ঝাঁকেদের কাছাকাছি।
রুপোলী ইলিশ—চকচকে সাদা আর
প্রকৃতির নিখুঁত পালিশ
অন্ততঃ গোটাকয় জুটবে না আমার কপালে !
বুড়ো মাঝি,
সারাদিন বসিয়ে রাখবে শুধু হালে ?
বিদ্যেটা শেখাবে না ? কোনদিন দেবে নাকো বর ?
শুধুই দেখব নদী ? শুধু ঢেউ ? শুধু জল ?
নিজে বুঝি হব না ধীবর ?

বিল্বমঙ্গল

রতনকুমার নাথ

সোনালী বিকেল, নীল নীলিমায় অস্তরাগের মায়া
মুক্ত হৃদয় হাঁটিছে বিল্ব শান্ত সৌম্য কায়া।

আলুথালু কেশ, গৈরিক বেশ, সারা মুখভরা দাড়ি,
উদাসী নয়ন, খোঁজে অনুখন প্রেমময় গিরিধারী।

কামনার দাহ, বাসনাপ্রদাহ, ধুয়ে নয়নের জলে
রেখেছে আপন হৃদয়-কমল কৃষ্ণচরণতলে।

পথে যেতে তার নয়নে পড়িল অপরূপা এক নারী,
কামনা অবশ হলো তার মন, ভুলে গেল গিরিধারী।

হৃদয়ের আলো, নিমেষে ফুরাল, থেমে গেল শ্যামগান,
বাসনাদহনে ছাই হলো তার পবিত্র দেহ-প্রাণ।

আসিল বিল্ব, তারে অনুসারি, রূপবতী গৃহঠাঁই :
স্বামী এসে তার নমিল চরণ, শুধাল, 'কি প্রভু চাই?'

শ্মশ্রুগুম্ফ-আবৃত সাধু সহসা কহিল তারে—
"একবার শুধু পত্নীকে তব চাই আমি দেখিবারে।"

চমকি উঠিয়া সাধুমুখে শুনি নিদারুণ প্রার্থনা
পূর্ণ করিল অভীপ্সা তাঁর গৃহস্বামী পূতমনা।

হেরিল বিল্ব রূপবতী-রূপ, কহিল—"মাতৃসমা!
তোমার খোঁপার দুটি কাঁটা দাও, অপরাধ কর ক্ষমা।"

নিয়ে দুটি কাঁটা আপন নয়নে বিঁধিল আপন হাতে
রক্তের ঢেউ ছলকি উঠিল অন্ধ-নয়নপাতে।

কপোল বাহিয়া অশ্রুরক্ত নীরবে পড়িল ঝরি
যন্ত্রণাময় প্রশান্ত মুখ হাসিতে উঠিল ভরি।

করজোড়ে কয় সাধক বিল্ব—"গিরিধারী, অনুপম,
পাপ আঁখি মোর করেছি ছিন্ন, দেখা দাও প্রিয়তম।

রূপের লালসা, কামনার কালি দুহাতে ফেলেছি তুলি,
এস, গিরিধারী, হৃদয়-নয়ন দাও দাও মোর খুলি।

হৃদয়-নয়নে হেরিব তোমার চির-অপরূপ জ্যোতি,
চরণে তোমার ঠাঁই দাও দেব, কৃষ্ণ মথুরাপতি!"

রূপান্তর

প্রভাকর মাঝি

শেঠ যাচ্ছেন বাণিজ্যে সফরেতে,
গাঁয়ের বুড়ীমা বললেন কাছে এসে,
আমার জন্যে এনো বাপু, মনে করে
সাধু-সন্তের একটি টুকরা হাড়।
বড় সাধ তাকে বেদীতে স্থাপনা করে
জানাব নীরব প্রাণের পূজাঞ্জলি,
প্রভুর করুণা পুণ্য করুণা পেয়ে
উদ্ধার পাব জীব-জন্মের থেকে।
শেঠ চলে যান ব্যবসায়ী-সফরেতে—
এখানে-ওখানে বহু মাল বেচা-কেনা,
আসতে কদিন পরে রাস্তার পাশে
দেখলেন মৃত কুকুরের হাড়-গোড়।
বুড়ীমার কথা তখন পড়ল মনে,
তাই তো বড়ই ভুল হয়ে গেছে দেখি,
শ্রেষ্ঠী ভাবেন—এখন কি যায় করা?
এমনিতেই তো দেরি হয়ে গেছে তাঁর।
যাই হোক, সেই সারমেয়-অস্থির
একটা টুকরা সংগ্রহ করে নেন,
বুড়ীমা আসতে জানালেন উল্লাসে
'সারিপুত্তের এই পূতাস্থি নিন,
খোঁজাখুঁজি করে অনেক কষ্টে পাওয়া।'
আহ্লাদে গদগদ বৃদ্ধার মন;
বেদিতে রাখে সে সরল বিশ্বাসেতে
সভক্তি পূজা প্রতিদিন করে যায়।
পূতাস্থি তার জপ তপ ধ্যান জ্ঞান।
প্রতিদিন করে অঙ্গন-মার্জনা।
প্রতিদিন যায় বনফুল চয়নেতে,
মন্ত্র কোথায়! তপ্ত চোখের জল!
মুখে মুখে কথা ছড়াল সারাটা গ্রামে
ভক্তেরা দলে দলে বিস্ময়ে দেখে—
অর্চনারত বুড়ীমা চোখের জলে
এবং অস্থি আলো বিকিরণ করে।
বাতাসের আগে ছুটে যায় সংবাদ
শ্রেষ্ঠীও এসেছিলেন খবর শুনে
অস্থির থেকে দিব্যজ্যোতি দেখে
চোখে জল তাঁর—আর গেলেন না ফিরে।

তোমাতেই লীন

দেবাশিস ঘোষাল

তোমাকে দেখেছি আমি
সৃষ্টির শালগ্রাম শিলায়
বুঝেছি তোমার শক্তি
ধ্বংসের তান্ডব লীলায়
পৃথিবীর প্রতি জীব জড়
অণু-পরমাণু
নিয়ত সম্মুখে তব
হয়ে নতজানু
করিছে প্রণাম।
শব্দতরঙ্গ শুধু
গাহে তব নাম
জেনেছি তুমি তো এক অখন্ড
আপনারে ব্যাপ্ত করি
হয়ে খন্ড খন্ড
সবাকার মাঝে
তোমার অস্তিত্ব তাই
অবাধে সর্বত্র বিরাজে
যত জানি যত দেখি
ব্যবধান হয়ে আসে ক্ষীণ
অপেক্ষা করিয়া আছি
কবে হব তোমাতেই লীন।

অন্তর বাজে—যন্তর বাজে

কমলা সেন

এ কোন্ খ্যাপা বাউল প্রেমানন্দে নাচে প্রাণের অঙ্গনে!
ভয়-ভাবনা ভুলে এবার ঐ প্রেমিকের সঙ্গ নে।
দ্যাখ চেয়ে ওর চোখের তারায়
দুঃখ-ব্যথা কোথায় হারায়—
ও গান ঝরিয়ে আপনা বিকায় কাহার চরণে!
কত দুঃখের সাধন সেধে ঠাকুরে চায় রাখতে বেঁধে,
সে যে ধরা দিয়েও লুকিয়ে পড়ে কোথায় কে জানে!
প্রেমের রঙে বসন রাঙা
কোথায় গো কূল কোথায় ডাঙা,
যাঁর প্রেমে ও পাগলপারা তাঁরই শরণ নে।
একতারাটির একটি তারে
পরাণ-সখার নাম বাজে রে
সেই নামের মধু পান করে তার সুরটি সেধে নে।
বুকের মাঝে নামটি বাজে তালে তালে চরণ বাজে,
পরাণ নাচে চরণ নাচে শ্রীনাথ-কীর্তনে।
বৈরাগীর ঐ হাতের ঝুলি শুদ্ধচিতে দ্যাখনা খুলি—
পারের কড়ি মিলেছে ওর প্রেমের সাধনে।
অন্তরেরই নয়ন মেলে শুদ্ধ প্রেমের প্রদীপ জেবলে
নিতুই দ্যাখে ঠাকুরে তার হৃদয়-ভুবনে।
বলি তোরে গোপন কথা, খুঁজিস নে আর যথা তথা
ঘরছাড়া ওর সাথী হয়ে পথটি চিনে নে।

প্রেমের ঠাকুর

সন্তোষ চৌধুরী

"ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ॥"
অপার করুণাসিন্ধু ভুবনমোহন,
ভবাঞ্ছাকল্পতরু হৃদয়রঞ্জন॥
প্রেমের ঠাকুর আমার নিত্য নিরঞ্জন,
ঘরে ঘরে মায়ের নাম করেন বিতরণ॥
জগদ্গুরু কল্পতরু পতিতপাবন,
দক্ষিণেশ্বর লীলাভূমি হলো তীর্থস্থান॥
দক্ষিণেশ্বরের মাটি হলো চন্দন সমান,
যেথা লীলা করেন রামকৃষ্ণ ভগবান॥
ধূলি নয়, ধূলি নয় বৃন্দাবনের রজঃ;
যেথা আছে রামকৃষ্ণ-চরণপঙ্কজ॥
মাখরে ভাই সর্ব অঙ্গে পরম যতনে,
প্রেমানন্দে রামকৃষ্ণ বলরে বদনে॥
"ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ॥"

এক-অক্ষরা

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

একটি নাম এক অক্ষর
বীজমন্ত্রের মতো অনুপম মধুক্ষরা
জীবনদায়িনী এক অত্যুজ্জ্বল মর্ত্য-মহিমা।
বিপদ বিভ্রান্তি বিভীষিকায়
ওই নামে ক্ষরিত হয় অভয় আস্বাদ।
অনুভূতির নিমগ্ন উৎসার
রক্তে-রক্তে প্রফুল্ল প্রবাহে
অসীম আনন্দ আনে প্রাণে
নিরন্তর উদ্দীপ্ত হয় অন্তর আকাশ
নমনীয় সংকল্প সাধনে।
একটি নাম এক অক্ষর
মা নামে নম্র হয়ে ডাকা
সংসারের সীমিত বন্ধনে সে মা ছিল আবন্ধ ;
পালনে মমতায় শুশ্রূষায়, লালনে সেবায় পরিচর্যায়
শুভাশুভ কামনায় সে চোখে ছিল
সকাতর উৎসুক প্রতীক্ষা।
উপমাহীন এক অক্ষর বজ্রসম সেই নাম
আদি-অন্ত রক্ষা করে ;
করুণ-কটাক্ষে অনিত্যেও নিয়ত নিত্য উপস্থিতি।
গুণাতীত অনন্ত অনঙ্গে প্রচ্ছন্না জননী
মহাকালের আসনে পূজিতা ;
প্রার্থনাকারী সন্তানের মোহপাশ ছেদনে
প্রসারিত বাহুদ্বয় তূর্ণ-তৎপরা॥

আশা জাগে মনে

শান্তিকুমার ঘোষ

জ্ঞানময় বীজ
বীজ থেকে তরু
বৃক্ষ ডালপাতা মেলে দিয়েছে আকাশে
শিকড় নামিয়েছে মাটির গভীরে
দেয় বছর-বছর ধরে ছায়া
আমি তারই তলে
বসে আছি গুড় আর জল নিয়ে
আশা জাগে মনে
ফেরার সময় তৃষার্ত ঘেসেড়া
যদি একটু জিরিয়ে যায় আমার কিনারে

আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও

নিমাই মুখোপাধ্যায়

শৈশবে জ্ঞান হবার পর
যে চোখ দিয়ে তাকিয়েছিলাম
সে চোখ হারিয়ে গেছে।
আমি ধীরে ধীরে বড় হয়েছি
দুচোখ দিয়ে দেখেছি এই পৃথিবীকে
উপভোগ করেছি এর সৌন্দর্য।
এই চোখ দিয়েই দেখেছি দেবতার মতো মানুষ
আবার এই চোখেই দেখেছি মানুষের নীচতা
দীনতার কত রূপ।
জীবনে চলার পথে এ চোখ কত লোককে
স্বাগত জানিয়েছে
কত লোককে বিদায়।
আজ বলতে পারব না কেন ও বড় ক্লান্ত,
ওকে সজীব করতে চেষ্টা করছি
মানুষের মাঝে দেবত্বের রূপ দেখব বলে।

এনে দিক সহস্র ক্ষমা

নিভা দে

ভিতরে এত কেন দহন তোমার !
কেন শূন্যে তোল শুধু অপার্থিব ধনুক-টঙ্কার !
এত কেন ক্ষমাহীন তুমি ?
এত তরল আগুন বুকে নিয়ে
পূর্ণিমার অভিলাষে যদি যাও
আরো যাবে জ্বলে আপাদমস্তক
দাউ দাউ ঈর্ষাবিষে অনেকেই
সারাটা জীবন পুড়ে পুড়ে
আলোহীন ধোঁয়া দেয় ;—চারিদিক
ভরে দেয় আবহ মৃত্যুলীন করুণ বিষে !

এত দহন কেন পুষে রাখো বুকের ভাঁজে ?
রাত্রির আকাশ-মুখে খুলে দাও বুকের মর্মর
ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক—বিষের পাথর ক্ষুব্ধ সন্ত্রাস
শান্তির শ্বেত পারাবত খুঁটে খাক দানা
হলুদ উল্লাস ঠোঁট ভরে এনে দিক সহস্র ক্ষমা।

চলোর্মি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবন একার
জীবনীও একারই তো—
তবু একাধিক !

মন নিজস্ব
মননও নিজস্বেরই তো—
তবু সর্বজনীন !

প্রাণ বুকের
প্রাণনও বুকেরই তো—
তবু সে বৌদ্ধিক।

দেহ গ্রন্থীর
দৈহিক গ্রন্থীধারারই তো—
তবু সর্বাধীন।

মস্তক দেবশীর্ষ
মস্তিষ্কও দেবতাই প্রায় তো—
তবু যন্ত্রে যন্ত্রণার !

দুচোখে চিত্রালী
চাক্ষুষ চেতনারই তো—
তবু তা বিবর্ণ !

বুদ্ধি নিশ্চিন্ত
বোধি সত্যে অভ্রান্তিই তো—
তবু ছিদ্রান্বেষী মন্ত্রণার !

কথা ভাবনার
কথাকলি বিকশিত ভাবেরই তো—
তবু শোনে সংকু কর্ণে।

জীবন মন প্রাণ,
দেহ বুদ্ধি চোখ মস্তক কথা তো-
তবু মিলিত বিধান !

সব একা
সর্ববিধ একাকীত্ব তো—
তবু চলোর্মি—মহান।

ভারত—আমার জন্মভূমি

মধুসূদন পাল

মাতৃমমতার মতো দশদিকে আশ্চর্য ধরণী—
নিয়ত সেখানে
কী দারুণ পুরুষ সংগ্রামে
চারা ধান ধীরে ধীরে দুগ্ধবতী হয়,
ঋতুমতী নারীর মতো গাঢ় হয় ডালিম বাগান।
নিয়ত সেখানে
কী কঠোর ধ্যানে ও সেবায়
বকের পাখার মতো জেগে ওঠে কার্পাস বাগিচা।
ঈশ্বরের হাসির মতো সুরভিত ফুলের সঙ্গীত।
নিয়ত সেখানে
প্রতিকূলে পাহাড়-চূড়া হাঁটু ভেঙে করে দেয় পথ,
নদীর অতল থেকে উঠে আসে দশ হাজার
সুখের সম্পদ
হে ভারত, হে প্রমত্ত বিলাসী আমার জন্মভূমি—
তুমি তার কতখানি জান ? কিছু জান ?
জান সেই আসমুদ্র হিমাচল
অশ্রু প্রেম যুদ্ধের কাহিনী ?
বস্তুতঃ কিছুই জান না—
হে দিব্যকান্তি, নশ্বর জন্মভূমি,
এক ফোঁটা ঘামও ফেলনি তুমি ঐ সব জানার আগ্রহে।
কেননা, তুমি তো মানুষ নও
গন্ধে পুষ্পে অলঙ্কৃত সুবিশাল পিত্তল বিগ্রহ
কিংবা কোনও বিগ্রহের বিশুদ্ধ সেবক !
অথচ কে না জানে
হে মদমত্ত উদ্ধত জন্মভূমি,
ওরকম মমতাহীন কলুষ জীবনে
মাতৃমমতাও নির্বাসনে যায় স্বাহা-র তুমুল উত্থানে।

অঙ্ক-কবিতা

সোফিওর রহমান

একটিই স্বপ্ন ঃ সময়ের
এবং একটিই রঙ ঃ নতুন।
একবারই সুখ ঃ মুক্তি
আর একটাই দুঃখ ঃ মানুষ।

শতাব্দীর খেলা
সুদীপ বসু

এখনো ব্যথার রঙ নীল হয়—
আমি তাই হেঁটে চলি
দূর থেকে দূরতর বেদনার দিকে
ভালবাসার মানুষজন কেউ গেছে কেউ যাচ্ছে
কেউ যাবে কালো দেওয়ালের দিকে

উদিত সূর্যের বর্ণ আজো বদলায়
বর্ণালীর সাত রঙ খেলা করে শরীরে শরীরে
কামনার টোপে গেঁথে মানুষের দল
ছিপে তোলে স্বাদুতর মাছ

তবু কেন মানুষ বিবাগী হয়
দেশরাগে কান্নার সুর ভাসে
বেদনারা নীল থেকে আরো নীল হয়
শতাব্দীর বুক চিরে জোয়ার নেমে আসে।

একজন মানুষ
তাপস বসু

একজন মানুষ বড় হয়
আপন অস্তিত্বের অমেয় অনুভবে
একজন মানুষ বড় হয়
আত্মায় আত্মা সংযুক্ত করে
একজন মানুষ বড় হয়
আপন বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে
একজন মানুষ বড় হয়
দুরন্ত লোভ আর অন্যায়ের কাছে নতজানু না হয়ে
একজন মানুষ বড় হয়
আপন সঞ্চয়ের ঝাঁপি সকলের জন্যে খুলে দিয়ে
একজন মানুষ বড় হয়
অগ্নিময় আত্মবিশ্বাসে আর ঈশ্বরের ভালবাসায়
এস আমরা এমনভাবেই বড় হয়ে উঠি
এস আমরা এমনভাবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠি।

অন্তর্গত শব্দ
সন্তোষকুমার মাজী

অন্তর্গত শব্দের নেশায় শুধু জেগে থাকি

সারা শীত জুড়ে অলৌকিক পাতা ঝরে
শব্দই হয় না, নাকি আত্মা অবিনাশী জেনে
পাতারা নিশ্চুপ, উত্তীর্ণ মৃত্যু থেকে
জেগে উঠবে একটু পরেই।

জলচৌকিতে পা ছড়িয়ে বসে আছে সময়
অথচ রক্তসুতোয় ক্রমাগত গেঁথে চলেছি শব্দশিল্প
স্তব্ধতাকে শাসন করছে আলোকপর্ণা সেই গান
অবলোহিত আলোয় ভেসে উঠছে
আমাদের চৈতন্য

অনাবিল স্বপ্নের মধ্য থেকে কুড়িয়ে আনি ঝিনুক
শব্দশঙ্খ;

সে সময়
অবিরাম ঝুঁকে থাকে কথার কাকলি, শব্দব্রহ্ম।

হারিয়ে যাই
অমর ষড়ংগী

আমার নিজের জীবনে আমি কিছু পেলাম না।
আমি যখন বিপন্ন, অস্থিরতা
যখন আমাকে অধৈর্য করে তোলে,
তখন আমি কেবল আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি—
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে হয়ে
যখন আমার আর কিছু ভাল লাগে না—
ভরতনাট্যম, কত্থক নৃত্য,
অথবা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর।
তখন, আমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে
ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি।
নির্ভরতার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় লাভের জন্য।
ঈশ্বর আমাকে দেখেন,
আমি বুঝতে পারি।
আমি তাঁকে দেখতে পাই না।
তাকিয়ে থেকে থেকে
অবশেষে আমি হারিয়ে যাই।
তাঁরই মধ্যে।

স্পর্শ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অন্ধকার যত গাঢ় হয়,
জাগে তত ছায়া তার সামনে আমার।
নির্জন পথের চার ধার
শব্দ হলে চকিতে তাকাই,
ঘাসের গোপনে সরীসৃপ
আকাশে মেঘের পুঞ্জ, নিশাচর পাখি মেলে ডানা,
গাঢ় হয়ে ওঠে অন্ধকার
স্পর্শ তবু পাই যেন, হয়তো এবার
ছায়া তার হৃদয়েরই কাছে।
চোখ বন্ধ করে দেখি, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর অতল,
ভয়ে কাঁপে হৃদয়—'ওগো, না,
এ আঁধার চাইনি জীবনে।
তুমি যে আলোকে দীপ্ত, আশ্বাসে উজ্জ্বল!'
তবু সে বিজন বন স্পর্শময় হয়ে ওঠে,
ছায়া দোলে তমসায়।
কথা বলে বাতাস, হৃদয়ে
শূন্য হয়ে ভেসে থাকে কামনার রঙ।
নিবিড় মৌনতা শুধু ছুঁয়ে যায় অসাড় চেতনা।
জেনেছি এবার তাকে,
যে আছে জীবনে, আছে মৃত্যুর উৎসবে
আলোকে আঁধারে একাকার।

অন্য বাঁচা

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

একটি সুস্থ সকাল বুকের অন্ধকারে ধরে রাখি
গায়ে মাখি নবীন সূর্যের নরম আঁচ।
এতকাল অন্য পথে নিজেকে ভাসিয়েছি
পথের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি সূক্ষ্ম অনুভূতি
বেঁচে থাকার প্রিয়তম স্বাদগুলি,
একটু ফিরে দেখার বা দেখে ভাবার
ফুরসুত পাইনি কোনদিনও।

এখন পুড়ে-পুড়ে, ক্ষয়ে, গলে
যেটুকু অবশিষ্ট আছে
তা-ই দিয়ে গড়ে তুলি নষ্ট বাড়িখানি।
খুব সহজে বুঝতে পারছি
সময় পশ্চিমে ঘুমিয়ে পড়ছে
হাওয়ারও জোর কমছে
মরচে ধরছে শক্তি আর সাহসে।

যতদিন বাঁচব
যেন রাখি নিজেকেই ধরে প্রিয় স্বপ্নে,
তারই ফাঁকে বারবার এসে
সুন্দর হেসে-খেলে যাক॥

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সহজ আজ্ঞায় কর্ম ঘিরেছে সংসার
বৃক্ষের মতন স্পষ্ট নীরব যদি-বা
কার সাধ্য রাত্রি খায় চাঁদের জ্যোৎস্নায়
প্রেম!—সেও কর্মময়ী কর্মের টঙ্কার।

দুহাতে ধরেছ বৃত্ত পরিধি জাননি
পরিধিতে মহানিম ওপারে সীমানা

কুয়াশাকে প্রাজ্ঞ এক শ্মশান ভেবেছ
কী রূপ সেখানে তার খবর রাখনি।

নীরব অর্চনা কেন সার্থকতা পায়
কর্ম কি তাহলে আত্ম-উন্মোচন শুধু
এ সংসার চলে কেন, কার চক্রে বাঁধা
কোথায় ত্যাগের ইচ্ছা কর্মকে জড়ায়?

কর্ম কর্মী গৃহ মেঘ শুভময় ব্যথা
এইসব নিয়ে থাকে সম্পন্ন ব্যস্ততা।

প্রবন্ধ

ঠাকুর যদি আজ থাকতেন

স্বামী চেতনানন্দ

'যদি' শব্দটা সংশয়াত্মক। আর এই সংশয় থেকে মানুষের যত দুর্গতি। এই 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার ফলে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টের কি দুর্গতি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে একটি অপূর্ব কাহিনী আছে। কুমারিল ছিলেন দাক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। বেদজ্ঞ দার্শনিক। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম-কীর্তির নিকট তর্কে পরাজিত হয়ে তাকে পণ অনুসারে বৌদ্ধ হতে হয়। পরে তিনি নালন্দাতে ধর্মপালের কাছে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। একদিন গুরু ধর্মপাল বেদের নিন্দা করায় কুমারিল গোপনে অশ্রু বিসর্জন করেন। জনৈক বৌদ্ধ তা দেখতে পেয়ে ধর্মপালকে জানায়। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কুমারিলকে বলেন ঃ "এখনও বেদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা! তুমি ভান করে বৌদ্ধ সেজে আমার শিক্ষা নিচ্ছ? তোমার সাধ্য থাকে তো আমার বাক্য তুমি অপ্রমাণ কর।" ফলে ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ শুরু হলো। ধর্মপাল যুক্তিশরে বিদ্ধ হলেন। শেষে কুমারিল বললেন ঃ "সর্বজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন জীব সর্বজ্ঞ হতে পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বেদ মানেননি—ইহা তাঁর চৌর্য ভিন্ন আর কি?"

বৌদ্ধরা তখন ক্ষেপে গিয়ে কুমারিলের শরীরের ওপর অত্যাচার শুরু করল। গুরু ধর্মপাল বললেন ঃ "একে তোমরা ঐ উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফেলে বধ কর।" বৌদ্ধরা কুমারিলকে টেনে ছাদে তুলল এবং ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ "বেদ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাকি।" ভূতলে পতিত হয়ে কুমারিল মরলেন না। বৌদ্ধরা স্তম্ভিত হলো। কুমারিল বললেন ঃ "ওহে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধগণ, আমি দেখছি আমার চক্ষুতে একটু আঘাত লেগেছে। আমার এ ক্ষতি হতো না, যদি আমি 'বেদ যদি প্রমাণ হয়'—এই সংশয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ না করতাম।" বৌদ্ধেরা কুমারিলের দৈবশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল।

কুমারিল তো তাঁর বিশ্বাসের জোরে রেহাই পেলেন, কিন্তু আমাদের গতি কি? আমাদের সন্দিগ্ধ মন ক্রমাগত সংশয়ের দোলায় দুলছে ঃ "আজ যদি ঠাকুর থাকতেন?" "তিনি কি আছেন না নির্বাণ নিয়েছেন?" "কিন্তু—যেন—মনে হয়...।" এইসব সংশয়াত্মক ভাব মন থেকে সরাবার জন্য আমরা শাস্ত্র পড়ি, সাধুসঙ্গ করি, জপধ্যান করি, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করি। তবুও সংশয় যায় না। আর এ সংশয় যাবেই বা কেন? একটা ক্ষুদ্র সর্ষের মতো বটের বীজের মধ্যে বিরাট বটবৃক্ষ লুকিয়ে রয়েছে—এ যেমন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, তেমনি অনন্ত বিরাট ঈশ্বর কি করে একটা সাড়ে তিন হাত মনুষ্য-শরীরে থাকতে পারেন, তাও ধারণা করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো, সেবক রামলাল একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সংশয়ের কথা বলেন ঃ "আমি তাঁকে 'আপনি' 'আপনি' করতুম, খুড়ো বলে মনে হতো না। ঠাকুরের আচরণ ভাব ও সমাধি দেখে কিছু বুঝতে পারতুম না, মনে একটা সংশয় উঠত। ভাবতুম ইনি (অর্থাৎ ঠাকুর) একজন মুখখু শুখকু মানুষ, এঁর কাছে কত বড় বড় লোক ও পণ্ডিত এসে পরাস্ত হচ্ছে, ইত্যাদি। ইনি কে, সত্যই কি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন? একদিন আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'দেখুন, আমার মনে আপনার সম্বন্ধে সংশয় ওঠে, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' এই কথা শুনে ঠাকুর আমায় বললেন ঃ 'দেখ, বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জানিস, যেমন জিলিপির পাক রে। জিলিপি গোল চক্রের মতো ঘুরানো আছে, ওপরে কিছু বুঝবার নেই, কিন্তু মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে। তুই যা মনে করেছিস (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন) তাই যদি এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) হয় তো এটার সেবা করছিস, মা কালীর পুজো ও ভক্তদের সেবা করেছিস। আবার এই রক্তের (নিজ শরীর দেখাইয়া)

স্রোত তোর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে। এর বেশি আর কি চাস?"[১]

প্রিয়জনের বিরহে মানবহৃদয়ে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এটি স্বাভাবিক নিয়ম। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যান, তখন রামলালদাদা ঠাকুরকে বলেনঃ "আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন করবে।" তিনি শুনে বললেনঃ "তুই মনে করবি যে, আমি যেন কলকাতায় গেছি, কি ঝাউতলায় শৌচে গেছি। আবার আসব এই ভাববি, তাহলে মন কেমন করবে না।"

রামলালদাদা পরবর্তী কালে ভক্তদের বলেছিলেনঃ "সেই অবধি মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর এখান থেকে চলে গেছেন। সর্বদাই মনে হয় তিনি রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই।

"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'যে আসবে চেনা হোক, অচেনা হোক, তুই তাকে একটু মিষ্টি, এক ঘটি গঙ্গাজল খেতে দিবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। এই করলে জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞের ফল যা কিছু সব হবে।' তাই এইগুলি করি, তাই খুব আনন্দ পাই। আর বাস্তবিক ধ্যান-জপে তেমন মন বসে না। তবে অভ্যাসবশতঃ যা করি এই পর্যন্ত।"[২]

"এখন তাঁর (ঠাকুরের) ভক্তসংখ্যা বেড়েছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে কত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ভাব! যাদের ভাষা জানি নে, এমন কত লোক দেশ-দেশান্তর থেকে এসে পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ধূলি নিয়ে যায়, অশ্বত্থপাতা নিয়ে যায়, বেলপাতা নিয়ে যায়।"[৩]

একেই ভক্তিশাস্ত্রে বলে প্রেমের লক্ষণ। প্রেমাস্পদের অধর মধুর, বদন মধুর, রূপ মধুর, হাসি ও কথা মধুর, নৃত্যগীত মধুর, বাসস্থান, জিনিসপত্র সব মধুর। "মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।"

প্রিয়তমের বিচ্ছেদে দুঃখ আছে, আনন্দও আছে। পুকুরের অগভীর জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়লে মাছেরা আনন্দে খেলা করে আর ভাবে চাঁদ তাদেরই সঙ্গী। চাঁদ অস্ত গেলে তারা বিষাদগ্রস্ত হয়; আবার চাঁদের অপেক্ষায় ক্ষণ গোণে। পদ্ম সূর্যোদয়ে বিকশিত হয়; আবার সন্ধ্যাগমে পাপড়িগুলি বন্ধ করে সারারাত প্রিয়তমের ধ্যানে কাটায়। ঐ ধ্যানে আনন্দ আছে। আমরা স্থূলবুদ্ধির মানুষ, তাই ক্ষণিক স্থূল শরীরের মিলনের আনন্দটাই বুঝি। সূক্ষ্ম মনের বা আত্মার মিলনানন্দ যে দীর্ঘস্থায়ী তা বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, "প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে: / দেখা নাই পাই/ পথ চাই, / সেও মনে ভাল লাগে।"

আমরা অনেক সময় ভাবি, আমরা যদি ঠাকুরের কাছে থাকতাম কি আনন্দটাই না হতো! স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেনঃ "ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা করে যা না হয়, তখন তা আপনিই হতো।"[৪] স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেনঃ "ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘণ্টার কীর্তনে যা আনন্দ হতো, তাতে সারাজীবনের দুঃখকষ্ট পুষিয়ে যেত।"[৫]

আবার শ্রীম বলেছেনঃ "কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুজ্যে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমায় আবার নেও মামা।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক।' আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন, 'আমি কি তখন তোমায় জানতুম?' অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।"[৬]

চর্মচক্ষে দেখা আর ভাবচক্ষে দেখা

মানুষ চর্মচক্ষে ঈশ্বরের মায়িক জীবজগৎ দেখে। এ দেখার শেষ নেই। মায়া এককে বহু করে, তাই এই জগৎ বৈচিত্র্যময়। তারপর সাধনার দ্বারা চর্মচক্ষু

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমলকৃষ্ণ মিত্র, পৃঃ ৬২
২ ঐ, পৃঃ ৬-৭, ৬১-৬২
৩ শিবানন্দ বাণী, ১।১৩৩
৪ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৪০
৫ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (১৩৬২), পৃঃ ৩১
৬ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ১৯৯–২০০

ভাবচক্ষু বা প্রেমের চক্ষুতে পরিণত হলে সেই মানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখে। একে বলে সমত্ব দর্শন বা জ্ঞান। তখন অনুভব হয়—উপনিষদের ভাষায়—একই অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেরূপ অদ্বিতীয় আত্মা (সর্বান্তর্যামী) বিভিন্ন জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের সদৃশ হন। আবার তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তদতিরিক্তরূপে বর্তমান থাকেন।[৭]

শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে বলেন : "একদিন ঘরে গান হয়েছে। অনেক লোক আছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন। এসো গো মা, বসো।' সত্যি যেন কেউ এসেছেন, এই ভাব, এইরূপে আদর আপ্যায়ন করলেন। আর একদিন খুব গান হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের লোক রয়েছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন' বলে। বিশ্বাস হয় না লোকের, তাই আবার বললেন, 'মাইরী বলছি, মা এসেছেন'।"[৮]

আমাদের ঠাকুরের মতো চোখ নেই যে, মা জগদম্বাকে ঠাকুরের মতো 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ' রূপে দেখব। আমরা ঠাকুরের বিষয় শুনি, পড়ি, ঠাকুরের লীলা স্মরণ করি, তবুও তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় না। কারণ কোন কিছু সরস করতে হলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন চাই। কেবল বুদ্ধির আশ্রয় করলে বস্তু প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে। শ্রীম ভক্তদের ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন scene রোজ একটি করে ধ্যান করতে বলতেন, যেমন : (ক) দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট। ধ্যানান্তে ভক্তদের বললেন, 'যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না।' (খ) আকাশে নবীন মেঘ উঠেছে। তার প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। ঠাকুরের পিছনে এই কাল চালচিত্র। তিনি পঞ্চবটী থেকে ঘরে আসছেন। (গ) বলরাম-মন্দিরে। বলরামের বাপকে বলছেন, 'অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু আমি দেখি সব এক।… যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার।'[৯]

ঈশানচন্দ্র রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শন' প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন :

"খ্রীস্টভক্ত জনৈক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হায়রে, যদি উনিশশত বৎসর পূর্বে জন্মিতাম!' শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত একজন বলিয়াছিলেন, 'যদি ঠাকুরের সময়ে থাকিতাম!' তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, তাহা হইলে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দর্শনের অভিলাষ একবার জন্মিয়াছিল। সাধু অভিলাষ ভগবানের বিধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, মরদেহ ত্যাগ করিলে মানুষ-মাত্রই চর্মচক্ষুর অদৃশ্য হয়; সেই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব কি?

"কোনও মহাপুরুষ, যুগমানব, যুগাবতারকে চর্মচক্ষুতে দেখিতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু মানুষ তো দেখিয়াও দেখিতে পায় না, চিনিয়াও চিনিতে পারে না। ভগবান যীশুকে দেখিয়াছিল সহস্র সহস্র লোক; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং এরিমেথিয়ার যোসেফ যে যীশুকে দেখিয়াছিলেন, সেই যীশুকে তো ফ্যারিসীদিগের সৈন্যরা দেখিতে পায় নাই! যদি দেখিতে পাইত তবে যীশুকে নির্যাতন করিতে, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিতে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনই চরম দর্শন নহে।

"এ-সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয় নীলমণি, কানা ছেলে হয় পদ্মলোচন! প্রণয়ী Helen's beauty দেখেন in Ethiope's brow, যে নারীকে একজন করে অবহেলা, তাহাকে আর একজন সর্বস্ব পণ করিয়া বরণ করে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ, চর্মনেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেত্রে দর্শন শ্রেষ্ঠ। চর্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ভাবনেত্রে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায়।

"কেহ মনে করিতে পারেন, ভাবনেত্রে দর্শন তো কল্পনারঞ্জিত, সুতরাং অবাস্তব; কিন্তু এ কথা যথার্থ নয়। মায়ের চোখে সন্তানের যে সৌন্দর্য ধরা পড়ে, সেই সৌন্দর্য সন্তানে যথার্থই বিদ্যমান

৭ কঠ উপনিষদ, ২।২।৯

৮ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৫

৯ ঐ, পৃঃ ২৬৭–২৬৮

থাকে, তাহা বাস্তব। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনের ফল যেরূপ সত্য, ভাবচক্ষুতে দর্শনের ফলও সেরূপই সত্য।"[১০]

শাস্ত্র বলেন, "ভাবেন লভতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।‌ শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, কথা, গান, লীলাস্থান মনকে ঠাকুরের ভাবে উদ্দীপিত করে।

ভাগ্যবানেরা দেখতে পায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছেঃ "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। / কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" আমরা আমাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করি, কারণ ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে সাময়িক অনুপ্রেরণা বোধ করি, আবার মন সেই অবসাদে ডুবে যায়। হা-হুতাশ করি। ভাবি—এ জীবনটা ব্যর্থ হলো।

শ্রীম এবিষয়ে একটু আশার কথা বলেছেনঃ "আজও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যদি কেউ বই পড়ে—কখন কোথায় বসেছিলেন, কোথায় কি করেছিলেন, এসব জেনে নিয়ে নিজেকেও ঐ স্থানে ঐ সময়ে ঐ সঙ্গে আছে বলে মনে করে কল্পনার ছবি আঁকে, তাহলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে দেখা যায়। আজ যা কল্পনা কাল তা বাস্তব। কল্পনা ঘনীভূত হলে দর্শন হয়। আবার যোগ-শাস্ত্রে সব বর্তমান—অতীত, ভবিষ্যৎ নাই।"[১১]

নবাগত লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অনুপস্থিত কালে কিভাবে তাঁকে দর্শন করেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে রামলাল-দা বলেনঃ "বালককে (লাটুকে) দেখি গঙ্গাতীরে বসে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলুম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন করছে।... বালক নাকি কার নিকট হতে শুনেছে যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন—দেশে গেলেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন এবং সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে বালক বসে আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আমি তাকে বাড়ি যেতে বলি। আমার কথা শুনে বালক কি বললে জান?—'হামি ঠিক শুনেছি তিনি ইথানকে আছেন—হামি তাঁর সাথে দেখা না কোরে যাবে না।' আমি যত বলি—'না রে না তিনি দেশে গেছেন।' বালক ততই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে—'আপুনি জানেন না; পরমহংস মশায় ইথানকে আছেন।' বালকের এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। মন্দিরে সন্ধ্যারতি করবার জন্য ফিরে গেলুম। মন্দিরে এসে মনে পড়ল যে লালটুকে তো মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়নি। প্রসাদ নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখি যেন কাকে ও প্রণাম করছে। কিছু বুঝতে পারলুম না—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মিনিট দুই-তিন পরে বালক সামনে আমাকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে 'পরমহংস মশায় কুথায় গেলেন?' আমি তো থ হয়ে গেলুম। কোন উত্তর দিতে পারলুম না। বালককে প্রসাদ দিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলুম।"[১২]

স্বামী শান্তানন্দ রামলাল-দার কাছ থেকে আর একটি ঘটনা শুনে উদ্বোধনে (৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৪৩০) লেখেনঃ

"রামলাল চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে, ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুনলেন যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম এতনা তকলিব করকে অযোধ্যাসে উনকো ওয়াস্তে পয়দল আঁতে হে, আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২।৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এসময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন

১০ উদ্বোধন, ৪১ বর্ষ, পৃঃ ৭০—৭১

১১ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৩০

১২ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২

—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন ; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ কদিন খাসনি, এই পায়েস এনেছি, খা।' এই বলে ওকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, এখন হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন। রামলাল-দা সেই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কিভাবে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

রামকৃষ্ণলোকে থাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ কি কেবল কামারপুকুরে, কাশীপুরে বা বেলুড় মঠে? তিনি ভগবান। স্থানকালের অতীত, তিনি সর্বত্র। তিনি সব জীবের ভিতরে আছেন, তবে মানুষে বেশি প্রকাশ। শ্রীম বলতেনঃ "ঠাকুর কৃপা করে এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন চোখে, তাতেই সব লাল দেখি, সবকে আত্মীয় বলে বোধ হয়, সব আপনার জন।"[১৩] একেই বলে প্রেমের চক্ষু। এই চক্ষু খুললে সবাইকে রামকৃষ্ণের লোক বলে মনে হয়।

ভক্তরা অনেকে কল্পনা করেন যে, মৃত্যুর পর আমরা সব 'রামকৃষ্ণলোকে' চলে যাব। একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ "আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠে—'দেহ ছেড়ে গেলে কোথায় যাব?' মহাপুরুষ মহারাজ এ-সম্বন্ধে বলেন, 'আমরা রামকৃষ্ণলোকে চলে যাব। ঠাকুর থাকবেন, আমরাও সেখানে থাকব।' আমি বলি, কোন লোকে যাচ্ছি না। External কোন world-এ যাচ্ছি না। ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো। মন যখন সদাসর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় ডুবে থাকবে, যখন মুহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে না ; তখন যেখানেই থাকি না কেন সেই রামকৃষ্ণলোকেই থাকা হলো।"[১৪]

১৩ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৯০

১৪ উদ্বোধন, ৪৩ বর্ষ, পৃঃ ৫৩৪

শ্রীমর ডায়েরী মধুচক্র

মৌমাছি ফুলে ফুলে ছোটে মধুর অন্বেষণে। তারপর মধু সংগ্রহ করে রচনা করে মধুচক্র। মানুষ ঐ মৌচাক ভেঙে মধু পান করে খুশি হয়। শ্রীম ছুটতেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রামকৃষ্ণ-মধু আহরণ করবার জন্য। তারপর তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে সৃষ্টি করলেন এমন এক রামকৃষ্ণ-মধুচক্র, যাতে ভাবীকালের অধ্যাত্ম-পিপাসুরা আনন্দে রামকৃষ্ণ-মধু পান করে অমর হতে পারে।

কোন এক অতীত যুগে বাল্মীকি 'রামায়ণে' রামকথা ও ব্যাস 'ভাগবতে' ও 'মহাভারতে' কৃষ্ণকথা লিখে গেছেন, এখনও আমরা ঐ পুরুষোত্তমদের জীবনগাথা ও বাণীর আস্বাদ পাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের চোখ ও কল্পনার ভিতর দিয়ে আমরা রাম ও কৃষ্ণকে দেখি। তেমনি আমাদের শ্রীম-র, স্বামী সারদানন্দের ও ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদের চোখ দিয়ে ঠাকুরকে দেখতে শিখতে হবে। কারণ এঁরাই ঠাকুরের জীবন ও বাণীর দ্রষ্টা, শ্রোতা, লেখক ও সংগ্রাহক। কালে আমাদের চোখ যখন ঠাকুরের কৃপায় দিব্যচক্ষুতে পরিণত হবে, তখন আমরা ঠাকুরকে সাধ মিটিয়ে দেখতে পাব।

পরবর্তী কালে ক্ষুধার্ত ও তৃষিত মানুষ ছুটে গেছে রামকৃষ্ণ-মধুচক্র-নির্মাতা শ্রীমর কাছে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ শুনতেঃ

"ভক্ত—আপনি ঠাকুরের কথামৃত কখন লিখতেন? রাত্রি জেগে কি লিখতে হতো? খুব পরিশ্রম হতো ; না?

"শ্রীম—পরিশ্রম ছাড়া কোন কাজ হয়? হ্যাঁ, রাত্রে লিখতাম। শুনে এসে পরদিনও লিখেছি, ধ্যান করে করে।

"তারপর চণ্ডীখানি লইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ উহা খুঁজিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ, তাঁর কাজ তিনিই করলেন।' 'মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা' ইত্যাদি পড়িয়া বলিলেন—'একি আর আমি করেছি। ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন। তিনিই মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার

ভিতর আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন। তিনিই কর্তা ও কারয়িতা। আমরা বুঝি আর না বুঝি'।"[১৫]

"ভক্ত—আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জীবন দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে। ওরা যখন যোগবাশিষ্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শুষ্ক মনে হয়, বুদ্ধিকে যেন লাঠি মারে। এখানে তো দেখছি বেশ সরস সবল সাবলীল।

"শ্রীম—এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। যাঁর জীবনই ছিল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির জীবন্ত ও জ্বলন্ত উদাহরণ, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছিলাম। চোখে দেখে, কানে তাঁর কথা শুনে, বলছি। কেবল বিচারে বেদান্ত বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই। এ করতে হলে সাধন চাই। আর যার এইসব অবস্থা হয় তাঁকে দেখলে তো কথাই নেই। শাস্ত্রের সদর্থ প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। সর্বদাই আসেন যখন কদর্থ হয়ে যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। ভাগ্যিস ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি পাঁচ বছর, তাই এসবের একটু একটু বুঝতে পেরেছি। 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মন্ত্রটি বিদেহ-মুক্তির দৃষ্টান্ত।"[১৬]

"সতীশ (শ্রীমর প্রতি)—অমূল্য জিনিস এই ডায়েরী। কত accurate (যথার্থ) লেখা, time place, personality (স্থান কাল পাত্র) সব আছে। শুনলে মনে হয় যেন চোখের সামনে দেখছি।

"শ্রীম—হাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের সময়ের একটি লোক পেলে আমরা দৌড়ে যাব না কি দেখতে? তেমনি ঠাকুরের কথা। তা শুনতে তো লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে।

"আমরা তাঁর contemporary (সমসাময়িক)। তাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে evidence (সাক্ষ্য) নিতে, examine (পরীক্ষা) করতে। ছেলেখেলা!

"অবতার যখন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় পরখ করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র নেয়। বাকি লোক পরখ করে। তাতে টিকলে তখন নেয়।

"তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের জীবনও দেখে। তাদের কথা শুনে যদি বুঝে ঠিক, তবে নেয়।

"আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সম্পর্কে বলে আমাদের দাম। নইলে কিছু নয়।

"Contemporary (সমসাময়িক) লোক ভাব অনেকটা ঠিক রাখতে পারে। তারপর মিকশ্চার হয়ে যায়। Mother tincture (মূল নির্যাসটি) আর পাওয়া যায় না তখন। First-hand evidence (চোখে-দেখা কানে-শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। তারপর first-hand evidence and second-hand evidence diluted (অধিক তরল) হয়ে যায়। আসল জিনিস আর তখন পাওয়া যায় না।"[১৭]

"শ্রীম—আমার জীবনের greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) যদি জিজ্ঞেস করেন—তা হচ্ছে পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"[১৮]

'এখানে এলে-গেলেই হবে"

কথায় বলে: "এলে-গেলেই আত্মীয়তা।" ঘন ঘন দর্শনের ফলে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর বা অবতারের সঙ্গে একবার আত্মীয়তা স্থাপিত হলে অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা ও ভয় দূর হয়। ঠাকুর বলতেন: "আমি আছি আর আমার মা আছেন।" ব্যস, আর কাকে চাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের শেখাতেন কি করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবের সাধন-কথা আছে। যেকোন একটা ভাব অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়। দক্ষিণেশ্বরের হাঁসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন: "দ্যাখ আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন

১৫ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪০৪
১৬ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৩৮
১৭ ঐ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ৩৫-৩৬
১৮ ঐ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৫

আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন-পীতি। (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য) কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, চেষ্টা করব।"[১৯]

ঠাকুর কাউকে কাউকে বলতেনঃ "এখানে এলে-গেলেই হবে।" এই 'এখানে'-র বিশেষ মানে—ঠাকুরের কাছে। ব্যাপক মানে ঈশ্বরের কাছে। ঠাকুর ছিলেন নররূপী ঈশ্বর। শ্রীম বলতেন, "অবতারকে দর্শন করলে ঈশ্বরকে দর্শন করা হলো—এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন। যীশুও তাই বলেছেনঃ 'he that hath seen me hath seen the Father', 'I and my Father are one.' কেন বলতেন, এখানে এলে গেলেই হবে—না তাঁকে দর্শন করলেই উদ্দীপন হবে। জপ-তপ করা কেন?—ভগবানের উদ্দীপন হবে বলে। এখানে যে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন। একে-বারে সাক্ষাৎকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে বসে আছেন। তাই বলতেন, 'এখানে এলে-গেলেই হবে।' নিজেকে নিজেই জানতেন।"[২০]

"তব তত্ত্বং ন জানামি"

শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার জন্য আমরা দৌড়ঝাঁপ করি, দেবদেউলে মাথা কুটি, সাধুসঙ্গ করি, শাস্ত্র পড়ি, কখনও কাঁদি ও হা-হুতাশ করি। কেউ বা নিজের কর্ম ও সংস্কারকে দোষ দেয়, আত্মধিক্কার করে, নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, সময় না হলে কারও বুঝবার অধিকার নেই। গীতা বলেনঃ "কালেন আত্মনি বিন্দতি।" বীজ পুতলেই ফল হয় না। কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। অধ্যাত্ম-জীবনেও তেমনি খানদানি চাষার মতো চাষ বা সাধন-ভজন করে যেতে হয়। বৃষ্টি বা কৃপা একদিন বর্ষিত হবেই হবে।

জনৈক ব্রহ্মচারী একবার স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন করেনঃ "মহারাজ, আমাদের এত গলদ, সন্দেহ হয়, ঠাকুর কি আমাদের মতো হতভাগাদের দেখা দেবেন?" উত্তরে, ব্রহ্মচারীকে অশেষ সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তাঁকে ডেকে যাও, বাবা। খাদ গালিয়ে মনকে গড়েপিটে তৈরি করে তিনিই নেবেন। তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। ভয় নাই। বিশ্বাস কর।"[২১]

কোন কোন গৃহী ভক্তদের বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই। মুক্তি অনিবার্য। কেউ কেউ মনে করতেন যে, ঠাকুরকে দেখেছি, সুতরাং সাধন-ভজনেরও প্রয়োজন নেই। স্বামীজী কিন্তু এব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি বলেনঃ "যারা তাঁর (ঠাকুরের) দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না; আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।"[২২]

স্বামীজীর মতো বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ বলেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে খুব অল্পই বুঝেছেন। ঠাকুরের সন্তানদের কথোপকথন থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব' জানবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টার মধ্যে বেদনা আছে, আবার আশাও আছে। ভক্তিশাস্ত্রে 'আশাবন্ধ' একটি গুণ। এটি ভগবৎ ভাবের একটি লক্ষণ।

মহাপুরুষ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ "তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল অনেক অনেক মুসলমান নরনারীও ঠাকুরকে খোদার পয়গম্বর মহম্মদজ্ঞানে ভজনা করছে। আমি সে বৎসর (উতকামণ্ডে) নীলগিরি পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানকার ভক্তেরা কুনুরে একটি বাংলো ভাড়া করে আমাদের রেখেছিল। আমরা ওখানে আছি এই সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাক্তার সপরিবারে কুনুরে এসে হাজির। পরিচয় নিয়ে জানলুম, তিনি বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বিলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে—খাসা চেহারা। সামান্য দু-চার কথার পর ডাক্তারটি আমায় বললেন, 'আমরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী

[১৯] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১।১০

[২০] শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬

[২১] রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ২৫০

[২২] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪—৩৯৫

বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, তার কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপালভাবে ভজনা করেন এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের ওপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা যে, তাঁর ইষ্টদেবই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের ওপর অগাধ ভক্তি! বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন—'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা! তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিবমহিম্নঃ-স্তোত্রের কথা মনে হলো—

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥'

—'হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাহা আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপ হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার!'

বাস্তবিকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়।"[২৩]

ছবিতে দেখাই কি সার হবে?

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রভৃতি অবতারদের সময় ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা ঠিক জানতে পারি না তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন। বিভিন্ন শিল্পী ও ভাস্কর কল্পনার দ্বারা ঐ সব অবতারের ছবি ও মূর্তি গড়েছেন তাই দেখে আমরা প্রাণের আর্তি মেটাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মোট ছয়খানি ছবি ক্যামেরার দ্বারা তোলা হয়—চারখানি জীবদ্দশায় এবং দুখানি দেহত্যাগের পর। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। এতে ধ্যানের সুবিধা হয়। অযথা কল্পনা করতে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশার তিনখানি ছবি সুপরিচিত—কেশব সেনের বাড়িতে তোলা, রাধাবাজার বেঙ্গল স্টুডিওতে তোলা এবং দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের সামনে তোলা। চতুর্থখানি ভক্ত রামদত্তের ব্যবস্থায় তোলা হয়। সে ছবি দেখে ঠাকুর বলেছিলেন: "এ চেহারা আমার নয়।" শশী মহারাজ স্বামী অভেদানন্দজীকে পত্রে ঐ ছবির সম্বন্ধে আরও লেখেন।[২৪] স্বামী অখণ্ডানন্দ রামবাবু কর্তৃক গৃহীত ফটো সম্বন্ধে বলেন: "সেই ফটো দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি কি এত রাগী?' রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, এ ছবি ঠাকুরের মনঃপুত হয় নাই। রামচন্দ্র সে ছবি লইয়া গেলেন এবং নেগেটিভসহ ছবিটি গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।"[২৫]

ঠাকুরকে চাক্ষুস দেখতে কার না সাধ হয়? একবার জনৈক সাধু ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন: "মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে দেখাই কি সার হবে? আমাদের কি কোন উপলব্ধি হবে না?" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ খুব আশ্বাস দিয়ে বলেন: "না, না, ছবিতে কেন? (হৃদয় দেখাইয়া) এইখানেই সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি উপলব্ধি হবে।"[২৬]

পুরীতে ঠাকুরের ছবি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটা অপূর্ব ঘটনা বলেন। মা সেবার পুরীতে সকালে পৌঁছে ঠাকুরের ছবিখানি একটা ঘিয়ের টিনের ওপর রেখে পূজো করে জগন্নাথ দর্শন করতে যান। (তখন মনে হয় ঐ বাড়িতে কোন বেদী বা আসবাবপত্র ছিল না।) মা ফিরে এসে দেখেন ঠাকুরের ছবি টিনের নিচে। মা নিজে বলেন: "শেষে দেখি বড় বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কিনা—সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।"

ভক্ত—"ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?"

২৩ শিবানন্দ-বাণী ১।১২৫-১২৬
২৪ পত্র-সংকলন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, পৃঃ ৩৭
২৫ উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫
২৬ শিবানন্দ বাণী, ২।৬৬

মা—"আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।"[২৭]

ঠাকুর বলতেনঃ "শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" তেমনি ঠাকুরের ছবি দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে। আমাদের পরিচিত এক হিন্দুপরিবার সৌদি আরবে কর্ম উপলক্ষে যান। ভদ্রমহিলার কাছে ঠাকুরের বাঁধানো ছবি ছিল। আরবে দেবদেবীর ছবির প্রবেশ নিষেধ। সেখানকার কাস্টম (custom) অফিসার, 'কার ছবি' জিজ্ঞাসা করায়, ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ "আমার বাবার ছবি।" তিনি মিথ্যা বলেননি। ঠাকুরই প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরম পিতা।

পরবর্তী কালে মানুষ ছুটে গেছে শ্রীশ্রীমাকে ও ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের দেখবার জন্য। মানুষরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা স্পর্শ করেছেন, তাঁদের স্পর্শ করবার জন্যও ভক্তদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আমি স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে রামেশ্বর তীর্থদর্শন করতে যাই। তিনি এই সুন্দর স্মৃতিকথাটি বলেন, যা আমি টেপ রেকর্ডারে তুলে নিইঃ

"আমি নারায়ণস্বামী আইয়ার নামে এক ভক্তকে জানতাম। তার বাড়ি ছিল মাদ্রাজ থেকে ৭৫ মাইল দূরে। সে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার গ্রাহক ছিল, ফলে সে ঠাকুর, স্বামীজী ও অন্য শিষ্যদের বিষয় অনেক কিছু জানত। সে অবিবাহিত ছিল, মাকে দেখা-শুনা করত, এবং আট টাকা বেতনে একটা বাগানের কর্মাধ্যক্ষ ছিল। তার একটা বাসনা ছিল। সেটি হলো, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যে স্পর্শ করেছে তাঁকে স্পর্শ করবার। সে যখন শুনল যে শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজে আসছেন (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ), সে মাকে দেখবার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় সে আসতে পারল না।

"তারপর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাদ্রাজে এলে নারায়ণস্বামী তাঁর সেই সুপ্ত বাসনা পূরণ করতে মনস্থ করল। সে মাদ্রাজ মঠে গিয়ে শুনল যে, মহারাজ মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমে রয়েছেন। নারায়ণস্বামী ছিল দীনতার প্রতিমূর্তি। সে বেলা দেড়টায় স্টুডেন্টস হোমে উপস্থিত হলো। মহারাজ তখন আহার সেরে সবে বিশ্রাম করছেন। মহারাজের সেবক নারায়ণস্বামীকে অসময়ে আসার জন্য বকুনি দিলেন। মহারাজ শুনতে পেয়ে সেবককে ডেকে ভক্তটিকে ভিতরে আসতে বললেন। নারায়ণস্বামী আমাকে তাঁর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছিলঃ "আমি ঘরে ঢুকে মহারাজের পায়ের কাছে ফলফুল রাখলাম। তারপর আমি মহারাজের পা-দুটি স্পর্শ করলাম এবং মাথা ঠেকালাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। আমি কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না। মন আমার আনন্দে ভরে গেল। আমার বহুদিনের বাসনা পূরণ হলো। আমি মহারাজকে ছুঁয়েছি আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ছুঁয়েছেন। মহারাজ তাঁর হাত দুখানি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন এবং আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি তাঁর শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখলাম। তারপর মহারাজের দিকে মুখ করে আমি পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।"

ইদানীংকালের অনেক ভক্তদের মনে ক্ষোভ—ঠাকুরকে দেখিনি, তাঁর সন্তানদের দেখিনি। কেবল ছবি ও বই নিয়ে কি করে ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাব? একবার বালিগঞ্জের জনৈক ভক্ত শ্রীমকে বলেন (১২.২.১৯১৯)ঃ "আপনারা খুব fortunate (ভাগ্যবান)। ঠাকুরকে স্পর্শ করেছেন, দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সেবা করেছেন।" প্রত্যুত্তরে শ্রীম বলেনঃ "না, ঠাকুর বলেছেন তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর সন্তানেরা সবাই পাবে। তাঁর ঐশ্বর্য হচ্ছে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম। ঠাকুরকে চিন্তা করলেই ভিতরে শুভ সংস্কার হয়।...ভক্ত যে ভগবানকে ডাকে, সে ভগবানের গুণে। ভগবানই ভক্তকে ডাকায়। সেটা ভক্তের গুণ নয়।...তিনিই সব হয়েছেন।...এখনও ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান, তাঁর ভাব সব ধ্যান করলে তাঁকেই (যেমন আমরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি) চিন্তা করা হয়। ফল একই।"[২৮]

২৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৫৭—৫৮

২৮ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪০৭

অথাতো রামকৃষ্ণজিজ্ঞাসা

ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ প্রথমে বেদান্তের অধিকারী হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ 'ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বস্তু, না অপ্রসিদ্ধ।' ব্রহ্ম যদি প্রসিদ্ধ হন তবে আমরা সবাই ব্রহ্মকে জানি, সুতরাং সেবিষয়ে প্রশ্ন নিরর্থক। আর ব্রহ্ম যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তাঁকে জানবার চেষ্টা বৃথা। যা অজ্ঞাত, তা কখনও জ্ঞাত হয় না। এপ্রসঙ্গে দীর্ঘ বিচার আছে। এখানে সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

রামকৃষ্ণ কে?—এ বিষয়ে অতীতে প্রশ্ন উঠেছে, এখনও উঠছে এবং ভবিষ্যতেও উঠবে। রামকৃষ্ণ-তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ও সূক্ষ্ম। ভাবীকালে ব্রহ্মসূত্রের মতো রামকৃষ্ণ-সূত্র রচিত হবে। ঠাকুরের এক-একটি কথা ধরে এক-একখানি গ্রন্থ রচিত হবে, দর্শন সৃষ্টি হবে, ভাষ্য টীকা-টিপ্পনী লিখিত হবে। রামকৃষ্ণ-সূত্রের কতকগুলি নমুনা ঃ 'যত মত তত পথ'; 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও'; 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল,' 'যত্র জীব তত্র শিব' ইত্যাদি।

ঠাকুর বলতেন যে, কেউ কাশী দেখেছে আর কেউ কাশীর বিষয় শুনেছে। যে দেখেছে তার কথায় খুব বিশ্বাস হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় খুব জোর। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে গেলে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা বা লেখা অবলম্বন করে এগুতে হবে। এসব ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষ নন; এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর। সাধারণ মানুষ এঁদের ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।

যে কেহ ঠাকুরকে একবার দর্শন করেছে সে-ই মহা পবিত্র ও পুণ্যবান। বিশ্বাসী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত বলতেন, এমনকি যে গাড়িতে ঠাকুর উঠেছেন, সেই গাড়ির কোচম্যান, সহিস, গাড়ি, ঘোড়া পর্যন্ত সব পবিত্র হয়ে গেছে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোকে তাঁকে রাস্তায় ঘাটে দর্শন করেছে, কত গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস, সকলেই তো দেখেছে। তারা কি আর তা বলে মুক্ত হয়ে যাবে?" একথা শুনে রামবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি গর্জে বললেন, "যা—যা। সেই গাড়োয়ান সহিসের পায়ের ধুলো একটু নিগে যা। যা—যা। যে ম্যাথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই ম্যাথরের একটু পায়ের ধুলো নিগে যা। তোর মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন পবিত্র হয়ে যাবে।"[২৯]

"রামবাবুর ছিল বৈষ্ণবভক্তের ভাব। একবার হরিপদ (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) বালকোচিত সহজভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?' রামবাবু ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক,আর কিনা বলিতেছিস তাঁহাকে মাঝি-মাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানবি যে, যে মাঝি-মাল্লা সুকৃতিবশতঃ তাঁহার শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান।' হরিপদ লজ্জায় ও ক্ষোভে রামবাবুর নিকট তাঁহার ঐ উক্তির জন্য পায়ে ধরিয়া মার্জনা চাহিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে লিখিয়াছেন, 'অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে-ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আমি তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নই'।"[৩০]

বিজয়নাথ মজুমদার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ "যোগোদ্যান ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। রামবাবু, গিরিশবাবু, অক্ষয়বাবু, হরমোহনবাবু, কালীপদবাবু ও মনোমোহনবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমরাও তিন-চারজন ছিলাম। সহসা একজন বলিলেন—'ঠাকুরের নিকট যাঁহাদের আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সাধক ও শুদ্ধসত্ত্ব।' মনোমোহনবাবু বলিলেন—'ওকথা আমি মানতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামারে (Grammar) ওকথা থাকলে আমাদের গতি কি হতো? আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তখন এদের মতোই (পার্শ্বস্থিত যুবকদিগকে দেখাইয়া) আমাদের অবস্থা। আমাদের না ছিল বিশ্বাস, না ছিল শ্রদ্ধা, না ছিল স্থির লক্ষ্য, না ছিল লক্ষ্যসাধনে তৎপরতা। ইন্দ্রিয়সংযম যে কাহাকে বলে তখন জানতাম না। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি ওসব আগে আসে না। একে একে তাঁর দয়ায় পরে পরে এসেছে। তাঁর কৃপায় তাঁকে

২৯ রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য, পৃঃ ৬৪

৩০ স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ১৫৭

ধরবার পর আমাদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, যা বল, সব এসেছে। আমরা নিজের জোরে ওসব পাইনি। তাঁর দয়ায় পেয়েছি।"[৩১]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে এই প্রশ্নটি ভক্তভৈরব গিরিশ-চন্দ্রকে করা হয়ঃ "তাঁহার (ঠাকুরের) অবতার সম্বন্ধে আপনার মত?" প্রত্যুত্তরে গিরিশবাবু বলেন ঃ

"যদি অনুরূপ ঈশ্বর থাকেন তাহলে আমি ক্ষুব্ধ হব। আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনার গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ থিয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। তাঁহার এক কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হলধারী আমাকে গাছে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়াছিল।' যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল দেখা যায়, এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র সন্দেহের উদয় হইতেই পারে না। তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।"[৩২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের ঠাকুর সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

"প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তোর দেখছি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তিনি সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য দিন-রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি সব সংশয় দূর করে দেবেন, তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন—আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই। তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে অনুরাগ, সে আকাঙ্ক্ষা কয়জনের আছে?"[৩৩]

৩১ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২২৭
৩২ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পৃঃ ৫৬৩
৩৩ ধর্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৫৬

"প্রশ্ন—ঠাকুরের **ideal existence** (মানসিক সত্তা) ছাড়া **real existence** (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি?

স্বামী সারদানন্দ—আছে বৈকি। অনেকে তাঁকে দেখছে, কথা কইছে।

প্রশ্ন—আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি?

স্বামী সারদানন্দ—কিছু কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে কি এমনি পড়ে আছি?

প্রশ্ন—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতেন না কেন?

স্বামী সারদানন্দ—কথা কইতেন বৈকি। এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক এমনিভাবে কথা বলেছেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্র হতো না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে দেখা করে তবে কইতে হবে। স্বামীজী তো আর ঠাকুরের সমান plane-এ (ভূমিতে) ছিলেন না, কর্মের মধ্যে থাকলে মন একটু নিচে থাকে। তাই কথাবার্তা হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের plane-এ (ভূমিতে) নিয়ে যেতে হবে।"[৩৪]

"জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ তো ভাল সাক্ষীকে—বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন? মনে কর, তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম। সবই কি সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ শুনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই, বিশ্বাস অচল অটল। সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না।"[৩৫]

"আমি যদি জন্ম নিতেম"

মানুষের কল্পনার শেষ নাই, সীমাও নাই। অনেকে কল্পনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না—কল্পনা কি করে বাস্তবে রূপ

৩৪ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৩৪০—৩৪১
৩৫ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ৩১

নেয়। একটা উদাহরণ দিই ঃ আমেরিকায় এমন লোক নেই যে ডিসনিল্যান্ডের (Disneyland) কথা জানে না। তা হলো পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্ত-বিনোদনের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াল্ট ডিসনি (Walt Disney)। তিনি একবার ইংলন্ডে গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার বড় বড় পুরনো ক্যাসল-গুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "দেখুন ঐ সব পুরনো ক্যাসলে অনেক ভূতপ্রেত আছে। তাদের বাস্তুহারা করছেন কেন? আপনারা যদি ঐ সব বাস্তুহারাদের জন্য বাড়ি তৈরি না করেন, তবে আমি ওদের আমেরিকায় নিয়ে যাব।" ওয়াল্ট ডিসনিল্যান্ডে Haunted House তৈরি করলেন। ইহা এক আকর্ষণীয় দৃশ্য। ঐসব বৃটিশ ভূতপ্রেত এখন আমেরিকার ডিসনিল্যান্ডে নাচছে, গাইছে, কাঁদছে, হাসছে, বাইবেল পড়ছে। এভাবে কল্পনা রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ দৃঢ় করে ধরতে পারে না—তাই বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' কবিতাটি এখন মনে আছে ঃ "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে / দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে। / চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা— / মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যু জরা। / জীবন-তরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে, / আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"

আমরা যদি জন্ম নিতেম রামকৃষ্ণের কালে? কি হতো? একবার আমেরিকার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ মনে করুন আপনি রাতে একা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় যীশুখ্রীস্ট সশরীরে আপনার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আপনি কি করবেন? খুব করে ভেবে দেখুন।

ভক্তদের চুপ করে থাকতে দেখে বললাম ঃ "আমি জানি আপনারা কি করবেন। আপনারা টেলিফোনে ৯১১ ডায়াল (dial) করবেন। (আমেরিকায় ৯১১ হচ্ছে এমারজেন্সি নাম্বার। ৯১১ ডায়াল করা মাত্র অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে—কাকে চাই? পুলিশ, অ্যামবুলেন্স অথবা ফায়ার-ব্রিগেড?) আমরা ভীতু। খ্রীস্টকে দেখবার জন্য এখনও প্রস্তুত হইনি। অনেকে বলবে, "প্রভু, তুমি দেয়ালের ঐ ছবিতে ঝুলে থাক। তোমাকে কাছে দেখলে বড় ভয় করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকা অত সহজ ছিল না। আমরা শ্রীমায়ের জীবনীতে পড়েছি—মায়ের উঠতে একটু দেরি হলে ঠাকুর নহবতের দরজার চৌকাঠের ভিতরে জল ঢেলে দিতেন। মা ও লক্ষ্মী-দিদি মেঝেতে শুতেন। অনেকদিন বিছানা ভিজে যেত। আমেরিকার মহিলাদের আমি ঠাট্টা করে বলি, এমন স্বামী পেলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স করে দিতেন!

রানী রাসমণিকে মা-কালীর মন্দিরে মকদ্দমার চিন্তা করতে দেখে ঠাকুর দুই চাপড় মারলেন। বরানগরের ঘাটে বসে জয় মুখুজ্যে অন্যমনস্ক হয়ে জপ করছিল। ঠাকুর তাকে দুই চাপড় মারলেন। এঁরা সব ভাগ্যবান। ঠাকুর চিরদিনের তরে ওদের মন ভগবদ্মুখী করে দিলেন। যখনই তাঁরা অন্য-মনস্ক হবেন ঠাকুরের কথা মনে করবেন। অনেক সময় ভক্তদের মনে হয়—হায়! সকাল-সন্ধ্যায় যদি ঠাকুরের দুটি চড় খেতাম, কি সুন্দর ধ্যানজপটাই না হতো!

মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত ছিল। নিজের অবর্তমানে ঠাকুরের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে একটা তালুক লেখাপড়া করে দেবার পরামর্শ হৃদয়ের সঙ্গে করতে গিয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর ঐ কথা শোনা মাত্র উন্মত্ত হয়ে 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস' বলে মথুরকে মারতে গেলেন। শোনা যায় মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রক্ষা পান।

লাটু মহারাজকে একদিন সন্ধ্যায় ঘুমোতে দেখে ঠাকুর প্রায় তাকে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ এক রাতে দুখানা রুটি বেশি খাওয়ায় ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের (৪ খানি) অধিক দিতে বারণ করেন। অবশ্য মা তাঁর কথা গ্রহণ না করে বলেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে মনস্থ করেন। তারপর আলমবাজার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। তিনি শুনেছিলেন যে, ঠাকুর সব লোকের মনের কথা জানেন। সুতরাং সকলের সামনে ঠাকুর যদি তার মনের কথা বলেন,

তাহলে তাকে বিব্রত হতে হবে। এই ভয়ে তিনি আর ঠাকুরকে দেখতে গেলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ। লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। 'যাকে যেমন তাকে তেমন'—এই ভাবে শিক্ষা দিতেন। উত্তররামচরিতে ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল।

হায় বাসনা! ঠাকুরের কাছে থাকবার বাসনা উঠলে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়েঃ কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।"[৩৬] মায়ের একথা পড়লে চোখ দিয়ে জল গড়ায়। নিজের স্বামীকে জগতের স্বামী করবার জন্য মায়ের এ স্বার্থত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আমরা ধন্য—তোমরাও ধন্য

এ জগতে যারা সন্দিগ্ধমনা তারা চিরদুঃখী। সন্দেহ তাদের সুখশান্তি ধ্বংস করে। বাইবেলে খ্রীস্ট-শিষ্য টমাসকে 'Doubting Thomas' বলা হয়। পুনরভ্যুত্থানের পর যীশুখ্রীস্ট শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হন। তখন টমাস সেখানে ছিল না। বন্ধুদের কাছে যীশুর আবির্ভাবের কথা শুনে টমাস বলল যে, সে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন সে নিজ হাতে যীশুর গায়ে ক্রুশ চিহ্ন স্পর্শ করবে। আট দিন পরে যীশু আবার সব শিষ্যদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, এবং টমাসকে দেখে বললেন, "তুমি আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের ও বুকের পাশের ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ কর। অবিশ্বাস করো না—বিশ্বাস করো।" টমাস বলে উঠল, "হে মোর প্রভু, হে মোর ঈশ্বর।" যীশু বললেন, "টমাস, তুমি দেখেছ সেহেতু তুমি বিশ্বাস করলে। তারাই ধন্য, যারা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে।"

তারাই ধন্য যারা ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে তাঁকে ধরে রয়েছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেনঃ "আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুরকে লইয়া পড়িয়া থাক—দেখিবে পরে কি হয়। তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও—দেখিবে সত্যসত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি।"[৩৭]

অনেকে হা-হুতাশ করে বলেনঃ "আমাদের সংস্কার খারাপ", "আমরা ভাগ্যহীন", "এ জীবনে আমাদের কিছু হলো না", ইত্যাদি নেতিমূলক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর শিষ্যগণ পছন্দ করতেন না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভক্তদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ "আমরা না হয় তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে পাগল হয়েছি, কিন্তু তোমরা যে তাঁর নাম শুনেই পাগল।"[৩৮]

একবার জনৈক সন্ন্যাসি-সেবক মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন ঃ "মহারাজ, আমরা ঠাকুরকে দেখিনি। আপনি আছেন, এতেও আমাদের কত আনন্দ! আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনার কাছে থাকতে পেয়েছি, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আছেন, তাই এত সাধুসন্ন্যাসী ও কত ভক্ত, সকলেরই ভরপুর আনন্দ। আমি তো এক এক সময় ভাবি, কত লোক দূর দূর থেকে টাকা পয়সা খরচ করে, কত কষ্ট স্বীকার করে আসে শুধু একটিবার আপনাদের দর্শন করতে! আর আমাদের এমনই সৌভাগ্য যে, সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকতে পারছি।"

মহারাজ খুবই আবেগভরে বলিলেন—"ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তোমাদের ওপর। তাই তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা। তোমরাও ধন্য, আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত?"[৩৯]

ভাগবতের দশম স্কন্দের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি আছে। ব্রহ্মা বলছেন, "আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাই, কোন বনভূমিতে। সকল বনের ভিতর বৃন্দাবনে জন্মলাভ করতে পারলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করব। কারণ, বৃন্দাবনবাসিগণ অহর্নিশ তাদের মিত্র কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছে। আপনার

৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৫৫

৩৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৩৪

৩৮ উদ্বোধন, ৪১ বর্ষ, পৃঃ ৩০৩

৩৯ শিবানন্দ-বাণী, ২।১৬০—১৬১

ও তাদের চরণরজে ব্রজভূমি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। সেই চরণরজঃ আমার শিরে ধারণ করে ধন্য হব। বেদও এই চরণরজের জন্য লালায়িত।

"হে কৃষ্ণ, যতদিন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় না হয়, ততদিন তাদের স্নেহাদি বৃত্তি চোরের ন্যায় তাদের সর্বস্ব হরণ করে তাদের অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। ততদিন তাদের গৃহ কারাগার-সদৃশ হয়ে থাকে, ততদিন তাদের পাদদ্বয় মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে।

"হে প্রভো, পৃথিবীতে আপনার অবতারশরীর গ্রহণ কেবল শরণাগত জনের আনন্দরাশি বৃদ্ধির জন্য। আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ।"

শ্রীম বলেন: "ব্রহ্মার ঐ কথাটি বড় সুন্দর— ব্রজে বাসের বাসনা নরশরীর ধারণ করে। কেন? না, ওখানকার ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণচিন্তা নিরন্তর করে করে কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। তাঁদের চরণরজঃ মস্তকে পড়লে ব্রহ্মা কৃতকৃত্য হবেন। ব্রহ্মা বেশ বললেন, শরণাগতজনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরীর।

"আমরা তাই ধন্য। তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে ঘর করেছি, তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরেছি, তাঁর প্রসাদ খেয়েছি, চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করেছি, কানে তাঁর কথা শ্রবণ করেছি, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার-নিরাকার রূপ দর্শন করেছি, মৃত মানুষে অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাপ্ত হয়েছি, আমরা ধন্য। তোমরাও ধন্য তাঁর কথা শুনে, না দেখে তাঁকে ভালবেসেছ। তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছ। তাঁর ভক্ত যারা ঘরে আছে তারা কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর একথা বলেছিলেন।"[৪০]

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন: "মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে কেউ চোখ চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর-দর্শন হলো না।" মা উত্তরে বললেন: "স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।" পরে ভক্তটির মাথায় হাত রেখে মা দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন: "আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।"[৪১]

স্বামী প্রেমানন্দ একবার স্বামী গিরিজানন্দকে (ইনি মায়ের দীক্ষিত) বলেছিলেন: "তোরা কি কম মনে কচ্ছিস নাকি? শ্রীশ্রীমায়ের ছেলে যারা তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাকি? আমাদের পায়ের ধুলা সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড় হয়ে গেছি মনে করিস? আমরা ঠাকুরকে দেখে এসেছি, আর তোরা না দেখে এসেছিস। তোরাই তো আমাদের চেয়ে বড়। ("মদ্ভক্তানাং যো ভক্তঃ স মে ভক্ততমো মতঃ"।)"

স্বামী গিরিজানন্দ বললেন, "ঠাকুর আপনাদের বড় করে গেছেন।" স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, "তিনি আমাদের বড় করেননি, ছোট করে গেছেন। তোরা সব ছোট হবি, অহঙ্কারগুলোকে একেবারে মনের ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিবি। ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।"[৪২]

গিরিশবাবু এক পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন: "কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া আক্ষেপ করে যে, ঠাকুরের দর্শন পাই নাই। আমি তাহাদের বলি যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত শতমুখী হইয়াছিলেন, ঠাকুরের প্রেমও সেইরূপ ভক্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বহিতেছে, জগৎকে পরিত্রাণ দিবে।"[৪৩]

আজ যদি ঠাকুর থাকতেন

জীবনে যখন ঝড়ঝাপটা আসে, চারিদিক অন্ধকার দেখি, পথ খুঁজে পাই না—তখন কেবল মনে হয় আজ যদি ঠাকুর থাকতেন তবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াতাম, মনের খেদ মিটাতাম। সংসারের অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক মানুষকে অহরহ পুড়িয়ে মারছে। চিতা মানুষকে একবার মাত্র পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা সর্বদা দাহ করছে। ঐ জন্য মানুষ ছুটে গেছে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেন: "সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকা ঠিক নয়—হাসবি, তামাসা করবি, তবে তো মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারবি। ঠাকুর ফুর্তি করে কত গল্প বলতেন, কত রসিক লোক ছিলেন।"[৪৪]

৪০ শ্রীম-দর্শন, ৯ম ভাগ, পৃঃ ১৭০—১৭১
৪১ মাতৃদর্শন, পৃঃ ২৪৭
৪২ প্রেমানন্দ, ২।৫২—৫৩
৪৩ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পৃঃ ৫০৬ ৪৪ ঐ, পৃঃ ৬০৯

দক্ষিণেশ্বরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেনঃ "আজ ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কত অবান্তর এসে যেতে পারে, কত ভুলচুক করে ফেলছি। তাঁদের ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচি। যাক—যখন সময়টা আমার ভাল যাচ্ছিল না, সাংসারিক সুখ একেবারেই ছিল না, অভাব আর অভাব, কিছুতেই কুলোয় না; বেশ মনে আছে—ঠাকুরের কাছে অনটন বা অভাবের কথা কোন দিন মাথায় বা মনে উদয় পর্যন্ত হয়নি। তাঁর কৃপা ভিন্ন তা সম্ভবই ছিল না। তাঁর কথা শুনতেই যেতাম, শুনে আসতাম।

"দুই কি আড়াই বছরের মধ্যে যে কয়দিন তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, একদিনও তাঁকে একলা পাইনি। সাংসারিক মনঃকষ্ট তো যাচ্ছিলই, একদিন আপিসে যাব বলে বেরিয়ে ওপারে (বালীর পারে) পেঁছে আর আপিসে গেলুম না, ইচ্ছা হলো না। গিয়ে কি ফল? তার চেয়ে ঠাকুরের কাছে যাই। কলকাতার ফিরতি পানসি ডেকে পূর্ব-পারে রানী রাসমণির ঘাটে গিয়ে নাবলুম। দেখতে পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্ডায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। নিকটে উপস্থিত হতেইঃ "কিরে—আপিস পালালি! ওটা ভাল নয়। তোরা কুমীরের মতো, জলের মধ্যে বা সংসারে হাঁপিয়ে উঠলে—শ্বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকিস, আবার সে কথা ভুলে গিয়ে ডুব মারিস—বেশিক্ষণ থাকতে পারিস না। দুঃখকষ্ট না থাকলে কি কেউ এদিক মাড়াতো! দুঃখকষ্ট বড় দরকারি জিনিস রে। সেই তো মানুষকে সৎপথ খোঁজায়। ভাগ্যবান পথ দেখতে পায়।"

পরে বলেনঃ "বিবাহ করেছিস, মা আছেন না?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছেন।" একটু চুপ করে রইলেন, যেন কি ভাবলেন। শেষে বললেনঃ "যা এখন সংসার কর, একটু দুঃখকষ্ট থাকা ভাল, এগিয়ে দেয়। দুঃখ না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নিত না।" এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক-একটি বলছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হলো তিনি যেন কষ্টবোধ করছেন। সত্যিই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে। না, আর নয়, বললুমঃ "আপনি একটু বিশ্রাম করুন, এই তো আহারের পর উঠেছেন, আমি বুঝিনি, জ্বালাতন করছি।"

"কষ্ট তো আছেই, কিছু জানবার থাকে তো বল।" হাসতে হাসতে বললুমঃ "আমাদের তো সবই জানবার, জানলুম আর কি?" "কেন, ভগবানকে জানবি, চেষ্টা থাকলেই পাবি। তিনি যখন রয়েছেন, পাবিনি কেন। ইচ্ছা প্রবল হলেই পাবি। সে ইচ্ছা আনা চাই!" "আপনি আশীর্বাদ করুন।" "ওসব আশীর্বাদের বস্তু নয়, নিজের কাজ—আকাঙ্ক্ষা বাড়া। বাড়ি যা।"

জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে তিনি তখনো বলতে প্রস্তুত। কি জিজ্ঞাসা করব—তাই জানি না। তাঁকে ঘরে দিয়ে বাড়ি ফিরলুম।"[৪৫]

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরে কেদারবাবুর মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা দেয়। তিনি উদাসীর মতো ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এক চলতি নৌকায় কলকাতায় যেতে রানী রাসমণির কালীবাড়ি চোখে পড়ল। হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।"

বাগবাজারের ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সেদিন কলকাতায় যাননি। পূর্বের এক শোনা কথা সহসা হৃদয়ে ধ্বনিত হলোঃ "কাঁকুড়গাছিতে ভক্ত রামদত্ত মহাশয়ের বাগানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির হয়েছে।"

কেদারবাবু কাঁকুড়গাছি কোথায় সঠিক জানতেন না। শুধু শুনেছিলেন যে, রেললাইন পেরিয়ে নারকেলডাঙ্গার কাছে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। সেই একবার মাত্র রাসমণির বাগানের সামনে একপ্রকার অসম্বিতেই তাঁর প্রাণ বলে উঠেছিল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।" ঐ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল।

তাঁর আত্মকথাঃ "রেল লাইন পার হয়ে আবার রাস্তা—তার দুধারে বাগানই বেশি। বসতবাটি বিরল। বেলা বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর, গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র প্রচণ্ড—ঝাঁ ঝাঁ করছে। পথ প্রায় জনশূন্য। দিনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয়।… নিশ্চয়ই রামবাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে।

৪৫ উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭৪–৭৫

কিন্তু কোথায়? আরো একটু এগুলাম। দক্ষিণে একটা গলিপথ কিছুদূর চলে গিয়েছে, প্রান্তে ফটক দেখা যাচ্ছে আর বাঁশঝাড়।... গেট বন্ধ নয়—ভেজানো রয়েছে। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম।

"কিন্তু মন্দির কই—ঠাকুরের সমাধি-মন্দির? তবে কি এ বাগান নয়? মন যে বলছে—এই বাগানই। এগোতেই পূব-পশ্চিমে লম্বা একটা ছোট পুষ্করিণী। তার চারদিকে রাস্তা। পুষ্করিণীর পূর্ব পারে পশ্চিমমুখো একটি ছোট পাকা কুটুরী—চুণকাম করা। এইবার কুটুরীর দিকে সোজা-সুজি চাইলুম—দ্বার উন্মুক্ত। এ কি! ঠাকুর যে! প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠল। ধন্য ভক্ত, একেবারে যে জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন! সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড়—সেই তেমনি কাঁধে ফ্যালা। আবার দেখলুম—এ কি, হাওয়ায় দাড়ির দুই এক গাছি চুলও মৃদু মৃদু নড়ছে! আশ্চর্য! যেমনটি দেখেছি হুবহু সেই মূর্তি!"

তিন-চার মিনিট দর্শনের পর কেদারবাবু বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুনতে পেলেন পূজারীর কণ্ঠস্বর, "কে গা আপনি? কি দেখছেন?"

"ঠাকুরকে দেখছি। এইটিই কি রামদত্ত মশায়ের বাগান?"—এই বলে কেদারবাবু পূজারীর দিকে এগুলেন।

"কী দেখছিলেন—বললেন?"

"পরমহংসদেবের মূর্তি...!"

"মূর্তি? কোথায়? কি বলছেন?"

"কেন—ঘরের মধ্যে তবে...।"

"ঘর তো বন্ধ। চাবি এই আমার কাছে রয়েছে। ঘরের মধ্যে রুপার বাসন-কোসন রয়েছে...দেখবেন কি?... বড় জোর এক ঘণ্টা হবে, পূজাদি সেরে ঘর বন্ধ করে খেতে গিয়েছিলুম। আপনি ওসব কি?..."

তখন উভয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে দেখেন, ঐ ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত, আর ঘরের মধ্যে ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মূর্তির চিহ্নমাত্রও নেই। বিহ্বল কেদারবাবু একটু সামলে বললেন, "মশাই, আপনার জিনিসপত্রগুলো সব ঠিক আছে কিনা আগে দেখে নিন।" পূজারীও অবাক হয়ে বললেন, "সে সব আমার সামনেই রয়েছে—ঠিক আছে। কিন্তু কয় বৎসর নিত্য এই কাজ করছি এমন ভুল তো কোনদিন ঘটেনি।"

তারপর "এটি রামবাবুর বাগান কিনা?" কেদারবাবুর এ প্রশ্নের উত্তরে পূজারী বললেন, "হ্যাঁ, তাঁরই যোগোদ্যান। আর এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধি-মন্দির। আচ্ছা, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? অনেকেই তো আসেন। আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। বাবুকে কি বলবো?"

"বাবুকে বলবার দরকারই বা কি? এই তো বললেন কত লোক আসেন, আমিও সেইরূপ একজন। ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় এসেছিলুম।"

তারপর পূজারীর কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদী শশা, কলা, পেঁপে, শাঁকালু, বাতাসা, আর এক গ্লাস জল খেয়ে কেদারবাবু দেহমন শীতল করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। অমনি এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, "বাবু যাবেন নাকি—কোথায় যাবেন?" বলে তাঁর সামনে থামল।

"দক্ষিণেশ্বর।"

"আসুন, আমার বরানগরের বেণী সার আস্তা-বলের গাড়ি।" গাড়িতে বসে কেদারবাবু ঠাকুরের অপূর্ব লীলা চিন্তা করতে লাগলেন: "আজ যখন নৌকা রানী রাসমণির মন্দির সম্মুখে, তখন তো আমার কোন চিন্তা, কোন জ্ঞানই ছিল না, কোথা হতে অবচেতনা সহসা সাড়া দিয়ে উঠল—'ঠাকুর যদি আজ থাকতেন?' কেন যে একথা (মনে) এসে-ছিল, কি অভাব বোধ হয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাকুলতা কি কাতরতা তার মধ্যে গোপন ছিল কিনা—তাও তো জ্ঞানতঃ বলতে পারি না। হে ভাবরূপী ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী, তুমিই অন্তরে বসে ওকথা বলিয়ে থাকবে, আবার অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তুমিই ব্যবস্থা করে সে অভাব মেটালে! এ অভাগার প্রতি একি অনির্বচনীয় করুণা! 'সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝাড়ো!' এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে? কোথায় পাব?"[৪৬]

৪৬ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ২৯২-২৯৮

ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে-ব্যক্তির ছবিটি অধিকাংশ মানুষের মনে সাধারণতঃ ভেসে ওঠে তা হলো অসাধারণ অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী এক সাধক যিনি দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসীর যিনি আচার্য। তাঁর অপূর্ব উপদেশের মাধ্যমে তিনি আপামর জনগণকে ধর্মের পথে নিয়ে আসেন। অনেকে তাঁকে একজন অবতার বলেও মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি হলেন 'অবতারবরিষ্ঠ' অর্থাৎ ঐশী শক্তির বিচারে ভগবানের অন্য সকল অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর মার্কিন সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ঈশারউডের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কোন ব্যক্তি মাত্র নন বা কোন পবিত্র সাধু মাত্র নন, তিনি ছিলেন একটি অসাধারণ ঘটনা (phenomenon)। এরকম আরো নানা অভিধায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল বর্ণনাই ধর্মীয় ভক্তের ভাষা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কাজকে ভক্তের চোখ দিয়ে না দেখে যদি সমাজসচেতন, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত গবেষকের চোখ নিয়ে দেখা যায় তাহলে তাঁর যে-ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা হলো ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর বিরাট ভূমিকা। একদিকে যেমন বহু সহস্র বৎসরের ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে, অন্যদিকে তিনি হলেন আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবী। তিনি হলেন ভারতের অধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল, ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, আবার একই সঙ্গে ঊনবিংশ শতকে সমাজবিপ্লবের সবচেয়ে সাহসী উদ্বোধক। তিনি যেমন অবতারবরিষ্ঠ, আবার তেমনই একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকশিক্ষক। তাঁর প্রতিভা যেমন বহুমুখী, তাঁকে দেখার ও বোঝার পথও একাধিক। তিনি একই সঙ্গে সন্ন্যাসীর ও গৃহিভক্তের আচার্য। ধর্মীয় সংস্কারের ও সমাজবিপ্লবের মন্ত্রদাতা, উচ্চশিক্ষিতের এবং সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়ের ত্রাতা। সবকিছু মিলিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-ভূমিকা সমাজ-সচেতক গবেষকের কাছে প্রধানতম হয়ে দেখা দেয় তা হলো এই যে, তিনি পরাধীন ভারতবাসীর মন থেকে পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত হীনম্মন্যতাকে দূর করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর সরল অথচ গভীর উপদেশাবলী ভারতীয়দের বোঝাতে চেয়েছে যে, তারা জগতে অন্য কারোর থেকেই শৌর্যে-বীর্যে বা জ্ঞানে-বিদ্যায় কোন অংশে কম নয়। এক মহৎ মানবিকতার অংশ সবাই, সুতরাং জাত্যাভিমান অশ্রদ্ধেয় এবং পরিত্যাজ্য। আর যে-কোন মহৎ মানবতাবাদীর মতোই তিনি স্বদেশবাসীর হীনম্মন্যতা দূর করতে গিয়ে অন্যজাতির প্রতি বৈরিতা সৃষ্টি করেননি। কারণ তাঁর স্বদেশচিন্তা ছিল বৃহৎ মানবহিতচিন্তার একটি অংশ। ভারতবাসীর চেতনার নবজাগরণে তিনি যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন তার প্রকাশ প্রধানতঃ ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বাতাবরণে ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আদর্শ ও বাতাবরণের সামাজিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে এমন এক সাহসী পুরুষকে যাঁর প্রবল উপস্থিতি ও প্রবলতর কার্যধারার ফলেই সম্ভব হয়েছিল পরাধীন ভারতবাসীর পুনর্জাগরণ। ভারতবাসীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাকে স্পষ্টভাবে বহুল প্রচার করেছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রূপদান করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে বিপ্লবের যে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে সহিংস ও অহিংস পথে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল ঢেউ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রতি প্রান্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সবকিছুর মধ্যেই দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাব। ব্রিটিশ শাসনের রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে রচিত গোপন প্রতিবেদনে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখিত হয়েছে যদিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনরকম সংযোগ খুঁজে বের করা যায়নি। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ কাজ করে গেছেন মানুষের মনোভূমিতে যেখানে তিনি সযত্নে ও অনবদ্যভাবে আত্মশক্তির বীজ বপন করেছেন। কালে সেই বীজ থেকেই জন্ম নিয়েছে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ।

ইতিহাসের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সময়-সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্র সরকারি ব্যবস্থায় ভারতের পরাধীনতা শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরেই কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার নীতি হিসাবে বেন্টিঙ্ক-মেকলের নেতৃত্ব লর্ড বেন্টিঙ্কের ৭ মার্চ ১৮৩৫ তারিখের প্রস্তাব অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, এদেশে প্রাচ্য-শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সংস্কৃত-ফার্সীর স্থান নেবে ইংরেজী শিক্ষা। মেকলে আশা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে শিক্ষিত ভারতীয় গাত্রচর্মে কালো থাকলেও মননে ও রুচিতে হবে পুরোপুরি ইংরেজ এবং তার ফলে এদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থায়ী হবে। মেকলে প্রকৃতই একটি স্পষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন যা কার্যে পরিণত হলে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এই সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্যই যেন ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়াতেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। আর জীবনের পঞ্চাশটি বছর ধরে তিনি যে কাজ করে গেলেন, যেভাবে করে গেলেন এবং যে উপদেশাবলী রেখে গেলেন তার ফলে ভারতবাসীর মনে উচ্চ জাতীয়তাবোধের, বিশ্বমানবিকতাকে স্বীকার করেই এক প্রবল স্বদেশচিন্তা ও স্বাজাত্যাভিমানের উন্মেষ ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন তাঁর অভীষ্ট কর্ম সমাধা হয়েছে। ভারতের জাতীয়তাবোধ সাংগঠনিকরূপ গ্রহণ করেছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মিলনমঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠেছে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে যে-সংগঠনের সূত্রপাত হলো সেটি সাংগঠনিক পরিপূর্ণতা লাভ করল ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষাতেই বলা যায় যে, তিনি সারাজীবন 'এক হাত' ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখেছিলেন 'আর এক হাতে' জাতীয় আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করার জন্য কাজ করে গেছেন। যখন ভারতের জাতীয়তাবোধ সচেতন হয়ে সাংগঠনিক পথে তার জয়যাত্রা শুরু করেছে তখনই তাঁর কাজ শেষ হয়েছে মনে করে তিনি 'দুই হাতই' ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে বিদায় নিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ধাপে ধাপে ভারতকে কৃষ্টি ও রাজনীতির দিক দিয়ে পরাধীন করার কাজ সমাধা করে। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফার্সী ভাষার স্থানে ইংরেজীকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, সরকারি কর্মনিয়োগে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই দুই কারণে ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ—এই সময়টি ছিল প্রকৃত অর্থে **transitional period,** এবং হিন্দু-মুসলিম সকল ভারতবাসীর কাছেই এসময়কার পরিবর্তনগুলি এনেছিল একটা বিরাট মানসিক ধাক্কা (shock)। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ১৮৪৪-এর পর থেকে দ্রুত ফার্সীর বদলে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করে। এদের মধ্যে জমিদারশ্রেণী 'ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে ১৮৪৪-১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে এবং ব্রিটিশশক্তির সঙ্গে নানান সুবিধা প্রার্থনা করে আলোচনা চালাতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেকে ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এরপর ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক বিখ্যাত ডেসপ্যাচে একটি সামগ্রিক শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন যার ফলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বলা হয়। শিক্ষা ও কৃষ্টির দিক থেকে ভারতীয় মননকে পুরোপুরি পরাধীন করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। অল্পকালের ব্যবধানে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঘটে যায় মহাবিদ্রোহ যার পরিণতিতে কোম্পানীর প্রশাসন উঠে গিয়ে আসে সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন। ইংল্যান্ডের রানীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয় এবং ভারত-শাসনের পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ ক্ষমতা গ্রহণ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা। ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের উপনিবেশে। ইতিমধ্যে ওয়াহাবি বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনগুলিকে পরাস্ত করা হয়েছে। আর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজকে রূপান্তরিত করা হয়েছে প্রেসিডেন্সী কলেজে নতুন পাশ্চাত্যশিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা, বোম্বাই ও

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ও পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে ভারতবাসীর শক্তিসাধনার প্রতীক হিসাবে কাজ শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রানী রাসমণির উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হলো জগদীশ্বরী বা ভবতারিণীর মন্দির এবং সেখানে দেবীর পূজাসেবাদি কাজের ভার দেওয়া হলো গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে যিনি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে। এখন থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে শুরু হলো ভারতে জাতীয় জীবনে জাতীয় বনাম বিজাতীয় জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব। এই দুই জীবনাদর্শকে কূপমণ্ডুকের মতো অস্বীকার না করেও উভয়কে অতিক্রম করে তিনি এক উচ্চতর জীবনাদর্শ প্রচার করলেন যার মূল কথা হলো সর্বমতের সমন্বয়। তিনি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান সকল বিভেদ দূর করে ভারতে সমন্বয়ী ধর্মভাবনার সাহায্যে এক মহাজাতি গঠনের ভাবধারা গড়ে তুললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকা এই ডায়ালেকটিকস-এর (dialectics) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা জার্মানীতে জাতীয়তাবোধের জাগরণে মার্টিন লুথার, হার্ডার এবং ফিকটে প্রমুখ রোমান্টিক চিন্তাবিদগণের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। এঁরা সবাই জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন ধর্ম ও দর্শনচিন্তাকে কেন্দ্র করেই এবং আপামর জনগণের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন ধর্মীয় বাগধারাকে ব্যবহার করে। তাঁদের এক-একজনের কাছে, বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে, যুগপ্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিভিন্নভাবে, কিন্তু যেখানে এঁরা সবাই একমত তা হলো যুগ-প্রয়োজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই গণ-সংযোগের ভাষা ও রীতি নিরূপণ করতে হবে। দেশের আপামর জনগণের মধ্যে যদি আত্মশক্তির উদ্বোধন করে লোকশক্তি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে জাতীয় অবস্থা বিবেচনা করেই তাদের বোধগম্য রূপকল্প, ভাষা, বাগধারা, প্রবচন, গল্প, রূপক ও উপমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আর অন্য পথে সাফল্যলাভ দুরূহ হয়ে উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি ছিল বিশেষ কঠিন, কেননা তাঁকে যেমন পরাক্রান্ত বিদেশী রাজশক্তির পদানত সমাজে বাস করেই কাজটি করতে হয়েছে, তেমনই আবার তাঁর স্বদেশীয় সমাজটিও তখন ছিল নানা মত ও পথের টানা-পোড়েনে বিভ্রান্ত ও অস্থির। হিন্দুসমাজের অনেক সংস্কার ও অসুস্থ জীবনবোধের বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণের বাইরে না গিয়েও এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি সংগ্রাম চালিয়েছেন সাধারণ মানুষের বোধগম্য গ্রাম্যভাষায় ও কথনরীতিতে, দরিদ্র ও নীচুতলার মানুষের মতো বেশভূষা পরিধান করে এবং তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলকাতার ইংরেজীনবীশ, অর্থগৃধ্নু 'বাবু' সম্প্রদায়ের চালচলন থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সামাজিক বিচারে ছিলেন আজীবন সংগ্রামী ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিলেন একজন বিশেষ ধরনের বিপ্লবী। তাঁর বিপ্লব মানুষের মননে, রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ-সন্ধানে জীবনপাত করেছিলেন, কিন্তু জীবজগৎকে অস্বীকার করেননি। মাটির ওপর শক্তভাবেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, জীবনকে মায়া বলে উপেক্ষা করেননি। তিনি যেমন ঈশ্বর-প্রেমী ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন মানবপ্রেমী। দেশ ও কালের বিচারে তাঁর মনে হয়েছিল যে, ধর্মের পরিভাষা ব্যবহার করলেই তিনি সকল মানুষের মনে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবেন। বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করেন, সমাজ-সচেতন মানবপ্রেমী রামকৃষ্ণদেব ঠিক তেমনি তাঁর বিস্ময়কর কবি-প্রতিভায় যে অজস্র রূপক, প্রতীক ও উপমা ব্যবহার করলেন সেগুলির যথাযথ মর্মোদ্ধার করতে পারলে তবে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। তাঁকে কেবল ঠাকুর বা দেবতা হিসাবে মনে করে মনো-সিংহাসনে বসিয়ে রাখলে সেটা হবে আত্মপ্রবঞ্চনা। তদানীন্তন সামগ্রিক সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকাকে বুঝতে হবে

বাংলাদেশে তাঁর কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে আরো চার ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন

হয়েছিল ঃ (১) রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম আন্দোলন, (২) রাধাকান্তদেবের রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলন, (৩) 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর কালাপাহাড়ী আন্দোলন, এবং (৪) বিদ্যাসাগরের জনহিতৈষী সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে প্রকৃত ধর্ম বলে প্রচার করেন। আর ব্রাহ্ম আন্দোলন নারী-স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করে হিন্দুসমাজের মধ্যে গতিশীলতা আনতে চেষ্টা করে। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এসকল কাজে ব্রিটিশ রাজশক্তির সাহায্য নেন এবং সরাসরি Comprador bourgeoisie-র ভূমিকা পালন করেন। ভারতবাসীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে স্বাধীনচিন্তা করতে তাঁরা শিখিয়েছিলেন, কিন্তু মনে-প্রাণে ও কাজে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশে পাকাপোক্তভাবে থেকে যাক। দ্বিতীয় আন্দোলনটি প্রধানতঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের এবং বিদেশী মিশনারীদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের মুখে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতেই তার সব যুক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করে। রাজা-জমিদারদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষাকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজনেতারা তাঁদের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ ও অন্যদিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই দুই পক্ষের সমর্থন নিয়ে তাঁরা এগিয়েছিলেন। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগরণে এই রক্ষণশীল আন্দোলনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। তৃতীয় আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ কিছু বিপথগামী ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের আন্দোলন। মূলতঃ কলকাতা-কেন্দ্রিক এই আন্দোলনের নেতারা হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে আনন্দ পেত এবং গোলদীঘিতে বসে প্রকাশ্যে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে উচ্ছিষ্ট অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারত। এরা শুধু ভাঙতে চাইল, গড়তে পারেনি কিছুই। ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে এদের দান উপেক্ষণীয়। চতুর্থ আন্দোলনটি প্রায় একজনমাত্র ব্যক্তিকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়েও তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেছেন। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজ থেকে অল্পবয়সী বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং শেষপর্যন্ত রাজশক্তির সহায়তায় এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করাতে সক্ষম হন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং শেষ জীবনে দেশবাসীর ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এসকল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনগুলি তাঁদের শক্তি হারিয়ে ফেলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই। ভারতবাসীর মননে নেমে আসে বিভ্রান্তি, হতাশা ও পরাধীনতাজাত এক ধরনের হীনমন্যতা। ভারত ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে মাতৃরূপে শক্তির আরাধনা শুরু করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু বিপ্লবী রামকৃষ্ণ শক্তির আরাধনাতে আনলেন নতুন পদ্ধতি ও নতুন ভাবধারা যা দ্রুত ভারতবাসীর মন থেকে সকল বিভ্রান্তি ও হীনমন্যতা দূর করতে সাহায্য করে এবং দেশবাসীর মনে নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে একনিষ্ঠতা জাগিয়ে তোলে। তিনি স্বদেশবাসীদের নিজের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ দূর করেন, এবং এক অপূর্ব সমন্বয়ী ধর্মের বাণী প্রচার করে ভারতের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধকে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে তোলেন। আধ্যাত্মিক জাতীয় সংহতি শীঘ্রই রাজনীতিক জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। জার্মানীতে যাকে বলা হয় 'volk' ইংরেজীতে তাকে বলে 'folk', সে ধরনের জাতীয় জনসমাজের চেতনা ভারতে সৃষ্ট হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং সেই ভারতচেতনার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁর তিরোভাবের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ও ভারতের বিপ্লবীদের ওপর তাঁর প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাজ গভীর অর্থব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। আপাতদৃষ্টিতে একজন অপ্রকৃতিস্থ সাধু বলে তাঁকে সেকালে অনেকে মনে করেছিলেন, কিন্তু দেশকালের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে তাঁর ব্যক্তিত্ব, কাজকর্ম ও কথা সবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা বুঝতে পারব। ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আগে থেকেই সমাজবিপ্লবীরূপে গদাধর চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন হিন্দুসমাজকে প্রবলভাবে

ধাক্কা দিতে থাকেন। বাল্যে উপনয়নের সময় তিনি জিদ ধরে ধনী কামারনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজে কুলীণ ব্রাহ্মণ-পরিবারের অন্তর্গত হয়েও কৈবর্ত রানী রাসমণির মন্দিরে যাজনবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি চাল-কলা বাঁধা পুরুত হতে অস্বীকার করেন। দক্ষিণেশ্বরে পূজার সময় শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ না করে ভবতারিণীর কাছে আকুল হয়ে আত্মনিবেদন করেন যাতে অনেকেই তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে সন্দেহ করেন। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন যে, তিনি 'বাবু' হতে পারবেন না অর্থাৎ তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে তাঁর এসকল কাজ ও ব্যবহার ছিল হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেওয়া। যদিও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর কোন রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না, তবুও দেখা যায় যে, এই ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ অধীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও চিৎকার করে বলছেন ঃ "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়"। এ যেন সহজ ভাষায় সেই কবির আহ্বান ঃ "মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা / সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—/আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥" এই মা ভক্তের কাছে মৃন্ময়ী ভবতারিণী কিন্তু অন্যের চোখে তা চিন্ময়ী দেশমাতৃকা।

সমাজে প্রচলিত অত্যাচার ও কুপ্রথা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিভাবে ইংরেজশাসন-সৃষ্ট জমিদার-প্রশাসনের প্রশ্রয় তার নিজস্ব সম্পত্তি বাড়াবার জন্য অন্যকে ভিটেমাটি ছাড়া করে সে অভিজ্ঞতা তাঁর পিতার ভাগ্যেই ঘটেছিল। তাঁদের পরিবারকে নিজস্ব ভিটে ছেড়ে কামারপুকুরে চলে আসতে হয়েছিল। আবার তিনি এটাও স্বচক্ষে দেখেছিলেন কিভাবে ভারতের সাধারণ মানুষ 'অন্নগত প্রাণ' হয়ে পড়েছে। টাকা রোজগারের জন্য মনিবের কাছে কাজ করে এবং সেই অর্থে পরিবার প্রতিপালনেই তার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। বিদেশী রাজশক্তি ও তার পুষ্ট সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের অনুতপরায়ণতা এবং সাধারণ অন্নগত মানুষের হীনম্মন্যতা দেখে দেখে তিনি মনে মনে পীড়িত হতেন। অথচ বুঝেছিলেন যে, এখনই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখছে। নিজের জীবনের পরিবেশ ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না জন্মালে তার নিজস্ব 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' হয় না। এই মানসিক দৈন্য ও ক্লীবতা দূর করতে না পারলে স্বাধীন হওয়া যায় না, কেননা আত্মশক্তির উদ্বোধন না হলে যথার্থ দেশপ্রেম জন্মায় না এবং মানুষের মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শের জন্য কাজ করার ইচ্ছেও সৃষ্টি করা যায় না। সেই ধর্মের চেয়ে বড় আদর্শ নেই যে-ধর্মে অনুপ্রাণিত হলে মানুষ তার ক্লৈব্যভাব ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মের জন্য উদ্যোগী হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যত কথা বলেছেন তার সারকথা হলো "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।" উপনিষদেও রয়েছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। রয়েছে "চরৈবেতি চরৈবেতি" অর্থাৎ অলস নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে আস্থা রেখে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং চলতে হবে সামনের দিকে। এদেশের মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প-রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে এগিয়ে চলার, আত্ম-উদ্বোধনের শিক্ষাই দিয়েছেন। সেজন্যই জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতির জাগরণে যেটা সবথেকে বড় প্রয়োজন তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-স্বীকার ও কর্মপ্রবৃত্তি। মনে হয় যেন হাতে ধরে সবাইকে তিনি এইগুলি শেখাতে চেয়েছেন তাঁর কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে। দক্ষিণেশ্বরে শক্তিময়ীকে পূজা করতে এসে তাঁর প্রথম প্রার্থনায় দেখা গেল পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ধর্ম-অধর্ম সবকিছুর পরিবর্তে শুদ্ধা ভক্তিলাভ করার জন্য আকুলতা। সবকিছু তিনি ছাড়তে রাজি কিন্তু বলতে পারেননি সত্যকেও ত্যাগ করলাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। তাঁর একটি প্রধান উপদেশ হলো ঃ 'সত্যে আঁট হয়ে থাক'। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো অন্তরাত্মার মুক্তি। এই মুক্তিলাভ হলে তবেই ঘটবে মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার প্রস্ফুটন আর অন্তরাত্মার মুক্তি আসবে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি ও

তাঁর প্রেমময়তাতে অটুট বিশ্বাস থেকে। কথাগুলি যে আধ্যাত্মিক ভাবধারার দ্যোতক ও বাহক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভাবধারার সামাজিক তাৎপর্য ছিল এই যে, বিদেশী রাজশক্তির চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে আছেন মানুষের প্রকৃত প্রভু; সুতরাং ক্ষমতার চাকচিক্য ও প্রভাবের জন্য বিদেশী মনিবের কাছে নিজের অন্তরাত্মা বিকিয়ে দেওয়া উচিত নয়; তা হবে ভারতবাসীর পক্ষে এক চরম অধর্মের কাজ।

হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের তিন প্রধান মার্গ নির্দেশিত হয়েছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, তিন মার্গেই আরাধ্যলাভ হয়, তবে আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় ভক্তিমার্গই অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান হলো সূর্যের মতো, তার উদয় হলে সব পরিষ্কারভাবে জানা-বোঝা যায়। কর্ম নিষ্কাম হলে কোন পিছুটান জন্মায় না, তাতেও মুক্তিলাভ হয়। সামাজিক দায়িত্ব ও সচেতনতা সহযোগে কর্ম করলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। আর ভক্তিরসে মুক্তির ধারণা জমাট রূপ নেয়। ভক্তির পথ সহজ পথ, শুধু প্রেম ও বিশ্বাস নিয়ে ধরে থাকতে হয়। ঈশ্বরভক্তি থেকে দেশভক্তিরও প্রেরণা আসে ভক্তদের মনে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় সে দেশভক্তি হতে হবে খাঁটি, তাতে ভেজাল থাকলে ইষ্ট সিদ্ধ হবে না অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। এর থেকেই জন্ম নেয় ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতা, কাজে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের সততা। খাঁটি মানুষ তৈরির কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ দেশবাসীর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাজটি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়তার আন্দোলনে জোয়ার আসতে পারেনি।

জ্ঞানকে কর্ম ও ভক্তি দিয়ে সঞ্জীবিত করতে হয়, নয়তো জ্ঞান জীবনকে শুষ্ক করে দেয়, মানুষকে নির্মম করে তোলে। তিনি ধর্মের কচকচানিকে বিদ্রূপ করেছেন। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই তর্ক যে অর্থহীন তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলছেন: "জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর নিরাকার আর ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার।" আবার বলেছেন: "ভক্তের কোন জাত নেই।" সুতরাং ভক্তি জন্মালে জাতিভেদ চলে যাবে। তাঁর কথার মর্মোদ্ঘাটন করে বলা যায়, এই ভক্তি যখন দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি বোঝাবে তখন আর জাতবিচারের ঝগড়া থাকার সুযোগ থাকে না।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে মানুষে মানুষে যে হানাহানি তা-ও অর্থহীন, অন্ততঃ এ-ধরনের কলহের পেছনে ধর্মের কোন সমর্থন নেই। তিনি তোতাপুরীর কাছে এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে সাধনা করেছেন। তিনি উপবীত ত্যাগ করে সুফী সাধক গোবিন্দ রায়ের কাছে ইসলাম ধর্মে সাধনা করেন। আবার অন্য সময় সবকিছু ছেড়ে যীশুর ভাবে তন্ময় হয়ে সাধনা করেছেন। দেখেছেন সব মত সব পথ একই জায়গায় নিয়ে যায়। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন: "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, জ্ঞানিগণ তাঁকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই তাঁর সকল প্রকার সাধনার পর ঘোষণা করলেন অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী "যত মত তত পথ"। যারা শুধু নিজের মতকেই সত্য ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করে এবং অন্যের মতকে ভুল বলে প্রচার করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তাদের হলো 'মতুয়ার বুদ্ধি' যা তিনি পরিহার করতে বলেছেন। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতপাতের ক্ষুদ্র আচার-বিচারে যে ভারতীয় জনজীবন শতধা-বিভক্ত ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে একথা বলা খুবই বৈপ্লবিক কাজ, সন্দেহ নেই। ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি ভারতীয় জনসমাজ ও তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির প্রথম ধাপ শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী। জাতীয় ঐক্যসাধনা থেকে মানবজাতির ঐক্য-সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথেই হবে একথা স্বামী বিবেকানন্দ, রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সমুলার থেকে অরবিন্দ, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আর্নল্ড টয়েনবী সবাই বলেছেন তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মননে বুদ্ধিবিভাসার (enlightenment) পূর্ণ বিকাশ ও তার সঙ্গে মানবাত্মার উদ্বোধন। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে ভোলতেয়র, দিদেরো, রুশো এবং জার্মানীতে কান্ট, হার্ডার, ফিকটে সবাই মিলে যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন ভারতে সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ একা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রচণ্ড কর্মযোগের মাধ্যমে তাঁর গুরুদেবের বাণী প্রচার করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে গতি সঞ্চার করেছিলেন সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দের সমস্ত চিন্তা-

ভাবনার উৎস তো শ্রীরামকৃষ্ণই। তাঁর ভাবে উদ্দীপিত শিষ্যগণ তাঁদের ভাবপ্রচার মুখপত্রের সার্থক নামকরণ করেছেন—'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার আর একটি প্রধান দিক হলো বেদান্তের অদ্বৈত দর্শনের ফলিত ব্যবহার। "যত্র জীব তত্র শিব" এই দর্শন থেকে এল তাঁর শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার উপদেশ। বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি বলেছিলেন 'জীবে দয়া' কথাটা ঠিক নয়। এক মানুষ অন্য মানুষকে দয়া করতে পারে না, কারণ সকল মানুষের মধ্যেই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ। মানুষের সাধ্য কি অন্যকে দয়া দেখায়, বরং মানুষের কর্তব্য হলো ঈশ্বর জ্ঞানে সকল জীবের সেবা করা। সেদিন তাঁর কথা স্বকর্ণে শুনেছিলেন তাঁর প্রিয়তম পার্ষদ নরেন্দ্রনাথ যিনি সেদিন রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলেন। এই কথা থেকে এক অপূর্ব আলো বা নতুন জীবন-দর্শন লাভ করেছিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গেই মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন যে, যদি কোনদিন সুযোগ আসে তবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে কার্যে রূপায়িত করবেন। বিবেকানন্দের সেই সংকল্পের ফল 'রামকৃষ্ণ মিশন' যে-প্রতিষ্ঠানটি তাঁর জন্মলগ্ন (১৮৯৭) থেকে আজপর্যন্ত 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করার মহৎ কাজে নিরলসভাবে ব্যাপৃত। পরবর্তী কালে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন ও নরনারায়ণ সেবার অনুপ্রেরণা এসেছিল এই জীবনদর্শন থেকেই। রামকৃষ্ণ মিশন তার কাজকর্মের মাধ্যমে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করে ফেলে এবং অনেকাংশে সেজন্যই একসময় ব্রিটিশরাজের সন্দেহের বস্তুতে পরিণত হয়। মিশনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের প্রসঙ্গ আলোচনার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ উল্লেখযোগ্য বক্তব্যটি লক্ষ্য করা যাক।

যেদিন তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন সেদিন সমাগত ভক্তবৃন্দকে তিনি শুধু এই কথাই বলেছিলেন: "তোমাদের চৈতন্য হোক।" সমাগত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে কথাটি উচ্চারিত হলেও সেটি উদ্দেশিত ছিল ভারতবাসী তথা মানবজাতির প্রতি। এই ক্ষুদ্র অথচ গভীর অর্থবহ কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনার্থ রয়েছে তার মূল কথা হলো চেতনার বিপ্লব না হলে অন্য কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে এটাই ছিল তাঁর প্রায়-শেষতম আশীর্বাণী ও মহত্তম শুভেচ্ছা। ঘটনাটি ঘটে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি আর সে বছরের আগস্ট মাসেই তাঁর তিরোধান ঘটে। এই বছরই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদিগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলগত মতান্তর দূরে সরিয়ে একটি সাধারণ জাতীয় মঞ্চে মিলিতহয়ে ভারতবাসীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করেন।

রামকৃষ্ণ জীবনদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীজাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সন্ন্যাস নিলেও গৃহে বাস করতেন এবং সহধর্মিণীকে ত্যাগ করেননি। পুরুষের কর্মযজ্ঞে নারীর অংশগ্রহণ যে প্রয়োজনীয় সে-কথা তিনি বুঝেছিলেন এবং বেশি করে যা বলার চেষ্টা করেন তা হলো নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিলে মানুষের সামগ্রিক প্রচেষ্টা হবে খণ্ডিত ও সাফল্যও পূর্ণাঙ্গ হবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল গান্ধীজীর আহ্বানে বিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। কিন্তু ভারতীয় নারীর সামাজিক ভূমিকা ধর্মীয় ভাষায় আভাসিত হয়েছিল তার অনেক আগে রামকৃষ্ণ-সারদার সম্পর্কের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কাজে সকল সময় সহায়তা করতেন তাঁর স্ত্রী সারদাদেবী যাঁকে তিনি একদিন জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রকাশ হিসেবে পূজো করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় মননে এই ঘটনা ছিল বিপ্লবের সামিল, কিন্তু একদিনের এই ঘটনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বোঝাতে চাইলেন তা হলো নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় তার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে দিলে তবেই ঘটবে পরিপূর্ণ জাতীয়তার উন্মেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি প্রতীকী ঘটনা ঘটেছিল যেদিন গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তিনি একহাতে মাটি আর অন্যহাতে টাকা নিয়ে অনেকক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঝুলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্তিলাভ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি ধনসর্বস্ব, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগাসক্ত জাতিকে ধিক্কার জানাতে চেয়েছিলেন। সারাজীবন টাকা না ছুঁয়ে এবং স্ত্রীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত না হয়ে তিনি যে-জীবনাদর্শ স্থাপন করলেন তা

থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ভারতের হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে বিপ্লবী যুবসমাজ—যাদের প্রধান ছিলেন আধুনিক সমাজসচেতন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মননের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ।

নরেনকে বিবেকানন্দ হিসাবে গড়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। তাঁর নিজের কাজ প্রায় শেষ বুঝতে পেরে তিনি নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান তাঁর স্বোপার্জিত সব শক্তি। তখন নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে চাইলে তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন এই বলে যে, চরম স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের মুক্তি চাওয়া অন্যায়। স্পষ্টভাষায় নরেনকে বলেছিলেন, তাঁকে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি তৈরি করেছেন। আর নরেন সে-কাজে তার অসামর্থ্যের কথা তুললে তিনি জোরের সঙ্গে বলেনঃ "তোর ঘাড় করবে"। অন্যদিকে স্ত্রী সারদাদেবীকেও তিনি ছাড়েননি। তাঁর জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি সারদাদেবীকে বলেন, তিনি স্থূলদেহে না থাকলেও তাঁর কাজ সারদাদেবীকে করে যেতে হবে। বললেনঃ কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে, তাদের দেখাশুনা করে মানুষ করতে হবে সারদাদেবীকে। স্ত্রী ও প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণের এই কথোপকথন পুরোপুরি ব্যঞ্জনাময়। ভারতের যে নবজাগরণ ঘটছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটাতে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এবং পরবর্তী যে-কাজ বাকি ছিল তার জন্য প্রয়োজনীয় চাপরাশ দিয়ে গেলেন স্ত্রী সারদাদেবীকে এবং প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে।

জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর ভূমিকাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের উচ্চশিক্ষিত নেতাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছেন কখনো নিমন্ত্রিত হয়ে আবার কখনো নিমন্ত্রিত না হয়ে। কারণ যুগপ্রয়োজনটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। সমাজনেতাদের সহযোগিতা ছাড়া সামগ্রিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব নয় জেনেই সাক্ষাৎ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। নিজের কাছে টেনে এনেছিলেন নরেন্দ্রনাথের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক থেকে আরম্ভ করে লাটুর মতো গৃহভৃত্য এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ধর্মজিজ্ঞাসুদের। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিলেন চরিত্রহীন গিরিশচন্দ্রকে, নটী বিনোদিনীকেও। বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা করেছেন তাঁর দয়ার জন্য। দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর ভগবদ্ভক্তির জন্য সম্ভ্রম জানিয়েছেন, বিজয়কৃষ্ণ-শিবনাথের চরিত্রের প্রশংসা করেছেন, কেশবচন্দ্রকে ভালবেসেছেন তাঁর ভক্তি ও বাগ্মীতার জন্য গিরিশকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন আর বিনোদিনীকে বলেছেন তার যেন চৈতন্য হয়। আরো কত কৃতী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন তিনি, যেমনঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), রামচন্দ্র দত্ত, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি। এঁদের সবার সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে অসাধারণ ভাবের কথা বলেছেন। সবাইকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের মহত্ত্বের কথা। মানুষ পাপের সন্তান নয়, সে আনন্দের সন্তান, সে পরম ব্রহ্মের অংশ। আর বলেছেন মানুষের একমাত্র কাজ হলো একনিষ্ঠ হয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাওয়া, কারণ কর্ম ছাড়বার যো নেই। তিনি নিজে অনেক চেষ্টা করেও কর্মত্যাগ করতে পারেননি, স্বদেশবাসীদের তাদের বিরাট ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার বিরাট কাজটি তাঁকে করতে হয়েছে। ছাগলের দলে ব্যাঘ্রশাবকের রূপক গল্পের সাহায্যে ভারতবাসীদের তাদের বিরাট আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। মনুষ্যত্বের অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন নানান গল্পের মাধ্যমে, রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ভাবের ঘরে কোন ফাঁকি ছিল না। শিশুর সারল্য নিয়েই তৎকালীন দিশেহারা সমাজকে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে সমগ্র সমাজের জীবনকে যোগ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর 'গানের পসরা' ব্যর্থ হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, মানুষকে মানসিক ভীরুতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। সকলের সঙ্গে মিশেছেন আর সকলকে বলেছেন যাচাই না করে কিছু গ্রহণ না করতে, এবং যাচাই-পরীক্ষা না করে তাঁর কথা মেনে নিতেও নিষেধ করেছেন। নরেনের (স্বামী বিবেকানন্দের) ও যোগীনের (স্বামী যোগানন্দের) মনে তাঁর নিজের আচার-

বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্রই তিনি খুশি হয়ে তাদের স্বাধীন মনের তারিফ করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে কোন ধর্মীয় ব্যক্তির এমন জোরালো কণ্ঠস্বর খুব কমই শোনা গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। শ্রীরামকৃষ্ণের জাতীয়তাবোধের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক, কিন্তু চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল সামাজিক। আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধের যে দীপ তিনি জেলেছিলেন কয়েকটি প্রাণে, তা দ্রুত শত শত ভারতীয়ের প্রাণে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গর্ববোধ না জাগলে স্বদেশভক্তি জাগে না এবং স্বদেশভক্তি ব্যতীত জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়ে গেলেন আর তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে থাকল ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে শুরু করে। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার রূপকার্থ ও ব্যঞ্জনা বাংলার বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করেছিল যখন পরাধীন ভারত সেই মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেল তাঁর বার্তাবাহক স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্য দিয়ে।

দেশাত্মবোধের উন্মেষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি জিনিস—কর্মে নিষ্ঠা ও ত্যাগব্রতে দীক্ষা। এই দুটির উৎস নিহিত থাকে অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে। ভারতীয় তরুণদের পক্ষে দেশকে মাতারূপে কল্পনা করা এবং তাঁর জন্য সর্বস্ব পণ করে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী তাদের কাছে পৌঁছাল। দেশমাতা আর জগন্মাতাকে অভেদ কল্পনা করা ছিল প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মানসিক চরিত্র। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন বঙ্কিম-চন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং এই তত্ত্ব বিপ্লবীদের কাছে তথা জাগ্রত জনমানসে প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ। স্বদেশের রাজনৈতিক মুক্তি জাতীয় বিকাশের জন্য অপরিহার্য—এমন কথা তখনই সোচ্চার হয়ে উঠল যখন ভারতবাসী অতীতের গৌরবের কথা ও মানুষের মহত্ত্বের কথা ভালভাবে বুঝতে পারল। অরবিন্দের চোখে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ছিল এক ধর্মযুদ্ধ এবং এই ধর্মযুদ্ধের প্রথম অগ্রদূত হিসাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই প্রত্যূষের আগমনবার্তা বহন করে আনে একদল পাখি। ভারতে জাতীয়তা-বোধের জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভোরের পাখির ভূমিকাই পালন করেছিলেন।

অরবিন্দ তাঁর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকাটিতে (১৯০৩) শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকার কথা বারবার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে রামকৃষ্ণের জীবনসাধনা এই মহান বাণীই প্রচার করে গেছে যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বর আছেন এবং আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের তেজ। ভারতবর্ষের ওপর অর্পিত হয়েছে মানুষের ঐক্যসূত্রসন্ধানী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার ভার। আর এই কাজটি আরম্ভ করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই ধর্ম প্রচার করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অরবিন্দ সকলকে স্মরণ করতে বলেছেন যে, যিনি কালী তিনিই ভবানী, শক্তিদায়িনী মা, যাঁকে দক্ষিণে-শ্বরে পূজা করতেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। পরে তিনি বলছেন, "শক্তিলাভ করতে হলে শক্তিস্বরূপা জগদম্বাকে পূজা করার প্রয়োজন। আমাদের জাতির চাই শক্তি। শক্তি এবং অধিকতর শক্তি।" বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে রচিত কলকাতার গোয়েন্দা পুলিস-প্রধান টেগার্টের রিপোর্টে (১৯১৪) 'ভবানী মন্দির' রচনা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে।

অরবিন্দের জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাধারায় সঞ্জীবিত ছিল। তাঁর মতে ভারতের "জাতীয়তার আন্দোলন হচ্ছে একটি ধর্ম যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করব। এ একটা ধৃতি যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই।" এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন: "আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য মতবাদে আস্থাবান কোন ব্যক্তি হয়তো বলিয়া বসিবেন, 'এই লোকটি জ্ঞান-হীন। কি সে জানে? আমি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, আমাকে সে কি বা শেখাবে? কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ঘটাইয়া তুলিতেছেন।... আজ ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম হইতে শিক্ষিত জনগণ—যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা যাঁহাদের অধিগত—তাঁহারা এই তাপসের পদপ্রান্তে আসিয়া নিপতিত হইতেছেন। তাই আমি

বিশ্বাস করি মুক্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"

'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেনঃ "যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম-প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেম তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান।...শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলতেন—'তুই যে বীর রে।' তিনি জানিতেন যে, নরেন্দ্রনাথের ভিতর যে-শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বে-পরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্বাণী স্মরণ রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে'।"

অরবিন্দের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, আলিপুর বোমার মামলার প্রাক্কালে দক্ষিণেশ্বরের কিছুটা পবিত্র মাটি তিনি শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখতেন। তাঁর বাসস্থান তল্লাসী করার সময় পুলিস উহাকে বোমা তৈরির মশলা মনে করে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর পুলিস অফিসার ক্লার্ক সাহেব মাটিকে মাটি বলে চিনতে পারেন এবং তা রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাঠানো প্রয়োজনীয় নয় বলে সিদ্ধান্ত করেন। এই মাটি রাখার ব্যাপারে অরবিন্দের যে বিশ্বাস প্রকাশ পায় তা হলো এ যুগের বিস্ফোরক শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-স্পর্শরঞ্জিত দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে আত্মগোপন করে আছে।

অরবিন্দ ব্যতীত, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারাও স্বীকার করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাচ্ছে এবং মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অগ্নিযুগের তরুণদের সমিতিগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে নিত্যপূজা করা হতো। অরবিন্দ-বারীন্দ্র ছাড়াও অন্ততঃ আরো দুজন বিপ্লবী নায়কের কথা জানা যায় যাঁদের জীবন এবং চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। এঁদের একজন রাসবিহারী বসু। টেগার্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে ইনি পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে (মার্চ ১৯১৪) পুলিস রামকৃষ্ণের আলোকচিত্র সহ মিশনসংক্রান্ত পুস্তিকাদি খুঁজে পায়। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধানের সময় পুলিস জানতে পারে যে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের হরিদ্বার কনখল শাখার সদস্য ছিলেন। অন্য বিপ্লবীর নাম হেমচন্দ্র ঘোষ যিনি বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো শত শত বাঙালী যুবককে দেশমাতার সেবায় জীবনপণ করে সবস্ব ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন। [স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে হেমচন্দ্র ঘোষের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে।] টেগার্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি দিগ্বিদিকে প্রচার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের সর্বত্র মিশনের শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দেন এবং তাঁর সেই আদেশ বিপ্লবীরা চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলায় বিপ্লব-যুগে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি-গুলিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পাঠ শুনিয়ে তরুণ কর্মী সংগ্রহ করা হতো। বিপ্লবীদের পরিচালিত পাঠাগারগুলিতে 'কথামৃত' বইটি ছিল অবশ্য পাঠ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মুক্তিমন্ত্রের কাজ করতো এবং তার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ দেশসেবার জন্য জাতীয়তার মন্ত্রে আকৃষ্ট হতো। পুলিসের কাছে বা আদালতে বিচারের সময় বহু বিপ্লবীর জবানবন্দী থেকে এ কথা জানা যায়। ১৯১০—১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুলিসের জেরার উত্তরে বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবীই নিজেদের স্পষ্ট ভাষায় "রামকৃষ্ণের অনুগামী" বলে অভিহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করার উপদেশ বিবেকানন্দের ভাষায় অনুরণিত হয়ঃ বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে

প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা এবং বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে আর্ত-পীড়িতের সেবার কাজে বিপ্লবীদের সোৎসাহে শ্রমদান করতে দেখা যেত বাংলার গ্রামে-শহরে। টেগার্ট রিপোর্ট স্পষ্টভাবেই এখানে রামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে। স্বদেশবাসী ও জন্মভূমির সেবা ও তার মঙ্গলের জন্য সর্বস্বত্যাগ হলো ধর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণা বিপ্লবকার্যে ইন্ধন যুগিয়েছিল বলেই টেগার্টের মনে হয়েছিল।

ভারতে বিপ্লবী কাজকর্মের অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে গঠিত সিডিশন কমিটিকে। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে (১৯১৮) বিপ্লবীদের ওপর বিবেকানন্দের মাধ্যমে সাধক রামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাবের উল্লেখ করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু একজন ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ আধ্যাত্মিক পুরুষমাত্র ছিলেন না, তাঁর মধ্যে কোটি-কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। তাঁর সমন্বয়ী ধর্মভাবনা ভারতে সাম্প্রদায়িক সংহতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তাঁহার ধর্ম জীবনমুখী যার কেন্দ্রস্থলে আছে মানুষ, শাস্ত্র নয়। তিনি কোন নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করতে বসেননি। গণমানুষের জয়কে তিনি বড় করে দেখিয়েছেন এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে নতুন ও চমকপ্রদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে-কারণেই ভারতাত্মার প্রতীক, আধুনিক যুগে আমাদের আদর্শ পুরুষ। তাঁর সংগ্রাম না ছিল সাম্প্রদায়িক, না ছিল রাজনৈতিক। তিনি কোন সংগঠন বা দল গঠন করেননি। ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধ অনাবিষ্কারের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন ভাবলোকে (world of ideas)। তাঁর সাধনা ছিল জাতির আত্মশক্তি উদ্বোধনের সাধনা। সেজন্য লোকশিক্ষার ওপর অত জোর দিয়েছিলেন এবং জোর করে স্ত্রী সারদা-মণিকে ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এই কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও বাণীতে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর জীবনে জেগে উঠেছিল নতুন প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও ক্ষাত্রতেজ। ভারতের অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনসমাজ ফিরে পেয়েছিল আত্মসম্মান। স্বধর্মে হতাশাগ্রস্ত ধর্মত্যাগীরা আপনধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন আলোর সংকেত পেয়েছিলেন। তিনি কোনদিন আপন গৌরব প্রচার করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতা ও সিদ্ধাই দেখাননি। শুধু ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন। সকলকে শিখিয়েছিলেন যে, মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মানুষী চরিত্রের অন্বেষণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদর্শ মনুষ্য রূপে লোকালয়ে আসেন। এই ধরনের মানুষ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন না কিন্তু নিজে মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণরাজিতে ভূষিত হয়ে স্বকার্য সাধন করেন। যুগ প্রয়োজনেই এই ধরনের আদর্শ মানুষ আসেন এবং প্রয়োজনীয় যুগধর্ম প্রবর্তন করে বিদায় নেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের স্থূল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নয়। কিন্তু চরিত্রের মহত্ত্বে তিনি অন্যের চোখে দেবত্ব লাভ করেছেন। লোকহিত পরিত্যাগ করে তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব ইত্যাদি কচ্‌-কচানিতে নিবদ্ধ না থেকে লোকহিতার্থে কর্ম করাই যথার্থ ধর্ম এবং এই ধর্মই জাতীয়তার প্রথম ধাপ, কেননা এর দ্বারাই জাতির বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার মূল কথাগুলি হলো পরমত-সহিষ্ণুতা, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, সকল মানুষের সাম্য, দরিদ্র ও অবহেলিতের প্রতি ভালবাসা, সকল মানুষের মধ্যে উদ্যম ঐক্য ও তাদের চৈতন্যের বোধন। এই লোকশিক্ষার ধর্মই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব

কুমুদবন্ধু সেন

[বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে ; তথাপি ঐ অবিস্মরণীয় ঘটনার জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্তমান লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যযুক্ত এই যে স্মৃতিধ্যানটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।]

প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর আগেকার কথা। সেই পুণ্য স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একদিন এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ-সমেত বেলুড় মঠের দুর্গোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মৃতির অর্ঘ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব।

বাংলা ১৩০৮ সাল—ইংরেজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬ আশ্বিন, শনিবার। বেলুড় মঠে গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। কয়েকমাস পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যা-তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাবজ্যোতিতে দীপ্তিমান্। আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জ্বল। মহালয়ার দিন মঠে শুনিলাম, বেলুড় মঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইবে, ইহা ঠিক হইয়াছে।

সুহৃদ্বর, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রীশ্রীমা দশভুজার পূজার সঙ্কল্প স্বামীজীর মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু মহালয়ার পূর্বে বহুবার যাতায়াত করিয়াও কাহারও নিকট স্বামীজীর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্ণে পশুপক্ষীদের লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বিল্বমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি মধুরকণ্ঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—বোধনের গান।

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী॥
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি॥"

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল -স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতলায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। পরদিন রবিবার প্রাতে একটু বেলা হইলে স্বামীজী নিচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গাতীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত পূজার আয়োজন এবং নানাবিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। নানাস্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে, জাতিবর্ণনির্বিচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পূজার দিবসত্রয় প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ করিবার কথা হইল। স্বামীজী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে বলিলেন—"খরচের জন্য ভাবনা নেই—মহামায়ার ইচ্ছা, তা পূর্ণ হবে। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে মা ঠাকরুণ

সদলবলে থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়া দেবে না—তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে।" মহারাজ বলিলেন, "ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও কুমোরই এত অল্প সময়ে নূতন প্রতিমা তৈয়ার করতে রাজী হলো না। তৈয়ারী প্রতিমা তো কৃষ্ণলাল* পেলে না। একজনের মাত্র একখানি ফরমাশী প্রতিমা আছে, ৫।৭ দিন পূর্বে তার নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়নি। কৃষ্ণলাল ঐ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে—খুব ইতস্ততঃ করছে, আরও দুদিন অপেক্ষা করতে চাইছে।"

স্বামীজী বলিলেন, "বাবুরাম, তুই যা কৃষ্ণলালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে প্রতিমাখানি কিনে ফেল। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, তোরা গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমিও তোদের সঙ্গে কলকাতায় যাব।"

গুরুভ্রাতারা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল থাকলে, তবে তো আনন্দময়ীর উৎসবে সকলে আনন্দোৎসব করতে পারবে।"

স্বামীজী বলিলেন, "মার কৃপায় ভাল থাকব, ভাবিসনি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে নিমন্ত্রণের পর সিমলায় আমার মার কাছে যাব, তাঁকে পুজোয় মঠে আসতে বলব। আজ রবিবার, এখনই নৌকা ঠিক কর, আর দেরি করা হবে না। প্রতিমাখানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।"

কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) নিকট শুনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাখানি চারিদিক আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়াই রাজা (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ আসিলে তাঁহাকে "এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়োজন কর" বলিয়াই স্বামীজী তাঁহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মহারাজও বলিলেন, "মঠে এই বেঞ্চিতে বসে গঙ্গাদর্শন করছি—এমন সময় দেখি, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে একেবারে বেলতলায় উঠলেন।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক, এবার মঠে পুজো করতেই হবে।" মহারাজ বলিলেন, "সময় সংক্ষেপ আগে প্রতিমা পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে—দুদিন পরে তোমাকে কথা দেব।" এদিকে মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা আয়োজন ও নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব—স্বামীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে?

যে প্রতিমা কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক আর আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থিত মূল্য দিয়াই কিনিলেন।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন, ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুরঘরের নিচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি—আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—"

স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতার বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা

* পরে স্বামী ধীরানন্দ

হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীজগজ্জননী দুর্গামায়ীর আজ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন—তখন দর্শনাথীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রোশনচৌকীর সানাই মধুরসুরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে ষোড়শপচারে শ্রীশ্রীদুর্গামায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশু-বলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণধারিণী-সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকা ভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (প্রথম ভাগ) আছে —শ্রীমা বলিতেছেন, "পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হল, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি'—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি ওঠে বসল।" মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্য-কৌতুক করিতে দেখিয়াছি—সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন—কখনো গুন গুন স্বরে গাহিতেছেন—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।"

রবিবার, মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতলায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দনজবাবিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল,—ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

৫ই কার্তিক মঙ্গলবার ৺বিজয়া দশমী। অপরাহ্ণে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল। প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান হইল—তখন ঢাক, ঢোল, রোশনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল, চারিদিকে "মহামায়ী-কী জয় দুর্গামায়ী-কী জয়" শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।—এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাক-ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নিচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘন ঘন উচ্চ কণ্ঠে "মহামায়ী-কী জয়—দুর্গামায়ী-কী জয়" ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল—প্রতিমার বিসর্জনে।

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী সাধু ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপূর্ব ভাব উদ্দীপিত হয়—তাহা অন্যত্র দুর্লভ।*

* উদ্বোধন, ৫৬তম বর্ষ (১৩৬১), ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, পৃঃ ৫০৫—৫০৮

নিবন্ধ

মৃত্যুঞ্জয়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভবতোষবাবু মৃত্যুশয্যায়। অনেকদিনকার ভক্ত। কিছুকাল হইতে ভুগিতেছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরিলে একবার যেন দেখা করিয়া আসি। বেলুড় মঠে পৌঁছিবার দুদিন পরেই ফোন আসিল ভবতোষবাবুর অবস্থা বড়ই সংকটজনক। মঠের পূজনীয় ম্যানেজার মহারাজ বলিলেন, যাও একবার দেখা করে এস। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকাল। ১৫ বৎসর দেশ ছাড়া। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। একজন সাধুভাইকে সঙ্গে লইয়া বাসে রওনা হইলাম দক্ষিণ কলিকাতায়। বাসে ভ্রমণ—১৫ বৎসর আগে অনেক করিয়াছি, কিন্তু এখন সেই ভ্রমণ যে কি কষ্টকর তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম। অবশ্য ট্যাক্সির চেষ্টা করা হইয়াছিল পাওয়া যাইল না।

দুই সন্ন্যাসী ভবতোষবাবুর শয্যার পাশে গিয়া বসিলাম। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে ঠাকুর ও তাঁহার গুরুদেবের ফটো টাঙানো রহিয়াছে। ধূপ জ্বলিতেছে। তাঁহার পুত্রেরা এবং নাতনী তাঁহার মাথার কাছে গিয়া আমাদের আগমনসংবাদ দিলেন। ভবতোষবাবুর চোখ বন্ধ নয়। পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন এবং অনিমেষ চোখে গুরু ও ইষ্টের ছবির দিকে তাকাইয়া আছেন। অতি পরিচিত সন্ন্যাসি-দ্বয়ের দিকে একবারও চোখ ফিরাইলেন না। বৃহৎ সংসার। রোগীর ঘরে আত্মীয়স্বজনগণের আনা-গোনা চলিতেছে। ভবতোষবাবুর কোনও হুঁশ নাই। চেতনা যে হারাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। তবে চেতনা এখন অন্তর্মুখ। খেলাঘর ভাঙিতেছে।

এখন আর খেলার পুতুলের দিকে মন দিবার ব্যাকুলতা কেন? একজন সন্ন্যাসী দু-তিনটি স্তব পাঠ করিলেন, দুটি ভজনও গাহিলেন। ভবতোষবাবু শুনিলেন কিনা বুঝা যাইল না।

বড় ভাল লাগিল। গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল ঃ

"নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্-
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥"
(গীতা, ১৫।৫)

—সংসারের মান মোহ যখন কাটিয়া যায়, দুষ্ট বিষয়াসক্তি যখন নিস্তেজ হয়, মন যখন সকলপ্রকার কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া হৃদয়স্থিত চৈতন্যসত্তা আত্মাতে অবস্থান করে তখন জীব সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞানের পারে শ্রীভগবানের সেই চিরন্তন পদ প্রাপ্ত হয়।

মঠে ফিরিবার পরের দিন খবর আসিল ভবতোষবাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বাস হইল তিনি ঠাকুরের উত্তম ভক্ত শাশ্বতগতি লাভ করিয়াছেন। সংসারে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু ভবতোষবাবু অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সংসারে আমরা যখন অত্যন্ত মত্ত থাকি, ভগবানকে নিত্য একটু ডাকিবার সময় পাই না, ডাকিবার প্রয়োজনও বোধ করি না, তখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বদ্ধজীব'। শাস্ত্র ও সাধুসন্তগণ মানুষের এই বদ্ধাবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট পান। এই বদ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চলে। অজ্ঞান দূর হইতে পারে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে। শাস্ত্র ও সাধু মহাত্মারা জন্মমৃত্যুর প্রবাহ হইতে পরিত্রাণের উপদেশ দিয়া যান মানুষকে। কেহ কেহ শোনে, অধিকাংশই গ্রাহ্য করে না। তাহারা ভাবে বেশ তো আছি। আধি-ব্যাধি দুঃখ-কষ্ট মাঝে মাঝে আসিবে, তা আসিলই বা। সংসারে নানাপ্রকার সুখও তো কম নাই। দেহসুখ, পারিবারিক সুখ, বিদ্যালাভের সুখ, নানাপ্রকার সম্পত্তিলাভের সুখ, দেশভ্রমণের সুখ, মান-সম্মানের সুখ। সংসারে যখন আসিয়াছি, তখন সংসারকে ষোল আনা ভোগ করিবার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁহাদের তাঁহারা কঠোপনিষদের ভাষায় প্রেয়ঃকামী। ইঁহার বিপরীত যাঁহারা তাঁহারা শ্রেয়ঃকামী। তাঁহারা সংসারে একান্তই সংখ্যালঘু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "সা চাতুরী চাতুরী।" ভগবৎ পথে যাঁহারা চলেন সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহারাই চতুর। তাঁহারা মায়ার অসংখ্য আকর্ষণে মুগ্ধ হন না, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন ভগবানই সার, সংসার অসার। ঠাকুর বলিতেন, সংসার মানে সৎ-ই যাহার সার।

সন্ত তুলসীদাসজী বলিয়াছেন, "জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম, জহাঁ রাম তহাঁ নহী কাম।"—রাম যেখানে প্রত্যক্ষ সেখানে কাম অর্থাৎ বিষয়-বাসনা থাকিতে পারে না, আর কাম যেখানে অতিশয় প্রকট রামের প্রকাশ সেখানে বন্ধ। তুলসীদাসজীর উক্তি কঠোপনিষদের শ্রেয় ও প্রেয়েরই ব্যাখ্যান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন ঃ ভগবানকে লাভ করাই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যাহা কিছু তাহার প্রতিবন্ধী তাহা হইতে সাবধান।

মৃত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করা একদিনে ঘটে না। শাস্ত্র, সাধু মহাপুরুষদের উপদেশ মনে রাখিয়া দিনের পর দিন যথাসাধ্য অনুসরণ করিলে তবেই উহা সম্ভবপর হয়। ভবতোষবাবু যে অন্তিম সময়ে সংসারের সকল বিষয় হইতে মন গুটাইয়া সারা মন দিয়া গুরু-ইষ্টের চিন্তায় তন্ময় রহিলেন এই পরম সাহসিকতা কি তিনি একদিনে পাইয়াছিলেন? শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার নিশ্চয়ই তিনি আবাল্য বা আযৌবন অভ্যাস করিয়াছিলেন। ফলে দিনে দিনে তাঁহার চরিত্রে বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস তত্ত্বদৃষ্টি সঞ্চিত হইয়াছিল। ইঁহাদিগকে গীতা দৈবী সম্পদ বলিয়াছেন। "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা ১৬।৫) —দৈবী সম্পদ দিয়া মুক্তিলাভ করা যায় আসুরী সম্পদে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি) নিজেকে আচ্ছন্ন করিলে তাহার পরিণাম নিবন্ধ অর্থাৎ মৃত্যু—বারবার সংসারে যাতায়াত। ইহাতে

যে কত দুঃখ তাহা বিচারশীল মহাজনরা বুঝিতে পারেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণ সংসারাবদ্ধ অভাগাদের জন্য কাঁদে। কিন্তু অভাগারা কি শোনে? তাহারা উলটিয়া লাঠি লইয়া তাড়া করে। কিছু কিছু লোক শোনে। তাহারা ভাগ্যবান। তাহারাই মৃত্যুঞ্জয়।

জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি চলিয়াছে। আমরা জীবনকেই ভালবাসি, মৃত্যুর কথা ভাবিতে চাহি না। বাড়ির পাশ দিয়া 'রাম নাম সচ্ হ্যায়' অথবা 'বলো হরি হরি বোল' ধ্বনি তুলিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া চলিয়াছে, আমরা জানালা দিয়া একটু কৌতূহলে তাকাই। ভাবি—যাহার মরিবার সে মরিয়াছে, আমি তো বাঁচিয়া আছি। অতএব হৃদয় কাঁপে না।

দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মণি মল্লিক ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মণি মল্লিক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিলে ভক্তটি বলিলেন তিনি শ্মশান হইতে মৃত পুত্রের সংকার করিয়া সিধা দক্ষিণেশ্বর আসিয়াছেন। কঠিন শোকসংবাদ। কিন্তু ঠাকুর কোনও কথা বলিলেন না, কোনও সান্ত্বনা প্রকাশ করিলেন না। অপর সকলে ঠাকুরের এই ব্যবহারে বিস্মিত। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ভাবস্থ হইয়া গান ধরিলেন—

জীব সাজো সমরে,
রণবেশে—কাল প্রবেশে তোর ঘরে। ইত্যাদি।

—হে জীব কাল অর্থাৎ মৃত্যু যুদ্ধবেশে তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। ভয় পাইও না, বসিয়া থাকিয়ো না। তুমিও মৃত্যুর সহিত লড়াই কর। মা ব্রহ্মময়ীর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তুমি অবশ্যই মরণজয়ী হইবে। তোমারও তো অস্ত্রশস্ত্র কম নাই।

"ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ,
রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।"

ভাবাবেশে ঠাকুর অনেকক্ষণ দাশরথি রায়ের এই গানটি গাহিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। এই গানের ভাব সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল। মণি মল্লিক মহাশয় পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন।

*

গীতা বলিয়াছেন ঃ

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"
(৭।৩)

—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। সিদ্ধির জন্য যত্নশীল বহুর মধ্যে ক্বচিৎ একজন কেহ আমাকে (ভগবানকে) ঠিক ঠিক জানিতে পারে। ঠিক ঠিক জানার নাম ভগবানকে লাভ করা—জন্ম-মরণ হইতে মুক্তি—মৃত্যুজয়। পৃথিবীতে নানা সময়ে বহু মানুষ স্ত্রী হউন, পুরুষ হউন, গৃহী হউন, ত্যাগী হউন, শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকে যে জয় করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবতোষবাবু একটিমাত্র উদাহরণ। মৃত্যুজয় যদি একটি কথার কথা মাত্র হইত তাহা হইলে উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র এমন জোর দিয়া ভগবানলাভের কথা বলিতেন না। কঠোপনিষদের নির্ভীক নিঃসন্দিগ্ধ উৎসাহ-বাণী ঃ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"—উঠ, (মোহনিদ্রা হইতে) জাগো, তত্ত্বদ্রষ্টাগণের সঙ্গ কর, জ্ঞানলাভ করিয়া মানবজন্ম ধন্য কর।"

বেদান্ত জ্ঞানপথ এবং ভক্তিপথ উভয়পথেই মৃত্যুজয়ের কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানপথের মুক্তি জীব ও ব্রহ্ম যে আলাদা নন, এই উপলব্ধি। ভক্তিপথের মৃত্যুজয় ভগবানের চিরন্তন সেবক ও ভক্ত হইয়া থাকা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—চিনি হইয়া যাওয়া নহে, চিনি খাওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, সর্বশেষে চরম জ্ঞান ও পরমা ভক্তি এক হইয়া যায়। যাহা জ্ঞান, তাহাই ভক্তি, তাহাই সব-সীমা সর্ববন্ধন হইতে পরিত্রাণ—অমৃতত্ব।

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম

শিশির কর

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব পরোক্ষ হলেও অপরিসীম। অন্তঃসলিলা নদীর মতোই তা নিয়ত প্রবহমান ছিল। মুক্তি-সংগ্রামীরা তাঁর সৃষ্ট পরিমণ্ডল থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর জীবন ও বাণী থেকে। এই অনাড়ম্বর পরম বিনয়ী মানুষটিকে ঘিরে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যে, অনেকেই মহৎ জীবনের ডাক শুনেছিলেন তাঁর কাছ থেকে--স্বামীজীর মতো প্রত্যক্ষভাবে না হলেও। তাই তো জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল তাঁর মহান অনুপ্রেরণাময় জীবন। মানুষের মুক্তির কথা, মানব-কল্যাণের পথের কথা, মানব-জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতার কথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "যত মত তত পথ।" প্রয়োজন নেই ধর্মে ধর্মে সংঘাতের, প্রয়োজন নেই ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষের মধ্যে তর্কাতর্কি, বিবাদ-বিসংবাদের। সব মতই সত্যে পৌঁছানোর, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের এক-একটি সোপান। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একাগ্র সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মানিকতলায় অরবিন্দ-বারীন্দ্রের স্বদেশী বোমা-তৈরির আখড়ায় রাখা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর পবিত্র মৃত্তিকা। বিপ্লবীরা মনকে সতেজ ও পবিত্র রাখার জন্য পড়তেন তাঁর 'কথামৃত' ও জীবনী। আর তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তো প্রত্যক্ষ প্রেরণাই পেয়েছিলেন মুক্তি-সংগ্রামীরা। মানবমুক্তির দিশারী প্রচার-বিমুখ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণেরই আবিষ্কার স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দেরও আবিষ্কার শ্রীরামকৃষ্ণ।

এ-দেশের মুক্তি-সংগ্রামীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাবের কথা আছে রোমাঁ রোলাঁর লেখায়ঃ "এই 'মহত্তর ভারত', এই নূতনতর ভারত—যাহার বিকাশের কথা রাজনীতিকরা ও পণ্ডিতরা উটপাখির মতো আমাদের নিকট এতদিন লুকাইয়া আসিয়াছেন এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—রামকৃষ্ণের আত্মায় তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পরমহংসের এবং যে বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা এবং মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—এই রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করিয়াছেন।"[১]

আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে আমাদের জাতীয়তা বিকাশের স্থায়ী ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণই গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, "এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণও আবির্ভূত হইয়া সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সকল ধর্মই একই সর্ব-শক্তিমান বিধাতার চরণতলে সম্মিলিত হয়। সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রেমের ভিত্তিতে ভারতের সকল ধর্মের সমন্বয়—ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিকাশের স্থায়ী ভিত্তিমূলে গড়িয়া তুলিবে।"[২]

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছেনঃ "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত

১ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, 1979, p. 288 (অনুবাদঃ ঋষি দাস)

২ সুভাষচন্দ্র বসুঃ সমগ্র রচনাবলী, সম্পাদক—শিশিরকুমার বসু, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০

বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্ম সমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।"[৩] শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন থেকে নবযুগের সূত্রপাত।"[৪] শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি দেশে যে-নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে-ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে-ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে-ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই। [কিন্তু] সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই—একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ-সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে-শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস—যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে, আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেনঃ 'তুই যে বীর রে!' তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতরে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকেও বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে, এবং অহরহ এই ভবিষ্য-দ্বাণী স্মরণপথে রাখিত হইবে, 'তুই যে বীর রে'।"[৫]

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজী জীবনীর ভূমিকায় লিখেছেনঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন—ধর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাহিনী। তাঁর জীবন আমাদের ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করার সামর্থ্য দিয়েছে। তাঁর জীবন-চরিত পড়লে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, অন্য সকলই অনিত্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর উক্তিসমূহ নিছক পণ্ডিতের উক্তি নয়, সেগুলি জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা, সেগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উদ্ঘাটন। তাই সেগুলি পাঠকের মনে ছাপ রেখে যায়, তাই থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছে। তাঁর দৃষ্টান্ত ভিন্ন এই সকল নরনারী আধ্যাত্মিকতার আলোক লাভ করতে পারত না। রামকৃষ্ণের জীবনে আছে অহিংসার পরম শিক্ষা।"

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুই মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী থেকে চরিত্র গঠনের রসদ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা এবং তাঁদের বহু অনুগামী এবং আরও অসংখ্য মুক্তি-সংগ্রামী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। মুক্তি-সংগ্রামীদের লেখা থেকে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'

৩ উদ্বোধন, ৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৭, পৃঃ ৭০

৪ Sri Aurobindo (Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry), Vol. I, p. 799

৫ Ibid, Vol. IV, p. 259

স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল, তৈরি করেছিল তাঁদের মনকে দেশের মুক্তির জন্যে জীবন উৎসর্গে।

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের, বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের চরিত্রালোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বিশেষ জোর দিয়ে এঁদের ওপর ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা বলেছেন। সে-ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, দেহমনকে পবিত্র রাখার ধর্ম। এ ব্যাপারে গীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শক্তি সাধনায় সিদ্ধ। সেজন্য বিপ্লবীরা আগ্রহী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে। তাঁরা কিভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে গ্রহণ করতেন, তার একটা দৃষ্টান্ত এই গোয়েন্দা-রিপোর্ট থেকে আমরা পাই: "অনুশীলন সমিতির কর্মপদ্ধতিতে সদস্য-ভুক্তির জন্য বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ্য-পুস্তকরূপে বিবেচিত হতো। বিপ্লবীদের বাড়িতে বিবেকানন্দের নামে পাঠাগারও দেখা যেত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ ছিল বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয় গ্রন্থ।"[৬] বস্তুতঃ বিপ্লবীদের যেসব গোপন পাঠাগার ছিল, সেখানে যেসব বইপত্র রাখা হতো, তাতে 'কথামৃত' থাকতই। মানসিক শক্তি অর্জন ও চিত্তের শুদ্ধির জন্য সেযুগে মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে 'কথামৃত' ছিল অবশ্যপাঠ্য বইগুলির অন্যতম।

কথামৃত, গীতার মতো ধর্মীয় গ্রন্থ কেন বিপ্লবীরা পড়তেন, তাঁদের লাইব্রেরীতে রাখতেন, দক্ষ পদস্থ ব্রিটিশ প্রশাসকরা, ঝানু গোয়েন্দারা সে-সম্পর্কে লিখেছেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ও নব-জাগরণের মূল প্রেরণা তো শ্রীরামকৃষ্ণই—একথা বলেছেন দুর্ধর্ষ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর মহানায়ক মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। এই বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ—মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে' শীর্ষক গ্রন্থে। হেমচন্দ্র বলেছেন: "বৃটিশের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার ইঙ্গিত স্বামীজী নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। কারণ, স্বামীজীর নিজের মুখে শুনেছি ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—'মনে রাখিস, ইংরেজই এদেশের সর্বনাশ করছে'।

"দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে সেই মহাসাধক ভবতারিণীর মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী সত্তাকে আবাহন করেছিলেন, পাথরের প্রতিমার মধ্যে সর্বৈশ্বর্যময়ী জগন্মাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর জাগ্রত করেছিলেন লেভিয়া-থানের মতো বিরাট, হাজার বছর ধরে নিদ্রিত এই জাতটার কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে। তাঁর সেই শক্তি-সাধনার হোমাগ্নি থেকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শক্তিই স্বামীজীর ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মূলপুরুষ তাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। সারা পৃথিবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দ সেই জাগরণের প্রক্রিয়ায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা, এবং পথনির্দেশ। এই দুই মহাপুরুষ যে কি ছিলেন এবং তাঁরা যে ভারতবর্ষকে এবং জগৎকে কি দিয়ে গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমরা এখনও কেউ পারিনি—এখনও বহু যুগ লাগবে।"[৭]

'কথামৃত' যে বিপ্লবীদের, দেশের সর্বশ্রেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রিয় গ্রন্থ ছিল তা সরকারি নথিভুক্ত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর, বিপ্লবীদের ওপর রামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শের প্রভাবের কথা সরকারি গোপন ফাইলে বারবার বলা হয়েছে।

শুধু গোয়েন্দা রিপোর্টই নয়, প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসকদের গ্রন্থেও এ-তথ্য আছে। জেমস ক্যামবেল কারও (**James Campbell Ker**) বিপ্লবীদের ওপর ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রভাবের কথা লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে আছে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাঠাগারে গীতাই ছিল ১৭৮টি। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর ধর্মগ্রন্থাদি ও অন্যান্য বইপত্রের বিপুল প্রভাবের কথা তিনি লিখেছেন, তাঁর '**Political Troubles in India (1907—1917)**' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি

৬ **West Bengal State Archives, Freedom Fighters' Papers, No. 45**

৭ স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, পৃঃ ৭৮–৭৯

লিখেছেন : "এই পরিচ্ছেদে যেসব বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই বাংলার তরুণেরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তল্লাসিতে এই প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির কয়েকশো বই আছে এবং সেখানে পাওয়া বই ইস্যুর এক তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে।...

"...সহজেই দেখা যায়, এইসব পুস্তকপাঠে কিভাবে একজন যুবককে সহজে ও সরাসরি ধর্ম ও দর্শনের ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠ থেকে রিভলভার ও বোমা ব্যবহারে নিয়ে যেত।"[৮] আর্ল অব রোনাল্ডসে তাঁর 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থেও তরুণ বিপ্লবীদের উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯]

ধুরন্ধর গোয়েন্দাকর্তা চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট বিপ্লবী ও অন্যান্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীর উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট দেন (২৪.৪.১৯১৪)। তাতে বিপ্লবীদের দলে তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভূমিকার উল্লেখ আছে :

"নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বরের একটি রিপোর্টে বসন্ত জানিয়েছিলেন যে, ঢাকায় ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে জ্ঞানরঞ্জন নিয়মিতভাবে আসতেন।

কথামৃত এবং বিবেকানন্দের ধর্মযোগ থেকে পাঠ করে কিভাবে সদস্য সংগ্রহ করা হতো সেসব ব্যাপারেও তিনি বলেন।

"ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের বরিশালের বাড়িতে একটি বিবেকানন্দ পাঠাগার ছিল। এখানে ছিল এক সেট বিবেকানন্দের রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একটি অনুলিপি এবং পাঠাগারের বইয়ের একটি তালিকা। এইসব বইয়ের মধ্যে ছিল পূর্বে-উল্লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং বইগুলি স্পষ্টতই বরিশাল দলের সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হতো।"[১০]

টেগার্টের রিপোর্টে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ এবং তাঁদের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের জন্য গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শুধু বাংলার বিপ্লবীদেরই প্রভাবিত করেননি, বাংলার বাইরে দেশের অন্যত্র এবং বিদেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। টেগার্ট সেকথা লিখেছেন, তাঁর 'গোপনীয়' নোটে :

"হিন্দুসন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তা সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে (বৃটিশ) কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই কারণে করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত যে বিপ্লব-প্রয়াস বাংলাদেশের যুব-সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেছে এবং যার বিষময় প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলির সঙ্গে মিশন ও তার অনুগামীদের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে।"[১১]

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য দেশের যত্রতত্র, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে অজস্র 'রামকৃষ্ণ মিশন' গড়ে ওঠে। এর অধিকাংশই বেলুড় মঠের অননুমোদিত হলেও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শ সামনে রেখেই তরুণেরা দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের শপথ নিত। গোয়েন্দাদের অভিযোগ, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে বিপ্লবীরা এখানে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতেন। গোয়েন্দারা সরকারের নজরে তা আনেন এবং ভাইসরয় পর্যন্ত তা গড়ায়। টেগার্টের গোয়েন্দা-রিপোর্টে এসব তথ্য আমরা পাই :

"সাধারণভাবে জানা ছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করছে এবং রাজনীতি এবং অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও তা সম্পূর্ণভাবে সংস্রবমুক্ত নয়। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল

৮ Political Troubles in India (1907—1917), p. 44 ৯ The Heart of Aryavarta, p. 85

১০ দ্রঃ—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯ এবং পুলিস রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন—অজিতমোহন রায়চৌধুরী, পৃঃ ৮৩ ১১ ঐ, পৃঃ ২৫৭—২৫৮ এবং ঐ, পৃঃ ৪০

ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটা পরিষ্কার জানা যায়নি যে, এইসব অননুমোদিত বা ভুয়া গ্রামীণ আশ্রমগুলি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কি পরিমাণে গজিয়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী দলের ৩৬জন সদস্যাকে শেষ পর্যন্ত এই মামলায় বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যে ১২জন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা সকলেই দীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাসদণ্ড লাভ করেন।

"এদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সদস্য।..."[১২]

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ' নাম যুক্ত করে তখনকার 'সন্ত্রাসবাদী' দলগুলিতে সদস্য সংগৃহীত হতো। ঝানু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরাও পড়ে। টেগার্টের রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, বিপ্লবী দলে গোপনে সভ্য সংগ্রহের জন্য বাংলার নানাস্থানে 'ভুয়া' রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে ওঠে।[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক এক সময় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, সরকার এক সময় রামকৃষ্ণ মিশনকে বেআইনি ঘোষণা ও বেলুড়ে মিশনের সদর দফতর বন্ধ করে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তা লিখেছেন ঃ "একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপর দেখিলাম লেখা আছে, 'রামকৃষ্ণ মিশন'। আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া ফাইলটি আমার বসিবার ঘরে নিয়া পড়িতে লাগিলাম। ফাইলের সর্বনিম্ন তলে একটি পুলিস রিপোর্ট আছে—তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮।১০ জন সাধু পূর্ব-জীবনে বিপ্লবী ও গুপ্তসমিতির সভ্য ছিলেন, কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেন।

"তাঁহাদের পূর্বেকার ও বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও ঐ ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এবিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও পর পর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সর্বশেষে সেক্রেটারী এইসব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব করিলেন যে, বেলুড় মঠকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

"এইসব মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট ফাইলে লিখিয়াছেন ঃ পুলিসের রিপোর্ট এবং সেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছেন। কারণ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা [মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড] আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এসময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোন রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়া সাদা পোশাকে কয়েকজন পুলিস কর্মচারীকে সদা-সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক। যে-সমুদয় বিপ্লবীর নাম পূর্বোক্ত বিবরণীতে আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা মঠে আছে, তাহাদের গতিবিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।"[১৪]

সাদা পোশাকের পুলিস যে বেলুড় মঠে মোতায়েন থাকতেন, তা শুধু জনশ্রুতিই নয় গোয়েন্দা রিপোর্টে, ঐতিহাসিকদের সংগৃহীত তথ্যেও তা স্বীকৃত।

বিপ্লবীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের প্রভাব প্রসঙ্গে সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও উল্লেখ পাই। এই কমিটির অন্যতম সদস্য বিচারপতি মুখার্জীর মন্তব্য ঃ "ঈশ্বরেচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্মীয় নীতিসমূহের মতো নীতিগুলিকে মতলববাজ ও দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিরা দুর্বলচিত্ত লোকেদের প্রভাবিত করার শক্তি-শালী উপায় হিসাবে প্রয়োগ করত।"

এই ব্যাখ্যা বিকৃত হলেও বিপ্লবীদের, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ-ভাবধারার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাবের কথা স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান লেখকের ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই-এ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬—২৮৭ এবং পুলিস রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন, পৃঃ ৮০

১৩ ঐ, পৃঃ ২৮৭ এবং ঐ, পৃঃ ৮১

১৪ উদ্ধৃত ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে, পৃঃ ৯১—৯২

বাঙালীর দুর্গোৎসব

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ।" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতিগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টী রকমের আছে এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্র-স্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী-জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনো বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনো বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই, চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূল রূপে সাধকের হৃদয়-মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃন্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় দুর্গোৎসবের প্রবর্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাংলার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপতপে, পূর্বে আমাদের দেশে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্মে মন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এদেশে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধ-তন্ত্রে মূর্তিপূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমানধর্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্তিপূজাকে "বোধ্‌পরস্ত্" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌-গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, বাংলা দেশেই মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্যসকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এখন সাধারণভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্তিপূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তনা এদেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্তি ভাবময়ী মূর্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়িতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণ কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খ্রীস্টানী ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজীশিক্ষিত

আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহবান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজীনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবা-রাধনার ইহা মূলতত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্যন্ত তিনি সর্বস্ব ও সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে সদা প্রমত্ত। এই 'অহং-মমেতি'-ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্রভাবের জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতির জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্তনা; জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে; প্রথম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞান-যোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রবৃত্তিমূলা সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আধার সন্ন্যাস-সংযম, সর্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তিমার্গে ভোগ নাই; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু, সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য, গৃহস্থালী সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য; আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া তাঁহার কর্মচারীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তিধর্মের মূলে এই সর্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রহস্যময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাবসাগরের বুদ্বুদমাত্র; আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন:

> "এবার শ্যামা তোমায় খাব;
> তুমি খাও কি আমি খাই মা,
> দুটোর একটা করে যাব।"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন, "ঈশ্বরতুষ্টেঃ একোঽপি বলী।"—ঈশ্বরতুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবল-ভাবে ধরিলেই কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উদ্দেশ্যেই সাধনা। অহঙ্কারের জন্যই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি-জনাই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্র-প্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি —এসকল সম্বন্ধই তো আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই তো তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ-সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণ-ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংবন্ধ হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন। আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহপূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ-মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া, বাংলায় দেবতার

পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মা-ই সর্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর, গৃহস্থালি। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ি আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়িতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ-দুঃখ আছে, অভাব-অভিযোগ আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে : তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ি আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন ঃ

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে-মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা; যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার দুলি, পুটি, বুড়ি যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, পার্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তখন ঠিক ভাবের মতো রূপেই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময়রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্বৈশ্বর্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে-ভাবের যে-বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে-সকলই মানস, প্রকৃত নহে। ইংরেজীতে তাকে hallucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সামলাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয়; অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন-দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার অভাব, কাম, ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এসকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কোন শক্তির অভাবে ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, হেতিপেতি যন্ত্রমন্ত্রধারিণী, সর্বশক্তিময়ী, সর্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্বরূপে হৃদয় আকাশে স্থিরদামিনীর ন্যায় কোটি সূর্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্তির পূজা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাংলায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়াই আগমবাগীশই এই দশভুজা পূজার প্রবর্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্যন্ত দশভুজা মূর্তির সর্বস্ব ভাবের দ্যোতনা আছে। সে-ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষ্ণাতৃষ্ণা, নিদ্রা, মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এভাবের ভাবুক হইলে, তবে তো

ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন—এ মা কিসের ? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহা তো ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্মপ্রধান শাস্ত্রে খোস-খেয়ালের কথা নাই। কর্ম আছে, কর্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ম মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম—কর্মীর ধর্ম। যে কর্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে, পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই ; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝানো যায় না, তাহা করিয়া কর্মিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। বাংলায় কর্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্মও লোপ পাইতেছে। কর্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাংলার কর্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল, অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আঁকিয়া জুখিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সংসার দাবদাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। এক দিকে রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসীপুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুর রসের অপূর্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন,

> "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
> স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
> চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃন্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর একজন ভক্ত গান করিয়াছেন,

> "জান না রে মন, পরম কারণ,
> শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
> সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
> কখনও কখনও পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রে—উপনিষদ্‌ শাস্ত্রের—উপনিষদরাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী ভাবময়ী, একথা বাঙালীমাত্রেই জানিত, তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্মময়-ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাংলা মর্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময় স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কয়টা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলাম ; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে তত্ত্ব-কথা কহিব।*

* সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৮

সংগ্রহ : সংহিত চৌধুরী

স্মৃতিকথা

চোখে স্বামী অখণ্ডানন্দ

উষারানী সান্যাল

স্বামী অখণ্ডানন্দ বা গঙ্গাধর মহারাজ বা স্থানীয় পরিচয়ে 'দণ্ডীবাবা' কিভাবে, কখন এবং কি প্রচেষ্টায় সারগাছি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তা অনেকেরই জানা আছে। তবে আমি ছোটবেলা থেকে দণ্ডীবাবাকে দেখেছি, সেই দেখার স্মৃতি আমার অক্ষয় সম্পদ।

আমার বাবা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদ জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। আমার বাবার কাছে দণ্ডীবাবার আহ্বান এল সারগাছি দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক চিকিৎসকের কাজ করবার জন্য। বাবার কাজ ছিল সপ্তাহে একদিন ঘোড়ার গাড়িতে করে শহর থেকে সাত মাইল দূরে সারগাছি আশ্রমে দুঃস্থ বিপন্নদের চিকিৎসা করার। ১৯২৪ পর্যন্ত আমি নিয়মিত বাবার সঙ্গে সারগাছি আশ্রমে যেতাম। পেতাম দণ্ডীবাবার স্নেহ-ভালবাসা। সে ভালবাসার স্বাদ এখনও আমার সত্তায় বিরাজমান।

কি সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর! জ্যোতির্ময় মূর্তি। ধারালো নাক। ব্যক্তিত্ব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। বড় বড় চুল। নাদুস-নুদুস চেহারা। খুব লম্বা ছিলেন না। গলায় থাকত রুদ্রাক্ষের মালা। কতদিন দেখেছি, আশ্রমের বাঁধানো ইঁদারার পাশে বসে পরম স্নেহে অনাথ ছেলেদের স্নান করিয়ে যত্ন করে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিচ্ছেন। আবার দেখেছি, পুরাতন বারান্দার দালানে ব্রহ্মচারী ও অনাথ বালকদের নিয়ে দণ্ডীবাবা প্রসাদ পাচ্ছেন। উনি নিজে একটা টুলে বসে, অন্য একটা টুলে প্রসাদ রেখে খেতেন। দুপাশে সার দিয়ে অনাথ বালকরা ও ব্রহ্মচারীরা খাচ্ছেন। আমার বাবার বাইরে কোথাও খাওয়া নিষেধ ছিল। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। আমাকে বললেন, "খুকি, প্রসাদ খাও।" আমি সেই আদরের ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই অনাথ বালকদের পাশে বসে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

সেদিনের সারগাছি আর কতটুকু। পুরনো দালান ও ঠাকুরঘর। গেটের উত্তর দিকে দাতব্য চিকিৎসালয়। মনে আছে পূর্বদিকে লম্বা রাস্তার দুদিকে ছোট ছোট পেঁপে গাছ ও তাতে বড় বড় পেঁপে ধরে থাকত। বাগানে ফুলের সমারোহ ছিল। কিছু কিছু ফলের গাছ লাগানো হয়েছে মাত্র। কি এক শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আমার ঐ বয়সেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে যেত।

আশ্রমের অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় মহারাজকে প্রায়ই বহরমপুর শহরে আসতে হতো। তখন বহরমপুর স্টেশনে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যেত। ভেতরে বসলে পয়সা বেশি লাগবে বলে চালকের পাশে বসে বিনা সঙ্কোচে তিনি যাতায়াত করতেন। কি নিরভিমান এবং কি কঠোর চরিত্র!

বাল্যকালেই আমায় বিয়ে হয়। আমার শ্বশুর-বাড়িতেও দণ্ডীবাবার যাতায়াত ছিল। আমার স্বামী শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও ভাসুর নলিনাক্ষ সান্যালের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। আমি দেখেছি, দণ্ডীবাবা হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আমার স্বামীর অনুরোধে খুশি হয়ে আমাদের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে গৃহস্থকে কৃতার্থ করেছেন। আমার শাশুড়িমা মটকার কাপড় পরে, দেবসেবা করার মতো গঙ্গাজলে ঠাঁই করে আসন পেতে ভক্তি-ভরে দণ্ডীবাবাকে খাওয়াতেন। আমি তখন বালিকা-বধূ। আমার কাজ ছিল, তাঁকে পাখার বাতাস করা। তখন কি জানতাম যে ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান যন্ত্র ও পার্ষদ।

দণ্ডীবাবা নিয়ম করে দিয়েছিলেন বহরমপুর শহরে প্রতি গৃহস্থ বাড়িতে একটি করে মাটির ভাঁড় ব্রহ্মচারীরা দিয়ে আসবেন। যখন বাড়ির মেয়েরা দৈনিক রান্নার জন্য চাল মেপে ভাঁড়ার থেকে বের করবে, আগে ঐ ভাঁড়ে এক মুষ্টি করে চাল রাখবে। সপ্তাহ শেষে ব্রহ্মচারীরা সেই চাল সংগ্রহ করে আশ্রমে নিয়ে যেতেন। তখন আশ্রমের বড়ই অর্থসঙ্কট। দণ্ডীবাবার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় আজ সারগাছি আশ্রম কত বড় হয়েছে! আজ সারগাছি মহাতীর্থ।

শিবতুল্য সেই মহাপুরুষকে আমি দেখেছি। তাঁর চরণস্পর্শ করেছি। তিনিও আমার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছেন। তখন বুঝিনি কার কাছে গিয়েছি, কার সান্নিধ্য পেয়েছি। কিন্তু না বুঝলেও গিয়েছি তো, পেয়েছি তো! আগুনে হাত জেনে দিই অথবা না জেনেই দিই, আগুনের যে শক্তি তা তো কাজ করবেই। আর তা-ই আমার তৃপ্তি এবং চরিতার্থতা।

প্রবন্ধ

এ যুগের উদ্বেগ

আশাপূর্ণা দেবী

এই নিখিল বিশ্বে বিধাতার বহু বিচিত্র অনন্তসৃষ্টির মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ' সৃষ্টির নিদর্শন যেমন মানুষ, তেমনি 'নিকৃষ্ঠতম'-এর নমুনাও বোধকরি এই মানুষই। মানুষ যতটা মহান মহৎ সুন্দর পবিত্র হতে পারে, ততটাই ক্রুর কুৎসিত নীচ নোংরা অসুন্দর হয়েও উঠতে পারে। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের তফাৎ এইখানেই। সমগ্র জীবজগৎ তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিকা মেনেই চলেছে আদ্যন্তকাল। তারা অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে না আর মানুষ তাঁর নির্দেশকে অনায়াসে উপেক্ষা করে খোদার উপর খোদকারি করে চলেছে। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে, প্রাণী মাত্রেরই মূল কাঠামো তো একই। আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষার প্রবণতা, আর বংশধারা বহন করে চলা। মানুষেরও তো তাই। তবু কে না জানে মানুষ তার ঊর্ধ্বে আরো 'কিছু'—আরো 'অনেক কিছু'। সেই অনেক কিছুর সম্বলটি নিয়েই মানুষ আজ এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছে। সমগ্র জীবজগৎ যেন তার সুবিধের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাদের ওপর তার যথেচ্ছ অধিকার। আবার জলে-স্থলে, ক্রমশঃ অন্তরীক্ষেও সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। মানুষ তার অধীত বিজ্ঞানের শক্তিবলে আজ দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকায়।

তাহলে ?

বিধাতা কি তাহলে ক্রমশঃই অসহায় হয়ে পড়ছেন ? মানুষ তাঁকে ক্রমশঃই কোণঠাসা করে চলেছে ?

আজকের পৃথিবীর বোধ হয় বিধাতার মুখোমুখি হয়ে এই প্রশ্ন করবার দিন এসেছে। জিজ্ঞেস করবার দিন এসেছে, 'তোমারই সৃষ্ট জীব ঐ স্বেচ্ছাচারী মানুষ কি তোমার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ছাড়তে চায় ? ক্ষমতার উল্লাস কি তার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত করে দিয়েছে ?'

পৃথিবীর গর্ভে লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত সঞ্চয়, যাদের মধ্যে ছিল পৃথিবীর জীবনী-শক্তিটিকে আরো অনন্তকাল টিকিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি, সেই সঞ্চিত সঞ্চয়, আজকের বিশাল বলদৃপ্ত অহংকারী মানুষ দুহাতে উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। যেমন জমিদারের বুদ্ধিহীন ছেলেরা হঠাৎ বাবার সম্পত্তিটা হাতে পেলে কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতব্যয়িতায় দুদিনে উড়িয়ে-ছড়িয়ে সব শেষ করে বসে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে তুলে রাখার চিন্তা তো দূরস্থান, নিজেই নিঃস্ব হয়ে বসে। আজকের পৃথিবীরও যেন সেই অবস্থা এসে যাচ্ছে।

কিন্তু আজকের মানুষ কি শুধুমাত্র এই জীবধাত্রী পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ ধ্বংস করে করেই তাকে নিঃস্ব করে চলেছে ? নিজেও কি নিঃস্ব হতে চলছে না 'হৃদয় ঐশ্বর্য'কে ধ্বংস করে করে ? ক্রমশঃই যে হিংস্রতার প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়ে ওঠাটাই মানুষের বাহাদুরির পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদা কবিকণ্ঠে সমগ্র মানবসমাজের কণ্ঠ ধ্বনিত হতে শোনা গেছে—

'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান,
আমারে দিয়েছ সুর, আমি তারও বেশি
করি দান,
আমি গাই গান।'

আর আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে, মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকের ধ্বংসদশাগ্রস্ত মানুষ বুঝি নিজেই উল্লসিত চিৎকারে বলে উঠতে চায়—

'পশুরে দিয়েছ নখ দাঁত,
হিংস্রতায় করে রক্ত পান
আমারে দাওনি তাহা, তবু আমি
পশু হিংস্রতায় করি রক্ত পান।'

আজকের সমাজের দিকে দিকে যেন এই ধ্বনিরই আভাস। অকারণ হিংস্রতায় মানুষ প্রায় রক্তপায়ী জীবতুল্যই হয়ে উঠতে চাইছে। তবে এটাও ভাববার কথা মানুষের সমস্ত হিংস্রতা, ক্রূরতা, নির্লজ্জতা, ইতরতার তুলনা দিতে 'পশু' শব্দটাই বা ব্যবহার করা হয় কেন? কেন মানুষের জঘন্য, কুশ্রী সব আচরণকে বলা হয় 'পাশবিক'? এটা কি পশুসমাজের প্রতি অবিচার নয়? সৃষ্টিকর্তা পশুকে যেভাবে গড়েছেন, সে সেইভাবেই চলে আসছে। তার বাইরে সে কি কিছু করতে যায়? পশু কি সমাজবিরোধী হয়? 'ব্যভিচারী' হয়? পশু তাদের স্ত্রীজাতির ওপর নির্লজ্জ নৃশংস অত্যাচার করে? পশু কি কখনো তার প্রকৃতিদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে? সৃষ্টিকর্তার নিয়মকে অস্বীকার করে? পশুর আচরণে কি কখনো 'নির্লজ্জতা'র পরিচয় মেলে? সৃষ্টিকাল থেকেই তার জন্য যে আচরণবিধি রচিত হয়েছে, আজও সেই বিধিই সে বহন করে চলেছে।

আর মানুষ?

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত নিয়ম আজও সেই বিধিই সে বহন করে চলেছে।

তাহলে? তাহলে মানুষের সমস্ত নির্লজ্জ নারকীয় আচরণের নমুনাকে 'পাশবিক' বলে অভিহিত করা কি সঙ্গত? সেটা যেন পশু-সমাজের প্রতিই অবমাননা। তথাকথিত এই 'মানুষের' মনুষ্যত্বহীন আচরণকে বরং বলা উচিৎ 'পৈশাচিক'। আজকের সমাজের যত্রতত্র সেই পৈশাচিক ক্ষমতার মদে মত্ততার দৃষ্টান্ত। এই অশুভ ক্ষমতা সমাজকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে সেটাই ভাববার। অথচ এই মানুষের মধ্যেই আছে 'দেবত্বে' উত্তরণের ক্ষমতা। এই মানুষই মহৎ হতে পারে, সুন্দর হতে পারে, পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু হয় কই? তেমন দৃষ্টান্ত তো ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। মানুষই মানুষকে নষ্ট করে। কিছু নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষ আপন নীচ স্বার্থে আরো কিছু মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারের অতল পথে। তাদের দিয়ে যা খুশি অন্যায় করায়, অত্যাচার করায়, লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কিনে নেয় তাদের ভিতরকার বিবেক বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব। নিষ্কাসিত করে ফেলে তাদের মধ্যেকার সমস্ত শুভবোধকে।

মানুষই মানুষের উত্তরণের অন্তরায়।

একথা অবশ্য বলা যায় না যে, এযাবৎকালের পৃথিবীতে এতাবৎকাল তাবৎ মানুষই মহদাশয় ছিল। শুধু আজকের যুগই মন্দ। তা অবশ্য নয়, চিরকালই—সবযুগেই কিছু নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষ ক্ষমতার মত্ততায় অহংকারের উগ্রতায় অনাচার করে, যথেচ্ছাচার করে, 'সত্য'কে মলিন করে, সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শুভকে গ্রাস করে।

বলবানরা চিরকালই দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব করে, তাদের শোষণ করে, বঞ্চনা করে, তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে আপন আরাম আয়েসের বাসনা চরিতার্থ করে। আপন খেয়ালে নিরীহ শান্তিপ্রিয় দেশের ওপর যুদ্ধ চাপায়। অসহায় জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যুদ্ধে পাঠায়। যখনই রাজশক্তি অশুভশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে চরম দুর্দিন। এ দুর্দিন পৃথিবীতে বারেবারেই এসেছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এমন কোন যুগ ছিল না, যে-যুগে সব মানুষই মহৎ ছিল।

চিরকালীন পৃথিবীতে ভূমি, স্বর্ণ আর নারী এই তিন বস্তু ইতর আর লোভী মানুষের লোভের বস্তু। চিরকালই অসৎ অন্যায়কারী তার লোভের হাতকে বাড়িয়ে দিয়েছে, যেনতেনভাবে তার কাম্য বস্তুটিকে আহরণ করতে। এবং আজও তার ব্যতিক্রম নেই। এসবের কোন কিছুই বোধ হয় নতুন নয়।

তাহলে? তাহলে আজকের পৃথিবীর কেন বিশেষ করে এই যুগের জন্য উদ্বেগ?

প্রশ্নটি এইখানেই।

চিরকালের পৃথিবীতে সমাজে ঐ সবই চলে এসেছে। রাজশক্তির সঙ্গে অশুভশক্তির যোগা-যোগ ঘটায় সমাজে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তবু এও ঠিক, তার মধ্যে থেকেই সাধারণ মানুষেরা', বৃত্তিজীবী নিরীহ মানুষেরা, খেটে-খাওয়া মানুষেরা, দীনদরিদ্র মানুষেরা, আদিবাসী

উপজাতি তথাকথিত অনুন্নত গোষ্ঠী সব মিলিয়ে বিশাল এক মানবসমাজ, তাদের উত্থান-পতনহীন নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ জীবনের মধ্য দিয়েই 'মনুষ্যত্বে'র চিরন্তন ধারাটি বহন করে চলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে।... তাদের সহজাত সততা, সত্যবোধ, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস আর সে-সম্পর্কে মূল্যবোধ তাদেরকে একটি কেন্দ্রভূমিতে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। আজকের যুগের হিসাবে অবশ্যই এরা নির্বোধ, অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই তারা চিরকাল অদৃশ্য একটি 'পাপপুণ্যের দাঁড়ি-পাল্লায়' আপন কর্মভারকে চাপিয়েছে আর ইহকাল-পরকালের প্রাপ্তির ওজন কষে কষে, জীবনকে সহনীয় সীমায় রেখে বহন করে এসেছে। সেই সব অজ্ঞ নিরক্ষর অতিসাধারণ মানুষেরাও কখনো কখনো জীবন-দর্শনের গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়েছে। অসংখ্য উত্থান-পতনের মধ্যে, তাদের যেমন উত্থান ঘটেনি, তেমনি পতনও ঘটেনি। এই সাধারণেরাই সমাজজীবনের পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরকার ছাদ। এরাই সমাজের মেরুদণ্ড।

আজকের যুগের ধারা এসেছে সেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে। ওরা যেন তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে স্খলিত হয়ে পড়ছে, বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তার চিরকালের পরিচিত জগৎ থেকে। কারণ ক্ষমতাবানদের হঠাৎ নজরে পড়ে গিয়েছিল—এরা একটা মস্ত হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে তাদের ক্ষমতার আসন শক্ত রাখতে হবে। অতএব সেইসব সাধারণদের টেনে নিয়ে এসেছে তাদের চিরন্তন বিশ্বাসের জগৎ থেকে, সততার জগৎ থেকে, নিজস্ব ধর্মবোধের (এযুগে অবশ্য যা অর্থহীন অলীক) জগৎ থেকে। বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসছে আপন কুটিল প্রয়োজন সাধনের জটিল পথে। আজ তাই সেই চিরকালের 'সাধারণ-জন' যারা এযাবৎকাল আপন সত্তাটিকে অটুট রেখে টিকে থেকেছে, তারা আজ সেই সত্তা বিসর্জন দিয়ে হয়ে পড়েছে অপরের হাতের ক্রীড়নক। আজ তারা পর্যন্ত এক লোভের শিকার।

লোভের হাতছানিতে তারা তাদের আলোর জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃই এক অন্ধকার পথের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অন্ধকারের জীবেরা আজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর অচেনা। এরা আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অসহায়তার জনক। আজ সেই চিরকালের সরল সাধারণেরাই যেন হয়ে উঠেছে সবথেকে প্যাঁচালো। আজ আর আমাদের 'বিশ্বাস' রাখবার কোন ঠাঁই নেই।

হ্যাঁ, এটাই আজকের যুগের পরম সমস্যা। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। কেউ কাউকে আপন ভাবতে পারি না, কেউ কাউকে ভালবাসতে পারি না। বলদৃপ্ত ক্ষমতা-বানেরা চিরদিনই অসহায়-জনকে তাদের অসহায়-তার সুযোগ নিয়ে বঞ্চিত করেছে, শোষণ করেছে, ভাঙিয়ে খেয়েছে। কিন্তু আজকের যুগ তাদের 'ভেঙ্গে চুরমার' করে ফেলেছে। তাদের বিবেককে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের আত্মাকে চিনে ফেলছে। এর থেকে বড় শোষণ আর কি আছে? এর থেকে নিঃস্ব করে ফেলবার পদ্ধতি আর কি আছে? অথচ আজকের সমাজে প্রতিনিয়তই এই শোষণের দৃষ্টান্ত দেখে চলতে হচ্ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মানবসমাজে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। তবু কোন এক সময় সে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হবার আশা থাকে। কিন্তু সমাজের মানুষ নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে, সে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপই বা কোথায়? পূরণেরই বা আশা কোথায়? অথচ এই ক্ষয় বোধহয় আর রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ ক্ষমতায় নেশাগ্রস্ত অন্ধজনেরা আপাতটুকুই দেখতে পাচ্ছে। আপাতের ওপারটা দেখতে পাচ্ছে না। অথবা দেখেও দেখছে না। আজকের বিজ্ঞানে বলদৃপ্ত মানুষ যেমন পৃথিবীর বুকের সঞ্চিত সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলতে দ্বিধা করছে না, তেমনি বিবেকের দংশনও অনুভব করছে না। এই অজ্ঞান-দৃপ্ত মানুষেরাও নির্বিকারত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

এখন আমাদের সমাজজীবনের অবস্থা এই—সমস্ত মানুষই সাহস হারিয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হতে বসেছে। আজকের মানুষের আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখে দাঁড়াবার সাহস নেই, সত্য বলবার সাহস নেই। চোখের সামনে খুন হতে দেখলে

বাধা দিতে যাবার সাহস নেই, চোখের সামনে নারীর লাঞ্ছনা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিকারের চেষ্টায় সাহস নেই। আজকের সমাজ যেকোন অন্যায় অনাচার দেখেও বলতে বাধ্য হয়— 'দেখিনি', শুনেও বলতে বাধ্য হয়—'শুনিনি', বুঝেও বলতে বাধ্য হয়—'বুঝিনি'।

কারণ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অথচ এই সেদিনও এমন অবস্থা ছিল না। পরশাসিত ভারতবর্ষেও অত্যাচারী শাসকের আসনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সামান্য অসহায় মানুষটিও। 'ভয়' নামক ভয়ঙ্কর প্রাণীটা তাদেরকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু আজকের স্বাধীন দেশের মানুষেরা কী অদ্ভুত এক ভয়ের শিকার হয়ে বসে আছে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে আজ দেশবাসী যেন জড়পদার্থে পরিণত। স্বাধীনতা কি তাদের এই মহার্ঘ বস্তুটি উপহার দিল? কেড়ে নিলো তাদের বিবেক-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়-অন্যায় বোধের পরিমাপের স্বাধীনতা?

দৈহিক অর্থে 'ক্রীতদাস' প্রথার বিরুদ্ধে কত সংগ্রাম, কত সাধনা হয়েছে। সেই অমানবিক প্রথার অবসানও ঘটেছে। কিন্তু অন্য রাস্তা ঘুরে আর এক ক্রীতদাস-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। লোভের জাল ফেলে ফেলে সেই সব সৎ সরল সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

তাদের বিচার-বিবেচনা, মানবিকতা-বোধ আর সর্বোপরি তাদের মনুষ্যত্বটুকুও কিনে নেওয়া হচ্ছে, আপাত কিছুর বিনিময়ে।

আজকের চিন্তা-ভাবনা এই নিয়েই।

কে এই অধঃপতিত যুগে আবার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে পারবে? কোথায় সেই পরিত্রাতা?

মনুষ্যত্ব হারানো মানুষ, ভালবাসবার ক্ষমতা হারানো মানুষ, বিশ্বাস হারানো মানুষকে নিয়ে যুগের জয়যাত্রা কতদিন অব্যাহত থাকবে?

এ প্রশ্ন কি সৃষ্টিকর্তার কাছেই করার নয়?

তার এ পৃথিবীতে অনেক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে রাজ্য নিয়ে হানাহানি, কাড়াকাড়ি। তবু বলব, আজকের দুর্দিন আরও বেশি ভাবনার।

কারণ আজ সেই মানুষেরা ধ্বংস হতে বসেছে— চিরকাল যারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে। যারা সমাজের পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরকার আকাশ, যারা সমাজের মেরুদণ্ড।

আর এক ভাবনা—আজকের নারীসমাজকে নিয়ে, হ্যাঁ, সেও এক পরম সমস্যা। কারণ দীর্ঘদিনের অন্ধকারের অবরোধ ভেঙে আজ নারীসমাজ বাইরের জগতে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই তার বন্ধনদশাগ্রস্ত অবস্থা ঘুচেছে। আপাত দৃষ্টিতে সে যে মুক্ত-জীবনের স্বাদই বহন করছে বলে মনে হয়। তবু সেই নারীসমাজ—মুক্তি আন্দোলনে সোচ্চার নারীসমাজও যেন আজ পথভ্রান্ত দিশেহারা। আজও সে বুঝে উঠতে পারছে না নিজে ঠিক কোনখানে উপস্থিত হবে? কোন পথটি তার শ্রেয়?

সে কি পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলবে? না কি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার সাধনা করবে? সে কি আজকের আধুনিক জীবনের নিরঙ্কুশ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলবে? নাকি শ্রেয়ের সন্ধানে অতীতের দিকে ফিরে তাকাবে?

বহুটানের মধ্যে আজকের নারীসমাজ (অর্থাৎ সচেতন নারীসমাজ, যার অধিকাংশই আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই।) যেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে। একটি স্থির লক্ষ্যের পথ ধরে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তারা পাচ্ছে না।

বলতে গেলে সে অনেক কথা। তবে আজকের নারীসমাজকে দেখলে, এবং তাঁদের অভিমত-সমূহ দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা এখনো দিশাহারা। আজকের সমাজ এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আছে।

এই সঙ্কট—অবক্ষয় থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই কি? আজকের সমাজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পরি-বর্তন সম্ভব নয়। তাই অপেক্ষা করে আছি বিবেকানন্দের মতো যুগপুরুষের আবির্ভাবের।

‘বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার : ১৯৯০’ প্রদান উপলক্ষে ‘উদ্বোধন’-কে প্রদত্ত মানপত্রটি নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে পাঠোদ্ধার করে দেওয়া হলো।

ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার

১৬৭/২২ সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার : ১৯৯০

॥ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মাসিক মুখপত্র ‘উদ্বোধন’-কে অর্পিত বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥



ভারতীয় জাগরণের প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খধ্বনি—“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ওঠো, জাগো”। সেই বাণীর উদাত্ত ঘোষণার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা। জাতীয় জাগরণের বার্তাবহ ‘উদ্বোধন’-কে নমস্কার করি।

‘উদ্বোধন’-এর প্রস্তাবনায় স্বামীজী বলেছিলেন—দ্বার খুলে দাও! বিশ্বের সকল দিক থেকে আলোক আসুক। আর বলেছিলেন—তুলে ধরো আমাদের পিতৃধন—ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে। ‘উদ্বোধন’ স্বামীজীর অমোঘ ইচ্ছায় এনেছে আত্মবোধের বাণী, আত্মবিস্তারের বাণী এবং সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী। মুক্তিদূত ‘উদ্বোধন’-কে নমস্কার করি।

বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারকারী স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার আধার—‘উদ্বোধন’ পত্রিকা। ‘বিলাত-যাত্রীর পত্র’ বা ‘পরিব্রাজক’, ‘ভাববার কথা’, ‘বর্তমান ভারত’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ প্রভৃতি স্বামীজীর বাঙলা রচনাগুলি ‘উদ্বোধন’-এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনী ও তাঁর ভাষ্য স্বামী সারদানন্দ-কৃত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’ ‘উদ্বোধন’-এই প্রকাশিত হয়েছে। ‘উদ্বোধন’-এ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যরূপে স্বীকৃত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ নামক অমর গ্রন্থের অনেকখানি অংশ; নিখিল মাতৃত্বের বিগ্রহ শ্রীমা সারদাদেবীর কথা ও জীবন কথা; সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের জীবনী ও স্মৃতিকথা। ‘উদ্বোধন’-এ লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, যদুনাথ সরকার, এস. ওয়াজেদ আলি, দিলীপকুমার রায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সেকাল ও একালের স্বনামধন্য মনীষিবৃন্দ। মহাজীবনের রত্নাগার 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারেই 'উদ্বোধন' সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য সহ মানবজীবনের নানা প্রকাশকে 'উদ্বোধন' ধারণ করেছে এবং বিগত একানব্বই বছর ধরে বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র হয়েও 'উদ্বোধন' তার প্রবর্তকের ইচ্ছানুসারেই নিছক ধর্মীয় পত্রিকা হয়ে উঠেনি কখনও। তবে 'উদ্বোধন' অবশ্যই প্রকাশ করেছে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুগভীর দিকগুলিকে এবং চিরন্তন ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছে একালের ভারতবর্ষের সঙ্গে। 'উদ্বোধন' প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে। জীবন-সত্যের উন্মোচক 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

কঠিন বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে 'উদ্বোধন'-এর সূচনা। তার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। অতঃপর তাকে লালন করেছেন স্বামী সারদানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ। এঁদের সাধনায় 'উদ্বোধন' উত্তরোত্তর উন্নতিমুখী। অব্যাহতভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাময়িক পত্রিকা 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন'-এর অতীত ও বর্তমানের সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও পরিচালকবর্গকে নমস্কার করি।

'উদ্বোধন' পত্রিকামাত্র নয়—তা বিবেকচৈতন্য-যজ্ঞে অরণিকাষ্ঠ। বিবেক-যজ্ঞ চিরন্তন। 'উদ্বোধন'-ও চিরন্তনের নিত্য উচ্চারণ। 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির বাণীশরীর। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষ চিরন্তনেরই নামভেদ। 'উদ্বোধন'-ও সেই অর্থে চিরন্তনের সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর ললাটে বহু শতাব্দীর আয়ুষ্কাল। চিরন্তনের অপর নাম 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

কলকাতার ত্রিশত-বার্ষিকী পূর্তির প্রাক্-লগ্নে আদি কলকাতার অন্যতম অঙ্গে স্থাপিত 'উদ্বোধন' এবং তার প্রতিষ্ঠাতা আদি-কলকাতার অপর এক অঙ্গের জাতক কলকাতার "সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান" স্বামী বিবেকানন্দ-কে নমস্কার করি।

ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার-এর পক্ষে 'উদ্বোধন'-কে অর্পিত এই 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯০' বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ নামক নিত্য-সত্যকে আমাদের ভক্তিনত হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন। আমরা ধন্য। জয়তু 'উদ্বোধন'। জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।

৪ঠা জুলাই ১৯৯০

বিশ্বনাথ দত্ত
প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক
ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার

প্রবন্ধ

হরিলীলায় যেন ভেলকি লেগে যায়

স্বামী প্রভানন্দ

আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে বিশ্ববৈরাজের খেলা। জড় পদার্থের মধ্যে একটি ভর অপর একটি ভরকে আকর্ষণ করছে। আবার চেতন মানুষ একে অপরকে আকর্ষণ করছে। পার্থক্য এইটুকু যে, মানুষের পরস্পরের আকর্ষণের পিছনে রয়েছে একটা প্রিয়ত্ব-বোধ, উপাদেয়ত্বের ধারণা। উপনিষদের ঋষি এর রহস্যভেদ করে বলেছেন ঃ "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" অর্থাৎ সবকিছুর অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভর করে সেই আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় বলে বোধ হয়। প্রিয়ত্ববোধ ও তজ্জনিত আকর্ষণ তীব্র-রূপে দেখা দেয় যখন সচ্চিদানন্দ ভগবান মানুষের বেশে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হন। বাউলের দলের মতো পরিকরদের নিয়ে তিনি হাজির হন, নাচগান করে মাতিয়ে নাচিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যান। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, এ হচ্ছে ভগবানের লীলা-বিলাস। যোগমায়ার সাহায্যে এ-লীলাবিলাস। মায়া ও যোগমায়া উভয়েরই অচিন্ত্য আকর্ষণী মোহিনীশক্তি আছে। ভগবদ্‌বহির্মুখদের মুগ্ধ করে মায়া, ভগবদ্‌উন্মুখদের মুগ্ধ করে যোগমায়া। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হয়েছে ঃ "যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ।"[১] যোগমায়া চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এর দ্বারা মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী হয়। ভগবানের কোনপ্রকার নিজ প্রয়োজন না থাকলেও তিনি কেবলমাত্র আনন্দোচ্ছ্বাসবশতই বিবিধ লীলা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপানন্দ বিতরণই তাঁর আনন্দাস্বাদন।

ইদানীং রামকৃষ্ণবপু আশ্রয় করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বর। সময় বেছে নিয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের মধ্যাহ্নকাল। স্থান—ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে উত্তরপশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম। পশ্চিম বাংলার চারটি জেলা—হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের প্রায় মিলনবিন্দুতে এই গ্রাম। শৈশব কৈশোর ঐ গ্রামে অতিবাহিত করে তাঁর জীবনের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ অতিবাহিত করেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে। প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ গন্ধ যেমন ছোট বড় সকল মধুপকে আকর্ষণ করে, তেমনি অবতার-পুরুষের দিব্য লীলাবিলাস সকল শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। মাধুর্যমণ্ডিত সে-আকর্ষণ।

অবতার-পুরুষের লীলাবিলাসের তাৎপর্য অবধারণ করতে হলে যে পরিপ্রেক্ষিতে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। শক-হূন-পাঠান-মোগলের উৎপীড়নের পর ভারতবর্ষ সে-সময়ে ইংরেজের দখলে। লোভী বিদেশী শক্তির নিয়ত শোষণে দেশের সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে, মহামারিতে, অশিক্ষায় পর্যুদস্ত। পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে দেশের নতুন-শিক্ষিতদের মধ্যে সনাতন মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দেখা গেল, জনমানস থেকে ধর্মবিশ্বাস উপড়ে ফেলতে একদল সচেষ্ট, অপর একদল সংস্কারপন্থী নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করতে আগ্রহী। অবশ্য এ-ধরনের বৈপ্লবিক ভাবোচ্ছ্বাস গ্রাম-ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় যে গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানকার লোকসংখ্যার বিরাট এক অংশ আদিম উপজাতি ও হিন্দু সমাজভুক্ত তপসিলী সম্প্রদায়। সে-অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রাণধারা শুকিয়ে গিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। পাল রাজ-বংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করলেও তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান এ-অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভবের পূর্বে প্রাচীন হিন্দুগণ শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর (বাসুদেব) আরাধনা করত। এ-সময়ের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে তন্ত্রাচারের বিকাশ ঘটেছিল রাঢ়ের সর্বত্র। এর প্রসারে সাহায্য করেছিল লৌকিক ধর্ম। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে অনড়-প্রায় ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, উদ্ধারণ দত্ত, কমলাকর পিপলাই প্রমুখদের ভূমিকা

১ ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলে নতুন ভক্তিধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েছিলেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হয়ে বিষ্ণুপুরের অত্যাচারী রাজা বীর হাম্বিরের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এ-পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর রচিত একটি গানের শেষাংশ, "এ-বীর হাম্বির হিয়া/ব্রজপুর সদা ধাঁয়া/যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে।"[২] এই রাজপরিবারের আনুকুল্যে ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে স্থাপত্যে নবজাগরণ উপস্থিত হয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে বিবিধ বিবর্তন ঘটেছিল। সেই বিবর্তনের অন্যতম হলো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেবের পরিবর্তন—মোহন বাঁশরী হাতে কালোসোনা, ননী-চোরা, শ্যাম রায় ইত্যাদি রূপে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ রাধিকা। কৃষ্ণ ও রাধার একাত্ম-মূর্তি শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই প্রেম সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন ঃ "কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।"[৩] গৌরাঙ্গলীলাবিলাসে ভক্তি মৈত্রী প্রেমের ছড়াছড়ি।

একথা অনস্বীকার্য যে, আর্য ও অনার্য এই দুই বিপরীতধর্মী কৃষ্টির সংঘাত ও সমন্বয় কালের সোপান বেয়ে নেমে এসে এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনে এনেছিল বহুবিধ পরিবর্তন। ধর্মঠাকুর, মনসা, পশুপতি (শিব), শীতলা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অপরপক্ষে আদিম উপজাতিগণ হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবগুলি বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[৪] এ-সকল বিবর্তন ছাড়াও সাধারণের দৃষ্টির প্রায় অগোচরে জনজীবনের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল মরমিয়া সাধনার ধারা। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিব্যাপ্ত এই ধারার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল আলোচ্য গ্রামাঞ্চলেও। এ-ধারা সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশ-গুপ্তের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "Side by side with the commonly known theological speculations and religious practices there has been flowing in India an important religious undercurrent of esoteric yogic practices; …when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult, known as the Vaisnava Sahajiya movement."[৫] শ্রীচৈতন্যোত্তর জাগরণের জোয়ার জনমানসে দৃঢ় শিকড়বদ্ধ মত ও বিশ্বাসকে প্রতিহত বা অবদমিত করতে পারেনি। উপরন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত মত-পথের সঙ্গে এ-ধারার মিথষ্ক্রিয়াতে (interaction) উদ্ভূত হয়েছিল আউল, বাউল,[৬] নেড়া, কর্তাভজা, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়। অক্ষয়কুমার দত্ত শ্রীচৈতন্য-সূত্রে সম্পর্কিত এ-ধরনের ত্রিশটি শাখা সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়েছেন।[৭] এ-সকল সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবিলাস করেছিলেন। এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ কথামৃতের পাতায় পাতায়। শুধুমাত্র পরিচয় ছাড়াও তিনি এজাতীয় মতপথ নিজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও উদার ভাবের আলোকে বিচার করেছেন এবং প্রয়োজন মতো সে-সকল মতানুসারী লোকদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছেন।

২ ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, ৭।৬১

৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মধ্যলীলা, ২৩ অধ্যায়

৪ "The new life breathed into Bengal Hinduism by Chaitanya's creed, burst forth in another direction. The Vaishnava Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after ages of neglect, contumerly and superstition." (History of Bengal—Jadunath Sarkar, Vol. II, 1948, p. 221-222)

৫ Obscure Religious Cult—Sashibhusan Dasgupta, 1969, Indroduction, pp. 33-34

৬ এক মতানুসারে বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীচৈতন্য। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে (১৯৫৪, পৃঃ ৪৮) লিখেছেন, মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাওয়া যায়।

৭ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠভবন সং, ১৩৭৬, পৃঃ ১১০—১৪৯

এদের সাধনপথে তিনটি পর্যায় দেখা যায়ঃ প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই পর্যায় তিনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পাঁচটি আশ্রয়, যথা নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। নাম ও মন্ত্র প্রবর্তক পর্যায়, ভাব সাধক পর্যায়, এবং প্রেম ও রস সিদ্ধ পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত।[৮] শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন এক থাকের লোক যারা 'সহজ' 'সহজ' বলে চিৎকার করে। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম 'কৃষ্ণগন্ধ' গায়ে থাকবে না অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত ভাব অন্তরে, বাইরে কোন চিহ্ন থাকবে না ; হরিনাম পর্যন্ত মুখে থাকবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, পদ্মের ওপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। অর্থাৎ নারীসঙ্গ হবে, কিন্তু নারীতে আসক্তি থাকবে না, জিতেন্দ্রিয় হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমা-পূজা—এসব like করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাইতো ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ কর্তাকে গুরুকে ঈশ্বরবোধে ভজনা করে—পূজা করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেনঃ "ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে—পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশ-তত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ—এই সব তত্ত্ব। এসব সাধন বড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকা।"

এ-সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অনাচার ও কদাচার। এরূপ একটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে কথামৃতে। ঠাকুর তখন শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে। সেখানে ছিলেন প্রতাপ হাজরা। একদিন উপস্থিত হয় এক বৈষ্ণব। সে বসতেই ঠাকুর তার দিকে পিছন ফিরে বসলেন। ঠাকুরের এরূপ আচরণ দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল বৈষ্ণবটি নষ্ট চরিত্রের। তার মাসির সঙ্গে ছিল তার অনৈতিক সম্পর্ক।

আবার এ-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নত সাধক-সাধিকাও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এরূপ দুজনের উল্লেখ পাই কথামৃতে। একজন সদয় বাবাজী, ভাল সঙ্কীর্তন করতেন। দ্বিতীয় সরী বা সরস্বতী পাথর। ইনি সম্ভবতঃ শিহড়ে বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিচয়ন করে বলেছেনঃ "এ মতের লোক পরস্পরের বাড়িতে খায়। কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়িতে খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়িতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়িতে খেলে না। বলে, ওরা জীব। আমি একদিন তার বাড়িতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে—তারপর অসুখ।"

উপরি উক্ত পরিমণ্ডলে শুভ বসন্তের এক ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শিশু রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। কৈশোরে ভাবাবস্থায় তিনি দর্শনলাভ করেছিলেন দেবী বিশালাক্ষীর। তাঁর মুখের কথাঃ "সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম।" তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হয়ে উঠেছিল। মন মাঝে মাঝেই তলিয়ে যেত ভাবের গভীরে। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে তাঁর অন্তরাত্মা অনুরাগের আবেগে উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল অভূতপূর্ব প্রেমোন্মাদনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আনন্দময়ী জগন্মাতা চৈতন্যস্বরূপা। অতঃপর তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করে সাধন করেন। পুরাণমতে, তন্ত্রমতে, বেদমতে সাধন করেন। বহির্দেশীয় ইসলাম-মতে সাধন করেন। খ্রীস্টমতেও করেন। প্রত্যেকটি মতপথ অনুসরণ করে সেই-সেই পথের শীর্ষ-বিন্দুতে আরোহণ করেন। সাধন-শোধনাদির শেষে তিনি ভাবমুখের শিখরে উত্তীর্ণ হন। এই অগ্রগতি পর্যন্ত বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি নরলীলা করেছিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসের বেগে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেছিলেন ভক্তগণের মধ্যে। ভক্তগণের অনুরক্তি প্রেমানন্দ-রসাস্বাদনে। তিনি নিজমুখে বলেনঃ "মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।" এই পর্যায়ে তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান করেন, হরিকথা বলেন, অপরের জন্য ভাবেন, তাদের দুঃখে কাঁদেন। পাপী-তাপীদের তারণ করেন। সর্বোপরি তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শুধু প্রেম বিতরণ করেন। শ্রীচৈতন্যরসসিক্ত বঙ্গদেশে স্বভাবতই তাঁকে দেখে

৮ **Obscure Religious Cult—Sashibhusan Dasgupta, p. 141**

মনে হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব। ভক্তগণের মনে পড়েছিল শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিশ্রুতিঃ "পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।/ কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।" এ-পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ। মনে হয়েছে তিনি যেন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্প্রসারিত রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নবগৌরাঙ্গ। তাঁকে কেন্দ্র করে উত্থিত হয়েছিল হরিরস ভাবতরঙ্গ। হরিনামের উদ্দাম উন্মত্ততা। রসিক মাত্রেই অনুভব করেছেন হরিলীলার তীব্র আকর্ষণ।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে করভাজনের মুখে শুনতে পাই সঙ্কীর্তনরূপ যজ্ঞ[৯] সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। তারই বাস্তবায়ন ঘটেছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত সংকীর্তনের মধ্যে। পূর্বে কেউ জানত না সঙ্কীর্তন কিরূপ। চৈতন্যভাগবত বলেছেনঃ "শিষ্যগণ বলেন 'কেমন সংকীর্তন'।/আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥" তিনি চালু করেন তরঙ্গতুফান-ময় সঙ্কীর্তন। হাজার হাজার মানুষ একভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক গানের এক তানে সৃষ্টি করে ভগবৎ ভজনতরঙ্গ। তরঙ্গশীর্ষে প্রেমদ্রুতচিত্ত গদগদ-ভাষী শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদেন, হাসেন, কখনো বা কীর্তন করেন বা নৃত্য করেন। প্রেমভক্তির আকর্ষণে জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, জনতা যেন ভাবের ঘোরে ভেসে চলে। এই সঙ্কীর্তনলীলার পুনরাভিনয় করলেন নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ। করলেন দক্ষিণে-শ্বরের সাধনপীঠে, কলকাতার হরিসভায়, পেনেটির শ্রীপাটে; মাহেশের রথের সম্মুখে, বাঁকুড়া-হুগলির প্রত্যন্ত কয়েকটি গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেনঃ "পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে না।"[১০] রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম ভবনে সংকীর্তনে মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে হয়েছেঃ "সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ-ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন।"[১১] মাহেশে রথের সম্মুখে ভাবে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে অক্ষয়-কুমার সেনের মনে হয়েছেঃ "আপনে আপন হারা জগৎ গোঁসাই।"[১২] নৃত্যরত ঠাকুরকে দেখে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের মনে হয়েছে "ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে-নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"[১৩] বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী হরিলীলায় রত শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবমূর্তিটি অঙ্কিত করেছেন তা ভাববৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁকুড়া ও হুগলির সীমান্তে কয়েকটি গ্রামে তিনি তাঁর যে সম্মোহিনী রূপটি উন্মোচিত করেছিলেন তা অতুলনীয়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হরিলীলার যে প্রচণ্ড আকর্ষণী ও সম্মোহিনী শক্তি তার public demon-stration দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরাবতারের নরলীলা ছায়াতপে ঘেরা। যোগমায়া আশ্রয় করে যে ভগবানের নরলীলা সে-যোগমায়ার মধ্যে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ উন্মুখমোহন, বিমুখমোহন এবং আত্মমোহন ত্রিবিধ কার্য লক্ষ্য করেছেন।[১৪] এই আত্মমোহনের দ্বারা অবতার-পুরুষ নিজে মোহিত হয়ে লীলা সম্পাদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে।" সে-কারণে নরলীলা অনেকাংশে দুর্বোধ্য, রহস্যঘন ও আকর্ষণীয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু ঠাকুরের হৃদয়ে তীব্র আঘাত হেনেছিল। তাঁর প্রাণের ভিতরটা গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়াতে থাকে। অবতার মানুষদেহে শোকতাপদগ্ধ মানুষের মতো ব্যবহার করেন তার শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য ভক্ত মথুরমোহন তাঁকে বর্তমান বাংলা-দেশের তালা ও সোনাবেড়ে গ্রামে এবং চূর্ণী নদীর তীরে কলাইঘাটাতে নিয়ে যান। কিছুকাল পরেই ঘটে 'অঘটনঘটন-পটিয়সী' যোগমায়ার একটি খেলা। সাধক বৈষ্ণবচরণের আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ গেছিলেন কলুটোলার হরিসভায়। বৈষ্ণবচরণের ভাগবত-পাঠ

৯ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্‌। / যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। (ভাগবত, ১১।৫।৩২)

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ৬৯

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৭৯

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ১০ম সং, পৃঃ ৫৭৭

১৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৮৯, পৃঃ ১০৯

১৪ শ্রীমদ্ভাগবত—কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, ১০ম স্কন্ধ, পৃঃ ১৭০৭

শুনতে শুনতে তাঁর ভাবাবেশ হয়। আত্মহারা ঠাকুর ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন 'চৈতন্যাসনের' উপর। শ্রীচৈতন্যের জন্য সংরক্ষিত আসন। শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধিস্থ নিশ্চল দেহ। শ্রীচৈতন্যের মতো ঊর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ। মুখে 'দিব্যামৃতবর্ষী হাসি'। ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত উপস্থিত সকলে হরিধ্বনি করে ওঠে, মেতে উঠে নাম-সংকীর্তনে। ক্রমে ঠাকুর নেমে আসেন অর্ধবাহ্য-দশায়, কীর্তনীয়াদের সঙ্গে তিনি উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। আবার ভাবের আধিক্যে সমাধিতে ডুব দেন। অন্তর্দশায় চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। লীলাসংকীর্তনে মুগ্ধ বৈষ্ণবগণ সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরে যান নিজ নিজ ঘরে। কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরের 'চৈতন্যাসন' অধিকারের যৌক্তিকতা নিয়ে বৈষ্ণবসমাজে তর্ক-বিতর্ক হয়। শীর্ষস্থানীয় নেতা কালনার ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কটূকাটব্য করেন। ঘটনাক্রমে অনতিকাল পরেই ঠাকুর উপস্থিত হন কালনায় বাবাজীর নামব্রহ্ম আশ্রমে। সাধনভজনে প্রাগ্রসর বাবাজী ঠাকুরের সমাধিস্থ দেহে মহাভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করে বিস্মিত হন। ঠাকুরের তেজপূর্ণ বাণীতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তিনি পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ-যাত্রাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে নদীগর্ভে অধুনালুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাস্থলে নিতাই ও গৌরের দিব্যমূর্তির দর্শনলাভ করেছিলেন। এ-ধরনের লীলাবিলাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের গহনের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর একটি উক্তিতে। তিনি বলেছিলেনঃ "আবার কখনও কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মিলন। এ-অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো।" শ্রীগৌরাঙ্গের ছিল 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা', পুরুষ ও প্রকৃতিভাব একসঙ্গে গ্রথিত। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ভাবিত ঠাকুরের এসকল লীলাবিলাসের কাল ১৮৭০-১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ। এ-জাতীয় ছোটখাটো ঘটনা আরও ঘটতে থাকে। অবশেষে প্রায় এক দশক পরে ঠাকুরের দেহমন আশ্রয় করে উপস্থাপিত হয়েছিল হরিলীলার অনুপম এক প্রদর্শন। প্রেম-ভক্তির ঐশ্বর্যে ভরপুর এক প্রদর্শন।

ইতোমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছিলেন রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে। তাঁর প্রবর্তিত 'ধর্মতত্ত্ব' (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬) ঘোষণা করেছিলঃ "আমরা নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" কিছুদিন পরে আবার ঘোষণা করেছিলঃ "শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া 'ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য-লৌকিকাঃ, / নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি-তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।' ...পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়।"[১৫] ব্রাহ্মনেতাদের অনেকের মূল্যায়নে তিনি ছিলেন নাইটিন্থ সেঞ্চুরির শ্রীগৌরাঙ্গ। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ মনে একটি বাসনার ফুট উঠেছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের 'সর্বজন মোহকর নগরকীর্তন' দেখবেন। একদিন তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে যেন একটি পর্দা উঠে গেল। অদ্ভুত এক দৃশ্য! ভাবচোখে নয় সাদাচোখে দেখেন সে-দৃশ্য। দেখেন পঞ্চবটীর দিক থেকে এক মহাসংকীর্তনতরঙ্গ বকুলতলায় বাঁক নিয়ে কালীবাড়ির ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জনসমুদ্র বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এগিয়ে চলেছে। চৈতন্য ভাগবতকারের ভাষায় "কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।/ স্বর্গ মর্তপাতালাদি পূরিল সকল।"[১৬] কিলবিল করছে মানুষ। হাজার হাজার মানুষ। মধ্যখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর ভাবোল্লাসে চতুর্দিক আপ্লাবিত—কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হরিধ্বনি করছে, কেউ বা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে। ভক্তিপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ডুবে-ভেসে-সাঁতারিয়ে এগিয়ে চলেছেন ভক্তগণ। গৌরভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিরস সম্ভোগ করেন, হরিলীলার আনন্দাস্বাদন করেন, হরিসংকীর্তনের সম্মোহিনী শক্তি লক্ষ্য করে নিজেই মুগ্ধ হন।

নিজে সুমিষ্ট আম খেয়ে মুখ পুঁছে ফেলার

১৫ ধর্মতত্ত্ব, ১ অক্টোবর, ১৮৭৯

১৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঠ, ২।২৩।৩৮০

ভূমিকা অবতার পুরুষের নয়। তিনি অপরকে আনন্দাস্বাদন করিয়ে দেবার জন্য, সকল মানুষকে চৈতন্যঘন আনন্দস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্ম-অভিমুখীন করবার জন্য সদাই ব্যগ্র। খানদানি ভক্তের বিশ্বাস, ভক্তদের ভক্তিপ্রেমের রসাস্বাদন করিয়ে দেবার জন্যই তো শ্রীভগবানের মনুষ্যদেহধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি যেখানেই যান সেখানেই আনন্দোৎসার ঘটে। হরিলীলার উচ্ছ্বাসে সকলেই অননুভূত আনন্দ আস্বাদন করে, হরিলীলার আকর্ষণ অল্পবিস্তর অনুভব করে। কিন্তু হরিলীলাবিলাসের থাক থাক রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত হরিলীলাবিলাসের পরম বিস্ফুরণ ঘটেছিল বাঁকুড়া হুগলির প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলুই-শ্যামবাজারে। এবং এটি সংঘটনের পূর্বে লীলাকর বেশ কিছু প্রস্তুতি করেছিলেন।

বর্ষাকালে দক্ষিণেশ্বরে পানীয় জল প্রায় অপেয় হয়ে উঠত, কখনো বা প্রাঙ্গণে গঙ্গার জল উঠে ঠাকুরের ঘরটিকে স্যাঁতস্যেতে করে তুলত। সে-সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় বছরই কামারপুকুরে চলে যেতেন। এবং শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। কোতলপুর থানার দক্ষিণদিকে শিহড় একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। ঠাকুরের পিসতুতো বোন হেমাঙ্গিনীর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রাম। বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা চার বছরের ছোট। দুজনে একইসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। হৃদয়ের বাড়িতে নিত্য 'শ্রীধর' শিলায় পুজো হতো। বাড়ির সামনে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুরের নির্দেশে এই চণ্ডীমণ্ডপে হরিসঙ্কীর্তনের আসর বসত। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ছোট ছেলে। হৃদয়ের বাড়ির উত্তরদিকে তাঁর বাড়ি। পরবর্তী কালে তিনি এ-সকল কীর্তনের কাহিনী বলে বেড়াতেন।

শিহড়কে কেন্দ্র করে গৌরাঙ্গভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু প্রাসঙ্গিক কাহিনী স্মরণ-যোগ্য। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে সাধনার প্রথম চার বছরের শেষভাগে তিনি কামারপুকুর গ্রামে এসে বাস করেছিলেন। একদিন পালকিতে চেপে যাচ্ছিলেন শিহড়ে। নীল আকাশ। দুপাশে সবুজ ধানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অকস্মাৎ দুটি কিশোর ঠাকুরের দেহ থেকে বেরিয়ে আশেপাশে ছোটাছুটি করতে থাকে, কখনো বা পালকির কাছে এসে হাস্যপরিহাসে মেতে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে বিহার করে তারা ঠাকুরের সত্তায় মিলিয়ে যায়। দেড় বছর পর এ-ঘটনাটি শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মন্তব্য করেছিলেন: "বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"[১৭]

শুধু শিহড়ের পথে কেন কলকাতায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণের এ-ধরনের ভাবদর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। একদিন শ্যামপুকুরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি চমৎকার একটি দৃশ্য দেখেন। পরে তিনি বলেন: "এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান?—তিন-চার ক্রোশব্যাপী শিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী!...চতুর্দিকে আনন্দের কুয়াসা!—তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটি ছেলে উঠলো—মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। দুজনেই দিগম্বর! তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা!"[১৮]

একবার শিহড়ে থাকাকালীন ঠাকুর রাখাল বালকদের খাওয়ান। সে-ঘটনাটি তিনি নিজমুখে বলেছিলেন: "শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জলপান দিলুম। দেখলুম, সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম।"[১৯] এই সকল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ-ভাবের প্রচ্ছায়া সুস্পষ্ট।

শিহড়ের দক্ষিণপাড়াতে নফর বাড়ুজ্যের বাড়ি ছিল। নফর ভক্তিমান। "প্রভুতে আছিল তাঁর ইষ্টদেবজ্ঞান।" তাঁর দুই ছেলে দিগম্বর ও হৃদয়। দিগম্বরের সময়ে এই পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিপুল উন্নতি হয়। বর্তমান বসতবাটির অট্টালিকা নির্মিত হয়। সাত-আট মহলের জমিদারি থেকে প্রচুর আয় হতো। কুলদেবতা 'শ্রীধর' শিলার নিত্য পুজো এখনো অনুষ্ঠিত হয় একটি ছোট সুন্দর দালানে। নফরের সময়ে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ঝড়ে তা পড়ে যায়। সামনেই আটচালার নাটমন্দির। ছাদ ছিল

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬১—১৬২

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১০৪৭

১৯ ঐ, পৃঃ ২৩০

খড়ের। ১৩৪৯ সালের ঝড়ের পর টিনের চারচালা তৈরি হয়। চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হতো। নফরের উৎসাহে নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো হরিসংকীর্তন। নফর নিজে একজন দক্ষ কীর্তনীয়া[20] ছিলেন। এখানকার সংকীর্তনের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেছেন কয়েকবার।[21] তার সুখস্মৃতি এই পরিবারের গর্বিত সম্পদ।

ব্রাহ্মণ-প্রধান শিহড়ের মানুষ জানত শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর। পণ্ডিতম্মন্যদের অনেকে তাঁকে সামান্য জ্ঞান করতেন। যেন তাঁদের দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্যই একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবৃতির মুখবন্ধ করে পুঁথিকার মন্তব্য করেছেন: "না দেখিলে মানুষেতে ঐশ্বর্য ব্যাপার। / কখনো না হয় হৃদে বিশ্বাস সঞ্চার॥" খানাকুলের কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে শিহড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। একদিন তাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দেন। ঠাকুরের ভূমিকা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুঁথিকার লিখেছেন:

"শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ সিংহের বিক্রমে॥
সুগূঢ় যে তত্ত্ব নাহি আইসে ব্যাখ্যায়।
বুঝান শ্রীপ্রভু হেন সরল ভাষায়॥
শত শত সরল উপমা সহকারে।
সুমূর্খে যে শুনে সেও বুঝিবারে পারে॥"

দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা হার স্বীকার করেন। ঠাকুরের কথা তাঁদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। এ-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই ঠাকুরের পূতসঙ্গলাভের জন্য লোকের ভিড় হতে থাকে। পুঁথিকার লিখেছেন: "শিকলে শিকলে যেন পরস্পর টানে। / সেইমত আসে কত প্রভু দরশনে।" কখনো বা হৃদয় উৎসবের আয়োজন করতেন। আমন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদিকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাতেন। হৃদয় আবার সুবিধা মতো আশপাশের গ্রামে হরিকীর্তন সমাবেশে তাঁর মামাকে নিয়ে যেতেন।

পুঁথিকারের তথ্যানুযায়ী মথুরমোহনের জীবিত-কালেই ঠাকুর একবার শ্যামবাজারের নটবর গোস্বামীর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। মথুরমোহন মারা যান ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুলাই। প্রকৃত-পক্ষে নটবর বেলটে গ্রামের অধিবাসী। গোস্বামী-প্রবর "প্রভুদেবে পূজিতেন গুরুর মতন।" শিহড়ের দক্ষিণদিকে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে পূবদিকের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে বেলটে গ্রামে ঢুকবার আগেই বাম দিকে একটি গলি। গলি ধরে কিছুটা গেলেই ডানদিকে পড়ত নটবর গোস্বামীর বাড়ি।[22] পাশে ছিল একটি ডোবা। প্রাঙ্গণে ছিল একটি আমগাছ। পশ্চিমে ছিল বসতবাটি। উত্তরে ছিল খামার। পূর্বে ঠাকুরঘর। সেখানে বিষ্ণুশিলা, বালগোপাল ও শীতলার নিত্য পূজা হতো। প্রতি ভাদ্র ও চৈত্র মাসে দশদিন করে পাণ্ডুগ্রামের শ্যামসুন্দর এ বাড়িতে এসে পূজা ও সেবা গ্রহণ করতেন। কোন এক সময়ে নটবরের বংশধরগণ কয়াপাট গ্রামে চলে যান। সেখানে নটবরের প্রপৌত্র অনিল গোস্বামী বর্তমানে নটবর-পূজিত অষ্টধাতুর শ্যামসুন্দরের পূজা-সেবা করে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ নটবর ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নটবরের বাড়ির উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বাস করতেন শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী। লক্ষ্মীনারায়ণ ভাল খোল বাজাতেন।

বেলটে গ্রামের পশ্চিমাংশে ছিল গোস্বামীদের বসবাস। গোস্বামী পাড়ার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ছিল অনেক তাঁতির ঘর। অনেকেই ছিল বৈষ্ণবমতাবলম্বী। খুব সম্ভবতঃ এই তাঁতিদের সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে-ছিলেন। বলেছিলেন: "ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন।)—ও আমরা ছুঁই না।…কেউ বলছে, 'তোমরা বুঝিয়ে দেও না, কোন হরি মান।' তাতে কেউ বলছে—

২০ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "উন্মাদ অবস্থা…শ্বশুরবাড়ি গেলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর—দিগম্বর বাড়ুজ্জের বাপ এরা এল। খুব সংকীর্তন।"—কথামৃত, পৃ: ২৩০

২১ নফর বাড়ুজ্জে সম্পর্কিত এ-তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাঁর প্রপৌত্র পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

২২ এ বাড়ির তথ্যাদি প্রবোধ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বর্তমানে তাঁর দখলেই রয়েছে নটবর গোস্বামীর জমি। আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পাওয়া গেছে প্রবীণ জীবন কোলের নিকট।

'না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক।'..."[২৩]

নটবর যেমন ভক্তিমান, তেমন তাঁর স্ত্রী ছিলেন "যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।"[২৪] তাঁরা দুজনে ঠাকুরকে পরম ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করেন। পুঁথিকার লিখেছেন ঃ

ভক্তিভরে দারাসহ সেবা কৈল তার।
বড় মিষ্ট রাষ্ট্র কথা পটল ভাজার ॥
পটলের ভাজি এত লেগেছিল মিঠে।
মহাভক্ত মথুরের কানে ক্রমে উঠে ॥
মথুরে বলিয়াছিলা আপনি গোঁসাই।
মধুর এমন ভাজি কোথাও না খাই ॥
কি দিয়া রাঁধিয়াছিল বামনের মেয়ে।
তুষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ সে ভাজি খাইয়ে ॥
অপুত্রক আছিলেন গোস্বামীপ্রবর।
পুত্রভিক্ষা করিলেন প্রভুর গোচর ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুদেব ভগবান।
কৃপা করি দিলা বর হইবে সন্তান ॥
যথাকথা প্রভুবাক্য নহে টলিবার।
অচিরে পাইল এক সুন্দর কুমার ॥[২৫]

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড়ে এসেছেন জানতে পেরেই নটবর তাঁর কাছে ছুটে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন কৃষ্ণভক্ত তাঁতিদের একটি কীর্তনের দল। "দেখিয়া প্রভুর মূর্তি লুটে পড়ে পায়।" সঙ্কীর্তন সহকারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যান নিজ আলয়ে। ইতোমধ্যে ঠাকুরের মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। শত শত লোকের ভিড় জমে যায়। কীর্তন সাঙ্গ করে সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করে। মনে হয় এ-যাত্রায় ঠাকুর নটবরের বাড়িতে একাধিক দিন বাস করেছিলেন। পুঁথিকার লিখেছেন ঃ "প্রভুর বৈঠক হয় গোস্বামীর ঘরে।/ভান্ডারা যোগায় দিন পিরীতের ভরে ॥ / শ্রীপ্রভুর হয় ভিক্ষা গ্রামে স্থানে স্থানে। / কত শত শত ভক্ত সেই ঠাঁই জমে ॥" এভাবে প্রচুর আনন্দ অকাতরে বিতরণ করে ঠাকুর ফিরে যান হৃদয়ের বাড়িতে।

শুধুমাত্র শিহড় গ্রামে নয়, আশপাশের কয়েকটি গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য। জনশ্রুতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা। এরকম একটি গ্রাম কয়াপাট। গোঘাট থানার অন্তর্গত। এ গ্রামের পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা। কয়াপাটের হাটতলায় যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির ও তার সম্মুখেই নাটমন্দির। সম্ভবতঃ শিহড় থেকে ঠাকুর সাড়ে তিন মাইল পথ পালকিতে চেপে এখানে এসেছিলেন এবং নাটমন্দিরে সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন।[২৬] কয়াপাট বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে থানার উল্টোদিকে ভুবনেশ্বর শিবের আটচালা। সেখানে পিলে দাগা হতো। এখানেই শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল। [স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ কয়েকজনের মতে যজ্ঞেশ্বর শিবের নাটমন্দিরে শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল।] কয়াপাটের দক্ষিণে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম। সেখানে বাস করতেন বিখ্যাত খোলবাদক রাইচরণ দাস।[২৭] লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তব্য করেছেন যে, রাইচরণের খোলের বাজনা শুনলেই ঠাকুরের ভাব হতো। কয়াপাট ও কৃষ্ণগঞ্জের পাশেই বদনগঞ্জ। তার পর ধানক্ষেত। তারপর শ্যামবাজার। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা আউলিয়া মনোহর দাস বদনগঞ্জ গ্রামে বাস করতেন। এখানেই তার সমাধি আছে।[২৮] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ-গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন কি? একমতে তিনি এ-গ্রামেও পরিক্রমা করেছিলেন।

মেমানপুর বা মেহেরবানপুর গোঘাট থানার অন্তর্ভুক্ত। শিহড় থেকে দক্ষিণে তিন মাইল দূরে। পাশের গ্রাম মড়াগেড়ে। প্রতাপ হাজরার বাড়ি। মেমানপুরের শ্যামসুন্দরের পঞ্চরত্ন মন্দির অতি সুন্দর। কথিত আছে আউলচাঁদ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল ১৮৯২

২৩ কথামৃত, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩

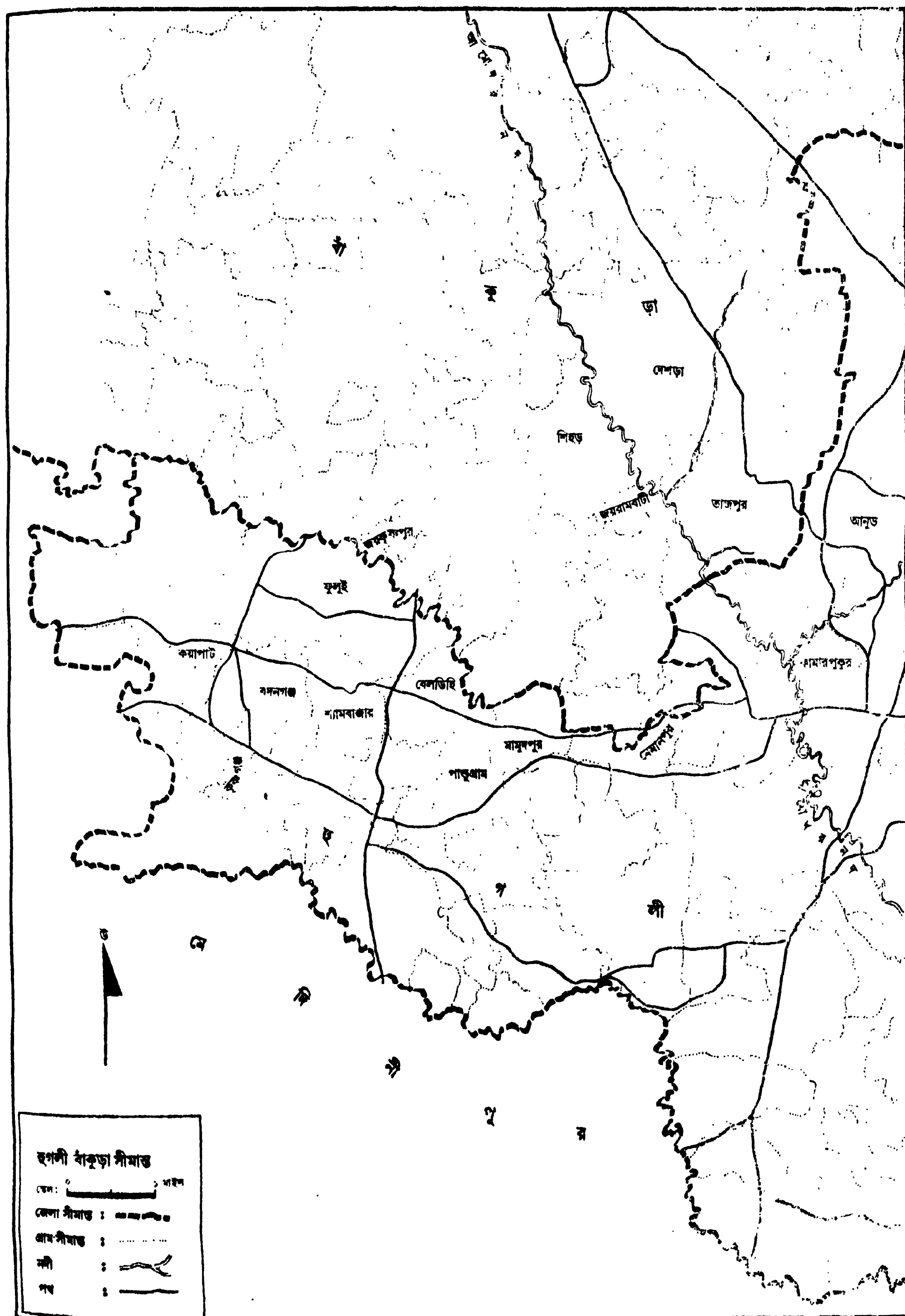
২৪ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

২৫ নটবরের পুত্রের নাম রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের দুই পুত্র শ্রীপতি ও পশুপতি। শৈশবে শ্রীপতি জলে ডুবে মারা যান।

২৬ কথামৃতকার কথামৃতের ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় লিখেছেন যে, ঠাকুর কয়াপাটে সংকীর্তন করেছেন। বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মন্মথনাথ কোঙার ছাত্রদের এস্থানটি দেখাতেন। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দও (রামময় মহারাজ) এস্থানটি সম্বন্ধে বলতেন। বলা বাহুল্য, উভয়েরই উৎস ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষক প্রবোধ চক্রবর্তী।

২৭ পূর্বোক্ত প্রধানশিক্ষক মন্মথনাথ কোঙার তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রাইচরণের ভিটে দেখিয়েছিলেন।

২৮ পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—সম্পাদনা ঃ অশোক মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৯



বাঁ
কু
ড়া
দেশড়া
শিহড়
জয়রামবাটী
তাজপুর
আনুড়
ফুলুই
কয়াপাট
বদনগঞ্জ
শ্যামবাজার
বেলডিহি
মামুদপুর
পাণ্ডুগ্রাম
কামারপুকুর
হু
গ
লী
উ
মে
দি
নী
পু
র
হুগলী বাঁকুড়া সীমান্ত
স্কেল: ০ ১ মাইল
জেলা সীমান্ত :
গ্রাম-সীমান্ত :
নদী :
পথ :

খ্রীস্টাব্দে। অগ্নিকোণে মনোরম একটি রাসমঞ্চ। আউলচাঁদের তিরোভাব ঘটেছিল অনন্তচতুর্দশীতে। প্রতিবছর সেদিন থেকে বারো দিন এখানে 'দ্বাদশ উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন কালে উৎসবের একটি আকর্ষণ ছিল প্রসিদ্ধ গোপালের কীর্তন। "দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত নাম সুধামাখা স্বর।/এদেশে বসতি নয় উত্তরেতে ঘর॥" বর্তমানে সংকীর্তন হয় শেষ চারদিন এ-অঞ্চলের জনশ্রুতি, অন্যগ্রামে যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন এবং মন্দিরের চাতালে বসে কথা বলেছিলেন।[২৯] ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে এলে সেখানকার গুরুদাস গোস্বামী তাঁর মারফৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।[৩০] সম্ভবতঃ এ-গ্রামেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

শ্যামবাজারের পূর্বে পাণ্ডুগ্রাম। এখানকার পাথরের তৈরি শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির খুবই সুন্দর। মন্দিরে রাধারানী ও শ্যামসুন্দর নিত্য-পূজিত। আউলচাঁদ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এ-মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীধর জীউর মন্দির। প্রতি বছর অনন্তচতুর্দশী থেকে বারো দিনের উৎসব হয়। শ্যামসুন্দর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দোলবাগানে দোলমঞ্চ। দোলোৎসবে অহোরাত্র কীর্তন প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দিরের কিছুটা দূরে ভগ্নপ্রায় বর্গী-দালানে বর্গীহাঙ্গামার সময় আশ্রয় নিত গ্রামের শিশু, নারী ও বৃদ্ধগণ। এ-গ্রামের সম্পন্ন গোস্বামিগণ এই দালান তৈরি করেছিলেন। এ-গ্রামও শ্রীরামকৃষ্ণের চরণচিহ্নের স্মৃতি বহন করছে।[৩১]

শিহড় গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ এসকল গ্রামে লীলাবিলাস করেছিলেন। আনন্দ ভুড়ভুড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ ঘটেছিল ফুলুই-শ্যামবাজারে। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে এই ঘটনার কাল কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে। অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের পর কোন এক সময়ে ঘটেছিল। শশিভূষণ ঘোষের মতে ১২৮৬ সালে অর্থাৎ ১৮৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে এ-ঘটনা ঘটেছিল। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বলেন এই ঘটনার কাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়। অপরপক্ষে কথামৃতকার দুটি স্থানে (পৃঃ ৪৪ ও পৃঃ ৫৯২) বলেছেন যে, ঠাকুর শেষবারের মতো কামারপুকুরে এসেছিলেন ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং ৩ মার্চ ১৮৮০ থেকে ১০ অক্টোবর ১৮৮০ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। আলোচ্য ঘটনা এই আটমাসের শেষের দিককার। কাল নিরূপণের একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, অনন্তচতুর্দশী তিথি পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ (৪ ভাদ্র ১২৮৭)। তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে, অনুমান করা যায় ঠাকুর ১৯ আগস্টের কিছু পূর্বে শিহড়ে এসেছিলেন এবং সেখান থেকে কামারপুকুরে ফিরেছিলেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠাকুর সে-বছর শিহড় অঞ্চলে প্রায় দেড় মাস বসবাস করেছিলেন। পুঁথিকারের দাবি শ্রীরামকৃষ্ণ বালি-দেওয়ানগঞ্জ থেকে সিধাপথে শিহড় গিয়েছিলেন। কিন্তু কথামৃতকার ও লীলাপ্রসঙ্গকারের ইঙ্গিত—তিনি শিহড়ে গিয়েছিলেন কামারপুকুর থেকেই। আমরা শেষোক্ত অভিমত গ্রহণ করেছি।

এবার শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন শেষবারের মতো। গ্রামে ঢুকবার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখতে পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে। তাঁর নবনটবরবেশ, পরিধানে কালপেড়ে ধুতি। এ-যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড় অঞ্চলে বিশুদ্ধ গৌরাঙ্গভাব প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। এখনো শিহড় গ্রামের লোকসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ব্রাহ্মণ ও সদ-গোপের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত। অবশিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দু। গ্রামে অনেক ঘর গোঁড়া ব্রাহ্মণের বাস। তাঁদের অধিকাংশই বাসুদেব-বিষ্ণুর উপাসক। এঁরা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ উপাসনা, হরি সংকীর্তনাদি সুনজরে দেখতেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রচার এবং কর্তাভজা বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের নৈতিক মানের অধঃপতন গোঁড়া বৈষ্ণবদের মনোভাব কঠোর করে

২৯ এ-গ্রাম সংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন পঞ্চরত্ন মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও পূজারী সচ্চিদানন্দ গোস্বামী।

৩০ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৯

৩১ এ-গ্রামের তথ্য দিয়েছেন গুরুদাস গোস্বামী। এঁর পিতা হরিহর গোস্বামী (নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কয়েকবার গিয়েছিলেন।

। এর ফলে

দেখিলে চৈতন্যভক্ত উচ্চ উপহাস।
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাঁশ ॥
গোউর নিতাই বলি যেথা সংকীর্তন।
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারেন গোঁড়াদের অধিকাংশই প্রকৃত হরিলীলারস আস্বাদন করেনি। লক্ষ্য করেন, শ্রীচৈতন্যোত্তর বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক ধর্মের আড়ালে অনাচারে ব্যভিচারে লিপ্ত। এসকল সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকটি আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রামের অনুকূল স্থানগুলিতে হরিকীর্তনের আয়োজন করেন। পুঁথিকার লিখেছেন: "সংকীর্তনে সবে মত্ত তবে এইবার।/ মহাভক্ত শ্রীনফর দলের সর্দার ॥" মাঝে মাঝে পথ-সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে যোগ দেন। ক্রমে ক্রমে শিহড়বাসিগণের শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আগ্রহ উদ্রিক্ত হয়, বিরোধী আবহাওয়া পালটিয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শান্তিনাথের মন্দির। পূর্বমুখী শিখর দেউলটি প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১১ ফুট ৮ ইঞ্চি। নিত্যপূজিত দেবতা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব। নাম শান্তিনাথ। শিহড়ের তদানীন্তন জমিদার বর্ধমানের মহারাজ এবং মন্দিরের সেবাইত চক্রবর্তীদের পূর্বপুরুষ একই সময়ে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন মন্দির নির্মাণের জন্য। নিকটবর্তী জঙ্গলে এক সাধু সাধনভজন করতেন। তিনি মারা যান। স্বপ্ননির্দেশে তাঁর ঝুলিতে পাওয়া যায় তিনটি সোনার ইট। তা দিয়ে মন্দির তৈরি হয়। বর্ধমানের মহারাজ সেবাপূজার জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের (শাণ্ডিল্য গোত্র) পরিবারের ওপর সেবা-পূজার ভার এবং তাদের চক্রবর্তী উপাধি দেওয়া হয়।[৩২]

মন্দিরের জগমোহনের উচ্চতা ১৫ ফুট ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। দেউলটি ও জগমোহন— উভয়েরই ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। স্থাপত্যশৈলীর বিচারে দেবালয়টি খ্রীস্টীয় সতের শতকে নির্মিত।[৩৩] জগমোহনের সম্মুখে নাটমন্দির। ইটের তৈরি থামের ওপর টালির ছাদ ছিল। ১৩৪৯ সালের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে সমান মাপের বর্তমান নাটমন্দিরটি তৈরি করা হয়। সিমেন্ট-লোহার তৈরি থামের ওপর টিনের চারচালার নাটমন্দির। চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজনের মেলা বসে ২২ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ পর্যন্ত। এখানকার 'মনুই' ভোগ প্রসিদ্ধ।

একদিন শান্তিনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের আসর জমিয়ে তোলেন। পুঁথিকারের বর্ণনা:

একদিন ভক্তগণ হয়ে মত্তচিত।
সংকীর্তনে ধরে নিম্নলিখিত সঙ্গীত ॥
"সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে।
দেখরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে;
সোনার বরণ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে ॥"
শুনিয়া শ্রীপ্রভু এই সংকীর্তন গান।
মহাভাবে হৈলা মহাবলের আধান ॥
সুবর্ণ বরণ কান্তি অঙ্গ ফেটে পড়ে।
মহালম্ফে সংকীর্তন প্রাঙ্গণ-উপরে ॥
বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইলা প্রভু উম্মত্তের প্রায় ॥
নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে।
লুটোপুটি যান গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে ॥
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়।
সুকোমল অঙ্গ প্রভু কত ছোড়ে যায় ॥

ঠাকুরের ভাবোম্মত্ততা কিছুতেই ভাঙে না। হৃদয় বারংবার ঠাকুরের কানে একটি বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর বাহ্যজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়। "স্বদেশের লোক দেখে অদ্ভুত ব্যাপার।/ সে হতে সেখানে নহে সংকীর্তন আর ॥" ঠাকুরের শরীরের অবস্থা বিবেচনা করেই হৃদয় ঐস্থানে ঠাকুরের সংকীর্তন বন্ধ করেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গভাব-সংবাহক শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আরও এক ধাপ অগ্রসর হন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয়গণের "অদ্যাপিও তুলসী কেহ না পরে গলায়।" হৃদয়ের সাহায্যে তিনি কুড়িটি তুলসীর মালা সংগ্রহ করেন। একদিন তিনি সমবেত ভক্তগণকে 'বিস্তর বিস্তর' তুলসীর মহিমা বলেন।

৩২ সংবাদদাতা বর্তমান সেবাইত ও জয়রামবাটী মিশন স্কুলের প্রধানশিক্ষক সাতুগোপাল চক্রবর্তী।
৩৩ বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১, পৃঃ ১২২-১২৩

শ্রোতাগণ তুলসীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানান। যাদের বাড়িতে নারায়ণ-শিলার পূজা ছিল ঠাকুর তাদের প্রত্যেককে একটি করে মালা দেন এবং বলেনঃ "পরশি তুলসীমালা শিলার চরণে। / উচ্চারিয়া মহামন্ত্র গুরুদত্ত ধন। / পশ্চাতে করিবে সবে গলায় ধারণ॥" মালা নিয়ে একে একে সকলে বাড়ি ফিরে যান, বসে থাকেন শুধু নফর বাড়ুজ্জে। ঠাকুরের শ্রীপদে তাঁর অচলা ভক্তি। ঠাকুরের অঙ্গে দেখতে তিনি পান শ্রীধরের প্রতিমূর্তি। তিনি "প্রভুর চরণে মালা দিল জড়াইয়া।" ঠাকুর গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। আনন্দিত নফর গলায় ধারণ করেন সেই তুলসী মালা।

শিহড়ের অনেকেই এভাবে হরিসুধা আস্বাদন করে অধিকতর আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এদিকে মেমানপুরে পাণ্ডুগ্রামে অনন্ত-চতুর্দশী থেকে শুরু হয়েছিল দ্বাদশ উৎসব। অনন্তচতুর্দশী পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০। মেমানপুরের আকর্ষণ প্রসিদ্ধ গোপালের সঙ্কীর্তন। তাঁর সুধামাখা স্বর, আর দেশজুড়ে নাম। শিহড়ের ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা তারা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গোপালের কীর্তনানন্দ উপভোগ করবে। তিনি যেতে অসম্মত হন। হৃদয়কে পাঠান মেমানপুরে। সন্ধ্যা সমাগত। গোপাল সেদিনকার মতো কীর্তন মাত্র সমাপ্ত করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথা শুনে গোপাল সদলবলে শিহড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আধক্রোশ দূর থেকে কীর্তনীয়াগণ খোল ও রণশিঙ্গা বাজান। ঠাকুর শুনতে পান, অপরে পায় না। কিছু সময়ের মধ্যে গোপাল হৃদয়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। দেখেন ঠাকুর গভীর ভাবস্থ। তাঁর শ্রীপদে গোপাল প্রণাম করেন। গোপালের আগমন জানতে পেরে গ্রামবাসিগণ ছুটে আসে। ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্তি হলে গোপাল কীর্তন আরম্ভ করেনঃ "ভুবনসুন্দর গোউর নদে কে আনিল রে।" ইতোমধ্যে গ্রামবাসিগণ ছুটে এসেছে। কীর্তন কিছুটা এগুতেই সমঝদার ঠাকুর আখর দেনঃ "গোপাল রে, তুই কি বলালি রে। গোরারূপ বিধির গড়া নয়। / স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ বিধির গড়া নয়।" ইত্যাদি। ঠাকুরের উপস্থাপিত গোরা রায়ের ভাবমূর্তিখানি কীর্তনীয়াদের হৃদয়ে ঝলমল করে ওঠে। কীর্তনীয়া গোপাল ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। হৃদয় আয়োজিত ভোজন সমাপ্ত হলে আনন্দোৎসব সেদিনকার মতো শেষ হয়। তখন অনেক রাত।

শ্যামবাজার ও বেলডিহা (বেলটে) পাশাপাশি গ্রাম। বেলটের পশ্চিমে শ্যামবাজার। গোঘাট থানার অন্তর্গত। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজারে পরীক্ষা-মূলক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটি ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কাজ সুবিধামতো না হওয়াতে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তা উঠে যায়। এখানকার তসর ও তাঁতের কাপড় এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রামে গঙ্গাধর জীউ নামক শিবের মন্দির প্রাচীন। দাসপাড়াতে নয়টি কুঞ্জ সাজিয়ে বিভিন্ন দলের সংকীর্তন এবং তিনদিন ব্যাপী মহোৎসবটি জনপ্রিয়। গ্রামের মধ্যভাগে সদর রাস্তার উত্তরপাশে দেখা যায় দুটি ভগ্নপ্রায় মন্দির। একটি রঘুবীরের মন্দির, অপরটি শিবের। পশ্চিমের মন্দিরটি ১৭৪৪ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত, তার পাশেই রয়েছে রামেশ্বর মন্দির। রাস্তার দক্ষিণে দেখা যায় দুর্গামণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ। এখানে শিবদুর্গা-মূর্তির পূজা হতো। সামনের মাঠে ছিল মল্লিকদের পাঠশালা। উপরোক্ত মন্দির দুটির মধ্য দিয়ে দেখা যেত জমিদার মল্লিকদের দক্ষিণমুখী দোতলা কোঠা-বাড়ি। জমিদার ঈশান মল্লিক ও শ্রীনাথ মল্লিকের বাড়ির মাঝে ছিল একটি গলি।[৩৪] শ্রীনাথ সম্ভবতঃ ঈশানের ছোট ভাই।

ঈশান মল্লিকের বাড়ির দক্ষিণে ঈশান চৌধুরীর বাড়ি ছিল দু-মিনিটের পথ। ঈশান ছিলেন ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। তাছাড়াও একটি গুঁই পরিবার[৩৫] ছিল শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর বেলটে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা মানিক গাঙ্গুলি। তিনি বেলটের বাঁকুড়া রায় ও শ্যামবাজারের দলু রায় প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার বন্দনা করেছেন।

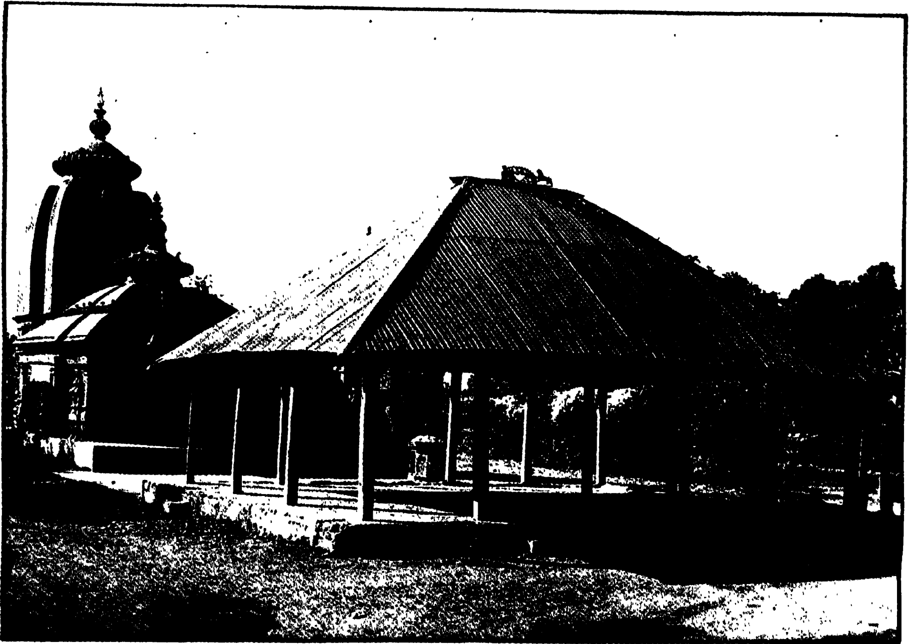
শ্রীরামকৃষ্ণ বেলটের নটবর গোস্বামীর বাড়িতে সাতদিন বাস করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ বাড়িতে "সাতদিন অবস্থানপূর্বক

৩৪ তথ্যাদি মুখ্যতঃ প্রাক্তন শ্যামবাজার-নিবাসী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে সংগৃহীত। কিছু তথ্য দিয়েছেন স্থানীয় লোক।

৩৫ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে গুঁই-পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

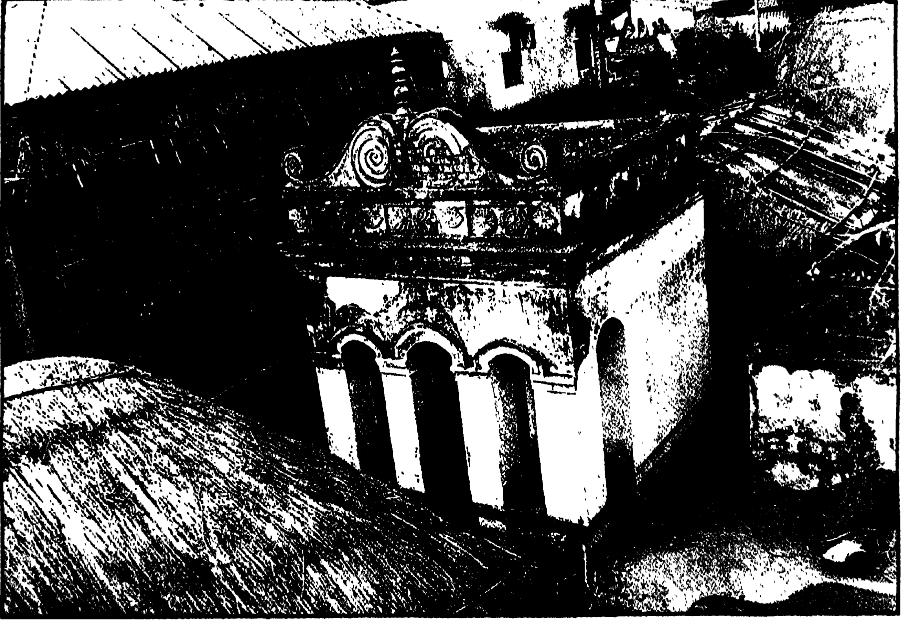


হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপ, শিহড়

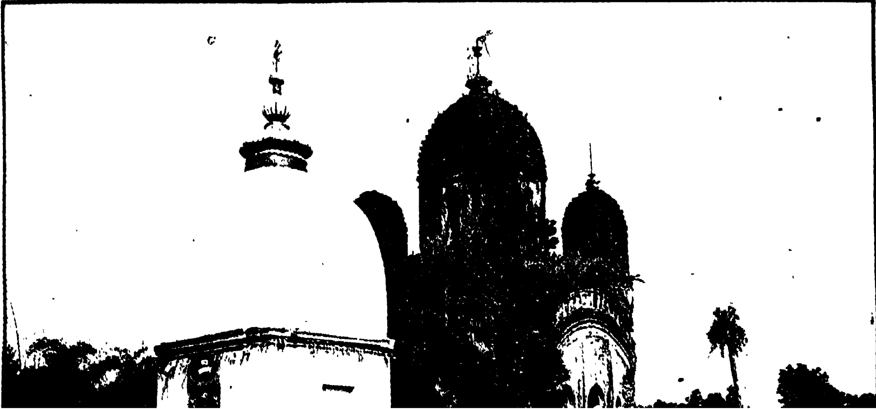


শান্তিনাথ শিবমন্দির, শিহড়

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী



নফর বাঁড়ুজ্জেদের শ্রীধর মন্দির, শিহড়





রামেশ্বর ও রঘুবীরের মন্দির, শ্যামবাজার

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী

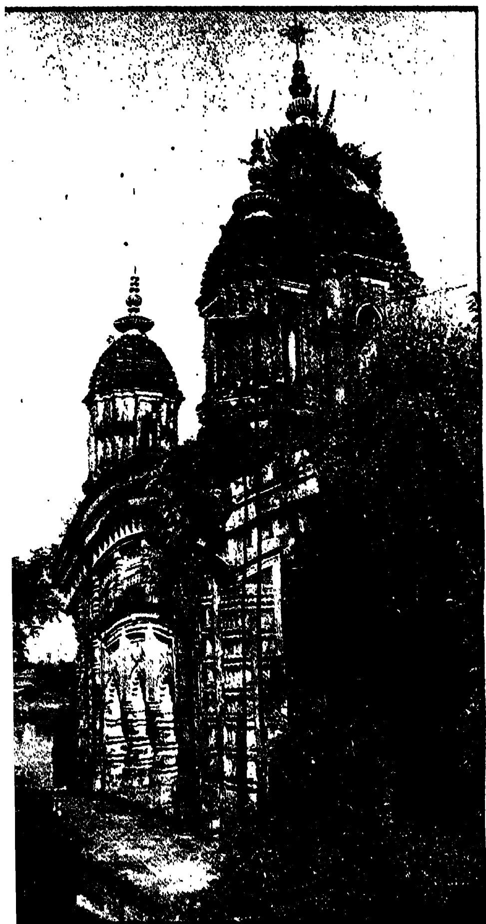


মল্লিকদের দুর্গামণ্ডপের
ধ্বংসাবশেষ, শ্যামবাজার



যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির, কয়াপাট

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী



শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির, মেহেরবানপুর



শ্রীধর জীউর মন্দির, পাণ্ডুগ্রাম

[আ]লোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী

শ্যামবাজারের বৈষ্ণবসকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন।" এবং ঈশানচন্দ্র মল্লিক "তাঁহাকে নিজ বাটিতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।" গুরুদাস বর্মনের মতানুসারে শ্যামবাজারে চব্বিশ প্রহরী হরিসংকীর্তন দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিকে পুঁথিকারের মতে নটবর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাল কীর্তন শোনাবার জন্য রামজীবনপুরের কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের খোলবাদক রাইচরণ দাসকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। এসকল তথ্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। নটবরের বাড়িতেই কীর্তনের আসর বসেছিল। ধনঞ্জয়ের মিষ্ট কণ্ঠ ও রাইচরণের সুনিপুণ হাত সংকীর্তনের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। ঠাকুর ভাবসায়রে ভাসেন ডোবেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। অনুমান, এইদিনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেই ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছিলেনঃ "ওদেশে নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম। বোধ হলো আমার লিঙ্গ শরীর শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে।"[৩৬]

কীর্তনের আসর জমজমাট, সেসময়ে গৃহকর্তা নটবর এক অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হলেন। আসরে ঠাকুরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল 'স্বতন্ত্র সর্বোচ্চ' আসন। অপর সকলের জন্য নিচের আসন। আমন্ত্রিত পাণ্ডুগ্রামের গোস্বামিগণ এই বৈষম্য দেখে ক্ষেপে ওঠেন, প্রতিবাদ করে নিজ গ্রামে ফিরে যান। গৃহস্বামীর অনুরোধ ক্ষমাপ্রার্থনাদি তাদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। নটবর অসহায় বোধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পেরে নটবরকে নির্দেশ দেন; "কীর্তন করিয়া বন্ধ যাও শীঘ্রগতি।/ডাকিয়া আনহ যেবা দল অধিপতি॥" নটবর আজ্ঞা পালন করেন। দলপতি উপস্থিত হতেই ঠাকুর আসন থেকে নেমে এসে দলপতিকে নমস্কার করেন। দলপতির মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে যায়। মনে হয় সেসময়ে ঠাকুরের নির্দেশে কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছিল। দলপতির লজ্জা ভাঙবার জন্য ঠাকুর তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে থাকেন। পুঁথিকার মন্তব্য করেছেনঃ "একমনে গোসাই ব্রাহ্মণ কথা শুনে।/বুঝে কিবা ভাবে এবে ঝুরে দুনয়নে॥" দলপতিসহ গোস্বামিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের পদাবনত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই পটভূমিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। স্থান—শ্যামবাজারে মল্লিকদের মন্দির প্রাঙ্গণ। পরদিন থেকে তিনি এক মহা-সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। "যতেক ব্রাহ্মণে প্রভু লয়ে পরদিনে।/তুলিলা অতুলানন্দ হরি-সংকীর্তনে॥" অতুলানন্দের সাথে ভাবভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাস সকলকে মাতিয়ে তুলল। শ্রীচৈতন্য বলেছিলেনঃ "এক কৃষ্ণনামে করে সব পাপক্ষয়।/ নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়॥"[৩৭] হরিনামের আকর্ষণ, কৃষ্ণপ্রেম-সঞ্চারণ, নববিধ ভক্তির পরিপূর্ণ বিস্ফুরণ ইত্যাদি জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তুতি। যোগমায়ার সাহায্যে হরিলীলা। সেকারণে যেন ভেলকি লেগে গিয়েছিল। বাজিকরের ক্ষমতা দেখে সকলে মোহিত হয়ে পড়েছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার বর্ণনা করেছেনঃ

> সাতদিন সাতরাত্রি হয় সংকীর্তন।
> অবিরাম হরিনাম বিভেদি গগন॥…
> প্রভুর মোহন নৃত্য হয়ে মাতোয়ারা।
> কভু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কভু বাক্যহারা॥
> অযুত উন্মত্ত করীসম গায় বল।
> শ্রীচরণ চাপে ধরা করে টলমল॥
> বাহ্যহারা যবে অঙ্গ জড়ের সমান।
> লোকে দেখে বুঝে যেন নাহি তার প্রাণ॥
> তখনি কিঞ্চিৎ পরে করে দরশন।
> বিকশিত মুখপদ্মে চাঁদের কিরণ॥
> মোহন নৃত্যন পুনঃ শতগুণে জোর।
> হুঙ্কারিয়া হরিনাম আনন্দে বিভোর॥…
> কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে।
> এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে॥

গুরুদাস বর্মনের বর্ণনার একটি অংশঃ "কীর্তনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থির-নেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে।

৩৬ কথামৃত, পৃঃ ৩৯৮ ৩৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়

অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের ইতরলোক বলিতে লাগিল 'শ্যামবাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্তন করতে করতে দিনে সাতবার মরে যাচ্ছে আবার বেঁচে উঠছে।' ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ দিগ্‌দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক[৩৮] মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে।"[৩৯]

মানুষ কাতারে কাতারে জমায়েত হয়েছিল। গৃহ-স্থালির কাজ ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মানুষ সমবেত হয়েছিল। লজ্জা ভয় ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছিল গৃহললনাগণও। লীলাকর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য লোক পাগল হয়ে উঠেছিল। পুঁথিকার লিখেছেনঃ "দরশনে লুব্ধ মন আসিয়াছে ছুটে।/ উপায়স্বরূপে লোকে চালে গাছে উঠে॥/ গাছে উঠে এত লোক দেখিবারে নাচ।/ গাছ গোটা বোধ হয় যেন মানুষের গাছ॥" এই আনন্দের আবহে দেখা গেল জন্মমূক হরিনাম করছে। এক-পায়ের খোঁড়া মানুষ প্রহর প্রহর নাচছে। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে "মূর্তিমান নাম।"[৪০] অদ্ভুত ব্যাপারসকল ঘটতে থাকে। সাধক পণ্ডিত গোস্বামীদের কেউ কেউ অনুভব করেন করুণাময় ঈশ্বরের করুণার বিগ্রহ অযাচিতভাবে প্রেম করুণা বিতরণ করছেন। তাদের মনে হয়ঃ

আনন্দঃ কিমু মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান্।
শ্রদ্ধা মূর্তিমতী দয়ৈব কিমু বা ভূমৌ স্বরূপিণ্যসৌ॥
মাধুর্যং নু শরীরি কিং নববিধা ভক্তিগতেকাং
তনুঃ।[৪১]

—আহা ইনিই কি আনন্দের প্রত্যক্ষ মূর্তি, ইনিই কি পরম প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, ইনিই কি মূর্তিমতী শ্রদ্ধা, অথবা ইনিই ধরাধামে উপস্থিত স্বরূপিণী দয়া, ইনিই কি মাধুর্যের প্রত্যক্ষ রূপ, নববিধা ভক্তি কি এরই তনুখানি আশ্রয় করে প্রত্যক্ষ হচ্ছে? লীলাকরের রূপের ঝলক, সঙ্গীতের গমক, ভাবের দমক উপস্থিত সকলকে সম্মোহিত করে রাখে। এর মধ্যে দুচারজনই চর্মদৃষ্টি ত্যাগ করে মর্মদৃষ্টি দিয়ে প্রকৃত লীলারস আস্বাদন করেন। চরিতামৃতকার যথার্থই লিখেছেন, "চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।/ প্রেমনেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ॥"[৪২]

অবতার-পুরুষ যোগমায়া আশ্রয় করে অপরকে আনন্দ আস্বাদন করান, তেমনি সেই মায়াতে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজেও রসামৃত আস্বাদন করেন। স্মৃতির কুঠুরিতে তা সঞ্চিত হয়ে থাকে। সে-কুঠুরীর দ্বার উন্মোচিত করে লীলাকর পরবর্তী কালে বলেছিলেনঃ "ওদেশে যখন হৃদয়ের বাড়িতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাত রাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক!

"নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে[৪৩] গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে।—আবার 'তাকুটি! তাকুটি' করছে। খাওয়া-দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো। রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল।—তাকুটি! তাকুটি! হৃদয় বকলে, আর বললে, আমরা কি কখনো কীর্তন শুনি নাই।

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা

৩৮ ১৮৮১ খৃস্টাব্দে শ্যামবাজার মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ছিল ১১,৬৩৫ জন। সুতরাং ১৮৮০ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হরিলীলায় 'সহস্র সহস্র' লোক হওয়া আক্ষরিকভাবেই সম্ভব ছিল।

৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মন, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫

৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ঐ, পৃঃ ২২৩

৪১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, কবিকর্ণপুর, ৪র্থ অঙ্ক, ৭ম শ্লোক।

৪২ চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম অধ্যায়

৪৩ গ্রামের শেষ প্রান্তে পূর্ব দিকে ছিল এ-বাড়ি। 'বায়েনদের বাড়ি' নামে পরিচিত। বায়েন শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষ বাদক। নাম ছিল রামময় বায়েন। ছেলে সুধীর। রামময় ভাল খোল বাজাতেন। মূল উপাধি ছিল দাস। পূর্ব ও পশ্চিম দুয়ারী দুটো কোঠাবাড়ি ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই। পিছনের ডোবাটি এখনও বর্তমান। নটবর গোস্বামীর বাড়ি এখান থেকে সামান্য পথ। প্রবল জনস্রোত এবাড়িতে এসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় বা একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মালা তিলক নাই কেন?' তারাই একজন বললে, 'নারকোলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে।' নারকোলের বেল্লো ও-কথাটি ঐখানেই শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

"দূরে গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাকত। যে-বাড়িতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদয় প্রস্রাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে 'এইখানেই (উঠানে) কর।'

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কি লেগে যায়।"

অপর একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এঘটনা-সম্পর্কে বলেছিলেন: "গৌরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম। ওদেশে শ্যামবাজারে—দেখালে। গাছে পাঁচিলে লোক—রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাতদিন হাগবার জো ছিল না। তখন বললাম, মা, আর কাজ নেই। তাই তখন শান্ত।"

এই মাধুর্যময় ঘটনার কিছু বাড়তি তথ্য দিয়েছেন কথামৃতকার। তিনি লিখেছেন যে, ঠাকুর নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী[৪৪] প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সংকীর্তন করেছিলেন।

এই তল্লাটে একটি জনপ্রবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। জনপ্রবাদটি হলো, "ক্ষ্যাপা এসেছে।" 'ক্ষ্যাপা'[৪৫] অর্থে বাউল। গ্রামের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে করেছিল একজন খাঁটি বাউল।

আরও একটি তথ্য জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-তথ্যানুসন্ধানী প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় সূত্রে। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, হৃদয়রাম ক্লান্ত-শ্রান্ত ঠাকুরকে বাইরে একটু ঘুরিয়ে আনবেন বলে তাঁকে বহুলোকের মেলা থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশান মল্লিক ও শ্রীনাথ মল্লিকের বাড়ির মধ্যকার পথটি দিয়ে। উত্তরদিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তাঁরা শ্যামবাজার থেকে কামারপুকুর যাবার রাস্তায় উঠেছিলেন। অতঃপর উত্তরমুখো আরও কিছুটা হেঁটে মাঝিপাড়ার (শ্যামবাজারের) মধ্য দিয়ে শিহড়ে পৌঁছেছিলেন।

১৩০৩ সনের ২৩ বৈশাখ আলমবাজার মঠে প্রাপ্ত হৃদয়রামের একটি দীর্ঘ পত্র থেকে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্থানীয় মানুষদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে ঈর্ষান্বিত গোস্বামিগণ তাঁকে হত্যা করতে পর্যন্ত চেয়েছিল। পরে গোস্বামিগণ ঠাকুরকে বিচারে পরাস্ত করতে চেষ্টা করে। বিচার্য বিষয় ছিল বৈষ্ণবমত না শাক্তমত সত্য। অনেক বিচারের পর সকলেই ঠাকুরের মত মেনে নেয় যে, দুটি মতই সত্য।

একশ দশ বছর পূর্বেকার ঘটনা। সচ্চিদানন্দ ভগবান নিত্যলীলাময়, কিন্তু তাঁর প্রকটলীলা ভক্তগণের চির-আকাঙ্ক্ষিত। প্রকটলীলার প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে তিনি যখন হরিলীলার গাঢ় মাধুর্যরস নিজে আস্বাদন এবং অপরকে আস্বাদন করাবার জন্য আয়োজন করেন, সেসময়ে লীলাবিলাস হয় পরম মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণ হয়ে ওঠে উন্মত্তকারী। তাঁর এই আয়োজন যোগমায়া আশ্রয় করে। যোগমায়াশক্তির প্রভাবে তিনি নিজে আত্মহারা হন, অপর সকলকে সম্মোহিত করেন। ফুলুই-শ্যামবাজারে এরূপ একটি পরিমণ্ডল রচনা করে অনন্তমাধুর্যময় শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমের বৈভব প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁকেও দেখে মনে হচ্ছিল "সংকীর্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার।"[৪৬] তাঁর হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ ঈশপ্রেম উপচে পড়ে সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রসাস্বাদন করেছিল, বিমুগ্ধ-চিত্তে দেখেছিল বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। অরূপরতন বাজিকর যেন বলেছিলেন "লাগ, ভেলকি লাগ", আর হরিলীলায় ভেলকি লেগে গেছিল। সে-লীলানাটকের স্মৃতি চিরপ্রেরণাপ্রদ।

৪৪ সদয় বাবাজীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি। অনুমান, তিনি ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। তদানীন্তন কালে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামবাজার-নিবাসী বন্ধু প্রবোধকুমার চ্যাটার্জির নিকট আসতেন এক বুড়ি। মোটা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ছাটা চুল। পরনে খাটো থান, গলায় মালা, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। শিবপ্রসাদবাবু (প্রবোধবাবুর ছেলে) মহিলাকে কয়েকবার সশ্রদ্ধভাবে বলতে শুনেছেন সদয় বাবাজীর কথা। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন সদয় বাবাজীর শিষ্যা। মহিলা বাস করতেন পাণ্ডুগ্রামে।

৪৫ 'ইহাদের (বাউলদের) মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়েই একার্থক শব্দ। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয়।' (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পৃঃ ১১৩)

৪৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।৩।৪২৬

নিবন্ধ

বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

এই বঙ্গের কোথায় কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-ধূলি পড়েছে, তার সঠিক বিবরণ আজও অজানা রয়ে গেছে। সেদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার আমডাঙ্গায় করুণাময়ী মন্দিরে গিয়ে শুনলাম: এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। একি শুধুই শোনা কথা, অথবা ঘটনা? ভবিষ্যতে জানার ইচ্ছা রইল। কিন্তু বর্ধমান শহরের ঈশানেশ্বর মন্দিরে তিনি যে এসেছিলেন, সেটাতো ইতিহাস।

শ্যামসায়রের ধারে ঈশানেশ্বর মন্দিরে শিবরাত্রির দিন বিরাট মেলা বসে। কত মানুষের ভিড়, কত মানুষের মিলন-মেলা! শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করেই সেই মিলনের আয়োজন। প্রাচীন শহরের এ এক প্রাচীন ঐতিহ্য।

বর্ধমানের তিনটি সায়র। শৈশবে বাবার হাত ধরে কতবার ঐ তিনটি সায়র পরিক্রমা করেছি, তার হিসাব নেই। রানীসায়র এবং কৃষ্ণসায়রের কথা এখন মুলতুবি থাক, ফিরে যাই শ্যাম সায়রের তীরে। 'সায়র' মানে বড় জলাশয়।

এই শ্যামসায়রের ঈশান কোণেই দিব্য আসন পেতে আসীন আছেন স্বয়ং ঈশানেশ্বর। এ হলো শিবঠাকুরের পীঠ। ঐ মন্দিরের দিকে দেখিয়ে আমার বাবা বলতেন: 'জানিস, ঐ মন্দিরে ঠাকুর এসেছিলেন।'

'—ঠাকুর? শিবঠাকুর নিজেই তো এক ঠাকুর, সেখানে আবার অন্য ঠাকুর এলেন কোথা থেকে? আর কেই বা সেই ঠাকুর?' শৈশবের প্রদোষে আমার প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে উঠেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তিনিও ঠাকুর, মানুষ ঠাকুর। কোন কোন মানুষ নিজের মহিমায় ঠাকুর হয়ে যান। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন।'

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঙ্গন। তারই মধ্যে এক-রত্ন শৈলীর এই মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরের লাল রঙ করা চূড়াটি দেখে মনে হয় যেন টালির ওপর টালি সাজিয়ে মন্দিরের শীর্ষদেশ তৈরি করা হয়েছে। উচ্চতা কত হবে? ২০ ফুটের কম নয়। সামান্য কিছু বেশি হলেও হতে পারে। এই মন্দিরটির এমনই একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৌন্দর্য আছে—যা সহজেই নজর কাড়ে, মনকে টানে, আমাকেও টেনেছে বারবার। যেমন শৈশবে তেমনি আজও।

বিশেষ করে যখনই জেনেছি, এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, দেবাদিদেব ঈশানেশ্বরের পূজা করেছিলেন, তখন থেকেই এই মন্দিরটি আমার কাছে এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত। জেনেছিলাম, অবতারবরিষ্ঠের এটিও এক লীলাক্ষেত্র।

মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ পাওয়ার ঘটনাটিও চিত্তাকর্ষক। সেটি পরে বলছি। তার আগে বলি, বর্ধমানের কীর্তিমান রাজাদের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপরূপ পূজার কাহিনীটি।

তখন বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেন চলতে শুরু করেছে। হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তার কিছুকাল পরেই হাওড়ার সঙ্গে বর্ধমানের রেলপথে সংযোগ সাধিত হয়েছিল। সেসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যেতেন বর্ধমান হয়ে। কামারপুকুর থেকে উচালন, একলক্ষী হয়ে একটা পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্ত। ঐ পথে পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে আসতেন, বা বর্ধমান থেকে কামারপুকুরে যেতেন।

সেবার তিনি দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাগ্নে হৃদয়। 'পুঁথি'র বর্ণনা পড়ে মনে হয় তাঁরা পথে বর্ধমানে এসে থেমেছেন। কিন্তু বিশ্রাম করবেন কোথায়? তিনি হৃদয়কে নিয়ে সোজা এসে উঠলেন এক পান্থশালায়। আমাদের মনে হয়

এই পান্থশালা হলো ঈশানেশ্বর মন্দির-সন্নিহিত অতিথিশালা। এই অতিথিশালা থেকে বর্ধমান স্টেশনও খুব দূরে নয়—এক মাইলের মতো রাস্তা। তাই এখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাওয়া ছিল সুবিধাজনক।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী অন্ততঃ দুবার দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গরুর গাড়িতে চড়ে কামারপুকুরে যাচ্ছেন। কিন্তু সেবার বর্ধমানে এসেছিলেন কিভাবে? সম্ভবতঃ সেবারও তিনি গরুর গাড়িতেই বর্ধমানে এসেছিলেন এবং ভাতছালার বাঁকা নদীর সেতু পেরিয়ে শহরে গিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেন রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির (পৃঃ ১৪০-১৪১) বর্ণনা থেকে জানতে পারি, ঈশানেশ্বর মন্দির-সন্নিহিত মাঠের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঁটাবন দেখে খুব উল্লসিত হন। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেনঃ

"কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি।
পূজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি॥

*

তাঁহার করম কার্য বুঝা মহাদায়।
কণ্টক লইয়া মত্ত হইলা পূজায়॥
আবেশে মহেশ পদে কণ্টক প্রদান।
দেখিয়া হৃদুর হয় আকুল পরাণ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে স্পষ্টভাবে বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করা না হলেও এটা যে এই মন্দিরেরই ঘটনা, তা ধরে নিতে পারি। প্রথমতঃ পুঁথিতে কাছাকাছি যে বড় স্টেশনের কথা বলা হয়েছে যেখান থেকে হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরেছিলেন তা নিশ্চয়ই বর্ধমান। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশানেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন তা বর্ধমানের বৃদ্ধদের কাছ থেকে জানা যায়। শোনা যায় মন্দিরে শিবপূজা করতে করতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বর্ধমানের প্রাচীন মানুষদের সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশানেশ্বর শিবপূজা আরও একটি কারণে স্মরণীয়। ব্যাপারটি পুঁথির বর্ণনাতেও সমর্থিত। শিবপূজা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এতই তন্ময় হয়ে যান যে, হৃদয় বহু ডাকাডাকি করেও তাঁর সেই তন্ময়তা ভাঙাতে সমর্থ হন না। এদিকে কলকাতার ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। পুঁথির বর্ণনাঃ

পূজার মরম-কথা হৃদু নাহি জানে।
কত ডাকে মত্ত প্রভু কেবা ডাক শুনে॥

*

ইতিমধ্যে সেদিনের নিরূপিত গাড়ি।
চলে গেল যায় যেন ইস্টেশান ছাড়ি॥
যতক্ষণ পূজা সাঙ্গ না হইল তাঁর
উঠাতে না পারে হৃদু বড়ই বেজার॥
কতক্ষণ পরে প্রভু আইলা আপনি।
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যামিনী॥
গাড়ি চলে গেল আজ হইবে থাকিতে।
কেবা হেথা আত্মজন কোথা রবে রেতে॥
আপনে আছেন প্রভু না দেন উত্তর।
হৃদয় আসিল ইস্টেশানের ভিতর॥
কর্মচারী জনৈকে জিজ্ঞাসে ব্যস্ত চিতে।
আজ কি পাইব গাড়ি কলিকাতা যেতে॥
প্রভুর আশ্চর্য খেলা কহিতে না পারি।
নাহি অন্য গাড়ি আজ কহে কর্মচারী॥
তবে এক আলাহিদা গাড়ি স্বতন্তর।
কাশী থেকে ছাড়িয়াছে তারের খবর॥

এই বিশেষ 'সেলুন'টিতে রেলের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাশী থেকে কলকাতা আসছিলেন। তাতে অন্য কোন যাত্রীর যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্ধমান স্টেশনের সেই সহৃদয় রেলকর্মচারীটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়কে তাতে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শিবচতুর্দশীর দিন এই মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন 'শিবের চরণে সেবা' লাগাতে। আগের মতো বড় মেলা এখন আর হয় না। কিন্তু আজও এখানকার মেলার ঐতিহ্য সুবিদিত।

এবার আমরা ঈশানেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তটি স্মরণ করতে পারি।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে ঈশানেশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। আগেই বলেছি সেসময় ছিল বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের আমল। মহারাজ তেজচাঁদ তাঁর মা বিষণকুমারী দেবীর নামেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। বিষণকুমারী ছিলেন মহারাজ তিলকচাঁদের পত্নী। জনশ্রুতি, শ্যামসায়র যখন কাটা হয় সেসময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শ্যামসায়রের ঈশান কোণে এই পাথরের স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা বর্ধমান শহরে সাড়া পড়ে যায়। লোকমুখে সেখবর একসময় রাজবাড়িতে চলে যায় এবং মহারাজা তেজচাঁদের কানেও পৌঁছায়। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। খবর পাওয়া মাত্র তিনি ঐ শিবলিঙ্গ দর্শন করতে লোকজন নিয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। লিঙ্গটি দেখে মুগ্ধ হন তিনি। কয়েক দিনের ভিতরেই ওখানে 'ঈশানেশ্বর' নামে দেবতার অভিষেক ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। দেবতার সেবার যাবতীয় খরচ তিনি রাজকোষ থেকে বহন করেন। যতদিন বর্ধমানের রাজারা রাজত্ব করেছেন ততদিন বর্ধমানের রাজপরিবারই ঐ মন্দিরের এবং দেবতার সেবা ও পুজার সমস্ত খরচ বহন করে আসতেন।

এখানে একটু শ্যামসায়রের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনেই শ্যামসায়র অবস্থিত। পূর্বে এই হাসপাতাল বিজয়চাঁদ মহাতাব হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল। মাত্র কিছুদিন আগেও ঐ বিশাল পুকুরের চারিপাশে উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। তার নিদর্শন অবশ্য এখনও আছে।

মন্দিরসংলগ্ন অতিথিশালাটি নির্মাণ করেন বিজয়চাঁদ মহাতাব। বিজয়চাঁদ মহাতাব তাঁর মা প্রণয়দেবীর নামে অতিথিশালাটি নির্মাণ করে দেন। প্রণয়দেবী ছিলেন রাজাবাহাদুর বনবিহারী কর্পুরের স্ত্রী।

ঈশানেশ্বর মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দেবদত্ত তেওয়ারী। তাঁর পুত্র রামনাথ তেওয়ারী জানালেন, ঈশানেশ্বর ঠাকুরের অনেক জায়গা এখন অন্যেরা দখল করে নিয়েছেন। ঠাকুরের ফুলবাগিচাও এখন বিক্রি হয়ে গেছে। ঠাকুরমন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরের পুরোহিতদের সমাধিস্থলও এখন অপরের হস্তে চলে গিয়েছে।

ঈশানেশ্বর মন্দিরের সেই সুদিন আর নেই। শ্যামসায়রের সেই নির্জন মাধুর্যও আজ হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এই মন্দিরে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, তেমনি, শোনা যায়, এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীও। এ-ও এক বিস্ময়কর যোগাযোগ।

আগেই বলেছি, ঈশানেশ্বর মন্দিরে আজও শিবচতুর্দশীর ভিড় হয়। কিন্তু সেভাবে সেখানে আর গণপ্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। একসময় বর্ধমানের রাজারা তাঁদের রাজ্যের যত প্রাচীন দেবপীঠ ছিল—সবগুলি সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, ধর্মীয় উৎসবগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু আজ সেসব কে করবে?

একদা পূর্বভারতের প্রাচীনতম সভ্যনগর ছিল এই বর্ধমান। আজ সেই ঐতিহ্যের দীপশিখাটি জ্বলছে অজস্র নিয়ন আলোর রোশনাইকে উপেক্ষা করেও।

সেদিন যখন ঈশানেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম, শ্যামসায়রের জলে তখন পড়ন্ত রোদের শেষ আভা। প্রশান্ত জলের বুকে তখন ক্লান্ত অবসন্নতা। সেদিকে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এই বর্ধমানেই তো ভগবান মহাবীর বর্ধমান এসেছিলেন। কুলীন গ্রাম থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই বর্ধমানেরই কানাই নাটশালে এসেছিলেন। এই তো সেদিন এই শ্যামসায়রের পথ ধরেই ঈশানেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্ধমানের পথে পথে মিশে রয়েছে তাঁদের পায়ের ধুলি। আমরা সেই ধুলির ওপর দিয়ে আজ হাঁটছি। এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। পথ থেকে তুলে নিলাম একমুঠো ধুলি। সেই ধুলিতে পেলাম যেন পবিত্র চন্দনের সৌরভ। চোখ বুজে মাথায় ঠেকালাম।

আমার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়

বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর সদস্যা উজ্জ্বলা মজুমদার (বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর প্রখ্যাত সাংগঠনিক নেতা এবং 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব', 'সবার অলক্ষ্যে' প্রভৃতি বিপ্লব-ইতিহাসগ্রন্থ-প্রণেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়) বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস। বাংলার কুখ্যাত গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন দার্জিলিং-এ গ্রীষ্মযাপন করছেন। তাকে হত্যা করার জন্য বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর দুই সদস্য ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবি ব্যানার্জী দলের নির্দেশে জয়দেবপুর থেকে সোজা দার্জিলিং চলে এসেছেন। তাঁদের সাহায্য করতে আরো যে দুজন সদস্যকে দার্জিলিং-এ দল পাঠিয়েছিল তাঁদের অন্যতমা ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। তিনি ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। উজ্জ্বলা একটি হারমোনিয়ামের মধ্যে এনেছিলেন দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি যথাসময়ে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি ভবানী ও রবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ৮ মে দার্জিলিং লেবং ময়দানে এ্যান্ডারসন ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিচ্ছেন। রবি ও ভবানী সেখানে এ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। বিচারে রবির দ্বীপান্তর ও ভবানীর ফাঁসির আদেশ হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম' সম্পর্কে জীবিত প্রবীণ বিপ্লবীদের বক্তব্য সংগ্রহ করছি বলে উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করি। শুনেছিলাম প্রবীণা এই মুক্তি-সংগ্রামী (জন্ম ১৯১৫) বার্ধক্য এবং অসুস্থতার জন্য শারীরিক দিক থেকে অপটু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারণে আমার অনুরোধে অপটু শরীর নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন এবং তাঁর বক্তব্য একটি প্রবন্ধের আকারে আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ ৩১. ১২. ১৯৮৯। উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ এবং রচনাটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর সদস্য, প্রাক্তন মুক্তি-সংগ্রামী এবং পরবর্তী কালে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা অমলেন্দু ঘোষ আমাকে সাহায্য করেছেন। অমলেন্দু ঘোষ উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের স্বামী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের আপন ভাগ্নে। স্বামী বিবেকানন্দ কি পরিমাণে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কোন্ গভীরে তাঁর জীবন ও বাণীর প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের এই অগ্নিকন্যার রচনায় আমরা তার পরিচয় পাব। —স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বর্তমানে রোগে জরাজীর্ণ ও অচল দেহ আমার। সেই সঙ্গে মনের সক্রিয়তাও স্বভাবতই হারিয়েছি। তাই এই ৭৫ বছর বয়সে ফেলে-আসা অতীতের পুরনো কথা, জানি না কতটা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছি। যাই হোক, 'উদ্বোধন'-এর যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর একান্ত অনুরোধে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব সে-স্মৃতি উদ্ধার করতে। আমি লেখক নই। শুধু 'বেণু'র অনুবর্তী বর্তমানের 'রাখাল বেণু' পত্রিকায় কিছু স্মৃতিচারণ করেছিলাম।

পরাধীনতার গ্লানিতে ভরা আমাদের কৈশোরের দিনগুলি, তবু এর মধ্যে আমাদের চলার পথে একটা আদর্শ ছিল। ছিল দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। আরও ছিল স্বাধীন দেশের রঙিন স্বপ্ন দেখার মানসিকতা। এসবই সম্ভব হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করার প্রেরণামন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের সকলের 'বড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) 'মুক্তিসঙ্ঘ' তথা পরবর্তিকালীন 'বি. ভি.' বা 'বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স' দলের সংস্পর্শে এসে।

তখনকার দিনে মন্ত্রগুপ্তির সাথে সাথে ছিল চরিত্রগঠনের কাজ। ছিল মনকে দৃঢ় করা ও সংকল্পে অটল থাকার সাধনা। কাজেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগ ও সেবার আদর্শ এবং গীতার নিষ্কাম কর্মকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। স্বামীজীর সেই আহ্বান: "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"—মন্ত্রের মতো আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিত। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন উৎসবে তাই যোগদান করা আমরা কর্তব্য বলে ধরে উৎসাহের সঙ্গে যেতাম।

তখনকার দিনে পিতামাতার অগোচরে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে যোগ দেবার যৌক্তিকতার যে মানসিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল তার মূলেও ছিল স্বামীজীর ঐ মন্ত্রশক্তিরই প্রেরণা ঃ আমি অন্যায় করছি না—কাউকে প্রতারণাও করছি না—দেশমাতৃকার পাদমূলে আত্মসমর্পণের এক মহাসুযোগ গ্রহণ করছি মাত্র।

আমার বাবা সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। তাছাড়া বি. ভি. দলের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগও ছিল। নানা দিক থেকে দলের বিশেষ **resourceful** সভ্য ছিলেন তিনি। আমার সুবিধা ছিল সেইখানেই।

তাঁর অজান্তে ধীরে ধীরে আমি 'বি. ভি.' দলে ঢুকে গেলেও একদিক থেকে দেখতে গেলে দলীয় প্রয়োজনে আমার বাবা-ই কিন্তু আমাকে হাতে-কলমে বিপ্লব-কর্মের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন। বাবার নির্দেশেই একবার বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে ঢাকা আসার সময় বুকে রিভলভার লুকিয়ে এনেছিলাম। আমাদের ঢাকার ১১নং লক্ষ্মীবাজারের বাসাটি ছিল বিপ্লবীদের একটি 'শেলটার'। এখানে অস্ত্র-শস্ত্রও যেমন থাকত, তেমনি স্বাভাবিক ও পলাতক জীবনেও এখানে অনেক বিপ্লবী অজ্ঞাতবাস করেছেন। এঁদের মধ্যে রসময় শূর (ইনি পরে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষাও নিয়েছিলেন), ভূপতি রায় ও নিকুঞ্জ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমার বাবা-ই এঁদের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন। আমরা ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় বাবার ভাই জ্ঞানে এঁদেরকে যথাক্রমে হিরণ্ময়কাকু, মুরারিকাকু ও নিকেশকাকু বলেই ডাকতাম। এই শেলটারের ব্যাপারে আমার বাবার অপর ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতাস্থ ৭নং ওয়ালিউল্লা লেনের গৃহটিও ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ঢাকায় লোম্যান মার্ডার ও হডসন শ্যুটিং-এর পর ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ভূপতিদার (রায়) সঙ্গে পলাতক বিনয় বসু এখানেই এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশ্য আমি তখন ঢাকায়।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। আমাদের ঢাকার বাসায় 'বি. ভি.' দলের যাঁরা আসতেন বা থাকতেন, যাঁদের মাধ্যমে আমি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি, তাঁদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িত হবার প্রারম্ভে মনকে তৈরি করার জন্য নানা আলাপ আলোচনা তো হতোই, তাছাড়া তাঁদের দেওয়া নানা বই আমাকে দেশের শৃঙ্খলমোচনের কাজে যুক্ত হবার প্রেরণা দিয়েছে। সেই বইগুলির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, পত্রাবলী, ভারতে বিবেকানন্দ এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুঝি বা না বুঝি, মনোযোগ দিয়েই সেসব বই পড়তাম। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা ও তাঁর বাণী এবং সর্বোপরি তাঁর সেই বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল ছিল এক মহাশক্তির আধার।

আমাদের ছেলেবেলায় ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গেলেও এবং অনেকটা প্রথাগতভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মা ঠাকুরানীর প্রতিকৃতির কাছে নিয়মিত প্রণাম জানালেও তাঁদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তেমন কিছুই অবহিত ছিলাম না। অনেক পরে স্বামীজীর উৎস সন্ধানে গিয়েই তাঁদের কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছি।

আমার 'বি. ভি.' দলে অন্তর্ভুক্তির পর ক্রমে ক্রমে আমাদের বাসায় 'বি. ভি.' দলের 'মেজদা'—বড়া অস্ত্র লুণ্ঠনখ্যাত হরিদাস দত্ত, হরিদাস রায়, ১৯৩০-১৯৩৩-এর পরিসরে 'বি. ভি.'-র বিভিন্ন এ্যাকশনের সঙ্গে জড়িত প্রফুল্ল দত্ত (ফুলদা), বীরেন ঘোষ, আমাদের লেবং গভর্নরের শ্যুটিং মামলায় দণ্ডিত সুকুমার (নান্টু) ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘমেয়াদী সাজা সহ এঁরা সবাই আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিলেন।

সেযুগে মেয়েদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন বৈপ্লবিক কাজে অংশ নেওয়া খুবই কঠিন ছিল। পুলিসের বাধার থেকেও বাড়ি বা পরিবারের বাধাই ছিল প্রবলতর। তবু যে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বাড়ি ছেড়ে মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হারমোনিয়ামের ভিতরে দুটি রিভলভার ও বেশ কিছু কার্তুজ লুকিয়ে নিয়ে দার্জিলিং-এ পৌঁছে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন-এর ওপর আক্রমণের জন্য সেগুলি পূর্বব্যবস্থামতো

জয়দেবপুর থেকে আলাদা ব্যাচে আগত ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জীর হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম এবং পরে পলাতক অবস্থায় কলকাতায় ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ, **identification parade**, বিচার ও দীর্ঘ সশ্রম কারাবাসের ধকল শান্ত মনে সামলে চলার শক্তি পেয়েছিলাম, তার মূলে নিশ্চয়ই ছিল স্বামীজীর সেই বাণী—"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। অবশ্য শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সম্পাদিত দলীয় মাসিকপত্র 'বেণু' ও তাঁরই লিখিত 'চলার পথে' শীর্ষক গল্পগ্রন্থটিও আমাদের পথ চলায় বিশেষ শক্তি জুগিয়েছিল। এ্যান্ডারসন শ্যুটিং মামলায় রবি ব্যানার্জীর দীপান্তর এবং ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। আমি তখন সেই রাজশাহী জেলেরই জেনানা ফাটকে কয়েদ খাটছি। শহীদ ভবানীর স্মৃতি আমার কাছে আজও অমলিন। আদালতে তাঁর সেই দৃপ্ত ভঙ্গি এবং সেই বিখ্যাত উক্তি: "I am sorry that His Excellency is still living" কখনোই ভোলার নয়। ফাঁসির আগে এই ভবানীই তাঁর ছোট ভাইকে চিঠিতে লিখেছিলেন: "অমাবস্যায় শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, আর সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।" কলকাতার এ্যান্ডারসন ভবনের 'ভবানী ভবন' নামকরণ শহীদ ভবানীরই স্মৃতিতে। বলা বাহুল্য, ভবানী এবং সকল মুক্তি-সংগ্রামীই স্বামীজীর বাণীতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম কারাবাসের সময় অবশ্য এত কিছু ভাবিনি। মানে ভাবার অবসর হয়নি। বিপ্লবীদের কয়েদী জীবন তখন বড়ই কঠিন ছিল। প্রেসিডেন্সী, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, রাজশাহী, মেদিনীপুর, দিনাজপুর সব জেলেই একই ব্যবস্থা। তবে ১৯৪২-এ যখন দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে ভারতরক্ষা আইনে সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে কারারুদ্ধ হই তখনই এসব চিন্তাভাবনার অবসর হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জেলে মার্কসীয় পুস্তকাদি কিছু পড়লেও আমরা কিন্তু স্বামীজীর চোখ দিয়েই দেশের 'দরিদ্রনারায়ণ'দের দেখেছিলাম এবং মনের দিক থেকে তাঁর সেবামন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলাম। মার্কস্-এর Class Struggle বা শ্রেণী সংগ্রাম আমাদের আকর্ষণ করেনি। ১৯৩৮-এ মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে বৈপ্লবিক কাজে দণ্ডিত মহিলা বন্দিগণ মুক্তি পেয়ে কেউ কেউ কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন ঠিকই, তবে আমি চিরকালই জাতীয়তাবাদীই আছি। স্বামীজী-নির্দেশিত 'ভারতমাতা'ই আমার উপাস্য।

১৯৪৬-এ জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষিকারূপে যোগ দিই তখনো এই ভেবে আমার আনন্দ হয়েছে যে, এই সেই স্কুল যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ছাত্র ছিলেন।

ভারতের 'তথাকথিত' স্বাধীনতার পর বিবাহ-সূত্রে আমি যে-পরিবারে এলাম তাঁরা অধিকতর সংস্কৃতিবান ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। আরো আনন্দের কথা এই যে, তাঁরা প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত ছিলেন। ঢাকাতে স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ (খোকা মহারাজ) তাঁদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার এক বড় ননদ প্রতিভা দেবীর কাছে সেই অমৃতময়ী 'মায়ী' সম্বোধন সহ স্বামী সুবোধানন্দজীর ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর পরিসরে লেখা প্রায় ৪০ খানা চিঠি এখনো আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসাবে রক্ষিত আছে। এর অনেকগুলো 'উদ্বোধন'-এ ১৩৭৪ থেকে ১৩৭৮-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বি. ভি.'র একজন প্রথম সারির ব্যক্তি আমার স্বামী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত না হলেও স্বভাবতই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন। স্বামীজীর জীবন ও বাণী ছিল তাঁর আদর্শ এবং প্রেরণার উৎস। স্বামীজীর ভাবানুসারী জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁরও জীবনের মূলমন্ত্র। আমার জীবনে তাই কোনদিনই আদর্শের সংঘাত আসেনি।

বেলুড় মঠে আমি বহুবার গিয়েছি। কিন্তু বেশ পরিণত বয়সে হঠাৎ একদিন দীক্ষা নেবার সুযোগ এল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাকে অনুগ্রহ করে দীক্ষা দেন।

বছর পাঁচ-ছয় আগে ভরত মহারাজ একদিন বীণা দাস (বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন

শ্যাটিং-খ্যাত) ও আমাকে বেলুড় মঠে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার একান্ত দুর্ভাগ্য যে, অসুস্থ থাকায় আমি যেতে পারিনি। বীণাদি গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সব শুনেছিলাম। আমি পরে ক্ষমা চেয়ে ভরত মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই ভরত মহারাজও তো সেদিন চলে গেলেন। জীবনে আর দেখা হলো না। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এঁরা ছিলেন আমাদের কাছে স্বামীজীরই প্রতিভূ।

জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা তো ভাবিই, আর বিশেষ করে ভাবি স্বামীজী ও তাঁর মানসপুত্র নেতাজীর কথা।

সেই ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে আমাদের 'বড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই। তোদের এখন একমাত্র ধর্ম হলো মানুষের শক্তি লাভ করে আগে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।" 'বড়দা' বলতেনঃ "আমরা জীবনভর এই গুরুবাক্যই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।"

[গত ১০ মে ১৯৯০ আমি শ্রীমতী রক্ষিত রায়কে একটি চিঠি লিখি। তাতে আমি তাঁর কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। শ্রীমতী রক্ষিত রায় তাঁর শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও ৩১ মে ১৯৯০ আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়ে তিনি স্বয়ং যে চিঠি আমাকে দিয়েছিলেন নিচে তা উপস্থাপিত হলো।] —স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ
যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন,
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

৩১ মে ১৯৯০

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১০ মে-র চিঠিতে আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছেনঃ (১) ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের আদি ও মধ্যপর্বে (১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত) এবং জাতীয় জাগরণের উন্মেষে স্বামীজীর প্রভাব সর্বাধিক বলা যায় কি এবং গেলে কেন ?

(২) বিপ্লবীদের চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রভাব ছিল কি ? আমি এখানে এ প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা করছি ঃ

(১) পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যেসব কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিন্দুমাত্রও অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের চরিত্র-গঠনে ও মনের দৃঢ়তায় এবং আত্মত্যাগের প্রেরণায় স্বামীজীর প্রভাব সর্বাধিক বলেই মনে হয়। দেশের জন্য স্বামীজীর সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র তাঁদের কাছে ছিল এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস। দরিদ্র, অজ্ঞ, মূর্খ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের মানুষকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়েও স্বামীজী যেন আবার চাবুক মেরে তাদের কুসংস্কার থেকে, মোহনিদ্রা থেকে মুক্ত করে এক আলোকোজ্জ্বল জীবনে উন্নীত করতে চেয়েছেন। কাজেই আদি ও মধ্য উভয় পর্বেই স্বামীজী বিদ্যমান। শুধু তাই বা কেন, পাশাপাশি মার্কসীয় প্রভাব সত্ত্বেও স্বামীজীর প্রভাব অন্ত্য পর্বেও অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের নেতাজী-পর্ব পর্যন্তও বিদ্যমান।

(২) ঠাকুর ও স্বামীজী তো অভেদ। যেখানে ঠাকুর সেখানেই স্বামীজী, বা যেখানেই স্বামীজী সেখানেই ঠাকুর। তবে আমি আগেই বলেছি আমরা —বিপ্লবীরা ঠাকুরকে কিছুটা পরে চিনেছিলাম এবং চিনেছিলাম স্বামীজীরই মাধ্যমে। স্বামীজী তন্ত্রে-মন্ত্রে নিজেকে আটকে না রেখে ভারত-আত্মার বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে গিয়েছিলেন তা ঠাকুরেরই প্রেরণায়। আজ বড় অভাব সে-আদর্শের। তাই ভারতের দিকে দিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ ও যুবসমাজ দিশাহারা। ঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে এদের যদি পরিচালিত করা যায় তবেই ভারত আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে—জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। নমস্কারান্তে

ইতি,
উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়

১০৪ সি, কড়েয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৭

একটি লকেটের অমর জীবন

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

কাহিনীটি শুনেছিলুম পূজনীয় ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের) মুখে। স্থান—বেলুড় মঠে তাঁর অফিস ঘর। সময়—২৩ অক্টোবর ১৯৮০, সকাল ১০-১১টা। উপস্থিত—মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু), বিমলকুমার ঘোষ ও অন্য কয়েকজন এবং বর্তমান লেখক। (কাহিনীটি অন্য সময়েও ভরত মহারাজের মুখে শুনেছি)।

ভরত মহারাজ মিস ম্যাকলাউডের কথা বলছিলেন।

মহারাজ তখন কর্মীরূপে মায়াবতীতে আছেন। মিস ম্যাকলাউডও সেখানে। ওঁকে মহারাজরা 'ট্যান্টিন' বলতেন। একদিন তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দ্রুতপদে এসে বললেন ঃ "ভরত! ভরত! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—আমার লকেট হারিয়ে গেছে। ওর মধ্যে স্বামীজীর মাথার কেশ ছিল। কি হবে ভরত? ও লকেট আমার চাইই। যেভাবে হোক, ওটি খুঁজে বার কর।"

ভরত মহারাজ দেখলেন, বৃদ্ধা কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁকে নানা কথায় আশ্বস্ত করার পরে, অদ্বৈত আশ্রমের সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃদ্ধার ধারণা হলো, কেউ ওটি চুরি করেছে। তিনি পুলিসের নীচু মহলে এবং ওপর মহলে খবর পাঠাতে লাগলেন। পুলিসের ওপর মহলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাছাড়া তখন বৃটিশ আমল এবং তিনি মেমসাহেব। ফলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল। অবস্থা দেখে ভরত মহারাজ খুব কড়া ভাষায় তাঁকে বললেন ঃ "ট্যান্টিন, এ কী কাণ্ড বাধাচ্ছো তুমি? তোমার প্রিয় জিনিস হারিয়েছে ঠিকই। তাই বলে এইসব গরিব পাহাড়ী লোকদের উত্ত্যক্ত করবার ব্যবস্থা করবে? এরা নিরীহ, সরল। পুলিস এদের অকারণে নাজেহাল করবে।"

মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন। তারপর ভরত মহারাজের দুটি হাত ধরে অতি কাতরস্বরে বললেন ঃ "ভরত, ও-জিনিস আমার সর্বস্ব। ঐ প্রাণের জিনিসটিকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে—সে একমাত্র তুমি। ভাল করে খুঁজে দেখো।"

বৃদ্ধা প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। ভরত মহারাজ অনেক সন্ধান করলেন, কিন্তু হদিস মিলল না। কয়েক মাস পরে, একদিন এক পাহাড়ী কুলি, অদ্বৈত আশ্রমে সে কাজকর্ম করে—হাতে হারের মতো কী একটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে হাজির। বলল ঃ "মহারাজ, এটি রাস্তার ধারে পড়েছিল। দেখুন তো, এখানকার কারো জিনিস কিনা?" মহারাজ দেখে চমকে উঠলেন। আরে, এ-যে ট্যান্টিনের হারানো লকেট। জিজ্ঞাসা করলেন "তুই এটা পেলি কি করে?" সে বলল, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দ্যাখে, কী একটা চিক্‌চিক্‌ করছে। পাতায় আর মাটিতে বাকি অংশ ঢাকা ছিল। মাটি সরিয়ে সে সেটি পেয়ে গেছে।

মহারাজ বুঝলেন, রাস্তায় হাঁটবার সময়ে মিস ম্যাকলাউডের গলা থেকে খুলে সেটি পড়ে গিয়েছিল লতাপাতার মধ্যে। পরে ধুলোয় চাপা পড়ে যায়। বর্ষার সময়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় সেটিকে কুলি দেখতে পেয়েছে।

মহারাজ তখনি টেলিগ্রাম করে মিস ম্যাকলাউডকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দিলেন। উল্লসিত মিস ম্যাকলাউড ফিরতি টেলিগ্রামে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আবিষ্কারক কুলিকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা বলে পাঠালেন।

ভরত মহারাজ কুলিকে ডেকে বললেন ঃ

"ওরে, মেমসাহেব খুশি হয়ে তোকে ২০০ টাকা দিতে বলেছে। এই নে।"

কুলি—"আমি নেব কেন?"

মহারাজ—"তুই মেমসাহেবের সাধের জিনিস খুঁজে দিয়েছিস, তাই বকশিশ দিয়েছেন।"

কুলি—"ওটা দেখতে পেয়েছি, তাই এনে দিয়েছি। তার জন্য টাকা নেব কেন? জিনিস খুঁজে এনে দিলে কেউ টাকা নেয় বুঝি?"

মহারাজ—"মেমসাহেব ভালবেসে দিয়েছে, নিবি না কেন?"

কুলি—"না, নেব না।"

অনেক চাপাচাপি সাধাসাধির পরে কুলি শেষ পর্যন্ত ২২ টাকা নিতে রাজি হলো। জমি না বাড়ি, কি একটা ব্যাপারে তার ঐ টাকা দেনা হয়েছিল।

॥ ২ ॥

লকেটটি অলঙ্কারমাত্র ছিল না। তার পিছনের ইতিহাস সুগভীর ভাবে ও অর্থে পূর্ণ। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে শুনে সে-কাহিনী বলেছেন তাঁর বোনঝি ফ্রান্সেস লেগেট (একদা লেডি স্যান্ডউইচ)। কাহিনী এই ঃ

স্বামীজীর সময়ের কথা মিস ম্যাকলাউড বোম্বাই-এ আছেন। একদিন দুটি তরুণ হিন্দু ছেলে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের এক-জনের ঘড়ির চেনে ঝুলছিল একটি নীলকান্ত মণি। বড়ো চমৎকার সেটি।

মিস ম্যাকলাউড বললেন ঃ "আহা, কী সুন্দর রঙ!"

ছেলেটি তখনি বলল ঃ "আপনি এটি নিন না!"

মিস ম্যাকলাউড একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন ঃ "সে কি, নেব কেন? না না, মোটেই নেব না।"

পরদিন সেই ছেলেটি একলা এল। একেবারে ধরে পড়ল, "এটি আপনাকে নিতেই হবে।" মিস ম্যাকলাউড পূর্ববৎ গররাজি।

মিস ম্যাকলাউড—"কি বলছ? অমন দামী জিনিসটা নিয়ে নেব? কেন নেব বলো?"

ছেলেটি—"আপনি আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসেন। তাই এই শ্রদ্ধার নিবেদন। আপনি নেবেন না?"

মিস ম্যাকলাউড নিলেন।

পরদিন ছেলেটির বন্ধু এল। সে বলল, "জানেন, আপনাকে আমার বন্ধু যা দিয়ে গেছে, তাই ছিল তার শেষ সম্পদ।"

মিস ম্যাকলাউড আর কখনো দুই বন্ধুর কোন একজনেরও দেখা পাননি।

এই ঘটনার সাত বছর পরে নিউইয়র্কে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে মঁসিয়ে লালীক-এর দেখা হয়। লালীক সেকালে ফ্রান্সে এবং ইউরোপে প্রখ্যাত কারু-শিল্পী ও মণিকার। শিল্পের বিশ্বকোষে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, এমন শিল্পী তিনি। লালীককে মিস ম্যাকলাউড রত্নটি দেখিয়ে তার প্রাপ্তির চমকপ্রদ ইতিহাস বললেন। তারপর অনুরোধ করলেন—ঐ মণিটি দিয়ে একটি রেলিকুয়্যারি (সাধুদের দেহাবশেষ বা পবিত্র বস্তুর আধার) তৈরি করে দেবার জন্য। মণিটি নিয়ে গিয়ে মঁসিয়ে লালীক এক বছর পরে লকেটটি তৈরি করে দিলেন।

অসাধারণ সেই সৃষ্টি। মহাবিশ্বের হৃদয়-রূপ যেন সেটি। আবছা নীল কাঁচে ফুটে আছে দুই দেবদূত; অর্ধস্বচ্ছ অস্থিযুক্ত তাঁদের পক্ষ; স্ফটিকের মেঘের উপরে নতজানু হয়ে তাঁরা হাতে ধরে আছেন আলোক-বিচ্ছুরিত নীলকান্ত মণিটিকে। অপরূপ!

লকেট পেয়ে মিস ম্যাকলাউডের আনন্দের সীমা নেই। বারবার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

মিস ম্যাকলাউড—"মঁসিয়ে লালীক, এই শিল্পকর্মটির জন্য আপনাকে পারিশ্রমিক হিসাবে কী দিতে হবে?"

মঁ লালীক—"কিছু দিতে হবে না। এটি আপনাকে আমার উপহার।"

মিস ম্যাকলাউড—"উপহার? কেন, কী কারণে?"

মঁ লালীক—"কারণ, আপনি আমাদের দেশের মানুষদের—ফরাসিদের—এত ভালবাসেন।"

তিন মহাদেশ মিলিত হলো একটি রত্নে—এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ। ভারতের এক অজ্ঞাতনামা যুবক, আমেরিকার মিস ম্যাকলাউড এবং ফ্রান্সের মঁসিয়ে লালীক।

কে মিলিয়ে দিলেন?

বিবেকানন্দ।

তিনি ভারতের এবং বিশ্বের। এবং মহাবিশ্বের। তাই তাঁর স্মৃতিচিহ্নভরা লকেটটিতে দেখা গেছে মহাবিশ্ব-ছবি—সেখানে অসীম প্রেমের নীলকান্ত রত্নকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে আছেন—দুই দেবদূত।

॥ ৩ ॥

মিস ম্যাকলাউডের কাছে বিবেকানন্দ কখনো 'নব বন্ধু', কখনো শুধু অনন্ত আলোক।

তিনি বলেছেন ঃ

"স্বামীজী আমাকে অনুভব করিয়েছেন,
অনন্তে অবস্থিত আমি,
তার পরিবর্তন নেই, বিকাশ নেই,
তা চিরন্তন।

স্বামীজীর এই অসীমতাই বেঁধে
রেখেছে আমাকে।
তার নিম্ন—ঊর্ধ্ব—পার্শ্ব—
পৌঁছতে পারি না কোনখানেই।"

মিস ম্যাকলাউডের যাত্রাও তাই চিরন্তন। রত্ন-লাভ তাঁর ভবিতব্য। প্রথম রত্নলাভ হয় যখন বয়স মাত্র পাঁচ কি ছয়। ম্যাকলাউড পরিবার তখন ডেট্রয়েটে অবস্থিত। একদিন শিশুটি স্বপ্নে দেখল—বাগানের একটা বিশেষ জায়গা খুঁড়লে সে সোনা পেয়ে যাবে। ঘুম ভেঙেই ছুটল বাগানে—স্বপ্নে দেখা জায়গাটি খুঁড়ল—এবং সত্যই পেয়ে গেল একটি সোনার দুল।

মেয়েটি তার পর থেকে খুঁজেই চলল। পৃথিবীর অনেক রত্নই তার আশপাশে এসে জুটল—কোনটাই মনঃপূত হলো না। অবশেষে সে পেল—সেই অনন্য রত্নটি—যার জন্ম সুদূর গঙ্গার তীরে। রত্নটিতে বিশ্বভুবন ভরা।

এহেন সম্পদ নিয়ে একান্তে বুঁদ হয়ে থাকার চরিত্র তিনি নন। "শোন শোন সুরলোকবাসী, / অমৃতের যে আছো সন্তান, / জানিয়াছি সেই অবি-নাশী, / জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান।" সুরলোকবাসী নিয়ে ওঁর ব্যস্ততা ছিল না। আগে অধিকার করতে হবে নরলোকবাসীদের।

মিস ম্যাকলাউডের কাজ দাঁড়াল—'শোন শোন' বার্তা কণ্ঠে তুলে নিয়ে সারা বিশ্বে ছুটে বেড়ানো—এক আশ্চর্য রত্নজ্যোতির বার্তা।

মিস ম্যাকলাউড বললেনঃ
"নির্ধারিত বিরাট ভূমিকা আমাকে নিতে হবে।
কোথায়, কিভাবে, তা জানি না।
কিন্তু স্বামীজীর সান্নিধ্যে বৃথা বাস করিনি,
বৃথা তাঁকে ভালবাসিনি।
তাঁকে জানা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকার পাওয়া—
একই কথা।
আমার সমাধি-ফলকে লেখা থাকবে—
'সদা প্রস্তুত আমি।'
আমার অপেক্ষা করার সময় নেই
আজই আমার নির্ধারিত লগ্ন।"

মিস ম্যাকলাউড বছরের পর বছর বৃহৎ বিশ্বে ঘুরেছেন। বলা হতো, তিনি চাকার উপর বিশ্রাম নিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা নিজের কাছে রেখে দিতেন—বলা তো যায় না, স্বামীজীর কাজে কখন কোথায় বেরিয়ে পড়তে হয়!

তাহলে ঐ-যে নীলকান্ত মণির লকেটটি—মিস ম্যাকলাউডের কাছে যা বিবেকানন্দ-প্রতীক—তাকে রেখে যাবেন কোথায়?

নিবেদিতা সে-প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর তিনিই দিয়েছেন।

৪ঠা জুলাই ওঁদের জীবনে মহাদিন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মর্ত্যজীবন থেকে স্বামীজীর মহামুক্তির দিন। তার দুই বৎসর পরে ১৯০৪-এর ৪ঠা জুলাই নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেনঃ

"এই সেই রাত্রি—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মহা-রাত্রি। 'এ এমন রাত্রি যাকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ করবেন ঈশ্বরের যত সন্তান আছেন এই পৃথিবীতে—সকলেই।' ক্রিস্টিন এখন একলা বসে আছে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে একেবারে নিঃশেষিত, ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আর আমি লেখার টেবিলে, কেবল ভাবছি, ভেবে চলেছি। আমার চিন্তা তোমারই দিকে ধেয়ে চলেছে—সমুদ্র-পথে তুমিও হয়তো একলাই রয়েছ।"

তারপর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের লকেট-প্রসঙ্গ আনলেন। তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট নয়, লকেটটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে কিনা। তবে লকেটের রেখাচিত্র তাঁর কাছে এসে গিয়েছিল—এবং সেটি যে কণ্ঠে ধারণ করা হবে, এই সংবাদও। নম্র-নত কণ্ঠে নিবেদিতা লিখলেনঃ

"মিস স্টাম-এর আঁকা তোমার 'রেলিকোয়্যারি'র ছবি আজ এসেছে। কী অপূর্ব সুন্দর! কী রহস্যময়! কী শান্ত মৌন! মঁসিয়ে লালীক যে ভাবে প্রতীকের ভাষায় চিন্তা করতে পারেন, দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু একটা কথা বলি, যদি তোমার জায়গায় আমি থাকতুম তাহলে ও-বস্তু কণ্ঠে ধারণ করতে পারতুম না। দেওয়ালের কোন একটি জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে ওটিকে স্থাপন করে, নতজানু হয়ে, তাকিয়ে থাকতুম। কিন্তু তোমার পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। তুমি যে যাযাবর পাখি। তোমার পক্ষে ওটিকে স্থাপন করার একটি স্থানই আছে—তোমার হৃদয়।"

মা সরস্বতী

স্বামী গোপেশানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেছেন —মা হচ্ছেন সরস্বতী—তখন সে-কথা শ্রদ্ধা সহকারে অনেকেই মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু যাঁরা ঠাকুরের সাথে মজা করতে চান তাঁদের কথাবার্তা একটু অন্য রকমের হবে—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া জানতেন না বললে বিশেষ ভুল বলা হবে না। অথচ ঠাকুর মাকে একেবারে সরস্বতী বলে দিলেন! এটি কেমন হলো? সরস্বতীর কাছে আমরা শিক্ষা পাব, জ্ঞান পাব —বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে যখন বিশ্বকর্মার রমরমা তখন যদি শিক্ষা দেবার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে কি শিক্ষাদাত্রীকে বর্তমান যুগ সরস্বতী বলে মেনে নেবে?

প্রথমে শিক্ষা ও নিরক্ষরতার যোগাযোগ কোথায় খোলা মনে একটু ভেবে দেখা যাক। বেদ-উপনিষদের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদেরকে বৈজ্ঞানিক না বলে ঋষি বলা হয়। এটাই প্রচলন। ঋষিই বলুন আর বৈজ্ঞানিকই বলুন—তাঁরা কি নিরক্ষর ছিলেন? এ কথায় আপনারা এক সঙ্গে বলে উঠবেন—"প্রশ্নটাই ভুল, প্রশ্নটাই ভুল, তখন অক্ষরই আবিষ্কার হয়নি, নিরক্ষর শব্দটি তখন অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে ঢাকা ছিল।" আপনাদের কথা মেনে নিলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, নিরক্ষর হলেও জ্ঞানী হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যা প্রাচীনকালে সম্ভব ছিল তা বর্তমান কালেও সম্ভব। আমাদের অবশ্য জ্ঞান আহরণের জন্যে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু সরস্বতীকেও যদি পড়তে হয় তাহলে তিনি কেমন সরস্বতী! অমন সরস্বতীতে আমাদের দরকার নেই। আমরা জ্ঞান-স্বরূপিণীকেই সরস্বতী বলে জানি।

এবার শ্রীশ্রীঠাকুর কি বলতেন, শ্রীশ্রীমা কি বলতেন তারই এক-আধটা কথা নিয়ে চিন্তা করা যাক।—সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। কারও দোষ দেখবে না, সকলকে আপন করে নাও। যে মহাসত্যগুলি মনুষ্য জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন সেই কথাগুলিই ওরা অতি সহজ সরল ভাষায় বলে গেছেন। এজন্যেই কি শ্রীমা সরস্বতী? কখনই নয়। শুধু বললে হবে কেন? আগেই বলেছি বর্তমান যুগে সরস্বতীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি বিজ্ঞান-শিক্ষাটাই বৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া দরকার। অন্য কিছু শিক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে না দিলেও চলবে। শুধু পড়ে গেলেই হলো অথবা বলে গেলেই হলো। আমরা জেনেছি—পড়ার থেকে শোনা ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল। ছড়ায় বলেঃ

পড়ার চেয়ে ভাল শোনা,
শোনার চেয়ে দেখা,
বস্তুটাকে দেখলে পর
সেই তো সেরা শেখা।

বৈজ্ঞানিকের দেখাতেই বিশ্বাস, তার জন্যেই তো 'ল্যাবরেটরি'-তে 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আন কিছু দস্তা, ঢাল কিছু 'এসিড,' ভুরভুর করে 'গ্যাস' বের হবে। আগুন দাও, কেমন সুন্দর আলো জ্বলবে। একবার যে দেখেছে, সে-ই শিখেছে। তাই বলি 'ডেমনস্ট্রেশন'

চাই। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকরা তো 'ডেমনস্ট্রেশন' চাইবেনই।

সংসার-জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতণ্ডা চলতে পারে। কিন্তু মা যে ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সে কি রকম জীবন? খুবই গরিবের। কাপড় গিঁট দিয়ে পরে পরের বাড়িতে ধান ভানতে যেতে হতো। কোন দিন অন্ন জুটেছে তো নুন জোটেনি। বাড়িতে কেউ বা আধ-পাগল আর কেউ বা পুরো-পাগল। ভাইদের কথা আর নাই বা বললাম। কারণ মা বলেছেন—কারও দোষ দেখো না। বিশেষ করে ভক্তদের কাছে জয়রামবাটীর মাটি পর্যন্ত যখন 'চন্দন সমান'—অতি প্রিয় ও পবিত্র বস্তু, তখন এ-ব্যাপারে বলতে হয়—মুখ, তুই চুপ করে থাক, চুপ করে থাক। এই দুর্বিষহ সংসারে কেমন করে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হয় তা মা একদিন নয়, দিনের পর দিন, দীর্ঘদিন দেখিয়ে গিয়েছেন। সংসারীদের উপযুক্ত স্থান সংসার, ওটাই তাদের কেল্লা, যেমন মঠ হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীদের কেল্লা। নৌকা জলেই ভাল থাকে। জল নৌকায় না থাকলেই হলো। মা সে-টি দেখিয়ে গেছেন। সময়বিশেষে মা অবশ্যই কৃত্রিম ফোঁস করেছেন। তা না হলে পরমুহূর্তেই হেসে কুটিপাটি হবেন কেন? মায়ের জীবনী যাঁদের পড়া আছে তাঁদেরই এসব ঘটনা জানা আছে। সত্যি, সংসার নিয়ে মা কি-খেলাই না খেলেছেন!

মা সকলকেই নিজের সন্তানজ্ঞানে ভালবাসতেন এবং তার জন্যেই নিজের দরকার না থাকলেও সকলের জন্যেই কতই-না ধ্যান-জপ-তপস্যা করেছেন। আমরা তো নিজের জন্যেই প্রার্থনা করে উঠতে পারি না। খুব বেশি হলে নিজের আশ্রমের জন্য, আর সংসারীরা নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য। ব্যস। পরের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর জন্যে আপনি কি কোন দিন প্রার্থনা করেছেন? অথচ মা এই সংসারে থেকেই এই সকল 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। মা বিড়ালের সেবা করেছেন, গরুর সেবা করেছেন, পাখির সেবা করেছেন, ডাকাতের সেবা করেছেন, রাধুর সেবা করেছেন, শিষ্যের সেবা করেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, গৃহীর সেবা করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা তো করেছেনই। কেউ বাদ নেই। সেবার কথা উনি শুধু মুখে বলেননি, সেবার 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে গেছেন। এইভাবে বলা যেতে পারে যে, মা যা যা বলেছেন তা তা 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং মাকে সরস্বতী বলতেই হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। আর যিনি সরস্বতী তিনি তো সকলেরই মা। অন্য প্রমাণও আছে। স্মরণ করুন দাক্ষিণাত্যের ঘটনা। দাক্ষিণাত্যে অনেকে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন না। মা-ও তাঁদের ভাষা জানেন না। মা নীরব, তাঁরা কথা বলে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা পরম পরিতৃপ্তি ও আনন্দ হৃদয় ভরে নিয়ে গেলেন। সব কথা বলা হয়ে গেল। কেমন করে এমন হলো? হবেই তো!

তিন-চার মাসের শিশু যে কথা বলা শেখেনি এবং কথা বুঝতে শেখেনি সে তার গর্ভধারিণীর কাছে কোন ভাষায় কথা বলে? অথচ গর্ভধারিণী সন্তানের কথা বোঝেন এবং শিশুও মায়ের কথা বোঝে। কোন ভাষার দরকার হয় কি? হয় না। অথচ শিশুই মাকে সর্বতোভাবে পায়। ঠিক ঠিক আসল মায়ের কাছে এলে এমন হবেই এবং এ 'ডেমনস্ট্রেশন'-ও মা অনেকবার দিয়েছেন। তাই তো বলি—সরস্বতীমায়ী কী জয়!



প্রণাম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি। ভীরু, দুর্বল, অক্ষম, অপদার্থ বলে নয়। গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হব বলেও নয়। মানুষ হব বলে আমি আপনার শরণার্থী। গৃহে থেকেও আমি আপনার অনুগামী, আর সেইটাই আমার গর্ব। এত বিক্ষিপ্ততা, এত চঞ্চলতা, এত প্রলোভন, কিন্তু সেই আপনারই নির্দেশ—'দেখিস, নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা, কাঁটায় কাঁটায় যেন এক হয়ে থাকে।' ওপরের কাঁটা হলেন আপনি আর নিচের কাঁটা হলো আমার মন। অনুক্ষণ রামকৃষ্ণলগ্ন। তার অর্থ? রামকৃষ্ণ তো শুধু একটা নাম নয়—বেঁচে থাকার বিজ্ঞান। ষড় রিপুকে বাগে রাখার বল্গা। আর যেই বলেছি, আপনি আমার অহংকার, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে—বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ নেহি হায় তো থোড়া থোড়া। আপনি যার পিতা, তার কি বেচাল সাজে! ঠাকুর, চীন দেশে অনুপম একটা কথা আছে—ছেলে তার পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তা বোঝা যাবে পিতার দেহাবসানের পরে। কিভাবে? সন্তান তার পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে কিনা। পিতার আদর্শে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিনা। পিতার জীবনধারা সে বজায় রাখতে পেরেছে কিনা। যদি পেরে থাকে তবেই সে সুসন্তান। নয় তো সে ভ্রষ্ট। যতই সে ছবিতে মালা ঝোলাক আর জন্মদিন, মৃত্যুদিন পালন করুক। কিছুই কিছু নয়।

ঠাকুর আমি আপনার প্রকৃত অনুগামী হতে চাই। ভড়ং দেখিয়ে নয়। কাজে, স্বভাবে, আমার আচরণে। লজ্জাই হলো আমার দর্পণ! যেমন? লজ্জা দর্পণ হয় কি করে? যদি কেউ বলে—আরে ছি ছি—এই নাকি রামকৃষ্ণ-সন্তান? এই তার কাজ, এই তার কথা! লজ্জা। সেই দর্পণে আমার মলিন, ভণ্ডমুখের প্রতিফলন। আমার আচরণে আপনি যেন অপমানিত না হন। আপনি বলতেন—সাধু সাবধান। আমি নিজেকে বলি—রামকৃষ্ণ-সন্তান অতিশয় সাবধান। লজ্জা পেতে পেতে লজ্জা আর লজ্জা থাকে না, হয় অঙ্গভূষণ। অপমানিত হতে হতে অপমান আর অপমান থাকে না, হয় গলার পদক। লজ্জার দর্পণটি ভেঙে যায়। কথায় আছে এক কান-কাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দুকান-কাটা যায় ভেতর দিয়ে। তার তো আর কোনও লজ্জা থাকে না তখন।

আমি আপনার সম্মান বাড়াতে পারব না, অপমানের কারণ হব—এই আমার ভয়। এই ভয়ই আমার ব্রেক। যদি কেউ বলেন, আরে মুছে ফেল না তোমার পরিচয়। খুলে ফেলে দাও তোমার অনুগামীর পোশাক। অনুসরণের পথ ছেড়ে বিস্মরণের দিকে যাও না। সে উপায় যে নেই। যে জানে সে জানে। ঠাকুর একদিন সকালে ঝাউতলার দিক থেকে গাড়ু হাতে ফিরছেন। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এল তাঁর। উঁকি মেরে দেখলেন। দেখেন কি, একটা ঢোঁড়া সাপ একটা কোলা ব্যাঙ ধরেছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই এই অবস্থা। গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও পারছে না। জাতসাপে ধরলে এই অবস্থা হতো না।' ঠাকুর যে আমার সেই জাতসাপ। অ্যায়সা ধরা ধরেছেন যে একেবারে নীল, বিষে জর্জর। এই যখন আমার অবস্থা তখন ফেরার আর পথ কোথায়! এই জীবনটা আমাকে তাঁর হাত ধরেই কাটাতে হবে।

কোন হাত? অপবিত্র হাত হলে তো চলবে না। পবিত্র হাত হওয়া চাই। সাবান দিলেই তো হলো না। সাফা হলো বটে। পবিত্র হতে হলে, সৎকর্ম আর সৎচিন্তার সাবান ঘষতে হবে। সৎকর্ম কি? দান-ধ্যান, গঙ্গাস্নান, তিলকসেবা, ঘণ্টা নাড়া, স্তোত্রপাঠ, নিরামিষ ভক্ষণ, তীর্থ-ভ্রমণ? না। ঠাকুর এক চড় মেরে বললেন—'ওসব নয়, নয়, নয়। নিজেকে ঠকিও না। তোমার ধারণা হবে—খুব হচ্ছে, খুব বুঝি এগুচ্ছি! আসলে

হচ্ছে না কিছুই। ও তোমার নিত্যকৃত্যের তালিকায় ঢুকে ভক্তিহীন, মনঃসংযোগহীন, যান্ত্রিক অভ্যাসের মতো হয়ে যাবে। কিরকম জানো? আমার সেই লাগ ভেলকি গল্পটা তোমাকে বলেছিলুম, মনে আছে?

আছে ঠাকুর। লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি করছিল এক মাদারিঅলা, হঠাৎ জিভ উলটে সমাধি লেগে গেল। যেই তার সমাধি ছুটে গেল, অমনি আবার সে, লাগ ভেলকি শুরু করে দিল। এর অর্থ কি ঠাকুর? এই প্রসঙ্গে এল কেন?

তুমি ভাব, ভেবে বল।

তাহলে কি এইরকম? প্রবল নামসংকীর্তন করছি, কি তারস্বরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াচ্ছি, ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে প্রবল আরতি করছি। হঠাৎ একদিন ঘোর লেগে গেল। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। তার অর্থ এই নয় যে, আমার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেল!

"ঠিক। ওটা সিদ্ধি নয়, ঘোর। 'নিতাই আমার মাতা হাতি' বলে ধেই ধেই নাচতে নাচতে, শেষে আর বলতে পারি না, বলি, মা হা। ঘোর লেগেছে। সেকরার ধরও সমাধি হলো। সমাধি যেই ভাঙল, সে অমনি আবার হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করল। একটু-আধটু সোনাও সরাতে লাগল। সেই তার আগের স্বভাব। স্বভাব বদলাচ্ছে কিনা দেখতে হবে। কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য, কমছে কিনা। বাজে কথা শুনতেও ভাল লাগে না, কইতেও ভাল লাগে না। কেবল তাঁর কথাই শুনতে ভাল লাগে। দিবারাত্র তাঁর প্রসঙ্গেই রুচি, অন্য প্রসঙ্গে অরুচি। তোমার হচ্ছে কিনা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁকে মনে পড়ামাত্রই তোমার চোখে জল আসবে। ইষ্ট তোমাকে দর্শন দেবেন। দর্পণটি পরিষ্কার রাখ, দর্শন যদি পেতে চাও। সৎচিন্তা আর সৎপ্রসঙ্গ, অনুক্ষণ তাতে মগ্ন থাকা।" কিন্তু কর্ম তো থাকবেই। গৃহী যখন, তখন বিষয়কর্ম তো থাকবেই। কর্তব্য কর্ম। আমার ঠাকুর বলছেন, 'অবশ্যই থাকবে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে তোমাকে করতেই হবে। সৎপথে জীবিকার্জন। কারোর কাছে হাত পাতবে না। আর দুখচেটে সংসারী হবে না। সন্ধ্যায় সব ঘর যেন আলোকিত হয়। সিঁড়িতে প্রবেশদ্বারে অবশ্যই যেন আলো থাকে।' ঠাকুর কেশব সেনের বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছেন—এইসব জায়গায় আলো দেবে, আলো দিতে হয়। নিজের মনেই বলেছিলেন, তদ্গত ভাবে। সামান্য নির্দেশ। যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ। গভীর কোনও তত্ত্বকথা নয় কিন্তু। অথচ এই একটি নির্দেশেই ঠাকুর, আমি আপনাকে আমার পরমপিতা হিসাবে ধরে ফেলেছি। গৃহীর প্রতি আপনার কি অসীম করুণা! সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে আলো দেবে। কেন? অন্ধকার, দারিদ্রের লক্ষণ, আলস্যের লক্ষণ, তামসিকতার লক্ষণ, উদাসীনতার লক্ষণ, অবহেলার লক্ষণ, অসচেতনতার লক্ষণ, মনের জড়তার লক্ষণ। আলো মানে আনন্দের প্রকাশ। চিদানন্দেরই প্রতিফলন। এই আলোর জন্যে গৃহী তুমি আলস্য ত্যাগ কর। দৈহিক এবং মানসিক আলস্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' ক্লীব হয়ে যেয়ো না। গৃহীর ক্লীবতা কী? বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অন্ধকারে থাকা। গৃহকে আলোকিত করার জন্যে উপার্জন, হৃদয়গেহকে আলোকিত করার জন্যে সাধনা। অতিথি যেমন গৃহ দেখেন, ঈশ্বর তেমনি মন দেখেন। অন্ধকার গৃহে আলোকিত প্রাণী থাকতে পারে না। মন আলোকিত না হলে প্রাণী আলোকিত হতে পারে না। একটি উপদেশে আমার ঠাকুর প্রাণ আর পরিবেশের শেষ কথা বলে গেছেন। একালের হাজারটা সাইকোলজিস্টের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। আলো করে থাক। বাইরে আলো। ভেতরে আলো।

স্বামীজী ঠাকুরের এই কথাটিকে তাঁর নিজের মতো করে, কালোপযোগী করে বলেছিলেন, "ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পুজো চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির।... ধর্মকথা

শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোনও ফল হবে না।"

অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাও। অভাব দূর করে নিজের পরিবারে আলো আনো। দক্ষিণেশ্বরে আমার ঠাকুরের কাছে বেশ মজার এক মানুষ আসতেন। সংসারে বিষম বিতৃষ্ণা। সংসার ত্যাগই করে ফেলবেন এমন অবস্থা। তিনি ঠাকুরের ঘরে এলেন। ঠাকুরকে সবাই ঘিরে আছেন। ধর্মকথা হচ্ছে। তিনি একপাশে মাদুর পেতে ভোঁস ভোঁস করে খুব খানিক ঘুমিয়ে আবার মাদুরটি গুটিয়ে তুলে রেখে চলে যেতেন। তাঁর কাণ্ড দেখে ঠাকুর হাসতেন। অভাবীর বৈরাগ্য, অলসের বৈরাগ্য, রাজার বৈরাগ্য, লোক-দেখানো বৈরাগ্য, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্য, চোরের বৈরাগ্য, ভোগীর বৈরাগ্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, কত-রকমের বৈরাগ্য যে আছে, ঠাকুর সবই লক্ষ্য করেছিলেন। সংসার ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। বেশ কিছুদিন বেপাত্তা। বউ ছেলে মেয়ে পড়ে রইল অভাবে, অনাহারে, অসহায় অবস্থায়। মাস তিনেক যেতেই পোস্টকার্ড এল। বেনারসের ছাপ মারা—'আমার একটি কর্ম জুটিয়াছে। শীঘ্রই তোমাদের লইয়া আসিব।' মর্কট বৈরাগ্য অসহ্য ছিল আমার ঠাকুরের। অন্তর্যামী বুঝতে পারতেন। ধর্মকে যাঁরা পলায়নের পথ ভাবতেন তাঁদের ধমক দিতেন—লজ্জা করে না, বিয়ে করেছ, ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে? ভূতে? পাড়াপড়শীরা? আগে কর্তব্য করে এস, তারপর সব হবে।

তাহলে ঠাকুর, আমার দুই হাতের পবিত্রতা আসবে কি ভাবে?

এইভাবে, একটি হাত সৎ জীবিকায়, আর একটি হাত আমার চরণে। যেই কর্ম তোমাকে মুক্তি দেবে তখন তোমার দুহাত দিয়ে আমাকে ধরবে। সংসারের প্রতি তোমার কর্তব্য কতদিন—না যতদিন তোমার সন্তান-সন্ততি জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ঠাকুর যে-হাতটি আপনি ধরেছেন, সেই হাত বেয়ে যে ভাবতরঙ্গ আপনাতে প্রবাহিত হচ্ছে তার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতার বিচার আপনি করবেন। আপনি বলেছিলেন—মন হলো মাছি। এই বিষ্ঠায় বসে, তো এই মধুতে। অনেক চেষ্টা করেছি আপনার নির্দেশে মনকে সেই মাছি করতে যা শুধুই ফুলে বসে। এখনও পারিনি। চেষ্টা করছি, পারছি না। কোনও আড়ম্বর রাখিনি, যেমন বলেছিলেন, মনে, বনে, কোণে, সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছি। আপনি বলে-ছিলেন সুতোয় সামান্য একটু ফেঁসো থাকলে ছুঁচের ফুটোয় ঢুকবে না। কামনা-বাসনার সামান্যতম ফেঁসো মনে লেগে থাকলে ঈশ্বররূপী সুচে প্রবেশ করবে না। রামকৃষ্ণ-সুচে মন প্রবিষ্ট করাতে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত তা হয়নি। সে আমার মনমাছির অক্ষমতা। আপনার চরণ থেকে মাঝে মাঝে আমার মন টলে যায়।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, 'সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা।' কোন্ সাম্যাবস্থা, গীতায় ভগবান যেমন বলেছিলেন 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভা-লাভৌ জয়াজয়ৌ।' সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে।' স্বামীজী আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, 'বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ ঈশ্বরতনয় হও, তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত 'বীর্য' বোঝায়। দুর্বলতা-দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবে তুমি কেবল আত্মা মাত্র। যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত।'

ঠাকুর আমার একটাই ভয়, যে-হাত আপনি ধরেছেন, সেই হাত যেন অপবিত্র করে না ফেলি কর্ম দোষে, কলুষিত চিন্তায়। আমার কারণে আপনি যেন ছোট না হয়ে যান। আমার এই ভয়ই আমার লাগাম। রামকৃষ্ণানুগতের বেচাল বড় দৃষ্টিগ্রাহী। যে হৃদয়গৃহে আপনি আসবেন সেখানে যেন সৎকর্ম, সম্ভাবনার আলোটি জ্বলে। আরও কথা ছিল, আজ আর হলো না। প্রণাম॥

কিংকর্তব্য

আনন্দ বাগচী

ঋষি বলেছেন অল্পে সুখ নেই। কথাটি নিখাদ সত্যি। অল্প মানেই অ-সুখ। কবিও বলেছেন, অল্প নিয়ে থাকি বলেই আমার 'যাহা যায় তাহা যায়'। সব হাহাকারের উৎপত্তি এই অল্প থেকেই। অথচ বাঙালী চিরদিন অল্প নিয়েই আছে! খুব বেশি হলে সে আদার কারবারি, কথায় কথায় প্রবচন শোনায়, জাহাজের খবরে তার দরকার কী! সব ব্যাপারেই যে এরকম আধা-ব্যাপারি, সে অল্প নিয়েই তুষ্ট থাকতে চায়। অল্পে খুশি তো নিশ্চয়ই তবে অল্পেই খুশি হয়। এই স্বল্পতা থেকেই অস্থিরতা তার স্বভাবে শেকড় গেড়েছে। অস্থিরতাই তাকে অগভীর করেছে। অলস এবং অনুকরণ-বিলাসী করেছে। কোন কিছুর মূলে পৌঁছানোর উদ্যম নষ্ট করেছে। তাই দেখি সে ছোটে কিন্তু দৌড়ায় না, অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত দৌড়ায় না। হুজুগের ছুট কিছুদূর গড়িয়েই থেমে যায়।

বাঙালীর কল্পনা, কৌতূহল এবং কর্মোদ্যম, তার জ্ঞান বিদ্যা ও বিশ্বাস কেমন যেন আলগা, অপ্রতিভ এবং অসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। অথচ তার সৌভাগ্য ছিল ঈর্ষনীয়, ইতিহাস অসামান্য, চরিত্র তুলনাহীন। এই সেদিন পর্যন্তও নেই-নেই করেও তার যা ছিল তা কাজে লাগাতে পারলে বিশ্বের দরবারে শীর্ষাসন অধিকার করা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অনায়াসপ্রাপ্ত ঐশ্বর্যকে সে চিনতে পারেনি, ধরে রাখতে পারেনি, নষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পরশপাথর খোঁজা ক্ষ্যাপার মতো অন্বিষ্টকে হাতে পেয়েও মূর্খের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সঙ্কটকালে প্রয়োজনবোধে পণ্ডিতরা নাকি অর্ধেক ত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু এই ত্যাগের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, অর্ধেক বাঁচাবার জন্যেই এই অর্ধেক ছাড়া। কিন্তু সঙ্কটকালে যাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় তারা অর্ধেক তো ছাড়েই বাকি অর্ধেকও রক্ষা করতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে। যে বিদ্যাবলী তার করায়ত্ত ছিল একদিন, সনিষ্ঠ চর্চার অভাবে তা সে বিস্মৃত হয়েছে। যে মহাপুরুষের দল বারে বারে তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের সে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে। তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে সে ভুলে গেছে। সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী কানে পৌঁছালেও বুকের মধ্যে পৌঁছায়নি। বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে পারেনি যাঁরা ছিলেন তার আত্মার অধিক, প্রিয় হতে প্রিয়জন। সোনার বাংলা দুটুকরো হয়েছে, পায়ের তলা থেকে মাটিও সরে যেতে শুরু করেছে অলক্ষ্যে। আত্মনষ্ট বন্ধুভ্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থা।

শুধু বাঙালীর নয়, গোটা ভারতবাসীরই আজ এই দশা, ভাঙনের দশা। অবশ্য ভালয় যেমন মন্দেও তেমনি, অতীতে যেমন আজকেও তেমনি, বাঙালীই হয়েছে ভারতের পথিকৃৎ। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম বিপ্লবের অগ্রভূমিকা নিয়েছিল এই বাঙালীই। প্রথম স্বাধীনতার সূর্যও এই বাংলার প্রান্তরে ডুবে

বাঙালীর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে। যে বিদ্যাবলী তার করায়ত্ত ছিল একদিন, সনিষ্ঠ চর্চার অভাবে তা সে বিস্মৃত হয়েছে। যে মহাপুরুষের দল বারে বারে তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের সে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে। তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে সে ভুলে গেছে। সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী কানে পৌঁছালেও বুকের মধ্যে পৌঁছায়নি। বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে পারেনি যাঁরা ছিলেন তার আত্মার অধিক, প্রিয় হতে প্রিয়জন। সোনার বাংলা দুটুকরো হয়েছে, তলা থেকে মাটিও সরে যেতে শুরু করেছে অলক্ষ্যে। আত্মনষ্ট বন্ধুভ্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থা।

ছিল বলেই হয়তো সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এভাবেই তাকে প্রথম শুরু করতে হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম মুক্তি-যুদ্ধের নেতৃত্বও দিয়েছিল বাঙালীই। তারপর রাজনীতির বিবর্তনেও বাঙালীই অগ্রণী হয়েছে।

এই শতাব্দীর শেষ প্রহরে এক অদ্ভুত অন্ধকার এখন পৃথিবী জুড়ে। বাঙালী কবির ভবিষ্যদ্বাণী এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে ভেবেছিল। এ এমন সময় যখন চক্ষুষ্মানরা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছেন। শুধু তারাই বেশি চোখে দেখছে যারা যত বেশি অন্ধ। এই অফুরন্ত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষও রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার দিগভ্রান্ত পথযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে কেবল দুর্নীতির রাজত্ব, আর মিথ্যাচার আর রাজনীতির ব্যভিচার। মনুষ্যত্ব শিরদাঁড়ার অসুখে ভুগছে। অন্যায় এবং অধর্মের সঙ্গে আপসরফার মধ্য দিয়ে সমাজ তার চলচ্ছক্তি বজায় রেখেছে। মূল্যবোধ বিনষ্ট, আদর্শ অট্ট-হাসির বিষয়। দেশের মানুষ মানেই সাময়িক ভোটপত্র, আর শোষণের চিরস্থায়ী করপাত্র। তার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এদেশের স্বাধীনতার এখন দুটিমাত্র হাতিয়ার বুলেট আর ব্যালট। কারণ প্রশাসনের তামাম কাঠামোটি এখন ঘুণে ধরা, সব উন্নয়ন পরিকল্পনারই অধোগতি শেষ পর্যন্ত ছোটবড় পকেটে। জনসাধারণের বহুকষ্টের অর্থ নিয়েও ছিনিমিনি খেলা চলেছে সর্বত্র। এদেশে এখন আর কেউ কাজ করে না, কাজ করতে দেওয়া হয় না। যতই জনসংখ্যা বাড়ছে 'মানুষ'-এর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে ততই দ্রুত হারে। এদেশের কোটি কোটি মানুষ এখন একলা, অসহায়, নিরাপত্তাহীন। তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, নালিশ জানানোর ভাষা নেই, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর উপায় নেই। দেশে আইন আছে কিন্তু সেই আইন শাঁখের করাতের মতো সামনে কাটে পিছনে কাটে মাঝখানেও কাটে। তার ফাঁক-ফোকরও যথেষ্ট। বিত্তহীন মানুষের কাজে লাগা শক্ত। পুলিস আছে, কিন্তু তার সাহায্য কারা পায়? পুলিসে ছুঁলে এবং পুলিস ছুঁলে একই অবস্থা। বিভিন্ন অঞ্চল মাসলম্যান, মস্তানদের খাসতালুক। এবং তাদের রিমোট-কনট্রোল অন্যত্র। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং ভেজাল রোধ করার সাধ্য এখন স্বয়ং সরকারেরও নেই। যে বণিকের মানদণ্ড একদা রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটাই বুঝি বণিকের তৈলদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে দেশশাসনের বাটখারা। রাজা গেছে, রাজছত্র গেছে, সিংহাসন লোপাট। গণতন্ত্র মতে এখন গদি, রাজনীতিও এখন তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বদলে গদিয়ান হতে উদ্গ্রীব। দেশ রসাতলে যাক, ঋণের ওপর ঋণের বোঝা পর্বতপ্রমাণ হোক, জোড়া-তালি গোঁজামিল দিয়ে, ভাষণের ব্যাসকূট দিয়ে বিভ্রান্ত করে এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচন পর্যন্ত টিকে থাকাই এখন মোক্ষ। মৌলবাদী রাজ-নীতি গোষ্ঠীস্বার্থে সমর্পিত। জনস্বার্থের যারা দোহাই পাড়ে জনসাধারণের সর্বনাশে তারা অবিচল, বিবেকহীন, নির্মম।

শিক্ষাব্যবস্থায় দূরদৃষ্টির অভাব দেখে ব্যথিত হতে হয়। মনে হয় শিক্ষাই এখন জাতীয় জীবনে সবচেয়ে অজরুরী ব্যাপার। স্কুলগুলিও চলেছে তেমনি ভাবে। আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, শিক্ষকদের সম্মান বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির দিকে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব, জীবনের শুভাশুভ নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। ক্লাসে পড়ানো হয় না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা এখন নিছকই হাজিরাসর্বস্ব চাকরি। বিদ্যালয়ের বুড়ি ছুঁয়ে শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব কুটিরশিল্পে আগ্রহী। যদিও সেই উপরি উপার্জনের ঘরানাও পুরোপুরি যান্ত্রিক বাণিজ্যে পরিণত। সব দেখে মনে হয়, 'নাথিং ইজ রং ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার' কথাটির সঙ্গে এ-যুগে আর একটি শব্দ যোগ করে নেওয়া যায়। সেই শব্দটি হচ্ছে এডুকেশন। বিদ্যা এখন আর কেউ দান করে না, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হস্তান্তরিত হয়। সব মিলিয়ে বাঙালীর এখন সমূহ দুর্দিন।

বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর ঘর-সংসার ঠিক কবে থেকে, কোথা থেকে এবং কেন ভাঙতে শুরু করেছে, সেকথা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক হয়তো বলতে পারেন, আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, পঞ্চাশ বছর আগেও যে বাংলার অস্তিত্ব ছিল, বাঙালীর যে মন-মেজাজ-মর্জি টিকে ছিল সেটুকুও আজ আর

অবশিষ্ট নেই। সেই দেশপ্রেম, সেই ভালবাসা, সেই কর্মনিষ্ঠা, ধর্মবোধ এবং উদ্দীপনা কোথায় হারিয়ে গেছে। মানচিত্রের দিকে তাকালে তো বটেই, তার মনচিত্রের দিকে তাকালেও বাঙালীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষায়িষ্ণুতা ও অবনতি চোখে পড়ে।

অখণ্ড বাংলা আজ কেবল দ্বিখণ্ডিতই হয়নি, বিবিধ ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। বহু রকমে ভেঙেছে, চিড় খেয়েছে, তুবড়ে গেছে। যাবেই। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে অপর কোন জাতি এত আঘাত, এত উপর্যুপরি গভীর আঘাত পেয়েছে বলে জানা নেই। ছেচল্লিশের আগস্ট থেকে সাতচল্লিশের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র এক বছরে—মাত্রই এক বছরে তিন তিনটি বড় রকমের আঘাত বাঙালী জীবনের উপকূলেই কেবল আছড়ে পড়েনি, তাকে ভেতরে বাইরে বিপর্যস্ত করেছে। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা তার এযাবৎকালের প্রচলিত বিশ্বাসকে আমূল নাড়া দিয়েছে।

মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা, আস্থা এবং নির্ভরতা নষ্ট হয়েছে। একগৃহস্থ পরিবারের ওপরে যে একসমাজস্থ পরিবার থাকে, এবং তারও ঊর্ধ্বে স্বদেশভূমির অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা, যাকে বলা যায় এক-দেশদর্শী স্বজনপ্রত্যয়—সেই পারস্পরিক একানাবর্তিতায় এবং একান্নবর্তিতায় ফাটল ধরতে শুরু করেছে। যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে, সম্পর্কের জোড় খুলে চালে-চুলোয় পৃথগন্ন হয়েছে, সমাজের অভিভাবকতা নড়বড়ে, অগ্রাহ্য এবং স্বদেশপ্রেমের আদর্শ ফিকে। কারণ ঠিক এর আগে আগেই জনজীবন ঘোলা করে রেখে যাওয়ার মতো দুটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ। আর্থিক এবং চারিত্রিক অসাম্যের সূচনা তখন থেকে। মনুষ্য-সৃষ্ট মন্বন্তর তাকে প্রথম বিবেকহীন, নির্দয়, কপটচারি, স্বার্থান্ধ করেছে। চরিত্রহীনতা ঘুণাক্ষরে হলেও তার স্বভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। নগর-মুখিনতা দুর্নীতিগ্রস্ত হবার পথ দেখিয়েছে। রাতারাতি কালোবাজারের ভেলকি আর ধনকৌলিন্য বাঙালীর মূল্যবোধকে নুইয়ে দিয়েছে।

অধঃপতনের ক্ষেত্রটি যখন এইভাবে প্রস্তুত, সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন স্তিমিত, দিল্লী দূরে অস্ত, বর্মা, আসামের সীমান্ত ছুঁয়ে স্বাধীনতার শেষ ফৌজ ফেরার, ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে এক বিকলাঙ্গ স্বাধীনতা এদেশের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। শতাব্দী যে-মুষল প্রসব করল সেকথা তখনো কেউ ভাল করে বুঝতে পারেনি।

তারপর দীর্ঘ চার দশক কেটে গেছে। নানা প্রাত্যহিক সমস্যায় রুদ্ধশ্বাস বাঙালীর এখন আর মরবারও সময় নেই। কিন্তু সে যে এখন দ্রুত গতিতে ডুবছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তার ঘরে একটা আলোর রেখাও অবশিষ্ট নেই। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে একক পরিবারে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন। সেই ছোট পরিবারও আর সুখে নেই। মা-বাবা যে-সন্তানের মুখ চেয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, যে-সন্তানের সমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে কৃপণের মতো, স্বার্থপরের মতো দিন যাপন করেছেন, সেই সন্তানও এখন মা-বাবার দিক থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। উত্তরোত্তর বড়ো হবার স্বার্থশিক্ষায়, অন্যকে ছলেবলে কৌশলে ডিঙিয়ে যাবার ঊর্ধ্বশ্বাস একচোখোমিতে তারা জীবনের এমন তালিম পেয়েছে যে, নিদারুণ হৃদয়হীন এক-একটি সফিস্টিকেটেড রোবটে পরিণত হয়েছে। কেউ দেশে, কেউ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এই বঙ্গ-সন্তানরা এখন কার ভবিষ্যৎ? দেশের না, দশেরও না, এমনকি মা-বাবারও না।

আগামী প্রজন্মের বাঙালী তাহলে কোন্ মাটিতে পা রেখে দাঁড়াবে? একটি জাতি কি এইভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? মানুষের জন্যে তার কি বিন্দু-প্রমাণ দায় এবং দরদও থাকবে না? এরই নাম কি জীবনের সাফল্য, সচ্ছলতা, সার্থকতা? কোন্ শিক্ষা—ইংরেজী বাঙলা মিডিয়ামের কোন্ শিক্ষা—এখান তাদের বাঁচাতে পারবে, যে-শিশুরা মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে? কোন্ আদর্শ তাদের বাঙালী হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার শক্তি যোগাবে? সুস্থ সবল চরিত্রবান করবে? হৃৎপিণ্ডের পাশাপাশি তার হৃদয়কেও বাঁচিয়ে রাখবে? উপদেশ, বক্তৃতা, লেখালিখি অনেক হয়েছে। বয়স্ক জীবনে আর কোন জীবনদায়ী ওষুধই এখন কাজ করবে

না। শৈশব থেকেই তাহলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে আমাদের। আর সে-শিক্ষা শুরু হবে ঘর থেকেই। ঘরের মানুষ সেকথা এবার ভাবতে থাকুন।

কিন্তু কোন্ ঘর থেকে তার শিক্ষা শুরু হবে, মা-বাবার কোন্ আচরণ থেকে তার বোধোদয় ঘটবে, শুরু হবে জীবনের প্রথমপাঠ? সে-ঘরে কেবল সচ্ছলতাই আছে, কিন্তু স্বজনতা নেই, বিলাসের উপকরণ এবং ইচ্ছাপূরণের অকৃপণতা আছে, কিন্তু বাকসংযম নেই, বাক্যে ও ব্যবহারে সঙ্গতি নেই, সততা নেই, সেখান থেকে এই অপাপবিদ্ধ শিশুরা কি শিখবে? তারা কি বেশিদিন অনাহত থাকবে? তাদের পাখির চোখ কতদিন স্বচ্ছ থাকবে? যাবতীয় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, মাথার ওপর কেবলই পাঠকেতাবের বোঝা চাপানোর রোখ চেপেছে, তাকে নিঃশ্বাসও ফেলার অবকাশ না দিয়ে বহুমুখী ছকের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, কিন্তু নিজের মতো করে তাকে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না, তখন বিকলাঙ্গই জন্মাবে।

যে শিশু তার চারপাশে দাদু-দিদিমাকে দেখল না, কাকা-জ্যাঠাকে চিনল না, এমনকি মা-বাবাকেও পেল না, স্নেহ কি বস্তু জানল না, তার পুষ্টি আসবে কোথা থেকে?

তাকে এখন থেকেই মানুষকে ভালবাসতে, মানুষের বেদনায় ব্যথিত হতে এবং পরের উপকার করতে শেখাতে হবে। সত্য

শিক্ষাব্যবস্থায় দূরদৃষ্টির অভাব দেখে ব্যথিত হতে হয়। মনে হয় শিক্ষাই এখন জাতীয় জীবনে সবচেয়ে অজরুরী ব্যাপার। স্কুলগুলিও চলেছে তেমনি ভাবে। আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, শিক্ষকদের সম্মান বেড়েছে. কিন্তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির দিকে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব, জীবনের শুভাশুভ নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। ক্লাসে পড়ানো হয় না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা এখন নিছকই হাজিরা-সর্বস্ব চাকরি। বিদ্যালয়ের বাড়ি ছুঁয়ে শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব কুটিরশিল্পে আগ্রহী।··· বিদ্যা এখন আর কেউ দান করেন না, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হস্তান্তরিত হয়। সব মিলিয়ে বাঙালীর এখন সমূহ দুর্দিন।

স্বাভাবিক প্রবণতা কি কেবলই ঘা খেতে খেতে অবিশ্বাসী, সন্দেহ-পরায়ণ, বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে না? কার বিরুদ্ধে তার অভিমান, আক্রোশ এবং ঘৃণা তা সে সঠিক করে জানবে না। ফলে গোটা সমাজের বিরুদ্ধেই, নীতি এবং ঐতিহ্যের প্রতিই সে বিমুখ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠবে। সে কেবলই ভাঙতে শিখবে, নিজেকে পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করতে চাইবে, গড়তে শিখবে না। অসাধু, অশিষ্ট এবং কপটচারির মুখে নীতিবাক্য, উপদেশ আর বড় হবার তাগিদবাক্য শুনতে শুনতে এরকম প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য এবং অসম্ভব নয়।

শিশুকে চিরন্তন বস্তুবাদী, সপ্রতিভ এবং নগদ-মূল্যে বাজারচালু করতে গিয়ে যখন তাকে প্রকৃতি-জগৎ থেকে, খেলাধুলোর জগৎ থেকে, কল্পনার কথা বলতে শেখাতে হবে। এবং সেই শিক্ষা নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে দিতে হবে, মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে এবং বোধে আনতে হবে। জাতিগঠন করতে হবে বললেই তো আর হবে না। প্রতিটি ঘরে এই চরিত্র মন্ত্রো করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। কারণ দেশে এখন কোন নেতা নেই, জাতির কাণ্ডারী নেই। এই ভারতক্ষেত্রে যাদের প্রহরী বলে মনে হচ্ছে এখন, কাছে গেলে দেখা যাবে তারা সকলেই কাকতাড়ুয়া, হাওয়াই মোরগের মতো দিক বদল করতে সময় নেয় না। এবেলার কথার সঙ্গে যাদের ওবেলার কথার সঙ্গতি থাকে না, স্বার্থের জন্যে যাদের শঠতার সীমা-পরিসীমা থাকে না, তাদের কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই।

প্রবন্ধ

হাওড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু পুরনো কলকাতার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধশালী গঙ্গার অপর তীরের 'হাওড়া' নামক জনপদটির কথা প্রায় অনুচ্চারিতই রয়ে যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রচনাটির প্রকাশ।

হাওড়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতক) তাম্রশাসনে 'বেতড্ড চতুরকের' অর্থাৎ বেতড় অঞ্চলের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের 'মনসা-মঙ্গল' (১৪৯৫) কাব্যে চাঁদ সওদাগরের 'বাণিজ্য যাত্রা'-র বর্ণনায় বেতড় বন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।

ডাহিনে কোতরঙ বাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥

শতকের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তাই দেখা যায়—

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতড় চণ্ডীপূজা কৈল সাবধানে।

কলকাতাকে সেসময় সকলে এড়িয়ে চলত, তার কারণ তখনকার কলকাতা ছিল বনবাদাড়, জলাজমি ও শ্বাপদসঙ্কুল। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলে ছিল সমৃদ্ধ গ্রামসমূহ এবং বেতড়ের মতো প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর-জনপদ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হবার পর পর্তুগীজরা এদেশে সকলের আগে এসেছিল। এই পর্তুগীজদের প্রথম ঘাঁটি ছিল বেতড়। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিশিয়ান নাবিক সিজার ফ্রেডারিক (Ceasar Frederic) এই অঞ্চলে এসে-ছিলেন। তার লিখিত বিবরণে জানা যায় বেতড়ের কাছে সরস্বতী ও দামোদরের জলধারা গঙ্গায় পড়ে যে বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে পর্তুগীজদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি নদীপথে আর না এগিয়ে সেখানেই নোঙর করত, কেবলমাত্র ছোট ছোট জলযানগুলি সোজাসুজি সপ্তগ্রামে চলে যেত। ফ্রেডারিক সাহেবের মতে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর। জানা গেছে যে, শেঠ-বসাকরা সুতানুটি ও কলকাতায় বসবাসের আগেই বেতড়-সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে গঙ্গা পার হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। পর্তুগীজরা পরে সালকিয়াতেও একটি ঘাঁটি তৈরি করেছিল।

প্রাচীন কাব্যে 'বেতড়', 'শালিখা' ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ থাকলেও 'হাওড়া'র কোন উল্লেখ নেই। ষোড়শ

হুসেন শাহের, মতান্তরে আকবরের, আমলে বাংলার বার ভুইঞার অন্যতম যশোহরের প্রতাপাদিত্য (ষোড়শ শতক) শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছাকাছি কোন একটি জায়গায় একটি মাটির দুর্গ তৈরি করান, তা পরে 'থানা মাকুয়া' নামে পরিচিত হয়। গঙ্গার তীরে এই অঞ্চলটি এখনও থানা মাকুয়া নামে পরিচিত। ১৫৮৯-এ মানসিংহ ষষ্ঠ মোগল সুবেদার হিসাবে বাংলায় আসেন। এই সময় হুগলির ফৌজদারের অধীনে থানাদুর্গের থানাদার নিযুক্ত করা হয় এবং পরে থানাদুর্গের সংস্কার করে গঙ্গার পূর্বদিকে আর একটি মাটির দুর্গ তৈরি হয়—যা মেটিয়াবুরুজ নামে বর্তমানে পরিচিত। ১৭৫০-এ মারাঠারা থানাদুর্গ অধিকার করলে নবাব আলীবর্দী ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মারাঠারা পালিয়ে যাবার কিছুদিন পরে ক্লাইভ থানাদুর্গ অধিকার করে ধ্বংস করে দেন। এই ঘটনা-টিকে পরবর্তী পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে অনেকে মনে করেন। হাওড়ার বুকেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

ইংরেজদের দুর্গ অধিকার সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ২১৫) লিখেছেন ঃ

"ইংরেজেরা ১৩ জুন প্রাতে দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও দুইখানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই দুর্গ আক্রমণ করেন। অকস্মাৎ অগ্নিবৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্যে অনভ্যস্ত সিপাহী সৈন্য হুগলি অভিমুখে পলায়নপর হইল। ইংরেজগণ কামানের কতকগুলিকে অকর্মণ্য, কতকগুলিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পরদিন হুগলির ফৌজদার ২০০০ সিপাহী পাঠাইয়া ইংরেজদের তাড়াইয়া দেন। তৃতীয় দিন ৩০জন ইংরেজ ফৌজ জাহাজ হইতে গোলাগুলি ছুঁড়িয়াও আর তাহা-দিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। অতঃপর ইংরেজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাবসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দিয়া প্রত্যাবর্তন বা পারাপার হইতে সহজে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা থানার এই দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা করেন।"

সিরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় থানাদুর্গে ২০০ জন সিপাহী ছিল। এডমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা উদ্ধারে আসছেন খবর পেয়ে হুগলির ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানাদুর্গ মেরামত ও মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার ঠিক করলেন থানাদুর্গ ও মেটিয়াবুরুজের মধ্যের গঙ্গা ইট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়াই হবে উপযুক্ত কাজ। এই উদ্দেশ্যে দুজাহাজ ইট দিয়ে বোঝাই করাও শুরু হয়। কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইভ থানাদুর্গ অধিকার ও ধ্বংস করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মচারী উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন ঃ **"Tanna fort taken by Job Charnock and destroyed by Clive and Watson on the 1st January, 1757" (Hedges' Diary, Vol. III, p. CCXV)।**

অতএব ক্লাইভ কর্তৃক থানাদুর্গ অধিকারকেই পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে ধরা যায়।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাবের কর্মচারীদের সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। হুগলিতে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজরা প্রথমে সুতানুটি পরে আরো দক্ষিণে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে এসে আশ্রয় নেয়। সালকিয়ার নুনের গোলা ধ্বংস করে থানাদুর্গ থেকে নবাব-সৈন্যদের বিতাড়িত করে কোম্পানি উলুবেড়িয়াতে ঘাঁটি করতে চাইলেন স্থায়িভাবে বাণিজ্যের জন্য। পরে স্থানীয় জনসাধারণের বাধা দানে কোম্পানির নির্দেশে উলুবেড়িয়া পরিত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে সুতানুটিতে চলে আসেন জব চার্নক। সেটি হচ্ছে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

হাওড়া যে কলকাতা হতে পারত—গঙ্গার পশ্চিম কূলেই উলুবেড়িয়ায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী গড়ে উঠত—সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এটিই ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। স্থানীয় কিছু ব্যক্তির বাধাদানে সেদিন যা ঘটেছিল তাও কিন্তু বিশেষভাবে ইতিহাসের গুরুত্ব পাবার অধিকারী। তা হচ্ছে হাওড়ার মানুষের স্বাধিকারবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা।

কেউ কেউ মনে করেন উলুবেড়িয়ার অনেক উত্তরে খাস হাওড়া-শিবপুরেই জব চার্নক কুঠি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শিবপুর কাহিনী' গ্রন্থে (পৃঃ ৫১) লিখেছেন ঃ "ভারতে ইংরেজ রাজধানীর বীজবপনের পূর্বে চার্নক সাহেব গঙ্গার পশ্চিমকূলে হাওড়া-শিবপুরের দিকে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের সংকল্প করিয়া-ছিলেন।" অন্নদাপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে গোল্ডউইনের 'বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন কেন জব চার্নকের ঐ সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি ঃ **'The natives repaired to Murshidabad [i.e., to the Nawab] to complain and orders came to prohibit finishing the factory. On this Charnock setting fire to all the houses on this side of the river (Howrah) embarked in a ship."** অভিযোগটি ঠিক কি ছিল ? গোল্ডউইন লিখেছেন—ইংরেজরা নদীর তীরে কুঠি স্থাপন করলে গঙ্গায় স্নানার্থিনী দেশীয় মহিলাদের আব্রু নষ্ট হবে।

'হাবড়' শব্দের অর্থ জলা জমি বা কর্দমাক্ত স্থান। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও 'হাওড়া' শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'হাওড়া' শব্দের অর্থ 'জলা জায়গা'। 'ড়া'-শব্দটি হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষার চিহ্ন। ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

মতে বাঙলা শব্দের 'ড়া'-প্রত্যয়টি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর 'ওড়ীক' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বাড়ি। 'জলা জায়গায় বাড়ি' অর্থে হাওড়াকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন 'হাওড়' শব্দটি ওড়িয়া। হাওড়া একসময় পরাক্রান্ত ওড়িয়া রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়েছিল এবং তার প্রভাব 'হাওড়া' নামের পিছনে থাকা অসম্ভব নয় বলে এঁদের অভিমত। ওড়িয়া 'হাওড়' শব্দের অর্থ ডোবা।

হাওড়া শহরের একাংশ এক সময়ে দলিল-পত্রে 'বোরো পরগণা' বলে উল্লিখিত হতো। 'বোরো' শব্দের অর্থ জলমগ্ন জায়গা। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেও কেবলমাত্র হাওড়া শহরের অন্তর্গত সাড়ে আট মাইল এলাকায় খানা-ডোবার সংখ্যাই ছিল ১৮০০টি।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'হাড়িয়াড়া' শব্দটি অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে 'হাওড়া'-য় রূপান্তরিত হয়েছে। 'আড়া' শব্দটি তাঁদের মতে কোল ভাষা থেকে উৎপন্ন যার অর্থ 'বাঁধের পাড়'—হাড়িদের বাঁধের পাড়। যাই হোক, আঠার শতকের প্রথম দিকে কোম্পানির কাগজপত্রে হাওড়ার নাম ছিল হারিড়া এবং একশ বছর আগে দেশীয় ব্যবহারে ছিল হাবড়া।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বার্ষিক খাজনা ১৪৫০ টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহী ফরমান পেলেও গঙ্গার পশ্চিম কূলে পাঁচটি গ্রামের জমিদাররা ইংরেজদের অধিকার অস্বীকার করেছিলেন প্রায় তেতাল্লিশ বছর (১৭১৭-১৭৬০)। মীরকাশিমের সময় এই অঞ্চলকে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় থেকেই অনুমান করা যায় যে, 'হারিড়া' বা 'হাড়িআড়া' বা 'হাবড়া' বিদেশীদের উচ্চারণে ক্রমে স্থায়িভাবে 'হাওড়া'য় পরিণত হয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। রেলের টিকিটে সেসময় ছাপা হয়েছিল Howrah—হাওড়া।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের প্রপৌত্র সম্রাট ফারুক-শিয়ার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গঙ্গার পূর্বতীরে তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে গঙ্গার পশ্চিমকূলে যে-পাঁচটি গ্রামেরও ফরমান দিয়েছিলেন, তাতে হাওড়ার আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের 'Consultation Book'-এ গঙ্গার পশ্চিম-কূলের পাঁচটি গ্রামের নাম এইরূপ বানানে লিপিবদ্ধ আছে—Salica (সালকিয়া), Harrirah (হাওড়া)· Cassundeah (কাসুন্দিয়া), Ramkrishnapur (রামকৃষ্ণপুর) এবং Battor (বেতড়)। অধুনা শিবপুর অঞ্চল তখন বেতড় নামেই পরিচিত ছিল।

বার্ষিক ১৪৫০ টাকা খাজনার বিনিময়ে ফরমান পাওয়া গেলেও গঙ্গার পশ্চিমকূলের পাঁচখানি গ্রামের জমিদাররা রাজা শুকদেব রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে সেদিন ইংরেজদের এই পাঁচটি গ্রামের অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা এই বাদশাহী ফরমানকে এবং ইংরেজদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেননি। ইংরেজদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি দেশের স্বাধিকার রক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয়। বেশ কিছু দিন পরে ১৭৬০-এ মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে আসার পর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। তখন হাওড়াকে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করে তার স্বাধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। এইভাবে হাওড়ার অঞ্চলগুলিকে বারবার বিভিন্ন জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, কোন স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হয়নি অনেক দিন পর্যন্ত। প্রথমে হাওড়া ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। মীরকাশিমের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিঃ এস. ডেভিস-এর ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেন এই জেলার। তারপর লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বর্ধমানকে ভেঙে নতুন জেলা হুগলির সৃষ্টি হয়। জানা যায়, এক সময় হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান থানা ছিল হুগলির মধ্যে আর হাওড়া সদর ছিল চব্বিশ পরগনার সঙ্গে। ১৮২২-এর ১ মে বর্ধমান থেকে হাওড়া ও হুগলির কালেকটরি আলাদা হয়ে যায়। ১৮৪৩-এ হাওড়াকে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। পরের বছর হাওড়ার জন্য একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। তার আগে হাওড়া যথাক্রমে চব্বিশ পরগনা এবং হুগলির জজের অধীনে ছিল।

১৯০৯-এ হাওড়ার প্রথম গেজেটিয়ার লেখা হলেও হুগলি থেকে হাওড়ার দেওয়ানী বিচার ও রাজস্ব

বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯২০-এ হাওড়ার রাজস্ব বিভাগ হুগলি থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর পর থেকে হুগলির সঙ্গে হাওড়ার প্রশাসনিক কোন সম্পর্ক থাকল না।

হাওড়ার ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসাবে বলা যায় যে, ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে ঘাঁটি করে। এরই পঁচিশ বছর পরে বেতড় অর্থাৎ বর্তমান শিবপুর অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরি হয়। প্রাচীন বেতড়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বেতাইচণ্ডী বা বেত্রচণ্ডীর মন্দির (সতের শতক)। প্রাচীন বেতড় কেবল প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর রূপেই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ধর্মস্থান হিসাবেও। পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের রাজত্বের শেষভাগে বেতড় বন্দরের সন্নিহিত গঙ্গা, দামোদর, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠেছিল শাক্ত উপাসনার নানা পীঠস্থান। একটি প্রাচীন ছড়ায় পাওয়া যায়, "কালীঘাটে কালীবন, বেতড়ে বেতাই।" বর্তমান শিবপুরের ধর্মতলার মোড়ে ধর্ম-মন্দির প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন, শিবপুর বাজারে শিবমন্দিরও প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন। এই শিব-মন্দিরের জন্যই শিবপুর নাম। এছাড়া আছে প্রায় তিনশ বছরের পুরনো ব্রহ্মময়ী মন্দির। হাওড়ার এই অঞ্চলটি এককালে এমন একটি ধর্মের কেন্দ্রভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার জন্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে-এ বলেছিলেন যে, মক্কা যাত্রীদের যেমন বিশ্রামস্থল ছিল জেড্ডা বন্দর, ঠিক তেমনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য যাত্রার নাবিকরা বেতড় বন্দরে বেতাই চণ্ডীকে প্রণাম জানিয়ে যেত।

পরবর্তী কালে স্থাপিত শিবপুরের হাজার হাত কালীর মন্দির ও সাঁতরাগাছির রামরাজার মন্দির বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছে। শিবপুরের রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের ভদ্রাসনে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদসহ এসেছেন; স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত প্রণাম-মন্ত্র 'স্থাপকায়চ ধর্মস্য ...' তিনি নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সময় রচনা করেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে কিছু দূরে ঘুষুড়ি কালীতলার অদূরে অবস্থিত ভোটবাগানের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন পুরাণগিরি (১৭৪৩-১৭৯৫) নামে শৈবসম্প্রদায়-ভুক্ত এক সন্ন্যাসী যিনি কয়েকবার বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়ে শ্রীলঙ্কা, মালয়, কাবুল, খোরাসান, মস্কো, ইস্পাহান, বসরা ও মস্কট হয়ে সুরাটে আসেন। পরে তিনি নেপাল ও মানস সরোবর পার হয়ে তিব্বতে যান। দলাইলামা তখন নাবালক থাকায় তাশীলামা ছিলেন তিব্বতের সর্বময় কর্তা। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে ভুটান রাজ্যের বিরোধ বাধলে তাশীলামা পুরাণগিরি মারফৎ হেস্টিংস-এর কাছে পত্র পাঠান। পরে হেস্টিংসও পুরাণগিরিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হিসাবে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে লাসায় পাঠান। তাঁর মাধ্যমেই কোম্পানির সঙ্গে তিব্বতের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পুরাণগিরি তাশীলামার সঙ্গে পিকিং যান এবং একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাশীলামার অনুরোধে পুরাণগিরি একটি মঠ বা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। হেস্টিংস হাওড়ার ঘুষুড়িতে একশ এবং পঞ্চাশ বিঘা দুই খণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দেন। এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভোট-বাগান যা পরবর্তী যুগে তিব্বতী ও চীনা বণিক, বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলনক্ষেত্ররূপে পরিচিত হয়। পাঞ্চেনলামাও এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার জন্য অর্থসাহায্য করেন। বর্তমানে এটি শিবমন্দির রূপে পরিচিত। বলা চলে হাওড়ার বুকেই তখন গড়ে উঠেছিল আধুনিক অর্থে প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন, অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলনকেন্দ্র। আর পুরাণগিরি সেই অর্থে আধুনিক ভারতের একজন ভূপর্যটক, রাষ্ট্রদূত, ধর্মসংহতি স্থাপনের প্রবর্তক। হাওড়ার বুকেই এই অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে। এরই একশ বছর পরে স্থাপিত হয়েছিল হাওড়া জেলার বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়—যা পরবর্তী যুগে বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাতিলাভ করেছে।

হাওড়ায় সংস্কৃত ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল অনেকদিন আগে। শ্রীধর আচার্য, ভরত মল্লিক এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র হাওড়ায়

থাকতেন। সালকিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণকে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস তাঁর সংস্কৃত শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের (জন্মস্থান হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্তী পেঁড়ো গ্রাম) মৃত্যুর পর থেকে বাঙলা-সাহিত্যে আধুনিক যুগ আসার আগে যে কবিয়ালের যুগ শুরু হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সালকিয়ার রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)। বাঁ্যাটরার ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত কবি আবদুল রহিম থাকতেন সালকিয়াতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকার হরিশচন্দ্র মিত্র (১৭৮৬-১৮২৩) সালকিয়াতে থাকতেন। আধুনিক যুগের বহু ঔপন্যাসিক, কবি ও সাহিত্যিক কর্ম এবং বসবাসের সূত্রে হাওড়ায় থেকে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং জীবনানন্দ দাশ শিক্ষকতা সূত্রে হাওড়ায় ছিলেন। উনিশ শতকের মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবী শিবপুরে থাকতেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর—যাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে গত বছর (২.১০.৮৯)—পৈত্রিক নিবাস হাওড়ার রামরাজাতলায়।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু যুবকদের জন্য হাওড়ায় যে বোর্ডিং স্কুলটি খোলা হয়েছিল সেটি হাওড়ার প্রথম ইংলিশ স্কুল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা শিবপুর থেকে বিস্তৃত এলাকায় ছটি স্কুল স্থাপিত করেছিলেন। হাওড়া ময়দানের কাছে ১৮৪৫-এ প্রতিষ্ঠিত হাওড়া গভর্নমেন্ট স্কুল পরে জেলা স্কুলরূপে পরিচিত হয়েছিল। এই স্কুলে প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

হাওড়ায় আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পত্তন হয় জাহাজ নির্মাণশিল্পকে কেন্দ্র করে। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে জব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা হাওড়ায় যে ডক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি ভারতবর্ষের প্রথম ডক স্থাপনের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৭৯৬-এ সালকিয়াতে মিঃ বেকন একটি জাহাজ নির্মাণের ডক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০-তে গোলাবাড়ি এলাকায় ম্যাকেঞ্জি ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮-এ 'ফরবেস' নামে হাওড়ায় প্রথম বাষ্পীয় পোতটি নির্মিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সালকিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত আটটি বড় জাহাজ নির্মাণের ডক ছিল। হুগলি ডকের বাঙালী প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ বসু মল্লিক ১৮৩৮-এ জলপথে মাল পরিবহনের ব্যবসা শুরু করেন। রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরেও ডক ছিল।

হাওড়ার শিল্পপ্রয়াসও বেশ পুরনো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকর তাঁর টেগোর কোম্পানির পত্তনের সময়েই ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কিশোরীলাল মুখার্জী শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস স্থাপন করেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে শিবপুরের ভড়পাড়ায় হেনরী উইলিয়াম একটি কারখানা স্থাপন করেন। পরে আন্দুল রোডে স্থানান্তরিত হয়ে সেটির নতুন নাম হয় গেস্ট-কীন উইলিয়াম। রেলগাড়ি নির্মাণশিল্পে হাওড়া ছিল অগ্রণী। ১৮৫৪-তে হাওড়া স্টেশন প্রতিষ্ঠার পর ১৮৮৩-তে শালিমার রেল টার্মিনাস, ১৯১৪-তে রেল কারখানা, ১৯২০-তে ব্রিজ অ্যান্ড রুফ তৈরি হয়। ১৮৬০-এ সালকিয়া শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চটকল স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হাওড়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে জুট মিলের পর পর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

হাওড়ার শিল্প-প্রচেষ্টা যে কত ঐতিহ্যপূর্ণ তা জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার ইম্পিরিয়াল গেজেটে। সেই যুগের ৫৬টি কারখানার মধ্যে কাপড় কল ৩টি, চটকল ৯টি, পাট-বাঁধাই কল ৭টি, কাগজ কল ২টি, ময়দা কল ৩টি, রেলের ওয়াগন ও সাজসরঞ্জাম এবং ওয়াগন ও মেরামতির কারখানা ৪টি, লবণ তৈরির কারখানা ২টি, ছাপাখানা ১টি এবং আরও বিভিন্ন ধরনের কারখানা ছিল হাওড়াতেই। মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ৫১,০০০। এছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য হাওড়াকে এককালে 'ভারতের শেফিল্ড' নামে অভিহিত করা হতো।

পরিক্রমা

ধর্মের সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয়ায়

স্বামী ভাস্করানন্দ

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমি রাশিয়া ভ্রমণে যাই। তখন রাশিয়ার প্রধান দুটি শহর মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ ও বিশেষতঃ ককেসাস অঞ্চলের বেশ কিছু শহর ও গ্রামাঞ্চল দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। ককেসাসে ভ্রমণ আমাকে প্রধাণতঃ ট্যুরিস্ট বাসের সাহায্যে করতে হয়। বাসে যেতে যেতে সোভিয়েত রাশিয়াতে জনৈক ইংরেজ সহযাত্রীর সঙ্গে আমার মোটামুটি নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়েছিল।

সহযাত্রী: "আপনি তো ধর্মযাজক, এই ধর্ম-বর্জিত দেশে বেড়াতে এলেন কেন?"

আমি: "এদেশে আমি এসেছি ধর্মের সন্ধানে।"

সহযাত্রী (অবিশ্বাসের স্বরে): "তাই নাকি?"

আমি: "দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে আমি খুলেই বলি। বছর কুড়ি আগে আমি সোভিয়েত সরকারের প্রকাশিত একটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম—Religion in the U. S. S. R.; লেখক—A. Puzin। তাতে বলা হয়েছিল যে, ধর্মের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের অনুসৃত নীতি হচ্ছে: নাস্তিকতা প্রচার। উপযুক্ত প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রমে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিটি মানুষকে ধর্মবিশ্বাস-বিহীন করাই হচ্ছে সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য।

"কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে, অর্থাৎ 'জার'-দের শাসনকালে, রাশিয়া ছিল অতি ধর্মসচেতন দেশ। সে-আমলে রাশিয়ায় বেশ কয়েকজন খ্রীস্টান সন্তেরও জন্ম দিয়েছে। রাশিয়ার ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ তখন রাশিয়ার বহু সহস্র গির্জা, মসজিদ ও সিনাগগে উপাসনা করেছেন; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে হৃদয়ে শান্তি পেয়েছেন। এ ধর্মবিশ্বাস কি আইন বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর করা যায়? এবিষয়ে জার্মান সমাজতন্ত্রবিদ এঙ্গেলস বলেন যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে ধর্ম-বিশ্বাস দূর করার চেষ্টা করলে সে-ধর্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ই করা হয়।

"বছর কয়েক আগে আমেরিকার একটি সংবাদ-পত্রে মস্কো থেকে সংগৃহীত একটি সংবাদ পড়েছিলাম। সংবাদটিতে বলা হয়েছিল যে, দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার ফলে এতদিনে রাশিয়ার যুব-সমাজকে বা নতুন প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিশ্বাসবিহীন করা সম্ভব হয়েছে। যদি এ সংবাদটি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন উঠছে: 'কি করে তা সম্ভব হলো? এবং এই ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে এঁরা কি পেয়েছেন?' উত্তরে আপনি বলতে পারেন: 'পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই তো ধর্মকে ঠিক ঠিক মানেন না! তাঁদের অধিকাংশই ধর্মকে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেননি; তাঁরা তাঁদের ধর্ম পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন মাত্র। এভাবে প্রাপ্ত ধর্মের উপযুক্ত মর্যাদা তাঁরা সচরাচর দেন না অথবা দিতে পারেন না। ধর্মের শিক্ষা তাঁদের অধিকাংশের জীবনে আদৌ প্রতিফলিত হয় না। এঁদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল এবং একান্ত অগভীর। এই শিথিল ধর্মবিশ্বাস দূর করা এমন কঠিন হবে কেন? তাছাড়া এই উপযোগিতাভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিক যুগে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু? এ ধর্ম গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি?'

"এর উত্তরে আমি বলব যে, শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয় সমাজজীবনেও ধর্মের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। ধর্ম কতগুলি নির্দেশিত আচার-ব্যবহার বা আচরণবিধির মাধ্যমে তার নিজস্ব সমাজ সৃষ্টি করে। এই ধর্মকেন্দ্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ সে-সমাজের অপর মানুষের প্রতি নৈকট্যবোধ অনুভব করেন। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতা দেখা যায়, এক ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যেও তেমন অন্তরঙ্গতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা নৈকট্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।

"ব্যক্তিজীবনে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু তা নির্ণয় করার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া যাক। শুধু সুদূর অতীতেই নয়, বর্তমান যুগের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, শুধু সত্যিকারের ধার্মিকেরাই নন, ধর্মে শিথিল-বিশ্বাসী মানুষেরাও প্রায়ই স্ব স্ব ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন এবং কঠোর

ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন না। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের পার্টিশানের কথাই ধরা যাক। সে ঐতিহাসিক দেশ-বিভাগের পর হিন্দু ও ইসলাম এই দুটি ধর্মের বহু ধনী এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, যাঁরা সমাজে একদা ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ও বহু পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে শরণার্থী হয়ে রিক্ত হস্তে হয় ভারত, নয় পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ব্যক্তিজীবনে ধর্মের শিক্ষা বা অনুশাসন তেমন মেনে চলেননি; তৎসত্ত্বেও এঁরা ধর্মের জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার ও দুঃখকষ্ট বরণ করলেন কেন?

"ধরে নেওয়া যাক, এঁরা যদি তখন স্বেচ্ছায় অপর ধর্মে ধর্মান্তরিত হতেন তাহলে খুব সম্ভবতঃ এঁদের বিষয়সম্পত্তি খোয়াতে হতো না, সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত; এবং তাঁদের এই কঠোর ত্যাগস্বীকার করতে হতো না! কিন্তু তাঁরা তা করেননি। স্ব স্ব ধর্মের কোনও উপযোগিতা তাঁদের ব্যক্তিজীবনে যদি তাঁরা অনুভব না করতেন তাহলে ধর্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এঁরা কপর্দকহীন শরণার্থীর জীবন বরণ করতেন না। এ বিনিময়ধর্মী জগতে এঁরা যদি নিজ ধর্মের কাছ থেকে মহামূল্য কিছু না পেতেন তাহলে ধর্মের জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার এঁরা করতেন কিনা সন্দেহ!

"এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে: 'ধর্ম এঁদের কি দিয়েছে যা এঁরা অন্যত্র পাননি? ধর্মের মাধ্যমে এঁরা কি পেয়েছেন যা এত মূল্যবান?'

"এ-প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সকল মানুষই মুখ্যতঃ চান নিরাপত্তা; নিছক ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা নয়—চিরস্থায়ী নিরাপত্তা। তাঁরা চান জীবন, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মান-সম্মান, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, জীবিকা ও ধনসম্পত্তির ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিরাপত্তা। তদুপরি তাঁরা চান ন্যায়বিচার, যদি না সে-ন্যায়বিচার তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিকূল হয়।

"কিন্তু মানবসমাজ অথবা কোন রাষ্ট্র যতই উন্নত হোক না কেন বড়জোর দিতে পারে খাদ্য, জীবিকা, আবাস, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে আংশিক নিরাপত্তাবোধ। জীবন, ধনসম্পত্তি, স্বাস্থ্য, মানসম্মান ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্যিকারের কোন চিরস্থায়ী নিরাপত্তাবোধ কেউ দিতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের কোর্ট বা আদালত সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে পারে না। কিছু নিরপরাধীকেও শাস্তি পেতে হয় এবং বহু অপরাধীর শাস্তি হয় না।

"পক্ষান্তরে অধিকাংশ ধর্মই শিক্ষা দেয়—সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরসদৃশ মহাপুরুষদের কৃপায় মানব-জীবনের সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। ধর্ম আশ্বাস দেয় যে, মৃত্যুর পর স্থূলদেহ বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্মাকারে মানুষের সত্তা অব্যাহত থাকবে। এই পার্থিব আপাত ক্ষণস্থায়ী জীবন চিরস্থায়ী মহাজীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কোন কোন ধর্ম সর্বপ্রকার দুঃখ ও যাতনার আত্যন্তিক নিবৃত্তির আশ্বাস দেয়!

"ধর্ম আরও বলে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন চরম বিচারকর্তা। তাঁর অমোঘ ন্যায়দণ্ডের হাত থেকে দুষ্কৃতকারীর নিস্তার নেই। ধর্মাচারীদের এ পৃথিবীতে কখনো কখনো কষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়; অধর্মাচারীরা প্রায়ই করেন সুখভোগ। কিন্তু ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন; যাঁরা অধার্মিক তাঁরা করবেন কষ্টভোগ। এধরনের বহু আশ্বাসের মাধ্যমে ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে এক বিশেষ ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয়। মানুষের মনোজগতে এই নিরাপত্তাবোধের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এধরনের নিরাপত্তা-বোধ নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও মানবমনের স্থৈর্য বা ভারসাম্য সহজে নষ্ট হতে দেয় না।

"ধর্মকে বা ধর্মবিশ্বাসকে যদি সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের মন থেকে সত্যি সত্যিই উৎখাত করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে ধর্মকেন্দ্রিক সে-নিরাপত্তাবোধও নিশ্চয়ই তাঁদের মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সে-শূন্যস্থান পূর্ণ হচ্ছে কি দিয়ে? তাছাড়া ধর্মবর্জিত সমাজসৃষ্টির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সোভিয়েত রাশিয়াতে গত আট দশক ধরে চলছে তার সফলতা কতদূর হয়েছে, তার শুভ বা অশুভ ফলই বা কী, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই আমি এদেশে বেড়াতে এসেছি।"

আমার এই নাতিহ্রস্ব বক্তব্য শোনার পর আমার ইংরেজ সহযাত্রীটি বললেন : "আপনার কথাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।" এই বলে দু-একবার হাই তুলে এবং চোখ বন্ধ করে তিনি একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিপ্লবের পরবর্তী ৭৩ বছরের মধ্যে প্রথম ৪৭ বছর সোভিয়েত রাশিয়াতে ধর্মকে কমবেশি উৎপীড়ণের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এর পরের ২১ বছরকে ধর্মের ক্ষেত্রে 'উপেক্ষার যুগ' বলা যায়। বাকি পাঁচ বছরকে আমি বলব 'সহনশীলতার যুগ'।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দব্যাপী লেনিনের আমলে চার্চকে সরকার থেকে পৃথক করা হয়। কিন্তু সমস্ত চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের ক্ষমতাধীনে আনা হয়। সমস্ত ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও জমিজমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। লেনিন কোন গির্জা বা উপাসনালয় বন্ধ করেননি, ধর্মযাজকদের ওপর কোন অত্যাচার করেননি ; কিন্তু তাঁর আমলে রাশিয়াতে যে অন্তর্বিপ্লব হয়েছিল তার ফলে সৈন্য ও দুর্বৃত্তদের হাতে বেশ কিছু ধর্মযাজক মারা যান।

এরপর এল স্ট্যালিনের যুগ। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৯ বছর স্ট্যালিন ক্ষমতাসীন ছিলেন। স্ট্যালিনের যুগকে সন্ত্রাসের যুগ বলা যায়। সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়া 'পুলিস স্টেটে' পরিণত হয়। রাশিয়ানরা এযুগকে বলেন 'personality cult-এর যুগ।' এ যুগে সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে আনা হয়। বহির্জগৎ থেকে—সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে—তা জানা এ আমলে প্রায় অসম্ভব ছিল। ইদানীং স্ট্যালিনের যুগের রাশিয়ার অনেক অপ্রিয় ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাচ্ছে।

অনুমান যে, স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত রাশিয়ার অর্ধেকেরও বেশি গির্জা, মসজিদ ও সিনাগগ হয় বন্ধ নয় ধ্বংস করা হয়েছিল। একমাত্র মস্কো শহরেই শ-খানেক উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। মস্কোতে আট-দশটি মাত্র গির্জা স্ট্যালিনের আমলে খোলা ছিল।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার হলেন। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও স্ট্যালিনের আমলের সন্ত্রাস-নীতি বহুলাংশে দূর করার জন্য রাশিয়া বর্তমানে তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের চেয়ে খুব বেশি সহনশীল ছিলেন না। তাঁর আমলে বহু গির্জা ও উপাসনালয়কে সরকারি গুদামে পরিবর্তিত করা হয়। কিছু গির্জা, মসজিদ প্রভৃতিকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। অবহেলা ও মেরামতের অভাবে বহু গির্জা ও উপাসনাগৃহ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, নতুবা ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হয়। ক্রুশ্চেভের আমলে পাঁচ-ছ হাজার চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক গির্জা ও উপসনালয়কে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রুশ্চেভের পদচ্যুতির কিছু পূর্বে তিনি মস্কোর বিখ্যাত 'রেড স্কোয়ারের' অনতিদূরে তিনটি ছোট অথচ অতি সুন্দর গির্জাকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ফলে তাঁর আদেশ কাজে পরিণত হয়নি।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রুশ্চেভের পরে এলেন ব্রেজনেভ। ব্রেজনেভের যুগকে রাশিয়ানরা বলেন 'নিষ্ক্রিয়তার যুগ' (the period of stagnation)। তাঁর আমলে রাশিয়ার সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও ভোগ্যপণ্যের বা দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস-পত্রের সরবরাহ অত্যন্ত কমে যায়। ব্রেজনেভের যুগ সরকারি মহলের দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রেজনেভই সর্বপ্রথম রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী, বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বপ্রধান গির্জা 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের' প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁর আমলে এক মুমূর্ষু খ্রীস্টানের অন্তিম প্রার্থনা সত্ত্বেও ধর্মযাজককে সেই মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কাছে যেতে অনুমতি না দেওয়ার জন্য জনৈক সরকারি আমলাকে জেলে দেওয়া হয়। এধরনের ঘটনা ব্রেজনেভের আমলের পূর্বে কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে কখনো ঘটেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াতে শিক্ষার খাতে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়েছে। রাশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যুক্তি, বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্ম এক ধরনের কুসংস্কার মাত্র।

॥ ৩ ॥

ককেসাস অঞ্চলে বেড়াবার সময় আমি ককেসাস পর্বতমালার পাদমূলে অরদ্‌জোনিকিদ্‌জে (Ordzhonikidze) শহরে গিয়েছিলাম। শহরটি 'উত্তর ওসেসিয়ান স্বশাসিত গণরাজ্যের' রাজধানী। শহরটিতে আমি একটি সুন্দর মসজিদ দেখেছি। মসজিদটিকে একটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সম্ভবতঃ স্ট্যালিন অথবা ক্রুশ্চেভের আমলে। মসজিদের ভিতরে উঁচু সিলিং থেকে বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ্যাবিদ্ ফুকোর (Foucault) পেন্ডুলামের মতো বিরাট একটি পেন্ডুলাম মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো রয়েছে দেখতে পেলাম। উদ্দেশ্য—জনসাধারণকে অবহিত করা যে, ইসলামধর্ম অথবা খ্রীস্টধর্ম বিজ্ঞানসম্মত নয়। এ দুটি ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী স্থির রয়েছে; সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। পেন্ডুলামটির ক্রমপরিবর্তনশীল গতিপথ দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, পৃথিবী আবর্তনশীল, স্থির নয়। সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমা করছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের দমননীতির ফলে বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম অবস্থায় যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের সবার মন থেকে ধর্মবিশ্বাস আইন বা শাস্তির ভয় দেখিয়েও দূর করা যায়নি। সেক্ষেত্রে এঙ্গেলসের কথাই সত্যি হয়েছে অনুমান করা যায়। রাশিয়ানদের মধ্যে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের ধর্মবিশ্বাস দমননীতির ফলে খুব সম্ভবতঃ আরও দৃঢ়ই হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে সোভিয়েত রাশিয়াতে যেকোন প্রকারের ধর্মপ্রচার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতাদের পক্ষেও প্রকাশ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না।

আমি গত বছর আগস্ট মাসে যখন সোভিয়েত রাশিয়াতে যাই তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান গোরবাচভ সেখানে 'গ্লাসনস্ত' ও ''পেরেস্ত্রৈকার' সূত্রপাত করেছেন। শাস্তির ভয়ে ভীত রাশিয়ার মূক জনতা তখন ক্রমে ক্রমে মুখর হতে আরম্ভ করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা উৎসাহের সঙ্গে গোরবাচভের এই নীতি-পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। ছাত্রসমাজ উল্লসিত। কিন্তু রাশিয়ার খেত-খামারের শ্রমিকরা সন্দিগ্ধচিত্ত; গোরবাচভের পূর্ববর্তী নেতাদের অনেকেই বহুবার তাঁদের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছিলেন। পেরেস্ত্রৈকার মাধ্যমে গোরবাচভ যে-ধরনের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজের সর্বস্তরে আনতে চাইছেন সে-পরিবর্তন কার্যকরী করতে হলে বহু পুরনো আইনকে রদ করতে হবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি গোরবাচভ দিতে চাইছেন তা কার্যকরী হতে হলে ধর্মপ্রচার-নিরোধক আইনটি সর্বপ্রথমে রদ করা দরকার। কিন্তু আমি যখন গতবছর আগস্ট মাসে সোভিয়েত রাশিয়াতে ছিলাম তখনো পর্যন্ত সে আইনটি সংস্কৃত বা রদ করা হয়নি।

রাশিয়ার নয়া প্রজন্ম এখন আর ধর্মবিশ্বাসী নয় বলে যে-দাবি করা হয়েছিল, আমার অভিজ্ঞতায় তা সাধারণভাবে সত্যি বলা চলে। এঁদের অধিকাংশই নিজ জীবনে ধর্মের আদৌ প্রয়োজনবোধ মনে করেন না। বিগত ষাট বা পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে জন্মেছেন তাঁরাই এখন রাশিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের অধিকাংশই নাস্তিক। এঁদের পূর্বে যাঁরা জন্মেছেন এবং বর্তমানে জীবিত রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই এখনো ধর্মে বিশ্বাসী। এঁরাই বিভিন্ন উপাসনালয়-গুলিতে যান। রাশিয়ার বর্তমান নেতা গোরবাচভের বয়স ষাট বছর। তিনি নাস্তিক; কিন্তু এঁর বৃদ্ধা মা ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি নিয়মিত গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন।

রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ইংরেজ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক মার্টিন ওয়াকার বলেন: "গোরবাচভ যদিও নাস্তিক তবু তিনি মনে করেন যে, 'চার্চ'কে এখন দেশের শত্রু ভাবাটা ঠিক হবে না। বিপ্লবের পর প্রায় আশি

বছর কেটে গেছে। ধর্মবিশ্বাসী হলেই যে রাশিয়ার কোন লোক রাষ্ট্রবিরোধী হবে এমন ভাবার এখন আর কারণ নেই।"

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেলে বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়াতে কারা ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবেন? সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা—যাঁরা ধর্মজীবন যাপনের প্রয়োজন আদৌ বোধ করেন না—তাঁরা কি হঠাৎ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবেন?

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সে-সম্ভাবনা বিশেষ নেই। রাশিয়াতে ভ্রমণকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, রাশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাস্তিক মানুষেরা তাঁদের মনোজগতে ধর্মের উচ্ছেদের ফলে যে-শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা কম্যুনিজমের ভাবাদর্শ দিয়ে পূর্ণ করেছেন। ধর্ম মানবমনে যে বিশেষ ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয় কম্যুনিজমের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নাস্তিক সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ, বিশেষতঃ সেখানকার যুবসমাজ, অনুরূপ নিরাপত্তাবোধ কম্যুনিজমের মাধ্যমে পাওয়ার আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করে এসেছেন। তাঁদের বলা হয়েছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টি মেহনতী মানুষের পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ। মেহনতী মানুষের কল্যাণই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য। কম্যুনিজমের মাধ্যমেই একমাত্র সমগ্র পৃথিবীতে শোষণবর্জিত ও ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব। আরও বলা হয়েছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো ভুল করতে পারে না।

কিন্তু আদর্শ যত উঁচুই হোক না কেন আদর্শ যদি কাজে পরিণত না করা যায়, তাহলে সে-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বেশি দিন বজায় রাখা চলে না। বিগত ৭৩ বৎসরব্যাপী কম্যুনিস্ট আমলে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ সরকারের রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে পার্টির মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন যে, পার্টি প্রায়ই ভুল করে; বিগত আট দশকেও সত্যিকারের ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ সোভিয়েত রাশিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। সমগ্র পৃথিবীর মেহনতী মানুষেরা এক সম্মিলিত বিরাট আদর্শ মানবসমাজ একদিন গঠন করবেন বলে যে-আশা রাশিয়ার মানুষের মনে সৃষ্টি করা হয়েছিল কার্য-ক্ষেত্রে তা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট মহাচীন ও কম্যুনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া একই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের অনুরাগী হয়েও শেষপর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেননি। ইউরোপ ও এশিয়ার ছোট বড় অনেক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ভাবা-দর্শকে ছাপিয়ে 'ন্যাশন্যালিজম'কে মাথা তুলতে দেখা গিয়েছে।

ভোগ-তারতম্য অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেও রয়েছে। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি চীনদেশে গিয়েছিলাম তখন জনৈক সুশিক্ষিত চীনা যুবকের সঙ্গে আমার একদিন কথা হচ্ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন। আমি তখন জানতে চাইলাম কেন তিনি পার্টির সভ্য হননি। তখন যুবকটি বললেন: "পার্টির মেম্বার হতে হলে অনেক বই পড়তে হয় এবং পরীক্ষা দিতে হয়; আমি তাই সে-চেষ্টা করিনি।" আমি তখন বললাম: "এদেশে পার্টির মেম্বার হলে কি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়?" যুবকটি এদিক ওদিক তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে মুচকি হেসে বললেন: "যেতেও পারে!"

এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শ যদি সেখানকার সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে তাহলে বহু নাস্তিক রাশিয়ান শেষপর্যন্ত ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতেও পারেন। রাশিয়াতে ইদানীং অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন বলে জনৈকা বিদুষী রুশ মহিলা আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, বেশ কিছু যুবক ইদানীং 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ' ও 'জর্জিয়ান অর্থোডক্স চার্চে' ধর্মযাজক হওয়ার জন্য যোগ দিচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম: "কেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "গির্জার ধর্মযাজকদের আয় আজকাল যথেষ্ট; মনে হয় এর জন্যেই!"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার ভক্তের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনেক সময় রাজনৈতিক কারণেও হতে দেখা যায়। পোল্যান্ড হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পোল্যান্ডে কম্যুনিস্ট সরকার

যখন ছিল (ইদানীং সেখানে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়েছে; 'সলিডারিটির' নেতৃবৃন্দ সেখানে সবেমাত্র অকম্যুনিস্ট সরকার গঠন করেছেন) তখন পৃথিবীর সমস্ত খ্রীস্টান দেশগুলির মধ্যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি লোক নিয়মিত ভাবে গির্জায় যেতেন। আনুমানিক ৯৫ শতাংশের অধিক খ্রীস্টানকে সেখানে গির্জাতে যেতে দেখা গিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অকম্যুনিস্ট ও সমৃদ্ধিশালী খ্রীস্টান দেশগুলিতে—যেখানে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত—গির্জাগুলির অধিকাংশ দু-চারটি খ্রীস্টীয় উৎসবের সময় ভিন্ন প্রায় শূন্যেই থাকে। এথেকে এই ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, পোল্যান্ডের লোকেরা অন্যান্য খ্রীস্টান দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি ধার্মিক। কিন্তু যে-কারণে পোল্যান্ডের খ্রীস্টান অধিবাসীরা এত অধিক সংখ্যায় গির্জায় যেতেন সে-কারণটি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক। এর পেছনে পোল্যান্ডবাসীদের মনে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল ভাবলে ভুলই হবে। অপ্রিয় নাস্তিকতাবাদী কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডবাসীরা এভাবে তাঁদের অহিংস প্রতিবাদ জানাতেন মাত্র।

সোভিয়েত রাশিয়াতেও সরকারের বা পার্টির বিরুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ রয়েছে। ককেসাস অঞ্চলের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস পিয়াটিগরস্ক (Pyatigorsk) শহরে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আমাদের হোটেলের অভ্যর্থনা বিভাগের একটি কমবয়সী মহিলা কর্মীকে আমার এক সহযাত্রী বলেছিলেন: "আপনি তো খুব হাসিখুসি স্বভাবের দেখছি; কিন্তু বাইরের অন্যান্য মহিলাদের তো তেমন হাসতে দেখি না?" তখন সে-মহিলা কর্মীটি উত্তর দিলেন: "আমি আপনাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছি একারণে নয় যে, আমি খুব আনন্দিত। হোটেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের হাসতে আদেশ দিয়েছেন বলেই আমি হাসছি।"

রাশিয়ার প্রায় সর্বত্র কর্মীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কাজেই প্রায় গাফিলতির লক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা নাকি বলেন: "এরা (অর্থাৎ সরকার) আমাদের বেতন দেওয়ার ভান করেন, আমরাও কাজ করার ভান করি।"

রাশিয়ার হাসপাতালগুলিতে নীচু তলার কর্মচারীদের প্রায়ই দু-চার রুবল ঘুস না দিলে ভাল সেবা পাওয়া যায় না। এধরনের দুর্নীতি অন্যত্রও রয়েছে।

রাশিয়ার জনসাধারণের অধিকাংশের মনে যে অসন্তোষ রয়েছে তা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেলে কিভাবে প্রকাশ পাবে এখন সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন। পোল্যান্ডের অধিবাসীদের মতো রাজনৈতিক কারণে ধর্মের ব্যবহার তাঁরাও করবেন কি?

ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা পেলে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকবে কিনা এবিষয়ে ইদানীং এর ঘটনা-পরম্পরা দেখে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানে যে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার কারণ মুখ্যতঃ রাজনৈতিক হলেও এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলিতে উভয় প্রদেশের খ্রীস্টান ও মুসলমান অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের গৌণ অবদান আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করার সময় শুনেছি যে, সংখ্যালঘু চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায়-গুলির মনে ভয় ঢুকেছে যে, সোভিয়েত সরকারের ইদানীং সমর্থনপুষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ'ই সে-দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করবে। সোভিয়েত রাশিয়াতে 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ' ছাড়াও 'লুথারান', 'জর্জিয়ান অর্থোডক্স', 'ক্যাথলিক', প্রভৃতি খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের চার্চ রয়েছে। এ ছাড়াও সোভিয়েত রাশিয়াতে বেশ কিছু ইসলামধর্মাবলম্বী রয়েছেন। ইহুদীদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বহু ভাষা, বহু কৃষ্টি ও বহু ধর্মমত-সমন্বিত সোভিয়েত রাশিয়াতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যদি মৈত্রীভাব রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে সোভিয়েত রাশিয়ার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সে-সম্ভাবনার কথা বিচার করে আমাদের মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী যদি সে-দেশে প্রচার করা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো তা সোভিয়েত রাশিয়াতে খুবই মঙ্গলপ্রসূ হতে পারে।

অনেকেই হয়তো জানেন যে, ইদানীং মস্কোতে একটি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সূত্রপাত হয়েছে। রাশিয়ার 'রাইটার্স ইউনিয়ন'-এর কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী সদস্য এই সোসাইটি সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। ধর্মপ্রচার-নিরোধক আইনটি রদ হলে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' আইনানুগভাবে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের জনকল্যাণমূলক সমাজচেতনার দিকটিই বিশেষ করে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করেছে। আবার কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধান্বিত হচ্ছেন। নাস্তিকতাপ্রধান সোভিয়েত রাশিয়াতে আমাদের মনে হয় জ্ঞানযোগ তথা বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমি যখন জর্জিয়াতে বেড়াতে যাই তখন আমাদের ট্যুর গাইড ছিলেন জনৈকা মধ্যবয়স্কা রাশিয়ান মহিলা। মহিলাটি বহুভাষী এবং উচ্চশিক্ষিতা।

রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশের বর্তমান রাজধানী টিবিলিসি। সেখানকার একটি হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। একদিন হোটেল থেকে ট্যুরিস্ট বাসে আমাদের টিবিলিসি শহরের অনতিদূরে মাৎসখেটা (Mtskheta) বলে একটি প্রাচীন শহরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহরটি ৩০০০ বছরের পুরনো। এ শহরটিতে একটি বিখ্যাত গির্জা রয়েছে। নাম ঃ ক্যাথিড্র্যাল অফ স্বেতিতস্কোভেলি (Cathedral of Svetitskhoveli)। আমরা যখন গির্জাটি দেখতে যাই তখন সেখানে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন গির্জাটির পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে আমরা প্রায় আধঘণ্টা ছিলাম। আমাদের গাইডও ততক্ষণ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হলে বেরিয়ে এসে আমি গির্জাটির বহিঃচত্বরে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের গাইডও আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন ঃ "স্ট্যালিনের আমলেও এ গির্জাটি বন্ধ করা হয়নি। গির্জাটি কেমন লাগল আপনার?" আমি বললাম ঃ "সব মন্দির ও উপাসনালয়ই আমার ভাল লাগে। এসব স্থানে এলে ধর্মভাবের উদ্দীপন হয়।" তখন মহিলাটি বললেন ঃ "ধর্ম কি জিনিস আমি তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না; কারণ আমি নাস্তিক। কিন্তু যখন গীর্জাটিতে অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল তখন আমি প্রাণে এক ধরনের শান্তি পাচ্ছিলাম। খুব সম্ভবতঃ সেটা গির্জার শান্ত পরিবেশের প্রভাব।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এধরনের শান্তি কি আপনি অন্য কোথাও পেয়েছেন?" তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, যখনই আমি সুযোগ পাই তখন জনকোলাহলের বাইরে নির্জন বনভূমিতে ক্যাম্পিং-এ (Camping) যাই। তাঁবুর মধ্যে বসে আমি পাখির ডাক শুনি; প্রজাপতি ও মৌমাছিদের ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করতে দেখি; কখনো বা ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে পাই। অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ক্রমে আমার মন শান্ত হয়ে আসে; আমি তখন হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ পাই। কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শহরে আমার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলে সে-আনন্দ আবার ম্লান হয়ে যায়।"

ওঁর একথা শুনে আমার মন হঠাৎ এক গভীর সমবেদনায় পূর্ণ হলো। ওঁর মাধ্যমে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, রাজনৈতিক প্রচার মানবমন থেকে ধর্মবিশ্বাসকে দূর করতে পারলেও মানবহৃদয়ের শান্তির তৃষ্ণাকে হনন করতে পারে না। উপনিষদের বাণীও মনে পড়ল। সে-বাণীর আলোকে দেখতে পেলাম যে, সংসারের তীব্র অনলে দগ্ধ মানুষের মন শান্তি বা আনন্দের সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত নিজের সত্তার গভীরে সেই অন্বেষিত শাশ্বত শান্তি এবং অনন্ত আনন্দকে খুঁজে পাবে। এবং নিরুপাধিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে পরিপূর্ণ এবং কৃতকৃত্য হবে।

আরও দেখতে পেলাম যেন সোভিয়েত রাশিয়ার ধর্মবিশ্বাসবর্জিত বহু তৃষিত প্রাণ তাদের অজ্ঞাতসারেই উপনিষদের বাণীর পথ চেয়ে বসে আছে।

কলকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রোগ

সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

কলকাতা তার সুদীর্ঘ ৩০০ বছরের পথপরিক্রমায় বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কত রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কৃতিক ঘটনা, কত মনীষীর কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্র যেমন এই কলকাতা, তেমনই কত রোগ ও মহামারীর সাক্ষী হয়ে আছে এই শহর। বহু ধরনের ব্যাধি কলকাতায় ছিল, পরবর্তী কালে কোন কোন ব্যাধি দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে, আবার কিছু নতুন রোগের সূত্রপাতও হয়েছে। বহুধরনের রোগের মধ্যে ভাইরাস-জনিত যে-সকল রোগের কথা আমরা জানি তা এই শহরে কতদিন থেকে আছে তা বলা শক্ত। বর্তমানে পরীক্ষাগারে উন্নততর পরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের উদ্ভাবনের ফলে বহু ভাইরাস-জনিত রোগের প্রকৃত স্বরূপ এখন ক্রমশঃ জানা যাচ্ছে।

সাধারণ ভাইরাস রোগগুলি যা এই কলকাতা শহরে সচরাচর দেখা যায় ও বিশেষ ঋতুতে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটে তার মধ্যে জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এছাড়া রুবেলা ও সাইটোমেগালো ভাইরাস-জনিত রোগের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে এই কলকাতা শহরে। শেষোক্ত রোগদুটির উল্লেখ করার অর্থ এই যে, গর্ভাবস্থায় মায়েদের এই রোগ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকে।

শুরু করা যাক গুটিবসন্ত রোগ (small pox) দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রোগের ইতিহাস কলকাতার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। কলকাতায় এই রোগ প্রায় প্রতি বছরই মহামারীর আকারে দেখা যেত ; শত শত শিশু, নারী-পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হতো। সত্তর দশকের আগে এই বসন্ত রোগ ছিল কলকাতার বুকে এক বিভীষিকা। বর্তমান বেলেঘাটায় ইনফেকশাস ডিজিস (Infectious disease) বা আই. ডি. হাসপাতালে এক সময়ে বসন্ত রোগীদের জন্য আলাদা বিভাগ (ward) থাকত—যেখানে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শত শত রোগী এসে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতো। যদিও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তার প্রয়োগও হতো এবং কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরোলজি বিভাগ বসন্ত রোগ সংক্রমণের ধারা নিয়ে মৌলিক গবেষণা ও তথ্য পরিবেশনও করেছিল ; তবুও রোগটিকে আয়ত্তে আনা যায়নি। অবশেষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) ও অন্যান্য দেশের সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বসন্ত রোগ ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে সারা পৃথিবী থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে।

ডেঙ্গু জ্বর কলকাতার অপর এক ভাইরাস-জনিত রোগ। মোটামুটিভাবে এই রোগ খুব ভয়ঙ্কর না হলেও সময়ে সময়ে মানুষকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর ও তার সাথে মাথা ব্যথা, গায়ে ও গাঁটে গাঁটে বেদনা, সারা দেহে লালচে চাকা চাকা দাগ এই রোগের লক্ষণ। ইডিজ জাতীয় মশা এই রোগের ভাইরাস বহন করে। ভাইরাসবাহী মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তিন-চার দিনের মধ্যে সে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। বর্ষাকালে মশার বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে ডেঙ্গু রোগের আধিক্য দেখা যায়। রক্ত পরীক্ষার দ্বারা সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কলকাতায় শতকরা ৯৮জন ব্যক্তিই জীবনে কোন-না-কোন সময়ে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জানা গিয়েছে, অতীতেও কলকাতায় ডেঙ্গু জ্বর সময়ে সময়ে এমন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল যে, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ডেঙ্গুর ভয়ে বালক রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে পানিহাটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হঠাৎ ভিন্নরূপ নিল ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সময়ে ও পরবর্তী দুবছর ধরে ডেঙ্গু জ্বরে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। দেহের

বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন শ্বাসনালি বা পেট থেকে, প্রস্রাবের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে রক্তক্ষরণ হয়ে রোগী এক সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছে যায় ; নাড়ির গতি অতি ক্ষীণ ও দ্রুত হারে চলতে থাকে। সময় মতো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে না পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ট্রপিক্যাল স্কুলের ভাইরোলজি বিভাগ তিনশোর বেশি রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গুরোগীর সমীক্ষা তথা পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য ও মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ডেঙ্গু জ্বর পরবর্তী কালে কলকাতায় ব্যাপকভাবে দেখা না গেলেও বিচ্ছিন্নভাবে এখনো দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কদাচিৎ হলেও এই কলকাতায় কয়েক বছর আগে এক এনসেফেলাইটিস (মস্তিষ্কপ্রদাহজনিত রোগ) রোগীর মস্তিষ্ককোষ থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে ; সুতরাং এই ভাইরাস ক্ষেত্র-বিশেষে মস্তিষ্কপ্রদাহ ঘটাতে সক্ষম।

এনসেফেলাইটিস রোগের মূলে বহু ধরনের ভাইরাসকে দায়ী করা হয়। এই রোগ প্রধানতঃ শিশু ও ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। হারপিস, কক্স্যাকী, পোলিও, ইকো প্রভৃতি ভাইরাস এই রোগের কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতায় অবস্থিত আই. ডি. হাসপাতাল থেকে কয়েকটি শিশুর মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্ক থেকে কক্-স্যাকী ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে।

পোলিও ভাইরাসও মস্তিষ্কপ্রদাহের অন্যতম কারণ হলেও পক্ষাঘাতজনিত বিকলাঙ্গের জন্য একে দায়ী করা হয়ে থাকে। পোলিও একটি জলবাহিত রোগ। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব নেহাৎ কম নয়। শহর কলকাতায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা থাকলেও এর উপকণ্ঠে বহু নিম্নমানের বসতি ও কাঁচা নালা-নর্দমা থাকার জন্য এই শহরে পোলিও রোগের সংক্রমণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যত্রতত্র মলত্যাগের অভ্যাসের জন্য পোলিও ভাইরাস যা আক্রান্ত ব্যক্তির মলের মধ্যে থাকে, সেগুলি কোন-না-কোন সময়ে পানীয় জলকে দূষিত করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া কাটা ফল, সস্তার আইসক্রীম প্রভৃতির ব্যবসায় যারা লিপ্ত, তাদের স্বাস্থ্য-বিধির মান ও জ্ঞান আশাপ্রদ না হওয়ার জন্য এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে কলকাতা শহরে পোলিও রোগ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দেহের মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করার পর সকলের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পেতেও পারে, কিন্তু যেসকল হতভাগ্য শিশু এর শিকার হয় তাদের সংখ্যা এই নগরীতে গড়ে বছরে প্রায় ৮০০ থেকে ২০০০ ; তার মধ্যে ৫ বছরের কম-বেশি বয়সীর সংখ্যা সর্বাধিক। এই রোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও পরিণতি লক্ষ্য করে বেলেঘাটায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পোলিও হাসপাতাল স্থাপিত হয় ষাটের দশকে।

পোলিও রোগের পরেই যে-রোগ বেশ উদ্বেগজনক তার নাম ভাইরাস হেপাটাইটিস। পুরনো চিকিৎসা-বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে কল-কাতায় ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগের ব্যাপকতার উল্লেখ আছে। আগে ধারণা ছিল যে, এই রোগ প্রধানতঃ দূষিত জলের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। ক্ষুধামান্দ্য, ওপর পেটে ব্যথা ও বমিভাব দিয়ে শুরু হয়ে জ্বর ও তার সঙ্গে চোখ হলুদ বর্ণ —যাকে বলে ন্যাবা (Jaundice) ও তার সঙ্গে হলুদ বর্ণের প্রস্রাব এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে আরোগ্য লাভ না হলে রোগীর অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়। লিভার গ্রন্থির সংকোচন (cirrhosis of liver) অথবা লিভারের ক্যানসার পর্যন্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উন্নত ধরনের রোগ-নির্ধারণ সরঞ্জাম (diagnostic kit) উদ্ভাবনের ফলে ভাইরাস হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাস-গুলিকে এখন চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। হেপাটাইটিস 'এ' বা ইনফেকশাস হেপাটাইটিস

যা দূষিত জল দ্বারা সংক্রামিত হয় ; হেপাটাইটিস 'বি' বা সেরাম হেপাটাইটিস আর এক শ্রেণীর ভাইরাস যা সংক্রামিত হয় রক্ত বা যৌন-ক্রিয়ার মাধ্যমে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাইরাসগুলিকে এখনও সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা না গেলেও জানা গিয়েছে যে, এরা 'এ' বা 'বি' কোন শ্রেণীরই নয় ; তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নন এ নন বি' হেপাটাইটিস। ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই 'নন এ নন বি' শ্রেণীর ভাইরাস আবার দুই ধরনের। এক ধরনের ভাইরাস হেপাটাইটিস 'এ'-র মতোই ছড়ায় অর্থাৎ জলের মাধ্যমে ; এদের নাম দেওয়া হয়েছে হেপাটাইটিস 'ই'। 'নন এ নন বি' গোষ্ঠীর অপর ধরনের ভাইরাসটির সংক্রমণের ধারা ঠিক হেপাটাইটিস 'বি'-এর মতো ; এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হেপাটাইটিস সি'। সর্বশেষ শ্রেণীর ভাইরাসটির নাম 'হেপাটাইটিস ডি'। এরা আলাদা করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, এরা 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাসের সাহায্যে রোগ সংক্রমণ করে থাকে। লক্ষণ দেখে কি ধরনের ভাইরাস জন্ডিস-এর কারণ তা বলা শক্ত ; তবে পরীক্ষার দ্বারা তা জানা যায়। রোগীর নিরাপত্তার দিক থেকে 'হেপাটাইটিস এ' শ্রেণীর রোগ থেকে নিরাময় অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং এতে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। 'নন এ নন বি' ও তার পরেই 'বি' শ্রেণীর ভাইরাস রোগ থেকে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি থাকে ; এর সঙ্গে 'ডি' ভাইরাস যুক্ত হলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে।

রেবিস (Rabies) বা জলাতঙ্ক রোগ এই কলকাতায় এক আতঙ্ক-স্বরূপ। কারণ এই রোগের লক্ষণ যার মধ্যে দেখা দেয়, তার মৃত্যু অবধারিত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই জলাতঙ্ক রোগের কথা শোনা যায়, তাই কলকাতা শহরের পত্তন থেকেই যে জলাতঙ্ক রোগ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অনেক প্রকার প্রাণীর কামড় থেকে এই রোগ হওয়া সম্ভব হলেও কলকাতা শহরে জলাতঙ্ক রোগের প্রধান কারণ রেবিস-আক্রান্ত কুকুরের কামড়। কলকাতায় বেওয়ারিস কুকুরের সংখ্যা ঠিক কত তার সঠিক পরিসংখ্যান দিতে না পারলেও অনুমান করা যায় যে, ২০ থেকে ৩০ হাজারের কম তো নয়ই। মানুষের মধ্যে এই রোগের ভাইরাস কোন রেবিস রোগাক্রান্ত কুকুরে (প্রধাণতঃ রাস্তার কুকুরই) কামড় দেবার কয়েকদিন থেকে ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। শ্বাসনালী ও অন্ননালীর সঙ্কোচন (tracheo-oesophageal spasm) যার ফলে তরল পদার্থ পান করার অসুবিধা ('জলাতঙ্ক' নাম এই থেকেই) ও পরে দেহের মধ্যে ঘনঘন খিঁচুনি (convulsion) ও জ্ঞান বিলুপ্ত এই রোগের প্রধান লক্ষণ। মৃত্যু এই রোগের পরিণতি।

দুঃখের বিষয়, জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক রোগ জানা সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় বেওয়ারিস কুকুরের ছড়াছড়ি এবং এই কুকুরগুলিকে ঠিক মতন আয়ত্তে না আনার জন্য সমস্যা আরও জটিল হয়ে রয়েছে। কলকাতা পৌর সংস্থায় কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক, কিন্তু ঐ কুকুরের রেবিস রোগের টিকা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কলকাতায় বিভিন্ন প্রাণীর কামড়ে রেবিস চিকিৎসার কেন্দ্রগুলিতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় চব্বিশ হাজার থেকে একত্রিশ হাজার ব্যক্তি পরামর্শের জন্য আসেন এবং এই প্রাণীগুলির মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই কুকুরের কামড়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১·৫ লক্ষ বেওয়ারিস কুকুর ঘুরে বেড়ায়। গত পাঁচ বছরে বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালে গড়ে ১৪২ থেকে ১৮৭জন ব্যক্তি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয় ও শতকরা ১০০জনই মারা যায়। কলকাতায় কয়েকটি হাসপাতালে প্রাণীর কামড়ের ফলে রেবিসের টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া টিসু কালচার টিকাও (প্রাণিকোষে প্রস্তুত) আজকাল পাওয়া যাচ্ছে যার প্রতিরোধ-শক্তি (immunity) বাড়ানোর ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি ; কিন্তু এর দাম অত্যন্ত বেশি হওয়ার জন্য সাধারণ ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্ত্রিক রোগের (gastro enteritis) খবর পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতায়ও তা দেখা গিয়েছে। আন্ত্রিক রোগ বলতে আমরা বুঝি অন্ত্রের অসুখ যা বিভিন্ন

ধরনের ব্যাকটেরিয়া (কলেরা, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি) ও প্রোটজোয়া (অ্যামিবা) থেকে হয়ে থাকে। জলবাহিত এই সকল জীবাণু দেহে প্রবেশ করায় বারবার তরল দাস্ত হয়, তার সঙ্গে বমি ও পেটে খিঁচ ধরতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে রোগীর দেহ থেকে অত্যধিক জল ও লবণজাত পদার্থ বেরিয়ে যায়। ফলে রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই সকল আন্ত্রিক রোগের মূলে ভাইরাসের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রোটা নামে এক ধরনের ভাইরাস এই আন্ত্রিক রোগের কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ শিশু বিভিন্ন আন্ত্রিক রোগে মৃত্যুবরণ করে। তার মধ্যে শতকরা ২৫ শতাংশই রোটা ভাইরাস-জনিত। কলকাতার বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল ও বেলেঘাটা আই, ডি. হাসপাতালে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে ১১৬ ও ২১৫ জন শিশুর মল পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকের মলে রোটা ভাইরাস পাওয়া গিয়াছে। পরিশ্রুত জল ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতনতা রোটা ভাইরাসজনিত আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

কলকাতার ভাইরাসের রোগের মানচিত্রে সর্বাধুনিক সংযোজন এইডস (AIDS)। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এই মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আমাদের কৌতূহল তথা সচেতনতা বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত এই রোগ কলকাতায় তেমন সমস্যার সৃষ্টি না করলেও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা উপযুক্ত সতর্কতা ও যথাযথ ব্যবস্থা এখনই না নিলে অদূরে ভবিষ্যতে এই রোগ দ্রুত এই শহরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন যুবকের মধ্যে প্রথম এই রোগ দেখা দেবার পরই ঐ দেশের অন্য সকল প্রদেশে এবং ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই রোগ ব্যাপকহারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন জাপান, ভারত ও ইজরায়েলেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার খতিয়ান থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সারা বিশ্বে মোট এইডস-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫৪,০৭৪জন; তার মধ্যে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই সংখ্যা ১২৬,১২৭; আফ্রিকায় ৬৩,৮৪২, সমগ্র ইউরোপে ৩৩,৮৯৬ ও অস্ট্রেলিয়ায় ১৭৮৯ জন। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত এইডস রোগীর সংখ্যা মাত্র ৪৪ হলেও রক্তে এইডস সংক্রমণের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২০০০ লোকের। এইডস রোগ প্রসঙ্গে জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এইডস রোগের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে বেশি (high risk group) তাঁরা হলেন : সমকামী পুরুষ (homosexuals), মাদকদ্রব্য সেবনকারী বিশেষতঃ যারা এই সকল দ্রব্য বহুজনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জের মাধ্যমে সেবন করার অভ্যাস রাখেন, বারবনিতা, এইডস-দূষিত রক্ত গ্রহণকারী বিশেষতঃ হিমোফিলিয়াক রোগী যাদের ঘন ঘন রক্ত বা রক্তের বিশেষ উপাদান (factor viii & ix) নিতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। এই রোগের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করার কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা যায় যার মধ্যে ঘুসঘুসে জ্বর, দ্রুত ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা, রাত্রিকালীন ঘাম, বারবার তরল দাস্ত ইত্যাদি। এছাড়া রোগটির বিশেষত্ব এই যে, রোগীর রোগ প্রতিরোধশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়, যার ফলে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকজাতীয় জীবাণু-সংক্রান্ত রোগের শিকার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর অবধারিত মৃত্যু হয়। এই রোগের সহায়ক চিকিৎসা-ব্যবস্থা থাকলেও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবার জন্য কোন ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রচেষ্টায় জনগণকে এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

গ্রন্থ পরিচয়

গীতার বাণী চিরন্তনী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

গীতার কথা—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। নবমালিকা মুখোপাধ্যায়, 'শ্যামলী', সি-এস ১/৮ গল্ফ গ্রীন, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ কুড়ি টাকা।

একথা সকলেই জানেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-সূচনার আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশাবলীর দ্বারা মোহমুক্তি ঘটিয়ে ধর্মরক্ষার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা-ই 'গীতা' নামে জগৎবিখ্যাত। গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত (২৫—৪২ অধ্যায়)। সুতরাং মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় গীতার বাণী আজ দেশ-দেশান্তরের অগণিত নরনারীর প্রাণের তন্ত্রীকে অনুরণিত করছে।

গীতা আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের দুটি পুরুষের মধ্যে সাধারণ কথোপকথনমাত্র। যদি সাধারণ কথোপকথনমাত্রই গীতা হতো তাহলে কি সহস্র সহস্র বছর ধরে এত বিপুলসংখ্যক নরনারীর কাছে তা এইভাবে আকর্ষণের বস্তু হয়ে থাকতে পারত? প্রশ্ন সেখানেই। উত্তর দিয়েছেন মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি:

ভারতে সর্ববেদার্থো ভাবতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেহয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

—চিরন্তন কালের নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান হলো বেদ-উপনিষদ্। বেদ-উপনিষদের সারমর্ম নিহিত আছে মহাভারতে এবং মহাভারতের নির্যাস বিধৃত রয়েছে গীতার মধ্যে। তাই গীতা হলো সর্বশাস্ত্রময়ী।

সেখানেই গীতার কালোত্তীর্ণতার রহস্য। গীতার বাণীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা দুরূহ। তবে যদি একটিমাত্র বাক্যে গীতার মর্মবাণীকে প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাষায় বলতে হয়: দশবার 'গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগ'। ত্যাগই গীতার মর্মবাণী। ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সকল অশান্তির ঊর্ধ্বে যেতে পারে, সকল দুঃখ জয় করতে পারে। 'ত্যাগ' অর্থে নেতিবাচক কিছু নয়। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন: 'To conquer is to renounce"—ত্যাগ হলো জয়। কি জয়? মানুষের অন্তরস্থিত ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আবিলতা, লোভ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসাকে জয়—বর্জন। যে-ব্যক্তি যত বড় 'ত্যাগী', সে তত বড় মানুষ। গীতার মধ্যে সেই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ত্যাগ করে, বৃহৎ আমিত্বে—মহৎ আমিত্বে উত্তরণের নিত্য আহ্বানই জানিয়েছেন ভগবান। সেই অর্থে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের মধ্যেই বিস্তৃত রয়েছে নিত্যকালের কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গন। ক্ষুদ্র আমিত্বে আচ্ছন্ন, মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা পরাভূত অর্জুন মানুষমাত্রেই —দেশে দেশে, কালে কালে। সেই অর্জুন যখন মনুষ্যত্বের যথার্থ মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে জগতের ধর্মরক্ষক হয়। এবং তা হয় কখন? যখন মানুষের অর্জুনরূপী মোহগ্রস্ত সত্তা মানুষের অপর সত্তা কৃষ্ণরূপী সারথির বাণীরূপ কশাঘাতে আপন শক্তিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত হলো, ভগবানের ভাষায়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং পরবর্তী শর্ত হলো আত্মশক্তির বিকাশ-সাধনে সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া।

বর্তমান বাংলার কৃষ্টিজগতের অন্যতম পুরোধা-ব্যক্তিত্ব ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অসাধারণ পারঙ্গমতায় তাঁর নাতিবৃহৎ গ্রন্থ 'গীতার কথা'য় গীতার সেই চিরন্তনী বাণীর মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে গভীর ও শাশ্বত তত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করেছেন, মণি-রত্নের মতো অমূল্য বাণীগুলিকে মালার মতো সুগ্রথিত করেছেন, অর্জুনের মাধ্যমে জগতের মানুষের কাছে জীবনের নানা সংগ্রামে সম্মুখীন হবার আদেশগুলি উচ্চারণ করেছেন—সে-সমস্তই ডঃ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে এই গ্রন্থে আমাদের উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই অনবদ্য উপস্থাপন সম্ভব নয়। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়েছে অনুভূতির, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উদ্বোধন

গত ৮ জুন '৯০ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ **বাঙ্গালোর আশ্রমের আলসুর উপকেন্দ্রের** নবনির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১০৭ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বহু ভক্ত যোগদান করেন।

গত ৪ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ **মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরে** সেকেন্ড ম্যাডলে স্ট্রীটে অবস্থিত সারদা বিদ্যালয়ের ইংরেজী-মাধ্যম প্রাথমিক বিভাগের জন্য নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

পরিদর্শন

গত ২৬ মে মেঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দীঘে, মুখ্যমন্ত্রী বি. বি. লিংদো ও শ্রমমন্ত্রী এ. পি. সোয়ের **চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন** পরিদর্শন করেন। গত ১৫ জুন অসমের রাজ্যপাল ডি. ডি. ঠাকুর, মিজোরামের রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এস. এস. কাং এবং ২২ জুন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলিংদো পুনরায় এই আশ্রম পরিদর্শন করেন।

গত ১১ জুলাই মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল কানওয়ার মামুদ আলি **নারায়ণপুর (মধ্যপ্রদেশ) আশ্রম** পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা ভবনের শিলান্যাস করেন ও উপজাতি-অধ্যুসিত গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনের জন্য 'ভিডিও-অন-হুইল'-এর উদ্বোধন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলিরাম কাশ্যপ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

আলং বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শঙ্কর কুমার ইউনাইটেড স্কুলস অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩৭তম সর্বভারতীয় সাধারণজ্ঞান পরীক্ষায় (জুনিয়র গ্রুপ) প্রথম স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ: বিশাখাপত্তনম আশ্রমের মাধ্যমে ঐ জেলার ইল্লামাণ্ডিলি ও রামবিল্লি মণ্ডলের ১৪টি ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত গ্রামের ২৪৩১টি পরিবারের মধ্যে ৫১১৮ কিলোঃ চাল, ২৫৬৫টি শাড়ি, ২৪৩৭টি ধুতি, ৩০০টি চাদর, ৫০২টি বিছানার চাদর, ৮২৮৬টি বিভিন্ন রকমের কাপড়-চোপড়, ১০০২ সেট বাসনপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

রাজমুন্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের ৭টি গ্রামের ৩০৩৩৪টি পরিবারকে ৭৫০ কিলোঃ আলু, ৫০০ কিলোঃ পেঁয়াজ, ৫৫০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ২৮৮৪টি ধুতি, ২৯৭১টি শাড়ি ও ৩৬৩২টি বিভিন্ন রকম পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্বাসন: ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামাণ্ডিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে পাকাবাড়ি নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৬ জুলাই এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত। প্রথম দফায় এই গ্রামের জন্য ৮৫টি বাড়ি তৈরি হবে।

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের আদিবিপালেমে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেখানে একটি কমিউনিটি হল-সহ আশ্রয়-গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গুমটিতে বিদ্যালয়-সহ আশ্রয়-গৃহের দ্বিতলের ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ পুনর্বাসন: ঢাকা আশ্রমের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার সাতুরিয়া ও ধামরাই মহকুমার ২৪টি গ্রামের ৪২৪টি পরিবারকে ৪২৪টি নতুন বাড়ি (বাড়িগুলির অর্ধেকাংশ পাকা), সমসংখ্যক পায়খানা এবং উন্নতমানের উনুন ও রান্নার সাজসরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

বাকিংহামশায়ার বেদান্ত সেন্টার (ইংল্যান্ড)-এর প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ গত জানুয়ারি মাসে এক সপ্তাহের জন্য এথেন্স গিয়েছিলেন সেখানকার ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে। সেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ধ্যান পরিচালনা ও ধর্মালোচনা করেছেন। ঐ সময় স্থানীয় যোগ সেন্টারের উদ্যোগে এক সপ্তাহের সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানেও যোগদান করেছিলেন।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া): গত মে মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে যথারীতি ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ১২ মে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এবং ১৯ মে ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। 'জয় মা মিউজিক কনসার্ট' নামে একটি সঙ্গীত দলের সদস্যবৃন্দ গত ৯ মে সোসাইটির পুরনো মন্দিরে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছে।

বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় ওলেমা-তে গত ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মে সকালে এই সাধন-শিবিরে ভাষণ দিয়েছেন ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপক ফিলিপ নভক এবং বিকালে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী অপর্ণানন্দ। তাছাড়া প্রতিদিন স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, পূজানুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি: জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মপ্রসঙ্গ করেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ এবং স্বামী ভাস্করানন্দ।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি: জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবারে গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ এবং প্রতি শুক্রবারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর আলোচনা করেছেন স্বামী তথাগতানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় সমবেত ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। ৩ জুন অতিথি-বক্তা রাবাই আশার রক 'দি ওয়ান গড' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সেন্টার: জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ ও প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

পরিদর্শন

ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোভাই কোটাড়িয়া গত ২১ জুন **ঢাকা আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

গত ২৪ জুন **সিঙ্গাপুর আশ্রমের** বার্ষিক উৎসবে স্বামী বিবেকানন্দের 'শিকাগো বক্তৃতা'-র চৈনিক অনুবাদ প্রকাশ করেন সিঙ্গাপুরের সাংসদ পে চিন হুয়া।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন

গত ২০ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ; ৬ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী এবং ১৩ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে তাঁর জন্মলীলা আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ এবং ১৯ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করছেন

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

গত ৭ ও ৮ এপ্রিল '৯০ **পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে** (কলকাতা-৩২) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ গান (রাবণবধ পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ৮ এপ্রিল ছিল মূল উৎসব। এদিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাস্তুতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনির্বাণ ও স্বাধীন মণিমেলা, যাদবপুর অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও যাদবপুর অখণ্ডমণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা ও ভক্তগণ সমবেত সংকীর্তন ও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও আলোচনা ও ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের অঙ্গ। সর্বমোট ১২০০জন ভক্ত প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। রবীন ভট্টাচার্য ও স্বপ্না দাস ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গত ১৩ মে **বিরাটী নবাদর্শ রামকৃষ্ণ কুটিরে**—ভোর ৪টা থেকে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্র, ভজন, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ৯টা থেকে কমিউনিটি হলে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী, ছাত্র-ছাত্রী ও দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে স্বামী ভবেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দান করেন স্বামী গিরিজাত্মানন্দ। এই অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী বিষয়ক পুস্তক, ২০জন দুস্থ নরনারীকে ধুতি, শাড়ি ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ১১জন দুস্থা ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-বৃন্দ "গল্পে ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

ফালাকাটা (জলপাইগুড়ি) **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** গত ৫ ও ৬ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাত-ফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিমূলক গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, ভক্তসম্মেলন ও সঙ্গীতাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল, উভয় দিনই মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী বসে প্রসাদ পান। স্বামী নিবৃত্তানন্দ ও স্বামী রামেশ্বরানন্দ উভয় দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। উভয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও নীরদবরণ রায়। উভয় দিনেই বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আলিপুর-দুয়ারের রঞ্জিত ঘোষ ও সম্প্রদায় ভক্তিমূলক লীলা-গীতি পরিবেশন করেন।

গত ৫—৯মে পাঁচদিন ব্যাপী মেদিনীপুরের **হরেকৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলনমন্দিরে** রামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসব নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পূজাপাঠ, শোভাযাত্রা, ভজন-সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং যুবসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ নেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী একরূপানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ এবং স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। শেষের দুইদিন সন্ধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘ' 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ও 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গীতিনাট্য পরিবেশন করে। গ্রন্থনা ও সঙ্গীতে অংশ নেন নটরাজ চ্যাটার্জী ও শঙ্কর সোম।

গত ৬ ও ৭ মে **বর্ধমান জেলার পতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের** উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। **উৎসবের প্রথমদিন** ধর্মসভা, ভক্তিগীতি, ভি. ডি. ও.

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ছায়াচিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কালীকিঙ্কর চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন জ্যোৎস্না চৌধুরী এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরূপানন্দ; বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ ও স্বামী নির্লিপ্তানন্দ। সন্ধ্যার পর দুটি গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে গীতিনাট্য পরিবেশন করে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবৃন্দ ও পরে সঞ্জিত দাস ও সম্প্রদায়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় **ইছাপুর (হুগলি) শ্রীরামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রমে** গত ২৭ মে ১৯৯০ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের (শশী মহারাজের) জন্মস্থানে এক বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ, সহঃ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ এবং কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যূষে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরিতে সমগ্র ইছাপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ যোগদান করেন। পরে স্বামী দেবদেবানন্দ পূজা ও হোম পরিচালনা করেন। মধ্যাহ্নে ইছাপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বামী গহনানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী দেবদেবানন্দ রামকৃষ্ণানন্দের জীবনী ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা বিষয়ে ভাষণ দান করেন। উল্লেখ্য যে, এই বাৎসরিক উৎসব গত প্রায় পনের বছর যাবৎ ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশ্রম একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক কোচিং ক্লাসও পরিচালনা করেন।

নিবেদিতা পুরস্কার

গত ২৯ এপ্রিল **হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে** নিবেদিতা পুরস্কার প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিল্পীকে বই, ফলক ও অর্থমূল্যে পুরস্কার দেওয়া হয়। ফলকটি নির্মাণ করেন শিল্পী অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত। শিল্পীর হাতে পুরস্কার অর্পণ করেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবের কথা বলেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ভগিনী নিবেদিতার অবদান এবং ভারতীয় শিল্পীদের উপর তাঁর প্রভাবের কথা বলেন। এইসঙ্গে তিরিশজন শিশুশিল্পীকে নিবেদিতার নামাঙ্কিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ নিমাই-সাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। সভায় হাওড়া শহরের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিল্পী এবং বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অনিলচন্দ্র দত্তগুপ্ত** গত ১৮ এপ্রিল ১৯৯০ বিকাল ৫টা ৫৫ মিঃ তাঁর বেহালাস্থ বাসভবনে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হীরাবতী দত্তগুপ্ত দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকার নিকটস্থ সাতগ্রামে। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৭ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার একজন আজীবন গ্রাহক। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে না পারলেও বেলুড় মঠ, মায়ের বাড়ী, নরেন্দ্রপুর প্রভৃতি মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যার মাধ্যমে তিনি আমৃত্যু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

বহুপ্রচলিত পানমশলা

বর্তমানে ভারতবর্ষে পানমশলা চিবানোর অভ্যাস প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, দেশে প্রায় দুই কোটি লোক এখন পানমশলা ব্যবহারে অভ্যস্ত। এদের সংখ্যা ধূমপানকারীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্য অনুযায়ী ভাগ করলে—গুজরাটে ৩ শতাংশ লোক তামাক দেওয়া মশলা ও ১.৫ শতাংশ লোক তামাকবিহীন মশলা ব্যবহার করে; কেরালাতে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ২৬ ও ০.৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩ ও ০.৫; বিহারে ১৩ ও ০.৪; মহারাষ্ট্রে ২৮ ও ০.৬। পান খাবার জন্য মশলা তৈরি করতে লোকের অনেকটা সময় ও অনেক রকম উপাদান লাগে। সেজন্য কয়েকটি সংস্থা দেশীয় প্রথা অনুসরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য এটি তৈরি করে ছোট প্যাকেটে বাজারে চালু করেছে। এতে পান ছাড়া পান খাবার জন্য আনুষঙ্গিক সবই আছে। এ খেতে বেশি চিবুতে হয় না। বিজ্ঞাপনের জোরে পানমশলা ভারতে ও তৃতীয়-বিশ্বের দেশগুলিতে খুব চালু হয়ে গিয়েছে। ফলে বছরে ৩০০ কোটি টাকার বেশি পানমশলা বিক্রি হয়। ছেলে-বুড়ো সকলেই পানমশলা ভালবাসে। মধ্যপ্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে বর্তমানে পানমশলা ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হয়।

ভারতে এখন কুড়িরও বেশি কোম্পানির তৈরি পানমশলা পাওয়া যায়। কোন-কোনটি খেতে মিষ্টি, কোনটিতে মিষ্টি নেই। মোটামুটিভাবে পানমশলাতে আছে:

	সাদা মশলা (%)	মিঠা মশলা
সুপারি	৮০	১০
শুকনো খেজুর	—	৭০
খয়ের	১০	১০
চুন	১	১
অন্যান্য মশলা (এলাচ, দারচিনি, মেন্থল, জৈত্রী প্রভৃতি)	৯	৯

যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুকনো খেজুর দিয়ে মিষ্টি করা হয়, তবে কোন-কোনটিতে মিষ্টি করবার জন্য স্যাকারিনও ব্যবহার করা হয়। একশ গ্রাম সুপারিতে আছে—প্রোটিন ৫—৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট (শর্করা জাতীয়)—৪৪—৪৭ গ্রাম, ধাতু—ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা; ভিটামিন—ক্যারোটিন; ট্যানিন—১১—২৬ মিলিগ্রাম; কয়েক প্রকার অ্যালকালয়েড (ক্ষারীয় পদার্থ) ১৫০—৬৭০ মিলিগ্রাম। অ্যালক্যালয়েডগুলির মধ্যে অ্যারিকোলিন (arecoline) উল্লেখযোগ্য, কারণ এর বিষাক্ত ক্রিয়া আছে; এটি প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুশিরাকে উত্তেজিত করে, মুখে লালা নিঃসরণ করায়, এবং ঘাম নির্গত করে; বেশি মাত্রায় এটি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুশিরাকে দমন করে এবং দাঁতের এনামেল নষ্ট করে।

তামাক সমেত সুপারি খেলে যে ক্যানসার হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। তামাকবিহীন সুপারি খেলে ক্যানসার হয় কিনা তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। ইঁদুরের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, খয়েরের জীবকোষের মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আছে। মুখে ঠাণ্ডার ভাব আনার জন্য মেন্থল যোগ করা হয়। মেন্থল খেতে খেতে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তবে লজেন্স এ এবং নানা খাবারে এখন মেন্থল ব্যবহৃত হয়। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বেশি পরিমাণে পানমশলা খেলে মুখের জীবকোষে ক্যানসারজাতীয় কিছু কিছু পরিবর্তন হতে পারে; তবে ক্যানসার হয় বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্যাকারিনের মূত্রাশয়ে (urinary bladder) ক্যানসার করার ক্ষমতা আছে—এই ধরনের কিছু কিছু প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া গিয়েছে।

সিগারেট সম্বন্ধে যেমন সতর্কবার্তা প্রচারিত হয়, পানমশলা সম্বন্ধে সেরূপ করা, প্রতিদিন এক প্যাকেটের কম পানমশলা ব্যবহার করা, সুপারি বাদ দিয়ে পানমশলা তৈরি করা—এই সব বিষয়ে বিবেচনা করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

[Nutrition News, November—1989]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



কার্ত্তিক

১৩৯৭

৯২ তম বর্ষ

১০ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



কার্তিক, ১৩৯৭ অক্টোবর, ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ—১০ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

—যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা (মঙ্গলরূপিণী) এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা, তাঁহার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

দেবীভাগবত, ১।২।১৯-২০



কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধন-এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাঁহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

দীপাবলীর উৎস ও তাৎপর্য সন্ধানে

প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠে বাণীরূপ পাইয়াছিল নিখিল মানবের একটি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা : "তমসো মা জ্যোতির্গময়" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।৩।২৮)। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। সময়ের বিচারে কোন্ মুহূর্তে উপনিষদের ঋষি এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই; কিন্তু ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উপনিষদের ঋষির ঐ উচ্চারণের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষের বোধের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে আলোককে ভালবাসিয়াছিল এবং অপছন্দ করিয়াছিল আলোকের অভাব বা অন্ধকারকে। 'দীপাবলী' বা 'দেওয়ালী' উৎসবের উৎস ও তাৎপর্য সন্ধান করিবার সময় উপরি-উক্ত বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্গদেশের বাহিরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপাবলী উৎসব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। ইহা বর্তমানে

সর্বভারতীয় উৎসবগুলির অন্যতম প্রধান রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও ইহার সূচনা হইয়াছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই। জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে ইহা একটি প্রাচীন জনপ্রিয় উৎসব। জৈন কল্পসূত্র (১২৩) অনুসারে কার্তিক মাসের অমাবস্যার পূর্ব রাত্রিতে অর্থাৎ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মহাবীর মহানির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীরের সম্মানার্থে দেবতারা সেই রাত্রি ও পরের রাত্রিতে দীপ জ্বালাইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন (জৈন কল্পসূত্র, ১২৪)। আবার জৈন কল্পসূত্র (১২৮) হইতেই জানা যায় যে, মহাবীরের অনুরাগী আঠার জন নৃপতি কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে দীপ জ্বালাইয়াছিলেন। ইহার পিছনে তাঁহাদের এই চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল ঃ "প্রজ্ঞার আলো যখন নির্বাপিত হইয়াছে, তখন আমরা অন্ততঃ প্রদীপ জ্বালাইয়া পৃথিবীকে আলোকিত করি।" সেই হইতে কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী ও অমাবস্যায় দীপোৎসব জৈনদের মধ্যে একটি পবিত্র অনুষ্ঠান হিসাবে প্রচলিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ মতে কার্তিক অমাবস্যায় বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের কাছে ঐ রাত্রিটি সেই হেতু বিশেষভাবে চিহ্নিত। বুদ্ধদেব তাঁহার মহাপরিনির্বাণের পূর্বে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে শোকে মুহ্যমান দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শোক না করিয়া তুমি স্বয়ং একটি প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়া উঠ। তোমাকে দেখিয়া অন্যরাও এক-একটি প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়া উঠুক। বুদ্ধের সেই সর্বশেষ বিখ্যাত বাণীটি হইলঃ "আত্মদীপো ভব"। বুদ্ধের গৃহত্যাগ জগতের কল্যাণের জন্য। জগৎ যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল, বুদ্ধ স্বয়ং দীপবর্তিকার ন্যায় জগৎকে আলোকদান করিবার জন্য সংসার-স্বজন ত্যাগ করিলেন। তাঁহার গৃহত্যাগ তাই বৌদ্ধ ঐতিহ্যে 'মহানিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত। সেই মহাঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এবং নিজেদের বৈরাগ্যকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিবার প্রেরণায় বুদ্ধশিষ্যগণ ঐ দিনটি অসংখ্য প্রদীপ জ্বালাইয়া উদ্‌যাপন করিতেন। তাহা হইতেই বৌদ্ধদের মধ্যে দীপাবলীর সূচনা।

কার্তিকের অমাবস্যায় ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ সেই উপলক্ষে আলোর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। শিখদের কাছে তখন হইতে দীপাবলী একটি অন্যতর তাৎপর্য পাইয়াছে।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দীপাবলী উৎসব প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। মধ্যযুগের প্রথম দিকে দক্ষিণভারত, মধ্যভারত এবং পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জনপ্রিয় হইতে শুরু করে। হিন্দুদের মধ্যে দীপোৎসবের সূচনা সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

কথিত আছে, রাবণবধ, সীতা-উদ্ধার এবং দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর কার্তিক অমাবস্যায় রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে অযোধ্যাবাসীরা গৃহে গৃহে দীপ জ্বালাইয়া আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। তাহারই স্মরণ ও অনুকরণে ভারতবর্ষে দীপাবলী বা দেওয়ালী উৎসবের প্রচলন হইয়াছে।

অপর একটি কিংবদন্তী হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অত্যাচারী শাসক নরকাসুরকে নিধন করেন এবং নরকাসুরের কারাগারে বন্দিনী ষোল হাজার অসহায় নারীকে উদ্ধার করেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অপশাসন এবং নিপীড়নের ঘোরতর এক অমানিশা-পর্বের সমাপ্তি ঘটান। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের মানুষেরা পরদিন গৃহে গৃহে দীপ জ্বালাইয়া সেই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে। দীপাবলী উৎসবের পশ্চাতে এই ঘটনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

অপর একটি কিংবদন্তীর মধ্যে ইতিহাস ও লোককাহিনীর মিশ্রণ রহিয়াছে। কথিত আছে, শকরাজ দেবপুত্রশাহী যখন আর্যাবর্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, গুপ্তসম্রাট রামগুপ্ত তখন সিংহাসনে। রামগুপ্ত ছিলেন বিলাসী, দুর্বল ও কাপুরুষ। শক আক্রমণ প্রতিহত করিবার মতো সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তিনি শক নরপতির কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। শকরাজ শুনিয়াছিলেন রামগুপ্তের প্রধানা মহিষী ধ্রুবাদেবী অপরূপ সুন্দরী। তিনি উত্তরে জানাইলেন, একটি মাত্র শর্তেই তিনি আক্রমণ করা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন এবং তাহা হইল সম্রাজ্ঞী ধ্রুবাদেবীকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। রামগুপ্ত সেই হীন প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। নিরুপায় ধ্রুবাদেবী শরণাপন্ন হইলেন দেবর এবং যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের। নির্ধারিত সময়ে চন্দ্রগুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধ্রুবাদেবীর ছদ্মবেশে তাঞ্জামে আরোহণ করিয়া শকশিবিরে যাত্রা করিলেন। তাঞ্জামবাহক এবং ধ্রুবাদেবীর রক্ষী হিসাবে সঙ্গে চলিলেন কিছু নির্বাচিত সশস্ত্র যোদ্ধা এবং ধ্রুবাদেবীর সহচরী ও দাসী হিসাবে নারীবেশে চলিলেন কয়েক

শত সৈনিক। শকাশাবরে তখন ধ্রুবাদেবীর আগমন উপলক্ষে উৎসবের পরিবেশ। বলা বাহুল্য, অপ্রস্তুত শক সৈন্যগণকে তাহাদের পক্ষে পর্যুদস্ত করা কঠিন হইল না এবং শকরাজও ধ্রুবাদেবীবেশী চন্দ্রগুপ্তের হস্তে নিহত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই দিন শুধু ধ্রুবাদেবী তথা গুপ্ত রাজবংশের সম্মানই রক্ষা করিলেন না, তাঁহার শৌর্য ও কৌশলে শকগ্রাস হইতে ভারতবর্ষও রক্ষিত হইল। সেই দিনটি ছিল কার্তিকের অমাবস্যা। রাত্রির অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া গুপ্তরাজধানীর প্রজাবর্গ সেই দিন সহস্র সহস্র দীপমালায় নগরীকে সজ্জিত করিয়া আলোকোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দীপাবলী উৎসব 'শকারি' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের সেই গৌরবকাহিনীর স্মারক।

বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ (১।২৩।৪) এবং তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের মতে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান অবশ্য-করণীয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, পিতৃপক্ষের শেষদিন অর্থাৎ মহালয়ার দিন প্রাতে যমলোক বা প্রেতলোক হইতে শ্রাদ্ধগ্রহণের উদ্দেশে আগত পিতৃ-পুরুষগণ কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে যমলোকে বা পিতৃলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের সময় যাত্রাপথে আলোক প্রদর্শনের জন্য উল্কাদান বা আলোকসজ্জা করিতে হয়। তাঁহারা যাহাতে অন্ধকার যমলোক বা প্রেতলোক হইতে জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক-প্রাপ্ত হন তাহাও সম্ভবতঃ উল্কাদানের উদ্দেশ্য। বলা হয়, যে-সকল দুর্বুদ্ধি ঐদিন উল্কাদান না করে তাহাদের পিতৃগণ নিরাশ হইয়া বংশধরগণকে কঠোর অভিশাপ প্রদান করিয়া যান। এই বিশ্বাস হইতে কার্তিক অমাবস্যায় দীপদান এবং আধুনিক কালে তৎসহ আতসবাজি পোড়াইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গদেশে দীপাবলী বা দেওয়ালী বলিতে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত কালীপূজা বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে দেওয়ালী এবং কালীপূজা সমার্থক হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের অন্যত্র দেওয়ালীর সঙ্গে কালীপূজার কোন সম্পর্ক নাই। সেখানে দেওয়ালী একটি স্বতন্ত্র উৎসব। বঙ্গদেশেও সম্ভবতঃ প্রথমে তাহাই ছিল। কালীপূজা পরবর্তী কালে তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে কালী-মূর্তির পূজা প্রাচীন অনুষ্ঠান নহে। মাত্র চারশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে উহার প্রচলন হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মূর্তি গড়িয়া বর্তমানে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। (দ্রঃ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ২৭৬ এবং Hindu Religion and Iconology, 1981, p. 3) কেহ কেহ কালীপূজার প্রাচীনত্বকে আরও তিনশত অথবা চারশত বৎসর পিছাইয়া দিবার পক্ষপাতী। কারণ আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে (১।২৩।১২-১৪,১৬) কালীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে আগমবাগীশ-প্রবর্তিত কালীমূর্তির নিবিড় সাদৃশ্য রহিয়াছে। ('কালীদেবীর মূর্তিতত্ত্ব'—ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশ, ১৭.১০.১৯৮৭, পৃঃ ১৫) প্রাচীনতর আর কোন গ্রন্থে কালীপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। (ভারতকোষ, চতুর্থ খণ্ড, 'দেওয়ালী' দ্রষ্টব্য।)

দীপাবলী বা দেওয়ালী হইল দীপমালা বা দীপদানের উৎসব। এই উৎসবে প্রদীপ বা বাতি দিয়া গৃহ, মন্দির, পূজামণ্ডপ ইত্যাদি সজ্জিত করা হয়। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে (১।২৩।১০) কালী-পূজার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেবীর জবানীতে দীপমালা দানের কথা বলা হইয়াছে। কালীপূজার পক্ষে প্রশস্ত কার্তিক মাসের অমাবস্যা 'দীপান্বিতা' অমাবস্যা বলিয়াও বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে (১।২৩।৪) অভিহিত হইয়াছে। মনে হয় কালীপূজার সঙ্গে দীপমালার এই সংযোগ হইতেই ক্রমে বঙ্গদেশে দীপাবলী ও কালীপূজা অভিন্ন হইয়া গিয়াছে

বঙ্গদেশে প্রচলিত কালীপূজার সঙ্গে দীপাবলীর একাত্মীকরণের একটি প্রতীকী তাৎপর্য রহিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে বলা হইতেছে, কার্তিক মাসের 'দীপান্বিতা' অমাবস্যার গভীর নিশীথে দেবী কালিকার আবির্ভাব হইয়াছিলঃ

> রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামমাবস্যাগিহৈব তু।
> পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্বসনাম্বিকা॥
> অসুরাণাং বধার্থায় ভবায় চ সুপর্বাণাম্।
> যদা চকম্পে পৃথিবী তদ্ভারাসহনেন হি॥
> তদা শিবঃ শবো ভূত্বা তাং দধার ত্রিলোচনাম্।
> তদা সর্বে স্থিরীভূতাঃ কূর্মশেষধরাদয়ঃ॥
> (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, ১।২৩।৬-৮)

—অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গা দিগ্বসনা কালীরূপে অসুরগণকে সংহার এবং সুরগণের মঙ্গলের জন্য দীপান্বিতা অমাবস্যার নিশীথকালে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পদভারে পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে। তখন শিব শবরূপে অবলম্বন

করিয়া সেই ত্রিলোচনাকে ধারণ করিলেন। তাহাতে কূর্ম, অনন্তনাগ এবং বসুন্ধরা স্থিরতা প্রাপ্ত হইল। [কিংবদন্তী রহিয়াছে কূর্ম ও অনন্তনাগ-রূপে ভগবান ভূ-ভার ধারণ করিয়া আছেন। তাহাতেই পৃথিবী স্থিরত্ব পাইতেছে।]

অসুরত্রাসমুক্ত বসুন্ধরার কৃতজ্ঞতাই কি তাহা হইলে আলোকোৎসবরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে?

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে কার্তিক মাসের অমাবস্যাকে 'দীপান্বিতা অমাবস্যা' বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে দীপমালা দেবী কালিকার পূজার একটি আবশ্যিক অঙ্গ। দীপমালার সঙ্গে গীত বাদ্য ও নৃত্যের কথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ রাত্রিতে এমন আলোকময় বর্ণাঢ্য এক উৎসবের পরিবেশ রচনা করিতে হইবে যাহাতে অমাবস্যা 'দীপান্বিতা' (দীপৈঃ অন্বিতা=দীপমণ্ডিত) হইয়া যেন পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই সম্ভবতঃ কোথাও কোথাও দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার প্রথা। অসুরদের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অন্ধকারময় অধ্যায়ের অবসান ঘটাইয়া দেবতাদের জীবনে আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন আলোকময়ী কালী। তাহারই স্মরণে হিন্দুরা অমাবস্যাকে দীপান্বিতা করিয়া আনন্দে মগ্ন হইতে চাহে, প্রাত্যহিক জীবনের অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তরণের স্বপ্ন দেখে। তাহাই রূপলাভ করিয়াছে দীপাবলীতে। ক্রমে দীপাবলী অঙ্গাঙ্গিভাবে সমার্থক হইয়া গিয়াছে কালীপূজার সহিত।

এই উৎসবের মাধ্যমে যেন বাঙালীর দেবীকে আপন পরিবারের সদস্য করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। দেবী আসিবেন বলিয়া কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষে আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে সন্ধ্যার পর আকাশবাতি দেওয়া হয়। ভাবটি হইল এই: এই আমার গৃহ, যাহাতে তোমার চিনিতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য আমি আকাশবাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। অমাবস্যার নিশীথে তো তুমি পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। স্বর্গ হইতে তুমি আমার গৃহটিকে দেখিয়া রাখ। তোমার দাক্ষিণ্য-দৃষ্টি আমার গৃহের উপর পতিত হউক।

এই ভাব বাঙালীর নিজস্ব। ইহা নিতান্তই বাঙালীর বৈশিষ্ট্যমূলক (typical) মানসিকতা। ইহাই গিরিরাজ ও গিরিরানীর কন্যা উমাকে তাহাদের ঘরের কন্যায় পরিণত করিয়াছে। কালী-পূজায় দীপদানের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'আমরা' কবিতায় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন: "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি।"

দীপাবলী আসলে আলোর জন্য অন্ধকারের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী অনুষ্ঠান। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষেরও চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। যেমন, ইংরেজ কবি শেলী লিখিয়াছেন, "The desire of the moth for the star,/Of the night for the morrow" —আগুনের জন্য পতঙ্গের আলিঙ্গনের আকুতি, প্রভাতের জন্য রাত্রির আকাঙ্ক্ষা অপ্রতি-রোধ্য। গভীরতম তমিস্রার প্রতীক অমাবস্যা। তাই বঙ্গদেশে কার্তিক অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে আলোকের উৎসস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি কালীর, কোথাও কোথাও লক্ষ্মীর আরাধনার আয়োজন; আয়োজন গৃহে, মণ্ডপে, মন্দিরে আলোকের উৎসব দীপাবলীর।

প্রকৃত অন্ধকার হইল স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, লোভ, হিংসা, ভোগসর্বস্বতা। আমরা তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কার্তিক অমাবস্যায় গৃহে, মণ্ডপে, মন্দিরে দীপা-বলীর উৎসব করিয়া সেই আকুতিকেই রূপদান করিতে চাহিয়াছেন।

গৃহ, মণ্ডপ বা মন্দির হইল বস্তুতঃপক্ষে আমাদের হৃদয়গুহা বা হৃদয়মন্দিরের রূপক। সেখানেই দেবীর অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের নিত্য অবস্থান। গৃহে, মণ্ডপে অথবা মন্দিরে দীপোৎসব করিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের আপন হৃদয়-কেই আলোকিত করিতে চাহি। উজ্জ্বল দীপালোকে সেখানে দেখিতে চাহি ব্রহ্মময়ীর তথা আপন স্বরূপের মুখ। বাহিরের উৎসব তাহারই স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অনবদ্য কথাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি:

"হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়! 'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১৪১)

"দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেবলে দিতে হয়। 'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'।" (ঐ, পৃঃ ১৯৩)

দীপাবলীর মাধ্যমে আমরা আমাদের জ্যোতিষ্মান্ স্বরূপের সন্ধান করিতে চাহি, পৌঁছাইতে চাহি আলোকসমুদ্রের তীরে। দীপাবলীর তমোঘ্ন প্রদীপ আমাদের প্রাণের আলো এবং মিলনের প্রতীক হইয়া উঠে।

ধারাবাহিক নিবন্ধ

সকলের মা সারদা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

(শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর)

মাদ্রাজে গেছেন শ্রীমা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর আন্তরিক আগ্রহে। মাদ্রাজীরা শ্রীমায়ের ভাষা বোঝেন না, আর শ্রীমাও জানেন না তাঁদের ভাষা। কিন্তু দীক্ষাদানের সময় কোন প্রয়োজন হলো না দোভাষীর। শ্রীমা নিজেই মন্ত্র, জপ-প্রণালী ও ধ্যানের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেন তাঁদেরকে। এ যে চিরন্তন সন্তান-জননীর গভীর সম্পর্ক। বাঙ্গালোরে এসেছেন শ্রীমা। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শ্রীমাকে গাড়ি করে মন্দিরাদি দর্শন করিয়ে ফিরছেন আশ্রমে। আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভক্তদের বিশাল সমাবেশ। গাড়ি থেকে নেমেই শ্রীমা অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মানা। চারিদিকে যেন হিমালয়ের নিস্তব্ধতা। আশ্রমবাটিতে এসে উপবেশন করলেন শ্রীমা। ভক্তেরাও বসলেন। সবাই মৌন। কিন্তু সকলের মনে অপার শান্তি। ঘুচে গেল ভাষার ব্যবধান। তবু শ্রীমায়ের আপসোস—কথা বলা হলো না। একথা শ্রীমা বললেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সমবেত ভক্তদের তা জানালেন। ভক্তদের উত্তর, "না, না, এই বেশ, এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে—এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন দরকার নেই।" অন্তরের আকুতিই যে জননী ও সন্তানের ভাষা।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃস্নেহ শুধুমাত্র ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সর্বত্রপ্রবাহী মাতৃত্ব প্রসারিত হয়েছিল বিদেশীদের মধ্যেও ধর্ম, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি কোনকিছুই তাঁর মাতৃত্বের সীমানায় প্রবেশাধিকার পায়নি। তাই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী ইংরেজ সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন—"তারাও তো আমার ছেলে।" স্বদেশী আন্দোলনে যেসব ছেলেরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও যেমন শ্রীমায়ের আপন ছেলে, তাঁদের বিরোধীপক্ষ ইংরেজরাও তা-ই। সেই একই সমদৃষ্টি, সমস্নেহ, সমসন্তান-বাৎসল্য! শ্রীমা তাঁর মাতৃস্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের—মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী কৃষ্টিনকে। সমান আদর পেয়েছিলেন ভগিনী দেবমাতা ও অজ্ঞাতপরিচয় একজন পোলিশ মহিলা।

ওলিবুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে শ্রীমা 'আমার মেয়েরা' বলে আপন করে নিজের কোলে তুলে নিলেন প্রথম সাক্ষাতেই। তাঁদের মন থেকে সংকোচ মুছে দেবার জন্য তিনি তাঁদের সঙ্গেই খেয়েছিলেন। স্বামীজীর কাছে এই ঘটনা এক 'অদ্ভুত ব্যাপার' মনে হয়েছিল। কৃষ্টিন বা দেবমাতাও এ সৌভাগ্য থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হননি। তাঁদের কাছেও শ্রীমা ছিলেন 'আমাদের মা'। ওলিবুলের একান্ত অনুরোধেই ব্রীড়াশীলা শ্রীমা ফটো তোলাতে রাজি হয়েছিলেন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার আবাসে। অবশ্য প্রথমে রাজি ছিলেন না শ্রীমা। যখন ওলিবুল "মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব" বললেন, তখন কন্যার আবদারের কাছে হার মানলেন শ্রীমা। এইটি শ্রীমায়ের প্রথম ফটো যা এখন সর্বত্র পূজিত। ম্যাকলাউড আত্মহারা হতেন শ্রীমায়ের স্নেহে। বলতেন, "সারদাদেবী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না," "সারদাদেবী ছিলেন এই নতুন ধর্মসঙ্ঘের নিকটে মহিমময়ী মেরীমাতা।" ম্যাকলাউড উদ্বোধনে শ্রীমাকে দর্শন করে মঠে ফিরেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরে প্রণামাদি করে ফিরছেন নিজ আবাসে। সঙ্গে এক ব্রহ্মচারী আলো নিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। কিন্তু ম্যাকলা কোন হুঁশ নেই। ভাবের ঘোরে অস্ফুটস্বরে তিনি বলছেন : "আমি তাঁকে দেখেছি!" ব্রহ্মচারীর কানের কাছে মুখ এনে ম্যাকলাউড বলছেন : "পবিত্রতাস্বরূপিণী মা। আমি তাঁকে দেখেছি!" শ্রীমায়ের আদরের

'আমার খুকী' নিবেদিতা। শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিদেশী ভক্তদের মধ্যে নিবেদিতাই সবচেয়ে বেশি লাভ করেছিলেন শ্রীমায়ের পূতসঙ্গ। তাঁর পত্রে শ্রীমায়ের কত কথাই না রয়েছে! পড়লে অবাক হতে হয়। নিবেদিতার কাছে শ্রীমা ধরা দিয়েছেন বিভিন্নরূপে। নিবেদিতা লিখেছেন ঃ "কিন্তু তবু আমার দৃষ্টিতে, তাঁহার পবিত্রতা যেমন চমকপ্রদ ছিল, তেমনি অপূর্ব ছিল তাঁহার সুমার্জিত সৌজন্য এবং অপরের ভাব বুঝিবার মতো পরম উদার মন।" "তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।" "সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র, যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা অসহায়।" দেবমাতা ছিলেন শ্রীমায়ের 'আদরের কন্যা'। প্রথম দর্শনেই শ্রীমার স্নিগ্ধ স্নেহের স্বর—"ওমা দেবমাতা! দেবমাতা!" মাথায় হাত রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। দেবমাতার হৃদয়ানুভব ঃ "তাঁর স্পর্শে আমার অন্তর হতে নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করে তুলল।" শ্রীমা বিদেশীদের ভাষা বুঝতেন না, তাঁরাও মায়ের ভাষা বুঝতেন না। সেবকরা কেউ মায়ের কথা ইংরেজীতে এবং বিদেশীদের কথা বাঙলাতে বলে 'ইনটার-প্রেটারের' কাজ করতেন। কিন্তু এমনও অনেক সময় হয়েছে যখন সেবকরা কেউ উপস্থিত নেই। "তখন তিনি হৃদয়ের অকথিত গভীরতর ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে-ভাষা বুঝতে আমাদের কারোরই কোন অসুবিধা কখনো হতো না"—একথা বলেছেন বিদেশীরাই। দেবমাতার কাছে শ্রীমা প্রতিভাত হয়েছিলেন, 'রাজরাজে-শ্বরীর মহিমায়'। "করুণা, ভক্তি এবং ঈশ্বরানু-ভূতি—এই ছিল শ্রীমার সহজাত স্বভাব।... তাঁর প্রাণজুড়ানো আশীর্বচনের একটি শব্দ, কিংবা ক্ষণিক স্পর্শের মধ্যে এই গুণগুলির অস্তিত্ব অনুভূত হতো।" অপরিচিতা এক বিদেশিনীকে 'এস মা' বলে শ্রীমা জানালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। বিদেশী কায়দায় 'হ্যান্ড শেক'ও করলেন তাঁর সঙ্গে। আবার সনাতন ভারতীয় রীতিতে কন্যাকে চুমুও খেলেন তিনি। মহিলা এসেছিলেন শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে তাঁর অসুস্থা মেয়ের জন্য। শ্রীমায়ের প্রাণঢালা আশীর্বাদে তাঁর মেয়ে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে মহিলাটি দীক্ষা নিয়ে শ্রীমায়ের আপন কন্যা হয়ে গেলেন। শ্রীমা হলেন বিদেশিনীদেরও মা।

শ্রীমা ছিলেন ডাক্তারদের মা। বিভিন্ন সময়ে শ্রীমায়ের অসুখের চিকিৎসাদি করেছিলেন প্রায় এক ডজন ডাক্তার—এ্যালোপ্যাথিক, হোমিও-প্যাথিক, কবিরাজ। কেউ চিকিৎসা করেছেন কলকাতায়, কেউ বা জয়রামবাটীতে অথবা কোয়ালপাড়ায়। বিপিনচন্দ্র ঘোষ ও স্বামী সারদানন্দজীর ভাই সতীশ চক্রবর্তী ছিলেন মায়ের ডাক্তার। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্য। কয়েকজন ছিলেন শ্রীমায়ের দীক্ষিত ডাক্তার-সন্তান—কাঞ্জিলাল, সজনীবাবু, লালবিহারী সেন ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ। তাঁদেরও যে মা হবেন শ্রীমা—এতো স্বাভাবিক। কিন্তু খ্রীস্টান এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার প্রাণধন বসুর মা হয়ে গেলেন শ্রীমা। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। শ্রীমায়ের তখন শেষ-অসুখ। ডাকা হলো প্রাণধন বসুকে। তখনকার দিনে প্রাণধন বসুর ভিজিট ষোল টাকা ও গাড়িভাড়া পাঁচ টাকা। নিলেনও প্রথম দিন। একদিন প্রচুর ফল, মিষ্টি, প্রভৃতি তাঁকে দেওয়া হলো শ্রীমায়ের আদেশে। পরের দিন শ্রীমাকে দেখতে এসে দৃষ্টি পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির ওপর। স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি?" উত্তরে স্বামী সারদানন্দজী সব খুলে বললেন। পরি-বর্তন হলো খ্রীস্টান ডাক্তারের হৃদয় ও মনের। আর কোন ভিজিট নিলেন না। শ্রীমায়ের যখন চিকিৎসার পরিবর্তন হলো তখনো নিজের খরচে দর্শন করতে আসতেন শ্রীমাকে। এভাবে কবিরাজ রাজেন সেন, কালীভূষণ সেন ও শ্যামাদাস বাচস্পতি শ্রীমায়ের স্নেহডোরে বাঁধা পড়েছিলেন। তাঁরা এলেই শ্রীমা সেবকদের বলতেন, "জল খেতে দাও, সন্দেশ খেতে দাও, আম খেতে দাও।"

ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য ও ডাঃ নীলরতন সরকারও তাঁর মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি।

শ্রীমা বাগবাজারের বাড়িতে আছেন। বাগবাজারে থাকেন স্বামী সারদানন্দজীর 'দোস্ত' পানাসক্ত 'পদ্মবিনোদ'—বিনোদবিহারী সোম। 'প্রফুল্ল', 'ম্যাকবেথ', 'জনা' প্রভৃতি নাটকের অভিনেতা তিনি। মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের ছাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য পদ্মবিনোদ। আকণ্ঠ মদ্যপান করে রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেন। 'দোস্ত'কেও ডাকাডাকি করতেন তিনি। কিন্তু কেউ সাড়া দিতেন না। একরাত্রে কারুর আওয়াজ না পেয়ে পদ্মবিনোদ গান ধরলেন নেশার ঝোঁকে—"উঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার।" ইত্যাদি। গান শেষে শ্রীমায়ের জানালা গেল খুলে। তৃপ্তি সহকারে পদ্মবিনোদ বললেন, "উঠেছ মা? ছেলের ডাক শুনেছ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" বলে গড়াগড়ি দিলেন রাস্তায়। রাস্তার ধূলি নিলেন মাথায়। গান ধরলেন—"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।/মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।" তারপর আখর দিলেন সজোরে "তুই দেখ আর আমি দেখি, দোস্ত যেন নাহি দেখে।" পরের দিন শ্রীমা খোঁজ নিলেন ছেলেটির। সব শুনে বললেন, "দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে।" পরে ভক্তেরা অনুযোগ করলে স্নেহময়ী শ্রীমায়ের উত্তর ঃ "ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে।" শ্রীমা হলেন মাতালের মা।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মা শ্রীমা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রীমা গিয়েছেন রঙ্গমঞ্চে। অভিনয় দেখেছেন। স্নেহাশিস দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরকে শ্রীমা তাঁর মাতৃকোলে স্থান দিয়েছেন পরম যতনে, পরম মমতায়। তৎকালীন সমাজে অপাঙক্তেয় নট-নটীদেরকে শ্রীমা একাসনে বসিয়েছিলেন তাঁর অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে। মায়ের স্নেহ-যত্নে অভিভূত অথবা সংসার-তাপে ক্লিষ্ট গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসের জন্য শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন একদা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে বুদ্ধিমান গিরিশ শ্রীমাকে বুঝিয়েছিলেন নিপুণ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা। অবিচলিত শ্রীমা সম্মতিদান করেননি তাঁর প্রার্থনায়। এই গিরিশের আমন্ত্রণে শ্রীমা গিয়েছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' অভিনয় দর্শন করতে। গিরিশের বাড়িতে দুর্গাপুজোয় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী শ্রীমায়ের পবিত্র চরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে সার্থক করেছিলেন নিজেদের জীবন। এই মিনার্ভা থিয়েটারে 'রামানুজ' অভিনয় দেখেছেন নট অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে। নাটকে লক্ষ্মণের কলহপরায়ণা স্ত্রী চমম্বার ভূমিকায় অবতীর্ণা নীরদাসুন্দরী। অভিনয় শেষে নীরদাকে ডেকে পাঠালেন শ্রীমা। পোশাক পরা অবস্থায় নীরদা দৌড়লেন শ্রীমায়ের কাছে। তাঁকে কাছে টেনে নিলেন, সস্নেহে চুম্বন করলেন শ্রীমা। বারবধূ নীরদা অভিভূতা, বিস্মিতা। অভিনেতা অমৃতলাল স্বয়ং স্বীকার করেছেন—তাঁর অভিনয়ের প্রেরণাদাত্রী শ্রীমা—"শক্তির সম্প্রচার করি, অলক্ষ্যে লেখনী ধরি।/শেখালে লীলার গীতি কত ভক্তজনে।" অভিনেত্রী তারাসুন্দরী মাতৃসন্দর্শনে এসেছেন উদ্বোধনে। মৃদুস্বরে আলাপ হচ্ছে মায়ে-ঝিয়ে। শ্রীমায়ের আদেশে তারাসুন্দরী শোনালেন 'জনা' নাটকের প্রবীরের বীররসাত্মক সংলাপ। 'মেয়ে' তারাসুন্দরী এমনি করে শ্রীমায়ের কাছে এসে শান্তি পেত মনে। 'বিল্বমঙ্গল'-এর পাগলিনীর ভূমিকার অভিনেত্রী নটী তিনকড়িও শ্রীমায়ের কাছে আসতেন। একদিন শ্রীমায়ের আদেশে তিনকড়ি শুনিয়েছিলেন পাগলিনীর গান—'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে'। ভাবাবিষ্টা শ্রীমা পরম স্নেহে অভিনন্দন জানালেন—"আজ কি গানই শোনালি মা!" এঁদের শ্রীমা যত্নের সঙ্গে প্রসাদ দিতেন, স্বহস্তে দিতেন পান। অভিনেতা অপরেশচন্দ্র লিখেছেন ঃ "মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোন পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া

গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না —সে দয়ার পাত্র-পাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোনও বিধিনিষেধ মানে না, সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"

শ্রীমায়ের এক দীক্ষিত ভক্ত নীচু জাতের। চলাফেরায় তাই তার বড়ই সংকোচ। দৃষ্টি এড়াল না শ্রীমায়ের। বললেন : "তুমি সঙ্কোচ করছ? তাতে কি বাবা! তুমি যে ঠাকুরের গণ —ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।" শ্রীমা তাকে 'ঘরের ছেলে' করে নিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমী। সকল ভক্তেরা একের পর এক শ্রীমায়ের চরণে দিচ্ছেন পুষ্পাঞ্জলি। তাজপুরের এক বাগদী অপলক নয়নে চেয়ে আছে। তার মনের তীব্র ইচ্ছা অপর সকলের মতো সেও শ্রীমায়ের চরণে ফুল দেয়। কিন্তু জাতে বাগদী। পাছে লোকে কিছু বলে, তাই বড়ই দ্বিধা। শ্রীমায়ের কিন্তু তীক্ষ্ন নজর। তাকে ডেকে বললেন পায়ে ফুল দিতে। মাতৃচরণ পূজা করে প্রফুল্লবদনে 'মায়ের ছেলে' চলে গেল। শ্রীমা কামারপুকুরে। 'সাগরের মা' নামে এক নিম্নবর্ণের মহিলা শ্রীমায়ের বাড়িতে কাজ করে দেয়। সেও বঞ্চিত হয়নি শ্রীমায়ের স্নেহ থেকে। প্রতিদিন মহিলাটি কাজে এলেই শ্রীমা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলতেন: "আগে মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে পরে কাজে লেগো।" শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় 'জগদম্বা আশ্রমে। এক ডোমের মেয়েকে তার উপপতি ত্যাগ করেছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। অকূলের কূল শ্রীমায়ের কাছে সে সব বলল অকপটে। শ্রীমা ডাকালেন লোকটিকে। স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে শ্রীমা বললেন : "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে ; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে —নরকেও স্থান পাবে না।" শ্রীমায়ের অপরাজেয় মাতৃশক্তির কাছে ডোমের মন গলল। মেয়েটিরও গতি হলো। শ্রীমায়ের সেবক স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন : "মায়ের বাড়িতে কুলি-মজুর, গাড়িওয়ালা, পাল্কি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যেই আসুক সকলেই মায়ের ছেলে-মেয়ে। সকলেই ভক্তের মতো স্নেহ-আদর পায়। সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি ইহ-পরকালে কেউই আর ভুলতে পারবে না। যদি বা কোন সময়ে বিস্মরণ হয়, দুঃখকষ্টে পড়লেই মনে ভেসে উঠবে সেই স্নেহকোমল কৃপাদৃষ্টি।" শ্রীমা সারদা ছিলেন নীচজাতি, অবহেলিতদের মা।

শুধু মানুষই নয়। শ্রীমা সারদা পশু-পাখি, ইতরপ্রাণীরও মা। সামান্য একটি বিড়ালকেও অবহেলা করা পছন্দ করতেন না। রাধুর পোষা বিড়াল শ্রীমায়ের কাছে নির্ভয়ে আশ্রয় নিত। বিড়ালের জন্য শ্রীমা নিয়মিত দুধের বন্দোবস্ত করেছিলেন। বিড়াল চুরি করে খাওয়াতে কেউ অনুযোগ করলে শ্রীমা বলতেন : "চুরি করা তো ওদের ধর্ম বাবা। কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে?" কলকাতা যাবার সময় শ্রীমা জ্ঞান মহারাজকে বললেন : "দেখ জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না, ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।"

তুচ্ছ ঝাঁটাটির প্রতিও তাঁর স্নেহদৃষ্টি! একদিন জয়রামবাটীতে গৃহকর্মে নিযুক্ত একজন স্ত্রীলোক ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটি ছুঁড়ে একদিকে ফেলে রাখলে শ্রীমা বললেন, ঝাঁটাটিকেও সম্মান দিতে হয়। সামান্য কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। ছোট জিনিস বলে তুচ্ছ করতে নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধরাধামে থাকতেই 'মা'-ডাকের আস্বাদ কিছু পেয়েছিলেন শ্রীমা। কিন্তু তৃপ্ত পাননি তিনি। মন খারাপ করে একদিন তিনি ভাবছেন কামারপুকুরে— ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন : "ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এইসব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা, মা বলে ডাকবে।" রত্ন-ছেলে নরেন, রাখাল, তারক, শরৎ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, যোগীন প্রমুখ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শেষের লাইনটি। তারও আগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী দেবীর অনুশোচনার উত্তরে বলেছিলেন : "শাশুড়ী ঠাকরুন, আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলে-মেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা'-ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"

শ্রীমাকে তিনিই বলেছিলেনঃ "এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি কে তখন বুঝতে পেরেছিল? 'মা-ডাকের' জ্বালা মর্মে মর্মে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা শ্রীমা অনুভব করেছিলেন। অনুধাবন করতে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যের গভীর মর্মার্থ। সকলকে তিনি কোল দিয়েছেন, আপন করে নিয়েছেন সবাইকে একই মাতৃস্নেহে। আগেই বলা হয়েছে, জাতির প্রশ্ন, বর্ণের ভেদ কোনদিন তাঁর কাছে কোন স্থান পায়নি। দেশের গণ্ডি, ধর্মের সীমা, সম্প্রদায়ের বাঁধন অতিক্রম করে তাঁর অপার মাতৃস্নেহ বিস্তৃত হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

শ্রীমা সারদা তাঁর অলৌকিক মাতৃস্নেহে ধারণ করে আছেন লতা-গুল্ম-বৃক্ষ, পশু-পক্ষী-পতঙ্গ, ধনবান-ঐশ্বর্যবান, দরিদ্র-অভাবী, নষ্টা-ভ্রষ্টা, সতী-পুণ্যবতী, সৎ-মহৎ, সাধু-সজ্জন, পাপী-পতিত থেকে অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই সারদা সকলের মা। শ্রীমায়ের সারা জীবনের খুঁটিনাটি সকল ঘটনাই এই সত্যের সাক্ষী।

একটা গভীর অধ্যাত্ম ধারণা—বারে বারে অবতারগণ আসেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং—সব অবতারের অবতারী। স্বামীজীরও গভীর উপলব্ধিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ। উপলব্ধি-মান সাধক-পণ্ডিত গৌরী বলেছিলেনঃ যাঁর অংশ থেকে যুগে যুগে অবতারগণ আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তিনিই। শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু ভবতারিণীর অবতার বলেও গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে উপলব্ধি করেন মা সারদা ও ভবতারিণী অভেদ। তবে কি এবারের অবতারের অবতারী মা সারদা? তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণে এত বিনয়, এত মাধুর্য, যেখানে শান্তভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠার কর্মব্যস্ততা থাকলেও দুষ্কৃতদের বিনাশের কোন দাপট নেই। মাতৃ-শক্তির অবতারত্বের প্রভাব সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিকতায় উত্তারিত করবে। তাদের বিনাশের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং মহা সৌভাগ্য, বড় আশা ও আনন্দের সংবাদ যে, এবারে শ্রীশ্রীজগজ্জননী ভবতারিণী স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন ধরাধামে রামকৃষ্ণ-সারদারূপে বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতার ঊর্ধ্বে মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিতে, সত্য পথে নিয়ন্ত্রিত করতে, পরমার্থলাভে ধন্য করতে। যিনি জগজ্জননী তিনিই ভবতারিণী, তিনিই মা সারদা। তাই সকলের মা শ্রীসারদা।

সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিবা অবসানে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কুঠিবাড়ির ছাদের ওপর উঠে বিশ্ববাসীকে বৈদিক ঋষির মতো আহ্বান করেছিলেন অমৃতের সন্ধান দিতে, সকলের মা সারদাও দেবীসূক্তের ভাষায় যেন বললেন :

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবাঃ ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥

—আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি। অতএব যজ্ঞার্হ-গণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজ-মানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।

প্রমাণিত করলেন অতি সাধারণ জীবনচর্যার মাধ্যমে জগজ্জননীর সর্বক্ষেত্রে মাতৃত্বের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। মাতৃস্নেহের জোয়ারে বিশ্বে এনে দিলেন বিশ্বপ্রসবিনীর করুণাধারা। অভয়া অভয় দিলেন, "মনে রেখো তোমার একজন মা আছেন।" জয় মা! জয় মা!

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

[সমাপ্ত]

প্রবন্ধ

মহাশক্তি কালী

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় সেখানে বহু দেবতার স্তব-স্তুতি বর্তমান। তখনকার মানুষ প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিল যে, প্রকৃতিতে চলছে বিভিন্ন শক্তির অবিরাম খেলা। প্রকৃতিতে সে নিরীক্ষণ করেছিল দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তাপ, রাত্রে গহন অন্ধকার; নিরীক্ষণ করেছিল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চোখ-ধাঁধানো ক্ষণিকের বিদ্যুঝলক, বজ্রের নির্ঘোষ, মুহূর্তে প্রাণবিধ্বংসী বজ্রপাত ও অবিশ্রান্ত বর্ষণ; নিরীক্ষণ করেছিল প্রবল ঝঞ্ঝা, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি ও বিস্তীর্ণ প্লাবন। অনুভব করেছিল প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্ম। আবার সে নিরীক্ষণ করেছিল শান্ত-স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ, নক্ষত্রখচিত নির্মল আকাশ, মৃদুমন্দ-প্রবাহিত প্রাণজুড়ানো শীতল সমীরণ, ফুলে-ফলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রকৃতির করাল ও কোমল উভয় রূপের মধ্যেই তখনকার মানুষ লক্ষ্য করেছিল বিচিত্র শক্তির প্রকাশ। এতে সে কখনো হয়েছিল ভীত, কখনো হয়েছিল বিস্মিত। সে এও বুঝতে পেরেছিল—এসকল শক্তি তার নাগালের বাইরে, এসকল শক্তির কাছে সে অতি অসহায়। তাই যেখানে যেখানে মানুষ প্রকৃতির শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখেছে তার পিছনেই সে এক-একজন শক্তিমানের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। সেসকল শক্তিমানদের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে দেবতা অর্থাৎ দ্যুতিমান বা প্রকাশশীল। আবার মানুষ এও লক্ষ্য করেছিল, প্রকৃতিতে প্রকাশিত শক্তিসমূহের ধ্বংসাত্মক ও কল্যাণকর ক্ষমতা সমান নয়।

এই তারতম্যানুসারে দেবতাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্থান-নির্দেশও হয়েছে। এজন্য দেখা যায়, বৈদিক ঋষিদের রচিত স্তোত্রাদিতে সকল দেবতার মহিমা সমভাবে কীর্তিত হয়নি। এই সকল মহিমান্বিত দেবতাদের মধ্যে দেব ও দেবী উভয়ই আছেন এবং মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের উপাসনা করেছে।

পরবর্তী কালে উপনিষদের যুগে বা দার্শনিক যুগে উপাস্য সকল দেব-দেবীকে একটি মাত্র পরম সত্তার প্রকাশ বলে ভাবনা করা হয়েছে। ভাবনা করা হয়েছে—প্রকৃতিতে বিভিন্নভাবে যেসব শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে তা এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ। সেই পরম সত্তাকেই উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা আত্মা। উপনিষদে এই ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—তিনি নিরাকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সত্তা। এই ব্রহ্ম থেকেই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্ভব হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—ব্রহ্মের সত্ত্ব-রজ-তম-গুণাত্মক অঘটন-ঘটনপটীয়সী অনির্বচনীয়া এক শক্তি আছে যা থেকে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্ভব হয়। ব্রহ্ম তার প্রকৃত স্বরূপে অবস্থায় নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয় হলেও তিনি যখন তাঁর অনির্বচনীয় শক্তিসহায়ে সৃষ্টি-উন্মুখ হন, তখন তিনি হন সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম। এই সগুণ-সক্রিয় ব্রহ্মই পুরাণশাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে কীর্তিত। যখন তিনি সৃষ্টি করেন তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন স্থিতি বা পালন করেন তখন বিষ্ণু আর যখন সংহার করেন তখন শিব বা রুদ্র। আর ব্রহ্ম যে অনির্বচনীয় শক্তিবলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন সে-শক্তিকেই মহামায়া, যোগমায়া বা মহাদেবীরূপে অভিহিত করা হয়েছে পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে। শাক্তসাধনার উপাস্য দেবতা হলেন এই মহাদেবী। এক মহাদেবীই এসকল শাস্ত্রে বহু নামে ও বহু রূপে স্তুতা হয়েছেন। তিনিই মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা, দক্ষসুতা সতী, হিমালয়-দুহিতা উমা বা হৈমবতী, শিবগেহিনী শিবানী। শীতলা মনসা এবং অন্যান্য গ্রাম্য দেবীগণও তাঁরই এক-একটি রূপ।[১] নাম ও রূপভেদে এঁরা ভিন্ন কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্না। এবিষয়ে বহু স্তব-স্তুতি ও কাহিনী পুরাণে বিদ্যমান। এ-সম্পর্কে দেবী-পুরাণের একটি শ্লোক উল্লেখ্য ঃ

> নামভেদাদ্ ভবেদ্ ভিন্না ন ভিন্না পরমার্থতঃ।
> শিবা নারায়ণী গৌরী চর্চিকা বিমলা উমা ॥

১ বহ্ব্যঃ সত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতে কলাঃ ॥—দেবীভাগবত, ৯।১।১৩৬

তারা শ্বেতা মহাশ্বেতা অম্বিকা শিবশাসনাৎ।[২]

—অর্থাৎ তিনি এক হয়েও শিবের আদেশে শিবা, নারায়ণী, গৌরী, চর্চিকা, বিমলা, উমা, তারা, শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও অম্বিকা—এই সকল নামে বিভিন্না হয়েছেন। কিন্তু পরমার্থতঃ (তত্ত্বতঃ) ভিন্না নন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা পাই—দেবী চণ্ডিকা যখন বহু দেবী পরিবেষ্টিতা হয়ে দৈত্যরাজ শুম্ভের সৈন্যসমূহ এবং তার প্রিয় ভ্রাতা মহাসুর নিশুম্ভকে নিধন করলেন তখন দৈত্যরাজ শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে অত্যন্ত ক্রোধভরে দেবীকে বললেন ঃ

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাস্যাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥

(চণ্ডী, ১০।৩)

—হে বলগর্বে দুর্গা! তুমি গর্ব করো না; কারণ অতি গর্বিতা হয়েও তুমি অন্যান্য দেবীগণের শক্তি আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ। অর্থাৎ একা তোমার যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা নেই; যদি ক্ষমতা থাকে একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন দেবী শুম্ভকে বললেন ঃ

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়॥

(ঐ, ১০।৫)

—একমাত্র আমিই জগতে বিরাজিতা। আমি ছাড়া জগতে অন্য দ্বিতীয়া আর কে আছে? ওরে দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই অভিন্না বিভূতি, এই দেখ, এরা আমাতেই বিলীন হচ্ছে ঃ

অতঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা।

(ঐ, ১০।৬)

—অতঃপর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ দেবীগণ দেবী চণ্ডিকার শরীরে বিলীন হলেন। চণ্ডিকা একাকিনীই রইলেন এবং একাই যুদ্ধ করে শুম্ভকে নিধন করলেন।

দশমহাবিদ্যার কাহিনী থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিভিন্ন দেবীমূর্তি এক মহাদেবীরই বিভিন্ন রূপ। কাহিনীটি হলো শিবপত্নী দক্ষসুতা সতী দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা করলে শিব বললেন, বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাওয়া উচিত নয়। তাতে অসম্মান হবে। সতী তবু অনুমতির জন্য শিবকে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় শিব বিরক্ত হয়ে সতীকে বললেন ঃ

জানামি বাগ্‌বহির্ভূতাং ত্বামহং দক্ষকন্যকে।
যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে॥[৩]

—আমি জানি তুমি আমার কথার বাধ্য নও। তোমার যা ইচ্ছা তা-ই কর। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করছ কেন? এই কথা শুনে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবেন—শিব আমাকে পত্নী হিসাবে পেয়ে আমার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন। এবার তাঁকে আমার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করাব। এই ভেবে দেবী ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি ধারণ করলেন। এই মূর্তি কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভা দিগম্বরী আলুলায়িতকেশা লোলজিহ্বা মুণ্ডমালিনী। এই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে শিব ভয়ে পলায়ন করতে চাইলেন। কিন্তু শিব যেদিকে যান সেদিকেই দেখেন এক-একটি ভয়ঙ্করী মূর্তি পথ আগলে আছেন। শিব আর পলায়নের পথ পাচ্ছেন না। শিব তখন ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন এবং পরে চোখ খুলে দেখেন সামনে সেই কালীমূর্তি। শিব তখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কে তুমি শ্যামা, আমার প্রাণবল্লভী সতী কোথায়?" শিবের এই অবস্থা দেখে দেবী দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "চিনতে পারছ না, আমিই তোমার সতী। আমি সৃষ্টি-সংহারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। তোমার বনিতা হওয়ার জন্যই গৌরবর্ণা হয়েছিলাম। আর দশদিকে মহা ভয়ঙ্করী যে-দশমূর্তি দেখেছ, সেসব আমারই মূর্তি। অতএব হে শম্ভু, ভয় করো না।"[৪] এখানে উল্লেখ্য যে, দেবী মহামায়াই ব্রহ্মার প্রার্থনায় শিবের পত্নী হওয়ার জন্য দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৫] সুতরাং পুরাণ শাস্ত্রসমূহ বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে সকল দেবীই তত্ত্বতঃ এক।

এই মহাদেবীরই একরূপ দেবী কালিকা বা কালী। উপরি-উক্ত দশমহাবিদ্যার কাহিনী থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় দেবী মহামায়ার এক প্রধান রূপই

২ দেবী-পুরাণ, ৯৮।৪-৫
৩ মহাভাগবত-পুরাণ, ৮ম অধ্যায়
৪ ঐ, এবং বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়
৫ কালিকা-পুরাণ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়

কালী। দেবী যে-দশটি রূপ ধারণ করে শিবের ভীতি উৎপাদন করেছিলেন সে-দশটি রূপ হলো ঃ

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা ॥[৬]

—মহাবিদ্যা কালী ও তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বিদ্যা ধূমাবতী, সিদ্ধবিদ্যা বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই হলেন দশমহাবিদ্যা। এঁদেরকে সিদ্ধবিদ্যাও বলা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেবীর প্রধান দশ রূপের মধ্যে প্রথম রূপই হলো কালী। দশমহাবিদ্যার কাহিনী ছাড়াও কালিকা ও মহাদেবীর অভিন্নত্ব প্রসঙ্গে নানা কাহিনী পুরাণসমূহে বর্ণিত আছে। কালিকাপুরাণের ৪১তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়—সতী যখন দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন সেসময় গিরিরাজ হিমালয় পত্নী মেনকা মহাদেবীর আরাধনায় নিমগ্না ছিলেন। তাঁর আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মহামায়া তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। মেনকা প্রথমে শতপুত্র ও পরে সুরূপা গুণশালিনী পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আনন্দদায়িনী এবং ত্রিভুবন-দুর্লভা একটি কন্যা প্রার্থনা করলেন। দেবী তখন মেনকার শতপুত্র হওয়ার বর দিয়ে বললেন ঃ

সুতা চ তব দেবানাং মানুষানাঞ্চ রক্ষসাম্।
হিতায় সর্বজগতাং ভবিষ্যাম্যহমেব তে ॥[৭]

—দেবতা রাক্ষস ও মনুষ্যের—সকল জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব। অতঃপর যথাকালে দেবী মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার গায়ের বর্ণ হয় 'নীলোৎপলদলানুগাম্' অর্থাৎ নীলপদ্মের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণ। কন্যার গাত্রবর্ণ শ্যামবর্ণ দেখে গিরিরাজ কন্যার নাম রাখলেন কালী। গিরিরাজ হিমালয়ের বন্ধু-বান্ধবগণ কন্যার নাম রাখলেন পার্বতী। তাঁরা তাকে কালী, গিরিনন্দিনী—এসকল নামেও ডাকতেন।

এই হিমালয়কন্যা কালীরই আরেক নাম উমা। কালিকাপুরাণের ৪৫তম অধ্যায়ে পাওয়া যায় উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। শিব একদিন গৌরবর্ণা অপ্সরাদের সম্মুখে কালীকে 'কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' অর্থাৎ 'হে অঞ্জনসদৃশ শ্যামলা কালি' বলে সম্বোধন করায় দেবী অপমানিতা বোধ করেন এবং গৌরাঙ্গী হওয়ার জন্য শিবেরই তপস্যা শুরু করেন। অতঃপর কঠোর তপস্যার পর শিবের বরে দেবী কালী গৌরবর্ণা হলেন। তখন তাঁর নাম হয় গৌরী।

চণ্ডীতে পাওয়া যাচ্ছে দেবী পার্বতীর শরীর-কোষ থেকে দেবী অম্বিকা বা কৌশিকী নির্গত হলে দেবী পার্বতীর রঙ কালো হয়ে যায় এবং তিনি কালিকা নামে খ্যাত হন ঃ

শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥[৮]

—অর্থাৎ পার্বতী দেবীর দেহকোষ থেকে অম্বিকা উৎপন্ন হয়েছেন বলে ত্রিজগতে তিনি (অম্বিকা) কৌশিকী নামে অভিহিতা। কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পর পার্বতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হলেন ও হিমালয়ে অধিষ্ঠিতা হয়ে কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হলেন। আবার চণ্ডীরই সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—দৈত্যরাজ শুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং অন্যান্য অসুরগণ হিমালয়-শৃঙ্গে সিংহের উপর সমাসীনা কৌশিকী (অম্বিকা) দেবীকে ধরবার জন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর নিকটবর্তী হলে দেবীর মুখমণ্ডল ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দেবীর ললাট থেকে খড়্গধারিণী ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী নির্গতা হন। এই কালীর নাম চামুণ্ডা। এসকল কাহিনী ছাড়া বহু স্তোত্রাদিতেও মহাদেবীর সঙ্গে কালীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। কালিকা-পুরাণে আছে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করছেন ঃ

নিতান্তনির্মলা ত্বং হি তামসী চ গীয়তে।
ত্বং হিংসা ত্বমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা ॥[৯]

—তুমিই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং তুমিই তামসী বলে বর্ণিত আছ; তুমিই হিংসা এবং অহিংসা, তুমিই কালী এবং চতুরাননা। এই পুরাণে মহাদেবী বহুবার 'কালী'রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

৬ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ১ম পটল, ৭-৮
৭ কালিকা-পুরাণ, ৪১।৩৪
৮ চণ্ডী, ৫।৮৭-৮৮
৯ কালিকা-পুরাণ, ৫।৩৫

দেবী কালিকার তত্ত্ব বা স্বরূপ এবং মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছেঃ "সচ্চিদানন্দস্বরূপেয়ং ব্রহ্মরূপাঽথ নির্গুণা।"[১০]—তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপা ও নির্গুণা। তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে তিনি নিগুর্ণা এবং সগুণা উভয় রূপেই কীর্তিতা—"সাকারাঽপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।[১১] তিনি সকলের আদি কিন্তু স্বয়ং অনাদি। তিনি সকলের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কর্ত্রী—"ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা।[১১] দেবী কালিকা থেকেই ব্রহ্মাদি দেবগণ উৎপন্ন এবং তাঁতেই লয় প্রাপ্ত হন। নির্বাণ-তন্ত্রে বলা হয়েছে—বৃক্ষ যেমন মাটিতে জন্মে ও মাটিতে মিশে যায়, বুদ্বুদ যেমন জলে জন্মে ও জলে মিশে যায়, তড়িৎ যেমন মেঘে উৎপন্ন হয় ও মেঘে বিলীন হয়, তেমনি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি দেবতারা দেবী কালিকা থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে তাঁতেই লীন হয়ঃ

জায়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথিব্যাং বিলীয়তে।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে।
জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে॥
তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াং প্রজায়তে (ন্তে)।
তথা প্রলয়কালে তু পুনঃ তস্যাং প্রলীয়তে (ন্তে)॥[১২]

'কালী'—এই নামের ব্যাখ্যার মধ্যেও তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব[১৩] দেবীকে বলেছেনঃ

তবরূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি॥
কলনাৎ সবর্তুানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে॥[১৪]

—"জগৎ সংহারকারী মহাকাল তোমার রূপ-বিশেষ। মহাসংহারকালে কাল সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করবেন। সর্বভূতকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করার জন্য তাঁকে মহাকাল বলা হয়। আর মহাকালকে গ্রাস কর বলে তুমি আদ্যা কালিকা। কালকে গ্রাস কর বলে তুমি কালী, তুমি সমগ্র বিশ্বের আদিরূপিণী এবং কারণস্বরূপা। সৃষ্টিকালে সমগ্র বিশ্বের তুমি আদিরূপিণী এবং সংহারকালে সমগ্র বিশ্বের তুমি কলন (গ্রাস) কর, এজন্য তোমাকে আদ্যা কালী বলা হয়।" কালকে কলন করেন বলে দেবী কালী। কলন শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ স্বাত্মলয়ীকরণ। আবার কালকে গ্রাস করেন বলে দেবী কালী। এখানে 'গ্রসন' এবং 'কলন' একই অর্থ বহন করে অর্থাৎ স্বাত্মলয়ীকরণ। দেবী কালকে নিজের সঙ্গে একীভূত করে নেন।

'কাল'-এর স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়—কাল হলেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। অথর্ব বেদের কালসূক্তে বলা হয়েছে—"কালো ভূতিমসৃজত···কালে হ বিশ্বা ভূতানি"—কালরূপ পরমাত্মা এজগৎ সৃষ্টি করেছেন ··· কালের আশ্রয়ে সকল বিশ্ব অবস্থান করছে।[১৫] সুতরাং কাল শুধু গ্রাসই বা সংহারই করেন না, তিনি সৃষ্টি এবং পালনও করেন। পুরাণে ও তন্ত্রে এই কাল-রূপী ব্রহ্মই মহাকাল বা শিব-রূপে বর্ণিত হয়েছেন। প্রবন্ধের সূচনায় উল্লিখিত হয়েছে ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। স্বরূপতঃ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম তাঁর অনির্বচনীয় শক্তিসহায়ে এসকল ক্রিয়া করেন। ব্রহ্ম ও কাল সমার্থক বলে কালও স্বরূপতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় কালের পক্ষে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করতে হলে তাঁর শক্তির প্রয়োজন হয়। কালের এই শক্তিই হলেন কালী—"কালী কালগতা শক্তিঃ"[১৬] শক্তি ও শক্তিমান অগ্নি ও দাহিকাশক্তির ন্যায় অভিন্ন। 'কলন' শব্দের 'স্বাত্মলয়ীকরণ' অর্থ গ্রহণ করলেও কাল ও কালীর অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হয়। এ-সিদ্ধান্ত যেমন শাস্ত্রীয় তেমনি সিদ্ধ-সাধকগণের উপলব্ধিগত সত্য। এজন্যই সাধক রামপ্রসাদের গানে পাইঃ "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

১০ শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড ৫।২৪

১১ মহানির্বাণতন্ত্র ৪।৩৪

১২ নির্বাণতন্ত্র, ১০ম পটল

১৩ তন্ত্রশাস্ত্র দুভাগে বিভক্ত—আগম ও নিগম। আগমের বক্তা শিব এবং শ্রোতা দেবী ভগবতী এবং নিগমের বক্তা দেবী ভগবতী এবং শ্রোতা শিব।

১৪ মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩০-৩২

১৫ অথর্ববেদ, ১৯।৫৩।৬

১৬ অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ৬৮

ভাষায় ঃ "ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। ...আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপ ভেদ।"[১৭]

কালীর মূর্তি নির্মাণের কল্পনা এবং ধ্যানমন্ত্রের রচনাও দেবীর স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। এসম্পর্কে প্রধান কয়েকটি বিষয় আলোচ্য—প্রথমতঃ দেবী কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণ বর্ণহীনতার প্রতীক। পরাশক্তি অরূপা, তাই বর্ণহীনা। যেখানে সকল বর্ণের অভাব তা-ই কৃষ্ণবর্ণ। দেবী সৃষ্টির আদি অর্থাৎ পূর্বা। সৃষ্টিপূর্বে অব্যক্ত জগৎ তমসায় আচ্ছন্ন ছিল। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে আছে ঃ "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে।"[১৮] তন্ত্রশাস্ত্রেও এই বেদবাক্য সমর্থিত। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে ঃ সৃষ্টাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্। পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ॥ বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাঽবশিষ্যসে॥[১৯] —সৃষ্টির পূর্বে বাক্য-মনের অতীত তমোরূপে তুমিই একা বিরাজমান ছিলে। প্রলয়ের পর তুমি আবার নিরাকার বাক্য-মনাতীত তমঃস্বরূপেই প্রাপ্ত হও। দেবী দিগম্বরী অর্থাৎ আবরণহীনা, মায়া বা অজ্ঞান হলো জীবের, এমনকি ঈশ্বরেরও সূক্ষ্ম আবরণ। দেবী কালিকা পূর্ণব্রহ্মময়ী বলে মায়াতীতা। তাই দেবী আবরণ-হীনা—দিগম্বরী। তিনি মুক্তকেশী। মুক্তকেশ মায়াপাশের প্রতীক, আবার মুক্তিরও প্রতীক। মহা-মায়া-স্বরূপিণী কালী সকল জীবকে মায়াপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও তিনি আবদ্ধ করতে পারেন। আবার সকলের মুক্তিবিধানও তিনিই করেন। তাই কালী মুক্ত-কেশী। কালী ত্রিনয়না। চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি—এই তিন জ্যোতিষ্মান পদার্থ দেবীর নয়নরূপে কল্পিত হয়েছে।[২০] আবার বলা যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কাল দেবীর প্রত্যক্ষ। তাই তিনি ত্রিনয়না। দেবী কালী করালবদনা লোলজিহ্বা-ধারিণী। তিনি সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেন বলে করালবদনা। তিনি লেলিহান জিহ্বা দংশন করে আছেন। শুভ্র দন্ত সত্ত্বগুণের সূচক। রক্তবর্ণ লোলজিহ্বা রজোগুণের সূচক। দেবী প্রথমে রজোগুণ দ্বারা তমোগুণের নাশ এবং পরে সত্ত্ব-গুণের দ্বারা রজঃ তমঃ উভয় গুণকেই নাশ করেন। এখানে এই তত্ত্বটি সূচিত হয়েছে। দেবী কালিকা মুণ্ডমালা পরিহিতা। মুণ্ডমালা পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রতীক। বর্ণ (অক্ষর) ছাড়া শব্দ হয় না। দেবী শব্দব্রহ্মময়ী পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী। তিনি চতুর্ভুজা। চতুর্ভুজ পূর্ণতার প্রতীক। দেবী চারিদিক অর্থাৎ সবকিছু পূর্ণ করে আছেন। দেবী শবরূপ-মহাদেবের বক্ষোপরিস্থিতা। এখানে শবরূপ শিব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই স্বগুণ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তি কালী। মহাশক্তি কালী কখনও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ-বিচ্যুত হন না। আবার এই রূপ কল্পনায় সাংখ্যদর্শনের প্রভাবও আছে। সাংখ্য-মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। জগদ্‌ব্যাপারে প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব। তবে পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া এই কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। শবরূপী শিব পুরুষ, কালী প্রকৃতি। আর প্রকৃতির কর্তৃত্ব বোঝাতে গিয়ে কালীমূর্তি মহাদেবের বুকের উপর স্থাপিত। এভাবে দেবীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের তাত্ত্বিক অর্থ দেবীমূর্তির কল্পনায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

তন্ত্রে দেবী কালিকার স্বরূপ-মাহাত্ম্যের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি কলিযুগে কালীর আরাধনাই যে প্রশস্ত সে-কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

> বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদম্।...
> কালিকায়াঃ প্রসাদেন ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা।[২১]

—একমাত্র কালীই ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। কালিকার প্রসাদেই ভুক্তিমুক্তি করতলগত হয়।

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৫-৯৬

১৮ ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৩

১৯ মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।২৫, ৩০

২০ মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩।৮

২১ শ্যামারহস্য, পরিচ্ছেদ—১

কালিকাং জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥[২২]
—কালিকা জগতের মাতা, শোক-দুঃখবিনাশিনী; বিশেষতঃ কলিযুগে তিনি মহাপাতকহারিণী। এজন্য ডাকাতেরাও কালীপূজা করত বলে মনে হয়। "কলৌ কালী কলৌ কালী কলৌ কালী তু কেবলা। সাধিতা কালনাথেন প্রত্যক্ষা কালিকা কলৌ। কলৌ কালী বিহায়াথ যঃ কশ্চিন্মোক্ষকামুকঃ। স ভোজনং বিনা নূনং ক্ষুন্নিবৃত্তিমভীপ্সতি।"[২৩]—কলিকালে কালীই একমাত্র আরাধ্যা। এ-যুগে শিব কর্তৃক আরাধিতা হয়ে কালী প্রত্যক্ষ হন। কলিকালে তাঁকে পরিত্যাগ করে কেউ যদি মোক্ষকামী হন তাহলে তিনি ভোজন ছাড়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি ইচ্ছা করেন। কালী আরাধনার এরূপ প্রশংসাসূচক আরও বহু বচন তন্ত্রে আছে।

বর্তমানে যেরূপ মূর্তিতে দেবী কালিকার পূজা হয় পূর্বে এরূপ মূর্তি করে দেবীর পূজা হতো না। অনেকের মতে হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা এসেছে বৌদ্ধদের থেকে। তান্ত্রিক সাধকগণ যন্ত্র অঙ্কন করেই দেবীর পূজা করতেন। অদ্যাপি কালীপূজায় যন্ত্র অঙ্কন অবশ্যকর্তব্য। মূর্তি থাকলেও যন্ত্রের উপরই দেবীর পূজা হয়। বর্তমানে দেবীর যেরূপ মূর্তিতে পূজা হয় সেই মূর্তির প্রকল্পক হলেন বিখ্যাত তন্ত্রসার গ্রন্থের রচয়িতা নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ১৫শ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। একদিন ভোরবেলায় নিম্নজাতীয়া কৃষ্ণবর্ণা এক রমণীকে দর্শন করে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি কালীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

সমগ্র ভারতে মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে-রূপটির বিশেষ প্রাধান্য, তা হলো দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী দুর্গার রূপ। অবশ্য দেবী কোথাও অষ্টভুজা কোথাও বা দশভুজা। কিন্তু শাক্তসাধকগণের—বিশেষতঃ বাংলার তান্ত্রিক সাধকগণের উপাস্যা হলেন দেবীর কালিকা-রূপ। এজন্য সাধারণ শাক্তসাধক বা তান্ত্রিক-সাধক বলতে লোকে কালীসাধককেই বুঝে থাকে। যদিও বাংলার প্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং জাঁকজমকের দিক দিয়ে এর সঙ্গে অন্য কোন উৎসবের তুলনা হয় না এবং এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জীবনে এক বিরাট সাড়া জাগে, তথাপি ব্যাপকতার দিক দিয়ে বিচার করলে কালীপূজারই প্রাধান্য। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপূজা সংখ্যার দিক দিয়ে দুর্গাপূজার চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমানে বারোয়ারি কালীপূজার দৌলতে এই পূজায়ও যথেষ্ট জাঁকজমক ও জৌলুস দেখা যায়। তাছাড়া অমাবস্যা তিথি ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সময়ে কালীপূজা হয়ে থাকে। কালীপূজা মূলতঃ তান্ত্রিক পূজা। বাংলায় কালীপূজার প্রাধান্য সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাংলায় বৈদিক প্রভাব থেকে তান্ত্রিকপ্রভাব বেশি পড়েছিল। এর কারণ বৌদ্ধপ্রভাব। পরবর্তী কালের বৌদ্ধদের মধ্যে তান্ত্রিকতা খুব ব্যাপকতা লাভ করেছিল। বাংলা সহ সমগ্র পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য বেশি থাকায় এসকল অঞ্চলে তন্ত্রের প্রভাবও বিস্তারলাভ করেছিল। তান্ত্রিকদের যে তারাদেবী, তিনি মূলতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। পরে তারাদেবী কালীরই একরূপ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। বাংলায় তন্ত্রসাধনা তথা শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে বহু সিদ্ধসাধকেরও আবির্ভাব ঘটে।[৮] পরবর্তী কালে সাধক বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মত ও পথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেও তাঁর সাধনার সূচনা কালীকে দিয়েই। ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রমতে তিনি সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রমুখ বিখ্যাত মাতৃসাধকগণও কালীসাধকই। প্রাচীন বাংলার রাজা, জমিদার ও বনেদী পরিবারগুলির মধ্যে শক্তি-উপাসনারই প্রাধান্য ছিল। ফলে কালীপূজা বাংলায় ব্যাপকতা লাভ করে এবং বাংলার নানা স্থানে কালীমন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানেও তার নিদর্শন দেখা যায়। গ্রাম বাংলার বহু স্থানে এখনও প্রাচীন কালীমন্দির দেখা যায়। এর মধ্যে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত মন্দিরও আছে।

বাংলায় বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ পরিস্ফুট হওয়ার বহু-পূর্বে শাক্তসাধনাকে কেন্দ্র করেই বাংলায় ভক্তিবাদ প্রসারলাভ করেছিল। এ-ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

২২ শ্যামারহস্য, পরিচ্ছেদ—৫

২৩ পুরশ্চর্যার্ণব, তরঙ্গ—৯

বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

॥ ১ ॥

বাগবাজার থেকে চৌরঙ্গী অবধি রাস্তাটি বিস্তারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। ফলে বহু বাড়ি ট্রাস্ট-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলো। বাড়ি-বিলুপ্ত করার চিঠি পাচ্ছেন বাড়ির মালিকরা। বাগবাজারের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির তদানীন্তন মালিকরা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে চমকে উঠলেন। কারণ, রাস্তার জন্য বাড়িটির একাংশ ভাঙতে হবে। বাড়ির কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র তা ইচ্ছা ছিল না। কর্তৃপক্ষ আবেদন করলেন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সর্বোচ্চ ব্যক্তির কাছে যাতে বাড়িটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পরিকল্পনার বাইরে থাকে। কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ কিছুতেই রাজি হলেন না। বাড়ির কর্তৃপক্ষও ছাড়বার পাত্র নন। জোরালো কারণ দর্শালেন কেন বাড়িটি অক্ষত রাখা উচিত। তখন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তাঁদের মুখ্য মূল্য-নির্ণয়কারী (Chief Valuer) বি. সি. ঘোষকে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দিলেন। প্রাথমিক ভাবে বাড়িটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝানো সত্ত্বেও বি. সি. ঘোষ তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। তখন তাঁকে একটি বই পড়তে দেওয়া হলো। তিনি খুব মনোযোগ সহকারে যতই বইটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ছিলেন, ততই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, বাড়িটি মোটেই সাধারণ বাড়ি নয়। এটি একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক বাড়ি। বি. সি. ঘোষ পরিবর্তন করলেন তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত। তিনি স্বীকার করলেন বাড়িটি অক্ষত রাখার প্রয়োজনীয়তা, সেই মতো তিনি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত মন্তব্যও জানালেন। আর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট মুখ্য মূল্য-নির্ণয়কারীর সুপারিশ মেনে নিয়ে বাড়িটিকে তাঁদের পরিকল্পনা থেকে বাদ দিলেন। বাড়িটি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। এই ঘটনা ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের।

এই ঐতিহাসিক বাড়িটি বাগবাজারের ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে (বর্তমানে ৭ গিরিশচন্দ্র এ্যাভিনিউ) অবস্থিত। বাড়িটির নাম 'বলরাম মন্দির'। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দের কাছে এই নামেই সমধিক পরিচিত। বলরাম মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাধন্য ভক্ত বলরাম বসুর বাসগৃহ। যে বইটি পড়ে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের মুখ্য মূল্য-নির্ণয়কারী বি. সি. ঘোষ (ইনি পরে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্টের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন) বলরাম মন্দিরকে রক্ষা করেছিলেন, সেই বইটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শতাধিকবার পবিত্র পাদস্পর্শে ধন্য এই ভবন—বলরাম মন্দির। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি 'আমার আড্ডা', 'আমার কেল্লা', 'কলকাতার কেল্লা'। আবার বিভিন্ন ভক্তের স্মৃতি-কথায় বলরাম মন্দির চিহ্নিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় কেল্লা', 'বাগবাজারের কেল্লা', 'কলকাতার বৈঠকখানা', 'জগন্নাথ ক্ষেত্র', 'প্রেমের হাট' রূপে। এখানেই কতবার হয়েছে 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা'। দক্ষিণেশ্বর যদি শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেওয়ান-ই-খাস' তবে বলরাম মন্দির 'দেওয়ান-ই-আম'। বলরাম মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় লীলাভূমি, তাঁর দিব্য লীলাস্থল, প্রধান কর্মক্ষেত্র, প্রচার কেন্দ্র। বলরাম মন্দির ভক্তদের মিলনস্থল। কলকাতায় এসে এখানেই তিনি রাত্রিবাস ও মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করতেন। শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের পুণ্য অবস্থানেও ধন্য বলরাম মন্দির। বলরাম মন্দির রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রামকৃষ্ণ মিশনের সৃষ্টি হয়েছিল এই বাড়িতেই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ও গৃহী গুরুভাইদের উপস্থিতিতে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে এখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের নরনারায়ণ উপাসনা এবং সকল

কর্মযজ্ঞের গোমুখী-উৎসরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে বলরাম মন্দির।

বলরাম মন্দিরের দেওয়ালগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের লীলার নির্বাক সাক্ষী। এই বাড়িই তাঁদের অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণের, কৃপা বিতরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ; তাঁদের জীবন ও বাণীর ধারক, বাহক ও রক্ষক। এই বাড়ি ভক্তদের কাছে এক মহাতীর্থ। তাই ভক্তেরাই বলরাম বসুর এই বাড়িটিকে বলরাম ভবন বা বলরামের গৃহ না বলে 'বলরাম মন্দির' বলতেন।[১] এই নাম সার্থক। বর্তমানে বলরাম মন্দির আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র, একটি ঐতিহাসিক ভবন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রথম পরিকল্পনায় (Scheme) বলরাম মন্দির ছিল। তখন জনমতের চাপে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বাড়িটি রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। আবার ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দেও বলরাম মন্দিরকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তাঁদের পরিকল্পনায় নিয়ে আসেন। সেবারও বলরাম মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আবেদন করেন এবং বাড়িটি সে-যাত্রা রক্ষা পায়।[২] অবশেষে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি বলরাম মন্দিরকে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ ("It is worthy of preservation as a National Monument of International Importance.") হিসাবে ঘোষণা করেন।[৩]

বলরাম মন্দির কলকাতার প্রাচীনতম বাড়িগুলির অন্যতম। বলরাম মন্দিরের ট্রাস্টীরা অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১ মে। এই আবেদনে লেখা ছিল : "Competent engineers and architects are of the opinion that the building (which is about 200 years old) needs complete renovation immediately". কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টও বলরাম মন্দিরের বয়স নির্ধারণ করেছিলেন ২০০ বছর ("They are, moreover, confronted with the urgent task of thorough renovation of the 200 years old building")। সুতরাং বর্তমানে (১৯৯০) বলরাম মন্দির প্রায় ২১৬ বছরের পুরনো। অর্থাৎ এই বাড়িটি সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়। এবার দেখি কলকাতার প্রাচীন বাড়িগুলির বয়স : ফোর্ট উইলিয়াম (১৭৫৭), পি. জি. হাসপাতাল (১৭৬৮), রাইটার্স বিল্ডিং (১৭৮৬), সেন্ট এন্ড্রুস চার্চ (১৭৮০), টাউন হল (১৮১৩), পার্কস্ট্রীটে এশিয়াটিক সোসাইটির পুরনো বাড়ি (১৮১৪), গভর্নমেন্ট হাউস (১৮৪৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), হাইকোর্ট (১৮৭২) প্রভৃতি।[৪] এর মধ্যে কোন কোন বাড়ির মূল কাঠামোর সঙ্গে নতুন ভাবে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীম 'বলরাম মন্দির'-এর কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন ১১ মার্চ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে—'শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৩৫)।

২ বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ আবেদন করেন যে, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বলরাম মন্দিরকে 'Exemption area' বলে ঘোষণা করলেও 'under acquisition' বলে চিহ্নিত করেছেন। এটিকেও বাতিল করা হোক। আবেদনের তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। এই আবেদনের উত্তরে ইতিবাচক সাড়া দেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট একটি নোট তৈরি করেন। নোটের প্রয়োজনীয় অংশ : "8. The need for its (Balaram Mandir) preservation was in fact recognised by the CIT as early as 1916, when, in difference to strong public opinion from all over India, it decided to preserve Balaram Mandir by excluding it from CIT Alignment No. IX in preference to Girish Ghosh's house which was erected on the spot at CIT's cost. 9. The CIT recognised the importance of Balaram Mandir for the second time in 1948, on the representation of its Trustees. It shifted the road line on the East so as to save Balaram Mandir from partial demolition under scheme No. LVIII."

৩ উক্ত নোটের সপ্তম ধারা। এসকল তথ্য বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাপ্ত।

৪ পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র), কলকাতা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৮, ২৫ আগস্ট ১৯৮৯।

পরিধি বিস্তার হয়েছে। কোন কোন বাড়ি জীর্ণদশা-প্রাপ্ত। কিন্তু বলরাম মন্দির প্রায় অপরিবর্তিত এবং সুসংরক্ষিত। যাই হোক, কলকাতার প্রাচীন বাড়িগুলির মধ্যে বলরাম মন্দির অন্যতম—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বলরাম মন্দির অন্য একদিক দিয়ে ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য। এই বাড়ি কলকাতার আদি নাট্যশালার অন্যতম আশ্রয়স্থল।[৫] তখন অবশ্য বলরামবাবুদের অধীনে এই বাড়ি ছিল না। এই বাড়ির মালিক ছিলেন বাংলা নাট্যজগতের দিকপাল তিন ভাই—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর লেখা 'ইন্দুপ্রভা' মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক, নাট্য সংগঠক ও ব্যবস্থাপক। তাঁরই অগ্রণী ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর ও রাধামাধব কর প্রথম রঙ্গালয় স্থাপন করেন 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। এই থিয়েটারে তাঁরা প্রথম নাটক অভিনয় করেন ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। পরে অ্যামেচার থিয়েটার প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-এ পরিণত হয়।[৬] কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলদর্পণ', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটকের অভিনেতা।[৭] প্রথমে থিয়োজফিস্ট, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপালাভে ধন্য দেবেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী' প্রভৃতি নাটকের লেখক।[৮] নগেন্দ্রনাথ নিজের বাড়িতে কনসার্টের দল বসিয়েছিলেন।[৯] তাঁদের বাড়িতে নাটকের আখড়াও চলত।[১০] এইসূত্রে এখানে নাট্যজগতের তৎকালীন রথী-মহারথীদের আনাগোনা হতো। নাট্যামোদীদের মিলনস্থল ও নাট্যসাধনার ক্ষেত্র ছিল এই বাড়ি।

॥ ২ ॥

বলরাম মন্দিরের সামনের অংশটির মালিক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ, কিরণচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছ থেকে খুব সম্ভবতঃ ১৮৮১-১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বলরাম বসুর জ্ঞাতিভাই হরিবল্লভ বসু ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বাড়িটি কেনেন।[১১] অবশ্য এই বাড়িটি বন্দ্যোপাধ্যায়রা

৫ ভারত (অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৩য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪৫, ৪২শ সংখ্যা, পৃঃ ৯২১। এই সংখ্যাটি বাগবাজার নিবাসী শ্রীব্রহ্মগোপাল দত্তের কাছে আছে।

৬ বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা—দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড (১৭৯৫-১৯২০), ১০৭৪, পৃঃ ৪২, ৪৪-৪৫, ১১৩-১১৪

৭ গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৩৪, পৃঃ ১০৮, ১১২

৮ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৯, পৃঃ ২৭ (এরপর থেকে 'স্মৃতিকথা')

৯ ঐ, পৃঃ ৫৮; ১০ ঐ, পৃঃ ১০৬

১১ 'স্মৃতিকথা'য় (পৃঃ ২৭) স্বামী অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন "এই দেবেন্দ্রবাবুদেরই বাড়ি বলরামবাবুরা ক্রয় করেন।" 'ভারত' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪৫, ৪২শ সংখ্যা, ৯২০) কিরণচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "রায় বাহাদুর হরিবল্লভ—বর্তমানের 'বলরাম মন্দির' সামনের ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বাড়িটি ৺গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, কিরণ—প্রথিতযশা নাট্যানুরাগী ও নাট্যরথীগণের পিতা) মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন।" বলরাম বসু তাঁর প্রথমা কন্যা ভুবনমোহিনীর বিবাহ উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। এর কিছুকাল পরে হরিবল্লভ উক্ত বাড়িটি কেনেন। বলরামের সংসারের প্রতি অনীহা দেখে হরিবল্লভেরা তাঁকে কলকাতার এই বাড়িতে বাস করতে অনুরোধ করেন এবং বলরামও তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৮০, পৃঃ ১১৪)। ঐ সময়ে বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণী শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন বলরামের বয়স চল্লিশ বছর। বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান ১৮৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে। (প্রেমানন্দ জীবন-চরিত—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, ১৩৫৯, পৃঃ ১৩ ও ভক্ত-মালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৪) কথামৃতে উল্লেখ আছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে শুভ পদার্পণ করেছিলেন ১১ মার্চ ১৮৮২। সুতরাং তার আগেই বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি (৮ম সং, ১৩৭৮, পৃঃ ২৭২) এবং কথামৃত (পৃঃ ৫, ৩৪) থেকেই তা জানা যায়।

নিজেরা তৈরি করেছিলেন বা অন্য কারুর কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন, তা জানা যায়নি। বলরাম মন্দিরের পিছনের অংশটির মালিক ছিলেন অন্য একজন। বলরাম বসুর পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, এই অংশের মালিক জাতিতে নাপিত ছিলেন। এই অংশটি কবে কেনা হয়, তাও জানা যায়নি। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বলরাম মন্দিরের সামনের অংশটি উঁচু ও পিছনের অংশটি নিচু। এই দুটি অংশকে এক করেন হরিবল্লভই। সেজন্য কয়েকটি ছোট ছোট ঘর তৈরি করতে হয়। যখন বসুরা এই বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তখন ঐ অঞ্চলে তাঁদের পরিচিতি ছিল 'নতুন বোস' নামে।[১২]

বলরামের পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর বসুর বাস ছিল হুগলি জেলার আঁটপুরের কাছে তড়া গ্রামে। তাঁর চারপুত্রের মধ্যে দয়ারাম সপরিবারে বাস করতে থাকেন হাওড়া জেলার বালিতে। দয়ারামের কনিষ্ঠ পুত্র হুগলির দেওয়ান দানশীল কৃষ্ণরাম কলকাতার শ্যামবাজারে তৈরি করেন একটি বাড়ি ও দুটি শিবমন্দির। সময় ১১৭৮ সাল। এই বাড়িতে তিনি সপরিবারে থাকতেন। একসময় কৃষ্ণরাম কলকাতার হাটখোলার দত্তদের বাড়িতে কাজ করতেন। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও সততায় তিনি দত্তদের ব্যবসার অংশীদার হন। নানান কারণে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়। পরে কৃষ্ণরাম নিজের অধ্যবসায় ও দক্ষতার গুণে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং কলকাতায় সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেন। বহুস্থানে মন্দির ও রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য কৃষ্ণরাম খ্যাতি অর্জন করেন।[১৩] তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মদনগোপালের অবিবেচনায় শ্যামবাজারের পৈত্রিক বাড়ি সহ বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়। মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদ[১৪] কর্তৃক গৃহদেবতা শ্রীশ্যামসুন্দরজীকে বৃন্দাবনে সদ্য নির্মিত একটি কুঞ্জে[১৫] স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীশ্যামসুন্দরজীর নামানুসারে কলকাতায় আজকের শ্যামবাজারের নামকরণ হয়।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ভদ্রক ও কোঠারে তাঁদের জমিদারি এবং পুরীতে[১৬] বাড়ি ছিল। গুরুপ্রসাদের পাঁচপুত্রের কেউ বৃন্দাবনে নিজস্ব ভবনে থাকতেন, কেউ বা দেখাশোনা করতেন উড়িষ্যার জমিদারি। ভজনশীল ও মুক্তহস্ত গুরুপ্রসাদের

১২ বর্তমান বসু বংশধর রণেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রাপ্ত। তারিখ ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯

১৩ কৃষ্ণরাম বসুর জনহিতকর কার্যের নমুনা ঃ (১) ব্যবসার জন্য আনীত একলক্ষ টাকার চাল দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিতরণ ; (২) পূর্বপুরুষদের গ্রাম তড়া হতে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ১৫টি পুকুর ও ১০টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ; (৩) মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ এবং মাহেশ হতে বল্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি ; (৪) কটক হতে পুরী পর্যন্ত ২৬ ক্রোশ রাস্তা তৈরি ও জগন্নাথ-যাত্রীদের জন্য আশ্রয়স্থল, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ; (৫) যশোহরে মুড়লি শিববাটি গ্রামে মদনমোহন ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ; (৬) দেওঘরে শ্রীবৈদ্যনাথজীর নহবত নির্মাণ ; (৭) বালীতে কল্যাণেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি।

১৪ গুরুপ্রসাদই প্রথম বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর থেকে বসু পরিবারে বৈষ্ণবধারা প্রবাহিত হয়েছে।

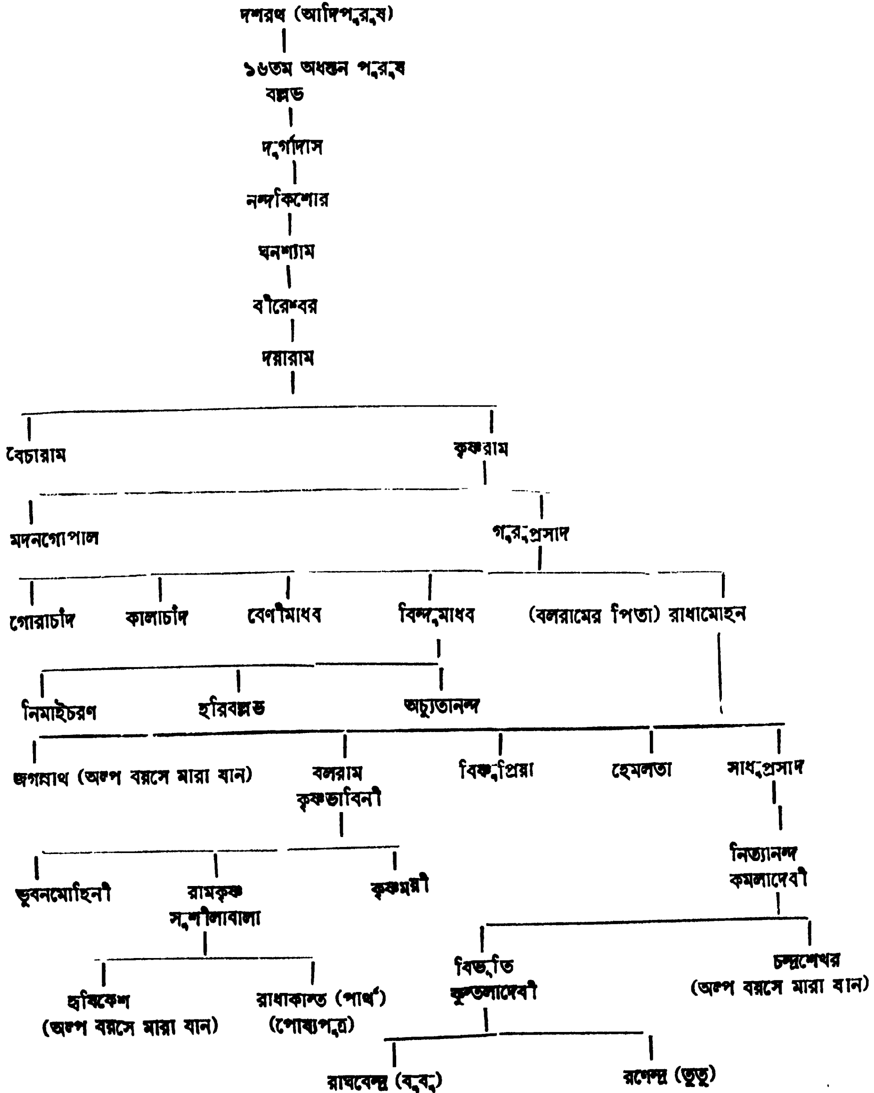
১৫ বৃন্দাবনে বলরাম বসুদের এই কুঞ্জের নাম 'কালাবাবুর কুঞ্জ'। গুরুপ্রসাদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কুঞ্জ তৈরি করান। এখানে শ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীবৃন্দসহ ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদরা কঠোর তপস্যা করেছেন এই বাড়িতে।

১৬ পুরীর বাড়ির নাম ছিল 'শশী নিকেতন'। এখানেও শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীগণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি পুরীধামে এলে এই বাড়িতে থাকতেন। বলরাম মন্দিরের মতো এখানেও তাঁদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার

কনিষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বৃন্দাবনেই থাকতেন। অপর এক পুত্র বিন্দুমাধবের ছিল তিনপুত্র—নিমাইচরণ, হরিবল্লভ ও অচ্যুতানন্দ। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব রাধামোহনেরও তিনপুত্র—জগন্নাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসাদ।[১৭] হরিবল্লভ ছিলেন কটকের সরকারি উকিল। নিমাইচরণের ওপর ভার ছিল জমিদারি দেখাশোনার। অচ্যুতানন্দ বাস করতেন কলকাতায়।[১৮] [ক্রমশঃ]

---

১৭ **বলরাম বসুর বংশতালিকা**



১৮ প্রেমানন্দ জীবন-চরিত, পৃঃ ৬-১০

কবিতা

প্রার্থনা

অরুণকুমার দত্ত

মা আমার,
তুমি কি শারদা হয়েই খুশি থাকবে চিরকাল,
উচ্চ বেদীতে আরূঢ়া হয়ে অর্চিত হবে মালাচন্দনে ?
কখনো কি ধূলিমলিন সমতলে নেমে এসে শুনবে না
হতভাগ্য মানুষের হৃৎস্পন্দন ?
শুনলে বুঝতে
প্রতি পলে পলে সেখানে জমে উঠেছে কত দুঃসহ যন্ত্রণা,
কত চোখের জল হারিয়ে গেছে দুর্ভাগ্যের চোরাবালিতে,
অট্টহাসিতে চাপা পড়েছে কত অভাগার করুণ ক্রন্দন।
প্রতিকারের আশায় তবুও এই সব মানুষ
তোমার দুয়ারে মাথা খুঁড়েছে বারংবার,
অসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষা করেছে দিনের পর দিন।
এবার তাদের অনুভব করাও
তোমার জাগ্রত অস্তিত্বকে,
মমতা ও করুণায় বিগলিত হয়ে
শুধু বরাভয় মূর্তিতে নয়,
এবার সামনে এসে দাঁড়াও
তোমার সমস্ত প্রহরণ নিয়ে,
সংহার কর সেই অসুরদের
যারা জীবনের সব মাধুর্যকে ভরে দিয়েছে বিষে,
নীল আকাশের নিচে
সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীকে যারা পরিণত করেছে
এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরীতে।

ভারতভগিনী

বিমল মৈত্র

উচ্ছল উথল নীল জলে ঘেরা
ছোট্ট একটি দেশ—
সুনিবিড় ছায়া—পাখির কাকলী,
শোভার নেইকো শেষ।

এক মহাপ্রাণ সেই দূর দেশে
বেড়ে ওঠে স্নেহছায়,
মুগ্ধপ্রকৃতি ভাবের রাজ্যে
কোথা যেন নিয়ে যায়!

একদিন মেলে পথের নিশানা,
মেলে আলো-সন্ধান ;
বিবেক-জ্ঞানের বারি-সিঞ্চনে
আপ্লুত মন-প্রাণ।

আকুল আশায় সেই আহ্বানে
স্বজন স্বদেশ ছাড়ি
অদেখার কূলে ভাসাল তরণী,
নির্ভয়ে দিল পাড়ি।

ধন্য সেদেশ—ধন্য ভারত—
মহীয়সী নিবেদিতা!
বিদেশিনী নহ—ভারতভগিনী,
সেবিকা, কন্যা, মাতা।

চাই না ছুটির বাকি

সমীরা দে

জানি গো মা তোর কাজেতে দিয়ে গেলাম ফাঁকি,
তবু কি চাস এই কাজেরই রাখতে কিছু বাকি ?
বাকি যদি থাকেই গো কাজ
আমার তাতে নাই কোন লাজ—
ক্ষমা করে নিস মা যদি দোষী হয়ে থাকি,
তোর কোলেতেই চাই মা যেতে, ছুটি দিবি নাকি!

পড়ে আছি একটি পাশে দেখতে পায় না কেউ,
শীর্ণ জলধারায় কভু থাকতে পারে ঢেউ!
মহাসাগর দূরে আছে,
ক্ষীণ নদী যায় তারই কাছে।
কোন মতে মিলতে সে চায়, জানিস না তুই তা কি ?
কোলে তুলে নে মা এবার, চাই না ছুটির বাকি।

নাস্তিকের দেবী-বন্দনা

তরুণ সান্যাল

উড়নচণ্ডী উদাস মানুষ বসল ধ্যানে,
হঠাৎ যেন বিজলী চমক মুহূর্ত-বা,
দেখল বিশ্ব অদৃশ্য কোন সুতোর টানে
চলচ্ছবি—চন্দ্রে মধু সূর্যে জবা,
এবং মাটির পাত্র চুয়ে মুহূর্ত-বা,
মানুষ তখন ঋষি তখন শিল্পী ধ্যানে।

জীবন এমনি জোয়ার-ভাটায় এগোন-পেছোন,
একটু একটু করেই এমনি চর জাগানো,
বোধের বীজে অশ্রুসেচন করেন যে-জন
তিনিই জানেন কোন রূপে কোন রঙ লাগানো,
জোয়ার-ভাটায় সেই সাধনাও এগোন-পেছোন
নদী সাগর-সঙ্গমে এক চর জাগানো।

দেবি, তোমার মধ্যে আছে ধ্যানের জ্যোতিঃ?
অর্থাৎ যা শরীর ধরে ভারতবর্ষ?
পাথর কুঁদে হাতুড়-ছেনীর কোন আরতি
স্পর্শাতীতেও ইন্দ্রিয়ে দেয় রূপের স্পর্শ?
দীঘল ত্রিচোখ তখন শিল্পে ধ্যানের জ্যোতিঃ
আস্তিকে-বা নাস্তিকে যা ভারতবর্ষ!

কেউ বলছেন দেবী কেবল ত্রস্ত রাখার
প্রতীক মাত্র, আর্ত-প্রার্থী ইত্যাদিদের,
তর্কে মানেন কেউ বা সাকার কেউ নিরাকার
বিমূর্ত ও মূর্ত ভাবায় কৃত্যাদি ঢের,
কেউ ভাবছেন প্রতীক দেবী ত্রস্ত রাখার
আর্ত অর্থী ভক্ত জ্ঞানী ইত্যাদিদের।

সত্যি তুমি ঠিক দেবী নও; বরং হলে
বিশ্বধারণ স্মৃতির পলির অশ্বত্থগাছ,
বিপুল ভুবন শিকড় নিকর দণ্ড পলের
যেমন শিল্প নটরাজের অদৃশ্য নাচ,
এবং ছন্দ রেখায় তখন মূর্ত হলে
মনন ও মন বিশ্বজীবন অশ্বত্থগাছ।

তোমার মধ্যে প্রাক্-পুরুষের টোটেম-প্রীতি
সীমা হারিয়ে কোন অসীমের ধ্যান শিখেছে?
যোজন-যোজন পথ হেঁটেছে অনিশ্চিতি
রূপের মধ্যে নিশ্চিতে তা শ্লোক লিখেছে?
প্রাক্-পুরুষের বিস্ময় ঘোর টোটেম-প্রীতি
মূর্তি এবং মন্ত্রে কখন ধ্যান শিখেছে!

নাস্তিকেরাও তোমার পায়ে হয় প্রণত,
প্রত্ন মাটির তলায় যেমন প্রাণ-ফোয়ারা
তেমনি পূর্বপুরুষ যাঁরা ভস্মগত,
আমার প্রণাম হয়েই প্রণাম জানান তাঁরা,
আস্তিকেরা যখন-তখন হন প্রণত,
নাস্তিকেরা উৎস খোঁজেন প্রাণ-ফোয়ারার।

ঢাক বাজাচ্ছে হাজার ঢঙে প্রথার দরদ
হয়তো পূজার আড়ম্বরই তাদের ইচ্ছে,
বন ঘিরেছে অতীত কালের গ্রাম জনপদ
প্রত্নবিদের কাছেই দেবী সাক্ষী দিচ্ছে—
হাজার বছর আগেও ছিল প্রাণের দরদ
কষ্টিপাথর রূপ দিয়েছে তাদের ইচ্ছে।

ঐতো দেবী, ভোর আলোতে গৌরী তিনি,
ঐতো দেবী, ঘোর আলোতে হলেন কালী,
ঐতো দেবী, ফুলের বনে মন-মোহিনী
পাথর-মাটি কিংবা কাঠে মুণ্ডমালী,
অন্ন বর্ণ গন্ধ ধন্য গৌরী তিনি।
অতসী রঙ পুষ্প কিংবা মুণ্ডমালী।

উদাস উড়নচণ্ডী কবি বসল ধ্যানে
ক্বচিৎ বিজলী চমক যেন মুহূর্ত-বা
দেখল বিশ্ব দৃশ্যাতীত প্রেমের টানে
চলচ্ছবি—চন্দনে চাঁদ সূর্যে জবা
এবং মাটির পাত্র চুয়ে মুহূর্ত-বা,
নাস্তিকও হয় তখন ঋষি-শিল্পী ধ্যানে

জন্মে-জন্মে থাকেন দেবী পুনর্ভবা॥

ভোরবেলায়

পলাশ মিত্র

ভোরবেলা ঘণ্টাধ্বনি থামার পরে
কে যেন বলেছিলেন,
'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি'—
আত্মাই পরম প্রিয়।
বলেছিলেন, আত্মা তোমার আত্মীয়।
ধূপের ভিতর থেকে
একটিই কালো হাত ইশারা করছিল। সারাক্ষণ।
ধূপের ধোঁয়া চন্দন
রজনীগন্ধার গুচ্ছ
কালো হাতের ইশারা ঃ
আবার সে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গিয়েছিল।
শোনা গিয়েছিল সেই সমুদ্রকণ্ঠ ঃ
'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি।'

মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না শ্মশানে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের দুয়ার খোলা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন
শ্মশানের সোজা পথ দেখি রাতের শব্দে
মধ্য রাত্রি, শুয়ে শান্ত, ঘুমে ঘোর মানুষ
আমি নিঝুম নিস্তব্ধ একা একা শ্মশানে।
মুখোশের শবদেহের চিতা জ্বলে শ্মশানে
চতুর্দিকে মুখোশের ছাই, মুখোশের
কুলকুণ্ডলিনী, মুখোশের মুখোশ।
শব্দের কাছে কখনো শব্দ করি না
শুধু মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না শ্মশানে
মুখে দিও না মুখোশের আগুন।
মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না শ্মশানে
মুখে দিও না মুখোশের আগুন, মুখাগ্নির
জন্য রেখে যাব না কোন মুখোশ সন্তান।

নাস্তিক-আস্তিক

শান্তশীল দাশ

কত কাজ করি আমি, প্রতিদিন কত কাজ করি,
এটা করি, ওটা করি আর সবিস্ময়ে
চেয়ে থাকি মুগ্ধ হয়ে সে-কীর্তির পানে;
কত-না অমিত শক্তির
অধীশ্বর এই আমি।

ঈশ্বর আছে কি নেই, সে-চিন্তার অবকাশ কোথা,
প্রয়োজনও নেই।
'আমি আছি' এই সত্য কত-না উজ্জ্বল।

কখনো সহসা দেখি দুর্যোগের ঘন অন্ধকার
চারিদিক ছেয়ে ফেলে।
কোথা গেল তারা সব, যারা ছিল আমার চারদিকে।
আমি একা, আমি বড় একা।

তখন তোমাকে মনে পড়ে,
'এস তুমি', ডাকি প্রাণপণে;
এস তুমি, আমাকে বাঁচাও।

অলক্ষ্যেতে থেকে তুমি হাস বুঝি, হাস মৃদু হাসি
নাস্তিকের এ-আস্তিকতায়।

মূর্তি হয়ে গেছ

ব্রত চক্রবর্তী

(শতবর্ষে স্মরণ ঃ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী)

বাহিরে পাহাড়, ঝরনা ভিতরে ছিল প্রাণোচ্ছল;
যে গেছে সে-ই জানে দরজা ভিতরে খুলে
গেলে লাভ হৃদয়ের ঘরে বসা যায় সসম্মানে।
প্রতিমা নাট্যের যদি কেউ তার চক্ষুদান করে,
কেউ বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র কেউ হাতে তুলে দেয়;
কিন্তু গর্জন তেলের বিভা, উজ্জ্বলতা, তুমি ছাড়া
কারো হাতে কখনো পায়নি মূর্তি তোমার সময়ে।
মহলার পরে যারা গেছে দুঃসাহসী
প্রাচীর টপকে, কাছে, ঝুঁকে গঙ্গোত্রী দেখেছে।
কাদা একতাল পেলে তুমি মূর্তি সহজে গড়তে,
প্রজ্ঞার আলোয় তার উদ্বোধন হতো জনতায়।
দারুণ অতৃপ্ত ছিলে, খুঁতখুঁতে, নিষ্ঠ নিদারুণ;
তাই ব্যাখ্যা সৌন্দর্যের, জীবনের তোমার ভঙ্গিতে
প্রাণ পেত, পেত উচ্চারণ তোমার কণ্ঠের কাছে।
যত হাত করতালি দিল, সব হাতে আশ্রয় ছিল না
তুমি অনাসক্ত, মূর্তি ভেঙে মূর্তি গড়ে মূর্তি হয়ে গেছ।

নিবন্ধ

কলকাতায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রাচীন সচিত্র বাঙলা বই

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম সচিত্র বাঙলা বইটি কলকাতার ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থটি প্রথম সচিত্র বাঙলা বই। যে বাঙালী প্রকাশকের ঐকান্তিক চেষ্টায় সচিত্র অন্নদামঙ্গল প্রকাশিত হয় তার নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। কলকাতায় তখন ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানার খুব সুনাম। ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানা থেকেই তিনশ আঠারো পাতার সচিত্র অন্নদামঙ্গল প্রকাশিত হয়।

অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে ছয়টি ছবি ছাপা হয়। এই ছয়টি ছবি হলো ধাতুখোদাই আর কাঠখোদাই ছবি। দুটি ছবির শিল্পীর নাম জানা যায়। তিনি রামচাঁদ রায়। ছবি দুটির ওপর লেখা আছে 'এনগ্রেভড বাই রামচাঁদ রায়'। দুটি ছবিই ধাতুখোদাই ছবি। ছবি দুটির পরিচয় হলোঃ অন্নপূর্ণা, সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা, সুন্দরের বর্ধমানে প্রবেশ, সুন্দর ও দারোয়ান, বিদ্যা-সুন্দরের দর্শন, সুন্দরের চোর ধরা। বাকি চারখানা কাঠখোদাই ছবির শিল্পী রামচাঁদ রায়ই হতে পারেন।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি গঙ্গাকিশোর গভর্নমেন্ট গেজেটের পাতায় এক বিজ্ঞাপনে জানান, ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল উত্তম বাঙলা অক্ষরে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ভাষা ছিল এইরকমঃ "মেঃ ফেরিস এণ্ড কোম্পানী সাহেবের ছাপাখানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য মহাসয়ের দ্বারা বর্ণ সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইতেছে (।) পুস্তকের প্রতি উপক্ষনে এক ২ প্রতিমূর্তি থাকিবেক (।) মূল্য ৪ টাকা নিরূপন হইল (।) জাহার লইবার ইচ্ছা হয় আপণ নাম ঐ ছাপাখানায় কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন।"

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে বটতলা থেকে রামচন্দ্র কবিকেশরীর 'গৌরীবিলাস' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের পাতায় ছয়টি ছবি প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ছবিটি হলো 'মহিষমর্দিনী'র। শিল্পী বিশ্বম্ভর আচার্য ছবিটি আঁকেন। বটতলা থেকেই ১৮২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটি সচিত্র। পাঁচখানা ছবি এই গ্রন্থে ছাপা হয়। ছবিগুলি হলোঃ কালকেতুর ভগবতী দর্শন, খুল্লনা ছাগল চরাচ্ছে, শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা করছে, কালীদহে শ্রীমন্তর কমলেকামিনী দর্শন, কোটালের হাত থেকে দেবী শ্রীমন্তকে রক্ষা করছেন। শিল্পীর নাম নেই। সমসাময়িক কালে 'হরিহরমঙ্গল' নামে যে সচিত্র বইটি প্রকাশিত হয় তাতে পূর্ণপাতা ছবির সংখ্যা হলো ৭২। সেই যুগে এত ছবি কোন বইতে ছাপা হতো না। শিল্পী রামধন স্বর্ণকার।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে নন্দকুমার কবিরত্নের 'শুকবিলাস' নামে একখানা বই বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটিতে একটি শুক-শারির ছবি ছাপা হয়। বটতলায় প্রথম যুগে 'নিগমতত্ত্ব গ্রন্থ' নামে একটি সচিত্র বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনখানা পূর্ণপাতা ছবি ছাপা হয়। প্রথম ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ শুয়ে রয়েছেন, সত্যভামা তাঁর পদসেবা করছেন। দ্বিতীয় ছবিতে হনুমান রামসীতার স্তব করছেন। তৃতীয় ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী সিংহাসনে বসে রয়েছেন, সত্যভামা রুক্মিণীর স্তব করছেন। ছবি তিনটির শিল্পীর নাম নেই।

বটতলা থেকে প্রকাশিত হয় কালীবিলাস বা কালিকাবিলাস নামে একখানা সচিত্র বই। বইটিতে হর-পার্বতীর একখানা পূর্ণপাতা ছবি আছে। শিল্পী বিশ্বম্ভর কর্মকার। প্রকাশক দে ব্রাদার্স বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশ করেন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। মোট ছাত্রিশখানা ছবি ছাপা হয়। ছোট, বড়, মাঝারি তিন রকমের ছবি ছাপা হয়। বেশির ভাগ বড় ছবি এঁকেছেন শিল্পী হীরালাল কর্মকার। বাঙলা 'দেবীযুদ্ধ' বইতে সত্তরের বেশি ছবি ছাপা হয়। শিল্পী নেত্যলাল দত্ত বেশির ভাগ ছবি এঁকেছেন

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক ঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর]

অবতার-পুরুষের সব লক্ষণ আছে। তাঁর শোক-মোহ-ভ্রম—এসব হবে না। সর্বদা আদর্শ-জীবন। কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কেন? তাঁর কখনো শোক-মোহ-ভ্রম হয়নি।

সমুদ্রে জলকেলি হচ্ছে—সব মত্ত, রুক্মিণী, বলরাম সব। খেলা থেকে শেষে মারামারি হয় হয়। কৃষ্ণ দেখলেন—এখনি বুঝি যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি জল থেকে উঠে পড়লেন, তীরে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে নিজের পীতবাস ওড়াতে লাগলেন। দেখ সর্বদা সচেতন! এদিকে বলরাম কৃষ্ণের অভাব অনুভব করছেন। কই কৃষ্ণ? কৃষ্ণ তো নেই! তাই খেলা আর ভাল লাগছে না। তিনিও উঠে পড়লেন। তারপর একে একে সব।

আবার দেখ কৃষ্ণ আদর্শ সংসারী। সংসারীর এক প্রধান কর্তব্য—অতিথিসৎকার, অতিথি যখন যেমন চাইবেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে, নারায়ণ-জ্ঞানে তাঁর সেবা করতে হবে। দুর্বাসা এসেছেন কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে, দেখতে—তিনি কেমন সংসার-ধর্ম করছেন। দুর্বাসার নামেই সবাই চটা, কিন্তু জান না তো—তাঁর শাপে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায়। এর নাম কোপরূপী কৃপা। তারপর দুর্বাসা এসে কৃষ্ণকে বলছেন, 'কিভাবে সেবা করবে?' কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রভু যেভাবে চান, দাস প্রস্তুত।' দুর্বাসা বললেন, 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ, তোমরা দুজনে আজ আমার সেবা করবে—জল তুলে চান করাবে, উনুন ধরিয়ে রান্না করে খাওয়াবে। তারপর যা যা বলব, সব করবে।' কৃষ্ণ ও রুক্মিণী একে একে সব করছেন। খেতে বসিয়ে রুক্মিণী বাতাস করছেন। খাওয়ার পর মুনিঠাকুর বললেন, 'পা টেপো।' বিশ্রামশেষে বললেন, 'চল, বেড়াতে নিয়ে যাবে গাড়ি করে।' গাড়ি এল। বললেন, 'ঘোড়া চাই না, তোমরা দুজনে টানবে।' তখনও দুজনেই অনাহারে, কারণ অতিথি এখনও অতৃপ্ত। সকলে খুব চটে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণ নির্বিকার, সহাস্য। তখনি ঘোড়া খুলে দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে দুজনে গাড়ি টেনে নিয়ে চললেন, হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়ছে। দুর্বাসা আর থাকতে পারলেন না, গাড়ি থেকে নেমে পদতলে, বললেন, 'প্রভু, বুঝেছি—কেন আপনি এত করছেন।' এই হলো অবতারজীবন—জগৎকে আদর্শ দেখানো!

রামের ভ্রম—বালি-বধ, শোক-মোহ—সীতা-বিলাপ। তাই ঠাকুর বলতেন, 'রাম বারো আনা। কিন্তু কৃষ্ণ ষোলো আনা—টং করে বাজে—যেখানেই বাজাও না।' অবতারজীবনের একটু মজা আছে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে অবতার আসেন না। যেখানে বহুদিন ধরে বহু লোক দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়ে অহরহ ভগবানকে ডাকছে, সরল কাতর প্রাণে জানাচ্ছে, 'প্রভু, আর এমন করব না, জ্বালা-যন্ত্রণা শেষ কর, দেখা দাও'—এই বলে সমস্ত কর্মফল তাঁর চরণে সমর্পণ করছে, অথবা ধর্মগ্লানি দেখে সাধকেরা দিনরাত তাঁকে ডাকছে—'প্রভু, এস, ধর্মস্থাপন করতে!' তখনই কাল পূর্ণ হলে জীবের সঞ্চিত ও সমর্পিত কর্মফল ভুগবার জন্য এবং ধর্ম-স্থাপন করবার জন্য তিনি আসেন। জীব-উদ্ধার আর কিছুই নয়—আত্মজ্ঞান দেওয়া, সংসার-মায়ার বন্ধন কেটে দেওয়া, জন্ম-মৃত্যুর শেষ করা।

জীবের কর্মফল তাঁকে ভোগ করতে হয়, তাই তো অবতারজীবনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এত দুঃখ-কষ্ট-ভোগ, নইলে তাঁর নিজের তো কোন কর্ম বা কর্মফল নেই। আবার অবতারপুরুষকে যারা ভালবাসতে সাহস করবে, তাদেরও ঐরকম কিছুটা কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালবাসতে হলে দুঃখকষ্টের ভারও নিতে হবে, এই রকম যতদূর যায় তারপর যথাপূর্বম্।

দেখ, স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। ঠাকুর অত সহজ

নন। এ-যুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্য দেখছিস না—লোকে স্বামীজীর ভাবই আগে নিচ্ছে, বেশি নিচ্ছে। এই সব সেবাকার্য, দেশপ্রেম—এর ভেতর দিয়েই field (জমি) তৈরি হলো। তারপর spiritual। আধ্যাত্মিক।

স্বামীজীকে বলে patriot-saint (দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী)। Patriot (দেশপ্রেমিক) কি সোজা কথা? দেশাত্মবোধ। আর তো কাউকে দেখলাম না—feel (অনুভব) করতে বা করাতে। স্বামীজীর যে স্বদেশপ্রেম—এ অত সোজা নয়। এ patriotism (পেট্রিয়টিজম্) নয়—এ দেশাত্মবোধ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ। তাই দেহেরই সেবা-যত্নে বিভোর। এ হচ্ছে দেশাত্মবোধ—সারা দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়ে চিন্তা। এই শেষ নয়, এরপরও আছে বিশ্বাত্মবোধ, সকলের জন্য চিন্তা।

এই বিরাট mass (জনগণ)—স্বামীজী যাকে বলেছেন sleeping leviathan (ঘুমন্ত জলজন্তু)—একে জাগানো কি মুখের কথা, না হুজুগের কাজ? ধীরে ধীরে তাকে touch (স্পর্শ) করতে হবে in spirit of sympathy and service (সহানুভূতি ও সেবার ভাবে)। হঠাৎ চমকভাঙা—যা মাঝে মাঝে হচ্ছে—mass response (গণ-জাগরণ) যাকে মনে করে ও বলে politician (রাজনীতিক)-রা তার বিশেষ কোন স্থায়ী দাম নেই। Mass awakening (গণজাগরণ) হবে slow and sure (ধীর ও নিশ্চিত)-ভাবে, যেমন হয়েছে ও হচ্ছে জাপান, রাশিয়া, টার্কী ও চায়নায় সান-ইয়াৎসেন্ ও কামালপাশা প্রভৃতির দ্বারা। স্বামীজীরও তাই প্রধান লক্ষ্য ছিল mass education (জনসাধারণের শিক্ষা)। পত্তন তো করে গেছেন—তারপর ধীরে ধীরে হবে, মড়াকে চেতানো—একি সহজ ব্যাপার? হাজার বছরের slaves (ক্রীতদাস)।

তবে আমরাই প্রথম—গ্রামে গ্রামে চাষার কুটিরে কুটিরে ঘুরেছি। সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মের বুলি না বলে—বলে বেড়িয়েছি সাধারণজ্ঞানের কথা, স্বাস্থ্যরক্ষার দু-চারটে কথা—জল পরিষ্কার করে ছেঁকে খাবে, মড়কের সময় পার তো ফুটিয়ে খাবে। কি করে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করা যায়, ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়, তার চেষ্টা করেছি, আর বলেছি—কিছু কিছু জমানো উচিত অসময়ের জন্য। আশ্রমের কপি-চাষ দেখে কত লোক শিখে নিল। তারপর গুটিপোকার পলু-চাষ তো আমরাই ধরালাম এদের, আশ্রমে কতদিন ঐ কাজ হয়েছে। ওদের রোজগারে যা বাঁচত, আমার কাছে জমা রাখত অসময়ের জন্য। এখনও অনেকেরই মজুরীর পয়সা কেটে—জমা রেখে দিই, বলি জমুক না, যেদিন কাজকর্ম করতে পারবি না—সেদিন নিবি।

শরৎ চাটুজ্যের ভাই বেদানন্দ এখানে অনেকদিন ছিল। শরৎবাবু একবার দেখা করতে আসেন [বলরাম মন্দিরে]। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) সঙ্গে দেখা, বললেন, 'এখানে অখণ্ডানন্দ স্বামী আছেন?' আমার কাছে এসে বললেন, 'আমি সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে আসিনি। শুনেছি, আপনি মানুষকে ভালবাসেন, চাষার কুটিরে কুটিরে ঘুরে বেড়ান, তাই আপনাকে দেখতে এলাম। আপনি যে ভাব নিয়ে কাজ করেন, আমি সেই ভাব নিয়েই বই লিখেছি, গল্প লিখেছি, যাতে ভাবটা ছড়ায়।' পরে তাঁর অনেক বই পাঠান। কতকগুলি বেশ লাগলো—পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই।

'জপ' যতটা পারবে, যখন পারবে করবে; ওর সময়-অসময়, স্থান-অস্থান নেই, 'ধ্যান' কি সহজে হয়?

মন তো চঞ্চল হবেই। জান তো গীতার কথা—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'। তার উত্তর হচ্ছে—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'। অভ্যাস চাই, তীব্র বৈরাগ্য চাই, নইলে কিছুই হয় না। মনের স্বভাবই হলো এদিক-ওদিক যাওয়া; জানো না কঠোপনিষদে আছে—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব বহির্মুখী, বাইরের অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের অন্তর্মুখী করতে হবে, ঐ জন্যেই তো পূজা, আরতি, ভোগরাগ, ধূপ-দীপ, ফুল-ফল—এত কাণ্ড, মনটাকে engaged (আটকে) রাখবার জন্য তাঁর কাজে, তাঁর কাছে।

মানুষের মন ভোগ করতে চায়, সেইটিকে divine (দিব্য) করে তুলতে হবে, ইষ্টের সঙ্গে ভোগ হলে আর অনিষ্ট হবে না, শুভ সংস্কার হতে থাকবে।

[ক্রমশঃ]

যৎকিঞ্চিৎ

অভাজনের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

অজিতেন্দ্র সিংহ

সুখ কি? অনেকের ধারণা সুখ বলে পৃথক কিছু নেই। কেউ মনে করেন সুখ যেখানে বাধা পায় সেখানেই দুঃখ হয়। আবার কেউ বলেন সুখ-দুঃখ মূলে এক জিনিস। সুখ-দুঃখ অভিন্ন। সুখ-দুঃখ চিরসঙ্গী। সুখের চেষ্টায় আমরা ঘুরে মরি অথচ সুখকে পাই না। তবু আমরা চাই সুখ, দুঃখ চাই না। আর সেই সুখ অর্জনের জন্য আমরা নিরন্তর যে চেষ্টা চালিয়ে যাই সেই চেষ্টাই হলো জীবন। আমাদের পক্ষে এই জীবন রাখাও দায় হয়ে পড়ত যদি-না আমাদের মনে আশা থাকত। লোকের ধারণা আশা সত্য কথা বলে না। আশা মায়াবিনী। তা কিন্তু সত্য নয়। আশাকে যদি আমরা অন্য পথে টেনে নিয়ে না যাই তো আশা আমাদের প্রবঞ্চনা কেন করবে? আশার অন্য কোন কাজ না থাকুক, ঈশ্বরের যে বিচার আছে ও পরকাল আছে এ-বিশ্বাস আশাই আমাদের মনে এনে দিয়েছে। আশা এমন একটা কিছু যা আমাদের মন থেকে বাদ দিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ব। পরকাল মানব না। ঈশ্বর ও পরকালে অবিশ্বাসী হলে মানুষ বিপদের সম্মুখীন হতে পারত না। সকল যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। ঈশ্বর তো অলীক কল্পনামাত্র নন। তিনি জীবন্ত সত্য। দুঃখের বিষয়, এই সত্য আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি না। এ-সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন এক ব্যক্তি এক সাধুজীকে দুটি প্রশ্ন করলেন। এক—'ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন লোকে একথা কেন বলে? আমি তো তাঁকে কোথাও দেখতে পাই না। সুতরাং তিনি কোথায় থাকেন আমাকে দেখাতে পারেন?' দ্বিতীয়—'অপরাধ করলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কেন? সেও তো ঈশ্বরেরই সৃষ্ট জীব এবং যা করে তা তো ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই করে?' প্রশ্ন দুটি শুনে সাধুজী একতাল মাটি নিয়ে প্রশ্নকর্তার মাথায় ছুঁড়ে মারলেন। লোকটি আদালতে নালিশ করল। সাধুজী তাঁর মাথায় আঘাত করেছেন। সে যন্ত্রণায় কাতর। বিচার চাই। জজ সাহেবের সামনে সাধুজীকে হাজির করা হলো। তিনি তাঁকে শুধোলেন: 'প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকে কাদা ছুঁড়ে মারলেন কেন?' উত্তরে সাধুজী বললেন: 'ঐ কাদার তাল ছুঁড়ে মারায় অভিযোগকারী যে-যন্ত্রণা পেয়েছে তারই মধ্যে তার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তার অভিযোগ তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। সেই যন্ত্রণা সে আমাকে দেখিয়ে দিক আমিও তাকে তাহলে ভগবান দেখিয়ে দেব। অভিযোগকারীর মতে মানুষ যা করে তা ঈশ্বরেরই কাজ। আমিও তো তাঁর ইচ্ছাতেই তাকে কাদার তাল ছুঁড়ে মেরেছি, তবে আমার বিরুদ্ধে নালিশ কেন?' জজ সাহেব সাধুজীর কথা শুনে খুব খুশি হলেন। নালিশ খারিজ হয়ে গেল। অভিযোগকারীরও চৈতন্য হলো। ঈশ্বরের অস্তিত্বও ঐ যন্ত্রণার অস্তিত্বের মতোই সত্য। সত্যরূপী ঈশ্বরকে যাঁরা দর্শন করতে পারেন তাঁরা তো সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে চলে যান। দেহের সুখ-দুঃখ ভোগ বলে তাঁদের আর কিছু থাকে না। কিন্তু কজন তাঁর সাক্ষাৎ পান? এক শিষ্য তার গুরুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন করে ভগবানকে পাব?' গুরু বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।' এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন, আর বললেন, 'তোমার জলের ভেতরে কিরকম মনে হয়েছিল?' শিষ্য বলল, 'প্রাণ আটু-পাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়।' গুরু বললেন, 'দেখ এই রকম ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটু-পাটু করে—তবেই তাঁকে লাভ করবে!' স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় একবার বক্তৃতা দানকালে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন। গল্পটি তাঁর ঠাকুরের কাছেই শোনা। প্রাণ যাওয়ার মতো ব্যাকুলতা আমরা কোথায় পাব? এরকম 'প্রাণ আটু-পাটু করা' আমাদের আসবে কোথা থেকে? ঈশ্বরদর্শনই বা

হবে কেমন করে?

'গুরু বিনা জ্ঞান নাই।' জ্ঞান গুরুই দিতে পারেন। দিতে পারেন প্রেরণা। এক আত্মা থেকে অন্য আত্মায় যিনি প্রেরণা সঞ্চারিত করতে পারেন তিনিই হলেন গুরু। কথায় বলে—'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সেজন নরকে মজে।' গুরুর নির্দেশ বিনা ঈশ্বরের উপাসনা করতে গেলে আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়ে হয় অধোগতি। এই গুরু সম্পর্কেও আবার কথা আছে—'গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।' গুরু করার আগে জেনে নিতে হবে তিনি প্রকৃত ধার্মিক ও চরিত্রবান কিনা। স্বামীজী বলেছেনঃ প্রেরণাদানকারী আত্মার যেন প্রেরণা সঞ্চারিত করার মতো যোগ্যতা থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রেরণা গ্রহণকারী আত্মারও যেন সঞ্চারিত হবার মতো যোগ্যতা থাকে। বীজকে হতে হবে প্রাণবন্ত; এবং জমিকে হতে হবে প্রস্তুত এক কর্ষিত ক্ষেত্র; এই দুই শর্তই পূর্ণ হলে পরমাশ্চর্যরূপে এক বিশুদ্ধ ধর্মভাব দেখা দেয়।

স্বামীজী ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেনঃ আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে ভগবান আছেন?

—হ্যাঁ, পারি।

—কেমন করে?

—আমি তাঁকে দেখতে পাই, যেমন তোকে দেখছি, এবং আরও স্পষ্টভাবে দেখি।

স্বামীজী বলছেন, "আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি একজনকে দেখলাম যিনি সাহস করে বলতে পারেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন।" স্বামীজী তাঁকেই করেছেন গুরু। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর গুরু।

আমরা দীনহীন গৃহী মানুষ। অতি অভাজন। সংসারের জোয়াল টানতে টানতে বুড়িয়ে যাব। না পারব যোগ্য শিষ্য হতে, না পারব সুযোগ্য গুরুর সন্ধান করতে। তা না পারি, আফসোস নেই তাতে। শুদ্ধ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্মরণ করব। আমাদের মতন সংসারী মানুষকে তিনিই শুনিয়েছেন আশার বাণী। চিনিয়েছেন পথ।

বলেছেনঃ "সত্যি বলছি—তোমরা সংসার করছ—এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না।"

"সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, 'যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই—তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে—সকলে ছি! ছি! করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে —সে-ই ধন্য। সে-ই বাহাদুর। সে-ই বীর পুরুষ তোমরা সংসারী। তোমরা এ-ও রাখ। ও-ও রাখ। সংসারও রাখ। ধর্মও রাখ।"

"সংসারে গুপ্তযোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ। বাইরে নয়।"

বলছেনঃ "সংসারে রেখেছেন—তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর। তাঁকে আত্ম-সমর্পণ কর। তাহলে আর কোনও গোল থাকবে না।"

"রেলগাড়ি অনায়াসেই ভারি বোঝা নিয়ে যায়। বিশ্বাসী ভক্ত-সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় নিয়ে অনায়াসে তাঁর ওপর ভক্তি-বিশ্বাস রেখে চলে যান। কোন কষ্ট বোধ করেন না।"

"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মেশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।"

ঈশ্বরদর্শন নাই বা হলো, তাঁর নাম-কীর্তন ছাড়ব কেন? ঠাকুর বলছেনঃ "যারা খানদানী চাষার মতো ঠিক ঠিক ভক্ত আর বিশ্বাসী—তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীর্তন করতে ছাড়ে না।"

"পাপী মানুষও ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকলে—তাঁর দয়া-গুণে আপনা আপনি পবিত্র হয়ে যায়।"

তাই বলি অন্য গুরুরই বা প্রয়োজন কি? দয়াল ঠাকুরই তো সকল অভাজনের গুরু। গুরুর গুরু। পরমগুরু। তাঁকেই ভগবান জ্ঞানে তাঁর নাম-গান করে তাঁর পাদপদ্মে ভরসা রেখে তরে যাব এই ভবনদী।

শিব ও শক্তি

পিনাকীলাল রায়

শিব কখনই শক্তিশূন্য নহেন। যখন তিনি শক্তি-সমন্বিত—তাঁহাতে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তখন তিনি বাক্যমনের অগোচর, কেবল সনাতন পুরুষমাত্র। তখন শিব একা বসিয়া আছেন ঃ তানপুরা লইয়া, শব্দব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া, নিজের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আছেন। তখন বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহাতে সংহৃত—তাঁহার মধ্যে যেন সম্পুটিত। তখন তাঁহাতে কোন ক্রিয়া নাই, কোন চেষ্টা নাই, শুধু তিনি বিরাজ করিতেছেন। এঅবস্থা মনুষ্যের চিন্তার অতীত—কল্পনার অতীত। কিন্তু যখন তানপুরা বাজিয়া ওঠে, শব্দব্রহ্মে ঝংকার হয়, তখনই মহাকাব্য উত্থিত হয়। সেই ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে "এক আমি বহু হইব", এই ইচ্ছাশক্তি যেন জাগরিতা হন। এই ইচ্ছা বেশ জমাট বাঁধিলেই সৃষ্টিশক্তি জাগিয়া কিশোরী গৌরীরূপে তাঁহার বাম উরুর উপর বসেন। তখন এক হইতে দুইয়ের উৎপত্তি হয়। এই দুই অর্থাৎ এই শিব-গৌরী হইতেই জগতের সৃষ্টি—বিশ্বের বিকাশ। বিশ্বের স্তরে স্তরে যেমন বিকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে আদ্যাশক্তির দশ-মহাবিদ্যা-রূপ ফুটিয়া ওঠে। যেই ক্ষণ হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ, সেই ক্ষণ হইতে নাশেরও উদ্ভব। অপচয় ও উপচয় একসঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। মা যেই মুহূর্তে উমা, সেই মুহূর্তেই কালী। কারণ, ক্রিয়ার অর্থই উপচয় এবং অপচয়। একদিকে উপচয়, অন্যদিকে অপচয়—একদিকে ক্ষরণ, অন্যদিকে বিকাশ। ক্রিয়া না হইলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি একটা ক্রিয়ামাত্র। শক্তি সঞ্চালিত—আন্দোলিত ও স্পন্দিত হইলেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। শক্তির স্পন্দন—আন্দোলন—সঞ্চালন তখনই হয়, যখন একদিকে অপচয় অন্যদিকে উপচয় ঘটে। সুতরাং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ দেখা দিবে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিবেই। তাই সদাশিবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—তিনই বর্তমান। তাই উমা দেখা দিলেই কালী এবং ছিন্নমস্তা ধুমাবতী ও বগলা দেখা দিয়া থাকেন। এক বিদ্যার বিকাশ হইলে, অন্য নয় বিদ্যা নয় দিক হইতে ফুটিয়া উঠেন।

যখন সৃষ্টির খেলা পুরাদমে চলিতে থাকে, তখন শক্তি কালীরূপে বিকশিতা। শিব শবাকারে চরণতলে পড়িয়া আছেন, মা শিবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য প্রেতনী সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ, নাশের সঙ্গে নূতন সৃষ্টির বিকাশ হইতেছে। আদ্যাশক্তি এক খাইতেছেন আর গড়িতেছেন, আবার খাইতেছেন আবার গড়িতেছেন। জীবন-মরণের এই পরম্পরা—ইহার যেন আদি নাই, অন্ত নাই, কেবলই চলিয়াছে নদীপ্রবাহের মতো। ইহাই সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। এই সময়ে শিবের শিবত্ব যেন ঢাকা পড়ে, শিব শবের ন্যায় হন। শক্তি এখন উন্মাদিনী—কোটি রূপে কোটি ভাবে অসংখ্য দিক দিয়া বিকশিতা। তখন শক্তি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র ও সর্বস্বে প্রকটিতা। শক্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না ; আর কাহারও খোঁজ পাওয়া যায় না। তখনকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত গান করিয়াছেন ঃ

"বাজবে গো মহেশের বুকে
নেচে নাচ গো ক্ষেপা মাগী !"

কিন্তু তাহা তো হইবার যো নাই। শিবের বুক ছাড়া তাঁহার নাচিবার অন্য স্থানও নাই। কারণ, শিব সর্বব্যাপী, অখণ্ড সত্তা—সর্বস্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মা সর্বব্যাপিনী, শিবও সর্বাধার-ভূত। সুতরাং নাচিতে হইলে মাকে শিবের বুকের উপরেই নাচিতে হয়। কল্পলতিকা তিনি, কল্পদ্রুম শিবের চারিদিকে—সর্বাবয়বে জড়াইয়া, লতাইয়া আছেন। শিব ছাড়া শক্তি থাকিতে পারে না। শিবদেহ সমাশ্রিত বলিয়াই শক্তি গতিরূপিণী ও লীলাময়ী। পক্ষান্তরে, তেমনই শক্তি ছাড়া শিবও থাকিতে পারে না। শক্তি প্রকট হউক, অথবা সম্পুটিতাই হউক, সদাই শিবদেহ সমাশ্রিতা। যখন শক্তি সংহৃতা, তখন শিব আত্মারাম—মহাযোগে নিমগ্ন। যখন শক্তি প্রকট, তখনও শিব যোগ-বিভোর বটে, পরন্তু ইচ্ছাময়। তাহা হইতে সিসৃক্ষা বা সৃজন-ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে আর ক্ষণে ক্ষণে এক

এক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও বিলয় তাঁহাতেই হইতেছে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অহরহঃ যে লীলা হইতেছে, প্রত্যেক জীবের দেহভাণ্ডেও সেই শিব-শক্তির লীলা অহরহঃ চলিতেছে। দেহভাণ্ডে শক্তি কুণ্ডলিনী-রূপে বিরাজিত, আর আমি আছি, এই শিব-জ্ঞান অখণ্ড-ভাবে তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। জীবন শক্তির একটা খেলা বটে। শক্তি নানাভাবে লীলা করিয়া জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতেছে বটে, পরন্তু আমি আছি, এই শিব-জ্ঞান অব্যাহতভাবে শক্তির খেলার মধ্যগত হইয়া না থাকিলে, শক্তির নানা বিকাশকে কেন্দ্রগত না করিলে জীবের জীবনই সম্ভবপর হয় না। স্থাবর জঙ্গম, সকল প্রকার জীবেই আমি আছি, এই জ্ঞান থাকিবেই। দেহাবচ্ছিন্ন আমি দেহেই বিরাজ করিতেছি, অন্য পদার্থসকল হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছি, এই জ্ঞান যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ দেহ সজীব থাকিবে। নহিলে শক্তি জড়শক্তি মাত্র, প্রাণ-হীন, জ্ঞানহীন।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জড় ও অজড় বুঝি না। সকল পদার্থেই, সকল শক্তির খেলাতেই, যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইখানেই যেখানে পদার্থের বিশিষ্টতা আছে, সেই পদার্থেই শিব ও শক্তি বিদ্যমান। বিশ্বসৃষ্টিতে শিব-শক্তি বর্জিত কিছু হইতে পারে না, কিছু থাকিতে পারে না। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু আছে, হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, সে সকলেই শিব-শক্তি আছে। শক্তির এক প্রকারের বিকাশকে আমরা জীব বলি, অন্য প্রকারের প্রকাশকে বলি জড়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও অজড়, জীব ও জড় দুই এক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় পদার্থেও জীব-ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। জড়েরও এক প্রকারের অনুভূতি আছে—উপচয় অপচয় আছে। যখন জড়ে ও জীবে শক্তি-ক্রিয়ার একই রকম পরিণতি ঘটিতেছে তখন জড় ও জীব এক, কেবল অবস্থার বিকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। এই হিসাবে তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে, সৃষ্ট-পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে, অনুভূতি শক্তি আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে। এই মেদিনীমণ্ডল একটা সজীব পদার্থ, সৌরমণ্ডল একটা প্রাণযুক্ত যন্ত্র মাত্র—দেহী পুরুষ স্বরূপ। তাহার উপর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট জীব, বিরাট পুরুষ। যেমন মনুষ্য বা পশুদেহ জীব-সমবায়ে স্বতন্ত্র সত্তারূপে বিদ্যমান, তেমনি পৃথিবীও জীবসমবায়ের সত্তারূপে জীবরূপে বিরাজমান। তাহার উপর সৌরমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড স্বতন্ত্র পুরুষ বিরাট জীব। এমনই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও জীবে এই অনন্ত আকাশ পরিপূর্ণ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে—জীবপূর্ণ আকাশ, আবার এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। আত্মাশূন্য স্থান নাই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিশ্বাত্মার সাগর। সেই সাগরের একটি বুদ্বুদ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টিতত্ত্বের এমন grand idea এমন বিরাট ভাব আর কোন জাতির কোন শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না।

জীবের কলেবরে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও সেই ক্রিয়া তেমনই ভাবে হইতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, মনুষ্য-দেহেও সেই ক্রিয়া তেমন ভাবে হইতেছে। তাই পৃথিবী একটা জীব। মেদিনীর শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, এক অপূর্ব ভাষার সাহায্যে ভাবের ব্যঞ্জনা আছে। জীব ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে। পৃথিবী হইতে যখন নানা জীব সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন পৃথিবী সজীব পদার্থ। যতক্ষণ সৃষ্টিলীলা চলিতে থাকে, ততক্ষণ কোন জীবের কোন পদার্থের নাশ নাই, শুধু অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটে মাত্র। যতক্ষণ শিব-শক্তির লীলা চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ কিছুরই নাশ হইবে না। তাই তান্ত্রিক ভক্ত বলিয়া থাকেন, মা থাকিতে ছেলে মরে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতক্ষণ মায়ের লীলা থাকিবে, ততক্ষণ মায়ের ছেলে মরিবে না। এক দেহ হইতে দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পরন্তু শিবশক্তি-সমুৎপন্ন জীব—আমি আছি এই জ্ঞান—আমার আছে এই বোধ—আমিত্ব বিস্তারের এই শক্তি কখনই নষ্ট হইবার নহে। কারণ, উহার নাশ ঘটিলে সৃষ্টির নাশ ঘটিবে। অতএব তন্ত্রের কথা মা-বাপ থাকিতে ছেলে মরে না, ইহা অসঙ্গত অলীক হইতে পারে না।

এইবার তন্ত্র বৌদ্ধধর্মের প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছেন। শাক্ততন্ত্র মাত্রেই লেখা আছে যে, 'অহিংসা পরমো ধর্ম" এমন কথা হইতেই পারে

না। ইহা অস্বাভাবিক কথা। জীবনই হিংসা, হিংসা না হইলে জীবন থাকে না। মায়ের বাহন হিংসার অবতার—সিংহ। তুমি খাইবে কি? যাহা খাইবে তাহাই জীব। জীবহত্যা না করিলে তোমার ভোজ্য প্রস্তুত হইবে না। পশু মারিয়া মাংস খাইতে হইলে মুমূর্ষু পশুর কাতর-ক্রন্দন শুনিতে পাও,—তোমার দুর্বল স্নায়ু বিচলিত হয়। তুমি দয়াপরবশ হইয়া মাংস ভোজন বর্জন কর। কিন্তু গাছের ফল ছিঁড়লে বৃক্ষ রোদন করে না? বেদনার অশ্রুধারায় তাহারও সর্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়। সে রোদনের ভাষা শুনিতে পাও না, বুঝিতে পার না, তোমার দয়া হয় না! গো-বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ পান কর কোন হিসাবে? তোমার জননীর স্তনযুগল হইতে যে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়, বিধাতার বিধানে তাহা তোমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহা পরকে খাইতে দিলে বাঁচিতে পার না। তেমনি ছাগ ও গাভী-শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য আদ্যাশক্তি মাতৃদুগ্ধরূপে তাহাদের জননীর স্তনে বিরাজ করেন। তুমি তাহা পান কর কোন লজ্জায়? ছাগ বা মৃগমাংস ভোজন করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ পান, ক্ষীর-ভোজনও মহাপাপ। তাহা হইলে কোটি কোটি জীব নষ্ট করিয়া, গোধূম-ধান্য, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য, আম-কাঁঠাল প্রভৃতি ফল, কন্দ-মূল, পত্র-পুষ্প ভোজন করাও মহাপাতক। আত্মরক্ষায় দয়া নাই, হিংসা আছে। কোনটা প্রকট হিংসা মনুষ্যের অনুভূতিগম্য, কোনটা বা অপ্রকট হিংসা—মনুষ্যের অনুভূতির বাহিরে। তুমি উঠিতে বসিতে শুইতে খাইতে জীবহত্যা করিতেছ। হিংসা ছাড়া তুমি থাকিতে পার না, তোমার দেহে কত জীব অন্য কত জীবকে সদা-সর্বদা খাইতেছে। তাহা রোধ করিতে পার? জীবের দ্বারাই জীবের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিতেছে। একটা বড় জীবের অবস্থিতির জন্য কোটি ক্ষুদ্র জীবকে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ দিতে হইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো যায় না, ব্যত্যয় কখনো হয় না। হীনযানী বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের এই প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তরে তাঁহারা নীতির কথা, সমাজের কথা তুলিয়াছেন। তবে তন্ত্র বলেন যে, যাহার যাহা সহ্য হয় সে তাহা খাইবে। ঘাস খাইলে সিংহ-ব্যাঘ্র বাঁচিতে পারে না, ঘাস সিংহ-ব্যাঘ্রের খাদ্য নহে। মাংস খাইলে গো-ছাগ, মেষ, মৃগাদি বাঁচে না, মাংস উহাদের খাদ্য নহে। তেমনি মানুষের ধাতু-অনুসারে, দেশ ও কাল-অনুসারে যখন যাহা খাদ্য, তখন মানুষ তাহাই খাইবে। আহারের বিচারে মানুষের উচ্চনীচ বিচার করিতে নাই, এবং মানুষের খাদ্যাখাদ্য তাহা সবই পবিত্র—হেয় নহে, বর্জনীয় নহে। মানুষ যাহা খায়, তাহাই মায়ের বলি, যাহা খায় না, তাহা মাকে নিবেদন করিতে নাই। যত জীব, তত শিব। প্রত্যেক দেহাবচ্ছিন্ন শিবের চারি পার্শ্বে কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া হইতেছে। সেই কুণ্ডলিনীকে তুষ্ট রাখিবার জন্যই মাকে ভোগ দিতে হয়, জীবের ভোজ্য স্থির করিতে হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের জন্য সংগৃহীত উপচারগুলি মাকে নিবেদন করিয়া দিবার পূর্বে চাখিয়া দেখিতেন! সুস্বাদু না হইলে তাহা মায়ের ভোগের জন্য দিতেন না। কথিত আছে, একদা তিনি কোন গৃহস্থের বাটীতে শ্যামাপূজার পৌরোহিত্য করিতে যান। পূজায় বসিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে মায়ের ভোগের উপকরণগুলি একটি একটি করিয়া চাখিয়া দেখিতে লাগিলেন। যেটি খাইতে ভাল নয়, সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে থাকেন। গৃহস্থ প্রমাদ গণিলেন! পূজামণ্ডপে সমবেত যাবতীয় লোক এই বিধি-বহির্ভূত অনাচার দেখিয়া কুপিত হইয়া তাঁহাকে পূজায় নিরস্ত হইতে বলিল। আগমবাগীশ বলিলেনঃ "আমি অদ্য এই পূজায় পুরোহিতের পদে বৃত হইয়া আসিয়াছি, মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, মা এই প্রতিমায় আবির্ভূতা হইয়াছেন, আমাকেই পূজা শেষ করিতে হইবে। যদি পূজায় কোন বিধি-বহির্ভূত ক্রিয়া আমার দ্বারা হইতেছে আপনারা এমন অনুমান করেন, তাহার বিচার পূজান্তে হইবে, এখন নয়। এখন যদি কেহ এই সাক্ষাৎ মায়ের সম্মুখে এই শুদ্ধীকৃত বীরাসন হইতে আমায় উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পূজায় মনোনিবেশ করিলেন, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে। একজন চিৎকার

করিয়া বলিয়া উঠিল: "বুজরুকটার কান ধরিয়া পূজামণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া দাও। এই রাত্রে আমরা নূতন পুরোহিত আনিয়া নূতন করিয়া মায়ের পূজা করাইব। প্রাণ থাকিতে এই উচ্ছিষ্ট ভোগ-রাগে মায়ের পূজা হইতে দিব না।" ইত্যাদি

বাড়ির কর্তাকে ডাকিয়া আগমবাগীশ বলিলেন: "তুমি আমাকে এই পূজায় পৌরোহিত্য করিতে বরণ করিয়াছ—তোমারও কি ঐ মত?"

তিনি বলিলেন: "এই পাঁচজনকে লইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে, আমি তো সমাজের বাহিরে নই বাবা।"

"তবে তাই হোক, আমি এই পূজা অর্ধ সমাপ্ত রাখিয়া চলিলাম। তবে যাইবার আগে তান্ত্রিক সাধকের বুজরুকিটা একটু দেখাইয়া দিয়া যাই।" এই কথা বলিয়া তিনি মায়ের চরণে কোশার খোঁচা মারিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মায়ের চরণ হইতে রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। আগমবাগীশ চাহিয়া দেখেন, সেই রক্তধারা মায়ের পদতলে পতিত শবরূপী মহাদেবের শ্বেতাঙ্গ আপ্লুত করিয়া মায়ের লোল রসনা স্পর্শ করিতেছে—মা ছিন্নমস্তা মূর্তিতে সেই রক্তধারা পান করিতেছেন—যাহা হইতে উদ্ভব, তাহাতেই লয়। মায়ের এই রূপোন্মত্ততায় আগমবাগীশের চোখে ভাবের অশ্রু, মুখে আনন্দের অট্টহাস ফুটিল। চারিদিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই—শুধু অন্ধকার—অমানিশার রাশি রাশি অন্ধকার—অন্ধকার যেন প্রলয়-মূর্তিতে সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিবার জন্য উপস্থিত। এই মুহূর্তে বাড়ির সমস্ত দীপগুলি নিবিয়া গিয়াছে—একটি মাত্র প্রদীপ মায়ের পূজামণ্ডপে জ্বলিতেছে—বোধ হয় প্রদীপও এখনি নিবিয়া যাইবে। এই মাত্র পূজা-বাড়ি লোকে গিজগিজ করিতেছিল মুহূর্তের মধ্যে সকলে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, শুধু বাটীর কর্তা মূর্ছিত হইয়া একধারে পড়িয়া আছেন।

আগমবাগীশ যেন মুহূর্তের জন্য সম্বিৎহারা হইয়াছিলেন—প্রকৃতিস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি তিনি পুনরায় সেই বীরাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইবামাত্র মায়ের সংহারিণী মূর্তি সংবারিত হইল। তিনি পূর্ণাহুতি দ্বারা মায়ের পূজা শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার পর লোকে এই তান্ত্রিক সাধক আগমবাগীশের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানিতে পারিল। তান্ত্রিকের ভক্তিকুম্ভ হইতে মা নামের অমৃতধারা পান করিবার জন্য বহুলোক আসিয়া তাঁহার আশ্রমে ভিড় করিতে লাগিল—অদ্বিতীয় তান্ত্রিক-পণ্ডিত জ্ঞানে বাংলার আপামর সাধারণ তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে তিনি 'বৃহৎ তন্ত্রসার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তান্ত্রিক মাত্রেরই অমূল্য সম্পত্তি—তন্ত্রতত্ত্বের রচনা-মণি-মঞ্জরী। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ যাহা খাইবে তাহাই মায়ের প্রসাদ—তাহাই মাকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। আর মা সেই জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বে এবং সংহারতত্ত্বে সর্বব্যাপারেই ছিন্নমস্তা। নিজের শোণিত নিজেই পান করিতেছেন,—সে শোণিতে নিজে পুষ্ট হইতেছেন। ইহাই সৃষ্টির গুপ্ত অব্যক্ত লীলা।

শিব ও শক্তির সর্বব্যাপিত ও সর্বকর্তৃত্ব বুঝাইয়া তন্ত্র তাঁহাদের রূপের কথা কহিয়াছেন। নাম ও রূপ না বুঝিলে রূপতত্ত্ব বুঝা যায় না। রূপের দুইটা স্তর আছে। এক অনুভূতিগম্য রূপ, আর বোধাতীত রূপ। বোধাতীত যাহা, তাহা বুঝানো যায় না; সুতরাং সেকথা চাপা থাকাই ভাল। অনুভূতিগম্য রূপ-ও দুই শ্রেণীর। এক জ্ঞানাভাস বা concept, দ্বিতীয়তঃ বোধাভাস বা precept। বোধের আভাস যাহা—অনুভূতিগম্য যাহা—তাহারই আলোচনা করিতে হয়। সেকথা পারি তো পরে বলিব। শিবের concept এবং precept দুইয়ের সুন্দর বিশ্লেষণ তন্ত্রে আছে। এই জ্ঞানাভাস ও বোধাভাস লইয়াই মায়ের দশমহাবিদ্যার রূপ নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এই রূপতত্ত্বের বিষয় গুরুমুখ ভিন্ন ঠিক বুঝা যায় না, বুঝানোও যায় না। পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া রূপতত্ত্বের আলোচনা করিতে নাই। উহা সাধনার ধন—করিয়া, কর্মিয়া সম্মুখে দেখাইয়া দিতে হইবে। গুরু দেখাইয়া দেন, শিষ্য সেই experiment দেখিয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া করে। তাই তন্ত্রে গুরুর এত আদর। গুরুর পদবী ঈশ্বরের সমান।*

* মাসিক বসুমতী, ২৩ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, (আষাঢ়), ১৩৫১, পৃঃ ১৯৮-২০১

সংগ্রহ: সংহতি চৌধুরী

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

তপোব্রত সান্যাল

[পূর্বানুবৃত্তি : শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর]

বেদান্ত

যে-আলোচনা আমরা আগে করেছি তাতে এটা স্পষ্ট, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিভূত উপাদান ও শক্তির উৎস-সন্ধানে নিরত। এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তি থেকে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমুদ্ভূত হয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানের এই ধারণার সঙ্গে ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পর্কে বৈদান্তিক ভাবনার সাদৃশ্য ক্রমেই স্ফুটতর হয়ে উঠছে। যাঁর মুখ চেয়ে আজ বিশ্বের তাবৎ পদার্থতত্ত্ববিদেরা বসে আছেন, সেই স্টিফেন হকিং বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপরিহার্য বলে মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পঙ্গু মহাবিজ্ঞানীই আবিষ্কার করবেন চরম সমন্বয়ের সেই অমোঘ সূত্রটি। এর কারণ, বোধকরি, শুধু যুক্তি দিয়ে এই দুরূহ রহস্যের উন্মোচন সম্ভব নয়। হকিং-এর গবেষণা শুধু যুক্তিচালিত নয়, অনির্বাচ্য বোধির দ্বারা প্রণোদিত। আইনস্টাইন-কথিত স্বজ্ঞার সরণি (intuitive leap) বেয়ে যে তাঁর অভিযাত্রা।

বেদান্ত এই মহাসমন্বয়ের বার্তা বহন করে চলেছে। সমস্ত অস্তিত্ব, সব উদ্দেশ্যের একরূপতা হলো বেদান্তের বাণী। বেদান্ত বলছেন :

"যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১১)

"এষ···যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"

(মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, ৬)

—ব্রহ্মই সমস্তের উপাদানকারণ, সর্বভূতের উৎপত্তি ও লয় তাঁর থেকেই।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ ··· তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" (মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।৭)

—ঊর্ণনাভ বা মাকড়সা যেমন সূতাজাল রচনা করে নিজের মধ্যেই সংহরণ করে, এই বিশ্বসৃষ্টিতে ব্রহ্মের ভূমিকাও সেইরকম। তিনিই বীজ, জগৎ তাঁর থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ। "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।১২)। গীতায়ও ভগবান একই কথা বলেছেন : "বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।" (৭।১০)

বেদান্তের মতে এই সৃষ্টি ও প্রলয় পর্যায়-নিয়মের অধীন (law of rhythm)। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয় আবার সৃষ্টি—এই পর্যায়প্রবাহ চলেছে, চলবে আদি-অন্তহীন। ঋগ্বেদের ঋষি এই পর্যায়প্রবাহ অনুধাবন করে বলেছিলেন :

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।" (১০।১৯০।৩) গীতায় ভগবান বলেছেন :

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।"

(৮।১৯)

প্রলয়ের পরে জগৎ ব্রহ্মে সাময়িকভাবে লীন থাকে, ব্রহ্মের সঙ্গে তখন হয় জগতের একীভবন।

"তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

তমঃ শব্দ বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মনি

একীভাবশ্রবণাৎ।"

(গীতায় ৭।৬ শ্লোকের রামানুজ ভাষ্যে ধৃত শ্রুতি)

প্রলয়ের অব্যবহিত পরে এই একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন :

"সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।১)

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।"

(ঐতরেয় উপনিষদ্, ১।১)

সেই প্রলয়াবস্থায় একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন, সেই অবস্থায় সৎ-ও ছিল না, অসৎ-ও ছিল না।

"নাসদ্ আসীৎ নো সদ্ আসীৎ তদানীম্।" (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১) শুধু ছিল তমসের দ্বারা নিগূঢ়তমঃ, ব্রহ্মলীন একীভূত অব্যাকৃত (unmanifested) প্রকৃতি।

"নাসীদ্ রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।"

(ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১)

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।" (ঐ, ১০।১২৯।৩)

উপনিষদ্ বলেছেন, প্রলয়োত্তর কালে প্রকৃতি

অব্যাকৃত থাকে।

"তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।৭)

পুরাণের ভাষায় এই অব্যাকৃত স্থিতির নাম কারণার্ণব (Sea of cosmic matter)। বেদে এই কারণার্ণবকে 'অপ্' বলা হয়েছে। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান যে মহাজাগতিক সূপের কথা বলছে, তার সঙ্গে কারণার্ণবের ঔপনিষদ্ ধারণার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ তাঁর 'সৃষ্টির-উৎস' শীর্ষক নিবন্ধে (দেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮) লিখছেন: "সৃষ্টি কেবলমাত্র আদি মুহূর্তে একবারের জন্য হয়নি, তার ধারা চলেছে চিরকাল ধরে নিত্য নতুন পথে, আজও তার সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়নি।"

যা হোক, বেদান্তমতে সৃষ্টির অর্থ হলো অব্যাকৃত ব্রহ্মশ্লিষ্ট জগতের পুনরাবির্ভাব। পৈঙ্গল উপনিষদে আছে:

"স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগদ্ আবির্ভাবয়তি।" (১।৪)

সৃষ্টি creation ex nihilo বা অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি নয়, অব্যক্ত জগতের প্রকটীভবন। সাংখ্যের "নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি" এই উক্তির অনুমোদন করে শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যে (১।৪।৭) লিখেছেন:

"অথৈবং সতি নাসত উৎপত্তিঃ ন সতো বিনাশঃ কার্যস্য ইত্যবধৃতং ভবতি।" গীতাতেও একই কথার অনুরণন:

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)

সৃষ্টি তাই creation নয়, emergence—আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে যা থাকে, তার দার্শনিক নাম প্রকৃতি বা প্রধান। প্রকৃতি প্রথমে নির্বিশেষ, বা সম-সত্ত্ব-সম্পন্ন (homogeneous) ও অপ্রকেত (undifferentiated) থাকে। এই নির্বিশেষ প্রকৃতিকেই বেদে 'সলিল' বা 'অপ্' বলা হয়েছে। অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।" (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৩) মনুসংহিতা বলছেন: "অপ এব সসর্জাদৌ।" (১।৮) এই অপ্রকেত প্রকৃতিকে উপনিষদে 'অদিতি'ও বলা হয়েছে। অদিতি-শব্দের অর্থ, যা দিতি বা অবয়বহীন। উপনিষদ্ একে 'অন্ন'ও বলেছেন। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।১।৮)। তপের দ্বারা স্ফীত ব্রহ্ম থেকে অন্নের উৎপত্তি। ব্যক্ত, সবিশেষ (heterogeneous) অবস্থায় অন্ন ও অন্নাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, matter ও spirit ছাড়া আর কিছুই নেই। তপঃস্ফীত ব্রহ্ম থেকে অন্নসৃষ্টির তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের স্ফীতি বা inflation-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পদার্থের যে নির্বিশেষ মূলীভূত উপাদানকে খুঁজে খুঁজে ফিরছেন বিজ্ঞানীরা, যার সংযোগ ও সংহননে এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, তাকেই বৈদান্তিকগণ 'প্রকৃতি' বলেছেন। সাংখ্য একেই জগতের অদ্বিতীয় উপাদান, অমূল মূল বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

বেদান্ত শক্তিকে স্বীকার করেছেন। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান যে চতুঃশক্তিসমন্বয়ের কথা ভাবছে, তাকে বেদান্ত বলছেন ব্রহ্মতেজ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বিলাস।

(১) "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্
ভাসয়তেঽখিলম্।" (গীতা, ১৫।১২)

(২) "তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।" (ঐ, ৭।৯)

(৩) "গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।" (ঐ, ১৫।১৩)

যে-ওজঃশক্তির কথা ভগবান ওপরের শ্লোকটিতে বলেছেন, তাকে মাধ্যাকর্ষণশক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক বেদান্তবেত্তারা। গীতার কথায় সমস্ত ক্ষেত্রেই 'তিনি' ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত। এই শক্তিকেই বেদান্তে ক্ষেত্রজ্ঞ, অন্নাদ এবং সাংখ্যে পুরুষরূপে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, অন্ন ও অন্নাদ, matter ও force এই—জগৎ-প্রকৃতির মহাদ্বৈত। এই মহাদ্বৈতকেই বৈদান্তিকরা অদ্বৈতে সমন্বিত করেছেন। তাঁদের মতে, এই দ্বৈতধারা সেই অদ্বিতীয়েরই বিধা বা প্রকার। প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ পরম ব্রহ্মে প্রলীন হয়। তখন কেবল 'তিনি'ই থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে:

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি।"

(৬।৪।৩৯)

ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হয়। গীতার একটি শ্লোকের (৭।৬) রামানুজ ভাষ্যে আছে —"অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি।" —অক্ষর তমঃ-তে লীন হয়, তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হয়। ঈশোপনিষদে আছে ঃ

"তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।" (৪) মাতরিশ্বা অর্থাৎ প্রাণ বা পুরুষ 'তাঁহাতে' অপ্ বা কারণার্ণব নিহিত করে। পরমেশ্বরের যে 'নারায়ণ' নাম, তারও কারণ আছে। মনুসংহিতা বলছেন ঃ "আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ।" (মনুসংহিতা ১।১৩) —অর্থাৎ তিনি 'নার' বা অপ্ (কারণার্ণব)-এর অয়ন বা আশ্রয়।

বেদান্ত বলছেন, প্রলয়ের পরে পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা (সিসৃক্ষা) হলে ("একোঽহং বহু স্যাম্") প্রকৃতি ও পুরুষের প্রলীন সমন্বয় ভঙ্গ হয়। অদ্বৈত তখন আবার দ্বৈতে রূপান্তরিত হন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিসাম্য নাসতত্ত্ব (Symmetry breaking) এক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য।

পুরাণে মহেশ্বরকে অর্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করা হয়েছে।—এক অঙ্গে হর, অন্য অঙ্গে গৌরী। হরগৌরীরূপ আসলে প্রকৃতি-পুরুষের অঙ্গাঙ্গীমিলনের দ্যোতক। জড়বিজ্ঞানেও matter ও force, জড় ও শক্তি অবিচ্ছেদ্য, অন্যোন্যাশ্রয়। বেদান্তের মতে প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বিত এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিধা, তাঁরই mode of manifestation। তিনিই কেবল সৎ বস্তু, আর সবই বাক্যের বিকার, নামের যোজনা, রূপের বিবর্তন। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।১।৪)। 'তিনি'ই একমাত্র সৎ, বিপ্রগণ 'তাঁকে' বহুরূপে বলেন—"একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি।" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বেদান্ত জগৎকে কেন মিথ্যা বলেছেন। উপনিষদের সিদ্ধান্ত, এই জগৎপ্রকৃতি শুধু ব্রহ্মের বিধাই নয়, বিবর্ত-ও বটে। যেমন রজ্জুর সর্পরূপে ভাণ, মরীচির মরীচিকারূপে প্রতীতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা বলছেন ঃ

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ (৬।১।৪)।

"যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ / বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্॥" (৬।১।৫)—একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলে সব মৃন্ময় বস্তুকে জানা হয়ে যায়, কারণ তারা তো মৃত্তিকারই বিকার, মাটিরই রূপান্তর। মৃত্তিকাই সত্য, মৃন্ময় বস্তু নয়। তেমনি স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু সত্য নয়; সত্য স্বর্ণধাতু, যা সব স্বর্ণ-নির্মিত বস্তুর মূল উপাদান। বৈদান্তিকের কাছে এই বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি সেই পরমব্রহ্মেরই বিকার, তাঁরই রূপের নানা প্রস্তাবনা মাত্র। 'তিনি'ই সত্য-বস্তু, তিনিই অমূল মূল। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই ব্রহ্মেরই রূপের ভ্রান্তি, নামরূপের আপাতপ্রভেদ-মাত্র। তাই এই জগৎ বৈদান্তিকের কাছে মিথ্যা, শুধু ব্রহ্মই সত্য। ঐতরেয় উপনিষদ্ বলছেন, এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত, এই পৃথিবী, এই বায়ু, আকাশ, অপ্, জ্যোতিঃ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, যাকিছু স্থাবর-জঙ্গম—সবই প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম।

"সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞা-নেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয় উপনিষদ্, ১।৫।৩) মহাপ্রমাণদ্বারা সম্যক্ বিদিত যে সর্বার্থদর্শক জ্ঞান, তাই প্রজ্ঞান। এই প্রজ্ঞানই চৈতন্য।

বিবেকানন্দ

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির বৈদান্তিক ধারণার সমীপবর্তী হচ্ছে। বিজ্ঞান আজ 'বস্তু বিশ্ববক্ষো-দংশ'-মাত্র নয়, স্বজ্ঞা ও অধিবিদ্যার অঙ্গনে তার পাদ-স্পর্শ ঘটেছে। স্বামীজী সেই ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আধুনিক প্রতীচ্য ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের মিলন একদিন না একদিন হবেই। নিউ ইয়র্কের সহস্রদ্বীপোদ্যানে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আধুনিক বিজ্ঞান সত্যই ধর্মের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যে এক, তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিপন্ন করা যায়। দার্শনিকরা যাকে 'সৎ' বলেছেন, পদার্থবিদ্‌রা তাকেই বলছেন 'বস্তু'। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কারণ

উভয়ই অভিন্ন। যদিও পরমাণুকে দেখা যায় না, ভাবা যায় না। তবু এই নিখিল সৃষ্টির সব শক্তি, সব ক্ষমতা এর মধ্যেই সংহত আছে। 'আত্মা' সম্বন্ধে বৈদান্তিকদেরও একই মত।"[১]

স্বামীজী পরমাণু বলতে প্রকৃতির অবিভাজ্য মৌল উপাদানকেই বোঝাতে চেয়েছেন যার অন্বেষণে সারা বিশ্বের ভৌতবিজ্ঞানীরা আজ নিরত। পরমাণু ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নেই। স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন ঃ "একত্বের আবিষ্কার হলো বিজ্ঞানের লক্ষ্য। যেদিন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বের সন্ধান পাবে, সেদিন বন্ধ হবে তার অগ্রগতির কারণ, তখন সে তার লক্ষ্যে উপনীত। এইভাবে রসায়নের অগ্রগমন থেমে যাবে সেদিন, যেদিন সে খুঁজে পাবে সেই উপাদান-মৌলকে যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে অন্যসব পদার্থ। পদার্থবিদ্যার খোঁজা শেষ হবে তখন, যখন সে আবিষ্কার করবে সেই অদ্বিতীয় শক্তিকে, অন্য সব শক্তি যার প্রতিভাস। আর ধর্মীয় বিজ্ঞান পূর্ণতা পাবে সেদিন, যেদিন সে খুঁজে পাবে 'তাঁকে'—যিনি সর্বব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে একমাত্র জীবন, যিনি এই নিয়ত পরিবর্তমান জগতে একমাত্র নিত্য বস্তু, যিনি সেই একমাত্র আত্মা অন্য সমস্ত আত্মা যাঁর ভ্রান্ত অবভাস। অতএব এই বহুত্ব ও দ্বৈতের মধ্য দিয়েই উপনীত হওয়া যায় সেই পরম একত্বে। এর পরে ধর্মের আর এগোবার পথ নেই। সব বিজ্ঞানেরই এই অভীষ্ট।"[২]

কী আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টি! যে-পরম একের বাণী বেদান্তে উদ্দ্যোতিত হয়েছে, শক্তির যে চরম সমন্বয়ের সন্ধানে আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ত নিষ্ঠিত, সে-কথাই স্বামীজীর উদ্দীপ্ত ভাষণে ভাষিত হয়েছে। সেই পরম একের প্রতিষ্ঠাই ধর্মের উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের অন্বিষ্ট। সেই একককে খুঁজে পেলেই হবে সব চাওয়া, সব খোঁজার অবসান। আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বামীজী-ব্যাখ্যাত বৈদান্তিক প্রজ্ঞান আজ যে সঙ্গত হতে চলেছে, সে-সম্বন্ধে সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে মহাবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"সব নিয়মই যেকোন বৃহত্তর নিয়মের অংশ, এমন একটা সমন্বয়-সাধক নীতির অনুমান খুব যুক্তিসহ মনে হয়। সেই বৃহত্তর নিয়ম—যা থেকে অন্য সমস্ত নিয়মের উৎপত্তি—খুঁজে বের করার চেষ্টাই আমরা করছি। আমার মনে হয়, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—ঈশ্বরে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা।"[৩]

স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় আরও বলেছিলেন ঃ

"বিজ্ঞান আমাকে প্রমাণ দিয়েছে যে, কায়িক স্বাতন্ত্র্য ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র, প্রমাণ দিয়েছে যে, আমার এই দেহ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু সমুদ্রে শুধু একটি ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল অংশ, আমার অন্য প্রতিরূপ আত্মার সঙ্গে অদ্বৈতসাধনই হলো চরম পরিণতি।"[৪]

যে "অপরিচ্ছিন্ন বস্তু-সমুদ্রের" (unbroken ocean of matter) কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, তার সঙ্গে যেন আধুনিক বিজ্ঞানের 'মহাজাগতিক যূষ' ও বেদান্ত-বর্ণিত 'কারণার্ণব-এর মিল রয়েছে। স্বামীজী বলেছেন ঃ

"পদার্থবিদ্যার দুপাশে অধিবিদ্যার বেড়া। অর্থাৎ যদিও তার সঙ্গে আছে যুক্তি, কিন্তু তার শুরু অযুক্তি দিয়ে, তার শেষেও রয়েছে অযুক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির গভীরে যদি আমরা অনুসন্ধান চালাই, তবে এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁছাব যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমার বাইরে। যুক্তি হলো স্মৃতি দ্বারা সংরক্ষিত সঞ্চিত ও শ্রেণীকৃত অনুভূতি। আমাদের কল্পনা বা বিচার এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাইরে যেতে পারে না।…

"ধর্ম হলো সেই বিজ্ঞান যা মানুষের অসীমতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অসীমতাকে জানতে চায়।… মানুষকে যত বেশি আমরা মানবো, এই নিখিল সৃষ্টিকে জানাও আমাদের তত বেশি হবে। মানুষই হলো সব বস্তুর সার আর তার মধ্যেই সংহত হয়েছে সব জ্ঞান।"[৫]

যে-সজ্ঞার সরণি বেয়ে আজ আধুনিক বিজ্ঞানের অভিযাত্রা, স্বামীজীর বাণীতে তারই অভ্রান্ত

১ দ্রঃ The Complete Works of Swami Vivekananda Vol. VII, (1972), p. 50

২ Ibid, Vol. I, (1977), p. 14-15

৩ New York Times, 23 January 1983

৪ দ্রঃ Complete Works Vol. 1, p. 14

৫ Ibid, Vol. 8 (1971), pp. 20-21

ইঙ্গিত। বিশ্রুত বিজ্ঞানী 'The Tao of Physics'-এর বিশ্ববিখ্যাত লেখক ফ্রিটজফ ক্যাপরার মুখেই শোনা যাক বিজ্ঞানের অধুনাতন প্রবণতার কথা ঃ

"আজকাল প্রায়ই দেখা যায়—অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে বিজ্ঞানীরা সাফল্যনীতির (holistic principles) ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন কাঠামোকে স্বীকার করতে চান না। এমন ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিতে পারবে যে এই ধরনের কাঠামো শুধু যে বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, প্রত্যক্ষ সত্য-সম্বন্ধিত সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে তা সমঞ্জসও।"৬

ম্যাকসবর্নের সম্ভাব্যতা তরঙ্গ-তত্ত্বের (probability wave theory) ধারণা থেকে মনে করা হচ্ছে, ফোটন ও ইলেকট্রন-কণা হয়তো বা চেতনাসম্পন্ন কোন জৈব পদার্থবিশেষ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যে ব্যাখ্যা কোপেনহেগেন-সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ঐ ব্যাপারে দুই বিজ্ঞানী এভারেট হুইলার (Everette Wheeler) যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাদের মানসসৃষ্টিমাত্র। তাঁদের মতে এই বিশ্বপ্রকৃতি কেবল বিষয়গত (objective) ব্যাপার নয়, বিষয়ীগত (subjective) ব্যাপারও বটে। প্রাচ্যরহস্যবাদের অভ্যন্তরে আজ ভৌত-পদার্থবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে মাইকেল ট্যালবট (Michael Talbot) তাঁর 'Mysticism and the new Physics'-গ্রন্থে লিখেছেন, ভৌত-পদার্থবিদ্যার এই বিষয় ও বিষয়ীগত সমন্বিত ধারণার (omnijective) প্রভাব প্রতীচ্য সভ্যতায় যে ছাপ ফেলে, সেটাই দেখার। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই প্রভাবের ফল বিস্ময়কর ও দূরপ্রসারী হবেই। রকফেলার ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ হাইনজ প্যাগেলস (Heing Pagels) তাঁর Cosmic Code গ্রন্থে লিখেছেন,আমরা আজ ভৌত-পদার্থবিদ্যার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তিনি বলেছেন যে, এই প্রত্যাসন্ন পরিবর্তন কোপার্নিকাসের যুগান্তকারী আবিষ্কার—যা ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে উন্মূলিত করেছিল—এবং এই শতাব্দীর প্রথমপাদে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উদ্ভাবনার সঙ্গে তুলনীয় হবে।

বস্তুতঃ ভারতীয় ক্রান্তদর্শী ঋষিরা যে সমন্বিত সংহত বিশ্বপ্রপঞ্চের ধারণা করেছিলেন, যে-সমন্বয়ের বার্তা স্বামীজীর ভাষণে ও রচনায় বারবার উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। সেই সমন্বয়-সূত্রটি আবিষ্কার করার জন্য সারা পৃথিবীর ভৌতবিজ্ঞানীরা তৎপর। জে. এ. হুইলার তাই বলেছেন যে, এই বিশ্ব আশ্চর্য সন্দেহ নেই কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছি আমরা নিজেরা। বিশ্বস্রষ্টার রহস্যলীলার মর্মোদ্ধার আজও আমরা করতে পারিনি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে একটিমাত্র সহজসূত্রের মধ্যেই সব রহস্যের সমাধান নিহিত আছে। এই সমন্বয় কেবল ভর, শক্তি বা অন্য মহাজাগতিক বলেরই হবে না, এ-সমন্বয় হবে বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের, পদার্থের সঙ্গে মনের, বুদ্ধির সঙ্গে বোধির, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞার ও সজ্ঞার। এই সমন্বয়-সূত্রটির অবশ্যম্ভাবী আবিষ্কর্তা হবে মানুষ, তাই তার কৃতিত্বও কম বিস্ময়কর হবে না। বিজ্ঞানী অ্যানটনজী তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'Fearful Symmetry' গ্রন্থে লিখেছেন, সময় ও চৈতন্যের রহস্য বিজ্ঞান আজও ভেদ করতে পারেনি। চেতন ও জড়, অতীন্দ্রিয় বোধ ও ঐন্দ্রিয় অনুভূতির মাঝে যে ভেদরেখা রয়েছে, তা অতিক্রম না করতে পারলে বিজ্ঞান পূর্ণতা পাবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিচয়' গ্রন্থের 'ছবির অঙ্গ' নিবন্ধে যা লিখেছেন, এ-প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

"মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তাহার মন মানে না, তাহার সুখ থাকে না, তাহার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তাহার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।"৭

এই একের অন্বেষণই মানুষের চিরন্তন সাধনা। বেদান্ত-বচনে ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে যে একের অসংশয় উদ্‌ঘোষণা, বিজ্ঞানের বর্তমানের নিষ্ঠিত গবেষণায় মিলছে তারই সমর্থন। বিজ্ঞান কবে সেই পরম অদ্বিতীয়কে খুঁজে পাবে, তারই প্রতীক্ষায় আমাদের কাল গোণা। [সমাপ্ত]

৬ The Schumacher Lectures—Abacus Edn. Sphere Books Ltd. London, 1982, p. 135

৭ রবীন্দ্র রচনাবলী—(বিশ্বভারতী সং) অষ্টাদশ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৫১০

ব্যাকুলতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। কোনও সন্দেহ নেই। এক পা তাঁর দিকে এগোই তো তিন পা পেছিয়ে আসি। এমন সব জাগতিক তুচ্ছ জিনিস চেয়ে বসি যে তাঁর দেবার ক্ষমতা থাকলেও আমার প্রতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। যেমন খুব একটা ভিড় বাসে উঠে, আমি মনে মনে বললুমঃ 'ঠাকুর, আমি রোজ আপনাকে প্রাণমন দিয়ে ডাকি। আজ নিজেকে আমার ভীষণ দুর্বল লাগছে, একটা বসার আসন আপনি আমাকে পাইয়ে দিন। আমাকে এমন একটা আসনের পাশে দাঁড় করিয়ে দিন, যে আসনের যাত্রী পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন।' সঙ্গে সঙ্গে মন বললেঃ 'তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও'। আমি ধরেই নিলুম, এ হলো আমার ঠাকুরের নির্দেশ। কোথায় কি! সেই আসনের দুজন যাত্রী একেবারে শেষ স্টপেজে গিয়ে নামলেন। অথচ প্রথমে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকলে পরের স্টপেজেই বসার জায়গা পেয়ে যেতুম। অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে গেল। সিদ্ধান্তে এলুম, ঠাকুর আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আমি ঠাকুরের কেউ নই। ঠাকুরও আমার কেউ নন। পরে গভীর রাতে যখন নিজের মুখোমুখি হলুম, নিজের নির্বুদ্ধিতায় হেসে ফেললুম। ঠাকুরের কাছে আমি কি সামান্য জিনিসই না চেয়েছি! বাসে বসার একটি আসন। আত্মজ্ঞান নয়। বিবেক-বৈরাগ্য নয়। শুধু একটি আসন। সোনার দোকানে গেছি লোহার শেকল কিনতে। মূর্খ সংসারী। প্রতিজ্ঞা করলুম, এই আমি আর কোনওদিন করব না।

সাতদিনের মধ্যেই সব ভুলে গেলুম। অফিস বেরোবার আগে আকাশ ছেয়ে এল কালো মেঘে। ঠাকুরের কাছে চেয়ে বসলুম, ঠাকুর বৃষ্টিটা একটু ধরে রাখুন। অফিসে পোঁছাবার পর যেন নামে। কোথায় কি! তিন মিনিটের মধ্যেই তেড়ে বৃষ্টি নামল। এক হাঁটু জলের তলায় তলিয়ে গেল কলকাতা। ভয়ংকর অভিমানে সেই দুর্যোগের মধ্যেই নেমে পড়লুম পথে—বুঝেছি, আপনি আমাকে ভেজাতে চান। গর্তে ফেলে কর্দমাক্ত করতে চান। তবে তাই হোক। আবার গভীর রাতে জ্ঞানোদয় হলো—বোকা! বৃষ্টি হবে প্রকৃতির নিয়মে। ঠাকুর কি করবেন! মন বললে, কেন ? ভক্তের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। যুক্তি বললে—মূর্খ! তোমার ভক্তি, তোমার বিশ্বাস কি অতদূর পেঁছেছে। মন বললে, না। তবে? তবে তুমি কি করে আশা কর, অলৌকিক একটা কিছু ঘটবে! তোমার ভেতরে কি সেই বালক জটিলের বিশ্বাস আছে ! ঠাকুর যে-গল্পটি ভক্তদের প্রায়ই বলতেন! বনপথে জটিল তার মধুসূদনদাদার দেখা পেয়েছিল। অথবা ঠাকুরের গল্পের সেই মেয়েটি। ঠাকুর বলছেনঃ "একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্প বয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছল। স্বামীর মুখ কখনো দেখেনি। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই ? তাঁর বাবা বললেন, গোবিন্দ তোমার স্বামী ; তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দরজা দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে,—বলে গোবিন্দ ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও। তুমি কেন আসছ না! ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না, তাকে দেখা দিলেন।" গল্প শেষ করে ঠাকুর বলছেনঃ "বালকের মতো বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্যে যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই

ব্যাকুলতা হলো তো অরুণোদয় হলো। তারপরে সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।"

সব পারি, ব্যাকুল হতে পারি না কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? বুঝতে পেরেছি, এই পৃথিবীতে নিজেকে ঠিক ততটা অসহায় মনে করতে পারি না। জৈব অভ্যাসে যা যা প্রয়োজন, কমই পাই আর বেশিই পাই, পেয়ে তো যাচ্ছি। আপনজনেরা আমাকে ঘিরে আছে। যতই দুঃখ দিক আঘাত দিক, মনের এমন অভ্যাস, কিছুতেই মানতে চায় না যে, ওরা কেউই আমার আপনজন নয়। স্বার্থের টানাপোড়েনে বাঁধা।

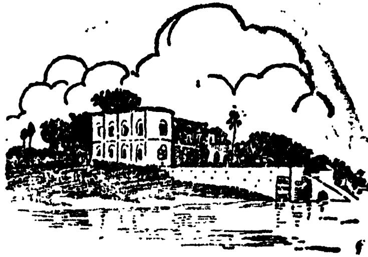
ঠাকুর বললেন, বড় ধন্ধে পড়েছিস তাই না! যে তাঁকে ভাবে না, সে একরকম থাকে। তার বিশ্বাস মতো সে চলে। খায় দায়, সংসার করে। হাসে, কাঁদে, রাগে। তার দুঃখের কারণ অন্য, তার আনন্দের কারণও অন্য ; কিন্তু যার মনে তিনি ছায়া ফেলেছেন, সে মরেছে। সে বুঝতে পারছে হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে অপার আনন্দের ধারা। সে-নদী বইছে। সে-নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। উজ্জয়ী বাতাস বয়ে আসছে। শুধু অবগাহন করা যাচ্ছে না। সূক্ষ্ম অথচ শক্ত একটা ব্যবধান। কিছুতেই ভাঙা যাচ্ছে না। উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে :

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখির মতো॥
অসংখ্য অপরাধী আমি জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি।
মায়াতে মোহিত হয়ে বৎসহারা গাভীর মতো॥

বলো, "কেন? পিঞ্জরের পাখির মতো হতে যাব কেন? হ্যাক! থু! সীতার মতো করে দাও। একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল...হাত, পা,...কোন দিকে হুঁশ নেই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম! শোন,

গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥

"কাম-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। পরমাত্মা চুম্বক পাথর জীবাত্মা যেন একটি সূচ—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু সূচে যদি মাটি মাখা থাকে, চুম্বক টানে না। মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কাম-কাঞ্চনমাটি পরিষ্কার করতে হয়। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বক টেনে নেবে। যোগ তবেই হবে।"



শিবের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাঁকে পর্বতমালায় দেখতে পেয়েছিলেন। অথবা অন্য কোথাও। কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উদ্ভাসিত হয়েছিল যে তুষারশিখর, চন্দ্রালোক আর স্থির জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা আর সব বর্ণ বৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্যের থেকে একেবারে আলাদা।

এ যেন জননী প্রকৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর পাখির নক্সা-আঁকা-পাড় সবুজ শাড়িটি পরে অগণ্য মণিখচিত নীলাম্বরীতে মুখ ঢেকে রয়েছেন, তবু তাঁর অজস্র ঐশ্বর্যের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাস খেলে যায়, যা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এমন কিছু যা শুভ্র, পবিত্র, তপস্যাপূত, যা নৈঃশব্দ্যের অনিবার্য ইঙ্গিত, যা স্তব্ধ, নিরাবেগ, চিরনিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্যে তখন দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা। আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, অণুতে-বিশ্বে, কার্যে-কারণে—সর্বত্র হিন্দুমানস তখন এই দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের দিকে তাকিয়েও সে তাই দেখেছে—নর ও নারী, আত্মা ও দেহ—এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন।

এইখানেই সূত্রপাত। সাঙ্কেতিকতার স্তরে এসে সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা যুক্ত হলো নররূপের সঙ্গে, আর শক্তিরূপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা প্রকৃতি বলি) নারী ও জননীমূর্তির সঙ্গে তা অন্বিত হলো। এই কল্পনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, নর ও নারী—এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি এখানে পারস্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক প্রকাশরূপে স্বীকৃত। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকৃতিও সেই ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ।

'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বন্দ্বরত ?' এ শুধু এক মহাকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন। শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অপরপ্রান্ত থেকে ভারতীয় ঋষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে —'আরো গভীরে চেয়ে দেখো ভাই! আসলে তারা দুই নয়, এক সত্তা।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্তাই পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাশিত।

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই একান্ত মানবিক। অন্তহীন প্রান্তরের বুকে এক বিরাট প্রস্তরচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মহিমার নানা বিচিত্র সৌন্দর্যময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিন্তু একবারও এমন ভুল হয় না যে, ঐ বস্তুটিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল—এরাও এমনি প্রতীক। এই সব প্রতীক কখনও হৃদয়বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে তাদের জন্য আত্মবিসর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। ঈশ্বরের অন্য ছবি—মেষপালকরূপে বা চিরকালীন পিতারূপে—তাঁর ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক পার্থক্য।

এক বিচিত্র মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের পটভূমিতে সত্যানুভব জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে, অনিবার্য আবেদনে, পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে এমন অমোঘ যে, সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে যাই যে, এও শেষকথা নয়, ভুলে যাই যে এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল সমগ্রতা নিহিত।

কোন বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার বিপদকে হিন্দুধর্ম বড়ো বিচিত্রভাবে পরিহার করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশি এবং অন্তরে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক। মণিখণ্ডের বিচিত্র দ্যুতির মতোই তাদের প্রতীকের বহুবর্ণময় প্রকাশ।

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর একটি ব্যাখ্যা। আত্মা

* ভগিনী নিবেদিতার "Kali the Mother" গ্রন্থের 'The Vision of Shiva' রচনার অনুবাদ।

ও অভিজ্ঞতা আর একটি ভাষ্য। বিদ্যুৎযন্ত্র ও তার পরিচালক বিদ্যুৎশক্তির রূপক হয়তো এর তৃতীয় অর্থ।

এই শেষ ব্যাখ্যাটি এক মুহূর্তের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্র আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। এই দুয়েরই ভারতবর্ষীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। নাইট (বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার প্রেরণাস্পর্শ ছাড়া সে শক্তিহীন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য—যাঁর মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, বহিরঙ্গ স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্মবিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বাহ্যজগত—সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা—আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা সে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্তসৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা—এই সেই আত্মোপলব্ধি।

কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা—আত্মার উন্মোচিতদৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া।

আমরা দেখেছি ঈশ্বরীয় সত্তার মানবীয় প্রকাশ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রকাশপদ্ধতি অনুধাবন করতে হলে একটি সমগ্র জাতির হৃদয় ও অনুভূতিলোকের সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যিক। আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে রাজা, প্রভু ও পিতার সমন্বয়ে গঠিত। সর্বোচ্চ সেই পরমপিতার স্থান। তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে তিনিই সেনাপতি ও সর্বাধিনায়করূপে চলেছেন। তাঁর সন্তানদের প্রতিটি কেশের সংবাদ তাঁর জানা। তাদের অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন সব দুর্দৈবের হাত থেকে। জগৎরূপ দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির তিনি একক অধিকারী, সযত্নে লালন ও গ্রহণ করছেন তাঁর প্রিয় দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রেমে শাসনে শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কল্পনায় ভগবৎস্বরূপের মানবিক প্রকাশ।

ভারতের আদর্শ কত আলাদা। জীবনের সেখানে একটিই পরীক্ষা, একমাত্র মানদণ্ড—একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানেনি; শুধুমাত্র তাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু কেবল প্রশ্ন—আত্মা কি পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করেছে?

জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় এই একটিমাত্র আবেগেরই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো বড়ো কথা নয়। জ্যাক (নায়ক) যে তার জোয়ানকে (নায়িকা) পাবে (অথবা পাবে না) তা একান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার-মাত্র—যা নাটকের গোড়াতেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করি—কখন এই মানুষ-গুলি ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা একথা উপলব্ধি করবে যে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়!

উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হওয়ারই সর্বস্বীকৃত বহিঃপ্রকাশ—ত্যাগ। ভগবৎপ্রেমের আরক্ত গোলাপটি সেই মুহূর্তে ভক্তহৃদয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ওঠে, 'তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন ঝরনার উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার হৃদয়ও তেমনি তোমার উদ্দেশে ধাবমান।' সমগ্র এশিয়া জানে যে, সেই মুহূর্তে জগতের আর সবকিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-জগতের সব আকর্ষণ মুহূর্তে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গৃহ, পরিজন, জনসংসর্গ—সবই বন্ধন বলে মনে হয়। আহার, নিদ্রা ও দৈহিক যত প্রয়োজন সবকিছু অসহ্য ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। হিন্দুকল্পনার দেবাদিদেব মহাদেব তাই ভিখারীমাত্র। যজ্ঞাগ্নির ভস্মবিভূষিত তাঁর তনু তখন তুষারাবৃত মনে হয়, অযত্নবিন্যস্ত তাঁর জটাভার, শীতোষ্ণনিরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর অবস্থান। অনন্তধ্যানে তিনি চিরসমাহিত।

অর্ধনিমীলিত দুটি নেত্র। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কত জগতের উদয়-বিলয়, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। তাঁর সামনে সবকিছু স্বপ্নবৎ ভাসমান। এই অপূর্ব অবাস্তব মূর্তিটির এমনি অর্থ। কিন্তু একটি শক্তি তাঁর সদাকর্মচঞ্চল। তারই

মধ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি নিহিত। ললাটের মধ্য ভাগে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তৃতীয় নয়ন। এই তো একান্ত স্বাভাবিক যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রতীক দেবাদিদেব শিবের আর এক নাম হলো বিরূপাক্ষ। পশুপতি তিনি। কণ্ঠ তাঁর সর্পবিষজর্জর, যে-বিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে তিনি কখনো ফিরিয়ে দেন না। উন্মাদ ও উৎকেন্দ্রিক, পাগল আর অদ্ভুত অল্পবুদ্ধি যত মানুষ—তাদের সবার ঠাঁই রয়েছে তাঁর দুয়ারে। দৈত্যদানবকেও তিনি আপন করে নিতে জানেন।

যা আর সবাই প্রত্যাখ্যান করে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। জগৎরক্ষার জন্য তিনি যখন বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে বিষ তাঁকে নীলকণ্ঠে পরিণত করেছে, তখনই জগতের সব বেদনা ও গ্লানির বোঝা তিনি টেনে নিয়েছেন।

এত সামান্য তাঁর সম্পদ! বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষভ, ধ্যানের ব্যাঘ্রচর্ম আর একটি কি দুটি জপের মালা—আর কিছু নয়, কিছুই নয়!

সবার উপরে—তিনি এত অল্পে সন্তুষ্ট। এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কি হতে পারে? শুধু পবিত্র বারি আর দুচারটি আতপ চাল আর একটি কি দুটি বেলপাতা দিনে একবার করে তাঁকে দিলেই চলে। জাগতিক বিষয়ে মহাদেবটি একেবারে সরলতম। যে সমস্ত বস্তুর জন্য আমাদের এত সংগ্রাম, এত মিথ্যাচার, পরস্পরের এত হানাহানি—তার কিছুই তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বাত্মা, অনন্ত-করুণাময়, অজ্ঞাননাশন দেবাদিদেব শিবের এমন একটি ধ্যানমূর্তি ভারতীয় হৃদয়ে ভেসে ওঠে। হিমালয়ের তুষারপুঞ্জের জ্যোতি আর স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্রেরেখার স্থির প্রতিচ্ছায়ায় এমনই একটি মূর্তির প্রথম আভাস জেগেছিল। পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ অন্তর্মুখীনতা, পরিপূর্ণ অনন্তের অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া—শুধু এই কথাগুলিই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, যিনি 'মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, যিনি বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ।'

প্রতিদিন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে তাঁর উদ্দেশে যে প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত হয়, সেটি এই—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাং অমৃতং গময়,
আবীরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

আদর্শ মনুষ্যত্বের, পরিপূর্ণ দেবত্বের এমন এক প্রতীক এই শিব।

পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দিকে তাঁর প্রলয়ের চিহ্ন ছড়ানো। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা। এখনো তাঁর একহাতে রুধিরচর্চিত খড়্গ, আর এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলেন।

মায়ের ডান হাতদুটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত, প্রসারিত জিহ্বায় লজ্জা ও বিস্ময়ের আতি-শয্যচিহ্ন—একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যেত।

আর শিব—তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নগ্নিকামূর্তি—নরমুণ্ডমালায় যাঁর ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, রক্তবন্যায় যিনি দানবদের রুধির পান করান, মহানন্দে যিনি হত্যা করে চলেছেন, কোন বেদনা যাঁর হৃদয়ে নাড়া দেয় না, যে তাঁর চরণাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র তাঁকেই যিনি আশীর্বাদ করেন—সেই কালী সমস্ত সৌন্দর্যের সার।

মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণকেশরাশি পিছনপানে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে, অথবা সমস্তবস্তুপ্রবাহবহনকারী সময়ের মতো দ্রুত ধাবমান। কিন্তু সেই পরম তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণ মেঘের

কাছাকাছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহা-ভয়ঙ্করীর হৃদয়গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত চেতনায় তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

কোন্ মননভূমি থেকে এমন ভাবনা উৎসারিত হয়, তা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? কালী তো কেবল প্রতিমামাত্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের উচ্চারণ।

উপলব্ধির দিব্য মুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করে—কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, সহাস আকাশ, রৌদ্রাপ্লুত পুষ্পরাশি—এরা কেউ সেই সর্বেশ্বরকে ভোলাতে পারে না। আপাত মাধুর্যের অন্তরালে তিনি দেখতে পান জীবন জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধাবমান, মধ্যাকাশে আঘাত হানতে উদ্যত ধূমকেতু। তাঁর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সর্বজীবের আর্ত ব্যথিত ক্রন্দন, লুব্ধের হাহুতাশ আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত কলরব। মমতাহীন, দায়িত্বহীন, মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা সে-ক্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্টহাস্যে মুখর কালস্রোত প্রবহমান।

সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। শ্রান্তহৃদয় বলে ওঠে, 'সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়ো, অনেক ভালো।'

কিন্তু আত্মার দিব্যদৃষ্টির মুহূর্তটি তো তা নয়। পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বসিত বিলাপ, করুণার জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য—কিছুই সে মুহূর্তে নেই। মাথা নিচু কর, অমনি চিরন্তনী মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা ও হতাশায় মন্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। যদিও ধ্বংসের নিনাদই তীব্রতর, আর সেই কণ্ঠস্বর মৃদুতম, তবু কান পেতে শোনো—

"আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করবো।"

শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয়নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করিনি?

চেয়ে দেখো, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান। তুমি আমাদের সংহার করলেও আমরা তোমারই শরণাগত।

মুহূর্তটি অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃষ্টি—মানবকল্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই মুহূর্তটি পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম আদিযুগের পার্বত্য-পটভূমিকায়।

বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন—আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার বহন করে বলিষ্ঠ এক বৃষভ ধীরস্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অগ্নিসংযোগ হলো, চারপাশের যজ্ঞকাষ্ঠকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত করে হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে নীলাভ শিখা সমুত্থিত হলো, তারই চারপাশে লেলিহান রক্তাভ অগ্নিরাশি। পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন, সমবেত জনসাধারণ অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্নির বিচিত্র মুখগুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, আত্মা ও জীবনের এক দিব্যকল্পনা।

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যজ্ঞাগ্নিরই রূপমূর্তি এই শিব। তিনিই বৃষভবাহিত কাষ্ঠরাশি থেকে সমুদ্যত নীলাভকণ্ঠ শুভ্র অগ্নিশিখা। আর কালী হলেন এই শিবের অন্যতম শক্তি, এই রক্তিম অগ্নি-শিখার অন্যতম শিখা—যার দ্বারা অদগ্ধ সমিধরাশি কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে ভস্মসাৎ হয়। প্রসারিত জিহ্বায় সেই অগ্নিশিখার স্মৃতি।*

* উদ্বোধন, ৭০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৪, পৃঃ ৩৯—৪৩

প্রবন্ধ

সন্ন্যাসিনী যখন বিপ্লবী

শিশির কর

যাঁর সংস্পর্শে পরাধীন ভারতের তরুণদের মনে বিপ্লব-অগ্নি জ্বলে উঠত, বিপ্লবীদের কাছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে যিনি ছিলেন দেশপ্রেমের প্রজ্বলন্ত শিখা, সেই 'শিখাময়ী' মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল বিখ্যাত 'ভগিনী নিবেদিতা' নাম পেয়েছিলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। অরবিন্দের ভাষায় তিনি 'শিখাময়ী'। তাঁকে 'লোকমাতা' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসিনী নিবেদিতা নিজেও অন্য আর এক নাম নিয়ে ছদ্মবেশে ভারত ও বিদেশ সফর করেছেন। সে-নামটি হলো : 'মিসেস থেটা মার্গট'। তাঁর নিজের ভাষায় : "আমি মিসেস থেটা মার্গট নাম নিয়ে ছদ্মপরিচয়ে ভ্রমণ করছি—নতুন নাম স্বাক্ষরে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' [১]

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর আমেরিকার পথে কলম্বো থেকে নিবেদিতা প্রখ্যাত সাংবাদিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফের স্ত্রী কেটিকে এই চিঠিটি লেখেন। এর আগেই তিনি ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। যদিও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন : "১৯০৯ আগস্ট মিসেস মার্গট কলকাতার বাগবাজারে তাঁহার বাড়িতে পৌঁছিয়াই ছদ্মবেশ ও মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। আবার যে কে সেই ভগিনী নিবেদিতা হইলেন, তথাপি তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হইলেন না লুকাইয়া থাকিলেন। তাঁহার বাড়ির গলিতে পুলিশের আনাগোনা চলিতেছিল।"[২] গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে নিবেদিতা 'মিসেস মার্গট' ছদ্মবেশ খুলে ফেলেন।[৩] কিন্তু নিবেদিতার পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তা সঠিক নয়। এখানে উল্লেখ্য, লেখার জন্য নিবেদিতা আর একটি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। তিনি 'Nealus' ছদ্মনামে লন্ডনের কাগজে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে লিখতেন।[৪]

পাঞ্জাবী তরুণ মদনলাল ধিঙ্গড়া যখন লন্ডনে কার্জন উইলিকে হত্যা করেন (১. ৭. ১৯০৯), নিবেদিতা তখন ছদ্মবেশে ইউরোপে। তিনি সে-সময় 'মিসেস মার্গট' নামে পরিচিতা। এই ছদ্মনামে এবং ছদ্মবেশেই তিনি ভারতে আসার জন্য জাহাজে উঠলেন (আগস্ট, ১৯০৯) সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী। কিন্তু মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ ছদ্মনামেই তিনি ১৯১০ অব্দে আমেরিকার কলম্বোয়। তবে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতা কতদিন মিসেস মার্গট ছদ্মবেশে ছিলেন? অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : "১৯০৭ আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা পাশ্চাত্যযাত্রা করেন। সেখানে বছর দুই কাটিয়ে ভারতে ফেরেন। আবার ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিসেস ওলি বুলের সংকট-অসুখের খবর পেয়ে আমেরিকাযাত্রা করেন। সেখান থেকে ভারতে ফিরে আসেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে। এই সকল যাতায়াতের সময়ে তিনি ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন এবং একবার অন্ততঃ জেনেছি—ছদ্মনামও নেন।"[৫]

তখন দেশে-বিদেশে থাকার সময় নিবেদিতা তাঁর সযত্ন প্রয়াসে এর ছদ্মবেশকে এত নিখুঁত করতে পেরেছিলেন যে, ধুরন্ধর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে তিনি সহজেই ধুলো দেন। তাই টেগার্ট প্রমুখ ঝানু গোয়েন্দাদের রিপোর্টে কোথাও তাঁর ছদ্মবেশ ধারণের উল্লেখ নেই। তাঁর ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশের অনেক চমকপ্রদ তথ্য ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে।

৩০ আগস্ট ১৯০৭ পাশ্চাত্যে যাত্রাকালে জাহাজ থেকে (জাহাজ তখন পোর্ট সৈয়দ ও সিসিলীর মাঝামাঝি রয়েছে) ছদ্মবেশের পরিকল্পনা বিষয়ে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখছেন : "তোমার প্রতিভাময়ী কোন পরিচারিকা আছে নাকি? 'ভেল দিয়ে ভিন্ন ধরনের 'হেড ড্রেস' করতে চাই। একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেছে —কিন্তু তা কার্যকর করতে বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রয়োজন।"[৬]

১১ মে ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : "তোমার পরিচ্ছদগুলি একেবারে ঈশ্বরপ্রেরিত যেন।..."[৭]

৪ জুন ১৯০৯ লিখলেন : "আমার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ—তোমার পোশাকের কারণে।"[৮]

কলকাতায় ফেরার পর নিবেদিতা কিছুদিন বাড়ি থেকে বেরোননি। ২২ জুলাই ১৯০৯ ম্যাকলাউডকে লিখলেন যে তাঁর দেওয়া পোশাক তিনি পড়ছেন "ছদ্ম থাকার প্রয়োজনে"।[৯] সিস্টার দেবমাতাকে তখন অনেকে নিবেদিতা বলে ভুল করত। ঐ একই তারিখে মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন :

১ দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড, ১৩৯৫, পৃঃ ৩৩
২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ, ১৯৩০, পৃঃ ১৫১-১৫২ ৩ ঐ, পৃঃ ১৫১ ৪ ঐ, পৃঃ ১৩২-১৩৩
৫ নিবেদিতা লোকমাতা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০ ৬ ঐ, পৃঃ ৩০ ৭ ঐ, পৃঃ ৩১ ৮ ঐ, পৃঃ ৩১ ৯ ঐ, পৃঃ ৩২

"সিস্টার দেবমাতা এখন এখানে আছেন, খুবই মনোহারিণী, আমার মতোই পোশাক পরেন।··· তোমার চিঠিতে যেন আমার নামোচ্চারণ করো না। আমি আড়ালে আছি, রাস্তায় বেরুতে চাইছি না। দেবমাতাকেই সকলে আমি বলে ধরে নেয়।"[১০] পরবর্তী সময়ে আমেরিকা যাত্রাকালে তিনি পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণ করেন। ঐ সময় জাহাজ থেকে মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা একটি চিঠির কথা এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে। একই তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছিলেন ঃ "···এখান (কলম্বো) থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ে যদি তুমি আমাকে চিঠি লেখ বা তার কর, তাহলে—মিসেস মার্গট এই নামে করবে। আমি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছি।"[১১]

ভারতের বিপ্লব আন্দোলন এবং মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ ধারণের কৌশল জানতেন বলেই। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য চিঠি লেখার ব্যাপারেও তিনি কত সতর্কতা কত কৌশল অবলম্বন করতেন ভাবলে বিস্ময় লাগে। সরাসরি চিঠি না পাঠিয়ে তিনি ব্যাংক বা অন্য এজেন্ট মারফৎ চিঠি পাঠাতেন। ভিন্ন নামে, ভিন্ন ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে 'কোড' ব্যবহার করেছেন। আবার তাও মাঝে মাঝে বদলেছেন। ভাষাও অস্পষ্ট করেছেন। এমনি সতর্কতায় ভরা একটি চিঠি, যেটি তিনি ২৬ জুন ১৯০৯ উইসবাদেন থেকে মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লেখেন ঃ

"[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে] বৃহস্পতিবার রাত্রে মার্সেই যাত্রার আশা রাখি। সকাল দশটায় ছাড়বে—এস. এস. ইজিপ্ট। সেখানে কিংবা যাত্রা-পথে, সকল চিঠি 'হিমসেলফ'-এর [অর্থাৎ ডঃ বসুর] ঠিকানায় পাঠাবে।

"একটা ব্যাপারে চিন্তা আমাদের মন অধিকার করে আছে, সে-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করে নেওয়া ভাল, যাতে কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিপত্র বেশি স্পষ্ট করার দরকার হবে না।"[১২]

এই ছদ্মবেশ, এই সতর্কতা ছাড়া নিবেদিতার গ্রেপ্তার না হবার আর একটা কারণ ব্রিটিশ উচ্চমহলে তাঁর যোগাযোগ। ইংরেজ রাজ-পরিবারের পরিধি-ভুক্ত লেডি ম্যান্ডউইচকেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক সংবাদবাহক করে তোলেন।

গ্রেপ্তার এড়ানো যখন অসম্ভব মনে হয় তখন তিনি ফরাসী চন্দননগরে চলে যাবার কথাও ভাবেন। বহু চিঠিতে সে-তথ্য আছে। যেমন, মিস ম্যাক-লাউডকে লেখা (১৮. ১২. ১৯১০), র‍্যাটক্লিফকে লেখা (১২. ১. ১৯১১) একাধিক চিঠি।

নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লব-আন্দোলনের সংশ্রব ছিল না বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু নিবেদিতার লেখা নিচের চিঠিটি পড়লে সে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারবে। র‍্যাটক্লিফকে লেখা ঐ চিঠিতে (২০. ১. ১৯১০) তিনি লিখেছেন ঃ "আমার কাছে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, যে-নিপীড়ন এখানে চলেছে, সং সমালোচনার প্রতিটি শব্দকে যেভাবে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা আপাততঃ যাই মনে হোক না কেন, বস্তুতঃপক্ষে মধ্যপন্থার ওপরই প্রচন্ড আঘাত। কতকগুলি ক্রীতদাসের ঘ্যানঘেনে কাঁদুনি কেবল শোনা যাচ্ছে, অপর পক্ষে যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ বাধ্য হয়ে নিশ্চুপ। এক্ষেত্রে একমাত্র যে আন্দোলনের বৃদ্ধির পথ খোলা আছে তা হলো—সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লব-বাদের পক্ষে গোপন প্রচার।"[১৩] ভারতের সেই বিশেষ অবস্থায় নিবেদিতার ধারণায় সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের পক্ষে গোপন প্রচারের পথই কেবল খোলা ছিল। তবে তিনি তাকেই একমাত্র পথ মনে করতেন না, তাও সত্য। তিনি ছিলেন সর্বাত্মক জাগরণের হোত্রী। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ. ডবলিউ. নেভিনসনও অগ্নিময়ী নিবেদিতার ছবিই এঁকেছেন ঃ

"নিবেদিতার সামগ্রিক জীবনময় ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রায়শঃ অগ্নির কথা স্মরণ করিয়ে দিত; অগ্নির মতোই ···তিনি একইসঙ্গে ধ্বংসকারী ও সৃষ্টিকারী, ভয়ঙ্কর ও কল্যাণকৃৎ···। শত্রুর সম্মুখীন হলে তাঁর চোখ হয়ে উঠত জ্বলন্ত ইস্পাত, রুষ্ট হলে তাতে গাঢ় রঙ ধরত, যেমন হতো গ্যারিবল্ডির। ···পৃথিবীর সংগ্রাম-ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তাঁর তুল্য কোন সত্তার দর্শন সহজে মিলবে না—আর আমি তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক-রূপেই দেখেছি—হাতে-ধরা জ্বলন্ত তলোয়ার।"[১৪]

বাস্তবিকই নিবেদিতা ছিলেন অগ্নি—অগ্নিই!

১০ নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৩২ ১১ ঐ, পৃঃ ৩৩ ১২ ঐ, পৃঃ ২২ ১৩ ঐ, পৃঃ ৩৭
১৪ উদ্ধৃত (অনুবাদ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু) ঃ ঐ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৪, পৃঃ ৪১

স্মৃতিকথা

স্মৃতির আলোয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সংযুক্তা মিত্র

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, প্রথম কবে মা-বাবার মুখদর্শন করেছিলেন, মনে পড়ে কি ? উত্তর দেওয়া যায় না, কেননা তার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। চৈতন্যের প্রথম বিকাশের লগ্ন থেকে এই পরিচয় ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা তাঁদের সঙ্গে।

পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিও আমার কাছে অনুরূপ অভিজ্ঞতা। যতদূর পেছনে তাকাই পশ্চাতের স্মৃতিপট জুড়ে পুণ্যধাম বেলুড় মঠের স্মৃতি। আর সেই সঙ্গে যেসব পুণ্যশ্লোক সাধু ও মহাপুরুষের অক্ষয় স্মৃতি জীবনের তটরেখায় অম্লান পদচিহ্ন রেখে গেছে, এই সুমধুর স্মৃতি তাদের অন্যতম প্রধান, হয়তো-বা প্রধানতম।

আমার শৈশব কেটেছে অরণ্যপর্বতময় উড়িষ্যার এক দেশীয় রাজ্যে। কলকাতায় প্রথম যখন আমরা বরাবরের মতো চলে আসি তখন আমার বয়স সাত কি আট। তারপর থেকে মায়ের হাত ধরে মঠে যাতায়াত। তারপর থেকে কল্লোলিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে, আকাশ-ভরা রৌদ্রছায়ার নিচে কতদিন কতভাবে বেলুড় মঠের অজস্র ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রসিদ্ধ আমগাছতলার উঠোনে পুরনো ঠাকুর-ঘরের সিঁড়ির ধারে ম্যারাপ বেঁধে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। দেখেছি কয়েক বছর ধরে মঠের শ্রীমন্দির গড়ে উঠতে, যা এখন সমগ্র ভারতের অনবদ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। যে পরম ভক্তিমতী মার্কিন মহিলাদ্বয়ের দানকে মূলতঃ অবলম্বন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপলাভ করে সেই হিন্দুনামে পরিচিতা ভক্তি ও অন্নপূর্ণাকেও দেখেছি। একবার মিস ম্যাকলাউডকেও দেখেছি। হাস্যময়ী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারত-অন্তঃপ্রাণ বিদেশিনী। গরিব ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি, মার্বেলগুলি বিতরণ করছেন। সেই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও দুর্লভ সেই সব দর্শন শিশুমনে নিশ্চয় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। না হলে আজো জীবনের সায়াহ্নবেলায় কেন সেসব মনে আসে, আশ্চর্য প্রত্যক্ষতা নিয়ে ? যেসব পদস্পর্শ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমাব হয়েছিল, আজো যেন সেই সব স্পর্শ চোখ বুজলে অন্তরের অন্তস্তলে তেমনি সজীব ও স্পষ্ট অনুভব করি। কিন্তু যখন এগুলি ঘটেছে তখন তাদের স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হয়েছে। তার গুরুত্ব বুঝিনি। কারণ সেই বিচারের ও দৃষ্টি-ভঙ্গি অর্জনের বয়সই সেটা ছিল না। এ যেন ছিল আমার নিতান্ত স্বাভাবিক অর্জিত অধিকার।

জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত জীবনেতিহাসের প্রতিটি বিশদ তথ্য যেমন বলা সম্ভব নয়, অথচ সবটা মিলিয়ে একটা অখণ্ড অনুভূতি চেতনায় জড়িয়ে থাকে, তেমনি বেলুড় মঠের সঙ্গে আবাল্যসংযোগ একটা সামগ্রিক বোধের মতো জীবনে জড়িয়ে গেছে। সালতামামি হিসাবে তাকে স্বাতন্ত্র্যদান করা মুশকিল। তবু কয়েকটি স্মৃতি যেন তাদের মধ্যে আরও একটু ভাস্বর।

বাল্যের স্মৃতিপটে ধ্রুবতারকার মতো উজ্জ্বল যে পুণ্যস্মৃতি জাগরূক সেটি গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দ্বারা বর্তমান মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা। মঠে যখন মা-বাবার সঙ্গে পৌঁছেছিলাম তখন শেষরাত। পুরনো মন্দিরবাড়ির আমগাছের নিচে বাঁধানো উঠোন ও এই পাশের সবুজ মাঠের মাঝের বর্তমান ফুলগাছের বেড়ার ব্যবধান সেদিন ছিল না। প্রাচীন ঠাকুরঘরের দিক থেকে আরম্ভ করে মাঠ ঘুরে নতুন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত লাল শালু কাপড়ে বিছানো ছিল। একপাশে অপেক্ষমান আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তবৃন্দ। অখণ্ড প্রশান্ত স্তব্ধতা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ। তারই মধ্যে মার পাশে একইভাবে দাঁড়িয়ে আমি ও আমার ছোট ভাই। দুজনেরই শৈশবাবস্থা। কিন্তু সেদিন সূর্যের উদয়লগ্নে গঙ্গার পবিত্র জলধারার পাশে হিমেল হাওয়ায় হৃদয়ে পূর্ণতা ও আনন্দের স্পর্শ আমাদের কি কিছু কম ছিল ? কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট পথ ধরে একটি মোটর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। ভিতরে প্রশান্ত গম্ভীর মুখে

উপবিষ্ট পূজ্যপাদ গুরুদেব। কোলের ওপর সযত্নে ধরা কাপড়ে ঢাকা কৌটো, যাকে তাঁরা 'আত্মারামের কৌটো' বলতেন। ভিতরে এযুগের নরদেবতার মর্ত্যছায়ার অবশেষ। গাড়ির পিছনে বহু সাধু-মহারাজরা নামগান কীর্তনে মুখর। বাজছে পাখোয়াজ, করতাল, মৃদঙ্গ। শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। গাড়ির অগ্রভাগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে একজন সাধু যাচ্ছিলেন। সকলের দৃষ্টি তখন ছিল ভিতরে উপবিষ্ট আত্মস্থ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের ও তাঁর পুণ্যহস্তধৃত দুর্লভদর্শন কৌটোটির প্রতি। গাড়ি ঘুরে মন্দিরের সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াতে এদিকের ভিড় কিছু ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীমন্দিরে মূর্তি-প্রতিষ্ঠার পর সকলের সঙ্গে গিয়ে প্রণাম করেছিলাম। এদিকে মাঠে বিশেষভাবে নির্মিত যজ্ঞমণ্ডপে দর্শন করেছিলাম বিধিমত বৈদিক যজ্ঞ উদ্‌যাপন।

এর পরের যে স্মৃতি তা হলো আমাদের মাসিমার বেলেঘাটায় তৎকালীন বসতবাটীতে বিজ্ঞানানন্দজীর শুভ পদার্পণ। আমার মেসোমশাই নেপালচন্দ্র দে প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। সাধু-সজ্জন-সেবায় আত্মীয়পরিজনপোষণে এবং আশ্রিতজনবাৎসল্যে তাঁর বিশেষ প্রীতি প্রকাশ পেত। তাই ওঁদের বাড়ির সব উৎসব-অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সার্বজনীন ঘটনা হয়ে দাঁড়াত। মা ও মাসিমা একই সময় দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই একসঙ্গে বেলুড় মঠে যাতায়াত করতেন। মাসিমা সুধাময়ী দে একবার স্বগৃহে পদার্পণের জন্য গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করলেন। আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা, গুরুদেবও কৃপা করে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য এই একটি বাড়ির আনন্দ-উৎসব ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রইল না। অন্যান্য আত্মীয়রাও এই অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগ দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করলেন। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে আমরা সকলে যোগ দিয়েছিলাম। এর বিশদ বিবরণ আমার মা প্রীতিময়ী কর উদ্বোধনে লিখেছিলেন।

মনে আছে, দীর্ঘদেহী বালষ্ঠকায় বিজ্ঞানানন্দজী অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ শুভাগমন করেছিলেন। সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিরজানন্দজীও। মনে আছে সেই মহাপুরুষের গৃহে প্রবেশের পর ধীরপদে ওপরে উঠে যাওয়া, দোতলায় বিশেষভাবে সজ্জিত কক্ষে আরামকেদারায় উপবেশন, গুরুজনদের নির্দেশে আমাদের বালক-বালিকাদলের তাঁর পদতলে বসা। স্মৃতিপটে চিত্রকলার মতো স্পষ্ট ছবির পর ছবি সাজানো। ঐদিন ঐ কক্ষেই আমার মাসতুতো ভাই (পরবর্তী কালে ইস্পাত-নগরী রাউরকেল্লার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ভূতাত্ত্বিক) সত্যেন্দ্রকুমার দে ও আমাকে গুরুদেব কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক প্রথাসিদ্ধভাবে নয়, কিন্তু সেই কাছে দুজনকে দাঁড় করিয়ে করুণার দৃষ্টিপাতে আলাদা আলাদাভাবে মাথায় হাত দিয়ে অভয়হস্তে আশীর্বাদ, নাম এবং কিছু নির্দেশ দান চিরজীবনের মতো আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে।

এর পরেও মায়ের সঙ্গে মঠে গিয়েছি। মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর খুব অল্পদিনই তিনি স্থূল দেহে ছিলেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষের পাশের ঘরে একটি চেয়ারে সমাসীন তাঁর সেই প্রসন্ন গম্ভীর মূর্তিটি এখনো মনে পড়ে। ভূমিলগ্ন হয়ে প্রণাম জানিয়েছি। হাত বাড়ালে সেই পদস্পর্শ যেন এখনো অনুভব করি। কথাবার্তা যা হয়েছে সব গুরুজনদের সঙ্গে। অত্যন্ত মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির পুরুষ। আমিও তখন বালিকা।

আমাদের ছোটবেলায় গুরুদেব সম্পর্কিত স্মৃতিচিত্রণ বা তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা বিশেষ পাওয়া যেত না। পরে শুনেছি তিনি ছিলেন আত্মস্থ কঠোর সংযমী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। কঠোর কৃচ্ছ্রতা বরণ করে এলাহাবাদ আশ্রমে তিনি থাকতেন।

আজ এই জীবনসায়াহ্নে এক এক সময়ে বাল্যের অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা মনে পড়লে ভিতরে এক আশ্চর্য বোধ সঞ্চার হয়। জীবনের আরম্ভেই এক বনস্পতির অভয়ছায়াতলের আশ্রয় পেয়েছিলাম বলেই কি পরবর্তী তাপদগ্ধ জীবনের পথে ক্লান্ত পায়ে কিন্তু অবিচলভাবে হেঁটে আসতে পেরেছি ? সমস্ত প্রতিকূলতার ও ঝঞ্ঝার মধ্যে অন্তরের অন্তস্তলে এই অভয়-হস্তই কি বারবার আমাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে—'ভয় নাই—ওরে ভয় নাই' ?

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

পরিক্রমার পথে এই জায়গাটুকু আমার খুব ভাল লাগে। বৃন্দাবনে যখনই যাওয়ার সুযোগ হয় নিত্যই একবার গোবিন্দজীকে প্রণাম করে এখানে চলে আসি। রাধাবাগ আর টাটিয়া স্থানের মধ্যেকার যমুনা পুলিনের এই অংশ-টুকু। গুরুকুল বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে যমুনার ধারে পরিক্রমার রাস্তা ধরে উত্তরদিকে কিছুদূর গেলেই এই জায়গা। এই পথের ওপরই একটি জায়গাতে আছে আট-দশটি অতি প্রাচীন কেলি-কদম্বের গাছ, প্রায় রাস্তাটাকে ঘিরেই তারা রয়েছে। আশেপাশে কিছু প্রাচীন নিম ও জাম গাছও আছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় তাদের বয়স একশো বছরের বেশি।

প্রায় রোজই এখানে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকি। এসময় যাত্রীর ভিড় নেই। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ। বৃন্দাবনের প্রচণ্ড গরম একটু কমেছে কদিন উপরি উপরি বৃষ্টির ফলে। আজও আকাশ কালো। কেলিকদম্বের গাছে প্রচুর কদম ফুল এসেছে। এ ফুল ঠিক বাংলা-দেশের কদমফুলের মতো আকারে বড় নয়। আর গন্ধও অত উগ্র নয়, কিন্তু হয় প্রচুর। সমস্ত গাছ ভরে উঠেছে ছোট ছোট কদমফুলে—মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরপুর। নানা জাতের পাখিরা এসে ঐ ফুল ঠোকরাচ্ছে। মৌমাছির শব্দ ও পাখির ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কালিন্দীর কালো জল এখনো কালো। বর্ষার ছোঁয়ায় এখনো তার রূপ পাল্টায়নি। দূরের গ্রাম থেকে গরুর পাল যমুনা পার হয়ে চলে আসছে—পেছনে তাদের কালো চুলে সাদা কাপড়ের ফেট্টি—কোমরে শুধু মাত্র কৌপীন, হাতে লাঠি আর রুপোর বালা। স্বচ্ছন্দচারী কয়েকটা ময়ূর দুটো ময়ূরীর পাশে পাশে ঘুরছে পেখম তুলে, পাখায় পাখায় বিরাট সৌন্দর্য মেলে ধরে। অদ্ভুত পরিবেশ! খুব ভাল লাগছিল। মনের অতলে ডুব দিয়ে ভাবছিলাম—সবই তো ঠিক সেই যুগের মতো, শুধু যদি সেই কালো রাখাল ছেলেটি থাকত—মাথায় ময়ূরের পাখা, আর হাতে লাঠির বদলে যদি বাঁশি থাকত! ভাবনার ছেদ পড়ল একটা দূরাগত উদার কণ্ঠের গীতধ্বনিতে। সুরটি জানা কিন্তু শব্দটি বুঝতে পারছিলাম না। ক্রমশঃ কাছে আসায় বুঝলাম কেউ একজন গাইতে গাইতে এই পথেই আসছেন—

"ও নীল যমুনার জল,
বলরে আমায় বল,
কোথায় মোর ঘনশ্যাম।
কোথায় গেলে পাব তারে
আমার কৃষ্ণ সে শ্যামল...।

গলাটা চেনা মনে হলো। স্মৃতির জগতে শুরু হলো তোলপাড়—কার গলা, কে এ গায়ক? ইতিমধ্যে গায়কও সামনেই এসে গিয়েছেন। ক্ষীণকায়—দীর্ঘ শরীর—শ্যামলা রং-এর এক যুবক, এক মাথা রুক্ষ চুল, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখে শিশুর সরলতা—চোখে উদাস দৃষ্টি। হাত দুটি ওপর দিকে তুলে নবীন এই বাবাজী প্রাণ খুলে গাইতে গাইতে আস-ছিলেন। আমি গাছের আড়ালে বসেছিলাম বলে সম্ভবতঃ আমায় এতক্ষণ দেখেননি। এবারে একেবারে সোজাসুজি সামনে এসে পড়ায় আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। গান থেমে গেল—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাবাজী। হাঁটু পর্যন্ত সাদা কাপড়, গলায় একটা চাদর ঝোলানো তার ফাঁক দিয়ে শুধু পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। তুলসীর মালা তিলক কিছুই নেই।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি, কিন্তু শ্রীমানের আমায় চিনতে একটু সময় লাগলো। যখন আমায় দেখেছে আগে, তখন আমারও মাথায় মুখে ছিল চুল দাড়ির জঙ্গল। এখন সব কামানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ—তাই বোধহয় একটু বিস্ময় স্তম্ভিত ভাব। সেই আমি আর এই আমি একই লোক কি না ? আমার মুখের চাপা হাসি তার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের আবরণ সরিয়ে দিল। লাফিয়ে এসে উত্তরাখণ্ডী কায়দায় সে আমার হাঁটুদুটো স্পর্শ করে বললেঃ "আরে দাদা, আপনি এখানে—কবে নামলেন উত্তরকাশী থেকে—কোথায় আছেন, কেমন আছেন ?" আমি তার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, "ভাই, তোর এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক সময় লাগবে ; তার আগে তুই বল, সেই যে উত্তরকাশীর নচিকেতা তালের পথে শেষ দেখা—তার পরে আর কোন খবরই দিলি না ?" দুষ্টু হাসি হেসে শ্রীমান বলল ঃ "খবর আবার কিসের ? 'কায়া প্রাণৈঃ ন সম্বন্ধঃ', তা সাধুর সঙ্গে সাধুর সম্বন্ধ" বলেই আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে আবার বললেঃ "রাগ করবেন না স্বামীজী—এটা আপনার কাছেই শোনা বেদান্তের কথা, একেবারে গুরুমারা বিদ্যে।" ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলামঃ "খুব হয়েছে, খবর দিবি না তা জানতাম, তবে এদিকে কদিন ? তুই তো বলেছিলি 'মহাবন পর্যন্ত ঘুরেছি, কিন্তু বৃন্দাবন যাইনি—কেন যেন ইচ্ছে হয়নি'।" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলল ঃ "হাঁ, আর তার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন, সেই কথাই আমাকে টেনে এনেছে এই বৃন্দাবনে। আপনি বলেছিলেন, 'প্রেম নগরী ব্রজভূমি হ্যায়, যাঁহা ন যাওয়ে কোই, যাওয়ে তো জীয়ে নহি, জীয়ে তো বাওরা হোই।' (বৃন্দাবন প্রেমের লীলাক্ষেত্র—সেখানে কারও যাওয়া উচিৎ নয়, কারণ যদি কেউ যায়—সে আর বেঁচে ফিরবে না, প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দেবে সে। আর যদি বেঁচে যায় তবে সে পাগল হয়ে যাবে। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হবে।) তাই তো দেখতে এসেছি কেমন সে বৃন্দাবন। এবারে উঠেছি রমনরেতিতে রাধাটিলার কাছে। এই পরিক্রমার পথেই। তা হলো বৈ কি বছরখানেক। মাধুকরী করি আর নিত্য পরিক্রমা করি। খারাপ লাগছে না। কিন্তু এখনও মরিনি, আর পাগল হয়েছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না। তবে এই ক্ষেত্র যে অন্য তীর্থ থেকে কিছুটা আলাদা তা একটু একটু বুঝতে পারছি।" আমি বললামঃ "ঠিক ধরেছ ভাই। এখানকার আকাশ বাতাস, নদীর জল—গাছপালা-ফুল-পশু-পাখি, নদীর চর, পরিক্রমার পথের ধূলি সব অদ্ভুত সুন্দর! তারা যেন কিছু বলতে চায়। একটু কান পেতে থাকলে—একটু মন দিয়ে ভাবলে—একটু প্রাণকে এদিকে ঘোরাতে পারলে সেই অশ্রুত ধ্বনি শোনা যায়। আর তার ঝঙ্কার সত্যিই মানুষকে পাগল করে দেয়, 'বাওরা' হয়ে যায় সে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমিও সে আনন্দ এই এক বছরে কিঞ্চিৎ পেয়েছ, নইলে কেন পড়ে আছো এখানে ? সত্যি কিনা বল !" তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—সে সামনের যমুনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তার চোখের কোণে জল। হঠাৎ চাপাস্বরে গেয়ে উঠল ঃ

"হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
সর্বনাশা বাঁশি বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে ভুলি লোকলাজে,
পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥

প্রমত্ত উজান মন-যমুনায়
লুকাইয়া বাঁশি ডাকে 'সখি আয়'।।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-ক্ষুধাতুর,
সে কানু কেন গো দূর এতদূর॥"

—স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ তাঁর। আকাশ থেকে বড় বড় জলের ফোটা পড়তে লেগেছে। তার চোখেও তখন জলের বন্যা। আমার দুটো হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে অমিতানন্দ ধরা গলায় বললঃ "চলুন দাদা, আজ আর এ পথে যাওয়া হলো না। সব মাটি করে দিলেন আপনি। কেন এমন সুড়সুড়ি দিলেন। বৃষ্টি এসে গেল। কাছাকাছি

কোথাও আশ্রয় নেওয়ার দরকার।" উঠে দাঁড়ালাম। সে প্রায় আমার হাত ধরে টেনেই নিয়ে চলতে লাগল। আমার কানে তখনও লেগে আছে সেই গানের সুর। মন সুরের আবেশে আচ্ছন্ন —"সে কানু কেন গো দূর এতদূর!"

আমরা গিয়ে উঠলাম টাটিয়া স্থানে। যমুনার ধারে যতগুলি আশ্রম আছে এদিকে, তার মধ্যে এইটিই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। কত পুরনো গাছ ও লতার কুঞ্জে কুঞ্জে ঘেরা আশ্রমটি। ভেতরে ও উঠানে বালি সুন্দর করে রাখা হয়েছে, কোথাও বাঁধানো চত্বর নেই। আশ্রমটির বাসিন্দারা অত্যন্ত কঠোরী মহাত্মা। সকলেই ব্রহ্মচারী, সামান্য বহির্বাস পরনে—সারা মুখে এক ধরনের মাটি মাখা বৈরাগী সাধু। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু হরিদাস স্বামীর ত্যাগী শিষ্য-সম্প্রদায়ের মূল আস্তানা এইটি। এখানে হরিদাস স্বামীর ব্যবহৃত একটি অতি জীর্ণ কাঁথা, তাঁর করঙ্গ (ভিক্ষাপাত্র) ও সাপের মতো বাঁকানো একটি গাছের ডালের লাঠি এখনও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর রাধাষ্টমীর দিন সেগুলি সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বাইরে রাখা হয়। ঐ দিন এই আশ্রমে বিরাট উৎসব হয়। উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেদিন কচুর তরকারি, কচুসেদ্ধর ভোগ হয়। অবশ্য তার সঙ্গে আরও নানা জিনিস থাকে। কিন্তু কচুই প্রাধান্য পায় তাতে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! মহাবৈরাগী হরিদাস স্বামী এই সব বন্য খাদ্য খেয়ে শরীর ধারণ করতেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই ব্যবস্থা। তিনি ছিলেন সখীভাবের সাধক। নিজেকে শ্রীমতী রাধারানীর সখী ললিতাদেবী জ্ঞানে সাধন করতেন। এই আশ্রমের মূল বিগ্রহ বিহারীজী। শহরের মধ্যেকার আসল বিহারীজী বা বাঁকেবিহারীজীর বিগ্রহেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। এখানকার সেবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। এখানকার মোহান্ত মহারাজও বসেন বালীর বেদীতে খড়ের ছাউনী দেওয়া চালাঘরে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দখল। আমরা ঠাকুর প্রণাম করে তাঁর কাছে যেতেই তিনি কাছে একটা চট পেতে দিয়ে বসতে বললেন। পাশে বসে একজন ব্রহ্মচারী সেবক হাওয়া করছিলেন, তাকে একটু প্রসাদ এনে দিতে বললেন। প্রসাদ ধারণ করে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম—এই আশ্রম কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ? তার উত্তরে তিনি শোনালেন এক দীর্ঘ কাহিনীঃ

"এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কাহিনীর পেছনে আরও একটি কাহিনী আছে—সে এক অলৌকিক সাধকের সাধনকথা। তাঁর নাম প্রায় অনেকেই জানেন। তানসেনের সঙ্গীতগুরু হরিদাস স্বামী। কিন্তু সেইটাই তাঁর আসল পরিচয় নয়। তাঁর জীবন অদ্ভুত। এই বৃন্দাবনে তিনি বিহারিনজী বলে পরিচিত। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে নানামত প্রচলিত ১৪৭৮ অথবা ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে আলিগড়ের কাছে রাজপুর গ্রামে পাঞ্জাব থেকে আগত এক সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবার নাম আসধীর, ভক্তমাল-গ্রন্থে আছেঃ "আসধীরেতি নাম্নাসীদ্ বিপ্রো গুর্জর-সম্ভবঃ। তস্য পুত্রেতি বিখ্যাতো হরিদাস ইতি স্মৃতর।"

"আসধীরও বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবন চলে আসেন। পুত্র হরিদাস অল্পবয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু সংসারের দিকে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীবিয়োগ হয়—তার পরেই তিনিও সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন ও পিতার কাছেই দীক্ষা নিয়ে সেসময়ের পরম বাঞ্ছিত নিত্যরাসস্থলী নিধুবনে থেকে সাধনভজনে ডুবে যান। তাঁর সাধনের উপায় হিসাবে তিনি নিজেকে শ্রীমতী রাধারানীর সখী শ্রীমতী ললিতা বলে ভাবতেন এবং সেই ভাব আরোপ করে ভজন করতেন। সেই সময়ের তিনি একজন খুব উঁচু দরের সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তবে তাঁর ভজন সবই ভক্তিসাধনার অঙ্গ ছিল। আকবরের সভাগায়ক বিখ্যাত তানসেনজীও তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁর সাধনপন্থীদের নাম সখী সম্প্রদায়।"

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

দূরভাষের উৎপত্তি ও প্রসার

মণীন্দ্রলাল রায়

'দূরভাষ' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে তার আত্ম-পরিচয়। মানুষ একা থাকতে ভালবাসে না, অন্য মানুষ—সে আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক, বন্ধু হোক কিংবা শত্রু হোক, তার সঙ্গে কথা বলতে সে চায় বা অন্যভাবে যোগাযোগ রাখতে চায়। কাছের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তো শক্ত কিছু নয়, কিন্তু দূরের মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ বা অন্যভাবে যোগা-যোগ করাও তো চাই। সেই চাওয়া থেকেই, দূর-ভাষের স্বাভাবিক ইচ্ছা থেকেই, অতীতে কোন কৌশল বের করার প্রয়োজন হয়েছিল।

এই যোগাযোগের প্রথম যুগে সঙ্কেত-সহকারে বাক্যবিনিময় ছিল অল্প দূরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের মন চায় না একটা খেলনা নিয়ে বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকতে। আরও ভাল কিছু করা চাই। ইতিমধ্যে বিদ্যুতের নানা উন্নতি হয়েছে, বৈজ্ঞানিক সমাজে বিদ্যুৎকে কতভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায় তারই অনলস প্রচেষ্টা চলেছে। মর্স (Morse)-এর চেষ্টার ফলে সঙ্কেতগুলিকে বিদ্যুৎ-মাধ্যমে দূরে পাঠানোর কাজ সহজ হয়ে গেল; শুরু হলো, টরেটক্কার যুগ—মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুষ্ঠু কৌশল। এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমেই আমেরিকার গ্রাহাম বেল (Graham Bell) টেলিফোন উদ্ভাবন করলেন। অবশ্য এসব অগ্রগতিই সম্ভব হয়েছিল মাইকেল ফ্যারাডের যুগান্তকারী আবিষ্কার তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ (electro-magnetic induction) থেকে। সুতরাং দূর সঞ্চার বা দূর-ভাষের আজকের এই অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছেন মাইকেল ফ্যারাডে।

যোগাযোগের দুটি মুখ্য অংশ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। প্রথমটি সঙ্কেত-বিনিময়, দ্বিতীয়টি বাক্য-বিনিময়। প্রথম টেলিগ্রাফ দিয়েই শুরু করা যাক।

ভারতবর্ষে মর্স-এর টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার শুরু হয় এক শতাব্দীরও আগে কলকাতা-ডায়মন্ড হারবারের সংযুক্তি দিয়ে। একটি মোটা লোহার তারকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতার অফিস থেকে ডায়মন্ড হারবারের অফিসে, যার সাহায্যে বিদ্যুৎসঙ্কেত এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পাঠানো হলো মর্স-সঙ্কেতের সাহায্যে, ওপ্রান্তে সে সঙ্কেতযন্ত্রের সাহায্যে ধরে তার পাঠোদ্ধার হলো। টেলিগ্রাফ এককভাবে খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। মর্স-এর পদ্ধতিরই নানারকম উন্নতি হতে লাগল। ইতিমধ্যে বাক্য-বিনিময়ের রাস্তা খুলে গেছে গ্রাহাম বেলের আবিষ্কারে। এবার সঙ্কেত কিংবা বাক্য-বিনিময়ের গোড়ার কথাটা অনেকটা জানা গেল। এরপর আর এককভাবে না টেলিগ্রাফ, না টেলিফোন কেউই অগ্রসর হয়নি, সবই হয়েছে যৌথ-ভাবে। বোঝা গেল যে, কথা বললে বায়ুমাধ্যমে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সে-তরঙ্গটা গতিশীল এবং সেই জন্যই সেটা শ্রোতার কানে পেঁৗছে যায়, যদি শ্রোতা কাছেই থাকেন। আরো জানা গেল যে, মানুষের কথার ফলে যে-কম্পন সৃষ্টি হলো তারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। উদ্ভূত কম্পনাঙ্ক (frequency) এই সীমার মধ্যে অবস্থান না করলে আমরা শুনতে পাই না। ২০ থেকে ২০,০০০ কম্প-নাঙ্কের মধ্যেই শ্রুতিসাধ্য শব্দের আনাগোনা। এতটাও দরকার হয় না। তিনহাজার থেকে তিনহাজার চারশোর মধ্যে হলেই চলে। এর ওপরে বা নিচের কম্পনাঙ্ক টেলিগ্রাফের জন্য ব্যবহার করা চলে। এবার আস্তে আস্তে সেই পরিণতির দিকে আসি। বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে পরিণত করলেই মানুষের পক্ষে তা শোনা সম্ভব। তবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বহন করবার জন্য দুটি ভাল তামার পরিবাহীর দরকার। এর এক প্রান্তে টেলিফোনের সাহায্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পাঠানো এবং অন্যপ্রান্তে অপর একটি টেলিফোনের সাহায্যে আবার শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত করে শোনা। আরম্ভ হয়েছিল ম্যাগনেটো টেলিফোন দিয়ে। দুপ্রান্তের টেলিফোন থেকেই কথা বলার প্রয়োজন, সুতরাং দুপ্রান্তেই ব্যাটারী থাকা প্রয়োজন এবং একজন আরেকজনকে ডাকতে গেলে কোন বিশেষ সঙ্কেত পাঠানোও দরকার। ম্যাগনেটো টেলিফোনে এ-প্রয়োজন মেটায় ফ্যারাডে আবিষ্কৃত একটি অমূল্য তথ্য প্রয়োগ করে। দেখা যায় যদি একটি তার জড়ানো বেলনাকৃতি (cylindrical) দণ্ডকে কোন চুম্বকক্ষেত্রে দ্রুতবেগে ঘোরানো যায় তবে সেই

জড়ানো তারের দুই মুখে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়। এই তথ্যটির উপযুক্ত ব্যবহার করেই ম্যাগনেটো পদ্ধতিতে পরস্পরকে ডাকার বিশেষ সঙ্কেত পাঠানো হয়। এর ব্যবহার আজও আছে। তবে এভাবে আধুনিক টেলিফোন চলে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাটারীর ব্যবহার শুরু হলো এক্সচেঞ্জ-এ যথেষ্ট শক্তিশালী অ্যাসিড-ব্যাটারী রাখা হয়, যার দ্বারা কথা বলা এবং সংযোগ-কেন্দ্রে সংবাদ পাঠানো দুই কাজই চলে। অবশ্য এক্সচেঞ্জ দুই ব্যক্তির সংযোগ ঘটানোর জন্য একটি যান্ত্রিক রিঙ্গার (ringer) ব্যবহার করে এই কাজটি করে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাটারী-পদ্ধতিতে এখনো আমাদের দেশে বহু এক্সচেঞ্জ কাজ করে। হস্তকৃত (Manual) পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো জরুরী প্রয়োজনের সময় অপারেটারের উত্তর পেতে দেরি হওয়া। এই অসুবিধা দূর করার জন্য জন্ম হয় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন পদ্ধতির। আজ ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরেই স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন চালু আছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যত ভাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই ব্যবহার করি না কেন, মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন কিন্তু কখনো ফুরোবে না। যেমন, দুবার-তিনবার কোন নম্বর নিজে ডায়াল করে না পেলে '১৯৯'-এর সাহায্য নিতে হয়।

স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন পদ্ধতি ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম শুরু হয়েছিল স্ট্রাউজার (Strowger) পদ্ধতি দিয়ে, এখন এসে পেঁছেছি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। স্ট্রাউজার পদ্ধতিতে কাজ হয় তড়িতের প্রভাবে যন্ত্রের নড়াচড়ায়। এতে দরকার বিভিন্ন সুইচ-এর। টেলিকমিউনিকেশন (Telecommunication)-এর ভাষায় এদের বলা হয় সিলেক্টর সুইচ (Selector Switch)। এর গতি দুধরনের—প্রথম লম্বালম্বি (vertical) এবং পরে সমভূমিক (horizontal) এবং প্রতিটি টেলিফোনের সংযুক্তি আছে এই সিলেক্টর-এর সঙ্গে। এক্সচেঞ্জ-এর ক্ষমতা হিসাবে এরকম সিলেক্টর-এর সংখ্যা একাধিক। গ্রাহক যখন ডায়াল ঘোরান তখন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সিলেক্টরটিও চলতে থাকে এবং ডায়াল করা শেষ হলে এই সুইচ পরের পর আপনার নির্দেশমতো কাজ করে আপনাকে নির্দিষ্ট নম্বরে লাগিয়ে দেয়, তাকে রিং (ring) করে এবং আপনাকে একটি সঙ্কেত দিয়ে তা জানিয়ে দেয়। এ সবটাই স্বয়ংক্রিয়। আগেই বলা হয়েছে এ-পদ্ধতির সকল কার্যকারিতা অনেকটাই যান্ত্রিক কুশলতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং চেষ্টা হলো যন্ত্রের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা ক্রসবার (Crossbar) পদ্ধতির টেলিফোন-কেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করলাম। এতে যন্ত্রের নড়াচড়া অনেকটাই কম, ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম। আমাদের দেশে বর্তমানে ক্রসবার এক্সচেঞ্জ অনেক জায়গায়ই আছে এবং নতুন হচ্ছে।

আরও একটা সমস্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। সেটা স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা। শহরাঞ্চলে বেশি জায়গা পাওয়া অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, তাই কম জায়গা নিয়ে যদি এর চেয়েও কম যন্ত্রনির্ভর কোন উপায় বের করা যায়, তারই চেষ্টা চলল বেশ কিছুদিন। এর মধ্যে চালু হলো কম্পিউটার (Computer) যা অন্যান্য বিজ্ঞানক্ষেত্রের মতোই টেলিকমিউনিকেশন-ক্ষেত্রেও যুগান্তর এনে দিল। কম্পিউটার-এর সাহায্য নিয়ে তৈরি হলো ইলেকট্রনিক টেলিফোন-প্রণালী যাতে চলমান যন্ত্র কিছুই নেই—আমাদের সঙ্কেত বিদ্যুৎ মারফৎ সঞ্চালিত হবে অত্যন্ত দ্রুত এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চাওয়া টেলিফোন-এর সংযোগ করতে। দরকার পড়লে সঙ্কেতগুলি কম্পিউটার তার স্মৃতিতে (memory) রেখে দেবে। এতে শুধু যে সংযোগ (call) পেতে অত্যন্ত কম সময় লাগবে তাই নয়, ভুল হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কমে যাবে। তাছাড়া এধরনের একটা এক্সচেঞ্জের জন্য জায়গা অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগবে। তাই আজ শুধু বড় বড় শহরেই নয়, এদেশের দূর প্রান্তেও যোগাযোগের কাজে ইলেকট্রনিক সুইচিং প্রথার প্রয়োগ ক্রমশঃই বাড়ছে। তবে আমাদের দেশে এরকম এক্সচেঞ্জ যত দরকার ততটা তাড়াতাড়ি বানানো এখনও সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণা-মাধ্যমে ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জকে আরও যাতে ভাল করা যায় তার চেষ্টা অবিরত চলেছে।

এতক্ষণ স্থানীয় যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা হলো। এবার প্রকৃত দূরভাষের কথায় আসি। কলকাতা থেকে বোম্বাই বা দিল্লীতে কথা বলতে বা তারবার্তা পাঠাতে কতটা অগ্রসর হয়েছি সেটা দেখা

দরকার। দুটি তারের দিন ফুরিয়েছে, কারণ শুধু তার ব্যবহারে কথা বা তারবার্তা বেশি দূরে পাঠানো যায় না। একে মাঝে মাঝে শক্তির যোগান দিয়ে সবল রাখা দরকার। শুধু তারকে সবল করে বেশি দূরে সংবাদ পাঠাম চলে না। তাছাড়া এতে খরচও খুব বেশি। তাই দরকার হলো এমন কোন পদ্ধতির উদ্ভাবন যাতে দুটি তারে এমনভাবে দূরভাষ চালানো যায় যে, একই সময়ে একাধিক লোক, বাক্য বিনিময় করতে পারে অথচ একে অপরকে শুনতে না পায়। মানুষের কথার মাধ্যমে যে কম্পন বা তরঙ্গের সৃষ্টি করে তার কম্পনাঙ্ক সীমাবদ্ধ—মাত্র তিন-হাজার থেকে তিনহাজার চারশোর মধ্যে রাখলেই চলে। এর খুব কম বা বেশি হলে আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু বার্তা দূরে প্রেরণের জন্য এর চেয়ে বহু বেশি কম্পনাঙ্ক সৃষ্টি করা দরকার এবং এই উচ্চ কম্পনের একটি বিশেষ গুণ—এর চলন অতি দ্রুত। মাঝপথে এর হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষীণ হবার সম্ভাবনা কম। তাই ঠিক হলো আমাদের কণ্ঠস্বরের কম্পনকে যদি কেন্দ্রে সৃষ্ট উচ্চ কম্পনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে সঙ্গী উচ্চ কম্পনের পিঠে চেপে আমাদের কথাও অনেক দূরে চলে যেতে পারে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছালে যদি আবার তাকে পৃথক করে আরেকটি মানুষের কানে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবেই তো আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর কম্পনগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা একসঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে মিশে যেতে পারে না। বরাবরই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সুতরাং গোড়াতে সব কম্পনকে মিশিয়ে দেওয়া ও শেষে আবার এদের পৃথক করা—এই হলো বর্তমান কেরিয়ার (carrier) পদ্ধতির কাজ। উপযুক্ত উচ্চ কম্পন সৃষ্টিকারী যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো, সব কম্পনকে মিশিয়ে দেবার জন্য মডিউলেটর (modulator)-ও তৈরি হলো। আবার শেষে কণ্ঠ কম্পনকে আলাদা করার জন্য ডিমডিউ-লেটর (demodulalor) তৈরি হলো—অবশ্য সবই বিদ্যুতের সাহায্যে। মানুষের কথার কম্পনাঙ্ক ৩০০০ থেকে ৩৪০০ হার্টজের (Hertz—কম্পনাঙ্কের একক) মধ্যেই থাকে, সুতরাং মোটামুটি ৪০০০ থেকে ২০,০০০ হার্টজ অন্য কাজেও লাগানো যায় এবং তাই লাগানো হয়; এ কম্পনাঙ্কগুলো তারবার্তা প্রেরণের কাজে লেগে যায়। এরজন্য যাতে দুই প্রান্তে একই সঙ্গে কথা বলা বা বার্তা প্রেরণ হতে পারে তার জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দুই তারকে দিয়ে চার তারের কাজ করানো হলো। প্রথমে কম দিয়ে শুরু হয়েছিল, পরে দাঁড়ালো ১২ চ্যানেলে (channel), যার অন্ততঃ একটা চ্যানেল-এ ২৪টা তারবার্তা পাঠানো সম্ভব হবে একসঙ্গে দুই প্রান্ত থেকে। ৩১০০ হার্টজ কম্পনবিস্তৃতিতে সহজেই চব্বিশটি টেলিগ্রাফ লাইন করা যায়, কারণ টেলিগ্রাফের কাজে ১২০ হার্টজ কম্পনবিস্তৃতির প্রয়োজন। সৃষ্টি হলো ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি টেলিগ্রাফ সংক্ষেপে ভি. এফ. টি. (V. F. T.), যার প্রত্যেকটি চ্যানেলে টেলিপ্রিন্টার বা টেলেক্স সংযোগ চলতে পারে। একজোড়া মাত্র তার থেকে কতজোড়া সংযোগগ্রন্থি তৈরি হলো। এবার প্রয়োজন হলো ওপরের তার বাদ দিয়ে মাটির তলায় বিশেষ ধরনের কেবল (cable) ব্যবহার করে তারই প্রত্যেক জোড়া তারে এমন অনেক কেরিয়ার সিস্টেম চালানো। এর প্রথম সফল প্রয়োগ কলকাতা ও আসানসোল সংযোগকারী কো-এক্সিয়েল (co-axial cable) কেবল। এ কেবল-এ কাজ শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে, আজও একে ব্যবহার করা হয় ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গায়। এ কেবলটি কিন্তু আমরা স্থানীয় যে-কেবল ব্যবহার করি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। কলকাতা-আসানসোলের ১৩৮ মাইল দূরত্ব জুড়ে পাতা হয়েছিল—কিছু দূরে দূরে একটি করে ছোট রিপিটার স্টেশন (Repeater Station), যা দিয়ে একে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থার সুবিধা, বিদ্যুতের প্রয়োজন খালি দুই প্রান্তে, কলকাতায় এবং আসানসোলে। মধ্যবর্তী সব ছোট রিপিটার-এ যে বিদ্যুৎ থাকে তা এরাই ভাগ করে দেয়। এক একটি তামার তারের জোড়াতে থাকে ৬০+৬০টি চ্যানেল। ৮টি জুড়ি-বিশিষ্ট এই কেবল-এ ৯৬০টি চ্যানেলের বন্দোবস্ত রাখা আছে। এর বেশির ভাগই ব্যবহার হয় কথাবার্তার কাজে, অল্প কিছু টেলিগ্রাফ-এর কাজে।

এর পর এসে গেল একেবারে তার বাদ দিয়ে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন (microwave communication)-এর চিন্তা। এই microwave এক শ্রেণীর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ যার বিস্তৃতি ১,০০০ $\times$ ১০^{৬} হার্টজ থেকে ৩০,০০০ $\times$ ১০^{৬} হার্টজ পর্যন্ত।

এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের জন্য ন্যূনাধিক ২৫ মাইল দূরে দূরে একটি করে রিপিটার স্টেশন-এর প্রয়োজন, যার অবস্থিতি বেশ উঁচু জায়গায়, অর্থাৎ ছোট পাহাড়ের মাথায় হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় এর প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এ-পদ্ধতির ব্যবহারে একদিকে বহু লোকের প্রয়োজন মিটল এবং খরচও অনেক কমে গেল। ঝড়-জল হলে ক্ষতি হয় না, কেবল চুরি যাবারও ভয় নেই। বেতারবার্তার সঙ্গে এর তফাৎ হলো—বেতারে মাঝপথে সহজেই শত্রুপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারে, প্রক্ষিপ্ত তরঙ্গকে নিজের যন্ত্রে ধরে নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে। বেতারে যে তরঙ্গ-কম্পনাঙ্ক ব্যবহার করতে হয় তা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ, যাতে একদেশের কম্পনাঙ্ক অন্যদেশের ব্যবহৃত কম্পনাঙ্কের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। মাইক্রোওয়েভের সেসব অসুবিধা নেই—হাজার মেগাহার্টজ থেকে ত্রিশহাজার মেগাহার্টজ কম্পনকে যে যত ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে করবে, কোন বাধা নেই। এটা নির্ভর করবে প্রান্তিক যন্ত্রপাতির ওপরে। কলকাতার টেলিফোনকেন্দ্রের মাথায় যে বড় বড় অর্ধগোলাকৃতি ধাতুর চাকতি দেখা যায় এ সেই মাইক্রোওয়েভ গ্রহণ করবার কাজ করে এবং পাঠাবারও কাজ করে। এদের সঙ্গে নিচে বাতানুকূল ঘরে প্রান্তিক যন্ত্রপাতির সংযোগ রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি তার দিয়ে। মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার ক্রমে বাড়ছে। এতে কথাও হয় চমৎকার। দেশের বিভিন্ন রেল ও দূরের স্টেশন ধরবার জন্য ব্যবহার করছে মাইক্রোওয়েভ।

এও শেষ কথা নয়। যদি দক্ষিণের ত্রিবান্দ্রমকে উত্তরের শ্রীনগরের সঙ্গে আরো সহজে সংযুক্ত করতে হয়, তাহলে এতটা পথ অতিক্রম করে যাওয়া তো সোজা নয়। কিংবা যদি কলকাতার লোক নির্বিঘ্নে কথা বলতে চায় লন্ডনের আত্মীয়ের সঙ্গে তবে তো আরো সহজ কোন পথের কথা ভাবা দরকার। তাই দরকার পড়ল আকাশে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে মাইক্রোওয়েভ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়াস। এসব কেন্দ্র চালাবার জন্য লোকের দরকার নেই, চাই শুধু কেন্দ্রটি যেন একই জায়গায় আপেক্ষিকভাবে স্থির থাকতে পারে এবং একপ্রান্ত থেকে পাঠানো মাইক্রোওয়েভগুচ্ছকে অন্যপ্রান্তে অবিকৃত অবস্থায় পাঠিয়ে দিতে পারে। ভারতের প্রয়োজন মেটাতে একাজ করে কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট। এটি রাখা হয়েছে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে সোজা-সুজি নাগপুরের ওপরে যাতে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত সহজেই এই ভাসমান কেন্দ্রের সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর সঙ্গে একই গতিতে পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে, একই সঙ্গে সূর্য পরিক্রমাও করছে, সুতরাং পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে আপেক্ষিকভাবে এটি স্থির। এযে শুধু টেলিযোগাযোগই করে তা নয়, এর ক্যামেরা সর্বক্ষণ পৃথিবীর ছবি নিচ্ছে ও পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে, এর পাঠানো ছবিই আমরা প্রতিদিন দেখি টেলি-ভিশনের মাধ্যমে যা থেকে আবহাওয়াবিদরা খবর দেন, আবহাওয়া কেমন থাকবে। এর সাহায্যে টেলিভিশনের যোগাযোগও হচ্ছে, টেলেক্স, টেলিফোন সবই চলছে। অবশ্য এই কেন্দ্র মাঝে মাঝে ৪৷৫ বছর পরে পরে পাল্টাতে হয়। যেজন্য ইনস্যাট-এ, ইনস্যাট-বি, ইনস্যাট-সি ইত্যাদি উপগ্রহ পাঠানোর বন্দোবস্ত হচ্ছে। এছাড়া বিদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দরকার পড়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কৃত্রিম উপগ্রহের—যাদের সাহায্যে আমরা শুধু দূর-দূরান্তের সঙ্গে বাক্যালাপই করি না, এদের সাহায্য না পেলে লন্ডনের ক্রিকেটখেলা কলকাতায় বসে দূরদর্শনের পর্দায় দেখতে পেতাম না। এর সাহায্যেই দেখেছি রোমে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা, সোজাসুজি। মানুষের নানা আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীটা বড়ই ছোট হয়ে আসছে এবং এদের সঠিক মানবিক ব্যবহারে হয়তো কোন দিন মানুষে মানুষে মিলনের সম্ভাবনা বাড়বে।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মে আন্তর্জাতিক টেলিফোন সংস্থার ১২৫ বছর পূর্ণ হলো। এই ১২৫ বছরে দূরসঞ্চার ব্যবস্থার বহু উন্নতি হয়েছে ; আশা করা যায় আগামী দশ বছরে এর আরও অনেক উন্নতি হবে, সঞ্চার ব্যবস্থা আরও অনেক ত্রুটিমুক্ত হবে এবং আজকের সঞ্চারের খামখেয়ালি তখন আর আমাদের মনে থাকবে না

বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের মর্মকথা

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে : দিলীপকুমার দত্ত। অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ৩৬ কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা।

বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে বিদগ্ধজনের আগ্রহ এখনো কিছু কম নয়। কাব্যপিপাসু মানুষ বৈষ্ণবকাব্যে রসের ভাণ্ডার খুঁজে পান। সাহিত্য ও দর্শন, উভয় বিভাগের ছাত্র, গবেষক ও পাঠক বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের তত্ত্বসন্ধানী। গবেষক-লেখক ডঃ দিলীপকুমার দত্ত পাঠককে আলোচ্য গ্রন্থটিতে বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণবদর্শন, এই দুয়েরই মর্মরস আস্বাদন করিয়েছেন। আটটি সুলিখিত, সমৃদ্ধ অধ্যায়ে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

প্রথম অধ্যায় : 'ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা।' ধর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে লেখক বহু শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করে, বৈষ্ণব প্রেমভাবনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই আলোচনাটি পুস্তকের ভিত্তি হিসাবে ধরা যায়। এই অধ্যায়ের শেষ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ : "মুক্তিভাবনা নয়, অনন্য-সদৃশ এই নির্মল ও নিরুপাধি প্রেমভাবনাই বৈষ্ণবধর্মের একমাত্র সাধনা ও সাধন-লক্ষ্য।"

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব।' লেখক দেখিয়েছেন, "শ্রীরাধা সমস্ত কিছু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে, একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের মুখ্য নায়িকা হিসাবে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যগৌরবে উদ্ভাসিতা হয়ে উঠেছেন গীতগোবিন্দ কাব্যেই সর্বপ্রথম।... তাই মহাজনকবি হিসাবে জয়দেবের যে শ্রদ্ধা-মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট আসন, তার অধিকার জয়দেব-পূর্ববর্তী লৌকিক কাব্যধারার কোন কবিকেই দেওয়া চলে না।" লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন অনেক সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করে, একটির পর একটি তথ্য সাজিয়ে। সিদ্ধান্তটি আশা করি সকলে স্বীকার করবেন।

তৃতীয় অধ্যায় : 'বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব'। লেখক চৈতন্যদেবের রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনার কথা বিস্তারিত আলোচনা করে পরিশেষে বলেছেন : "শ্রীচৈতন্যদেব তাই ভারতবর্ষের সমগ্র বৈষ্ণবধর্মের প্রাণদাতা প্রাণপুরুষ তো বটেই, তাঁর মর্যাদার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে—তিনি সমগ্র ভারতের রসময় আধ্যাত্মিক প্রাণসত্তারও পরম জাগরণ।" লেখকের আলেচনা এখানে শুধু যে যুক্তি-অনুসারী তা নয়, গভীর হৃদয়রসেও সিঞ্চিত। ফলে আলোচনাটি খুব উপভোগ্য হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : 'বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন : বীজ ও বিবর্তন'। এই দীর্ঘ অধ্যায়ে লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণব উদ্ভাবিত অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন নিয়ে অনেক আলোচনা করে লিখেছেন : "ব্রহ্ম-স্বরূপ থেকে জীবকে একদিকে যেমন ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, তেমনই আবার বিপরীত যুক্তির দ্বারা অভিন্নরূপে চিন্তা করাও অসম্ভব। তাই উভয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ দুই-ই বর্তমান।" লেখকের আলোচনা এক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ স্বীকার করতেই হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ত্ব—স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব'। সাধারণ পাঠকদের পক্ষে এই অধ্যায়টি একটু কঠিন। লেখক সেটি সহজ করবার জন্য বলেছেন : "বাংলার বৈষ্ণবরসতত্ত্ব এই বিপ্রলব্ধ ভাবনাকে (বিরহ) যতখানি আত্মসাৎ করে নিয়ে তার কেন্দ্রীয় ভাবনায় পরিণত করেছে, তার তুলনা আর কোথাও মেলে না।"

ষষ্ঠ অধ্যায় : 'ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা'। লেখক বৈষ্ণবসাধনা ও বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি প্রধান বক্তব্য ও ভাবকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"বৈষ্ণবভক্তি-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম। তাই কেবল সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, বৈষ্ণবসাহিত্য, দর্শন সবকিছুরই গৌরবান্বিত বিকাশক্ষেত্রে অনিবার্য কেন্দ্রমূলে হয়ে উঠেছেন রাধা।" আলোচনার বিষয় জটিল। কিন্তু তা সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার জন্য লেখক যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ঃ 'গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার'। এখানে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক বলেছেনঃ "স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব, বিশেষ করে কবি চণ্ডীদাসেরই রচনাশ্রিত নানা পদ-আস্বাদন করে দিব্যোন্মত্ত হয়ে উঠতেন।... শ্রীরাধাভাবতনু শ্রীচৈতন্যের অনুপম কৃষ্ণপ্রেম—মানসিকতার প্রধানতম উৎসটি হলো কবি চণ্ডীদাস-কল্পিত শ্রীরাধা কিংবা নিত্যবিরহিনী শ্রীমতী রাধিকার স্রষ্টা কবি চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা।" সমগ্র আলোচনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য চণ্ডীদাসের বহু উদ্ধৃতি লেখক দিয়েছেন।

অষ্টম অধ্যায়ঃ 'বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস'। চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি জ্ঞানদাসকে নিয়ে আলোচনা করে লেখক তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন। জ্ঞানদাসের রচনায় শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমাদর্শ, ঈশ্বরকে আপন করার দৃষ্টান্ত ও ঈশ্বরের অনুপম মাধুরী সত্যিই অনবদ্যভাবে প্রকাশলাভ করেছিল। অধ্যায়টিতে লেখক রাধার প্রেমের মহিমা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বহু সংশ্লিষ্ট পুস্তক ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে। পুস্তকের শেষে গ্রন্থপ্রসঙ্গটি (Bibliography) আগ্রহী পাঠকের কাজে লাগবে। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে, আমরা যেন বাস্তবিকই বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে প্রবেশ করেছি। সুতরাং লেখক রসপিপাসু পাঠকের প্রশংসা লাভ করবেন, সন্দেহ নেই।

ডায়াবেটিসে করণীয় ও জ্ঞাতব্য

জলধিকুমার সরকার

Queries on Diabetes Answered: কে. সি. বসুমল্লিক। শ্রীকান্ত বসুমল্লিক, পি৯-৮৫, সি. আই. টি. স্কিম VI M, কলিকাতা-৭০০০৫৪।

এই পুস্তিকাতে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছু প্রশ্নোত্তর আকারে দেওয়া আছে। লেখক বহুবৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছেন; তাছাড়া তিনি ছিলেন পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং অবসর গ্রহণের পর একটি ল্যাবরেটরির পরিচালক। তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বহু ডায়াবেটিস রোগীর সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। তিনি ডায়াবেটিস সম্বন্ধে যত রকমের প্রশ্ন পেয়েছেন, এই পুস্তিকাতে সেগুলির সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। ডায়াবেটিস রোগটি কি, কতরকম এবং কেন হয়, এর পরিণাম কি, এই রোগে কিভাবে সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন-যাপন করা যায়, খাবার কি ধরনের হওয়া উচিত বা কেন, ইনসুলিন ইন্‌জেকশন বা ট্যাবলেট কারা ব্যবহার করবেন এবং সেই ব্যবহারে কি সাবধানতা নিতে হবে, এই অসুখে শরীরের কি ক্ষতি হয় এবং তা কিভাবে প্রতিহত করা যায়, রক্ত বা প্রস্রাব-পরীক্ষা সম্বন্ধে কি জানা উচিত—এই সবের উত্তর পাওয়া যাবে এই পুস্তিকাতে। পরিশিষ্টে শরীরের উচ্চতা অনুযায়ী ওজনের হার, বিভিন্ন খাদ্যের বিশ্লেষণ, বাজারে কয় প্রকার ইনসুলিন পাওয়া যায় এবং ডায়াবেটিস রোগে পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী দেওয়া আছে।

মোট কথা, অধুনা বহু বিস্তৃত এই অসুখ সম্বন্ধে এটি খুবই উপকারী পুস্তক। ডায়াবেটিস রোগীরা তো বটেই এমনকি সাধারণ চিকিৎসকদের অনেকেই বইটিতে বেশ কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাবেন। পুস্তিকার মূল্য দেওয়া নেই, মনে হয় লেখক কেবল জনহিতের জন্যই বিতরণ করার জন্য এটি লিখেছেন। আশা করা যায়, যে কেউ লেখক বা প্রকাশকের কাছে চাইলেই পুস্তিকাটি পেতে পারবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ : বিশাখাপত্তনম জেলার ইয়েল্লামাঞ্চিলি মণ্ডলের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি গ্রামের ১৬৪০টি পরিবারের মধ্যে ১৬৪০টি তুলোর কম্বল, ৬৩৭টি ধুতি, ১৯৯৭টি শাড়ি, ৪৮২টি জামাকাপড়, ১৭ সেট বাসনপত্র পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে।

গুজরাট বন্যাত্রাণ : রাজকোট আশ্রম ভাবনগর জেলার মোখাডাকা, রণদোলা, সাগাপাড়া, জালিয়া গ্রাম এবং পালিতানা শহরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গত ১৯ আগস্ট থেকে ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে। ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ৪০৬টি পরিবারের মধ্যে ৬,৭০০ কিলোঃ গম, ১৬০টি শাড়ি, ৪০২টি চাদর, ৪১০ মিটার কাপড়, ১৬০ সেট বাসনপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্বাসন

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশাখাপত্তনম জেলার ইয়েল্লামাঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম ও সোমলিঙ্গপালেম গ্রামে দুশো বাড়ি-নির্মাণের কাজ চলছে।

গত ১১ আগস্ট গুন্টুর জেলার রাপাল্লে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুরমে আশ্রয়গৃহ সহ একটি কমিউনিটি হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গুন্টুর জেলায় আরও অনুরূপ তিনটি আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করা হবে। এই জেলায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আর্থিক পুনর্বাসনের কাজ যথেষ্ট সফল হয়েছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া) **:** জুন মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। শনিবারগুলিতে মায়ের ওপর আলোচনা হয়েছে এবং ২৩ জুন ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৮ জুলাই পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকালে বাঙলা চলচ্চিত্র 'রানী রাসমণি' দেখানো হয়।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি : আগস্ট মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয়প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী ভাস্করানন্দ। ২৫ আগস্ট এই বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় সিয়াটলে এক দিনের মাসিক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

ফিজি আশ্রম বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র 'Fiji Plain English Speaking Contest'-এ ন্যাশনাল শীল্ড লাভ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী শিবরামানন্দ (অচিন্ত্য) গত ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

স্বামী শিবরামানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে করিমগঞ্জ, ঢাকা, কোয়ালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ এবং পুরী মঠ প্রভৃতি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি করিমগঞ্জ আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। ঐকান্তিক সাধনভজন-শীলতা ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১৩ সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং ১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন স্বামী গর্গানন্দ।

১৮ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে বহু ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ পান।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ঃ গত ৪ ও ৫ মে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তাৎপর্য আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে কর্মযোগের প্রয়োগ-বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। এদিনের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ সরকার ও অসীম দত্ত। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা বিজ্ঞানপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা। ঠাকুরের ওপর ভাষণ দেন সভার সভানেত্রী প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। সভায় সঙ্গীত ও বেদমন্ত্র পাঠ করেন প্রব্রাজিকা পুণ্যপ্রাণা। উভয় দিনই সভায় প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তপোদ্যান, গড়বালিয়া, হাওড়া, বহু ভক্তজনের সমবেত প্রচেষ্টায় আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে গত ৮ জুন ১৯৯০ শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দিবসে সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। সারাদিবস ব্যাপী পুজা, হোম, ভজন ছিল উৎসবের অঙ্গ। দুপুরে ৩৫০০ দরিদ্রনারায়ণ বসে প্রসাদ পেয়েছে। বিকালে দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ১০০টি ধুতি ও ১০০টি শাড়ি বিতরণ করা হয়। পরে ধর্ম-সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী সনাতনানন্দ, অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সন্ধ্যারতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন শেষে 'রানী রাসমণি' ছায়াছবি দেখানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির (ডোমজুড় কালীতলা, হাওড়া) গত ৭ ও ৮ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। প্রথম দিন ভক্তিগীতি, কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, হাওড়া রামরাজা নাট্যমন্দির কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, বাউলসঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে রামায়ণ গান পরিবেশন করেন সুধীর চৌধুরী ও গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরি। তারপর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং ভাষণ দেন ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়। এই সভায় সাতজন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ৫৫ জন দুঃস্থ গ্রামবাসীকে বস্ত্র দেওয়া হয় এবং ২০ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় বেলুড় জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'ভক্ত কবীর' ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শিল্পী পরেশমণি দাসের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ স্মরণ-তীর্থ (মুলাজোড়, শ্যামনগর, উঃ ২৪ পরগনা) গত ১৮ জানুয়ারি, ১৯৯০ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব এবং গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপন করেছে। প্রতিটি উৎসবেই বিশেষ পুজা, হোম, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৫ মার্চ ১৯৯০ **পঞ্চসায়র অমৃত সন্ধ্যা পাঠচক্রের** উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন সকালে প্রভাতফেরী এবং সন্ধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ।

লিলুয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (চকপাড়া শাখা): গত ২২ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব

উদ্‌যাপন করে। এদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা করা হয়। ভক্তিগীতি, রামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক গীতিনাট্য পরিবেশন এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরি এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী শরণ্যানন্দ এবং প্রণবরঞ্জন ঘোষ। এ উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

উদ্বোধন

গত ২৯ জুলাই **রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি** (**ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা**) কর্তৃক পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী উদ্গীথানন্দ। এই সেবাসমিতি গত ছয় বছরে দশ হাজারের অধিক রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছে এবং দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ বিতরণ করেছে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের অর্থানুকূল্যে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের ৪২৯টি পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্পে মোট পাঁচলক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা সাহায্য করেছে।

গত ২৩ আগস্ট **কল্যাণী রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে** মহকুমা শাসক বি. এন. কুণ্ডু, কল্যাণী সিভিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও ভারতীয় শল্য-চিকিৎসক সংস্থার স্থানীয় মহকুমা সভাপতি ডাঃ প্রদোৎকুমার দাস ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তরের আনুকূল্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ঐ পাঠক্রমের সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের সেলাই ও ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিকিৎসা-শিবির

গত ৮ জুলাই ১৯৯০ **রামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ ধামে** (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা) সপ্তম চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। স্থানীয় ও দূরাগত ২৯৭ জন রোগী বিনামূল্যে শল্য, কান-নাক-গলা, স্ত্রীরোগ ও মেডিকেল—চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র লাভ করেন। কিছু রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধও দেওয়া হয়। পরীক্ষান্তে কতিপয় দুঃস্থ রোগীর হাসপাতালে ভর্তির এবং বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই চিকিৎসা শিবির সকাল ১০টা থেকে অপরাহ্ণ ৩টা পর্যন্ত পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিল-কুমার আঢ্য এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তুষারকান্তি মিত্র। আশ্রম-সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা, আশ্রমের সক্রিয় কর্মী স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ শচীন্দ্র-নাথ পাল ও অন্যান্য আশ্রম-কর্মিবৃন্দ তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ সহযোগিতা করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সুকুমার সেনগুপ্ত** গত ৫ এপ্রিল ১৯৯০ কোন্নগরে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কর্মজীবনে তিনি কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁকে লেখা শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের চিঠি কিছুকাল আগে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ২৭ নভেম্বর ১৯৮৯ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানা-নন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **রামমোহন মুখোপাধ্যায়** হুগলী জেলার বড় দিগরুই গ্রামের বাসভবনে ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি উদ্বোধনের গ্রাহক ছিলেন।

তরুণ প্রতিশ্রুতিবান শল্য-চিকিৎসক **ডাঃ শ্যামল-কুমার দে** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ এপ্রিল রাত্রিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিশুকালে পিতৃহীন ডাঃ দে-র মাতা, স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান। পরহিত-সেবাব্রতে নিয়োজিত ডাঃ দে-র বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। বিভিন্ন সময়ে আর্তের সেবা, গঠনমূলক কাজও বন্যাত্রাণে গিয়ে রোগী ও বিপন্নদের সেবায় তিনি প্রায়শঃই ছুটে গিয়েছেন। ডাঃ দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ-এর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শে বিশ্বাস-অবিশ্বাস

ডিম থেকে এক রকমের জীবাণু (Salmonella) সংক্রমণের ভয়ে ব্রিটেনে হঠাৎ ডিম বেচা-কেনা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর আগে বহুদিন ধরে ডিম খাওয়ার কুফল (রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে, করোনারি অসুখ হতে পারে ইত্যাদি) সম্বন্ধে সরকারি সূত্র থেকে বলা হচ্ছিল যে, তাতে ডিম খাওয়া এরকমভাবে বন্ধ হয়নি। কারণ লোকে ততটা ওতে গুরুত্ব দেয়নি। এই গুরুত্ব দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করলে কয়েকটি বিষয় ধরা পড়ে। গত বিশ বছরে লোকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, তাদের জীবনযাত্রার ধারার (লাইফ-স্টাইল—life style) ওপর তার স্বাস্থ্য ও মৃত্যু অনেকটা নির্ভর করে। 'লাইফস্টাইল'-এর মধ্যে পড়ে খাদ্য, পানীয়, পরিশ্রম, ধূমপান, নিদ্রা প্রভৃতি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই 'লাইফ-স্টাইল'-এর ওপর সরকারিভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও এখনও লোকে মদ্যপান ও ধূমপান বন্ধ করেনি। এর একটা কারণ হচ্ছে—পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সরকারি উপদেশের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অনেকেই ধরে না। আর একটি কারণ হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ'রা ভাসা ভাসা ভাবে এমন পরামর্শ দেন, যার মধ্যে থাকে—লোকে যা পছন্দ করে তা বারণ করা, অথবা যা খুব অপছন্দ করে তা করতে বলা। এই বিশেষজ্ঞগণ আবার প্রায়ই মত বদলান; যেমনঃ 'প্রতিদিন আধ সের দুধ খাবেন' (Drink a pint of milk everyday'), যা ছিল দুগ্ধ সমিতির (Milk Board) স্লোগান; আবার তার পরেই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ থেকে এল 'ডেয়ারিজাত খাদ্য-পানীয়তে বিপদ আছে।' আগে উপদেশ এসেছিল 'জগিং ভাল'; তার পরে এসেছে 'হাড়ের পক্ষে জগিং খারাপ'। আগে ডিম্ব সমিতি (Egg Board) বলেছিল "একটি ডিম খেয়েই কাজে বার হতে পার, যেটা লোকের মনে গেঁথে আছে। এখন আবার ডিম খেলে কোলেস্টেরল বাড়ে বলা হচ্ছে। অতীতে বিশেষজ্ঞগণ ধূমপান, মদ্যপান, ব্যায়াম ও খাদ্যের ব্যাপারে নানা ধরনের ঘোষণা করেছেন। কিছুকাল আগে লবণ খাওয়া সম্বন্ধে উপদেশ এসেছিল, এখন এসেছে চিনি খাওয়া সম্বন্ধে। খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশগুলি এখন খাম-খেয়ালি বা অবিশ্বাস্য বলে গণ্য করা হয়। যারা এই সব উপদেশ মানে, তাদেরকে অনেকে 'মাথা খারাপ' বলে, আরও বলে "ঐ সব মানলে তুমি কিছুই খেতে পাবে না।" তার ওপর অনেকে আবার উদাহরণ দেবে "অমুক দীর্ঘজীবন ধরে ধূমপান করেছিল", "অমুক মাখন, ভাজাজিনিস খেয়েও তার কিছুই হয় নাই" ইত্যাদি। এইসব 'অমুক'দের মধ্যে যদি কোন নামী ব্যক্তি থাকে, তা হলে সেই উদাহরণ গাদাগাদা স্বাস্থ্য-উপদেশকে হারিয়ে দেবে। এর ওপর আছে অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন "আমি যদি এটা না খাই, তুমি কি নিশ্চিত হয়ে বলতে পার যে আমি ১০০ বছর বাঁচব?"—পরামর্শদাতা উত্তর দিতে থতমত খান। কতজনের মধ্যে কতজনের অসুখ হতে পারে, এই ধরনের হিসাবে লোক গোলমালে পড়ে। একশর মধ্যে একশ (odds) পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ (ratio), না দশলক্ষের মধ্যে একজন (probability)? সিগারেট-এর কথায় আসা যাক। এবিষয়ে প্যাকেটে সতর্ক করা হচ্ছে "ধূমপানে সাংঘাতিক ধরনের অসুখ হতে পারে।" অনেকে এই ধরনের সতর্কের অর্থ করে নেয় "ধূমপান কোন অসুখ সৃষ্টি করে না, অসুখ হবার সম্ভাবনা বাড়ায় মাত্র।"

[**New Scientist**, 11 March 1989, pp. 45-49]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



অগ্রহায়ণ

১৩৯৭

৯২ তম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ নভেম্বর, ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌॥

মনুসংহিতা



কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মের মর্ম

'ধর্ম' বলিতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ 'ধর্ম' বলিতে আমরা বুঝি ধর্মমত। যেমন হিন্দু-ধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম, ইসলামধর্ম, শিখধর্ম প্রভৃতি। মানুষকে আমরা ঐরকম কোন-না-কোন ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত করি, নিজেরাও একই ভাবে কোন-না-কোন ধর্মমতাবলম্বী বলিয়া আমাদের পরিচয় দিই। এখন প্রশ্ন হইল 'ধর্মমত' বস্তুটি কি? ধর্মমত হইল সাধারণতঃ এক বা একাধিক আচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত বা নির্দেশিত ঈশ্বর, পরলোক, নৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, মত ও বিশ্বাস; সেগুলি এক বা একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থে গ্রথিত ও লিপিবদ্ধ থাকে। সংশ্লিষ্ট আচার্যের শিক্ষা ও জীবনে এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে ঐ ধ্যান-ধারণা, মত ও বিশ্বাসসমূহ কিভাবে অনুশীলন করিতে হইবে তাহার বিধান থাকে। বিধান থাকে অনুশীলনের জন্য প্রশস্ত স্থানের যাহা সাধারণভাবে উপাসনালয় এবং বিশেষভাবে মন্দির, মঠ, গির্জা, মসজিদ, গুরুদ্বার প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত হয়। সুতরাং ধর্মমত বলিতে সাধারণতঃ বিশেষ ধর্মাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত, বিশেষ ধর্মগ্রন্থে গ্রথিত, বিশেষ উপাসনালয়ে অনুশীলিত মূলতঃ ঈশ্বর, পরলোক ও নৈতিকতা কেন্দ্রিক বিশেষ মত, বিশ্বাস ও ধারণাকে বুঝায়। ব্যাপকতর অর্থে 'ধর্ম' এবং 'ধর্মমত' সমার্থক।

প্রত্যেক ধর্মেই আবার অধিকাংশ মানুষ 'ধর্ম' বলিতে বুঝে তীর্থভ্রমণ, সাধু-সন্তের দর্শন ও সেবা, ব্রত-উপবাস, জপ-ধ্যান-পূজা-পাঠ-ভজন, কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান, বিধি, আচার ও অনুশাসন। সেগুলির অধিকাংশই প্রতিটি ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায় ও সমাজপতিগণ কর্তৃক নির্দেশিত। মালা-তিলক-গৈরিক ইত্যাদি ধারণ, হাঁচি-টিকটিকি মানা, আমিষ-নিরামিষ গ্রহণ অথবা বর্জন ইত্যাদিও 'ধর্মীয়' বিধির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনা প্রধানতঃ এই সমস্তকেই কেন্দ্র করিয়া গঠিত। ব্যক্তিজীবনে একজন ব্যক্তি হয়তো চূড়ান্ত অসং এবং চরম স্বার্থপর; কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে সে একজন ধার্মিক মানুষ বলিয়া অভিনন্দিত হইবে এবং সে নিজেকেও তাহাই ভাবিবে যদি সে 'ধর্মীয়' বলিয়া চিহ্নিত কিছু বিধি-অনুশাসন পালন করে।

আবার একদল মানুষ আছে যাহারা 'ধর্ম' বলিতে বুঝে যাদু বা অলৌকিক ক্ষমতা। যিনি যত বেশি সেই ক্ষমতার অধিকারী তিনি তত বড় মহাত্মা। সাধুসন্তরা এক খণ্ড লোহা লইয়া একতাল সোনা করিয়া দিবেন, ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিবেন, মাদুলি-কবচ দিবেন যাহাতে মামলায় জয় হইবে, পরীক্ষায় সাফল্য আসিবে, ব্যাধির নিরাময় হইবে। শুধু যে সাধারণ মানুষের মধ্যেই এই বিশ্বাস ক্রিয়াশীল তাহাই নহে, বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, উচ্চশিক্ষিত মানুষও এই ধারণার বশবর্তী।

এইভাবে 'ধর্ম' বলিতে আমরা এখন যে-বস্তুটি সাধারণতঃ আমাদের ধারণায় রাখিয়াছি তাহা হইল উপরি-উক্ত বিষয়গুলির একটি মিশ্রিত রূপ। বলা বাহুল্য, মর্মের দিক হইতে উহাদের দুই-চারিটি ভিন্ন কাহারও সহিত ধর্মের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; অধিকাংশের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই—

দূরবর্তীও নহে। ধর্মমতগুলির লক্ষ্য এক হইলেও উহাদের মধ্যে 'এইটি অন্যগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এই জাতীয় সংকীর্ণতাও রহিয়াছে। সেই সংকীর্ণতার জন্য উহাদের প্রবর্তকগণ দায়ী নহেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ধর্মমতাবলম্বীগণের অনেকেই তাহাদের প্রবর্তক যে অপরাপর ধর্মাচার্যগণ অপেক্ষা মহত্তর এবং তাহাদের ধর্ম যে অন্য ধর্মগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তাহা বুদ্ধি ও বাহু দুই-এর জোরেই প্রমাণ করিতে উৎসাহী। অসহিষ্ণুতা কখনও ধর্মের শিক্ষা হইতে পারে না। ধর্ম মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হইতে, সকলের মত ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিতেই শিক্ষা দেয়। দুঃখের বিষয়, শাস্ত্রগ্রন্থ ও ধর্মাচার্যগণের উপদেশ ও শিক্ষার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী অযোগ্য ধর্মনেতাগণ ধর্মমতগুলির মধ্যে অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা ও সংকীর্ণতার বীজ বপন করিয়া ধর্মের নামে মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। ধর্মের লক্ষ্য মানুষে মানুষে সেতুবন্ধন করা, কিন্তু ধর্মমতগুলি মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, ইহার জন্য ধর্মের কোন দোষ নাই, দোষ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের যাহারা লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হইয়া ধর্মকে ব্যবহার করে। মানুষ যখন আগুন আবিষ্কার করিল এবং তাহার কল্যাণকর শক্তি সম্পর্কে অবহিত হইল তখন সে তাহাকে তাহার নানা প্রয়োজনে লাগাইল। ক্রমে আগুন হইয়া দাঁড়াইল সভ্যতার অগ্রগতির এক প্রধান বাহক। কিন্তু মানুষের ভুলে, মানুষের হিংসা ও লোভে আগুন শহর, জনপদ এবং সভ্যতার ধ্বংসের কাজেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই মারণ-মহোৎসবে আগুনের নিজস্ব কোন ভূমিকা থাকে নাই। ঠিক তেমনই ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণ-সাধন; কিন্তু স্বার্থান্বেষী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের হঠকারী কার্য ও পরিকল্পনার দ্বারা ধর্মকে ধ্বংসের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে বারবার রক্তক্ষয় ও সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্মমত ধর্ম নহে। তেমনই তীর্থভ্রমণ, ব্রত-উপবাস, সাধু-সন্তের সান্নিধ্য, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ভজনাদি ধর্মজীবনের সহায়ক; কিন্তু ঐগুলিই ধর্ম নহে। উহাদের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুলতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পথে মানুষকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। উহাদের আনুষঙ্গিক ফল হইল মনের শুদ্ধিকরণ। উহারা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। ইহা ছাড়া আরও যেসব বিধি ও বিধান স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে বা লোকাচারের সঙ্গে প্রচলিত হইয়াছে উহারা প্রধানতঃ ধর্মজীবনের বাহিরের বিষয়। মূলে ধর্মের সহিত উহাদের অধিকাংশের কোন সম্পর্ক নাই; উহারা ধর্মজীবনকে বিড়ম্বিতই করে, মানুষকে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয়, মানুষকে সংকীর্ণ করে, আচারসর্বস্ব করিয়া দেয়, মানুষের মনে অর্থহীন গোঁড়ামির জন্ম দেয়। ধর্মের সিংহদ্বার হইতে মানুষের দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

আর ধর্মকে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতা বা যাদুশক্তির সঙ্গে সমার্থক করিয়া ফেলে তাহারা তো ধর্মের মর্ম হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে। বস্তুতঃ ধর্মের সঙ্গে অলৌকিকতার কোনই সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রাদি এবং সন্ত-সাধকগণ বলেন ধর্মপথের পথিকগণ শুদ্ধ জীবন-যাপন করিবার ফলে তাঁহাদের মধ্যে নানা 'সিদ্ধি' বা বিভূতি আসিতে পারে বা আসেই (ভাগবত, ১১।১৫।৩১); কিন্তু সেই বিভূতি শাস্ত্রাদিতে এবং উচ্চ কোটির যথার্থ ধর্মবেত্তাগণ কর্তৃক অতিনিন্দিত। শাস্ত্রাদিতে ঐগুলিকে ধর্ম-জীবনের 'অন্তরায়' এবং 'কালক্ষেপের কারণ' (ভাগবত,১১।১৫।৩৩) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। কারণ উহাদের দ্বারা ধর্মজীবনের পরম লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ অসম্ভব (ভাগবত, ১১।১৫।৩৪)।

তবে বাহ্যিক অর্থে ধর্ম যাদু না হইলেও প্রকৃত অর্থে ধর্ম অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদুর শক্তিতে লোহা সোনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়, মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, উহা যাদুকরের কৌশল মাত্র, বাস্তবে উহা ঘটে না, ঘটা সম্ভবও নহে। ধর্ম এই কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু যে, ধর্মের প্রভাবে মানুষের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। ধর্ম পশুকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যস্থিত পশুভাবকে) মানুষে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়। এবং এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বাস্তব এবং সম্ভবও। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এখন প্রশ্ন হইবে 'ধর্ম' বস্তুটি আসলে কি? একটিমাত্র শব্দে যদি ধর্মের অর্থ বলিতে হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে ধর্মের অর্থ হইল বৈশিষ্ট্য। 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হইতে। পাণিনির মতে, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা' (to hold)। সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মতে, ধারণের তাৎপর্য হইল ধারণের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করা (to protect) এবং পোষণ বা পুষ্টি বিধান করা (to support or to nourish)। অর্থাৎ যাহা মানুষকে

ধারণ করে বা মানুষ যাহাকে ধারণ করে তাহাই ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের যাহা মূল ও প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাই তাহার ধর্ম। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মূল বা প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি আসুরিক বা পাশবিক হয় তাহা হইলে তাহাই কি তাহার ধর্ম হইবে? না। সেই কারণেই সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ 'ধারণ'-এর তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন রক্ষা করা এবং পোষণ বা পুষ্টিবিধান করা। অর্থাৎ যাহা মানুষকে সমস্ত অশুভ প্রভাব হইতে রক্ষা করে এবং তাহার অন্তরে শুভবোধ ও শুভবুদ্ধি সঞ্চার করিয়া তাহার আত্মিক পোষণ ও পুষ্টিবিধান করে। ইহাতে শুধু যে ব্যষ্টি-মানুষ রক্ষা পায় তাহা নহে, পরিবার রক্ষা পায়, সমাজ রক্ষা পায়, দেশ ও জাতি রক্ষা পায়, পৃথিবী ও সমগ্র মানবসমাজ রক্ষা পায়। সুতরাং ধর্ম বা ধর্ম-চেতনা হইল একমাত্র বস্তু যাহা সমগ্র মানবসমাজকে 'মহতী বিনষ্টিঃ' (কেন উপনিষদ্, ২।৫) হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। মহাভারতের কর্ণপর্বে (৬৯।৫৮) কৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিতেছেন:

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

—মনীষিগণ বলেন, 'ধারণ করা' হইতে 'ধর্ম' কথাটির উদ্ভব। ধর্ম মনুষ্যগণকে ধারণ করে। সুতরাং যাহা ধারণ-কর্মের সহিত সংযুক্ত তাহাই নিশ্চিতভাবে ধর্ম।

ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ সত্য, আরেকটি অহিংসা। মূলতঃ ভারতীয় ধর্মভাবনার ইমারতটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই দুই প্রধান স্তম্ভের উপর। গীতায় (১৬।২-৩) ভগবান ধর্ম বা দৈবী সম্পদের লক্ষণগুলি নির্দেশ করিয়াছেন এইভাবে:

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

—হে অর্জুন, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, দোষদৃষ্টি-বর্জন, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, নম্রতা, অসৎ চিন্তা ও কর্মে লজ্জা, বাক্সংযম, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য, পবিত্রতা, জিঘাংসাশূন্যতা, অনভিমান—এই সকল গুণ হইল শ্রেষ্ঠ মানুষদের দ্বারা অনুশীলিত দৈবসম্পদ।

মহাভারতের বনপর্বে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানেও ধর্মের উপরোক্ত লক্ষণগুলি পুনরুচ্চারিত হইয়াছে (বনপর্ব, ২০৭।৮৪-৯৬)। মনুও ধর্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন তাহাতেও ধর্মব্যাধের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় (মনুসংহিতা, ৬।৯২)। কিন্তু সমস্ত ধর্মলক্ষণের নির্যাস বিধৃত হইয়া আছে সত্য ও অহিংসার মধ্যে:

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ॥
(মহাভারত, বনপর্ব, ২০৭।৭৪)

—অহিংসা এবং সত্য সকল প্রাণীর পক্ষেই পরম কল্যাণকর। অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরন্তু অহিংসা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই যথার্থ মহৎ ব্যক্তির প্রবৃত্তিসমূহ প্রবর্তিত হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকথিত ধর্ম-লক্ষণগুলির মধ্যে সত্য ও অহিংসাই সর্বপ্রধান। অবশিষ্টগুলি উহাদেরই শাখা-প্রশাখা। সত্য ও অহিংসা অনুশীলন করিলে বাকিগুলি স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলিত হইয়া যায় অথবা বাকিগুলি অনুশীলন করিলে ধর্মের লক্ষ্য-স্বরূপ সত্য ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে সত্য ও অহিংসা সমার্থক হইয়া দাঁড়ায়। গান্ধীজী বলিয়াছেন, ঈশ্বরানুসন্ধান, সত্যানুসন্ধান এবং অহিংসা বা সর্বজীবে প্রেম চূড়ান্ত পর্যায়ে একই মুদ্রার এক-একটি পিঠমাত্র। গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রাচীন ধর্মসাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন এবং ভারতের ঋষি, সাধক ও মনীষীদের বাণীতে প্রচারিত উপলব্ধির প্রতিধ্বনিমাত্র। বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথা আমাদের বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

ধর্ম মানুষকে কি দেয়? ধর্ম মানুষকে গতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষকে বলে, তুমি কখনও থামিয়া থাকিবে না। তুমি শুধু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।৩।১৫)। জীববিজ্ঞানী-দের মতে, মানুষের যাত্রার সূচনা হইয়াছিল অ্যামিবা হইতে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অ্যামিবা পরিশেষে মানুষে পরিণত হইয়াছে। বিজ্ঞানের মতে মানুষের বাহ্যিক বিবর্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে, আকৃতিতে মানুষের আর কোন বিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু ধর্ম বলিতেছে, না—সামগ্রিকভাবে মানুষের বিবর্তন কখনও থামে না। মানুষ যেহেতু চেতন সত্তার অধিকারী, তাহার বিবর্তন অব্যাহত। এই বিবর্তন অব্যাহত মানুষের মনোজগতে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে। মানুষের এই বিবর্তন নিরন্তর চলিবে অশুভ হইতে শুভে উত্তরণের প্রেরণায়, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে এবং পরিশেষে দেবত্বে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় এবং অবশেষে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠায়। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিবর্তন সমাপ্ত হইবে। যেমন সমাপ্ত হইয়াছে বুদ্ধের ক্ষেত্রে, খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে,

চৈতন্যের ক্ষেত্রে, রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে। ব্যষ্টির দৃষ্টান্ত সমষ্টি-মানবকে অনুপ্রাণিত করিবে পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে। সুতরাং যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা চলিতেই থাকিবে। ধর্ম সেই যাত্রায় প্রেরণার প্রদীপে তৈল যোগাইবে। আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী মানুষের এই চিরন্তন বিবর্তনকে স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও বলিয়াছেন, ধর্মকে চিরকাল পৃথিবীর প্রয়োজন হইবেই। যতক্ষণ মানুষ মানুষ, ততক্ষণ মানুষের লোভ, হিংসা, কুটিলতা, সংকীর্ণতা থাকিবেই থাকিবে। বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে পারে, বহির্জগৎকে সুন্দর করিতে পারে, প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষমতা একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান মানুষের অন্তরস্থিত লোভ, হিংসা, কুটিলতা ও সংকীর্ণতাকে দূর করিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে ধর্মের ভূমিকা অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ধর্মকেও 'বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম হইল 'হওয়ার বিজ্ঞান'।

বস্তুতঃ 'হওয়া'-ই হইল ধর্মের আদি, মধ্য ও অন্তের মূলকথা। স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা'র বৃহৎ অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এই 'হওয়া'র প্রসঙ্গ। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র সঙ্গে সামান্য পরিচিত জনও তাহা অবহিত। স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজের) সূত্রে প্রাপ্ত স্বামীজীর একটি অপ্রকাশিত উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি। কলকাতার একটি বাঙালী পরিবারের কয়েকজন বেলুড় মঠে আসিয়াছেন স্বামীজীর কাছে। তাঁহারা সদ্য কেদারনাথ-বদরীনাথ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন। কথায় কথায় তাঁহারা বলিলেন: "আমাদের বহুদিনের একটি মনোবাসনা এবার পূর্ণ হলো। কেদারনাথ-বদরীনাথ দর্শন করে আমরা জীবনের একটি মহা ধর্মকৃত্য সম্পন্ন করতে পেরেছি।" বলিতে বলিতে তাঁহাদের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল পরম পরিতৃপ্তি। স্বামীজী কিন্তু গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন: "Religion, of course, is a journey; but it is never a journey from Calcutta to Kedarnath. It is a journey from Brute-man to Buddha-man." (ধর্ম অবশ্যই একটি যাত্রা, কিন্তু সেই যাত্রা কলকাতা হইতে কেদারনাথ যাত্রা নহে, সেই যাত্রা হইল পশু-মানব হইতে বুদ্ধ-মানবে যাত্রা।)

এই পশু-মানব হইতে বুদ্ধ-মানব হওয়াই হইল ধর্মের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোকেই শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা হইয়াছে মোক্ষপ্রাপ্তি। মোক্ষ বলিতে বুঝায় যাহা অপেক্ষা উচ্চতর অথবা শ্রেয়স্কর অপর কিছু প্রাপ্তির নাই। তাই মোক্ষকে বলা হয় নিঃশ্রেয়স। মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বহু দার্শনিক আলোচনা রহিয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে যাইতে চাহিতেছি না। তবে দার্শনিক আলোচনায় যাহাই সাব্যস্ত হউক না কেন, মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের সারকথা ঐ 'হওয়া'। বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য হওয়া।

ধর্মের প্রাচীনতম সংজ্ঞাটি দিয়াছেন সম্ভবতঃ বৈশেষিক-সূত্র প্রণেতা মহর্ষি কণাদ। বৈশেষিক-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে কণাদ লিখিতেছেন: "অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।"—এখন ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ॥"—যাহা হইতে (মানুষের) অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাহাই ধর্ম।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় কণাদের সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম 'অভ্যুদয়' অর্থাৎ জাগতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির যেমন হেতু, তেমনই পারমার্থিক ক্ষেত্রে 'নিঃশ্রেয়স' বা পরম কল্যাণেরও সোপান। অর্থাৎ ধর্ম শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য বিকাশ বা 'হওয়া'র জন্যই প্রেরণা যোগায় না, মানুষকে জীবন-সংগ্রামে সম্মুখীন ও তাহাতে জয়ী হইতেও প্রেরণা যোগায়। কিভাবে মানুষের 'অভ্যুদয়ে' ধর্ম তাহার ভূমিকা পালন করে? ধর্ম মানুষকে বলে, 'যাহার হেথায় আছে, তাহার হোথায় আছে'। অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। সেখানে আলস্যের কোন ক্ষমা নাই, ফাঁকির কোন স্থান নাই। ধর্ম কখনও মানুষকে বলে না তুমি অনাহারে থাক, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান কর। ঈশ্বরের জন্য কেহ স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রতা করিতে চাহিলে করুক, কিন্তু সংসারী মানুষকে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া তাহার জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। ইহা ধর্মের অভিপ্রেত। তবে জীবনযাত্রার মান (standard of life) উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জীবনের মানও (quality of life) উন্নত হয় ধর্ম তাহাই চাহে। উভয় 'মান' যখন সমৃদ্ধ হয় তখনই, ধর্মের মতে, মানুষের বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটে।

কিন্তু ধর্মের প্রেরণা অগ্রসর হইবার জন্য। সুতরাং তাহারও পরে ধর্মের ভূমিকা থাকিয়া যায়। তাহা হইল 'একত্বের অনুসন্ধান' বা 'একত্বের উপলব্ধি'। ইহারই নাম সত্য-উপলব্ধি। আর ইহাতেই ধর্মের সমাপ্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আমি কিভাবে এসেছি

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ

ভাষান্তর: গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ছবিটি সম্বন্ধে দু-চার কথা দিয়ে আরম্ভ করছি, যাতে আমরা একটু আভাস পাব ছবিটি কিসের পরিচায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণের চারটি প্রতিকৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তিনটি ছবি তোলা হয়েছিল এবং সেগুলির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। একটি হলো বসে থাকা অবস্থায়, দক্ষিণেশ্বরে তোলা। দ্বিতীয়টি একটি স্টুডিওতে তোলা (কিভাবে ফটোগ্রাফ তোলা হয় দেখার কৌতূহল হওয়ায় তাঁকে স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ছবি তোলার জন্য নয়); এই ছবিটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ডান হাতটি একটি থামের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তৃতীয়টি ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে তোলা। এই সবগুলি ছবিতেই কিন্তু তিনি গভীরতম সমাধিতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন। চতুর্থ আর একটি ছবিও আছে, যেটি তাঁর মহাসমাধি লাভের পরে তোলা হয়েছিল, কিন্তু সেটি সর্বসমক্ষে প্রচারিত নয়।

মানুষী তনুতে ভগবানের একমাত্র ইতিহাসভিত্তিক প্রতিকৃতি

এই তিনটি ছবি—সাধারণতঃ ছবি বলতে আমরা যা বুঝি, তা কিন্তু নয়। প্রতিকৃতিশিল্প বা ফটোগ্রাফির ইতিহাসে এগুলি অভূতপূর্ব, মানবসমাজের অধ্যাত্মজীবনে অনন্য এবং এমন এক ঘটনা যা সমস্ত মানবের লিপিবদ্ধ ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। তা হলো এই যে, এই ছবি তিনটি এমন একজন মানুষের, যিনি পূর্ণ ও সমগ্ররূপে ঈশ্বর-চেতনায় নিমজ্জিত এবং দেহ-মন-ইন্দ্রিয় ও বাহ্য জগতের সমস্ত চেতনার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই ছবিগুলি এমন একজন মানুষের এমন অবস্থার যখন তিনি শুধু ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে একীভূতই নন, বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নন অথবা আমরা বলতে পারি তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হয়েছিলেন। সুতরাং আমরা যদি ঈশ্বরের মানব-মূর্তির কোন ধারণা করতে চাই, তা হলে এটিই একমাত্র ইতিহাসসম্মত বাস্তব মূর্তি। যা আর কখনো পাওয়া যায়নি। এই ছবিটি তাই বাস্তবে কোন মানুষের ছবি নয়। এ হলো এমন এক মানুষের ছবি, যাঁর ছবি তোলার সময় সর্বার্থেই যিনি ছিলেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নন। এটি তাই ঈশ্বরেরই একমাত্র ঐতিহাসিক মানবিক প্রতিকৃতি।

তাই আমরা যদি ঈশ্বরকে মানুষের মূর্তিতে ধ্যান করতে চাই, তা হলে সে-অর্থে এইটিই ঈশ্বরের একমাত্র ইতিহাসভিত্তিক রূপ যা মানবসমাজ এপর্যন্ত পেয়েছে। সেই কারণেই আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, যখনই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিতে ভগবানের ধ্যান করি তখন বস্তুতঃ আমরা একমাত্র সাক্ষাৎ ভগবানকেই ধ্যান করে থাকি।

অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে একই পরম তত্ত্বের নানা ঈশ্বরীয় বিভাব

প্রথম ছবিটি মনুষ্যবর্গকে সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে দেয় শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনের সঙ্গে—তাঁর তীব্র অধ্যাত্ম-সাধনা, অনুভূতি ও উপদেশের সঙ্গে। এই ছবি মানবকুলকে মনে করিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে চোখের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতারূপে ঈশ্বরকে পূজা করেছিলেন ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন। কেমন করেই বা তিনি বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাত্মক আবার বিশ্বাতীত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইত্যাদি অনন্ত বিভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা ও উপলব্ধি করেছিলেন। এইসব বিভিন্ন অধ্যাত্মসাধনার অনুষ্ঠান তিনি

করেছিলেন সেইসব অধ্যাত্ম গুরুদেরই নির্দেশে ও পরিচালনে যাঁরা ঠিক সেই সেই ধারা ধরেই নিজেরা সাধন করে ঈশ্বরকে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশেষে অবশ্য এই প্রত্যেকটি স্তরে অধ্যাত্ম উপলব্ধিগুলি তাঁকে ঈশ্বরের এক-একটি বিশিষ্ট বিভাবের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। শেষে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিল এক অখণ্ড অদ্বয় পরম সত্তার উপলব্ধিতে। এই চরম ও পরম উপলব্ধির ফলে তিনি জেনেছিলেন যে, ঈশ্বরের এই বিভিন্ন বিভাবগুলি সেই এক অখণ্ড অদ্বয় পরম সত্তারই অনুভূতির বিভিন্ন স্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যত মত তত পথ

এই ছবি আমাদের সামনে প্রমূর্ত করে তোলে শ্রীরামকৃষ্ণের নানা অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধিকে, যা মানবকুলকে সক্ষম ও সমর্থ করে প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে অধ্যাত্ম-পথে এগিয়ে যেতে, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈতের সাধনধারার অনুবর্তনে এবং এইভাবে প্রত্যেকে আপন বিশিষ্ট ধারায় নিজের নির্বাচিত আদর্শকে উপলব্ধি করে যাতে কৃতার্থ হতে পারে, তারই প্রেরণা দেয়।

ধর্মমতগুলি একত্বেরই নানা অভিব্যক্তি মাত্র

এই ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের নানা অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধিকে প্রমূর্ত করে মানবকুলকে জানতে, বুঝতে ও সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রে গাঁথতে সাহায্য করে যে, নানা ধর্মমতগুলি যা পরস্পরবিরোধী ও বিপরীতধর্মী বলে বোধ হয়, আসলে কিন্তু তারা তা নয়। বাস্তবে বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একত্বরূপী যথার্থ ধর্মেরই নানা বিভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে রূপায়িত ও প্রতিবিম্বিত করে মাত্র। ধর্ম তাই প্রকৃতিতে এক, কিন্তু আকৃতিতে বিভিন্ন এবং আকৃতিগত এই বিভিন্নতার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, যাতে বিভিন্ন রুচির অধ্যাত্ম-পথিকেরা তাদের ক্রমিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যার যেটি অনুকূল, সেইটি অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে পারে। এই আকৃতিগুলি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভিন্ন, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভিন্ন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও ভিন্ন হতে বাধ্য; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানসিক গঠন, রুচি, প্রবৃত্তি, সহজাত সামর্থ্য পৃথক পৃথক এবং তদনুসারেই ধর্মের আকৃতির এত রকম বৈচিত্র্য, যদিও স্বরূপে, প্রকৃতিতে তার সর্বত্র সর্বদা পরম ঐক্য অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত।

ধর্মমতসমূহের ঐক্য ও সাম্যের পরম জীবন্ত সাক্ষ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে যে-ঐক্য ও সাম্য উপলব্ধি করেছিলেন তারই প্রতীক এই ছবি। সেই কারণেই এই ছবিটি ঐ ঐক্য ও সাম্যের জীবন্ত সাক্ষ্য, যার মাধ্যমে মানবকুল বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু এইভাবে তাঁর উপলব্ধি ও উপদেশের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব তার বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে সৌভ্রাত্রের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বজনীন শান্তি ও প্রগতিকে প্রবর্তিত করতে পারে।

যোগসমূহের সমন্বয়

এই ছবির মাধ্যমে এটিও উদ্ঘাটিত যে, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সবগুলিরই চরম পরাকাষ্ঠায় এক আশ্চর্য সমন্বয়ের অনন্য ব্যক্তিত্ব মানবজাতির মধ্যে কখনো আবির্ভূত বা প্রকটিত হয়নি যেমন হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। এবং এমনই এক নিখুঁত চরিত্রের সংগঠনই এ-যুগের লক্ষ্য এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে শুধু তারই জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অনন্ত বিভাবযুক্ত ভগবানকে সান্ত ও সঙ্কীর্ণ করা ভগবানকে অস্বীকার করারই নামান্তর

এই ছবি সুদৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন ঈশ্বরের অনন্ত বিভাবকে সীমার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে। ঈশ্বরের অনন্ত বিভাবকে সান্ত-সীমিত করা অধার্মিকতার বা নাস্তিকতারই নামান্তর—এ-যুগের পক্ষে এই শিক্ষা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

ব্যাপকতা ও গভীরতার সহাবস্থান

এই ছবি মানুষের কাছে প্রকাশ করে তুলে ধরে যে, সমাজে ব্যাপকতা ও গভীরতা একসঙ্গেই থাকতে

পারে। একটি সঙ্কীর্ণ সমাজে দেখা যায় আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা ও তীব্রতা। আবার উদারভাবাপন্ন সমাজে দেখা যায় যে, ভাবের ব্যাপ্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গভীরতা ও তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রামকৃষ্ণমূর্তির মধ্যে যেসব ভাবধারার সম্মিলন ঘটেছে, তারা সাগর থেকেও গভীরতর আবার আকাশ থেকেও ব্যাপকতর, ইতিহাসের সব দলিলকেই তা যেন ছাপিয়ে গিয়েছে, কারণ কোথাও আর এর নিদর্শন মেলেনি আজ পর্যন্ত। এটি এই প্রমাণ করে যে, মাত্র একটি ব্যক্তির মধ্যে যদি ব্যাপকতা, উদারতা, গভীরতা চরম মাত্রায় একসঙ্গেই থাকতে পারে যা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকট হয়েছিল তবে এরই আদলে সমাজকেও গড়ে তোলা যায়, কারণ সমাজ হলো ব্যষ্টিরই সমষ্টি বা সম্মিলিত রূপ।

বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক প্রতীক

এই ছবিটিকে সেইজন্য কোন সাধু-সন্ত বা বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমতের উদ্গাতা বা প্রবক্তার ছবি বলে ধারণা করা উচিত হবে না। এটি হলো বাস্তবে ঐতিহাসিক মানবীয় মূর্তিতে সেই এক পরম অব্যক্ত অমূর্ত আত্মার অনন্ত বিভাবেরই প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষই সমর্থ হবে তার নিজস্ব বিশিষ্ট রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে আপন দৈব সত্তাকে উপলব্ধি করতে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন আগামী দিনের বহু বৈচিত্র্যময় এক অখণ্ড বিশ্বসমাজের জন্য আবির্ভূত একমাত্র ঐতিহাসিক আদর্শ মানবমূর্তি।

প্রকৃত তাৎপর্য

অতএব, এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য এবং এই কারণেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি মন্দিরে এই মূর্তিটিরই পূজা করা হয় এবং সম্প্রদায় ও মতবাদ নির্বিশেষে যেকোন পূজোর স্থানেও এটি অর্চিত ও পূজিত হতে পারে। তা হলেই তাঁর নিজের উক্তির যথার্থ সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে: "কালে এই ছবির প্রতি ঘরে ঘরে পূজা হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের ব্রতীকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি ব্রতী করলেন সমগ্র মানবকুলে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য। শেষের দিকে একদিন একটি কাগজের টুকরোয় তিনি স্বহস্তে লিখলেন: "নরেন শিক্ষে দিবে। যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে।" তেমনি আর একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি তাঁর পাশে ডাকলেন এবং এক আশ্চর্য ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার সর্বকিছু উপলব্ধির পরম সম্পদ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিলেন। এইভাবে শক্তিসঞ্চার করে তাঁর ওপর দায়িত্ব দিলেন পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দান করে সফল করতে। এই ঘটনার সময় তাঁর নিজের কণ্ঠের উক্তি ছিল এইরূপ: "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।"

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় এলেন তখন থেকেই আরম্ভ হলো তাঁর অধ্যাত্ম উপদেশদান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারে তিনি ব্রতী হলেন। আধুনিক মানুষ এবং আধুনিক কালের উপযোগী করে আধুনিক ভাষার মোড়কে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশই তাই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মূলসূত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রামাণিক ভাষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের মূল শিক্ষা

জীবনই হলো সাক্ষাৎ ঈশ্বর-উপলব্ধি। তাই তাঁর শিক্ষা হলো: ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই এবং তাঁর মধ্যে সাকার-নিরাকার দুই-ই অন্তর্ভুক্ত। যেমন বাড়ির যিনি মালিক তিনি একজন হয়েও নানা সম্বন্ধের সূত্রে কারুর কাছে বাবা, কারুর কাছে ভাই, কারুর কাছে স্বামী। তেমনি সেই একই ঈশ্বরকে যে বিশিষ্ট ব্যক্তি যে বিশিষ্ট ভাব নিয়ে দেখে বা উপলব্ধি করে সেই অনুসারেই তাঁকে নানা নামে, নানা রূপে ডাকা হয় বা বলা হয়। তিনি সেই গিরগিটির মতো, যাকে কখনো দেখায়

লাল, কখনো বা সবুজ, কখনো বা হলদে, কখনো বা নীল, আবার কখনো যেন কোন রঙই তার নেই। ঈশ্বর তাই স্বরূপে ও স্বভাবে এক, কিন্তু অনেক বলে প্রতিভাত হন যখন যে-মানুষ যে-ভাব নিয়ে তাঁকে দেখে বা উপলব্ধি করে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত

শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দকে করে তোলে সেই কর্মযোগের পরম প্রচারক, যা কিনা জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই বরং এ-দুয়েরই চরম অভিব্যক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিকে ভিত্তি করেই তাঁর এই মতাদর্শ গড়ে তুলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে অদ্বৈততত্ত্বের গভীরতম মৌল অর্থ উদ্ঘাটন করে দিয়ে যেন এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন, যার মধ্যে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত একই আন্তর বিকাশের তিনটি স্তর বা ভূমি, যাদের চরম লক্ষ্য হলো পূর্ণ অখণ্ড অদ্বৈত।

পারমার্থিক ও জাগতিকে কোন ভেদ নেই

দৃষ্টির এই উন্মীলন স্বামী বিবেকানন্দের চোখের সামনে যেন তুলে ধরল অনন্তপথগামী সমগ্র মনুষ্যকুলের লক্ষ্যস্থল সেই এক অদ্বয় পরম ও চরম স্বরূপের অসীম দৃশ্যপট, যাতে তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পেলেন সংজাত রুচি ও অধিকারভেদে ঋজু কুটিল নানা পথ অবলম্বনে তারা সেই একই চৈতন্যসাগরে এসে মিলিত হয়ে একত্ব লাভ করছে। এইটিই হয়ে দাঁড়াল তাঁর এই অপরূপ মতাদর্শের ভিত্তিভূমি যা নানা হয়েও স্বরূপে ও সত্তায় বিভিন্ন নয়; শুধু বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে সেই এককেই মনের দেখার ভেদ মাত্র। নানা এবং এক যেহেতু একই সত্তা, সেই কারণেই কেবল একটি রূপ, একটি রীতি বা একটি মাধ্যমই নয়, সমানভাবে সব রূপ, সব পদ্ধতি, সব মাধ্যমই সেই একের উপলব্ধির পথ। শুধু উপাসনা-পদ্ধতিই বা বলি কেন, সমস্ত রকমের কর্মধারা, সমস্ত জীবনসংগ্রামের প্রকারবৈচিত্র্য, সমস্ত রকমের সৃষ্টির বিচিত্র অভিব্যক্তি সবই সেই একের উপলব্ধির রাজমার্গ। সেই কারণেই 'পারমার্থিক' এবং 'জাগতিক' এ-দুইয়ের কোন ভেদ নেই। যেমন ভেদ নেই মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায়। যেকোন প্রয়াস বা প্রচেষ্টাই তাই প্রার্থনা। জয়ী হওয়া মানেই ত্যাগ করা। অধিকারগ্রহণ ও তার যথাযথ সংরক্ষণ তেমনি কঠোর বিশ্বস্ত দায়িত্ব, যেমন সব কিছু ত্যাগ ও পরিহার করা। সমগ্র জীবনই হলো ধর্ম। ক্ষেতখামার বা ধানের গোলা, কারখানা, শিক্ষাকেন্দ্র, কলাকেন্দ্র, ও সন্ন্যাসীর গুহা বা মন্দিরের দুয়ারের মতোই সমানভাবে মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ও যথার্থ ক্ষেত্র। কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম সেই এক সত্যেরই ত্রিবিধ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। (ভগিনী নিবেদিতা এইভাবেই তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।)

প্রতিটি জীবই শিব

স্বামী বিবেকানন্দের এই অনন্য স্বকীয় শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে তাঁর আর একটি গভীর বাণী—মানুষের দেবত্ব, জীবের শিবত্ব—যা হলো সব ধর্মের সার। প্রতিটি মানুষই দেবতা, প্রতিটি জীবই শিব, সে ঈশ্বর। মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত এই মানবাত্মা; আসলে কিন্তু সে সূর্যই। মানুষে মানুষে যে আপাত ভেদ তা শুধু এই মেঘের নানা স্তরের ঘনত্বেরই দরুণ ভেদ। ভেদটা শুধু অভিব্যক্তির নানা স্তরেরই ভেদ, স্বরূপগত ভেদ নয়, ভেদ শুধু মাত্রাগত। এই সনাতন সত্যই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সব ধর্মেরই ভিত্তি এবং সমগ্র মানব-ইতিহাসের বিকাশের—তা সে স্থূলে জাগতিক বা সূক্ষ্মে মানসিক অথবা পরম আধ্যাত্মিক, যে-বিকাশই হোক না কেন তার একমাত্র ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য। সেই এক পরম ব্যাপক চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নিজেকে নানা ভূমিতে, নানা স্তরে প্রকাশ করে চলেছেন।

নব যুগের উদ্গাতা ও মানুষের দেবত্বের প্রবক্তা

স্বামী বিবেকানন্দের এই শিক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে এক অভিনব তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন দেখি এই শিক্ষা শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্রই নয়, অধিকন্তু অতীত ও ভবিষ্যতেরও মধ্যবিন্দু। তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র জীবনই ধর্ম এবং প্রতিটি জীবই শিব। তাই তিনি হয়ে ওঠেন নব যুগের উদ্গাতা এবং মানুষের দেবত্বের দূত, যিনি সকলকে এই পরম প্রয়োজনটি সম্বন্ধে সচেতন করে দেন যে, জীবনের প্রতি গতিভঙ্গিমায় দেবত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তিনি মানবকুলের কাছে ঘোষণা করলেন যে, যতকাল তিনি এই পৃথিবীর বুকে বিরাজিত থাকবেন এই বাণীকেই প্রচার করে যাবেন এবং যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন তখনও তিনি অলক্ষ্যে থেকে এই একই বাণী প্রচার করতে থাকবেন, যতদিন না পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করবে। স্বরূপতঃ এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের চরম ও পরম বাণী এবং বেদান্তের সার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতি দর্শনে প্রথম অনুভূতি

এখন আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই আমি কেমন করে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের উপবিষ্ট ভঙ্গিমার এই ছবিটি দেখি। আমার যতদূর মনে পড়ে আমি এটি প্রথমে দেখি আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উদ্বোধন পত্রিকায়, যেটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মুখপত্র। আমার তখন কোন জ্ঞান বা ধারণাই ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণ কে, কিন্তু তাঁর এই ছবিটি আমার কাছে এমন মনোমুগ্ধকর মনে হলো যে, আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন উপলব্ধি করলাম যে, তিনিই আমার হৃদয়দেবতা। আমার অজ্ঞাতসারে আমি এত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে গেলাম যে, সেই দিন থেকে এই মূর্তিটি আমার মানসপটে চিরদিনের মতো মুদ্রিত হয়ে রয়ে গেল। তখন থেকেই আমি বুঝেছি যে, তিনিই আমার জীবনসর্বস্ব এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার হৃদয়মন্দিরে এক শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন দেব-দেবীই স্থান লাভ করেননি। আমি সংস্কারবশেই তাঁকে আমার বরণীয় আদর্শ এবং আমার নিত্য ধ্যান ও উপাসনার একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছিলাম। তাঁর ঐ ছবিটি সেই প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন থেকেই আমার জীবন তাঁর শ্রীচরণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে।

বেলুড় মঠে প্রথম আসা—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে

এইটুকু ভূমিকা করে এখন আপনাদের জানাতে চাই আমি কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (বেলুড় মঠ) ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের সংস্পর্শে এলাম এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণে এসে উপনীত হলাম। পূর্বেই বলেছি, আমি স্বভাবতই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য ক্রমে ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলাম এবং শেষে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে একদিন পঞ্জিকাতে দেখতে পেলাম যে, সেই বছরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব বেলুড় মঠে পালন করা হবে ১ মার্চ রবিবার। আমি তখন বেলুড় মঠে গিয়ে ঐ উৎসব দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমাদের বাড়ি ছিল অনেক দূরে—অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় এক গণ্ডগ্রামে। বেলুড় মঠ থেকে তা সত্যিই বহু দূরে। যেতে হতো প্রথম পদব্রজে স্থলপথে প্রায় দশ-বারো মাইল, পরে স্টীমারে, শেষে রেলে কলকাতা—তারপর গঙ্গা পার হয়ে তবে বেলুড় মঠ।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি আমার জন্ম। সুতরাং আমার বয়স তখন মাত্র পনের বছর। গ্রামেরই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে তখন পড়ি এবং তার আগে গ্রামের বাইরে কোথাও যাইনি। তবুও আমারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবার ব্যবস্থা করলাম। যেহেতু জায়গাটি আমাদের কাছে একান্ত অপরিচিত ও নতুন, সেই কারণে আমাদের এক বন্ধুকে চিঠি লিখলাম, যে মঠের অদূরে সালকিয়ায় থাকত। যখন আমরা কলকাতায় রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালাম, তখন আমাদের বন্ধুটি আমাদের নিতে এসেছিল এবং তাদের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল। পরের রবিবার ছিল উৎসব-অনুষ্ঠান। আমরা ঠিক করলাম আগের দিন শনিবার সন্ধ্যার দিকে একবার

কিছুক্ষণের জন্য বেলুড় মঠ ঘুরে আসব। সেইমতো আমার আত্মীয়, সেই বন্ধুটি এবং আমি বেলুড় মঠে গেলাম। মঠ ওদের বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। মঠের দক্ষিণ দিকের প্রধান ফটক পেরোতেই দেখলাম বিবেকানন্দ মন্দিরের কাছে একজন গেরুয়াধারী প্রবীণ সাধু বসে আছেন, পরে জানতে পারি তিনি স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ। সেসময় এই মন্দিরটি এখন আমরা যেরকম দেখি তা কিন্তু ছিল না। তখন এটি ছোট সমাধিপীঠের মতো ছিল, যার ভিতরে এখন যে স্বামীজীর মার্বেলে খোদাই করা ধ্যানাবিষ্ট মূর্তিটি দেখা যায়, সেইটি মাত্র ছিল। এর অনেক পরে মন্দিরটির আর সব সংযোজন করে বড় করা হয়। আমরা সাধুটির কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথা থেকে আসছি। আমি তখন তাঁকে বললাম যে, ঢাকা জেলার যোলোঘর নামক গ্রাম থেকে আমি আসছি এবং আরও জানালাম যে, আমি কেবলমাত্র মঠটি দেখতে ও উৎসবে যোগ দেবার জন্যই এসেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি উৎসবে অংশ নিতে রাজি আছি কিনা এবং স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পরের দিনের উৎসবের প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি কিনা। মঠে প্রবেশ করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উৎসবে সাক্ষাৎ অংশগ্রহণের এই প্রস্তাবটুকুই আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন ছাপিয়ে গেল এবং আমার জীবনের স্বপ্নকে অনেকটা সফল করে দিল। আসলে এটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়েরই আহ্বান, যাঁরা আমার চিরদিনের আশ্রয়। তাঁদের চরণে এটি ছিল আমার চলে আসার নির্দেশ। আমার সমস্ত সত্তা শিহরিত হয়ে উঠল এবং তাঁর এই প্রস্তাবে আমি যেন লাফিয়ে উঠলাম। জ্ঞান মহারাজ আমাকে তখনই কাজ আরম্ভ করতে বললেন। আমার আত্মীয় ও বন্ধুটি মঠ থেকে বিদায় নিয়ে সালকিয়া ফিরে গেল, পরের দিন আবার আসবে বলে। আমি মঠে রয়ে গেলাম।

বেলুড় মঠে প্রথম আসার দিনে পাওয়া প্রথম কাজের ভার

বেলুড় মঠে আসার এদিনটি সত্যিই আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়। সেদিন ছিল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। মঠে আসার প্রথম দিনের সেই স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে চিরদিনের মতো আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। অবশ্য আমি তখন মঠ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। জায়গাটি বিরাট বিস্তৃত কিন্তু পরের দিন ভক্তদের যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে তা প্রস্তুত করার এবং রাখার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি ছিল গেটের কাছেই। এই ঘরের নানা নির্দিষ্ট কাজে সাহায্য করার জন্যই আমাকে ভার দেওয়া হলো। একদল লোক তখন এই কাজই করছিল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সেই দলে ভিড়ে গেলাম ও কাজ আরম্ভ করে দিলাম। সারা রাতই কেটে গেল খিচুড়ি, তরকারি ও মিষ্টি তৈরি করতে এবং ভালোমতো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে, যাতে সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণ করতে সুবিধা হয়। আমি তখনো জানি না কোথায় মন্দির এবং অন্য সব জায়গাই বা কোথায়। যা হোক, আমার ওপর যে কাজটুকুর ভার দেওয়া হয়েছিল তা ভালভাবে শেষ হওয়াতে আমার অপার আনন্দ হলো। আমার আনন্দের যেন সীমা রইল না।

এইভাবে বেলুড় মঠে আসার একেবারে প্রথম দিনেই সবচেয়ে প্রথম যে-দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হলো তা আমাকে একেবারে বাস্তবে সেই প্রাথমিক শিক্ষা দান করল, যা আমার সারা জীবনের চরম ও পরম শিক্ষা। সে-শিক্ষা হলো: সেবা, যা কিনা অধ্যাত্মসাধনার সারসর্বস্ব, জীবনের পরিপূর্ণতার যা একাধারে উপায়ও বটে, লক্ষ্যও বটে। প্রণাম জানাই তাই বেলুড় মঠকে।

স্বপ্ন-সফলের চরম দিন

অবশেষে প্রভাত হলো। এল সেই দিন—যেটি আমার স্বপ্নের সেই পরম দিন—রবিবার, ১ মার্চ, ১৯১৪।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। একটি ছোট্ট ঘটনা চোখে পড়ল—ছোট্ট অথচ প্রচণ্ড তার প্রভাব পড়ল আমার কিশোর মনে। এটি ছিল আমার কাছে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যে, কেমন করে সেবার মনোভাব মানুষের কর্মকে ভগবানের পূজায় রূপান্তরিত করে থাকে।

তখনকার দিনের প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজারের একজন প্রতিষ্ঠাতা, মাখন সেন ছিলেন সমগ্র উৎসবের নানা অনুষ্ঠানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অতি প্রত্যূষেই তখন স্বেচ্ছাসেবকদের পূর্ব-নির্দিষ্ট উৎসবের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ার সময় এসে গিয়েছে। কিন্তু যখন মাখন সেন স্বেচ্ছা-সেবকদের আপন আপন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই সময় একজন প্রবীণ মানুষ হঠাৎ তাঁর সামনে এসে তাঁকে কিছু কাজ দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মাখন সেন তাঁকে তখন বললেন যে, কাজের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছা-সেবকদের ইতিমধ্যে নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে এবং আর কোন লোকের দরকার হবে না। তবু সেই ভদ্রলোক এত বিনীতভাবে তাঁকে কিছু কাজ দেবার সুযোগ ভিক্ষা করতে লাগলেন যে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে মুগ্ধ হয়ে মাখনবাবু তাঁকে বললেন: "আচ্ছা, আপনার যখন এত আগ্রহ তখন আপনাকে আমি একটিমাত্র কাজই দিতে পারি এবং তা হলো যেখানে সবলোক জাতিধর্মনির্বিশেষে একত্রে বসে খাবে, সেই জায়গাটি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা।" এর পরেই আমি যে দৃশ্যটি দেখলাম তা আমাকে সচকিত করল এবং অন্তরে গভীরভাবে স্পর্শ করল। যে-মুহূর্তে মাখন সেন তাঁকে এই অনুমতি দিলেন সেই মুহূর্তে ভদ্রলোক তাঁর দুহাত তুলে সোল্লাসে বলে উঠলেন: "খুব ভাল, খুব ভাল। চমৎকার, চমৎকার! ধন্য আমি, ধন্য আমি!" এই কটি কথা বলে তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন সেই দিকে, যেখানে তাঁকে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঠের সমগ্র পরিমন্ডলে যেন তখন পরম আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল এবং সেদিনের সেই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা আকারে যেন তা অভিব্যক্ত হচ্ছিল। সেবার মাধ্যমে উপাসনা বা পূজার ভাবটি সেই ভদ্রলোকের মনটিকে যেন গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল এবং সেদিন তাঁকে সেই সেবার কাজের দিকে তাঁকে পরিচালিত করেছিল। তিয়াত্তর বছর পরে আজ আমি সেই কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঠিক ততখানিই পুলকিত হয়ে উঠছি যতখানি বহুকাল পূর্বে সেদিন হয়েছিলাম।

সমুজ্জ্বল সেই প্রভাতে উৎসব সুরু হলো। আমার মনে হতে লাগল আমি যেন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি। একটি বিশাল মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুবৃহৎ তৈলচিত্র অতি সুন্দর করে লতা-পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। দলে দলে লোক এসে জড়ো হচ্ছে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রাঙ্গণটিই অসংখ্য লোকসমাগমে পূর্ণ হয়ে গেল। ঐ বিশাল সমাবেশ তখন যেন এক অখণ্ড ঘনীভূত মূর্তি হয়ে দাঁড়াল। তারই মধ্যে চলছিল নানারকমের সঙ্গীত পরিবেশন, কথকতা, সুমিষ্ট পানীয় বিতরণ ইত্যাদি অনেক কিছু। এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং সব মানুষই পরম আনন্দে যেন আত্মহারা। চরমতম অধ্যাত্ম সম্প্রীতির সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য যথার্থই সেদিন যেন ফুটে উঠেছিল।

সর্বশ্রেণীর হাজারো মানুষের একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ

আনন্দে বিভোর এক বালকের মতো আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর আমার চোখে এমন একটি দৃশ্য এসে পড়ল, যা এর আগে কখনো দেখিনি আমার জীবনে। উচ্চ-নীচ, পতিত-অধম সমস্ত শ্রেণীর হাজার হাজার লোক সব একসঙ্গে বসেছে ও প্রসাদ গ্রহণ করছে। মনে হলো এইসব মানুষের মন থেকে ভেদ-বিভেদের সমস্ত বোধ যেন চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও উপদেশে উদ্ভাসিত মানুষের অধ্যাত্ম ঐক্য-চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে কত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে সবরকম জাতিধর্মের সামাজিক ভেদ-বিভেদ আপনি অপসারিত হয়ে যায়, এই দৃশ্যটি যেন তারই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে সেদিন ফুটে উঠেছিল।

মঠবাড়ি, শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির এবং আম্রবৃক্ষ

যাকিছু ঘটছে তাই দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন মনে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আমি শেষে এসে পড়লাম একেবারে মঠবাড়িরই চত্বরে আমগাছটির কাছে। আমগাছটির পূর্বদিকে মঠবাড়ি, তার পূর্বদিকে সামনে দিয়েই উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে বয়ে চলেছে গঙ্গা। এই বাড়িটিতেই বাস করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইরা তখন এখানেই বাস করছেন। তখন এইটিই প্রধান বাড়ি ছিল বলে রান্না ও খাওয়া ছাড়া অন্য সব কাজের জন্যও এই বাড়িটি নির্দিষ্ট ছিল। আমগাছটির উত্তরদিকে একটি দোতলা বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির দোতলায় এবং একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার দালান ইত্যাদি। যখন আমি ঐ জায়গাটিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম, তখন অবশ্য এসব বাড়িগুলির সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না।

আন্দুলের কালীকীর্তন

আমগাছের তলায় দেখলাম একদল দীর্ঘ জটাজুটধারী গায়ক মা-কালীর মহিমা কীর্তন করছেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম তাঁরাও সন্ন্যাসীই হবেন, কিন্তু পরে জানলাম তাঁরা তা নন। তাঁরা শুধু সাধুর বেশধারী মাত্র। যে গানগুলি তাঁরা গাইছিলেন সেগুলি বিভিন্ন সময়ের বাংলাদেশের নানা সাধকের রচনা এবং যখন দলবেঁধে এগুলি গাওয়া হয়, তখন তাকে 'কালীকীর্তন' বলে। ঈশ্বরকে জগজ্জননী ভগবতীরূপে যে-অধ্যাত্ম উপলব্ধি, এইসব গানে সেই পরম সত্যই বিধৃত হয়ে আছে। এই গানগুলি পরম্পরাগত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতিতে গাওয়া হচ্ছিল। আন্দুল নামক একটি গ্রামের একটি দল বিশেষ একটি রীতি বা ধারা অনুশীলন করে গানগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছিল। তাই এর নামই হয়ে গিয়েছিল 'আন্দুলের কালীকীর্তন'। আজও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর সেই আমগাছের তলায় আন্দুলের সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা কালীকীর্তন করে থাকেন।

প্রসাদ গ্রহণের কথা ভুলে যাওয়া

ভোর থেকেই আমি এত কাজে ডুবে গিয়েছিলাম এবং উৎসবের নানা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আনন্দে এত বিভোর ছিলাম যে, প্রসাদগ্রহণের কথা চিন্তা করারও আমার অবসর ছিল না। যদিও প্রত্যেক ভক্তের পক্ষেই প্রসাদগ্রহণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাই যখন আমি আমার এই মহা ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হলাম এবং যা হোক সামান্য একটু প্রসাদ আমাকে গ্রহণ করতেই হবে মনে করলাম, তখন যে-ভাঁড়ারে আমি সারারাত স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেলাম ; কিন্তু গিয়ে দেখলাম সব ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা হোক, আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি ভক্তের দেখা পেলাম, যিনি তাঁর বাড়ির জন্য কিছু প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার থেকে আমাকে সামান্য একটুখানি দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম এবং তিনি সানন্দেই তা দিলেন। আমার তখন পরম আনন্দ এবং প্রসাদটুকু পেয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আমার বহুদিনের ইচ্ছা এইভাবে পূর্ণ হয়ে গেল ও হৃদয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি এনে দিল। মন আমার পরম সুখে সত্যিই ভরে গেল।

জ্ঞান মহারাজ

আগেই বলেছি বেলুড় মঠে এই আমার প্রথম আসা। এরকম এক স্থানে এর আগে আমি কখনো আসিনি এবং আজও সেই স্থান আমার কাছে সেইরকমই আছে, যার দ্বিতীয় আর কোথাও আমি খুঁজে পাইনি। এই সঙ্ঘের কোন সন্ন্যাসীকেই এর আগে আমি জানতাম না। আগেই উল্লেখ করেছি ঐ প্রথম দিন মঠের প্রধান ফটক পেরিয়েই যাঁর প্রথম দর্শন পেয়েছিলাম তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য জ্ঞান মহারাজ। তারপর তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তাঁর সঙ্গ আমার সেই অন্তরঙ্গতা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তেমনিই ছিল।

তিনি তরুণ বালকদের বড় ভালবাসতেন এবং

তাঁর প্রেরণায় ও নির্দেশে বহু তরুণ বালক ত্যাগ ও সেবার জীবন বরণ করে তাতেই আত্মোৎসর্গ করেছিল। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের একটি নিদর্শনের কথা বলিঃ আমি পরে তখন ঢাকায় কলেজে পড়ছি এবং ঐ কলেজেরই হোস্টেলগুলির মধ্যে একটিতে বাস করছি। সেই সময় জ্ঞান মহারাজ পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলি পরিদর্শনের জন্য এলেন। তাঁর কাছে এ ছিল, যেমন তিনি নিজে বলতেন, তীর্থদর্শন। যখন তিনি ঢাকায় এলেন, তখন সোজা আমাদের হোস্টেলে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর এই তীর্থদর্শনে আমাকে সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমার কাছে এটি একটি পরম আশীর্বাদ বলে মনে হলো এবং আমি মহা আনন্দে তাঁর সঙ্গী হলাম। জ্ঞান মহারাজ তাঁর সঙ্গে আমারই সমবয়স্ক গোবর্ধন নামে একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে তাঁর সেবায় এবার নিযুক্ত হলাম। পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ জায়গায় সবরকম যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য নৌকারই ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জ্ঞান মহারাজ তাই যেসব জায়গায় যাবেন স্থির করেছিলেন তার জন্য একটি নৌকা ভাড়া করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর দুই সেবককে নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে তাঁর এই পবিত্র তীর্থদর্শন সম্পূর্ণ করলেন। তিনি শিশুর মতো সরল ছিলেন এবং তরুণ বালকদের খুব তাড়াতাড়ি আপন ও ঘনিষ্ঠ করে নিতে পারতেন। যেখানেই তিনি যেতেন, কি প্রবীণ কি তরুণ, নির্বিশেষে সকলকে স্বামীজীর জীবনদায়িনী শিক্ষা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর জীবনের বিশেষ ব্রতই ছিল স্বামীজীর বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই কাজেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সেই আত্মোৎসর্গ অশেষ ফলপ্রসব করেছে। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেকগুলি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যেগুলি স্বামীজীর বাণীর প্রচার ও প্রসারে তাঁর আজীবন আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য হয়ে আছে।

অনুচিন্তন

প্রসঙ্গতঃ আপনাদের কাছে জানাতে চাই পরবর্তী কালে আমার কাছে উদ্ঘাটিত সেই তথ্যটি। তা হলো এইঃ আমার বর্ণিত এইসব ব্যাপারগুলির অন্তরালে কিছু ঘটেছিল, যা সেসময় আমার একান্ত অগোচর ও অদৃশ্যই রয়ে গিয়েছিল। সেই অপূর্ব অনন্য ঘটনাটি হলো এই যে, সেদিনের সেই উৎসবে শ্রীশ্রীমা আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন এবং সব অনুষ্ঠানগুলিই নিজে দেখেছিলেন। 'যিনিই ঠাকুর তিনিই আমি' শ্রীশ্রীমায়ের এই নিজ উক্তিকে অবলম্বন করে আবার এ-ও বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে অভিন্নাত্মতনু শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়ে স্বয়ংই উপস্থিত ছিলেন যেমন তাঁর জীবদ্দশায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে তিনি থাকতেন। আজও যখন আমি সেদিনের সেই ঘটনার কথা চিন্তা করি তখন আমার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে সেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ রবিবারের দিনটি—যে-দিনটিতে আমি সারা সময়টি কাটিয়েছিলাম আমার নিজেরই আপন অধ্যাত্মনিকেতনে—তাঁরই একান্ত সান্নিধ্যে ও স্নেহচ্ছায়ায়, যিনি একাধারে পিতা ও মাতারূপী আমার নিত্য চিরন্তন ঈশ্বর। আজও আমি মনে মনে ভাবি ও প্রত্যক্ষ করি যে, শ্রীশ্রীমা যেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট হয়ে আছেন—যেমন তিনি সাধারণতঃ এইসব উৎসব উপলক্ষে এসে বসতেন, এবং সেখানে বসে দেখছেন ও শুনছেন আমগাছের তলায় অনুষ্ঠিত কালী-কীর্তন। এবং আমিও কিনা প্রাণের টানে সেখানে এসে পড়েছি এবং দেখছি ও শুনে চলেছি সেই একই গান! আজ উপলব্ধি করি কি অপরিসীম আমার সৌভাগ্য যে, সেদিন বেলুড় মঠে তাঁর শ্রীচরণতলেই আমি ছিলাম, যদিও আমার জীবনের এই অসাধারণ ঘটনা সেদিন আমার সম্পূর্ণ অজানা ও অগোচরেই ছিল।*

[ক্রমশঃ]

* গত ১২ জুন ১৯৭৮ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত (পরবর্তী সময়ে পরিমার্জিত) ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক ঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধ্যান করবে না কেন? ধ্যান করবে—একটা বিষয় নিয়ে—যেন অনেকক্ষণ ধরে আরতি করছ, দীপ দিয়ে হয়ে গেল, ধূপ কর্পূর দিয়ে কর, চামর দিয়ে কর, যেন শেষ হতে না চায়। অনেকক্ষণ পরে যদি আর তাতে ভাল না লাগে, মনে কর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছ নানারকম ফুলের, নানা রঙের মালা পরাচ্ছ, নানারকম খাবার জিনিস নিবেদন করছ—এই রকম অবিচ্ছিন্ন ভাবনার ধারা—এই তো ধ্যান।

মনে তো ময়লা উড়ছেই, যেমন ঘরে ধুলো উড়ছে। ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, ঘর মুছে—সে ধুলো পরিষ্কার করতে হবে। কতক ভাব জোর করে, যেন ঝাঁট দিয়ে মন থেকে তাড়াতে হবে। কতক ভাব কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে সরাতে হবে—যেমন জল ছিটিয়ে দিলে সব ধুলো নেবে যায়। কেঁদে কেঁদে বলতে হয়—'প্রভু, কেন আমার মনে এভাব আসে—এভাব থাকলে তো তুমি আসবে না, আমার মন শুদ্ধ পবিত্র করে দাও। তুমি এসো, তুমি দেখা দাও।' এমনি করে কেঁদে কেঁদে বলবে। ঠাকুর আমাদের এইরকম শিখিয়েছিলেন।

রাত্রে জপ করতে চাও? ঘুম পায়? তো ঘুমুবে। খুব বেশি ইচ্ছে হলে উঠে পড়বে, জোরে জোরে পায়চারি করবে, বসে বসে যদি ঘুম পায় তো চলতে চলতে জপ করবে।

রাত্রে দুটি কম খেতে হয়। আর সর্বদা একটা প্রার্থনার ভাব, একটা উচ্চ চিন্তার স্রোত থাকা চাই। আর একটা ভাব থাকা চাই যে, আমাকে এই জীবনেই তাঁর দেখা পেতে হবে। তাঁকে ডেকে ডেকে ডাকার পালা শেষ করতে হবে—'মা গো, তোমায় কেমন করে ডাকি? আমায় এমন করে ডাকতে শেখাও যেন এক ডাকেতে শেষ হয়ে যায় মা, চীরজীবনের ডাকাডাকি'।

শিব গাঁজা খান, ভাঙ খান—লোকে এই সব বলে। সত্যি কি আর তিনি ঐসব খান? না—না। আর যদিই বা খান তো হয়েছে কি? যিনি সমুদ্রমন্থনের গরল খেতে পারেন, তাঁর কাছে এসব আর কি? অতি তুচ্ছ। কি জানো?—ঐ গরল খাওয়াটাকে symbolise (প্রতীক) করেছে ধুতুরা ভাঙ খাইয়ে।

দীক্ষা আর কি দিই? যে যাকে চায়, তাকে তার কাছে দিই। যে মাকে চায় তাকে মা দেখিয়ে দিই, যারা বাবাকে চায় তাদের বাবা দিই। ঠাকুর বাবা—আবার ঠাকুরই মা, এই তো দীক্ষা।

সাধুসঙ্গ খুব দরকার। আমরা কি কম সাধুসঙ্গ করেছি? যেখানে যখন সুবিধা পেয়েছি—করেছি। সাধুসঙ্গ না হলে কি কিছু হয়? 'তুলসী ইয়ে জগমে পাঁচো রতন হৈ সার। সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার।' স্বামীজী বলতেন—'সাধুসঙ্গ থেকেই হরিকথা, ভগবানের কথা, দয়া, দীনতা, উপকার, সব। সাধুসঙ্গ থেকেই সব। সাধুসঙ্গ থেকেই প্রথম ধর্মভাব জাগে। সংসার তো সব ভিজে রয়েছে—সুখ-ভোগ-বাসনার রসে। জ্বলবে কি করে? একটু তাতিয়ে নিতে হয়। তবে যদি চকমকি পাথর হয়, তার কথা আলাদা। হাজার বছর জলে ডুবে থাকলেও যখনি উঠিয়ে নিয়ে ঘসবে, তখনই আগুন জ্বলে উঠবে। সে-রকম কই? কটা হয়?

দেখ, ত্যাগের ওপরই সব বড় বড় কাজ নির্ভর করে। কখনো বহরমপুরে গিয়ে চার আনার জলখাবার খাইনি—বড়জোর একটা ডাব, বরং গাড়োয়ানকে খাইয়েছি,—দেব বাড়িতে দুপুরটা খেতুম। পাছে পাঁচ ব্যঞ্জন করে তাই বলে দিতুম—শুধু ভাতে-ভাত, এর বেশি করলে আর আসব না। নেহাত অনিচ্ছেয় ওরা তাই দিত, আর কত বলত

এ ঠিক হচ্ছে না—একদিন আমাদের ইচ্ছেমতো খেতে হবে।

কখনো আশ্রমের পয়সায় নিজের জামা-কাপড় কিনিনি। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পাঠিয়ে দিতেন। পরে অবশ্য অনেক অনেক হয়েছে। কখনো ভাল বিছানায় শুইনি। এখনকার এই ঘর, খাট বিছানা বালিশ, জামা কাপড় দেখে কিছুই বোঝা যাবে না।

Principle (নীতি) মেনে চলতে গেলে পুরুষকার চাই। হলো হলো, না হলো না হলো—এ করলে চলবে না। Principle (নীতি)-এর জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। Principle (নীতি) বড় ভয়ানক জিনিস। তার জন্যে সব ত্যাগ করতে হয়। Principle (নীতি)-ই তো ideal (আদর্শ)। Principle-কে ধরে রাখা কি সহজ কথা? অনেক ত্যাগ তপস্যা চাই।

'স্বামীজী, স্বামীজী' কর—স্বামীজী তো একটি principle-এর প্রতিমূর্তি। তিনি রক্তমাংসে তৈরি ছিলেন না, তিনি ছিলেন idea (ভাব) দিয়ে গড়া। তিনি যেমন বলতেন, 'Radha was not of flesh and blood. She was a froth in ocean of love'—(রাধা রক্তমাংসে গড়া ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ)। তেমনি স্বামীজীও রক্তমাংসের ছিলেন না—ছিলেন একটা ভাবের প্রতিমূর্তি।

ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়া কি সহজ কথা? সন্ন্যাসী হওয়ার আগে আমরা কত সাধন তপস্যা করেছি। কত কঠোর—ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা, তারপর নিন্দা-স্তুতি তুল্যবোধ—একি সহজ? একলা চুপ করে গভীরভাবে ভাবছি, ধ্যান করছি—এক গালে চন্দন, এক গালে বিষ্ঠা। ভাবছি—এই যেন কেউ আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে যত্ন করে নিয়ে গেল, তারপরেই একজন এসে অপমান করছে, মারছে, গায়ে নোংরা জল দিচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি যেন সবতাতেই স্থির।

এই যেন মরুভূমি দিয়ে চলেছি, তারপরই তুষার-মণ্ডিত পর্বতচূড়া। এইসব আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল। কারেই বা বলছি, আর কেই বা শুনছে! সবাই ফাঁকি দিয়ে সারতে চায়। যে যতদূর করবে, সে ততদূর পাবে। ফাঁকি দিয়ে যা পাবে—তাও ফাঁকা, ফক্কা।

রোজ শোবার সময় একটু ভেবে শোয়া উচিত—আজ কতটুকু কি করলুম? ভগবানকে ডেকেছি তো? কারুর মনে কোন কষ্ট দিইনি তো? গুরুজনদের মিষ্টিকথার উত্তরে পরুষবাক্য বলিনি তো?—এই সব। আর খুব প্রার্থনাপরায়ণ হতে হয়। জপ ও প্রার্থনা। ধ্যান অনেক দূরের কথা। যারা কাজের ভয়ে ধ্যানে বসে, তাদের লাঙ্গলে জুড়ে দিতে হয়—স্বামীজী বলতেন। আমি তো তবু কোদাল দিয়ে মাটি কুপুতে বলি।

সর্বদা জপ ও প্রার্থনা—ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, দেখা দাও। শুধু জপে কি হবে?

পুজো? শুধু পুজো আর কতটুকু কাজ? ও আর বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। নিগম পুজো করত—একটি একটি কৃষ্ণকলি ফুল দিত পাঁচ মিনিট ধরে। দু-ঘণ্টা লেগে যেত ফুল দিতেই। এদিকে ঠাকুরের সামনে জলখাবার সাজানো—ঠাকুরের খাওয়া হচ্ছে না। সেদিকে খেয়াল নেই। পুজোর সব কাজটাই পুজো—ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুছবে, বাসন মাজবে, ফুল তুলবে, ফুল সাজাবে, ফল কাটবে, ফল সাজাবে—সব কাজ করবে পুজোর ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করবে, আর ইষ্টচিন্তা করবে।

তারপর পুজো? অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল দেবে, বলবে 'এই নাও, প্রভু, ফুল নাও।' চন্দন পরিয়ে দেবে, মালা থাকলে মালা পরিয়ে দেবে, গুটি দুই-চার ফুল ছবির পাশে সাজিয়ে দেবে। আরও যতগুলো ছবি আছে—সবগুলোতে দুটি একটি ফুল দেবে। তারপর ঠাকুরকে জলখাবার দেবে—নিবেদন করে বলবে, 'খাও, প্রভু, এই তোমার খাবার। আজ যা পেয়েছি, তাই দিয়েছি। খাও, ঠাকুর।' এই বলে দরজা বন্ধ করে বাইরে এসে একটু জপ করবে, আর ভাববে—ঠাকুর যেন খাচ্ছেন। এই তো পুজো। [ক্রমশঃ]

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৩ ॥

পরমবৈষ্ণব ও শান্তিপ্রিয় বলরাম যদিও উড়িষ্যার জমিদারির তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কিন্তু হাঙ্গামা পোয়ানোর ভয়ে ও নিজের ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণে নিমাইচরণের ওপর জমিদারির দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে একাদিক্রমে এগার বছর পুরীধামে বাস করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্রে বলরাম জানতে পেরেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা। তাঁদের পুরোহিত-বংশীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত রামদয়াল বলরামকে সবিস্তারে চিঠিতে জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম কাহিনীর কথা। নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কলকাতায় এলেন বলরাম। দর্শন পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। মুগ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবে, অপূর্ব সঙ্কীর্তনে, নয়নাভিরাম নৃত্যে, ঈশ্বরের নামে মুহুর্মুহু অদ্ভুত ভাবের আবেশে। তাঁর মনে হলো, এরূপ মহাপুরুষ তিনি জীবনে আর কখনো দেখেননি। তাঁর আরো মনে হলো, সত্য সত্যই নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বলরাম স্থির করলেন হরিবল্লভের কলকাতার বাড়িতেই থাকবেন। হরিবল্লভরাও চাইছিলেন বলরাম থাকুক।[১১] বলরামের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে ঈশ্বরের একটি গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত ছিল। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গেল যে বলরাম বসুর বাসভবনকে কেন্দ্র করেই শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণীর প্রচারকর্ম শুরু হলো। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন না হলে জগৎ হারাত ভাগবতী লীলার তীর্থভূমিকে। ভক্তজনেরা পেতেন না আজকের বলরাম মন্দির।

প্রথম সাক্ষাৎকারেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে চিনতে পেরেছিলেন নিজের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন হিসাবে। তিনি বলরামকে দেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তনের দলে—'ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল' মুখমণ্ডল। শ্রীরামকৃষ্ণের 'রসদ্দার' না হয়েও যেভাবে বলরাম সেবাধিকার পেয়েছিলেন, আর কোন ভক্ত তা পাননি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আহারের সবকিছু যোগাতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় বলরাম শান্তির অধিকারী হয়েছিলেন। দিন দিন তিনি উদারভাবে ভাবিত হলেন। এই অনাবিল আনন্দ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে তাঁদেরও শান্তির অধিকারী করালেন। বলরামের সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ শ্রীরাধারাণীর অষ্টসখীর প্রধানা। বলরামের শ্বশুরবাড়ির সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। শ্যালক স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ। পিতা রাধামোহনকে বলরাম নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ-স্পর্শে ধন্য হয়েছিলেন রাধামোহন। হরিবল্লভ অপছন্দ করতেন বলরামের সপরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া। সেই হরিবল্লভ কলকাতায় এলে ভক্তভৈরব গিরিশ ঘোষের মাধ্যমে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে উপনীত হলেন তিনিও। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে ও কৃপায় হরিবল্লভ অভিভূত।

বলরামের তিন সন্তান—ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী-সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের আশিস-বন্যায় স্নাত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা।" পরিবারের ছোট-বড় সকলেই—ঈশ্বরের

১১ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৮০, পৃঃ ১১৩—১১৪

নাম না করে জলগ্রহণ করেন না। পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সর্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ। তাই কৃষ্ণভাবিনীর অসুখ শুনে উতলা হন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি শ্রীমাকে আদেশ করেন পায়ে হেঁটে কৃষ্ণভাবিনীকে দেখবার জন্য। বললেন : "আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে।"[২০] 'আমার' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। অথচ বলরামের বেলায় হলো তার ব্যতিক্রম।

॥ ৪ ॥

সুদীর্ঘকাল পুরীধামে বাসকালে বলরাম নিত্য জগন্নাথ দর্শন করতেন। কলকাতায় এসে সে-দর্শন হতে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি প্রথমে খুব ব্যাকুল হন। বলরামের মনোকষ্ট অচিরেই দূর করে দেন হরিবল্লভ। কলকাতার বাসগৃহের দোতলায় উত্তর-পূর্ব ঘরে[২১] জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হলেন। প্রবর্তিত হলো নিত্য ভোগরাগ। পুঁথিকার লিখেছেন : "জগন্নাথ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে। / ভোগরাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে।" বলরাম মন্দিরে এলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তঃপুরে জগন্নাথ দর্শন করতে যেতেন। শ্রীবিগ্রহে অর্পণ করতেন সুগন্ধ পুষ্প। সেসময় স্ত্রী-ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের নিত্য সেবা থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণও বলরামের অন্নকে বলতেন 'শুদ্ধ অন্ন'। এখানেই তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাত্রির আহার গ্রহণ করতেন। বলতেন : "ওর অন্ন খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।"[২২]

বলরামের অন্ন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দেরও এই একই অভিমত ছিল। স্বামী সারদানন্দজী প্রভৃতিরাও তা-ই মনে করতেন। এসম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে একটি ঘটনা আছে। বলরামের পুত্র রামকৃষ্ণ বসু তাঁর কন্যার বিয়ের পর বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনের সাধুদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছেন অন্ন গ্রহণের জন্য। উদ্বোধনের সাধুদের সারদানন্দজী বললেন যে, তিনি অমুক সময়ে বলরাম মন্দিরে যাবেন। যে যে তাঁর সঙ্গে যেতে চায়, যাবে। স্বামী ভূমানন্দ বিয়ে বাড়িতে অন্ন খাওয়া উচিত নয় বলে মত প্রকাশ করলেন। সারদানন্দজী কিছু বললেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে চললেন দুজন—স্বামী গঙ্গেশানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ। বেলুড় মঠ থেকেও সাধুরা এসেছেন। সকলে খেতে বসেছেন। সেসময় স্বামী প্রেমানন্দজী অসুস্থ অবস্থায় ওখানে ছিলেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে সাধুদের বকলেন : "তোরা খেতে পাস না? বিয়ের অন্ন খেতে এসেছিস?" সাধুরা দাঁড়িয়ে উঠছে। তখন রামকৃষ্ণ বসু বললেন : "দেখুন, বাবুরাম মহারাজ (রামকৃষ্ণ বসুর মামা), আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু বলবেন না। আমি তিন পুরুষের ভক্ত। আমি জানি সাধুকে কি দিতে হয়, না দিতে হয়। এখানকার কোন জিনিস বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।" এ কথা বলাতে স্বামী প্রেমানন্দজী ঘরের ভিতর চলে গেলেন। সাধুরা অন্নগ্রহণ করলেন। স্বামী সারদানন্দজী খাওয়ার পর যেতে যেতে বললেন : "বাবা, আমি বিয়ের অন্ন কি শ্রাদ্ধের অন্ন তা বুঝি না। ঠাকুর বলতেন যে, বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন। আমি সেই অন্ন গ্রহণ করতে এসেছিলাম।"[২৩] কেবলমাত্র এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের নিত্য পূজা-সেবা হয় বলে বলরামের অন্নকে শুদ্ধ অন্ন বলতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ; বলরামের বিশ্বাস, ভক্তি এবং শুদ্ধ জীবনচর্যা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধ।

২০ ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৯, ২০১, ২০৮
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ ১৩৮০, গুরুভাব : উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৭৮-২৮১ ;
শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৯৭৫, পৃঃ ১৪৯

২১ এই ঠাকুরঘরের মেঝে প্রথমে সাধারণ সিমেন্টের ছিল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে এর মেঝে মার্বেল করা হয়। বর্তমানেও এটি বসু বংশধরদের পারিবারিক ঠাকুরঘর।

২২ ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৭ ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন ১৩৮৮, পৃঃ ৩১২ ;
কথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৮৮৭, ৫৯৮

২৩ বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবর্ষের (১৯৮২-৮৩) আলোকে বলরাম মন্দির, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৬-৩৭

বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের[২৪] একটি ছোট রথ ছিল। প্রতিবছর রথযাত্রায় বলরাম ভক্তসহ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করতেন। আনন্দ-উৎসবের ফোয়ারা বয়ে যেত বলরাম মন্দিরে। রথযাত্রার দিনে রথখানিকে ধ্বজা-পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত করে বাইরের বারান্দায় আনা হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে রথ টানতেন। কথামৃতকার বর্ণনা দিয়েছেন: "শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন-ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফেলিয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন করিলেন, ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করিতেছেন।...উচ্চ সংকীর্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন।"[২৫] এক রথযাত্রা উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন: "সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবের রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে-বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তরা সকলে প্রসাদ পাইতেন।"[২৬] রথযাত্রার আনন্দোৎসবের আনন্দস্মৃতি ভক্তদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।[২৬]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ কোঠারে থাকায় বলরাম মন্দিরে রথোৎসব বহুবছর পালিত হয়নি। রথটিও গুদাম ঘরে পড়েছিল। ১৯৫৪-৫৬ খ্রীস্টাব্দে রথটিকে গুদাম ঘর থেকে বের করা হয়। তখন তার ভগ্নদশা। রথটিকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়। রথের সাইজ পূর্বের মতন। পুরাতন রথের পাটাতন ও ঘোড়া দুটি নতুন রথে সংযোজিত হয়।[২৭] বর্তমানে বলরাম মন্দিরে রথোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় প্রতি বছর।

॥ ৫ ॥

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ এলে হলঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিমের ছোট ঘরে দুপুরে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করতেন।[২৮] স্বামী ব্রহ্মানন্দজীরও আবাস ছিল এই ঘরে। হলঘরকে বলা হতো বৈঠকখানা। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের মজলিস করে বসতেন। হলঘরেই অনুষ্ঠিত হতো সংকীর্তন ও নৃত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মুক্ত করতেন তাঁর অফুরন্ত অধ্যাত্ম জ্ঞানভাণ্ডার। উপনীত হতেন নতুন নতুন ভক্তগণ। বলরামকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন তাঁর ছোকরা ভক্তদের। এখানে কলকাতার বহু লোক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন পেয়েছেন। বহু ভাগ্যবানদের তিনি কৃপা করেছেন এখানে।

শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য পাদস্পর্শ ও অবস্থানে বলরাম মন্দির ধন্য। শ্রীমা থাকতেন অন্দর মহলের দোতলার উত্তর-পশ্চিমের ঘরে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ও বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী' হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যখনই প্রয়োজন হয়েছে, শ্রীমা বাস করেছেন বলরাম মন্দিরে। বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী' হওয়ার পর শ্রীমাকে বলরাম মন্দিরে এনে খাওয়াতেন বলরামের পুত্র রামকৃষ্ণ বসু।

হলঘরেই স্বামীজী ১ মে ১৮৯৭ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। আজও প্রতিবছর ১ মে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়। এখানে বেশ কয়েকবার মিশনের সাপ্তাহিক সভাও হয়েছে। এসকল সভাতে

২৪ বসু পরিবারের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বর্তমানে বলরাম মন্দিরে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে জাপানী বোমার ভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে বসু পরিবারের কোঠারের (উড়িষ্যা) বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁর নিত্য পূজা-সেবাদি হয়। (বসু পরিবারের বর্তমান বংশধর রণেন্দ্র বসুর কাছে প্রাপ্ত সংবাদ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৯)।

২৫ কথামৃত, পৃঃ ৯০৯

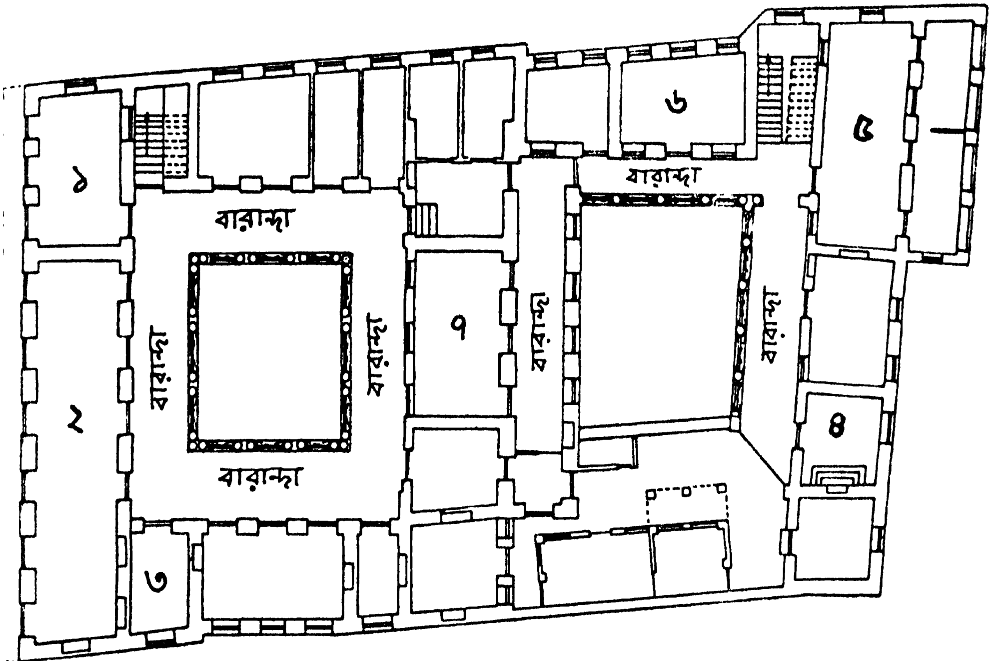
২৬ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য়, গুরুভাব: উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৮৫; লীলাপ্রসঙ্গে রথযাত্রার বিবরণ: (১) ২য় ভাগ, গুরুভাব: উত্তরার্ধ, পৃঃ ২১৯-২৫৩; (২) পৃঃ ২৭৮-৩১১। কথামৃতে রথযাত্রার বিবরণ: (১) পৃঃ ৫৯১-৬০৪, তারিখ ৩ জুলাই ১৮৮৪ (২) পৃঃ ৯৬৯-৯৮৭, তারিখ ১৩ জুলাই ১৮৮৫।

২৭ রণেন্দ্র বসু ও রাঘবেন্দ্র বসুর কাছে প্রাপ্ত সংবাদ: তারিখ ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯।

২৮ বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ও হলঘরটিকে যথাক্রমে ঠাকুরঘর ও নাটমন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর।

উপস্থিত থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তেরা। তাঁরা বক্তৃতাদি দিতেন। মহাকবি গিরিশ ঘোষ বেশ কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা এখানেই দিয়েছেন। ভক্তদের অনুরোধে স্বামীজী তাঁর কিন্নর কণ্ঠে গান গেয়ে সকলকে মোহিত করতেন এখানে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরাম মন্দিরে থাকতে ভালবাসতেন। বলরাম মন্দিরে স্বামী প্রেমানন্দও থাকতেন। শেষ অসুখের সময় তিনি হলঘরে ছিলেন। হলঘরে বলরাম, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাসমাধি হয়। বলরাম মন্দিরের



১ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর (বর্তমানে ঠাকুর ঘর)
২ হলঘর
৩ স্বামী প্রেমানন্দের ভাই শান্তিরাম ঘোষ থাকতেন
৪ বলরাম বসুর পারিবারিক ঠাকুর ঘর
৫ শ্রীশ্রীমায়ের ঘর
৬ রামকৃষ্ণ বসুর ঘর
৭ বলরাম বসুর ঘর

বলরাম মন্দির : দোতলা

স্কেল 0 ১৬ ২৪ ফুট

বলরামবাবুর মৃত্যুর পর স্বামীজী প্রায় একমাস বলরাম মন্দিরে ছিলেন। বিদেশ থেকে আসবার পরও স্বামীজী বহুবার অবস্থান করেছেন বলরাম মন্দিরে। তিনি ভক্ত ও যুবকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গাদি করতেন এখানে।

নিচের তলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ঘরে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় নয়-দশ মাস (১৯১৮) চিকিৎসার জন্য ছিলেন। অন্য সময়েও তিনি এখানে থেকেছেন। মিশন প্রতিষ্ঠা হবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ হলঘরে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। ঐ একই

ঘরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ একাদিক্রমে প্রায় নয় বছর ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদরা কোন-না-কোন সময়ে অবস্থান করেছেন বলরাম মন্দিরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অদ্ভুতানন্দ তাম্রকলসপূর্ণ পবিত্র অস্থি সহ শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন বলরাম মন্দিরে। জিনিসপত্রাদি রাখা হয়েছিল বাড়ির দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির বামদিকের ঘরে। বরাহনগর মঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলরাম মন্দিরে ঠাকুরঘরে পূজিত হতো 'আত্মারামের কৌটা' (শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র ভস্মাধার)।

বলরাম মন্দিরের নিচের তলায় একটি ছোট ঘরে একটি বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমানে অফিস ঘর) ছিল। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। স্বামী প্রেমানন্দ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছেন। নিচে একটি বালিকা আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বন্‌বন্ করে ঘোরাচ্ছিল। দোতলা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ বালিকাকে দেখিয়ে বাবুরাম মহারাজকে বললেন: "দ্যাখ, মেয়েরা পুরুষদের এই রকম করে বেঁধে বন্‌বন্ করে ঘোরায়। তুইও কি তাদের হাতে ঐরকম ঘুরতে চাস?" মেয়েদের হাতে পুরুষেরা কিভাবে ক্রীড়নক হয়, এই দিনের দৃষ্টান্তে বাবুরাম মহারাজের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল।[২৯]

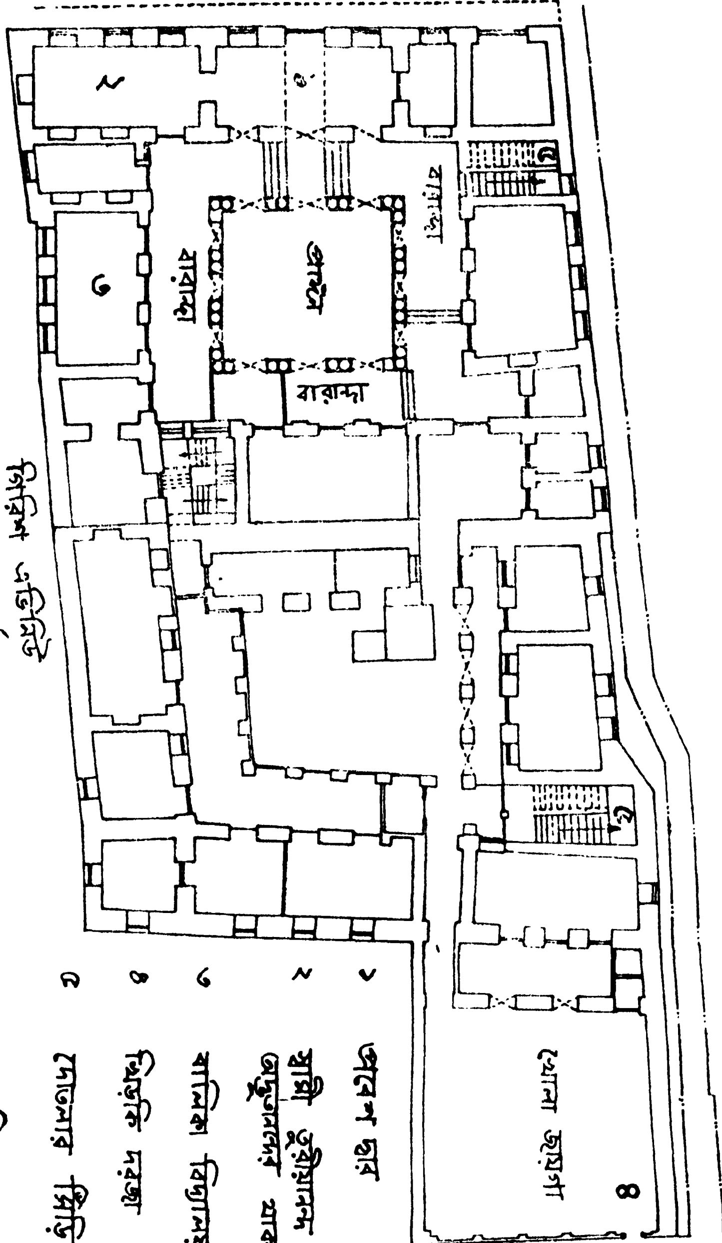
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম নারীশিক্ষা-উদ্যোগ—বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হলঘরে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ও শ্রীম-র ছাত্র হরিচরণ মল্লিক স্মৃতিচারণ করেছেন: "নিবেদিতার সেই প্রথম উদ্যোগ। বাগবাজার পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় খুলবেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে গৃহস্থ ভক্তদের একটি ঘরোয়া সভা হলঘরে হলো, যাতে গৃহস্থরা ঐ স্কুলে মেয়ে দেন—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন। এমন সময় অতর্কিতভাবে স্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাস্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজী কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, "ওঠ ওঠ। ওঠ না। শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠ বল—আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল—হ্যাঁ, আমরা রাজি আছি। আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।" কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজী হরমোহনবাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন, "তোকে দিতেই হবে।" তাঁর হয়ে স্বামীজী নিজে তখন বললেন, "Well, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you." (মিস নোবল, এই ভদ্রলোক তাঁর মেয়েটিকে তোমায় দিচ্ছেন।) নিবেদিতা প্রথম দেখতে পাননি যে, ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর ঐ উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব বেশিরকমের খুশি হলেন। হাততালি দিতে লাগলেন এবং শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন। ঠিক যেন একটি ছোট্ট বালিকা।"[৩০]

হলঘরের উত্তর দিকের ছোট্ট ঘরটিতে (বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাঁড়ারঘর) স্বামী প্রেমানন্দের ভাই শান্তিরাম ঘোষ থাকতেন। গোপালভাবে সিদ্ধা কামারহাটির বামনী গোপালের মাকে তাঁর শেষ অবস্থায় এখানে আনা হয়েছিল। এখান থেকে নিবেদিতা তাঁকে তাঁর আবাসে নিয়ে যান।

বলরাম মন্দিরের একতলায় স্মৃতিপূত স্থানগুলির একটি মানচিত্র এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হলো পাঠকবর্গের বোঝবার সুবিধার জন্য। মানচিত্রটি মূল নক্সা থেকে তৈরি করেছেন সদ্যপ্রয়াত সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস (হাওড়া) ও শ্রীসন্তোষ সাঁতরা (বাগনান, হাওড়া)। নক্সা দিয়েছেন বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ। [ক্রমশঃ]

২৯ প্রেমানন্দ জীবন-চরিত—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, ১৩৫৯, পৃঃ ৮৪

৩০ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১৯৯০, পৃঃ ২৫৯-২৬০


রামকান্ত বোস স্ট্রীট
বারান্দা
উঠান
বারান্দা
বারান্দা
খিড়কি গলি
খোলা জায়গা
উঃ
১ প্রবেশ দ্বার
২ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভুতানন্দের থাকার ঘর
৩ বালিকা বিদ্যালয়
৪ খিড়কি দরজা
৫ দোতলার সিঁড়ি
বলরাম মন্দির : একতলা
স্কেল ০ ৮ ১৬ ২৪ ফুট

বিবেক-ঋত্বিক

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

দিনান্ত ডুবিয়া গেল দিগন্ত তিমিরে
ধূসর মাটিতে
অসহ রাত্রির ছায়া পক্ষ মেলি নামে
পথপ্রান্ত 'পরে
যূথবন্ধ মানবের পদচিহ্ন লেখা
সন্ধ্যার আঁধারে যেথা মিশে।
অনন্তের কোণে
একটি নক্ষত্র শুধু জ্বলে অবিরাম
শুকতারা নাম।
সূর্যবহ্নি-বলয়ের বন্ধন বাহিরে
কালের প্রহরী গণে প্রহরে প্রহরে
ত্রিযামা রাত্রির শেষে
প্রতীক্ষার তীরে
জ্যোতির্ময় অভ্যুত্থান-ক্ষণ।
বিদগ্ধ মানব-আত্মা
লোক হতে লোকান্তরে
ফিরে হাহাকারে।
আমি শুধু জেগে রই একাকী অভীক
অনন্তের বরতনু, অণু-পরমাণু স্নাত
বিবেক-ঋত্বিক ॥

ক্ষণিক আঁধার

সনৎকুমার মিত্র

তুমি আছ বিন্দুতেও তুমি থাক সিন্ধুতেও,
খুশি হয়ে প্রেম দাও খুশি হলে প্রেম নাও।

তুমি প্রেম দিলে সূর্যোদয়,
তুমি প্রেম নিলে জন্ম হয়
নবযুগ অসীম আশার ;
আমি তার ক্ষণিক আঁধার।

গ্রাম মানে

মধুসূদন পাল

গ্রাম মানে ভালবাসা, মাটির মায়া
শরীর ছুঁয়ে থাকে
মায়ের আশীর্বাদের মতো।
গ্রাম মানে সরল মানুষের স্বর্গ,
সন্ধ্যাপ্রদীপ, পদ্মপুকুর, উদার আকাশ।
মাটির ঘরে দুঃখের ভাত
পরম তৃপ্তিতে ভাগ করে খাওয়া।
গ্রাম মানে মন্দির, উঠানে আলপনা
বুক-জুড়ে আনন্দ-উৎসব
দুঃখ ও সুখে পাশাপাশি থাকা।
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজের আশ্চর্য স্বপ্ন
আউল-বাউলের উদাসী নূপুর
ফুলে ফুলে সাজানো শান্তি
গ্রাম মানেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মা।

ফসল

দেবকুমার বাগচী

আতপ্ত পৃথিবী ছিল
জলের ফোঁটার দিকে চেয়ে
মাটি নিয়ে বেঁচে থেকে
নতুন জীবন দেবে বলে।
যত বাঁধ বাঁধো আজ
তার বুকে নদীর প্রবাহমূলে
আকণ্ঠ নিমজ্জিত জলের বাসনা আছে
পিপাসার্ত পৃথিবীর হৃদয়ে।
মেঘ হতে অনন্ত ফোঁটাজল
সিঞ্চিত বারিধারা খাতে
প্রবিষ্ট সে মাটির স্নায়ুতে—
মানুষের করস্পর্শে
শিহরিত রোপণ ও মাটির ঘ্রাণে ঘ্রাণে
বিকশিত অমৃত ফসল।

তোমারই মুখের পানে চেয়ে

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানে যা দেখি
রকমফের পৃথিবীর মানচিত্রে
সকল মানুষ তোমার মুখের পানে চেয়ে—

তোমার মুখ ঊষায় হাসে, মেঘলায় কাঁদে,
ফুলে ফুলে পা রেখে হয় প্রজাপতি ;
সমুদ্রের তীরে তরঙ্গ হিমালয়ের কুহেলী—
মানচিত্রের সব মানুষ।

অন্ধকারে, কান্নায়
তুমি কোথায় লুকিয়ে থাক, কোনখানে ?
আত্মম্ভরী অহঙ্কারের দিনে
কোন বনে তোমার লুকোচুরি ?

মানচিত্রের সমস্ত মানুষ তোমায় সারাক্ষণ খুঁজেছে।
হাতে মিলেছে শুধুই
ভয়, ভাবনা আর সংশয়।

শান্ত শব্দ-তরঙ্গের লোভ পুরোমাত্রায় মনে,
মানচিত্রের সমস্ত মানুষ যাত্রা-তরঙ্গে দুলছে ;
তুফান তুলছে—মনে, প্রাণে, গানে…
এ গান তোমারই মুখের পানে চেয়ে, স্বনির্ভর হয়।

উপলব্ধি

চিরপ্রশস্ত বাগদী

উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো, যখন শববাহকের কাঁধে
শবদেহ দেখেছিলাম
সেদিন মনে হলো,
'আমি' এই শব্দটির আবিষ্কর্তা
অত্যন্ত মূর্খ-মূঢ় ;
উপলব্ধি ছিল, তবে এতো ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো, যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দ-ভাবার
উৎস খুঁজেছিলাম
সেদিন মনে হলো, শব্দের উৎস জল-মাটি-বায়ু
কারণ এসবেই উদ্ভব।

উপলব্ধি ছিল, তবে এতো ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো,
যখন গঙ্গায় জোয়ার কালে
সূর্য-প্রণামরত একজনকে দেখলাম
সেদিন মনে হলো,
ব্রহ্ম মানুষের ভিতর অবস্থিত
সূর্য ও মানুষ মূলতঃ এক ও অভিন্ন।

দরজা আমার কেউ নাড়ে না

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

সাত সকালে—দিন দুপুরে—ভর সন্ধ্যায়—নিশুত রাতে—
আশেপাশের বাড়ির কড়া নিত্য নাড়ায় কারা যেন।
কেন ডাকে, কি প্রয়োজন, কি চায় ওরা ?—প্রশ্ন জাগে।
নিত্য শুনি, "দরজা খোল, দরজা খোল", ডাকছে কারা।

আমার বাড়ি আমি একা, দরজা আমার কেউ নাড়ে না।
বাইরে কড়ায় জং ধরে তাই অনাদরে,—আয়ু গড়ায়।
দরজা আমার আমি লাগাই, আমি খুলি কৌতূহলে,
তবু যেন পাল্লা দুটি আটছে ক্রমে, খুলবে না আর।

হায়রে কবে শুনতে পাব, "দরজা খোল, কেউ আছ কি ?
কেউ যে থাকে, নিজের কানেই শুনব যখন দেব সাড়া।
বিস্ময়েরই চমক ভেঙে জানব আমায়, যখন আমি
খুব চেঁচাব, উঠবে ধ্বনি, "স্বয়ং থাকি…স্বয়ং থাকি…"।

আমেরিকাবাসীকে নিরামিষাশী হওয়ার পরামর্শ

আমেরিকাবাসীদের মৃত্যুর কারণগুলির প্রায় ৫০ শতাংশ হচ্ছে রক্তনালীতে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis—রক্তনালীর ভিতরে জায়গায় জায়গায় চর্বিজাতীয় দ্রব্যজাত ঘা) হওয়া। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নিরামিষাশী হওয়া এবং রক্তে লিপিড (lipid—চর্বিজাতীয় দ্রব্য) কমানোর উপায় গ্রহণ করা—বলেছেন ডাক্তার উইলিয়াম সি. রবার্টস, যিনি 'আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিয়লজি'র সম্পাদক। কয়েকমাস আগে বম্বেতে 'করোনারি হৃদ্‌রোগ'-এর ওপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের যে আলোচনাচক্র বসেছিল, সেখানে ডাক্তার রবার্টস-এর ভাষণ থেকে তাঁর অভিমতগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, "আমাদের খাদ্যই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে।" আমেরিকানরা যা খেতে ভালবাসে, অর্থাৎ হ্যামবার্গার (Hamburger—মাংসের পিঠা) এবং দুগ্ধমন্থিত পানীয় (milk-shake), সে দুটিতে প্রচুর ক্যালরি (calorie—উত্তাপশক্তির মাপবিশেষ) ও স্যাচুরেটেড (saturated—সংপৃক্ত) লিপিড আছে, এবং সেগুলিই ঐ দেশে এত বেশি হৃদ্‌রোগের কারণ।

সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীদের কতকগুলি অসুখ সাধারণতঃ হয় না, যেগুলি আমিষভোজীদের হয়। অসুখগুলি হচ্ছে রক্তচাপবৃদ্ধি (hypertension), নিম্নঅন্ত্র (colon) এবং স্তনে ক্যানসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, অন্ত্রের টিউমার (diverticulosis), হার্নিয়া (hiatus hernia), পিত্তকোষে এবং বৃক্কে পাথুরি, গাঁটব্যথা (osteoarthritis) প্রভৃতি।

মোটামুটিভাবে, শরীরের ওজন যত বাড়বে মৃত্যু তত এগিয়ে আসবে। প্রতি পাঁচজন আমেরিকানের মধ্যে তিনজনের ওজন বেশি। ডাক্তার অ্যানসেল কীজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করে প্রথমে দেখান যে, রক্তে কোলেস্টেরল (cholesterol—একরকম চর্বিজাতীয় পদার্থ) ১৫০ মিলিগ্রাম (প্রতি ডেসিলিটারে বা ১০০ মিলিলিটারে)-এর ওপর গেলে রোগলক্ষণ দেখা দেয়। জাপানে যেখানে করোনারি রোগ কম হয়, সেখানে লোকের রক্তে কোলেস্টেরল ১৫০ মিলিগ্রামের কম, কিন্তু আমেরিকায় এটি প্রায় ৩০০ মিলিগ্রামের কাছাকাছি। তারপরে যত গবেষণা হয়েছে, সবগুলিতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্তে কোলেস্টেরল যত বাড়ে, রক্তনালীতে তত অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস ঘা বাড়ে এবং এই কারণে মৃত্যুও তত বেশি হয়। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে এও দেখা গেছে যে, রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো হলে রক্তনালীর অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের ঘাও কমে যায়। রক্তে এক শতাংশ কোলেস্টেরল কমলে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ দুই থেকে তিন শতাংশ কমে। এর বিপরীতটিও সত্য। অর্থাৎ কোলেস্টেরল ১০ শতাংশ বাড়লে হৃদ্‌রোগ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়ে। মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্যের মধ্যে থাকা কোলেস্টেরল একটা বড় সমস্যা নয়, কারণ বেশিরভাগ আমেরিকান প্রতিদিন আধগ্রাম কোলেস্টেরল খান—যেটা ডিম বা 'লাল মাংস' (red meat) না খেলেই প্রায় বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু চর্বির ব্যাপারটি আলাদা। প্রাপ্তবয়স্ক একজন আমেরিকান প্রতিদিন প্রায় ১৪০ গ্রাম চর্বি খান, যার এক তৃতীয়াংশ পরিপৃক্ত (saturated) চর্বি যা কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়। যেসব তেল বা চর্বিজাতীয় জিনিসে রান্না করা হয়, তা পরিপৃক্ত বা অপরিপৃক্ত হতে পারে। পরিপৃক্ত চর্বির মধ্যে প্রধান হচ্ছে নারকেল তেল (৯২ শতাংশ পরিপৃক্ত); তারপর পাম (palm) তেল (৮৬ শতাংশ পরিপৃক্ত), মাখন (৬৬ শতাংশ পরিপৃক্ত)।

চর্বিজাতীয় সব দ্রব্যই ক্ষতিকারক নয়; কয়েকটি কোলেস্টেরল কমায়, বা এব্যাপারে নিষ্ক্রিয় (neutral) থাকে ; এর মধ্যে পড়ে অলিভ তেল ও বাদাম (peanut) তেল, যাদের মধ্যে ভাল জাতের ফ্যাটি অ্যাসিড (mono unsaturated ও poly unsaturated fatty acids) আছে।

আমেরিকাবাসীর খাদ্যতালিকা থেকে ডাঃ রবার্টস হ্যামবার্গারের দিকে আঙ্গুল দেখালেন। হ্যামবার্গারের ওপরে পনির (cheese) দেওয়া থাকে ; সেটি এবং আনুষঙ্গিক 'ফ্রেঞ্চ ফ্রাই' (French fries) ধরলে একটি হ্যামবার্গারে ১০০০ ক্যালরি উত্তাপশক্তি আছে, এবং এটিকে নিংড়ালে ১৫ চা-চামচ চর্বি নির্গত হবে, যার অধিকাংশ হচ্ছে পরিপক্ক চর্বি। ডাঃ রবার্টস বলেছেন, "আমেরিকায় ২০ শতাংশ লোক দুপুরের ও রাতের আহার সারে দ্রুত খাবারের দোকান-গুলিতে (Fast food chains), যেখানকার প্রধান সামগ্রী হলো হ্যামবার্গার ও দুগ্ধমথিত পানীয়। ৫ শতাংশ আমেরিকান প্রাতরাশও সারে ঐসব জায়গায়।

ডাঃ রবার্টস মনে করেন যে, নিরামিষ ভোজনে শুধু স্বাস্থ্যই ভাল থাকে না ; এর ফলে যা খাদ্য-সামগ্রী বাঁচে তাতে পৃথিবীর অনশনক্লিষ্ট দেশগুলিকে অনেক সাহায্যও করা যেতে পারে।

ডাঃ রবার্টস শেষে বললেন যে, অ্যাথিরো-স্ক্লেরোসিস অনেক কারণে হয়, তবে প্রধানতঃ এটি লিপিডজাত রোগ। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ২০০ মিলিগ্রামের ওপরে উঠলেই অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার ঝুঁকি আসে। কোলেস্টেরলের মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রামের নিচে থাকলে উচ্চ রক্তচাপ বা ধূমপান থেকে বিপদ আসার ভয় সামান্য।*

* **Medical Times, Vol. 20, No. 3, March 1990, pp. 1-3.**

মাধুকরী

স্বামীজী

নরেন্দ্র দেব

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-অবতার,
লীলা যাঁর করিতে প্রচার,
সপ্তর্ষিমণ্ডল ত্যজি ভূমণ্ডলে এসেছিলে নামি—
হে বিবেকস্বামী!
কুসুম-সুষমা-সিক্ত জীবনের তব অনাবিল প্রথম উষায়
কনক-কিরণ-কান্তি বিহসিত হিরণ ভূষায়—
উদ্ভাসিত যে-মুহূর্তে যৌবনের অরুণ-আভাষ,
অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাস—
এনেছিল অকস্মাৎ নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়,
বিভীষিকাময়!
অভাবের বিকট কঙ্কাল,
বিস্তারিয়া অস্থিসার দুবাহু বিশাল
সেদিন আসিয়াছিল দিতে নিষ্পেষিয়া—
তোমার তরুণ-তপ্ত হিয়া!
সেই ঘন-অন্ধকার দুর্যোগের দিনে সংশয়ের
ঘোর ঝঞ্ঝাবাত—
নাশিতে আস্তিক্য-বুদ্ধি, বিশ্বাসের মূলে,
কেবলই করিতেছিল সবলে আঘাত ;
সেই তব জীবনের চরম দুর্দিনে রামকৃষ্ণ দীনের দেবতা
দুর্বল অন্তরে তব দিয়াছিল আনি অভিনব
আনন্দ-বারতা!
অযাচিত—তাঁহারই কৃপায়,

দেবীর দর্শন লভি জননীর দুটি রাঙা পায়,
চিত্ত তব বিত্ত আশে করে নাই অনিত্য প্রার্থনা—
হে আজন্ম মহামতি সমুন্নত-মনা।
তুমি শুধু চেয়েছিলে জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য—
অবাধে কেবল নিত্য চিন্ময়ী মায়ের অপরূপ
দর্শন-সৌভাগ্য।
সে যাচনা শুনি তব কামনা-বিহীন—
পরা-ভক্তি-ভরা—
অভয় দানিয়াছিল প্রসন্ন অন্তরে বরাভয়-করা।

*

আশৈশব শিবভক্ত, সন্ন্যাসের ছিলে অনুরাগী,
ওগো সর্বত্যাগী।
বুদ্ধের চরিত্রে তব শ্রদ্ধার ছিল না যে গো সীমা—।
গৈরিক বৈরাগ্যবেশে বিজড়িত যে বিচিত্র ত্যাগের মহিমা,
সত্য ও সুন্দর,
কিশোর বয়স হতে সুকুমার চিত্তপটে এঁকেছিল
চিত্র মনোহর।
ব্রহ্মজ্ঞানে তীব্র লিপ্সা—ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন
অভিলাষ,
নিরাকার শূন্যে যবে ঘুরাইতেছিল বৃথা,
চক্ষে বাঁধি মিথ্যা মোহ-ফাঁস—
শুভক্ষণে দেখা দিল নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ,
পূর্ণব্রহ্ম তেজে যাঁর উদ্ভাসিত সত্যপথে ক্রমে তব
নবীন জীবন।
জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ জ্ঞানমূর্তি সর্বদ্বন্দ্বাতীত
ত্রিগুণ-রহিত,—
সৎ-চিৎ-আনন্দ কান্তি মুখে,
শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্য-সাধু সতত সমাধিমগ্ন সুখে,
ভক্তের আরাধ্য সেই পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র যার—বারম্বার,
নির্বিকল্প সমাধি লভিয়া—
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তব হিয়া।
বরদ বেদান্ত-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আপনার আজন্ম ঈপ্সিত,
বরিলে সন্ন্যাস;
মুণ্ডিত-মস্তক, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, কৌপীন
গৈরিক অঙ্গবাস।

*

তারপরে একদিন তুচ্ছ করি নিজ মোক্ষ-ফল,
গুরু-ইচ্ছা মাত্র শুধু করিয়া সম্বল,
লোকশিক্ষা দেশহিতে জনে জনে দিতে জ্ঞানদান—
অনুষ্ঠিতে বিশ্বের কল্যাণ
হে বঙ্গের গৌরবের ধন।
উৎসর্গ করিয়াছিলে আপনার সমস্ত জীবন।
প্রশান্ত সাগরপারে সম্মিলিত নিখিলের ধর্ম-সভাতলে
যেদিন দাঁড়ায়ে কুতূহলে
বিশ্বপ্রেমে উচ্ছ্বসিত প্রাণ—
স্ফুরিল অধরপুটে বেদান্তের প্রথম আহ্বান;
তোমার সে অকৃত্রিম স্নেহ-সম্ভাষণ,
অপূর্ব পুলক প্রেমে দিয়াছিল ভরি মুহূর্তেই
সবাকার মন।
হে সন্ন্যাসি—হে বীর সাধক।
উদাত্ত গম্ভীর গুরু তোমার সঙ্গীত—
এনেছিল অকস্মাৎ এ-জাতির অচেতন দেহে
অভিনব জীবন-সম্বিৎ—।
তীব্র তব উদ্দীপনা ওজস্বিনী সুরে
মোহাচ্ছন্ন কোটি চিত্ত-পুরে—
নিমেষে জ্বালিয়াছিল অপূর্ব আলোক।
বিশ্ব-লোক,
সেদিন বিস্ময়ে—
বরণ করিয়াছিল বঙ্গের ভুবনজয়ী বেদান্ত-কেশরী,
স্পন্দিত হৃদয়ে।
তোমার অভয়বাণী পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ধ্বনি সম,
দৃপ্ত, অনুপম—
দিকে দিকে উঠেছিল সঘনে ধ্বনিয়া,
শত শত হৃদয় রণিয়া।
নিদ্রিত দেশের এই সহস্র বর্ষের অবরুদ্ধ
বাতায়ন-দ্বারে,
আঘাত করিয়া বারে বারে—
ডাকি জনে, জনে,
গভীর গর্জনে,
গিয়াছ বলিয়া অবিরত—
"উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।
মোহাঞ্জন মুছাইয়া মলিন নয়নে রঞ্জিত করিয়াছিলে
জ্ঞানের কজ্জল,
তম দমি শত চিত্ত সত্ত্ব-জ্যোতি-যুত,
রজঃ-পুঞ্জ প্রভা সমুজ্জ্বল;
মহা উদ্বোধন-মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলে নিখিল ভারত;
তব জয়-রথ—

বহিয়া চলিয়া গেছে তুলি যশোধূলি জগতের
নব-নব পথ।
দামিনী দমক-দীপ্তিবৎ সেই চক্র-রেখা—
সমুদ্র হিমাদ্রির সুবিস্তৃত বুকে আজও যায় দেখা।

*

প্রতিভা সর্বতোমুখী জ্ঞান সুগভীর,
প্রেম ভক্তি সম্মিলিত মহা কর্মবীর,
নিত্য-সিদ্ধ-শুদ্ধ-যোগী, সাধকপ্রধান,
হে কৌপিনী, খলু ভাগ্যবান।
স্বদেশের যেথা যত পতিত, কাঙাল, নিরাশ্রয়,
অন্ন-বস্ত্র-হীন,
অসহায়, রোগাতুর, নির্যাতিত, বুভুক্ষিত, দীন,
তাদের কল্যাণ তরে ভাবিয়াছ তুমি নিরন্তর,
সতত দুঃখীর দুঃখে কাঁদিয়াছে সহৃদয় তোমার অন্তর,
কলুষিত দেশাচার, সমাজের অযথা পীড়ন
আমূলে করিতে সংশোধন,
করেছিলে প্রাণান্ত যতন—
প্রাচ্যের প্রাচীন-পথে প্রতীচ্যের শ্রেয়-প্রথা
করি প্রবর্তন।
অস্পৃশ্য অধম নীচ, পাপীতাপী দরিদ্র ভিখারী,
সবারে জানিয়া নারায়ণ,
করেছ কত না পূজা শ্রদ্ধা প্রেমে সজল-নয়ন।
তোমার সে ব্রহ্মনিষ্ঠা—
পরহিতে পরাকাষ্ঠা,
সেবা-ধর্ম, জীবে দয়া, অদ্বৈত আলোকে,
জানে সর্বলোকে।
গভীর স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হেরি প্রতি বাক্যে
প্রতি কার্যে তব,
জাতির উন্নতি-কল্পে উন্মেষিত নির্শিদিন
চিন্তা নব নব।
নরনারী নির্বিশেষে,
দেশে দেশে,
শিক্ষার বিস্তার,
বলিয়া গিয়াছ অনিবার
উন্মুক্ত করিয়া দিবে বিশ্ব-সভাতলে
আমাদের প্রবেশ-দুয়ার।
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা বিজ্ঞানের বহুল প্রচার—
ঘুচাইবে দেশ-দৈন্য, দুর্বলতা যত অক্ষমের
শূন্যে হাহাকার,
ভাগ্যহীন ভারতের পূর্ণ করি পুনরায় ষড়ৈশ্বর্যে
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
তোমার সে শুভ ইচ্ছা কল্যাণের শত উপদেশ,
জাগ্রত ভারতে আজি মূর্তি ধরি করিছে প্রবেশ।
হে পরিব্রাজক স্বামী, পত্রাবলী তব,
তন্দ্রাতুর অন্ধগণে দানিয়াছে দেব-দৃষ্টি অভিনব
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম বিজ্ঞান-বারতা,
বর্তমান ভারতের ভাবিবার কথা।
জ্ঞান-কর্ম-রাজ-ভক্তি-যোগ—
নিত্য কত ভ্রান্ত জনে সত্য পথে করিছে নিয়োগ,
বৈরাগ্যের বীরবাণী, সন্ন্যাসীর গান,
মাতাইয়া তোলে আজও প্রাণ।
বরেণ্য বাঞ্ছিত তব শ্রীচরণ চুমি,
এ ভারত-ভূমি,
যুগে-যুগে অবতীর্ণ যেথা ভগবান,
পেয়েছিল ফিরে তার গত-পুণ্য, হৃত-যশোমান।
মহাশক্তি সাধনার প্রভাবে তোমার,
বিশাল এ হিন্দু জাতি—পবিত্র হইয়াছিল
আর একবার।
যাহার অশ্রান্ত চেষ্টা জাতির অন্তর হতে
মন্দাকিনী-স্রোতে—
মুছায়ে দিয়াছ কত যুগান্তের ঘন অন্ধকার,
হে মোর স্বদেশবাসি, অবনত শিরে দেশভক্ত
সেই বীরে কর নমস্কার।
ভারতের চারিভিতে সঘন নির্ঘোষে, কোটি কণ্ঠ
উঠুক ধ্বনিয়া উচ্চ আজ—
জয়তু বিবেকানন্দ। জয় স্বামীজীর।
জয়, জয়, গুরু মহারাজ।*

ভারতবর্ষ, অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭, পৃঃ ৩২৬-৩২৯
সংগ্রহ : প্রদ্যোৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : সংযোজন

সন্ন্যাসিনী-মা

সরলাবালা সরকার

গত শ্রাবণ ১৩৯৭ সংখ্যায় "অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : সংযোজন" বিভাগে 'সন্ন্যাসিনীর কাহিনী' রচনাটি শেষ হয়েছে। সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে সরলাবালা সরকারের তৃতীয় ও শেষ রচনাটি এই বিভাগে এবার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। পূর্বে প্রকাশিত দুটি রচনায় যেসব ঘটনা বর্তমান রচনায় উল্লিখিত হয়েছিল সেগুলি আমরা এখানে বাদ দিয়েছি, কোথাও-বা সামান্য অংশ রাখা হয়েছে ধারাবাহিকতার স্বার্থে।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

কাশীতে যখন আসি তখন ট্রেনে সমস্ত রাত্রি ঘুম আসেনি। বারবার মনে হচ্ছিল, কাল সকালে কাশী গিয়ে পেঁছিব আর পেঁছেই যেতে হবে আমাকে সন্ন্যাসিনী-মার আশ্রমে। গিয়েই কি তাঁর দেখা পাব? যদি তিনি আশ্রমে না থাকেন? না, আশ্রমে তিনি থাকবেন নিশ্চয়। শুনেছি, তিনি বড় একটা কোথাও যান না, বিশ্বেশ্বর দর্শনে যান কেবল সোমবারে।

কাশীতে পেঁছলাম। গাড়ি লেট হয়েছে, তখন বেলা এগারটা। চৌষট্টি-মার গলিতে দিঘাপতিয়ার বাড়ি। সেখানেই আমাদের থাকার জন্য বাবাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন দিঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর।

পেঁছেই অন্য সকলে পোটলা-পুঁটলি স্তূপাকার করে রেখে গঙ্গাস্নানে রওনা হলেন, আর আমি রওনা হলাম অশ্বত্থতলার সেই ঘরটির উদ্দেশে, সেখানে সন্ন্যাসিনী-মার কাশীর আশ্রম। দিঘাপতিয়ার বাড়ির খুব কাছেই।

ঐ যে অশ্বত্থগাছ, ঐ তো তার তলায় বেদি বাঁধানো, বেদিতে তিন-চারটা জলভরা বালতি, ঐ তো সেই ছোট ঘরটি। এগিয়ে যেতে যেতেই শুনলাম, 'সরলা, এলি বাবা?'

সন্ন্যাসিনী-মার সঙ্গে যখন প্রথম আমার দেখা হয়, তখন বুঝতে পারিনি যে, মানুষের মন আকর্ষণ করে নেবার তাঁর কতখানি ক্ষমতা। গেরুয়া-পরা কালো-কোলো চেহারা, মুখে-চোখে যেন প্রসন্নতা মাখানো আছে। এমন মানুষ, আমার মনে হয়েছিল, আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি।

কদিনেরই বা পরিচয়! কাশী চলে গেলেন তিনি। তারপর চলে গিয়েছে সাত মাস। পুজোর ছুটিতে হাইকোর্ট বন্ধ হয়েছে, আমাদের কাশী যাবার কথা শুনে আমার সেই সঙ্গিনী, যাঁর জন্য প্রথম পরিচয় হয় সন্ন্যাসিনী-মার সঙ্গে, তিনিই তাঁর কাশীর ঠিকানাটা আমাকে দিয়েছিলেন, আর কোন জায়গায় তাঁর ঘর সেটাও ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

আমি তাঁর ঘরের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, অশ্বত্থগাছ থেকে প্রকাণ্ড এক বাঁদর লাফিয়ে পড়ল জলের বালতির কাছে, আর একটা বালতিতে মুখ দিয়ে চোঁ চোঁ করে জল খেতে লাগল।

আমি ছুটে গেলাম বাঁদর তাড়াতে। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসিনী-মার স্নানের জল, কিংবা অপর কোন প্রয়োজনের জন্য রাখা জল। শুনতে পেলাম তাঁর চিৎকার, 'করছিস কী? করছিস কী? দেখছিস না ওর জলতেষ্টা পেয়েছে। দে, ওকে জল খেতে দে।'

কাশীর এই বানরদল। এরা যেন মানুষেরই প্রতিবেশী। দিঘাপতিয়ার বাড়ির একতলায় ছিল ভারত ধর্মমহামণ্ডলের সাধুদের আস্তানা। ব্যারাকের মতো সারি সারি ঘর, আর সামনের দিকে প্রকাণ্ড অঙ্গন। গাছে গাছে যেন একটি জঙ্গলের মতো, আর সেইসব গাছে বসে আছে বানরের দল এবং ছেলে

বকে নিয়ে বানরীর দল। সাধরা যখন ভোজনে বসতেন—পাতে পাতে মোটা মোটা রুটি, শাক আর অড়হর ডাল, বানরেরাও তখন গাছের তলায় সার বেঁধে বসে যেত, প্রসাদ পাবার জন্য। সাধরা তাদেরও পরিবেশন করতেন রুটি, ডাল আর শাক। এই বানরেরা উৎপাতও কম করে না। তবে কি জন্য জানি না, সন্ন্যাসিনী-মার ওপর বেশি কিছু উৎপাত করত না।

সন্ন্যাসিনী-মা বললেন, 'আয়, ঘরে আয়, চা করে দিই একটু চা খা।' আমি তাঁকে জানালাম, 'এইমাত্র আমি ট্রেন থেকে টাঙ্গায় করে বাড়ি পৌঁছেছি, আমার এখনও স্নান পর্যন্ত হয়নি।'

বললেন, 'বলিস কী, স্নানও করিসনি? যা শিগ্গির বাড়ি যা, সবাই হয়তো ভাবছে। স্নান-আহ্নিক সেরে একবার যদি আসতে পারিস তো আসিস।'

সেদিন থেকে প্রতিদিন তাঁর কাছে গিয়েছি, এবং দীর্ঘ সময় তাঁর ঘরেই কাটিয়ে এসেছি। যতদিন কাশীতে ছিলাম, তার মধ্যে কেবল একদিন মাত্র এর ব্যতিক্রম হয়েছে।

সেদিন ভোরে উঠেই রামনগর গেলাম। আমি আগে এ-ব্যবস্থার কিছু জানতাম না, তাই তাঁকে না জানিয়েই আমাকে যেতে হয়েছিল। পরদিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন তাঁর শিষ্যা ও সেবিকা—সুধন্যা নামে যে মেয়েটি তাঁর সমস্ত কাজ করে দেয়—তার কাছ থেকে শুনলাম, তিনি আগের দিন চা পর্যন্ত খাননি।

আমি অবাক হলাম। বললাম, 'তোমার এ কী ব্যাপার? আমি আসিনি বলে তুমি উপোস করে রইলে?'

তিনি বললেন, 'আর বলিস কেন? গয়লা এসে দুধ দিয়ে গেল, ভাবলাম সরলা আসুক তারপর চা করব। কিন্তু ক্রমেই বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে সুধন্যাকে পাঠালাম খবর নিতে। সুধন্যা রাগ করতে লাগল, বকতে বকতে খবর নিতে গেল। খবর পেলাম, বাড়িতে কেউ নেই, সবাই গিয়েছে রামনগরে। তখন আর চা কি রান্না করতেই ইচ্ছা হলো না, যোগবাশিষ্ঠ নিয়ে আসনে বসলাম। সন্ধ্যা যখন হয়ে এল তখন ভাবলাম, এখন যদি আসে তবে চা করব আর সেই সঙ্গে একটু হালুয়াও করব, ওকেও দেব, আমিও খাব। কিন্তু তুই এলিনে, রাত হয়ে গেল তখন আসনে গিয়ে বসলাম।'

আমি তাঁকে জিগ্যেস করেছিলাম, সারারাত্রি তিনি কী করে জেগে থাকেন। তিনি প্রশ্ন শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'জেগে কি আর থাকি? জাগিয়ে রাখে। সেসময় রাত কি দিন, নিদ্রা কি জাগরণ তার কি কোন হুঁশ থাকে রে। শুনে তুই আশ্চর্য হবি, এইভাবে একবার এমন বেহুঁশ হয়েছিলাম যে, প্রায় ছদিন কেটে গিয়ে তবে হুঁশ হয়েছিল। আসনে বসবার আগে একবাটি ঘি চুমুক দিয়ে আসনে বসেছিলাম শনিবারের দিন সন্ধ্যার পর, যেদিন চোখ মেললাম সেদিন শুক্রবার। আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম কি করে এমনটা হলো।'

সুধন্যা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মত অনুসারে চলত না। সে সমস্ত দিন অনশনে থাকত, সন্ধ্যার পর যবের ছাতু খেত। সে আমাকে বলেছিল, 'এই যে ব্রত, এর নাম নক্তব্রত।' সে আরও বলেছিল, 'গুরুমা এ ব্রতের মর্ম কি বুঝবেন; ধ্রুব-প্রহ্লাদ এই ব্রত করেই হরি-দর্শন পেয়েছিলেন। আমার ভক্তি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো ভক্তি। রসনাকে আমি জয় করেছি, ছাতুর সঙ্গে অবশ্য একটু ঘি হলে ভাল হয়, কিন্তু ঘি আর কোথায় পাব।' এ শুনে আমি তাকে এক সের গাওয়া ঘি কিনে দিয়েছিলাম।

সন্ন্যাসিনী-মার সম্বন্ধেও সুধন্যা মাঝে মাঝে অভিযোগ জানাত, 'আমি জল আনি ওঁর হাত-পা ধোওয়ার জন্যে, সেই জল উনি বানর দিয়ে খাওয়ান। তা খাওয়াবেন না কেন, নিজেকে তো আনতে হয় না। রান্না করতে গিয়ে এত ঘি ঢালেন, ঘর পরিষ্কার

করতে করতে আমার হাতের কি দুর্দশা হয়েছে দেখ।' সে আমাকে নিজের হাত মেলে দেখাত এবং বলত, 'আমার মতো গুরুসেবা কি সকলে করতে পারে! তবুও গুরুর কৃপা পাই না। এই তুমি দুদিন এসেছ, তোমাকে ওঁর কত প্রেম, কিন্তু আমার ওপর প্রেম দূরে থাক, একবিন্দু কৃপাও নেই।'

সন্ন্যাসিনী-মাকে সুধন্যার এই অভিযোগের কথা কিছু কিছু জানিয়েছিলাম। শুনে তিনি হাসতে লাগলেন, বললেন, 'দেখ চেষ্টা করে, ওকে ছাতু খাওয়া ছাড়িয়ে সময়মতো দুটি অন্ন খাওয়াতে যদি পারিস। যোগের নিয়ম অনশন বা অতি-ভোজন কিছুই নয়, ও সেই নিয়মই মানতে চায় না। বলে, আমার এই তপস্যা, এ হলো কঠোর তপস্যা।'

ঘিয়ের কথায় বললেন, 'জানিস, আমি অল্প ঘিয়ে কোনদিনই রাঁধতে পারিনে। সুধন্যাকে বলি, সোডা কি সাজি মাখিয়ে রেখে দে, আমিই ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলব ও সে কথা শুনবে কেন, তাহলে যে গুরুসেবার পুণ্যসঞ্চয় হবে না।'

সুধন্যার কঠোর নিষ্ঠার দিকেই একটু বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই সে সাধুরা কিরূপ কঠোর তপস্যা করেন, সে-সম্বন্ধে নানা কাহিনী আমাকে শোনাত। একদিন সে আমাকে বলল, 'সরলাদিদি, দেহধারী বিশ্বনাথ দর্শন করবেন? আমার সঙ্গে আসুন দশাশ্বমেধ ঘাটে, আমি আপনাকে দর্শন করিয়ে দেব।' দেহধারী জীবন্ত বিশ্বনাথ! আমি কৌতূহলী হয়ে সুধন্যার সঙ্গে সঙ্গে চললাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়। বড় বড় ছাতার তলায় পান্ডারা বসে আছে। একদিকে কীর্তন হচ্ছে। সুধন্যা আমাকে এককোণের দিকে নিয়ে গেল। ছোট একটা কাঠের কুঠরির মতো একটি মানুষ কোনমতে তার মধ্যে বসে থাকতে পারে, কিন্তু দাঁড়াতে পারে না। সেই ঘরের মধ্যে একজন উলঙ্গ সাধু পদ্মাসনে বসে আছেন, তাঁর চক্ষু মুদ্রিত। এমনভাবে উপবেশন করেছেন যেন মনে হচ্ছে কটিদেশে ছোট একটি কৌপীন আছে, কিন্তু সাধু সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কোন আবরণমাত্রই নেই।

কী শান্ত প্রসন্ন মুখশ্রী! আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হলো, কি পরম তৃপ্তি ইনি লাভ করেছেন যাতে দিনের পর দিন এই ভাবে একই আসনে একভাবে বসে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে না।

শুনলাম, সাধুটির নাম বিহারী চক্রবর্তী, মৌনী; দিনান্তে একবার মাত্র দুধ পান করেন। সন্ন্যাসিনী-মার কাছে গিয়ে সাধুটির কথা বললাম। তিনি বললেন, 'পূর্ববঙ্গে ওদের দেশ। সেবার গিয়ে ওদের বাড়িতেই উঠেছিলাম। তখন ও আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। বিয়ে হয়েছে, দুটি ছেলেও হয়েছে, তখন সংসারীই ছিল, কথাও বলত। ও মা, তারপরেই দেখি, কারও সঙ্গে কথা বলে না। হাতে একটা শ্লেট আর পেন্সিল, কেউ কিছু জিগ্যেস করলে পেন্সিলে স্লেটের ওপর লিখে উত্তর দেয়। বুড়ো বাপ কাঁদাকাটি করে এসে আমার পায়ে পড়ল, আর একগলা ঘোমটা দিয়ে বৌও এল আমার পা ধরতে। বল তো সরলা, আমার কী মুশকিল, কী করব আমি, যদি আমার কথা না শোনে। আমি কাশী চলে এলাম। দেখি যে, ও-ও এসেছে কাশীতে।...'*

[ক্রমশঃ]

* সরলাবালা রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯১৫—৯১৮

বিশেষ প্রবন্ধ

জগদীশচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

অসীম মুখোপাধ্যায়

জগদীশচন্দ্র বসুর* নাম মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন এক বৈজ্ঞানিকের ছবি, যিনি তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত এই বহু প্রচলিত ধারণা বা ছবিটির মাধ্যমে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ প্রকাশ ঘটে না। অর্থাৎ তাঁর সফলতম বিজ্ঞানসাধনা তাঁর কর্মবহুল জীবনের একটা বড় অংশ হলেও তথাকথিত বিজ্ঞানীদের মতো দেশ-কাল-পাত্র ভুলে তিনি নিজেকে কেবলমাত্র গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। বিজ্ঞানের চিহ্নিত গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্য ও দর্শনের জগতে এসে মিশেছে। তাঁর রচিত একাধিক প্রবন্ধ ও বিভিন্ন জনকে লেখা চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে তা বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি যেহেতু কখনো সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেননি তাই তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতি বা দেশপ্রেমের কথা আমাদের কাছে প্রায় অস্পষ্টই রয়ে গেছে। জগদীশচন্দ্রের এই গভীর দেশপ্রেমের তথাকথিত অস্পষ্ট ছবিটাকে একটু স্পষ্ট করে দেখা ও দেখানোর জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

জগদীশচন্দ্রের সারা জীবনব্যাপী বিভিন্ন কাজ-কর্মের পিছনে দেশপ্রেমের আপাত প্রচ্ছন্ন যে সুরটি নিহিত ছিল, তা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্রের কাছ থেকে। কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও জনসাধারণকে স্বদেশীভাবে উদ্বুদ্ধ করে তার মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য ভগবানচন্দ্র আজীবন বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন। নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাস ও চিন্তার ছোঁয়া দিয়ে ছেলে জগদীশচন্দ্রকে তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই ফরিদপুরে একটি সরকারি স্কুল থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলকে বিস্মিত করে জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে।[১] বাংলা স্কুলে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে জগদীশচন্দ্র দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। ফলে খুব ছোটবেলা থেকেই তাদের ব্যথা-বেদনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়। এই পরিচয়ের সূত্রে অল্প বয়সেই জগদীশচন্দ্রের মনে দেশমাতৃকার একটি অস্পষ্ট করুণ ছবি আঁকা হয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট ছবিটি ক্রমে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাস করে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোস ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এসসি. ডিগ্রি লাভ করে তিনি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পর তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা ও ভাইসরয় লর্ড রিপনের আগ্রহে সেই বছরই পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন তখন ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে একজন ইউরোপীয় অধ্যাপককে যে বেতন দেওয়া হতো, একজন ভারতীয় অধ্যাপক পেতেন তার দুই-তৃতীয়াংশ। এই বৈষম্য-মূলক আচরণের বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ জানান। সরকারি চাকরিতে ভারতীয় অধ্যাপকদের সম-মর্যাদা প্রাপ্তির দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র এক নতুন, নীরব, অহিংস প্রতিবাদের পথ গ্রহণ করেন।

* আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ও মৃত্যু নভেম্বর মাসে। জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৯ এবং মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭।

১ The Life and Work of Sir J. C. Bose—Patrick Geddes, Longmans Green & Co, 1920, London, pp. 14-16.

তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে এই ইচ্ছাকৃত অন্যায় ব্যবধান দূর না হলে অধ্যাপনার জন্য তিনি কলেজ থেকে এক পয়সাও নেবেন না। যদিও সেই সময় পিতার বিরাট ঋণের ফলে তাঁকে তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয় তবুও ভারতীয়দের এই অসম্মানের প্রতিবাদ হিসাবে দীর্ঘ তিন বছর তিনি কলেজ থেকে এক পয়সাও নেননি। অবশেষে, কর্তৃপক্ষ হার স্বীকার করে তাঁর চাকরি স্থায়ী করেন ও একসঙ্গে তাঁর তিন বছরের পাওনা টাকা দিয়ে দেন।[২] কর্মজীবনের প্রথম দিকে এই সংগ্রামের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাবের যেমন পরিচয় মেলে তেমনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধও বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের কিছু পর থেকেই জগদীশচন্দ্র মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্রের এই বিজ্ঞানসাধনা ছিল ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের একটা বিকল্প রূপ; কারণ, তখনকার ব্রিটিশ-শাসকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ভারতীয়রা আইন, সংস্কৃত-চর্চা, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু দক্ষতা দেখালেও আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় মানসিক দিক দিয়ে তারা একান্ত অনুপযোগী। ব্রিটিশ-শাসকদের এই অপমানকর মনোভাব তরুণ জগদীশচন্দ্রের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। জাতীয় অপমানের এই গ্লানি মুছে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ভারতবর্ষের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই ছিল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতপথিক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'দিনপঞ্জী'তে লিখেছেন: "প্রকৃতপক্ষে, এটা হলো একধরনের নীরব সংগ্রাম, যার সঙ্গে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটা ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"[৩] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি-রক্ষার উদ্যোগ সম্পর্কে হরি সিং গৌরিকে লেখা একটি চিঠি থেকে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানসাধনাকে যে ভারতের মুক্তিসাধনার একটা পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেখানে জগদীশচন্দ্র লেখেন: "আমি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বতোমুখী কর্ম-ধারার একজন উৎসাহী সমর্থক। আমি নিজে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কর্মধারার অঙ্গীভূত একটিমাত্র পথ অনুসরণ করে চলেছি। সে হলো জ্ঞানবিস্তারের পথ। আমি দীর্ঘদিন ধরে যে-বিষয়ে চিন্তা ও অনুশীলন করছি তার বাইরে অন্য কোন ভূমিকায় জনসাধারণের কাজে আত্মপ্রকাশ করব না —এই আমার ব্যক্তিগত মনোভাব।"[৪]

প্রথম পর্বের গবেষণা সম্বন্ধে বিদেশী বৈজ্ঞানিক-দের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও তথ্যের সর্বাধিক স্বীকৃতি জগদীশচন্দ্রকে নতুনভাবে গবেষণায় উৎসাহিত করে। নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যকে ইউরোপবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞানী-সম্মেলনে তাঁর তৈরি বিদ্যুৎতরঙ্গ-পরিমাপক যন্ত্র ও তার গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা দেবীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঐ দিন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ, যেমন জে. জে. টমসন, অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে লর্ড কেলভিন ও অলিভার লজ যখন তাঁকে ইংল্যান্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তখন জগদীশচন্দ্র তাঁর জবাবে বলেন: "আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা

২ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—মনোজ রায় ও গোপাল ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী প্রকাশনী সংস্থা, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ: ২৬

৩ ভারতবর্ষ: দিনপঞ্জী (১৯১৫-১৯৪৩)—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদ: অবন্তীকুমার সান্যাল), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ: ২১৩

৪ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৮-২৩৯

হইলেই জীবন ধন্য হইবে।"[৫] বিনা দ্বিধায় জগদীশচন্দ্র যেভাবে বিদেশের মর্যাদাজনক পদগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মধ্য দিয়েও জগদীশচন্দ্রের সুতীব্র দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান-কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে গর্বভরে লেখেনঃ "সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে-বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!"[৬]

বিদেশে জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন ঠিক তেমনি তাঁর বিপুল খ্যাতি কোন কোন বিজ্ঞানীর, বিশেষ করে শরীরতত্ত্ববিদদের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জগদীশচন্দ্র 'উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া' নামে যে প্রবন্ধটি জমা দেন তা চুরি করে ওয়েল (Walle) নামে একজন বৈজ্ঞানিক তা নিজের নামে প্রকাশ করেন। অবশ্য অধ্যাপক ভাইমস-এর চেষ্টার ফলে লেখাটি জগদীশচন্দ্রের বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু একশ্রেণীর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের এই নীচতা জগদীশচন্দ্রকে দারুণভাবে আঘাত করে। তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণার পরিচয় মেলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লেখেনঃ "তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য। আমি একাকী পথ খুঁজিয়া ক্লান্ত, কখন একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই। সেই মাতৃস্বর ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই…। আমার আর কে আছে?"[৭] তাঁর লেখা এই চিঠির প্রত্যেকটি ছত্রের মধ্যে তাঁর গভীর দেশপ্রেম বড় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের নীচতায় ব্যথিত জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন যে, তাঁর মতবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করবেন। তাঁরই ফলে তাঁর প্রথম বই—Response in the Living and Non-living প্রকাশিত হলো। ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তিনি তাঁর প্রথম বই উৎসর্গ করলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে —"To my countrymen, this work is dedicated."[৮] গবেষণার পথে নিরন্তর বাধা পাওয়া সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র তাঁর জন্মভূমির সম্মানবৃদ্ধির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার একটি চিঠির মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্রের এই মনোভাব বড় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে লেখেনঃ "একটি আশঙ্কায় জগদীশচন্দ্র সর্বদা তাড়িত হয়েছেন, যদি কোন একটি ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় তাঁর

৫ ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক জগদীশচন্দ্র—দিবাকর সেন, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১১

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ১২৪

৭ পত্রাবলী—জগদীশচন্দ্র বসু (সম্পাদনা: পুলিনবিহারী সেন), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী সমিতি, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ৮৬

৮ Response in Living and Non-Living—Jagadish Chandra Bose, Longmans Green & Co. London, 1902, Preface.

দেশবাসীর কোন অধিকার নেই তাই যেন প্রমাণিত হয়ে যাবে।”[৯]

নিরলস বিজ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্র যেমন পাশ্চাত্য-জগতে ভারতকে সম্মানের আসনে বসাবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি বিজ্ঞান ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিভাবে ভারতের মহিমা প্রচার করা যায় সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে। এই চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি ইংরেজী অনুবাদ করার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে ইউরোপবাসী সরাসরি রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপভোগ করতে পারবে ও ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের এতদিনকার খারাপ ধারণার পরিবর্তন হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জগদীশচন্দ্র যখন এই চিঠি লেখেন তখন সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা এদেশে খুব বেশি হয়নি। তাঁর জীবনের অন্যান্য কাজকর্মের মধ্য দিয়েও তাঁর স্বদেশচেতনার পরিচয় মেলে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মহৎ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে কবিতা রচনায় জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[১০] ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে গয়াতে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে মৃতপ্রায় বাঙালী জাতিকে আত্মশক্তিতে জাগিয়ে তোলার জন্য দেশাত্মবোধক গান লেখার অনুরোধ করেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল ‘বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ’ নামক বিখ্যাত স্বদেশী গানটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন: “বলা বাহুল্য, মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধক মহান সঙ্গীত ‘আমার দেশ’ রচনা করেন।”[১১] কেবলমাত্র ‘আমার দেশ’ই নয়—‘বন্দেমাতরম’ জাতীয়সঙ্গীত হতে পারে কিনা এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রের উত্তরে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র লেখেন: “যাহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, এ-ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।”[১২]

জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দির তাঁর স্বদেশকল্যাণ-চিন্তার এক প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বসু-বিজ্ঞানমন্দির তথা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার পিছনে প্রত্যক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিসেস সারা ওলি বুলের বিরাট আর্থিক সাহায্য এবং ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতার বিরাট ভূমিকা আছে। পরোক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল ক্রিয়াশীল।) ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর এই বিজ্ঞানমন্দির জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নিজের হাতে তাম্রফলকে তিনি লেখেন: “ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞানমন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।” এই বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকায় যোগ দিতে না পারলেও আমেরিকা থেকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে যে চিঠি লেখেন তার মধ্য দিয়েও এই বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে জগদীশচন্দ্রের কী তীব্র দেশপ্রেম কাজ করেছে তা ধারণা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন: “এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এতো তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত

৯ Letters of Sister Nivedita—Ed., Sankariprasad Basu, Vol-II, Nababharat Publishers, Calcutta, 1982, pp. 555-559

১০ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬

১১ ঐ, পৃঃ ২৩৭-২৩৮

১২ ঐ, পৃঃ ২৩৭-২৩৮

দেশের সংকল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল। তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে··· তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।"[১৩]

বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য ছাড়াও তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা তথা আন্দোলন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের চিন্তা যেমন ছিল স্পষ্ট তেমনি তার সঙ্গে যোগাযোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। কারা রাজনীতির কলকাঠি নাড়ে তা তিনি সহজেই ধরতে পারতেন। তাই মুখোশের আড়ালে 'লীগ অব নেশনসের' প্রকৃত রূপটি চিনে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তাই মুসোলিনী বারবার তাঁকে ইটালীতে নিমন্ত্রণ জানালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে দুজন ভারতীয় মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন জগদীশচন্দ্র ও অপরজন জওহরলাল নেহেরু।[১৪] ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যেকোন জাতীয় উদ্যোগকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র মতো সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লেখেন: "আপনার প্রতিষ্ঠান ও কাজকর্মের প্রতি আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। আমার শ্রদ্ধার প্রকাশ হিসাবে ছাত্রদের পুরস্কার দেবার জন্য ২৫ টাকা পাঠালাম।"[১৫] ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এক্ষেত্রে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে নিবেদিতার মাধ্যমেই তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের খুঁটিনাটি ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হন। শ্রীমতী লিজেল রেঁম-এর লেখা 'নিবেদিতা' নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, জগদীশচন্দ্র কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবীদের গোপনে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিপ্লবীদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থাও করতেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পুলিনচন্দ্র দাস আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার পর যখন তীব্র অর্থকষ্টে পড়েন তখন জগদীশচন্দ্র পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে তাঁকে লাঠি ও ছোরাখেলা শেখানোর জন্য একটি মাসিক ভাতায় বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে নিয়োগ করেন।[১৬] দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যতই উত্তালরূপ ধারণ করেছে ততই জগদীশচন্দ্র নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন স্বাধীনতা-আন্দোলনে। জগদীশচন্দ্রের এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগ তাঁর বিজ্ঞানসাধনা তথা বিজ্ঞানসাধনায় ভারতের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশঙ্কা করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অনুরোধ করেন, "তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদ দেখান।"[১৭]

কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনই নয় ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেও তিনি নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিদেশে বিজ্ঞান-প্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইনের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ-ছাড়াও ব্যবসা বা নিজের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ায় তিনি বিশেষ-

১৩ চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, (সম্পাদনা : পুলিনবিহারী সেন), বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ: ৬৪-৬৫

১৪ ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক জগদীশচন্দ্র, পৃ: ১০৯

১৫ Origins of the National Education Movement—Haridas and Uma Mukherjee, Jadavpur University, Calcutta, 1957, p. 297

১৬ নিবেদিতা—লিজেল রেঁম (অনুবাদ : নারায়ণী দেবী), কলকাতা, ১৯৬২, পৃ: ২৭৩-২৭৪

১৭ ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী (১৯১৫-১৯৪৩)—রোমাঁ রোলাঁ, পৃ: ২১৩

ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই উৎকণ্ঠার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তিনি লেখেন: "আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকানরা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য, উৎপাদন ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এদেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপরে পড়িবে। যদি একে একে সমস্ত জীবনধারণের উপায় পরহস্তগত হয় তাহা হইলে নির্লোপ হইবার বেশি দেরি নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও।"[১৮] দেশের শিল্পোদ্ধার সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ মেলে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমপুর সম্মিলনীতে তাঁর অভিভাষণে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মতোই ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশের স্বাভাবিক কৃষি-কার্যের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় কচুরিপানা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।[১৯] এই কচুরিপানা প্রতি-রোধের জন্যে তিনি তাঁর জ্ঞান প্রয়োগ করেন। অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার মতো ভারতের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ছিল ম্যালেরিয়া রোগ। এই সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য তিনি কতখানি চিন্তিত ছিলেন তার পরিচয় মেলে কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণের মধ্যে। সেখানে তিনি বলেন: "ব্যাধিজীর্ণ জাতীয় জীবনকে আমাদের পুনরুদ্দীপ্ত করতেই হবে —বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।"[২০] এছাড়া শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তিনি যে উদ্যোগী ছিলেন তার পরিচয় মেলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'আত্মজীবনী'র মধ্যে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "জগদীশচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর আগে এক বিরাট অর্থ বিহারের খনি অঞ্চলে শ্রমিক-কল্যাণের জন্য ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, সেই সময় এই কাজ নিষিদ্ধ ছিল। তবুও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ থেকে এই অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কিছু করার দায়িত্ব তিনি আমায় দেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত নিষিদ্ধ হলেও যতদূর সম্ভব আমি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছি।"[২১] ডন সোসাইটি পত্রিকা থেকে একথাও জানা যায় যে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

জগদীশচন্দ্রের কর্মমুখর জীবনের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অজ্ঞাত ও বিস্মৃত নানা ঘটনার অংশ-বিশেষের মধ্য দিয়ে যে ছবিটা ফুটে ওঠে তা তাঁর প্রচ্ছন্ন গভীর দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধকে বড় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে মেলে ধরে।

১৮ পত্রাবলী—জগদীশচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৩১

১৯ 'কচুরিপানা',—জগদানন্দ রায়, প্রবাসী, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩২৯, আশ্বিন, পৃঃ ৮১০-৮১৭

২০ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০

২১ ঐ, পৃঃ ২৪১

সংশোধন

মুদ্রিত: (একদা লেডি স্যাণ্ডউইচ) (উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৯৭, পৃঃ ৫৮০)

হবে: (মিঃ এবং মিসেস লেগেটের একমাত্র সন্তান—ডেভিড মার্জেসনের, পরবর্তী কালে ভাইকাউন্ট মার্জেসনের পত্নী। ভাইকাউন্ট মার্জেসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে চার্চিল মন্ত্রীসভায় যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন [১৯৪০-৪২])।

মুদ্রিত: ভূপতি রায় (উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৯৭, পৃঃ ৫৭৬)

হবে: সুপতি রায়

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অতঃপর নিধুবন। হরিদাস স্বামীর সাধনক্ষেত্র। নিধুবন বৃন্দারণ্যের শ্যামলীলা নিকুঞ্জের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক শোভায় অপরূপ স্থানটি। ছোট ছোট প্রাচীন কুঞ্জ, অসংখ্য সবুজ লতামণ্ডপের মাঝে মাঝে যাতায়াতের সরু পথ। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর-ঘেরা এই নিধুবন শ্যাম-রাই-এর নিত্য-রাসস্থলী। অমিতানন্দ বাবাজী আমাকে প্রায় টানতে টানতেই এখানে এনেছে। পথে ডানদিকে ছেড়ে এসেছি শ্রীরাধারমণ মন্দির, শেঠদের মন্দির। কোন প্রশ্ন করলেই বলেছে: "এখন এসব মন্দিরের প্রসঙ্গ নয়, পরে হবে—আজ এক চিন্তা 'শ্রীহরিদাসকে স্বামী শ্যাম কুঞ্জবিহারী' ছাড়া অন্য কথা নয়।"

নিধুবনের প্রধান প্রবেশদ্বারে বিশাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল: "দাদা, এবার ঝোলা-ঝুলি এই পাশে-বসা দারোয়ানের জিম্মায় রেখে দিন, নইলে নিধুবনের কুঞ্জগলিতে বাঁদরের হাতে সব যাবে।" তার কথামতো তাই করে এক পা এগোতেই আবার বাধা, সে বলে ওঠে: "এই প্রথম চত্বরে বাঁ দিকে দেখছেন একটি ছোট মন্দির, বিগ্রহশূন্য, এটিই কিন্তু আদি বিহারীজীর মন্দির। হরিদাস স্বামীর সময় এখানেই তাঁর আরাধ্য বিহারীজী ছিলেন। পরে বাইরে বর্তমান মন্দির তৈরি হলে সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ চত্বরটি সবটাই বাঁধানো। এরপর দ্বিতীয় ফটক পার হয়ে মূল নিধুবন এলাকায় আমরা এসে পৌঁছালাম, বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হয়। এটি প্রাচীন বৃন্দাবনের বহু আনন্দলীলার সাক্ষী। বৃন্দাবনের প্রাচীন মন্দিরাদি কালবশে লুপ্ত হয়েছিল, শ্রীমৎ মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে সেই সব লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার পায়, সেই ভাবেই এই নিধুবনও আবার লোকলোচনের সামনে ফিরে আসে তার দিব্য রাসমাধুরীর পরিচয় দিতে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বৃন্দাবনের তৎকালীন বিখ্যাত গৌড়ীয় ষড়্ গোস্বামীর জীবনে নিধুবনের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই বিহারীজীর কথাও। যদিও প্রায় একই সময়ে ষড়্ গোস্বামীর বৃন্দাবনে বিরাজকালেই এই নিধুবনে থেকে তপস্যা করেছিলেন আর একজন বিখ্যাত সাধক, যাঁর প্রেমের টানে বৃন্দাবনবিহারী এই নিধুবনেই প্রকট হন। সেই রসিক সাধক—হরিদাস স্বামী। আজ তাঁর তপঃক্ষেত্র দর্শনেই আমরা এসেছি এখানে।

নিধুবন চত্বরে ঢুকেই অমিতানন্দ বাবাজী সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—সর্বাঙ্গে ব্রজরজঃ মেখে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আমায় বলল—"দাদা, একটু কৃষ্ণস্তুতি করুন—এই লীলাস্থলে তাঁর বন্দনা দিয়ে আমাদের তীর্থপরিক্রমা শুরু হোক।" সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে আমার মনে পড়ল বিখ্যাত স্তবটি—তাই সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলাম—

"এহি মুরারে কুঞ্জবিহারে, এহি প্রণতজনপান্থ।
হে মাধব মধুমথন বরেণ্য, কেশব করুণাসিন্ধো।
রাসনিকুঞ্জে গুঞ্জতি নিয়তং ভ্রমরশতং কিল কান্ত।
এহি নিভৃতপথপান্থ ॥
ত্বামিহ যাচে দর্শনদানং হে মধুসূদন শান্ত।"

কুঞ্জবিহারীর এই নিভৃত লীলানিকেতনে পা ফেলতে সত্যিই সঙ্কোচ হচ্ছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল কত যুগ—কত যুগ আগে এখানেই বৃন্দাবনবিহারীলাল প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে কত নৃত্য ছন্দে মাতিয়ে তুলেছিলেন ভক্তচূড়ামণি রসিকশ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনাদের। জগতের সব আকর্ষণ তুচ্ছ বোধ করে তাঁরা ছুটে আসতেন তাঁদের জীবন-সর্বস্ব পরমাত্ম-স্বরূপ কৃষ্ণচরণে আত্ম-নিবেদনের জন্য। তাঁরা জানতেন কৃষ্ণ কে, আর তাঁরাই বা কে। তাই তো তাঁরা বলতে পেরেছিলেন: "ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্।" সর্বান্তর্যামীকে বাইরে এনে, অন্তরের আনন্দসত্তাকে বাইরে রূপ দিয়ে সেই রূপ-

সায়রে ডুব দিয়ে অমৃতত্বলাভের আশায় গোপিনীরা পাগলিনীর মতো ছুটে ছুটে আসতেন যমুনা-পুলিনে, এই নিধুবনে। সেই নিধুবনে আজ এসেছি। এসেছি কৃষ্ণলীলা-রসসাগরে রসাস্বাদন করতে। এসেছি কৃষ্ণভক্তের জীবনকথার অনুচিন্তন করতে। শ্রীকৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত এক। ভক্তকথার স্মরণে কৃষ্ণের কৃপালাভ সহজে হয়। তাই শাস্ত্র বলছেন: "আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চনম্॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা। সর্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চনাৎ॥" ভগবৎলীলা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা সাধক-চূড়ামণি হরিদাস স্বামীর কথাও শুনব বলে এখানে এসেছি।

নিধুবনে প্রবেশ করে কুঞ্জেশ্বরী শ্রীমতী রাধা-রানীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ডানদিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই পৌঁছালাম একটি মন্দিরের মতো স্থানে। বেশ বড় একটি নাটমন্দির—প্রায় চতুষ্কোণ, তার সংলগ্ন তিনটি ঘর। মাঝেরটি বড়, দুপাশের দুটি ছোট। মাঝের ঘরেই হরিদাস স্বামীর সমাধি। এটা তাঁর সাধনস্থলীও। এখানেই দেখা হলো রাধিকাদাস বাবাজীর সঙ্গে, তিনি দীর্ঘদিন শ্রীবৃন্দা-বনের সেবা করছেন। এই নিধুবনই তাঁর দিনের বেলার ভজনস্থান। রাত্রে চলে যান কালাবাবুর কুঞ্জে। অমিতানন্দ বাবাজী তাঁকে দেখতে পেয়েই আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। তিনি তখন খুব তন্ময় হয়ে একটি পাতার ঝাড়ু দিয়ে নিধুবনের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে ইঙ্গিতে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। অল্পক্ষণ পরেই ঝাড়ুটি চাতালের একপাশে রেখে হাতটি মাথায় মুছে নিয়ে আমাদের কাছে এসে "রাধে-রাধে" বলে ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে আমার হাতদুটি ধরে কাছে এসে বসলেন, মন্দিরের একটু তফাতে অথচ মন্দিরের সবকিছু যাতে দেখা যায় এমন স্থানে। ইনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন ড্রয়িং টিচার। সুদর্শন অথচ তপোক্লিষ্ট বাবাজীর শরীরে কোন বৈষ্ণবীয় চিহ্ন নেই। একটি মার্কিনের টুকরো বহির্বাস হিসাবে হাঁটু পর্যন্ত কোমরে জড়ানো, খালি গা, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, গলায় একটি সুতোয় শুধু একটি তুলসী-কাঠের দানা। কিন্তু চোখদুটি অপূর্ব সুন্দর টানাটানা। চোখের চাউনি বড় উদাস। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন: "ও বাবা, এ যে দেখছি বড় চেনা মুখ! সে আলোক লুকালো কোথায়? এতদিন পরে একেবারে সন্ন্যাসীর বেশে, তাও পাগলা অমিতের সঙ্গে…", ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে আন্দাজ করেই আমি তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বললাম "থাক্ বাবাজী আর উচ্ছ্বাসের দরকার নেই—এখন দয়া করে আপনি পাগলা অমিতকে একটু সাহায্য করুন, সে আমাকে এই বনের উপাস্য দেবতা ও তার সাধকের কথা শোনাবে বলেই আপনার কাছে এনেছে। আমার কথা শোনানোর চেয়ে আপনার কথাই শোনার আগ্রহ আমার এখন প্রবল, দয়া করুন।" উদাস চোখের চাউনি আরও প্রশান্ত হলো। এখন দৃষ্টি আমাকে ছেড়ে সামনের মন্দিরের দিকে ঘুরে গেল। তারপর স্থির হলো সেই দৃষ্টি। বোধহয় ডুব দিলেন হৃদয়সাগরে। সেখান থেকে তুলে আনবেন ভক্তকথামৃত।

হ্যাঁ, তাই। একটু পরে প্রায় আত্মস্থভাবেই বলতে শুরু করলেন: "এই যে নিধুবন—একে প্রাচীনেরা বলতেন নিধিবন অর্থাৎ বহুমূল্যবান সম্পদস্বরূপ এই বন। বৃন্দারণ্যের দ্বাদশ অরণ্যের মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনবাসী ও বিশ্বাসী বৈষ্ণবভক্তের বিশ্বাস আজও এখানে নিত্য রাত্রে শ্যামল-কিশোর রাইকিশোরীর সাথে নিত্য রাসবিহার করেন। তাই সন্ধ্যার পর এখানে কারও প্রবেশ নিষেধ। এমনকি বনচর বাঁদরেরাও বনের বাইরের ঐ চত্বরে চলে যায়। তখন এই নিধুবন মেতে ওঠে দিব্য আনন্দে, নৃত্য-গীতে। বনের বৃক্ষলতা আর কৃষ্ণসখা ময়ূরেরাই একমাত্র তার সাক্ষী থাকে। যদি কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কখনো থেকে যায় এই নিধুবনে, সে আর ফিরে পায় না তার জীবন। অপর মানুষকে এসে বলতে পারে না তার রাত্রের দর্শন অনুভূতির কথা। এ মহাপবিত্র স্থান, অনুভূতিবান সমর্থ সাধক ছাড়া রসবেত্তা প্রেমিক তপস্বী ছাড়া তখন এস্থানে প্রবেশ অসম্ভব।

"আজকের এই শহরের মাঝখানে প্রাচীর-ঘেরা

নিধ্যুবন পূর্বের অরণ্যের সামান্য অবশেষ মাত্র। প্রায় পাঁচশো বছর আগের এই বনাঞ্চল ছিল গভীর অরণ্য। ঘরবাড়ি, মন্দির, রাস্তা কিছুই তখন এরকম ছিল না, ছিল অপূর্ব শোভা সৌন্দর্যময় অরণ্য—তমাল-কদম্ব গাছে ঘেরা অসংখ্য লতাবেষ্টিত কুঞ্জাবলী। সেই অরণ্যে সম্ভবতঃ ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে এসে হাজির হয়েছিলেন আলিগড়ের রাজপুর গ্রাম থেকে বিপত্নীক বৈরাগী পঁচিশ বছর বয়সের হরিদাস। এখানে এসে বাবার কাছেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে গভীর সাধনভজনে তিনি ডুবে যান। তাঁর সাধনধারা ছিল বিচিত্র। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃন্দাবনবাস বিহারীলাল এবং বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা ছাড়া অসম্ভব। আর সেই বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণময়ীর কৃপা পেতে হলে তাঁর সেবা করতে হবে, তাঁর প্রসন্নতা লাভ করতে হবে। এই সেবার ভাবটি অন্তরে নিয়ে তিনি নিজেকে তাঁর সহচরী ললিতা জ্ঞান করে ভজনে মত্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সাধন-উপকরণ ছিল প্রধানতঃ সঙ্গীত। অপূর্ব কণ্ঠের অধিকারী হরিদাস গান গাইতে গাইতে ভাব-সমুদ্রে ডুবে গিয়ে নওলকিশোর আর রাইকিশোরীর প্রেমরসাস্বাদন করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর দিব্যগীতির শ্রোতা তখন ছিল ঐ বনবৃক্ষ-লতা আর শাখাবিহারী মর্কট-ময়ূরেরা।

"তবে এই সঙ্গীতের মূল শ্রোতা ছিল অবশ্যই দিব্য ক্রীড়ারত শ্যামলকিশোর ও রাইকিশোরী। ভাব-দৃষ্টিতে হরিদাস স্বামী তাঁদের দর্শন করতে করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গীত রচনা করে গান গেয়ে যেতেন। ললিতা সখীর ভাবে ভাবিত হরিদাস স্বামী কৃষ্ণলীলার নিত্য প্রবাহিত রসমাধুরী প্রকট করার জন্য নরশরীরে এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণলীলার স্থূলজাগতিক বিকৃতি দেখে ব্যাকুল হয়ে প্রকৃত রসতত্ত্ব নিজজীবনে অনুভব ও জগতে প্রচারের জন্য সংসার ছেড়ে এই নিধ্যুবনে এসে সাধনা শুরু করেন। সে-সাধনা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রিয়তমের মনোরঞ্জন। বাংলাদেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সাধক-কবিরা যেমন গানের মধ্য দিয়ে জগজ্জননীর আরাধনা করে গিয়েছেন, তাঁদের দর্শন পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছেন, এখানেও তেমনি এই হরিদাস স্বামী নিজের সুরলহরীতে শ্যাম-শ্যামার রসতত্ত্ব মহিমা ব্যাখ্যায় ডুবে গিয়েছেন। সুগন্ধ লুকানো যায় না। দূরদূরান্তর থেকে সঙ্গীতানুরাগী ভক্ত, রাজা-মহারাজারা আসতে লাগলেন এখানে গীত-সুধারস পান করতে। কিন্তু নিস্পৃহ নিষ্কিঞ্চন বিবিক্ত সাধক কোন দিকেই লক্ষ্য না করে মত্ত হয়ে রইলেন প্রিয়তমের 'কেলি গানে'। এই ভাবেই রচিত হলো তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কেলিমাল'। কেলিমাল অপূর্ব ভক্তিভাবসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এটি তিনি চির-কিশোর কুঞ্জবিহারী ও চিরকিশোরী রাধার নিত্য-বিহার লীলা দর্শন করে কথোপকথনের মাধ্যমে রচনা করেছেন। কেলিমাল ছাড়া তাঁর রচিত 'অষ্টাদশসিদ্ধান্ত' তাঁর সখী-সম্প্রদায়ের সাধকদের সাধনার তত্ত্বগ্রন্থ হিসাবে নির্দিষ্ট। এতে আঠারোটি পদে তিনি তাঁর সাধনধারা বলে গিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে তিনি 'সখী-সম্প্রদায়' বলে পরিচিতি দিয়ে গেছেন। যমুনাতীরের টাটিয়া স্থানের সাধকেরা এই সখী-সম্প্রদায়ের সাধক। হরিদাস স্বামীর ভাই-এর বংশের গোস্বামীর এবং বহু গৃহী ভক্তরাও সংসারে থেকে এই সখীভাবেরই সাধনা করেছেন।" রাধিকাদাস বাবাজী থামলেন। আর তার পরেই নিতাইদাস বাবাজী এমন একটি কথা বললেন যা এই বিষয়ে জানতে আমাকে আরও আকৃষ্ট করল। তিনি বললেনঃ "জানেন ভাই, আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন এই নিধুবনেই তাঁর দেখা হয়েছিল এক সাধিকার সঙ্গে, তিনি গঙ্গামাঈ নামে খ্যাতা। এই গঙ্গামাঈ ছিলেন এই সখী-সম্প্রদায়ের সাধিকা—তিনিও নিজেকে ললিতা সখী জ্ঞান করে নিধুবনে সাধন করেছিলেন। ঠাকুরের মহাভাব অবস্থা দেখে তাঁকে তিনি 'প্যারী' অর্থাৎ রাধারানীর অংশভূতা বলে মনে করেছিলেন আর সেই ভাবেই তাঁর সঙ্গে আচরণ করতেন। ঠাকুরও এই ভাবময়ী সাধিকার টানে সেখানে থেকে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরই কাছে। বিহারীজীর মাহাত্ম্য শুনে, বিহারীজীর মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে ঠাকুর দিব্য আনন্দে আপ্লুত হন। এসব কথা লীলাপ্রসঙ্গেই আছে।" আমারও মনে পড়ল সেসব কথা। এই নিধুবন—শ্রীরামকৃষ্ণ-পদধূলিপূত। তাঁর মহাভাবের স্মৃতিজড়িত এই নিধুবন আমার কাছে তাই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

বাহাই ধর্ম ও সম্প্রদায়

নমিতা ঘোষ রায়

আরবের ঊষর জমি ও মরুভূমির বাসিন্দা পরস্পর কলহ এবং যুদ্ধরত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিকে হজরত মহম্মদ কোরানের পবিত্র ও ছন্দোময় দিব্য সঙ্গীত-গাথার মাধ্যমে ইসলামধর্মের পতাকাতলে একত্রিত করেছিলেন। কথিত আছে, হজরত মহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—এক হাজার বছর পর একজন ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ এবং তারপর আরও একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন, যাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করবেন। মহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের ঠিক এক হাজার বছর পর আলি মহম্মদ ইরানের দক্ষিণে সিরাজে জন্মগ্রহণ করেন। জনসমক্ষে তাঁর পরিচয় ছিল 'বাব' নামে, যার অর্থ হলো—"বিশ্বে ঈশ্বরের নয়া সাম্রাজ্যের দ্বার।"

মধ্য যৌবনে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে প্রচার করেন এবং নিজের দেশে প্রচারের পর পবিত্র শহর মক্কাতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমক্ষে এই কথা বলেন। তাঁর উপাসনাপদ্ধতি ছিল অনুষ্ঠানবর্জিত এবং সংস্কারমুক্ত। কট্টর মৌল-বাদীরা এর বিপক্ষে যায় এবং রাজার সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে পরে হত্যা করে।

বাব শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু সুন্দর ছন্দোময় কাব্যে তাঁর বাণী তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বাব তাঁর অনুগামিগণকে বলেছিলেন: "একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধি আসবেন—তোমরা তাঁকে চিনতে ভুল করো না।" ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাহাউল্লাহ নিজেকে হজরত মহম্মদ এবং বাব নির্দিষ্ট 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে প্রচার করেন আক্কাতে নির্বাসিত অবস্থায়। পরবর্তী কালে বাহাউল্লাহ যে সমন্বয়-মূলক উদার ধর্মমতের প্রচার করেন তাঁর নাম অনুসারে সেই ধর্মমত বাহাইধর্ম নামে পরিচিত হয়।

বাহাউল্লাহ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ইরানের এক বিশিষ্ট রাজপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণের পার্থক্য অতি অল্প বয়সেই ধরা গিয়েছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাহাউল্লাহ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজার অনুরোধ উপেক্ষা করে রাজসভা ত্যাগ করেন এবং ঈশ্বর-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেন। বাব প্রচারিত অনুষ্ঠানবর্জিত সংস্কারমুক্ত ঈশ্বর উপাসনা-পদ্ধতি বাহাউল্লাহ গ্রহণ করেন এবং তাকে পরিমার্জিত করে একটি নতুন ধর্মমতে পরিণত করেন।

বাবের মতোই বাহাউল্লাহ মৌলবাদিগণের প্ররোচনায় রাজশক্তি কর্তৃক নিগৃহীত হন। তাঁকে অন্ধকার কারাগৃহে বন্দী করে রাখা হয় খুনী ও ডাকাতদের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়। বন্দী অবস্থায় তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্দেশ পান যে, তাঁর বিজয় হবে। এর পর বাহাউল্লাহ এবং তাঁর পরিবারকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বাগদাদে নির্বাসিত করা হয়। বাগদাদে তাঁর মতাদর্শ প্রচারিত এবং আদৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সুদূর ইস্তাম্বুলে এবং তারপর আক্কাতে বন্দী করে রাখা হয়। এখানেই ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মে বাহাউল্লাহ দেহত্যাগ করেন।

বাহাউল্লাহ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি প্রার্থনাগীতি। বেশিরভাগ গ্রন্থে তিনি তার মতবাদ প্রচার করেন। বাহাইধর্মের মূল নীতি, শিক্ষা এবং পরিচালন ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থসমূহ তাঁর গভীর প্রজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়বাহী। প্রচলিত ধর্মসমূহের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা এবং তার কুফল, বিভেদ-নীতি, অন্যায়-অবিচার-প্রসূত ক্লেশ—যাকিছু মানব-জাতির পক্ষে অহিতকর, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বাহাউল্লাহ আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তাকে বাহাউল্লাহ সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন এবং একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা স্থাপনার কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির বিঘ্নকর কারণগুলি দূর হয়ে বিশ্বশান্তি আসবে। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যবোধ

জাগ্রত করে জন্ম দেবে এক নতুন সভ্যতার। বাহাই-ধর্মের মূল নীতি হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ নিজের জীবনে উপলব্ধি করা এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। পুরোহিত, মোল্লা ও যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ-বিহীন এই ধর্ম প্রতিটি মানুষকে সত্যকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয়।

বাহাইধর্মের ভবিষ্যৎ অনুগামিগণের কথা চিন্তা করে, বাহাউল্লাহ তাঁর ধর্মমতকে সাধারণের অনুসরণযোগ্য করার জন্য 'বাহা বিশ্বনীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতি বাহাইধর্মের অনুগামিগণের অবশ্যপালনীয়।

বাহা বিশ্বনীতি

মানবজাতির একত্ব

দেশ জাতি ও গাত্রবর্ণের সংস্কারমুক্ত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মানবজাতির ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করবে। এই প্রসঙ্গে বাহাউল্লাহ বলেছেন—মানবজাতি এক ঈশ্বরের সন্তান এবং পরমপিতা ঈশ্বরকে আন্তরিক ভালবাসা পৃথিবীর সমগ্র নর ও নারীকে ভ্রাতা ও ভগিনী বোধে প্রতিষ্ঠিত করবে। ঈশ্বর সমদর্শী, তাই সমদর্শী হওয়াই বাহাই অনুগামীদের উদ্দেশ্য।

কুসংস্কার বর্জন

কুসংস্কারের পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা সম্ভব নয়। তাই সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

স্বাধীনভাবে সত্যের উপলব্ধি

খণ্ড এবং বিকৃত সত্যকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করার ফলে বিভেদজনিত নানা সমস্যা ও দুঃখের সৃষ্টি। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা স্বকীয় সত্যের উপলব্ধি খণ্ড সত্য ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে এক অখণ্ড মানবজাতির চেতনায় মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন

বাহাউল্লাহর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক। বিজ্ঞানকে ধর্মের বাহন করার শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োগ করার কথা বলেছেন।

সার্বজনীন ভাষা

ভাষা মানুষের মধ্যে ব্যবধান এবং একত্ববোধ দুই-ই আনয়ন করে। পৃথিবীব্যাপী একটি সার্বজনীন ভাষার প্রসারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সার্বজনীন শিক্ষা

প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত হতে হবে এবং শিক্ষা-পদ্ধতি এইরূপ হবে যে, প্রতিটি শিশু পাঁচটি মহাদেশ এবং অগণ্য দেশের সমষ্টি পৃথিবীকে একটি মাত্র দেশ এবং পৃথিবীবাসী মানুষকে একটি মাত্র জাতি--মানবজাতি মনে করে এই দেশ এবং জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

এ ছাড়া বাহাউল্লাহ পৃথিবীর ঐক্য সম্পাদনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসঞ্চয় এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনটন সামাজিক অসাম্য আনয়ন করে, অতএব তা বর্জনীয়। বাহাউল্লাহ একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের চিন্তাও করেছিলেন।

পরিচালন ব্যবস্থা

প্রত্যেক ধর্মেই কয়েকজন বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক সেই ধর্মের ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁদের অনুশাসনে ধর্মানুগামিগণ পরিচালিত হন। উদাহরণ স্বরূপ হিন্দুধর্মের পুরোহিতগণ, ইসলামধর্মের মোল্লা বা ইমাম এবং খ্রীস্টধর্মের যাজক সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। বাহাইধর্মের বৈশিষ্ট্য—এই বৃত্তিভোগী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন। বাহাউল্লাহ বলেছেন, সত্যকে প্রতিটি মানুষের জীবনে উপলব্ধি করতে হবে নিজস্ব প্রচেষ্টায়—বিশ্বাস এবং প্রার্থনাকে পাথেয় করে। এক পরাশক্তিতে বিশ্বাস এবং তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা এই ধর্মের মূল মন্ত্র। বাহাউল্লাহ তাঁর পুত্র আবদুলবাহাকে তাঁর লিখিত উপদেশসমূহের ব্যাখ্যাতা এবং 'বাহা বিশ্বনীতি'র প্রয়োগকর্তা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। পরবর্তী কালে সোফি এফেন্দী আবদুলবাহার উত্তরসূরী নির্বাচিত হন। সোফি এফেন্দী আবদুলবাহার দৌহিত্র ছিলেন। বাহাই অনুগামিগণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য বাহাউল্লাহ একটি কার্যনির্বাহী ব্যবস্থার

পরিকল্পনা করেন। কয়েকটি শাখায় বিভক্ত এই কার্যনির্বাহী ব্যবস্থা।

(১) স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ (Local Spiritual Assembly): কয়েকটি গ্রাম বা জেলা বা শহর-কেন্দ্রিক এই পরিষদ পরিচালিত হয় স্থানীয় বাহাইদের ভোটে নির্বাচিত কর্মীদের দ্বারা। ২১ বছরে ভোটাধিকার। কর্মীর নীতি-নিষ্ঠা, সেবা এবং শ্রমে আন্তরিকতা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে প্রত্যেক ভোটদাতা নয়জন কর্মীর নাম লিখিতভাবে পেশ করেন। প্রতি বছর ২১ এপ্রিল সূর্যাস্তের মধ্যে এই ভোটপর্ব শেষ করতে হয়। ২১ এপ্রিল 'রিদ্‌ভান গার্ডেন'-এ বাহাউল্লাহ নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করেছিলেন। কোন কারণে ২১ এপ্রিল ভোটপর্ব সম্ভব না হলে পরের বছর ঐ দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ভোটদাতারা একটি স্থানে মিলিত হয়ে সমবেত প্রার্থনাশেষে ভোটপত্র দাখিল করেন। সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত নয়জন সদস্য একবছরের জন্য পরিষদের কাজ নির্বাহ করার জন্য নির্বাচিত হন। স্থানীয় বাহাইদের স্বার্থ রক্ষা, তাঁদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সমস্যার সমাধানকল্পে সাহায্য করা এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির প্রসার এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিচালনকার্য নির্বাহ করার জন্য একজন চেয়ারম্যান, সহকারী চেয়ারম্যান, সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়।

(২) জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ (National Spiritual Assembly): এই পরিষদ একটি দেশের বাহাই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর বাহাইদের যোগসূত্র স্থাপন করে। দেশের প্রতিটি কেন্দ্র থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে স্থানীয় পরিষদের মতোই জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। জাতীয় পরিষদ বিভিন্ন স্থানীয় পরিষদের কার্য পর্যালোচনা করে, সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে এবং পত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠায়। স্থানীয় পরিষদের মতোই জাতীয় পরিষদে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়ে থাকে।

(৩) আন্তর্জাতিক নীতি-পরিষদ (Universal House of Justice): এই পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদের মাধ্যমে। বাহাউল্লাহ এই পরিষদের রূপরেখা নির্ধারণ করে ঘোষণা করেছিলেন যে, যতদিন বাহাইধর্মের অস্তিত্ব থাকবে তিনি ততদিন এই সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করবেন। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রচলিত নীতির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে একথা চিন্তা করেই তিনি এই পরিষদকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংযোজন করার দায় অর্পণ করেছিলেন। বাহাউল্লাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই পরিষদের চালক স্বয়ং ঈশ্বর এবং সেহেতু এর নির্ধারিত নীতি এবং গৃহীত প্রস্তাব হবে নির্ভুল ও সর্বজনহিতকারী। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নীতি পরিষদের পত্তন হয়।

বাধ্যতামূলক নিয়ম

প্রচলিত ধর্মসমূহের বাহ্যিক পালনীয় নিয়মবিধির মতো বাহাইধর্মেও কয়েকটি অবশ্যপালনীয় নিয়ম আছে। পরিচ্ছন্নতা—বেশভূষা, বাসগৃহের পরিচ্ছন্নতা, নিত্যস্নান এবং পরিচ্ছন্ন খাদ্য গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য।

প্রার্থনা—প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় বাহাউল্লাহ এবং আবদুলবাহাকৃত প্রার্থনা ও স্তবপাঠ অবশ্যকর্তব্য। সভা-সমিতি, প্রীতিসম্মেলন, বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের প্রথমে এবং সমাপ্তিতে প্রার্থনা করতে হবে। বাহাইদের এই নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। বাহাউল্লাহ বলেছেন: "প্রার্থনা মন ও আত্মার প্রকৃষ্ট খাদ্য।"

উপবাস—ইসলামধর্মের রমজান মাস উদ্‌যাপনের মতো বাহাইধর্মেও বছরের চার-পাঁচটি দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করার রীতি আছে। এসময় অতিথি আপ্যায়ন এবং দরিদ্রদের ভোজন করানো হয়। বাহাউল্লাহ উপবাস করার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কর্মই উপাসনা—ভিক্ষাবৃত্তি এবং অলসতা এই ধর্মে নিষিদ্ধ। জীবনধারণের জন্য পরিশ্রম অবশ্যকরণীয়। বাহাইদের বিশ্বাস—সেবার মনোভাব নিয়ে কর্ম ভগবৎ উপাসনার সমতুল।

বাহাইধর্ম সামাজিক জীবন ত্যাগ করে একক তপস্যাকে অনুমোদন করেনি। বাহাউল্লাহ বলেছিলেন: "হে মর্ত্যমানবগণ, একক এবং কঠোর সংযমী জীবন এখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।" তিনি বলেছেন, অতীতে অনেকে পর্বতে অরণ্যে বাস করে কঠোর তপস্যা করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের দরকার ক্ষেতে এবং কারখানায় ঈশ্বরের উপাসনা। বাহাইধর্মে তাই সন্ন্যাসী বা সংযত উদাসীন ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না।

পৃথিবীর ৩৪০টি দেশে বাহাইদের বসবাস আছে। বাহাইগ্রন্থের অনুবাদ প্রচলিত ৭০০টি ভাষায় করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাহাই সংগঠনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারতবর্ষে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাহাইধর্মের প্রবেশ ঘটে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৩৫,০০০ এলাকায় বাহাইধর্মানুগামিগণের বসবাস আছে। ১০,০০০ স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদের মাধ্যমে কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কলিকাতাতেও একটি বাহাই রাজ্যপরিষদ আছে নিউ আলিপুরে।

পুরাতনী

ভববন্ধন ছেদনের উপায়

স্বামী অবধূতানন্দ

একদা যিনি দম্ভভরে বলেছিলেন, "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—সেই দুর্যোধন ভীমের গদাঘাতে ভগ্নোরু হয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে একাকী পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। সেনাপতি ভীষ্ম ও দ্রোণ নেই, সখা কর্ণ নেই, শত ভ্রাতাসহায়ও নেই। চারু-চামর-বীজনে কুসুমাস্তৃত স্বর্ণ পালঙ্কে যিনি নিদ্রা যেতেন, আজ তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। ভক্ষণোদ্যত শৃগাল-কুক্কুরকে অঙ্গুলি তাড়নে নিবারণের সামর্থ্যও তাঁর নেই। পার্থিব ঐশ্বর্যের তো এই পরিণাম! দুর্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সংসার-সুখের আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব ঐশ্বর্য-মান-যশ-প্রতিপত্তির লালসা সব চলে গেল। দুর্যোধনের মৃত্যু পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আঠারো দিনের পুরো ঘটনাই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন।

বুদ্ধি ও বিচারশক্তি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ ও মোহগ্রস্ত ছিলেন, যার ফলে তিনি বারবার দুর্যোধনের অন্যায় কার্য সমর্থন করেছেন এবং পাণ্ডবদের প্রতি অবিচার ও অন্যায়ভাবে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছেন। নিজ অন্যায় ও ভুল বুঝতে পেরে সংসারাসক্ত ধৃতরাষ্ট্র এখন অনুতপ্ত ও শোকসন্তপ্ত। তাই শোক নিবারণের জন্য ও মানসিক শান্তির জন্য মহাত্মা বিদুরের নিকট তিনি উপদেশ প্রার্থনা করলেন। বিদুর বললেন: "হে মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন করে সুখ-দুঃখবর্জিত হয়ে শান্তিলাভ করেন। আমরা যাকিছু চিন্তা করি সবই অনিত্য। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হয়। কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা সেরূপ একদেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ আশ্রয় করে। প্রাণিগণ স্ব-স্ব কার্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

"হে মহারাজ! যখন সংসারের ও মানুষের এরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করছেন?" মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে অতঃপর বহু সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়েছিলেন, জীবন ও দেহের অসারতা সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব বলেছিলেন। সংসারাসক্তির স্বরূপ নির্দেশ করে বিদুর এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন:

"একদা এক ব্রাহ্মণ পথ চলতে চলতে এক গভীর

অরণ্যে এসে উপস্থিত হন। দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল সেই অরণ্য; বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতি সবই আছে সেখানে। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শনে ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন হলেন। ব্রাহ্মণ দেখলেন এক ভয়ঙ্করদর্শনা নারী বাহুদ্বয় দ্বারা জাল বিস্তার করে ঐ অরণ্য বেষ্টন করে রয়েছে। ভয়ে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। প্রাণপণে তিনি ছুটে চললেন আত্মরক্ষার জন্য। ছুটতে ছুটতে ব্রাহ্মণ একটা কূপমধ্যে পড়ে গেলেন। কূপটি তৃণ ও লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত থাকায় তিনি কূপের অবস্থান বুঝতে পারেননি। সেখানে তাঁর পা লতায় আটকে গেল; পা ওপরের দিকে, মাথা নিচের দিকে—এই অবস্থায় গাছে কাঁঠাল ঝোলার মতো তিনি ঝুলতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে পড়ে গিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করলেন, তা নয়। তাঁর অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হলো। তিনি দেখলেন যে, একটা বিরাট সাপ কূপের নিচেই রয়েছে এবং ছটি মুখ, বারোটি পা বিশিষ্ট একটি কালো রঙের বিরাট হাতি কূপের পাশে একটা গাছের কাছে বিচরণ করছে। কয়েকটি সাদা ও কালো ইঁদুর ঐ গাছটিকে দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করেছে। গাছটির ডালে মৌমাছিরা চাক করেছিল। হে মহারাজ! সেই চাক থেকে অনবরত মধুধারা ঝরে পড়ছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কটসময়েও সেই মধুধারা পান করতে লাগলেন; এতেও তৃপ্ত হলেন না বরং আরও খেতে চাইলেন। ঐ অবস্থাতেও তাঁর জীবনে কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য দেখা গেল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ ভয়ঙ্করদর্শনা নারী, তৃতীয়তঃ সাপ, চতুর্থতঃ পাগলা হাতি, পঞ্চমতঃ ইঁদুরের দংশনছিন্ন বৃক্ষপতন, এবং মৌমাছির দংশন থেকে শঙ্কা বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে ঐ অবস্থায় থেকেও কোন ক্রমেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করতে পারলেন না।" বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: "হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান নিতান্ত কষ্টকর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কি নিমিত্ত সেখানে অবস্থান করতে সমর্থ হলেন, সেই স্থান কোথায় অবস্থিত এবং সেই অবস্থা থেকে ব্রাহ্মণ কিভাবে পরিত্রাণ পেলেন তা তোমার কাছে শুনতে ইচ্ছা করি।"

বিদুর বললেন: "মহারাজ! মোক্ষধর্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত উপাখ্যানকে সংসারের রূপক বলে গেছেন। মানবগণ সেসম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হয়ে সাবধানে অবস্থান করতে পারলে পরলোকে সুকৃতি লাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্বে আপনাকে যে অরণ্যের কথা বলেছি, তা আসলে এই সংসার। সেখানে হিংস্র সর্পাদি হলো ব্যাধি, আর ভয়ঙ্করদর্শনা নারী হলো রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং কূপটি হলো মানবগণের দেহ। কূপমধ্যস্থ সাপ হলো মৃত্যু। কূপমধ্যে যে লতাবিতান রয়েছে এবং যাতে ব্রাহ্মণ লম্বমান হয়ে ঝুলে আছে, তা হলো মনুষ্য-দিগের জীবনের আশা। হাতিটি হলো স্বম্বৎসর; তার ছয় মুখ ছয় ঋতু, বারোটি পা বারো মাস। সাদা ও কালো যে ইঁদুরগুলি বৃক্ষচ্ছেদন করছিল তারা হলো মানুষের আয়ুক্ষয়কর দিন ও রাত্রি। মৌমাছি হলো কাম বা বিষয়াভিলাষ, আর মধুধারা হলো কামরস, যে-রসে মানবগণ সতত নিমগ্ন থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ বর্ণন করেন এবং তাই তাঁরা তাতে বদ্ধ হন না।"

দুঃখই মানুষের আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটায়। দুঃখকষ্ট মানুষকে নিপীড়িত করে বটে, কিন্তু অনেক সময় দুঃখই মানুষের সুপ্তশক্তিকে জাগরিত করে। আগুনে দগ্ধ না হলে সোনা বিশুদ্ধতা লাভ করে না। ভগবান সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদ দিয়ে মানুষকে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে নিয়ে যান। *এ তাঁর কৃপারই নিদর্শন। ধৃতরাষ্ট্র সেই কৃপা পেলেন।*

মহা দুঃখের সময় সান্ত্বনার কথা, তত্ত্বকথা আমরা অনেক শুনতে পাই, কিন্তু মন উন্নত ও প্রজ্ঞাবান না থাকলে তাতে কিছুই লাভ হয় না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হলেও, সংসারাসক্ত হলেও তিনি প্রজ্ঞাবান ছিলেন। সংসারসুখে আসক্তি স্বাভাবিক, নির্বেদ কিন্তু দুর্লভ, হাজার আঘাতেও তা আসে না।

আমাদের সমস্ত কার্য, সমস্ত চিন্তা যদি সজ্ঞানে করা যায়, আমরা যদি প্রজ্ঞাবান হই তাহলে আমরাও সমাধি বৈশ্যের মতো, রাজা পরীক্ষিতের মতো এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতো ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হব।

[মহাভারত স্ত্রীপর্ব, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় অবলম্বনে]

প্রবন্ধ

ঈশ্বর-বীক্ষণ যন্ত্র

স্বামী সহদেবানন্দ

—মহাশয়, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

—হ্যাঁরে, এই তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখেছি। তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি।

বলাবাহুল্য, প্রশ্নোত্তরকারীরা আমাদের খুবই পরিচিত। প্রশ্নটি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ), আর উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমরা মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—এর প্রায় পৌনে তিনশ বছর পূর্বে (১৬১০ খ্রীস্টাব্দে) গ্যালিলিও তাঁর শিষ্যদের অনুরূপ একটি কথা বলেছিলেন—"তোরা যদি অণুর ক্ষুদ্র জগৎকে কিংবা দূরের বৃহৎ জগৎকে দেখতে চাস আমি দেখাতে পারি। আমি তোদের যেভাবে দেখছি তার চেয়েও পরিষ্কার ও খুব কাছে সেই সকল জগৎকে দেখতে পেয়েছি।" তিনি তাঁর শিষ্যদের এই সকল জগৎ দেখিয়েছিলেন নিজ আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ ও দূর-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। আমরা পরে দেখব দুই যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী প্রায় একই, পার্থক্য শুধু—দূরবীক্ষণে দূরের জিনিস আর অণুবীক্ষণে কাছের ক্ষুদ্র জিনিস দেখা যায়।

'ঈশ্বর আমাদের খুব কাছে—অন্তরের অন্তস্তলে (জ্ঞানীর আত্মস্বরূপ), আবার খুব দূরে (অবিদ্বান-কর্তৃক অপ্রাপ্য); ইনি বৃহৎ আবার ক্ষুদ্রও বটেন, ইনি চলেন, ইনি চলেন না; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে।' "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। / তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশ উপনিষদ্, ৫)।

এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবযুক্ত আমাদের অন্তরস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে হলে—জানতে হলে নিজ নিজ দূরবীণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই জানতে হবে—দেখতে হবে। ঈশ্বরকে দেখার—জানার বীক্ষণ যন্ত্র হলো আমাদের এই শরীর। সেজন্য শাস্ত্র বলছেন, 'শরীরম্ আদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্।'

বীক্ষণ যন্ত্র দুইটির গঠন ও কার্যপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের শরীরবীক্ষণ যন্ত্রের কোন স্থূল সম্পর্ক রয়েছে কিনা তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দুটো বিষয়ই কঠিন ও বিস্তৃত। আমরা অতি সংক্ষেপে তাই অনুধ্যান করার চেষ্টা করব। স্থূলের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মে পৌঁছানই হবে আমাদের কাছে অধিকতর সহজ।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "আত্মচৈতন্যকে আবরিত করে রয়েছে তিনটি শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা পাঁচটি কোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। মৃত্যুর পর যা পড়ে থাকে তাই স্থূল শরীর বা অন্নময় কোষ। পৃথিবী (অন্ন) থেকে এর উৎপত্তি, পৃথিবীতে এর লয় হয়। যা চলে যায় তা সূক্ষ্মশরীর সহ জীবাত্মা। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর তিনটি কোষের (প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়) দ্বারা বা সতেরটি অবয়বের (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ; পাঁচ বায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান; মন ও বুদ্ধি) দ্বারা গঠিত। স্থূলদেহ-সংলগ্ন যে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি—তারা ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ বাসস্থান (বৈঠকখানা) মাত্র। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যায়। অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত) নিশ্চয়করণশক্তিযুক্ত বৃত্তির নাম বুদ্ধি; আর সংকল্প ও বিকল্প (বিবিধ কল্পনা করার শক্তি) শক্তিমতী অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। চিত্ত ও অহঙ্কার এই মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মক আত্ম-বৃত্তির নাম চিত্ত, আর অভিমানাত্মক আত্মবৃত্তিই অহঙ্কার। বুদ্ধি আর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। এই বিজ্ঞানময় কোষকেই ইহ-পরলোক-সঞ্চারী জীব বলে ব্যবহার করা হয়। এতেই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অভিমান প্রভৃতি বর্তমান অর্থাৎ এই বিজ্ঞানময় কোষই 'অহং কর্তা, অহং করোমি, অহং ভোক্তা, অহং সুখী' এইরূপ অভিমান ধারণ করে।

মন আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এই ছয় মিলে মনোময় কোষ হয়। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ প্রকার বায়ু

মিলে প্রাণময় কোষ নাম প্রাপ্ত হয়েছে। এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষটি জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃরূপ; মনোময় কোষটি ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও করণরূপ এবং প্রাণময় কোষটি ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও কার্যরূপ।

ঈশ্বর-বীক্ষণ যন্ত্রটি দুইটি উপাদানে নির্মিত। একটি জড়। নাম দেওয়া হয়েছে 'আকাশ'। এই আকাশই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূল দেহ প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়েছে। অপরটি প্রাণশক্তি। এই প্রাণই স্নায়ুশক্তি-প্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। দেহের সমস্ত কোষগুলি প্রাণরসে জারিত হয়ে রয়েছে।

ঈশ্বর-বীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী খুবই জটিল, বোঝানো ততোধিক কষ্টসাধ্য। অতবড় জ্ঞানী ভীষ্মদেব, তিনিও শরশয্যায় শুয়ে কেঁদেছিলেন আর বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না—পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে ভগবান সদাসর্বদা রয়েছেন অথচ তাদের দুঃখের শেষ নেই!' এই দেহের মধ্যে ঈশ্বর সর্বদা রয়েছেন অথচ মানুষের দুঃখের অন্ত নেই। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেহের পঞ্চকোষ ও অহং-এর প্রতীক।

বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুকে দেখতে হলে যন্ত্রটিকে, যন্ত্রমধ্যস্থ সমস্ত যন্ত্রাংশগুলিকে, দ্রষ্টার দৃষ্টিকে ও বস্তুকে যেমন একই সরলরেখায় আনতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগ যেমন একান্ত আবশ্যক হয় তেমনি কোন বস্তুকে দেখতে হলে বা তার সম্বন্ধে জানতে হলে বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সঙ্গে যোগ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ধরুন, আপনি একমনে পড়ে যাচ্ছেন। একটা মশা কখন থেকে যে আপনার চোখের সামনে হাতের ওপর বসে আপনার রক্ত চুষে খাচ্ছে তা আপনি টেরও পাননি। যেই একাগ্রতা একটু কমে এল তখন হাতের ওপর একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন। দেখলেন, ব্যাপারটা কি! সঙ্গে সঙ্গে মারলেন এক চাপড়—লালে লাল!

ঘটনাটি কিভাবে ঘটল একটু অনুসন্ধান করা যাক। যখন আপনি একাগ্র হয়ে পড়ছেন তখন পুস্তকরূপ বিষয়, বহির্যন্ত্র চক্ষু, অন্তর্দর্শনেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটছে। ইচ্ছাশক্তি মন, চক্ষু ও বিষয়ের বিষয়াভিঘাত বেদনাকে ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রাণের সাহায্যে স্নায়ুরূপ তারের মধ্য দিয়ে (সংবেদাত্মক প্রবাহ) প্রথমে মস্তিষ্কের দর্শনেন্দ্রিয়ে নিয়ে যায়। তারপর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন তার উপাদান অনুসন্ধানাত্মক চিত্ত-বৃত্তির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে অভিমানাত্মক অহঙ্কারের (ভোক্তা জীব) মারফৎ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির নিকট পাঠায়। বুদ্ধি সমস্ত বিষয়টিকে জ্ঞানস্বরূপ এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট প্রেরণ করে। তিনি সব দেখে শুনে যা আবশ্যক, তা আদেশ করেন। আমরা আত্মার এই প্রতিক্রিয়াকে—এই সিদ্ধান্তকে বাস্তব জ্ঞান বলি। তারপর যে যে ক্রমে ক্রিয়াটি ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে প্রতি-ক্রিয়াটি বাইরে আসে। প্রথমে বুদ্ধির সাহায্যে জীবাত্মা তা উপলব্ধি করে, তারপর তা মনে এসে চিত্তরূপ খাতায় দাগ কেটে যায়, তারপর মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে। এইভাবে গভীর পাঠের সময় চক্ষু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়ে পুস্তক ও আত্মার মধ্যে যোগাযোগ হতে থাকে। এই সময় আপনার অন্য ইন্দ্রিয়গুলি—কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক খোলা রয়েছে অথচ তাদের দ্বারা কোন অনুভব করতে পারছেন না, কারণ তখন মন কেবল চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—ঈশ্বর বা আত্মা যদি সকলের মধ্যে এক হন তাহলে বাস্তবজ্ঞান সকলের এক হয় না কেন? ঈশ্বর সকলের মধ্যে রয়েছেন—তিনি এক ও অদ্বিতীয়—এতে কোন দ্বিরুক্তি নেই। কিন্তু সেই আত্মার মধ্যে যে বিষয়া-ভিঘাত ক্রিয়াটি পেঁছাচ্ছে তা আলাদা আলাদা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মধ্য দিয়ে পেঁছাচ্ছে। তাই তাদের প্রতিক্রিয়াও আলাদা আলাদা। এতে বাস্তবজ্ঞান সকলের এক হবে কী করে? স্বামীজী জ্ঞানযোগে শুক্তির উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন—একই জগৎ নানান জনের কাছে নানাভাবে প্রতিভাত হওয়ার কারণ—যে যার নিজের মনের এনামেলকে বাইরে প্রক্ষেপ করছে। বাইরের জগৎ সদাসর্বদা একভাবে রয়েছে। জগৎ হলো বালুকণাসদৃশ উত্তেজক কারণ। কিন্তু পরাজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'সব শেয়ালের এক রা'।

কারণ তখন সকল মহাপুরুষেরই মন-বুদ্ধি একেবারে স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে যায়।

যাই হোক, আমরা পূর্ব কথায় ফিরে আসি। যখন কোন কারণে চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে বা একাগ্রতা কমে যায়, তখন মন ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে অর্থাৎ প্রাণ মনকে স্থূলশরীরের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগ করে দেয়। ত্বকের বিষয়াভিঘাত (মশক-দংশনের) রশ্মি প্রাণের মারফৎ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া হয়ে এসে পড়ে জীবাত্মার ওপর অর্থাৎ ভোক্তাজীব একটি যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। তখন সে মন বুদ্ধি সজাগ রেখে অনুসন্ধান করতে শুরু করে— কেন এই যন্ত্রণা ভোগ, যন্ত্রণাটা কোথায়—শরীরের বাইরে না অভ্যন্তরে, যন্ত্রণার প্রকৃতি কিরূপ— রোগের না অন্য কিছুর, যন্ত্রণার কারণ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। বুদ্ধি নিশ্চয় করল—শরীরের বাইরে হাতের ওপর এবং তা বোধ হয় রোগের নয়। তখন বুদ্ধি তার সহকারী চক্ষুকে নির্দেশ করল যে, ব্যাপারটা কি দেখতে। দর্শনেন্দ্রিয় তার বৈঠকখানা-রূপ চোখ যন্ত্রে এসে দেখল—একটা মশা বসে রক্ত খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণের মারফৎ জানিয়ে দিল বুদ্ধিকে। বুদ্ধি ইচ্ছাশক্তি মনকে নির্দেশ দিল মারতে। মন কার্যরূপ প্রাণকে বুদ্ধির নির্দেশ জানাল। প্রাণ তার সৈন্য হস্তরূপ অস্ত্রের সাহায্যে মারল এক চাপড়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়—সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারটি প্রাণশক্তির সাহায্যে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে প্রাণ ঘটকের কাজ করছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে সমস্ত কোষগুলি প্রাণরসে জারিত রয়েছে। আবার স্থূলশরীরের মধ্যে এবং স্থূল-শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্মশরীরের সংযোগ ঘটছে স্নায়ুরূপ তারের মাধ্যমে। সূক্ষ্মশরীরের এক কোষের সঙ্গে অন্য কোষের সংযোগ ঘটছে মাধ্যম ব্যতিরেকে শূন্যপথে।

সাধারণ মানুষের বীক্ষণ যন্ত্রটি দূরবীক্ষণের মতো। বাহ্যিক (দূরের) বস্তুকে দেখার জন্য এটিকে ব্যবহার করা হয়। তাই দূরবীক্ষণের মতো মনের ফোকাসে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। অর্থাৎ মন অনুযায়ী বস্তুর জ্ঞান হয়। যার মনের গঠন যেমন সে সেইভাবে জগৎকে দেখবে। স্বামীজী জ্ঞানযোগে সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন—অন্ধকারে একটি মরা গাছকে দেখে প্রেমিক ভাবছে প্রেমিকা, ছোট ছেলে ভাবছে ভূত, চোর ভাবছে পাহারাওয়ালা। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন, এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে—শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা কাব্যের মতো আর বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে— ভাগবত। বুদ্ধিকে (eye piece) অ্যাডজাস্ট করে কেউ যদি মনের ফোকাসে-এ আনে তবে বস্তু সম্বন্ধে সে জানতে পারবে। আমরা অধিকাংশই আই পীস (eye piece)-কে অ্যাডজাস্ট করতে পারি না, তাই আমাদের এই দুর্গতি। আর যারা পেরেছে তারাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া প্রকৃত বীক্ষণের মূলে কয়েকটি প্রধান জিনিস রয়েছে। প্রথমতঃ বাইরের কাঁচের পরিচ্ছন্নতা—স্থূল শরীরের সুস্থতা, সবলতা। দ্বিতীয়তঃ objective (বীক্ষণ যন্ত্রে যে লেন্সটি বস্তুর দিকে থাকে বা বস্তুর রশ্মি যাতে পড়ে) ও eye piece (বীক্ষণ যন্ত্রে যে লেন্সটি চোখের দিকে থাকে; একে বিবর্ধক লেন্সও বলে, কারণ এর সাহায্যে বস্তুর প্রতিবিম্বকে বড় করে দেখা যায়।)-এর স্বচ্ছতা—মন-বুদ্ধির স্থিরতা ও পবিত্রতা।

মনীষীদের (সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতিদের) বীক্ষণ যন্ত্রটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। তাঁরা বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্যের অনুসন্ধান করেন। সূক্ষ্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা সত্যের আলোক দেখতে পান। অনুবীক্ষণের মতো তাঁদের বুদ্ধির focus-এ বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। অর্থাৎ তাঁরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী জগৎকে দেখেন। মন-বুদ্ধির focus-এর মধ্যেকার দূরত্ব যাঁর যত বেশি তিনি জীবনে তত প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ মনের আসক্তিভাব থেকে যিনি যত দূরে তিনি তত সত্যের নিকটবর্তী। তারপর মন-বুদ্ধির focus-এর দূরত্ব যিনি যত নিখুঁতভাবে adjust করতে পারবেন তিনি বীক্ষণে তত বেশি কৃতকার্য হবেন।

এতক্ষণ আমরা পার্থিব জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় কিভাবে দেখা যায়, অনুভব করা যায় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এখন আমরা আমাদের অতি সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বর-বীক্ষণ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে অনুধ্যান করার চেষ্টা করব।

বলা হয়েছে, ঈশ্বর বিষয় থেকে দূরে। যেন

টাকার এ পিঠে জগৎ ও পিঠে ঈশ্বর। মাঝে মন ও বুদ্ধি। ঈশ্বরও বিষয়, তবে তিনি পরমার্থ বিষয়। তিনি পরাচৈতন্য, তাঁর চৈতন্যে সমস্ত চৈতন্যান্বিত। যে মন ও বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে যাব সেই মন-বুদ্ধি জড়, তাঁর প্রভায় প্রভাযুক্ত। তবে শাস্ত্র বলেছেন, 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ'। ঠাকুর বলেছেন, তিনি শুদ্ধ মন-বুদ্ধির গোচর। আবার শাস্ত্র বলেছেন, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। সূর্য উঠলে কাউকে যেমন জানাতে হয় না যে সূর্য উঠেছে, ঠিক তেমনি মন-বুদ্ধি শুদ্ধ হলেই এই মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এ যেন ঠিক বৈদ্যুতিক বাল্ব। অনেকদিন ধরে ধুলো বালি ইত্যাদি পড়ে বাল্বের ওপর একটা আচ্ছাদন পড়ে যায়, যার ফলে আলো খুব কমই পাওয়া যায়। বাল্বটি পরিষ্কার করে ফেললে আলোর যেমন পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি মন-বুদ্ধি শুদ্ধ হলে তার মধ্য দিয়ে আত্মস্বরূপের প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়—দেখা যায়। অবতারে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।

আত্মচৈতন্য সূর্যের ন্যায় স্থির ও সর্বত্র সমান ভাবে তাঁর রশ্মি বিকিরণ করছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া বিকৃত হচ্ছে আর সৃষ্টি হচ্ছে প্রথমে বুদ্ধি, পরে পরে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, তন্মাত্র ইত্যাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় যন্ত্র। আত্মরশ্মি প্রথমে বুদ্ধিতে আপতিত হচ্ছে। বুদ্ধি তার focus-বিন্দুতে আত্মার ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব গঠন করছে। একে শাস্ত্র অভিমানাত্মক জীবাত্মা বলে অভিহিত করেছেন। আত্মচৈতন্যের সমস্ত রশ্মি এই জীবাত্মার মধ্য দিয়ে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি যন্ত্রে প্রতিসৃত হচ্ছে। আত্মচৈতন্যের রশ্মির গতি বিষয়-মুখী, তাই মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির গতি বিষয়মুখী। সেজন্য জীবাত্মা বহির্বিষয়সমূহকে দর্শন করেন, অন্তরাত্মাকে নয়। কঠ উপনিষদ্ বলছেন: "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" (কঠঃ ২।১।১)

জীবাত্মা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারছে না কেন? প্রথমতঃ যার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করবে সেই মন-বুদ্ধির গতি সম্পূর্ণ উল্টো —বিষয়মুখী। দ্বিতীয়তঃ বিষয়ের রশ্মি অনবরত তাদের ওপর পড়ছে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মন-বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে পড়ছে—জীবাত্মা তার স্বরূপ বুঝতে পারছে না। তৃতীয়তঃ মন-বুদ্ধি স্বচ্ছ নয়, ফলে রশ্মির প্রতিসরণ ঠিকভাবে হচ্ছে না।

আত্মার স্বরূপ জানতে হলে প্রথমে বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ ছিন্ন করতে হয়। সেজন্য কঠ উপনিষদ্ বলছেন—'আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্'। আর এ করা যায় প্রাণায়ামের—প্রাণের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এই সংযোগ ঘটায় প্রাণ। শুধু বহির্যন্ত্র চক্ষু কর্ণ প্রভৃতিকে বন্ধ করলে হবে না। এতদিন এতজন্ম ধরে সে যা যা দেখেছে শুনেছে আস্বাদ করেছে তার সব জমা রয়েছে চিত্তরূপ মনের খাতায়। প্রাণসংযম করলেও মনের এই ফুট অনবরত উঠতে থাকবে। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবেক, বিচার ও সৎ চিন্তার দ্বারা মনের জমানো ময়লা দূর করতে হয় এবং মনের নিম্নাভি-মুখী গতিকে রোধ করতে হয়। মন শুদ্ধ ও স্থির হলে বুদ্ধিও শুদ্ধ ও স্থির হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে মন-বুদ্ধি শুদ্ধ ও স্থির হলে সাধক অহঙ্কারের ঘাঁটিতে বসে বুদ্ধির সাহায্যে দেখতে পাবেন আত্মজ্যোতি, উপলব্ধি করবেন ঈশ্বরকে। শাস্ত্র বলছেন,'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ'—তিনি আছেন, বুদ্ধির দ্বারা এই উপলব্ধি হয়। সাধক তখন বলেন —'অবাঙ্মনসোগোচরম্'—বোঝে প্রাণ বোঝে যার। তিনি তখন দেখেন, উপলব্ধি করেন :

আমি বা আমার কোথায় তখন ?
ঈশ্বর-মানব-তুমি-পরিজন ?
সকলেতে আমি আমাতে সকল
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল।

মুণ্ডক উপনিষদ্ (৩।১।১) বলছেন—"সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষকে (দেহকে) আশ্রয় করে রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি নানা ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করে দর্শন করে।"

কেন চোখের জলে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর বলছেন : "বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ষড়্দর্শনে দর্শন মেলে না, মেলে না আগম নিগম তন্ত্রসারেও। তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নেই, তখন সে প্রদীপ নিয়ে খুঁজতে লাগল। দুতিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাবে। সেইটুকু পড়ে নিয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কী দরকার।"

ঠাকুর বলছেন : "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। হনুমান বলেছিল, 'ভাই, আমি তিথি-নক্ষত্র অতসব জানি না, আমি কেবল রাম-চিন্তা করি'। শোনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়।" তাহলে তাঁর দিকে এগোবার প্রধান বাধা হলো সন্দেহ। তিনি আছেন, না তিনি নেই! প্রবল সংশয়। তিনি আছেন; তাহলে আমি যা চাই, তা পাই না কেন? আমার সব আশা পূর্ণ হয় না কেন?

ঠাকুর হাসলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি দেনদার আর পাওনাদারের! তুমি চাইবে আর তিনি দিয়ে দেবেন! ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন : "তা বটে; সময় না হলে কিছু হয় না। যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হতো, একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বলল : 'নাচ-কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আট্‌কেল আছে'।"

তিনি দেবেন, তাঁর ব্যবস্থা মতো, মাপ মতো, মর্জি মতো। মানুষ যেমন প্রার্থীকে, ভিখারিকে, স্তাবককে, তোষামদকে ঘৃণা করে, তিনিও সেইরকম ঘ্যানঘেনেকে সহ্য করতে পারেন না। উপেক্ষা করেন। মা জানেন অবোধ শিশুটির কখন কি প্রয়োজন। ছেলে সকালে উঠে কি খাবে, কোন জামা পরবে! কখন তাকে স্নান করাতে হবে, ঘুম পাড়াতে হবে। শিশুর মতো নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে তাঁর কোলে। বিশ্বাস, অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। যদি সেই প্রশ্ন মনে উঁকি মারে, তাহলে বুঝতে হবে তুমি ছিটকে গেছ। ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, তাহলে, 'কি করবে?' কি করব তা তো জানি না। দুঃখে, সুখে, সংশয়ে, বিশ্বাসে দোল খাচ্ছি। আপনিই বলুন ঠাকুর।

"তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের ওপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনো মন্দ করবে না।"

কিন্তু সাধনার প্রয়োজন আছে। সে-সাধনা হলো ধীরে ধীরে তাঁর দিকে সরে যাবার প্রয়াস। নিজের হাতটি তাঁকে ধরিয়ে দেবার সাধনা। এখন তুমি কোন পথ নেবে? বানরের না বেড়ালের? সে আবার কি? ঠাকুর বলছেন, শোন তাহলে—"এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব, আরেক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। তেমনি কোন কোন সাধক মনে করে, এত তপস্যা করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত জপ করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে।

এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে। মা কখনো বিছানার ওপর, কখনো ছাদের ওপর, কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে করে এখানে-ওখানে নিয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। তেমনি কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে, কোন সাধন করতে পারে না, এত জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।”

চাওয়া নয় কান্না। তাঁর ঐশ্বর্য নয়, খোদ তাঁকেই চাওয়া। যমরাজ নচিকেতাকে খুব লোভ দেখাচ্ছেন—রাজ্য নাও, বাহন নাও, এমন ভোগ নাও, যা কেউ কখনো ভোগ করেনি, দীর্ঘতম জীবন নাও। তুমি সব নাও ; কেবল আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়ো না। আত্ম-দর্শনের বাসনা ত্যাগ কর। কারণ আত্মা সম্পর্কে দেবতাদেরও সংশয় আছে। নচিকেতা বললে, দেবতাদেরও সংশয় ? আপনার মুখেই শুনলুম, তবু জেনে রাখুন, আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার কাছে সবই তুচ্ছ।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥
(কঠ উপনিষদ্, ১।১।২৯)

আত্মতত্ত্ব ছাড়া নচিকেতা আর কিছুই চায় না।

বড়বাবুকে যখন পেয়েছি তখন বড়বাবুকেই চাই। নচিকেতার গোঁ। কী চাই তোমার ? বড়বাবু কৃপা করবেন। নায়েবকে বলবেন, দাও, দু-দশটাকা দিয়ে দাও। তখন খপ্ করে তাঁকে চেপে ধরে বলব, ‘প্রভু! আর তো চাহি না কিছু, তোমাকেই চাই।’

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে ॥
ধুলাতে বসিয়া দ্বারে, ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভাল লাগে ॥

ঠাকুর আপনি বলেছেন ঃ “জীব প্রথমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। ঈশ্বরবোধ নেই, নানা জিনিস বোধ, অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে এনে ঐ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান-কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান-কাঁটা তুলে ফেলা। অর্থাৎ বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান-কাঁটা এবং জ্ঞান-কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে—শুধু দর্শন নয়। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে ; যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।”

যদি কিছু না-ও হয় এই জন্মে, অজ্ঞান থেকে যেন জ্ঞানে যেতে পারি। বিশ্বাস। সর্বোত্তম হলো বিশ্বাস। আপনি বলছেন ঃ ‘ইনিই আমার ইষ্ট’। এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ হয়, দর্শন হয়। আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল।

আমি যেন সেই ‘আগেকার লোক’ হতে পারি। হলধারীর পিতার মতো। ওইটাই আমার অ্যাম্বিশান। স্নানের পর জলে দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্র পড়তেন, রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্—চোখ জলে ভেসে যেত।

মা তুমি আর কিছু না দাও, চোখের জল দাও। তাঁর কথায় যেন বুক ভেসে যায়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রাকৃতিক আরোগ্য-নীতির ওপর নির্ভরশীল। দেহের কোন অংশে যদি একটি কাঁটা ফোটে তাহলে আরও একটি কাঁটা বা ছুঁচ দিয়ে ঐ কাঁটাটিকে তুলে ফেলতে হয়। ঐ কাঁটাকে দেহ থেকে তুলে ফেলার জন্য যদি ছুরি, কাঁচি বা কোন বড় আকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহলে নতুন ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষত নিরাময় হতেও সময় লাগে। যদি ঐ ব্যক্তির বহুমূত্র বা চর্মরোগ থাকে তাহলে ঐ ক্ষত থেকে আবার নতুন রোগের আবির্ভাব হয়। হোমিওপ্যাথি সূক্ষ্ম ঔষধের সাহায্যে রোগীকে আরোগ্য করে এবং নতুন রোগের আবির্ভাব হতে দেয় না। আধুনিক বা অ্যালোপ্যাথিক বা বিসদৃশ (dissimilar) পদ্ধতির চিকিৎসা রোগীর একটি রোগ নিরাময় করে, কিন্তু তা আবার অন্য রোগ দেহে আনয়ন করে থাকে। এই জটিলতাকে চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে আলাদা করার জন্যই কে. এফ. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩) সদৃশনীতির (Law of Similars) চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

সদৃশনীতির প্রথম আবিষ্কর্তা অবশ্য হ্যানিম্যান ছিলেন না। তিনি এই নীতির আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন হিপোক্রেটিসের লেখা থেকে। হ্যানিম্যান নানাভাবে এই পদ্ধতিকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। সত্যসন্ধানী হ্যানিম্যান যখন বুঝলেন এই পদ্ধতি অভ্রান্ত, তখন তাঁর আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম রাখলেন 'হোমিওপ্যাথি'।

গাছ-গাছড়া, বীজ, ফল, ফুল, শিকড়, গাছের ছাল, খনিজপদার্থ, কীট-পতঙ্গ, রোগবীজ, সূর্যরশ্মি, এক্সরে রশ্মি, সর্পবিষ ইত্যাদির মধ্যে ভেষজশক্তি বর্তমান। হোমিওপ্যাথি ঔষধে এইসব পদার্থের নির্যাস বা শক্তি সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। ক্ষমতা অনুসারে সূক্ষ্মমাত্রায় ভেষজ নির্যাস সুস্থদেহের অধিকারী কোন মানুষকে স্বল্প মাত্রায় সেবন করানো হয়। প্রতিটি ভেষজের অন্তর্নিহিত শক্তি দেহে একটি ঝঙ্কার সৃষ্টি করে। সে-আন্দোলিত ঝঙ্কার যদি তীব্র হয় তাহলে সে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। সেই অনুভূত অবস্থাগুলিকে হোমিওপ্যাথিক গবেষণাগারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ভাবে এক-একটি ভেষজকে পরীক্ষা করাকে 'প্রুভিং' (proving) বলা হয়। সংগৃহীত সাধারণ, অসাধারণ, অস্বাভাবিক লক্ষণগুলিকে 'প্রুভিং' থেকে সংগ্রহ করে 'মেটিরিয়া-মেডিকা'য় (Materia Medica) লিপিবদ্ধ করা হয়। অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে যে-লক্ষণগুলির সমাবেশ হয় তার সঙ্গে প্রুভিং-কৃত যে-ঔষধের লক্ষণ তালিকার সাদৃশ্য থাকবে সেই রোগীকে সেই ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

বিসদৃশ-পদ্ধতি বা আধুনিক বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য গিনিপিগ, খরগোস, কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদির শরীরে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। তাতে তাদের গঠনতন্ত্রে যেসব বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় সেগুলির ভিত্তিতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ পশুর সঙ্গে নাও মিলতে পারে। বিসদৃশ-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঔষধ বিভিন্ন দৈহিক যন্ত্রের ওপর ক্রিয়া করে। ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য বিভিন্ন ঔষধ বা মিশ্রিত ঔষধের একই সঙ্গে প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসানীতি একমাত্র প্রুভিং দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অনুযায়ী যেকোন প্রাণীর ওপর সামগ্রিকভাবে বিস্তৃত। সেজন্য রোগের যেকোন পর্যায়ে সেই সময়কার সমগ্র অবস্থাটি তখনকার একটি একক সমগ্র লক্ষণসমষ্টির দ্বারা প্রতিফলিত হয়। হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ ঐ সমগ্র লক্ষণসমষ্টির সদৃশ-তম হওয়া প্রয়োজন এবং তার জন্য একটিই মাত্র ঔষধ হতে পারে, একাধিক হওয়া কখনো সম্ভব নয়। সেজন্য হোমিওপ্যাথি-পদ্ধতিতে কখনো একই সাথে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করা চলে না। চিকিৎসাক্ষেত্রে লক্ষণ-সমষ্টির সদৃশতম শক্তিকৃত ঔষধের ক্রিয়া গভীর ও সূক্ষ্ম স্তর থেকে ক্রমশঃ বহিস্থ স্থূলতর স্তরে প্রসারিত হয়। এর ফলে হোমিওপ্যাথিতে অর্বুদ (tumour) প্রভৃতি অপসারণ করা সম্ভব হয় বা পুরনো (ক্রনিক) নানা ব্যাধি নির্মূল করা এবং রোগের সামগ্রিক ও আমূল নিরাময়ের জন্য হোমিওপ্যাথিক-পদ্ধতি ছাড়া

অন্য কোনও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। কারণ,আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির ক্রিয়াস্থল সাধারণতঃ নানাবিধ ব্যাধির স্থূলস্তর পর্যন্ত প্রসারিত। তা রোগগ্রস্ত প্রাণীর গভীরতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সেজন্য রোগের মূলোৎপাটনও করতে পারে না। ইঁটের দেওয়ালে বটগাছ জন্মায়, যতই তা কেটে ফেলা হোক দেখা যাবে আবার সেখানে গাছ জন্মেছে। কিন্তু গাছটির মূলোৎপাটন করে দিলে সেখানে তার গজিয়ে ওঠা বন্ধ হবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যাধির মূলোৎপাটন করা সম্ভব এবং তা-ই তার লক্ষ্যও।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রতি রোগীর রোগলক্ষণ মনোযোগ সহকারে লিপিবদ্ধ করতে হয়। মেটিরিয়া মেডিকা ও রেপার্টরীর (Repertory—হোমিও-প্যাথিক অভিধান) সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন করা হয়। সঠিক নির্বাচিত ঔষধের ক্ষমতা অতুলনীয়, যার দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন-স্টেনোসিস, রিউম্যাটিক হার্ট, টিউমার, হাড়ের বৃদ্ধি, মূত্রে সুগার বা অ্যালবুমিন, হাই ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদির নিরাময় সম্ভব হয়।

অনেক রোগীর মুখে শোনা যায় যে "হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করেছিলাম কিন্তু সুস্থ হলাম না", ইত্যাদি। জনগণের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, হোমিও-প্যাথিক ঔষধ সেবন বা প্রয়োগ করলেই তা হোমিও-প্যাথি হয় না। রাস্তাঘাটে, যত্রতত্র কথায় কথায় যাঁরা প্রেসক্রিপশন লিখে দেন তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। যাঁরা সঠিকভাবে রোগ-লক্ষণসমষ্টি লিপিবদ্ধ না করেই ঝটপট প্রেসক্রিপশন লিখে দেন বা এক মিনিটে একজন রোগীকে পরীক্ষা সমাপ্ত করেই ঔষধ নির্বাচন করেন অথবা অ-হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-ব্যবসায়ীদের স্বনির্মিত হোমিওপ্যাথিক টনিক পেটেন্ট ইত্যাদি রোগীদের বিতরণ করে অধিক অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের থেকে বহু দূরে থাকা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ জেমস টাইলার কেন্ট তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, যারা হাতুড়ে ডাক্তার তাদের নিকট চিকিৎসা করানো থেকে হিংস্র ব্যক্তিদের,—যাদের হাতে ধারালো অস্ত্র রয়েছে তাদের সাথে একই ঘরে থাকা শ্রেয় মনে করি।

আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে সদৃশের নিয়ম (Law of Similars) বা সমান দিয়ে সমানের চিকিৎসা অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature cure) নেই। ঔষধ বাছাইয়ে ভুল হলে হোমিও-প্যাথিক ঔষধও বিসদৃশ (dissimilar) হয়। গভীর ক্রিয়াশীল বিসদৃশ মূলে রোগসহ একটি কৃত্রিম রোগও সৃষ্টি করে ; যেমন অসৎসঙ্গে বাস করলে নানা প্রকারের কু-অভ্যাস হয়। অন্য ভাষায় যাকে ঔষধজ রোগ (iatrogenic disease) বলে। বর্তমান যুগে অ্যালোপ্যাথিতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল স্থূলে ঔষধ এ্যান্টিবায়োটিকস প্রয়োগ করে উপস্থিত কম গুরুত্ব-পূর্ণ রোগের সাময়িকভাবে নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু তাতে ভবিষ্যতের জন্য দুরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে।

আমাদের প্রশ্ন ঃ এই পদ্ধতির আধুনিক চিকিৎসাই কি বৈজ্ঞানিক? বিভিন্ন এ্যান্টিবায়ো-টিকস বর্তমান যুগে পেনিসিলিনের স্থলাভিষিক্ত। পেনিসিলিন ইনজেকশন যখন জনসমাজে অনেক সমস্যার কালো ছায়া বিস্তার করে চলছিল তখন বাধ্য হয়ে আইন করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। এ্যান্টিবায়োটিকসের প্রয়োগে খাদ্যনালীর উপকারী ব্যাকটেরিয়াসকল মরে গেলে ফাঙ্গাসের (fungus) আক্রমণের সুবিধা হয় ও নতুন রোগ আক্রমণ করে। পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ দেহের হিমোগ্লোবিন হ্রাস করে হিমোলাইটিক রক্তাল্পতা (haemolytic anaemia) সৃষ্টি করে। জ্বরে দীর্ঘ-দিন ক্লোরোমাইসিটিন প্রয়োগে দুর্বলতা, মাথাঘোরা, সাময়িক স্মৃতিলোপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, প্রলাপ্স ইত্যাদি ঔষধজ রোগ বা উপসর্গের উদ্ভব হয়।

যীশুখ্রীস্টের আগমনের অনেক আগে থেকেই প্রচেষ্টা হয় চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে। এর জন্য যেসব মহাপুরুষের অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন—হিপোক্রেটিস, প্যারাসুলসাস, গ্যালেন, স্ট্যাল প্রমুখ। এছাড়াও অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সচেষ্ট হয়েছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রকে পদার্থ-বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান বা রসায়নবিজ্ঞানের মতো মৌলিক বিজ্ঞান আখ্যা দিতে। কিন্তু হ্যানিম্যানই পৃথিবীতে সম্ভবতঃ প্রথম, যিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে নীতিভিত্তিক পর্যায়ে উন্নত করেন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছে দেন। এর জন্য তাঁকে দীর্ঘ কুড়ি বছর নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে কাটাতে হয়েছিল। সেসময়ে জার্মানীর স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ "অভিজ্ঞতায় যদি প্রমাণ হয়

আমার হোমিওপ্যাথিক-পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট তাহলে তা মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হোক।" এ আহ্বান তিনি পৃথিবীর সকল পদ্ধতির চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের নিকট রেখেছেন, কারণ তিনি ছিলেন যথার্থ উদার বিজ্ঞানী।

সদৃশ-নীতিই (সমান দিয়ে সমানের চিকিৎসা) প্রাকৃতিক রোগ নিরাময়ের একমাত্র স্বাভাবিক পদ্ধতি। সুস্থ শরীরে ঔষধ খেলে রোগ হয়; রুগ্নকে সদৃশ ঔষধ ক্ষুদ্রতম মাত্রায় দিলে আরোগ্য হয়। ঔষধের স্থূল ও বড় মাত্রা দেহে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আনে। মানুষের উদ্ভট কল্পনাশক্তি বা অহেতুক চিন্তা-ভাবনাও নানা প্রকারের জটিল রোগ তৈরি করতে সক্ষম। রোগের প্রকাশ মানসিক স্তর থেকে দৈহিক স্তরে যেতে পারে—এই কথাগুলো হ্যানিম্যানের পূর্বে কেউ বলেননি।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তখনকার আমলে বিসদৃশ বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতির একজন দিক্‌পাল বলে স্বীকৃত ছিলেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ভারতে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সংস্থার (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। প্রথম জীবনে হোমিওপ্যাথির ওপর তিনি তুষ্ট ছিলেন না; কিন্তু পরে হ্যানিম্যানের 'অর্গ্যানন' (১৮১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) পুস্তক তিনি অধ্যয়ন করেন। ক্রমে বিসদৃশ চিকিৎসা পরিত্যাগ করে তিনি সদৃশ পদ্ধতি বা হোমিওপ্যাথিতে আসেন। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার বিসদৃশ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ উপাধিযুক্ত হয়েও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বিসদৃশ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে এক কৃতী চিকিৎসক হয়েও হোমিওপ্যাথিতে প্রথিতযশা চিকিৎসক হয়েছিলেন। এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী জেমস ল্যাঙ্গ বলেন, কুকুর ভয় পেয়ে কামড়ায়, সাপ ভয় পেয়ে ছোবল মারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যখন ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন ইংরেজ শাসকবর্গ নিজ দেশে নির্মিত বিসদৃশ ঔষধ ভারতে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। সে-অবস্থায় হোমিওপ্যাথির উন্নতি হওয়াতে তাঁদের ক্ষতি হবার আশঙ্কায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি তাঁরা অবহেলা দেখান এবং স্বীকৃতি দিতে বিরত থাকেন। বিসদৃশ চিকিৎসক মহলও হোমিওপ্যাথির নিন্দায় তৎপর হন। ইংরেজের শাসন শেষ হয়েছে তেতাল্লিশ বছর। তবুও তাঁদের প্রচারিত মনোভাব বিসদৃশ চিকিৎসকরা বদলাতে পারেননি।

হোমিওপ্যাথির স্রষ্টা হ্যানিম্যান বিসদৃশ চিকিৎসা-পদ্ধতির এম ডি. উপাধিধারী ছিলেন। চিকিৎসাকার্যে নিয়োজিত থাকার সময় তিনি স্থূল ঔষধের অপকারিতা, নানা জটিলতা, জটিল ও ক্রনিক রোগ সৃষ্টি করার প্রবণতা ইত্যাদি দেখে চিকিৎসা-কার্য পরিত্যাগ করেন। পরে ঔষধের স্থূলতাকে হ্রাস করে অকারণে ঔষধজ রোগ, রোগ চাপা দেওয়া ইত্যাদি থেকে অব্যাহতির জন্য গবেষণা শুরু করেন। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করেন। তৎকৃত হোমিওপ্যাথি ঔষধের সূক্ষ্ম ও বিভাজিত আকারে ব্যবহারের উপকারিতা বারবার তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

হোমিওপ্যাথি ক্রমে মানুষের মধ্যে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সার হলে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপযোগিতা সম্পর্কেই শুধু বলেননি, নিজেরাও হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহার করতেন।

দেশে-বিদেশে বহু মানুষ এই চিকিৎসায় উপকৃত হচ্ছে। বহু কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি এই চিকিৎসায় নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষকে সত্যকে অনুসন্ধান করতে প্রেরণা দেয় এবং পরীক্ষিত সত্যকে, সত্য বলে প্রমাণিত বিষয়কে স্বীকার করতে, মর্যাদা দিতে শেখায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই যাঁরা বিজ্ঞান বলে মনে করেন তাঁরা দেশে-বিদেশে সহস্র-সহস্র রোগাক্রান্ত মানুষের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় নিরাময়ের পরি-সংখ্যান পরীক্ষা করতে পারেন। সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণেই সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুধু যে সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, তা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুলভ এবং নির্দোষ চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠও বটে।

গ্রন্থ পরিচয়

রামচন্দ্র : মর্যাদা-পুরুষোত্তম

অভিরূপ গোস্বামী

Rama : The Ideal Man : Swami Siddhinathananda. Ramakrishna Sevashrama, Calicut-18, Kerala. Rupees Sixteen only.

বাল্মীকি রামায়ণে (১।২।৩৬) ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলছেন : যতদিন পৃথিবীতে গিরি নদী প্রভৃতি থাকবে ততদিন রামায়ণকথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে।

বলা বাহুল্য, রামায়ণকথা হলো রামেরই কথা ও কাহিনী। রামায়ণ ও রাম তাই সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকপিতামহের কথা যে কতদূর সত্য তা রামায়ণ রচনার হাজার হাজার বছর পরেও রামায়ণ এবং রামচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা দেখে আমরা বুঝতে পারছি। কিছুদিন আগে দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে যখন রামায়ণ ও মহাভারত দেখানো হচ্ছিল তখন জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমগ্র ভারতের সর্বস্তরের ও সকল বয়সের মানুষ যে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তা দেখেছে তাতে রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের যোগসূত্র কোন্ গভীরে নিহিত তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। রামায়ণের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব রামচন্দ্র এবং মহাভারতের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ। বস্তুতপক্ষে রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ হিন্দু-ভারতের গভীরতম তন্ত্রীকে স্পর্শ করে রয়েছে।

হিন্দু-ভারতের চোখে রামচন্দ্র (এবং কৃষ্ণ) নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর কি বাস্তবিক অবতীর্ণ হন এবং হলে এই সামান্য মনুষ্যদেহে তাঁর অবতরণ কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আজকের নয়, এ প্রশ্ন অবতারবাদ প্রচলনের সময় থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। এসম্পর্কে হিন্দুদর্শনের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের বাদানুবাদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই বাদানুবাদ হিন্দুধর্ম তথা হিন্দুদর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যও এবং সেটি তার সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। আধুনিক যুগে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিতর্ক নতুন করে শুরু হয়। কিছু ইংরেজ ও ইউরোপীয় পণ্ডিত রামচন্দ্রকে (এবং কৃষ্ণকে) কবির কল্পনা-প্রসূত অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেবার জন্য বহু মসী ব্যয় করেছেন। রাম (এবং কৃষ্ণের) চরিত্র এবং আচরণের অনেক স্খলন দেখিয়ে হিন্দুদের অবতারবাদকে তাঁরা উপহাস করেছেন। মানুষ হিসাবে রাম (এবং কৃষ্ণ) যে অতি সাধারণ শ্রেণীর তাও তাঁরা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন দেশীয় কিছু ইংরেজী-শিক্ষিত পণ্ডিতও।

ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন কয়েকজন দেশীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি উপরি-উক্ত পণ্ডিতদের অপ-প্রয়াসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য সরব হয়েছিলেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, রাম ও কৃষ্ণের কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতার চেয়ে বড় সত্য হলো, তাঁদের চরিত্র এবং আচরণে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত আদর্শ প্রকটিত হয়েছে। বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেনের নাম এপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থটি শেষোক্ত ধারায় একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। লেখক স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন প্রবীণ এবং গবেষক-সন্ন্যাসী। প্রবীণতা এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টিরও অধিকারী তা তাঁর লেখায় সহজেই ধরা পড়ে। স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, রামচন্দ্র অবতার ছিলেন, কি অবতারী ছিলেন সে-প্রসঙ্গের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো রামচন্দ্র মানুষ হিসাবে কত সম্পূর্ণ ছিলেন তার আলোচনা। বর্তমান গ্রন্থে তিনি সেই আলোচনাই করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। গ্রন্থটি প্রথমে তিনি মলয়ালম ভাষায় লিখেছিলেন। মলয়ালম সংস্করণটি এত সমাদৃত হয় যে,অনেকের অনুরোধে তিনি তার ইংরেজী অনুবাদে হাত দেন। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান গ্রন্থটি ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক রামচন্দ্রের জন্ম থেকে শুরু করে দেহাবসান পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার

বিশেষত্ব হলো এই যে, বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় রামচন্দ্রের আচরণ মানব-আদর্শের কোন উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করেছে তার খতিয়ান। তিনি দেখিয়েছেন কি বীরত্বে, কি শৌর্যে, কি সত্যনিষ্ঠায়, কি ক্ষমায়, কি আত্মত্যাগে, কি প্রেমে, রাজা হিসাবে, যোদ্ধা হিসাবে, পুত্র হিসাবে, ভ্রাতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে এবং পিতা হিসাবে রামচন্দ্র মনুষ্যত্বের সমস্ত মর্যাদা বা সীমাকে কিভাবে অতিক্রম করে যথার্থই 'মর্যাদা-পুরুষোত্তম' রূপে নিজেকে প্রতি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে ভারতীয় সমাজ ও পরিবার যখন নানা সংকীর্ণতা ও স্বার্থসর্বস্বতায় বিপন্ন হয়ে পড়ছে তখন এই ধরনের একটি মহনীয় মূল্যবোধ-ভিত্তিক চরিত্র আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি বাল্মীকিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেই মানুষ হিসাবে রামচন্দ্রের এমন সুন্দর একটি বিশ্লেষণ ও আলোচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। লেখকের ভাষা আদ্যন্ত অত্যন্ত সহজ, বর্ণনাভঙ্গি স্বচ্ছ ও ঋজু এবং আলোচনা কখনোই দার্শনিক জটিলতায় কোনভাবেই ভারাক্রান্ত নয়। এই সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার কাম্য।

"হরিনাম সুধারস পিওরে বদন ভরি"

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। পার্থদেব ঘোষ, কৃষ্ণকুটির, বি-৬।১৪০, কল্যাণী-৭৪১২৩৫।

আমাদের শাস্ত্রে—বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের নামমাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। ভগবানের রূপ ও মহিমা অনন্ত। তাই অনন্ত মহিমময় ভগবানের নামও অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে বহুনামে ডেকে তাঁর স্মরণ-মনন করেন। বেদ ও পুরাণে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ পুরাণে বিষ্ণু বা নারায়ণকেই প্রধান দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—নারায়ণই সগুণ সাকার প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম এবং তিনিই নির্গুণ-নিরাকার পরব্রহ্ম। সুতরাং অনন্ত মহিমময় বিষ্ণুর নাম-কীর্তন ও স্মরণ-মনন যে মুক্তিলাভের বিশেষ সহায়—একথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রের মর্মার্থদর্শী মহাপুরুষগণও নামজপের উৎকর্ষ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। বৈষ্ণব মহাজনগণের মুখে—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"—এই পৌরাণিক শ্লোকটি প্রায়শই শোনা যায়। আর এই হরির নাম কীর্তন ও জপ করার পক্ষে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্' নামক পুস্তকখানি খুবই উপাদেয়। বিষ্ণুর সহস্রনামের প্রত্যেকটি নামই এক-একটি বিশেষ শক্তি ও গুণের দ্যোতক। কিন্তু প্রত্যেকটি নামের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা পাওয়া দুর্লভ। সাধক-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সেই অভাব দূর করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি নামের শাস্ত্রসম্মত অর্থ সন্নিবেশ করেছেন এবং 'অনুধ্যান' নামে তাঁর স্বকীয় ব্যাখ্যায় প্রতিটি নামের যথার্থ তাৎপর্য চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসকল থেকে খুবই উপকৃত হবেন। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্বয় থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে অল্পায়াসেই এই সহস্রনাম আবৃত্তি করার সুবিধা হবে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে হেমন্তকুমার ষট্‌তীর্থ-কৃত 'অভিমত জ্ঞাপন' এবং ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্যকৃত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রমাহাত্ম্য' নামে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদুটি প্রবন্ধ থেকেও ভক্তজন নামমাহাত্ম্য সম্পর্কে বেশ কিছু শাস্ত্রীয় বচন জানতে পারবেন। পুস্তকটির মুদ্রণ ভাল। তবে প্রচ্ছদ সুন্দর হলে পুস্তকটি আরও আকর্ষণীয় হতো। কিন্তু তার মূল্য যেহেতু—"নাম কর নাম চিন্ত নাম কর সার।/ নাম বিনা এ-জগতে কিছু নাহি আর॥"—সেজন্য প্রচ্ছদ মনোরম করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হয়। বঙ্গভূমিতে 'বিষ্ণুসহস্রনাম' পাঠের প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। যদি এই গ্রন্থখানি বহুল প্রচারিত হয় তবে ভক্তসমাজ হরিনামের বিশেষ রসাস্বাদনে কৃতার্থ হবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৬—২৯ সেপ্টেম্বর **বেলুড় মঠে** শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার প্রতিদিন এবং মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা দর্শনের জন্য প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। প্রতিদিন ভক্তদের হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

আগরতলা, আঁটপুর, আসানসোল, বরিশাল (বাংলাদেশ) বোম্বাই, বারাসত, কাঁথি, ঢাকা, দিনাজপুর, গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ), পাটনা, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম এবং বিবেকনগর (আমতলী)।

গত ৯ সেপ্টেম্বর **সালেম আশ্রম** (তামিলনাড়ু) মহিলা যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ২৭৫ জন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কিছু ভক্তও তাতে যোগদান করেছিলেন।

গত ১৪ অক্টোবর **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে** সারাদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন ('ভক্ত-সম্মেলন') অনুষ্ঠিত হয়। ধ্যান, ভজন, পাঠ, ভাষণ, গীতি-আলেখ্য এবং প্রশ্নোত্তর ছিল সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। প্রায় সাতশো ভক্ত নরনারী এই ভাবানুরাগী সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ভাষণ দেন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রশ্নোত্তরও তিনি পরিচালনা করেন। অন্যান্য যাঁরা ভাষণ দেন তাঁরা হলেনঃ স্বামী অক্ষরানন্দ (ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ), স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী রসজ্ঞানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ২৭ অক্টোবর **ইনস্টিটিউটে** স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি কিশোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চারশো কিশোর-কিশোরী এতে যোগ দেয়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

উদ্বোধন

গত ৬ সেপ্টেম্বর **রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমের** গ্রাম-প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নবনির্মিত কারখানাগৃহ, শ্রেণীকক্ষ-সহ অফিসগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

চেরাপুঞ্জি আশ্রমের নিকটস্থ লয়তাইরা গ্রামের একটি ভগ্ন শিবমন্দির এই আশ্রম কর্তৃক সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এই মন্দিরটির উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, দুই বছর পূর্বে নার্তিয়াং গ্রামে এরূপ একটি ভগ্ন দুর্গামন্দিরও সংস্কার করা হয়েছিল।

ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ, রহড়া বালকাশ্রম এবং বরানগর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ১৬টিই অধিকার করেছে। নিম্নে তাদের স্থান উল্লেখ করা হলোঃ

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ, ১২শ (দুজন)।

রহড়া বালকাশ্রম—৭ম, ৯ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ।

বরানগর বিদ্যালয়—৮ম, ১৬শ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের বি. এসসি. অনার্স পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক কলেজের ৩ জন ছাত্র যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও স্ট্যাটিসটিকস-এ প্রথম স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া একজন স্ট্যাটিসটিকস-এ দ্বিতীয় ও একজন রসায়নবিদ্যায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণঃ কোয়েম্বাটোর আশ্রমের মাধ্যমে কোয়েম্বাটোরের নিকট শ্রীলঙ্কা থেকে আগত

শরণার্থীদের দুটি শিবিরে ৫০টি কেরোসিন স্টোভ, ২০০টি বিছানার চাদর, ১০০টি শাড়ি, ১০০ জোড়া লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

সালেমের আশপাশে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে সালেম আশ্রমের মাধ্যমে ১৯১৭টি বড়দের পোশাক, ৪১৮টি শিশুদের পোশাক এবং ১০০টি বিছানার চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

মেঘালয় পুনর্বাসন : চেরাপুঞ্জি আশ্রমের মাধ্যমে শেলানদীর তীরবর্তী কালাটেক গ্রামে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২৫টি পরিবারকে বাড়ি-ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্বাসন : বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামণ্ডিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির জন্য স্টোনব্লক তৈরি এবং বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে।

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের লক্ষ্মীপুর গ্রামে কমিউনিটি হল সহ আশ্রয়গৃহ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজও এগিয়ে চলছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রোমেন্টো বেদান্ত সোসাইটি: সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও বব কিন্ডলার। ১২ সেপ্টেম্বর উপনিষদের ওপর এবং ১৯ সেপ্টেম্বর রাজযোগের বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন যথাক্রমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী প্রপন্নানন্দ। তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওয়াই-এর জয় মা মিউজিক্যাল গ্রুপ এই আশ্রমে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করে।

২৬ সেপ্টেম্বর বেদান্ত সোসাইটিতে ভক্তিগীতি, স্তোত্রাদি পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ৺বিজয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনও হাতে হাতে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি: গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বেলা ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। সন্ধ্যায় রামনামসংকীর্তন, ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবারে স্বামী ভাস্করানন্দ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের ক্লাস পরিচালনা করেছেন। গত ৫ অক্টোবর তিনি ৮ বছরের ওপর বয়সের বালক-বালিকাদের জন্যও একটি প্রশ্নোত্তরের ক্লাস পরিচালনা করেছেন।

বাকিংহামশায়ার বেদান্ত সোসাইটির (ইংল্যান্ড) প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের আমেরডন-এ একটি সাধন-শিবির পরিচালনা করেন। ঐ শিবিরে ৪০জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন। ঐ শিবিরে স্বামী ভব্যানন্দ এবং মারকস ব্রেব্রুক ধর্মালোচনা করেছেন। গত মার্চ মাসে **হল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটিতেও** তিনি একটি সাধন-শিবির পরিচালনা করেন। ঐ শিবিরে ৬০জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন। গত ১০ বছর যাবৎ তিনি এই বেদান্ত সোসাইটিতে বছরে একবার এই শিবির পরিচালনা করে আসছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা : গত ১৭ অক্টোবর রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরদিন সকালে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সারদানন্দ হল-এ সন্ধ্যারতির পর আগমনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৬ আগস্ট স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৯৪জন ছাত্র-ছাত্রীকে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সম্পর্কীয় পুস্তক বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। এই অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষার তাৎপর্য ও ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষানন্দ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এদিন দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

বালিগ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে গত ২০ মে '৯০ এই আশ্রমের ২য় বর্ষপূর্তি উৎসব, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও স্বামী শেখরানন্দ।

গত ১ জুলাই অপরাহ্ণে **জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ** এক জনসভায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত' বিষয়ে ভাষণ দেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করতে সকলকে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, পূজনীয় মহারাজ গত ৩০ জুন এই আশ্রমে আসেন এবং দুই শতাধিক ভক্তকে দীক্ষা দেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় হাসপাতালের প্রসূতি-বিভাগে ১০০ কিলো ফল বিতরণ করা হয়েছে।

গত ১৯ আগস্ট '৯০ **হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** ষোড়শ ষাণ্মাসিক সভা **রামপাড়া রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘে** অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ। সভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে গঠিত বিভিন্ন সংস্থার সেবামূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয়। সভায় হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী দেবদেবানন্দ, সহ-সভাপতি স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ সহ বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ভাঙড় রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (উঃ ২৪ পরগনা) গত ১৫ আগস্ট এই আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১২৫জন রোগীর মধ্যে ফল বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য, এই আশ্রম সপ্তাহে দুই দিন বিনামূল্যে রোগীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেয়।

গত ২১ জুলাই '৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শ-ধন্য যদুলাল মল্লিকের ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের বাড়িতে **যদুলাল মল্লিক স্মৃতি সমিতি** কর্তৃক ভাবসমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এদিন বিকালের সর্বধর্মসমাবেশ অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দ ; বক্তব্য রাখেন খ্রীস্ট-ধর্মের ফাদার ম্যাথু সিলিং, বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু সুধম্মালঙ্ক থেরো, জৈনধর্মের গণেশলাল ওয়ানি, ইসলামধর্মের ডঃ এম. আর. শিবলী, অধ্যাপক,

মনিরুজ্জমান, মৌলানা আব্দুল অহাব এবং আচার্য সুন্দরস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতা মাইতি এবং আব্দুল 'পূর্বদল' কর্তৃক রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের রচিত 'রামকৃষ্ণ-বোধন' গীতিবিচিত্রা পরিবেশিত হয়।

গত ৮ জুন স্নানযাত্রার দিন **পাতুন্দা (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ আশ্রমে** এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং স্বামী হীরানন্দ ও স্বামী ইন্দ্রানন্দ। ঐদিনটি ছিল স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি। তাই ধর্মসভায় স্বামী আত্মস্থানন্দজী তাঁর জীবনের কিছু আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব জার্মানী গত মে মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টের নিকটবর্তী বাদনোহাইম-এ তাদের বার্ষিক সাধন-শিবির পরিচালনা করে। **বোর্ন এন্ড বেদান্ত সোসাইটির** (ইংল্যান্ড) প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ সেই সাধন-শিবিরে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ্য ত্রিশের দশক থেকে জার্মানীতে বেদান্ত আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং বর্তমানে তা ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করছে। বর্তমানে এক কোটি ভক্ত এই ভাবধারায় বিশ্বাসী। এই বেদান্ত সোসাইটি বছরে বিভিন্ন স্থানে এরূপ তিনটি সাধন-শিবির পরিচালনা করে। এই সাধন-শিবিরে মোট ৭০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

আন্তর্ধর্ম সম্মেলন

ওয়েস্টমিনিস্টার ইন্টারফেইথ গ্রুপ গত ২৪ মার্চ '৯০ পশ্চিম লন্ডনের আইলওয়ার্থ-এ মাল্টিফেইথ সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনারে **বোর্ন এন্ড আশ্রমের** স্বামী ত্রিপুরানন্দ অন্যতম বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'রিলিজিয়াস লাইফ ফর দ্য ফিউচার'। তাছাড়া প্রশ্নোত্তর আলোচনাও হয়েছে।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ডাঃ **গোপেন্দ্রলাল পোদ্দার** দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২০ মে সকাল ৮-৩০ মিনিটে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কল্যাণীস্থ বাসভবনে করজপ-অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে তিনি উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে-ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নবগোপাল কুন্ডু** গত ১২ মে '৯০ সন্ধ্যা ৮-২৫ মিনিটে তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তাঁর আদি নিবাস ছিল অবিভক্ত নদীয়া জেলার (অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলা) কুমারখালি গ্রামে। তিনি বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে ১০ বছরের অধিককাল কর্মী হিসাবে ছিলেন।

গত ২২ মে আলিপুরদুয়ার শ্রীশ্রীসারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী **ঊষা মিত্র** বিকাল ৪-১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। কিছুদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্র-শিষ্যা। ১২ বছর বয়সে তিনি তাঁর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী কালে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করেন এবং রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। দীর্ঘকাল তিনি উক্ত সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনে অনেককে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

ঘুম ও তার সমস্যা

বিশেষজ্ঞরা যখন প্রমাণ করলেন যে, ক্লান্ত বা নিদ্রাতুর কর্মীরাই বেশকিছু বড় রকমের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তখন থেকেই নিদ্রা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবাই সচেতন হয়েছে।

প্রায় পাঁচ কোটি আমেরিকান সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা রোগে ভোগে। প্রতি বছর প্রায় এক কোটি আমেরিকান ডাক্তারের কাছে নিদ্রা-সমস্যা নিয়ে যায় এবং তাদের অর্ধেককে ঘুমের বড়ি খেতে হয়। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির নিদ্রাব্যাঘাত গবেষণাকেন্দ্রের ডাইরেক্টর ডাঃ উইলিয়াম ডিমেন্ট বলেছেন যে, আর্থিক ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে জাতীয় ঋণ চিন্তার মতোই জাতীয় নিদ্রা-ঋণ (নিদ্রাভাব) চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাঃ ডিমেন্ট সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিদ্রা-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন। তিনি বলেছেনঃ (১) আমেরিকায় যে 'চ্যালেঞ্জার' মহাকাশযানে দুর্ঘটনা হয়েছিল, তাতে ভূমিতে যেসব নাবিকরা ঐ যানের সঙ্গে কাজ করছিলেন, তাদের ক্লান্তিই দুর্ঘটনার কারণ বলে তদন্ত-কমিটি জানিয়েছে।

(২) চেনোবিল ও থ্রিমাইল দ্বীপে দুর্ঘটনাগুলি ভোর রাত্রিতেই হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নিদ্রালু কর্মীদের ভুলের জন্য সেগুলি হয়েছে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টটি বন্ধ করতে হয়েছে, কারণ দেখা গেছে যে, রাত্রের কর্মীদের নিয়মিতভাবে ঘুমোতে দেখা যেত।

(৩) আমেরিকায় যেসব মোটর দুর্ঘটনা হয়, সেগুলির কারণ হিসাবে মদ্যপানের পরে হলো চালকদের ঘুম।

(৪) কারখানায় যেসব কর্মী রাত্রে কাজ করে, তাদের অর্ধেকের বেশি ঘুমোয়; দিনের কর্মীদের ২০ শতাংশ ঢোলে।

(৫) বিমানচালকদের যখন একটানা অনেক দূরে চালাতে হয়, তাদের ঢুলুনি বন্ধ করার জন্য বিমানের অন্য কর্মীদের প্রায়ই চালকের ঘরে উঁকি মারতে হয়।

ঘুম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আধুনিককালেই হচ্ছে। আমেরিকায় গবেষণার জন্য ১৭০টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের ঘুমের সময় মস্তিষ্কের তরঙ্গ, চোখের ও পায়ের নড়ন-চড়ন, নিশ্বাস এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

ঘুমের সময় কী হয়? ৫০ বছর আগে ভাবা হতো, ঘুমের সময় মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায়। এখন জানা গেছে যে, মস্তিষ্ক ঘুমের সময় খুবই কর্মরত থাকে। এখন ৭০ রকম ঘুমের বিশৃংখলা ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি বেশি দেখা যায় সেগুলি হলো—অনিদ্রা (যা দুশ্চিন্তা, গোলমাল ইত্যাদি থেকে হয়), ঘুমের সময় শ্বাসবন্ধভাব (sleep apnea), দিনে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়া (narcolepsy) ইত্যাদি।

আমেরিকায় সাধারণভাবে ঘুম কমে যাচ্ছে। যেখানে অপরাহ্ণে ঘুমের ঐতিহ্য ছিল, এখন সেখানে লোকে গর্ব করে যে, সে দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র, যার প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা ঘুম দরকার, সে এখন রাত্রে ৭ ঘণ্টা ঘুমোয়। ফলে সে সপ্তাহশেষে বেশি ঘুমোয় কিংবা ক্লাসে ঘুমোয়।

সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৬—৮ ঘণ্টা ঘুম দরকার। অবশ্য এবিষয়ে সকলের প্রয়োজন সমান নয়। বয়স যত বাড়ে ঘুমের প্রয়োজন তত কমে—শৈশবে ১৫ ঘণ্টা থেকে বার্ধক্যে ৬—৭ ঘণ্টা।

ঘুম সম্পর্কে বেশি সংখ্যক রোগীই হলো নাক-ডাকার রোগী, যাদের ঘুমোবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা পায়। বিবাহ-বিচ্ছেদও হয় নাক-ডাকাকে কেন্দ্র করে। খুব ছোট বাচ্চাদের হঠাৎ মৃত্যুর (crib death) কারণ এইভাবে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

সাময়িক ঘুমের ব্যাঘাত হলে 'ঘুম-স্বাস্থ্য'-এর (sleep hygiene) কয়েকটি নির্দেশ হলো—প্রতিদিন ব্যায়াম, রাত্রে কম খাওয়া, নিয়মিত সময়ে ঘুমানো ও শয্যাত্যাগ।

[SPAN, December 1989, pp. 37-39]



উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



পৌষ

১৩৯৭

৯২তম বর্ষ

১২শ সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



পৌষ, ১৩৯৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

যে চায় সে পায় না, যে চায় না সে পায়।

পৃথিবীর মতন সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইচে : মানুষেরও সেইরকম চাই।

ঝড়ের এঁটোপাতা হয়ে থাক। অস্তিত্ব থাকবে, ব্যক্তিত্ব থাকবে না। তাহলে সব জ্বালা যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



কথাপ্রসঙ্গে

জীবনই যাঁহার বাণী

সারদাদেবীর দেহান্তের পর মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন : "…সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহা হইলে নির্বাপিত হইল। [তবে] আধুনিক হিন্দুনারীর সম্মুখে রাখিয়া যাইল আগামী তিনহাজার বৎসরে নারীকে যে-মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হইতে হইবে তাহারই আদর্শ। আমার নিকট তাঁহার জীবন হইল অসীম উৎসাহের জীবন—যাহা আমাদের সকলকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতি-ভরা জীবনতলে একত্র করিয়াছে, যাহা নূতন প্রয়োজনের উপযোগী আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত নূতন নূতন আদর্শের নজির সৃষ্টি করিয়াছে। আহা, তাঁহার জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাইতে পারি! তিনি আদর্শের নূতন নূতন নজির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—আমাদেরও অবশ্য তাহাই করিতে হইবে—তাঁহার নহে, আমাদেরই স্বকীয় [জীবনের নজির সৃষ্টি]! ইহা ভিন্ন অপর কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাইবে না।"

মিস ম্যাকলাউডের এই চিঠির কাল ও সারদাদেবীর দেহান্তের পর সাত-সাতটি দশক অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এই অন্তর্বর্তী সময়ে পৃথিবী আজ বাহ্যিক দিক হইতে খুবই ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের দিক হইতে পৃথিবীর মানুষের মনও ক্রমেই অস্বাভাবিক-ভাবে ক্ষুদ্রতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হইতেছে মানুষের জীবনে নানা জটিলতার অনুপ্রবেশ। উহারা ক্রমে এমন ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে যে, সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরকে স্পর্শ করিয়াও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এখন আর মানুষের বাসযোগ্য থাকিবে কিনা সেই প্রশ্ন উঠিতেছে। সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও কৃত্রিমতায় আমাদের সমাজ, আমাদের হৃদয় ভয়াবহভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান ইহার জন্য অবশ্যই দায়ী নহে, দায়ী আমাদের মানসিকতা। বিজ্ঞান জীবনকে সহজ করিতে, সুন্দর করিতে, স্বাচ্ছন্দ্যময় করিতে পরম সহযোগী সুহৃদের ভূমিকা পালন করিতে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু বিজ্ঞানের সৌজন্য গ্রহণ করিয়া মানুষ ক্রমেই তাহার বৌদ্ধিক, নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক সম্পদগুলি দ্রুত হারাইতে বসিয়াছে।

একই ছাদের তলায়, একই কক্ষে বাস করিয়াও একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে। অন্তরের ভাষার কথা

তো ছাড়িয়াই দিলাম, মুখের ভাষার অর্থই বুঝো দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। কারণ, পোশাকী সভ্যতার সৌজন্যে আজ প্রতিটি মানুষের মুখ যেন আর মুখ থাকিতেছে না, তাহা প্রকৃতপক্ষেই এক-একটি মুখোশে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, আত্মকেন্দ্রিকতা আজ কুরিয়া কুরিয়া আমাদের হৃদয়গুলিকে খাইয়া ফেলিতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে, স্বামীজী যাহা বহু বৎসর পূর্বে বলিয়া আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, পরানুকরণের উদগ্র মোহ। ইউরোপ অথবা আমেরিকার ছাপ থাকিলেই হইল—তাহা আমার পক্ষে, আমাদের পক্ষে, আমাদের সমাজ ও দেশের পক্ষে কতখানি উপযোগী, কতখানি শোভন, কতখানি স্বাস্থ্যকর তাহা দেখার প্রয়োজন আমরা বোধ করিতেছি না। এই নির্লজ্জ পরাণুকরণ-মোহ আজ আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে। এই মনোবৃত্তি পরাধীনতার দীর্ঘ সময়ে ভারতীয়দের যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার পর চার-চারটি দশক অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু দাস-সুলভ সেই জঘন্য মানসিকতা আজও আমাদের ছাড়িয়া যায় নাই। শুধু যায় নাই নহে, তাহা আরও বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে। আমরা সেই চিরন্তন শিক্ষার মর্ম-গ্রহণ আজও করিতে পারিলাম না: সিংহ-চর্মাবৃত হইলে গর্দভ সিংহ হয় না, ময়ূরপুচ্ছ আপন পুচ্ছে গুঁজিয়া লইলে কাক ময়ূর হয় না। উপরন্তু ঐ হাস্যকর এবং লজ্জাকর প্রয়াস করিতে যাইয়া আমরা শুধু যে নিজেদের ক্ষতি করিতেছি তাহা নহে—পরিবারের, সমাজের ও জাতির মধ্যেও অবক্ষয়ের ভূমি প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। স্বামীজী সেই কবে আমাদের সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন:

"ভয় হয়, পাছে [পাশ্চাত্য প্রভাবের] প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।

"এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।"

গ্রহণ অপরাধ নহে, কিন্তু নির্বিচার গ্রহণ অবশ্যই অপরাধ। গ্রহণের সময় স্মরণ রাখিতে হইবে: যাহা আমার নাই, অপরের আছে—যাহা থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে, তাহা অবশ্যই আমি গ্রহণ করিতে যত্নবান হইব, কিন্তু তাহাকে 'আমার' করিয়া লইতে হইবে; আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, যাহা আমার নিজস্ব মৌল সম্পদ রহিয়াছে তাহা যেন অটুট থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিত সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি সারদাদেবীর দিকে তাকাই তাহা হইলে দেখিব আমাদের মৌল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ ও পাথেয় আমাদের এই 'ঘরের' মানুষটির জীবন ও বাণীর মধ্যেই রহিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে-কোন পরিবার, সমাজ অথবা জাতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণসূত্রটি থাকে নারীর হাতে এবং সেই নারী প্রধানতঃ জননী অথবা পত্নী। তাঁহারা তাঁহাদের স্নেহ, প্রেম, সেবা ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা সহস্র সমস্যার মধ্যেও আমাদের গৃহকে বাসযোগ্য করিয়া রাখেন, পরিবারকে দৃঢ়বন্ধ করিয়া রাখেন এবং সমাজ, দেশ ও জাতিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করেন। কিন্তু এই বৃহৎ ও মহৎ কর্মের প্রায় সম্পূর্ণই সকলের অলক্ষ্যে ও অশ্রুতে সংঘটিত হয়, নিরুচ্চারে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রচার হয় না। অবশ্য প্রচারের কোন প্রয়োজনও হয় না। কারণ, নারীর এই মাঙ্গলিক ভূমিকা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই মানুষের জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহা তো যাইল নারীর ঐতিহ্য-অনুসারী ভূমিকা। কিন্তু যদি ইহার বিপরীতটি ঘটে—অর্থাৎ নারী যদি তাঁহার সনাতন স্বভাব ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে ব্যক্তি-জীবনে, পরিবার-জীবনে, সমাজ-জীবনে, জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। নারীর স্বভাব ও আদর্শে বিচ্যুতি যত ব্যাপক হইবে সামগ্রিকভাবে পরিবার, সমাজ ও জাতির ভিত্তি তত দুর্বল হইয়া যাইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শুধু নারীর স্বভাব-ভ্রষ্টতা ও আদর্শ-বিচ্যুতির উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হইবে কেন? পুরুষের অসংযত স্বভাব ও আদর্শ-বিচ্যুতির জন্যও তো পরিবারে অশান্তি নামিয়া আসে। সেই অশান্তির প্রভাবও সমাজ ও জাতির মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই প্রসারিত হয়। কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরুষের ক্ষেত্রেও চরিত্র এবং আদর্শ রক্ষায় নিষ্ঠা একইভাবেই কাম্য; কিন্তু জগতের সকল সভ্যজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুরুষের স্বভাব চিরকালই

তুলনামূলকভাবে অস্থির ও বহির্মুখী এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, স্নেহ-মমতা, সেবা ও ত্যাগের ভাব তুলনায় নারী অপেক্ষা কম। নারীই প্রধানতঃ জননী এবং পত্নী রূপে স্নেহ-মমতা, সেবা ও ত্যাগের শক্তিতে পুরুষকে চিরকাল নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে। ফলতঃ পরিবার, সমাজ ও জাতি অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নারীর মধ্যে ঐ ভাবগুলি সহজাত এবং স্বাভাবিক। তাই নারীর নিকট সহনশীলতা, সেবা, আত্মত্যাগ, মানাইয়া লইবার প্রয়াস প্রভৃতি মানবসমাজ বিশেষভাবে আশা করে, মানবসভ্যতা একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করে।

আজ সমাজ পালটাইয়াছে, যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। নারীরাও পুরুষের সহিত সর্ববিষয়ে তাঁহাদের সমানাধিকার ও সমান বিচারের দাবি জানাইতেছেন। ইহাতে অন্যায় নাই, অস্বাভাবিকতাও নাই। তবে একথা বোধহয় যথার্থ যে. এই মানসিকতার জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্যের কাছে ঋণী। পাশ্চাত্যের যাহা কিছু কল্যাণপ্রদ তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণীয়, কিন্তু গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি পাশ্চাত্য-মোহ আচ্ছন্ন করিয়া বসে তাহা হইলে তাহা উদ্বেগের কারণ হয়। পাশ্চাত্যে প্রতিদানের প্রত্যাশা বা 'দোকানদারি' ভাবটি বেশি। বস্তুতঃ, ভালবাসা যেখানে থাকে সেখানে প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে না, ভালবাসার পাত্রের কাছে কেন নত হইয়া রহিব তাহা লইয়া প্রশ্নও জাগে না। প্রকৃত ভালবাসায় দোকানদারি নাই। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য পাশ্চাত্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতবর্ষের নারী চিরকাল দিয়াই গিয়াছেন, পাইবার চিন্তা করেন নাই, পাইবার চিন্তা তাঁহাদের মনে স্থানই পায় নাই। ভারতীয় নারীর বেহিসাবী ও আত্মবিলয়ী স্বভাবের জন্যই বোধহয় ভারতীয় পুরুষ নারীর আত্মত্যাগ, সেবা ও মমতাকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছেন উহা তাঁহাদের প্রাপ্য। সুখের কথা, এই মানসিকতার প্রায়শ্চিত্ত আবার ভারতীয় পুরুষের পক্ষ হইতেই হইয়াছে। নারী-মুক্তি, নারী-উন্নয়ন, নারী-প্রগতি, নারী-কল্যাণের ধ্বজা প্রথম উঠাইয়াছেন ভারতের পুরুষরাই। ইহাতে অবশ্য আত্মতৃপ্তির কিছু নাই। কারণ, নারীর নিকট হইতে চিরকাল ধরিয়া পুরুষ যাহা পাইয়া আসিয়াছেন তাহার তুলনায় এই প্রয়াস নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গভীরভাবে একটি বিষয় স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই হউক অথবা এদেশে নারী-প্রগতির কল্যাণেই হউক, ভারতীয় নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজ সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জীবন ও জীবিকার প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে নারীর শক্তি ও যোগ্যতা অবিসংবাদীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নারীরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষই শুধু নহেন, শ্রেষ্ঠতরও হইতে পারেন। কিন্তু সমস্ত কিছুরই দুইটি দিক থাকে—ভাল ও মন্দ। নারী-প্রগতির বিষয়টি এক দিকে যেমন আশা ও আনন্দ আনয়ন করিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে উদ্বেগেরও কারণ ঘটাইতেছে। প্রগতির নামে বর্তমানে অনেক আধুনিক নারীর মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব জাগ্রত হইতেছে। ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা, নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা, পরিবার ও সংসারের জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ও মানসিকতায় অবিশ্বাস প্রভৃতি উক্ত স্বেচ্ছাচারিতার ফলশ্রুতি। তাঁহাদের বিচারে আজ সহযোগিতার স্থান লইতেছে প্রতিযোগিতা, যাহা ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হইতেছে। বহু আধুনিক নারীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা, আত্মম্ভরিতা ও উগ্রতা বড়ই প্রকট। ফলে মানুষ ভাঙিতেছে, পরিবার ভাঙিতেছে, সমাজ ভাঙিতেছে, জাতি ভাঙিতেছে। কথায় কথায় গৃহ-বিবাদ, কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ আজ শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও ছায়া বিস্তার করিতেছে; এবং তাহা হইতেছে অনেক সময় সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া, যাহা নারী ও পুরুষের সামান্য সহিষ্ণুতা, সামান্য ত্যাগস্বীকার এবং সামান্য সহানুভূতির দ্বারা পরিহার করা যাইতে পারিত। তবে নারীর নিকট সমাজের প্রত্যাশা অধিক। কারণ, নারী যে ধরিত্রীর প্রতীক-স্বরূপিণী। সুতরাং নারীর নিকট হইতে যে ত্যাগস্বীকার, যে সহানুভূতি, যে সহিষ্ণুতা প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত তাহার অভাব সমস্যাগুলিকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক নারীর মধ্যে থাকেন একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন কন্যা, একজন ভগিনী। এই ভাবগুলিই নারীকে পরিবারে ঐক্যসঞ্চারী শক্তি (cementing force) হিসাবে প্রকাশ করায়। উঁহাদের ব্যাতিরেকে পরিবার গঠিত হইতেই পারে না। আজ শুধু ভারতেই নহে, বাস্তব পরিস্থিতি বলিতেছে যে, সারা পৃথিবীতেই নারী এই ভাবগুলির মাধুর্য হারাইতে বসিয়াছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর নারীকে পথ দেখাইতে আসিয়াছেন একজন নারী। আমরা অবশ্য এখানে আমাদের ঘরের কথা অর্থাৎ ভারতের কথাই ভাবিতেছি। আধুনিক অর্থে যাহাকে 'আলোক' বলা হয়, 'শিক্ষা' বলা হয়,

'প্রগতি' বলা হয় তাহার সহিত সেই নারীর কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল না স্বাধিকার প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার আধুনিক অগ্রবর্তিনীগণের আন্দোলনের সঙ্গেও। তিনি নারী-আন্দোলনের সমর্থনে কোন জনসভা বা আলোচনাচক্র সংগঠিত করেন নাই অথবা তাহাতে যোগদানও করেন নাই, পত্র-পত্রিকায় লেখনী ধারণ করেন নাই, প্রচারমাধ্যমগুলিতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন নাই। তাঁহার নিরক্ষর দরিদ্র পিতার স্নেহে তিনি 'শৈশব' অতিবাহিত করিয়াছেন; নিরক্ষর দরিদ্র স্বামীর প্রেমে তাঁহার 'যৌবন' অতিক্রম করিয়াছেন; একটিও সন্তানকে গর্ভে ধারণ না করিয়া বহু সন্তানের শ্রদ্ধায় 'বার্ধক্য' অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রাচীন-পন্থী, গ্রামীণ সংস্কারাচ্ছন্ন শাশুড়িকে তিনি অন্তর দিয়া সেবা করিয়াছেন; স্বামীর ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সহিত গ্রামের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে থাকিয়াছেন; কলহপ্রিয়, ঈর্ষাপরায়ণ একাধিক ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সকল সংকীর্ণতা-সহ তাহাদের ভালবাসিয়াছেন এবং শেষদিন পর্যন্ত তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকিয়াছেন। কিভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে? সম্ভব হইয়াছে একটি-দুইটি মন্ত্রের জন্য। সেই মন্ত্র হইল: "আমার আমিত্ব যেন না আসে" এবং "সহ্যের সমান গুণ নাই, সন্তোষের সমান ধন নাই"। এইসব মন্ত্র তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন তাঁহার নিরক্ষর ও দরিদ্র স্বামী। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে আরও শিখাইয়াছিলেন:

যখন যেমন তখন তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

অন্যের দোষ নহে, দোষ দেখিতে হইবে নিজের।

কেহ তোমার পর নহে, সকলেই তোমার আপন। সকলকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।

স্বামী তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন সেকথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য তিনিও শ্রদ্ধার সহিত, ভালবাসার সহিত শিখিবার নিমিত্ত উন্মুখ ছিলেন। ইহা কখনও তাঁহার মনে হয় নাই যে, স্বামীকে শিখাইবার অধিকার কে দিয়াছে? স্বামীর নিকট হইতে দেবীর মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পাইয়াও তিনি ভাবিতেন এবং সগর্বে ঘোষণা করিতেন যে, তিনি তাঁহার দাসী। 'দাসী' তিনি নিজেকে ভাবিলেও তাঁহার স্বামীর নিকট যে সমুচ্চ সম্মান তিনি পাইয়াছেন তাহা আমরা সকলেই অবহিত। স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য-প্রশিষ্যগণও সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দাসী' হিসাবে নহে, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপর সত্তা অথবা অপর বিগ্রহরূপেই দেখিয়াছেন। এমনকি অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের উপরেও তাঁহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে, নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দাসী হিসাবে ভাবিলেও বস্তুতঃপক্ষে সারদাদেবী রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। শুধু তাহাই নহে—তিনি ছিলেন উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীও। কি সংসারে, কি ভক্তমহলে, কি সঙ্ঘে—সর্বত্রই তিনি নিজেকে সাধারণের একজন করিয়া রাখিতেন, অথচ সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার আসন ছিল নিরঙ্কুশ কর্ত্রীর, প্রশ্নাতীত নেত্রীর। বিনয়, নম্রতা, সহিষ্ণুতা যে দুর্বলতা নহে, বরং তাহাই যে শক্তি এবং শক্তিরও অধিক তাহা সারদাদেবীর জীবন ও আচরণ হইতে বারম্বার প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বামী অথবা অন্য গুরুজনের ইচ্ছার নিকট প্রশ্নবিহীন আত্মসমর্পণ তো নারীর নিজ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ-বিরোধী! তাহা তো পক্ষান্তরে পুরুষকে স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারীই করিয়া তুলিবে? তাহার উত্তরও দিয়াছেন সারদা-দেবী। একবার কোন ব্যাপারে তাঁহার আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের বিরোধী মনে হওয়ায় তাঁহাকে একজন প্রশ্ন করিলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিয়াছিলেন: "মানুষ কি সব কথা মেনে চলতে পারে?" আর একবার গুরুসেবা প্রসঙ্গে নিষ্কম্প কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন: "উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।" অর্থাৎ সারদাদেবী দেখাইলেন যে, সর্বতোভাবে স্বামী ও গুরুজনদের অনুবর্তিনী থাকিয়াও আপন স্বাধীন চিন্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং চিন্তা ও কর্মে 'আধুনিক' হওয়া সম্ভব এবং তাহা করিয়া সংসারে শক্তি ও সংহতির বাতাবরণকে ঘনতরও করা সম্ভব। প্রয়োজন, কোথায় ও কখন থামিতে হইবে তাহার কৌশল জানা। প্রয়োজন, সকলপ্রকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কিভাবে সুষ্ঠ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহার পদ্ধতি শিখা।

সারদাদেবীর জীবন দেখাইয়া দিয়াছে—সেই কৌশল ও পদ্ধতি হইল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা তপস্যারই অপর নাম। এই তপস্যা পর্বতের গুহা অথবা লোকালয় হইতে দূরে নির্জন অরণ্যে করিতে হইবে না। সংসারে থাকিয়াই নিত্যদিনের কর্ম ও প্রাত্যহিক কর্তব্য সাধন করিয়াই তাহা করা যায়। সেই তপস্যা হইল মনের অশুভ ও বহির্মুখী বৃত্তি ও বাঁকগুলির উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন। সারদাদেবী কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ না লিখিয়া, কোন ভাষণ না দিয়া নীরবে আপন আচরণে সেই তপস্যাকে বাণীরূপ দিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার বাণীই হইল তাঁহার জীবন এবং তাঁহার জীবনই হইল তাঁহার বাণী।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

গোদাবরী হাউস
উতকামন্ড, দক্ষিণভারত
২৬ আগস্ট, ১৯২৬

শ্রীমান সুধীর,*

তোমার ১৭।৮ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। অরুণের এক পত্র মধ্যে পাইয়াছিলাম। সে অত্যন্ত পেটের অসুখে ভুগিতেছে শুনিয়া চিন্তিত রহিয়াছি। তাহার পত্রের উত্তর দিয়াছি।

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। প্রভু তোমায় ঠিক পথেই চালাইতেছেন ও চালাইবেন, আমি নিশ্চয় জানি। তিনিই তোমার হৃদয়ের নাথ, হৃদয়ের দেবতা আর অধিক তোমায় লিখিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ, যাহা লিখিব তুমি সেসব উপলব্ধি করিতেছ তাঁহার কৃপায়। আমি কেবল তোমায় আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ করি। তুমি যেন ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই না জান। জনমে মরণে তিনিই তোমার, আর কেহই নয়।

আমি ভাল আছি। তুমি একভাবেই আছ, তা ভাল। এখানে এখন এতদিনে বর্ষা ছাড়িয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার প্রায়ই থাকে। মাঝে মাঝে মেঘ হয় আবার কাটিয়া যায়। পর্বতশ্রেণীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখাইতেছে। নীলগিরি এখন ঠিক নীল রং ধরিয়াছেন—অতি শোভাময়, সর্বদাই উদ্দীপন হয়।

কলকাতায় অসুখ-বিসুখ খুব হইতেছে শুনিতে পাইতেছি। মা দয়া করিয়া সব ভাল করিয়া দিন। বৃহৎ শহর—বহু লোকের বাস। নানাপ্রকার ময়লা আবর্জনা প্রায়ই জমে। ভাল করিয়া সেসব নিত্য পরিষ্কার না করিতে পারিলে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি হয়। পদস্থ লোক যাঁহাদের উপর এসব দেখিবার ভার আছে তাঁহারা মায়ের কৃপায় এসকল নিবারণ করিবার সং উপায় উদ্ভাবন করুন এবং শহরবাসীকে সুখী করুন।

তোমার মেজদিদির মেয়ের বিবাহ বেশ সৎপাত্রে হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তাঁহাকে আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ দিও। মণীন্দ্রকেও দিও। তোমার মা ও বাবাকেও আমার আশীর্বাদ দিও। বাবার কাজে একটু সাহায্য করিবার চেষ্টা নিশ্চয় করিও।

আমরা বোধ হয় এখানে ২।৩ সপ্তাহ আছি। তাহার পর খুব সম্ভব বাঙ্গালোরে যাইতে পারি। তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ জানিবে। যে ভাইটির মাথায় একটু গোলমাল হইয়াছিল সে কেমন আছে? গদাধর আশ্রমে মাঝে মাঝে যায় কি? তাহার জন্য আমার চিন্তা আছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* পরিচয় জানা যায়নি—যুগ্ম সম্পাদক।

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
২২।৯।২৬

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার ২২শে ভাদ্রের পত্রে তোমরা ওখানে সুখে শান্তিতে আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব্যাকুলভাবে ডাকিবে এবং সুবিধা হইলেই মঠে যাইয়া তাঁহার দর্শনাদি করিবে। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার কুশল। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং তোমার মাকে এবং অন্যান্য সকলকে জানাইবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ।

॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
৮।১০।২৬

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার ১৩ই আশ্বিনের পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তোমার মা শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন। তাঁহাকে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ দিও এবং তুমি ও বাটীস্থ সকলে জানিও। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার অন্যান্য সকলের কুশল।

জপধ্যান একমনে করিবে—তাহা হইলেই প্রাণে শান্তি পাইবে। তোমার যখন দীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আর ভাবনা কি? ইষ্টমন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিয়া যাইবে। উহা হইতেই ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সব হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা সর্বপ্রথমে করিয়া তাহার পরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। তাঁহার কৃপায় ক্রমে ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে ও মনে আনন্দ আসিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ।

॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
১১।১১।২৬

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার ১৭ই কার্তিকের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে এবং তোমার মাতাকে জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার দেখা হইবে—সেজন্য ভাবনা কি? সকলের মনের অবস্থাই ঐরূপ কখনও ভাল থাকে, আবার কখনও অস্থির এবং চঞ্চল হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেমন ডাকিতেছ সেইরূপ ডাকিয়া যাও। ক্রমে সব ঠিক হইয়া যাইবে। ৺পূজা দেখিয়া বেশ আনন্দ পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমার মাতাঠাকুরাণীর শরীর, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, শীঘ্র সুস্থ ও সবল হউক। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার অন্য সকলের কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ।

পুঃ অদ্য তোমার ভাই কালা আসিয়াছিল। আমাকে প্রণামী টাকা দিয়া গিয়াছে। তাহাদের বাটীর সকলে ভাল আছে।

* চিঠি তিনটি কমলেকামিনী ঘোষকে লিখিত। অল্পবয়সে বিধবা এই মহিলার স্বামীর নাম রমণীমোহন ঘোষ; পিতা রামচরণ মল্লিক। তিনি সারাজীবন ধর্ম-সাধনায় অতিবাহিত করেন। ইংরাজী, বাঙলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত কবিতা দু-একটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।—যুগ্ম সম্পাদক।

প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং আমরা মেয়েরা

কেয়া তালুকদার

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অমৃতজীবন। পৃথিবীতে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাই অমৃত। কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথামৃত। জলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরণামৃত। দিনের শ্রেষ্ঠ সময় অমৃতযোগ। শ্রেষ্ঠ ফল আম—অমৃতফল। সর্বলোকের শ্রেষ্ঠলোক স্বর্গ—অমৃতলোক। ঠিক তেমনি ভাবে মানবিক গুণগুলির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় যে-জীবনে সেই জীবনই অমৃতজীবন।

পৃথিবীতে মানুষ আসে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে। চলে যায় আপন জীবনসীমার পরিসমাপ্তিতে। আগমন আর বিদায়ের মধ্যবর্তী জীবন-প্রবাহ প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়েও মোটামুটিভাবে একমুখী—জীবিকা, সংসার এবং উত্তরসূরীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখবার আকাঙ্ক্ষা। মানবজীবন মোটামুটিভাবে এই সাধারণ নিয়মে চলে। এরই মধ্যে আপনার সুখ খুঁজে নিয়ে নিরন্তর সুখী হবার চেষ্টা চালায় মানুষ। এজগতে মানুষ আত্মমগ্ন। কিন্তু আত্মমগ্ন এই কোটি কোটি মানুষের পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আকাশ বাতাস আলোকিত হয়। আর্ত মানুষের পরিত্রাতা আসেন অমৃতের সন্ধান দিতে। তখন "উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' নবজীবনের আশ্বাসে।"

অমৃতজীবনের অধিকারী মহামানব মহামানবী-গণ সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেন না। তাঁদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের বহু অসঙ্গতিকে আবিষ্কার করে তার সমাধানের পথ দেখায়। যেমন দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ।

জীবন একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমিত। কিন্তু কাল নিরন্তর প্রবহমান। তাই বর্তমান ও আগামী দিনের কথা স্মরণ করে প্রত্যেক মহামানব মহামানবী তাঁদের উপলব্ধির প্রকাশ বর্তমান ও ভাবীকালের কাছে রেখে যান। তাকে আমরা বলি তাঁর শিক্ষা। তাঁদের শিক্ষা তাঁদের জীবন থেকে আলাদা হয় না। পূর্বোক্ত সকল মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য সারদা-দেবীর ক্ষেত্রেও। তাঁর সম্পর্কে আমরা বলতে পারি তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকেও আমরা পাই সত্যের শিক্ষা, উদারতার শিক্ষা, ত্যাগ, ক্ষমা, মমতা, ধৈর্যের শিক্ষা, আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা, সন্তোষের শিক্ষা, প্রতিকূল অবস্থায় অবিচলিত থাকার শিক্ষা। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে উল্লেখ করেছেন "অনাড়ম্বর সহজতমার সাজে পৃথিবীর মহত্তমা নারী" বলে। প্রকৃতই সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন পল্লীনারী, শিক্ষার আলোকবঞ্চিতা, দরিদ্রকন্যা, দরিদ্রগৃহিণী—ভারতের কোটি কোটি নারীরই একজন। কিন্তু এতো সাধারণ দৃষ্টির কথা। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। মায়ের নিজেরই একটি কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "সকলেই কি তাঁকে চিনতে পারে মা? ঘাটে একখানা হীরে পড়েছিল, সবাই পাথর মনে করে স্নান করে তাতে পা ঘষে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী এসে দেখেন সেখানা মস্ত এক মহামূল্য হীরে।" এরই নাম দৃষ্টি। এ-প্রসঙ্গে একটি উর্দু কবিতা মনে পড়ছেঃ "অগড় সত্তকে দীদার হ্যায় তো / আঁখোমে নজর পয়দা করো।" অর্থাৎ যদি দর্শনের ইচ্ছা থাকে তবে তোমার চোখে দৃষ্টির সৃষ্টি কর। আজ আমাদের চোখে সেই দৃষ্টি চাই। মায়ের সহজ অনাড়ম্বর জীবন থেকে তাঁর সহজ সরল বাণীগুলিকে তুলে নিতে হবে, গেঁথে নিতে হবে আমাদের হৃদয়ে।

মায়ের জীবন ছিল সত্যদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাগর পাড়ি দিলে যখন অস্পৃশ্য-দলভুক্ত হতে হতো, তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অখ্যাতপল্লীর নিরক্ষর, ব্রাহ্মণের বিধবা হয়েও মা স্বামীজীর বিদেশে যাওয়ার পথ সুগম করেছেন তাঁর দ্বিধাহীন আশীর্বচন উচ্চারণ করে। সেই সত্যদৃষ্টির প্রেরণাতেই তিনি ম্লেচ্ছ নিবেদিতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছেনঃ "নরেন এ ফুল বিদেশ থেকে এনেছে।" স্বামীজী নিজেও সন্দিহান ছিলেন মা নিবেদিতাকে গ্রহণ করবেন তো। সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে মা

নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছেন—শুধু তাঁর আবাসে নয়, তাঁর অঙ্কেও। নিবেদিতা একবার নিজ হাতে ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ মাকে দেন এবং মা পরম আনন্দে তা গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে তো বটেই, আজও ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবতার ভোগ রান্না হয় না। ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে ঢি ঢি পড়ে গেল। কিন্তু মা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন: "নিবেদিতা আমার মেয়ে। ঠাকুরের ভোগ রান্না করবার অধিকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে আমি নেব। যার তাতে আপত্তি সে নিজেকে নিয়ে থাক।"

মানুষ বড় তার জন্মসূত্রে নয়, বৃত্তিসূত্রেও নয়, মানুষ বড় তার আন্তর ঐশ্বর্যে। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলনের জননী-স্বরূপা শ্রীমা তাঁর ভাইঝি রাধুকে নির্দেশ দিয়েছেন অব্রাহ্মণ শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করবার। বলেছেন: "কত বড় বিজ্ঞ। ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য।" অকারণ জাত্যাভিমান আর বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তিনি সহজ সরল দু-একটি কথায়: "আমার ইচ্ছে হয় সকলকে একপাত্রে বসে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশের আবার জাতের বড়াই আছে।" শুধু বলেননি, কাজে করেও তিনি দেখিয়েছিলেন জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে মুড়ি আর জিলিপি খাইয়ে।

সমন্বয় সাধনের এ এক আশ্চর্যরূপ। সমন্বয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তাঁর ব্যবহারে পদে পদে প্রকাশ পেয়েছে সমদর্শিতা। তাইতো মানবিক বোধের কোন্ গভীর অন্তর্লোক থেকে তিনি উচ্চারণ করতে পারেন: "শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমনি ছেলে।" শরৎ হলেন স্বামী সারদানন্দ আর আমজাদ বিধর্মী, ডাকাত। কিন্তু সাম্যের আদালতে রায় হয়ে গেল উভয়েই তাঁর তুল্য সন্তান।

সহজ সরল ছোট ছোট কথায় তিনি অধ্যাত্মপথের যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার দৃষ্টান্তও বিরল। ঈশ্বরকে সব অবতারের মধ্যে উপলব্ধি করে মা একদিন বলেছিলেন: "একই চাঁদ রোজ রোজ।"—কি সহজ সরল উপমা। আবার ঈশ্বরের করুণা তো সকলের ওপরই বর্ষিত, কেউ তা থেকে বঞ্চিত নয়। একথা আমরা বুঝেও কত সময় বুঝতে চাই না। মা বড় সুন্দর করে বললেন: "সূর্য থাকে আকাশে, জল থাকে নিচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, 'ওগো সূর্য, তুমি আমাকে ওপরে তুলে নাও।' সূর্য আপনার স্বভাব থেকেই জলকে বাষ্প করে তুলে নেয়।"

স্বামী অরূপানন্দ একবার একটি বটবীজ দেখিয়ে বলেছিলেন: "মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট, এর থেকে কত বড় গাছ হয়।" মা বললেন: "তা হবে না? দেখছ না ভগবানের নামের বীজ কতটুকু, তার থেকেই কালে প্রেম, ভক্তি, ভাব কত কি হয়।" বলেছিলেন: "যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে গন্ধ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ তত্ত্ব আলোচনা করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

নিবেদিতা লিখেছেন: "আমার সবসময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি শুধু পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা নতুন আদর্শের অগ্রদূত?"

নিবেদিতার এই যে প্রশ্ন—এ প্রশ্নের খোঁজার দায়িত্ব আমাদেরই। কোন কিছু আদর্শ হিসাবে তখনই গ্রহণীয় হয় যখন তা জীবনের চিরকালীন প্রয়োজনে আসে। তাই আজ দেখতে হবে যে, একটি মহান জীবন হিসাবে শুধু কি তাঁকে শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বসিয়ে রাখব? তাই যদি হয় তবে কিন্তু মহীয়সী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনের মূল্যবোধগুলির দাম থাকে না; কিন্তু যদি দেখি তাঁর জীবন আমাদের আজ ও ভবিষ্যতে অনুসরণীয়, তবেই তিনি নবীন আদর্শের অগ্রদূত।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের তিনটি দিক: ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এবং সমাজ তথা রাষ্ট্র জীবন। ব্যক্তি হিসাবে যিনি একটি স্বতন্ত্র-সত্তা, তিনিই সমাজে পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারা সকলের সাথে যুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্যক্তিজীবন প্রত্যেকেরই নিজস্ব এবং তাকে নিজের খুশিমতো চালিত করা সম্ভব; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন

কিছুই দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-সমাজের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে না। আবার পরিবার বা সমাজ শুধু ব্যক্তির সমাবেশ নয়। চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, মমতার বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় প্রকৃত পারিবারিক তথা সামাজিক বন্ধন। তাই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী মানুষ যেমন সার্থক মানুষ হতে পারে না, ঠিক তেমনি ভাবেই আত্মকেন্দ্রিক মানুষ দ্বারা গঠিত দেশ জাতি সমাজ পরিবার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিভাবে গঠিত হতে পারে সার্থক ব্যক্তিজীবন তথা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন? মায়ের অনবদ্য জীবনখানির মধ্যে আছে সেই রহস্যের চাবিকাঠি।

মানবজীবনে সহ্য, ধৈর্য, ক্ষমা মহৎ গুণ। কিন্তু সেইসব আদর্শকে আমরা ভুলতে বসেছি। একবার যদি কেউ অন্যায় করেছে তো সে চিরপরিত্যাজ্য। এর ফলে ভেঙে যাচ্ছে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ক।

মায়ের ভাইয়েরা, ভ্রাতৃবধূরা, ভাইঝিরা তাঁকে কত কটু কথা বলেছেন, কত অন্যায় দোষারোপ করেছেন, তবুও মা কোনদিন কারো দোষ ধরেননি, সকলকেই ক্ষমার চোখে দেখেছেন। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন: "আমাদের তো দেখছ, পান থেকে চুন খসলে আমরা রেগে আগুন হই, কিন্তু মাকে দ্যাখো, তাঁর ভাইয়েরা কত কি কাণ্ড করেছেন কিন্তু তিনি যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন।"

রামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে হৃদয় মাকে মাঝে মাঝেই কটুকাটব্য বলতেন। একবার মা এবং তাঁর মা শ্যামাসুন্দরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন কিছুদিন থাকবেন বলে। হৃদয় তাঁদের থাকতেই দিলেন না। 'কেন এসেছ', 'কি জন্য এসেছ' ইত্যাদি কটুকথা বলে তাঁদের বিদায় করে দিলেন। কিন্তু মা একটি কথাও বললেন না। যাবার আগে ভবতারিণীকে শুধু বললেন "মা, যদি আবার কখনো টানো তবে আসব।"

ইংরেজদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে কজন বিপ্লবী সন্তান একবার বলেছিলেন: "মা, তুমি বল ইংরেজরা উচ্ছন্নে যাক।" কিন্তু চিরক্ষমাময়ী মা তা বলতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন "তারাও তো আমার সন্তান, সকলেরই কল্যাণ হোক।" আজ সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে এই কথাটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি, সকলের সব দোষ অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারি, তবে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সংসারে কিভাবে চলা উচিত? মা বলতেন: "যা-কিছু কর না কেন সকলকে নিয়ে একটু মান্য দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বৈকি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে থেকে লক্ষ্য করতে হয় যাতে বেশি কিছু খারাপ না হয়। সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।" পাগলী মামীর মেয়ে রাধুকে তত্ত্ব পাঠাতে হবে। পাগলী মামী এবং মায়ের আর এক ভাইঝি নলিনীদির মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। পরস্পরের প্রতি তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ। তত্ত্বের ব্যাপারে নলিনীদি নির্ঘাত ঝামেলা করবেন, তা এড়াতে মা নলিনীদিকেই মুরুব্বি করলেন। জানতে চাইলেন এব্যাপারে তাঁর কি মত? দেখা গেল এই অপ্রত্যাশিত সম্মানলাভে নলিনীদি পাগলী মামীর সাথে চিরকালের শত্রুতা সাময়িকভাবে হলেও ভুলে গেলেন। মায়ের করা ফর্দ দেখে বললেন: "ওতে কি করে হবে পিসীমা? তোমার তো সম্মান আছে, তুমি কেন ছোট নজর দেখাবে? তুমি তোমার মতো করে দাও।" এই বলে মায়ের ফর্দের সাথে আরো কিছু জিনিস যোগ করে খুব সুন্দরভাবে তত্ত্বের ব্যবস্থা করলেন নলিনীদি।

এযুগে আর এক যন্ত্রণার শিকার হয়েছি আমরা, তা হলো অন্যের ওপর অবিশ্বাস। মায়ের জীবনের সর্বত্রই দেখি সরল বিশ্বাসের পূর্ণ ছবি। তেলো-ভেলোর মাঠে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দস্যুর সামনে পড়েও তিনি কিন্তু সরল বিশ্বাসে তাকে সম্বোধন করেছিলেন 'বাবা' বলে।

আজকের সমাজে আরো একটা জিনিস প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হলো অতিরিক্ত চাহিদা। অর্থের চাহিদা, স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা, বিলাসিতার চাহিদা। আজকে আমাদের চাহিদা একটা প্রতিযোগিতার স্তরে যেন পেঁৗছে গেছে। সর্বক্ষেত্রে জীবনের চাহিদার যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেছে সুন্দরের। সেখানে উঠে দাঁড়াচ্ছে কুৎসিত। ইষ্টপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট পুরুষ, ইষ্টপথ থেকে পুরুষকে বিচ্যুত করার চেষ্টা নারীর।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে কোন চাহিদা ছিল না। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে চাহিদা ছাড়া জীবন তো

মূল্যহীন। চাহিদা থাকবে, কিন্তু কোন্ চাহিদা? যে-চাহিদা জগতের কল্যাণে আসে। মায়ের জীবনেও সেই কল্যাণকামী চাহিদা ছিল। যে-চাহিদা তাঁর ছিল না, তা হলো নিজের সুখের জন্য অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা। কিন্তু যে-চাহিদা তাঁর ছিল তা হলো জগতের কল্যাণ। তাইতো ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর চৌত্রিশ বছর তাঁর জীবনধারণ। যখন রামকৃষ্ণ মঠ হলো তখন বলেছিলেন: "আহা, এর জন্য ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। তাইতো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যাকিছু।" তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ছিল মঠে সংসারের তাপদগ্ধ মানুষ এসে শান্তি পাবে। মায়ের আদর্শের অনুসরণে আজ আমাদেরও চাহিদা হওয়া উচিত পরকল্যাণমুখী।

মা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই আধুনিকা। 'আধুনিকতা' বলতে আজ আমরা বুঝি বিদেশী উগ্রজীবনের অক্ষম অনুকরণ আর চরম স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা হলো চলমান জীবনের যা-কিছু অসঙ্গতি, তার আবিষ্কার ও পরিমার্জনা এবং এর দ্বারা সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। তাই আধুনিক মনোভাবাপন্ন তিনিই, যাঁর চোখে থাকবে আগামী দিনের সুস্থ সমাজ-জীবনের উজ্জ্বল চিত্র এবং সেই চিত্রটিকে সার্থক করবার জন্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাব। মায়ের জীবন ছিল এক নিঃশব্দ সংগ্রাম। নারীমুক্তি সম্পর্কে সেই সময়েই তিনি চিন্তা করেছিলেন। বালবিধবাকে নিরম্বু উপবাস করতে দেখে বলেছিলেন: "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।" এক ভক্তের মেয়ের বিয়ের ভাবনা দেখে বলেছিলেন: "বে দিতে না পার এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি করে দাও। লেখাপড়া শিখবে—বেশ থাকবে।" নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে মা প্রার্থনা করেছিলেন, বিদ্যালয়ের ওপর যেন জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে সেলাই ইত্যাদি হাতের কাজ শেখানো হবে দেখে তিনি খুবই খুশি হন মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে পারবে ভেবে। রাধু ও মাকুকে তিনি অন্যদের সমালোচনা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও নিবেদিতার বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। অন্য মেয়েদেরও পড়াতে উৎসাহ দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রায় সম্মতি দান, ভগিনী নিবেদিতাকে গ্রহণ, আমজাদ প্রভৃতিকে স্নেহ দান, নারীশিক্ষাকে সমর্থন, স্বামীজীর সেবা-ধর্মকে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি হলো তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন।

স্বামীজী বলতেন, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার জন্য শুধু ব্রত, উপবাস, জপ-তপই একমাত্র উপায় নয়। মানবসেবাই ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সেবা। স্বামীজী বলেছিলেন শুধু মন্দির-মসজিদই উপাসনা-গৃহ নয়। মানবসেবার সমস্ত ক্ষেত্রই উপাসনাগার। মঠকে এই সেবা-কর্মের সাথে যুক্ত করতে হবে। একেই তিনি বলেছিলেন ব্যবহারিক বেদান্ত। অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত তাঁর এই মতের সাথে একমত হননি। মা কিন্তু এ-সত্য উপলব্ধি করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তিনি বলতেন, মঠে সন্ন্যাসীরা শুধু নিজেদের মুক্তির জন্য আসবেন না, আসবেন জগতের সেবার জন্য।

সংসারে শান্তি এনেছে মেয়েরাই। কিন্তু বর্তমানে বেশির ভাগ সংসারে শান্তির সেই পুণ্য বাতাস আর বইছে না। আজকের মেয়েদের মধ্যে বাইরে কর্মরতা হোক বা না হোক তাদের মধ্যে আসছে—কি পেয়েছি আর কি পাইনি এই বোধের জাগরণ। কি পাইনি ভাবতে ভাবতে মেয়েরা আজ ভুলতে বসেছে কি দেবার ছিল। তারা তাই আজ অভিযোগে পরিপূর্ণ। অথচ দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ছোট্ট ঘরে সবার সেবা করে পরম তৃপ্তিতে কাটিয়ে গেলেন মা। আজকের মেয়েরা আমরা ভাড়াটেবাড়ি বা ছোট ঘরের দোহাই দিয়ে কত প্রয়োজনীয় দায়িত্বই না এড়িয়ে যাই। কিন্তু কত ছোট জায়গার মধ্যেও যে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায়, মা তো তা দেখিয়ে গেছেন। আজ সামান্য অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমরা নিজেদের মনে করি বঞ্চিতা, অবহেলিতা। আসলে আজ আমরা মনে করি ভালবাসা মানে আত্মতৃপ্তি। কিন্তু মা দেখিয়ে গেছেন ভালবাসা মানে আত্মত্যাগ। পরের জন্য আপনার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করা। স্বামী, সন্তান, সর্বোপরি পরিবারের সকলের সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই ভালবাসা। আজ সেই ভালবাসার স্বরূপ আমরা ভুলতে বসেছি বলেই আজ মেয়েদের মধ্যে আসছে নারীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউ। মেয়েরা আজ মুক্তি চাইছে

প্রধানুগ জীবন থেকে। সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমান অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাদের দাবি।

তাদের দাবি অস্বীকার না করেই প্রথমে দৃষ্টিপাত করি মায়ের জীবনের দিকে। দেখি তাঁর জীবনদর্শন কি বলে। তাঁর জীবনদর্শন বলে: সুখের স্বাভাবিক অস্তিত্ব অন্তরে, ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা দুঃখকে জয় করা যায় না। দুঃখ জয় করতে হয় আপনার মধ্যে সুখ অনুসন্ধান করে, আত্মার আনন্দে মগ্ন থেকে। এর উৎস হলো আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে উপলব্ধি করে চির-আনন্দময় সত্তাকে নিজের প্রকৃত সত্তা বলে চিনে নেওয়া। সেই আনন্দের স্বাদ ভুলিয়ে দিতে পারে অবহেলাবোধ, স্বীকৃতির অভাবের বেদনা, নিজেদের অযোগ্যতার ধারণা। এক মহিলা ভক্তকে মা বলেছিলেন: "কত সৌভাগ্যে মা এ জন্ম। খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও।" মায়ের উপদেশাবলী প্রসঙ্গে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন: "শ্রীমায়ের উপদেশ এবং শিক্ষা সবই তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতিকেন্দ্রিক। কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থনির্ভর নয়।" বর্তমান যুগের জটিল বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেও কিভাবে পবিত্র সংঘাতহীন সহজ জীবনযাপন করা যায় ঠাকুর এবং মা উভয়েই তা পৃথিবীকে দেখিয়ে গিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক সন্তানের চরিত্র গঠন করে। আর আজ স্বামী-স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্কের ফলে সন্তান হচ্ছে বহির্মুখী, হচ্ছে মাদকের শিকার। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে পুরুষের দায়িত্বও অনস্বীকার্য। স্ত্রীর ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া যেমন স্বামীর কর্তব্য, তেমনি স্ত্রীর কর্তব্য তাঁর মতানুবর্তিনী হওয়া। এই মিলিত শ্রদ্ধার জীবন ছিল ঠাকুর এবং মায়ের। বর্তমান যুগে এই মিলিত শ্রদ্ধার জীবন বিরল উদাহরণে পরিণত হচ্ছে। এর মূলেও আছে গভীর কারণ। আজ দেশের বহু মহিলা শিক্ষিতা, আধুনিকা, সাজ-পোশাকে দর্শনীয়া, বেশ কিছু সংখ্যক চাকুরিরতা। তাঁরা যে সবদিক দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্না এ বোধটা তাদের মধ্যে খুব প্রবল। ফলে আসছে সংঘাত। কিন্তু শান্তি তখনই আসবে যখন স্ত্রী মনে করবেন তিনি কিছুই নন, অন্যদিকে স্বামী মনে করবেন স্ত্রীই সব। ঠিক এই রকম সম্পর্ক ছিল ঠাকুর এবং মায়ের।

নিবেদিতা লিখেছেন: "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী যখন তাঁর আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলতেন তখন তিনি নিজে যেন কেউ নন এইভাবে আপনাকে পৃথক করে রাখতেন।" নিজের সম্পর্কে মা বলতেন, "আমি আর কি? তিনি দয়া করে চরণে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাই বর্তে গিয়েছি। আমি তাঁর দাসীর দাসী।" আবার ঠাকুর যে তাঁকে কি চোখে দেখতেন তার পরিচয় পাই তাঁদের জীবনের অনেক ঘটনায়। নিবেদিতা বর্ণিত এরকম একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন মাতাঠাকুরানী হর্ষোৎফুল্ল বালিকার মতো আনন্দ ও গর্বভরে একঝুড়ি ফল মিষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত জিনিস দেখে অসন্তুষ্ট হন। তিনি গম্ভীরভাবে শ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন: "কিন্তু এত বেশি বেশি কেন?" সহসা বালিকাবধূর সব আনন্দ অন্তর্হিত হলো। "অন্ততঃ এ আমার জন্য নয়"—শুধু এইটুকু বলেই তিনি নীরবে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাছে যে ছেলেরা বসেছিল তাদের বললেন: "তোদের মধ্যে কেউ একজন গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্যন্ত উড়ে যায়।"

আজ নারীরা অনেক অর্থেই শক্তিময়ী। তবু কেন তাদের জীবন এত হতাশা আর অস্থিরতায় পরিপূর্ণ? কেন তাদের জীবনে আসছে না পরিপূর্ণতার ভাবময় স্নিগ্ধতা? তাই আজ প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। হতাশা ও অস্থিরতার ক্ষেত্রে পুরুষ-শাসিত সমাজের কিছু ভূমিকা থাকলেও মেয়েদের নিজেদের ত্রুটিও কম নয়। আজ অধিকাংশ নারীই মনে করে শিক্ষা মানে ডিগ্রীলাভ, সংস্কৃতি মানে নাচ, গান, বিদেশী উগ্র পোশাক-পরিচ্ছদের নির্লজ্জ অনুকরণ। জীবনের মানদণ্ড—সন্তানকে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলে পড়ানো আর অতি আধুনিক আসবাবে বাড়ি ভরানো। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা। জীবনকে উগ্র আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে মেয়েরা যে পুরুষের চোখে শ্রদ্ধা হারাচ্ছে একথাও অনস্বীকার্য। কত গভীর শ্রদ্ধায় শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক

পূজিতা হয়েছিলেন শ্রীমা। প্রীতিপূর্ণ সম্ভ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিকে স্থাপন করেছিলেন শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর নিত্যদিনের সর্ব আচরণে।

আর আজ একজন আধুনিকা মহিলা রাস্তা দিয়ে চলেছেন, সন্তানের বয়সী থেকে শুরু করে কেউই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না। একটি ঘটনা শুনেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে সেটি উল্লেখ না করে পারছি না। সাজ-পোশাকে অতি আধুনিকা এক মহিলা রাস্তা দিয়ে আসছেন। একটু দূরে থেকে তাঁকে দেখে কিছু অল্পবয়সী ছেলে অশোভন মন্তব্য করতে শুরু করল। কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওরা দেখল মহিলা ওদেরই এক বন্ধুর কাকিমা। দলে বন্ধুটি ছিল কিনা অবশ্য জানি না।

আজ নারীদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে আত্মম্ভরিতা। প্রয়োজন ছিল আত্মবিশ্বাসের, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের বদলে এল আত্মম্ভরিতা। আত্মবিশ্বাস মানুষকে দেয় কঠোর সংগ্রামী মনোভাব, উন্মুখ করে মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে ফলবতী করতে। আত্মবিশ্বাসকে যেন পরিচালিত করে শুভবুদ্ধি। আজ মেয়েরা নিজে যা বুঝছেন সেটাই ঠিক। গুরুজন ব্যক্তি কিছু বলতে এলেই শুনতে হবে—"উপদেশ দিতে হবে না, উপদেশ দরকার হলে চেয়ে নেব।" এই কথাটি অবশ্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছোট-বড় সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। তবুও আমি বিশেষভাবে মেয়েদের কথাই বলছি, কারণ সংসারে কিভাবে মানিয়ে চলতে হয় সেটা জানা মেয়েদেরই বেশি প্রয়োজন।

আজ প্রথম-মা-হওয়া মেয়েরা সন্তানের সামান্য অসুস্থতায় শরণ নেয় চিকিৎসকের। মা, ঠাকুমা, শাশুড়ি ইত্যাদি গুরুজনস্থানীয়াদের কোন অভিজ্ঞতার কোন মূল্য তারা দিতে রাজি নয়। গুরুজনেরা আজ হেলার বস্তু। শুধু অসুস্থতা নয় সন্তানের সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষেত্রে অভিমত তাদেরটাই সঠিক। লেখাপড়ায় "আমার ছেলে বা মেয়ে ইংলিশ-মিডিয়াম ছাড়া পড়বে না।" 'আমার'—এই কথাটির ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চান সন্তান শুধু তাঁরই অধিকারের। এরপর আছে তোষণ। কোন অপরাধেই শাসন নেই। কারণ আরো গভীরে। শাসন করার ক্ষমতাই নিঃশেষিত। স্বামী-স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্ক। দর্শক ও শ্রোতা হলো সন্তান। শ্বশুর, শাশুড়ি, আত্মীয়-পরিজনের নিন্দা সন্তানের কাছে। মা ভাবেন, এর দ্বারা তিনি নিজে ভাল হবেন। কিন্তু ঘটনা তা হচ্ছে না। সন্তানের কাছে সকলকে তো ছোট করলেনই, নিজেও কিন্তু ছোট হয়ে গেলেন। যখন সেটা বুঝতে পারেন, তখন আর ফেরা বা ফেরানোর পথ নেই।

এরপর আছে পরশ্রীকাতরতা। বিজ্ঞান সহজ করে দিয়েছে জীবনযাত্রার প্রণালী। গ্যাসে রান্না এক ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। দোকানে কিনতে পাওয়া যায় তৈরি পোশাক; ফলে ঘরের সূঁচসুতো অতি প্রয়োজনেও পাওয়া যায় না। টি. ভি. ভিডিও-র কল্যাণে অবসর সময় বেশ কাটছে। অখণ্ড অবসরে পরচর্চার মতো মুখরোচক আর কি আছে? আর পরচর্চা পরের ভালটা নিয়ে হয় না, দোষটা নিয়েই হয়। দোষ যদি পাওয়া যায় খুবই ভাল, যদি না পাওয়া যায় খুঁজে বের করতে দোষ কি?

অবশ্য হ্যাঁ, বিপরীত চিত্রও কি নেই? আছে। অনেক মহিলা জীবন উৎসর্গ করছেন সন্তান, স্বামী, পরিজনদের জন্য। হয়তো প্রয়োজনে চাকুরিও করছেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হচ্ছে ট্রাম বাস ট্রেন ধরতে। ঘরে ফিরে অসুস্থ পরিজনের সেবা করছেন। আছে, এমন চিত্রও আছে। সংসারের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃতা মা, দিদি, বৌদি, মাসিমা, পিসিমারা আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেসব চিত্র ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে পড়ছে। সেইসব মহিলা যাঁদের কাছে এলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হয়ে যায় তাঁরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো বধূ-হত্যা, বধূনির্যাতন, পণপ্রথা। দেশ থেকে কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর নির্মূল হচ্ছে, কিন্তু নির্মূল হচ্ছে না বধূহত্যা, বধূনির্যাতন, পণপ্রথা। আসলে মেয়েরা আজ স্বরূপেই ব্যর্থ—স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে, শাশুড়ি হিসাবে, ননদ হিসাবে। পরিবারে সকলের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ যদি না ঘটে তবে এইসব পারিবারিক সমস্যার সমাধান আইন-আদালত করতে পারে না। পরকে আপন করার কত শত দৃষ্টান্ত মা দেখিয়ে গেলেন, আর আজ আমরা আপনাকেও পর করে দিচ্ছি।

ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের চরিত্রালোকের সুমহান স্পর্শ আজও কেন অগ্নিশুদ্ধি ঘটাতে পারেনি আমাদের চিত্তবৃত্তির? আজও কেন জাতি, ধর্মের বিরোধ আমরা তখনই তুলি যখন প্রশ্নটা জড়িত থাকে আমাদের স্বার্থের সাথে? মা বলে গেলেন: "কারো দোষ দেখবে না, দোষ দেখবে নিজের। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।" তবু নিজেকে আড়াল করে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াই আমরা। কোথায় সেই সমন্বয়ের আলোকে জীবন ও জগৎকে এক সূত্রে বাঁধার প্রচেষ্টা? আজও কেন অন্যের অন্তরকে অন্তর দিয়ে অনুভব করি না আমরা? আজও কেন জাতীয়তাবোধ আর বিশ্বমৈত্রী বন্দী থাকে অসার বক্তৃতা আর কাগজ-কলমের অন্তঃসার-শূন্য চুক্তির মধ্যে? মা কি শুধুই পূজিতা হবেন? হবেন না অনুসৃতা? তাঁর জন্মদিন কি শুধুই স্মরণের দিন হবে? হবে না শপথের দিন? মায়ের সজ্জিত প্রতিকৃতির সামনে বসে আমরা কি শপথ গ্রহণ করে বলতে পারি না—'We shall over come'—'আমরা জয়ী হব'?

শক্তিরূপিণী ভারতীয় নারীর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি যুগে যুগে। বৈদিক যুগের ঋষিকন্যাদের কথা আজ বলতে চাই না, বলতে চাই না ঐতিহাসিক বীরাঙ্গনাদের কথাও। বলতে চাই আমাদেরই মায়েদের কথা, যে-মায়েরা আপন মানসিক শক্তির উৎকর্ষতার ফলে দেশকে দিতে পেরেছিলেন পুরুষসিংহ সন্তান। রামমোহনের জননী, বিদ্যাসাগরের জননী, স্বামীজীর জননী, নেতাজীর জননী তো আমাদেরই জননী। বিজ্ঞান বলে শক্তি অবিনশ্বর। তাই সেই বৈদিক যুগ থেকে নারীশক্তির যে রূপ আমরা দেখেছি তা চিরন্তন। সমাজের এতাবৎকালের কাঠামো সাময়িক-ভাবে নারীদের করে রেখেছিল শক্তিহীন, অনধি-কারিণী। কিন্তু বিশ শতকের অপরাহ্নে, প্রগতি-শীলতার যুগে, কম্পিউটার আর পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে, মহাকাশ-চারণার যুগে নারীশক্তির প্রকাশ তো দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র—শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, ক্রীড়াঙ্গনে, মহাকাশে, রাষ্ট্র-পরিচালনায়। শুধু ভারত, ইজরায়েল, ইংল্যান্ডই নয়, নিকট অতীতে বিশ্ববাসী স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে এক ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রীরূপে নারীকে। রাজনীতির কথা আমি বলছি না, বলছি স্ত্রীশক্তির মহিমময় বহিঃপ্রকাশের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ এক গুরুভ্রাতাকে পত্রে লিখেছিলেন: "মা ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

মা পথ দেখিয়েছেন। মা আলো জ্বালিয়েছেন। সেই পথে যাতে আলোর প্রকাশ অব্যাহত থাকে তার দায়িত্ব আমাদের। সেই আলোয় মঙ্গলদীপ জ্বালানোর দায়িত্বও আমাদেরই। আত্মকেন্দ্রিকতা স্বার্থপরতা প্রবল বাসনা-কামনার কলুষতা মুক্ত হয়ে অন্তরের মহত্তম চেতনাকে আবার খুঁজে পেতে হবে আমাদের। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ সমাজ। কিছুই হারায় না, হারিয়েছে বলে ভ্রম হয় মাত্র।

আজ তাই মায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যেই আলো নতুন করে খুঁজতে হবে আমাদের। তিনিই যে আমাদের ধ্রুবতারা। তাঁর মধ্যেই আমরা পাব যুগযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের পথ ও পাথেয়। তাঁর দেহান্তের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে লিখেছিলেন: "সেই নির্ভীক শান্ত তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হলো! তবে আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে তা রেখে গেল আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে-মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ।"

শংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন: "নিবেদিতা নাম্নী ধাবমান অগ্নিপতাকা বোধহয় মনের গভীরে চাইতেন বিরতির ক্ষান্তি এবং শান্তির অপার্থিব জ্যোৎস্নাকিরণ। আর সে-জিনিস তিনি পেয়েছিলেন মাতাঠাকুরানীর সান্নিধ্যে। তাইতো প্রতিদিনের সংগ্রামে বিক্ষত হৃদয় নিয়ে তিনি ছুটে আসতেন ঐ শান্তি-সরোবরে অবগাহনের জন্য।" অশান্ত তো আমরাও। সব মেয়েরাই। আমরাও শান্তির সন্ধান পাব মায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যেই। কারণ তিনি যে শান্তির উৎসস্বরূপিণী।

মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা—মা, আমাদের সেই দৃষ্টি আসুক। সেই বোধ আসুক। তুমি থাক আমাদের অবচেতনে, আমাদের চেতনায়। আমাদের আশা, নিরাশা, আকাঙ্ক্ষায়। আমাদের বোধে, আমাদের সাধে, আমাদের সাধনায়। আমাদের নিত্য দিনের প্রতি কাজের সাধনে।

কবিতা

কোন্ সুর

পামেলা মুখোপাধ্যায়

নিখিলের কোন্ সুর বাজে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে।
হে জননি, তোমায় কি চিরকাল
এমনি করেই চেয়ে এসেছি।
কবে তুমি ডেকেছিলে,
ভাসিয়েছিলে আঁখিজলে,
মনে নেই।
মনে হয় অনন্তকালের
এই চাওয়া-পাওয়া,
এই অশ্রুধারা।

তমিস্রার সুদূর পার হতে
ধ্বনিত হয় কোন্ গম্ভীর আহ্বান,
সে ধ্বনি জাগিয়ে দেয় আমায়
গভীর সুপ্তি থেকে,
তমিস্রার পারে
যেতে হবে আমায়,
যেতে হবে তোমার
অমৃতলোকে।

মমতাময়ী

পূরবী মৈত্র

পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি আপনার সুখ
বয়েছ জীবন ভরি দুঃখ সবাকার,
নিজেরে বিলায়ে দিয়ে সকলের মাঝ
মুছায়েছ ব্যথিতের দুঃখ-অশ্রুভার।

দুবাহু প্রসারি তুমি এ বিশ্ব মাঝারে
লয়েছ সবারে কোলে স্নেহ মমতায়
কেবা নিজ, কেবা পর জাননি কাহারে
সমস্থান সকলের বিস্তৃত সেথায়।

দেবতা কেমন তাহা দেখেনি নয়ন
শ্রবণে শুনেছি শুধু তাঁর যত কথা,
শুনিয়া তোমার কথা, জানি তব স্নেহ
মনে হয় তুমি যেন ধরায় দেবতা।

হিমগিরি সম তুমি মৌন স্তব্ধ স্থির
পারাবার সম তব অনন্ত করুণা,
তোমার জীবন হতে ঝরে শতধারে
ধরায় অমৃতধারা, স্বরগ-সুষমা।

পবিত্র বেদির তলায়

কঙ্কাবতী মিত্র

প্রতি রাতে আমি শুনতে পাই
মন্দিরের ঘণ্টা বাজে।
আমার হৃদয় জুড়ে সে আওয়াজ
আমার কোষেতে ছড়িয়ে যায়।
আমার বেদনার্ত হৃদয়
সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণের বেদির তলায়,
অন্ধকারে উষ্ণীষে
প্রদীপের আলোয়;
মন্দিরের প্রাঙ্গণ
অজস্র লাল ফুল হলুদ ফুলে ঢাকা।
মন্দিরের পবিত্র বেদির পাশে
কত ফুল—
কত রং তাদের!
এইসব ফুল আমি দেখেছি অনেক আগে
মন্দিরে—বিগ্রহের পায়ে,
পবিত্র বেদির তলায়,
আমি শুনতে পাই
মন্দিরের ঘণ্টা বাজে।

স্বপ্নই যদি দেখেছি

ভক্তিমা ভট্টাচার্য

স্বপ্নই যদি দেখেছি,
স্বপ্নভঙ্গের পর ধরে রাখার দায় তবে কার?
মরীচিকা, ভ্রম, প্রমাদ, অলীক—
যা-কিছু আমার অশুদ্ধির উপকরণ।
তা সংশোধনের ভার নিতান্তই তোমার।

সন্তান, স্বামীর স্বর্গসুখ—
তাও যদি হয় তাৎক্ষণিক
তবে নিষ্ঠুর সত্যের সত্যদণ্ড
আমাকে ছুঁইয়ে দাও।

ভেবে শিহরিত হই—
ভেঙে যাবে চুরমার হবে
পরিচিত যা কিছু প্রেয় বস্তু।
এও জেনেছি নিশ্চিতভাবে
আপ্তবাক্যের মাঝে,
ঈশ্বরের করুণাস্পর্শে ভেঙে যায় যার ভ্রম,
অমৃতে অবগাহন সেই করেছে,
সেই তো পরম প্রাপ্তি।
প্রাতিভাসিক সাম্রাজ্য ভেঙে যায়
কঠিন বাস্তব তাড়নায়,
লৌকিক জাল ছিঁড়ে যাক
তোমার অমৃতময় চেতনায়।

শরণাগতি

অমিয়া ঘোষ

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, আমার জীবনস্বামী
হাতটি আমার ধরবে না কি তুমি?
জানি প্রভু, জানি আমি জানি।
চিরকালের তোমার আমি
চিরকালের আমার তুমি
একথাটা ভাল করেই
বুঝেছি আজ আমি।

সকল দিবস, সকল রাতে
চলব তোমার সাথে সাথে,
করব না ভয় আর কিছুতে,
করব না ভয় ঝঞ্ঝাবাতে,
করব না ভয় আঁধার রাতে।
পড়ে যাবার থাকবে না ভয়—
হাত যে আমার থাকবে ধরা
তোমার মুঠতে।

নিঃশেষে আজ সঁপে দিলাম-
আমায় তোমার পায়ে
থাকব আমি যুগযুগান্ত
নিত্য পরম সুখে
তোমার চরণছায়ে॥

সাধ ও সারদা

হীরাবতী দত্তগুপ্তা

কত যে ঘুরিতেছি শান্তির সন্ধানে
তৃষিত হৃদয়ে জীবন-সায়াহ্নে,
মিলিল না সুধা, মিটিল না ক্ষুধা।
কিভাবে পাইব, কবে বা মিটিবে
বল বল বল, বল মা সারদা।

ধুলো-কাদামাখা সন্তানে সব
তুলে নেবে তুমি অঙ্কেতে তব
বলেছিলে তুমি স্বয়ং শ্রীমুখে
তা-ই মোর আশা, তা-ই ভরসা
ডরাই না তাই বিপদে দুখে।

হৃদয়ের যত না-বলা বেদনা কিছুই তোমার নাহিকো অজানা,
বিদায়ের ক্ষণে কিছুই চাহি না, চাহি শুধু মা নির্বাসনা।

জীবন

কৃষ্ণা দে

রূপ, রস, গন্ধে ভরা
পৃথিবীর এই পান্থশালায়
দু-দিনের যাত্রী মোরা।
সুখদুঃখের ঘূর্ণিঝড়ে,
জন্ম-মৃত্যুর দোলায়,
জ্বালায় ভালবাসায়
ভুলে যাই,
কে আমরা,
কোথা থেকে এসেছি,
কেন এসেছি,
কোথায়ই বা যাব।
কিন্তু যাই তো।
রোজই তো দেখি
শবদেহ বয়ে নিয়ে যায় পথ দিয়ে,
অথবা শুনি কেউ না কেউ চলে গেল,
চিতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়
রোজ কত শত দেহ।
শাস্ত্র বলে, দেহটার নাশ হয়,
আত্মা অবিনশ্বর, অবিকারী—
লক্ষ লক্ষ আত্মা জন্ম জন্ম ঘুরে
ভুল মোহ অজ্ঞানে
পবিত্রতায় ভালবাসায়
ভক্তি প্রেম পূজায়
পরমের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদনে
সব জীবের ব্যষ্টি-আত্মা
এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তায়
মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।
দেহে দেহে বার বার আশ্রিত যে
সে আসলে সেই এক ও অদ্বিতীয়
পরম আত্মারই অংশ অথবা অঙ্গ—
যার লয় নেই, ক্ষয় নেই
জন্ম নেই—মৃত্যু নেই—
সে অনাদি অনন্ত শাশ্বত
সৎ-চিৎ-আনন্দ
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।
জন্ম জন্ম ধরে
অর্জিত সঞ্চিত সংস্কারের বোঝা
ঝেড়ে ফেলে
শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে হতে
সব বাসনার ক্ষয় হলে
নির্বাসনা হয়ে
অবশেষে মিশে যাই
সেই পরম সত্তায়
জীবন-মৃত্যুর পরপারে।

কতদিনে

ডালি বন্দ্যোপাধ্যায়

মন-অঙ্গনে পেতেছি আসন
হৃদয়-দুয়ার রেখেছি খুলি,
কবে হবে মাগো সেই শুভদিন
পড়িবে তোমার চরণ-ধূলি।

স্নেহময়ী তুমি সারদা-জননী,
রেখেছিলে তুমি নিজেরে ঢাকি
বাহিরে নিজেকে করনি জাহির
সেবা দিয়ে গেছ আড়ালে থাকি।

দীন-পীড়িত মানবেরে তুমি
শেখালে সবারে বাসিতে ভালো
তোমার স্নেহের অমৃত-পরশে,
হৃদয়ে সবার জ্বালিলে আলো।

তাই ভাবি মাগো, আর কতদিন
আশা-পথ চেয়ে অধীরে থাকি,
কতদিনে তুমি কাছে নেবে টানি,
সব অপরাধ আঁচলে ঢাকি ?

সাধন-ভজন

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সঙ্কলক ঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

হিন্দীতে সুন্দরদাস, নিশ্চলদাস কি সুন্দর সব বিচার করেছেন, 'বৃত্তি-প্রভাকর' 'বিচারসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা। 'বৃত্তি'তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই বিচার, পশ্চিমে এইসবের খুব চল। পাঞ্জাবী মেয়েরাও এসব পড়ে—সুন্দর বিচার করে। 'বিবেক-চূড়ামণি'-তে শঙ্কর বোঝাচ্ছেন ; বোঝাতে বোঝাতে শিষ্যের অনুভব। বলছেন—ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ?—এই যে দেখেছিলাম বিচিত্র জগৎ, কোথায় গেল—কে নিয়ে গেল? সৎ চিৎ আনন্দ—সব কিছুতে, তুমি আমি চেয়ার—এই সবার ভেতর অস্তি ভাতি প্রিয়। ভাবছ বিষ্ঠা আবার কার প্রিয়?—শূকরের প্রিয়, কৃমির প্রিয়। Eternal existence—common to all. (অনন্ত সত্তা, সবার মধ্যেই সমান)।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥

(দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক)

ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয়? ব্রহ্মবিচার এমনি হয় না, সাধন-চতুষ্টয় চাই। কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব। বিবেক ঃ নিত্যানিত্য-বস্তুবিচারঃ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বৈরাগ্য ঃ ইহা-মুত্রফলভোগবিরাগঃ—স্বর্গ মর্ত্য দুই-এরই ভোগ-বাসনাত্যাগ। ঠাকুরের কথায় সোনার চেন, লোহার শেকল দুই-ই বন্ধন। ষট্‌সম্পত্তি ঃ শম কিনা মনের সংযম, দম কিনা শরীরের ইন্দ্রিয়াদির সংযম, তিতিক্ষা কিনা সহ্য করা—শ-ষ-স—শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, সব দ্বন্দ্বভাব, 'মাত্রাস্পর্শ'। উপরতি ঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের রতি এক এক দিকে, এক এক বিষয়ে—চোখের দৃষ্টিতে, কানের শ্রবণে, জিহ্বার আস্বাদনে, নাসিকার ঘ্রাণে, ত্বকের স্পর্শে—এসব থেকে উপরতি, ঠাকুরের কথায় মোড় ফিরানো। শ্রদ্ধা ঃ গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। তারপর সমাধান—নিষ্পত্তি শান্তি। মুমুক্ষুত্ব ঃ মুক্তির ইচ্ছা—তীব্র মুক্তির ইচ্ছা, তবে নিঃশ্রেয়স হবে।

কারেই বা বলি, আর কেই বা শোনে? তবে শঙ্কর এও বলেছেন যে, সাধনচতুষ্টয়হীন বা গৃহস্থরাও ব্রহ্মবিচার করতে পারে, তাতে ভালই হবে, একটা ভাল ভাব মনে জাগবে। যেমন—সাধুকে ভিক্ষা দেওয়া, এতে গৃহস্থেরই কল্যাণ ; সাধু দেখলে বৈরাগ্য ভাব জাগে, ক্ষণেকের জন্যেও ভগবানকে মনে পড়ে। সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে, লজ্জা করবে না। শিব অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা করেন—লজ্জা করেন কি? শিব সর্বত্যাগী, তাঁর আবার লজ্জা কি? সাধুকে দেখে ভালভাবের—ত্যাগ-বৈরাগ্য ঈশ্বর-নির্ভরতার উদ্দীপন হয়। বাংলাদেশে কি ওসব (বেদান্ত ও সন্ন্যাসধর্ম) ছিল? বরং একটা ঘৃণার ভাবই ছিল। আমরাই তো এনেছি এসব।

সন্ন্যাসীর রাগ থাকবে না। রাগ থাকলে আবার সাধু কি? আমরা ধ্যান করেছি—একজন এ-হাতে বিষ্ঠা দিচ্ছে, আর একজন ও-হাতে চন্দন মাখাচ্ছে। আমি এর ওপর রাগ করছি না, আর ওর ওপরও আকৃষ্ট হচ্ছি না—চুপ করে বসে আছি।

ঠাকুর বলতেন, 'কাম ক্রোধ লোভ যাবে কি রে? মোড় ফিরিয়ে দে না, যেগুলি অন্তরায় সেগুলিই সহায় হয়ে যাবে। তাঁকে পাবার কামনা কর। তাঁর ওপর ক্রোধ কর—কেন দেখা দিচ্ছ না? রাগ অনুরাগ সব তাঁর ওপর। তাঁর নাম-রূপ-লীলায় লোভ। তাঁর রূপে মোহ-মুগ্ধ হয়ে যাও। মদ—অহঙ্কার, আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছি, তাঁকে ভালবেসেছি—এই অহঙ্কার। মাৎসর্য—ঈর্ষা হিংসা, ওর কেমন জপ-ধ্যান ব্যাকুলতা হচ্ছে, অশ্রুপাত রোমাঞ্চ হচ্ছে! আমার হচ্ছে না কেন? ও তাঁকে লাভ করল ; আমি কেন পারছি না?'

মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) কথা বেরিয়েছে 'উদ্বোধনে'—'যোগীর ঘুম চার ঘণ্টা, আর ভোগীর ঘুম ছয় ঘণ্টা।' কি করে ঘুমুবে? অন্তরে যার সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সে কি আর ঘুমাতে পারে? সে শুধু জেগে জেগে, থেকে থেকে কাঁদে—দেখা দাও, দেখা দাও, আজও তো দেখা দিলে না।

ঠাকুরের কাছে যখন গান গাইতাম আমরা—

'বৃথা বয়ে যায় রজনী, ওগো সজনি।
সেঁজ বিছায়নু···পন্থ নেহারনু···
হাতো কি দরপন মাথো কি ফুল।'

শ্রীরাধার বিরহের গান এসব—যেন ফুলশয্যা বিছানো—সব আছে কিন্তু সে কই? ঠাকুর বিছানায় হাত বুলাতে বুলাতে স্থির হয়ে যেতেন, তারপর ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। সারারাত ঘুম-টুম সব কোথায় চলে যেত।

প্রথম অবস্থায় গঙ্গার বালিতে মুখ রগড়াতেন, রক্ত বেরিয়ে যেত। মাঝিরা সব অবাক হয়ে দেখত আর 'আহা আহা' বলত। সূর্য ডুবে গেল, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠল—ঠাকুর পঞ্চবটীর বনে গিয়ে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন: 'মা, ঐ আরো একটা দিন তো কেটে গেল। কই মা, দেখা তো দিলি না।'

কামরাজ তান্ত্রিক জিজ্ঞেস করেন, 'কি চাও?' আমি বলি, 'ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—এই অবস্থা চাই।' তিনি করুণভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার অম্বাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও?'

মায়ারাম অবধূত চারবার চার ধাম করেছেন। তিনি খুব ত্যাগী বিখ্যাত মহাপুরুষ। গ্রামের বাইরে আসন করতেন, একজন একটা কম্বল দিতে এসেছে। তিনি নিজের পুরানো কম্বলটা দেখিয়ে বললেন, 'কম্বল? এই তো।'

ভাস্করানন্দ কাশীতে খুব স্নেহ করতেন, একদিন নিজহাতে খাওয়ান।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিশ্বনাথের অংশ আছে।' তিনি রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকতেন। তাঁকে একসময় ম্যাজিস্ট্রেট Gobin (গবিন) সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও বিচার হয়। সাহেব তাঁর নির্বিকার ভাব দেখে তাঁকে ছেড়ে দেন এবং হুকুম জারী করেন, 'ওঁকে কেউ কিছু বলবে না।' উঁচু ঘাটের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিত, কুম্ভক করে ভাসতেন। গরমে তপ্ত ফুটপাথে, মাঘ মাসে শীতের রাতে একগলা গঙ্গাজলে থাকতেন। খুব যোগী—শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু বোধ নেই। ও-একটা হয়ে গিছল—খুব হঠযোগ করেছিলেন প্রথমটা। এক গরিব বুড়ি ওঁকে এক হাঁড়ি দই দেয় গঙ্গার ঘাটে। তিনি যে আসে তাকে একটি করে ফোঁটা দেন আর সে টাকা-পয়সা দেয়। এমনি করে অনেক টাকা হলো, সব টাকা পেল সেই বুড়ি। আর একদিন একটা দুষ্টু লোক সহজে অনেক টাকা পাবার লোভে তাঁর কাছে ঐরকম এক হাঁড়ি দই দেয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও প্রথম যে লোকটি এল তাকেই এক পয়সায় হাঁড়িশুদ্ধ দিয়ে দিলেন।

রামপ্রসাদ লক্ষ জবা দিয়ে মায়ের পুজো করেছিলেন, এক একটি গান এক একটি জবা। লক্ষ গান—লক্ষ জবা। এই সাধনা—এই সিদ্ধি। এইসব গান ঠাকুরের বড় প্রিয়—ঠাকুরের ভাবে ভরা।

ভাগলপুরে তানপুরা নিয়ে স্বামীজী গান ধরেছেন—সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা বেজে গেল—চলেছে একটি গান:

'এল না এল না শ্যাম কুঞ্জে তো এল না,
রজনী পোহায়ে যায় তবুও সে এল না।'

গান আর থামে না। কত সব গণ্যমান্য লোক এসেছে—কেউ উঠতেও পারেন না, ওদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শেষে ডাকাডাকি করে গান ভাঙাতে হলো। স্বামীজীর ভাব বড় ভয়ানক।

মঠে স্বামীজী এক এক দিন তর্ক লাগিয়ে দিতেন: পূর্বজন্ম জন্মান্তর এসব আছে কি না। দুটো পক্ষ হয়ে গেল। তিনি মধ্যস্থ—কখনো এ পক্ষে—কখনো ও-পক্ষে যোগ দিচ্ছেন, তাতিয়ে দিচ্ছেন—যাদের যুক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে তাদের। রাত দুটো পর্যন্ত চলল, তারপর ঘুম।

তোমরা যোগী, ভগবানকে চাও। তোমরা ঘুমাবে কি করে? যে ভগবানকে চায়, সে তাঁকে লাভ না করা পর্যন্ত কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে? থেকে থেকে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে—ওঃ, এখনো তাঁকে পাইনি। সে যে জীবন অন্ধকার দেখে, কিছু তার ভাল লাগে না। ভগবানের নাম করার কি আবার স্থান-কাল আছে নাকি?

আহা! ঠাকুরের কাছে গান গাইতে গাইতে রাত কেটে গেছে। হায়, এই ঘুম-ই তো মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে, মানুষকে মেরে রেখেছে, বেহুঁশ করে রেখেছে। যদি মানুষ হতে চাও—ঠাকুর বলতেন 'মানহুঁশ'—যদি সেই মানহুঁশ হতে চাও তো প্রার্থনা কর: যেন ঘুম কমে যায়, যাতে তাঁকে ডাকতে পার বেশিক্ষণ ধরে। [ক্রমশঃ]

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বলরাম মন্দির : পুরনো কলকাতার ঐতিহাসিক বাড়ি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

বলরাম মন্দির ভক্তদের মিলনকেন্দ্র। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্তদের বলতেন, "কলকাতায় এস, সেখানে বলরামের বাড়িতে থাকব, আমার সঙ্গে দেখা হবে।" ভক্তদের কাছে অবারিত দ্বার বলরাম মন্দির। এখানে কত উচ্চাঙ্গের ধর্ম-গাথার আসর বসেছে, কত নিগূঢ় অনুভূতির মর্মবাণী উন্মোচিত হয়েছে, হয়েছে কত হাসি-রসিকতা, ঈশ্বর-চিন্তন, মনোহর উদ্দাম নৃত্য, প্রেমোন্মত্ত সঙ্গীত, সংঘটিত হয়েছে। অনির্বচনীয় সমাধির কত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ জাগিয়েছেন সুপ্তকে, উদ্ধার করেছেন ভ্রষ্টকে, পথের আলো দিয়েছেন ভ্রান্তকে, নাস্তিক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন ভগবৎ-প্রেম। ঈশ্বর-কৃপা-গঙ্গা-স্রোতের উৎসধনি বলরাম মন্দির। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম মন্দিরে শতাধিকবার শুভ পদার্পণ হলেও 'কথামৃত' ও অন্য এক পুস্তকে মোট তেইশ দিনের বিবরণ পাওয়া যায়।[৩১] এছাড়া,'লীলাপ্রসঙ্গে' বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগাথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বলরাম মন্দিরে মিলনোৎসবের শ্রীম-র অনুপম বর্ণনা : "শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বাগবাজারে বসু পাড়ায় বলরামের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুর সার্কাসের গল্প করিতেছেন। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরীয় অনেক কথা হইতেছে। মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথা। সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া মধুর নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিয়া আছেন ও সেই মধুর নাম শুনিতেছেন।… মাস্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিদ্রিত। দু-একটি ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন। মাস্টার একপার্শ্বে বসিয়া সেই সুপ্ত বালক-মূর্তি দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন।"[৩২] লীলা-প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের অপরূপ স্মৃতি : "আজ ঠাকুর প্রাতেই এ বাটীতে আসিয়াছেন। বাহিরে কিছুক্ষণ বসার পর তাঁহাকে অন্দরে জলযোগ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল।… জলযোগ সাঙ্গ হইলে ঠাকুর বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও ভক্তদের

৩১ 'কথামৃতে' বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শুভাগমনের তারিখ দেওয়া আছে ১১ মার্চ ১৮৮২। তার আগেও শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে গিয়েছিলেন। (পাদটীকা ১১ দ্রষ্টব্য)।

☐ 'কথামৃতে' বলরাম মন্দিরের বিবরণের তারিখ : ১১ মার্চ, ১৫ নভেম্বর (১৮৮২); ৭ এপ্রিল, ২ জুন, ২৫ জুন, ১৮ আগস্ট (১৮৮৩) ; ৩ জুলাই (১৮৮৪) ; ১১ মার্চ, এপ্রিল ৬, ১২, ২৪ ; ৯ মে, জুলাই ১৩-১৫, ১৮ (১৮৮৫)। অন্য পুস্তকটির নাম শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম খণ্ড (১৩৯২), পৃঃ ১–১৮।

☐ বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শুভ পদার্পণ উপলক্ষে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ১৯৮২–৮৩ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় দুটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—(১) বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (২) বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবর্ষের আলোকে। দুটি পুস্তকের প্রকাশক বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ।

☐ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে (১৩৮৮ পুনর্মুদ্রণ) বলরাম মন্দিরের বিবরণ, পৃঃ ২৭০-২৮৫, ৫০৯-৫১৩, ৫৮৪-৫৮৫

৩২ কথামৃত, পৃঃ ১২০, ১২৪, ১২৯

সহিত নানা কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেল—ভক্তরাও সকলে প্রসাদ পাইলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাহিরে হলঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। আমরা সকলেই বালগোপালের ধাতুময়ী মূর্তি দেখিয়াছি—দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদ-সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে। ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ঠিক সেইরূপ সংস্থান হইয়া গেল, কেবল চক্ষু দুটি যেন বাহিরের কিছুই দেখিতেছে না, এইরূপ ভাবে অর্ধনিমীলিত অবস্থায় রহিল ; ···বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান করেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তাঁর সকল-গুলিই কি মিষ্টি!··· আজ বলরামবাবুর বাড়িতে এই যে তাঁহার গোপাল-ভাবাবেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান বালগোপালের ন্যায় হইল, তাহাই বা কত সুন্দর! কেন যে ঐরূপ সুন্দর বোধ হইত, তাহা তখন বুঝিতাম না—কেবল সুন্দর ইহাই অনুভব করিতাম।"[৩৩]

স্বামী অখণ্ডানন্দের রমণীয় স্মৃতি : "সেদিন ভাবমুখে ঠাকুরের কত নৃত্য কীর্তন ইত্যাদি হতে লাগল। আর একদিনের কথা। ঠাকুর সকাল সকাল বলরামবাবুর বাড়ি এসেছেন। অনেক ভক্ত তাঁর চারদিকে বসে আছেন। এমন সময় স্বামীজী একটা কামিজ গায়ে এসে ঠাকুরের খুব কাছে বসলেন। ঠাকুর তাঁকে 'হ্যাঁরে, যাসনি কেন ?'—এরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। স্বামীজী গুন গুন করে গান ধরলেন, 'নেরে মন রামনাম—নিতি নিতি নেরে' ইত্যাদি। ঠাকুর শুনে মুগ্ধ এবং সকলেই স্তব্ধ। তারপর ক্রমশঃ ভক্ত-অভক্ত নানাশ্রেণীর লোক সমাগমে বাড়ি ভরে গেল। কিছুক্ষণ এরূপ কথাবার্তার পরই ঠাকুর হঠাৎ ভাবমুখে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য-গীত আরম্ভ করলেন। ভক্তগণের মধ্যে অনেকেরই ভাবান্তর উপস্থিত হলো। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ ধ্যানস্থ, কারও পুলক। অদ্ভুত ব্যাপার! যারা এসেছিল তামাসা দেখতে তারা নিচে নামবার সময় বলতে লাগল, 'বাঃ! মা-নাম করে রে পরমহংস! একেবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে যায়'।"[৩৪]

স্বামী অদ্ভুতানন্দের উপস্থিতিতেও বলরাম মন্দিরে বহু ঘটনা ঘটেছিল। তিনি সময়ে সময়ে ভক্তদের সেসব কথা বলতেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "সেখানে লাটু রাখাল মহারাজকে ভাবাবেশে প্রথম নৃত্য করিতে দেখেন।··· সেখানে অবধূত নিত্যগোপালকে ভাবে মাতোয়ারা হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি দেখিতে পান এবং এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাহার (নিত্য-গোপালের) চৈতন্য সম্পাদন করেন।··· সেখানে নরেন্দ্রনাথের গান শুনিয়া ঠাকুরকে সর্বপ্রথম অশ্রু-বিসর্জন করিতে দেখেন।··· সেখানে গিরিশবাবুকে তিনি প্রথম দেখিয়াছিলেন। তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) মহারাজের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ বলরাম মন্দিরে হইয়াছিল। সেখানে ছোট নরেন, হরিনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেন।"[৩৫]

বলরাম বসুর প্রতিবেশী শৈলেশ্বর বসুর স্মৃতি : "পরমহংসদেবকে বলরামবাবুর হলঘরে একদিন সমাধিস্থ দর্শন করি। জ্যোতির্ময় শ্রীমুখের শোভা ভুলবার নয়। একটি চোখে মাছি বসেছিল, চোখ চাওয়া, বাহ্য হুঁশ একদম নাই। আর একবার ঐখানেই দেখলাম—সমবেত সকল ভক্তের পাদস্পর্শ করে তিনি প্রণাম করছেন। অদ্ভুত আচরণ!"[৩৬]

৩৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ পৃঃ ২৮৫-২৮৯

৩৪ স্মৃতিকথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৭, পৃঃ ৪০-৪১

৩৫ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (এর পর থেকে 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা') ১৩৮৩, পৃঃ ৮৫

৩৬ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৯০, পৃঃ ২৪৩। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ জানিয়েছেন, ভুলক্রমে স্মৃতি-লেখকের নাম শৈলেন্দ্রনাথ বসু মুদ্রিত হয়েছে, হবে—শৈলেশ্বর বসু।

গলরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুর বাটীতে যাবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে সাতদিন ছিলেন। সে-সময়কার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্য অক্ষয়কুমার সেন ঃ

"বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি॥
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥
প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে।
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে॥"[৩৭]

এই সাতদিন ছিল বলরাম মন্দিরে স্থূলদেহে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ শুভাগমন। ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুলোকের জীবনের জটিল প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছিলেন, ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় আকৃষ্ট করেছিলেন বহু ব্যক্তিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে ও গভীর সমাধিদৃষ্টে বহু অধ্যাত্ম-পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছ্বলিত হয়েছিল।"[৩৮] [ক্রমশঃ]

৩৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ৫৮৪

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৯৭ ; স্বামী জীবানন্দ প্রণীত বলরাম মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরাম মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থেও বহু বিবরণ আছে।

প্রবন্ধ

স্বামী শিবানন্দের শিবতুল্য পিতা

নির্মলকুমার রায়

স্বামী অপূর্বানন্দ তাঁর 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "একদিন তারকনাথ অপর ভক্তদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ঝাউতলার দিকে শৌচাদিতে গেলেন। সাধারণতঃ তাঁহাকে শৌচে যাইতে দেখিলে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেহ তাঁহার গাড়ুটা লইয়া যাইতেন এবং যথাসময়ে গাড়ু হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেন। কারণ, ঠাকুর অনেক সময়েই ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, সেইদিন তারকনাথই গাড়ু লইয়া অগ্রসর হইলেন। শৌচান্তে ঠাকুর তাঁহাকে গাড়ু হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, 'দেখ্, তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করি।' তারকনাথ তো শুনিয়া অবাক।"[১]

ঠাকুর যাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, সেই ভাগ্যবানের নাম রামকানাই ঘোষাল। তাঁরই পুণ্যাত্মা-পুত্র তারকনাথ, পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, তথা 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে পরিচিত। তারকনাথের পিতাকে যে ঠাকুর গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা। তাই তারকনাথের সেবা গ্রহণেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন।

রামকানাই ঘোষালের আদি বাসস্থান—হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। ভূকৈলাসের প্রখ্যাত ঘোষাল রাজবংশের সঙ্গে ছিল তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক। রামকানাইয়ের পূর্বপুরুষ হরেকৃষ্ণ ঘোষাল ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান। রামকানাইয়ের পিতামহ নিধিরাম ঘোষাল পর্যন্ত বলাগড়েই ছিল তাঁদের বাসস্থান; পরে নিধিরামের দুই পুত্র—রামকুমার ও রামকমল নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার মানপুরে চলে আসেন এবং নিজেদের সার্বিকগুণে কৃষ্ণনগরের রাজার দানস্বরূপ প্রায় ৫০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃঃ ২৯

মহকুমায় বড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হন। এইভাবে প্রথমে হুগলী জেলা, পরে নদীয়া জেলা এবং সবশেষে এই ঘোষাল-পরিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

রামকুমার ঘোষালের দুই পুত্র—মদনমোহন ও রামকানাই। রামকানাই ইংরেজী জানতেন না; সেই সময় বাঙলা ভাষায় মোক্তারি পড়ার সুযোগ থাকায়, তিনি বাঙলাতেই মোক্তারি পাস করেন এবং প্রথমাবস্থায় নিজ গ্রাম বড়া থেকেই বারাসাতের আদালতে মোক্তারি করা শুরু করেন। রামকানাই যখন মোক্তার হিসাবে আইন-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন স্বনামধন্যা রানী রাসমণি তাঁকে তাঁর এস্টেটের অন্যতম মোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং কাজের সুবিধার জন্য বারাসাত শহরেই রানীর কাছারিবাড়িতে রামকানাই বাস করতে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে বনগাঁ বা বসিরহাটগামী যশোহর রোডের ধারেই বারাসাতের প্রসিদ্ধ শেঠপুকুরের প্রায় বিপরীত দিকে রানী রাসমণির সেই কাছারিবাড়িতেই রামকানাইয়ের পুত্র তারকনাথ, তথা স্বামী শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বামী শিবানন্দের জন্মস্থানরূপে বর্তমানে বাড়িটির সংস্কার-সাধনের পর এখানে বেলুড় মঠের অধীনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' স্থাপিত হয়েছে এবং মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক এখানকার শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রামকানাইয়ের প্রথমপক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করায়, তিনি দ্বিতীয়পক্ষে বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই বামাসুন্দরীর গর্ভে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন: চণ্ডী (কন্যা), তারকনাথ (পুত্র), ক্ষীরোদা (কন্যা) এবং নীরদা (কন্যা)। ইষ্টদেবী মা-কালীকে স্মরণ করে রামকানাই তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানের নাম রেখেছিলেন চণ্ডী। বিবাহের পর দুটি সন্তানের জননী হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই চণ্ডী অকালে পরলোকগমন করেন। পুত্রসন্তানের অভাবে মর্মবেদনায় পীড়িত রামকানাই ও বামাসুন্দরী উভয়েই তারকেশ্বরের শিবের উপাসনা এবং বৎসরাধিককাল নিষ্ঠার সঙ্গে পুরশ্চরণ, উপবাস ও প্রার্থনাদির পর তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায়, তাঁর নাম রাখেন তারকনাথ; ডাকনাম 'ফুনু'। ইনি রামকানাইয়ের দ্বিতীয় সন্তান। রামকানাইয়ের তৃতীয় সন্তান ক্ষীরোদা বিবাহের পরেই বিধবা হন এবং পিত্রালয়ে চলে আসেন। রামকানাইয়ের চতুর্থ সন্তান নীরদার তিন-মাস বয়সেই জননী বামাসুন্দরী দেহত্যাগ করেন। তাঁর লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার তারকনাথ গ্রহণ করেন। নীরদার বিবাহ হয়েছিল বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত মহেশ্বরপুর গ্রামে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) মহাশয়ের পুত্র কালিদাসের সঙ্গে এবং পরিবর্তে কালিদাসের ভগ্নী নিত্যকালীকে পুত্র তারকনাথের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রামকানাই তাঁকে পুত্রবধূরূপে নিজ গৃহে আনেন। মাতৃহীনা স্নেহের ভগ্নীর বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারকনাথ পিতার নির্দেশে এই পরিবর্ত বিবাহ করেন। এই সময় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভ করেছেন এবং অল্পকাল পরেই স্ত্রী নিত্যকালীর অকালমৃত্যুর পর তারকনাথ সংসার ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের আশ্রয়ে চলে আসেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংসারত্যাগী। তারকনাথের মাতা বামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর রামকানাই পুনরায় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেছিলেন।

রামকানাই ঘোষাল ছিলেন উচ্চকোটি শক্তিসাধক। শ্মশানে বা জঙ্গলে নয়, নিজ বসতবাড়িতেই তিনি তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে দেবীর উপাসনা করতেন। বিশেষ বিশেষ পূজানুষ্ঠানে যেমন অনেক প্রতিবেশী আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বাড়িতে প্রসাদ পেতেন, আবার দূর দেশ থেকেও সাধকেরা এসে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করতেন।

নিজ পিতামাতা সম্পর্কে স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী কালে বলেছেন: "আমার বয়স যখন নয় বৎসর আন্দাজ, তখন মা মারা যান। মার সম্বন্ধে বেশি কিছুই মনে নেই। মা-ই লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার আয় কমে যেতে লাগল। তাঁর অনেক দান-ধ্যানাদি ছিল; কিন্তু আয় কমে যাওয়ায় আর আগের মতো দানাদি করতে

পারতেন না। আমি খুবই ভাগ্যবান যে, অমন বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেছিলাম। বাবার ত্যাগ ছিল যথেষ্ট। অত টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু নিজের থাকবার জন্য একটি ভাল বাড়িও করেননি। সব টাকা গরিবদের সেবায় ব্যয় করে দিয়েছেন।

"বাবা খুব ভক্ত ছিলেন। রাত্রিতে 'মা, এখনো কৃপা করলি না' বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন। একবার তাঁর কাছে কামাখ্যা থেকে একজন সাধক ভট্টাচার্য-মশাই এসেছিলেন। তাঁর কী চেহারা—বেঁটে লাল টুকটুকে। সারারাত দুজনে পুজাদি করতেন। একবার পুজোর সময় ঘটস্থাপন করে তাতে ডাব-নারিকেল দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাব থেকেই নাকি প্রকাণ্ড নারিকেল গাছ হয়ে গিয়েছিল, ছাদের সমান উঁচু।"[২]

রানী রাসমণির মোক্তার নিযুক্ত হবার পর, নানা কাজ উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসা-যাওয়ার ফলে রামকানাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথমাবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচণ্ড গাত্রদাহ শুরু হয়েছিল; মাথায় ভেজা গামছা রেখে বা গঙ্গার জলে শরীর ডুবিয়ে রেখেও তাঁর শান্তি হতো না। বুকের ভেতর এক মালসা আগুন জ্বালিয়ে রাখার মতো প্রচণ্ড উত্তাপে ও যন্ত্রণায় ঠাকুর তখন অস্থির হয়ে পড়তেন। ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকানাই এলে, ঠাকুর তাঁর পরামর্শমতো ইষ্টকবচ ধারণ করেন এবং তার পর থেকেই তাঁর গাত্রদাহ ও অসহ্য জ্বালার নিবারণ হয়। এই ঘটনার পর থেকেই ঠাকুর তাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন।

সাধক ও ভক্ত রামকানাই সম্পর্কে ঠাকুর কি ধারণা পোষণ করতেন, সেবিষয়ে স্বামী অপূর্বানন্দ লিখেছেন: "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তারকনাথকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দ্যাখ, এখানে কত লোক আসে, কিন্তু কার বাড়ি কোথায় বা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা করিনে, জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক, আর তোর বাড়ি কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবরও জানতে ইচ্ছা হচ্ছে কেন বলতো?' ঠাকুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তারকনাথ তাঁহার পিতৃপরিচয়াদি দিলেন। শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বটে! তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি তো রানী রাসমণির বাড়ির মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান করে, লালচেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হতো যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত, সে পেছনে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামা-বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হতো। আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বললাম, 'হ্যাঁগা, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পারো? দ্যাখ (গা দেখিয়ে) এমন গাত্রদাহ যে, লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনো কখনো বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই কবচধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো?"[৩]

তারকনাথ পিতাকে ঠাকুরের কথা ও তাঁকে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি জানালে, রামকানাই ঠাকুরের কথা শুনে খুব আনন্দিত হন এবং যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঠাকুরও রামকানাইকে দেখে এত আনন্দিত হন যে, ভাবস্থ অবস্থায় একখানি পা তাঁর ঘাড়ে তুলে দিয়ে স্পর্শকৃপা দান করেন। সংসারী রামকানাই সেই সময় ঠাকুরের কাছে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা জানালে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন যে, মায়ের ইচ্ছা হলে তাই হবে। এই সম্পর্কে ঠাকুর একদা তারকনাথকে বলেছিলেন—"তোর বাবার সাধন সকাম ছিল। সেই সাধনবলেই এত অর্থাগম হয় এবং

২ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পৃঃ ৯

এত সদ্‌ব্যয়ও করেছিলেন।"[৪]

প্রকৃতপক্ষে, মাতৃসাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেও রামকানাই তাঁর প্রচুর উপার্জনের সিংহভাগ সাধু-ভক্ত সেবায় এবং গরিব-দুঃখীদের সেবায় অকাতরে ব্যয় করতেন এবং ২৫।৩০ জন ছাত্রকে নিজবাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তাদের ভরণপোষণের ভারও গ্রহণ করতেন। বারাসাতে তাঁর প্রতিপত্তি এমনই ছিল যে, নিজে ইংরেজী না জানলেও, বারাসাত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপে দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তৎকালীন বারাসাতের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

একমাত্র উপার্জনশীল পুত্র তারকনাথ পত্নীবিয়োগের পর অন্তরের প্রেরণায় যখন পিতার কাছে চিরদিনের মতো সংসার ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন শিবতুল্য পিতা রামকানাই অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে ভগবানলাভের জন্য আশীর্বাদ করেন এবং সংসার ত্যাগের জন্য একমাত্র পুত্রকে সরল মনে, বিনা বাক্যব্যয়ে অনুমতি দিয়ে একটি বিশেষ ও দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই সম্পর্কে স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী কালে বলেছিলেন ঃ "এদিকে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করতে করতে ক্রমে যখন সংসারের সকল সম্বন্ধ ছেড়ে দেব সংকল্প করলাম, তখন বাবার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে যাই। বাবাকে নিজ অভিপ্রায় জানাতেই তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন। ধারা বয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। ঠাকুরঘর ছিল—আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বললেন। পরে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার ভগবানলাভ হোক। আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। তাই তোমায় আশীর্বাদ করছি, তোমার ভগবানলাভ হোক।' আমি একথা ঠাকুরকে এসে বলেছিলাম; তিনি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে।' আমার বাবার সাধনভজন কিছু ছিল কিনা—তাই। আবার নিজে চেষ্টা করেও পাননি, অথচ প্রাণে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। এদিকে সংসারে নানা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট লাভ করেছিলেন। তাই তিনি অত সহজে আমায় বিদায় দিতে পেরেছিলেন।"[৫]

এর পর থেকেই পিতা রামকানাইয়ের সঙ্গে পুত্র তারকনাথের সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। স্বামী শিবানন্দ যখন নাসিক প্রভৃতি স্থানে তপস্যায় রত ছিলেন, তখন তাঁর পিতা রামকানাই দেহত্যাগ করেন। তাই সে-সংবাদ তিনি পাননি। পরে তিনি যখন আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) তাঁকে তাঁর পিতৃবিয়োগের সংবাদ দিলে, স্বামী শিবানন্দের মনে তাতে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেসম্পর্কে তাঁর নিজের কথায় জানা যায় ঃ "গোদাবরী তীরে নাসিক প্রভৃতি স্থান হয়ে পরে মঠে এলাম—মঠ তখন আলমবাজারে। শশী মহারাজ আমাকে দেখে কি যেন বলতে ইতস্ততঃ করছেন। আমি বললাম—'কি, বলই না।' 'আপনার বাবার দেহত্যাগ হয়েছে।' 'তাতে আর কি। তুমি বলতে কিন্তু কিন্তু করছ কেন? বহুকাল তো বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে এসেছি। তা বাবা খুব সাধক লোক ছিলেন—আর ত্যাগী। অতটাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু একটা বাড়িও করেননি'।"[৬]

অতঃপর স্বামী শিবানন্দ শেষবারের মতো জন্মস্থান বারাসাতে গিয়েছিলেন এবং পিতার শ্মশানে প্রণাম করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চোখের জলে পিতার তর্পণ করেছিলেন।

সত্যই রামকানাই ছিলেন পরমভাগ্যবান। তাই তারকনাথ তথা স্বামী শিবানন্দ তথা মহাপুরুষ মহারাজকে পুত্ররূপে তিনি লাভ করেছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শকৃপায় নিজে ধন্য হয়েছিলেন। ঠাকুর যাঁকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, আজ তাঁরই বারাসাতের গৃহের বাস্তুভিটায় নির্মিত মন্দিরে মর্মর মূর্তিতে ঠাকুর জগদ্গুরুরূপে বিরাজিত হয়ে সকলের পূজা গ্রহণ করছেন, মৌন আশীর্বাদে সকলকে পবিত্র করছেন। একথা স্মরণ করে প্রণাম জানাই সেই প্রীতি, উদারতা ও পবিত্রতার আধার, শক্তিসাধক রামকানাই ঘোষালকে, যিনি স্বামী শিবানন্দের জীবনের আধ্যাত্মিক পটভূমির প্রকৃত স্রষ্টা।

৪ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পৃঃ ২১

৫ ঐ, পৃঃ ৩০ ৬ ঐ, পৃঃ ৬৪, পাদটীকা, ১

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী

(মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

অনিল গুপ্ত*

নিকুঞ্জ দেবী (মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী) দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রায়ই দর্শন করিতে যাইতেন। কখনো কখনো তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত রাত্রি-যাপনও করিতেন। পুত্রশোকে নিকুঞ্জ দেবী যখন উন্মাদিনীপ্রায়, ঠাকুর তখন বিশেষ ভাবিত হন ও তাঁহার যথাযথ ব্যবস্থাও করেন। তাঁরই আদেশে নিকুঞ্জ দেবী ঐ যাত্রায় কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর আশ্রয়ে বাস করেন। ঠাকুর ঐ সময়ে নিকুঞ্জ দেবীকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেন যে, আত্মহত্যা করিলে ফিরিয়া ফিরিয়া এই দুঃখময় সংসারে আসিতে হয়, এবং পাশে গঙ্গা থাকায় নিজেও সতর্ক থাকিতেন। ভক্তবৎসল কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে তাঁহার স্নেহস্পর্শে ভক্ত-পরিবারটির হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করেন ও হৃদয়ের জ্বালা দূর করিয়া দেন। ঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে অবস্থান করেন নিকুঞ্জ দেবী ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি স্বপ্নে দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠেন— "ওগো তোমার কাছে গিয়ে যে আমার সব জ্বালা গিয়েছিল।" এই উক্তিই ইহার পরিচায়ক। আহা! কি ছিল তাঁহার অশেষ করুণা!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর নিকুঞ্জ দেবী ১২৯৩ সালের, ১৫ ভাদ্র শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তীর্থে গমন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী বলিতে নিকুঞ্জ দেবীই ছিলেন।[১] প্রথমে দেওঘর দর্শনাদি করিয়া ৺কাশীধামে আসেন ও তিনদিন অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত নিকুঞ্জ দেবী বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন আরতি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে ও গণ্ডদেশে এক অপূর্ব রক্তিম আভা দর্শন করেন ও সেই সময়েই শ্রীশ্রীমাকে দ্রুত-গতিতে মন্দির হইতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হন। পরে তিনি শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীমা বলেনঃ "ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" নিকুঞ্জ দেবী শ্রীশ্রীমায়ের এই সময়ে যে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করেন, তাহা সকলকেই বলেন। ৺কাশীধাম দর্শন করিয়া অযোধ্যায় একদিন থাকিয়া বৃন্দাবনে আসেন। এখানে এক মাস কাল থাকিয়া নিকুঞ্জ দেবী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। অতীব দুঃখের সহিত 'মন্দ ভাগ্য' এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২] নিকুঞ্জ দেবী বলেন—বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমা আবার হাতের বালা খুলিতে যান ও এই সময়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়া বলেনঃ "তুমি বালা খুলো না, গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার, তার বিধবা হওয়া (বৈধব্য) নাই—সে

* শ্রীম-র পৌত্র—শ্রীম-র জীবিত সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র গুপ্তের (ডাক নাম 'নটি') চতুর্থ পুত্র।

১ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, শ্রীমায়ের সেবারের বৃন্দাবন-যাত্রায় অন্যতম সহযাত্রী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা'-য় লিখেছেনঃ 'শ্রীমার সঙ্গে যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ও আমি রহিলাম। গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি দিদি, শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবীও চলিলেন।" (আমার জীবনকথা, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ১২৮)। যোগীন-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েকদিন আগেই বৃন্দাবনে এসেছিলেন। শ্রীমা বৃন্দাবনে যোগীন-মাকেও সঙ্গিনীরূপে পুনরায় পেয়েছিলেন। (দ্রঃ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২৯ ; শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৮৬-১৯০ ; শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ৫৬ ; শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশংকর দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ ১৪৪-১৯১।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

২ স্বামী অভেদানন্দের আত্মজীবনী অনুসারে শ্রীশ্রীমা-ই নিকুঞ্জ দেবীকে তাঁদের কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে দিতে স্বামী অভেদানন্দকে আদেশ করেছিলেন। —যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

চির-সধবা।"[৩] পরে শ্রীশ্রীমা তৎকালীন তীর্থভ্রমণ সমাপনান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে নিকুঞ্জ দেবী প্রায়ই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন মাস্টার মহাশয়ও ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া অশেষ সহায়হীন হইয়া পড়েন ও শ্রীশ্রীমাকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও কয়েকবার মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া কখনো পক্ষাধিক কাল, কখনো বা মাসাধিককাল বাস করিয়া যাইতেন। ৺ঘট প্রতিষ্ঠা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমা মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া পূজা ও ৺ঘট স্থাপনার ব্যবস্থাও করেন। এই ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমা কতই না পূজা, জপ ও ধ্যান করিয়াছেন।

নিকুঞ্জ দেবী যখনই মায়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন ও তাঁহার সহিত যেসব কথা হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু মাস্টার মহাশয়কে বলেন ও তিনি ডায়েরীতে সেইসব কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ডায়েরীর উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।

নিকুঞ্জ দেবী—মা, সংসারে কেবল যন্ত্রণা আর অশান্তি। তোমার কাছে এলেই তপ্ত হৃদয়ে একমাত্র শান্তি আসে। আর তোমাকে মা বলে ডাকলে হৃদয় জুড়ায়।

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, তুমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছ, তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে উনি খুব ভাল বলতেন। তিনি আমায় বলেছেন, 'মাস্টারের স্ত্রী কি উদার, কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।' আর মা, তোমায় বলি শোন, এই সংসারে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ আছেই, যার যখন সময়, ঠিক আসে, ভোগও করিয়ে নেয়। মনে জোর করতে হয় আর ঈশ্বরে মন রাখতে হয়। কেবল এমন অশান্তি-অশান্তি বলতে নাই।

নিকুঞ্জ দেবী—তোমার সঙ্গে কথা কইলেই মনে জোর আসে আর প্রাণ জুড়ায়। মা, তাই যখনই প্রাণটা হু-হু করে তোমার কাছেই আসবার জন্য ব্যাকুল হই।

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, আমার তখন ১৮।১৯ বৎসর বয়স হবে, তখন ওঁর সঙ্গে শুতুম (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ)। একদিন বললেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কে?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আমা বই আর কাউকে জান না?

শ্রীশ্রীমা—না, তিন সত্যি।

"একদিন বললেন, 'ছেলে কী হবে? এই দেখছ সব মরছে।' তা আমি বললাম, 'সব কি যায়।'

"একদিন খাবার সময় নুন না থাকায় বলেছিলাম, 'নুন নাই।' তখন তিরস্কার করে বললেন, 'নেই কি? নেই শব্দ বলতে নাই। সব জোগাড় করে রাখতে হয়।'

"শ্বশুরবাড়ি বাসকালে রামলালের বাবা (রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়) রাত্রে আমায় শুতে যেতে বলতেন, আর উনি কেবল হাসতেন। সেইসময় একসঙ্গে শুতুম আর সারারাত গল্পেই কেটে যেত। বলতেন —কেমন করে সংসারের কাজ করতে হয়, কেমন করে সকলকার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আর জানতে হয়, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার ও নিত্যবস্তু।

"কামারপুকুরে আমার মা আসাতে কত আদর-যত্ন করলেন আর বললেন, 'আপনি আচার তৈয়ার করে খাওয়ান।'

"জয়রামবাটীতে যখন ছিলাম তখন উনি এলেন। আমায় বললেন, 'সাজি মাটি দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো।' তা দেওয়াতে বাড়ির অন্য মেয়েরা দেখে বলাবলি করতে লাগল, 'ওমা, সারদার কি গো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হলো না তবু দেখ…।'

"শাশুড়ি (চন্দ্রমণি দেবী) যখন পুত্রশোকে* মুহ্যমান সেই সময় শাশুড়ির কাছেই থাকতেন, কত বোঝাতেন। একদিন প্রার্থনা করলেন, 'মা! আমি তোমার নামগুণ করব, আর মা যদি সদা-সর্বদা শোক

৩ কথাগুলি নিকুঞ্জ দেবীর সূত্রেই প্রাপ্ত। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন নিকুঞ্জ দেবী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য নিকুঞ্জ দেবীর কাছে কথাগুলি শুনে তৎ-প্রণীত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ১১৮, পাদটীকা ৩; শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১৮, পাদটীকা ৯।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

* ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের মৃত্যুতে।

করে আর কাঁদে কেমন করে পারব। তা ওর মন উলটে দাও মা।' শেষে তাই হলো, শাশুড়ি সব সময়েই ভাবে থাকতেন।

"শম্ভু মল্লিক থাকার জন্য একটি বাসাবাড়ি (১১ এপ্রিল, ১৮৭৬) করে দিলে। তা বৌমা, সেখানে থাকতে মন চাইত না। সেকথা বলতে তিনি হৃদয়কে বললেন, 'হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন।' হৃদুও বললে, 'আমার স্ত্রীর জন্য কি শম্ভু মল্লিক বাড়ি করে দিলে?'

"ওখানে তখন একজন ব্রহ্মচারী (তান্ত্রিক সাধক) থাকত। মনে বড় ভয় হতো যদি ওঁর কোন মন্দ করে, তাই ১০ টাকা দিতে গেলুম যাতে কোন মন্দ না করে। তা ঠিক টের পেয়েছেন। অমনি নবতে এসে বললেন, 'আমার মা আছে, কে মন্দ করবে?'

"রাম দত্ত প্রভৃতিকে একদিন বললেন 'দেখ, বড় ছেলে ছেলে করে, তোমরা একবার নবতে যাও, আর বলে এস আমরাই আপনার ছেলে।'

"নৌকায় করে বালী হয়ে একসঙ্গে দেশে যাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া আর কত গান গাইলেন, আহা! সে কি ভাব! আবার বললেন, 'আমি জানি তুমি কে। কিন্তু এখন বলব না। আর এর (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ভিতরে সব আছে।'

"শাশুড়ির মৃত্যুর (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭) সময় বলতে লাগলেন, 'মা গো, তুমি কে গো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে। মা, একরূপে এতদিন দেখলি এখন যেন দেখিস।'

"শাশুড়ির মৃত্যুর পর একদিন খাবার পূর্বে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি মার জন্য পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'

"হৃদুকে একদিন বললেন, 'তুই শ্যালা আঁধের থাক, তুই এ-ঘরে আসিসনি। আমি তোকে গালাগাল দিই, তোরও রক্তমাংসের শরীর, তুইও দিস।'

"আমাকে ও আমার সঙ্গীদের দেখে বললেন, 'দেখ হৃদে, ওকে ছেড়ে দিতে আমার অবিশ্বাস হয় না, তবে লোকে কি বলবে।'

"বেতন ৭ টাকা সম্বন্ধে খাজাঞ্চীকে বললেন, 'যদি ওকে (শ্রীশ্রীমাকে) দাও তো দাও, তা না হলে গঙ্গার জলে ফেল, কি অতিথিসেবায় দাও। যা ইচ্ছা কর।'

"নবতে যখন থাকতুম সমস্ত দিন বসে একদিন মালা গেঁথে বললাম, 'ওঁকে বলো—পরতে হবে।' তা মালা গলায় পরে গান গাইলেন—'ভূষণ বাকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।'

"বাড়ি (জয়রামবাটী) যাবার সময় বার বার ওঁকে দেখতে যাওয়াতে হৃদুকে বললেন, 'একশো বার কি? যেতে বল।'

"গোলাপ-মাকে একদিন বললেন, 'ওর সহ্যগুণ কত, ওকে নমস্কার'।"

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, সেবার যখন নয় মাস আসিনি বড় কষ্ট হয়েছিল।

নিকুঞ্জ দেবী—মা, তুমি দেবী! তুমি মা জিতেন্দ্রিয়!

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, ও কথা বলোনি, কি কপালে আছে কে জানে? কাশীপুরে যখন থাকতুম কত কি মনে উঠত, তা ওঁর কাছে গিয়ে তবে শান্তি হতো। কিন্তু নবতে যখন থাকতুম তখন অত কি হয়েছিল?

"একদিন বললেন, 'তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের বলব না। তোমার ধার শোধবার জন্য আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে লব।'

"লক্ষ্মীর একাদশী শুনে বললেন, 'আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে। আর থান ধুতি, যেন রাক্ষসে বেশ।'

"পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন, হাতে ডায়মণ্ডকাটা বালা। সেই বালা দেখে আমায় সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, এদিকে নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না।

"ওঁর অসুখের সময় বললেন, 'ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, কেবল লাটু। রঞ্জিত রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই।'

"তোমার কত নাতি-পুতি (হবে), (তোমার) কিসের ভাবনা।"

"একদিন ওঁকে বললাম, 'আমার ভাবটাব তো কিছুই হলো না।' তা শুনে বললেন, 'আবার কি হবে, আবার কি কাপড় ফেলে ধেই-ধেই করে নাচতে হবে, তখন কাপড় সামলাবে কে?'

"দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে বললেন, 'কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়'।"*

* মাসিক বসুমতী, ৩১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, পৃঃ ১৭৯

সংগ্রহ : প্রদ্যোৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ন্যাসিনী-মা

সরলাবালা সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

সন্ন্যাসিনী-মার আর-একটি ছেলে এলেন বর্মা থেকে। ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু দেখলে মনে হতো বয়স খুবই অল্প, মুখের ভাব একেবারে ছেলেমানুষের মতো। একটা বিছানার বাণ্ডিল আর হাতব্যাগ নিয়ে একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। সন্ন্যাসিনী-মা চা খেতে বসেছেন। আমাকে একটা বাটিতে ঢেলে দিয়েছেন, আর কাদম্বিনী নামে আর-একটা মেয়ে প্রায়ই তাঁর কাছে আসত, তাকেও একটা বাটিতে দিয়েছেন। এই মেয়েটি সন্ন্যাসিনী-মাকে অভিভাবিকার মতো শাসনও করত।...

দরজার কাছে শব্দ শুনেই সন্ন্যাসিনী-মা চেয়ে দেখলেন এবং বলে উঠলেন, 'বিমল এলি? কাল তোর চিঠি পেয়েছি। বিছানাপত্তর নিয়ে এসেছিস যে, এখানেই থাকবি নাকি?'

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি রাগত স্বরে বলল, 'থাকব না তো অতদূর বর্মা থেকে এলাম কি কাশীর বিশ্বনাথ দর্শন করতে? দাও, শিগ্‌গির এক পেয়ালা চা দাও, নিজেরাই সব খেয়ে ফেল না যেন।'

সন্ন্যাসিনী-মা হাসতে হাসতে বললেন, 'এসেই রাগারাগি আরম্ভ করলি? পেয়ালা কোথায় পাব রে, কাঁসার বাটিতেই খেতে হবে।' বলে নিজের চায়ের অর্ধেক তাকে একটা বাটিতে করে ঢেলে দিলেন।

'একটা পেয়ালাও রাখতে পার না?' বলে ছেলেটি চায়ের বাটিটা টেনে নিয়ে হাঁটু মুড়ে দুয়ারের কাছেই বসে পড়ল।

'কী রাঁধবে আজ? মুলোর ঘণ্ট তো রাঁধবেই, আর সেই রকম অড়হর ডাল। ঘি আছে তো ঘরে? না থাকে তো বল কিনে আনি।'

সন্ন্যাসিনী-মা বললেন, 'এসেই তো খাবার ফর্দ আরম্ভ হলো। এই তো ঘর। পাশে ঐ রান্নার জায়গাটুকু, শুবি কোথায় এখানে?'

বিমল বলল, 'তোমার ঐ হরিণের চামড়ার ওপর শুতে যাচ্ছি না। আমি এই সামনের দিকে ব্যাগ বিছিয়ে শোব। তুমি থাকবে তক্তপোশে। আর আমি নিচে শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে সারারাত গল্প করব। তোমাকে ওসব জপতপ করতে দিচ্ছি না।'

সুধন্যাও এই সময় এসে পড়ল। বিমলকে দেখে সে খুবই খুশি হয়েছে, বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম, বিমল এর আগেও অনেকবার এখানে এসেছে।

বিমল সুধন্যাকে দেখেই বলল, 'কি? এখনও সেই ছাতু খাওয়াই চলছে নাকি তোমার? মা, সুধন্যাকে ভাত খাওয়াতে পারলে না?'

সন্ন্যাসিনী-মা বললেন, 'দশমী আর দ্বাদশীতে গুরুর প্রসাদ বলে আমার এখানে ভাত খায়। তুই যাবার পর ওর এইটুকু হয়েছে।'...

বিমল যে কয়দিন ছিল তার উৎপাতে সন্ন্যাসিনী-মা আসনে বসবার অবসরই পেতেন না। চাকি ও বেলনা কিনে আনল, রাত্রে লুচি ভাজা হবে, না হয় ঢাকাই পরোটা। কিন্তু সুধন্যা তার সাধনায় অটুট হয়ে রইল। সে কিছুতেই ছাতু খাওয়া ছাড়ল না।

বাড়ির কাছেই প্রণবাশ্রম, অর্থাৎ প্রণবানন্দ স্বামীর আশ্রম। এই প্রণবানন্দ স্বামী গার্হস্থ্য জীবনে সন্ন্যাসিনী-মার সম্পর্কিত মামা ছিলেন। এখনও সন্ন্যাসিনী-মা তাঁকে 'মামা' বলেই সম্বোধন করেন।

প্রণবানন্দ স্বামীর আশ্রমের নিয়ম খুবই কঠোর। তেল মাখা চলবে না, চুল রাখাও চলবে না। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যারা প্রায় সকলেই মাথা নেড়া করেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী-মা তেলও মাখতেন এবং চুলও কাটেননি। এ নিয়ে তাঁকে আশ্রমে নানারকম কথা শুনতে হতো। যেমন, 'শরৎদিদি একটু সরে বস দেখি, তোমার মাথায় দেখছি তেল চবচব করছে। বাবা তেলের গন্ধই সহ্য করতে পারেন না।' 'ওমা, এখানে এতবড় একটা লম্বা চুল কোত্থেকে এল? শরৎদিদি, তোমারই মাথা থেকে নিশ্চয় পড়েছে।' এইসব গঞ্জনা শুনে সন্ন্যাসিনী-মা শুধু হাসতেন, কিন্তু প্রতিদিনই প্রণবাশ্রমে যেতেন।...

সন্ন্যাসিনী-মা তাঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আমাকে বলেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর ছেলেবেলার কাহিনীও ছিল।

কালনায় তাঁদের বাড়ি, বাড়িতে ছিলেন শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। বাড়ির ভাঁড়ার ঘর থেকে তিনি প্রতিদিনই চাল-ডাল প্রভৃতি চুরি করে ভিখারিদের দিতেন এবং চুরি করলে যে পাপ হয় তাও জানতেন। তাই শ্যামসুন্দরের দুয়ারে মাথা কুটে কুটে প্রার্থনা জানাতেন, 'শ্যামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, আমাকে পাপ দিও না।' একথা শুনে শ্যামসুন্দর যেন হেসে তাঁর দিকে চাইতেন। এতেই বুঝতে পারা যেত যে, শ্যামসুন্দর পাপ দেননি।...

কাশীতে পুণ্যার্থিনী বাঙালী মেয়ের সংখ্যা করা যায় না। পুণ্যের জন্য যেন তাঁরা পাগল হয়ে আছেন। গুরুপুজা তো বড় কথা, তাঁরা কীর্তনীয়াদেরও পুজা করেন। রামকমল নামক একজন কীর্তনীয়াকে একদিন তাঁরা সিংহাসনে বসিয়ে যেভাবে পুজা ও আরতি করলেন, তা দেখে মনে হয়েছিল, যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ ভগবানেরই পুজা করছেন।

আবার দেখেছি, তীর্থবাসিনীর দল পথে কাপড় বিছিয়ে বসে আছেন, যাঁরা দৈনিক দেবদর্শনে যাত্রা করেন তাঁদের হাত থেকে কয়েকটি চাল যদি এসে পড়ে তাঁদের পাতা ছেঁড়া কাপড়ে, এই আশায়।

পথের ধারে অসংখ্য শিবলিঙ্গ, 'নমঃ শিবায়', 'নমঃ শিবায়' বলে গঙ্গাজলে ভিজে চাল ছিটাতে ছিটাতে চলেছেন যাত্রিনীর দল। এক বাঁধানো বটগাছের তলায় এক মুমূর্ষু রুগ্ন পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় যে, বহুদূরে তীর্থ থেকে সে এসেছে। পরনের কাপড় লাল ধুলার রঙে রাঙা, মাথার কাছে একটা পুঁটলি। যাত্রিনীরা 'নমঃ শিবায়' বলে তারও গায়ে জল-সহ চাল ছুঁড়ে দিলেন, কেননা কাশীতে মরবামাত্র মানুষ শিবত্ব লাভ করে। কিন্তু আমি দেখলাম, তার ঠোঁটদুটো নড়ছে, সে এখনও মরেনি।

শুনলাম লোকটি দুদিন থেকে এই গাছতলায় এইভাবে পড়ে আছে, আগের দিন নাকি ছটফট করছিল, কিন্তু এখন আর ছটফটানি নেই।

আমি ছুটে গেলাম সন্ন্যাসিনী-মাকে জানাবার জন্য। শোনামাত্র তিনি একটি জলের বাটি নিয়ে ছুটে এলেন, কিন্তু রোগীর আর জল পান করার মতো অবস্থা ছিল না। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, 'কি জল দিচ্ছেন? গঙ্গাজল তো?'

সন্ন্যাসিনী-মা একটু হাসলেন, অতি দুঃখের হাসি। এরপরে একদিন আমাকে বলেছিলেন, "তীর্থে তীর্থে সর্বত্রই দেখেছি এই দৃশ্য। পুরীতে, বৃন্দাবনে, সব জায়গায়। দেখেছিলাম জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছেই পথের একধারে পড়ে আছে একটা লোক, তার দু-পা ফুলে গিয়েছে, মুখে রক্তের লেশও নেই। মাথার কাছে কে যেন একটা ভাঙা আটকের খোলাতে পখালো প্রসাদ রেখে গিয়েছে। এত মাছি তার ওপর বসেছে যে, প্রসাদ দেখাই যাচ্ছে না, জগন্নাথ-মন্দিরে আরতির বাজনা শুনে উর্ধ্বশ্বাসে সকলে সিংহদুয়ারের দিকে ছুটছে, কেউই তার দিকে চেয়েও দেখছে না। একটা গাড়ি ডাকলাম তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। একজন তাই দেখে বলল, 'করছ কী, সিংহদুয়ারের সম্মুখ থেকে এসময় কি নড়াতে আছে?' লোকটা

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। অবশ্য আমাকে দুবেলাই তাকে দেখতে যেতে হতো।

"আর বৃন্দাবন! রাধারানীর প্রেমের রাজ্য! রাস্তায় পথচারীরা একজনের সঙ্গে একজনের দেখা হলে 'রাধে, রাধে' বলে সম্ভাষণ করছে। আর রাস্তায় পড়ে আছে এক রোগিণী, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধুসর, বোঝা যায় যে, ছটফট করতে করতে তার এই দশা হয়েছে। আর সবাই বলেছে, 'আহা কি ভাগ্য, এতদিনে রজঃ পেয়ে গেল।'

"আমার তখন মনে হয়েছিল, প্রেমময়ীর প্রেমের রাজ্য নাকি এই বৃন্দাবন? 'বৃন্দাবন! বৃন্দাবন!' করে পাগল হয়েছিলাম। দিনরাত বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখতাম, ডালে ডালে গান করছে শুক-শারী, নৃত্য করছে ময়ূর-ময়ূরী। ভোরবেলায় নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাবার জন্য মা যশোদা সাজাতে বসেছেন 'স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া যায়', অঙ্গনে রাখাল বালকেরা অধৈর্য হয়েছে প্রতীক্ষায়, ধবলী-শ্যামলীর হাম্বা হাম্বা, আর বলরামের শিঙার আহ্বান, প্রতিদিনই প্রত্যূষে এই স্বপ্ন যেন মনের মধ্যে ফুটে উঠত।

"বৃন্দাবনে গেলাম, 'হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ' বলতে বলতে গোবিন্দের মন্দিরে যখন গিয়ে ঢুকলাম তখন কি আর আমাতে আমি ছিলাম। মুখ দিয়ে অনবরত উচ্চারিত হচ্ছে 'হে নাথ, হে রমণ, নয়নাভিরাম।' মাথার কাপড় যে খুলে গিয়েছে তা কি আমার জ্ঞান আছে? এক পুরুষের হাতের ধাক্কায় যখন চৈতন্য হলো তখন শুনতে পেলাম 'নঙ্গা শির, নঙ্গা শির!' অর্থাৎ মাথার কাপড় নেই কেন?..."

সন্ন্যাসিনী-মা একটু চুপ করলেন। তারপর বললেন, "সেসব দিনের কথা যখন মনে পড়ে, কী যে মনে হয় কি বলব তোকে। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পাহাড়ে একা একা বেড়াচ্ছি, কোন ভয় নেই। বৃন্দাবনে গিয়ে দেখেছিলাম, শুধু দেখাই নয়—শুনেওছিলাম, গিরিশবাবুর সেই গান শুনেছিস, 'চেতন যমুনা চেতন রেণু, মোহন কুঞ্জবন ব্যাপিত রেণু।' সরলা রে, কি বলব তোকে, এই কুঠুরিতে পড়ে আছি একা, পনেরো দিন ধরে জ্বর, সুধন্যা তখন ছিল না। মনে হলো একটু জারক নেবু, একটু আমসত্ত্ব যদি পেতাম, অমনি দেখি এক হিন্দুস্থানী ছেলে এসে হাজির। 'মাতাজী, থোড়া আচার খাইয়ে, আপকো ওয়াস্তে ভেজ দিয়া, কৃপা করকে লিজিয়ে।' আচার? না আচার নয়, একটা মোটা পুরু আমসত্ত্ব আর গোটা-কতক জারক লেবু একটা কেয়াপাতা দিয়ে তৈরি পেটারিতে সাজানো আছে।"

সন্ন্যাসিনী-মা উচ্ছ্বসিতভাবে যখন বলে যেতেন, তখন তাঁর শ্রোতা কেউ আছে কিনা অনেক সময় সে খেয়ালও হয়তো তাঁর থাকত না। তীর্থের মাধুর্য যেমন তিনি প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করতেন, তেমনই লোকের দুঃখ-দুর্দশা তীব্রভাবে অনুভব করতেন। তীর্থে এসে বাঙালীর মেয়ে একমুঠো অন্নের জন্য কি দুর্গতি ভোগ করছে! বৃন্দাবনে এসেছে তীর্থবাস করতে, হয়তো তাদের যারা বাড়ির লোক তারা তাদের বিদায় করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সন্ন্যাসিনী-মা বলতে লাগলেন, "গোবিন্দের মন্দিরের কাছেই একটা ঘেরা প্রকাণ্ড বাগিচা। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সেখানে পুণ্যলাভের ব্যবসা আরম্ভ করেছে। হরিনাম কীর্তনের আসর, সেখানে ভিখারিনী বাঙালিনীদের দিয়ে হরিনাম করিয়ে নিচ্ছে ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। সকালে তিন ঘণ্টা, বিকালে তিন ঘণ্টা। পারিশ্রমিক দিচ্ছে। হরিনাম কীর্তন পুণ্য কাজ, যারা পয়সা খরচ করছে এই পুণ্য কাজের জন্য, তারা অবশ্যই এই পুণ্যের বেশ কিছু অংশ পাবে।

"একটা করে টিকিট যোগাড় করতে পারলে তবেই যোগ দেওয়া যেতে পারে—সেই টিকিটটা পাবার জন্যই তীর্থবাসিনীদের কিরকম পায়ে ধরাধরি! এরই নাম তীর্থবাস।"*

[সমাপ্ত]

* সরলাবালা রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯১৮-৯২২

মহাপুরুষ মহারাজের কিছু অস্ফুট স্মৃতি

শিবশম্ভু সরকার

নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে একটি অমর বাণী সংগ্রথিত করেছেন। উক্তিটি হলো : "মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোহগম্যোঽমোঘশ্চ"—মহাত্মার সঙ্গ দুষ্প্রাপ্য, অবোধ্য ও অব্যর্থ। সিদ্ধ ভগবৎ-বেত্তা মহাপুরুষকে গুরু বা পরিচালকরূপে পাওয়া শুধু সৌভাগ্য বললে ছোট করে বলা হয়। জন্ম-জন্ম-অর্জিত পুণ্যের সমাহার বলে অভিহিত করলেও অনেকখানিই না বলা থেকে যায়। ব্যাখ্যাকার 'অগম্য' শব্দটির ওপর মন্তব্য করেছেন : সদ্গুরুর সঙ্গগুণে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও সুচরিত্র হয়ে ওঠে, আর এই রূপান্তর কিভাবে ঘটে তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর আশ্রয় যদি মিলে যায়, তাহলে সেই সঙ্গলাভ নিষ্ফল হবে না—একদিন না একদিন অভীষ্ট ফললাভ হবে। তাই তা, 'অমোঘ'ও। এটা পরম আশার কথা। "লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব"—ঈশ্বরের কৃপা সদ্গুরুর কৃপায় পাওয়া যায়।

আমি তখন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু কৌতূহল অদম্য। একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মঠে গিয়েছি। বাইরের একতলায় দক্ষিণের খোলা বারান্দায় স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ বসে ছিলেন। সঙ্গী ভদ্রলোকটির সঙ্গে জ্ঞান মহারাজ আলাপ করতে লাগলেন। এই প্রথম শুনলাম বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির কথা। তখন 'বিশ্ব-বিদ্যালয়' কথাটি বহুল-প্রচারিত হয়নি। স্বামীজীর প্রস্তাবিত 'man-making education'-এর বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় সেখানে মঠাধীশ 'মহাপুরুষ মহারাজের' (স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সঙ্ঘের সাধু ও ভক্তমহলে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর অসাধারণ ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা জ্ঞাত হয়ে স্বামীজীই ঐ নামে তাঁকে অভিহিত করেন) আগমন ঘটল। প্রশান্ত গম্ভীরমুখ, সমুজ্জ্বল পুষ্ট শরীর, মাথায় একটি গৈরিক কাপড়ের টুপি, হাতে লাঠি। মহাপুরুষ মহারাজ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোচ্ছেন। সকলেই উঠে দাঁড়ালেন ও প্রণতি জানালেন। জ্ঞান মহারাজ একটা আর্জি জানালেন : "আপনি তো কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। আমার কুকুরগুলো যাতে খাবার পায়, তার কথা বলে যাবেন।" মহাপুরুষ মহারাজ স্মিত হাস্যে সম্মতি জানালেন। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটি মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন : "এই ছেলেটি আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চায়।" মহাপুরুষ মহারাজ বেশ গম্ভীরভাবে বললেন : "ছেলেমানুষ বুড়ো মানুষের সঙ্গে আবার কি কথা কইবে!" আমি কিঞ্চিৎ নাছোড়। বলে ফেললাম : "মহারাজ, আপনার দু-একটি কথা শুনতে পাব বলেই এসেছি।" তিনি আরও গম্ভীর হলেন। বললেন : "ঠাকুরের কথামৃত পড়বে।" তারপর একটু যেন ভেবে বলে উঠলেন : "ছ-মাস বাদে দেখা করবে।" প্রথম দর্শন অনেকটা হঠাৎই ঘটে গেল।

দ্বিতীয় দর্শন প্রায় বছর খানেক বাদে ঘটল। কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজ দুজনে গোলঘরের ওপরের ছাদে পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসে গল্প করছেন। আমি প্রণাম করে মুখ তুলতেই মহাপুরুষ মহারাজ প্রশ্ন করলেন : "কথামৃত কতটা পড়া হলো?" আমি তো স্তম্ভিত! আমার মতো একটি নগণ্য ছোঁড়াকে কবে কি বলে-ছিলেন, তা মনে থাকল কি করে! সবিনয়ে উত্তর দিলাম : "আজ্ঞে, প্রত্যহই পড়ে থাকি।" পরক্ষণেই বেশ প্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : "আচ্ছা, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের যখন আলোচনা চলছিল তখন মাস্টারমশায় এই কথাগুলি ব্যবহার করেছেন—'সরস্বতী যেন ঠাকুরের রসনায় নৃত্য করছেন।'—*"

* ভাবটি প্রায় এইরকম হলেও 'কথামৃতে' মাস্টারমহাশয়ের মূল কথাগুলি হলো এই : "যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন।" (কথামৃত, ৩।১।৭) মহাপুরুষ মহারাজ নিশ্চয় এই কথাগুলিই বলেছিলেন। বহুদিনের ব্যবধানে লেখকের ভুল হয়েছে। —যুগ্ম সম্পাদক।

এর চেয়ে ভাল কিছু দিয়ে প্রকাশ করতে পার?" নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে বললাম: "এর থেকে ভাল expression হয় না।" মহাপুরুষজী হাসলেন। কী মধুর অপার্থিব সেই হাসি! তারপর বললেন: "ভাল করে পড়। তোমার হবে। আবার এসো।"

তৃতীয় বা চতুর্থ দর্শন বলে কিছু মনে পড়ে না। স্মৃতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে রবিবার পেলেই মঠে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হতো। এক রবিবার সকালে গেছি। সাধুরা লাইন দিয়ে মঠাধীশকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। মহাপুরুষজী সকলের কুশল সংবাদ নিচ্ছেন। আমার পরিচিত একজন মহারাজকে মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: "কি সন্তোষ, সব সন্তোষ তো?" তিনিও সম্মতি জানালেন। সকলকেই আশিস জানাচ্ছেন মহাপুরুষজী। এক বৃদ্ধকে দেখে বলে উঠলেন: "একি! আপনাকে এতদূর টেনে আনল কে?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাসলেন: "কলকাতায় এসে আপনাকে দর্শন না করে ফিরে যেতে মন চাইল না।" মহাপুরুষজী বেশ অস্বস্তির স্বরে বলে উঠলেন: "এতটা পরিশ্রম—এই বয়সে আপনার করা ঠিক হয়নি।" মহারাজের আন্তরিকতায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ধন্য হয়ে গেলেন।

একটি দিনের ঘটনা বেশ মনে পড়ে। হরি মহারাজজীর (স্বামী তুরীয়ানন্দের) স্মরণসভা হচ্ছে মঠে। যেতে খানিকটা দেরিই হয়ে গেছে আমার। কালীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ), নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) প্রভৃতির ভাষণ কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা শতরঞ্জির ওপর বসে আছেন। মহাপুরুষ মহারাজ একা চেয়ারে বসে। তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হলো। মহাপুরুষজী বললেন: "হরি মহারাজের ধ্যান ছিল অদ্ভুত—একেবারে দেহচেতনা থাকত না। স্বামীজী ঐ যে, ওদেশে বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে তোমরা আর্য ক্ষাত্রিয়াচার দেখতে পাবে আর স্বামী তুরীয়ানন্দে স্পষ্ট অনুভব করবে—আর্য ব্রাহ্মণাচার।'* একথা হুবহু সত্য। ধ্যানে বসলেই হরি মহারাজের দেহাতীত অবস্থা এসে যেত। সে এক অনির্বাচ্য অভিজ্ঞতা। …সে ধ্যান মানে কি? সে ধ্যান মানে সমাধি। দেহবোধ কিছুক্ষণের জন্য লোপ পেয়ে যাবে। তবে অন্যের তা হওয়া সাধন সাপেক্ষ। দু-ঘণ্টা ধ্যান করলাম, তার মধ্যে দেহবিচ্ছিন্ন ধ্যান হলো পনের মিনিট। তাতেই মন ভরপুর হয়ে এল। যেন নবজীবন লাভ হলো। এই রকম ধ্যান যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে—যা স্বামীজী ঠাকুরের কাছে চেয়েছিলেন—তাতেই তো এসে গেল নির্বিকল্প সমাধির দেবদুর্লভ সম্পদ।"

তিনি আরও কিছু দৈবী কথা পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতি তা ধরে রাখতে পারেনি। তবে বেশ মনে আছে, স্বামী মাধবানন্দ প্রমুখ উচ্চ আধিকারিকরাও স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলেন মহাপুরুষজীর কথা।

এই ফাঁকে একটি কৌতুককর ঘটনা বলা যাক। পূজনীয় খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) স্নানে যাচ্ছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। প্রসন্ন না হয়ে বেশ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন: "তোমার বাড়ি কোথায় হে?" ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম: "আজ্ঞে, পূর্ববঙ্গে।" তিনি কিছুটা রুষ্ট কিছুটা হৃষ্ট ভাবে বললেন: "জানো না, তেলমাখা লোককে প্রণাম করতে নেই?" আমি সত্যিই জানি না। তাই দ্রুত পণ্ডিতের বাক্য অনুসরণ করলাম: "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি"।

একদিন অপরাহ্ণ বেলায় মহাপুরুষজী দোতলার পূর্বদিকের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। দু-চারজন সাধু মহারাজও উপস্থিত। এমন সময়ে দীনেশ মহারাজ (স্বামী নিখিলানন্দ) কয়েকজন সাহেব-মেমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিয়ে দীনেশ মহারাজ বলে উঠলেন: "Here is the oldest living disciple of Sri Ramakrishna." (ইনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত শিষ্যগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।) সাহেব-মেমরা কোথা থেকে এসেছিলেন জানি না।

* দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার আগে ভারতেও স্বামীজী হরি মহারাজকে বলেছিলেন: "আমি পাশ্চাত্য জগৎকে ক্ষাত্রবীর্য দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও।" —শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, ১৩৭৯, পৃঃ ৪৮১

হয়তো মঠ ঘুরে দেখতে এসেছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজন মহাপুরুষজীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেনঃ "নমস্কার"। তারপর দীনেশ মহারাজ তাঁদের স্বামীজীর শয়নকক্ষ দেখাতে নিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি তাঁদের বলছেনঃ "We have kept the room in a manner as if somebody has just gone out and would soon return." (আমরা ঘরটি এমনভাবে রেখেছি যেন একজন ঘরটি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন এবং শীঘ্রই ফিরে আসবেন।)"

অতঃপর এগিয়ে এল পার্থিব জীবনের অপার্থিব দিনটি। বাড়িতে চিঠি পেলাম—অমুক দিন সকালে আসবে, দীক্ষা হবে। মঠে গিয়ে দেখি আমার আগে কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই অপেক্ষমান দীক্ষাপ্রার্থী। হঠাৎ মতি মহারাজ (স্বামী শিবস্বরূপানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজের সেবক) এসে ঘোষণা করলেনঃ "আজ কারও দীক্ষা হবে না। মহাপুরুষ মহারাজের শরীর খারাপ।" সকলেরই মুখ মলিন হয়ে গেল। একে একে সবাই চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ একা বসে রইলাম। ভাবলাম, চলেই যখন যাচ্ছি, তখন মহারাজের ঘরের দরজায় একটা প্রণাম করে যাই। গিয়ে দেখি দরজাটা আধ-খোলা অবস্থায় ভেজানো। উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঘরে কেউ নেই। মহারাজ একা বসে আছেন। জানালার বাইরে আমগাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসেছিলেন। এই সুযোগ! প্রণাম করতেই সচকিতে প্রশ্ন করলেনঃ "কে?" আমি খানিকটা আড়ষ্টভাবে উত্তর দিলামঃ "দীক্ষার জন্য এসেছিলাম, মহারাজ।" পূজনীয় মহারাজ কিন্তু ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেনঃ "দীক্ষা চাস? এখুনিই দীক্ষা দেব। আমার সঙ্গে সঙ্গে বল।" তাঁর উচ্চারণকে অনুসরণ করে আমি মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। তারপর করুণার সাগর বলে উঠলেনঃ "মনটা ভরল না, কেমন?" এমন সময় মতি মহারাজ ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে দেখে রক্তচক্ষু হয়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু তখন স্বয়ং সম্রাট আমার আশ্রয়দাতা।

"মতি, দীক্ষার ব্যবস্থা কর। আজই দীক্ষা দেব।" আমার দিকে চেয়ে বললেনঃ "আমি ওপর দিয়ে ঠাকুরঘরে যাচ্ছি, তুমি নিচের সিঁড়ি দিয়ে যাও।"

পুরনো ঠাকুরঘরে দীক্ষা শুরু হলো। মহারাজের হুকুম মতো ফুল, ফল, একটি মুদ্রা আমার হাতে দিয়ে বলা হলো "এইগুলো গুরুকে দাও"। তারপর ঠাকুরের পাদুকা স্পর্শ করতে বললেন। এর পর তাঁর নির্দেশে পূতাস্থির কৌটা স্পর্শ করলাম। সব প্রক্রিয়ার অন্তে তিনি নির্দেশ দিলেনঃ "পাঁচ হাজার বার জপ কর। তারপর আমার সঙ্গে দেখা করবে। মঠেই আজকের দিনটা থাকবে এবং প্রসাদ পাবে। বিকালে আবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

আজও মনে হয়, এই অত্যাশ্চর্য সৌভাগ্যের কারণ কি? হেতুটি খুঁজে পাইনি। চৌদ্দজন দীক্ষার্থী চলে গেল। আমার অদৃষ্টে নেমে এল শিশিরস্নাত সৌভাগ্যটি। কারণ হয়তো একটা আছেই। তবে, অকারণ কৃপাও হতে পারে। কারণ, বারবার প্রমাণ পেয়েছি, তিনি ছিলেন অহেতুক কৃপাসিন্ধুই।

জানবাজারে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির প্রাসাদের বাইরে রুদ্রাক্ষের মালা কিনতে পাওয়া যেত। একদিন মালা নিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে গিয়েছি। তিনি হাতে নিলেন, দু-এক মিনিট চোখ বুজে রইলেন। আমার দিকে চেয়ে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বললেনঃ "নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে একটু বেশি সময় জপ করবে। বিষয়বিষ ক্রমেই ঘিরে ধরবে। এর থেকে ত্রাণ পাওয়ার অব্যর্থ পথ হচ্ছে—নির্জনে জপ করা।" সাহস কোথায় ছিল, জানি না। জোয়ার যেন এসে গেল! বলে ফেললামঃ "মহারাজ, আপনি আমার জন্য যদি কিছু করে দেন।"

মহাপুরুষ মহারাজ গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেনঃ "আমি কিছু করতে পারব না। 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্'—নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হবে, জানো তো। ঠাকুরকে চিনিয়ে দিয়েছি। তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। সে তুমি যেভাবেই পার—চোখের জল দিয়ে, ভক্তি-ভজনা দিয়ে, আর্তনাদ দিয়ে—যেভাবে পার ঠাকুরের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। তবে একটা কথা আছে, বাঁধন-দড়িটা কাটতে হবে। অনেক নৌকা বাইলে, কিন্তু নৌকা আর এগোয় না। শেষে দেখা গেল—খোটা-বাঁধা দাঁড়টি কাটা হয়নি। তাই, বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করতে হবে। তাহলেই তাঁর কৃপা মিলবে।" বন্ধন-

রজ্জু যে কি, তা আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বন্ধন-রজ্জু কি অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি আসক্তি? তাই তো মনে হয়।

মহাপুরুষজী যখন মঠে থাকতেন তাঁর মহিমময় ব্যক্তিত্ব সর্বত্র অনুভূত হতো। একজন ব্রহ্মচর্য নেবেন। শুনেছি মহাপুরুষ মহারাজ বস্ত্রখণ্ডটি তাঁর হাতে দিয়ে বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পার, তাহলেই সার্থক। তা নইলে পাঁচ হাত পরো আর দশ হাত পরো, কিছুই আসে যায় না।" শুনেছি এক মহারাজ পুস্তক রচনা করে বেশ নাম-যশ অর্জন করেছেন। তিনি একটু বিজ্ঞভাবে বলে উঠলেন: "আমদের পেয়ে মহারাজ বেশ খাটিয়ে নিলেন।"

আর যায় কোথায়! মহাপুরুষ মহারাজ বেশ উষ্ম কণ্ঠে জবাব দিলেন: "তুমি বেরিয়ে যেতে পার। কোথায় আমাদের সংস্পর্শে এসে জীবন ধন্য মনে করবে। তা নয়, এইসব কথা। খাটিয়ে নিচ্ছি! তুমি আজই ইচ্ছে হয় তো চলে যাও।" উক্ত মহারাজ তো সন্ত্রস্ত—একেবারে কাঠ! আবার মহাপুরুষজীর শান্ত অনধীর মূর্তিও দেখেছি। বাগবাজারের কয়েকটি যুবক এসে অভিযোগ করল: "উচ্চবর্ণদের জাত নষ্ট করার জন্য মঠে একসঙ্গে ভক্ত-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" প্রশান্ত কণ্ঠে মহারাজ বললেন: "বামুন দিয়ে রাঁধিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়—এতে জাত নষ্ট করার কি হলো?" যুবকবৃন্দ নিঃশব্দ।

মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে। নবমীর দিনে এলেন কালী মহারাজ—স্বামী অভেদানন্দ। মহাপুরুষজী উঠে কালী মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন। কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। কাছে যেতে সাহস হয়নি। দূরে থেকে মহাপুরুষজীর একটা কথা যেন ভেসে এল: "হ্যাঁ, বেশি দিন বাঁচা বড় কষ্টকর।" উত্তর দিলেন কালী মহারাজ: "আপনার বাকি রয়েছে যে!" সমবেত সাধুমণ্ডলী স্মিতহাস্যে অনুমোদন করলেন।

এইকালের একটি উল্লেখ্য ঘটনা ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন। সিঁড়ি দিয়ে নামা কষ্টকর, তাই চেয়ারে করে মহাপুরুষ মহারাজকে নিয়ে আসা হলো নির্দিষ্ট স্থানটিতে। অপর একটি চেয়ারে কালী মহারাজ বসলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং শ্রীম উপস্থিত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ আসতে পারেননি, তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। স্বামী মাধবানন্দ সেটি পাঠ করলেন। ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠিত হলে মহাপুরুষ মহারাজ গম্ভীর অথচ উদাত্ত স্বরে বলে উঠলেন: "আত্মারাম তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো এই আসনে বসে জগৎকল্যাণ করুন।"

আর একবার উপলক্ষ ছিল স্বামীজীর জন্মোৎসব। মঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে উৎসব-সভা হচ্ছে। সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।* শ-পাঁচেক লোক জমায়েত হয়েছে। দু-তিনজন সন্ন্যাসী মহারাজ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তারপর উঠলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল: ধর্ম আমি মানি না। আমার আত্মা স্বর্গে যাবে বা নরকে যাবে—এটা আমার কাছে অবান্তর। তবু স্বামীজীর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। কারণ, তিনি দীন-দুঃখী মানুষের জন্য সমবেদনা অনুভব করেছেন। এই লোকহিতৈষণার নিমিত্ত তাঁর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। নইলে ধর্ম-কর্ম আমার কাছে নিরর্থক এবং অবান্তর।

উপস্থিত কিছু শ্রোতা বাহবা দিলেন। সভাপতি সুভাষচন্দ্র বললেন: স্বামীজী হলেন একটি প্রকাণ্ড হীরে—যার উজ্জ্বলতা নানা পাশে ও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যে-দিকটি যার ভালো লাগে, তিনি সেই দিক থেকেই স্বামীজীকে দেখুন ও বুঝুন। এতে আপত্তির কিছু নেই। তবে আমার কথা বলতে পারি—তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমি স্বামীজীর একজন দীন শিষ্য হতাম। আপনারা শরৎবাবুর কথায় ক্ষুব্ধ হবেন না। তিনি স্বামীজীকে মানবদরদী মহাপুরুষরূপে বুঝেছেন।..."

শুনেছিলাম, মহাপুরুষজী সব কথা শুনে পরে বলেছিলেন: "কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"।

মঠে গিয়ে প্রথমেই ঠাকুর-দর্শন। তারপর গুরু-

* এটি ১৩৩৭ সালের ঘটনা। স্বামীজীর ঊনসপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হচ্ছিল সেবার। উদ্বোধন-এর ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় সভার প্রতিবেদনে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের ভাষণের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক

দর্শন। একদিন মহাপুরুষজী চেয়ারে বসে আছেন। মনটি বেশ হালকা। সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম: "এম. এ. ক্লাসে ইকনমিক্স পড়ছি, কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।" মহাপুরুষজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি দেখলেন, জানি না বা বুঝি না। তারপর বলে উঠলেন: "তুই বাঙলা পড়। ওতেই তোর হবে।" বিভ্রান্ত সুরে উত্তর দিলাম: "কিন্তু মহারাজ, আমার ইকনমিক্স-এ অনার্স ছিল।" দ্রুত কণ্ঠে মহারাজ জবাব দিলেন: "তা হোক, ছেড়ে দে, বাঙলা পড়, ওতেই তোর হবে।"

বাইরে এসে একজন মহারাজকে কথাটা বলতেই তিনি যেন ক্ষেপে উঠলেন: 'পাগল হয়েছ! ইকনমিক্স-এর মার্কেট-ভ্যালু কত জানো? তার পাশে বাঙলা! মহাপুরুষজী সাধু-সন্ত লোক, অতশত ভেবে বলেননি!"

পরে বুঝেছি, মহাপুরুষজীর দৃষ্টি ছিল অভ্রান্ত, ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য, নির্দেশ অমোঘ। বহুদিন পর তাঁর জন্মবাসরে মঠে গিয়েছি। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ মনে করিয়ে দিলেন, "সেদিন তোমায় মহাপুরুষ মহারাজ কি বলেছিলেন, মনে আছে?"*

একদিন মঠে গিয়েই শুনলাম, আজ কারো সঙ্গে মহারাজ দেখা করছেন না। কি আর করা যাবে! অকস্মাৎ চোখে পড়ল, একটি বৃদ্ধ দম্পতি স্বামীজীর ঘরে যাবার ভেতরের সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে অপেক্ষা করছেন। মনে হলো তবে আমিও সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে থাকি। আশ্চর্য! মহাপুরুষজীর ঘরের দরজা খুলে গেল! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাঁকে দর্শন করলেন। মহাপুরুষজীর গর্জন শুনলাম: "একটা দিনের জন্যও আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না।" আমি ভাবলাম, গর্জনাংশ বৃদ্ধ দম্পতির ওপর দিয়েই যাক না! ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে মনে মনে বললাম: "শরণাগত। শরণাগত"। মুখ তুলেই অবাক। একি! নাট্যাভিনয় দেখছি অথবা চলচ্চিত্র! অমেয় প্রসন্নতায় মহাপুরুষজী বলে উঠলেন: "কেমন আছিস বাবা?"

এই ঘটনাটি পরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে বলেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "বুঝতে পারলে না! This is the nature of Shiva—কখনো রুদ্র, কখনো আত্মভোলা।" স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন: "তুমি মনে মনে 'শরণাগত! শরণাগত!' উচ্চারণ করছিলে যে।"

পড়াশুনার চাপে, জীবিকা অর্জনের তাগাদায়, সাংসারিক নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মঠে নিয়মিত যাওয়া কিছুটা শিথিল হয়ে উঠেছে। দু-মাস বাদে একদিন গেছি সকালের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি কিন্তু সিঁড়ি শেষ হলো না। পূর্বের বারান্দা থেকে পায়চারি করতে করতে মহাপুরুষজী এসে পড়েছেন একেবারে সামনে। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "মহারাজ, কেমন আছেন?" অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া স্বরে উত্তর দিলেন: "শরীরটায় আর কিছু নেই বাবা। একেবারে ভেঙে গেছে।" একটু যেন দম নিলেন। আবার বলতে লাগলেন: "শরীরটায় আর কিছু নেই বাবা—একেবারে ভেঙে গেছে।" হঠাৎ ডান হাতের তর্জনীটি মাথার ওপর দিয়ে বলে উঠলেন: "কিন্তু মন? মন পূর্ণানন্দে বিরাজ করছে! মন পূর্ণানন্দে বিরাজ করছে!" বারবার কথাগুলি উচ্চারণ করতে করতে তাঁর সমস্ত মুখ ও দেহ এক দিব্য বিভায় আলোকিত হয়ে উঠল! দেবতারও কাম্যদর্শন সেই নিরুত্তাপ উজ্জ্বলতা—সেই অচিন্তনীয়, আত্মাধীশের স্বর্গীয় মুখ ও দেহের দ্যুতি!

মহাপুরুষজীর উপস্থিতিতে মনে হতো শূন্যতা বস্তুটি কল্পনামাত্র। সবকিছু যেন ভরে আছে! পূর্ণতা শুধু একটা concept নয়—পূর্ণতা বিরাজমান।

সাধুসঙ্গের তাৎপর্য কি, তা বুঝতে পুঁথি খোঁজার দরকার নেই। তাঁকে দেখার পর মনের যে অবস্থা—শুধু সেইটুকু উপলব্ধিই যথেষ্ট। ঐ তো পূর্ণতা সামনে!

তাঁর তিরোধানের পর প্রণতি জানিয়েছিলাম একটা কবিতায়। উদ্বোধনে বেরিয়েছিল। শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

ধরার প্রমূর্ত শিব, উদাসীন, স্বেচ্ছা-সহচর
তোমার জীবন লাভ সার্থক হয়েছে তব নাম,
কিঙ্কর করুণ ছন্দে রেখে যাই শিহর-প্রণাম ॥

* লেখক পরবর্তী কালে কলকাতার একটি নামী কলেজে বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাগ্মী, কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

দক্ষিণ কোরিয়াতে বালকের সংখ্যা বালিকার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতি বছরই নবজাতকদের মধ্যে বালিকার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এখনকার শিশুরা যখন বিবাহযোগ্য বয়সে পেঁছাবে, তখন চার লক্ষ যুবক অবিবাহিত থাকবে। এরূপ ঘটনার কারণ, কোরিয়-দম্পতিরা পুত্রসন্তান চান। এবং এই আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র যে, তাঁরা এরজন্য সব কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত। ভেষজ ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের (Herbal doctors) কাছে অনেকে আসছেন, কিভাবে পুত্রসন্তান জন্মে সেই রহস্য জানবার জন্য। যেসব পত্রিকায় 'কি করে পুত্রসন্তান জন্মে', 'পুত্র-সন্তান পাবার নিশ্চিত উপায়'—এই ধরনের প্রবন্ধ বের হয়, সেগুলি প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে। কোরিয়ার সমাজে পুত্রাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে, গর্ভে পুত্র না কন্যাসন্তান আছে, তা জেনে নিয়ে গর্ভস্থ কন্যা-সন্তানকে বিনষ্ট করা হয়। এর জন্যই সাম্প্রতিক কয়েক বছরে, পুত্রসন্তানের জন্ম কন্যাসন্তানের জন্মের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কোরিয়া সরকারের পরিসংখ্যানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মের অনুপাত ছিল ১০০জন কন্যাসন্তানঃ ১১০·২জন পুত্র-সন্তান। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুত্রসন্তান জন্মের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১১৩·৬। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, অনুপাত হলো ১০০ জন কন্যা-সন্তানঃ ১০২·৫জন পুত্রসন্তান। কোরিয়ার টিগু অঞ্চলে যেখানে পিতৃত্বের অধিকারে পুরুষ পরিবারের কর্তা হয় (patriarchal tradition), সেখানে ১০০জন কন্যাপ্রতি ১২৩জন পুত্র এবং চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ১০০জন কন্যা প্রতি ৫৮২জন পুত্র দেখা যায়।

অতীতে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বালক ও বালিকার সংখ্যা মোটামুটি সমান ছিল এবং একজন বালক ও একজন বালিকা একই ডেস্কে পড়াশুনা করত। কিন্তু বর্তমানে ৬০জনের ক্লাসে ১০জন বালক অতিরিক্ত হয়, সেজন্য ডেস্কে একজন বালিকাকে পেলে বালক-ছাত্ররা গর্ববোধ করে।

গত সত্তর দশকের মাঝামাঝি, গর্ভাবস্থায় সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তখন থেকেই স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞদের কাছে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ জানবার জন্য মায়েদের ভিড় হচ্ছে এবং ভ্রূণ কন্যা হলে মায়েরা গর্ভ নষ্ট করতে চাইছেন। কোরিয়ার আইনে কিন্তু মায়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন না হলে গর্ভ নষ্ট করা বারণ; তাছাড়া ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা ব্যাপারটিতে বিপদের ঝুঁকি আছে। কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ 'প্রতি পরিবারে একটি সন্তান'-এর পক্ষপাতী; সেজন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে গর্ভ নষ্ট করা হয়ে থাকে। এখানে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক শতাংশের কম এবং অধিকাংশ দম্পতির সন্তান-সংখ্যা দুইয়ের কম। অনেক দম্পতি একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করেন।* [শোনা যায় যে, ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো গর্ভ নষ্ট করা হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে এই প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হতেও দেখা যায়। হয়তো সেজন্যই যেসব ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষা করা হয়, তারা এই ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয় না। বর্তমান বর্ষটি (১৯৯০) 'আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান বর্ষ' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। অথচ বিংশ শতকের শেষ পাদে পৃথিবী জুড়ে কন্যাসন্তান সম্পর্কে এই মানসিকতা শুধু পরম ক্ষোভেরই নয়, চরম লজ্জারও। —যুগ্ম সম্পাদক]

* **Korean News, Vol. XIX, No. 2, p. 23**

মধুর বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীহরিদাসের সাধনপন্থায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে প্রথমে আসেন তাঁরই এক আত্মীয় বিঠল বিপুল। কেউ বলে তিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই, কেউ বলে ভাইপো। যাই হোক, তিনিই তাঁর প্রথম শিষ্য। সাধনায় তিনিও খুব উচ্চস্তরে উঠেছিলেন। তিনি একদিন হরিদাস স্বামীকে বললেন: "আপনি যে প্রিয়া-প্রিয়তমের সাধনা করছেন, তাঁদের সাক্ষাৎ দর্শন কি সকলের হয় না?" উত্তরে গুরু বললেন: "সময় হলেই হবে।"

এর বেশ কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় হরিদাসজী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন: "আজ শুভদিন, আজ কার জন্মদিন জান?" শিষ্য বললেন, তাঁর জানা নেই। উত্তরে হরিদাসজী বললেন: "আজ তোমারই জন্মদিন। ১৫৭২ সংবৎ (১৫১৫ খ্রীস্টাব্দ)-এর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। আর এই শুভদিনে তোমার প্রার্থিত সেই ইষ্টমূর্তির রূপ যা তুমি দেখতে চেয়েছিলে তা তোমার সামনে আবির্ভূত হবেন। এস এই নিধুবনের নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা তাঁকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ করি।" এই বলে তাঁকে নিয়ে হরিদাসজী নিধুবনের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কুঞ্জের কাছে গিয়ে আসন করলেন। ধীরে ধীরে তানপুরাটি হাতে তুলে নিয়ে ভাবসমুদ্রে ডুবে গেলেন। দরবিগলিত অর্ধনিমীলিত নেত্রে রোমাঞ্চিত কলেবরে সুর মূর্ছনায় ভরিয়ে দিলেন চতুর্দিক। স্বরের আরোহ অবরোহের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দু-একজন মাত্র ভক্ত শ্রোতা ও বিঠল বিপুলজী আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন। সমগ্র নিধুবন কি এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। নিস্তব্ধ নিথর বিশ্বচরাচরে যেন ঐ সুরের তরঙ্গই শুধু খেলে যেতে লাগল। আর সেই সুরসমুদ্র মথিত করে লতামণ্ডপের একপাশে প্রকাশিত হলেন এক জ্যোতির্ময় বিগ্রহ পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। কালো মেঘের কোলে জ্যোতির্ময়ী সৌদামিনীর মতো কৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীমতী রাধারানীর যুগল বিগ্রহ সেখানে আবির্ভূত হলো। হরিদাসজী ভাববিহ্বল পুলকিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন: "ভাইরো সহজ জোরী প্রকট ভই, / গৌর শ্যাম ঘন দামিনী যৈসে, / অঙ্গকি অঙ্গ উজরাই সুধরাই চতুরাই ঐসে; / শ্রীহরিদাসকে স্বামী, শ্যাম কুঞ্জবিহারী সম বৈসে বৈসে।" গান শুনে শ্রীবিগ্রহের মুখে হাসি ফুটে উঠল। গীত শেষ হলে প্রিয়াজী বললেন: "ললিতে, কি চাও?" হরিদাসজী বললেন: "কিশোরীজী আমায় ভুলে গেছ। এইটাই তোমার স্বরূপ। শ্যামসুধা পেলে কি আর আমাদের কথা মনে থাকে?" অভিমান-ক্ষুব্ধ সখীর দিকে তাকিয়ে বিহারীজী বললেন: "ললিতে, তোমার ইচ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে। এখন এই যুগলরূপেই তাহলে আমরা এখানে থাকব?" বৈরাগী হরিদাসের মনে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিন্তার উদয় হলো। তিনি করজোড়ে বললেন: "ওগো আমার প্রাণসখা, এ যুগলরূপ তো নিকুঞ্জবিহারী বিগ্রহ। নিকুঞ্জের বাইরে এই রূপের সেবা আমি কি করে করব? আমার প্রার্থনা তোমরা দুজনে এক হয়ে যাও, আর চিরকাল এখানে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় বিরাজ কর, যাতে জগতের মানুষ তোমাদের এই অভিন্ন মূর্তি দর্শন করে চরিতার্থ হয়।"—তাই হলো। জ্যোতির্ময় সেই চেতন বিগ্রহের পরিবর্তে সেইস্থানের মাটির ভিতর থেকে তার পরেই পাওয়া গেল বর্তমান

বাঁকেবিহারীজীর শ্রীবিগ্রহ। "বড়ে বাঁকে হি কুঞ্জ-বিহারী।" ত্রিভঙ্গ মুরারি, বঙ্কিম বিগ্রহের সবই বাঁকা। চাউনি বাঁকা—বামে রাধা অঙ্গ দরশন পিপাসায়। অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। মূর্তির অভিষেক হয়ে গেল। সাধ্যমতো ভোগরাগের পর সেই প্রসাদ তিনি বিলিয়ে দিলেন ময়ূর মর্কটদের মধ্যে। সেই বিশেষ দিনটির স্মরণে আজও এখানে উৎসব হয়। এ তিথিকে এঁরা বলেন "বিহারপঞ্চমী"। এই বিগ্রহের অন্য নাম ইচ্ছাবিগ্রহ। "নিত্য কিশোর নিরন্তর বিহরত / সেবত শ্রীহরিদাস দুলারী।" নিজের প্রাণপ্রিয়াকে হৃদয়ে ধারণ করে বিহারীজী এখানে নিত্য বিহার করেন।

ভাবের সাধক হরিদাসজী বেশি সময়েই ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। ভাবনেত্রে তাঁর আরাধ্যদেবতার নিত্যলীলা দর্শনানন্দে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন দিনরাতের বেশি সময়। একবার সকালে দাঁতন করতে করতে যমুনায় গিয়েছেন। সঙ্গে একটা কলসীও নিয়েছেন। একেবারে স্নান সেরে যমুনার জল নিয়ে আসবেন। ঐ জলে বিহারীজীর পূজো-স্নানাদি হবে। কিন্তু যমুনায় নেমে হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হলো। স্থির হয়ে গেল দাঁতমাজা, এক-দৃষ্টে কি দেখছেন—আর আনন্দ উপচে পড়ছে তাঁর চোখে-মুখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, সময়ের হুঁশ নেই। ওদিকে নিধুবনে বিহারীজীর মন্দিরে হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। হরিদাস স্বামী অভিষেকের জল নিয়ে এখনও এলেন না—কি ব্যাপার! খুঁজতে খুঁজতে অন্যান্য সেবকেরা যমুনার তীরে গিয়ে সেই ভাববিভোর মূর্তি দেখে হতভম্ব। বহুজনের কণ্ঠস্বরে হরিদাসজীর ভাবভঙ্গ হলো। বিস্মিত সাধক দুঃখিত হন বিহারীজীর পূজায় বিলম্বের কারণ হয়েছেন জেনে। কিন্তু আরও কষ্ট পান চিরকিশোর বিহারীজীর সেদিনের যমুনা-কেলির দৃশ্য দর্শনে বাধা পাওয়ার জন্য। স্থান-কাল সব ভুলে তিনি সেদিন দিব্যলীলা দর্শন করেছিলেন যমুনা-সলিলে। এইভাবে নিরন্তর ভাবরাজ্যে বিরাজ করার ফলে দেববিগ্রহের সেবার ত্রুটি হচ্ছে ভেবে তিনি নিজেই সেবার ভার তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য বিঠল বিপুলজীর হাতে। বিহারীজী প্রথমে এই নিধুবনের নিকুঞ্জ মহলেই ছিলেন। সেখানেই তাঁর সেবা হতো। পরে বাইরে এনে বাইরের ঐ চত্বরে ভক্তদের তৈরি করে দেওয়া লাল-পাথরের মন্দিরে তাঁর পূজাদি হতে লাগল। ক্রমে বিঠল বিপুলজীও ভাবের তোড়ে বিধিনিয়মের পাড়ে চলে যেতে লাগলেন। তখন দেববিগ্রহের সেবায় এলেন হরিদাস স্বামীর পূর্বাশ্রমের ছোটভাই জগন্নাথ গোস্বামীজী। তিনি সংসারী ভক্ত ছিলেন। বর্তমানে বিহারীজীর সেবকেরা জগন্নাথ গোস্বামীজীর বংশধর। হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতসুধায় আকৃষ্ট ভক্তদের মধ্যে আকবরের সভার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের নাম শোনা যায়। প্রবাদ আছে, হরিদাস স্বামীর জীবনের শেষদিকে তানসেন তাঁর গুরুর কাছে দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরকে নিয়ে আসেন। প্রথমে হরিদাস স্বামী সম্রাটকে গান শোনাতে অস্বীকার করেন। কারণ তাঁর গান মানুষকে সুখী করার জন্য নয়। ভগবানের প্রীতির জন্য তিনি ভজন গান করেন। পরে আড়াল থেকে আকবর তাঁর ভজন শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। সেই সময়েই আকবর এইসব জীর্ণ বস্ত্রধারী বিষয়-বিরাগী সাধুদের দিব্যজীবন ও বিষয়ে অদ্ভুত অনাসক্তি দেখে বৃন্দাবনের নাম রেখে যান ফকিরাবাদ; আর এক ফরমানে এখানে সম্পূর্ণ-ভাবে জীব-হিংসা রোধ করার নির্দেশও জারি করে যান। শ্রীমতী মীরাবাঈ বৃন্দাবনে যখন আসেন তখন তিনিও বিহারীজীর চরণে সঙ্গীতে প্রণাম জানান:

> হমারি প্রণাম শ্রীবাঁকেবিহারীজীকো
> মোর মুকুট সাথে পৈ বিরাজৈ,
> কুণ্ডল অলকা কানো কো।
> অধর মধুর পর বংশী বজায়ে
> রোই রোষাবে রাধা প্যারে কো॥
> ওহ ছবি দেখি মগনভই মীরা
> মোহন গিরিধর নাগর কো॥

প্রণাম জানিয়ে গেছেন আরও কত ভক্ত-সাধকের দল। এদিকে হরিদাস স্বামী ক্রমশঃ অন্তররাজ্যে ডুবে যেতে লাগলেন। এই নিধুবনে প্রায় সত্তর বছর বিহারীজীর সেবা করে সাধকচূড়ামণি

হরিদাস স্বামী সম্ভবতঃ ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে পঁচানব্বই বছর বয়সে 'কুঞ্জ-প্রবেশ' করলেন। চির কিশোর চির কিশোরীর নিত্যলীলায় তাঁদের সখী নিত্য-প্রবিষ্ট হলেন।

এতক্ষণ বসে বসেই রাধিকাদাস বাবাজীর কাছে হরিদাস স্বামীর এইসব কথা শুনছিলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন রাধিকাদাসজী—দুহাত ওপর দিকে তুলে গেয়ে উঠলেন :

সুখ বৃন্দাবনে বহে প্রেমলহরী—
দিবসে রাখাল চরান গোপাল,
নিশি আগমনে ব্রজগোপীসনে—
প্রেমের মিলনে লীলা নিধুবনে—
লয়ে রাধা বামে মহারাসেশ্বরী ॥

"বুঝলেন ভাই, বড় পবিত্র এ-স্থান, এখানকার প্রতি ধূলিকণা কত অতীত ইতিহাসের সাক্ষী, কত ভক্ত সাধক কত তপস্বী কত হাজার হাজার বছর ধরে এখানে এসে এই একটি চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে থেকেছেন—এই স্থান তাঁদের নিত্যলীলার স্থান —সেই সব সাধু-ভক্তের ভাবচিন্তা জমাট বেঁধে এ স্থানকে আরও পবিত্র করেছে। একটু স্থির হয়ে বসতে পারলে সেই চিন্তাতরঙ্গ আপনাকেও ছুঁয়ে যাবে। ঐ যে সামনে দেখছেন মাঝের ঘরটি, ওখানে একটি কুঠিয়ায় হরিদাস স্বামী থাকতেন, এখনও তাঁর তপঃশীর্ণ বিগ্রহের একটি পট সেখানে দেখা যাচ্ছে, হাতে তানপুরা তন্ময় দৃষ্টি। একদিকে ময়ূর, অন্যদিকে গাছে টিয়াপাখি আর বাঁদর। সেসময় এরাই ছিল হরিদাস স্বামীর নিত্যসহচর। মানুষ কদাচিৎ আসত। এখনও বিহারপঞ্চমীতে তাঁর চিত্রকে সখীবেশে সাজিয়ে চতুর্দোলায় চাপিয়ে মধ্যাহ্নে নিধুবন থেকে বর্তমান বিহারীজীর মন্দিরে আনা হয়। ঐ দিন বিঠল বিপুলজীর জন্মোৎসবও হয়। আর যেখানে বিহারীজী প্রকট হয়েছিলেন সেখানে বসে বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন। ভারতবর্ষের বড় বড় গাইয়েরা আসেন হরিদাস স্বামীর স্মরণে তাঁদের সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন করতে। হরিদাস স্বামীর সমাধির দুইপাশে আরও দুটি ঘর আছে—বিঠল বিপুলজী ও জগন্নাথ গোস্বামীজীর সমাধি।" কথা শেষ করে আবার গাইতে গাইতে বাবাজী এগিয়ে চললেন নিধুবনের সেই প্রাকট্য স্থানদর্শন করাতে।

কণ্ঠে আবার সুরের পসরা—"সুন্দর লালা নন্দ দুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবনমে।" গাইতে গাইতে এবারে বাবাজী সত্যি সত্যিই হেলেদুলে নাচতে নাচতে এসে হাজির হলেন নিধুবনের একবারে উত্তর-পূর্ব কোণে। এখানে কিছুটা জায়গা একটু পরিষ্কার। তারই মাঝে একটি লাল সিমেন্টের ছোট বেদি। একটু হেলান দেওয়ার মতো পেছন দিকে দেওয়াল তোলা। এখানে এসে একেবারে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন বাবাজী আর গাইতে লাগলেন :

রাধাকৃষ্ণ একতনু হোয়
নিধুবনমে যো রঙ্গ মচাই,
বিশ্বরূপ যো ভগবান
সো হি লীলা করত বৃন্দাবনমে।

এই সেই স্থান। ভক্তের সুরের আর্তিতে আকুল হয়ে এখানেই ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন শরীর ধারণ করে। এই হলো শ্রীবিহারীজীর প্রাকট্য ভূমি। "বাঁকে বিহারী জয় হো তিহারী" বলে ধূলিশয্যা থেকে উঠে বসে গম্ভীর হয়ে গেলেন বাবাজী। আমরাও প্রণাম করে উঠতেই বাবাজী দেখালেন একটু উত্তরে আর একটি ছোট পাকা ঘর। "এর নাম 'রঙ্গ মহল'। যেখানে ছোট খাট-বিছানা আছে, রাসলীলায় পরিশ্রমের পর শ্রীকিশোর-কিশোরী এখানে বিশ্রাম করেন। তাঁদের শৃঙ্গারের সব মালা আভরণাদি দিয়ে এই শয্যা সন্ধ্যায় সাজিয়ে দিয়ে সেবকেরা চলে আসেন। পরদিন সকালে দেখা যায় সব এলোমেলো হয়ে আছে। আজও এখানে নিত্য লীলা চলে। বিশ্বাসী মন বিশ্বাস করে আনন্দ পায়, সংশয়ী মন মিথ্যা ভেবে উড়িয়ে দেয়। লাভ কার কতটা সেটা আপনারাই বিচার করুন। এর পর নিয়ে যাবো সেইখানে যেখানে মুসলমান আমলের পরে বিহারীজীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বর্তমানের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমান মন্দির প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো। তবে এখনকার মন্দিরের যে আকৃতি সেটি ১২৫ বছরের মতো হবে। গোস্বামী বংশের ভক্তদের দানে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। আজ আর সময় হবে না, কাল আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে। কাল অক্ষয়-তৃতীয়া বড় শুভ দিন। ঐ দিনই আপনাদের দর্শন হবে বিহারীজীর শ্রীচরণ।" [ক্রমশঃ]

"দুজনেই মার সখী"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন করেছিলেন গিরিশ। ঠাকুর সেদিন বলরাম মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ভাবাবেশে রয়েছেন। তারিখটা হলো ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। গিরিশ, শ্রীম ও অন্যান্য ভক্তরা রয়েছেন। কথা বলতে বলতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। দেশ কাল বোধ চলে যাচ্ছে। অতি কষ্টে ভাবসম্বরণ করার চেষ্টা করছেন। ভাবে বলছেন ঃ "এখনও তোমাদের দেখছি, কিন্তু বোধ হচ্ছে, যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ—কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নেই।"

কোনও রকমে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বলছেন ঃ "জল খাব।" সমাধিভঙ্গের পর মন নামাবার জন্যে ঠাকুর এই কথা প্রায় বলে থাকেন। গিরিশ নতুন আসছেন। এইসব দেখেননি, জানেন না, তাই জলের সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। ঠাকুর বারণ করছেন, আর বলছেন ঃ "না বাপু, এখন খেতে পারব না।"

প্রকৃতিস্থ ঠাকুর তখন নিজের মহাভাবের অলৌকিক অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন। শেষে বলছেন ঃ "আমার অবস্থা নজিরের জন্যে। তোমরা সংসার কর অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে, তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।"

গিরিশ তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন ঃ "আপনারও তো বিয়ে আছে?" সঙ্গত প্রশ্ন। ঠাকুরের বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল। কামিনী আর কাঞ্চন দুটির প্রতিই ঠাকুরের অসীম বিতৃষ্ণা। হাতে টাকা পড়লে আঙুল বেঁকে যায়। ঠাকুরের বর্ণনা ঃ "সিঁথির মহিন্দর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন দিয়েছে?' রামলাল বললে, 'এখানের জন্যে দিয়েছে।' তখন মনে উঠতে লাগল যে, দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লি আঁচড়াতে লাগল। তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, 'কাকে, দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?' রামলাল বললে, 'না আপনার জন্য দিয়েছে।' তখন বললাম, 'না, এক্ষুণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না'।"

কাঞ্চনে যাঁর আসক্তি নেই শুধু নয়, মুদ্রা স্পর্শ মাত্রে যাঁর হাত বেঁকে যায়, অন্যের কাছে তাঁর সেবায় দেওয়া অর্থ মাঝরাতে বেড়ালের মতো আঁচড়ায়, সেই ঠাকুর আমার সংসারী! সংসারীর জন্য তাঁর করুণা ঝরে পড়ত। তিনি আক্ষেপ করতেন ঃ "বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে।" ঠাকুর বলতেন ঃ "আমার সন্তানভাব।" নারী তাঁর চোখে জননী। তাহলে কেন বিবাহ করলেন?—গিরিশের অতি সঙ্গত সাহসী প্রশ্ন।

সেই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন ঃ "সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়, সামলাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল।"

ঠাকুরের কথায় সকলেই হাসলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "কামিনী-কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।"

বিবাহ করবে সংসারীও হবে ; কিন্তু থাকবে কি ভাবে? সেই শিক্ষাটুকুও তো দিতে হবে গুরুর গুরু জগদ্‌গুরু, অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে। শুধু মুখের উপদেশ নয়—আপনি আচরি ধর্ম। শ্রীশ্রীমা একদিন মৃদু প্রশ্ন করেছিলেন। বিবাহের অনেক বছর পরে। মা তখন যুবতী, প্রশ্নটা সরাসরি—"আমি তোমার কে?" ঠাকুর তখন মহাভাবে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"আনন্দময়ী।"

মা আনন্দময়ী। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন: "পায়ে হাত বুলায়ে দেয়, তারপর আমি আবার নমস্কার করি।"

এই ভাব সাধারণ সংসারীরও হতে পারে, যদি তাঁরা ঠাকুরের ভাবটি ধারণ করেন। সহধর্মিণী সেবাদাসী নয়, ভোগ্যা নয়, তিনি আনন্দময়ী। মাতৃস্বরূপা। শক্তিরূপিণী। বিদ্যার সংসারে এই ভাবই খেলে। বিদ্যার সংসার হয় কিভাবে? ঠাকুর বলছেন: "ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে, ঘরে ঘটিবাটিও আছে, হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে, এদের জন্যেও ভাবি।"

অবতারপুরুষের সংসারচিত্রটি বড় মধুর। ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ কি চব্বিশ। শ্রীশ্রীমা তখন ছ-বছরের বালিকা। বিবাহ হলো। কেন বিবাহ! ঠাকুর বলছেন: "সকলে বললে, পাগল হলো, তাই তো এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা, প্রথম চিন্তা হলো, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে।"

তিনি জগজ্জননী হবেন। ঠাকুর তাঁকে সেবা শেখাবেন, জ্ঞান দেবেন, তাঁর ভাবাদর্শ ধারণের শক্তি দেবেন। সন্তান নয়, ঠাকুরকে ধারণের জন্যে তিনি জননী হবেন। রামকৃষ্ণ-দীপাধারে তিনি হবেন তৈল, শিখা নরেন্দ্রনাথ।

মায়ের স্থান হলো নহবতে। একটি, দুটি সন্তান তো নয়, আবিশ্ব ভক্তমন্ডলীর জননী তিনি। মা নহবতে থাকতেন, অনেক সময় জানাই যেত না, তিনি আছেন। নীরব সেবিকা। বোঝা যেত তখনই যখন নহবত থেকে ভক্তদের জন্যে আসত রুটি, ছোলার ডাল। নহবত থেকে মাঝে মাঝে আসতেন ঠাকুরের কাছে, তাঁর সেবায়। ঠাকুর বলেইছেন, আমার সন্তান ভাব। আবার সর্বদাই ভাবে বিভোর। কে দেখবে তাঁকে! তিনি মায়ের ওপর কতটা নির্ভর করতেন, বোঝা যায় তাঁর এই উক্তিতে: "উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কত দিন! সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম! জড় হলুম! দেখলুম মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়। রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম!" আশ্চর্য নয়! অমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঠাকুর কাকে ডাকতে চাইছেন! শ্রীশ্রীমাকে!

আমার আত্মভোলা, জগৎভোলা ঠাকুরের সুমিষ্ট একটা দাম্পত্যজীবনও ছিল। তার চিত্র ধরা আছে এই কথায়—"আমি একজায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে। আর যাওয়া হলো না।" পরেই ঠাকুর মন্তব্য জুড়ছেন: "উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাতেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কিরকম বশ!"

রামকৃষ্ণ-সেবিকা মা সারদা। একটি কথায় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরিষ্কার। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন—প্রসঙ্গটা ছিল ইন্দ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয়—"তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন করে? দুজনেই মার সখী।" আর তো কিছু ভাবা যায় না! এ-লীলা কেমন লীলা!

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

হীরের আদর এত বেশি কেন

এ. আর. ভার্মা

ডঃ সি. ভি. রমন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "হীরক একটি আশ্চর্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এর গঠন-প্রণালী সরল হওয়ায় মৌলিক স্ফটিক-পদার্থবিদ্যা (crystal physics) অধ্যয়নে হীরক একটি সম্ভাবনাময় দ্রব্য।" সত্যই হীরের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পদার্থ প্রকৃতিতে আর নেই। হীরের কতকগুলি গুণ হলো ঃ

(১) এটি সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তু। হীরে ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে এর ওপর আঁচড় কাটাও যায় না।

(২) এর ওপর কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালানো খুবই কঠিন। সাধারণ উত্তাপে, এমনকি হাইড্রোফ্লুয়োরিক অ্যাসিড, অ্যাকোয়া রিজিয়া প্রভৃতিও এর কিছু ক্ষতি করতে পারে না। এই জন্য হীরের জ্যোতি বহু বছরেও অপরিবর্তিত থাকে। এই জন্য একটা কথা চালু আছে—"হীরে চিরকালের জন্য"। অন্যান্য মণি জহরত ব্যবহারে কিছুটা ক্ষয় হয়।

(৩) হীরে ধাতু নয় এবং (ক) হীরে অতি উচ্চ ধরনের বিদ্যুৎ-অপরিবাহী (electrical insulator); (খ) কিন্তু এর সর্বোচ্চ তাপ পরিবহন ক্ষমতা (thermal conductivity) আছে—সাধারণ উত্তাপে তামার চেয়ে এই ক্ষমতা পাঁচগুণ। এই দুই (ক ও খ) গুণের সমন্বয় আর কোন প্রকৃতিজাত দ্রব্যে নেই।

(৪) প্রকৃতিজাত স্ফটিকদের মধ্যে হীরের প্রতিসরণ হার (refractive index বা μ) খুব উচ্চ, প্রায় ২.৫; সাধারণ কাঁচের এই হার ১.৫। এরই জন্য রত্ন হিসাবে হীরের উজ্জ্বলতা এত বেশি।

ঐতিহাসিক পরিচয়

সুদূর অতীতকাল থেকে হীরে বহুমূল্য রত্ন হিসাবে পরিগণিত। কিন্তু না কাটলে ও পালিশ না করলে, হীরেকে একটি চকচকে পাথর বলে মনে হয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবশ্য হীরে 'পাথর' নামেই অভিহিত। খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে ভারতে হীরের ব্যবসা বেশ জমজমাট ছিল। তা থেকে ধরে নিতে পারা যায় যে, সেসময়ে ভারতীয়রা হীরে কাটা এবং পালিশ করা জানতেন। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশে হীরে পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকশ বছর আগে। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রেজিল থেকে নুড়ির আকারে হীরে আনা হয়েছিল লিসবনে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুল পরিমাণে হীরে আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রকৃতপক্ষে হীরের খনি বলা যেতে পারে, কারণ, ভারতে ও ব্রেজিলের নদীগর্ভে বা নদীর ধারে যে হীরে পাওয়া যেত তাকে পলিজ (alluvial) হীরে বলা যেতে পারে। ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত হীরের নাম করা যেতে পারে ঃ (১) কোহিনুর (অর্থ—জ্যোতির পাহাড়); ওজন ১০৮.৮ ক্যারাট (এক ক্যারাট=২৫০ মিলিগ্রাম বা ⅕ গ্রাম)। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে এটি ব্রিটিশ মুকুটের অংশ হয়ে আছে। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক ট্যাভের্নিয়ের ভারতবর্ষ থেকে যে-হীরেটি নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইকে উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম 'নীল ট্যাভের্নিয়ের'। এটি চুরি যায় ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে; তারপর ছোট আকারে পরিবর্তিত হয়ে ব্যাঙ্ক মালিক হোপের নামে এর নাম হয় 'হোপ হীরক'। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্নর একটি হীরে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের রিজেন্টকে উপহার দিয়েছিলেন, যার নাম 'রিজেন্ট হীরক'।

হীরে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ঃ বাঁ হাতে হীরে পরলে পৌরুষ বৃদ্ধি পায়; হীরে অশুভ গ্রহের প্রভাব নষ্ট করে; বিভিন্ন রঙের হীরে বিভিন্ন অসুখ সারায় ইত্যাদি। এসবের তেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চলচ্চিত্রে অনেক সময় দেখানো হয় যে, কোন নবাব বা রাজা হীরে চুষে আত্মহত্যা করছে। এটা ঠিক নয়, কারণ, হীরে কেউ খাদ খেয়েও ফেলে তা অপরিবর্তিতভাবে মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। আন্ত্রিক পাচকরস হীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

রাসায়নিক গঠন

এখন এটা স্বীকৃত যে, হীরে কার্বন মৌল (element carbon) দিয়ে গঠিত। এমনকি এও বলা যেতে পারে যে, হীরে কার্বনেরই স্ফটিকীকৃত (crystallised) রূপ। উৎকৃষ্ট হীরের শতকরা একশ ভাগই কার্বন। ভাল হীরেতে থাকে ৯৯.৫ শতাংশ কার্বন, ০.৫ শতাংশ অন্যান্য দ্রব্য, প্রধানতঃ নাইট্রোজেন।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে, স্ফটিকের অভ্যন্তরে কার্বন অ্যাটমগুলির (অর্থাৎ মৌল কার্বনের) বিন্যাসের তফাতের জন্য এই রকম হয়েছে। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে রঞ্জেন (Rontgen)-এর এক্সরে আবিষ্কারের আগে পরমাণুর বিন্যাস অধ্যয়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক হীরে ও গ্রাফাইটের মধ্যে পরমাণুর বিন্যাসের তফাৎ দেখিয়েছেন।

কাঠিন্য

একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক মস বস্তুসমূহের কাঠিন্যের মাত্রা (gradation) নির্ধারিত করেছেন এক বস্তু অন্য বস্তুর ওপর আঁচড় কাটার ক্ষমতা দেখে। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তুকে ১০ নম্বর দিয়েছেন। এইভাবে হীরে পেয়েছে ১০, রুবি ৯, টোপাজ ৮, কোয়ার্জ ৭। সবচেয়ে শক্ত বলে, ধুলো বালি বা কোন পরিষ্কারক দ্রব্যের দ্বারা ঘষলেও হীরে কোন কালে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে না। হীরে দিয়েই হীরেকে পালিশ করা হয়। হীরক-কলম দিয়ে কাঁচ কাটা হয়। হীরক-করাত দিয়ে শক্ত পাথর কাটা হয়। সমস্ত আধুনিক কারখানায়, যেখানে প্রস্তুত সামগ্রীতে যথার্থতা (precision) রক্ষিত হয়, সেখানে হীরক-যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বা ঘষবার জন্যে হীরে ব্যবহৃত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১০ কোটি ক্যারাট (প্রায় ২০ টন) শিল্প সংক্রান্ত হীরে এক বছরে ব্যবহৃত হয়।

মানুষের তৈরি হীরে

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার জেনারেল ইলেক্ট্রিক প্রথম হীরে তৈরি করে। দেখা গেছে যে, গ্রাফাইটকে হীরেতে পরিবর্তিত করতে হলে খুব উচ্চশক্তির চাপ (বায়ুমণ্ডলের চাপের ৬০,০০০ গুণ) এবং উচ্চশক্তির তাপ (প্রায় ২০০০ k)-এর দরকার। তাছাড়া একটি ক্যাটালিস্ট (অনুঘটক) বা নিকেলের মতো কোন দ্রাবকের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে নয়া দিল্লীর ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রথম হীরে তৈরি করেছে। কৃত্রিম হীরে কলকারখানায় কাজে লাগছে। এক ক্যারাট রত্নস্তরের হীরেও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তার দাম প্রচুর। ধরা হয়েছে যে, ২০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার গভীরে উচ্চ তাপ ও চাপে হীরে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর গতির জন্য ধীরে ধীরে তা উপরিভাগে চলে এসেছে।

রত্ন হিসাবে হীরক

হীরেকে কেটে এমন আকারে তৈরি করা হয় যে, আলো তার ওপর পড়ে ৮০ শতাংশ যেন ঠিকরে আসে। বর্তমানে, ভালভাবে কাটা হীরের ৮০টি পৃষ্ঠা থাকে। এর ফলে আলো এলোমেলোভাবে প্রতিফলিত হয়। সাদা আলোর বিকিরণের (dispersion) ফলে নানাদিকে নানা রঙের আলো প্রতিফলিত হয়; একে বলা হয় 'আগুনের ঝলক' এবং এর জন্য হীরের আরও আকর্ষণ।

নকল হীরে

সম্প্রতি ল্যাবরেটরিতে কতকগুলি দ্রব্যের সংশ্লেষণ (synthesis) করা হয়েছে যার ফলে ঐ সব দ্রব্য হীরেকে কিছুটা নকল করে। দ্রব্যগুলি হলো—

(১) ইট্রিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-গারনেট (YAG)—কাঠিন্য ৮, μ=১.৮০

(২) স্ট্রনসিয়াম-টিটানেট —কাঠিন্য ৫, μ= প্রায় হীরের সমান।

(৩) গ্যাডোলিনিয়াম-গ্যালিয়াম-গারনেট (GGG) —কাঠিন্য ৬½, μ=২, কিন্তু ঘনত্ব জলের ৭ গুণ।

(৪) কিউবিক জিরকোনিয়া—কাঠিন্য ৮, μ= ২.১৮, ঘনত্ব জলের দু গুণের বেশি।

বলা বাহুল্য, এইসব দ্রব্যের ঘনত্ব, প্রতিসরণ হার এবং কাঠিন্য পরীক্ষা করলে তাদের চিনতে পারা যায়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, হীরে একটি অদ্বিতীয় সামগ্রী। স্যার চার্লস ফ্রাঙ্ক বলেছেন, "হীরে হচ্ছে পৃথিবীর গভীর তলের চিঠি, যে-গভীরে আমরা কোনদিন যেতে পারব না; সেজন্য এ-চিঠি পড়া দরকার।" যেসব বিজ্ঞানী হীরে নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা হলেন—নিউটন, ব্র্যাগ এবং ব্র্যাগ, ল্যাভয়সিয়ের, আইনস্টাইন এবং রমন। কিন্তু হীরে সম্বন্ধে অনেকগুলি গবেষণালব্ধ তথ্য এখনো অবোধগম্য হয়ে আছে।*

* I N S A News, March-April 1990, Indian National Science Academy, New Delhi: pp. 9-13

ভাষান্তর: জলধিকুমার সরকার

ভোগতৃষ্ণাই দুঃখের

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার

মহারাজ যযাতি গিয়েছেন মৃগয়ায়। তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি জলাশয়ের খোঁজ করছেন। এমন সময় নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকারে চমকিত হয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আর্তনাদ লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলেন অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল এক কন্যা জীর্ণ ও জঞ্জালপূর্ণ কূপের মধ্যে থেকে আর্তনাদ করছেন। মহারাজ যযাতিকে দেখেই তিনি তাঁর কোমল ও রক্তাভ করতলদ্বয় আন্দোলিত করে কূপ থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানালেন। তাঁকে উদ্ধার করে যযাতি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। তীব্র মনোবেদনায় সহানুভূতি পেলে দুঃখ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যুবতী করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে করতে জানালেন, তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। তাঁরই সখী দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ক্রোধে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছে। এখন তিনি তাঁর উদ্বিগ্ন পিতার কাছে ফিরতে পারলেই তৃপ্ত হবেন। যযাতি তাঁকে শুক্রাচার্যের কাছে পেঁছে দিলেন।

আদরের দুহিতার এহেন দুর্গতির কথা শুনে শুক্রাচার্য বড়ই ব্যথিত হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বৎসে! সাপ যেমন অনাদরে তার খোলস পরিত্যাগ করে দেয়, তুমিও তেমনি শর্মিষ্ঠার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করে শান্ত হও। ক্ষমাগুণদ্বারা যে ক্রোধ ত্যাগ করতে পারে সে-ই প্রকৃত মানুষ।' তারপর শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে তাঁর উপকারের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

যযাতি প্রাসাদে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেলেন পরমাসুন্দরী দেবযানীর অপরূপ দেহলাবণ্যের মোহময় স্মৃতি। ক্ষণকাল ঐ সুন্দরীর সান্নিধ্যে তিনি তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

দেবযানী কিন্তু শুক্রাচার্যের কথায় শান্ত হলেন না। শর্মিষ্ঠার প্রতি অভিমানবশতঃ তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। পিতাকে তিনি জানালেন শর্মিষ্ঠার অপরাধ অমার্জনীয়। তবে শর্মিষ্ঠা যদি তাঁর দাসী হন তবেই তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন। শুক্রাচার্য আর কি করেন, প্রিয় কন্যার কথা রক্ষার জন্য দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কাছে যেতে বাধ্য হলেন। দৈত্যগুরুর আগমনে বৃষপর্বা পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে অভ্যর্থনাদি করে জানতে চাইলেন তাঁর আগমনোদ্দেশ্য। সব শুনে তিনি শর্মিষ্ঠার গর্হিত আচরণের কথায় দুঃখ পেলেন খুবই। শুক্রাচার্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার ওপর দৈত্যদের গুরু। তাঁর কন্যার প্রাণনাশের চেষ্টা কি কম অপরাধ? কিন্তু তাই বলে শর্মিষ্ঠা রাজকন্যা হয়ে দেবযানীর দাসী হবেন? এনিয়ে অনেক ভাবলেও মুখে তিনি কিছুই বললেন না। কারণ, শুক্রাচার্যের ভয়ংকর ক্রোধ আর তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই বাধ্য হয়েই বৃষপর্বা মেনে নিলেন শুক্রাচার্যের কঠিন শর্ত। কন্যা শর্মিষ্ঠাকে আদেশ করলেন দেবযানীর অন্যতমা দাসী হয়ে শুক্রাচর্যের গৃহে যেতে। শর্মিষ্ঠাও চলে এলেন দেবযানীর কাছে পিতৃবাক্য পালন করতে।

এদিকে মহারাজ যযাতি হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন শুক্রাচার্যের কাছে। প্রার্থনা জানালেন, দেবযানীকে তিনি রানী করতে চান। যযাতির সুমহান চরিত্র শুক্রাচার্য ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি রাজি হলেন নির্দ্বিধায়। কিন্তু যযাতিকে জানালেন তাঁর এক শর্ত। দেবযানীর দাসী শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়ে বললেন, এই সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা, দেবযানীর সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করবেন। একে আপনি সসম্মানে পালন করবেন, কিন্তু কখনই এর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন না। যযাতি মেনে নিলেন সেই শর্ত। যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হয়ে গেল।

এখন অঢেল রাজৈশ্বর্যের অধিকারী মহারানী দেবযানী। আর তাঁরই প্রাসাদে হতভাগ্য রাজকন্যা

শর্মিষ্ঠা রইলেন তাঁর অন্যতমা দাসী হয়ে। অবহেলিতা, অপমানিতা শর্মিষ্ঠার হৃদয়ে কেবল অনুতাপ আর অনুতাপ। নিয়তির বিধানে কি না হতে পারে! আজ তিনি অসহায়, তাঁর কথা শুনতে আজ কেউই প্রস্তুত নয়।

শর্মিষ্ঠার অসহনীয় মনোবেদনার কথা জানতে পারলেন যযাতি। শর্মিষ্ঠার অপমানবোধ তাঁর হৃদয়ে আঘাত করল। দেবযানীকে গোপন করে তাই একদিন শর্মিষ্ঠাকে তিনি গান্ধর্ব মতে বিবাহ করলেন। যথাসময়ে দেবযানী যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্রের জননী হলেন। শর্মিষ্ঠার গর্ভে ও দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্রের জন্ম হলো। কথায় বলে, সত্য কখনও গোপন থাকে না, একদিন না একদিন তা প্রকাশিত হবেই। যযাতি ও শর্মিষ্ঠাকে একদিন দেবযানীর কাছে স্বীকার করতে হলো আসল তথ্য।

শান্তিতে শয়ান বাঘিনীকে সহসা আঘাত করলে সে যেমন ভীষণ হয়ে ওঠে, দেবযানীও তেমনি একথা শোনামাত্র ক্রুদ্ধ হয়ে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। আরক্ত নয়নে তিনি পিতাকে বললেন, 'মহারাজ যযাতি আপনার শর্ত উপেক্ষা করে আমার দাসী শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করেছেন; তাঁর সন্তানেরাও রাজৈশ্বর্য ভোগ করছে মহানন্দে। আপনার মতো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা উপেক্ষা করার স্পর্ধা কি আপনাকে এবং আমাকে অপমান করারই নামান্তর নয়? আপনি অবিলম্বে এর প্রতিবিধানে তৎপর হোন।'

বিষধর সর্পের পুচ্ছে আঘাত করলে সে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারীর প্রতিশোধস্পৃহায় তৎপর হয়ে ওঠে। শুক্রাচার্যের আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তখনই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতির কাছে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন, 'ধর্মজ্ঞ হয়েও অধর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য অবিলম্বে জরা তোমাকে আক্রমণ করবে।' যযাতি বোঝালেন, বিবেকের দংশনেই তিনি এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। শুক্রাচার্য সে-কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেলেন।

অল্পকাল মধ্যেই শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতির সুঠাম, সুন্দর তনু হলো ক্ষীণকায়, দুর্বল ও হতশ্রী। দেহের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠল বার্ধক্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। যুবক যযাতি পরিণত হলেন লোলচর্ম বৃদ্ধে।

মেঘের ভীষণ গর্জনে প্রকম্পিত হয় দিঙ্‌মণ্ডল, কিন্তু তার পরেই বৃষ্টির সুশীতল ধারায় শান্ত হয় সর্বলোক। পিতৃদত্ত অভিশাপে স্বামীর ভয়াবহ পরিণাম দর্শন করে দেবযানীর সমস্ত ক্রোধ ম্লান হয়ে গেল। পিতাকে জানালেন যাতে স্বামীর শাপমুক্তি ঘটে। শুক্রাচার্য বললেন, 'ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হবে না। তবে স্বেচ্ছায় কোন যুবক যযাতির জরা গ্রহণে সম্মত হলে আমাকে স্মরণ-মাত্র যযাতির জরা তার দেহে সঞ্চারিত হয়ে যযাতি তার যৌবন প্রাপ্ত হবে।'

উদ্বিগ্ন যযাতি ভাবতে লাগলেন, কেই বা তাঁকে যৌবন দান করবে, জরা গ্রহণে সম্মতই বা কে হবে! একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ডেকে তিনি বললেন, 'বৎস! শুক্রাচার্যের অভিশাপে আমার এই দুর্দশা। জ্যেষ্ঠ সন্তানের ওপরেই পিতার অধিকার অধিক। তুমি কি আমার জরা গ্রহণ করে তোমার যৌবন আমাকে দেবে? আমি যৌবন সম্ভোগে বঞ্চিত। এক হাজার বছর পরে আমার যৌবন তোমাকে ফিরিয়ে দেব।' যদু বললে, 'পিতা, আপনার জরা গ্রহণে আমার শরীর কৃশ ও দুর্বল হবে, আমার ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হবে, লোলচর্ম বলে আমাকে সকলে অবজ্ঞা করবে। যৌবনের দীপ্তিতে প্রাণোচ্ছল ও সুন্দর এই দেহে আপনার জরা গ্রহণ করার অপ্রীতিকর অনুরোধ আমাকে করবেন না। দয়া করে আপনার অন্য সন্তানদের বলুন।' একইভাবে অপর তিন পুত্রও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে আকুতি জানালে সে সসম্ভ্রমে বললেন, 'সে কি পিতা, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি এখনই আপনার জরা গ্রহণে প্রস্তুত। আমার যৌবন আপনি সম্ভোগ করলে আমি কৃতার্থ হব।' যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রকে আশীর্বাদ করে শুক্রাচার্যকে স্মরণ করামাত্র তাঁর জরা পুরুর দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তিনি পুরুর যৌবন লাভ করলেন।

নব বসন্তের সমাগমে যেমন প্রাণময়তার স্পর্শে সবকিছু হয়ে ওঠে প্রাণময়, জরা অন্তর্হিত হয়ে যৌবনের আবির্ভাবে যযাতির দেহও তেমনি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। যযাতি পূর্বের ন্যায় ঐহিক ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হলেন। বরং অধিকতর উগ্র ভোগসুখের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলল তাঁর জীবন।

হাজার বছরের সুদীর্ঘ যৌবনকালও একদিন মহাকালের নিয়মে শেষ হবার উপক্রম হলো। অফুরন্ত ভোগ-সুখে প্রমত্ত যযাতি দেখলেন, যে-দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে এখনও রয়েছে তার পরিপূরণের জন্য আরও কয়েক সহস্র বছরের যৌবন প্রয়োজন। কিন্তু এবার কে তাঁকে দেবে সেই পুনর্যৌবন লাভের আশীর্বাদ? কোথায় সেই যৌবন? এসব কথা ভেবে চঞ্চল যযাতির অন্তরে ছুটল অন্তহীন ভোগাকাঙ্ক্ষার তুমুল তুফান। ভাবতে লাগলেন, আবার সেই জরা? সেই বিভীষিকাময় বার্ধক্যের অসহনীয় অভিশাপ? চরম দুঃখে ও গভীর হতাশায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

ঠিক এই মানসিক বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে যযাতির মনে ভেসে উঠল এক দিব্যচিন্তার নির্মল তরঙ্গ। গভীর তন্ময়তায় সব চাঞ্চল্য দূর হয়ে শান্ত হলেন তিনি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উত্থিত প্রজ্ঞার পরিচ্ছন্ন আলোকে পর্যবেক্ষণ করলেন এক মহা-আসুরী শক্তি ভোগ-সম্ভোগের পিছনে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে। সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় ক্ষুধিত সেই অপশক্তি তাঁকে হাজার বছর ধরে তাড়িত করেছে। আরও কত সহস্র বছর ছোটাবে তা কে বলতে পারে! অথচ তাঁর অন্তরেই রয়েছে পরম প্রশান্তির এক পূর্ণ পারাবার। কে সেই অসুর? যে অপ্রতিহত গতিতে তাঁকে এতকাল তাড়িত করে চলেছে? উত্তর পেলেন—'কাম'। দুর্ধর্ষ 'কাম-তৃষ্ণা'ই তাঁর প্রধান শত্রু। বুঝলেন, কামই মানুষকে অশান্তির আলয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দেয় মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে। কিন্তু আজ তিনি পেয়েছেন এক নতুন আলোর সন্ধান। না—আর নয়। আর ভোগের দ্বারা তাড়িত হবেন না তিনি। আজ তিনি আবিষ্কার করেছেন এক মহাসত্য। আর তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর মনে নেমে এল এক স্বর্গীয় প্রশান্তি। যযাতি উপলব্ধি করলেন ঃ

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥

—উপভোগের দ্বারা কখনও কাম প্রশান্ত হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতিতে অগ্নির বৃদ্ধি পাওয়ার মতো তা ক্রমে বর্ধিতই হয়ে থাকে।*

* **মহাভারত ঃ আদিপর্ব, ৭৮ম অধ্যায় থেকে ৮৫তম অধ্যায় অবলম্বনে**

গ্রন্থ পরিচয়

বিশ্বজননীর সংসারে হল্যাণ্ডের সন্তান স্বামী অতুলানন্দ

হোসেনুর রহমান

With the Swamis in America and India : Swami Atulananda. Advaita Ashrama, Calcutta-700 014. Rupees Forty only.

ভারত-মার্কিন বেদান্তচর্চার অভিব্যক্তির একটি মূল্যবান অধ্যায় এই গ্রন্থ। আর এই অধ্যায়ের প্রধান আকর্ষণ গুরুদাস মহারাজ। গুরুদাস মহারাজ এক জীবনে বহু জীবনের বিস্তার ঘটাতে পেরেছেন। হল্যান্ডে জন্ম যাঁর, পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতায় অধিকার যাঁর সহজাত, তিনিই নতুন করে মন্ত্র নিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে। হল্যান্ড-বাসী কর্নেলিয়ান জে. হেজবুম হলেন স্বামী অতুলানন্দ—গুরুদাস মহারাজ। এমন সব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গুরুদাস মহারাজ সংসর্গ করলেন, যাঁরা রামকৃষ্ণদেবের দর্শন পেয়েছিলেন, যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই পৃথিবীতে বাস করেছেন সগৌরবে। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের এই সাধক-সমাজ ভারত-মার্কিন দূরত্ব মুক্ত হয়ে বহু মত ও পথের চর্চা করলেন।

এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ গুরুদাস মহারাজের ২৭৫টি চিঠির অংশবিশেষ। এই চিঠিগুলি পাঠককে বুঝতে সাহায্য করে অধ্যাত্ম-সাধন বলতে কি বোঝায়। বুঝতে সাহায্য করে আশ্রমজীবন, স্বরূপ-উপলব্ধি, সত্য-সন্ধান কোন্ পরিবেশে, কোন্ মানসিকতায় সম্ভব। এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে অন্ততঃ একটি চিঠির উল্লেখ করতে হয়। এই চিঠি

("Never Forget It", p. 132) গুরুদাস মহারাজ তাঁর চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বলছেন অকপটে। এই চিঠির প্রতিটি ছত্র প্রণিধানযোগ্য। ধর্ম, ঈশ্বর, জীবন—এসব নিয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব সীমাহীন। সীমাহীন মানুষের জিজ্ঞাসা। এ সব বহুস্তর-বিশিষ্ট জীবন পেয়েছিলেন গুরুদাস মহারাজ। তিনি আবার এসব বাঁক পেরিয়ে নব-চেতনার ঊষালোকে অবতীর্ণ হতেও পেরেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ বলছেন 'ধর্ম' শব্দটি তিনি পছন্দ করেন না। কারণ, এই শব্দটি বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও একই কথা।

হ্যাঁ, শিশুদের সঙ্গে ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে কথা বলা বিপজ্জনক। কারণ, তাদের অদ্ভুত (আমাদের অদ্ভুত মনে হয়, ওদের প্রশ্নগুলো ওদের কাছে ভয়ানক জরুরি, ভয়ানক সত্যও বটে) সব প্রশ্ন আমাদের জর্জরিত করে। অধিকাংশ সময়ই এসব প্রশ্নের জন্যে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি না। কোন কোন সময় আবার আমরা উত্তরগুলো তেমন ভাল জানি না। অতএব, গুরুদাস মহারাজের উপদেশ শিরোধার্য।

বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থে মার্কিন মুলুকে বেদান্তচর্চার সূচনা ও বিস্তারের ইতিহাস পাওয়া যাবে এবং তা কেবল শুষ্ক ইতিহাস নয়। তা হলো, দু-দেশের মানুষদের জীবনচর্যা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের ধর্মধারণার প্রকাশ। গুরুদাস মহারাজ যেদিন প্রথম দর্শন পেলেন স্বামী অভেদানন্দজীর (১৮৯৮) বা যেদিন ব্রহ্মচর্য দীক্ষা পেলেন (১ এপ্রিল, ১৮৯৯) বা যেদিন তুরীয়ানন্দ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্কিন দেশে এলেন (২৮ আগস্ট, ১৮৯৯) সেদিনই যথার্থ 'এক-জগৎ' চিন্তা আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো। আর গুরুদাস মহারাজ মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করলেন। মুক্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী ভারতদর্শন করলেন প্রায় ছ-বছর ধরে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এল সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত। স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। গুরুদাস মহারাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আপনি মায়ের কথা বুঝলেন কী করে? তিনি তো ইংরেজী বলতে পারতেন না। আর আপনি বাঙলা বোঝেন না। মহারাজের স্পষ্ট উত্তর: "When a child sits on its mother's lap, in which language do they converse? Similarly, I felt at that time as though the whole world were dissolved, and I was a small baby sitting on the lap of my mother. I felt inebriated, and I had no doubts." (পৃঃ ১০)।

গুরুদাস মহারাজ ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে গেলেন মার্কিন দেশের শান্তি আশ্রমে। শান্তি আশ্রম যেন মার্কিন দেশের আধুনিক চার্চ। এখানে মার্কিন নরনারী এসেছেন জ্ঞান, ভক্তি, সাধনা, ত্যাগ, প্রেম চর্চা করতে। এখানে স্বচ্ছন্দে এসে মিলেছে ভারতবর্ষ ও আমেরিকা। এ মিলন শীর্ষ সম্মেলনের মিলন নয়। এ মিলন জীবনের সঙ্গে জীবনের মিলন। লক্ষ্য: মহাজীবন। লক্ষ্য: অধ্যাত্ম-সাধনা। লক্ষ্য: সমস্ত ছোট ছোট কৃত্রিম গণ্ডি ভেঙে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির সাধনা। এ এক ধর্মভাব। এ যাঁকে আক্রমণ করে তিনি সত্যি সত্যিই "bitten by the cobra"। ছোট কোন পরিসরে আর তাঁকে ধরবে না। এবার জগৎজুড়ে তাঁর অভিযান।

গুরুদাস মহারাজই প্রথম পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী যিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিশ্বাস নিয়েছেন। মার্কিনদেশে বসেই সারদাদেবীকে যেন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রতিটি কাজে কর্মে। এই জীবনসাধনায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ। ভারতবর্ষে এসে গুরুদাস মহারাজ নিজের মধ্যে নিজেকে অশেষ করে ফিরে পেয়েছেন। এই পাওয়ায় তিনি পেলেন শান্তি ও আনন্দ। এখানেই আরম্ভ তাঁর জীবনলীলার চূড়ান্ত অধ্যায়।

ভারত-মার্কিন আধ্যাত্মিক চর্চা কতখানি উচ্চমার্গে পৌঁছেছে তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই গ্রন্থ পড়তে হবে। যাঁরা ভারতবর্ষের অনন্ত শক্তির কেন্দ্র কোথায় বুঝতে চান, যাঁরা ভারতবর্ষের মানবপন্থাকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের এই গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৯ অক্টোবর **কামারপুকুর আশ্রমের** নবনির্মিত একটি গৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। বাড়িটি অফিস ও বুকস্টলের জন্য নির্মিত হয়েছে। স্বামী গহনানন্দজী ঐ দিন জয়রামবাটীতে মায়ের পুরনো বাড়ির সংলগ্ন কয়েকটি ঘরকে নতুন করে নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই বাড়িগুলি শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-বিজড়িত।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর আশ্রম পরিচালিত জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের ছয়জন ছাত্র ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ১ম, ৪র্থ (দুজন), ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

গুজরাট বন্যাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে গুজরাটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভাবনগর, সুরেন্দ্রনগর, বাদোদারা, খেদা ও পঞ্চমহল জেলার ৪৩টি গ্রামের ২,৬৮৪টি পরিবারের মধ্যে ২৭,৪৭৭ কিলোঃ খাদ্যশস্য, ৫,৫৩৮টি শাড়ি, ধুতি, চাদর, ৬০২ মিটার কাপড় এবং ১,৬৫০টি প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামণ্ডিলি ও অচ্যুতপুরম মণ্ডলের চারটি গ্রামের ১৮৯টি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১৫৪টি শাড়ি, ১,০২৬টি বিভিন্নরকম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ৮৪টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গুন্টুর জেলার আদিবিপালেম, গঙ্গাদিপালেম, লঙ্কাবনী, দিন্ডা ও অন্য ২০টি গ্রামে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে ৩,৮৯২টি কম্বল, ১২,১৯৭টি বিভিন্নরকম পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামণ্ডিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে এবং আরো আঠারোটি বাড়ি তৈরির জন্য স্টোনব্লক তৈরি হয়েছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া)ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিজয়া দশমীর দিন সকাল ৭টায় দেবী দুর্গার পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। তার পূর্বে ২৬ সেপ্টেম্বর দেবী দুর্গা সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এবং ১৭ অক্টোবর ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটিঃ গত নভেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বেলা ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। ২, ৩ ও ১৬ নভেম্বর স্বামী ভাস্করানন্দ তিনটি বিতর্কসভা পরিচালনা করেন। প্রথম দুটি অল্প-বয়স্কদের এবং তৃতীয়টি বয়স্কদের জন্য।

গত ২২ নভেম্বর সিয়াটলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তধর্ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই বেদান্ত সোসাইটির সদস্যবৃন্দ যোগদান করেছিল। ২৩ নভেম্বর স্বামী ভাস্করানন্দ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য একটি ক্লাস পরিচালনা করেন।

সেন্টলুইস বেদান্ত সোসাইটিঃ নভেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় আলোচনা করেছেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। আলোচনার বিষয়গুলি ছিল—'ফ্রম দ্য ডাইরি অব এ মঙ্ক', 'সেলফ সারেন্ডার', 'টেল আস দ্য ওয়ে' এবং 'ইজ লাইফ অ্যান এম্পটি ড্রীম'। তাছাড়া তিনি প্রতি মঙ্গলবার 'কঠ উপনিষদ্' ও বৃহস্পতিবার 'লীলা-প্রসঙ্গ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন। ২৭ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিও পালন করা হয়েছে।

টরন্টো বেদান্ত সোসাইটি (কানাডা)ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিন পূজা, পাঠ, ভক্তি-গীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতির মাধ্যমে দেবী দুর্গার অর্চনা

করা হয়। পূজান্তে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ৺বিজয়াদশমীর দিন শান্তিজল সিঞ্চন করা হয়। নভেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেছেন স্বামী প্রমথানন্দ। তাছাড়া প্রতি বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও কঠ উপনিষদের ওপর ক্লাস হয়েছে।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি ঃ গত নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ভাষণ দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী গণেশানন্দ। প্রতি বুধবার রাজযোগ ও উপনিষদ্ এবং শনিবারগুলিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে।

মরিশাস আশ্রমে গত দুর্গাপূজায় মরিশাসের গভর্নর জেনারেল বীরস্বামী রিঙ্গাডু, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আর্মুগাম পরশুরাম এবং মরিশাসস্থ ভারতের হাইকমিশনার কে.এস. রানা যোগদান করেছিলেন।

ঢাকা আশ্রমে দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশের তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি জনাব মৌদুদ আহমেদ, তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান শেলী, আইনমন্ত্রী জনাব ফজলে রাব্বি, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিতাই রায়চৌধুরী এবং বাংলাদেশস্থ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের কন্সলেইট জেনারেলগণ এসে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দেহত্যাগ

গত ১১ অক্টোবর '৯০ **স্বামী অপূর্বানন্দ (শংকর মহারাজ)** বেলা ১টায় বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বার্ধক্যবশতঃ গত দুই বছর ধরে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। গত ১ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং চিকিৎসায় মোটামুটি সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ৮ অক্টোবর থেকে তিনি জ্বরাক্রান্ত হন এবং সেই সঙ্গে মূত্রসংক্রান্ত অসুবিধাও দেখা দেয়। ক্রমশঃ তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং অবশেষে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মরদেহকে সলিল সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী অপূর্বানন্দ ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন এবং ঐ বছরই বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) নিকট ব্রহ্মচর্য এবং ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন। ঐসময় শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্যের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শ্যামলাতাল আশ্রমের কর্মী ছিলেন এবং শেষ তিন বছর তিনি ঐ কেন্দ্রের প্রধানও ছিলেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ। তারপর তিনি ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। পুনরায় ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে বৃত ছিলেন। তিনি বাঙলা ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর কয়েকটি অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর গভীর ভালবাসা, মমতা ও শুভেচ্ছা লাভে ধন্য হয়েছেন। এসকল গুণাবলীর জন্য তিনি সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৩১ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি ও ২৭ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ এবং ২ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর ধর্মালোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৭, ২৮, ২৯ এপ্রিল '৯০ **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** নদীয়া জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** ৩য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বর্ধমান, বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গ থেকেও পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের ১ম অধিবেশন—প্রতিনিধি সভা সকাল দশটায়; দ্বিতীয় অধিবেশন—প্রশ্নোত্তরের আসর বেলা দুটোয়। স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী উমানাথানন্দ, স্বামী ইন্দ্রানন্দ মহারাজ উভয় সভাতেই উপস্থিত থেকে পরিষদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেন। সন্ধ্যায় বেহালার সুরপীঠ গোষ্ঠী অরুণচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় 'সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিন প্রথম অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিরা 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোকে নিজ জীবন গঠন' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন। বেলুড়স্থ সারদাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রী যুবকবৃন্দের পূর্ব অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফলাফল ভিত্তিক গান, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার অধিবেশন বসে। বিকালের সাধারণ জনসভায় প্রণবেশ চক্রবর্তী 'স্বামীজী আজও প্রাসঙ্গিক' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় ডোমজুড়ের ভক্তদলগোষ্ঠী ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। তৃতীয় দিন সকাল ৬টায় শহরের তিনটি প্রান্ত থেকে নগর-পরিক্রমা শুরু হয়, শেষ হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীর এই পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন বেলুড় মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণ। সকাল দশটায় স্বামী দেবদেবানন্দের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে 'কথামৃতের গান' পরিচালনা করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং সন্ধ্যায় গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দেবরাজানন্দ।

গত ২ জুলাই '৯০ সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ আশ্রমে পদার্পণ করেন। ৩ ও ৪ জুলাই দেড় শতাধিক ভক্ত নরনারীকে তিনি দীক্ষাদান করেন। ৩ জুলাই সন্ধ্যায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন পূজনীয় মহারাজ। ৪ জুলাই বিকালে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে যান।

গত ১১ নভেম্বর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ৭৫জন সহায় ও সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নববস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী উদ্গীথানন্দ, স্বামী ক্ষান্ত্যানন্দ, স্বামী ইন্দ্রানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ এবং স্বামী প্রভানন্দ।

গত ৩ জুন '৯০ **বলপাই বিবেকানন্দ আশ্রমের** ব্যবস্থাপনায় **হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** প্রথম জেলা যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল—বর্তমান সমাজে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা, গ্রামগঠনে বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রয়োগ, এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে যুবক-যুবতীদের ভূমিকা। আলোচনাসভাগুলি পরিচালনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিমলাত্মানন্দ, নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ শিবশংকর চক্রবর্তী এবং স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। তিনটি বিভাগে মোট ২৭ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সকালে শোভাযাত্রা, বিকালে প্রশ্নোত্তর-সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

নবব্যারাকপুর শ্রীসারদা সংঘ: নবব্যারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে সংঘের উদ্যোগে ১১ নভেম্বর রবিবার সারাদিনব্যাপী এক আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১১২জন মহিলা শিবিরে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সারদা সংঘের সদস্যাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা ছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রাণিয়া কুলটিকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ৩ ও ৪ নভেম্বর এই আশ্রমের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই দুই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা, পাঠ, সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ভক্তদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর অঙ্গ। এই সম্মেলন গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

রামপুরহাট রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ স্মরণ উৎসব সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় পুরনো হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৬টায় একটি প্রভাতফেরী ও বিকেলে ভজন ও কথামৃত পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় 'রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও শ্রীমা সারদাদেবী' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী দেবরাজানন্দ এবং 'আজকের সমাজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। রামপুরহাটে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে এই ধরনের প্রকাশ্য সভার আয়োজন এই প্রথম। সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়।

চিকিৎসা-শিবির

গত ১৮ নভেম্বর রবিবার **শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমের** সহযোগিতায় কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে আশ্রমে অষ্টম চিকিৎসা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক রোগীকে বিনাব্যয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সমাজসেবী ডাঃ সুধীর-কুমার রাহা, ডাঃ শচীনকুমার পাল চিকিৎসাকালে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। ২০৪জন রোগী বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার সুযোগলাভ করেন। সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত শিবিরের কাজ চলে। চিকিৎসা-শিবির উদ্বোধন করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য এবং ডাঃ তুষারকুমার মিত্র।

বস্ত্র-বিতরণ

হুগলী জেলার **ভদ্রেশ্বর সারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** ব্যবস্থাপনায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর '৯০ সঙ্ঘের মল্লিক-হাটী শাখায় এক অনুষ্ঠানে ঐ অঞ্চলের দুঃস্থ ১০০ জন নরনারীর মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন স্বামী সনাতনানন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিঘাটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান যোগেশ পাত্র। তাঁরা এই অনুষ্ঠানে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ওপর বক্তব্য রাখেন।

পরলোকে

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী **ডাঃ জগদ্বন্ধু মণ্ডল** গত ১৯ জুন সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে পরলোক-গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ মণ্ডল কর্মজীবনে সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেবাকার্যে যোগদান করেছিলেন।

পূর্ণিয়া (বিহার) নিবাসী **যদুপতি চট্টোপাধ্যায়** ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বল্প রোগভোগের পর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ১২ মে সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। উনি দশম সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশ্রিত ছিলেন। তিনি অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গ্রামে (১৯১৫) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যদুপতিবাবু পূর্ণিয়া, কাটিহার, আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অকপটতা ও সরল স্বভাবের জন্য সবার কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

জন্মগত ভাইরাস রোগ

যেসব ভাইরাস (জীব-পরমাণু) জন্মগত বা সহজাত (congenital) রোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে জানা গেছে, তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে যেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছেঃ রুবেলা ভাইরাস, সাইটোমেগালো ভাইরাস, ভেরিসেলা জস্টার ভাইরাস (যা পান বসন্ত রোগের কারণ), হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচ. আই. ভি.—যা এইড্‌স রোগ সৃষ্টি করে) এবং হিউম্যান পারভো ভাইরাস। এরা সবাই বর্ধনশীল ভ্রূণকে সংক্রমণ করে। সম্প্রতি জাপানী এনকেফেলাইটিস ভাইরাস ও লাসা ভাইরাস এবং কখনো কখনো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (যা জন্ডিস রোগের কারণ) মা থেকে শিশুকে সংক্রামিত করতে পারে বলে জানা গেছে। কয়েকটি ভাইরাস জন্মের সময় মা থেকে শিশুকে সংক্রমণ (perinatal infection) করে—হারপিজ সিমপ্লেক্স, ভেরিসলা জস্টার, আন্ত্রিক রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি, হেপাটাইটিস বি এবং হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস।

উপরিউক্ত ভাইরাসগুলির মধ্যে রুবেলা ভাইরাস মাকে যদি গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে সংক্রামিত করে, তাহলে তা ভ্রূণের ক্ষতি করবেই। জন্মের পর ঐসব শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে, হৃৎপিণ্ডের বা মানসিক অসুখ হতে পারে, চোখে ছানি পড়তে পারে বা তারা বধির হতে পারে। গর্ভাবস্থার ত্রয়োদশ এবং ষোড়শ সপ্তাহের মধ্যে যদি মা রুবেলা দ্বারা আক্রান্ত হন, তাহলে ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে শিশু বধির হয়; সপ্তদশ বা বিংশ সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত হলে খুব কম ক্ষেত্রেই শিশু বধির হয়। সম্প্রতি ৩৮টি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, গর্ভ হবার আগে মায়ের রুবেলা সংক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও শিশুর কোন অসুখ দেখা যায়নি। ছোট বেলায় রুবেলার বিরুদ্ধে টিকা নিলে, সন্তান ধারণকালে মায়েদের এই সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। গর্ভাবস্থায় রুবেলা সংক্রমণ হলে চামড়ায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয় মাত্র, মায়ের সাংঘাতিক কিছু অসুখ হয় না। সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রামিত হলে, মায়ের কোন অসুখই নজরে পড়ে না এবং মাত্র দশ শতাংশ ক্ষেত্রে ভ্রূণের সাংঘাতিক ধরনের ক্ষতি করে।

গ্রীষ্মপ্রধান এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স-এর শহরাঞ্চলে সন্তানধারণ-যোগ্য বয়সের মেয়েরা বেশি সংখ্যায় এইচ. আই. ভি. ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হচ্ছেন। এঁদের ৩০-৪০ শতাংশ ভাইরাস গর্ভে থাকাকালীন বা জন্মকালীন শিশুকে সংক্রমণ করে। এইসব শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ হয়—এরূপ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। এদের ২৫-৪০ শতাংশ দ্বিতীয় জন্মদিন পালন করার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ভেরিসেলা (চিকেন পক্স বা পানি বসন্ত) ভাইরাসের সংক্রমণ হলে, ভ্রূণের সেরকম কিছু ক্ষতি করে না। ভেরিসেলা জস্টার সম্বন্ধেও একই কথা।

প্রশ্ন উঠছে যে, গর্ভে থাকা ভ্রূণের এইসব ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে কিনা তা কি পরীক্ষা দ্বারা বলা যেতে পারে? কারণ, সেরকম প্রমাণ পেলে জন্মের আগেই গর্ভপাত (abortion) করান যেতে পারে। কোন কোন ভাইরাস-এর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে, তবে এই পরীক্ষা-প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু গলদ থাকা অসম্ভব নয়। এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ সন্দেহে এইরূপ পরীক্ষার বিপদ হচ্ছে যে, জরায়ু ফুটো করে গর্ভস্থিত জল বার করার সময় (aminocentesis) ভ্রূণ ঐ জল থেকে পাওয়া ভাইরাসদ্বারা সংক্রামিত হতে পারে।

[British Medical Bulletin, 5 May 1990, pp. 1151-1152]



UDBODHAN DECEMBER 1990 Licence No WB/NC/CL-3 R.N. 8793/57 Postal Reg. No. WB/NC-19

বার্ষিক গ্রাহকমূল্যঃ ছত্রিশ টাকা ☐ সডাক বিয়াল্লিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যাঃ পাঁচ টাকা
আজীবন গ্রাহকমূল্যঃ একহাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা)

সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ যুগ্ম সম্পাদকঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ



